Talkes delivered by Swami Samarpanananda on ***Veda*** before the students of Indian Spiritual Heritage Diploma Course at Ramakrishna Mission Vivekananda University, Belur Math.
(Transcribed and Edited by Amit Ray Chaudhuri)

ভারতের জাতীয় সুর

ঠাকুরের মহাসমাধির কিছু দিন পর স্বামীজী ভারত পরিক্রমায় বেরিয়ে ১৮৮৬ থেকে শুরু করে ১৮৯৩ সালে আমেরিকা যাওয়ার আগে পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন জায়গায় পরিক্রমা করলেন। ঘুরতে ঘুরতে তিনি বর্তমান পাকিস্থানের সিন্ধু নদীর অববাহিকায় চলে গিয়েছিলেন। পাকিস্থান তখন ভারতেরই অঙ্গ ছিল। স্বামীজীর ভারত পরিক্রমাতে ভারতের ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধ ও ধর্মীয় স্থানগুলি বেশি প্রাধাণ্য পেয়েছিল। সিন্ধু নদীর তীরে স্বামীজীর একটা দিব্য দর্শন হয়েছিল, পরের দিকে নিবেদিতাকে তিনি এই দিব্য দর্শনের কথা বলেছিলেন। একদিন ভোরবেলায় স্বামীজী দেখছেন সিন্ধু নদীর তীরে এক প্রাচীন ঋষি বসে আছেন আর তাঁর উপর কুয়াশার ঢেউ যেন আছড়ে পড়ছে। স্বামীজী নিজের ভাষায় বলছেন waves of darkness। ভোরের আবছা আলোয় স্থুল চক্ষু দিয়ে এই দিব্যদর্শনে পরিষ্কার দেখছেন একটার পর একটা কুয়াশার ঢেউ ঋষির উপর আছড়ে পড়ছে আর কর্ণে স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছেন ঋষি ঋগ্বেদের একটি মন্ত্র বৈদিক সুরে আবৃত্তি করছেন। মন্ত্রটি সরস্বতী দেবীর বন্দনা – *আবহি বরদে দেবী যৎচ্ছরিতম্ আবাদিনী গায়ত্রী ছন্দসাম্ মাতা ব্রহ্মযোনি নমহোস্তুতে*। এটাই বাগদেবীর আবাহন মন্ত্র। স্বামীজী আগে থেকেই বৈদিক সুর জানতেন, তিনি প্রচুর জায়গায় গিয়েছিলেন, বিভিন্ন জায়গায় তিনি বেদের অনেক পণ্ডিতদের সংস্পর্শেও এসেছিলেন। যদিও স্বামীজী বেদের পণ্ডিত ছিলেন না, কিন্তু যে সুরে বেদের মন্ত্র আবৃত্তি করা হয় সেই সুরটা তাঁর জানা ছিল। তিনি লক্ষ্য করলেন ঋষির মন্ত্রোচ্চারণ আর তাঁর সুর বর্তমানে যে সুর ও ছন্দে বেদের মন্ত্র আবৃত্তি করা হয় তার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। নিবেদিতাকে স্বামীজী বলছেন – আমি যেন ঘুম থেকে উঠলাম আর ঋষির সাথে সুর ও ছন্দ মিলিয়ে বেদের ওই মন্ত্রোচ্চারণ করতে লাগলাম। এই সুর ও ছন্দকে নিয়ে স্বামীজী নিবেদিতাকে বলছেন – শঙ্করাচার্যেরও নিশ্চয়ই এই রকম কোন দিব্য দর্শন হয়েছিল, যার ফলে ভারতের যে জাতীয় সুর সেই সুরকে শঙ্করাচার্য ধরতে পেরেছিলেন। স্বামীজীর জীবনে দিব্য দর্শনের ঘটনা খুব কমই শোনা যায়। যে কটি দিব্য দর্শনের কথা স্বামীজী নিজের মুখে বলে গেছেন তার মধ্যে এটি একটি অন্যতম দিব্য দর্শন।

স্বামীজী নিবেদিতাকে ভারতবর্ষের যে জাতীয় সুরের কথা বলছেন, ভারতের সেই জাতীয় সুর হল বেদ। স্বামীজীর বিশ্বাস শঙ্করাচার্য এই সুরকে ধরতে পেরেছিলেন। তারপরেই তিনি বলছেন, এরপর হয়ত নিশ্চয়ই শঙ্করাচার্যের জীবন সম্পূর্ণ পাল্টে গিয়েছিল। এই দিব্য দর্শনের পর স্বামীজীর জীবনেও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সূচিত হল। তার আগে পর্যন্ত স্বামীজীর মধ্যে অনেক টানাপোড়েন চলছিল, অনেক আগেই তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়ে গিয়েছিল, পিতৃবিয়োগের পর জ্যেষ্ঠ সন্তান হেতু তাঁর উপর মা ও ছোট ছোট ভাইবোনদের দেখাশোনার দায়ীত্ব চেপে গেল। এদিকে শ্রীরামকৃষ্ণ অন্য এক জগতের জ্ঞানের রত্নভাণ্ডার তাঁর কাছে উন্মোচিত করে দিয়েছেন, সমাধির উপলব্ধিও হয়ে গেছে, অন্য দিকে ভারতবর্ষের কুসংস্কারের বিভীষিকায় তিনি মর্মে মর্মে জর্জরিত হয়ে আছেন। সিন্ধু নদীর তীরে এই দিব্য দর্শনের পর থেকেই স্বামীজীর চিন্তা-ভাবনার জগৎ যেন একটা নতুন আকার নিতে শুরু করে দিল। কিসের আকার? এই রাষ্ট্রীয় সুরের আকার নিতে শুরু করল।

যে কোন বিষয় নিয়ে আমরা যে পড়াশোনা করছি, সব বিষয়েরই একটা মূল সুর থাকে। এই মূল সুরকে যদি একবার কেউ ধরে নিতে পারে তখন বাকিটা তার হাতের খেলনা হয়ে যাবে। মূল সুরকে ধরাটাই অসম্ভব ব্যাপার। ঈশ্বর যতক্ষণ না চাইবেন কেউ এই জাতীয় সুরকে ধরতে পারবেন না। কারণ তিনি জানেন কাকে দিয়ে তাঁর কার্যোদ্ধার করা যাবে। তিনি যদি দেখেন একে দিয়ে আমার কাজ হবে তখন তিনি এই সুরটা তাঁকে ধরিয়ে দেন। তাহলে কি চৈতন্য মহাপ্রভু, কবীর দাস, মীরাবাঈদের এই রাষ্ট্রীয় সুর ঈশ্বর দেননি? না, এনারা কেউ পাননি। কারণ জাতীয় সুর তাঁরাই পান যাঁরা দেশকে আধ্যাত্মিকতা, ধার্মিকতা, সামাজিকতা, রাজনীতিকতা সব কিছু দিয়ে একটা সূত্রে বেঁধে দিতে পারবেন। ঈশ্বর কাউকে দিয়ে এটা করাচ্ছেন আবার কাউকে দিয়ে অন্য কিছু করাচ্ছেন, কিন্তু তিনি যা কিছুই করান না কেন তাঁর একটাই উদ্দেশ্য মানুষকে মুক্তির পথে নিয়ে যাওয়া। স্বামীজী এক জায়গায় বলছেন I will not siez to work till the world knows

that it is one with God, জগৎ ঈশ্বরের সাথে এক, যতক্ষণ এই সত্যকে এই সৃষ্টি না জানতে পারছে ততক্ষণ আমি আমার কাজ করে যেতে থাকব, আমার এই স্থূল শরীরের পতন হয়ে যাবে তারপরেও আমি সূক্ষ্ম শরীরে কাজ করতে থাকব যাতে পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জানতে পারে সে ঈশ্বরের সঙ্গে এক।

জগৎ ঈশ্বরের সঙ্গে এক, এই জ্ঞান একমাত্র ভারতবর্ষেই আছে, অন্য কোন জাতির কাছে এই জ্ঞান নেই, অন্য কোন ধর্মের কাছেও নেই। *অহং ব্রহ্মাস্মি* এই উচ্চতর জ্ঞান একমাত্র হিন্দু ধর্মের কাছেই আছে। তাই হিন্দু ধর্মকে যদি রক্ষা করা হয় তাহলে পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রক্ষা হয়ে যাবে। হিন্দু ধর্ম মানেই ভারতবর্ষ। স্বামীজী যখন ভারতবর্ষকে রক্ষা করার কথা বলছেন, দেশ সেবার কথা বলছেন তখন এর একটাই উদ্দেশ্য, এই শ্রেষ্ঠ জ্ঞানকে রক্ষা করা। কোন অবতারই দু-পয়সা কাজের জন্য পৃথিবীতে আসেন না, অবতাররা কখনই এসে বলবেন না যে তুমি শুধু দেশের সেবা করে যাও। অবতার সব সময়ই পুরো মানবজাতির কল্যাণের জন্য আসেন, তিনি কোন বিশেষ দেশ, জাতি বা ধর্মের মঙ্গল সাধন করার জন্য অবতার হয়ে আসেন না। কিন্তু এই উচ্চতম বিদ্যা একমাত্র ভারতবর্ষের কাছেই আছে, সেইজন্য স্বামীজী সবার আগে ঘোর তমোগুণে আচ্ছন্ন ভারতবর্ষকে জাগ্রত করার কাজে এগিয়ে এলেন। আমার কাছে একটা বিদ্যা আছে কিন্তু আমি বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছি। এই বিদ্যাকে পাওয়ার জন্য আগে আমার বেহুঁশ অবস্থাটা কাটাতে হবে, বেহুঁশ অবস্থা না কাটলে এই বিদ্যা পাওয়া যাবে না। আগেকার দিনে লোকেরা টাকা-পয়সা, সোনার গয়না মাটিতে পুঁতে রাখত। ছেলের অসুখ করেছে, চিকিৎসার জন্য প্রচুর টাকার দরকার। কিন্তু বাড়ির কর্তা একমাত্র জানে কোথায় টাকা-পয়সা পুঁতে রাখা হয়েছে। কর্তা যদি বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকে বাড়ির লোকেরা আপ্রাণ চেষ্টা করবে তার হুঁশ ফিরিয়ে আনার জন্য – ওগো! কোথায় রেখেছ। ভারতবর্ষের কাছে জগতের অমূল্য সম্পদ গচ্ছিত আছে। কিন্তু ভারতবর্ষ ঘুমিয়ে আছে, বহিরাগতরা এসে ভারতের উপর অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে। দেশকে না বাঁচালে এই বিদ্যা সম্পদ হারিয়ে যাবে। স্বামীজী তাই ধাক্কা মেরে মেরে ভারতবর্ষকে জাগ্রত করার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ভারতবর্ষকে যদি বাঁচানো না যায় তাহলে এই অমূল্য সম্পদ নষ্ট হয়ে সৃষ্টির বিনাশ হয়ে যাবে। আমেরিকা ইউরোপে শুধু ভোগবাদ, সেখানে আত্মানুসন্ধান নেই। ভারতেও ভোগবাদ আছে কিন্তু আত্মার অনুসন্ধান একমাত্র ভারতেই হয়ে থাকে। কিন্তু ভারতবর্ষ শত শত বৎসরের শোষণ নিপীড়নে উল্টে পড়ে আছে, তাকে চাঙ্গা করে দাঁড় করাতে হবে। ভারতবর্ষ একবার দাঁড়িয়ে গেলে বিশ্বের সব কিছুই আবার স্বাভাবিক ভাবে চলতে থাকবে। স্বামীজী তাই এক জায়গায় বলছেন – ভারত যদি মরে যায় তাহলে জগৎ আর বাঁচবে না, ভারত যদি বেঁচে থাকে তবেই জগৎ টিকে থাকবে, তাই সর্বাগ্রে ভারতকে বাঁচাও।

যখন কেউ বলে স্বামীজী সত্যিকারের একজন দেশপ্রেমিক ছিলেন, তখনই এগুলো সব মুর্খের মত কথা হয়ে যায়। স্বামীজী কেন দেশপ্রেমিক হতে যাবেন! উনি নিজেই বলছেন – আমি কি শুধু ভারতবর্ষের! কি করে তিনি শুধু ভারতবর্ষের হবেন! সমস্ত মানবজাতির কল্যাণের জন্য তাঁর আগমন। স্বামীজী ভারতবর্ষকে কেন এত গুরুত্ব দিচ্ছেন? কারণ, যে কাজের জন্য স্বামীজী এসেছেন সেই বিদ্যাটা ভারতের কাছেই আছে, তাই ভারতকে আগে চাঙ্গা করতে হবে। আজ সারা ভারত যদি মুসলিম রাষ্ট্র হয়ে যায় তাহলে মানবজাতির যে উচ্চতম উপলব্ধি সেটাই চিরদিনের মত চলে যাবে। অন্য ধর্মে আমিই সেই ব্রহ্ম বললে গলা কেটে রেখে দেবে। যেমন সেক্সপিয়রের রচনা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনাকে নাশ করা যায় না, আইনস্টাইনের থিয়োরীকে যেমন নাশ করা যায় না, তেমনি এই ব্রহ্মবিদ্যাকেও নাশ করা যায় না। যে করেই হোক এই ব্রহ্মবিদ্যাকে বাঁচাতে হবে। কারণ মানবজাতির যে মন, সেই মনের শ্রেষ্ঠতম উপলব্ধি হল এই ব্রহ্মবিদ্যা। ভবিষ্যতে এমন একদিন আসবে সবাই এই ব্রহ্মবিদ্যাকে পেয়ে যাবে। মাইকেল ফ্যারাডে বিদ্যুৎ শক্তির আবিষ্কার করার পর রানী এসে জিজ্ঞেস করলেন – এই বিদ্যুৎ মানুষের কি কাজে লাগবে? মাইকেল ফ্যারাডে বললেন – শিশু যখন জন্ম নেয় তখন কেউ জানে না এই শিশু কি কাজে লাগবে, বড় হওয়ার পরেই জানা যায়। আমিও জানি না এই বিদ্যুৎ শক্তি কি কাজে লাগবে। সেই বিদ্যুতের শক্তি আজ ঘরে ঘরে কাজ করে চলেছে। বিদ্যুৎ শক্তি ছাড়া মানবজাতির জীবন কল্পনাই করা যায় না। যে বিদ্যা একজনের কাছে ছিল সেই বিদ্যা আজ ঘরে ঘরে প্রবেশ করে গেছে। আমরা বিদ্যুৎ শক্তির প্রয়োগ ক্ষমতা ও কৌশলকে না বুঝে থাকতে পারি, তার বৈশিষ্ট্যকে আমরা না বুঝতে

পারি কিন্তু এই বিদ্যা আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কাজ করে চলেছে। *অহং ব্রহ্মাস্মি*, আমি সেই পূর্ণব্রহ্ম, এই বিদ্যা আমি আপনি জানি না, বুঝি না। কিন্তু এই বিদ্যা ভারতবর্ষের ঘরে ঘরে ছেয়ে আছে। ভারতের সাহিত্য, কলা, কৃষ্টি এই বিদ্যাকেই অবলম্বন করে দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের অবতারবাদ, ভক্তিশাস্ত্র, যোগশাস্ত্র, কর্মবাদ সব এই একটি বিদ্যাকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু এই বিদ্যার অন্য একটা দিক আছে, এই বিদ্যার সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার পর তার যে ব্যবহারিক প্রয়োগ হবে তখনই সেখানে অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত শক্তির প্রকাশ এসে যাবে। সেখানে তখন আর কোন কাপুরুষতার, কোন দুর্বলতার স্থান থাকবে না। এই বিদ্যাই কয়েক ধাপ নীচ থেকে ভারতের ঘরে ঘরে পাওয়া যাবে। কিন্তু এই বিদ্যার উচ্চতম প্রকাশ, পূর্ণ সত্য রূপে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে, স্বামীজীর জীবনে অভিব্যক্ত হয়েছিল, তাঁদেরও আগে শঙ্করাচার্যের জীবনে পাওয়া গিয়েছিলে, তাঁরও আগে শত শত মুনি ঋষিদের জীবনে এই বিদ্যা পূর্ণ রূপে প্রতিভাসিত হয়েছিল। এই শত শত মহাত্মাদের পূত জীবনের সান্নিধ্য আর শিক্ষাতেই ভারতবর্ষ শক্তিমান হয়ে সারা বিশ্বের বুকে দাঁড়িয়ে আছে।

আমাদের মনে স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন আসতে পারে এই বিদ্যার শক্তির মূল কেন্দ্রটা কোথায় ছিল? এর একটাই উত্তর, এই উচ্চতম আধ্যাত্মিক বিদ্যা এসেছে বেদ থেকে। সেইজন্য বেদই ভারতের একমাত্র ঠিক ঠিক রাষ্ট্রীয় সুর। পাশ্চাত্য জগৎ অর্থ সম্পদ তৈরী করতে জানে, বোমা বানাতে জানে। এসব করতেও অনেক কারিগরি বিদ্যার দরকার, এই বিদ্যারও প্রয়োজন আছে। বোমা বানাবার পরই তো জানা গেলে বোমা থেকে কিভাবে বিদ্যুৎ তৈরী করা যায়। নিউক্লিয়ারকে নিয়ে মানবজাতির কল্যাণে এখন কত রকম কাজ হয়ে চলেছে। আইনস্টাইনের থিয়োরী অফ রিলেটিভিটি আবিষ্কারের সময় সব কিছু academic জিনিস ছিল। বাড়িতে ধর্মের কথা বললে সবাই বলবে, ধর্মের কথা বুড়ো বয়সে করা যাবে। কারণ তাদের কাছে ধর্ম একটা academic জিনিস। বিদ্যুৎ শক্তির তত্ত্বটাও academic ছিল, থিয়োরী অফ রিলেটিভিটিও academic ছিল, প্লেটোর সিদ্ধান্তগুলিও academic জিনিস ছিল। প্লেটোর সিদ্ধান্ত থেকেই পরে পরে বিজ্ঞানের থিয়োরী এসেছে। কিন্তু ব্যবহারিক জীবনে এই জিনিসগুলি প্রত্যেক মানুষকেই স্পর্শ করে যায়। ব্যবহারিক জীবনে এগুলোকে নামাতে সময় লাগে, স্বামীজীও এই বিদ্যাকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রত্যেক মানুষের জীবনে নামানোর চেষ্টা করলেন।

বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্যতা অর্জন করে। ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্যই হল ব্রহ্মবিদ্যা। এই ব্রহ্মবিদ্যা বেদে আছে। সেইজন্য বেদ ভারতবর্ষের জাতীয় সুর। যার জন্য স্বামীজী বলছেন – নিশ্চয়ই শঙ্করাচার্য এই রকম কোন একটা অনুভূতি পেয়েছিলেন। স্বামীজী খুব সুন্দর বলছেন – শঙ্করাচার্য আসলে কি? তিনি হলেন বেদ ও উপনিষদের যে সৌন্দর্য, তার যে ছন্দ তারই মুর্ত রূপ, Throbing of the beauty of the Vedas and Upanishads, Shankaracharya is the personification of that throbing। শঙ্কারাচার্যে জীবনে বেদ আর উপনিষদের সৌন্দর্য মুর্ত রূপ ধারণ করেছে। ভারতে মাত্র তিনজন মহাত্মা এসেছেন যাঁদের জীবনে বেদের এই সৌন্দর্য মুর্ত রূপ ধারণ করেছে, তাঁদের একজন ব্যাসদেব আর বাকি দুজন হলেন শঙ্করাচার্য আর স্বামী বিবেকানন্দ। এখানে অবতার পুরুষদের আনা যাবে না, শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামকৃষ্ণ, চৈতন্য এনারা আলাদা থাকের। কিন্তু এই তিনজন হলেন বেদের সৌন্দর্যের প্রতিমুর্তি। বেদের প্রতিমুর্তি তাঁরা নন, বেদ উপনিষদের যে সৌন্দর্য আর সেই সৌন্দর্যের যে খেলা তার জীবন্ত মুর্ত রূপ এই তিনজন। তাই যিনি ব্যাসদেব তিনিই শঙ্করাচার্য, তিনিই স্বামী বিবেকানন্দ, কোথাও কোন পার্থক্য নেই। যার জন্য স্বামীজী ওই দিব্য দর্শনের পর বলতে পারলেন – নিশ্চয়ই শঙ্করাচার্যের এই রকম কোন দিব্য দর্শন হয়েছিল যার ফলে তাঁর পরবর্তি জীবন-ধারা পুরো পাল্টে গেল। স্বামীজীর জীবনেও এই একই ব্যাপার ঘটে গেল। স্বামীজীর পুরো রচনাবলী, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, রাজযোগ ও কর্মযোগ তাঁর যে কোন রচনাই নেওয়া হোক না কেন, সবটাই বেদের যে সৌন্দর্য তারই মুর্ত রূপ।

স্বামীজীর বিখ্যাত উক্তি – মুর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী আমার ভাই, আমার প্রাণ। স্বামীজীর কথার মধ্যে কি রকম একটা আবেগময়তার ভাব, কি রকম একটা দেশভক্তির কথা। কিন্তু আসলে এগুলো কিছুই নয়। এটাই বেদের একটি আধ্যাত্মিক সত্য, এটাই বেদের সৌন্দর্য। বেদেই বলছে *ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমান্ অসি ত্বং উত বা কুমারী। ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতো ভবসি*

বিশ্বতোমুখঃ।। হে পরমাত্মা! তুমিই নারী তুমিই পুরুষ, তুমিই কুমার তুমিই কুমারী। যে বৃদ্ধ দণ্ড হস্তে স্খলিত পদে হেঁটে যাচ্ছে সেই বৃদ্ধও তুমি। এটাকেই স্বামীজী নিজের ভাষায় বলছেন মুর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আর ব্রাহ্মণ ভারতবাসী আমার প্রাণ। মানুষ ফিল্মস্টার, মন্ত্রী, পণ্ডিতদের দৌড়ে দেখতে যায়। কারণ এদের মধ্যে তারা সেই দিব্য মুর্তি দেখছে। তারা ভুল কিছু দেখছে না। কিন্তু দিব্য মুর্তির আরেকটি দিকও আছে, যে মুর্খ সেও দিব্য, যে দরিদ্র সেও সেই দিব্য মুর্তির প্রকাশ। এই এক কথা বেদও বলছে আবার স্বামীজীও বলছেন। কিন্তু স্বামীজীর নতুনত্ব হল তিনি যুগোপযোগী করে বলে দিলেন। স্বামীজীর কথা কি বেদের অনুবাদ? কিছুই না, বেদের এই মন্ত্র একজন ঋষি বলেছিলেন, এটাই আরেকজন ঋষি বলছেন। কথা একই বলছেন। কি একই কথা? যিনি ঈশ্বর তিনিই নানান রূপ ধারণ করেছেন। এই কথাকে বেদের ঋষি এক ভাবে বলেছেন আর স্বামীজী রাষ্ট্রীয় সুরকে ধরার পর আরেক ভাবে বলছেন। এর মধ্যে কোন দেশভক্তি নেই, কোন আবেগময়তা নেই। মুর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী আমার প্রাণ, স্বামীজীর এই উক্তি একটা আধ্যাত্মিক সত্যের শব্দ বিন্যাস। ভারতের এই রাষ্ট্রীয় সুরকে ঋষিরা ধরতে পেরেছিলেন। এই সুরকে ধরেই ঋষিরা সমগ্র ভারতবর্ষকে একসূত্রে বেঁধে দিলেন। এই জাতীয় সুরকে ধরেই কন্যাকুমারী থেকে কাশ্মীর আর আসাম থেকে পাঞ্জাব পর্যন্ত সমগ্র মানবজাতিকে ঋষিরা একটা অখণ্ড জাতিতে দাঁড় করিয়ে দিলেন। একটা সময় এই বাঁধনটা একটু আলগা হতেই আবার শঙ্করাচার্য এসে আধ্যাত্মিক রশি দিয়ে পুরো জাতিকে একসূত্রে বেঁধে দিলেন। ভারতবর্ষে যত রকম মতবাদ, সংস্কৃতি ছিল সবটাকে এক জায়গায় সম্মিলিত করে দিলেন। বাড়িতে পূজা অর্চনা করার সময় আমরা যে পঞ্চদেবতার পূজা করছি, এই পঞ্চদেবতার পূজা শঙ্করাচার্যের অবদান। তাছাড়া গুরুপূজা, গণেশ পূজা শঙ্করাচার্যেরই অবদান।

শঙ্করাচার্যের পর আবার স্বামীজী এসে এই রাষ্ট্রীয় সুরে পুরো দেশকে একসূত্রে বেঁধে দিলেন। ব্যাসদেব, শঙ্করাচার্য আর স্বামীজী আধ্যাত্মিকতার পথ অবলম্বন করে এক করলেন। রাজনীতির সাহায্যেও এই কাজ করা যায়, যেমন গান্ধীজী চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তার পরিণতি কি হতে পারে চোখের সামনেই দেখছি। আরও অনেকেই চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তারও পরিণাম আমরা দেখেছি। কিন্তু শঙ্করাচার্যের মত বা ব্যাসদেবের মত কাশ্মীরেও স্বামীজী সমাদৃত হয়ে চলছেন, কন্যকুমারীতও স্বামীজী সমাদৃত হয়ে চলছেন, আবার কামাক্ষ্যাতেও হয়ে চলেছেন, কচ্ছতেও চলেছেন। তার কারণ স্বামীজী জাতীয় সুরটাকে ধরতে পেরেছিলেন। জাতীয় সুরটা কি? জাতীয় সুর হল বেদ। স্বামীজীর এই দিব্য দর্শন বা তাঁর এই আধ্যাত্মিক অনুভূতিকে যদি আমরা মনে রাখতে পারি তাতেই আমরা বুঝে নিতে পারবো বেদ জিনিসটা আসলে কি।

শব্দের শক্তি

আমাদের সমগ্র জীবন মুখ আর গলা এটুকুর মধ্যেই সঙ্কীর্ণ হয়ে আছে। যা কিছু খাওয়া-দাওয়া করছি তার স্বাদ মুখটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ঠাকুর বলছেন সন্দেশ গলার নীচে যেতে না যেতেই সব শেষ। কথাও যা বেরিয়ে আসে সব গলা থেকে শুরু হয়ে মুখের কাছেই শেষ হয়ে যায়। আমাদের জীবনে খাওয়া আর কথা ছাড়া কিছু নেই। বাকি সব কিছুর গোলমাল হয়ে গেলেও এই দুটো ঠিক থাকলেই হল, এই দুটো দিয়ে জীবন আরামসে চলে যাবে। যখন বলছি আমি তোমাকে ভালোবাসি, সেটাও মুখের কথা। আর যখন বলছি আমি এটা করব, সেটা করব, তখন সেটাও মুখের কথা ছাড়া কিছু না। যত বই পড়ছি সবটাই মুখের কথা, নিউজপেপার, ম্যাগাজিন সবই মুখের কথা। কিন্তু কদাচিৎ কখন কেউ যখন মৌন অবস্থায় চলে যান আর তখন সেখান থেকে যে শব্দগুলি ভেসে ওঠে, সেই শব্দগুলিই অনেক দামী হয়ে যায়। একজন সাংবাদিক একবার খুব দুঃখ করে তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলছিলেন। 'সকাল থেকে আমাকে কত খাটতে হয়, খবরের কাগজের জন্য কাহিনী তৈরী করতে হবে, তার সম্পাদনা করতে হবে, ছাপার পর প্রুফ দেখতে হবে, দেখার পর সম্পাদকের কাছে পাঠাতে হবে। সম্পাদক যদি কিছু পাল্টাতে চান সেটাকে আবার সংশোধন করতে হবে। এত খাটুনির পর ক্লান্ত ক্ষুধার্ত হয়ে বাইরে বেরিয়ে ঝালমুড়িওয়ালার কাছে ঝালমুড়ি কিনে খেতে খেতে পায়চারি করতে থাকি। হঠাৎ নজরে আসে আমারই লেখা কাগজ দিয়ে ঝালমুড়ির ঠোঙা বানান হয়েছে। এখনও এই লেখা কাগজে বেরোয়নি, যে খবর আগামীকাল বেরিয়ে এসে আলোড়ন তৈরী করবে তার আগেই সেই প্রুফ দেখা

কাগজ দিয়ে ঝালমুড়ির ঠোঙা বানানো হয়ে গেছে। সেদিন থেকে আমার খবর তৈরী করার প্রতি একটা বিতৃষ্ণার ভাব এসে গেল’। আমাদের কাছে খবরের কাগজের দাম কতক্ষণ? যতক্ষণে পাতাটা ওল্টানো হচ্ছে। আগামীকাল এই খবরের কাগজই আবর্জনার বাক্সে চলে যাবে। কিন্তু মৌন অবস্থায় যে কথাগুলো বেরিয়ে আসে সেই কথাগুলো অনেক দিন চলতে থাকে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা, গল্প, উপন্যাস আমরা কতবার পড়ছি, স্বামীজীর কথা কতবার পড়ছি। কারণ এই কথাগুলির মধ্যে একটা বিশেষ শক্তি আছে।

আমাদের মধ্যে শক্তি নেই, তাই আমাদের কথারও কোন দম নেই। আমরা ভালো কথা যা বলি তারও শক্তি নেই। তবে খারাপ কথা যা বলি তার মধ্যে একটা শক্তি থাকে। যদি কাউকে বলি তোমাকে আমি কত স্নেহ করি, এই কথা তার মনে হয়ত কোন রেখাপাত করবে না, কিন্তু একবার যদি তাকে বলে দিই তুমি একটা গাধা, তুমি একটা অপদার্থ, সারা জীবন সে এই কথা মনে রেখে দেবে। কারণ আমাদের ভেতরটা বিষে টইটুম্বুর আর বাইরে মুখে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে যাচ্ছি। জগতের প্রতি, জগতের সবারই প্রতি আমাদের শুধু দ্বেষ ভাব, জগতকে কি করে পিষে নিজের পায়ের তলায় রাখা যেতে পারে, কি করে ছলে বলে কৌশলে নিজেকে সবার উপরে রাখা যায়, এই ভাব আমাদের সবারই মধ্যে কম বেশি আছে। এই ভাবকে কেন্দ্র করেই আমাদের বাকি সমস্ত চিন্তা ভাবনা চলতে থাকে। এরপর আমাদের মুখ থেকে যে কথাই বেরোবে সেটাই একটা মিথ্যা ভাষণ হয়ে যায়। নিজের স্বার্থের একটু হানি হলে কেউ কাউকে ছাড়বে না, স্বার্থের কারণে দুদিন পরে সে ভুলে যাবে। কারণ আমাদের ভেতরটা বিষে ভর্তি হয়ে আছে কিনা। কাউকে যে খারাপ কথা বলছি সেটা যেন রাইফেলের গুলি মত বেরিয়ে এসে তাকে বিদ্ধ করছি, আবার যখন মিষ্টি কথা বলছি তখন রাইফেলের ঐ গুলিই হাতে করে ছুড়ছি। হাত দিয়ে রাইফেলের গুলি ছুড়লে কিছুই হবে না, কিন্তু বিষবাক্যগুলি রাইফেলের গুলি হয়ে বেরিয়ে আসছে। কবিরা যে কথাগুলি কাব্যের মাধ্যমে দেন তখন সেই কথাগুলো রাইফেলের গুলি মত বেরিয়ে আসে। সেইজন্য অনেক দিন ধরে মানুষ সেটাকে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে থাকে।

বেদ ও সনাতন সত্য

কিন্তু মানুষ যখন মনের আরও গভীরে চলে যায়, যদিও ঋষিরাই একমাত্র ওই গভীরে যেতে পারেন, তখন তাঁর কথাগুলি আর শব্দ রূপেও থাকে না। মনের গভীরে চলে যাওয়া মানে সমাধি অবস্থায় চলে যাওয়া। সমাধি অবস্থাতেই ঋষিদের কাছে জীবের সত্য, জগতের সত্য, স্রষ্টার সত্য, সৃষ্টির সত্য, এই সত্যগুলি উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। তিনি তখন জেনে যান – এটাই সত্য। সেখান থেকে যে কথাগুলি বেরিয়ে আসে সেই কথাগুলি তখন আর তাঁর কথা থাকে না। সমগ্র কথামৃতে যত কথা আছে তার একটিও ঠাকুরের কথা নয়, তখন এগুলোই হয়ে যায় ঈশ্বরীয় কথা। কোরান মহম্মদের কথা নয়, বাইবেল যীশুর কথা নয়, বেদও কোন ঋষির কথা নয়। বেদের কথা মানেই সনাতন সত্য। ঋষিরা যখন ধ্যানের গভীরকে অতিক্রম করে সমাধির অবস্থায় চলে গেলেন, সেই অবস্থায় তখন তাঁর কাছে যে সত্যগুলি উদ্ভাসিত হল, সেই সত্যগুলিকেই তিনি পরে নিজের শিষ্যদের বলে দেন, সেটাই তখন হয়ে যায় বেদবাক্য। তাঁর হয়ত অনেক শিষ্য, কোন শিষ্য গুরু যেমনটি বলেছেন তেমনটিই লিপিবদ্ধ করে রাখলেন, আবার কোন শিষ্য গুরুবাক্যকে মনে রাখার জন্য সেটাকে ছন্দোবদ্ধ করে কবিতার আকারে রেখে দিলেন। কিন্তু কোরান আর বাইবেলের সাথে বেদের সব থেকে বড় পার্থক্য হল, কোরান আর বাইবেলে একজন দ্রষ্টা কিন্তু বেদে দ্রষ্টা রূপে শত শত ঋষির নাম পাওয়া যায়।

ঋষিরা যে সত্যগুলিকে প্রত্যক্ষ করেছেন সেই সত্যগুলিকেই সমগ্র বেদে ধরে রাখা হয়েছে, এর বাইরে বেদে আর কিছু নেই। দ্বিতীয় আরেকটি কথা বলা যায় তা হল, মনকে অতিক্রম করে যাওয়ার অবস্থা যেখানে যেখানে বর্ণনা করা হয়েছে সেটাই ঠিক ঠিক বেদ। নিজে নিজে বেদ অধ্যয়ন করে কখনই বেদের জ্ঞান অর্জন করা যায় না, গুরুর কাছে বেদ অধ্যয়ন না করলে বেদের জ্ঞান হবে না। গুরু শিষ্য পরম্পরাতেই বেদের জ্ঞান অর্জন করা হয়। সিদ্ধ গুরু যখনই শিষ্যকে বেদের মন্ত্র দেবেন তখনই ওই মন্ত্রের কাজ শুরু হবে, তার আগে মন্ত্র মুখস্ত করে লক্ষ লক্ষ জপ করলেও কিছু হবে না। তৃতীয় হল যেটা এর আগে আমরা দীর্ঘ আলোচনা করলাম, বেদই ভারতের জাতীয় সুর। শেষ কথা হল, স্বামী বিবেকানন্দকে কে স্বামী বিবেকানন্দ বানিয়েছেন?

কোন একজনকে দিয়ে তো স্বামী বিবেকানন্দ আজকের স্বামী বিবেকানন্দ হননি, শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন আছেন, তেমনি তাঁর মা-বাবা আছেন, স্বামীজীর নিজস্ব অনেক উপলব্ধিও আছে। কিন্তু তার মধ্যেও আমরা আজ যেভাবে স্বামীজীকে নেতা রূপে, দেশের জাতীয় আদর্শ রূপে দেখছি, এই আদর্শ রূপে, নেতা রূপে স্বামীজীকে সার্থক রূপে প্রতিষ্ঠিত করার পেছনে সব থেকে বেশি অবদান বেদের। যে কোন জীবনকে সার্থক করে দেওয়ার ক্ষমতা বেদের আছে। তা সে যে কোন জীবনই হোক না কেন, তিনি কোন গৃহিণীই হন, কিংবা বড় অফিসার হন তাতে কিছু আসে যায় না।

ঋষিরাও এই কথা বলছেন, আমি ধন্য হয়েছি তুমিও ধন্য হও। কিভাবে ধন্য হবে? আমি যেভাবে বেদের সত্যকে প্রত্যক্ষ করেছি তুমিও সেভাবে সত্যকে প্রত্যক্ষ কর। প্রত্যক্ষ না করা পর্যন্ত কিছু হবে না। যেমন *ওঁ সহনাববতু*, আমাকে এই মন্ত্র প্রত্যক্ষ করতে হবে, আমাকেও তাই এই রকমই হতে হবে, যতক্ষণ না প্রত্যক্ষ হয় জীবন ধন্য হবে না, বেদের মন্ত্র ততক্ষণ শব্দ মাত্র রূপে থাকবে। শব্দ রূপে থাকলে জীবন সার্থক হবে না, আর সত্য যদি প্রত্যক্ষ হয়ে যায় তাহলে জীবন ধন্য হয়ে যাবে। বেদ মানে এই কটি জিনিসের মধ্যে বাচ খেলা – ঋষিরা ধ্যানের গভীরে সনাতন সত্যগুলিকে প্রত্যক্ষ করেছেন সেই সত্যের বর্ণনাই বেদে করা হয়েছে, দ্বিতীয় বেদ সব সময় গুরু-শিষ্য পরম্পরাতেই চলে। তাহলে যারা প্রত্যক্ষ করেনি তারা কিভাবে পাবে? গুরু-শিষ্য পরম্পরাতেই পেয়ে যাবে। তৃতীয় বেদকে পালন করলে মানুষের জীবন সার্থক হয়ে যায়। আর শেষ কথা হল, বেদই ভারতের জাতীয় সুর। প্রত্যেক ভারতবাসীর বিশেষ করে হিন্দুর একটাই কাজ, নিজের জীবনকে বেদের মুর্ত রূপে প্রতিষ্ঠিত করা আর বেদকে আদর্শ করে সমাজ ও জগতের সামনে নিজেকে মেলে ধরা। আমাদের যদি কেউ জিজ্ঞেস করে বেদ কি, তখন আমরা যেন বলতে পারি, বেদ মানে আমি, আমিই বেদের মুর্ত রূপ। শ্রীরামকৃষ্ণকে যেমন নরেন্দ্র নাথ দত্ত প্রশ্ন করছেন – আপনি কি ঈশ্বরকে দেখেছেন? শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন- দেখেছি কি বলছিস! তোকেও দেখিয়ে দিতে পারি। বেদের মুর্ত রূপ কেন? কারণ আমি এর সত্যকে প্রত্যক্ষ করেছি। শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদের ঋষি, যিনি সত্যকে প্রত্যক্ষ করেছেন, বলছেন – *বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। তমেব বিদিত্বাহতি মৃত্যমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেহয়নায়।।* ঋষি দু হাত তুলে বলছেন আমি সেই পুরুষকে, সেই ঈশ্বরকে জেনেছি। তিনি কি রকম? *আদিত্যবর্ণং*, তিনি উজ্জ্বল জ্যোতির্ময়, *তমসঃ পরস্থাৎ* তিনি সমস্ত অন্ধকারের পারে। এখানে কোন কোটেশান নেই, অমুক বলেছিলেন, তমুক নেতা বলেছিলেন, স্বামীজী বলছেন, নেতাজী বলছেন এসব কিছু নেই। তোমার নিজের কথা বল, তুমি কি ঈশ্বরকে দেখেছ? যদি না দেখে থাক তাহলে এসব কথা বলা বন্ধ কর। স্বামীজীর একটা কথাকে ধারণা করতে পেরেছ? ঠাকুরের একটি কথাকে তুমি নিজের জীবনের আদর্শ তৈরী করেছ? কামিনী-কাঞ্চন থেকে তোমার কি বৈরাগ্য এসেছে? তুমি কি ত্যাগ তপস্যায় প্রতিষ্ঠিত? যদি না হয়ে থাকে তাহলে এর ওর কোটেশান দেওয়া বন্ধ কর। বেদের একটাই কথা, আমারই কথা আমি বলছি, আমি যা দেখেছি তাই বলছি। আমি কি দেখেছি? *বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্*, আমি সেই পরম পুরুষকে জেনেছি, সেই ঈশ্বরের কথাই আমি তোমাকে বলছি। এটাই ভারতের জাতীয় সুর। ঈশ্বর আছেন, ঈশ্বর কৃপা করেন এসব কথা বন্ধ করে আগে বল – তুমি কি ঈশ্বরকে দেখেছ, তোমাকে কি ঈশ্বর কৃপা করেছেন?

বেদ কি, বেদের কেন এত মাহাত্ম্য, বেদের বিষয় বস্তু কি, বৈদিক যুগে ধর্ম এবং আধ্যাত্মিক নিয়ে আমাদের পূর্বজদের চিন্তা-ভাবনা কেমন ছিল, এগুলোকে নিয়ে আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি। যদিও সম্পূর্ণ বেদ অধ্যয়ন করতে আমাদের কয়েক জন্ম লেগে যেতে পারে, তবুও বেদ সম্বন্ধে যাতে একটা স্বচ্ছ ধারণা আমাদের হয়, সেই উদ্দেশ্য নিয়েই আমাদের এই আলোচনা। যদিও হিন্দু ধর্মের সমস্ত শাস্ত্রের জনক বেদ কিন্তু হিন্দু ধর্মের অন্যান্য শাস্ত্র থেকে বেদ সম্পূর্ণ আলাদা। সাধারণ মানুষের পক্ষে বেদ সত্যিই অত্যন্ত কঠিণ। বেদ অধ্যয়ন ও অধ্যয়নের জন্য আচার্যের সংখ্যাও ইদানিং খুবই সীমিত। সীমিত হওয়ার পেছনেও অনেক কারণ আছে। প্রথম কারণ বেদের পরিধি এত বিশাল যে এর বিশালত্বকে আমরা ধারণাই করতে পারব না, আধ্যয়ন করা তো তার পরের কথা। অন্যান্য ধর্মের যত ধর্মগ্রন্থ আছে সব ধর্মগ্রন্থের তুলনায় বেদ বিশাল, বিশালত্বের দিক দিয়ে বেদের সাথে কোন ধর্মগ্রন্থের তুলনা করা দূরে থাক কল্পনাই করা যায় না।

ধর্ম ও ধর্মের গতি প্রকৃতি

বেদের উপর আলোচনা শুরু করার আগে ধর্ম ও ধর্মের গতি প্রকৃতি এবং জীবন-দর্শনের কিছু জিনিসকে আমাদের ভালো করে বুঝে নেওয়া দরকার। যে কোন ধর্মকেই একটা ধর্মীয় গ্রন্থকে অবলম্বন করে চলতে হয়। ধর্মগ্রন্থ না থাকলে ধর্ম হবে না। দেখা গেছে যে যে ধর্মের কোন ধর্মগ্রন্থ ছিল না সেই ধর্মগুলি ইতিহাস থেকে হারিয়ে গেছে। কারণ ধর্মগ্রন্থই একটা ধর্মের পরম্পরাকে ধরে রাখে। আমাদের জীবন দুই প্রকার, একটা বাহ্য প্রকৃতির জীবন, যে জীবনকে আমরা পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করি। আরেকটি হল অন্তঃপ্রকৃতির জগৎ। বড় বড় ইতিহাসবিদরা, যাঁরা মানবজাতিকে নিয়ে চিন্তন করেছেন, তাঁরা বলছেন, মানুষের যদি খাওয়া-পড়ার ব্যবস্থা নিশ্চিত হয়ে যায়, বহিঃশত্রুর আক্রমণের আশঙ্কা না থাকে, তখন ধীরে ধীরে মানুষের মন ভেতরের দিকে যেতে শুরু করে। যখন ভেতরের দিকে যাত্রা শুরু হয় তখন জন্ম নেয় বিভিন্ন রকম সংস্কৃতি ও কলার, যেমন কবিতা, চিত্র, ভাস্কর্য, সঙ্গীত, নৃত্য ইত্যাদি। সেইজন্য দেখা যায় যেসব জাতি বেশির ভাগ সময় যুদ্ধ-বিগ্রহে ব্যস্ত থাকে, খাওয়া-পড়ার অভাব থাকে সেই সব জাতি খুব বর্বর প্রকৃতির হয়। যে সমাজের মানুষকে বিষম পরিস্থিতির সাথে লড়াই করে জীবন ধারণ করতে হয়, সেই সমাজের মানুষরা সব সময় বাহ্য প্রকৃতিকে জয় করাতেই সমস্ত চেষ্টা লাগিয়ে দেয়। বাহ্য প্রকৃতিকে জয় করতে গিয়ে তারা ধীরে ধীরে বিজ্ঞান প্রযুক্তির দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। ভারতবর্ষ প্রথম থেকেই নিজেকে অন্তর্জগতের অনুসন্ধানে নিযুক্ত রেখেছে। অন্তর্জগতের যাত্রায় প্রথমেই যেটা দেখা যায় তা হল তারা সংস্কৃতিতে খুব উন্নত হয়। সেখান থেকে তারা মূল্যবোধের দিকে বেশি করে চলে যায়। তার মধ্যে কিছু মানুষ অস্তিত্বকে নিয়ে গভীরে চিন্তনে ডুবে থাকেন।

কোন জাতি যখন প্রথম চিন্তন করতে শুরু করে তখন তারা প্রথমে দেখে আমি আছি, জগৎ আছে, আর আমি এই জগতেরই একটি অঙ্গ, এই জগতটাই শেষ কথা। এই জায়গাতে প্রথম যে দর্শন জন্ম নেয় সেই দর্শনকে বলে ভৌতিকবাদ। সেখান থেকে চিন্তা করে আরেকটু এগিয়ে যখন বিচার করতে থাকে তখন তাকে বলে বিজ্ঞান। ভৌতিকবাদ আর বিজ্ঞান মোটামুটি একই কথা বলে। এই দুটোকে অতিক্রম করে যখন সে নিজের মনকে নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে তখন একটা দর্শনের জন্ম নেয় যার নাম অস্তিত্ববাদ বা Existencialism। এটাই সক্রেটিসের দর্শনের মূল, আমি আছি জগৎ আছে, কিন্তু আমি জগতের অঙ্গ নই। অন্য দিকে উনি আবার ভগবান মানতেন না, তিনি জানতেনই না ভগবান কি। সক্রেটিসের কাছে নীতিবোধ, মূল্যবোধের গুরুত্ব বেশি ছিল। তৃতীয় আরেকটি দর্শনে বলা হয়, আমি আছি, জগৎ আছে আর তার সাথে আরেকটি সত্তা আছে। এই সত্তাকে বিভিন্ন ভাবে পরিভাষিত করা হয়। এই সত্তাকে মুসলমানরা বলছে আল্লা, হিন্দুরা বলছে ঈশ্বর বা ব্রহ্ম, খ্রীশ্চানরা বলছে গড্। এই দর্শনকে বলে ধর্মীয় দর্শন।

ধর্মীয় দর্শন তিনটে জিনিসকে নিয়ে বেশি আলোচনা করে – জীব, জগৎ আর ঈশ্বর। বিজ্ঞান শুধু জীব আর জগৎকে ব্যাখ্যা করে, কিন্তু ধর্মীয় দর্শন জগতকে ব্যাখ্যা করবে, জীবের ব্যাখ্যা করবে আর তার সাথে ঈশ্বরকেও ব্যাখ্যা করবে। ধর্মীয় দর্শন জীব আর জগতের থেকে ঈশ্বরকে বেশি ব্যাখ্যা করে। কিন্তু কিছু দিন পরে সব ধর্মই দেখে আমরা যা বলছি, যা কিছু করছি এই দিয়ে সব কিছুকে স্পষ্ট ভাবে দাঁড় করান যাচ্ছে না, কোথাও কোথাও ফাঁক থেকে যাচ্ছে। তখন তাঁরা আরও গভীরে চলে যান। আরও গভীরে যেতে যেতে ওনারা যেন মৌন হয়ে যান। মৌনের পরে আরেকটি অবস্থায় চলে যান, যে অবস্থাকে আমরা বলি সমাধি। প্রথমে শুরু হয় কাজ, সব সময় কাজ আর কাজ, কাজের পেছনে সবাই ছুটতে থাকে। কাজের প্রকোপ কমে যাওয়ার পর আসে কথাবার্তা। এই কথাবার্তাও যখন থেমে যায় তখন মৌন অবস্থায় চলে যায়, যেখান থেকে কবিতার জন্ম হয়, দর্শনের জন্ম হয়। এই মৌন অবস্থাকেও অতিক্রম করার পর একটি অবস্থায় চলে যায়, তখন আসে ঠিক ঠিক ঈশ্বর চিন্তন। মানুষ যখন কাজের মধ্যে ডুবে থাকে তখন তার সামনে কিছু সত্য ভেসে আসে, যখন কথাবার্তা, চিন্তা-ভাবনার বিচার বিনিময় করে তখন আরও কিছু সত্য সামনে আসে। এরপর মৌন অবস্থায় চলে যাওয়ার পর সে অনুভব করে আমার আরও অনেক কিছু জানার আছে। কিন্তু মানুষ যখন সমাধির অবস্থায় চলে যায় তখন সে আর কিছু শেখে না, তখন সে ঈশ্বরের সম্মুখীন হয়ে যায়। ঈশ্বরের সাক্ষাৎ হয়ে যাওয়ার পর এই জীব, জগৎএর যে সত্য, সেই সত্যটা তার সামনে ভেসে ওঠে। তখন তিনি দেখছেন এটাই একমাত্র সত্য।

তিনি তাঁর এই সত্যানুভূতিকে নিয়ে কারুর সাথে যুক্তিতর্ক করতে যাবেন না। ঠাকুর একজনকে বিরক্ত হয়ে বলছেন 'আমি তোমার সঙ্গে কী তর্ক করব আমি এই রকমই দেখেছি'। দেখা মানে বোধে বোধ করা। তাঁরা যে জিনিসগুলিকে বোধে বোধ করেন সেগুলোকেই বলা হয় আধ্যাত্মিক সত্য। সব ধর্মই এই আধ্যাত্মিক সত্যের উপর দাঁড়িয়ে আছে। ঠাকুর যে বলছেন সব ধর্ম দিয়ে সেই এক জায়গাতেই যাওয়া যায়, তার মানে ঠাকুর এখানে আধ্যাত্মিকতার যে শেষ কথা সেই সত্যের কথা বলছেন।

কিন্তু সমস্যা হল, মৌনের পর যে মন দিয়ে শব্দ বেরোচ্ছে, যে মন দিয়ে কার্য হয়, সেই মন তাকে ছেড়ে দেয়। মনের পারে তিনি কি দেখছেন, বাস্তবিক তিনি কি অনুভব করছেন, সেটা কি করে বলবেন! তাঁরা শুধু বলছেন জিনিসটা এই রকম। ওই অনুভূতিকে যখন জগতের সাথে মেলাতে যাচ্ছেন তখন আর মেলানো যাচ্ছে না। কারণ ঈশ্বর বা আধ্যাত্মিক সত্তার সাথে এই জগতের কোন কিছুর মিল পাওয়া যাবে না। তাঁর শিষ্যরা হয়তো তাঁর মত উচ্চ আধারের নন, তাঁদেরকে যখন তিনি তাঁর আধ্যাত্মিক সত্যের অনুভূতি বোঝাতে যাচ্ছেন তখন শিষ্যরা কিছুটা বুঝলেন কিছুটা বুঝলেন না। বিশ্ব আধ্যাত্মিক ইতিহাসে আমরা একমাত্র স্বামীজীকেই পাই যাঁর মধ্যে তাঁর গুরুর মতই জ্ঞান ছিল। ঠিক ঠিক জ্ঞান না থাকার জন্য পরের দিকে শিষ্যরা গুরুর উপলব্ধ জ্ঞানের অনুভূতিকে বুঝতে গিয়ে অনেক গোলমাল করে বসেন। যার ফলে জীব আর জগতকে ঈশ্বরের সঙ্গে মেলাতে গিয়ে অনেক কিছু এলোমেলো করে দেন। শিষ্যরা গুরুর কাছে কিছু কিছু জিনিস শোনার পর লিখে রেখেছেন, আবার নিজেরা যুক্তিতর্ক দিয়ে কিছু জিনিসকে দাঁড় করাচ্ছেন। যে জিনিসগুলিকে নিজের যুক্তিতর্ক দিয়ে দাঁড় করাচ্ছেন, সেটাকেই বলা হয় ধর্মীয় দর্শন। গুরুর কাছে যে আধ্যাত্মিক সত্যগুলি শুনেছেন, ওই সত্যকে কোন দিন প্রশ্ন করা যাবে না। বাইবেলকে প্রশ্ন করলে সে আর খ্রীশ্চান থাকবে না, কোরানকে প্রশ্ন করলে সে আর মুসলমান থাকবে না। ঠিক সেই রকম যে বেদকে প্রশ্ন করবে সে আর হিন্দু থাকল না। যে বলবে আমি এই ধর্মের লোক তাকে সেই ধর্মের ধর্মগ্রন্থের কাছে মাথা নত করে রাখতে হবে। কারণ ওই তত্ত্বগুলিকে তিনি যেমনটি দেখেছিলেন ঠিক তেমনটি তাঁর শিষ্যদের বলে দিয়ে গেছেন। আধ্যাত্মিক সত্যের যিনি দ্রষ্টা তিনি আবার সব কথা বলে দিতে পারেন না। ঠাকুর একবার তাঁর শিষ্যদের বলছেন, আজ তোদের আমি সব কথা বলে দেব। তারপর তিনি ধীরে ধীরে সমাধিতে চলে গেলেন, তারপর দেখছেন কে যেন তাঁর মুখ চেপে রাখছে। যার জন্য কেউ যদি বলে দেন আমি ঈশ্বরের ব্যাপারে সব কথা বলে দেব, বুঝে নিন ঈশ্বরের ব্যাপারে তাঁর আদৌ কোন ধারণাই নেই।

যীশু ঠিক কি দেখেছিলেন, ঠাকুর ঠিক কি দেখেছিলেন আমরা কখনই জানতে পারবো না। আমরা তাহলে কিভাবে জানতে পারবো? তাঁদের যে কথাবার্তাকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তাই দিয়ে আমরা জানতে পারছি। এটাকেই বলা হয় দর্শন। দার্শনিক সত্যগুলোকে সেখানে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু যেহেতু আমাদের অন্নগত প্রাণ, ভোগ-বাসনার মধ্যে পড়ে থাকার জন্য কিছু দিন পর মানুষ ওই সত্যকে নিতে পারে না। তাদের জন্য তখন দরকার হয় ধর্মের সহজীকরণ। সহজীকরণ করার জন্য কাহিনী নিয়ে আসা হল। এভাবেই জন্ম নেয় ধর্মীয় পুরাণ কথা বা পৌরাণিক কাহিনী। জগতে সাধারণ মানুষের সংখ্যাই বেশি, তাই যে কোন ধর্মের পৌরাণিক কাহিনীর এত জনপ্রিয়তা। হিন্দু ধর্মের পৌরাণিক কাহিনী আসে বাল্মীকি রামায়ণ, মহাভারত আর পুরাণ থেকে। বেদ উপনিষদে শুধু মাত্র আধ্যাত্মিক সত্যগুলিকে রাখা হয়েছে। ঋষিরা ধ্যানের গভীরে যে আধ্যাত্মিক সত্যগুলিকে দেখেছিলেন সেই সত্যগুলিকেই বেদে ধরে রাখা হয়েছে।

বেদের ব্রাহ্মণরা সবাই খুব উচ্চমানের সাধক ছিলেন, তাঁদের বেশির ভাগই ঋষি ছিলেন। কথামৃতে ঠাকুর বর্ণনা দিচ্ছেন আগেকার ঋষি মুনিরা কত খাটতেন, সকালবেলায় কুঠিয়া থেকে বেরিয়ে যেতেন আর সারা দিন তপস্যা করতেন, সন্ধ্যেবেলায় কুঠিয়ায় ফিরে একটু ফলমূল খেয়ে থাকতেন। এই তপস্যার জন্যই তাঁদের কাছে আধ্যাত্মিক সত্যগুলি উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। বেদের ঋষিরা সেই সময় কয়েকটা জিনিস করতেন। তারমধ্যে একটা ছিল দর্শনের সত্যগুলির আলোচনা। এছাড়া তখনকার সময়কার কিছু কিছু পৌরাণিক কাহিনীর আলোচনা করা আর সারা দিন ধরে যজ্ঞ করতেন। যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও তপস্যা এর বাইরে কিছু করতেন না। জাগতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ স্বচ্ছলতার দিকে তাঁদের কোন দৃষ্টি ছিল না, সেইজন্য বেদের ব্রাহ্মণরা প্রথম থেকেই

গরীব ছিলেন। মনু তাঁর স্মৃতিশাস্ত্রে বলছেন, যে ব্রাহ্মণের কাছে টাকা-পয়সা আছে বা জীবিকার জন্য কোন কাজ করছে, সেই ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণ বলে মানবে না। বেদের ব্রাহ্মণ মানেই, তিনি সারাটা জীবন বেদ অধ্যয়ন করবেন, যজ্ঞ করবেন আর শিষ্যদের বেদ অধ্যয়ন করাবেন। শিষ্যত্ব করে বেদ অধ্যয়ন করাবেন কিন্তু বিনিময় কোন অর্থ নিতে পারবেন না। স্বামীজী জাতিপ্রথাকে কখন নিন্দা করেছেন আবার কোন কোন পরিপ্রেক্ষিতে প্রশংসাও করেছেন, কিন্তু ব্রাহ্মণদের ব্যাপারে তিনি বলছেন – তোমরা এই ব্রাহ্মণদের নিন্দা করছ! কিন্তু ভুলে যেও না এই ব্রাহ্মণরা যদি না থাকত তাহলে তোমাদের সংস্কৃতি কবেই ধ্বংস হয়ে যেত আর ব্রাহ্মণরা না থাকলে মুসলমানরা সবাইকে ধর্মান্তরিত করে নিত।

বেদের বিশালত্ব

চারটি বেদের চারটে করে ভাগ, সুতরাং যে ষোলটা ভাগ তার মধ্যে ঋগ্বেদের যে সংহিতা, তাতে শুধু মন্ত্রই আছে। কিন্তু শুধু মন্ত্র পড়লে বেদের কিছুই বোঝা যাবে না, সাথে সাথে ভাষ্য না পড়লে মন্ত্রের সঠিক অর্থ অনুধাবন করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য। বেদের উপর ভাষ্য রচনা করার দুঃসাহস কেউ করেন না। কিন্তু সায়নাচার্য ঋগ্বেদের শুধু সংহিতার অর্থাৎ মন্ত্র অংশের ভাষ্য রচনা করে গেছেন। সায়নাচার্য শঙ্করাচার্যের পরবর্তি কালের, তাও আজ থেকে প্রায় হাজার বছর আগে। শঙ্করাচার্যও বেদের ভাষ্য রচনা করেননি, কিন্তু সায়নাচার্য পরে এই গুরু দায়ীত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। তাও তিনি চারটি বেদের ঋগ্বেদের সংহিতার মন্ত্রগুলিকেই বেছে নিলেন ভাষ্য রচনা করার জন্য, আর তাতেই তার মোটা মোটা বারোটা খণ্ড লেগে গেল। ভাষ্য ছাড়া বেদের কিছুই বোঝা যায় না, সহজ সরল সেই মন্ত্রগুলিই আমরা সচরাচর আবৃত্তি করে থাকি। ম্যাক্সমুলার সায়নাচার্যের ভাষ্য পড়ে বেদের অনুবাদ করতে গিয়েও অনেক ক্ষেত্রে গোলমাল করে ফেলেছেন। এটা অবশ্য মানতে হবে যে চারটে বেদের মধ্যে ঋগ্বেদ সব থেকে বৃহৎ। তা সত্ত্বেও একটা জিনিস বুঝতে হবে যে ঋগ্বেদের শুধু মন্ত্রের অর্থ লিখতে যদি বারোটা খণ্ড লাগে তাহলে ঋগ্বেদের বাকি তিনটে বিভাগ এবং সামবেদ, যজুর্বেদ ও অথর্ববেদের চারটে করে যে বিভাগ আছে – মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ, বেদের এই সমগ্র পুঁথিগুলিকে যদি একসাথে রাখা হয় তাহলে পুরো একটা ঘরই ভরে যাবে। সুতরাং একজনের পক্ষে এক মনুষ্য জন্মে সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করা দুঃসাধ্য। এই স্বল্প পরিসরের মধ্যে বেদের সামগ্রিক আলোচনা করাও তাই কখনই সম্ভব নয়। যারা বেদ নিয়ে চর্চা করেন তাঁরাও সমগ্র বেদের ব্যাপারে বলতে গেলে খেই হারিয়ে ফেলেন।

বেদের নিজস্ব পৃথক ব্যাকরণ সহ একটি অভিধান আছে, যার শেষ সংস্করণ যীশুর জন্মের চারশো বছর আগে হয়েছে। এর থেকে বোঝা যায় আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগে বেদের ভাষা অপ্রচলিত হয়ে গেছে। সেই অপ্রচলিত ভাষাকে বোঝার জন্য আড়াই হাজার বছর আগে একটা অভিধান লেখা হয়েছিল। বেদ বেশির ভাগ লোকের না বুঝতে পারার জন্য ভাষাগত কারণও অন্যতম। আরও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা যে বেদের যে কত পুঁথি হারিয়ে গেছে তার কল্পনাই করা যায় না। যা আমাদের কাছে এখন আছে তার একটা ধারণা এখানে দেওয়া হল। সেইজন্য বেদের সামনে এসে মানুষ হাত-পা ছেড়ে অসহায় হয়ে বসে পড়ে। যারা গবেষণা করে খুব বড় বিশেষজ্ঞ হয়ে গেছেন তারা একটু আধটু বোঝেন, আর দক্ষিণ ভারতে, বেনারসে কিছু কিছু ব্রাহ্মণ পরিবার আছেন যাঁরা এখনও নিষ্ঠা সহকারে অধ্যয়ন করে বেদকে বংশপরম্পরায় ধরে রেখেছেন।

বেদের সামগ্রিক চিত্রকে তুলে আনা এখানে সম্ভব নয়, কিন্তু আমরা জানতে চেষ্টা করব বেদে মূলতঃ কি আছে, আর কিছু প্রচলিত মন্ত্র নিয়ে আলোচনা করা হবে। বেদ আসলে কি বলতে চাইছে সেই ব্যাপারে একটা স্পষ্ট ধারণা একবার হয়ে গেলে ভারতীয় অন্যান্য ধর্মশাস্ত্রগুলি অধ্যয়ন করার সময় মূল জিনিস গুলি বোঝার ক্ষেত্রে অনেকটাই সুবিধা হবে। যেমন গীতাতে এমন অনেক শ্লোক আছে যা কিছুতেই বোঝা যায় না কি বলতে চাইছেন। বিভিন্ন আচার্যরা তাঁদের ভাষ্যে বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করলেও পরিষ্কার হয় না, কিন্তু বেদের ধারণা থাকলে বোঝা যায় এই শ্লোকগুলি এই এই কারণে বলা হয়েছে। যেমন গীতার পঞ্চোদশ অধ্যায়ে আছে – *অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা,* এখানে মনে হবে হঠাৎ বৈশ্বানর কেন বলতে গেলেন, বেদ পড়া থাকলে বোঝা যায় এই এই কারণে বৈশ্বানর বলা হচ্ছে, বৈশ্বানর বললে এর আলাদা একটা মাত্রা যোগ হয়ে যায়। গীতার তৃতীয় আর চতুর্থ অধ্যায়ে অনেক প্রকারের যজ্ঞের কথা বলা হয়েছে, একটি শ্লোকে বলা হচ্ছে – *কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি*

ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবং, এই ধরণের শ্লোকগুলি বেদের ধারণা যতক্ষণ না হবে ততক্ষণ বোঝা যায় না, তা নাহলে শ্লোকগুলি মাথা থেকে হারিয়ে যাবে।

বেদ পাঠের অধিকার

বহু কাল ধরে আমাদের একটা প্রচলিত ধারণা চলে আসছে যে শূদ্রের বেদ শুনতে নেই। কিন্তু বেদেই একটা মন্ত্র আছে যা এই ধারণার উল্টো কথাই বলছে। যজুর্বেদের ছাব্বিশ অধ্যায়ে এই মন্ত্রের মূল তাৎপর্য হল, এক ঋষি প্রার্থনা করছেন হে ঈশ্বর! আমি যেন বেদের এই সুমধুর কথা, বেদের সুমহান তত্ত্বগুলি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্র, আমার সন্তানদের, অন্যের সন্তানদের, দেশে বিদেশের আপামর সাধারণ মানুষকে বলতে পারি। স্বামীজীর খুব প্রিয় মন্ত্র – *শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্যা পুত্রা*, এখানেও সারা বিশ্বের সমস্ত মানুষের কথা বলা হচ্ছে। এটা একটা মারাত্মক ভুল ধারণা যে সবাইকে বেদ বলতে নেই। অনেক ঋষিরা চাইতেন না যে আমার এই অনুভূতিলব্ধ জ্ঞান মুর্খদের কাছে চলে যায়। কিন্তু এখানে ঋষি বলছেন আমি যেন আমার উপলব্ধ জ্ঞান সবাইকে বলতে পারি। পরের দিকে বেদ মুষ্টিমেয় কয়েকজন বোদ্ধাদের জন্য রেখে সাধারণ মানুষের জন্য প্রাচীর তুলে দিয়েছিল। মনুস্মৃতিতেই আবার বলছে ব্রাহ্মণ বেদ না পড়িয়ে মরে যায় তাও ভালো কিন্তু তবুও সে যেন অপাত্রে কখনই বিদ্যা দান না করে। কিন্তু বেদের মূল দর্শনে এই ধরণের প্রতিবন্ধকতা তৈরী করা হয়নি, শুধু বিদ্যাকে অপাত্রে দান করার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা ছিল। অপাত্রে দান করলে অনেক সমস্যা এসে যায়। দর্শনের গভীর তত্ত্বগুলি অযোগ্য বা অপাত্রে চলে যাওয়াটা সামাজিকতা ও আধ্যাত্মিকতা উভয় ক্ষেত্রেই বিপজ্জনক। যেমন গীতার খুব বিখ্যাত শ্লোক *‘ন হন্যত হন্যমানে শরীর’* অর্থাৎ যাঁর আত্মজ্ঞান হয়ে গেছে তিনি জানেন কেউ কারুকে বধ করেন না। এই তত্ত্ব যদি কোন মুর্খের কাছে চলে যায়, তখন সে বলতে পারে যে আত্মার যখন মৃত্যু নেই তখন আমি যাকেই বধ করি না কেন আমার পাপ লাগবে না। এটাই দর্শনের অপপ্রয়োগ। কারণ যাঁর আত্মজ্ঞান হয়েছে সে কখনই কাউকে বধ করতে যাবে না। ঠাকুর বলছেন ‘যার ঈশ্বর দর্শন হয়েছে তার আর বেতালা পা পড়ে না’। এই জিনিসটাকে আটকাবার জন্য ঋষিরা বেদ উপনিষদের ক্ষেত্রে একটা প্রাচীর তুলে দিয়ে বলে দিলেন – যাদের এখনও প্রস্তুতি হয়নি তাদেরকে এই বিদ্যা দিও না।

ধর্মকে অবশ্য সব সময়ই যুগোপযুগী করে দেওয়া হয়, এটা না করলে ধর্মের অধঃপতন হয়ে যায়। স্বামীজী বলছেন ঠাকুরের আগমনের পর থেকে সত্যযুগ শুরু হয়েছে। শাস্ত্রের অনেক কিছুকে এত দিন রুদ্ধ করে রাখা হয়েছিল, শাস্ত্রের সব কিছুকে এখন উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। বেদ এখন সবার কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। স্বামীজী চেয়েছিলেন প্রত্যেক হিন্দুর বাড়িতে শালগ্রামের সাথে বেদেরও যেন পূজা হয়। শালগ্রাম মানে কুলদেবতার কথা বলা হচ্ছে। তার মানে সর্বোচ্চ বেদেরও পূজা হবে সাথে সাথে পারিবারিক কুল দেবতাদেরও পূজা হবে। আমরা এখনও নিজের নিজের কুলদেবতার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছি। স্বামীজী এই সঙ্কীর্ণতা ভাঙ্গতে চেয়েছিলেন। কারণ পুরো বেদ ও উপনিষদের দর্শনকে যখন মানুষ বুঝে নেবে তখন ধর্মের বাহ্যিক ও অন্তরমুখী আচরণে আমূল পরিবর্তন এসে যাবে এবং ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ মানুষের মধ্যে উদ্ভাসিত হয়ে যাবে।

স্বামীজীর খুব ইচ্ছে ছিলে সবাই যেন বেদ পড়ার সুযোগ পায়। এই কারণেই তিনি বেলুড় মঠে একটি বেদ বিদ্যালয় স্থাপিত করতে চেয়েছিলেন। আজ বেলুড় মঠে বেদ বিদ্যালয় স্থাপন করে স্বামীজীর স্বপ্নকে সার্থক করা হয়েছে। কিন্তু বেদ বিদ্যালয় স্থাপন করার পর প্রথম পর্বে বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষদের প্রচুর সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। প্রথমের দিকে যাঁরা আচার্য হয়ে এসেছিলেন তাঁরা বলে দিলেন আমরা ব্রাহ্মণ ছাড়া বেদ পড়াব না। মঠ কর্তৃপক্ষ এতে আপত্তি করে স্বামীজীর ইচ্ছাকেই দৃঢ় ভাবে ধরে রইলেন – আমরা চাই সবাই যেন বেদ অধ্যয়ন করার সুযোগ পেতে পারে। পরে কয়েক জন ব্রাহ্মণ কি করে রাজী হয়ে গেলেন। এখন বেলুড় মঠের নিজস্ব আচার্যরাই বেদ অধ্যয়ন করাবার জন্য তৈরী হয়ে গেছেন।

হিন্দু ধর্মের অন্যান্য আনুষাঙ্গিক শাস্ত্রের সাথে বেদের সম্পর্ক

হিন্দু জাতি বা ধর্মে যা কিছু আছে, বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা, পূজার বিভিন্ন উপাচার, যাগ-যজ্ঞ, দর্শন সব কিছু সরাসরি বেদ থেকেই এসেছে, বেদের বাইরে হিন্দু ধর্মের কিছু পাওয়া যাবে না। হিন্দু ধর্মে এমন

কোন কিছুই পাওয়া যাবে না যার কথা বেদে বলা হয়নি। প্রশ্ন আসতে পারে তাহলে হিন্দু ধর্মের পুরাণ, তন্ত্র, রামায়ণ, মহাভারত, গীতা ইত্যাদি যে সব বিভিন্ন শাস্ত্র রয়েছে এদের সাথে বেদের কি সম্পর্ক। বেদ সমস্ত শাস্ত্রের মূল। কিন্তু বেদে কিছু কিছু বিধিবাদ আছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বেদের সীমা রেখা টেনে দেওয়া হয়েছিল। ফলে বেদের শিক্ষা জনসাধারণের মধ্যে সম্প্রসারিত করা সম্ভব হচ্ছিল না। তখন মহান আচার্যরা বেদের শিক্ষাকে জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার জন্য অন্য কোন মাধ্যমের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। এই অনুভব থেকেই ভারতে হিন্দুধর্মের বিশাল শাস্ত্র সমুদয়ের সৃষ্টি হয়েছে।

সব থেকে মজার ব্যাপার হল দু হাজার বছর থেকে আজ পর্যন্ত হিন্দুরা বেদ বলে যে তাদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ আছে জানলেও বেদ চোখেই দেখেনি। কিন্তু কোন হিন্দু পাওয়া যাবে না যে বেদের প্রতি অশ্রদ্ধা মনোভাব পোষণ করবে। হিন্দু মানেই তাকে বেদকে স্বীকার করতে হবে, বেদ যা করতে বলে দিয়েছে সেটা করা হবে, বেদ যেটা বলেনি সেটা করা যাবে না। পরবর্তি কালে হিন্দু ধর্মের যত শাস্ত্র রচিত হয়েছে সব শাস্ত্রে এই নিয়ম অনুসরণ করা হয়েছে, অর্থাৎ বেদে যা বলা হয়েছে তাই অনুসরণ করা হয়েছে। যদি কেউ জিজ্ঞেস করে হিন্দু কাকে বলা হয়? এর একটাই উত্তর – যে বেদকে ultimate authority বলে মনে করে। যিনি বেদ পড়েছেন তাকেই হিন্দু বলা হবে না, বেদের কথাই শেষ কথা এই বিশ্বাস যার আছে সেই হিন্দু।

আস্তিক দর্শন ও নাস্তিক দর্শন

ভারতে দু ধরণের দর্শনের আবির্ভাব হয়েছে – আস্তিক দর্শন আর নাস্তিক দর্শন। আমরা সচরাচর মনে করি যার ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে তাকে আস্তিক বলা হয় আর যে ঈশ্বরকে মানে না তাকে নাস্তিক বলা হয়। কিন্তু দর্শনে আস্তিক শব্দের অর্থ হয় যিনি তাঁর দর্শনে বেদকে ultimate authority মনে করেন আর যারা তাদের দর্শনে বেদের কথাকে শেষ কথা বলে মানে না তাদের দর্শনকে নাস্তিক দর্শন বলা হয়। মজার ব্যাপার হল আস্তিক দর্শনে এমন অনেক দর্শন আছে যেখানে ঈশ্বর বলে কোন শব্দ তো নেইই আর তারা ঈশ্বরকেও মানে না। অথচ বেশির ভাগ মানুষ মনে করে হিন্দু ঋষিরা, দার্শনিকরা সবাই ঈশ্বর মানেন। কিন্তু খুব মনযোগ সহকারে হিন্দু-দর্শনগুলিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে শঙ্করাচার্যের আগে পর্যন্ত এমন অনেক হিন্দু দার্শনিক ছিলেন যাঁরা আদপেই ঈশ্বর বলে কেউ আছেন বলে মানতেন না, অথচ তাঁরা ছিলেন প্রচণ্ড ধার্মিক ও উচ্চ আধ্যাত্মিক সম্পন্ন ব্যাক্তিত্ব। এর কারণ বেদে আধ্যাত্মিক সত্তাকে বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, এখানে বেদ উপনিষদ সব মিলিয়েই বলা হচ্ছে, সেই ব্যাখ্যাগুলিকে যে যেভাবে নিতে শুরু করবে, ঈশ্বরকে মানা না মানাটাও সেভাবেই নির্ধারিত হবে। কেউ যদি বলেন আমি ঈশ্বর মানিনা, তা সত্ত্বেও তিনি একজন উচ্চকোটির ঋষি হতে পারেন। তখনকার দিনে চার্বাক দর্শনের অনুগামীরা এবং পরবর্তি কালে বৌদ্ধ, জৈনরা বেদকে ultimate authority বলে মানতেন না। জৈন বা বৌদ্ধ দর্শনকেও খুব গভীর ভাবে অধ্যয়ন করলে দেখা যাবে, বেদের আধ্যাত্মিক সত্তাকে তারা অস্বীকার করছে না, কিন্তু একটা জায়গায় এসে তারা বেদের সাথে অমত প্রকাশ করছে। প্রথম হল তারা বেদকে ultimate authority বলে মানবে না আর বেদের বর্ণপ্রথাকে বৌদ্ধ ধর্ম মানে না। এই দুটোকে মানে না বলে বৌদ্ধরা হিন্দু ধর্ম থেকে আলাদা। এই দুটো প্রভেদ সরিয়ে বৌদ্ধ দর্শন পড়লে বোঝাই যাবে না যে বৌদ্ধ ধর্মের দর্শন পড়ছি না উপনিষদ পড়ছি।

বেদের আলোচনার মূল কেন্দ্রবিন্দু পুরুষার্থ

সমগ্র বেদে আমরা কি পাই? এই বিশাল গ্রন্থে ঋষিরা এতো কথা কি বলছেন? খুব ভালো করে বিচার করলে দেখা যাবে একটা জিনিসকেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলা হয়েছে, তা হল চতুর্বর্গ পুরুষার্থ। এই চতুর্বর্গ পুরুষার্থ বেদ থেকে এসে ধীরে ধীরে সমস্ত হিন্দুদের মধ্যে ছড়িয়ে গেছে। চতুর্বর্গ পুরুষার্থের পুরুষার্থ কথার অর্থ জীবনের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য, প্রত্যেক মানুষকে বেদ জীবনের চারটে উদ্দেশ্য ঠিক করে দিয়েছে – ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। অর্থ হল যাদের লক্ষ্য জীবনে প্রচুর অর্থোপার্জন করব, জমি, বাড়ি, গাড়ি বানাব। কাম মানে যারা জীবনে প্রচুর ভোগ করতে চাইছে, ভালো খাবো, বেড়াব, দামী দামী সাজ-পোষাক দিয়ে নিজেকে সাজাব,

আর সুখে থাকব। ধর্ম মানে পূজো, পাঠ, সকাল বিকেল মন্দিরে যাওয়া, গঙ্গাস্নান, সাধুসেবা করা, দান ধ্যান করা ইত্যাদি। মোক্ষ হল একমাত্র আত্মোপলব্ধিই যাদের লক্ষ্য।

এই চারটি পুরুষার্থকে কেন্দ্র করে হিন্দুধর্মের বিভিন্ন শাখা একটা থেকে আরেকটা আলাদা হয়ে যায়। যেমন কথামৃতে ঠাকুর অর্থ আর কামকে প্রায় পুরোপুরি বাদ দিয়ে রেখেছেন। কিন্তু কথামৃতেই অনেক জায়গাতে ঠাকুরও সংসারীদের অর্থ সঞ্চয়ের কথা বলেছেন। ঠাকুর বলছেন টাকা দিয়ে কি হয়? সাধু সেবা হয়। আবার বলছেন দুটি সন্তান হয়ে গেলে স্বামী-স্ত্রী ভাইবোনের মত থাকবে। ঠাকুরও তো দুটি সন্তানের কথা বলছেন। ঠাকুর কিন্তু কোথাও কামিনী-কাঞ্চনকে প্রথমেই উড়িয়ে দিতে বলছেন না। আমাদের একটা ভুল ধারণা যে ঠাকুর কামিনী-কাঞ্চনকে পুরোপুরি উড়িয়ে দিতে বলেছেন। নারী হল মা, নারী থেকে সৃষ্টি চলছে – এ কথা ঠাকুরই বলছেন। ঠাকুর কার জন্য কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগের কথা বলছেন? ঠাকুরের কাছে বিভিন্ন থাকের মানুষ আসছেন। একটা থাক যারা শুধুই উচ্চ আধ্যাত্মিক অনভূতির জন্য নিবেদিত। স্কুলে কিছু ছাত্রের মধ্যে অত্যন্ত মেধা, প্রচণ্ড বুদ্ধি, এদের প্রশিক্ষণ পুরোপুরি আলাদা হয়, অন্যান্য ছাত্রদের থেকে এদের অনেক সামলে রাখতে হয়। জাগতিক অর্থে আমরা যা বুঝে থাকি সে ধরণের কোন কিছু ঠাকুরের ছিল না, তাই ঠাকুরকে কখনই আমরা দেখছি না যে তিনি কারুর রোগ ভালো করে দিচ্ছেন, কাউকে চাকরি করে দিচ্ছেন, মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না, সন্তান হচ্ছে না ঠাকুর তার ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন। কিন্তু এই ঠাকুরই আবার মথুরবাবুকে টাকা পয়সার অনেক ঝামেলা থেকে বাঁচাচ্ছেন, নরেনকে বলেছেন তোর খাওয়া-পড়ার অভাব হবে না। তিনি যাঁদের পুরোপুরি টেনে নিয়েছিলেন, যাঁদের মাধ্যমে তিনি তাঁর অবতারত্ব গ্রহণের উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করবেন, তাঁদের জন্যই তিনি সম্পূর্ণ ভাবে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগের কথা বলছেন। কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ না করলে এরা এগোতেই পারবে না আর অবতারের কাজের গুরুদায়ীত্ব নেওয়ার ক্ষমতাও হবে না। বাকীদের তিনি বলেছেন, কর্ম কর, অর্থোপার্জন কর, তবে যাই করবে ধর্ম পথে করতে বললেন। কেন ধর্ম পথে করতে বললেন? এই কারণে যে এটাই এর স্বাভাবিক, আমি নিষেধ করলেও তুমি কর্মের পেছনে ছুটবে। সংসারীদের যেমন বলে দিতে হয় না যে টাকা সব খরচা করবে না, ব্যাঙ্কে কিছু রাখবে, সংসারীরা এমনিতেই অর্থ সঞ্চয় করবে।

বেদে কেন অর্থ আর কামের কথা বলা হয়েছে? ঠাকুর কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগের কথা বলছেন অথচ বেদ চারটে পুরুষার্থের কথাই বলছে। আর পুরো বেদ, বিশেষ করে সংহিতাতে বলছে – প্রভু টাকা দাও, প্রভু সন্তান দাও। তাহলে কি ঠাকুর বেদবিরোধী কথা বলছেন? ঠাকুর যদি বেদবিরোধী কথা বলেন তাহলে হিন্দুরা প্রথমেই ঠাকুরকে ছুঁড়ে ফেলে দিত। এর উত্তর খুঁজতে হলে আমাদের আরও পেছনের দিকে ফিরে যেতে হবে, বিশেষ করে পুরাণে দেখা যায় ব্রহ্মা প্রথম সৃষ্টি করলেন চার কুমারের – সনক, সনন্দন, সনাতন ও সনৎকুমার। ব্রহ্মার প্রথম মানসপুত্র হওয়ার জন্য চার কুমাররা ত্যাগ বৈরাগ্যতে পূর্ণ ছিলেন। চার কুমার জন্ম নিয়েই দেখছেন আমরা কোথায় সংসারে এসে ফেঁসে গেছি, সঙ্গে সঙ্গে কমণ্ডলু তুলে নিয়ে চারজনই সংসার ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। ব্রহ্মা পড়ে গেলেন মহা ফাঁপড়ে, এত কষ্ট করে চারটে ছেলে সৃষ্টি করলাম যাতে এরা সৃষ্টিটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে আমাকে সাহায্য করতে পারে, কিন্তু সংসার ছেড়ে এরা তপস্যাতে চলে গেল। সৃষ্টি এগোবে কি করে? ব্রহ্মা তখন আবার নতুন করে সৃষ্টি করলেন। এবার যাদের সৃষ্টি করলেন যদিও এরা চার কুমারের মত বৈরাগ্যবান ছিল না, কিন্তু প্রায় ঐ রকমই হল। এরা বিয়ে করেছে কিন্তু সংসার কার্যে কোন ভাবেই সম্পর্ক না রাখাতে সমস্যা দেখা দিল। ঋষিরাও বিয়েথা করে গৃহস্থধর্ম পালন করতেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁরা সন্তানের জনক হতে চাইতেন না। এই রকমই হয়, যাঁরাই খুব বেশি ধর্মপ্রাণ পুরুষ হন, তাঁদের মন কিছুতেই জাগতিক কোন কিছুতে লিপ্ত হয়ে চায় না। দেখা যেত গুরু যদি পূর্ণ ত্যাগী হন, শিষ্যরাও গুরুর মত হয়ে যেতেন, সাংসারিক ব্যাপারে সমস্ত আগ্রহ হারিয়ে কেমন একটা উদাস উদাস ভাবে থাকতেন। এটাকে আটকানোর জন্য অর্থ আর কামের কথাও বলা হয়েছিল।

ভারতের এটা একটা জাতীয় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে জাগতিক ব্যাপারে ভারতীয়রা কোন আগ্রহই অনুভব করত না, যার ফলে যারা আধ্যাত্মিক পথে অজ্ঞ ছিল তাদেরকে অলসতা আর নিষ্কর্মতা গ্রাস করে কুসংস্কারে আচ্ছন্ন করে দিত। গত আট দশ বছর ধরে ভারতের লোকেরা বুঝতে পারল যে সুস্থ জীবন-যাপন

করতে গেলে টাকা আয় করতে হবে আর টাকা অর্জন করতে গেলে খাটতে হবে। আমাদের দেশের এটাই ছিল জাতীয় রোগ, এখানে প্রেমের কবিতা লিখে দেবে কিন্তু কিছুতেই অর্থ আর কামের জন্য খাটবে না। আমাদের পূর্বপুরুষরা ছিলেন ঋষি, আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা সব ঋষিদের পরম্পরা থেকে এসেছে। ফলে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ আমাদের কাছে স্বাভাবিক। কিন্তু অন্য দিকে মনের মধ্যে কামিনী-কাঞ্চনের বীজ রয়েছে, বীজ না থাকলে সে তো মুক্ত পুরুষ হয়ে যেত, আকাঙ্খা রয়েছে কিন্তু খাটবে না, কায়িক শ্রমে সব সময় বিমুখ। শ্রমবিমুখতার জন্য তাদের জোর করে কাজে লাগাবার জন্য বলা হত – ওহে ভাই তুমি কি মোক্ষ লাভ করতে চাইছ? মোক্ষের কথা শুনেই বলবে – না না, ওসব মোক্ষ-টোক্ষতে আমার মোটেই বিশ্বাস নেই ওসব ফালতু কথা। তাহলে তুমি ধর্ম কর্ম কি করবে? ধর্ম! না না, শীতের মধ্যে ভোর চারটেয় গঙ্গাস্নান আমার দ্বারা হবে না। ঠিক আছে, তুমি যখন ধর্ম ও মোক্ষ কোনটাই পারবে না তখন তুমি অর্থ সাধন ও কাম সাধন কর। কিন্তু বেশির ভাগ লোক অর্থ ও কাম সাধন না করে চাইত জীবন যেমন ভাবে চলছে চলতে থাকুক। ধর্ম ও মোক্ষ তো দূরের কথা এদের শরীর কাম সাধনেরও উপযুক্ত নয়, কারুর হজমের গোলমাল, কারুর ব্লাডপ্রেসার, কারুর হাঁপানি। তিন কিলো মিটার হাঁটতে দিলেই হাঁটু আর বুকে ব্যাথা হয়ে যাবে। এদিকে ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্সও সেরকম আহামরি কিছু নেই। পরিষ্কার ভাবেই বোঝা যাচ্ছে এদের শারীরিক ও মানসিক গঠন কোন সাধনার পক্ষেই যোগ্য নয়। ভারতে বেশির ভাগই এই শ্রেণীর লোক। সেইজন্য বেদ বলে দিল – এই চারটের মধ্যে যে কোন একটাকে উদ্দেশ্য করে কিছু একটা কর। তাই বেদ কোন আজেবাজে কথা বলেনি। মোক্ষ সাধন হল সব কিছু ছেড়ে দেওয়া, নিজের শরীর যে এত প্রিয় সেই শরীরের মমত্বকেও ত্যাগ করতে হবে। শীতকালে গঙ্গাস্নান করলেই সর্দি-কাশি হয়ে যাবে, এই হল আমাদের শরীরের অবস্থা, তাই বেদ বলল – তুমি তো বাপু এসব পারবে না, তাই অর্থ আর কামের জন্য লেগে পড়।

কিন্তু কাম ও অর্থ সাধন যে মন ও বুদ্ধি দিয়ে করবে সেই মন-বুদ্ধিই হয়ে আছে মূঢ় ও বিক্ষিপ্ত। নির্দিষ্ট ভাবে কোন কিছুতেই একাগ্র হয়ে লেগে থাকার ক্ষমতাও নেই আর ইচ্ছেও নেই। বেদ কাম ও অর্থ সাধনের পুরো ব্যাপারটাকে একটা নির্দিষ্ট দিকে নির্দেশ করে দিল। আর আমরা যা কিছুই করতে যাই না কেন আমাদের শেষ হাতিয়ার মন। মন আর বুদ্ধি ছাড়া আমাদের আর কিছু নেই। ঈশ্বর উপলব্ধি এই মন বুদ্ধি দিয়েই করতে হবে, ভালো মন্দ যা কর্ম এই মন বুদ্ধি দিয়েই করতে হয়। মন বুদ্ধিই যখন আমাদের প্রধান অস্ত্র তাই মন বুদ্ধিকে সর্বাগ্রে শাণিত করতে হবে। ঠাকুর বলছেন মানুষের মন হল সরষের পুটলি, পুটলির মুখ খুলে সরষে ছড়িয়ে গেছে। বেদ এই ছড়ানো মনকে কুড়িয়ে আনতে সাহায্য করে। যখন আমরা কাম ও অর্থ সাধন করতে থাকি তখন এই সাধনই আমাদের মনকে কুড়িয়ে নিয়ে একাগ্র করে উদ্দেশ্যের দিকে এগিয়ে দেয়। শুধু তাই নয়, এই সাধনের ফলে মানুষের মনে যে নানান কুবৃত্তি গুলি রয়েছে যেমন হিংসা, দ্বেষ, কাম, ক্রোধ, লোভ, চাহিদা এগুলিকেও নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে। ভারতের বেশির ভাগই নিষ্কর্মা প্রকৃতির। আইটি সেক্টরে একটা কথা আছে – বলা হয় ভারতে চাকরির কোন অভাব নেই, এখানে অভাব কর্ম প্রবণতার।

এই কর্ম বিমুখতাকে কাটাবার জন্য বেদ মানুষের জন্য অর্থ আর কামকে নিয়ে এল। অর্থ আর কামের সাধন করে চেতনা একটু জাগ্রত হলে ধীরে ধীরে এদের মনকে ধর্মের দিকে নিয়ে যাবে। ধর্ম সাধন করার পর আস্তে আস্তে তাকে মোক্ষের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। আরেক ধরণের দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক আছে যারা খুব অতিরিক্ত মাত্রায় ছটফটে, এরা আবার প্রচণ্ড ক্ষমতা লোভী, মনে করে আমিই একা লুটেপুটে খাব। একদিকে এদের মনে ইতিবাচক আবেগ নেই, অন্য দিকে এরা আবার অন্যদের মত নিষ্কর্মাও নয় কিন্তু নেতিবাচক আবেগে মনটা আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। নেতিবাচক আবেগ মানে হিংসা, বিদ্বেষ, ক্রোধ, লোভ, ঘৃণা ইত্যাদি। এরা বলবে – হ্যাঁ, আমি ধর্ম করব কিন্তু তার আগে আমি একে মেরে শেষ করব। যে চারিদিকে শত্রু তৈরী করে রেখেছে, একে মারব, তাকে শেষ করব, এই যাদের মনোভাব, এদের কি করে ধর্ম করতে বলবে! পৃথিবীর কোন ধর্মে কোথাও এদের মনকে ধর্মের দিকে ফিরিয়ে আনার কোন উপায়ের কথা বলা নেই। এদের মন সব সময় বিষিয়ে রয়েছে, এই ধরণের লোকের সব থেকে ভালো দৃষ্টান্ত হল হল দুর্যোধণ, মেঘনাদ। দুর্যোধন আর মেঘনাদের মন সব সময় পাণ্ডবদের আর লক্ষণের বিরুদ্ধে হিংসায় পুড়ছে।

আপাত দৃষ্টিতে বলতে গেলে এদের জন্য ধর্ম নেই। সব ধর্মই এদের বলবে আগে তোমার মন থেকে এগুলো পরিষ্কার কর। কিন্তু বেদ এদের দিকেও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। বেদ বলবে তুমি তোমার শত্রুকে মারতে চাও? তাহলে এই নাও আমার শত্রু মারণ যজ্ঞ, এই যজ্ঞ করলে তোমার শত্রু মরবেই। এখন সে শত্রুকে মারার জন্য পুরোদমে নেমে যাবে যজ্ঞ করতে। যেমন মেঘনাদ লক্ষ্মণকে মারার জন্য যজ্ঞ করতে চলে গেল। কিন্তু কি হল? যজ্ঞের ফল হবে কি হবে না আমাদের জানা নেই। কিন্তু মাঝপথে কোন কারণে যজ্ঞটা পণ্ড হয়ে গেল। যজ্ঞ পণ্ড হয়ে যাওয়া, যজ্ঞ পণ্ড না হলে কি হত সেটা আমাদের কাছে গুরুত্ব নয়। গুরুত্ব হল, যজ্ঞের প্রস্তুতি পর্বে যজ্ঞাকর্তা খেটেখুটে যে এতো কিছুর আয়োজন করছে, মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে এত আহুতি দিচ্ছে, দেবতাদের আবাহন করা হচ্ছে, এর ফলে মন কিছু কিছু শোধরাতে থাকে।

শাস্ত্র তো বলে দিল তোমার মনে যত নোংরা আছে সব পরিষ্কার না করলে তোমার কিছুই হবে না। আমিও জানি আমার মনে নোংরা আছে। একটা বাচ্চা ছেলেও জানে তার খেলার দিকে মন বেশি, লেখাপড়ায় মন কিছুতেই দিতে পারছে না, আর এটাও সে জানে মন দিয়ে পড়লে ভালো রেজাল্ট করতে পারবে। সে যদি বলে আমি মন খেলাতে দিতে চাইছি না, লেখাপড়াতেই মন দিতে চাইছি কিন্তু আমার মনকে খেলাই টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আমি জানি আমার দুর্বলতা কোথায়, কিন্তু আমি এই দুর্বলতাকে কাটাতে পারছি না। তখন আমরা তাকে কি পথ দেখাব? কোন পথ আমাদের কাছে নেই, আমরা কোন পথ দেখাতে পারিনা। কিন্তু বেদ বলবে – হ্যাঁ উপায় আছে, তুমি এই এই যজ্ঞ কর। আবার অনেকে বলছে আমার কোন সন্তান নেই তাই একটা বেদনায় মনটা খুব অস্থির হয়ে আছে, আমার যদি একটা সন্তান হয়ে যায় তাহলে আমার মনের অস্থিরতা কেটে গিয়ে মনের শান্তি হয়ে যাবে। বেদ তখন বলে দেবে – ঠিক আছে, তুমি পুত্রেষ্টি যজ্ঞ কর। এখন পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করার জন্য কয়েক মাস থেকে প্রস্তুতি নিতে হবে, এই উপোশ কর, এই এই জিনিস খাবে না, এই এই দেবতার নামে পূজা দাও, রোজ এত স্নান কর, ভূমিশয্যাতে শয়ন করবে। এটাই তপস্যা হয়ে গেল। এইভাবে কিছু ব্রত পালনের পর যজ্ঞের জন্য মনটাকে তৈরী করে নিল। এখন যজ্ঞ করে সন্তান হবে কি হবে না আমাদের জানা নেই। আলোচনা করতে করতে এর উত্তরও আমরা পেয়ে যাব।

পুত্রেষ্টি যজ্ঞের প্রচুর দৃষ্টান্ত আমরা শাস্ত্রেই পাই, যেমন শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম পুত্রেষ্টি যজ্ঞ থেকে হয়েছিল। দ্রৌপদী, ধৃষ্টদ্যুম্নের জন্মও যজ্ঞ থেকে হয়েছিল। দুর্যোধনের জন্ম যজ্ঞ থেকে। এত যে ঘটনার কথা শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে, ইচ্ছে করলে এগুলোকে কেউ বিরাট আকারের ধাপ্পা বলতে পারেন। কিন্তু বেদের বিভিন্ন যজ্ঞের ধারণা পরবর্তি কালে এসে অন্য রূপ নিল। যজ্ঞের ধারণাটা আস্তে আস্তে বিবর্তিত হয়ে পূজা পদ্ধতিতে এসে দাঁড়িয়ে গেল। কাশীতে বিশ্বেশ্বরের কাছে মানত করে ভূবনেশ্বরী দেবী নরেন্দ্রনাথকে পেলেন। এটাই বেদের সময়ে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ নামে করা হত। শুধু পুত্রেষ্টি যজ্ঞই নয়, যে কোন কিছুর জন্য, বাড়িতে প্রায়ই চুরি হয়, যজ্ঞ কর তোমার বাড়িতে চুরি বন্ধ হয়ে যাবে, বাড়িতে সাপের উপদ্রব, সর্পযজ্ঞ কর সাপের উপদ্রব কমে যাবে। স্বামীজী মজা করে বলছেন – তোমার যদি গরু হারিয়ে গিয়ে থাকে, সেটাও তুমি বেদে খুঁজে পাবে। বেদের সম্বন্ধে মানুষের এই রকম ধারণাই ছিল। বেদের মন্ত্র এত শক্তিশালী যে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস নিয়ে ঠিকঠিক উচ্চারণ করলে মন্ত্র কাজ করবেই করবে। বেদ বলে দিচ্ছে তুমি এই যজ্ঞ করলে তোমার এই ফল লাভ হবে, কোন কিছুই এই ফল লাভকে আটকাতে পারবে না।

রামায়ণের একটি ঘটনার দ্বারা বেদমন্ত্রের শক্তি আর তার কার্যকারিতার প্রমাণ পাওয়া যায়। শ্রীরামচন্দ্র চৌদ্দ বছরের জন্য অযোধ্যা ছেড়ে বনবাসের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেছেন। ভরত শ্রীরামচন্দ্রকে অযোধ্যায় ফিরিয়ে আনার জন্য খুঁজতে গেছেন। যেতে যেতে সন্ধ্যে হয়ে গেছে, ভরত সৈন্য সামন্ত নিয়ে ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে এক রাতের জন্য আশ্রয় নিয়েছেন। ভরদ্বাজ মুনি চিন্তায় পড়ে গেলেন, রাজা এসেছেন, সঙ্গে এত লোকজন, এদেরকে তো আর গাছের তলায় রাখা যায় না, আর সামান্য ফলমূল খাইয়ে অতিথি সৎকার করাও উপযুক্ত কাজ হবে না। ভরদ্বাজ মুনি তখন বেদ মন্ত্রের আবাহন করতে শুরু করলেন। বেদের ঋচাগুলি যখন আবাহন করতে লাগলেন তখন দেখা গেলে স্বর্গ থেকে বিভিন্ন রকমের খাদ্যসামগ্রী, পেয় পদার্থ আশ্রমে নামতে শুরু করে দিল। স্বর্গ থেকে অপ্সরারাও নেমে এসেছেন সবাইকে পরিচর্যা করবার জন্য। সৈন্যরা এই ধরণের

সুস্বাদু খাবার, পানীয় কোন দিন চোখেই দেখেনি, তারপরে অপ্সরাদের সাথে নাচগান করার সুযোগ পেয়ে সৈন্যরা বলছে 'রামচন্দ্রই রাজা হোক কি ভরতই রাজা হোক তাতে আমাদের আর কি যায় আসে, আমরা এখানেই সুখে আছি, এই জায়গা ছেড়ে আমরা আর কোথাও যাবো না, এখানেই আমাদের জীবন সার্থক'। সকালের আলো ফুটতেই দেখে সব ভোঁ ভা, কিছুই নেই। বেদ মন্ত্র দিয়ে যে কোন জিনিসকেই নিয়ে আসা যায়, এই ধারণাটা আমাদের প্রাচীন কাল থেকেই চলে আসছে। হ্যারি পটারের মত ম্যাজিক কিছু নয়, সত্যি সত্যিই এই জিনিসই হবে।

আমাদের মূল কথা চলছে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ নিয়ে। ধর্মপথের অনুপযুক্ত লোকেদের জন্য অর্থ আর কামের সাধনার ব্যাবস্থা বেদ করে দিয়েছে। হাজরাকে ঠাকুর কত গালাগাল দিচ্ছেন – হাজরার গর্ভধারিণী দেশে কত কষ্টে পড়ে আছে, এদিকে হাজরা এখানে লোকের কাছে চেয়ে চেয়ে বেড়ায়, আবার ধারদেনাও করে রেখেছে। কই ঠাকুরতো হাজরাকে বলছেন না যে হরিনাম কর। কিন্তু তার বদলে বলছেন তোমার বাড়ির লোককে কি বামুনপাড়ার লোক এসে খাইয়ে যাবে। দেশে গিয়ে চাষবাস করে অর্থ রোজগারের দ্বারা মায়ের প্রতিপালনের কথাই ঠাকুর বলতে চাইছেন। ঠাকুর বলছেন কলিতে মানুষের অন্নগত প্রাণ, লোকেদের সময় খুব কম, এই অল্প সময়ের মধ্যে যদি সাধন ভজন করতে যায় তার হবে না। আবার ঠাকুরের কাছে যেসব শুদ্ধসত্ত্ব ছোকরারা আসছে তাদের যাতে সময় নষ্ট না হয় তাই সরাসরি তাদের কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগের কথা বলে দিয়ে বলছেন ঈশ্বর দর্শনই জীবনের উদ্দেশ্য। কিন্তু প্রত্যেক হিন্দুকেই ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারটের মধ্যে যে কোন একটাকে জীবনের উদ্দেশ্য করে সেইভাবে জীবন যাপন করতে হবে। অনেক টাকা যদি কেউ রোজগার করতে চায় তাতে কোন দোষ নেই। এটাই সবার জন্য বেদের উপদেশ।

বেদ শব্দের অর্থ

বেদ শব্দ এসেছে বিদ্ ধাতু থেকে। যে কোন ভারতীয় ভাষায় শব্দের একটা root থাকে যাকে বলা হয় ধাতু। এই ধাতুর সাথে যখন প্রত্যয়াদি যুক্ত করা হয় তখন একটা শব্দের সৃষ্টি হয়। উল্টোপাল্টা কোন শব্দ উচ্চারণ করলেই তাকে প্রকৃত শব্দ বলা যাবে না, যেমন বলে দিল 'দুম্', দুম্ শব্দের ইতিহাস যদি খুঁজতে যাওয়া হয় তাহলে দেখা যাবে সংস্কৃতে এটা কোন শব্দই নয়। কেন শব্দ নয়? দুম্ মূলতঃ একটা ধ্বনি, এর কোন ধাতু নেই। ধাতু না থাকলে তাকে শব্দ বলা যাবে না। যেমন 'সংস্কৃত', এর অর্থ সম্যক রূপে কৃ ধাতু। কৃ মানে করা, সম্যক রূপে করা মানে ভালো করে কিছু পরিষ্কার করা। সংস্কৃত ভাষাও তাই খুব পরিষ্কার, সাফসুতরো ভাষা, এখানে কোন ধরণের আবর্জন নেই। এইভাবে সৃপ্ ধাতু থেকে এসেছে সর্প, সৃপ্ মানে যেটা সরে সরে যায়, গরু এসেছে গম্ ধাতু থেকে, গম্ মানে যে জিনিসটা চলে। যে ভাষা যত বেশি গ্রাম্য ভাষা সেই ভাষাতে তত বেশি আবর্জনা ঢুকে জংলী ভাষাতে পরিণত হয়ে যায়। ইংরাজী শব্দ টেনশানকে হিন্দী ভাষায় পাল্টে দিয়ে বলবে টেনশানিয়া। এগুলো কোন শব্দই নয়, কারণ প্রত্যেকটি শব্দের একটা ধাতু বা রুট থাকা চাই, তা নাহলে সেটাকে কোন শব্দ বলেই গণ্য করা হবে না, নিছক ধ্বনি মাত্রই থেকে যাবে। যে কোন ধাতুরও আবার একটা বিশেষ অর্থ আছে। পাণিনির ব্যাকরণ শাস্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী বিদ্ ধাতুর পাঁচটি অর্থ হয়। পাঁচটার মধ্যে একটা হয় জানা। বিদ্যা, বিদ্বান এই ধরণের যত শব্দ আছে সব বিদ্ ধাতু থেকে এসেছে। যখন যে কোন বিদ্যাকে জানা হয়, সে যে ধরণের বিদ্যাই হোক না কেন তাকেই বেদ বলা হয়, কারণ এর সবটাই বিদ্ ধাতু থেকে আসছে। বিভিন্ন সময় পণ্ডিতরা বেদ শব্দের বিভিন্ন অর্থ করেছেন, স্বামীজীও বেদের অর্থ বলছেন – যে কোন জ্ঞান, যা কিছু বিদ্যা সেটাই বেদ। অর্থাৎ যে কোন বিদ্যা, যে বিদ্যা দিয়ে যা কিছু জানা যেতে পারে সেটাই বেদ। কোন কিছুকে জানা মানেই বুদ্ধির এলাকা হয়ে গেল। যেটাই বুদ্ধির এলাকা সেটাই অপরা বিদ্যা, সেইজন্য বেদ মানেই অপরা বিদ্যা। অপরা বিদ্যা মানে বুদ্ধি দিয়ে যা কিছু জানা বা গ্রহণ ও ধারণ করা হয় সেটাই অপরা বিদ্যা। যে বিদ্যা বুদ্ধির এলাকার বাইরে সেই বিদ্যাকে পরা বিদ্যা বলা হয়।

আমাদের কাছে বেদের একটা অর্থ common noun সাধারণ নাম বা বিশেষ্য – যেমন ধনুর্বেদ, যেখানে ধনুর বিজ্ঞান বলা হয়েছে, আয়ুর্বেদ, যে বিদ্যার দ্বারা আয়ু বৃদ্ধি করা যায়। এই ধরণের যত বিদ্যা

আছে এদেরকেও বেদ বলা হচ্ছে সাধারণ নাম হিসাবে, যে কোন বিদ্যার সাথে বেদ নাম দিয়ে ব্যবহার করা যেতে পারে। আবার যখন গুণ বা বিশেষণ adjective রূপে ব্যবহার করা হয়, কোন জিনিসকে মর্যাদা দেওয়ার জন্য বা কোন গ্রন্থকে স্তুতি করার জন্য বেদ শব্দকে ব্যবহার করা হয়, যেমন ভাগবতকে অনেক সময় বলা হয় পঞ্চম বেদ। চারটে বেদই আছে, কিন্তু পঞ্চম বেদ যখনই বলা হল তখন বেদ শব্দকে বিশেষণ হিসেবে ব্যবহার করে ভাগবতের সম্মান বাড়িয়ে দেওয়া হল। সব শেষে হচ্ছে proper noun, proper noun হিসাবে যখন ব্যবহার করা তখন এই চারটে বেদ – ঋক, সাম, যজুঃ ও অথর্ব বেদকে বোঝাবে।

ইংরাজীতে যখন Veda লেখা হয় তখন তার একটা বিশেষ অর্থ হবে আবার যখন The Vedas লেখা হবে তখন তার আবার অন্য অর্থ হবে। যখন Veda বলা হয় তখন তার অর্থ হবে common noun, যেটা আমরা আগে আলোচনা করেছি। আবার যখন The Vedas বলা হয় তখন চারটে বেদকে উল্লেখ করা হয় – ঋক, সাম, যজু ও অথর্ব। প্রাচীন কাল থেকে দুটো মত চলে আসছে – একটা মতে বলছে যা কিছু আছে সব বেদেই আছে, তোমার গরু হারিয়ে গেছে, সেই গরুকে বেদে খুঁজবে, তার মানে যত ধরণের জ্ঞান হতে পারে সবই বেদ। এটাই ভারতের প্রাচীন হিন্দুদের মত। যার ফলে যে কোন বিদ্যার নামের সাথে বেদকে জুড়ে দেওয়া হত যেমন – ধনুর্বেদ, আয়ুর্বেদ ইত্যাদি। ইদানিং কালে যেমন বিজ্ঞান শব্দকে জুড়ে দেওয়া হয় – environmental science, political science, management science etc. বেদকে যখন এইভাবে ব্যবহার করা হয় তখন common noun হিসাবে বলা হচ্ছে। যাকে এখন বিজ্ঞান বলে সম্বোধিত করা হচ্ছে তাকেই আমরা আগে বেদ বলতাম।

প্রথমেই বলা হয়েছে চারটে বেদের আবার চারটে করে ভাগ – মন্ত্র বা সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক এবং উপনিষদ। এই মন্ত্র আমরা যে মন্ত্রোচ্চারণ করি সেই মন্ত্রকে বোঝাচ্ছে না। মন্ত্রকে সংহিতাও বলা হয় – যদি বলা হয় ঋগ্বেদ সংহিতা তখন বুঝতে হবে এখানে ঋগ্বেদের অন্য কোন অংশের কথা বলা হচ্ছে না, ঋগ্বেদের শুধু মন্ত্র অংশের কথাই বলা হচ্ছে। সংহিতাতে বিভিন্ন দেবতাদের স্তুতি, এবং বিশেষ বিশেষ যজ্ঞের মন্ত্রগুলি দেওয়া আছে। বেদের ব্রাহ্মণ অংশের সাথে ব্রাহ্মণ জাতির কোন সম্পর্ক নেই। ব্রাহ্মণে সাধারণত মন্ত্র অংশে যা দেওয়া হয়েছে সেগুলিকেই বড় করে টীকাকারে ব্যাখ্যা করা হয়েছে – যজ্ঞ কিভাবে করা হবে, কিভাবে যজ্ঞের বেদি তৈরী করা হবে ইত্যাদি। এর আগে যে পুত্রেষ্টি যজ্ঞের কথা বলা হল, পুত্রেষ্টি যজ্ঞে যা যা মন্ত্র পাঠ করা হবে সব সংহিতাতে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যজ্ঞটা কি নিয়ম ও পদ্ধতিতে করা হবে, কি কি উপকরণ লাগবে, এর সব কিছু ব্রাহ্মণ অংশে পাওয়া যাবে। তৃতীয় আরণ্যক। বয়স হয়ে গেলে যখন আর যজ্ঞ করার ক্ষমতা থাকবে না, তখন সে কিভাবে মানসিক যজ্ঞ করবে সেটাই আরণ্যকে বলা হয়েছে। যে যজ্ঞগুলি আগে বাহ্যিক উপকরণ ও পুরোহিত ব্রাহ্মণদের দ্বারা সম্পন্ন করা হত এখন সেই যজ্ঞই মনে মনে কল্পনার দ্বারা করা হবে। সব শেষে আসছে উপনিষদ। এই বিভাজন যে আগাগোড়াই স্পষ্ট ভাবে মানা হয়েছে তা নয়, অনেক ক্ষেত্রে মন্ত্র অংশ ব্রাহ্মণে চলে গেছে আবার ব্রাহ্মণের কিছু কিছু অংশ মন্ত্র অংশে চলে গেছে। আবার যজুর্বেদে বিখ্যাত উপনিষদ ঈশোপনিষদ যেটা মন্ত্রের চল্লিশতম অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে, তার মাঝখান থেকে ব্রাহ্মণ অংশটা হারিয়ে গেছে। যেভাবেই শ্রেণীবিন্যাস করা হোক না কেন কোনটাই কাঁটায় কাঁটায় মিলবে না, কিন্তু এই চারভাবে শ্রেণী বিভক্ত করলে মোটামুটি কাছাকাছি আসে।

বেদ জানার জন্য দু ধরণের দৃষ্টিভঙ্গীকে মানা হয়, একটা Western approach, আরেকটা Traditional approach। ম্যাক্সমূলার, ডয়েটসনদের মত বড় বড় Indologists আর traditional approach, এরা দুজন দুজনকে মানবে না। আমরা পুরোপুরি ভারতীয় পরম্পরার দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বেদ অধ্যয়ন করছি। যজুর্বেদে ঊনচল্লিশ অধ্যায় পর্যন্ত হচ্ছে মন্ত্র, অর্থাৎ এর বিভিন্ন অধ্যায়ের মন্ত্রগুলি বিভিন্ন যজ্ঞের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে, হঠাৎ চল্লিশ অধ্যায়ে এসে ঈশোপনিষদ এসে গেল, যার মন্ত্র যজ্ঞে ব্যবহার করা হয় না। যদি কেউ জিজ্ঞেস করে ঊনচল্লিশটা অধ্যায় মন্ত্র অংশের আর চল্লিশ অধ্যায় উপনিষদ, এটা কে ঠিক করে দিয়েছে? কেউ বলতে পারবে না কে ঠিক করে দিয়েছে। আদিম কাল থেকে এভাবেই চলে আসছে। কোথাও কোন গুরু বলে দিয়েছিলেন এর ঊনচল্লিশ অধ্যায়টা মন্ত্র আর চল্লিশতম অধ্যায়টা উপনিষদ। সেই থেকে তার

শিষ্য আবার তার শিষ্যকে বলেছে, এইভাবে গুরুশিষ্য পরম্পরায় চলে আসছে। গুরু পরম্পরায় হতে হতে শঙ্করাচার্যের কাছে এসেছে। ঈশোপনিষদের উপর শঙ্করাচার্য ভাষ্য রচনা করে দিলেন। ভাষ্যের প্রথম লাইনটাই অনেকে ধরতে পারে না, বলছেন, *কর্মসু অবিনিয়োগঃ*, অর্থাৎ এই অধ্যায়কে যজ্ঞে যে ব্যবহার করা হয় না সেটা ঠিকই করা হয়। কেন কর্মে বা যজ্ঞে ব্যবহার করা হয় না বোঝাই যাবে না। তাহলে এই অধ্যায়টা কিসের জন্য? বলা হচ্ছে – ধ্যানের জন্য, এটা চলে আসবে উপাসনাতে।

এখানে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক আমাদের মাথায় রাখতে হবে, প্রথমে থেকেই বেদ গুরু পরম্পরায় চলে আসছে। কোন গুরু হয়ত তাঁর শিষ্যদের বলে দিলেন – তুমি সংহিতা মুখস্ত রাখো, তুমি ব্রাহ্মণ, তুমি আরণ্যক আর তুমি উপনিষদের অংশটুকু মুখস্ত রাখো। পরে যে শিষ্য যে অংশের মন্ত্র মুখস্ত করেছিল সে আবার তার শিষ্যকে সেই মন্ত্রটা মুখস্ত করিয়ে যাচ্ছে। এবার মাঝখান থেকে যে ব্রাহ্মণ অংশটা মুখস্ত রেখেছিলে সে হয়ত ভালো শিষ্য পেলো না, কিংবা মরে গেল। এরপর কি হবে? ওখানেই ঐ বেদের ব্রাহ্মণ অংশটা গেল হারিয়ে। আর এভাবেই বেদের অনেক শাখা হারিয়ে গেছে। কেননা তাঁরা কিছু লিখে রাখতেন না।

অবতার বা পয়গম্বর বলতে যা বুঝি বেদের ঋষিরাও ঠিক তাই ছিলেন। বেদকে আমরা যে পরম্পরা বলছি, একজন ঋষি কোন একটি আধ্যাত্মিক সত্যকে দেখেছেন, তিনি তাঁর শিষ্যকে দিলেন, সেই শিষ্য আবার তাঁর শিষ্যকে সেই সত্যটা বলে দিলেন। এই পরম্পরা হস্তান্তর করে দেওয়ার মত ছিল না, আমি আপনাকে দিলাম, আপনি তাকে দিলেন এভাবে পরম্পরা ছিল না। ইনিও সেই সত্যকে দেখছেন, তাঁর শিষ্যও সেই সত্যকে দেখছেন, শিষ্যের শিষ্যও একই জিনিস দেখছেন। মাঝখানে এখানকার শিষ্য ওখানে যাচ্ছে, ওখানকার শিষ্য এর কাছে আসছেন, সেখানে আরও অনেক আধ্যাত্মিক সত্যের কথা শুনছেন। এরপর সবটাকে নিয়ে একটা জায়গায় সংরক্ষিত করা হচ্ছে। সেইজন্য বেদের আধ্যাত্মিক চিরন্তন সত্যগুলির শুধু মাত্র একজন কোন গুরুই দ্রষ্টা ছিলেন না। সেই গুরুর শিষ্যক্রমে কোন একজন শিষ্য এই জিনিসটা যাতে কেউ ভুলে না যায়, একটা জিনিসকে ভুলে না যাওয়ার সব থেকে ভালো উপায় হল জিনিসটাকে ছন্দোবদ্ধ করে দেওয়া, কোন এক শিষ্য যাঁর মধ্যে কবি প্রতিভা ছিল, তিনি সেটাকে ছন্দোবদ্ধ করে সুর দিয়ে দিলেন। অনেকে বলেন ছন্দ সৃষ্টিতে ভারত সব থেকে পারদর্শি। আমরা যেভাবে ছন্দ তৈরী করেছি, বিশ্বে এভাবে কেউ করতে পারেনি। আমাদের নামতা পর্যন্ত ছন্দে বেঁধে দেওয়া হয়েছে, কোন ছোটবেলায় আমরা নামতা মুখস্ত করেছি কিন্তু এখনও আমরা ভুলতে পারছি না। বেদের সময় তখনও লেখার পদ্ধতি আসেনি, সেইজন্য তাঁরা এই কৌশলটাকে উন্নত করে দিলেন যাতে গুরুশিষ্য পরম্পরায় বিদ্যাটা থাকে। বেদে যে ঋষিদের নাম পাই, তাঁরা কি এই মন্ত্রের দ্রষ্টা ছিলেন নাকি ছন্দোবদ্ধ করেছিলেন এটা জানার এখন আর কোন উপায় নেই।

পরের দিকে এনারা মন্ত্রকে বেশি গুরুত্ব দিলেন, আরণ্যককে ততটা গুরুত্ব দিতেন না। কারণ আরণ্যক যে জিনিসকে অবলম্বন করে তৈরী হয়েছিল সেটা মন্ত্র অংশে আগে থেকেই আছে। আর যে উদ্দেশ্যকে সে নির্দেশ করছে সেটাও আগেই উপনিষদে নির্দেশ করে দিয়েছে। এই কারণে সব থেকে প্রথমে আরণ্যক অংশটাই নষ্ট হতে আরম্ভ করেছে, কেননা আরণ্যকের উপযোগিতাই কেউ সেইভাবে অনুভব করতেন না। একটা জিনিস যত ব্যবহার হবে সেটা তত প্রচলিত থাকবে, আরণ্যকের ব্যবহার কমে যাওয়াতে আস্তে আস্তে অপ্রচলিত হতে থাকল। ব্রাহ্মণের ক্ষেত্রে দেখা গেল, এর মধ্যে বিভিন্ন কাহিনী আছে আর যজ্ঞ-যাগ কিভাবে করতে হবে তার বর্ণনা করা হয়েছে। পরের দিকে যজ্ঞ-যাগ করার জন্য যে নিয়মাবলী ছিল সেগুলো কল্পসূত্র, গৃহ্যসূত্র ইত্যাদি নামে আলাদা অভিধান বানিয়ে নিয়েছিল। ফলে ব্রাহ্মণের গুরুত্বও কমে গেল। পণ্ডিতেরা তখন একদিকে মন্ত্র মুখস্ত করতে থাকলেন আর অন্য দিকে উপনিষদকেও মুখস্ত রাখতে থাকলেন। যার ফলে মন্ত্র অংশ ও উপনিষদের অংশটা সহজে হারিয়ে যেতে পারল না। কিন্তু এই দুটো ব্রাহ্মণ আর আরণ্যক ভীষণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেল। পরবর্তিকালে দেখা গেলে বেদের ব্রাহ্মণ আর আরণ্যক অংশ আমাদের পুরাণাদি গ্রন্থে নানা আকারে ঢুকে নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে। সেইজন্য আমরা কখনই বলতে পারিনা যে ব্রাহ্মণ আর আরণ্যক ভারত থেকে সম্পূর্ণ ভাবে হারিয়ে গেছে। তবে এই দুটো অন্য ভাবে জায়গা করে নিয়ে এখনও আধ্যাত্মিক পিপাসু মানুষের অনেক চাহিদা পূরণ করে চলেছে।

বেদ বলতে মন্ত্র অংশকেই বোঝায়। যেমন যখন বলছি ঋগ্বেদ তখন ঋগ্বেদের মন্ত্র অংশকেই বোঝায়, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ঋগ্বেদ বলতে পুরো চারটে অংশকেই ধরা হয়। অনেকে বলেন যে আমার ঋগ্বেদ মুখস্ত, তার মানে ঋগ্বেদের সংহিতা অংশটাই তার মুখস্ত। বেলুড় মঠে একজন আচার্য আছেন তাঁর যজুর্বেদের পুরোটাই মুখস্ত – মানে মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ চারটেই মুখস্ত। আবার যাঁরা বৈদিক দর্শনের কথা বলেন তখন বুঝতে হবে যে তাঁরা উপনিষদের কথাই বলছেন। যখন proper noun হিসাবে বলবে তখন বেদের তিন ধরণের অর্থ হয় – একটা Samhita portion alone, Official portion alone and all four combined, বেদের অনেক রকমের আলাদা আলাদা অর্থ করা হয় আবার অনেক সময় উপনিষদকেই বেদ বলে চালিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু মন্ত্রের কাজ আলাদা উপনিষদের কাজ আলাদা। কেউ যদি কঠোপনিষদ পড়ে থাকেন আর তাকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে আপনি কি বেদ পড়েন? সে যদি বলে হ্যাঁ, আমি বেদ পড়ি। তাতে সে ভুল কিছু বলছে না, কঠোপনিষদ বেদেরই অংশ। কিন্তু যদি ঠিক ঠিক বলত হয় তাহলে বেদ বলতে এখন হয় মন্ত্র অংশকে বলা হবে নয়তো চারটেকে মিলিয়েই (মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ) বেদ বলা হবে।

বেদকে আধার করে পরের দিকে ছটি দর্শনের জন্ম হয়েছে। এই ছটি দর্শনকে আস্তিক দর্শন বলা হয়। আস্তিক দর্শন মানে যে দর্শন বেদের কথাকেই শেষ কথা বলে বিশ্বাস করে। ছটি দর্শন হল – ১) সাংখ্য, ২) যোগ, ৩) ন্যায়, ৪) বৈশষিক, ৫) পূর্বমীমাংসা বা কর্মকাণ্ড এবং ৬) উত্তর মীমাংসা বা বেদান্ত। আস্তিক মানে ভগবানকে বিশ্বাস করাকে বলা হচ্ছে না, সাংখ্য ও যোগ দর্শন আস্তিক দর্শন কিন্তু এরা ভগবানকে বিশ্বাস করে না, পূর্ব মীমাংসাও ভগবানে বিশ্বাস করে না। আস্তিকের সাথে ভগবানে বিশ্বাসের কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু এদের কাছে বেদ সর্বোপরি, বেদের বাইরে কোন কিছুই তারা মানবে না। কর্মকাণ্ডীরা মনে করেন তাঁরাই ঠিক ঠিক বেদকে ব্যাখ্যা করেন। এখনও বেদের ব্যাপারে কর্মকাণ্ডীদের কথাকেই শেষ কথা বলে মনে করা হয়। কর্মকাণ্ডীরা বেদের সংজ্ঞা দিচ্ছেন *মন্ত্রব্রাহ্মণয়োর্বেদনাম ধেয়ম্*, মন্ত্র আর ব্রাহ্মণই বেদ, এই দুটির বাইরে আর কিছু বেদ নয়। যে মন্ত্রগুলি যজ্ঞে ব্যবহার করা হয় সেই মন্ত্রগুলি যেখানে আছে সেটাকেই মন্ত্র বলা হয় আর যজ্ঞের ব্যাখ্যা যেখানে করা হয়েছে তাকে বলা হয় ব্রাহ্মণ। মন্ত্রের আরেকটি নাম সংহিতা। কিন্তু আমরা জানি আরণ্যক আর উপনিষদও বেদের অঙ্গ। পূর্ব মীমাংসকরা কখনই আরণ্যক আর উপনিষদকে বেদ বলে মানবে না। অন্য দিকে এনারা মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ মুখস্ত করার সাথে আরণ্যক আর উপনিষদও মুখস্ত করতেন। পূর্ব মীমাংসকরাও বলে আরণ্যক আর উপনিষদেরও দরকার আছে। কিভাবে দরকার হয়? যজ্ঞ যখন হয় তখন তাঁরা আরণ্যক ও উপনিষদের মন্ত্রগুলি উচ্চারণ করতেন। ওনারা মনে করেন যজ্ঞের সময় উপনিষদের মন্ত্র উচ্চারণ করলে যজ্ঞের শক্তিটা বাড়ে, যজ্ঞের ফলটা ভালো হয়। কিন্তু উচ্চারণ না করলেও কিছু যায় আসে না। রান্নাতে ফোড়ন দেওয়ার মত, ফোড়ন দিলে রান্নার স্বাদের মাত্রাটা একটু বাড়ে, এর বেশি কিছু না। কিন্তু বেদ বলতে যে কোন বিদ্যাকেই বোঝায়, পদার্থ বিজ্ঞানও বেদ, রসায়ন বিজ্ঞানও বেদ, নৃত্যকলা, সঙ্গীতকলাও বেদ আর মূল চারটে যে বেদ সেটাও বেদ। কর্মকাণ্ডীরা বেদের এই সংজ্ঞাকে কখনই মানবে না, তাঁদের কাছে বেদ মানে শুধু মন্ত্র আর ব্রাহ্মণ। অথচ আচার্য শঙ্কর বেদের সংজ্ঞায় বলছেন যার দ্বারা পরমাত্মা লাভ হয় ওটাই বেদ। শুধু মন্ত্র আর ব্রাহ্মণকে নিয়ে পড়ে থাকলে পরমাত্মা লাভ কখনই হবে না। তার মানে বেদের ঠিক ঠিক অর্থ হবে যেখানে উপনিষদ আছে। কারণ পরমাত্মা লাভ করার জন্য উপনিষদের দরকার, সেখানে মন্ত্র আর ব্রাহ্মণ দিয়ে কাজ হবে না। তাহলে মন্ত্র, ব্রাহ্মণ আর আরণ্যককে সরিয়ে দিয়ে শুধু উপনিষদকে রাখলেই হয়। কিন্তু না, শুধু উপনিষদকে রাখলে সারা দেশে আর বিদ্যার স্তুতি হবে না। বিদ্যার প্রতি প্রীতি হওয়ার জন্য দরকার যজ্ঞ ও উপাসনা। যজ্ঞ মানেই মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ, উপাসনা আসছে আরণ্যক থেকে। মন্ত্র, ব্রাহ্মণ আর আরণ্যককে সরিয়ে দিলে পুরো উপনিষদ অপাত্রে দান হতে থাকবে। অপাত্রে দান হতে থাকলে পুরো বিদ্যাটাই অবলুপ্ত হয়ে যাবে। একটা অবস্থায় সবাইকে প্রচুর কাজ করতে হবে, কাজের মধ্য দিয়েই মানুষের শুদ্ধিকরণ হয়। কাজ না করলে আমরা জানব কি করে তোমার কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ মাৎসর্য কি অবস্থায় আছে। সেইজন্য যতক্ষণ মন্ত্র ব্রাহ্মণ না জেনে থাকে তার মানে ততক্ষণ সে কোন যজ্ঞ করেনি, যজ্ঞ করেনি মানে তার শুদ্ধি হয়নি। আরণ্যকে যদি না গিয়ে থাকে, উপাসনা যদি না করে থাকে মনের চাঞ্চল্যতা এখনও প্রশমিত

হয়নি। মন যদি প্রশমিত না হয়ে থাকে তাহলে কিভাবে উপনিষদের বিদ্যা আয়ত্ত করবে! তাই পূর্ণাঙ্গ আধ্যাত্মিক জীবনকে সংগঠিত করার জন্য পুরো বেদেরই বিরাট ভূমিকা, প্রত্যেকের মনের বর্তমান মানসিক গঠন অনুসারে মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ এই চারটিকেই সমান গুরুত্ব দিতে হবে।

বেদের পাঁচটি নাম ও বেদের ধর্ম সাধন

বেদে ধর্ম সাধন মানেই শাস্ত্রোক্ত নৈষ্ঠিক কর্মানুষ্ঠান, শাস্ত্রে যে সব কর্মের কথা বলা হয়েছে সেই কর্মের অনুষ্ঠান। যেমন যজ্ঞ-যাগ, পূজা অর্চনা সবই ধর্ম সাধন। সব ধর্মেই নানান কর্মের কথা বলা হয়েছে, যেমন কোরানে কিছু কর্মের কথা বলা হয়েছে, যে কর্মের কথা শাস্ত্রে বলা আছে সেগুলোকে নিষ্ঠাপুর্বক করাই ধর্ম সাধন। মোক্ষ সাধনে ঠিক এর উল্টোটা হয়ে যায়। আমাদের সন্ন্যাস ধর্মে যা আছে বা উপনিষদে যা আছে সেটা অন্য ধর্ম থেকে তফাৎ। অন্যান্য ধর্মে সবাইকে ধর্মের নিয়ম আচারাদি পালন করতে হবে, কিন্তু হিন্দু ধর্মে সন্ন্যাসীদের ধর্মের আচার নিয়মে অতিক্রম করতে হয়। ধর্মকে অতিক্রম করা মানে বিধর্মী হয়ে যাওয়া বোঝায় না, তারা ধর্মের ঐ স্তরকে অতিক্রম করে আধ্যাত্মিকতার আরো উন্নত স্তরে চলে যান। আচার নিয়মকে অতিক্রম করে সন্ন্যাসীরা একমাত্র আত্মানুভূতিতে মনকে লাগিয়ে দেন। অর্থ সাধন হল টাকা-পয়সা, জমি-জায়গা অর্জন করার চেষ্টা করা। তবে যে কোন উপায়ে অর্জন করা নয়, পুরুষার্থ রূপে অর্থ সাধন মানে সৎ ভাবে, ধর্ম পথে অর্জন করার চেষ্টা। ধর্ম যদি এর মূলে না থাকে তাহলে তাকে অর্থ সাধন বলা হবে না। চতুর্বর্গ মানে চারটে লক্ষ্য আর চারটে আশ্রম মানে যারা আধ্যাত্মিক জীবন-যাপন করতে চান তাদের জন্য। শঙ্করাচার্য গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের ভাষ্যে বলছেন – বেশির ভাগ লোকেদের মধ্যে কামনা বাসনা বেশি মাত্রায় থাকে, এদের জন্য ধর্ম কথা নয়। যে মুহুর্তে বর্ণাশ্রম বা পুরুষার্থের কথা বলা হবে তখনই ধরে নিতে হবে তার মধ্যে অনর্থ বা অধর্মের কিছু থাকবে না। নিজের খামখেয়ালি মত কিছু করা যাবে না একমাত্র শাস্ত্র যা যা বলে দিয়েছে তার বাইরে কিছু করা যাবে না।

বেদের যে আলাদা আলাদা নাম আছে সেই নামানুসারে বোঝা যাবে বেদকে কি অর্থে গ্রহণ করা হয়। বেদকে পাঁচ ভাবে অর্থ করা হয় – নিগম, শ্রুতি, আমনায়, ত্রয়ী ও বেদ। বেদ কথার অর্থ আমরা আগেই বলেছি, বিদ্ ধাতু থেকে বেদ এসেছে, বিদ্ ধাতুর অর্থ জানা। আস্তিক দর্শন আর নাস্তিক দর্শন সম্বন্ধে আমরা জেনে গেছি। আস্তিক দর্শনের ছটি দর্শনকে একসঙ্গে বলা হয় ষড়্দর্শন। ছটি দর্শনের মধ্যে একটা দর্শন মীমাংসা। মীমাংসকরা পুরো শক্তি বেদের উপরেই দিয়েছেন, বেদের ব্যাখ্যাতেই এদের গোটা দর্শন দাঁড়িয়ে রয়েছে। এই দর্শন খুবই কঠিণ। তবে এটাই আশ্চর্যের যে, যদিও বেদ আমাদের শেষ কথা, আর মীমাংসকরা বেদ নিয়েই তাদের দর্শনকে প্রতিষ্ঠিত করছেন, অথচ শঙ্করাচার্যের প্রধান প্রতিপক্ষ এই মীমাংসকরা, তাঁর প্রধান লড়াই এদের সাথেই। আমাদের যখন শাস্ত্র পড়ান হয় তখন চারটে দর্শন পড়ানোর পরে মীমাংসা পড়ান হয়, একেবারে শেষে বেদান্ত পড়ান হয়ে থাকে। কেননা মীমাংসা দর্শন বুঝে নিলে পরে বেদান্ত পড়তে সহজ হয়। শঙ্কারাচার্যের সময় মীমাংসকদের বলা হত প্রধানমল্ল। মীমাংসা দর্শন এতো শক্তিশালী ছিল যে যদি কেউ মীমাংসকদের হারিয়ে দিতে পারে তাহলে ধরে নিতে হবে জগতের যত দর্শন আছে সবাইকে সে হারিয়ে দিয়েছে। কলকাতার সবথেকে বড় মল্লবীর যদি পাঞ্জাবে গিয়ে ওখানকার চ্যাম্পিয়নকে হারিয়ে দিতে পারে তাহলে পাঞ্জাবের সব মল্লবীরকেই হারিয়ে দেওয়া হবে।

মীমাংসকদের হারাতে গিয়ে শঙ্করাচার্যকে খুব কঠিণ কঠিণ শক্তির মুখোমুখি হতে হয়েছিল। প্রথমে তিনি খোঁজ নিলেন মীমাংসকদের প্রধান কে আছেন। খোঁজ নিয়ে জানলেন যে তাদের প্রধান হলেন কুমারিল ভট্ট। কুমারিল ভট্টকে যখন তিনি খুঁজে বার করলেন তখন কুমারিল ভট্ট একটা প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য তুষের আগুনে নিজেকে আত্মাহুতি দিয়ে মৃত্যুর অপেক্ষা করছেন। কুমারিল ভট্ট বৌদ্ধ ধর্মকে জানার জন্য নিজের ধর্ম ত্যাগ করে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। বৌদ্ধ ধর্মকে ভালো করে জেনে বুঝে, এদের দুর্বলতা ও দোষ-ত্রুটিকে আয়ত্ত করে নিয়ে পরে তিনি বৌদ্ধ ধর্মকে আক্রমণ করলেন, আর এমন আক্রমণ করলেন যে সারা ভারতে বৌদ্ধধর্মকে একেবারে নস্যাৎ করে ছেড়ে দিলেন। কিন্তু নিজের ধর্মকে যেহেতু ত্যাগ করে বিধর্মী হয়েছিলেন

সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য তিনি নিজেকে তুষাগ্নিতে আহুতি দিয়ে তিল তিল করে পুড়তে পুড়তে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। শঙ্করাচার্য কুমারিল ভট্টকে খুঁজতে খুঁজতে সেখানে পৌঁছে দেখেন কুমারিল ভট্ট একমাস ধরে একটু একটু করে পুড়ছেন। ঐ অবস্থাতে শঙ্করাচার্য তাঁকে গিয়ে বলছেন 'আমি আপনার সাথে তর্ক করতে এসেছি'। কুমারিল ভট্ট শঙ্করাচার্যকে তখন বলছেন 'আমারতো এই অবস্থা দেখছ, আমি তো এখন পুড়ছি, এই অবস্থায় আমি তোমার সাথে কি আর তর্ক করব। তবে মিথিলাতে আমার শিষ্য মণ্ডন মিশ্র আছে, তুমি তাকে গিয়ে হারাও, ওকে হারালে আমাকেই হারান হবে'। শঙ্করাচার্য কুমারিল ভট্টের মৃত্যু পর্যন্ত সেখানে অপেক্ষা করে থেকে তাঁর মৃত্যুর পর ক্রিয়াকর্মাদি করিয়ে দিয়ে মিথিলাতে মণ্ডন মিশ্রের কাছে এসে তাকে তর্কে আহ্বাণ করলেন। সাত দিন ধরে এই তর্ক চলেছিল। সাত দিন পর মণ্ডন মিশ্র নিজের পরাজয় স্বীকার করে শঙ্করাচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস নিয়ে নিলেন। পরবর্তি কালে শঙ্করাচার্যের চারজন প্রধান শিষ্যের মধ্যে মণ্ডন মিশ্র একজন প্রধান শিষ্য হয়েছিলেন, তাঁর নাম হয়েছিল সুরেশ্বরাচার্য। মণ্ডন মিশ্রকে যেদিন শঙ্করাচার্য হারিয়ে দিলেন সেই দিন থেকে ভারতের প্রধান দর্শন হয়ে গেল বেদান্ত। শঙ্কারাচার্যের পর প্রায় তেরশো বছর ভারতের উপর দিয়ে অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে কিন্তু আজ পর্যন্ত বেদান্তকে কেউ হারাতে পারেনি। বেদান্তের মধ্যে প্রচুর শাখা-প্রশাখা আছে – দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ, অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ ইত্যাদি আর এদের প্রত্যেকের মধ্যে প্রচণ্ড বাদ-বিতণ্ডা লেগেই থাকে, কিন্তু অন্য দর্শন বা ধর্ম থেকে কেউ আক্রমণ করলে এরা সবাই এক জোট হয়ে পাল্টা আক্রমণ করবে।

বেদান্ত যতই শীর্ষে থাকুক, কিন্তু বেদের ব্যাপারে আজ পর্যন্ত আমরা যা কিছু পেয়েছি, আর এর যা কিছু ব্যাখ্যা সবটাই মীমাংসকদের অবদান। সেইজন্য বেদের ব্যাপারে মীমাংসা দর্শন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বেদের বিভিন্ন মন্ত্রের, শব্দের অর্থ কিভাবে নেওয়া হবে, এই অর্থ কিভাবে কোথায় প্রয়োগ করা যাবে, এই শব্দ কেন ব্যবহার করা হয়েছে ইত্যাদি যে সব নিয়মগুলো আজ আমরা পাচ্ছি এগুলোকে মীমাংসা দর্শন খুব যুক্তিসম্মত ও বিজ্ঞানসম্মত ভাবে তৈরী করে বেদকে তার নিজস্ব কাঠিণ্যতা আর ভীতি থেকে বার করে সবার ব্যবহারের উপযোগী করে দিয়েছে। সেইজন্য মীমাংসা খুব উচ্চকোটির দর্শন।

শ্রুতি – মীমাংসকরা শ্রুতিকে ব্যখ্যা করছে – *শ্রুয়তে ধর্ম অনয়া ইতি*। যে ধর্মোপদেশ গুরুমুখে শ্রবণ করা হয় তাকে শ্রুতি বলছে। যার তার কাছ থেকে যে কোন কিছু শুনে নিলেই শ্রুতি হবে না। গুরুর কাছ থেকে শোনা চাই আর যেটা শুনছে সেটা ধর্মের কথা হওয়া চাই, তবেই সেটা শ্রুতি হবে।

আমনায় – *আমনায়তে উপদিষ্যতে অনেন ইতি*। যিনি আদেশ দেন। বেদ – তিনি আদেশ দিচ্ছেন, এটা কর, এভাবে কর, এখানে আদেশ দেওয়া হচ্ছে। বেদ আদেশ দিচ্ছে বলে বেদের আরকটি নাম আমনায়। বেদ আর শাস্ত্রের এখানেই পার্থক্য, শাস্ত্র শাস্ ধাতু থেকে আসে, যা আমাদের কিছু আচরণ বিধি ঠিক করে দিচ্ছে, আমাদের আচার আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করছে। কিন্তু বেদ আমাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করছে না, আমাদের জীবনকে উচ্চ থেকে উচ্চতর অবস্থাতে নিয়ে যায়। তাই শাস্ত্রের স্থান বেদের থেকে একটু নীচে। রামকৃষ্ণ মঠ মিশনকে স্বামীজী দাঁড় করিয়ে গেছেন আর বর্তমান মঠ মিশনের অধ্যক্ষরা এই সংস্থাকে এখন চালাচ্ছেন – এখানে স্বামীজী হলেন বেদ আর অধ্যক্ষরা শাস্ত্র।

নিগম – নিগম মানে, যে ঐতিহ্য অনাদিকাল থেকে পরম্পরা ভাবে চলে আসছে। নিগম আর শ্রুতি প্রায় একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। গুরুর কাছে ধর্মের যা কিছু শোনা হচ্ছে সেটাকে শ্রুতি বলা হয় আর পরম্পরা ভাবে যে আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য প্রবাহমান কাল থেকে চলে আসছে তাকেই নিগম বলা হয়।

ত্রয়ী – অনেকে বিশেষ করে পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা ঋক্, সাম ও যজুর্বেদ এই তিনটেকেই বেদ মনে করে, সেইজন্য বেদের আরেকটি নাম ত্রয়ী। আসলে বেদকে তিন ভাবে দেখা হয়, যার জন্য বেদকে ত্রয়ী বলা হয়। প্রথমতঃ বেদকে পদ্য রূপে দেখা হয়। দ্বিতীয়তঃ গদ্য রূপে আর তৃতীয়তঃ সঙ্গীত রূপে, যেটাকে গান করা যায়। যে কোন সাহিত্য যখন রচিত হয় তখন এই তিনটির যে কোন একটি রূপে রচিত হয়ে থাকে – পদ্য, গদ্য ও গেয়। পদ্য আবার দুই প্রকার – একটা পাঠমুক্ত আরেকটা গেয়মুক্ত। পাঠমুক্ত – কিছু কিছু

কবিতা আবৃত্তি করতে খুব ভালো লাগে কিন্তু গান করা যায় না। আবার কিছু কিছু কবিতা আবৃত্তি করতেও ভালো লাগে আবার সুরের ব্যবহার করে সুন্দর গান করাও যায়। বেদ এই তিনটে রূপেই পাওয়া যায়, যেমন ঋগ্বেদ পাঠমুক্ত, মানে শ্লোক রূপে। যজুর্বেদের বেশিটাই গদ্যরূপে আর সামবেদ গেয়মুক্ত, মানে গান করা যায়। এই তিনটি বৈশিষ্ট্যের জন্য বেদের আরেক নাম ত্রয়ী। আর অথর্ববেদ পদ্য ও গদ্যের সংমিশ্রণ।

বেদকে ত্রয়ী কেন বলা হয় আমরা দেখলাম। যেহেতু বেদকে ত্রয়ী বলা হয় সেইজন্য পাশ্চাত্য দর্শনের পণ্ডিতরা বলেন প্রথমে তিনটি বেদ ছিল – ঋক, সাম ও যজু। যেহেতু অথর্ববেদ পরে রচিত হয়েছে তাই বেদকে চতুর্বেদ বলা যায় না। প্রাচ্যের পণ্ডিতরা এই মতকে অস্বীকার করেন। তাদের মতে ছন্দের তিনটে রূপ, এই তিনটে ছন্দ তিনটে বেদে প্রতিফলিত হয়েছে, অথর্ববেদের বিশেষ কোন ছন্দ নেই। ঋগ্বেদের ছন্দকে বলা হয় ঋক, সামবেদের ছন্দকে বলা হয় সামগান আর যজুর্বেদে যে ছন্দ আছে তাকে বলা হয় যজুস্ ছন্দ। অথর্ববেদ ঋক আর যজুস্ ছন্দের সংমিশ্রণ। অথর্ববেদে ছন্দের দিক থেকে আলাদা কোন বৈশিষ্ট্য নেই বলে বেদকে ত্রয়ী বলা হচ্ছে। আমরা আমাদের পরম্পরা দৃষ্টিভঙ্গীই মানব।

বেদ – বেদ কথার অর্থ আমরা আগেই বলেছি। বেদ মানে যেটা দিয়ে জানা যায়। একটা মানুষের মনুষ্য জীবনে যা কিছু জানার আছে এই বেদ থেকেই সে সব জানতে পারে।

বেদেরই পাঁচটি বিভিন্ন নাম, আর প্রত্যেকটি নামের মধ্যে বেদের তাৎপর্য নিহিত রয়েছে, কোন ধরণের কল্পিত বা খেয়াল হল একটা কিছু নাম দিয়ে দেওয়া হয়েছে তা নয়। প্রত্যেকটি নামের একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে – এই এই অর্থের জন্য বেদকে এই এই নামেও অভিহিত করা যায়।

শঙ্করাচার্য বেদের সংজ্ঞা দিচ্ছেন – *পরমাত্মানাং লভন্তে ইতি*। শঙ্করাচার্যের মতে যার দ্বারা পরমাত্মাকে লাভ করা যায় তাকেই বেদ বলা হয়। মীমাংসকরা বেদের সংজ্ঞা দেন – *শ্রুয়তে ধর্ম অনয়া ইতে*। বেদের এই দুটো সংজ্ঞাতেই বিরাট পার্থক্য। বেদের অর্থ দু দিকে চলে গিয়ে ভারতে দুটো দর্শনের জন্ম নিয়ে নিল। ধর্ম সাধন হল যা মানব জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করছে, আধ্যাত্মিক জীবন-যাপন করতে সাহায্য করছে আর আমার বাস্তবিক স্বরূপকে জানার একমাত্র লক্ষ্য করে যে সাধন করা হবে তাকে বলা হচ্ছে মোক্ষ সাধন। মীমাংসকরা বেদের সংজ্ঞা দিচ্ছে বেদের দ্বারা ধর্ম সাধন হয় আর শঙ্করাচার্য বেদের সংজ্ঞা দিচ্ছেন বেদের দ্বারা মোক্ষ সাধন হয়। বেদ অধ্যয়ন করতে গিয়ে যে নানান ধরণের সংশয় আসে তার মূলে বেদের এই দুটো বিপরীত সংজ্ঞা। যদিও ষড়্দর্শন পুরোপুরি বেদের উপর আশ্রিত কিন্তু দুটি প্রধান দর্শন বেদের উপরে বেশি জোর দেয়, এর একটা পূর্বমীমাংসা আর দ্বিতীয় উত্তরমীমাংসা – একদল বলছে বেদ হল ধর্মসাধন আরেক পক্ষ বলছে বেদ হল পরমাত্মাকে জানার সাধন, পরমাত্মাকে জানার সাধনই মোক্ষ সাধন।

ধর্মসাধনের সাথে মোক্ষের কোন সম্পর্কই নেই। ধর্মসাধনে মানুষ অনেক ভদ্র, নম্র, পবিত্র, মার্জিত হয়ে একজন ভালো মানুষে রূপান্তরিত হয়। গঙ্গা স্নান করা, জপ করা, উপোস করা এগুলোই ধর্মসাধন, এর সাথে পরমাত্মা সাধনের কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু এগুলো করার ফলে মানুষের মধ্যে ভালো সংস্কার তৈরী হয়, ভালো মানুষ হতে সহায়তা করে। জপও করছে আবার ঝগড়া মারামারিও করছে, এই জপ করা ভালো না খারাপ? জপ না করা থেকে অনেক ভালো। মিথ্যা কথাও বলে আবার মন্দিরেও যায়। তার স্বভাবে আছে সে তো মিথ্যে কথা বলবেই কিন্তু তাই বলে কি মন্দিরে যাওয়া ছেড়ে দেবে! ধর্মসাধন করতে করতে ধীরে ধীরে তার মিথ্যে কথা বলাটা বন্ধ হয়ে যাবে। তেলোভেলোর মাঠে ডাকাতের ঘটনা আমাদের সবারই জানা। কালী পূজা করে ডাকাতি করত, ডাকাতি করে আবার এসে মা কালীকে পূজা করত। আরেকজন ডাকাতি করছে সে এসব কিছুই করছে না, এ কিন্তু কোন দিনই ডাকাতি ছাড়তে পারবে না, যদিও ছাড়ে ভালো মানুষ হতে পারবে না, অন্য কোন খারাপ কিছু করতে থাকবে। কিন্তু যে কালী পূজা করে ডাকাতি করছে, যেদিন সে ডাকাতি করা ছেড়ে দেবে সেদিন থেকে সে এক অন্য মানুষ হয়ে যাবে। আজ তেলোভেলো গ্রামে মায়ের বিরাট মন্দির, যারা ডাকাতি করত তারাই আজ ভক্ত হয়ে গেছে। অন্যান্য ধর্ম থেকে হিন্দু ধর্মের এটাই বিশেষত্ব – তুমি চুরি কর, ডাকাতি কর, যাই কর মনটা ভগবানের দিকে দাও, আস্তে আস্তে তোমার কর্ম পাল্টাতে থাকবে।

ধর্মসাধনে যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ তা হল কর্মটা পাল্টাতে থাকে। কর্ম পাল্টে গেলে মানুষের কাম আর অর্থে সিদ্ধিটা আসতে থাকে। অর্থোপার্জনে যে বাধাগুলো ছিল সেগুলো সরে যায়, এখন সে চেষ্টা করলেই প্রচুর অর্থ রোজগার করতে পারবে। এরপরে আসছে কাম লাভ, কাম মানে শুধু নারী-পুরুষের সম্পর্ককেই বোঝায় না, ইন্দ্রিয়ের যে কোন ধরণের সুখ ভোগকে কাম বলা হয় – ভালো খাওয়া, ভালো থাকার জায়গা, ভালো পোষাক, গাড়ি, যে কোন ভোগই কাম। ধর্মসাধনে ভোগ করার শক্তিটা বেড়ে যায়। আমরা মনে করি বেশি ধর্মসাধন করলে মাথা খারাপ হয়ে যায়, কিন্তু না, উল্টোটাই হয়। যার দিনকাল খুব খারাপ যাচ্ছে সে যদি খুব করে ধর্মসাধন করে তাহলে তার খারাপ অবস্থাটা কেটে যায়। এখনও দেখা যায় কারুর যদি সময় খারাপ যাচ্ছে তাকে বলা হয় একদিন সত্যনারায়ণের পূজো দাও, কিংবা রোজ এক অধ্যায় করে চণ্ডীপাঠ কর, হনুমান চল্লিশা পাঠ কর সব ভালো হয়ে যাবে। সত্যি সত্যিই ভালো হয়ে যায়, কারণ যে বাজে কর্মগুলো আছে সেগুলি এই শুভ কর্মের দ্বারা কেটে যায়। যেসব বাচ্চারা খুব চঞ্চল, অবাধ্য, এদের যদি জোর করে রোজ জগন্নাথের আটকে প্রসাদ আর একটু গঙ্গাজল খাইয়ে দেওয়া হয় কিছুদিন পরে দেখা যায় এদের স্বভাবটা আগের থেকে অনেক শান্ত হয়ে গেছে। একদিনে হবে না, সময় লাগবে, কিন্তু ফল দেবেই।

মীমাংসকরা এগুলোই বলছেন, তোমার চরিত্র পাল্টে যাবে, তোমার কর্মের গোলমালগুলো ঠিক হয়ে গিয়ে কামসিদ্ধি ও অর্থসিদ্ধি হবে। কিন্তু মীমাংসকদের কাছে সব থেকে যেটা বেশি গুরুত্ব তা হল, ধর্মসাধন ভালোভাবে করলে মৃত্যুর পর তুমি উচ্চ স্বর্গে যাবে, স্বর্গ থেকে পরে যখন তোমার পতন হবে তখন তুমি কোন ভালো বংশে, ভালো বাড়িতে জন্ম গ্রহণ করবে। মীমাংসকদের মতে ধর্মসাধনে তিনটে জিনিস হবে – তোমার স্বভাবটা পাল্টে গিয়ে তোমাকে ভালো মানুষ হতে সাহায্য করবে, দ্বিতীয় তোমার কর্মগুলি ঠিক হয়ে তোমার অর্থ ও কাম লাভের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে এবং সব শেষে তৃতীয় যেটা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ তা হল তোমার মধ্যে যে সূক্ষ্ম শরীর রয়েছে সেটা মৃত্যুর পর আরেকটা শরীর ধারণ করে উচ্চ থেকে উচ্চ স্বর্গে গিয়ে সেই শরীরের মাধ্যমে আরো ভালো সুখ ভোগ করতে থাকবে। মীমাংসকরা মোক্ষ বলে কিছু মানে না, মুক্তি বলে কিছু নেই। এদের কাছে ধর্মই সব কিছু, কর্ম কর, ধর্মকার্যই ঠিক ঠিক কর্ম, কর্ম করলে এই জীবনে সুখ ভোগ করবে আর মৃত্যুর পর ভালো স্বর্গে যাবে, সেখান থেকে তুমি আবার ভালো ঘরে জন্ম নেবে। এদের এটাই মত – জন্ম নিচ্ছে মরে যাবে, আবার জন্ম নেবে আবার মরবে এটাই চলতে থাকবে, মুক্তি-ফুক্তি বলে কিছু নেই। গীতাতেও শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন – তুমি যদি মীমাংসকদের মত মনে কর আত্মা জন্মে নেবে আবার মরবে, তারপরে আবার জন্ম নেবে, তাহলেও তোমার শোক করা উচিৎ নয় – *অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্। তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং শোচিতুমর্হসি।।* মীমাংসকদের এটাই সিদ্ধান্ত – আত্মার জন্ম নেই মৃত্যু নেই, সৃষ্টিও অনাদিকাল চলতে থাকবে, আত্মাও জন্ম নিয়ে একটা শরীর ধারণ করবে আবার মৃত্যু হবে, মৃত্যুর পর তার কর্মানুসারে স্বর্গে যাবে, সেখান থেকে আবার জন্ম নেবে এভাবে কোটি কোটি বছর চলার পর সৃষ্টিতে প্রলয় হবে, প্রলয়ের পর কোটি কোটি বছর পর আবার যখন সৃষ্টি হবে তখন আবার এই জন্ম-মৃত্যুর খেলা চলতে থাকবে, এর শেষ নেই। সমুদ্রের জল বাষ্প হয়ে মেঘ হয়ে চলে গেল আবার বৃষ্টি হয়ে নদী দিয়ে সেই জল প্রবাহ হয়ে সমুদ্রে এসে পড়ল, এইভাবে অনাদি কাল ধরে চলতেই থাকবে। এদের এই মতবাদকে খণ্ডন করা খুবই কষ্টসাধ্য, শঙ্করাচার্যকে এর জন্য প্রচুর খাটতে হয়েছিল। চার্বাক দর্শনে এগুলো কিছুই মানা হয় না, তাদের কাছে মৃত্যুর পর সব শেষ।

চতুর্থ যে মতবাদ মীমাংসকরা তা মানে না, কিন্তু বেদান্তীরা মানে। ধর্মসাধন তাকে মোক্ষের দিকে এগিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুতি করিয়ে দেয়। বেলুড় মঠের সন্ন্যাসীরা যে এত নিষ্ঠা ও নিঃস্বার্থ ভাবে সেবা কাজ করছে, পূজো করছে, সবাই কিন্তু এখানে মীমাংসকদের অনুসরণ করছে। এতে সন্ন্যাসীদের মন পরিষ্কার করে দিচ্ছে। মন যখন পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে তখন তাকে মোক্ষের দিকে এগিয়ে দেবে। আগেই বলা হয়েছে মীমাংসকরা মোক্ষ সাধনকে মানে না, বেদ থেকেই এরা বলবে, আর এর জন্য তাদের খুব জোড়াল যুক্তিও দাঁড় করিয়ে দেবে, আবহমান কাল থেকে এই বিতর্ক চলে আসছে। শঙ্করাচার্য বলছেনে – *পরমাত্মানাং লভন্তে ইতি*। কিন্তু পরমাত্মা বলে পূর্বমীমাংসকরা কিছু মানেই না। পূর্বমীমাংসকরা ঈশ্বর মানে না, ভগবান মানে না,

পরমাত্মাকে মানছে না, তাহলে এরা আসলে কি মানে? এদের কাছে একটাই আসল, ধর্ম সাধন। কর্ম কর্ম কর্ম, এ ছাড়া মীমাংসকরা আর কিছু জানে না। পূর্বমীমাংসার দর্শন পুরোপুরি এর উপরেই দাঁড়িয়ে আছে। তারা মানুষ ছাড়া বলবে ভূত-প্রেত আছে আর আছে ইন্দ্রাদি দেবতা আছেন। ইন্দ্রাদি দেবতাদেরকেও যজ্ঞ দ্বারা পতন করিয়ে দেওয়া যাবে। পূর্বমীমাংসকরা বলে আমি এমন মন্ত্র জানি, যে মন্ত্র দিয়ে আমি ইন্দ্রকেও টেনে নীচে নামিয়ে আনতে পারি। মহাভারতে এরা তাই করে দেখিয়ে দিয়েছে। সর্পযজ্ঞ করার সময় যখন জানা গেল তক্ষক ইন্দ্রের মুকুটে লুকিয়ে আছে, তখন জনমেজয়কে পুরোহিতরা বলে দিল ইন্দ্রশুদ্ধু তক্ষককে যজ্ঞে টেনে নামিয়ে আনছি। ইন্দ্র বুঝতে পেরেই তার মুকুটটা খুলে ছুঁড়ে ফেলেছে। বেদ মন্ত্রের এমন শক্তি যে দেবতাদেরও বেঁধে নিয়ে আসতে পারে। এরা বিশ্বাস করত বেদের মন্ত্রের মধ্যেই রয়েছে সর্ব শক্তি। বেদ মন্ত্রকে যদি যজ্ঞে ঠিক ভাবে প্রয়োগ করা হয় তাহলে যে কোন কার্যসিদ্ধি সম্ভব। এদের কাছে মুক্তি বলে কিছু নেই, সেইজন্য কর্মই এদের শেষ কথা। অনেকে যে বলে স্বর্গ বলে কিছু আছে নাকি? মৃত্যুর পর আবার কিছু হয় নাকি? মরে গেলেই সব শেষ। এই ধরণের মত হাজার হাজার বছর আগে চার্বাক দর্শনে বলা হয়ে গেছে। চার্বাকরা বলে – যারা বেদ লিখেছে এরা হল ধুর্ত, ভ্রষ্ট, নিশাচর দৈত্য। শুধু অর্থ রোজগার করবে, মাংস খাবে এই লোভে এরা বেদ লিখেছে। চার্বাকরা ভারতের বস্তুবাদী দর্শনের জনক, আজ থেকে চার হাজার বছর আগেই এদের পুরো দর্শন সারা ভারতে ছড়িয়ে গিয়েছিল, কম্যুনিষ্টরা আজ নতুন কিছু কথা বলছে না। বেদের পণ্ডিতরা এগুলো নির্বিকার ভাবেই গ্রহণ করেন, এরাও এর উপযুক্ত জবাব দিয়ে দেন। তাই আজকালকার কিছু বস্তুবাদীরা দুই একটা বই পড়ে আমাদের শাস্ত্র নিয়ে তর্ক করতে আসে তাদের জন্য একটাই কথা – ভাই তোমরা বেদের বিরুদ্ধে নতুন কথা কিছু বলছ না, আমাদের একটা পুরো দর্শন এর উপরে বহু বছর আগে থেকে চলে আসছে।

মীমাংসকরা বেদের যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞা, যা সমস্ত বেদ শিক্ষার্থীকে প্রথমেই মুখস্থ করতে হয় তা হল – *মন্ত্র ব্রাহ্মণয়ো বেদানাম্ ধ্যেয়* – বেদের অর্থ মন্ত্র আর ব্রাহ্মণ। এই সংজ্ঞা থেকে বোঝা যায় মীমাংসকদের কাছে বেদ শুধু মন্ত্র আর ব্রাহ্মণ, বাকি যা আছে তা বেদ নয়। কারণ উপনিষদ শুধু আত্মতত্ত্বের কথা বলে, কিন্তু আত্মতত্ত্ব দিয়ে তো আর ধর্ম সাধন হবে না। আরণ্যকেও কোন বাহ্যিক ক্রিয়াদি নেই, শুধু মনে মনে কল্পনা করলেই হবে। এই দিয়েও ধর্ম সাধন হবে না। তাই মীমাংসকরা উপনিষদ আর আরণ্যককে বেদ বলে গ্রহণ করবে না। মন্ত্রের সংজ্ঞা হল, যা ধর্ম করার দিকে প্রেরিত করে, অর্থাৎ ধর্মের দিকে নিয়ে যায়। আর ধর্ম মানে বিধি ও নিষেধ। ব্রাহ্মণে যজ্ঞ কি ভাবে হবে তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এই দুটোই ধর্ম সাধনের প্রধান অবলম্বন তাই এই দুটোকেই বেদ বলা হয়। তাই বলে উপনিষদ আর আরণ্যককে মীমাংসকরা উড়িয়ে দিচ্ছে না। তারা বলে আরণ্যক আর উপনিষদেরও প্রয়োজনীয়তা আছে, তবে এই দুটো গৌণ। গৌণ এই কারণে, লোকেদের মন যাতে ধর্মসাধনে প্রবৃত্ত হয় তার জন্য বেদে আরণ্যক আর উপনিষদের কথা বলা হয়েছে। এই দুটো প্রস্তুতি করিয়ে দিচ্ছে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ যাতে ঠিকভাবে করতে পারি। শঙ্করাচার্য এটাকেই পুরোপুরি উল্টে দিয়ে বললেন – আগে অনেক দিন ধরে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ অনুশীলন করতে থাক, মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ অনুশীলন করে যখন তোমার মন শুদ্ধ হবে তখন তুমি উপনিষদ অধ্যয়ন করার যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে।

এখন যদি বলা হয় *অগ্নীমিড়ে পুরোহিতং* এই মন্ত্রকে কি করে বেদ বলা হয়? তখন বলা হয়, কোন কোন যজ্ঞে অগ্নীসূক্তম্ দরকার, ওই যজ্ঞ করলে আপনার কিছু একটা প্রাপ্তি হবে। সেটাই তখন বিধি হয়ে গেল, ধর্ম বলে দিচ্ছে তুমি এই যজ্ঞ করলে এটা পাবে, তাই তুমি এই যজ্ঞ কর। বিধি মানে করা। তার সাথে মন্ত্র বলে দিল কি উচ্চারণ করলে তুমি এটা পাবে। আর এই জিনিসটা বেদে আছে। মন্ত্র বলে দিচ্ছে কিভাবে একটা জিনিস হবে আর মন্ত্র বেদে আছে। মন্ত্রকে যখন কার্যকর করতে যাওয়া হবে তখন তার ব্যাখ্যার প্রয়োজন হবে, তুমি জিনিসটা কিভাবে করবে। এইভাবেই বিধি আর নিষেধ বলা হয়েছে। ব্রাহ্মণ একটা যজ্ঞ কিভাবে করতে হবে বলে দিচ্ছে। বেদের খুব নামকরা যজ্ঞ পুত্রেষ্ঠি যজ্ঞ বা পর্জন্য যজ্ঞ। বৃষ্টি হচ্ছে না, চাষবাশ হচ্ছে না, তুমি পর্জন্য যজ্ঞ কর। পর্জন্য যজ্ঞ করার জন্য মন্ত্র লাগবে, মন্ত্র পাওয়া যাবে একমাত্র বেদে। সেইজন্য বলছেন মন্ত্র মানেই বেদ। কিন্তু এই মন্ত্র কিভাবে কাজে লাগাতে হবে, কিভাবে উচ্চারণ করতে হবে, যজ্ঞ কিভাবে করতে হবে? অগ্নিকুণ্ড স্থাপনা করতে হবে, বেদের ব্রাহ্মণ ডাকতে হবে, যজ্ঞের আনুষাঙ্গিক

জিনিসপত্র জোগাড় করতে হবে, অগ্নিতে আহুতি দেওয়ার একটা পদ্ধতি আছে, এসব কথা বলা আছে ব্রাহ্মণ অংশে। সেইজন্য মন্ত্র অংশ আর ব্রাহ্মণ অংশ, এই দুটো অংশকে মিলিয়ে বেদ। কেউ যদি জিজ্ঞেস করে বেদ জিনিসটা কি, তখন তাকে বলতে হবে মন্ত্র আর ব্রাহ্মণ হল বেদ।

বেদের উপরে আমরা এই দুটো পরিষ্কার বিভাজন দেখতে পাই। এই বিভাজনটা পরিষ্কার ভাবে ধরতে না পারলে বেদের কিছুই বুঝতে পারব না। দুটো বিভাজন হল – মন্ত্র + ব্রাহ্মণ (প্রথম ভাগ) আর আরণ্যক + উপনিষদ (দ্বিতীয় ভাগ)। মীমাংসকরা অনেক জায়গায় আরণ্যককে ব্রাহ্মণের মধ্যে মিশিয়ে দিয়েছে। আরণ্যকে খুব বেশি দর্শনের কথা নেই, দর্শনের দিকে নির্দেশ করে দিচ্ছে কিন্তু আলোচনা করেনি। এই কারণে মীমাংসকরা মন্ত্র আর ব্রাহ্মণকেই বেদ বলছে। পরের দিকে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীও মীমাংসকদের এই মত গ্রহণ করেছেন। এদের কাছে উপনিষদের কোন মূল্য নেই। উপনিষদের ব্যাপারে বলছে – তোমার ভেতরে যে আত্মা আছে সেই আত্মার ভাবকে উপনিষদ জাগিয়ে দিচ্ছে। সেইজন্য তোমাকে আত্মসাধন করতে হবে। আত্মসাধন এদের মতে – ধর্মসাধন। ধর্মসাধন মানেই মন্ত্র আর ব্রাহ্মণের যজ্ঞ-যাগ। তুমি যজ্ঞ-যাগ কর তাহলে তোমার আত্মভাব জেগে যাবে। যজ্ঞ-যাগ কর, তিথি পূজাতে বেলুড় মঠে খিচুরী খাও, পয়লা জানুয়ারী কাশীপুর যাও, রোজ দুবেলা জপ কর সবই ধর্মসাধন। মীমাংসকরা মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের মধ্যেই বেদকে বেঁধে দিয়ে বেদের সনাতন দর্শনকে সঙ্কুচিত করে দিয়েছে।

মীমাংসকদের বেদের এই সংজ্ঞা আচার্য শঙ্কর তাই মানছেন না। শুধু মন্ত্র আর ব্রাহ্মণই বেদ মেনে নিলে বেদান্ত দর্শন পুরো ধুলিসাৎ হয়ে যাবে। শঙ্করাচার্য চারটেকেই বেদ বলে গ্রহণ করেছেন। তিনি বেদের সংজ্ঞা দিচ্ছেন, যেটা দিয়ে পরমাত্মাকে জানা যায় সেটাই বেদ। আচার্যের দৃষ্টিভঙ্গী খুবই প্রাঞ্জল ও গভীর। শঙ্করাচার্য যে দর্শন দিয়ে গেছেন সেখানে বোঝাই যায় শঙ্করাচার্যের সাথে কারুরই বিরোধ নেই, হিন্দুধর্মের মত তিনি সবাইকে জায়গা করে দিয়েছেন, কাউকেই অস্বীকার করেননি। মীমাংসকরা যেমন উপনিষদ ও আরণ্যককে বেদ বলেই মানেনা, আচার্য কিন্তু কোনটাকেই বেদ নয় বলছেন না, তিনি মন্ত্র-ব্রাহ্মণকেও বেদের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলছেন। আচার্য বলছেন মন্ত্র-ব্রাহ্মণ ভালো করে অনুশীলন করলে তোমার মন শুদ্ধ হবে। মন শুদ্ধ হলেই তুমি বুঝতে পারবে উপনিষদ কি বলছে। রামকৃষ্ণ মঠ মিশনেরও একই ভাব – মন্ত্র-ব্রাহ্মণের কথা বলছে না কিন্তু অন্য ভাবে বলছে – কাজ কর, দেশের জন্য কাজ কর, সমাজের জন্য কাজ কর, আর্ত-পীড়িতদের জন্য কাজ কর। কাজ করতে করতে তোমার মন শুদ্ধ পবিত্র হবে, তখন ঠাকুরের নাম নিলে উপনিষদের তত্ত্ব কিছু কিছু ভেতরে যেতে শুরু করবে। কিছু না করে ফাঁকা আওয়াজে কিছুই হবে না। শঙ্করাচার্যের মত ও শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের আদর্শ এক, কোন বিরোধ নেই। যদিও আচার্য বেদের সংজ্ঞা দিয়েছেন যেটা দিয়ে পরমাত্মাকে জানা যায় কিন্তু সংজ্ঞার দিক দিয়ে বেদের এই সংজ্ঞা সেভাবে প্রচলিত নয়। মন্ত্র আর ব্রাহ্মণ মানে বেদ, এই সংজ্ঞাই বেশি প্রচলিত।

স্বামীজীর জীবনের দিব্য দর্শনের কথা আমরা প্রথমেই উল্লেখ করেছি। ভারত পরিক্রমার সময় সিন্ধু নদীর তীরে একদিন ভোরবেলা তিনি দাঁড়িয়ে আছেন সেই সময় তাঁর এই দিব্যদর্শন হয়। তিনি দেখছেন হাল্কা কুয়াশা সিন্ধু নদীর তীরের সামনেটা ঢাকা। সেই কুয়াশার মধ্যে এক জটাজুট ও শশ্রুমণ্ডিত প্রাচীন ঋষিকে দেখতে পান। কুয়াশা যেন তরঙ্গাকারে ঢেউয়ের পর ঢেউ এসে ঋষির উপর দিয়ে ভেসে যেতে লাগল। ঘুম থেকে জেগে গেলে যে রকম অনুভব হয়, সেই রকম স্বামীজীর যেন মনে হল তিনি ঘুম থেকে জেগে গেলেন আর তাঁর কানে ঋষির উদাত্ত কন্ঠে উচ্চারিত বেদের একটি বিখ্যাত মন্ত্র ভেসে এল - *আবহি বরদে দেবী যৎচ্ছরিতম্ আবাদিনী গায়ত্রী ছন্দসাম্ মাতা ব্রহ্মযোনি নমহোস্তুতে*। এটাই বাগদেবীর আবাহন মন্ত্র। স্বামীজী বৈদিক মন্ত্রের ছন্দ ও সুর জানতেন। স্বামীজী দেখলেন তাঁর জানা বেদের সুর থেকে ঋষি যে সুর ও ছন্দে মন্ত্রোচ্চারণ করছে পুরো আলাদা। স্বামীজী একটু আশ্চর্য হয়ে গেলেন, আমরা পরম্পরায় বেদের যে মন্ত্রোচ্চারণ শুনে থাকি তার থেকে আলাদা একটা অন্য সুরে উচ্চারিত হচ্ছে। এখান থেকে স্বামীজী একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছালেন। আগেকার দিনে ঋষিরা যে সুরে বেদের মন্ত্রোচ্চারণ করতেন তার সুর পুরো আলাদা ছিল। কিন্তু পরের দিকে ম্লেচ্ছরাও যখন বেদ পাঠ করার সুযোগ পেয়ে গেল তখন থেকে বেদমন্ত্রের উচ্চারণ ও সুর

পাল্টাতে থাকে। মন্ত্রের উচ্চারণ ও সুর যদি ঠিক না হয় তার প্রথম যেটা ফল হবে, মন্ত্র ঠিকঠিক কাজ করবে না। স্বামীজী এখানে যে যুক্তি দেখিয়েছেন সেখানে কোথাও এতটুকু ফাঁকফোকর নেই, পুরোটাই যুক্তিপূর্ণ। স্বামীজী বলছেন ঋষির কণ্ঠে যে সুর উদ্‌গারিত হয়েছিল সেটাই ভারতের জাতীয় সুর। স্বামীজী আরও বলছেন শঙ্করাচার্যেরও নিশ্চয় এই রকম কোন দিব্যদর্শন হয়েছিল যেখানে তিনি ভারতের এই জাতীয় সুরকে ধরতে পেরেছিলেন। বেদ আর উপনিষদের ঠিক ঠিক হৃৎস্পন্দনকে শঙ্করাচার্য ধরতে পেরেছিলেন। আর আজ আমিও বেদ ও উপনিষদ ঠিক কি বলতে চাইছে, তার মর্মবাণীকে উপলব্ধি করলাম। সেইজন্য বলা হয় ভারতের আধ্যাত্মিকতাকে ঠিক ঠিক ভাবে জানতে হলে একমাত্র শঙ্করাচার্য আর স্বামীজীর মাধ্যমেই জানা যেতে পারে। ভারতের জাতীয় সুরটা কি? নানান ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যেও ভারত কেন এখনও স্বমহিমায় টিকে আছে, দেশ কোন দিকে যাচ্ছে, সেখানে স্বামীজীর কি ভূমিকা, এই সমগ্র চিত্রটা তাঁর পরিষ্কার হয়ে যায়। এই যে প্রাচীন বৈদিক যুগের ঋষির কণ্ঠে বেদ মন্ত্রের সুরের মুর্ছনা শুনলেন, সেই সুরের সঙ্গে গলা মেলালেন, তারপর থেকে তিনি পুরোপুরি পাল্টে গেলেন। এই ঘটনার পরেই তিনি গেছেন কন্যাকুমারী। স্বামীজীর এই দিব্যদর্শনের তাৎপর্যকে যদি আমরা ঠিকঠিক বুঝতে পারি তখন বেদ কি, বেদ কেন, সব পরিষ্কার হয়ে যাবে। প্রত্যেক দেশের একটা নিজস্ব অন্তরের বাণী আছে, আমেরিকার আছে, জাপানের আছে, ইংল্যাণ্ডের আছে। ভারতের সুর হল এই বেদের সুর, বেদে যা আছে সেটাই ভারতের অন্তর্নিহিত বাণী। ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যকে জানতে হলে ভারতের এই জাতীয় সুরকে ধরতে হবে। যে মুহুর্তে কোন ব্যক্তিত্বের মধ্যে বেদে কি আছে, বেদ কি বলতে চাইছে বেদের এই সুর একই তরঙ্গে প্রতিধ্বণীত হবে সেদিন থেকে সে মহান আধ্যাত্মিক পুরুষে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। সেদিন থেকে তিনি আর টাকা পয়সা মান সম্মানের দিকে ফিরেও তাকাবেন না। কিন্তু তাঁদের মধ্যে এমন একটা শক্তি এসে যায় যে শক্তিতে তাঁরা গোটা বিশ্বকে কাঁপিয়ে দিতে পারেন। এই কারণেই স্বামীজী মহান আধ্যাত্মিক পুরুষ। অন্য এক দৈবী শক্তিতে শক্তিমান হয়ে তাঁরা জগতকে বহু বছর ধরে প্রভাবিত করে চলেন। ঠাকুরের সমগ্র জীবনটাই বেদ। তিনি বেদস্বরূপ ছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ রূপী বেদ। বেদে যা আছে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন তাইই। শ্রীরামকৃষ্ণ ভারতরাষ্ট্রের যে রাষ্ট্রীয় সুর সেটাকে স্বামীজী বা শঙ্করাচার্যের মত ধরেননি, তিনিই স্বয়ং সেই রাষ্ট্রীয় সুর। স্বামীজী সিন্ধুনদের তীরে যে রাষ্ট্রীয় সুর শুনেছিলেন, সেই সুরই তিনি পেয়েছিলেন যখন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে নিজের সব কিছু দিয়ে বরণ করেছিলেন। আমাদের বলা হয় শ্রীরামকৃষ্ণকে ধরে থাকো তাহলেই সব হয়ে যাবে। শ্রীরামকৃষ্ণকে ধরা মানে কি? শ্রীরামকৃষ্ণের যে ভাবতরঙ্গ সেটাকে ধরা। যেদিন কেউ এটাকে ধরে নিতে পারবে সেদিনই সে আধ্যাত্মিক জগতের মহান ব্যাক্তিত্ব রূপে পরিগণিত হবে। শ্রীরামকৃষ্ণের যে ছন্দ, যে ভাব, আর বেদের যে ভাব ও ছন্দ দুটোই এক। ভারতের জাতীয় সুর ধ্বণিত হচ্ছে একমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যাক্তিত্বে। স্বামীজীও এটা ধরতে পেরেছিলেন। যে এই সুর ধরে নিতে পারবে সাথে সাথে তারও ব্যাক্তিত্বে এই সুরে বাজতে শুরু করে দেবে।

বেদের সব মন্ত্রই সেই দিব্যশক্তির স্তুতি, এখানে যেমন বাকদেবীর স্তুতি করা হচ্ছে। দ্বিতীয়, বেদের সব মন্ত্র ঋষিরা অনুভূতির মাধ্যমে পেয়েছিলেন। বছরের পর বছর সাধনা করে করে তাঁরা যখন গভীর ধ্যানে মগ্ন হয়ে যেতেন সেই অবস্থায় এই মন্ত্রগুলো তাঁদের ভেতরে উদ্ভাসিত হত। তারপর তিনি তাঁর নিজের শিষ্যদের বলতেন – হে তাত, আমি সেই সত্যকে জেনেছি, এই মন্ত্র পেয়েছি। এই বলে তিনি সেই মন্ত্র তাদের শুনিয়ে বলতেন – এটা তোমরা মুখস্ত করে হৃদয়ে ধ্যান করবে। আমার মধ্যে একটা কল্পনা এলো আর এই কল্পনা থেকে একটা কবিতা লিখলাম, এভাবে বেদ কখনই রচিত হয়নি। যারা মনে করে বেদ কয়েকজন কবির মনের কল্পনার প্রতিচ্ছবি, এদের জন্য বেদ নয়। ঋষিরা যদি কিছু রচনা করতে চাইতেন তাহলে তিনি এর থেকে অনেক বিরাট কিছু রচনা করতে পারতেন। বিখ্যাত সাহিত্যিকদের মত বইয়ের পর বই তারা লিখতে যেতেন না। আমরাও যদি সারাটা জীবন সাধনা করে যাই তাহলে হয়তো এ রকম দুই একটা মন্ত্র পেতেও পারি। কিন্তু ঋষিরা আরো অনেক বেশি পেতেন। কিন্তু ঋষিরা কখনই কোন অবস্থাতেই নিজের খুশি মত কবিতা লিখতে যেতেন না, বরং তার থেকে ধ্যানের গভীরে গিয়ে বসে থাকতে চাইতেন। বসেই আছেন, কত ঋষি কিছু না পেয়েই হয়তো শরীর ছেড়ে দিয়েছিলেন। যিনি পেতেন তিনি আবার তাঁর শিষ্যকে দিয়ে

যেতেন, যেমন এই ঋষি স্বামীজীকে দিয়ে গেলেন। এভাবেই গুরু পরম্পরা চলে আসছে। এটাই ভারতের আধ্যাত্মিক সাধনার মূল ভিত্তি। বই পড়ে আধ্যাত্মিক বিদ্যা উপার্জন করা যায় না। আমরা যে এখানে বেদের আলোচনা করছি এতে বেদের শব্দগুলিকে বাক্যরূপে দেওয়া যাবে মাত্র, বেদের প্রকৃত তাৎপর্যকে দর্শন করান যাবে না। বেদের এই ঐতিহ্য সম্প্রসারণ একমাত্র গুরু থেকে শিষ্যের মাধ্যমেই সম্ভব। সুফি সম্প্রদায়ের মুসলমানরাও এটাকে মানে, এনারাও বলেন বই পড়ে সুফির ঐতিহ্য লাভ করা যায় না।

বেদ অনন্ত

বিদ্ ধাতু থেকে বেদ শব্দের জন্ম, বিদ্ মানে যে কোন কিছুকে জানা। যে কোন জিনিসকে জানার ব্যাপারকে বেদ কেন বলা হচ্ছে? সব ধর্মেই ঈশ্বর অনন্ত। পৃথিবীতে যতগুলি ধর্মীয় দর্শন আছে তার মধ্যে একটি দর্শন ঈশ্বরকে মানে না, সেই দর্শনটির নাম পূর্বমীমাংসা। ঈশ্বরকে না মানলেও এরা দেবতাদের মানে। ইংরাজীতে বানানের মাধ্যমে সুন্দর ভাবে দেবতা ও ভগবানের মধ্যে পার্থক্য করা হয়। দেবতাদের ক্ষেত্রে গড্ শব্দে ছোট অক্ষরের 'জী' ব্যবহার করা হয় আর ঈশ্বরের ক্ষেত্রে বড় অক্ষরের 'জী' লেখা হয় – (god – দেবতা আর God – ঈশ্বর)। দেবতারা হলেন সান্ত এঁদের ক্ষমতাও সীমিত। দেবতাদেরও পতন হয়, কিছুদিন দেবতা পদে অধিষ্ঠিত থাকার পর তাঁদের সেখান থেকে পতন হয়ে যায় – এটাই মীমাংসকদের মত।

যারা ঈশ্বরকে মানেন, তাদের কাছে ঈশ্বর অনন্ত, আর জ্ঞান ঈশ্বরের সঙ্গে একীভূত, ঈশ্বর আর তাঁর জ্ঞানকে কখনই আলাদা করা যাবে না। আমরা বলি – তিনি সচ্চিদানন্দ। সৎ, চিৎ আর আনন্দ একসাথে হয় সচ্চিদানন্দ। এর চিৎ অংশকেই বলা হয় জ্ঞান বা চৈতন্য। ঈশ্বরেরই আরেকটি নাম জ্ঞান বা চৈতন্য। নিউ টেস্টামেন্টে আছে – In the beginning there was word, and God was with word and word was God. গ্রীকের প্রাচীন দার্শনিকরা এই শব্দকে বলত Logos, পরে এই লোগোস্ থেকেই লজিক্ শব্দ এসেছে। ভারতীয় দার্শনিকরা বলতেন শব্দ। বাংলার শব্দ আর সংস্কৃতের শব্দ এই দুটো আলাদা অর্থ। প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত যত ধর্ম টিকে আছে তাদের তিনটে বিভাগে বিভক্ত করা হয় – হিন্দু, পার্সি আর জুহুদী। জুহুদী হল Jews, পার্সি Zoroastrian, ইদানিং মুম্বাই অঞ্চলে এদের মুষ্টিমেয় কিছু সম্প্রদায় থেকে গেছে, এদের বেশির ভাগই আগে ইরানের দিকে ছিল। আর Jewsরা ইরান থেকে আরো পশ্চিমের দিকে যারা থাকত, যে অঞ্চলকে বলা হয় land of somatic. এদের সেমেটিক বলা হয়। এই সেমেটিক ধর্ম থেকে প্রথমে Jews দের, পরে খ্রীশ্চান আর সেখান থেকে পরের দিকে ইসলাম ধর্মের জন্ম হয়েছে – এদের মত হল প্রথমে ছিল শব্দ - শব্দ কোথায় ছিল? ঈশ্বরের সঙ্গে এক ছিল। এটাকেই হিন্দুরা বলছে সচ্চিদানন্দম্ – এর 'সৎ' মানে ভগবান সব সময় আছেন, তাঁর কখন নাশ হয় না। আজ ভগবান জন্ম নিলেন আর আগামীকাল তিনি মারা যাবেন, এরকমটি ভগবানের হবে না। ভগবানের কখন জ্ঞান আছে আবার কখন তাঁর মধ্যে অজ্ঞান এসে গেছে, তা কখনই হবে না, তিনি সব সময় চৈতন্যে পরিপূর্ণ, তাই তিনি 'চিৎ'। 'আনন্দম্' ভগবানের এখন আনন্দ হচ্ছে আবার পরে তাঁর মধ্যে নিরানন্দ ভাব এসে তাঁকে দুঃখ আচ্ছাদিত করে দিল, এটাও ভগবানের মধ্যে দেখা যাবে না। তিনি সৎস্বরূপ, চিৎস্বরূপ আর আনন্দস্বরূপ, এটাই তাঁর স্বরূপ। যেমন সূর্যে কক্ষণ অন্ধকার কল্পনা করা যায় না ঠিক তেমনি ঈশ্বরের কক্ষণ অসৎ কল্পনা, অচিৎ কল্পনা আর নিরানন্দ কল্পনা করা যায় না।

আমাদের এখন আলোচ্য বিষয়বস্তু ভগবানের চিৎ। চিৎকে চৈতন্য বলা হলেও এর সঠিক অর্থ জ্ঞান – যেমন উপনিষদে বলা হয়েছে – *সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তম্*। ব্রহ্ম কি? তিনি সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত। বিভিন্ন ভাবে ভগবানের স্বরূপের বর্ণনা করা হচ্ছে। সেমেটিক ধর্মের মতে God is with word, আর হিন্দু দর্শনের মতে ঈশ্বর সচ্চিদানন্দম্ মানে God is one with knowledge. কিন্তু সেমেটিকরা বলছে the word was God. মানে ভগবানের এটা একই রূপ নয়। যেমন আমরা বলি লাল ফুল বা হলুদ ফুল, লাল বা হলুদ ফুলের গুণ একই রূপ নয়। কিন্তু সচ্চিদানন্দম্ বললে বোঝায় তিনি ঐটাই – তাঁর থেকে এটা আলাদা কোন গুণ কিছু নয়। Word was God এটাই ভারতীয় প্রাচীন দর্শনে হয়ে যায় শব্দব্রহ্ম। এই শব্দ আমরা যে আম লিচু ঘর

বাড়ি রাস্থা বলছি এ রকম কোন শব্দ নয়। ব্রহ্মই আমাদের শেষ একমাত্র যা আছে, যাকে বলা হয় পরমসত্তা। এই পরমসত্তা যখন শব্দব্রহ্ম হন তখন সৃষ্টির রচনা হতে থাকে। চৈতন্যকে কোন রূপ বা আকারে দেখা যায় না। ব্রহ্মের যখন ইচ্ছে হয় আমি এবার সৃষ্টি রচনা করব, প্রথমে তিনি শব্দব্রহ্ম হয়ে যান – এই জায়গাটাকেই সেমেটিকরা বলছে – word was one with God. এই শব্দব্রহ্ম যখন তিনি হয়ে যান প্রথম তিনি নাদরূপে সৃষ্টি করেন 'ওঁ'। ওঁ থেকেই সব কিছুর সৃষ্টি হতে থাকে – উপনিষদ এটাকেই বিস্তৃত ভাবে ব্যাখ্যা করে।

ঈশ্বর যদি অনন্ত হন তাহলে শব্দও অনন্ত, জ্ঞানও অনন্ত। তাহলে বেদও অনন্ত, কেননা বেদ মানে জ্ঞান যেহেতু বিদ্ ধাতু থেকে এসেছে – খুবই সহজ যুক্তি। যে কোন জ্ঞান, যেটা জানার বিষয় সেটাই বেদ। যে কৃষিবিদ্যা পড়ান হয় তাকেও একই কারণে আমরা বেদ বলতে পারি। নাচ, গান, এমনকি ক্রিকেট খেলার বিদ্যা, যে কোন জ্ঞানই বেদ। সেইজন্য প্রাচ্য দার্শনিকরা সব সময় বলবেন – বেদ অনন্ত। এটাই বেদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাহলে বাইবেল আর কোরানকে কি আমরা অনন্ত বলতে পারি? না বলতে পারিনা, কেননা বাইবেল আর কোরানের এই বৈশিষ্ট্য নেই। কথামৃতকে যতই বলি বেদস্বরূপ কিন্তু কথামৃতকেও বেদ বলা যাবে না। কারণ কথামৃত সমগ্র জ্ঞানসমষ্টিকে তুলে আনছে না। বেদের আধ্যাত্মিক তত্ত্ব আর কথামৃতের আধ্যাত্মিক তত্ত্ব এক হতে পারে, এ ব্যাপারে কোন দ্বিমত হবে না। কিন্তু ভারতে বেদ বলতে যা বোঝাবে সেটা কিন্তু কথামৃত কখনই নয়। কেন নয়? বেদ হল সমগ্র জ্ঞানরাশির সমষ্টি। বাইবেল, কোরান, কথামৃততে সমগ্র জ্ঞানরাশির সমষ্টি নেই। তাই বেদের ধারে কাছে কোন ধর্মগ্রন্থই দাঁড়াতে পারবে না।

শ্রীমদ্ভাগবত গীতা মানে যোগাবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ যে কথা বলেছেন সেই কথাগুলিকে গীতা ধরে রেখেছে। তাই গীতাকে one with God বলা যায় না, কিন্তু বেদ one with God । আবার বেদের সংজ্ঞা অনুযায়ী যে কোন জ্ঞানই বেদ, আর এই জ্ঞান কোথা থেকে আসছে? ভগবান থেকে, তাই বাইবেল, কোরান, ধম্মপদ, কথামৃত সব গ্রন্থকেই বেদ বলা যাবে। ভারতীয় ভাবনা ও ধারণা অনুযায়ী হিন্দুদের কাছে জাগতিক বিদ্যা বলে কিছু নেই। হিন্দুদের কাছে যা কিছু বিদ্যা আছে সবই আধ্যাত্মিক বিদ্যা। কেন? বিদ্যা মানেই জ্ঞান, জ্ঞান মানে বেদ আর বেদ ও ঈশ্বর এক। যে কোন বিদ্যা, কৃষিবিদ্যা, ধাতুবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা সমস্ত বিদ্যাই বেদ, এই বিদ্যার্জন করে যে কাজগুলো করা হবে সেটা যদি নিষ্কাম ভাবে করা হয় তখন ওই বিদ্যাই মোক্ষের দিকে নিয়ে যাবে। আবার বেদে যে যজ্ঞ-যাগের বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলিও যদি নিষ্কাম ভাবে করা হয় তাতেও মোক্ষের দিকে নিয়ে যাবে। যজ্ঞ-যাগের সাথে কৃষিকাজ, ডাক্তারি করা, শিক্ষকতা করা, রান্না করাতে কোন পার্থক্য নেই। হিন্দুধর্মের উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ত্বের সিদ্ধান্ত অনুসারে বেদের মন্ত্রোচ্চারণ আর কেমেস্ট্রির ফরমুলা মুখস্ত করার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। ইসলাম আর খ্রীশ্চানদের কাছে এটাই আবার বিরাট সমস্যা – তাদের কাছে জগতের মালিক আলাদা দুই ব্যাক্তি, একজন ভগবান আরেকজন শয়তান। জগতকে কখন শয়তান চালায় কখন ভগবান চালান। স্বামীজী মজা করে বলতেন – ভগবানের রাজত্বে শয়তান যেভাবে রাজত্ব করছে তাতে মনে হয় শয়তানেরই শক্তি আছে, আমি কিন্তু এই শয়তানকেই পূজা করব। এটা তাদের সমস্যা। ভারতে খ্রীশ্চান আর ইসলাম ধর্মের অনুপ্রবেশেরে পর থেকে আমাদেরও এই সমস্যা এসে গেছে – এই কাজটা জাগতিক আর এই কাজটা আধ্যাত্মিক, এভাবে আমাদের সনাতন ভাবধারা থেকে সরে আসছি। আমাদের কাছে জগতে যত নাম আছে সবই তাঁরই নাম আর যত রূপ আছে সব তাঁরই এক একটি রূপ। আমরা আলাদা কেন দেখছি, কারণ আমাদের মন এখন দূষিত হয়ে আছে। হিন্দুদের কাছে জাগতিক বলে কিছুই হয় না, যা কিছু আছে সবটাই তিনি। তাই বলে কি আমরা যা খুশি তাই করতে পারব? তা কখনই হবে না। মাটি কত ভালো জিনিস, বাতাস কত ভালো জিনিস তাই বলে জলের মাছ কি ডাঙায় এসে থাকতে চাইলে থাকতে পারবে? ঠাকুর বলছেন – বাঘ নারায়ণ, তাই বলে বাঘকে আলিঙ্গন করতে যাবে না। কিছু নারায়ণকে দূর থেকে প্রণাম করে সরে আসতে হয়। কিন্তু সেও নারায়ণ, এই জ্ঞান থাকতে হবে। যতক্ষণ আমরা ঐ অবস্থায় না পৌঁছাচ্ছি বুঝতে হবে আমাদের জ্ঞান লাভ এখনও হয়নি। যা কিছু আমরা ছাপা অক্ষরে পাচ্ছি, যা কিছু কর্ণে শ্রবণ করছি, যেগুলো জানা হয়ে গেছে, যেগুলো এখনও জানা হয়নি – সবটাই বেদ, বেদের বাইরে কিছু নেই। সমস্ত জ্ঞান ঈশ্বর থেকেই আসছে আর জ্ঞান ও ঈশ্বর এক। আমাদের শাস্ত্র মতে বেদ মানে এটাই।

বেদ সনাতন ও অপৌরুষেয়

বেদের আরেকটি যে বৈশিষ্ট্য, তা হল – বেদ সনাতন। যে জিনিসটা অনন্ত স্বাভাবিক ভাবেই সেটা সনাতন। সনাতন মানে যেটা অনন্তকাল ধরে চলে আসছে। কেউ যদি প্রশ্ন করেন বেদ কে রচনা করেছে তখন এই ধরণের মুর্খের মত প্রশ্ন আর একটিও হতে পারেনা। খ্রীশ্চানরা যাকে word বলছে আমরা তাকে বেদ বলছি। খ্রীশ্চানরা বলছে word was not created by any one তাই বেদও কখন কেউ রচনা করতে পারে না। পতঞ্জলির যোগসূত্রে একটা সূত্র আছে সেখানে তিনি বলছেন বেদ বলতে যে শব্দরাশি বোঝাবে তা নয়, বেদ জ্ঞানরাশি।

বেদকে সনাতন বলা হয়। আরেকটা যে শব্দ বেদের সাথে যুক্ত করা হয় তা হল – বেদ অপৌরুষেয়। অপৌরুষেয় কথার অর্থ, যে জিনিস কোন মানুষের দ্বারা সৃষ্টি বা রচিত হয়নি। পতঞ্জলি তাঁর যোগসূত্রে বলছেন শব্দ সনাতন নয়, শব্দ যে জ্ঞানকে প্রকাশ করছে সেই জ্ঞান সনাতন। শব্দের বদলে ঋষিরা আরেকটি শব্দ ব্যবহার করতেন তার নাম স্ফোট, শব্দ আর স্ফোট সমার্থক। পঞ্চাশ জন লোককে যদি রাম শব্দ উচ্চারণ করতে বলা হয় দেখা যাবে প্রত্যেকেরই রাম উচ্চারণ আলাদা হবে। আবার একই ভাষা এক জেলা থেকে অন্য জেলাতে এসে পাল্টে যাবে। অনেকে আত্মা শব্দকেই আত্তা উচ্চারণ করে। আত্মাই বলুক আর আত্তাই বলুক আমরা বুঝেতে পারি সে কি বলতে চাইছে। এখান থেকে বোঝা যায় যে যে কোন শব্দের দুটো দিক – একটা তার বাহ্যিক আকার আর আরেকটি শব্দের অন্তর্নিহিত ভাব। যে আত্মা বলছে আর যে আত্তা বলছে আমরা কিন্তু বুঝে নিচ্ছি যে আত্তা বলছে সেও সেই আত্মার কথাই বলতে চাইছে। তার মানে শুধু উচ্চারণের সঙ্গে শব্দের বিশেষ কোন সম্পর্ক নেই, উচ্চারণ শব্দের বাহ্যিক রূপ, জামা কাপড়ের আড়ালে একটা শরীর আছে যেটা তার আসল বস্তু। শব্দের আসল বস্তু শব্দের অন্তর্নিহিত ভাব, যাকে জ্ঞান বলা হয়। যে কোন শব্দেরই এই দুটো দিক থাকবে। জলকে যেমন বিভিন্ন নামে বলা যায় কিন্তু জলের বিভিন্ন নাম একটা বস্তুকেই নির্দেশ করছে। বেদকে যখনই বলছেন বেদ সনাতন ও অনন্ত তখন বেদকে শব্দের বাহ্যিক রূপে বলা হচ্ছে না, বেদের অন্তর্নিহিত জ্ঞানের কথাই বলা হচ্ছে। যেমন 'ওঁ নমঃ শিবায়' মন্ত্র বলা হল, এটা মন্ত্রের বাহ্যিক রূপ। মন্ত্রের একটা অন্তর্নিহিত রূপও আছে। এখানে এই রূপটা কি – শিবের যে আসল স্বরূপ সেটাকে জানার চেষ্টা। যিনি এই মন্ত্রের দ্বারা মন্ত্রের স্বরূপকে জেনে নিলেন, তিনি এখন ঐ মন্ত্রকে পাল্টে বলতে পারেন 'ওঁ গং গণেশায় নমঃ'। এই মন্ত্রে বাহ্যিক রূপটা পাল্টে গেল কিন্তু ভাব একই থেকে যাবে। এর মূল ভাবটা কি? সেই সচ্চিদানন্দম্। সেই এক সত্তাকে উদ্দেশ্য করে নির্দেশ করার জন্য কতকগুলি শব্দের ব্যবহার করা হচ্ছে। যে মন্ত্রই হোক না কেন, স্বামীজীর ওঁ হ্রীং ঋতম্‌ও একই নিয়মে সেই এক পরমসত্তাকে নির্দেশ করছে। এই যে বলছেন 'আবহী বরদে দেবী' এখানেও বাকদেবীর স্তুতি করা হচ্ছে, আবার এর মধ্যে পরমসত্তার জ্ঞানের কথাও রয়েছে।

এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে স্বামীজী মাধ্যাকর্ষণের নিয়মের কথা দিয়ে বলছেন – তোমরা কি মনে কর মাধ্যাকর্ষণের জ্ঞান কোথাও পড়েছিল আর নিউটন এসে আবিষ্কার করলেন? মাধ্যাকর্ষণের জ্ঞান আগে থেকেই বিদ্যমান ছিল। একটা মজার জোক আছে – একটা ক্লাশে পড়ান হচ্ছে আটারশো সালে অক্সিজেন আবিষ্কার হয়েছিল। ক্লাশের একটি মেয়ে শুনেই গালে হাত দিয়ে চিন্তায় পড়ে গেছে। শিক্ষক তাকে জিজ্ঞেস করছে 'তুমি কি ভাবছ'? মেয়েটি বলছে 'আঠারশো সালের আগে মানুষ নিঃশ্বাস নিতো কিভাবে'? অক্সিজেন তো সব সময়েই রয়েছে। বেদের সব মন্ত্র আগে থেকেই আছে। যুগ যুগ ধরে হিন্দুরা যে গায়ত্রীমন্ত্র জপ করছে, এই মন্ত্র আগে থেকেই আছে – *ওঁ ভূর্ভবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং* – সর্বলোকের যিনি মালিক তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে, হে প্রভু তুমি আমার বুদ্ধিকে পরিশ্রুত করে আলোকিত করে দাও যাতে সমস্ত জ্ঞান আমার মধ্যে আসতে পারে। এটাও একটা জ্ঞান, কতকগুলি শব্দের মধ্যে তাকে রূপ দেওয়া হচ্ছে। প্রভুর কাছে যখন প্রার্থনা করছে তখন তার বুদ্ধি প্রচোদিত হয়ে যাবে। এই জ্ঞান বা ভাব নিয়ে যদি কোন বাচ্চা ইংরাজী ভাষায় প্রার্থনা করে তাহলেও কাজ হবে। পার্থক্য হল গায়ত্রী মন্ত্র সিদ্ধ মন্ত্র, ধ্যানের গভীরে উচ্চকোটির মহান ঋষি বিশ্বামিত্র এই মন্ত্রকে বের করে এনেছিলেন। আর বাচ্চা ছেলেটা যা বলছে সেটা কতকগুলি মামুলি শব্দের বিন্যাস মাত্র। কিন্তু সেও যদি এই জ্ঞানের ভাবে পরিপূর্ণ হয়ে আবৃত্তি করে তাহলেও কাজ হবে। কারণ যে কোন জ্ঞানই সনাতন।

মাধ্যাকর্ষণের জ্ঞানকে যে ভাষাতেই বলা হোক না কেন তার জ্ঞানটা আর পাল্টে যাবে না। শব্দ দিয়ে যে জ্ঞানের দিকে ইঙ্গিত করে সেই জ্ঞানই সনাতন। এটাই পতঞ্জলির যোগসূত্রের ব্যাখ্যা।

অপৌরুষেয় শব্দের অর্থ যা কোন পুরুষের দ্বারা অর্থাৎ মানুষের দ্বারা সৃষ্টি হয়নি। পৌরুষেয় মানে মানুষের সৃষ্টি। একটা জিনিস মানুষের সৃষ্টি নাকি মানুষের সৃষ্টি নয় আমরা কি করে জানব? যেমন এই কলম মানুষের সৃষ্টি বলেই জানি। পৃথিবীতে স্বাভাবিক ভাবে আমরা যা কিছু পাই সেভাবে কলম নিজে থেকে আসেনি। ধর্মের দিক থেকে পেছনের দিকে যেতে যেতে আমরা পাঁচটি তত্ত্বে গিয়ে পৌঁছে যাব, তারও পেছনে যেতে যেতে শুধু থেকে যায় বিচার বা কতকগুলি ভাব। ভাবের দিক দিয়ে গেলে কিছু কিছু জিনিসকে আমরা মনে করি এগুলো মানুষের মন থেকে এসেছে। অনেক সময় লেখকরা নিজেদের রচনাকে মহান করার জন্য বলেন এ জিনিস আমার দ্বারা রচিত হয়নি, অন্য কোন দিব্য শক্তি দ্বারাই এই রচনার সৃষ্টি হয়েছে। কোন সুন্দর চেহারার লোককে বলি you look so divine, বা কোন সুন্দর দৃশ্যকে বলি নৈসর্গিক, এই ধরণের কথা আমরা প্রায়ই বলে থাকি। কিন্তু এগুলো সবই চলতি কথা। চলতি কথা আর যে কথার পেছনে একটা চিন্তন বা ভাবনা আছে এই দুই ধরণের কথাগুলোকে বোঝার চেষ্টা করা দরকার। একজন কবি যে চিন্তন করছেন তখন দেখতে হবে ওই চিন্তন আর কেউ ভেবেছেন কিনা কিংবা কেউ ভাবেননি, দ্বিতীয় ব্যাপার হল সেখানে শব্দ সংযোজন ঠিক আছে কিনা। স্বামীজী নিউটনের কথা উল্লেখ করে বলছেন, মাধ্যাকর্ষণের যে নিয়ম এই নিয়ম কি নিউটনের জন্য হয়েছে নাকি প্রকৃতির নিয়মের মধ্যে আছে? মাধ্যাকর্ষণ যদি প্রকৃতিরই নিয়ম হয়ে থাকে তাহলে নিউটন এই নিয়মকে আবিষ্কার করেছেন। তাহলে মাধ্যাকর্ষণের নিয়মকে আমরা পৌরুষেয় বলব নাকি অপৌরুষেয় বলব? আমরা যেভাবে জেনেছি সেই অনুসারে মাধ্যাকর্ষণের সাথে নিউটনের নাম লাগিয়ে দিই। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যে সত্যগুলি রয়েছে সেই তুলনায় মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম প্রকৃতির একেবারে খুব স্থূল নিয়ম। যদি আরও সূক্ষ্মে যাই তাহলে সেখানে যে সত্যের অনুসন্ধান পাই, যে সত্যগুলিকে অবলম্বন করে এই সৃষ্টি দাঁড়িয়ে আছে, তাহলে ওই সত্যগুলি কি fundamental truth নাকি derived truth? Fundamental truth হল ভগবান ওই রকমই জিনিসটাকে দিয়েছেন। সৃষ্টির বিস্তারের সাথে সাথে যত জটিলতা বাড়তে থাকে ততই এক অপরের সঙ্গে মিলে মিশে সব কিছু গুলিয়ে যেতে শুরু হয়। প্রকৃতি আমাদের আলাদা আলাদা করে চাল দিচ্ছে, ডাল দিচ্ছে, লবণ, হলুদ দিচ্ছে, আমরা সব কটাকে মিশিয়ে নতুন একটা জিনিস খিচুড়ি বানিয়ে দিচ্ছি। একটা মৌলিক জিনিস আসছে তার সাথে একটা যৌগিক জিনিসও আসছ। যৌগিক যখন আসে তখন হয় আমরা তাকে প্রকৃতি বলছি, নয়তো বলছি মানুষের তৈরী। কিন্তু দিব্য কোন কিছু যখন আসে তখন তা একেবারে মৌলিক, ওর মধ্যে কোন কিছুর মিশ্রণ নেই। বেদে যা কিছু আছে আসলে তার সবটাই মৌলিক সত্য। সৃষ্টির ব্যাপারে যা কিছু মৌলিক সত্য আছে বেদে শুধু সেগুলোকেই রাখা হয়েছে। ঋষিরা এই সত্যগুলিকে ধ্যানের গভীরে বা চিন্তনের গভীরে গিয়ে জানতে পেরেছেন। আমরা যখন এই সত্যগুলিকে দেখছি বা জানছি, যেমন গায়ত্রী মন্ত্র, আমাদের মনে প্রশ্ন আসে এই গায়ত্রী মন্ত্র কি একটি কবিতা, এর মধ্য দিয়ে যে সত্যকে সামনে নিয়ে আসা হচ্ছে সেটা কি মৌলিক সত্য নাকি কোন derived truth? আমাদের এখানে বলবে এটা মৌলিক সত্য, যে সত্যের উপর সৃষ্টি দাঁড়িয়ে আছে। তখন আর গায়ত্রী মন্ত্র আর মানুষের মনের কল্পনা থেকে সৃষ্টি নয়, ঈশ্বর প্রদত্ত। যে জিনিস ঈশ্বর দিয়েছেন সেটাকেই বলা হয় দিব্য, শাস্ত্রে এর পরিভাষা হল অপৌরুষেয়। মুসলমানরাও বলেন কোরানের কথা খোদ আল্লার কথা। মন যত দূর বিচার করতে পারে, মনের এলাকার মধ্যে যা কিছু ধরা পড়বে সেগুলোকে বলবে পৌরুষেয়। মনের এলাকার বাইরে যে সত্যগুলি ঋষিদের মুখ দিয়ে উচ্চারিত হচ্ছে সেই সত্যগুলিকে বলে অপৌরুষেয়। আবার বেদের বেশ কিছু জিনিস আছে যেগুলোকে দেখে মনে হয় যেন আমাদের জীবনের সঙ্গে মিলে মিশে রয়েছে। কিন্তু ঋষিরা যে অর্থে জিনিসগুলিকে দেখছেন সেগুলো এই জগতের নয়। যেমন বেদেরই সভা সূক্তমে বলছেন সভাতে আমার কথা যেন সবাই মেনে নেয় বা সভাতে আমি যেন জয়ী হই। সভা সূক্তমে কিন্তু সভা সমিতির কথা বলা হচ্ছে না, সেখানে সেই দিব্য শক্তির কাছে প্রার্থনা করা হচ্ছে, যাঁর কৃপা পেলে মানুষ সভাতে জয়ী হতে পারবে। এটাও একটি আধ্যাত্মিক সত্য। আধ্যাত্মিক সত্য কখনই মানবিক হবে না। রবীন্দ্রনাথ যখন কবিতা লিখছেন ‘যদি

তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চল রে’, এটাও একটা গভীর সত্য। আমরা জানি যদি আমাদের সাথে কেউ না থাকে তখন আমাদের একলাই চলতে হবে, কিন্তু এখানে এই সত্যকে আরেক ধাপ এগিয়ে বলছেন তোমাকে একলাই চলতে হবে। এরপর এই সত্যকেই ছন্দোবদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তা সত্যেও একে অপৌরুষেয় বলা যাবে না, এটাও মানুষের সৃষ্টি। তার মানে, ঈশ্বরীয় ব্যাপারটা এখানে অনুপস্থিত। কোন রচনা বা কবিতা পড়ে আমাদের পক্ষে বলা সম্ভব নয় যে এটা পৌরুষেয় নাকি অপৌরুষেয়। তবে যাঁরা খুব উচ্চমানের চিন্তক তাঁরা বলে দিতে পারেন। যে কোন সৃষ্টি বা রচনার মধ্যে যদি মানুষের বুদ্ধি, চিন্তা জড়িয়ে থাকে তাকে কখনই অপৌরুষেয় বলা যাবে না। বেদে যে সত্যগুলো আছে বা কোরানে যে সত্যগুলো আছে বা যে কোন আধ্যাত্মিক গ্রন্থে যে সত্যগুলো রয়েছে সেগুলো সব সময়ই অপৌরুষেয় হয়। আর অপৌরুষেয় যদি না হয় তাহলে সেই গ্রন্থ কোন দিন ধর্মগ্রন্থ হতে পারবে না। গীতাকে যদি সাধারণ ভাবে দেখা হয় তাহলে সবাই বলবে গীতা ব্যাসদেবের রচনা, সত্যিই তো ব্যাসদেবরই রচনা। কিন্তু ব্যাসদেবের রচনা হলে গীতাকে কেউ আর ধর্মগ্রন্থ বলে মানতে চাইবে না। সেইজন্য আমরা সব সময় বলি গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই রকম বলেছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেও তো সেটা হয় না, সেইজন্য পরের দিকে ভগবান অর্জুনকে বলছেন, আমি তখন যোগে অবস্থিত ছিলাম, যোগে অবস্থিত হয়ে তোমাকে গীতার উপদেশ দিয়েছিলাম। তার মানে যোগে অবস্থিত হয়ে যে কথাগুলো বেরোবে সেই কথাগুলি সব সময় অপৌরুষেয়। সেইজন্য গীতাকে আমরা পরিষ্কার তিনটে স্তরে দেখি, প্রথম অপৌরুষেয়, দ্বিতীয় স্তর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা এবং তৃতীয় ব্যাসদেবের রচনা। প্রাচীন কালের অনেক গ্রন্থে দেখা যায় লেখক গীতা থেকে কিছু উল্লেখ করে বলছেন, গীতাতে ব্যাসদেব এই রকম বলেছেন। কিন্তু এখন আর এই ধরণের কথা কেউ না বলে বলেন, গীতায় ভগবান বলছেন। সেই দিক থেকে গীতা অপৌরুষেয়। বেদের ঋষি বলতে আমরা যেরকম বুঝি শ্রীকৃষ্ণ সেই রকম একজন ঋষি, শ্রীরামকৃষ্ণ একজন ঋষি। তাঁদের মুখ থেকে নিঃসৃত যে কোন ঈশ্বরীয় কথাই অপৌরুষেয়। কথামৃতও তাই অপৌরুষেয়।

ইদানিং কিছু বাবাজী গায়ের জোরে নিজেদের অবতার বলে জাহির করছেন, তাঁদের কথা গুলোকে আমরা কি বলব? এখানে এসেই সমস্যা হয়। তাঁর শিষ্যদের কাছে অপৌরুষেয়ই হবে। অপৌরুষেয় কিনা শেষ পর্যন্ত নির্ভর করবে তাঁর উপর আপনার শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস কেমন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা পৌরুষেয় অপৌরুষেয় ব্যাপারটাই মানতে চাইবে না। বেদের মন্ত্রগুলিকে তাঁরা উচ্চ মানের কবিতা ছাড়া আর কিছু ভাবতে চান না। কিন্তু যে নিজেকে হিন্দু বলবে তাকে প্রথমেই মানতে হবে বেদের কথা ভগবানের কথা, যেমন একজন মুসলমানকে মানতেই হবে কোরানের কথা মানে আল্লার কথা। অপৌরুষেয় মানে তাই, যে আধ্যাত্মিক সত্যগুলিকে ঋষিরা ধ্যানের গভীরে দেখেছেন। কিন্তু সাধারণ লোকেরা এগুলো বোঝে না, তাই বলা হয় ভগবানের কথা। কিন্তু যাঁরা চিন্তনশীল তাঁরা জানেন ভগবান তো আর সরাসরি বলবেন না।

চার্বাকদের বিরুদ্ধে মীমাসংকদের যুক্তি

চার্বাকরা বলছে বেদ যারা লিখেছে তারা – *ত্রয়ী বেদস্য কর্তার ধূর্ত ভ্রষ্ট নিশাচরঃ*। বেদের ব্যাপারে কিছু বলার সময় সারা দেশ মীমাংসকরা যেটা বলছে সেটাকেই অনুসরণ করে। পূর্বমীমাংসকদের বিখ্যাত দার্শনিক জৈমিনি। তিনি সূত্রাকারে বেদের বিষয়ে লিখে গেছেন, এর নাম মীমাংসাসূত্র। এর প্রথম সূত্রই হল – *অথাতো ধর্ম জিজ্ঞাসা* – আমরা এখন ধর্মের ব্যাপারটা জানব। চার্বাকদের বিরুদ্ধে মীমাংসকরা দুটো বড় যুক্তি নিয়ে এলেন। হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে, বিশেষ করে বেদের বিরুদ্ধে যত ধরণের আক্রমণ হয়েছিল তাকে আটকাবার জন্য যে সব যুক্তি আনা হয়েছিল সেই যুক্তিগুলি আজ থেকে তিন হাজার বছর আগেই একটা নির্দিষ্ট ছকে দাঁড় করান হয়ে গিয়েছিল। তার ফলে এখন কারুর পক্ষে কোন প্রকার বেদবিরুদ্ধ কথা বলা বা বেদের বিরুদ্ধে কোন নতুন যুক্তি দাঁড় করান একেবারেই অসম্ভব। মানুষের ভোগের ব্যাপার আগেও ছিল এখনও রয়েছে আর চিরদিনই মানুষের ভোগাকাঙ্ক্ষা থাকবে। সুতরাং যারা ভোগী তারা যোগীদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে এটা কোন নতুন ব্যাপার নয়। ভোগীদের মধ্যেও অনেক বড় বড় তাত্ত্বিক নেতারা ছিলেন আর তাদের বেদবিরুদ্ধ যুক্তি গুলিও মারত্মক রকমের শক্তিশালী ছিল। এই যুক্তিগুলি খণ্ডন করার জন্য মীমাংসকরা আরও জোড়ালো যুক্তি দাঁড় করালেন। বেদ জ্ঞানরাশি, আর জ্ঞানকে কখনই মানবজাতির পক্ষে তৈরী করা সম্ভব নয়। আমরা

আবিষ্কার করতে পারি, জানতে পারি কিন্তু মাধ্যাকর্ষণের মত একটা নিয়মকে আমরা তৈরী করতে পারব না। নিউটন এসে মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম আবিষ্কার করে তিনি কতকগুলি সিদ্ধান্ত দিলেন। পরে আইনস্টাইন এসে নিউটনের সিদ্ধান্তের সমালোচনা করে আরো কয়েকটা নতুন সিদ্ধান্ত দিয়ে নিয়ে এলেন laws of relativity, এতে কি মাধ্যাকর্ষণের নিয়মের কোন পরিবর্তন হবে? কক্ষণই হবে না। মাধ্যাকর্ষণ নিয়ম যেমন চলছিল সেই একই নিয়মে চলতে থাকবে, বিজ্ঞানীদের নিজেদের সিদ্ধান্তের পরিবর্তন হয়েছে মাত্র। সুতরাং বেদ হল সেই জ্ঞান, তত্ত্ব যা অনাদিকাল থেকে চলে আসছে, তাই বেদকে বলা হয় সনাতন আর অনন্ত। দ্বিতীয় যে যুক্তি মীমাংসকরা নিয়ে আসেন তা হল – মানুষ যখন কিছু রচনা করে তখন সেখানে নিজের নাম অবশ্যই দেবে। আজ আমি আপনি কিছু রচনা করে নাম না দিয়ে আমাদের বন্ধু বান্ধবদের শুনিয়ে দিলাম। তারপর যদি এই রচনা জনপ্রিয় হয়ে যায় তখন আমার বন্ধুরাই বলবে যে 'এটা আমার এক বন্ধুর রচনা'। কিন্তু বেদের কোথাও আজ পর্যন্ত এভাবেও কোন ধরণের একটি নামেরও উল্লেখ আমাদের নজরে পড়বে না। বেদের যে এত বিশাল কাণ্ড, যত পুঁথি এখনও হারিয়ে, নষ্ট হয়ে যাওয়ার পরও যা অবশিষ্ট রয়েছে, তাতেই একটা বিশাল ঘরে সঙ্কুলান হবে না। কিন্তু কোথাও একটা কারুর নাম পাওয়া যাবে না যে এগুলো কে রচনা করে গেছেন? তবে এটা পরিষ্কার বোঝা যায় যে একজনের পক্ষে এই বিশাল বেদ রচনা করা অসম্ভব। তবে ভাষাকে বিশ্লেষণ করে ভাষাবিদরা বলছেন, বেদ বিভিন্ন সময়ে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। আবার কিছু মন্ত্র ইন্দ্রের, কিছু মন্ত্র বরুণ, অগ্নি এই রকম বিভিন্ন দেবতাদের উদ্দেশ্য। যেটা থেকে বোঝা যায় যে বেদ একজন লোকের কাজ নয়। বেদ যদি অনেক লোকের কাজ হয়ে থাকে তাহলে একজন লোক হয়তো ধাপ্পা দিতে পারে যে আমার নাম দিলাম না যাতে কেউ জানতে পারে যে আমি ধাপ্পা দিচ্ছি কিন্তু এত লোক কখনই একই ভাবে ধাপ্পা দিতে পারে না। মীমাংসকরা চার্বাকদের বিরুদ্ধে এই যুক্তিই দিচ্ছে – যখন কেউ কিছু রচনা করে তখন সে তার নাম দিয়ে দেয়। বাল্মিকী রামায়ণ রচনা করে তিনি নিজেই তাঁর নাম উল্লেখ করে দিয়ে বলেছেন – আমি এর রচয়িতা। ব্যাসদেব প্রথমে বেদের পুনর্বিন্যাস করে বলে দিলেন – বেদকে আমি এইভাবে বিন্যাস করে দিলাম মাত্র। কিন্তু পরে তিনি মহাভারত রচনা করে বললেন আমি মহাভারত রচনা করেছি। ভাগবতের ক্ষেত্রেও তিনি বললেন এটা আমার রচনা। সবাই নাম ব্যবহার করছেন কিন্তু বেদের ক্ষেত্রে কোন নাম কেউ ব্যবহার করলেন না। যখন কোন নিম্নমানের রচনা হয় তখন তার সাথে নিজের নামকে যুক্ত করতে না চাওয়াটা অযৌক্তিক মনে হবে না, কিন্তু সেই অর্থে বেদকে বেদবিরোধীরাও কেউ কখন কোন দিন স্বপ্নেও নিম্নমানের রচনা মনে করবে না। তাহলে কেন ঋষিরা তাঁদের নাম বেদের সঙ্গে যুক্ত করলেন না? এই জিনিসটা তখনকার দিনের মানুষের কাছে পরিষ্কার ধারণা ছিল না। স্বামীজী পরে এগুলোকে অনেক পরিষ্কার করে দিলেন। আমরা এর আগেও বলেছি যে – ঋষিরা ধ্যানের গভীরে গিয়ে অনন্ত জ্ঞানভাণ্ডার থেকে কিছু কিছু রত্ন পেয়ে গেলেন, তারপর তিনি সেটা তাঁর শিষ্যদের দিয়ে দিতেন। তিনি ভালো করে জানতে যে এ আমার জিনিস নয়, আর আমার সাধ্যেরও বাইরে এই রত্ন আবিষ্কার করা। যেটা তাঁদের সাধ্যের মধ্যে নয় তার সাথে এনারা কখনই নিজেদের নাম যুক্ত রাখতে চাইতেন না। ঋষিরা মনে করতেন বেদের সব কিছু অন্য এক দিব্যশক্তির কাজ, যে কাজ নিজের নয় তার সাথে নিজের নামকে যুক্ত করা তাঁদের চিন্তাতেও নিয়ে আসা একটা মারাত্মক গর্হিত কর্ম।

শব্দের জন্ম

এই জিনিসটাকে ভালো করে বুঝতে হবে – শব্দ থেকে শব্দের জন্ম হয়। দুটো বাচ্চা ছেলে কথা কাটাকাটি করছে, একটা বাচ্চা আরেকটা বাচ্চাকে বলছে – তুই একটা গাধা। গাধা শব্দ শুনেই তার মনটা ক্রোধবৃত্তিতে ভরে গেল, সেও প্রত্যুত্তরে বলে দিল – তুই একটা প্যাঁচা। এ আবার বলছে – তুই আমাকে প্যাঁচা বললি, তাহলে তুই একটা ছাগল। এইভাবে শব্দ থেকে শব্দ জন্ম নিচ্ছে। সব সময় আমরা যে ধরণের কথাবার্তা বলি এর সবটাই শব্দ থেকে শব্দ জন্ম নিচ্ছে। বেশির ভাগ সাহিত্যিক, লেখক যা কিছু লিখছেন এও সেই শব্দ থেকে শব্দের জন্ম দিচ্ছেন। যত সংবাদপত্র ছাপা হচ্ছে সব শব্দ থেকে শব্দের জন্ম দিচ্ছে, ফলে কি হয় এক দিন কি দুদিন থাকবে তারপরে সব বই, খবরের কাগজ, ম্যাগাজিন সের দরে বিক্রী হয়ে যাবে। কিন্তু যখনই শব্দ মৌন থেকে, নিস্তব্দতা থেকে জন্ম নেবে তখন সেই শব্দের শক্তি অনেক গুণ বেড়ে যায়। যাঁরা খুব

বিখ্যাত কবি তাঁরা যে কবিতা রচনা করেন, সেই কবিতার শব্দগুলি মৌন থেকে জন্ম নেয়। আবার যখন ধ্যানের গভীর থেকে যে শব্দগুলি আসে সেই শব্দগুলিই শাশ্বত বাণী হয়ে যায়। হাজার হাজার বছর ধরে সেই শব্দ জনমানসে গেঁথে থাকে। এইভাবে শব্দ তিন ভাবে জন্ম নেয় – শব্দ থেকে, মৌনতা থেকে আর ধ্যানের গভীর থেকে। যাঁরা সমাধিবান পুরুষ, সমাধিবান পুরুষরা যে কথাগুলি বলেন সেগুলো ভগবানরই কথা।

বেদের সব শব্দ ধ্যানের গভীর থেকে এসেছে, একটা মন্ত্র, একটা শব্দ আসছে সেটাই তাঁর শিষ্যদের যখন দিচ্ছেন তখন নিজেদের নাম নিচ্ছেন না। একবারেই যে নাম নিতেন না তা নয়, ইতিহাসের দিকে একটু এগিয়ে এলে দেখতে পাব বৈশাম্পয়নের খুব নামকরা শিষ্য ছিলেন যাজ্ঞবল্ক্য, তিনিও ছিলেন একজন খুব নামকরা ঋষি। একবার কোন একটা ঘটনায় গুরুর সাথে যাজ্ঞবল্ক্যের বিবাদ হয়ে যায়। গুরুর অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য একটা গোহত্যা হয়ে গেছে। তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। গুরু তখন যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রায়শ্চিত্তের জন্য যজ্ঞের আয়োজন করতে বললেন। যাজ্ঞবল্ক্য তখন গুরু কে বললেন – হে গুরুবর, আপনার কাছে একটা কথা আমি নিবেদন করতে চাই। আপনার শিষ্যরা সবাই অল্প বয়সী, এই ধরণের যজ্ঞের ব্যাপারে খুবই অপটু, আপনি আমার উপরে সব ভার দিয়ে দিন আমি একাই সব সুন্দর ভাবে ব্যবস্থা করে দিচ্ছি, আপনি কোন চিন্তা করবেন না। যাজ্ঞবল্কের কথা শুনে গুরু খুব রেগে গেলেন – তোমার এত অহঙ্কার! আর তুমি আমার শিষ্যদের এতো ছোট করলে! তোমাকে আমি যা কিছু শিখিয়েছি সব আমাকে ফেরত দিয়ে দাও। যাজ্ঞবল্ক্যও খুব অপমানিত বোধ করলেন, তিনি মনে মনে ভাবলেন – যে গুরু নিজের শিষ্যকে বুঝতে পারেনা, বুঝতে চায়না, এই রকম গুরুর শিষ্য হয়ে থেকে আমার কাজ নেই। যাজ্ঞবল্ক্য খুব তেজস্বী ছিলেন। গুরুর কাছ থেকে লব্ধ জ্ঞান তাঁকে ফেরত দিয়ে দিতে হবে। তখন যাজ্ঞবল্ক্য পুরো যোগশক্তি লাগিয়ে বেদের যত জ্ঞান পেয়েছিলেন বমি করে তিনি সেটাকে বার করে দিলেন। এমন গুরু আর এমন বিদ্যাও আমি চাইনা। এখন মহা সমস্যা হয়ে গেল। যাজ্ঞবল্ক্য ছিলেন বৈশাম্পায়নের প্রধান শিষ্য, আর তিনি বৃদ্ধও হয়ে গেছেন। কেননা বেদ হল গুরু-শিষ্য পরম্পরা বিদ্যা, গুরু যেটা শেখালেন শিষ্য সেটাকে থু করে ফেলে দিল, এখন কি হবে? যে বিদ্যাটা আমি শিষ্যকে দান করলাম সেটাতো নষ্ট হয়ে যাবে। তখন বৈশাম্পয়ন ঋষি তাঁর বাকি শিষ্যদের বললেন তোমরা তিতির পাখি হয়ে যাজ্ঞবল্ক্যের বমি করে দেওয়া বিদ্যাটা খেয়ে নাও। মানুষতো আর বমি খেতে পারেনা, পাখিরা খেতে পারে, তাই তাদের তিতির পাখি হয়ে বমিটা খেয়ে নিতে বলা হল। এইভাবে যাজ্ঞবল্ক্যের গুরুভাইদের মধ্যে বেদের জ্ঞানটা এসে গেল। তিতির পাখি হয়ে এরা এই বিদ্যাটা পেয়েছিল বলে বেদের এই শাখাকে বলা হয় তৈত্তিরীয় শাখা। এই তৈত্তেরীয় শাখা থেকেই তৈত্তেরীয় উপনিষদ এসেছে। আর বমি করা বিদ্যা বলে এর নাম হয়ে গেল কৃষ্ণযজুর্বেদ, এই বিদ্যার মধ্যে সেই আগের শুদ্ধতা থাকল না বলে কৃষ্ণ বলা হয়। আর যাজ্ঞবল্ক্য গুরুকে ত্যাগ করে বলল – এমন গুরুর আমার দরকার নেই, কোন মানুষকে আমি আর গুরু করছি না, সাক্ষাৎ ভগবানই আমার গুরু হবেন। আশ্রম পরিত্যাগ করে তিনি সূর্যোপসনা করতে থাকলেন। পরে সূর্য একটা বাজপাখি হয়ে যাজ্ঞবল্ক্যকে যে বিদ্যা বৈশাম্পায়নের কাছ থেকে পেয়েছিলেন সেই বিদ্যাটাই নতুন করে শিখিয়ে দিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য আবার বেদের পণ্ডিত হয়ে গেলেন। তিনি যে বিদ্যাটা পেলেন তার নাম হয়ে গেল শুক্লযজুর্বেদ, যেহেতু সূর্য থেকে বিদ্যাটা এসেছিল তাই এর নাম হয়ে গেল শুক্ল, আবার বাজপাখির কাছ থেকে শ্রবণ করেছিলেন বলে এর আরেকটা নাম বাজশনীয় সংহিতা, বাজপাখি শক্তির প্রতীক। শুক্ল আর কৃষ্ণ যজুর্বেদের মন্ত্রগুলি মোটামুটি একই, শুধু এদের বিন্যাসটা অন্য রকম।

এই কাহিনীতে আমরা বেদের যে বৈশিষ্ট্য পাই তা হল বেদ হল পুরোপুরি একটা মুর্ত্ত রূপ। যে কারণে এই কাহিনী বলা হল, ঋষিরা কোথাও নাম নিতেন না, কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে যে ওনারা নাম ব্যবহার করেননি তা নয়, শুক্লযজুর্বেদের ক্ষেত্রে যাজ্ঞবল্ক্য বলছেন – এই বিদ্যা আমি পেয়েছি। অথচ তাঁর আগে যাঁরা ছিলেন তাঁদের নাম কেউই জানে না। যাজ্ঞবল্ক্য কি পেয়েছিলেন? যে বিদ্যাটা তিনি আগে পেয়েছিলেন সেটাকেই তিনি আবার পুনরায় উদ্ধার করে বললেন আমি পেয়েছি। আমরা যদি অশুদ্ধ মনে বলি – যাজ্ঞবল্ক্য এখানে একটু কায়দা করে ঐখান থেকে নিয়ে পরে নিজের নামে চালিয়ে দিয়েছেন। তাই যদি হত, তাহলে বৈশাম্পয়ন ঋষি কি যাজ্ঞবল্ক্যকে ছেড়ে দিতেন? আমরা আজ এই প্রশ্নগুলি করতে পারি, কিন্তু কই, তখনকার

দিনে তো কেউ কোন রকম প্রশ্ন যাজ্ঞবল্ক্যকে করেনি। এই কারণে অনেকে চারটে বেদের জায়গায় পাঁচটা বেদ বলেন – যখন যজুর্বেদে আসবে তখন তারা এটাকে দুভাগে বিভক্ত করে বলে শুক্লযজুর্বেদ ও কৃষ্ণযজুর্বেদ।

তত্ত্ব ও তথ্য

পৃথিবীতে যত নামকরা ধর্মশাস্ত্র আছে, বেদ, বাইবেল, কোরান সব শাস্ত্রই একটা বিশেষ ভাবের অবস্থায় আবিষ্কৃত হয়েছে। তাই যখনই আমরা এই সব শাস্ত্রকে জাগতিক দৃষ্টিতে বিচার করতে বা বুঝতে যাব তখনই আমাদের অনেক গোলমাল হয়ে যাবে। ঋগ্বেদের প্রথম মন্ত্র – *অগ্নিমীডে পুরোহিতম্*, এই মন্ত্রকে যখনই কবিতা রূপে অনুবাদ করতে যাওয়া হবে, তখনই এর ভাব নষ্ট হয়ে যাবে। বিদেশীরা এই মন্ত্রের অনুবাদ করছে – অগ্নি হলেন দেবতাদের পুরোহিত। এই অর্থ বেদের প্রথম মন্ত্রের পুরো ভাবকেই সর্বনাশ করে দিল। কারণ বেদের যে মূল কাঠামো প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে, সেই কাঠামোটাই এই অনুবাদে ভেঙ্গে খান্‌খান্ হয়ে গেল। বেদ স্তব রূপে, প্রার্থনা আকারে রচিত। প্রার্থনা রূপে যদি হয় তাহলে আর এভাবে অনুবাদ হবে না। প্রথমেই সম্বোধন করতে হবে 'হে অগ্নি' দিয়ে। যদি কেউ বলে – অগ্নি তুমিই পুরোহিত আর অন্য কেউ যদি বলে – হে অগ্নি তুমি পুরোহিত, দুটো কথার অর্থ সম্পূর্ণ আলাদা।

বেদের সব মন্ত্রকে যে মুহুর্তে কোন কবির রচনা বলে মনে করা হবে তখন তার যে অনুবাদ হবে আর তার যে প্রভাব পরের প্রজন্মে এসে পড়বে সেটা এক রকম হবে, আবার যে মুহুর্তে মনে হবে যে এই তত্ত্বটা ধ্যানের গভীরে প্রাপ্ত হয়েছে, তার প্রভাব ও অনুবাদ দুটোই অন্য মাত্রায় চলে যাবে। যে কোন জ্ঞানের দুটো দিক – একটা দিক তত্ত্ব আর অন্যটা হল তথ্য। তত্ত্ব ও তথ্যের মধ্যে বিরাট পার্থক্য। ছোটবেলা থেকে আমরা তথ্য জেনে জেনে ভুলে গেছি যে তত্ত্ব বলেও একটা ব্যাপার আছে। তত্ত্ব যেগুলো আমরা জানি, সেগুলো আমরা দৈনন্দিন কাজে লাগাই। যেমন আগুনে হাত দিলে হাত পুড়ে যায় – এটা হল তত্ত্ব, তথ্য নয়। এটাই জীবনের একটা বাস্তব সত্য যে আগুনে হাত দিলে হাত পুড়ে যায়, এটাই তত্ত্ব, জ্ঞান। আবার কবিতা যখন লেখা হয় তার বেশির ভাগটাই তথ্য। কবি লিখছেন – ওগো মৌমাছি তুমি ফুলে বসতে যেও না। এটা একটা তথ্য। বেদ কিংবা গীতাতে বা বাইবেল কোরানে যা আছে তার কোনটাই তথ্য নয় এর সবটাই তত্ত্ব। আগুনে হাত দিলে হাত পুড়ে যায় এটা যেমন একটা তত্ত্ব ঠিক তেমনি বেদের প্রত্যেকটি কথাই তত্ত্ব। তত্ত্ব আর তথ্যের এই পার্থক্য বোধ যার নেই সে যদি বেদ পড়ে তখন সে বেদকে এক রকম বুঝবে, আর যে এই দুটোর পার্থক্যকে বুঝে নিয়ে বেদ পড়বে তার বেদ উপলব্ধি অন্য রকমের হবে। মানুষের একটা শরীর আছে, সেই শরীরে হাত আছে, পা আছে, মাথা আছে তাতে বুদ্ধি আছে, এগুলো সব তথ্য। ডাক্তাররা এদের সব খবর জানে। কিন্তু এই শরীরের মধ্যে একটা সত্তা আছে, সেই সত্তা হলেন আত্মা, আত্মা আছেন বলেই শরীরের এতো খেলা চলে। কথামৃতকে এই কারণে বেদ বলা হয়। কথামৃতকে পুরাণ বলা হয় না, তন্ত্র বলা হয় না। কথামৃতকে বলা হয় বেদরূপী শ্রীরামকৃষ্ণ। কারণ বেদে কোন তথ্য নেই, বেদের সবটাই তত্ত্ব, কথামৃতও পুরোটাই তত্ত্ব। এই জিনিসটাকে না বুঝতে পারলে বেদ ঠিক ঠিক বোঝা যাবে না। বেদে যা কিছু আছে সবটাই সার বস্তু, essence, সেইজন্য আমাদের কোর্সের নাম Essential of Spiritual Heritage of India. Essential কেন বলা হচ্ছে? যতটুকু না বললেই নয় ঠিক ততটুকুই বলা হয়েছে, যা বলা আছে এর পরেও যদি কিছু দেওয়া হয় সেটা দিলেও যা হবে, না দিলেও কিছু হবে না।

বেদ, বাইবেল, কোরানে যা কিছু আছে সবটাই তত্ত্ব, তার মানে এর বিরুদ্ধে কোন প্রশ্ন করা যাবে না। বাইবেলে যেমন বলা হচ্ছে – In the beginning there was word, and word was with God and word was God. শব্দই ভগবান। সাধারণ মানুষকে কিংবা কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের যদি বলা হয় শব্দই ভগবান, তারা হেসে উড়িয়ে দেবে, তারা এগুলিকে তথ্য হিসাবে জানে। কিন্তু যারা জানে তারা বলবে বেদ বাইবেল যা বলছে এগুলো ভগবানের কথা নয় এর প্রত্যেকটি শব্দই ভগবান নিজে। শান্তি মন্ত্রে যেমন রোজ পাঠ করা হয় *'ওঁ সহ নাববতু সহ নৌ ভুনক্তু'*, এটিও বেদের মন্ত্র। এই মন্ত্রের শব্দগুলিও ভগবানের কথা, ভগবানের কথাই নয়, এই শব্দগুলিই ভগবান। কারণ শুধুমাত্র *'সহনাববতু'* এই এতটুকুর উপরেই যদি কেউ বছরের পর বছর ধ্যান করতে থাকে তাহলে একদিন সে যে কেবল ভগবানের সাক্ষাৎ করে নেবে তা নয়, সে

ভগবানের সাথে এক হয়ে যাবে। *'সহনাববতু'*র অর্থ কি? আমি আর আমার আচার্য এক সাথে প্রার্থনা করছি। গুরু ও শিষ্যের মধ্যে যে একত্ব ভাবে রয়েছে এই একত্ব ভাবের উপরে যে ধ্যান করবে কিছু দিনের মধ্যেই তার হৃদয় এক আধ্যাত্মিক দিব্য আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে যাবে। *'মা বিদ্বিষাবহৈ'* – গুরুর প্রতি আমার যেন কোন বিদ্বেষ ভাব না আসে, গুরুরও আমার প্রতি যেন কোন বিদ্বেষ ভাব না থাকে। এই মন্ত্রগুলো ধ্যানের গভীর থেকে বেরিয়েছে। ধ্যানের গভীর থেকে একটা সত্য বেরিয়ে এসেছে, কি সেই সত্য? গুরু আর শিষ্যের মধ্যে পারস্পরিক যে সম্পর্ক সেই সম্পর্ক সর্বদা শ্রদ্ধা, ভালোবাসাতে পরিপূর্ণ থাকবে। যদি গুরুর প্রতি শিষ্যের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস না থাকে আর গুরুর শিষ্যের প্রতি যদি ভালোবাসা না থাকে তাহলে কোন বিদ্যাই অর্জন করা যাবে না। বেশির ভাগ মানুষই মনে করে দীক্ষা নেওয়ার পর দিনে দুবার একশো আট বার জপ করলেই অনেক করে ফেলেছি, কিন্তু এতে কিছুই হয় না। যেদিন থেকে চব্বিশ ঘন্টা যদি কেউ জপ করতে পারবে সেদিন থেকে সে এগোতে শুরু করবে। *'মা বিদ্বিষাবহৈ'* এই ভাবকেই যদি কেউ চব্বিশ ঘন্টা গভীর ভাবে শ্রদ্ধার সঙ্গে চিন্তন করতে থাকে তখন কিছু দিনের মধ্যেই জগৎ যে পর্দাটা দিয়ে সত্যকে আড়াল করে রেখেছে সেই পর্দাটা টেনে হিঁচড়ে ছিড়ে ফেলতে চাইবে। এটা যে শুধু *'মা বিদ্বিষাবহৈ'* এর ক্ষেত্রেই হবে তা নয়, বেদের যে কোন মন্ত্রের উপর ধ্যান করলেই তাকে আধ্যাত্মিক পুরুষে রূপান্তরিত করে দেবে।

বেদে একটা মন্ত্র আছে, যারা জুয়া খেলে তারা যদি ঐ মন্ত্র রোজ পাঠ করে তাদের জুয়া খেলার বদ অভ্যাসটা চলে যাবে। যারা জুয়া খেলে তারা যুধিষ্ঠেরের মত সব কিছুই, এমনকি স্ত্রীকেও জুয়াতে লাগিয়ে দেবে। এই জুয়া খেলা থেকে তাকে কি করে বার করে আনা হবে? জুয়ার নেশা থেকে বাঁচার জন্য বেদ একটা মন্ত্র আবিষ্কার করল। পরবর্তি কালে যখন পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা বেদের মন্ত্রগুলিকে সংস্কৃত থেকে ইংরাজীতে অনুবাদ করতে গেল তখন এই মন্ত্রকে এক জুয়াড়ির জীবন-দুঃখের আত্মকথার নিছক একটা কবিতা বলেই মনে করল। একবার ভেবে দেখল না যে টানা বত্রিশ বছর ব্রহ্মচর্য পালন করে ব্রাহ্মণরা এই বেদ মুখস্ত করতেন। মোটামুটি আট বছর বয়সে একজন ব্রাহ্মণ সন্তান গুরুগৃহে বেদ অধ্যয়ন করতে যেত, সেখান থেকে টানা বত্রিশ বছর ধরে বেদ অধ্যয়ন করতেন, তারপরে চল্লিশ বছর বয়সে তাঁরা বিবাহ করতেন, পরের বত্রিশ বছর বেদ মুখস্ত করাতেন, বর্তমান প্রজন্মের কোন ব্রাহ্মণ সন্তান এই ধরণের কঠোরতা ও নিষ্টা কল্পনাই করতে পারবে না। এখনতো তিরিশ বছরের মধ্যে বিয়ে হয়ে যাচ্ছে, আর পাঁচ মিনিটও স্ত্রীকে ছাড়া থাকতে পারে না। বত্রিশ বছর স্বল্পাহার, কঠোর ব্রহ্মচর্য পালন করে যৌবনের মূল্যবান সময়টাই তাঁরা গুরুগৃহে চতুর্বেদ মুখস্ত করতে কাটিয়ে দিতেন। পরের বত্রিশ বছর ধরে বেদ অধ্যয়ন করাতেন। বেদের জন্যই সারাটা জীবন উৎসর্গ করে দিতেন। কি করেই বা সংসার ধর্ম পালন করবে আর কিভাবেই বা ধনসম্পদ অর্জন করবে! এই কতকগুলি নিম্ন মানের 'ওহে মৌমাছি তুমি ফুলে বসো না'র মত কবিতা মুখস্ত করার জন্য একটা পুরো জাতি হাজার হাজার বছর ধরে তাঁদের পুরো জীবনকে উৎসর্গ করে দেবেন? কখনই এই জিনিস সম্ভব নয়। এটা মানুষ যদি না বুঝতে পারে তাহলে কোন দিনই বেদের সার, হিন্দুরা বেদকে কেন এত শ্রদ্ধা করে ধারণাই করতে পারবে না। এই জন্য বিদেশীদের বলা হয় – যদি ভাই তুমি বেদকে ঠিক বুঝতে চাও তাহলে আগে ভারতের যে কোন গ্রামে দু-চার বছর গিয়ে কাটাও। ম্যাক্সমুলার, বেদে যাঁর এত অবদান, তিনি জীবনে একবারও ভারতে আসেননি। স্বামীজী তাঁর সঙ্গে দেখা করে একবার অন্তত ভারতে আসার জন্য বলেছিলেন। তখন অবশ্য তিনি বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। স্বামীজীকে বলছেন – ভারত আমার স্বপ্নের দেশ, ওখানে গেলে আমার স্বপ্ন ভেঙ্গে যাবে বলে আমি আর ভারতে গেলাম না। বিদেশীর কথা বাদ দেওয়া যায়, বেশির ভাগ হিন্দুর বেদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী এখনও বিদেশীদের তুলনায় কোন অংশেই স্বচ্ছ নয়।

শাস্ত্র বোঝার আগে বলা হয় প্রথমে শাস্ত্র পূজা করতে। সৈন্যবাহিনীতেও তারা বছরে একদিন, বিশেষ করে দুর্গাপূজার সময় অস্ত্র পূজা করে। শাস্ত্রের প্রতি এই সম্মান যদি না থাকে তাহলে শাস্ত্রকে গ্রহণ করতে পারা যাবে না। ভারতে হিন্দুরাই যে শুধু বেদকে এভাবে দেখে তা নয়, বিদেশে খ্রীশ্চানরা বাইবেলকে এভাবেই দেখে, মুসলমানরা কোরানকে এভাবেই শ্রদ্ধা করে। বেদ বাইবেলে যা আছে, ধ্যানের গভীরে যখন কোন সাধক চলে যান তখন তিনি দেখেন শাস্ত্রে যা যা বলা আছে সেটা সত্যিই তাই, শাস্ত্রের বাণী সেই ভগবানের কাছ

থেকেই আসছে। নাসদীয়সুক্তেও একই জিনিস বলা হয়েছে – যা কিছু আছে সব ঈশ্বরের কাছ থেকে বেরোচ্ছে। যখন এই জিনিসটা মানুষ বুঝতে পারবে তখন শাস্ত্রের প্রতি তার প্রচণ্ড শ্রদ্ধার ভাব এসে যাবে।

বেদের প্রাচীনত্ব

এরপর আসছে বেদের প্রাচীনত্ব। বেদ পৃথিবীর সব থেকে প্রাচীনতম সৃষ্টি। পাশ্চাত্য জগতে হোমারের ইলিয়ড ওডিসিকে প্রাচীনতম সাহিত্য বলা হয়। যীশু খ্রীষ্টের জন্মের সাতশ বছর আগে হোমারের আবির্ভাব। সেই তুলনায় বেদ আরো অনেক পুরানো। বেদের প্রাচীনত্বকে নিয়ে পাশ্চাত্যের পণ্ডিতদের অনেক সমস্যা হয়। আগেই বলা হয়েছে যে ধর্মের চারটে ভাগ – দর্শন, পুরাণ, তন্ত্র ও স্মৃতি। চারটে ভাগের জন্য আলাদা চার ধরণের শাস্ত্র আছে। কিন্তু অন্যান্য ধর্মে – খ্রীশ্চান, ইসলাম, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, জুদাই, জিউস ধর্মের ওরা এই চারটেকেই একটার মধ্যে মিশিয়ে রেখেছে। বর্তমানে কোন জায়গাতে তাদের দর্শন, কোন জায়গায় পুরাণ বা রীতি নীতি আছে বোঝা কঠিণ হয়ে গেছে। হিন্দু ধর্মের যত কাহিনী আছে, অসুর, দৈত্য, দশ হাতওয়ালা ভগবানের কাহিনী সব পুরাণের মধ্যে আলাদা ভাবে সন্নিবেশিত করা আছে। আবার বেদ উপনিষদে হিন্দু ধর্মের দর্শন বা তত্ত্বগুলিকে রাখা আছে, সেখানে কোথাও বলবে না যে ভগবানের হাজারটা হাত। কিন্তু হিন্দুদের মত এত কাহিনী আর কোন ধর্মে পাওয়া যাবে না, গল্প বানাতে হিন্দুদের মত জুড়ি মেলা ভার। অথচ কোন মননশীল হিন্দু কখনই এই কাহিনীগুলিকে অত গুরুত্ব দেন না। এনারা ভালো করেই জানেন বোঝেন যে এই কাহিনীগুলো পরম তত্ত্ব নয়, আধ্যাত্মিক সত্য নয়। অন্যান্য ধর্মে পুরাণ দর্শনের মধ্যে মিশে যাওয়ার ফলে, বিশেষ করে খ্রীষ্ট ধর্মের বিরাট বড় সমস্যা দেখা দিল। বাইবেলে পৃথিবীর সৃষ্টির তারিখের হিসাব করতে গিয়ে, যাতে নিউটনেরও যোগদান আছে, তাতে তারা একটা অদ্ভূৎ হিসাব দিয়ে বললেন ভগবান পৃথিবীর সৃষ্টি করেছেন ৪০৩২ বিসিইতে (Before Common Era) । খ্রীশ্চানদের এখনও ধারণা যে পৃথিবী ৪০৩২ খ্রীষ্টপূর্বেই সৃষ্টি হয়েছে, মানে আজ থেকে প্রায় ছয় হাজার বছর আগে। বেদ কবে সৃষ্টি হয়েছে? হিন্দুরা বলছে আট থেকে নয় হাজার বছর আগে। খ্রীশ্চানরা তো হেসেই ফেলে, পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে ছয় হাজার বছর আগে তার আগে বেদ কি করে আসবে। খ্রীশ্চানরাও বুঝতে পারছে বেদ খুবই প্রাচীন, কিন্তু কত পুরনো বলবে না। যে যাই বলুক তারা ছয় হাজার বছরের আগে কিছুতেই যাবে না। এখন বিজ্ঞান বলছে পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে ১৫ বিলিয়ন বছর আগে, মানে পনেরোর পরে দশ বারোটা শূন্য দিলে যা সংখ্যা হবে তত বছর আগে পৃথিবীর জন্ম হয়েছে। বিজ্ঞানীদের এই তথ্যে খ্রীশ্চানদের মাথায় বাজ পড়ে গেছে, এখন কিছুতেই পৃথিবীর জন্মের তারিখ বাইবেলের দেওয়া তারিখের সাথে মেলাতে পারছে না। যখন ম্যক্সমুলারদের মত পণ্ডিতরা এলেন, এনারা যে পরম্পরায় শিক্ষা-দীক্ষা পেয়েছেন, সেই পরম্পরা বলছে ভগবান পৃথিবীর সৃষ্টি করেছেন ছয় হাজার বছর আগে। হঠাৎ তাদের হাতে এলো বেদ, রামায়ণ, মহাভারতের মত প্রাচ্যের সব গ্রন্থ। তাঁরা জানতেন না যে ভারতে এসব বই আছে। সব বই তাদের হাতে আসার পর বইগুলির তারিখ নির্ধারণ করতে গিয়ে তাদের মাথা গেল ঘুরে। বেদের তারিখ নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে বেদের ভাষার উপর, আর বেদের ঘটনাগুলিকে বিচার বিশ্লেষণ করতে লাগল। বিচার করতে গিয়ে দুম্ করে অনেক পেছনের দিকে চলে যেতে হয়েছিল।

ঠাকুর এসেছেন তাও দেড়শ বছর পেরিয়ে গেছে, রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের সন্ন্যাসীরা অত্যন্ত বিদ্বদজন, তাঁরা তাঁদের জীবন পুরোপুরি এখানেই নিবেদিত করে দিয়েছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত ঠাকুরের উপর নির্দিষ্ট করে একটা কোন দর্শন বেরোল না। কেননা ঐ ক্ষমতাই এখনও কারুর হয়নি, কারণ একটা জিনিসকে জমতে প্রচুর সময় দিতে হবে। সাহিত্যের একটা খাত থেকে আরেকটা খাতে যেতে সময় লাগে। ভাষার বিবর্তনও পাল্টাতে একটা সময় লাগে। বেদের দর্শন, সাহিত্য, ভাষা এগুলোকে গবেষণা করে করে তারা একটা তারিখ দিয়ে বলল – বেদ লেখা হয়েছিল ১৫০০ খ্রীষ্টপূর্বে। কিভাবে আর কোথা থেকে এই তারিখ বার করল আমাদের কারুর জানার কথা নয়। তাদের কাছে একটাই সমস্যা, তা হল বাইবেল। এরা যদি বেশি গভীরে গিয়ে বেদের সৃষ্টিকালকে ধরতে যায় তাহলে সেটা বাইবেলের বিরুদ্ধে চলে যাবে। গীতাকে নিয়েও তাদের এই একই সমস্যা হয়েছিল। গীতার সংক্ষিপ্ত ও ক্ষুদ্র পরিসরে আধ্যাত্মিক জগতের সমস্ত তত্ত্বগুলিকে এত গভীর ও ছন্দোবদ্ধ ভাবে দেওয়া হয়েছে যে এখন যদি গীতাকে বাইবেলের আগে বলা হয় তাহলে বাইবেলের গুরুত্ব অনেক নেমে যাবে।

তাই খ্রীশ্চান পণ্ডিতরা প্রাণপন চেষ্টা চালিয়ে গেছেন যে গীতা খ্রীষ্টের অনেক পরে। কিন্তু ইতিহাসের তথ্যগুলিকে তো তারা অস্বীকার করতে পারছে না। তাই এত প্রাণপন চেষ্টা চালিয়েও আজকে তারা মেনেছে যে গীতা যীশুর জন্মের ছশো বছর আগে লেখা হয়েছিল। কিন্তু তথ্য বলছে গীতা যীশুর পনের'শ বছর আগে লেখা। ম্যাক্সমূলার যেটা বেদের তারিখ দিয়েছেন সেটা আসলে গীতার তারিখ।

মানুষ অপরকে বিচার করে নিজেকে দিয়ে, আমি যেমন অপরকে আমি তেমনই দেখব। আমরা যেটা দশ বছর আগে লিখেছি, দশ বছর পরে সেই লেখা অনেক পাল্টে যাবে। পঞ্চাশ বছর আগে সাহিত্যকাররা যে ভাষায়, যেভাবে সাহিত্য রচনা করেছেন, আজকের সাহিত্যকদের লেখা তার থেকে অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে, আর এই পার্থক্য থেকে পরিষ্কার ধরা যায় কোনটা আগে আর কোনটা পরে। এই জিনিসটাকে অনুসরণ করে ম্যাক্সমূলাররা ঠিক করে ফেললেন যে বেদ খ্রীষ্টের পনের'শ বছরের আগে কোন এক সময়ে লেখা হয়েছিল। তার ফলে পাশ্চাত্যের যত পণ্ডিত আছে তারা ম্যাক্সমূলারের তারিখটাকে আঁকড়ে থাকল। পনের'শ বিসিইকে ধরলেও বেদ পৃথিবীর প্রথম দর্শন সাহিত্য।

আড়াই হাজার বছর আগে যোগসূত্রকার পতঞ্জলি ব্যাকরণের উপরে একটা ভাষ্য লিখেছিলেন, সেখানে তিনি উল্লেখ করেছেন যে সামবেদের এক হাজারটা শাখা আছে। এর বিভিন্ন শাখা লুপ্ত হতে হতে এখন আমাদের কাছে সামবেদের মাত্র তিনটি শাখা টিকে আছে, ৯৯৭ টি শাখা হারিয়ে গেছে। সংক্ষেপে শাখা বলতে বোঝায়, একই সামবেদ যখন দশটা ব্রাহ্মণ পরিবারে থাকত তখন সেই বেদের কিছু মন্ত্র এই পরিবারে কিছু মন্ত্র অন্য অন্য পরিবারের মধ্যে থাকত, এরা সবাই বলবে আমরা সামবেদীয় কিন্তু আমাদের শাখা আলাদা। এই ভাবে সামবেদের হাজারটা শাখা ছিল। সামবেদের মত অন্য তিনটি বেদের কত শাখা যে হারিয়ে গেছে কেউ বলতে পারবে না। কি করে বোঝা যায় যে হারিয়ে গেছে? যে শাখাগুলি রয়েছে তার কোথাও কোথাও উল্লেখ করা আছে এর এত শাখা ছিল, ওই বেদের এত শাখা ছিল।

ঋগ্বেদের শুধু সংহিতাতে কুড়ি হাজার চারশ সূক্ত রয়েছে, সব মিলিয়ে প্রায় নব্বুই হাজার লাইন বা পদ। মহাভারতে সাধারণত দুটো লাইনে এক একটা শ্লোক, কোথাও কোথাও চারটে লাইনেও শ্লোক আছে, মহাভারতে এক লক্ষ শ্লোক তাতেই মহাভারত এত বিশাল। ঋগ্বেদের শুধু সংহিতা মহাভারতের অর্দ্ধেক, তারপর ঋগ্বেদের ব্রাহ্মণ আছে, আরণ্যক ও উপনিষদ আছে। এতেই বোঝা যায় বেদ কত বিশালাকার হতে পারে। যদি কেউ ঠিক করে নেয় জীবনে বেদ ছাড়া আর কিছু পড়ব না, তাহলে ধরে নিতে হবে সারাটা জীবন তার বেদ পাঠ করতেই চলে যাবে। এই কারণেই আজকালকার দিনে কেউ সাহসই পায় না যে শুধু বেদ পড়বে। বেদপাঠ করা যে কত কঠিণ ছোট একটা উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে। সায়ানাচার্য যে বেদের ভাষ্য লিখেছিলেন, তিনি ঋগ্বেদের মন্ত্রের প্রত্যেকটি লাইনের ব্যাখ্যা দিলেন, এই ভাষ্য পড়তেই আমরা কুল কিনারা পাইনা, বইটা দেখলেই অনেকে হাঁফ ছেড়ে দিয়ে বসে পড়ে। উনি কাগজ কলম দিয়ে এই বিশাল গ্রন্থ লিখলেন কিভাবে এটাই একটা আশ্চর্যের ব্যাপার। বেদে একটি শব্দ আছে, পরের দিকে যে শব্দটি সংস্কৃতে অর্থ হয়ে গেল কন্যা। আবার কখন কখন বিশেষ অর্থে এই শব্দটির অর্থ হয় নর্তকী। সায়নাচার্য তাঁর ভাষ্যে শব্দটির ব্যাখ্যা করছেন – এই শব্দের অর্থ নর্তকী বিশেষ। শুধুমাত্র কন্যাও নয় আবার শুধু নর্তকীও নয়, এক বিশেষ ধরণের নর্তকী যার কোমর থেকে ওপরের দিকে কোন বস্ত্র নেই। সায়নাচার্যের এই ব্যাখ্যাকে কেউ মানতেই পারল না, সবাই বলতে লাগল তিনি কোথা থেকে এই শব্দের এমন ব্যাখ্যা পেলেন, কেননা ভারতে এই ধরণের সংস্কৃতি কোন কালেই ছিল না। কিছু দিন আগে পাটলিপুত্রের কাছে এক জায়গায় প্রত্নতাত্ত্বিকরা খনন কার্য চালাতে গিয়ে বহু প্রাচীন কালের এক ধরণের নারী মুর্তি আবিষ্কার করলেন যে নারী মুর্তিগুলির কোমর থেকে ওপরের দিকে কোন বস্ত্র নেই। সায়নাচার্য ঠিক যে রকমটি বর্ণনা করেছিলনে হুবহু সেই নারীর মুর্তি। যারা সায়নাচার্যকে গালাগাল দিয়েছিল তাদের মাথায় হাত পড়ে গেল, লোকটাতো ঠিকই বলেছিল, আর পাটলিপুত্রের আশেপাশে বৈদিক সভ্যতার বিকাশ হয়েছিলে এটা তাদেরও জানা আছে। সায়নাচার্যের কাছে পরম্পরা বিদ্যা ছিল, তিনি জানতেন এই শব্দের এই অর্থ। এখন আমরা যদি নিজেরা বেদকে পড়ে বুঝতে যাই তখন কি অবস্থা হবে বোঝাই যাচ্ছে, বেদ বুঝে নেওয়ার কল্পনাই করতে পারব না।

সায়নাচার্য বেদের যা কিছু লিখেছেন তিনি যাস্ককে অবলম্বন করেই লিখেছিলেন। যাস্ক ছিলেন সাত খ্রীষ্টপূর্ব বছরের সময়কার পণ্ডিত। সায়নাচার্যের সাথে প্রায় দু- হাজার বছরের পার্থক্য। তার মানে দু-হাজারের বছরের মধ্যে বেদের উপরে কিছুই লেখা হয়নি। তাও যাস্ক বেদের শব্দগুলির উপরে শুধুমাত্র একটা অভিধাণ তৈরী করেছিলেন। দু-হাজারের মধ্যে সেই শব্দগুলো আরও কঠিণ হয়ে গেছে, নয়তো পাল্টে গেছে অথবা হারিয়ে গেছে। আজ আমরা বেদের যা কিছু অর্থ বিচার করি তার পুরোটাই সায়নাচার্যের বিশাল এই বেদের ভাষ্যের উপরে ভিত্তি করে। সায়নাচার্যের কোন শব্দের ব্যাখ্যাকে যদি না বোঝা যায় তখন যাস্কের নিরুক্তে সেই শব্দের অর্থ খুঁজতে হবে। নিরুক্ত হল বৈদিক শব্দের অভিধাণ। সেখানেও যদি না পাওয়া যায় তাহলে তখনকার দিনে অন্যান্য বিষয়ের উপরে যাঁরা ভাষ্য রচনা করেছেন সেই সব ভাষ্যে খোঁজ করতে হবে। যদি পাওয়া গেলো তো ভালো, সেখানে কি বলছে দেখে নেওয়া যাবে। কিন্তু না পাওয়া গেলে আর কোন উপায় নেই।

কেন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা তাঁদের সমগ্র জীবন বেদের জন্য নিঃশেষে সমর্পিত করে দিলেন? কেন এখনও বেদকে এত গুরুত্ব দেওয়া হয়? তার কারণ, স্বামীজীর সেই বিখ্যাত উক্তি স্মরণ করতে হবে – কবে সেই দিন আসবে যেদিন ভারতের ঘরে ঘরে বেদের পূজা হবে। তার কারণ বেদ যদি না পড়া হয়, বেদ যদি না বুঝতে পারি তাহলে হিন্দু ধর্ম শেষ হয়ে যাবে। আমরা যদিও বলি বেদের সার পুরাণে আছে, বেদের সার উপনিষদে আছে, কিন্তু শুধু সার জানলেই হবে না, বেদের সামগ্রিক চিত্রটা সম্যক রূপে অনুধাবন করতে পারলেই আমাদের ব্যাক্তিজীবন বা সমাজজীবনের সমস্ত নোংরা-আবর্জনা পরিষ্কার করতে পারব। বেদের পুরো জিনিসকে না জানলে এ কখনই সম্ভব নয়। গরুর দুধটাই সার, গরুর বাঁটটাই আসল, কিন্তু গরুকে ঠিক ঠিক পরিচর্যা করলে, সুস্থ সবল না রাখলে সারটাও পাওয়া যাবে না। গরুকে পরিচর্যা করতে গেলে গরুর শারীরিক কাঠামোটাও জানতে হবে। গরুর সমগ্র শরীরটারও আলাদা মূল্য আছে, যেটা কখনই উপেক্ষ করা যায় না। প্রথমে শঙ্করাচার্যের জন্য, পরে স্বামীজী উপনিষদের উপরে খুব জোর দেওয়ার ফলে উপনিষদের মন্ত্রগুলি বিভিন্ন সংস্থাগুলি বিশেষ করে গীতাপ্রেস, রামকৃষ্ণ মিশন থেকে বই আকারে বেরিয়ে যাওয়ায় উপনিষদ আর হারিয়ে যাবে না। গীতাও সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে গেছে। কিন্তু বেদ যে তিমিরে ছিলে এখনও সেই তিমিরেই পড়ে আছে। একবার বেদ যদি গীতা উপনিষদের মত ছড়িয়ে যায় তাহলে হিন্দু ধর্ম, শুধু হিন্দু ধর্মই নয়, গোটা ভারতবর্ষ আবার নতুন ভাবে সঞ্জীবনি শক্তিতে জাগ্রত হয়ে উঠে মানবকল্যাণকারী রাষ্ট্রে পরিণত না হয়ে থাকতে পারবে না।

হিন্দুরা প্রাচীনকাল থেকে বিশ্বাস করে আসছে ভগবানের নিঃশ্বাসের সাথে বেদ বেরিয়েছে। কিন্তু বেদে কোথাও বলছে না যে আমি ভগবানের নিঃশ্বাসের সাথে বেরিয়েছি। অনেক পরের দিকে পুরাণে অবশ্য বলা হয়েছে, আর পুরাণ থেকেই সমস্ত হিন্দু বিশ্বাস করে যে ভগবানের নিঃশ্বাসই বেদ। পুরাণ কেন বলতে গেল বেদ এভাবে এসেছে? গ্রামের লোকেদের কাছে গিয়ে যদি বলা হয় – প্রথমে ছিল শব্দ, সেই শব্দ ভগবানের কাছে ছিল আর শব্দই ভগবান, গ্রামের লোকের হাঁ করে তাকিয়ে থাকবে নয়তো বলবে কি আবোল-তাবোল কথা শুনতে এসেছি এর থেকে চল বাবা ক্ষেতে গিয়ে বেগুন লাগাই। উচ্চ দর্শনের তত্ত্ব কথা সাধারণ মানুষের কাছে বলা আর পাথরের দেওয়ালকে বলা একই ব্যাপার। কিন্তু গ্রামের সাধারণ মানুষের মধ্যেও ধর্মভাব নিয়ে আসতে হবে। ধর্মভাব এদের মধ্যে কিভাবে জাগানো যাবে? তাদের মত করে ধর্মের কথা শোনাতে হবে। তাই সহজ করে পুরাণ বলে দিলে – ভগবানের নিঃশ্বাসের সঙ্গে বেদ বেরিয়ে এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে এক কথায় সবাই বুঝে নেবে। আধ্যাত্মিক দর্শনের কঠিণ দুর্বোধ্য পরম সত্যগুলিকে সাধারণ মানুষকে বোঝানর জন্য গল্পচ্ছলেই বলতে হয়। বেদ হল শব্দ, শব্দ মানে জ্ঞান, জ্ঞান আর ভগবান এক, এই চরম সত্য বোঝাতে পুরাণ বলে দিল – ভগবানের নিঃশ্বাসের সাথে বেরিয়ে এল চারটে বেদ। এটাকে নিয়ে আরও চিন্তা ভাবনা করতে করতে একদিন সে বুঝতে পারবে বেদ মানে জ্ঞান, জ্ঞান আর ভগবান এক, জ্ঞান ভগবান থেকেই এসেছে, আর সমস্ত জ্ঞানরাশি বেদ, তাই বেদ ভগবান থেকেই এসেছে। আমাদের যেমন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস, ঈশ্বরের কাছে জ্ঞানটাও সেই রকম। আমাদের মত ভগবানকে জ্ঞান আয়ত্ত করতে হয় না, জ্ঞান তাঁর স্বাভাবিক, সে যে কোন জ্ঞানই হোক না কেন, জাগতিক কিংবা আধ্যাত্মিক জ্ঞান, ভগবানের থেকে কখনই তা আলাদা থাকে না। পুরাণে

আবার কোথাও কোথাও বলবে ব্রহ্মার চারটে মুখ থেকে চারটে বেদ বেরিয়েছে। যেহেতু বেদ কোন পুরুষের থেকে বের হয়নি তাই বেদকে বলা হয় অপৌরুষেয়।

যে কোন মানুষ তার সৃষ্টিকে নিজের থেকেও বেশি মূল্যবান মনে করে। সেখানে বেদ এত বিশাল, যার কথা একটা ধর্মের, একটা জাতির শেষ কথা, তার রচনা যাঁরা করেছেন কেউ তাঁদের নাম কোথাও উল্লেখ করলেন না। বাবা হয়তো খুব বিনয়ী হতে পারেন তাঁর ছেলেকে যখন বেদের মন্ত্রটা দিলেন তখন তিনি হয়তো তাঁর নাম বললেন না, কিন্তু পরে ছেলে যখন নাতিকে দেবে তখন কি তাকে বলবে না যে এটা তোমার ঠাকুর্দার আবিষ্কার। কিন্তু বেদের কোথাও, এই ধরণের উল্লেখও পাওয়া যায় না। এর কারণ আমরা আগে বলেছি – ধ্যানের গভীরে ঋষিরা এই মন্ত্রগুলি পেয়েছিলেন, তাঁরা অবাক বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছেন, তাঁরা বুঝেছিলেন এই জিনিস আমার দ্বারা রচনা করা কখনই সম্ভব নয়। শ্রীমা বলছেন – আমি ভাবি, আমি তো সেই কোন এক অচেনা গ্রামের রামচন্দ্র মুখোপধ্যায়ের নিরক্ষর মেয়ে, অথচ আমাকে কত লোকে দেখতে আসছে, তাদের কেউ আবার ডাক্তার, উকিল, অধ্যাপক, তাই মনে হয় এর মধ্যে কিছু একটা আছে যার আকর্ষণে এতো লোক আসছে। শ্রীমা কি বলতে চাইছেন? শ্রীমার মধ্যে এতটুকু অহঙ্কার নেই। ঠাকুরও বলছেন – আমাকে এত লোকে মানে জানে কিন্তু মাইরি বলছি আমরা এতটুকু অভিমান হয় না। মানুষ চেষ্টা করে একটা স্তর পর্যন্ত যেতে পারে তারপরে যতটুকু এগোবে সে বুঝতে পারে এটুকু আমার দ্বারা কখনই সম্ভব নয়, সে তখন হাত তুলে বলে দেয়, আমার যা কিছু সব তাঁরই খেলা। বড় বড় মহৎ কাজের দায়ীত্ব ভগবান যার তার কাঁধে চাপিয়ে দেন না। মানুষ যখন বুঝে নেয় এই কাজ আমার ক্ষমতার বাইরে, তখন মানুষ বিনম্র হয়ে যায়। আজকাল বেশির ভাগ মানুষই ঔদ্ধত, কেন ঔদ্ধত? কারণ তাদের কোন কৃতকৃত্যতা নেই। মানুষ যখন কৃতকৃত্য হয়ে যায় তখন ভগবান তাকে নিজের যন্ত্র করে নেন, আর তাকে তিনি আরও অনেক বেশি শক্তি দিয়ে দেন। যখন ঈশ্বর নিজে শক্তি দেন তখন মানুষ আঁতকে ওঠে, সে দেখে আমার থেকে এই জিনিস কি করে বেরোচ্ছে, এ আমার ক্ষমতার বাইরে। কেননা তার নিজস্ব ক্ষমতার দৌড় কতখানি তার জানা আছে। তখন সে মাথা নত করে নেয়, প্রকৃত বিনম্রতা তখন তার মধ্যে আসে। বেদের ঋষিদের মধ্যে এই ব্যাপারটাই হয়েছিল। ধ্যানের গভীরে তাঁরা কিছু কিছু তত্ত্বকে, যেটাকে তিনি তাঁর চোখের সামনে দেখতেন সেটাকেই তিনি পরে শব্দাকারে প্রকাশ করছেন। আধ্যাত্মিক তত্ত্বগুলিকে তো মুখে বলে কিছু হয় না, সবই অনভূতি সাপেক্ষ, তখন বেরিয়ে আসছে *ওঁ ভুর্ভূবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি*। এটা যদি কবিতার পদ হয় তাহলে একজন কবির নাম থাকবে। মন্ত্র যদি হয় তাহলে কবির নাম হবে না, তখন এই মন্ত্রের দ্রষ্টার নাম হবে। আমরা এই মন্ত্রের দ্রষ্টা কে জানি – বিশ্বামিত্র ঋষি। বিশ্বামিত্র এই মন্ত্রের দ্রষ্টা, তাঁকে কখনই এই মন্ত্রের রচয়িতা বা কবি বলা হয় না। তিনি নিজেও কখন বলছেন না যে আমি এই মন্ত্রের দ্রষ্টা। বেদে বিশ্বামিত্র একটা বংশের নাম, একটা কুল বা গোত্র। এখন রামকুমার গাঙ্গুলি কিছু একটা লিখলেন আর রামকুমার না দিয়ে গাঙ্গুলি লিখলেন। তাঁর ছেলেও গাঙ্গুলি লিখছে, নাতিও গাঙ্গুলি লিখছে, পরে বোঝা যাবে না আসল রচয়িতা কে। বিশ্বামিত্র একটা গোত্র, একটা বংশের নাম। এখন কোন্ বিশ্বামিত্র এই মন্ত্রের দ্রষ্টা বলা খুবই মুশকিল।

ভাব, শব্দ ও বস্তু

মীমাংসকরা তাই বলে বেদ যদি মানুষের সৃষ্টি হত তাহলে তার রচয়িতার নাম থাকত। নাম যেহেতু নেই তাই বেদ অপৌরুষেয়। মীমাংসকরা ভগবান বা ঈশ্বর বেশি মানত না, এটা মানে যে বেদের ঋষিরা ধ্যানের গভীরে বেদের মন্ত্রগুলি পেয়েছিলেন। স্বামীজী সিন্ধু নদীর তীরে ঋষির কণ্ঠে যে বেদমন্ত্রের সুর শুনেছিলেন নিবেদিতাকে পরে বলছেন 'এ সুর আমার জানা ছিল না। অনেক আগে ভারত থেকে এই সুর লুপ্ত হয়ে গেছে'। আগে আমরা এর আলোচনা করেছি। শব্দ আর বস্তু এক। যদি অনেকে মিলে 'চক' শব্দ উচ্চারণ করি সবার উচ্চারণ আলাদা হলেও সবাই কি বলতে চাইছে বোঝা যাবে, কিন্তু এই চকের মূলে একটা সাধারণ সত্ত্বা রয়েছে, যেটা চকের প্রকৃত আধ্যাত্মিক সত্তা। সেই শব্দ যদি ঠিক ঠিক উচ্চারণ করা যায় তখন সত্যি সত্যিই চক এসে হাজির হয়ে যাবে। বৈদিক মতাদর্শিদের সবারই এটাতে দৃঢ় বিশ্বাস, তাছাড়া স্বামীজীও এই কথা বলছেন। যখনই সৃষ্টির লয় হয়ে যায় তখন সৃষ্টির সব কিছুই সমষ্টি শক্তিতে একীভূত হয়ে যায়। আমাদের

বৈদিক ধর্মের এই তত্ত্বটা যখন আবিষ্কার হয়েছিল তার প্রায় সাত আট হাজার বছর পর আইনস্টাইনের $E=MC^2$ থিয়োরি এসেছে। স্বামীজীও আইনস্টাইনের আগে বলেছেন জড় শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। শক্তি যখন আরো ঘনীভূত হয়ে যায় তখন শক্তি শব্দতে, শব্দ চিন্তাতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। ধরুন এই জগতের লয়ের পরে আমি সাক্ষী হয়ে সব দেখছি, তখন আমি কিছুই দেখতে পাবো না, কেননা তখন না আছে জড়, না আছে শক্তি, না আছে শব্দ, তখন সব কিছু শুধু চিন্তা বা ভাব রূপে সূক্ষ্ম হয়ে বিরাজ করবে। চিন্তাকে তো কেউ দেখতে পায় না, আমাদের মনের মধ্যে সব রকম চিন্তা রয়েছে, দুশ্চিন্তা, সুচিন্তা সবই রয়েছে কিন্তু এগুলোকে আমরা দেখতে পাইনা। ভারতীয় পরম্পরায় সৃষ্টি হল – প্রথমে চৈতন্য, চৈতন্য জন্ম দিচ্ছে ভাব বা চিন্তাকে, চিন্তা থেকে জন্ম নিচ্ছে শব্দ, শব্দ জন্ম দিচ্ছে শক্তিকে, শক্তি জন্ম দিচ্ছে বিষয়ের। আমাদের পারস্পরিক চিন্তা ভাবনাকে পরিস্ফুট করার জন্য এই বিষয়টা জানা যেমন প্রয়োজন তেমনি আমাদের আধ্যাত্মিক অন্তর জগতের বিকাশের জন্যও প্রচণ্ড জরুরী।

পদার্থ বিজ্ঞানের ভাষায় আমরা যেটাকে বিষয় বা object বলছি সেটাকে বলছে জড় বা matter, ঈশ্বর যখন সৃষ্টি করেন বা যোগীরা যখন সৃষ্টি করেন তখন কিন্তু এভাবে হয়না। যেমন বাইবেলে আছে – Let there be light, and there was light, সমস্ত ব্যাপারটা এত দ্রুত হয় যে আমরা কল্পনাই করতে পারব না, আর এভাবেই হয়। বাল্মীকি রামায়ণে বর্ণনা আছে ভরদ্বাজ ঋষি বলছেন সব খাওয়ার সামগ্রী, নর্তকীরা এসে যাক, সাথে সাথে সব এসে গেল। ভরদ্বাজ ঋষি তো তখন ডারউইনের বিবর্তনবাদের থিয়োরিকে অনুসরণ করে করলেন না, সরাসরি এসে গেল। লোকেরা বলবে এগুলো গাঁজাখুড়ি। গাঁজাখুড়ি বলতে পারে, কিন্তু এটা একটা তত্ত্ব বা ভাবকে সামনে নিয়ে আসছে। কি সেই ভাব? ঈশ্বর বা যোগীরা ইচ্ছে করলে সরাসরি যে কোন কিছুর সৃষ্টি করে দিতে পারেন। যোগীরা যে এসব করতে পারেন, আমরা ঠাকুরের জীবনে, এমনকি স্বামীজীর জীবনেও অনেক দেখেছি। ঠাকুর, মা, স্বামীজীর মধ্যে সিদ্ধাই দেখিয়ে বেড়াব এই মনোভাব কখনই ছিল না, কিন্তু কোন কোন পরিস্থিতিতে প্রয়োজনে তাঁরা ভালো মতই এর প্রয়োগ করেছেন।

পাশ্চাত্যের ভোগসর্বস্ব আদর্শে জর্জরিত প্রত্যেক ভারতবাসীকে তার ধমনীর রক্ত প্রবাহে যে নিজস্ব ঐতিহ্য পরম্পরা প্রবাহিত হয়ে চলেছে সেই ঐতিহ্যকে জানাটা আজ খুবই বাঞ্ছনীয়। ভারতের আসল ধর্মটা কি আমরা প্রায় সকলেই ভুলে গেছি, সেটাকে জানা খুবই প্রয়োজন। সকালে বেলুড় মঠে আসলাম, মন্দিরে প্রণাম করে চরণামৃত আর বাতাসা প্রসাদ খেলাম, এটাই ধর্মের সব কিছু নয়, এগুলো ধর্মের খুবই নগণ্য জিনিস। সঠিক ধর্মকে জানতে হলে আমাদের আরও গভীরে গিয়ে আমাদের চিন্তা বুদ্ধিকে খেলাতে হবে।

স্বামী-শিষ্য সংবাদে স্বামীজী শিষ্যকে বলছেন – পৃথিবীতে যত ঘট আছে সব ঘটকে যদি ভেঙ্গে দেওয়া হয়, এমনকি দু-হাজার বছর পর্যন্ত ঘট শব্দটাও ব্যবহার করা হল না, তাই বলে ঘটত্ব, ঘটের ভাবটা থেকে যাবে। ভগবানের যে মন, তাতে এই ঘটত্বের নাশ কখনই হবে না। ফলে কি হবে, সমস্ত ঘটকে নাশ করে দিলেও ঘট শব্দটা থেকে যাবে, ঘট শব্দকেও নাশ করে দেওয়া হল, তারপরেও ঘটত্ব ভাবটা থেকে যাবে। যত দিন ভগবান আছেন তত দিন ঘটত্বের নাশ কখনই হবে না। সেইজন্য ভগবান যে মুহূর্তে ইচ্ছা করবেন তখন আবার ঘটের আবির্ভাব হয়ে যাবে। তাই হিন্দুদের মতে জগতে বিনাশ বলে কিছু নেই। ভাবের বিনাশ নেই বলে সেখান থেকে আবার সব কিছু সাকার হয়ে যাওয়াটা কোন ব্যাপারই নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণকে যেভাবে আমরা দেখছি সেটাই সব কিছু নয়, তিনি মানুষের রূপ নিয়ে আছেন বলে তিনি কখনই মানুষ নন, তিনি হলেন একটা ভাব। শ্রীরামকৃষ্ণের এই ভাব কখনই বিনাশ হয়ে যাবে না। এই ভাবকে যখনই কেউ ধ্যানের মধ্যে চিন্তা করবে তখনই শ্রীরামকৃষ্ণ হাজির হয়ে যাবেন। বলা হয় বেদের মন্ত্র যখন ঠিক ঠিক উচ্চারণ করা হয় তখন সেই মন্ত্রগুলি মুর্তরূপ ধারণ করে, শ্রীরামকৃষ্ণ যখন ঠিক ঠিক উচ্চারণ করা হবে তখন শ্রীরামকৃষ্ণও মুর্ত হয়ে উঠবেন। কেন এই রকমটি হবে? কারণ ভাব, শব্দ আর বিষয় পরস্পর সম্পর্ক যুক্ত। পতঞ্জলি যোগসূত্রে একটি সূত্র আছে - *তজ্জপস্তদর্থভাবনম্* , পতঞ্জলি বলছেন কিভাবে আমরা ঈশ্বরে মন দেবো, *তজ্জপঃ* তার নাম জপ করতে বলছেন, আর *তদর্থভাবনম্,* তাঁর যে নাম জপ করছি, সেই নামের অর্থ

ভাবনা সাথে সাথে করতে হবে। এখানেও সেই শব্দ আর ভাবের কথাই বলা হচ্ছে। শব্দ আর ভাবকে যেই ঠিক ঠিক জুড়ে দেওয়া হবে বিষয় আপনা থেকেই এসে যাবে। যদি মনের সেই একাগ্র শক্তি থাকে তাহলে সে যে কোন কিছুর শব্দ আর ভাবকে নিয়ে ঠিক ঠিক উচ্চারণ করতে পারলে সেই জিনিস তার কাছে চলে আসবে। এটাই হিন্দু ঋষিদের অভিমত। ঋষিরা কোন কিছুর কাল্পনিক চিন্তা থেকে এই অভিমত দিচ্ছেন তা নয়। ওনারা বলেন এগুলো আমাদের কাছে অতি নগণ্য ব্যাপার। সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় ঈশ্বর ছাড়া কিছুই নেই। ভগবান যখন সৃষ্টি করেন তখন কি তিনি বাস্তুকার আর রাজমিস্ত্রির মত নকশা বানিয়ে ইট, সিমেন্ট, বালি দিয়ে কিছু বানান? কখনই তিনি তা করতে যান না। ভগবান যেই বললেন সৃষ্টি হোক সেই মুহুর্তেই সব সৃষ্টি হয়ে যাবে। তাঁর ইচ্ছা মাত্রেই সব কিছু প্রকাশ হচ্ছে আবার তাঁর ইচ্ছা মাত্রেই সব কিছুর লয় হয়ে যাবে। খ্রীশ্চানদের কাছে এটাই আবার সমস্যা হয়ে যায়, বাইবেলে আছে ভগবান আগে এটা করলেন তারপরে ওটা করলেন, এইভাবে হিসেব করে করতে গিয়ে তাদের একটা জায়গায় এসে সমস্যা হয়ে যায়। কেন তাদের এই সমস্যা? কারণ তাদের পরম্পরা নেই। ভারতের যে পরম্পরা, বেদের ঋষিদের যে পরম্পরা চলে আসছে, সেই ধরণের কোন পরম্পরা থাকলে তারা আর কোন সমস্যায় পড়ত না। Idea, Words and Objects are co-related. এটাকে খ্রীশ্চানরা ধরতেই পারেনা বলে তারা সৃষ্টির ব্যাপারে যা বলে তার কোনটাই দাঁড়াতে পারে না। কথামৃতেও আমরা বেদের এই তত্ত্ব পাই। শব্দ ও বিষয় এক, এটাকেই কথামৃতে বলছে নাম আর নামী অভেদ। নাম হল শব্দ আর নামী হল বিষয় মানে object. শাস্ত্র পড়লে কথামৃতে ঠাকুরের কথাগুলো ঠিক ঠিক বোঝা যায়। নাম নামী অভেদ এই কথাটা কোথা থেকে এসেছে? বৈষ্ণব সম্প্রদায় থেকে। কথামৃতে যা পড়ছি সেই একই জিনিসে বেদেও পড়ছি। এই নাম-নামী থেকেই সৃষ্টি বেরোচ্ছে।

ভাবের অবস্থান মনে, শব্দ আছে মুখে আর বিষয় আসছে কার্যে। যে চুরি করতে চাইছে সে প্রথমে মনে মনে ভাববে আমি চুরি করব, তারপর তার মনের কথা তার নিজের লোকদের কাছে বলবে – আমি কিন্তু চুরি করব, চুরি করা ছাড়া আমার উপায় নেই। তারপর একদিন সে সুযোগ পেয়ে চুরি করতে যায়। এই তিনটে জিনিস সব সময় পরস্পর সম্পর্ক যুক্ত। এই তিনটের মধ্যে আসল হল ভাব। যে মন শুদ্ধ পবিত্র, যে মন খুব একাগ্র, সেই মনের মধ্যে যে ভাব আসে সেই ভাব কার্যকর হবেই হবে। এইজন্য দেখা যায় সাধারণ লোকেরা সাধুর কাছে যায় আশীর্বাদ নিতে, মানে সাধু যদি কিছু বলে দেন তাহলে সেটা হয়ে যাবে। অর্থাৎ সাধুর মনে যদি কোন বিচার আসে যে ওর ভালো হোক, তার ভালো হবেই। শুদ্ধ পবিত্র মনে যে ইচ্ছা জাগ্রত হবে সেই ইচ্ছাই ফলপ্রসু হয়ে যায়। বেদ এবং বৈদিক রচনা এই দুটোর মধ্যে গভীর সম্পর্ক রয়েছে। বেদ সৃষ্টি কিভাবে হয়েছে তার ব্যাখ্যা করেছে আবার বেদ কিভাবে এসেছে সেটাও বেদে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ঈশ্বরের মনে যে ভাব বা চিন্তা আছে সেটা যখনই সাকার রূপ ধারণ করবে তখন সেটা কোন আজগুবি কিছু হবে না, একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ ও ছন্দোময় পরিকাঠামো তার থাকবে। বেদ ঈশ্বরের সৃষ্টির এই সামঞ্জস্যযুক্ত ও ছন্দোময় পরিকাঠামোটাকে ধরে রেখেছে, এরই বাহ্যিক প্রকাশ হল এই সমগ্র জগৎ।

স্বামীজী বলছেন সৃষ্টির ঠিক আগে, যখন কোথাও কিছু নেই, ভগবান প্রথম ওঁ সৃষ্টি করেন। ওঁ শব্দের সাথে সাথেই প্রত্যেকটি বস্তুর সূক্ষ্মরূপ গুলি উদয় হয়ে যায়। কোথায় উদয় হচ্ছে? ভগবানের মনে। যেমনি সূক্ষ্মভূত গুলির উদয় হয়ে গেল তখন সেখান থেকে স্থূল জগতের প্রকাশ হওয়াতে আর কোন সমস্যাই থাকবে না। সৃষ্টির ব্যাপারে এটাই বেদের মত। আমরা যদি কোন কিছু রচনা করতে যাই তখন আমাদের অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে, নানা পন্থা অবলম্বন করে, এটা ওটা দিয়ে রচনা করতে হবে। আমরা বোতল শব্দটা উচ্চারণ করলে বোতল সৃষ্টি হয়ে যাবে না, আমাকে প্রথমে খনি থেকে ক্রুড পেট্রোল তুলে আনতে হবে, সেই পেট্রোলকে শোধানাগারে পাঠিয়ে শোধন করতে হবে, তার থেকে পেট্রোলিয়াম বাই-প্রোডাক্টস গুলি আসবে, তারপর সেটা কারখানায় গিয়ে বোতল তৈরী হবে আর ভগবান বা যোগীরা যখন কোন কিছুর রচনা করেন তখন তাঁরা সরাসরি সেটাকে রচনা করে আমাদের সামনে প্রকাশ করে দেন, বলবেন 'বোতল' সঙ্গে সঙ্গে বোতল এসে যাবে। যোগীরা ইচ্ছে করলে তাঁরা একাধিক শরীর নিয়ে নিতে পারেন। এগুলো যোগীদের কাছে স্বাভাবিক, এই নিয়ে তাঁরা মাতামাতি বা নাচানাচি করেন না। আমাদের কাছে এগুলো অস্বাভাবিক লাগবে।

একটা গ্রামের লোক, যে কোন দিন রেফ্রিজারেটর দেখেনি তার কথাও শোনেনি, তাকে যদি ফ্রীজ থেকে বরফের টুকরো দিয়ে দেওয়া হয় সে অবাক হয়ে যাবে। বেদের ব্যাপার গুলো আমাদের কাছে ঐ গ্রামের লোকেদের মত। কিন্তু যাঁরা ঋষি, যোগী তাঁদের কাছে এগুলো একেবারেই মামুলি ব্যাপার যেমন আপনার কাছে ফ্রীজের বরফ। যারা বেদ অধ্যয়ন করতে আসেন তাদেরকে এই জিনিসগুলিকে আনুষ্ঠানিক ভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়, কেননা আগে যা কিছু শুনেছে, তার যা বিশ্বাস অবিশ্বাস রয়েছে, প্রথমে তাকে মন থেকে সব ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বেদের শিক্ষা নিতে হবে। তাই তাকে প্রথমে বেদের বৈশিষ্ট্যগুলিকে বলে দেওয়া হয়। যা এতক্ষণ বলা হল, এগুলোই বেদের বৈশিষ্ট্য। সৃষ্টি কিভাবে হয় সেই ব্যাপারে এটাই বেদের মূল বক্তব্য।

গীতাতে একটা শ্লোক আছে – *যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ (৯/২২)*।, ভগবান বলছেন – যাঁরা যোগী আমি তাঁদের জন্য ক্ষেম বয়ে নিয়ে আসি। গীতার ভাষ্যকার শ্রীমধুসুদন সরস্বতী তাঁর ভাষ্যে প্রশ্ন করে বলছেন – যাঁরা যোগী তাঁদের খাবার না হয় ভগবান বয়ে নিয়ে আসেন, কিন্তু যারা যোগী নয় তাদের খাবার কে দেন? আমরাই তো বলি সবই তাঁর ইচ্ছা, তাহলে তিনিই সবাইকে খাওয়াচ্ছেন, কিন্তু ভগবান গীতাতে বলছেন যোগীদের খাবার আমিই বহন করে আনি। তাহলে বাকিদের খাবার কে নিয়ে আসে? শ্রীমধুসুদন সরস্বতী বলছেন – ভগবানই সবাইকে দেন। কিন্তু যোগী ছাড়া বাকীদের পুরুষকারের মাধ্যমে দেন, মানে তাদেরকে দিয়ে খাটিয়ে নেন আর যোগীদের না খাটিয়েই দিয়ে দেন, এটাই তফাৎ। ভাষ্যকার বলছেন – যোগীদের না খাটিয়ে সব কিছু দেন, তা ভগবান তাঁদের কি দেন? যোগ সাধনের জন্য যতটুকু দরকার ঠিক ততটুকুই তাঁদের তিনি নিজে থেকে দিয়ে দেন, তাই বলে বিলাসিতা করার জন্য কোন বিলাসসামগ্রী তাঁদের তিনি দেন না। বেলুড় মঠে ঠাকুরের তিথি পূজা হবে সেখান সন্ন্যাসীরা খেটেখুটে সব জোগাড় করতে যান না, ভক্তরাই সব জোগাড় করে দেন। কোথাও কোন সাধু যজ্ঞ করবে, দেখা যায় কেউ চাল দিয়ে গেল, কেউ ডাল দিচ্ছে, এক এক জন ভক্ত এক একটা কাজের ভার নিয়ে নিচ্ছে, সাধু এখন নিশ্চিন্ত হয়ে নির্ভাবনায় যজ্ঞ করতে বসে গেলেন। এটা একটা ভাব – তুমি যোগী হয়েছ, তুমি আর সংসারে বেশি মন না দিয়ে আমাতে মন দাও, তোমার জীবন ধারণ আর সাধন-ভজনের জন্য যতটুকু যা দরকার আমিই যোগাড় করে দেব। ঠাকুর নরেনকে বলছেন – তোর মোটা ভাত আর মোটা কাপড়ের অভাব হবে না। যোগীদের বলা হচ্ছে – তুমি যদি কিছু নাও পাও তার জন্য উতলা হয়ো না। কিন্তু যারা সংসারী তাদেরকে কিছু পেতে হলে খাটতে হবে।

আর্যরা কি বহিরাগত

বেদের সময়কে যদি তিন হাজার কি দু হাজার এগিয়ে পিছিয়ে দেওয়া হয় তাহলে বেদের অনেক কিছুর গুরুত্ব পাল্টে যাবে। বেদে যা বলা হয়েছে তার উপর ভিত্তি করেই ভারতের ইতিহাস রচিত হয়, আবার ভারতের পরিচয় পেতে হলে বেদকে জানতে হয়, এই দুটোর মধ্যে একটা গভীর সংযোগ রয়েছে। স্বামীজী এক জায়গায় বলছেন – তোমরা এমন কোন সূত্র কি পেয়েছ যে আর্যরা ভারতের বাইরে থেকে এসে আক্রমণ করে পরে ভারতে বসবাস করতে আরম্ভ করল? সাহিত্য যখন রচনা করা হয়, তা আধ্যাত্মিকই হোক কিংবা ধর্মের কথাই হোক, কিন্তু পরবর্তি কালে এটাই দেখা যায় যে বর্তমানের মধ্যে যে ঘটনা ঘটবে তার মধ্যেও বহু আগেকার কিছু কিছু ঘটনা প্রতিফলিত হবে। কিন্তু কোথাও এই ধরণের উল্লেখ নেই যে আর্যরা ভারতের বাইরে থেকে এসেছিল। ইদানিং কালে Voice of India নামে একটি সংস্থা হয়েছে যার মধ্যে অনেক বিদেশীরাও আছেন, এরা অনেক তথ্যমূলক বই লিখছেন যার মধ্যে অনেক পুরানো ধ্যান ধারণার উপরে প্রশ্ন করা হয়েছে।

শেষ যিনি বেদের উপরে বিরাট কাজ করেছেন তিনি হলেন বাল গঙ্গাধর তিলক, বেদের উপর তিনি অনেকগুলি বই লেখেন, তাতে বেদের অনেকগুলি মন্ত্রকে নিয়ে তিনি যুক্তির সাহায্যে দেখিয়েছেন যারা বেদ রচনা করেছিলেন তারা প্রথমে উত্তরমেরুর কাছাকাছি কোথাও ছিলেন। পৃথিবীতে কখনও কখনও উষ্ণতার প্রবাহ চলতে থাকে আবার কখনও কখনও শীতলতার প্রকোপ চলতে থাকে। প্রাকৃতিক কারণে এই ধরণের পরিবর্তন পৃথিবীতে মাঝে মাঝেই হয়ে থাকে। একটা সময় এসেছিল যখন পৃথিবীতে তুষারপাতের মাত্রা প্রচণ্ড বৃদ্ধি পেয়েছিল, যেটাকে বলা হয় তুষার যুগ। কোন এক সময়ে ভূতাত্ত্বিকরা খনন কার্য করে বড় বড় হাতির

অস্তিত্ব দেখতে পেয়েছিলেন, যার নাম ম্যামথ। এদের শরীরের আকার সাধারণতঃ যে ধরণের হাতি এখন পাওয়া যায় তার থেকে দ্বিগুণাকৃতির। এই রকম একটা দুটো নয়, প্রচুর সংখ্যায় এই ধরণের ম্যামথের অস্তিত্ব পাওয়া গেল। কোন বিকৃত না হয়ে পুরো শরীর নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় বিজ্ঞানীরা ম্যামথগুলি পেয়েছিলেন। এটাতো কখনই সম্ভব নয় যে একটা এত বড় প্রাণীকে অবিকৃত অবস্থায় সংরক্ষণ করা হয়েছে। এর রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করলেন হয়তো কোন এক সময়ে স্বাভাবিক পর্যাবৃত্ত অনুযায়ী পৃথিবীতে হঠাৎ তুষার যুগ শুরু হয়ে যায়, আর তার ফলে এমন বরফ পড়তে শুরু হল যে এই প্রাণীগুলি কোথাও পালিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে পারেনি এবং বরফে ঢাকা পড়ে যায়। বরফের মধ্যেই তাদের স্বাভাবিক প্রাকৃতিক সংরক্ষণ হয়ে গেছে।

বাল গঙ্গাধর তিলক দুটো বই রচনা করেছেন, একটার নামে Orayan আরেকটি বিখ্যাত বইয়ের নাম The Arctic Home of the Vedas। সেখানে তিলক বেদের একটা যজ্ঞের কথা উল্লেখ করছেন। যজ্ঞটি ঊষার নামে। এই যজ্ঞে ব্রাহ্মণরা সূর্যোদয়ের আগে জলে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করছেন – হে ঊষা, তুমি উদিত হও, কেন তোমার উদয় হচ্ছে না, আমরা সবাই ভীত, তুমি উদিত হয়ে আমাদের এই ভয় নিবারণ কর। যজ্ঞের আনুষাঙ্গিক সব কিছু বিচার করে বাল গঙ্গাধর তিলক বলছেন – ঊষা যজ্ঞ ঊষাকালেই করতে হবে। যেমন কালীপূজা রাত্রের মধ্যেই শেষ করতে হবে। তিনি হিসেব করে দেখিয়েছেন ঊষা যজ্ঞ শেষ করতে আট ঘন্টা লাগে। কিন্তু ভারতের কোথাও আট ঘন্টা ঊষাকাল থাকে না। আট ঘন্টা ঊষাকাল একমাত্র উত্তরমেরুর কাছাকাছি কোথাও হতে পারে। কারণ ওখানে ছয় মাস দিন আর ছয় মাস রাত হয়। সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের মাঝখানের সময়টা কমতে কমতে এক সময় আসবে যখন উত্তরমেরুতে অথবা উত্তরমেরু থেকে একটু নীচের দিকে নেমে এলে, অনেকক্ষণ ধরে ঊষাকাল পাওয়া যাবে। ভারতে ঋষিরদের পক্ষে যেটা সম্ভব নয় সেটাকে তাঁরা যজ্ঞরূপে কি করে করবেন, পরে আবার যজ্ঞের মন্ত্রগুলি বংশ পরম্পরায় মুখস্ত করে রাখবেনই বা কেন। অথচ এনারা ঊষাযজ্ঞের কথা বলছেন আর তার অনুষ্ঠানও হত। তাহলে এনারা নিশ্চয়ই এমন জায়গায় যজ্ঞ করতেন যেখানে ঊষাকাল আট ঘন্টা পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হবে। তাই এটা নিশ্চিত হওয়া যায় যে ঊষাযজ্ঞ নিশ্চয়ই উত্তরমেরুর কাছাকাছি কোন অঞ্চলে সম্পন্ন হত। তিলক এই ধরণের অনেক যুক্তির অবতারণা করেছে। তারপর ওরায়ণ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি বলছেন ওরায়ণ হল তারাসমূহ। বেদে যে সব তারমণ্ডলীর কথা বলা হয়েছে, এই তারাসমূহকে ভারতের কোন অঞ্চল থেকেই অবলোকন করা যায় না। এই তারাসমূহকে বেদের বর্ণনা অনুযায়ী দেখা যাবে একমাত্র যদি কেউ উত্তরমেরুর কোন অঞ্চল থেকে দেখবেন। এই ধরণের অনেক তথ্য তিনি তাঁর বেদের আলোচনার মধ্যে উল্লেখ করে আর্যদের ভারতের বাইরে থেকে অনুপ্রবেশের তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন।

কিছু দিন আগে Bound Together নামে একটা বই বেরিয়েছে সেখানে লেখক বলছেন – বিশ্বে এখন জেনেটিক মানচিত্র তৈরী হয়ে গেছে। পৃথিবীর সব অঞ্চলের লোকেদের মধ্য থেকে এলোপাতাড়ি কিছু লোকের জিনের নমুনা সংগ্রহ করে এই জেনেটিক মানচিত্র তৈরী করা হয়েছে। এই মানচিত্র করে দেখা গেল যে মা যখন তার বাচ্চার জন্ম দেয় তখন বাচ্চার শরীরে অনেক জিনের পরিবর্তন হয় কিন্তু একটা বিশেষ জিন আছে যেটা কোন বাচ্চার ক্ষেত্রেই পরিবর্তন হয় না। বিশ্বের যত মহিলা আছে সব মহিলার মধ্যে একটা বিশেষ জিন আছে যেটা সব মহিলার মধ্যেই থাকবে। এই জিন, বলছে, মায়ের থেকে তার কন্যা ও পুত্র উভয় সন্তানে যায়। জেনেটিক মানচিত্রের সাহায্যে এই জিনের উৎস খুঁজতে খুঁজতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে আফ্রিকার এক মহিলার মধ্যে এই জিন পাওয়া গেছে। বাইবেলের আদম ও ঈভের যে তত্ত্ব, এই আবিষ্কারের ফলে হয়ত সত্য প্রমাণিত হয়ে যাচ্ছে। তার মানে বলতে চাইছে বিশ্বে যত মহিলা আছে ঐ একটি মহিলা থেকে এসেছে। এই থিয়োরিকে এখন জেনেটিক বিজ্ঞানীরা সবাই স্বীকার করে নিয়েছে, তাদের কাছে এটা এখন আর থিয়োরি নয় এটাই ঘটনা। এই জিনকে কোন ভাবেই পরিবর্তন করা যায় না।

জিন মানচিত্রের সাহায্যে জিনের এখন এমন বিশ্লেষণ করা হচ্ছে যে একজন মানুষের পূর্বপুরুষদের পুরো ইতিহাসকে সাজিয়ে দেওয়া যাবে, কে কোথায় ছিল সব বলে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। বইটির লেখক নয়ন

চন্দা নিজের জিনের নমুনা নাম ঠিকানা গোপন করে এদের কাছে পাঠিয়েছিলেন পরীক্ষা করার জন্য। জিনের নমুনার রিপোর্ট যখন লেখা হচ্ছে তারা প্রথমেই বলছে যে – যেখান থেকেই এই নমুনা আসুক না কেন, এই ব্যাক্তি কোন ভারতীয় বংশোদ্ভব। কারণ ভারতে যারা আগে থাকতেই এসে গেছে, ভারতে এলেই তাদের জিন একটু একটু করে পাল্টাতে থাকে। কিন্তু আগের যে জিনগুলি ছিল সেটাও থাকবে, আবার তার আগেও যে জিনগুলি পাল্টে ছিল সেটাও থাকবে। পাল্টে গিয়ে নতুন যেটা হয়েছে সেটার সাথে আগের আগের সব কয়টা জিনই থেকে যাবে। এই আগের আগের জিনগুলির রিডিং নিতে নিতে যত পেছনের দিকে যাবে ততই তার পুরো ইতিহাস বেরিয়ে আসবে। আমাদের শরীরের যে কোন একটা কোষের মধ্যে জেনেটিক ইতিহাস পুরোটাই পাওয়া যাবে। একটা গোটা জাতির ইতিহাসও এইভাবে বলে দেওয়া যাবে।

কলোম্বাস যখন আমেরিকাতে গিয়ে নামল তখন আমেরিকার নিগ্রো আদিবাসীদের দেখে তার মনে হল যেন একটা নতুন কোন জগতে এসে সে পৌঁছেছে। সেই থেকেই আমেরিকার নাম হয়ে গেল New World, কিন্তু কলম্বাসের উত্তরসূরীদের ছ'শ বছর লাগল জানতে যে এই নিগ্রো আফ্রিকানরাই তাদের পূর্বজ। আফ্রিকানদেরই আজ জেনেটিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে বলা হচ্ছে আমাদের সবার পূর্বজ। এটা হল এখনকার প্রাণীবিজ্ঞানীদের মত। বিজ্ঞানীদের পক্ষে মুশকিল হল আজ যে তত্ত্বকে প্রামাণিক সত্য বলছে দু-দিন পরেই বলবে যে আগের হিসেবে একটু গোলমাল হয়ে গেছে, ঐ তত্ত্বটা এখন বাতিল করা হল। কিছু দিন আবহাওয়া বিজ্ঞানীর বলল যে আমাদের গঙ্গোত্রীর বরফ যে ভাবে গলতে শুরু করেছে তার ফলে আগামী পঞ্চাশ বছরে সব বরফ গলে যাবে। তার কয়েক বছর বাদে সেই বিজ্ঞানীরাই বলল যে আমাদের হিসাবে একটু গণ্ডগোল হয়ে গেছে, গঙ্গোত্রির বরফ এখন তিনশ বছরের মধ্যে কিছুই পরিবর্তন হবে না। এতক্ষণ আমরা এই কথাগুলো আলোচনা করলাম এইজন্যই যে যদি আমরা এই Bound Together বইয়ের থিয়োরী অনুযায়ী বিচার করি তাহলে আর্যরা যে ভারতের বাইরে থেকেই এসেছিলেন এটা মানতে কোন অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

আমাদের যদি কোন কিছুর ব্যাখ্যার দরকার হয় তখন আমরা সেটাকে বিজ্ঞানীদের কাছে নিয়ে যাই। বাচ্চারা মা বাবাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে থাকে – এই গরুটা সাদা কেন, ঐ গরুটা কালো কেন, পাখি কেন ওড়ে, গরু কেন উড়তে পারে না, গরু কেন ঘাস খায় – প্রশ্নের শেষ নেই। ছোট্ট শিশুর কাছে বাবা মাই সব। বিজ্ঞানীরাও আজকে আমাদের কাছে বাবা-মা। ভারতে আগেকার দিনে এখনকার বিজ্ঞানীদের এই গুরু দায়ীত্বটা ছিল আধ্যাত্মিক পুরুষদের কাছে। মুনি-ঋষিদের সমস্যাটা ছিল অন্য ধরণের, তাঁরা ধ্যানের গভীরে একটা তত্ত্বকে উপলব্ধি করে নিলেন, কিন্তু তত্ত্বের আগে কিছু তথ্যও থেকে যায়, ওনারা সেটাকে জানতেনও না, জানবার প্রয়োজনও অনুভব করতেন না, তাই জানার চেষ্টাও করতেন না, আর তাঁদের পক্ষে জানা সম্ভবও ছিল না। মনে করা যাক – একজন ঋষি হিমালয়ের কোন শৃঙ্গের উপরে বসে রয়েছেন, সেখান থেকে তিনি ইচ্ছা করলেই একটা পা শুধু বাড়িয়ে দেবেন আর সাথে সাথে আরেকটা শৃঙ্গে চলে যাবেন। তিনি যখন একটা শৃঙ্গ থেকে আরেকটা শৃঙ্গে এইভাবে ঘুরে বেড়ান তখন শৃঙ্গের নীচে পাহাড়ের উপত্যকায় কি আছে সেটা জানা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু যারা পায়ে হেঁটে হিমালয়ের পাদদেশ থেকে শৃঙ্গে যান তারা সব কিছু বলতে পারবেন কোথায় গ্রাম আছে, সেই গ্রামে কি ধরণের মানুষ থাকে, কোথায় কি ধরণের বৃক্ষাদি আছে, কোথায় বড় পাথর, কোথায় ছোট পাথর, কোথায় বালি ইত্যাদি। কিন্তু ঋষিদের পক্ষে এগুলো জানা সম্ভব নয়, কেননা তাঁরা ওপর ওপর দিয়ে এক শৃঙ্গের থেকে আরেক শৃঙ্গে যাতায়াত করেন। বিজ্ঞানী হল পর্বত অভিযাত্রীদের মত।

সাধারণ মানুষ তখনকার দিনে সব ধরণের অনুসন্ধিৎসা নিয়ে ঋষিদের কাছে হাজির হত সব কিছুর ব্যাখ্যা জানতে। ঋষিরা দেখলেন এদের যদি আমার মত করে ব্যাখ্যা করি তাহলে তারা বুঝতে পারবে না, তখন তাঁরা এদের মনের মত করে সহজ করে, কিছুটা যুক্তিকে আশ্রয় করে, মোটামুটি যুক্তিভিত্তিক একটা আখ্যায়িকার মাধ্যমে ধর্মের তত্ত্বগুলি বুঝিয়ে দিতেন। ঋষির যে শিষ্যরা তাঁর কাছে থাকত তারা ওটাকেই মেনে নিত, আর অন্যদেরও মেনে নেবার জন্য প্রচেষ্ট হতেন। তাদের অনুসন্ধিৎসু মনকে শান্ত করার জন্য এ ছাড়া আর কোন উপায়ও ছিল না। এইভাবেই ভারতে পুরাণাদি ধর্মীয় শাস্ত্রের জন্ম নিল।

আমাদের প্রত্যেকেরই জানতে ইচ্ছে করে প্রথমে কি ছিল। আমরা এই বর্তমান অবস্থায় কিভাবে এসেছি? সৃষ্টির রহস্য জানার আগ্রহ বরাবর মানুষের মধ্যে যেমন রয়েছে আর এই সৃষ্টির রহস্যকে বোঝাবার দায়ীত্ব যাদের ছিলে তাদেরও অনেক সমস্যা ছিল সাধারণ মানুষকে তার মত করে বুঝিয়ে দেবার ক্ষেত্রে। বোঝাবার দায়ীত্ব যার কাছেই থাকুক না কেন, সে বিজ্ঞানীই হোন, আর ঐতিহাসিকই হোন আর আধ্যাত্মিক পুরুষই হোন সবার ক্ষেত্রেই এই সমস্যা ছিল। ভারতের যে আধ্যাত্মিক শাস্ত্রগুলি রয়েছে তার মধ্যে সৃষ্টির ব্যাখ্যা বিভিন্ন ভাবে আলোচনা করা হয়েছে। বিজ্ঞানী তার মত করে একটা তত্ত্বকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন, অন্যরাও একটা থিয়োরী দিয়েছেন। কিন্তু সৃষ্টি রহস্যের প্রকৃত সত্যটা কি? নাসদীয় সুক্তের শেষ ভাগে বলছেন – যিনি ভগবান তিনিই হয়তো জানেন কোথা থেকে এই সৃষ্টি এসেছে, অথবা হয়তো তিনিও জানেন না। কিন্তু গ্রামের সাধারণ লোককে যদি কোন ঋষি নাসদীয় সুক্তের ভাষায় এই কথা বলেন ভগবানই জানেন না তা আমি কি করে জানব, তাহলে ঋষিকে কে মানতে যাবে। যারা বালবুদ্ধি সম্পন্ন তাদের কাছে ঋষিরা সর্বজ্ঞ, তাঁরা যদি বলে দেন আমি জানিনা, তাহলে তারা অবাক হয়ে যাবে যে পৃথিবীতে এমন জিনিসও আছে যেটা ঋষিরা জানেন না। বালবুদ্ধি যারা তারা এটা কখনই মানবে না যে ঋষিরা এটা ছাড়া বাকি জিনিসগুলি জানেন, এই ভাব থাকলে তাদের মন থেকে ঋষিদের প্রতি শ্রদ্ধাটা হারিয়ে যেতে পারে। সেইজন্য ঋষি প্রতিম বিজ্ঞ লোকেরা এদের মনকে শান্ত করার জন্য একটা কিছু তথ্য বলে দেন, অন্য দিকে এনারা মিথ্যে কথাও বলতে চাইতেন না। তাই একটা যুক্তি ভিত্তিক আখ্যায়িকার মাধ্যমে বুঝিয়ে দিতেন।

ম্যক্সমুলারের অবদান

বেদের রচনাকাল নিয়ে অনেক মতবাদ আছে। সত্যি কথা বলতে কি বেদ কবে রচনা হয়েছে সঠিক ভাবে কেউই জানে না। তবে সবাই তাঁদের মতের পক্ষে অনেক জোরালো যুক্তি নিয়ে আসেন, আবার খুব ভালো করে বিচার বিশ্লেষণ করলে সব কটি মতেই অনেক ফাঁক-ফোকর বেরিয়ে আসে। প্রথম দিকে পাশ্চাত্যে বেদ জিনিসটা কেউ জানতই না। সেই সময় ভারতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এক ভয়ঙ্কর লুটপাটের রাজত্ব কায়েম করেছিল। বৃটিশ সরকারের কাছে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নামে অনেক আপত্তিজনক সংবাদ আসছিল, এরা ভারতকে লুট করে যাচ্ছে। ওরা তখন তড়িঘড়ি করে বৃটিশ সরকারকে বোঝাতে চাইল যে, আমরা ভারতে শুধু যে লুট করে যাচ্ছি তা নয়, ভারতের মঙ্গলের জন্যও অনেক কাজ করছি। ভারতের মঙ্গলের জন্য কি কাজ করছে? ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি সেই সময় ভারতের অনেক প্রাচীন গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ করার কাজে অর্থ ঢালতে শুরু করে। ১৮৩৫ সালে মেকলে ভারতের জ্ঞান ভাণ্ডার দেখে খুব হতবাক হয়ে যান। তিনি বলছেন, পাশ্চাত্যে যত লাইব্রেরী আছে তার আলমারির একটা তাক যদি নেওয়া হয়, ভারতের যা কিছু বিদ্যা আছে সবটাই ওই আলমারির একটা তাকেই শেষ হয়ে যাবে। সত্যি সত্যিই তখন আমাদের কাছে কিছু আছে কিনা কেউ জানতই না। অত হাজার হাজার পুঁথি কোথায় আছে কারুরই জানার কথা ছিল না, আর ব্রাহ্মণদের মাথায় অনেক কিছু রাখা থাকত ব্রাহ্মণরা আবার কোন কিছু কাউকে বলতেন না। যাই হোক এরপর ইস্ট ইণ্ডিয়া ভারতের সমস্ত পুঁথি সংগ্রহ করা আর তার অনুবাদ করার জন্য একটা বড় পরিকল্পনা নিলেন। এই কাজের জন্য তারা ম্যক্সমূলারকে নির্বাচিত করলেন। জন্ম থেকেই ম্যাক্সমূলারের স্বপ্ন ছিল সারা বিশ্বকে খ্রীশ্চান ধর্মের মধ্যে নিয়ে আস। ম্যাক্সমূলার সংস্কৃতটা শিখে নিয়েছিলেন। কিন্তু কাজে নামার পর ওনার মাথাটা গেল ঘুরে। ভারতের বিদ্যা সম্পদ দেখে তিনি কল্পনাই করতে পারছেন না যে, বিদ্যার এত বিশাল পরিধি হতে পারে। যাই হোক তিনি অনেক বন্ধু আর পণ্ডিতদের একত্রিত করে বেদ অনুবাদের কাজে নামলেন। পুঁথি সংগ্রহ করা থেকে শুরু করে বেদের অনুবাদ করা আর তাকে ছাপানোর কাজে তখনকার দিনেই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে কয়েক লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করতে হয়েছিল। বেদকে সংস্কৃত থেকে ইংরাজীতে অনুবাদ করার পেছনে ম্যাক্সমূলারের বিরাট অবদান। স্বামীজীও পরে তাঁর সঙ্গে গিয়ে দেখা করে নিজের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছিলেন। বেদের সংহিতার ইংরাজী অনুবাদ করেছিলেন গ্রিফিথ নামে একজন বড় পণ্ডিত। সংহিতার মূল সংস্কৃত আর ইংরাজী অনুবাদ যখন বেরিয়ে এল তখন তাই নিয়ে অনেক ঝামেলা শুরু হয়ে যায়। পাশ্চাত্য জগতের গোঁড়া পণ্ডিতরা বলতে শুরু করে দিল এত এত অর্থ ব্যয় করে এই ধরণের নিকৃষ্ট জিনিসকে প্রকাশ করার কোন

অর্থই হয় না। মাঝখান থেকে ম্যাক্সমূলারের সমস্যা হয়ে গেল, কারণ ইস্ট ইণ্ডিয়া থেকে তিনি প্রচুর অর্থ পাচ্ছিলেন। তাঁকে এখন দেখাতে হবে তিনি যা করছেন এগুলোর বিরাট মূল্য আছে। বেশি মূল্য দিলে খ্রীশ্চান ধর্মকে ছোট করা হয়ে যায়। ম্যাক্সমূলারের কাছে সব থেকে বড় সমস্যা হল খ্রীশ্চানদের মত, যে মতকে নিউটনের মত বিজ্ঞানীও বিশ্বাস করে চলছিলেন, পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে ৪০৩২ বিসিতে। আবার পাশ্চাত্যের কিছু কিছু খ্রীশ্চান বিজ্ঞানী হিসাব করে বলে দিলেন ওটা ৪০৩২ হবে না, সঠিক সাল হল ৪০২৮। পৃথিবীর জন্মের ক্যালকুলেশনে চার বছরের তফাৎটা এমন কিছু নয়। বর্তমানে বিজ্ঞানের এত উন্নতির পরেও খ্রীশ্চানদের মাথায় বসে আছে ভগবান ৪০৩২ বছর আগে সব কিছুর সৃষ্টি করেছিলেন। বিগ্ ব্যাঙ, ব্ল্যাক হোল ইত্যাদি বিজ্ঞানের যখন আবিষ্কার হতে শুরু করল তখন তারা আর হিসাব মেলাতে পারছে না। এখন ৪০৩২ সালে যদি সৃষ্টি হয়ে থাকে আর তারপর আপনি যদি বলেন ৪০০০ বছর আগে এই বেদ রচনা হয়েছে তাহলে খ্রীশ্চান ধর্ম কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। খ্রীশ্চান ধর্মের যা কিছু বিদ্যা সব ভগবান যীশুর কাছ থেকে এসেছে, তারপর কেউ যদি বলে দেয় ভারতে এই বিদ্যা চার হাজার বছর আগে থেকেই নিয়মিত চর্চিত হয়ে আসছিল, তাহলে সেই সভ্যতার ইতিহাস আরও কত বছরের হবে কেউই বলতে পারবে না। ছোটবেলা থেকে যাঁর স্বপ্ন ছিল সারা বিশ্বকে খ্রীশ্চান ধর্মের পতাকার নীচে নিয়ে আসা, সেই ম্যাক্সমূলার কি বলবেন বুঝে উঠতেই পারছিলেন না। অনেক কেঁদে কুঁকিয়ে তিনি বেদের রচনাকালকে ১৫০০ বিসিতে নিয়ে এলেন। ১৫০০ বিসিও যদি কেউ বলে দেয় তাতেই তো খ্রীশ্চান ধর্ম ধুয়ে মুছে বেরিয়ে যাবে। কারণ যীশুর জন্মের পনেরশ বছর আগে যদি বেদ রচিত হয়ে থাকে তার মানে খ্রীশ্চান ধর্ম তো কোথাও দাঁড়াবেই না। চার্চের পাদরি থেকে শুরু করে গোটা পাশ্চাত্য দুনিয়া থেকে ম্যাক্সমূলারের উপর সাংঘাতিক ধরণের আক্রমণ শুরু হয়ে যাওয়াটা অপ্রত্যাশিত কিছু নয়। শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে ম্যাক্সমূলার দুদিক থেকেই মার খেলেন, একদিকে খ্রীশ্চানরা গালাগাল দিল, ম্যাক্সমূলার একটা অপদার্থ লোক আমাদের খ্রীশ্চান ধর্মকেই শেষ করে দিল আর হিন্দুরা তাঁকে এই বলে গালাগাল দিল, যে বিদ্যা ভগবান সৃষ্টির সময় দিয়েছেন অর্থাৎ কোটি কোটি বছর আগেকার বিদ্যাকে ম্যাক্সমূলার বলে দিলেন ১৫০০ বিসিতে বেদ রচিত হয়েছে। অন্য দিকে লোকমান্য তিলকও অনেক যুক্তি দিয়ে বলে দিলেন বেদ আট হাজার বিসিতে অর্থাৎ দশ হাজার বছর আগে রচিত হয়েছে। স্বামীজী বলছেন, যে যাই বলুক, কিছু না হোক বেদ আট হাজার বছর আগে নিশ্চয়ই রচিত হয়ে গিয়েছিল। আট হাজার বছর আগে মানে ৬০০০ বিসি। বেদে আর্যদের নিয়ে যে বিতর্ক চলে আসছে এটাও বেদের কোন কোন ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। বেদের রচনাকাল আর্যদের ভারতে অনুপ্রবেশের কালের তত্ত্বের উপরে খুব বেশি নির্ভর করে। বেদে যে ধরণের সাহিত্যের প্রভাব দেখা যায় আর তখনকার মানুষের দৈনন্দিন জীবনচর্চার যে বর্ণনা বেদে পাওয়া যায় তার সাথে অনার্যদের জীবনচর্চার কোন ধরণের মিল পাওয়া যায় না, বেদের জীবনচর্চা অনার্যদের নয়। মহেঞ্জোদারো আর হরপ্পার আবিষ্কারের পর অবশ্য আর্যদের নিয়ে ইণ্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশান্ এই থিয়োরী সম্পূর্ণ ভাবে ভুল প্রমাণিত হয়ে গেছে। এখন এর নামই হয়ে গেছে হরপ্পান সিভিলাইজেশান্। কিন্তু হরপ্পা সভ্যতার ইতিহাস বেদের আগে না পড়ে এই নিয়ে আবার অনেক রকম মতবাদ তৈরী হয়ে গেছে। ইতিহাসবিদরা মেনে নিয়েছেন যে হরপ্পা সভত্যার ইতিহাস তিন হাজার খ্রীষ্টপূর্বের। এখানেই তো বেদের রচনাকাল পাঁচ হাজারের উপর চলে যাচ্ছে। কোন দিক দিয়েই পাশ্চাত্যের পণ্ডিতরা বেদের রচনাকালকে বাইবেলের রচনাকালের আগে নিয়ে যেতে না পেরে শেষ পর্যন্ত ম্যাক্সমূলার প্রথমেই যে ১৫০০ খ্রিষ্টপূর্ব বলে দিয়েছিলেন, সেটাকেই ধরে রইল, ওটাকে আর পাল্টাতে চাইল না।

আবার ইন্দো-ইউরোপিয়ান ভাষার মিল প্রচুর পাওয়া যায়। ভাষার অনেক গ্রুপ আছে, তার মধ্যে একটা হল ইন্দো-ইউরোপিয়ান ভাষা। সংস্কৃত, জুরাথ্রীষ্টদের পার্সি, লাতিন, যেখান থেকে ইংরাজী ভাষার উৎপত্তি হয়েছে, এই ভাষাগুলির মধ্যে প্রচুর মিল পাওয়া যায়। বাংলায় যেমন বাবাকে পিতা বলা হয়, সংস্কৃতে পিতা হয়ে যায় পিতৃ, আর লাতিনে হয়ে যায় প্যাটার (pater) এর রুট এক। ঠিক তেমনি মাকে সংস্কৃতে বলছে মাতৃ, লাতিন হয়ে যায় মাতের (metr), রাজাকে সংস্কৃতে বলছে রাজ্ঞঃ আর ওদের হচ্ছে regal, ধাতু একই। এই ধরণের হাজার হাজার শব্দ আছে, যা সংস্কৃতে আর ইন্দো-ইউরোপিয়ানের ভাষাতে সাযুজ্য পাওয়া

যায়। ভাষার এই ধরণের সাযুজ্যতা থেকে গবেষকরা স্থির সিদ্ধান্তে এসেছেন যে এদের পূর্বপুরুষরা একই হতে হবে। একটা ভাষা রয়েছে সুদূর ইউরোপে আরেকটা ভাষা ব্যবহার হচ্ছে ভারতে, কিন্তু এদের পূর্বপুরুষরা এক, তখন কোথাও কোথাও এদের একটা মিল থাকতেই হবে। বেদের প্রাচীনত্বকে বিচার করার ক্ষেত্রে এই ধরণের অনেক ধরণের তথ্য, ঘটনাকে মেলাবার দরকার। বেদের রচনাকাল বেদের পক্ষেই অত্যন্ত জরুরি কেননা আমরা যদি বলে দিই বেদ কালকের রচনা তখন কিন্তু বেদের অর্থ একেবারেই পাল্টে যাবে।

এইভাবে বেদের রচনাকালের তারিখ নির্ণয় করার পরেও অনেক ফাঁক ফোঁকর থাকার সম্ভবনা সব সময়ই থেকে যাবে। তবে আমরা স্বামীজীর কথাকে বেশি গুরুত্ব দিই, স্বামীজী বলে গেছেন বেদ কম করে সাত আট হাজার বছর আগে রচিত হয়েছে, আর ইউরোপের পণ্ডিতরা, বিশেষ করে ম্যাক্সমূলারের মতে বেদ যীশুর জন্মের পনের'শ বছর আগে, মানে সাড়ে তিন হাজার বছর আগে রচিত হয়েছিল। এই দুটোর মাঝামাঝি কোন সময়ে বেদের রচনাকালকে ধরে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু পরম্পরার উচ্চবর্ণের হিন্দুরা বলবে – যখন সৃষ্টি হয়েছে তখন থেকেই বেদ ভগবানের থেকে এসেছে, তার মানে বেদ রচনা হয়েছিল অনেক হাজার হাজার বছর আগে। আর যারা গোঁড়া হিন্দু তারা বেদের রচনাকালকে কয়েক লক্ষ বছর পেছনে নিয়ে যাবে। তাদের আবার নিজস্ব গ্রহ নক্ষত্রের হিসেব আছে, বিভিন্ন গ্রহ নক্ষত্রের গতিবিধি পর্যালোচনা করে তারা বলবে বেদের রচনা কয়েক লক্ষ বছর আগে হয়েছিল। বিভিন্ন পণ্ডিত একটা পদ্ধতিকে আঁকড়ে থাকে অন্য কোন কিছুকে বিচারের মধ্যে আনতে চাইবে না। আমাদের এগুলো নিয়ে কাঁটাছেড়া করা উদ্দেশ্য নয়, আমাদের কাছে যেটা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে বেদ হল ভারতে যা কিছু আছে তার সব কিছুর উৎস।

আরেকটা জিনিস পণ্ডিতরা বলেন তা হল, আমাদের যে বর্ণমালা গুলো প্রথম লেখা হয়েছিল ছ'শ বছর খ্রীষ্টপূর্বে। ভারতে অনেকগুলি বর্ণমালা পাওয়া যায় কিন্তু তার সবার জননী হল ব্রাহ্মী হরফ। এই কারণে ভারতের কিছু কিছু ভাষার বর্ণমালাতে যেমন বাংলা, আসামী, মণিপুরী বর্ণমালাতে অনেক মিল পাওয়া যায়। বেশির ভাগ বর্ণমালা যখন লেখা হয় তখন সেটা বাঁ দিক থেকে ডান দিকে লেখা হয়। আবার কিছু কিছু বর্ণমালা ডান দিক থেকে বাঁ দিকে লেখা হয়, যেমন উর্দু। ভারতেও আগে ডান দিক থেকে লেখা হত। কিন্তু পরের দিকে এই পদ্ধতিতে লেখাতে কিছু অসুবিধা হওয়ার জন্য ভারতে এর প্রচলন উঠে যায়। অন্য ভাবেও বর্ণমালাগুলিকে লেখার ক্ষেত্রে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়, যেমন ওপর থেকে নীচের দিকে লেখা, নামতাগুলি এইভাবে এখনও লেখা হয়ে থাকে। উর্দুকে ধরলে ভারতে এখন এই তিন ভাবেই লেখার পদ্ধতি চালু আছে।

বেদের ভাষার উচ্চারণের স্টাইলের সাথে স্থানীয় ভাষার উচ্চারণের স্টাইল আলাদা। বেদের শব্দগুলিকে তিন ভাবে উচ্চারণ হয় – উদাত্ত, অনুদাত্ত এবং স্বরিত। এই তিন রকম সুরে বেদের মন্ত্রগুলি উচ্চারণ করা হত, উদাত্ত মানে উঁচুতে সুর, অনুদাত্তে সুর নীচে আর স্বরিতের বেলায় সমান থাকে । লেখার মাধ্যমে এই তিন ধরণের উচ্চারণগুলিকে চিহ্নিত করার কোন উপায় নেই। অনেক পরে বিশেষজ্ঞরা বললেন – ব্রাহ্মী হরফের কোন পরিবর্তন করার দরকার নেই, এই তিনটি স্বরকে বোঝাবার জন্য অক্ষরের মাথার উপরে একটা (।) চিহ্ন দিয়ে উদাত্ত আর অক্ষরের নীচে (-) চিহ্ন দিয়ে অনুদাত্তের উচ্চারণকে ব্যবহার করলেন।

এছাড়া দ্বিতীয় যে সমস্যা হয়েছিল, বেদের মন্ত্রগুলিকে এতো পবিত্র ভাবা হত যে এগুলিকে কোথাও লিপিবদ্ধ করা হত না, যেমন দীক্ষার পরে বলে দেওয়া হয় গুরুর দেওয়া মন্ত্র কাউকে বলবে না, কোথাও লিখবে না। বেদের ক্ষেত্রে এই প্রথাটা অনেক দিন বজায় ছিল। ম্যাক্সমূলার যখন প্রথম বেদের পুঁথি সংগ্রহ করতে শুরু করলেন তখন তিনি বলে দিলেন যাঁরা বেদের পুঁথিগুলো লিখে দেবেন প্রত্যেকটি পুঁথির জন্য পাউণ্ড হিসাবে মূল্য ধরে দেওয়া হবে। তখন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির এজেন্টরা সারা ভারতে লোক নিয়োগ করল তন্ন তন্ন করে বেদের পুঁথি সংগ্রহ করতে। যেসব পুঁথি সংগ্রহিত হচ্ছে সেগুলিকে আবার পণ্ডিতদের দিয়ে তার আসলত্বকে যাচাই করে নেওয়া হত। এইভাবে পণ্ডিতদের দিয়ে মিলিয়ে মিলিয়ে বেদের পুঁথিগুলি প্রথম ছাপা হতে শুরু হল। প্রথমের দিকে ভারতের পণ্ডিতরা খুব নিন্দা করতে লাগল যে বেদ ম্লেচ্ছদের হাতে চলে গেল, বেদকে ছাপাতে দিতেও পণ্ডিতরা খুব আপত্তি করেছিল। কিন্তু ছাপা হয়ে বেরিয়ে আসার পর পণ্ডিতরা যার যার নিজের নিজের পুঁথিগুলিকে ছাপার সঙ্গে মেলাতে লাগলেন যে নিজেরটা ঠিক আছে কিনা। এর মধ্যে একটা

হয়েছিল যে বেশ কিছু পুঁথি পাওয়া যাচ্ছিল না, কিন্তু মন্ত্রগুলি ব্রাহ্মণদের মাথায় ছিল, পণ্ডিতরা মুখে বলে গেছেন আর কোম্পানির লোকেরা ঝরঝর করে লিখে নিয়ে পণ্ডিতদের দিয়ে আবার মিলিয়ে নিয়েছিল। এইভাবে বেদ ছাপা হয়ে বেরিয়ে এল।

মজার ব্যাপার হল, চারটে বেদের সংহিতাগুলি যখন সংগ্রহ করা হল, সে আসাম থেকেই হোক, কি সুদূর কন্যাকুমারি বা কাশ্মীর থেকেই হোক, সব ব্রাহ্মণরা বিভিন্ন কারণে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ছিটকে সরে গিয়েছিলেন, তাও কত হাজার বছর আগে, কিন্তু তা সত্ত্বেও কারুর বেদের শব্দগুলির উচ্চারণে কোথাও এতটুকু পার্থক্য পাওয়া যায়নি। একটা সামান্য ঘটনা আমি যদি একজনকে বলি, তার কাছ থেকে সেই ঘটনার বিবরণ আরেকজনের কাছে যখন যাবে তখন ঘটনাটা পাল্টে যায়। আর সাত আট হাজার বছর ধরে কেবল সংহিতারই প্রায় নব্বুই হাজার লাইন শুধু মাথার মধ্যে মুখস্ত রেখে ভারতের চার কোণের ব্রাহ্মণদের উচ্চারণের কোথাও এক চুল অমিল পাওয়া গেল না। এতো শুধু সংহিতার কথা বলা হল, এরপরেও ব্রাহ্মণ, আরণ্যক আর উপনিষদ রয়েছে। একটা মাত্রে বর্ণে তফাৎ পেয়েছিল, তাও সেটা স্বরিত হবে না উদাত্ত হবে এই নিয়ে মত পার্থক্য হয়েছিল। বিদেশীরা অবাক হয়ে গিয়েছিল হাজার হাজার বছর ধরে নব্বুই হাজার লাইন মাথার মধ্যে গেঁথে রয়েছে কিভাবে, তাও এক প্রান্তের ব্রাহ্মণ অন্য প্রান্তের ব্রাহ্মণদের মধ্যে কোন রকম পরিচয়ই নেই। আর এই বিদ্যাকে বংশের পরে বংশে হস্তান্তরিত হয়ে চলেছে। কঠোর নিয়মানুবর্তিতা, নিষ্ঠা আর সাধনা ছাড়া এ জিনিস কখনই সম্ভব নয়। ব্রাহ্মণরা আজেবাজে লোকদের সঙ্গে মিশতেন না, হবিষ্যান্ন খেতেন, টাকা-পয়সা রাখতেন না, কৃচ্ছ সাধন করে করে মন এতো পবিত্র হয়ে গিয়েছিল যে, আমরা এখন কল্পনাই করতে পারিনা। চারটে বেদকেই মুখস্ত করে রেখেছেন আজ এই রকম ব্রাহ্মণ পাওয়া খুব মুশকিল। এই কারণেও বেদকে অনেকে শ্রুতি বলেন, কখনই তাঁরা লিখতেন না, শুধু মুখস্ত করে মাথার মধ্যে পুরো বেদকে ধরে রেখেছিলেন। একাদশ শতাব্দিতে কাশ্মীর অঞ্চলে প্রথম বেদের পুঁথি পাওয়া গিয়েছিল। পুঁথি পাওয়া যাক আর নাই যাক সব মাথায় ধরে রাখা আছে, আর কারুর সাথে কোন তফাৎ নেই। পরের দিকে মহাভারতে কিছু তফাৎ পাওয়া যায়, উত্তর ভারতের মহাভারত আর দক্ষিণ ভারতের মহাভারতে প্রায় হাজার খানেক শ্লোকের তফাৎ। দক্ষিণ ভারতের মহাভারতে হাজার খানেক শ্লোক বেশি। কিন্তু বেদের ক্ষেত্রে কোথাও এতটুকু অমিল পাওয়া যাবে না, তাও আবার কোথাও লেখা ছিল না। আবার পণ্ডিতরা একে অপরকে জানে না চেনে না। এই হল আমাদের বেদ, কত শ্রদ্ধা, কত নিষ্টার সাথে বেদকে আমাদের পণ্ডিতরা সংরক্ষণ করে রেখেছিলেন।

আজ বেদ সবার জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। ম্যাক্সমূলারের জন্যই এটা সম্ভব হয়েছে। ম্যাক্সমূলার যদি বেদ না ছাপাতেন, ব্রাহ্মণ ছাড়া এই বেদ কেউ শুনবে কোন প্রশ্নই ছিল না। তবে রাজাদের কাছে বেদের কিছু পুঁথি সংগ্রহিত ছিল, সেগুলো অনেকে দেখতে পেতেন, আর কোন ভালো আধার পেলে গুরুরা বেদের কথা তাদের বলে দিতেন। চতুর্দশ শতক পর্যন্ত ব্রাহ্মণ ছাড়া বেদ পড়া কারুর পক্ষেই সম্ভব ছিল না। যদিও প্রথমের দিকে নিয়ম ছিল তিনটে বর্ণাশ্রমের লোকেরা বেদ পড়তে পারবে – ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় আর বৈশ্য। কিন্তু পরের দিকে ব্রাহ্মণরা কাউকে বেদ বলতেনই না। ব্রাহ্মণরা ছিলেন খুব দরিদ্র, যজ্ঞ-যাগের সময় ব্রাহ্মণদে ডাকা হত, রাজারা বিশেষ করে ব্রাহ্মণদের যে যজ্ঞ-যাগ করাতেন সেখানে যখন ব্রাহ্মণরা বেদের মন্ত্র উচ্চারণ করতেন তখনই কেউ কেউ বেদ শুনতে পেত। এছাড়া আর কোনভাবেই কেউ বেদ শুনতে পেতেন না।

বেদ মুখস্ত করার প্রাচীন কয়েকটি পদ্ধতি

ঋগ্বেদের দশটি ভাগ, এগুলিকে বলা হয় মণ্ডল, অনেকগুলি সুক্ত নিয়ে একেকটি মণ্ডল, আর কয়েকটা মন্ত্র নিয়ে সুক্ত হয়। বেদের প্রথম মন্ত্র – *অগ্নিমীঢ়ে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্। হোতারং রত্নধাতমম্।*। প্রথম সুক্তে নটি মন্ত্র আছে। ঈঢ়ের ‘ঢ়’ ‘ꣳ’ সংস্কৃতেই একমাত্র এই অদ্ভুত বর্ণের ব্যবহার হয়, এর উচ্চারণও লোকেরা এখন ভুলে গেছে, এটাকে ‘রল’ য়ের মত দেখালেও ল উচ্চারণ হবে না। সংস্কৃতে ‘ঋ’ উচ্চারণ প্রচণ্ড কঠিণ, ইংরেজীতে হৃষিকেশকে ঠিক ঠিক উচ্চারণ করলে ‘হৃ’কে বানান করে লিখতে গেলে লেখা হয় hrui, কিন্তু যখন ‘ঋ’ একা থাকবে তখন উচ্চারণ করতে গেলে rui ‘উ’ দিয়ে শুরু হয়ে ‘ই’ তে গিয়ে শেষ হয়।

ঠিক তেমনি 'জ্ঞ'র উচ্চারণও খুব কঠিণ আসলে 'জ্ঞ'এর মধ্যে 'জ' আর 'ণ' রয়েছে, সেইজন্য ইংরাজীতে লেখা হয় 'jn'। ঠিক সেই রকম এখানে 'ঈড়ে'র 'র' আর 'ল' মিলিয়ে উচ্চারণ হবে, খুবই কঠিণ ব্যাপার সাধ্য। অনেক সংস্কৃত পণ্ডিত এটাকে 'ল' উচ্চারণ করবে আবার অনেক পণ্ডিত বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতের পণ্ডিতরা 'ড' উচ্চারণ করেন। সংস্কৃতে এই ধরণের কিছু কিছু উচ্চারণ আছে যেগুলো আজকাল কেউ আর ঠিক ঠিক উচ্চারণ করতে পারে না, এখন এই ধরণের অক্ষরও আর কোন ভাষাতে পাওয়া যাবে না।

অগ্নিমীঢ়ে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্। হোতারং রত্নধাতমম্।। এটাকেই টানা উচ্চারণ করাকে বলা হয় সংহিতা পাঠ। সংহিতা পাঠের পর, মন্ত্রগুলিকে মুখস্ত করার জন্য প্রত্যেকটা শব্দকে ভেঙ্গে আলাদা আলাদা করে উচ্চারণ করে পাঠ করান হয়, কোন সন্ধি তখন থাকবে না, এটাকে বলে পদপাঠ। পদপাঠে এই মন্ত্রকে বলবে – *অগ্নিম্ ঈড়ে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবম্ ঋত্বিজম্* - সন্ধি যেখানে যেখানে থাকবে সেটাকে ভেঙ্গে আলাদা করে উচ্চারণ করা হয়। আমি যদি বলি – এখন আমি বেদ পাঠ করছি। তখন আমাকে জিজ্ঞেস করা হবে – কি পাঠ করছ, সংহিতা পাঠ না পদপাঠ করছ? সংহিতা পাঠে আমাকে টানা মুখস্ত করে যেতে হয়, এতে প্রথমের দিকে উচ্চারণে ভুল হবে। সেইজন্য পরের ধাপে পদপাঠ করান হয়। পদপাঠের পরে ঘনপাঠ। ঘনপাঠের খুব জটিল নিয়ম আছে, এখানেও সন্ধি ভেঙ্গে উচ্চারণ করা হয়। আমরা বর্তমান মন্ত্রের প্রথম চারটে শব্দকে চারটে ভাগে বিভক্ত করে নিলাম – ক, খ, গ ও ঘ। ঘনপাঠে বলবে ক+খ, খ+ক মানে প্রথমে বলবে অগ্নিম্(ক) ঈড়ে(খ), তারপরে বলবে ঈড়ে(খ) অগ্নিম(ক)। তারপরে ক, খ ও গ, তারপরে করবে খ+গ, গ+খ, ক+খ+গ। পরের ধাপে আসবে খ+গ+ঘ, গ+ঘ, ঘ+গ, খ+গ+ঘ। শেষে আবার ক+খ+গ+ঘ। এখন এই মন্ত্রে প্রথম চারটে শব্দ হচ্ছে – অগ্নিম্(ক) ঈড়ে(খ) পুরোহিতং(গ) যজ্ঞস্য(ঘ) – এর ঘনপাঠ কিভাবে হবে – অগ্নিম্ – অগ্নিম্ ঈড়ে – ঈড়ে অগ্নিম্ – অগ্নিম্ ঈড়ে – ঈড়ে পুরোহিতম্ – পুরোহিতম্ ঈড়ে – অগ্নিম ঈড়ে পুরোহিতম্ – পুরোহিতম্ যজ্ঞস্য – যজ্ঞস্য পুরোহিতম্ - ঈড়ে পুরোহিতম্ যজ্ঞস্য – অগ্নিম্ ঈড়ে পুরোহিতম্ যজ্ঞস্য – এইভাবে ঘনপাঠের মাধ্যমে বেদের সব মন্ত্রগুলি শিষ্যদের মুখস্ত করান হত।

তারপরে আরেক ধরণের পাঠ হয় যার নাম অনুক্রমণী পাঠ। অনুক্রমণী পাঠ হল সূচীপত্র পাঠের মত, ওপর থেকে প্রথম শব্দকে ধরে নীচের দিকে পাঠ করবে। যেমন ঋগ্বেদের প্রথম সুক্তে নটি মন্ত্র আছে এই নটি মন্ত্রের নটি লাইনের প্রথম শব্দগুলি ওপর থেকে নীচে পরপর পাঠ করবে – অগ্নিম্ অগ্নিঃ অগ্নিনা অগ্নে, অগ্নিহোতা যদ্ উপ রাজন্ত স। মন্ত্র যাতে ভুলে না যায় তার জন্য বিভিন ভাবে খুব বিজ্ঞান সম্মত ভাবে মুখস্ত করান হত। এভাবে প্রত্যেকটি বেদের Indexing ব্রাহ্মণদের ঝাড়া মুখস্ত থাকত। সেইজন্য কোন মন্ত্রকে ভুলে যাবার কোন ধরণের সম্ভবনাই ছিল না। ৩২ বছর ধরে ব্রাহ্মণরা শুধু বেদ মুখস্ত করেই যেতেন। তার পরের ৩২ বছর বেদ মুখস্ত করাতেন, এভাবেই তাঁরা তাঁদের জীবনকে বেদের জন্য উৎসর্গ করে হাজার হাজার বছর ধরে বেদকে ধরে রেখেছেন, সেইজন্য এখনও আমরা বেদ অধ্যয়ন করার সুযোগ পাচ্ছি।

সমগ্র বেদ, শুধু ঋগ্বেদের সংহিতাতে তিরিশ হাজার লাইন, এই ভাবে সামবেদ, যজুর্বেদ ও অথর্ববেদে যা কিছু আছে ব্রাহ্মণরা মুখস্ত করতেন। আমাদের একটা মন্ত্র মুখস্ত করতেই ঘাম ছুটে যাচ্ছে, অথচ তখনকার ব্রাহ্মণরা সমগ্র বেদ মুখস্ত করতেন, শুধু একভাবে মুখস্ত করতে না, সংহিতা পাঠ, ক্রমপাঠ, পদপাঠ, ঘনপাঠ এই রকম পাঁচটি বিভিন্ন পদ্ধতিতে পুরো বেদ মুখস্ত করতে হত। বেদ মুখস্ত করার জন্য একজন ব্রাহ্মণ সন্তানকে গুরুগৃহে বত্রিশ বছর পড়ে থাকত হত, কল্পনা করা যায়! যার ফলে প্রথম থেকে বেদ যেমনটি ছিল আজ পর্যন্ত ঠিক তেমনটি আছে। ভারতের বিভিন্ন জায়গা থেকে বেদের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করে অক্সফোর্ডে গিয়ে বসলেন, তারপর পুরো বেদ ছাপা হতে শুরু হল। এই প্রথম সমগ্র বিশ্ব অবাক হয়ে দেখছে, কাশ্মীরের ব্রাহ্মণের কাছ থেকে পাণ্ডুলিপি নেওয়া হয়েছে, কন্যাকুমারীর ব্রাহ্মণের কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে, এইভাবে পূর্ব ভারত আসাম থেকে আবার পশ্চিম ভারতের গুজরাট থেকে পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করে এক জায়গায় জড়ো করা হয়েছে, কারুর পাণ্ডুলিপিতে কোথাও একটা অমিল পাওয়া যায়নি। অথচ কাশ্মীরের ব্রাহ্মণ জানেই না যে আসামে ওই রকম একটা পরিবার আছে। আসামের ব্রাহ্মণও জানেই না যে কাশ্মীরে এই রকম একটা পরিবার আছে। অথচ পুরো জিনিসটা মাথায়, কারণ কোনটাই লিখিত কিছু নেই। ম্যাক্সমূলারের লোকরা গিয়ে ব্রাহ্মণদের

বলছেন, আপনারা বলুন আমরা লিখে নিচ্ছি। চট চট করে লিখে নিয়ে ইংল্যাণ্ডে পাঠাচ্ছে। সবারটা মেলাতে গিয়ে দেখছে কারুর সাথে কোথাও কোন পার্থক্য নেই। কত হাজার বছর ধরে ব্রাহ্মণরা মাথায় বহন করে চলেছেন? ভগবান জানেন। পাঁচ হাজার না ছয় হাজার, না সাত হাজার বছর ধরে, কেউ জানে না। কোন লাইব্রেরিতে গিয়ে চারটে বেদের চেহারাটা একবার দেখার পর ভাবুন, এই বিশাল বেদ পাঁচটা পদ্ধতিতে মুখস্ত করে পুরো বেদকে মাথায় ধরে রেখেছেন। এরপর নিজের ছেলেকে শেখাচ্ছেন, তারপর শিষ্যদের শেখাচ্ছেন, তাঁরা আবার নিজের ছেলে আর শিষ্যদের শেখাচ্ছেন। এই করে পুরো বেদকে পাঁচ থেকে সাত হাজার ধরে টেনে নিয়ে চলেছেন। আর এই পরিবারের সাথে ওই পরিবারের কোন সংযোগ নেই। আর যখন মুখ থেকে বেরোচ্ছে কারুর সাথে কোথাও কোন অমিল নেই। এই ব্রাহ্মণদের আবার আমাদের বুদ্ধিজীবিরা কত নিন্দাবাদ করে। এদের কোন ধারণাই নেই। স্বামীজী বলছেন, এই ব্রাহ্মণরা না থাকলে কবেই ভারত মুসলমানদের দেশ হয়ে যেত। ম্যাক্সমূলার ভারত থেকে কয়েকজন শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে লণ্ডনে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেই সময় পাণ্ডুলিপি থেকে বই ছাপা হচ্ছিল। ছাপা কাগজগুলো তিনি ব্রাহ্মণদের দেখাচ্ছেন, ছাপা দেখেই ব্রাহ্মণরা বলে দিচ্ছেন এখানে এই ভুল আছে। অক্ষরে কোন ভুল নেই, উদাত্ত অনুদাত্তে ভুল। পাণ্ডুলিপির সাথে মিলিয়ে দেখা যাচ্ছে, ঠিক ওই জায়গাতেই ভুল আছে। ম্যাক্সমূলারকে প্রুফ রিডিংও করতে হচ্ছে না। ম্যাক্সমূলারের একটা খুব নামকরা লেখা আছে (India: What can it teach us),তাতে উনি বলছেন I have some students at Oxford, who not only could repeat these hymns but who repeated them in proper accents and when looking through my printed edition of Rigved could point out a misprint without a slightest hesitation। ছাপা বই দেখে ব্রাহ্মণরা উচ্চারণ করেই বলে দিচ্ছেন আপনার এই জায়গাতে ভুল আছে। ম্যাক্সমূলার জানতেন এই রকম হয়, কিন্তু চাক্ষুস কখন করেননি। তিনি চোখে দেখেই তাজ্জব বনে গেছেন। যখন তিনি বেদ ছাপতে শুরু করেছেন তখন লোকেরা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। ব্রাহ্মণরা বেদ ছাপা অবস্থায় কখন দেখেননি, পুরোটাই তাঁদের মাথার মধ্যে ধরে রাখা ছিল। এখনও ব্রাহ্মণরা মুখস্ত করে যাচ্ছেন। ইদানিং অবশ্য বেশির ভাগই স্কুল হয়ে গেছে। মুখস্ত করতে গিয়ে কোথাও তাঁদের যেন ভুল না হয় সেইজন্য পাঁচ রকম পদ্ধতিতে তাঁরা পুরো বেদ মুখস্ত করতেন, যার ফলে কোথাও ভুল হওয়ার কোন সম্ভবনাই থাকত না। ঋগ্বেদের সংহিতায় তিরিশ হাজার লাইন, তার মানে পনের হাজার মন্ত্রের কাছাকাছি। শুধু ঋগ্বেদের সংহিতায় পনের হাজার মন্ত্র, যদিও ঋগ্বেদ সব থেকে বড়। গীতায় মাত্র সাতশটি শ্লোক, তাতেই আমরা হিমসিম খেয়ে যাই। ম্যাক্সমূলার বর্ণনা করছেন, যখনই কোন শিষ্য গুরুগৃহে যায় সেখানে তাঁরা প্রথম অবস্থায় আট বছর থাকে। কয়েকটি দিন বেদ অধ্যয়ন বন্ধ থাকত, যেমন প্রতিপদে পাঠ হবে না। চান্দ্রমাসের হিসাবে বছরে তিনশ ষাট দিন ধরলে আট বছরে আটাশ’শ আশি দিন হয়, তার মধ্যে মোট তিনশ চুরাশি দিন বেদ অধ্যয়ন করা হয় না। এইভাবে মোটামুটি পঁচিশ’শ দিন বেদ অধ্যয়নের জন্য পাওয়া যেত। এই কটি দিনে তাঁদের এই তিরিশ হাজার লাইন মুখস্ত করতে হচ্ছে। তার মানে গড়ে বারোটি করে লাইন মুখস্ত করতে হত। শুধু বারোটা লাইন বললেই হবে না, বারো গুণিতক পাঁচ, কারণ পাঁচটা বিভিন্ন স্টাইলে মুখস্ত করতে হচ্ছে। সেইজন্য একদিকে দিয়ে মুখস্ত করে যাচ্ছেন অন্য দিকে দিয়ে আগের গুলো ভুলে যাচ্ছেন, এই জিনিসটা হবে না। এইভাবে শুধু ঋগ্বেদ সংহিতাকে তাঁরা আট বছর ধরে মুখস্ত করে যাচ্ছেন। এরপর বাকি তিনটে বেদ একই পদ্ধতিতে আট বছর ধরে মুখস্ত করে যেতেন। আট গুণিতক চার মোট বত্রিশ বছর বেদ মুখস্ত করার জন্য গুরুগৃহে পড়ে থাকতেন। আট বছর বয়সে গুরুগৃহে যেতেন আর চল্লিশ বছর বয়সে গৃহস্থাশ্রমে এসে ঘর-সংসার করতেন। বিদ্যার জন্য ব্রাহ্মণরা এই ত্যাগ করে এসেছেন আর পাঁচ-ছ হাজার বছর ধরে বেদকে ধরে রেখেছেন। আজকে বিদেশে যে বিদ্যার সম্মান শুধু বেদের জন্যই এই সম্মান। এই হল ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য।

আমাকে যদি কেউ এক কোটি টাকা দিয়ে বলে – এই টাকা আমি আপনার নামে ব্যাঙ্কে রেখে দিলাম, কিন্তু আপনি এই টাকাতে কখন হাত দিতে পারবেন না। এই টাকাতে আমার কি লাভ? বাচ্চাকে দুটো টাকা দিয়ে মা মেলায় পাঠিয়ে বলে দিল – টাকাটা কিন্তু খরচ করিস না। বাচ্চার কাছে এই দুটো টাকা থাকাও যা

না থাকাও একই ব্যাপার। বেদ আমরা কেউ শুনতে পারব না, ছুঁতে পারব না, জানতে পারব না, এই বেদ থাকলেই বা কি আর না থাকলেই বা তাতে আমাদের কি হবে। কারণ আমাদের কোন কাজেই তো বেদ লাগছে না। সেইজন্য আমাদের দিকে তাকিয়ে মুনি ঋষিরা এক নতুন ধরণের শাস্ত্র রচনা করলেন। এইভাবে রচিত হল রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণের মত যাবতীয় ধর্মীয় সাহিত্য। বেদ লেখাতে নিষেধ ছিল, কিন্তু এগুলোর ক্ষেত্রে লেখার কোন বাধা ছিল না। তার ফলে বেদের ব্যাপারে অনেক সমস্যা দূর হয়ে গেল। বেদকে প্রথম থেকেই যে কোন কারণেই হোক, গুরুর আজ্ঞাতেই হোক বা গভীর উচ্চ আধ্যাত্মিক দর্শনের জন্যই হোক, অত্যন্ত পবিত্র গ্রন্থ রূপে দেখা হত। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ রচনার পর বেদের পবিত্রতা নিয়ে যে কেউ প্রশ্ন করবে সেটাও করতে পারল না, কারণ মুনি ঋষিরা বলে দিলেন পুরাণে যা আছে বেদেও তাই আছে, রামায়ণ মহাভারতে যা আছে বেদেও তাই আছে। সাধারণ মানুষের মনে বেদের ব্যাপার তাই কোন কৌতুহল রইল না।

মানুষ প্রথমের দিকে ভাবে জীবনে আমি একটু বড় হব। কিন্তু কিছু দিন সংগ্রাম করার পর ভাবে – না বাবা, যেমন আছি বেশ আছি। মানুষ সব সময় মনে করে সে নিজে খুব সুখে স্বাচ্ছন্দে আছে আর অপরের যে সমস্যা সেটা তার কাছে ভীতিকর। বেদের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হল। বত্রিশ বছর খেটেখুটে বেদ মুখস্ত করতে হবে, আর তার থেকে সহজেই যদি সেটা পুরাণ, মহাভারতে পেয়ে যাই তাহলে অত কষ্ট করে বেদ মুখস্ত করতে যাব কেন। ফলে ব্রাহ্মণদের কেউ জোর করে বলতেই গেল না যে বেদে কি আছে তোমাকে বলতেই হবে। বেদেকে এই ধরণের আক্রমণের সামনে পড়তেই হলো না। এটা অবশ্য ঠিকই যে বেদে কি আছে সেটা পরে উপনিষদে, মহাভারতে আমরা পেয়ে যাই।

বেদ ও বেদব্যাস

বেদের দৃশ্যপটে ব্যাসদেব কবে এসেছেন এই নিয়েও অনেক বিতর্ক আছে, কেউ বলে এক হাজার খ্রীষ্টপূর্ব আবার কেউ বলে দেড় হাজার খ্রীষ্টপূর্বে এসেছিলেন। কিন্তু এর বেশী আগে তাঁর আসার কথা নয়। ব্যাসদেবের কাছে যখন বেদ এসেছে তখন বেদ বিশালাকার হয়ে গেছে। তিনি দেখলেন মানুষের এইতো ক্ষুদ্র জীবনে, এই ক্ষুদ্র জীবনে এই বিশাল বেদ কখন মুখস্ত করবে! আর মুখস্ত করে বেদকে জীবনে প্রয়োগ করবে কীভাবে? বলা হয় চারটে বেদ আগে একটার মধ্যেই ধরে রাখা হয়েছিল। এখন যদি বলা হয় যারাই সারাটা জীবন স্বামীজীর কাজে উৎসর্গ করবে তাদের সবাইকে স্বামীজীর দশ খণ্ড রচনাবলী মুখস্ত করতে হবে। একজনের পক্ষে এটা কখনই সম্ভব হবে না। তাই প্রত্যেকের মধ্যে ভাগ করে দিয়ে বলে দেওয়া হল তুমি প্রথম খণ্ড, আমি দ্বিতীয় খণ্ড, আরেকজন তৃতীয় খণ্ড মুখস্ত করবে, এইভাবে দশটি খণ্ডই সবার মধ্যে ভাগ করে যার যার খণ্ড মুখস্ত করতে বললে আর কোন সমস্যা হবে না। ব্যাসদেবও ঠিক তাই করলেন তিনি বেদকে বিভাজন করে দিলেন। বিভাজন করে তিনি তাঁর শিষ্যদের মধ্যে ভাগ করে দিয়ে মুখস্ত করাতে লাগলেন। ঋগ্বেদ দিলেন তাঁরই এক শিষ্য পৈলাকে, যজুর্বেদ দিলেন বৈশম্পায়নকে। পুরাণ, মহাভারতেও আমরা বৈশাম্পয়নের নাম অনেকবার উল্লেখ দেখতে পাই। সামবেদ দিলেন জৈমিনীকে, জৈমিনীও বিরাট বড় ঋষি ছিলেন, তিনি পূর্বমীমাংসার সূত্রগুলি রচনা করেছিলেন। আর অথর্ববেদ সুমন্তকে দিলেন।

পরের দিকে বৈশাম্পয়নের শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্যের সাথে গুরুর যে বিবাদ হয়েছিল সেই কাহিনী আগেই বলা হয়েছে। এখানে যজুর্বেদ কৃষ্ণযজুর্বেদ ও শুক্লযজুর্বেদ নামে দু ভাগে ভাগ হয়ে যায়। যাজ্ঞবল্ক্যের এই কাহিনী ভারতের আধ্যাত্মিক জগতে খুব গুরুত্বপূর্ণ। লোকেরা একে খুব বেশি গুরুত্ব দেননা কারণ শুক্লযজুর্বেদ আর কৃষ্ণযজুর্বেদের বিষয়বস্তুর মধ্যে খুব একটা পার্থক্য নেই। কিন্তু এর সুক্ত আর মন্ত্রগুলি যেভাবে সাজানো হয়েছে তার মধ্যে অনেক পার্থক্য দেখা যায়। এই পার্থক্য দেখে পরিষ্কার বোঝা যায় যে দুটো পুরো আলাদা পরম্পরা থেকে এসেছে। যাজ্ঞবল্ক্য এত বড় ঋষি ছিলেন, বৃহদারণ্যক উপনিষদ পুরোটাই যাঁর উপর দাঁড়িয়ে আছে, এটা কখনই বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে না যে তিনি যজুর্বেদের কয়েকটা অধ্যায়কে একটু এদিক ওদিক করে দিয়ে সবটাই নিজের নামে চালিয়ে দেবেন। তিনি এই বিদ্যাকে ত্যাগ করেছিলেন কিন্তু পরে সূর্যের তপস্যা করে সূর্যের কাছ থেকে সরাসরি এই বিদ্যা আবার অর্জন করেছিলেন। ঠাকুর যেমন মা ভবতারিণীর কাছ থেকে

আদেশ পেয়েছিলেন 'তুই ভাবমুখে থাক'। 'ভাবমুখে' বলে কোন শব্দ কোন দর্শনেই পাওয়া যাবে না। সাক্ষাৎ মাকালী এসে শ্রীরামকৃষ্ণকে অনেক কথাই বলেছিলেন, কিন্তু সব কথা লিপিবদ্ধ হয়নি, ঠাকুরও সবাইকে বলে যাননি, কিন্তু ভাবমুখে থাকার যে আদেশ মাকালীর কাছ থেকে পেয়েছিলেন তা লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। সূর্যের কাছ থেকে সরাসরি যেমন যাজ্ঞবল্ক্য পেয়েছিলেন, ঠিক একই ভাবে ঠাকুর মার কাছ থেকে ভাবমুখে থাকার ব্যাপারটা পেয়েছিলেন। এই রকম আরেকটা ঘটনা আমরা স্বামীজীর জীবনেও দেখতে পাই। স্বামীজী তখন আমেরিকাতে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছেন। সেই সময়কার একটা ঘটনা স্বামীজী অনেক জায়গাতেই উল্লেখ করে গেছেন। রাত্রিবেলা শুয়ে শুয়ে ভাবছেন আগামীকাল বক্তৃতায় কি বলব। ভাবতে ভাবতে তিনি ঘুমিয়ে পড়তেন, ঘুমের মধ্যে দেখতেন কে যেন এসে তাঁকে ঘুমের মধ্যেই আগামীকাল কি বলবেন সেটা অনর্গল ভাবে বলে চলে গেলেন। স্বামীজী যে বাড়ীতে থাকতেন তারা সকালবেলা এসে স্বামীজীকে জিজ্ঞেস করত 'স্বামীজী আপনি রাত্রিবেলা কার সাথে কথা বলছিলেন, কিন্তু আপনার ঘরের দরজা বন্ধ, লাইট নেভানো'? একজন দৈবী সত্তা যে স্বামীজীর ভাষণ আগে থেকে বলে দিচ্ছে এটা সত্যিই হয়। আমরা এখন বেদ অধ্যয়ন করছি, বেদের মধ্যে এরকম অনেক কিছু পাই যেটা ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর জীবনেও পুনারবৃত্তি হয়েছিল, এগুলো জানা থাকলে আমাদের বেদ বুঝতে অনেক সহজ হয়ে যায়। যাজ্ঞবল্ক্যও যদি সূর্য থেকে এই বিদ্যা পেয়ে থাকেন এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

উপনিষদেও আমরা এর অনেক সাক্ষ্য পাই। সত্যকাম ঋষির এভাবেই জ্ঞান হয়েছিল। সত্যকামকে গুরু কয়েকটা রুগ্ন গরু সহ জঙ্গলে পাঠিয়ে বলে দিলেন 'এই গরুগুলো তুমি লালন পালন করবে, হাজারটা গরু যখন হয়ে যাবে তখন তুমি আমার কাছে এসো'। এভাবেই গুরুরা শিষ্যদের কাজ করিয়ে মনকে শুদ্ধ করতেন। সত্যকামও গুরুর আদেশে জঙ্গলে দশ বারো বছর ধরে গরুর দেখাশোনা করছে। হঠাৎ একদিন গরুর প্রধান ষাঁড় বৃষভ এসে সত্যকামকে বলছে 'সত্যকাম আমরা সংখ্যায় হাজারটা হয়ে গেছি, এবার গুরুগৃহে চলো' এই কথা বলে সত্যকামকে ব্রহ্মজ্ঞানের একটা উপদেশ দিল। উপদেশ দিয়ে বলছে 'এর পর বাকীটা রাত্রে অগ্নি তোমাকে বলবে'। রাত্রে অগ্নি একটা উপদেশ দিয়ে বলছে 'এর পর বাকীটা তোমাকে সকালে অমুক পাখি উপদেশ দেবে'। সকালে একটা পাখি তাকে বাকি উপদেশটা দিল। পরে সত্যকাম হাজারটা গরু নিয়ে গুরু গৃহে প্রত্যাবর্তন করেছে। গুরু সত্যকামকে দেখেই বুঝে গেছেন সত্যকাম ব্রহ্মজ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত। তিনি জিজ্ঞেস করছেন 'সত্যকাম! তোমাকে ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ কে দিল, তোমার চেহারা ব্রহ্মজ্ঞানের জ্যোতিতে আলোকিত'? সত্যকাম বলছে 'আমাকে তো কেউ উপদেশ দেননি, আর আপনাকে ছাড়া আমি কাউকে জানিও না'। তার ব্রহ্মজ্ঞান হয়ে গেছে, চেহারা জ্বলজ্বল করছে, কিন্তু সে জানে না যে এটাই ব্রহ্মজ্ঞান, সেটাও সে বুঝতে পারছে না। বৃষভ, অগ্নি আর পাখি যে উপদেশ দিয়েছিল সত্যকামকে তার সবটাই উপনিষদে লেখা আছে, আমরা সেই উপদেশ কতবার পড়ছি কিন্তু আমাদের ব্রহ্মজ্ঞান হচ্ছে না কেন? সত্যকামের কেন হল? কারণ বারো বছর ধরে সত্যকাম যে গুরুসেবা করল, এই গুরুসেবা করে করে তার মন শুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, আর যেই ঐ বীজটা পড়ল দপ্ করে ব্রহ্মজ্ঞানের আলোটা জ্বলে গেল। যারা কাজ করে না, খাটতে চায় না তাদের দ্বারা কোন দিনই হবে না। আর যারা কাজ করে কিন্তু নিষ্কাম ও অনাসক্ত হয়ে করে না, তাদের দ্বারাও কোনদিন হবে না। কর্ম করতে হবে, নিষ্কাম ভাবে সেই কর্ম করতে হবে, অনেক বছর ধরে করতে হবে, তারপর গুরুর একটা ছোট্ট কথা যেই কানে যবে 'তত্ত্বমসি' তখনই তার উপলব্ধি হয়ে যাবে। সত্যকামকে তত্ত্বমসি বলা হয়নি, সেখানে দিক সমুদয় ব্রহ্ম এই তত্ত্ব শুনিয়েছিল। সেইজন্য বেদে যে আমরা পাই উপদেশ যে কোন ভাবে আসতে পারে, আমাদের কাছে এটা নতুন কিছু নয়। বিদেশীদের কাছে বুঝতে অসুবিধা হয়। মহম্মদের ক্ষেত্রেও একই জিনিস ঘটেছিল, হীরা পর্বতে দেবদূত এসে তাঁকে উপদেশ দিয়েছিল।

ব্যাসদেব বেদকে প্রথম তিনটে ভাগে বিভক্ত করলেন – ঋক্, ঋক্ এক ধরণের মন্ত্রের উচ্চারণ, সেগুলোকে সব ঋগ্বেদের মধ্যে রাখা হয়েছে, সাম – বেদের কিছু মন্ত্র আছে যেগুলোকে সুরারোপিত করে গান করা যায়, সেই মন্ত্রগুলিকে সামবেদে রাখা হল, বেদে যত গদ্যরূপ আছে সেগুলোকে যজুর্বেদে রাখা হল। এর মধ্যে কিছু কিছু তথ্যমূলক কথাও বলা হয়েছে। অথর্ববেদ – বেদের সব কিছু নিয়ে একটা সম্পূর্ণ অন্য শ্রেণীর

তথ্য ও তত্ত্বে সমন্বিত। এগুলোকে বলা হয় ছন্দ, পদ্য বা গানে যে ছন্দ আমরা জানি, এখানে সেই ছন্দের কথা বলা হচ্ছে না।

ত্রয়ী কথার অর্থ তিন। বেদে এই ত্রয়ীর অর্থ, যজ্ঞের সময় যখন আসল আহুতি দেওয়া হয় তখন তিনজন প্রধান পুরোহিতের দরকার, এই তিন জন পুরোহিতরা হলেন ঋকবেদীয়, সামবেদীয় ও যজুর্বেদীয় পুরোহিত। এখানে অথর্ববেদের ভূমিকা খুব কম। এটাকে ভিত্তি করে পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা বলে দিলেন অথর্ববেদ পরে লেখা হয়েছে। কিন্তু পরম্পরা সূত্রে যে তথ্য পাই তাতে চারটে বেদকে আমরা এখন যেভাবে পাচ্ছি সেটা ব্যাসদেব এভাবেই বিভাজন করে গেছেন, আরও পরে তিনি অথর্ববেদ সুমন্তকে শিক্ষা দিলেন, এই তথ্যগুলি পাশ্চাত্যের ধারণার উল্টো কথাই বলছে।

অথর্ববেদের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা আরেকটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যকে ভুলে যান। যে কোন যজ্ঞে মোট চারজন পুরোহিত থাকবে, প্রথম তিন জনের কাজের কথা আগে বলা হয়েছে। অথর্ববেদের পুরোহিতকে বলা হয় ব্রহ্মা। ব্রহ্মা হলেন সমগ্র যজ্ঞের সমস্ত কর্মের সাক্ষী রূপে সব দেখাশোনা করেন। ব্রহ্মা দেখবেন যজ্ঞের সব কিছু ঠিকঠাক চলছে কিনা। ব্রহ্মার এই ভূমিকাকে এখন তন্ত্রধারক রূপে তন্ত্র গ্রহণ করেছে। বৈদিক যজ্ঞে ব্রহ্মার গুরুত্ব এত বড় ছিল যে যা কিছু প্রণামী, দক্ষিণা পড়বে তার অর্দ্ধেক ব্রহ্মার প্রাপ্য ছিল, আর বাকী অর্দ্ধেক তিন জনের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হত। এখন পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতে যদি অথর্ববেদ পরে লেখা হয়ে থাকে আর অথর্ববেদ অনেক পরে বেদের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়ে থাকে এবং যদি অথর্ববেদের গুরুত্ব অন্যান্য বেদ থেকে অনেক কম হয় তাহলে অথর্ববেদের পুরোহিতকে যজ্ঞের প্রধান পুরোহিত কেন করা হবে? শুধু তাই নয়, যজ্ঞে যত দক্ষিণা পড়বে তার অর্দ্ধেক অথর্ববেদের পুরোহিতের প্রাপ্য, অথর্ববেদের গুরুত্ব যদি কম হত তাহলে বাকি তিনটি বেদের পুরোহিতরা কি অত সহজে এটা মেনে নিতেন?

ঋগ্বেদে মোট দশটি মণ্ডল আছে। বাইবেলে মণ্ডল গুলি Book-1, Book-2, এই ভাবে আছে। প্রত্যেকটি মণ্ডলে অনেকগুলি করে সুক্ত রয়েছে, আর প্রত্যেকটি সুক্তে কয়েকটি করে মন্ত্র রয়েছে। সুক্ত হল একটি সম্পূর্ণ প্রার্থনা। ঋগ্বেদের সুক্তগুলিকে একটা বিশেষ পদ্ধতিতে সাজান হয়েছে, যেটা দেখলে বোঝা যাবে যে এটা কৃত্রিম ভাবেই সাজান হয়েছে। ঋগ্বেদ দেখলেই বোঝা যায় যে এটা খুব সাজান গোছান, কোথাও এলোমেলো কিছু নেই। এই সাজানো গোছান ব্যপারটাই প্রমাণ করে দিচ্ছে যে ব্যাসদেব যে বেদের বিভাজন করেছিলেন এটা ঘটনা। যদি মণ্ডলগুলিকেই বিচার করা হয় তাহলে দেখা যাবে যে এক একটি মণ্ডল এক এক জন দেবতার উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছে। যেখানে অগ্নি দেবতার মন্ত্র আছে সেখানে পর পর অগ্নিদেবতার মন্ত্রই থাকবে। তার মধ্যে প্রথমে যেগুলো সব থেকে লম্বা সুক্তো সেগুলো থাকবে, তারপরে তার থেকে যেটা ছোট, এইভাবে বড় থেকে ছোট সাজান হয়েছে। এমনকি দুটি সুক্তে যদি সমান মাপের হয় যেমন প্রথম সুক্তে '*অগ্নিমীঢ়ে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম। হোতারং রত্নধাতমম্*' এখানে ন'টি মন্ত্র আছে, এখন যদি দ্বিতীয় সুক্তে ন'টি মন্ত্র থাকে তাহলে কোনটা আগে কোনটাকে পরে থাকবে, সেই অবস্থাতে ছন্দের মাত্রা অনুযায়ী সাজান হবে, যে মন্ত্রের ছন্দের মাত্রা বড় সেটা আগে যাবে। এত বিজ্ঞানসম্মত ভাবে সাজান হয়েছে যে বোঝাই যে এগুলোকে পরের দিকে কেউ এভাবে সুসম্বদ্ধ ভাবে সাজিয়ে দিয়েছেন। কবি, সাহিত্যিকরা যখন কিছু রচনা করেন তখন প্রথমেই তাঁরা তাঁদের রচনাগুলিক সুসম্বদ্ধ ভাবে এভাবে এত গুছিয়ে করেন না। আমাদের পরম্পরাতে যে বলা হয় ব্যাসদেব বেদকে সুসম্বদ্ধ ভাবে সাজিয়ে গেছেন, এর অনেক প্রমাণও পাওয়া যায়। এতো সহজ জিনিসটা পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের নজরে পড়ল না, সত্যিই তাজ্জব লাগে। দশম মণ্ডল ছাড়া বাকী নটি মণ্ডলকেই খুবই সুসংগঠিতে ভাবে সাজিয়ে দিয়েছেন। কিছু কিছু মন্ত্রকে যখন সংগঠিত করা গেল না তখন সেই মন্ত্রগুলিকে নিয়ে দশম মণ্ডল তৈরী করে দিলেন। আমরা যেমন বাড়ির জিনিসপত্র গোছগাছ করার সময় যে জিনিসগুলোকে গুছিয়ে রাখা যায় না তখন সেগুলিকে আলাদা করে একটা জায়গায় জড়ো করে রাখি, দশম মণ্ডলের ক্ষেত্রে ঠিক তাই করা হয়েছে।

ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের প্রথম সুক্তের প্রথম মন্ত্র ‘***অগ্নিমীডে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম। হোতারং রত্নধাতমম্’***, এটিই বেদের প্রথম মন্ত্র। সুক্তটি অগ্নি দেবতার উদ্দেশ্যে। বেদ দুই রকমের – *ঋকভি স্তবন্তি* আর *যজুর্ভি যজন্তি* – এই দুই শ্রেণীর মন্ত্র, ঋক আর যজুঃ। *ঋকভি স্তবন্তি* মানে এই মন্ত্র পূজো করার জন্য, স্তবন করার জন্য বা প্রশংসা করার জন্য। আর *যজুর্ভি যজন্তি* – যজ্ঞে আহুতি দেওয়ার সময় যজুর্বেদ থেকে সাহায্য নেওয়া হয়। যজুর্বেদের যিনি ব্রাহ্মণ তিনিই যজ্ঞে আহুতি দেবেন, স্বাহা বলে যিনি যজ্ঞের অগ্নিতে ঘি বা অন্য কিছু ঢালবেন। ঋগ্বেদের আবার দুটো ভাগ আছে, একটা ঋক ছন্দে, এটাও একটা মন্ত্রের ধরণ যেটা ব্রাহ্মণরা ব্যবহার করতেন, দ্বিতীয় স্তবন্তি, যে মন্ত্রগুলি প্রার্থনার জন্য ঠিক করা আছে। কিন্তু মজার ব্যাপার হল যজুর্বেদের মুষ্টিমেয় কটি মন্ত্রকে বাদ দিলে বেশির ভাগ মন্ত্রই ঋগ্বেদ থেকে এসেছে, মানে এই মন্ত্রগুলি ঋগ্বেদেও পাওয়া যাবে। আবার সামবেদের কয়েকটি মন্ত্র বাদে সবটাই এসেছে ঋগ্বেদ থেকে। ঋগ্বেদের বিরাট কলেবর। তাহলে ঋগ্বেদকে আমরা কিভাবে নেব – যদি বলা হয় যে ঋক্ কখনই যজ্ঞে আহুতির সময় ব্যবহার করা হয় না, কিন্তু সেই মন্ত্রই যখন যজুর্বেদে যাবে তখন কিভাবে আহুতির সময় ব্যবহার হচ্ছে? এই জন্য ঋগ্বেদকে বোঝাবার জন্য বলা হয় ঋগ্বেদ হল স্তবন্তি। একই মন্ত্র কখন স্তবন্তি হিসাবে ব্যবহার করা হয় আবার ঐ একই মন্ত্রকে কখন যজন্তি রূপে ব্যবহার হচ্ছে। চণ্ডী যজ্ঞেও চণ্ডীর যে মন্ত্রগুলি চণ্ডীপাঠে ব্যবহৃত হয় সেই মন্ত্রই চণ্ডী যজ্ঞে বেলপাতা ঘৃতের মধ্যে ডুবিয়ে অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হয়। একদিকে চণ্ডীকে মন্ত্ররূপে পূজো করা হয় আবার যজ্ঞ রূপেও ব্যবহার করা যায়। ইদানিং অনেকে গীতা যজ্ঞও করেন, গীতার শ্লোক গুলি পাঠ করে করে অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হয়। ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলি যখন যজুর্বেদে আসবে তখন তার একটা নির্দিষ্ট নিয়ম আছে, এই যজ্ঞে এই মন্ত্রই আহুতি দিতে হবে। বিভিন্ন যজ্ঞের জন্য আলাদা আলাদা মন্ত্র নির্দিষ্ট করা আছে।

বৈদিক যুগেও বিভিন্ন রকমের যজ্ঞ হত আর সব সময়েই যে অগ্নি প্রজ্জ্বলন করে সব যজ্ঞ করতে হবে তার কোন বাঁধাধরা নিয়ম ছিল না। যেমন অশ্বমেধ যজ্ঞের সময়ন অগ্নি প্রজ্জ্বলন করা হত না, ঘোড়াকে বলি দেওয়া হত। তবে বেশির ভাগ যজ্ঞেই অগ্নির ব্যবহার বাধ্যতামূলক ছিল। বেদে সবচেয়ে বেশি স্তুতি রয়েছে ইন্দ্রের নামে, তারপরেই অগ্নির নামে। এর মানে এই নয় যে ইন্দ্র বড় দেবতা আর অন্য দেবতারা ছোট।

বৈদিক অভিধান নিরুক্তে অগ্নি শব্দের বিভিন্ন অর্থ

নিরুক্ত হল বৈদিক অভিধান যেখানে বেদের শব্দগুলির অর্থ করা হয়েছে। যাস্ক, যিনি সাতাশ’শ বছর আগে বৈদিক ঋষি ছিলেন, তিনি এই নিরুক্ত রচনা করেছিলেন। যাস্ক বৈদিক দেবতাদের একটা শ্রেণীবিন্যাস করে তিন রকমের দেবতার কথা বলছেন। প্রথম শ্রেণীর দেবতারা এই পৃথিবীতে থাকেন, দ্বিতীয় শ্রেণীর দেবতারা অন্তরীক্ষে আর তৃতীয় শ্রেণীর দেবতারা স্বর্গে থাকেন। এখানে আমরা যে অগ্নি দেবতার স্তুতি পেলাম সেই অগ্নি পৃথিবীর দেবতা, ইন্দ্র স্বর্গের দেবতা।

আমরা আগে আলোচনা করেছি যে সংস্কৃতের সমস্ত শব্দ এসেছে ধাতু থেকে। অগ্নির অর্থ উদ্ধার করতে হলে আগে এর ধাতুটা জানতে হবে, কোন ধাতু থেকে অগ্নি শব্দ এসেছে। ধাতুর একটা সমস্যা হল, একই ধাতুর আবার অনেক রকম অর্থ হয়। যেমন বেদ বিদ্ ধাতু থেকে এসেছে, বিদ্ ধাতুর পাঁচ রকমের অর্থ হয়। আরো যেটা বড় সমস্যা, একই শব্দ কখন কখন দুটো কিংবা তিনটে ধাতু থেকে আসতে পারে, যদি দুটো কিংবা তিনটে ধাতু থেকে আসে তখন শব্দের অর্থ নিরূপণের ক্ষেত্রে আরো বেশি সংশয় তৈরী হয়, কেননা বেদের ভাষা অনেক প্রাচীন, কিছু কিছু শব্দের এখন আর ব্যবহারই হয় না। যাস্ক অগ্নি শব্দের অর্থ করছেন ‘অগ্রম্ নিয়তে’। যে কোন যজ্ঞে অগ্নি হলেন সেই দেবতা যাঁকে প্রথম আবাহন করা হয়, যিনি প্রথম পূজা পান। ঋগ্বেদের প্রথম সুক্ত তাই অগ্নি দেবতাকে দিয়েই শুরু করা হয়েছে। ‘অগ্রম্ নিয়তে’ আছে বলে অগ্নি শব্দ নিয়ে যাওয়ার অর্থেও ব্যবহার করা হয়। অগ্নির আরেকটি অর্থ ‘অগ্রণি ভবতি’, অগ্নি হলেন নেতা, দলপতি, অগ্নি না এলে বাকি দেবতারা আসবেন না। অগ্নির তৃতীয় অর্থ – যত দেবতা আছেন সমস্ত দেবতাদের মধ্যে অগ্নির জন্ম প্রথম। অগ্নির জন্ম জল থেকে, আমরা যে জল জানি সেই জলের কথা এখানে বলছে না, বিশ্বের জন্মের আগে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড জলের যে তন্মাত্রায় আপ্লুত ছিল, সেই জল থেকে অগ্নির জন্ম

হয়। যে জীব-জগতের বিকাশ দেখছি, এর সৃষ্টি অগ্নি থেকে। জগতে যত রকম খারাপ জিনিস, অশুভ যা কিছু আছে অগ্নি সব নাশ করে দেন। এই ধারণা থেকেই এখনও দোলের আগে যা কিছু আবর্জনা থাকে সব জড়ো করে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। এখানে সাধারণ অগ্নিকে মাথায় রেখেই করে। কিন্তু আমরা সাধারণ অগ্নিকে নিয়ে আলোচনা করছি না, অগ্নি দেবতার কথাই বলছি। অগ্নি সর্বদর্শী, তিনি সব কিছু দেখতে পান, সব কিছু জানতে পারেন, সেইজন্য অগ্নির আরেকটি নাম জাতবেদস। যা কিছু জন্ম নিয়েছে, জাত হয়েছে অগ্নি তাদের সবাইকে জানেন। জাতবেদসের মত অগ্নির আরেকটা নাম বিশ্ববেদস। বিশ্ববেদসের অর্থ, যারা জাত বা জন্ম নিয়েছে অগ্নি শুধু তাদেরকেই জানেন না, যা এখন জাত হয়নি তাদের ব্যাপারেও অগ্নি সব জানেন।

এখানে অগ্নি দেবতার ক্ষেত্রে সর্বজ্ঞ প্রযোজ্য হবে না, কেননা সর্বজ্ঞ বিশেষিত এই শব্দটি একমাত্র ঈশ্বরের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। সেই অর্থে অগ্নি কিন্তু ঈশ্বর নন। ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, মিত্র, বায়ু, যম এঁরা সবাই দেবতা, ইংরাজীতে গড্ লেখার সময় এঁদের ক্ষেত্রে ছোট অক্ষরের ‘জি’ লেখা হয় আর ভগবানের ইংরাজী গড্ লেখার সময় বড় অক্ষরের ‘জি’কে ব্যবহার করা হয়।

বেদমন্ত্রের ব্যক্তি থেকে নৈর্ব্যক্তিক, মূর্ত থেকে অমূর্তের দিকে অগ্রসর

বেদের ঋষিরা প্রথমের দিকে প্রকৃতির দিকে তাঁদের দৃষ্টি দিয়েছিলেন। ভারত প্রথম থেকেই কৃষি প্রধান দেশ, কৃষি প্রধান দেশ হওয়ার জন্য এখানকার জীবনযাত্রা পুরোপুরি বৃষ্টির উপর নির্ভরশীল ছিল। বৃষ্টির পেছনে এক দৈবী শক্তিকে তাঁরা বিশ্বাস করতেন, সেই শক্তিই ঠিক সময়ে বৃষ্টি দিয়ে বৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ করছেন। এই প্রকৃতির দেবতা হলেন ইন্দ্র, তখন তারা ইন্দ্রের পূজা করতে শুরু করলেন। তারপরে ঋষিরা দেখলেন অগ্নি আমাদের জীবনে একটি অপরিহার্য শক্তি, এই শক্তির দেবতা অগ্নি নিজেই, তাই অগ্নি দেবতা খুব প্রাধান্য পেলেন। তাঁরও পূজা ও স্তুতি হতে লাগল। পরবর্তি কালে ইন্দ্র বা অগ্নির একটা রূপ দিয়ে মুর্তি তৈরী করে পূজার প্রবর্তন হয়। বিভিন্ন আদিবাসীরাও নানান মুর্তি তৈরী করে পূজা করে। বৈদিক দেবতা আর আদবাসীদের দেবতাদের মধ্যে একটা বিরাট পার্থক্য আছে। এই পার্থক্য না ধরতে পারলে বেদের দর্শন বোঝা যাবে না। বৈদিক যুগে যেসব অনুন্নত উপজাতিরা ছিল তারাও অগ্নিদেবতার মুর্তি করে পূজা করছে, এই অগ্নি দেবতার সাথে বেদে যে অগ্নি দেবতার কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে সব থেকে বড় পার্থক্য হল বেদের অগ্নি দেবতার মধ্যে অনেক মহৎ গুণ আছে, কিন্তু উপজাতিরা যে অগ্নি দেবতার পূজা করছে সেই দেবতার একটাই গুণ, সে শুধু জানে সবাইকে পুড়িয়ে দিতে, তাঁকে যদি শান্ত না রাখা হয়, তাঁকে যদি প্রার্থনা না করা হয় তাহলে তাঁর রোষ দিয়ে তিনি সবাইকে ভষ্ম করে দিতে পারেন, আর তাঁকে যদি খুশি রাখা হয় তাহলে তিনি খুশি হয়ে তাদের যা যা চাহিদা আছে সব পূরণ করে দেবেন। কিন্তু বৈদিক দেবতাদের মধ্যে রয়েছে অনেক মহৎ গুণ, এই গুণগুলো নৈর্ব্যাক্তিক। আমাকে যদি কেউ বলে – আপনি কি বুদ্ধিমান। বুদ্ধিমান এই গুণটা আমার সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার জন্য এটা আমার নিজস্ব গুণ। কিন্তু বুদ্ধি গুণ সার্বিক ভাবে নৈর্ব্যাক্তিক, যে কোন লোকেরই হতে পারে। ঠিক সেইভাবে কারুকে যদি বলা হয় – তুমি কি সুন্দর। সুন্দর এই গুণটা এখানে ব্যাক্তিগত, কিন্তু সৌন্দর্যটা নিরপেক্ষ। এই যে বলা হল অগ্নিদেবতা হলেন জাতবেদস, বিশ্ববেদস, সব কিছু জানবার ক্ষমতা তাঁর মধ্যে আছে। সব কিছু জানার যে ক্ষমতা এই গুণটাই হয়ে গেল নৈর্ব্যাক্তিক, impersonal quality, কিন্তু সর্বজ্ঞত্বতা একমাত্র ভগবানের, অগ্নি কিন্তু ভগবান নন। এক দিকে বেদের অগ্নিদেবতার সাথে উপজাতি আদিবাসীদের দেবতাদের মধ্যে কিছুটা মিল রয়েছে এই কারণে যে তাঁর নিজস্ব কিছু গুণ রয়েছে আবার সাথে সাথে বেদের অগ্নিরও কিছু নিজস্ব গুণ আছে। অন্য দিকে তাঁকে আবার একজন শ্রেষ্ঠ দেবতারূপে গণ্য করা হচ্ছে, কারণ তাঁর মধ্যে কিছু গুণ আছে যেগুলি নৈর্ব্যাক্তিক। এগুলোই বেদের বৈশিষ্ট্য, এই ধরণের বৈশিষ্ট্যতা বেদ ছাড়া অন্য কোথাও দেখা যাবে না।

খ্রীশ্চানদের গড্ বা মুসলমানদের আল্লাকে যে যে গুণের দ্বারা ভূষিত করা হয় সেই একই গুণ বেদে ইন্দ্রকেও দেওয়া হয়েছে, একই গুণ অগ্নিকেও দেওয়া হয়েছে। এর জন্য বেদের অনেক সমস্যাও হয়, সমস্যার কথা এই কারণে বলা হচ্ছে যে এই সমস্ত দেবতাদের একটা মুর্ত রূপ দেওয়া হয়, তাঁদের একটা শরীর আছে।

ইন্দ্র অনেক সময় সোমরস খেয়ে বেহুঁস হয়ে পড়ে থাকেন, তাঁকে সামলান যায় না। দেবতাদের মধ্যে হিংসা আছে, দ্বেষ আছে, মানবজাতির হেন রোগ নেই যা ইন্দ্রাদি দেবতাদের নেই। কেউ কোন যজ্ঞ করছে সেই যজ্ঞ করলে যদি ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব চলে যায় সেই ভয়ে ইন্দ্র ঐ যজ্ঞকে পণ্ড করতে সব রকমের অসদুপায় অবলম্বন করবেন। একদিকে দেবতাদের অনেক দোষ আছে আবার অন্য দিকে তাঁদের মধ্যে অনেক মহৎ গুণও আছে – যেমন অগ্নিকে বলা হচ্ছে জাতবেদস, যারা জন্ম নিয়েছে তাদের সবাইকে তিনি জানেন, বিশ্ববেদস, যারা জন্ম নেয়নি তাদেরকেও জানেন। তথাপি তাঁকে সর্বজ্ঞ বলা হচ্ছে না। কারণ যদি তিনি সর্বজ্ঞ হতেন তাহলে তাঁর মধ্যে মানবিক যে দোষগুলি আছে সেগুলো থাকত না। সেই কারণে বৈদিক দেবতাদের সম্বন্ধে যে অদ্ভুত ধারণা বেদে দেখা যায় এটাকেই পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা বুঝতে পারেনা। বিদেশীদের কাছে আদিবাসী উপজাতিদের দেবতা আর বাইবেল বা কোরানের সর্বোচ্চ দেবতাদের ধারণাই আছে। আমাদের কাছে এখন না হয় বেদান্ত এসে গেছে। কিন্তু বেদের দেবতারা এই দুটোর মধ্যে কোনটাই নয়। এই দুটোকে সমণ্বয় করা সাধারণ মানুষের সাধারণ বুদ্ধিতে কখনই সম্ভব নয়।

প্রথম প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণের আরাধনা শুরু করার পর আমাদের সবারই মনের মধ্যে ঘুরপাক খাবে শ্রীরামকৃষ্ণ কামারপুকুরে জন্ম নিয়েছেন, দক্ষিণেশ্বরে সাধনা করেছেন, তাঁর মুর্তি এখন বেলুড় মঠে পূজা করা হয়। এরপর ঠাকুরের প্রতি আরো একটু শ্রদ্ধা ভক্তি বৃদ্ধি পেল, তখন মনে হবে যদি বেলুড় মঠে ঠাকুরের খিচুরী ভোগ খেতে পারি তাহলে আমার জীবন ধন্য হয়ে যাবে। তারপর ধীরে ধীরে এগুলোও বন্ধ হয়ে মনে হবে আমি প্রসাদ খাই আর নাইই খাই তাতে আমার কোন প্রয়োজন নেই, আমি যেন নিরিবিলি ঠাকুরের কাছে চুপচাপ বসে তাঁর চিন্তা করতে পারি। এইভাবে এক সময় মনে হবে জগতে আর কিছুই নেই আমি আছি আর ঠাকুর আছেন। তারপর এক সময় আসবে মনে হবে যে বেলুড় মঠে ঠাকুরের অস্তি রাখা আছে, এখানে কত সাধু সন্ন্যাসীরা জপ-ধ্যান করেছেন। কিন্তু বেলুড় মঠে কি আমি ঠাকুরকে পাব? ঠাকুরকে যদি ঠিক ঠিক খুঁজতে হয় তাহলে আমাকে আমার অন্তর্জগতে ধ্যানের গভীরে গিয়ে খুঁজতে হবে। মন্দিরে মাথা ঠুকলে, খিচুরী আর চরণামৃত খেলেই হবে না। আমরা মন এখন একটা অন্য দিকে মোড় নিয়েছে। এই পরিবর্তনটা আসার পর আমি ঠাকুরের ধ্যান করতে শুরু করলাম। ধ্যান শুরু করতে গিয়ে প্রথমের দিকে ঠাকুরর ছবিই ধ্যানে আসতে থাকবে। এতদিন খোলা চোখে ঠাকুরের যে ছবি দেখতাম এখন সেই ছবিকে ধ্যানের মধ্যে দেখছি খুব বেশি হলে three dimensionএ মন্দিরের ঠাকুরের যে মুর্তি আছে সেই মুর্তি ধ্যানের মধ্যে দেখা শুরু হবে। কিন্তু মুর্তিতো মানুষ নয়, মানুষ আর মুর্তির মধ্যে অনেক তফাৎ আছে। এইভাবে চলতে চলতে এক সময় মনে হবে – আরে, ঠাকুর তো মুর্তি নন, তিনি তো জীবন্ত দেখছি। জীবন্ত মানুষটি কোথায় রয়েছেন? আমার হৃদয়ে মনের ভেতরে। একদিন মন্দিরে ঠাকুরের মুর্তির সামনে এসে দাঁড়াতেই মনে হবে যে এতো কোন মুর্তি নয়, দেখছি সাক্ষাৎ ঠাকুর বসে আছেন। এখান থেকে যখন আরো এগোব তখন আরও অনেক কিছু বোধ হতে থাকবে। তারপর দেখছি ঠাকুরই সব কিছু হয়েছেন। এই যে প্রথম বাতাসা খাওয়া থেকে শুরু হয়েছিল, বাতাসা না খেলে জীবনটা যেন বিফল হয়ে যাবে, একদিন যদি গুরুপ্রণাম না হয় তা হলে মনে হত জীবনটা বৃথা চলে গেল, এখান থেকে বেরিয়ে এসে এগোতে এগোতে দেখছি, বাতাসা খাওয়া না খাওয়াতে আমার কিছুই হয় না, এখন দেখছি সিয়ারাম ম্যায় সব জগ জানু, গোটা বিশ্বজগৎ দেখছি রামকৃষ্ণময়। এগুলোই সূচিত করছে যে আমার মধ্যে ঠাকুরের ব্যাপারে আমার চেতনার বিস্তার হচ্ছে। এখানে কার পরিবর্তনটা হল?

সেই প্রথম যেদিন আমি ঠাকুরের ছবি দেখলাম, যেদিন আমার প্রথম দীক্ষা হল সেখান থেকে হতে হতে এই যে আমি ঠাকুরকে আজ পুরো জগৎ জুড়ে দেখছি, এতটা রাস্থা চলার পথে কি ঠাকুর পাল্টে গেলেন? তিনি ছবি থেকে বেরিয়ে সর্বভূতে বিরাজমান হয়ে গেলেন? কখনই ঠাকুর ছবি থেকে বেরিয়ে আসেননি। আমার চেতনা বিস্তার হতে হতে আমার ভাবটা পাল্টে গেছে। যখন আমার মনে ঠাকুরের প্রতি ভক্তি ভাব এসেছিল তখন এক রকম অনুভূতি হয়েছে, আবার যখন আমার মধ্যে ভক্তির পরাকাষ্টা এসে গেল তখন সেই ঠাকুরকে আমি অন্য ভাবে দেখছি। গভীর ভাবে অনেক বছর সাধনার পর যখন আমার উপলব্ধি হল যে ঠাকুর তো সমস্ত জগৎ জুড়ে রয়েছেন, সেই অবস্থায় যদি আমার এই পরিবর্তনগুলি প্রথম থেকে কোথাও লিপিবদ্ধ করে রাখি –

তার প্রথম লাইনটা দিলাম – আহা, ঠাকুর তোমার কি অপরূপ সৌন্দর্য দেখলাম। দ্বিতীয় লাইনে লিখলাম ঠাকুর তো জীবন্ত তিনি তো সজীব, এতদিন তাঁকে শুধু পাথরের মুর্তির মধ্যেই দেখেছি। তারপরে লিখলাম – তিনি সাড়া বেলুড় মঠ জুড়েই রয়েছেন। চতুর্থ লাইনে গিয়ে লিখলাম, যেদিকেই তাকাই সেদিকেই ঠাকুর বিরাজমান। ঠাকুরের প্রতি আমার অনুভূতিগুলি ক্রমান্বয়ে যে পরিবর্তন হয়েছিল সেটাকে এই চারটে লাইনে খুব সুন্দর পদ্যাকারে লিপিবদ্ধ করলাম। তারপর হাজার বছর এই লাইনগুলি কেউ হয়তো মিশিয়ে আগে পড়ে করে দিয়েছে। এখন ঠাকুর তুমি সর্বত্র বিরাজমান এই লাইনটাও থাকবে আবার শ্রীরামকৃষ্ণ মুর্তিরূপে বিরাজমান এই লাইনটাও থাকবে। এর মধ্যে আমার পরবর্তিকালে যারা সাধক এসেছিলেন তাঁদের অনুভূতির কথাও ঢুকে গেছে। এখন কেউ হয়তো প্রথমেই এর মধ্যে খুব উচ্চ অবস্থার অনুভূতির কথা পেলেন, তারপরেই হঠাৎ দেখতে পেলেন অনেক সাধারণ নিম্ন অবস্থার কথা লেখা রয়েছে। বেদেও ঠিক এটাই হয়েছে। এতে বেদের কোন দোষ নেই। পঞ্চাশ জন ঋষির বিভিন্ন অবস্থার উপলব্ধির কথা তাঁদের শিষ্য, সন্তানদের মাধ্যমে চলতে চলতে লাইন গুলোর এদিক সেদিক হতেই পারে। পরবর্তি সময়ে তাই বলা মুশকিল হয়ে দাঁড়াল যে কোন্ কথাটা প্রথমে লেখা হয়েছিল আর কোন্ কথাটা পরের দিকে লেখা হয়েছে। কোন উপায়ই নেই জানার যে কোনটা আগে কোনটা পরে এসেছে। এমনও হতে পারে, যেমন তোতাপুরীর ক্ষেত্রে হয়েছিল, অদ্বৈতজ্ঞান আগে হয়েছে দ্বৈতজ্ঞান পরে হয়েছে। ঠাকুর দেখলেন মা'ই সব হয়েছেন, পরে দেখলেন সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। এখন কে বলবে কোনটা আগে কোনটা পরে, আমাদের বুদ্ধিতে মনে হবে দ্বৈত আগে অদ্বৈত পরে, কিন্তু তোতাপুরি ছাড়াও অনেক সাধক আছেন যাদের দ্বৈতজ্ঞান অদ্বৈতজ্ঞানের আগে হয়েছে। স্বামীজীরই অদ্বৈতজ্ঞান আগে হয়েছে, পরে যখন তিনি ক্ষীরভবানীতে গেছেন তখন তিনি দৈববাণী পেলেন – মা বলছেন আমি তোর রক্ষা করি না তুই আমার রক্ষা করিস। ঠাকুরের দিব্যস্পর্শে যাঁর নির্বিকল্প সমাধি হয়ে গেছে, যিনি দেখছেন সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, ঘটি, বাটি, ঘরবাড়ি সবই দেখছেন চৈতন্য, তাঁকেই মা বলছেন – তুই আমাকে রক্ষা করিস না আমি তোকে রক্ষা করি। বেদের ঋষিদের হাজার হাজার বছর আগে যে উপলব্ধি হয়েছিল এখন আমরা আমাদের এই জাগতিক বুদ্ধি দিয়ে কি করে বিচার করব যে তাঁদের কোন্ উপলব্ধিটা আগে হয়েছিল আর কোনটা পরে হয়েছিল। এটাকে জানার কোন উপায়ই নেই।

আমরা জানি মানুষ ক্ষুদ্র থেকে আরও আরও মহৎ হতে থাকে। লীলাপ্রসঙ্গে স্বামী সারদানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের মানবরূপ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ঠাকুরের যে বর্ণনা দিয়েছেন এগুলো সবই তার মানবিক গুণ, তিনি সাধারণ ভাবে কি রকম থাকতেন, তাঁর কি ধরণের বিভিন্ন শখ ছিল, তাঁর শরীর বড়সর ছিল, বসতে গেলে বড় পিড়ের দরকার হত, কি কি খেতে ভালোবাসতেন আরও অনেক ধরণের বর্ণনা রয়েছে। এগুলোই ঠাকুরের মানবরূপ, প্রথম প্রথম ঠাকুরের ধ্যান করার সময় সবাই এই মানবিক গুণ আর তাঁর মানবরূপেরই ধ্যান করে। মানবিক গুণই মানবিক দুর্বলতা। নরেন ঠাকুরকে দেখিয়ে বলছে – এঁকে সবাই বলে পরমহংস আবার মোটা গদিতে বসে। ঠাকুরও শুনে বলছেন – শালা, তোর গদি আমার থেকে দ্বিগুণ মোটা হবে। নরেন্দ্রনাথ যখন স্বামী বিবেকানন্দ হয়ে দেশে ফিরে এলেন তখন আমেরিকার এক ভক্ত স্বামীজীকে একটা মোটা গদি করে দিয়েছিল, যেটা এখনও স্বামীজীর ঘরে তাঁর খাটের উপরে পাতা আছে। মেপে দেখা গেল দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের খাটে যে গদি আছে তার থেকে স্বামীজীর খাটের গদি ঠিক দুই গুণ বেশি মোটা। সে যাই হোক, তাঁকে পরমহংস বলছে আবার তিনি গদিতে শোয়া বসা করেন। বেলুড় মঠ স্থাপন হওয়ার পরেই বেলুড় মঠের নামে কোর্টে নালিশ গেল যে বেলুড় মঠ নরেন দত্তের বাগান বাড়ি। জজ সাহবে জিজ্ঞেস করছেন – এটা কি সত্যি যে আপনারা খাটে শোন, এটা কি সত্যি আপনারা চা খান, এই ধরণের সব প্রশ্ন তখন কোর্টে উঠেছিল। যাই হোক পরে প্রমাণিত হলে যে বেলুড় মঠ কারুর বাগান বাড়ি নয়। একশ বছর আগে সন্ন্যাসীদের খাটে শোওয়া, চা খাওয়া ছিল এক ধরণের সামাজিক দুর্বলতা।

শ্রীরামকৃষ্ণের মানবিক রূপের উপর যখন আমরা ধ্যান করতে যাব তখন তাঁর এই মানবিক গুণগুলিও আমাদের সামনে এসে যাবে, ঠাকুরের এটা ভালো লাগত, ঠাকুর এই করতেন, ঠাকুরের এটা পছন্দ ছিল, এই জিনিস তাঁর ভালো লাগত না। আমাদের চেতনার স্তরের যত উন্মেষ হতে থাকবে তত ঠাকুরের মানবিক

গুণগুলিও আস্তে আস্তে আমাদের চিন্তা ভাবনা থেকে খসে পড়তে থাকবে। কিন্তু ঠাকুর যে যে গুণের স্বরূপ – সত্য বিগ্রহায়, তিনি সত্যের বিগ্রহ, *কৃত্যং করোতি কলুষম্*, তিনি এমনই পবিত্র যে আমাদের যা কলুষ বা পাপ সেটাকেও তিনি পূণ্যে পরিণত করে দেন। সত্য, পবিত্রতা, সর্বজ্ঞতা, চৈতন্য এই গুণগুলো তাঁর স্বরূপ। এগুলো তাঁকে সাধনা করে অর্জন করতে হয়নি, এটাই তাঁর স্বরূপ, এইটাই তাঁর বৈশিষ্ট্য। এভাবেই আমরা ব্যাক্তি থেকে নৈর্ব্যাক্তিক, মুর্ত থেকে অমুর্তের দিকে অগ্রসর হই। বৈদিক মন্ত্রও এভাবেই এগিয়েছে। কিন্তু বেদে কোথাও আমরা এটাকে একটা প্রণালীতে, নিয়মের মধ্যে সাজান অবস্থায় পাবো না। কোথাও প্রথমেই পাই আধ্যাত্মিকতার শেষ উচ্চাবস্থার কথা, আবার কোথাও প্রথমেই পুরোপুরি ব্যাক্তি রূপে কোন দেবতাকে স্তুতি করা হচ্ছে। আবার কোথাও ইন্দ্র প্রচণ্ড সোমরসে আসক্ত, অপর নারীর প্রতি সে প্রলুব্ধ। এখনকার দিনে আমরা কি ভাবতে যাব স্বামীজী চরুট খেতেন কি খেতেন না, মুরগী খেতেন কি খেতেন না। স্বামীজীর সময়ে খবরের কাগজে স্বামীজীকে নিয়ে কার্টুন আঁকা হত স্বামীজী চুরুট টানছেন, আর স্বামীজীকে চারটে মেম ঘিরে রেখেছে আর তাঁর কমণ্ডলু থেকে মুরগীগুলো মুখ বার করে আছে। আজকে কি কেউ স্বামীজীকে এভাবে চিন্তা করতে পারবে বা করবে? একই জিনিস বেদের দেবতা ইন্দ্র, বরুণের ক্ষেত্রে হয়েছিল। প্রথমেই ঋষিদের মনে দেবতাদের জাগতিক দোষত্রুটি গুলিই ধরা পরেছিল পরে তাঁরাও যত ধ্যানের গভীরে যেতে থাকলেন ততই এই গুণগুলি থেকে সরে উচ্চতর দৈবী গুণগুলির প্রতি আকৃষ্ট হলেন।

বেদের বিভিন্ন আনুষাঙ্গিক শাস্ত্র

এর আগে বেদের চারটে অঙ্গ, মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ নিয়ে সামান্য আলোকপাত করা হয়েছে, পরে আরও বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করা হবে। ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখি একটা বিশেষ কাল অনেক দিন চলতে চলতে সেই কালটা ক্ষীণ হয়ে গিয়ে আরেকটা কাল শুরু হয়ে যায়। বেদেও ঠিক এই রকম কালের গতিতে আরও দুটো ধারা এসে সংযুক্ত হয়েছিল। মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ যেমন এক সময় অনেক দিন ধরে চলছিল, অনেক পরে সমাজের প্রয়োজনের তাগিদেই হোক বা অন্য কোন কিছুর প্রয়োজনেই হোক আরও তিনটি জিনিস এসে যোগ হল। এই তিনটি হল শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্র আর কল্পসূত্র।

বেদের আমরা যত কিছুই বলি না কেন, বেদের আসল ধর্ম যজ্ঞ-যাগের ধর্ম। উপনিষদের তত্ত্বগুলিকে বেদের আলাদা ভাগে ভাগ করা হলেও সংহিতা বা মন্ত্র অংশে উপনিষদের তত্ত্বগুলি আগে থেকেই আছে। কিন্তু একটা জিনিসের বৈশিষ্ট্যগুলিকে যখন বিচার করা হয় তার মধ্যে বেশি যেটা আছে সেটাকেই তার প্রধান বৈশিষ্ট্য বলে মানা হয়। বেদে বিভিন্ন যজ্ঞ-যাগের কথাই বেশি বলা হয়েছে। এই সব যজ্ঞ-যাগের কি বিধি হবে, কিভাবে করা হবে, কখন করা হবে, কি কি আনুষাঙ্গিক দ্রব্য লাগবে এগুলোর জন্য ওনারা আলাদা নিয়মাবলী তৈরী করতে শুরু করলেন, বর্তমানের পুরোহিত দর্পণ, বা রামকৃষ্ণ পূজাপদ্ধতির মত। যজ্ঞ-যাগের সব নিয়মাবলীকে একটা নির্দিষ্ট ভাবে সাজান হল, আর সব নিয়মবলীকে খুব সংক্ষেপে সূত্রাকারে লেখা থাকত। ব্রাহ্মণ সন্তানরা এই সূত্রগুলি মুখস্ত করে রাখতেন আর এর সব ব্যাখ্যা গুরুর কাছে শুনে রাখতেন। একটা সময় থেকে ভারতের ঋষিরা খুব সংক্ষেপে তাঁদের কথাগুলিকে সূত্রাকারে লিখে রাখতে শুরু করেন। নামকরা যত শাস্ত্র আছে তার বেশির ভাগই সূত্রাকারে রচিত হয়েছে – যেমন ভক্তিসূত্র, যোগসূত্র, জৈমিনির ধর্মসূত্র, ন্যায়সূত্র। এনারা মনে করতেন আমাদের জ্ঞানের পরিধি এত বিশাল যে পরবর্তি প্রজন্মের পক্ষে এগুলোকে মুখস্ত করে ধরে রাখাটা খুব কঠিন হবে। তাই মূল তত্ত্বটাকে সূত্রাকারে লিখে নিয়ে ওটাকেই মুখস্ত করাতেন। যজ্ঞ-যাগের বিধি-নিয়মাবলীগুলিকে নিয়ে সূত্রাকারে রচিত হল শ্রৌতসূত্র, গৃহসূত্র আর কল্পসূত্র। এই তিনটি বৈদিকপূর্ব আর বৈদিকপরবর্তি কালের মেলবন্ধন।

এই তিনটি সূত্রের পরেই পরবর্তি কালে এল বেদাঙ্গ। বেদাঙ্গ ছটি – কল্প, ব্যাকারণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ, শিক্ষা ও ছন্দ। বেদ যে পড়তে যাবে তাকে বেদের সাথে বেদাঙ্গ অবশ্যই পড়তে হত। শিক্ষাতে বেদমন্ত্রের উচ্চারণ পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে। বেদের প্রত্যেকটি শব্দের সঠিক উচ্চারণ করার কৌশল শিক্ষা থেকে প্রাপ্ত করতে হয়। কল্প হল সমস্ত সূত্রগুলি যাতে লিপিবদ্ধ করা আছে। ব্যাকারণে বেদের সংস্কৃত ভাষার

নিয়মাবলীর ব্যাখ্যা করা হয়েছে। নিরুক্ত হল বিশেষ অভিধাণ যাতে শুধু বেদের শব্দগুলির অর্থ বলা আছে, নিরুক্ত ব্যাকারণ সহ অভিধাণ। বেদের মন্ত্রগুলি বিভিন ছন্দে লেখা হয়েছে, কত রকমের ছন্দ আছে, কোন ছন্দের কি নিয়ম, কোন ছন্দে কটি কটি করে শব্দ থাকবে তার বিশদ বিবরণ যাতে বলা হয়েছে তার নাম ছন্দ। শেষে জ্যোতিষ, এখন যাকে জ্যোতিষ শাস্ত্র বলা হয়। সরস্বতি পূজাতে পুষ্পাঞ্জলী দেওয়ার মন্ত্রে বলা হয় ......বেদ বেদাঙ্গ বেদান্ত বিদ্যাস্থানেভ্য..., এখানে বেদ বলতে বোঝাচ্ছে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণকে, বেদান্ত বলতে বোঝাচ্ছে উপনিষদ আর বেদাঙ্গ বলতে এই ছয়টিকে বোঝাচ্ছে। কিন্তু বেদেকে যখন সামগ্রিক রূপে ব্যাখ্যা করা হয় তখন তিনটেকে মিলিয়েই সমগ্র জিনিসটাকে বলা হয় বেদ। আবার যখন তিনটেকে আলাদা করে দেবে তখন আরেকটু বড় পণ্ডিত তাঁরা বলবেন – বেদ মানে তুমি কোনটা বলছ? মন্ত্র বলছ না ব্রাহ্মণ বলছ? তখন আবার বেদ আলাদা হয়ে যাবে। বেদকে যে কত ভাবে আলাদা আলাদা করে ভাগ করা আছে বিদেশীদের ধারণাই নেই। বেদাঙ্গের এই ছটি জিনিসকে যদি ঠিক মত না জানা থাকে বেদ কেউ বুঝতেই পারবে না। বেদের পণ্ডিত মানে তিনি এই ছটি বেদাঙ্গকে সম্পূর্ণ রূপে জানেন।

আগেও বলা হয়েছে ঈশোপনিষদ শুক্লযজুর্বেদের সংহিতার শেষে এসেছে, বেদ যেভাবে সাজান আছে সেই ক্ষেত্রে এখানে একটা ব্যতিক্রম ধরা পড়ে। আবার এটাও একটা ব্যতিক্রম যে শুক্লযজুর্বেদের মধ্যে আরণ্যক নেই। আরণ্যক বলতে আমরা যা বুঝি সেটাকে শুক্লযজুর্বেদের বৃহদারণ্যক উপনিষদে মিশিয়ে দেওয়া আছে। শুক্লযজুর্বেদের দুটো উপনিষদ, ঈশোপনিষদ ও বৃহদারণ্যক। মজার ব্যাপার হল শুক্লযজুর্বেদে সংহিতা অংশের ৩৯তম অধ্যায়ের পরেই ৪০তম অধ্যায়ে ঈশোপনিষদ, আরণ্যক নেই। শুক্লযজুর্বেদের এটাই সংহিতা কিন্তু তার ৪০তম অধ্যায় উপনিষদ, তারপর ব্রাহ্মণ, তারপরেই বৃহদারণ্যক উপনিষদ। সেইজন্য বেদকে যেভাবে বিভাজন করা হয়েছে তাতে একটা পদ্ধতিকেই আগাগোড়া অনুসরণ করা হয়নি। তবে যে কোন ভাবেই বিভাজন করতে যাওয়া হোক না কেন তাতে অনেক সমস্যা হয়। তবে আমরা যে বিভাজনটা অনুসরণ করছি এটাই ঠিক ঠিক বেদের বিভাজনের পরম্পরা পদ্ধতি, আমাদের পূর্ব পুরুষরা এভাবেই বেদকে বিভাজন করেছিলেন – প্রথমে মন্ত্র বা সংহিতা, তারপর ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও শেষে উপনিষদ। এতেও সমস্যা আছে কিন্তু অন্য পদ্ধতিতে বিভাজন করলে সমস্যাটা আরও বেড়ে যায়। ঈশাবাস্য উপনিষদ যজ্ঞের কাজে লাগবে না, সেইজন্য প্রথম থেকে আমাদের ঋষিরা বলে এসেছেন এটা হল উপনিষদ।

একই বেদের আবার কয়েকটি শাখা আছে। প্রত্যেকটি শাখাতে যে বইগুলো সাজান আছে সব কটা বই আলাদা। বৃহদারণ্যক উপনিষদের কোথায় যে আরণ্যক আর কোথা থেকে যে উপনিষদ শুরু ধরা খুব মুশকিল। অবশ্য বৃহদারণ্যক পড়ানোর সময় বলে দেওয়া হয় যে এর প্রথম চারটে অধ্যায় আরণ্যক, তখন আর এই চারটে অধ্যায়কে পড়ান হয় না, কেননা আরণ্যক এখন আমাদের খুব একটা কাজে লাগে না। যদিও শঙ্করাচার্য আরণ্যকের উপরে ভাষ্য রচনা করেছেন কিন্তু উপনিষদের তুলনায় আরণ্যক বুঝতে খুব কষ্ট হয়।

শ্রৌতসূত্র আর গৃহসূত্র যেহেতু বৈদিক যুগের শেষের দিকে এসেছিল তাই অনেক সময় এনারা এগুলোকে ঠিক শ্রুতির মধ্যে গণ্য না করে স্মৃতি শাস্ত্রের মধ্যে অন্তর্গত করে দেন। তবে এই নিয়েও অনেক বিতর্ক আছে। মাঝে একটা মত এসেছিল যাতে বলা হত সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক আর উপনিষদ ব্রহ্মচর্য, গৃহস্থ, বাণপ্রস্ত ও সন্ন্যাস, এই চারটে আশ্রমের জন্য এক একটা অংশকে ঠিক করে দেওয়া হয়েছিল। সংহিতা ব্রহ্মচর্যশ্রামের জন্য, গৃহস্থাশ্রমের জন্য ব্রাহ্মণ, আরণ্যক বাণপ্রস্তাশ্রম আর উপনিষদ সন্ন্যাসাশ্রমের জন্য ঠিক করে দেওয়া হয়েছিল। এটা একটা মত, কিন্তু স্মৃতিশাস্ত্রে এই ধরণের কোন নিয়মের উল্লেখ আমরা পাইনা। অন্য দিকে আমরা দেখি ব্রহ্মচর্যাশ্রমে ব্রহ্মচারীদের বেদের শুধু সংহিতাই নয়, পুরো বেদই মুখস্ত করতে হত।

বেদের বিভিন্ন শাখার উৎপত্তি

বেদের বিশাল পরিধি, এর মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ, এর সাথে শ্রৌতসূত্র ও গৃহসূত্র আর এগুলোর আনুষাঙ্গিক রূপে শিক্ষা, কল্প, ব্যাকারণ, জ্যোতিষ, নিরুক্ত ও ছন্দ এতগুলো বিষয় একই লোকের পক্ষে অধ্যয়ন করা আর অধ্যয়ন করান খুবই কঠিণ ও সময় সাপেক্ষ ছিল। একেই বেদের চারটে ভাগ, চারটে

ভাগের পরেও বেদকে এভাবে ধরে রাখা কঠিণ ছিল। তাই এনারা এক একটা বিষয়কে বেছে নিয়ে এক এক জন ব্রাহ্মণ গুরুকে দিয়ে দিলেন, কেউ হয়তো ঋগ্বেদের মন্ত্র অংশকে মুখস্ত করছে, সেই গুরু আবার তাঁর শিষ্যদের, সেই শিষ্যরা আবার তার শিষ্যদের দিতে থাকলেন, এইভাবে বেদের এক একটি বিষয় বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে গেল। যারা সংহিতা মুখস্ত করছে তারা আবার সংহিতার অধ্যায়গুলি যার যার মত করে আগে পরে করে মুখস্ত করেছে। কেউ হয়ত প্রথম অধ্যায়টা করে তৃতীয় অধ্যায়টা মুখস্ত করেছে আবার কেউ হয়ত তৃতীয় অধ্যায়ের পর ষষ্ঠ অধ্যায় করেছে, কিন্তু যেটাই করত সেটা পুরোটাই মুখস্ত করে রাখত, মানে কোন অধ্যায়ের কিছুটা মুখস্ত করে ছেড়ে দিয়ে অন্য আরেকটা অধ্যায়কে ধরছে না। এই আগে পরে হওয়ার কারণ হল, কোথাও হয়তো কোন যজ্ঞ করতে হবে, সেই যজ্ঞে যে অধ্যায়ের মন্ত্রগুলো দরকার হবে তখন গুরু বলে দিলেন যে আগে এই অধ্যায়টা মুখস্ত করে নাও, পরে যজ্ঞ শেষ হয়ে যাওয়ার পর অন্য অধ্যায় শুরু করা যাবে। শিষ্যরা যে ক্রমানুসারে মুখস্ত করেছে পরে সেই ক্রমটাকেই ধরে রেখেছে। তারপর শিষ্যরা বিবাহ করে আলাদা হয়ে হয়ে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেছে। এইভাবে ছড়িয়ে যাওয়ার পরে এদের মধ্যে আবার inter-mixing হয়ে আরও ছড়িয়ে যাওয়াতে এক এক জন বেদের একেকটা বিষয়কে ধরে রাখতে শুরু করল। শুধু যে বেদকেই ধরে রাখছিল তা নয়, বেদের পরেও পরিবারগুলিতে যে তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য যে নতুন সংস্কৃতি নতুন চিন্তা ভাবনার ধারা সংযোজিত হয়েছিল সেটাকেও ধরে রাখতে শুরু করল। এটাকেই এনারা বলতে শুরু করলেন শাখা। এইভাবে এক একটা বেদের অনেক শাখার জন্ম হল। যে পরিবারগুলির মধ্যে মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, কল্পসূত্র আর অন্য কোন অতিরিক্ত পাঠ্য যখন একই হবে তখন সেটাকে বলবে শাখা বা চরণ।

মনে করা যাক পাঁচটা পরিবার আছে, পাঁচটা পরিবারই সামবেদ মুখস্ত করছে। এখন গুরু দেখলেন যে আমার যে পাঁচজন শিষ্য আছে এদের ক্ষমতা সবার সমান নয়। তিনি এক শিষ্যকে মন্ত্র আর ব্রাহ্মণ শিখিয়ে দিলেন, আরকজনকে বললেন – তোমার বাহ্মণ জানার দরকার নেই তুমি শুধু মন্ত্র আর উপনিষদটা জেনে রাখ। এখানেই শাখা পুরো আলাদা হয়ে গেল। ঋকবেদে প্রথমে একুশটি শাখা ছিল, আর এখন মাত্র দুটো শাখা – সকল ও বাস্কল শাখাকে খুঁজে পাওয়া গেছে। সকল ও বাস্কল এনারা পরের দিককার ঋষি। এনাদের শিষ্যরা আবার কিছু কিছু জিনিস মুখস্ত রেখেছে, কিছু করেনি। যদি কেউ বলে আমি সামবেদ জানি, এটুকু বললেই হবে না, তাকে শাখা উল্লেখ করতে হবে, মানে সামবেদের কোন শাখার সে অন্তর্ভুক্ত সেটা বলতে হবে। ঋগ্বেদের যেমন প্রথম দিকে একুশটি শাখা ছিল, তেমনি কৃষ্ণযজুর্বেদের পঁচাশিটি, শুক্লযজুর্বেদ সতেরো, সামবেদের এক হাজার আর অথর্ববেদের পঞ্চাশটি শাখা ছিল। সামবেদের যে এক হাজারটা শাখা ছিল এটা আমরা জানতে পারছি পতঞ্জলি এর হাজারটা শাখাকে দেখেছিলেন, সেই সূত্রে আমরা এই তথ্য পাই। কিন্তু এই হাজারটি শাখা সামবেদের কয়েকটা ভাগকে মুখস্ত রেখেছিলেন না সবাই কতকগুলি একই জিনিস মুখস্ত রেখেছিলেন সঠিক ভাবে এখন বলা মুশকিল। কিছু দিন আগে একটা তথ্য থেকে জানা গেছে যে দুটি শাখাতে একটা একই সূক্ত পাওয়া গেছে – একটি শাখা এই সূক্তটিকে উদাত্ত আর অনুদাত্ত দিয়ে মুখস্ত রেখেছে, আরেকটি শাখা এই সূক্তকে পুরোটাই স্বরিত দিয়ে মুখস্ত করেছে। উদাত্ত আর অনুদাত্ত সহ মুখস্ত করা খুব কঠিণ হয়। একটা অনুমান করা হয় যে – এই শাখার আদিতে যিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন তাঁর হয়তো একজন শিষ্যই ছিল, গুরু হয়ত দেখলেন শিষ্যের স্মরণ শক্তি অতটা প্রখর নয় বা বুদ্ধিটাও একটু কম থাকতে পারে, কিন্তু তাকে বিদ্যা দিতে হবে তা নাহলে পুরো বিদ্যাটাই হারিয়ে যাবে। তখন হয়ত গুরু সেই শিষ্যকে বলে দিলেন – তোমাকে এর সুরটা মনে রাখতে হবে না, শুধু স্বরিত দিয়ে কবিতার মত মুখস্ত করলেই হবে। পরে এর যখন শিষ্য হল তাদেরকেও সে কবিতার মত মুখস্ত করিয়ে গেছে।

ম্যাক্সমূলারের লোকেরা যখন ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বেদের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করতে শুরু করল তখন একই বিষয় বস্তু দুটো আলাদা শাখায় পাওয়া যেতেই তারা অবাক হয়ে গিয়েছিল। শুধু একটাই পার্থক্য দেখা গেল, একটা শাখাতে সুর দিয়ে আছে আরেকটা শাখাতে সুর দিয়ে নেই। একটা শাখায় সুর আছে আর আরকটা শাখায় সুর নেই তাই এটাকে দুটো শাখাই ধরতে হবে। আবার আরেকটা শাখাতে দেখা যায় কিছু কিছু মন্ত্রের সুরই হারিয়ে গেছে। অনেকে বলেন আজ পর্যন্ত বেদের যত গুলি শাখা পাওয়া গেছে এর বাইরেও

আরও কিছু শাখা আছে, ম্যাক্সমূলার যখন বেদ সংগ্রহের কাজ করছিলেন তখন অনেক পণ্ডিত তাঁদের পাণ্ডুলিপি ম্যাক্সমূলারের লোকেদের না দিয়ে লুকিয়ে রেখেছিল। এখনও এই রকম অনেক শাখা পাণ্ডুলিপি রূপে থেকে গেছে, ছাপাই হয়নি। যদিও কেউ এই পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করে ছাপে, তাতেও এগুলো সত্যিই বেদ কিনা বিদ্বৎ পণ্ডিতদের দিয়ে বিচার করেও বোঝা সম্ভব হবে না। আকবরের সময় একটা উপনিষদ লেখা হয়েছিল, তার নাম দেওয়া হয়েছিল আল্লাহোপনিষদ, যাতে বলা হয় আল্লাই সব কিছু। এখন আমরা এটাকে উপনিষদ হিসাবে কতটা মান্যতা দেব? কোন পণ্ডিত একটা পাণ্ডুলিপি নিয়ে এসে বলে দিতে পারেন এটা বেদের অঙ্গ। এমন কি কোন বেদের অঙ্গ সেটাও বলে দেবেন। যদি বলা হয় – কিন্তু কেউ তো এখন এটাকে বেদ বলে জানেনা। তখন পণ্ডিত বলবে – যে বেদগুলো লুপ্ত হয়ে গেছে এটা তারই একটা শাখা। এই ভাবে দিনে দিনে উপনিষদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। যদি বলা হয় এই উপনিষদের আগের মন্ত্র, ব্রাহ্মণ এগুলো কোথায়? তখন বলবে ওগুলো হারিয়ে গেছে। এখন এর প্রতিবাদ কে করতে যাবে আর কিভাবেই বা প্রমাণ করবে যে এটা সেই হারিয়ে যাওয়া বেদেরই একটা অংশ। প্রথমে আটাত্তরটি উপনিষদের নাম শোনা যেত, এখন দুশোটা উপনিষদ তৈরী হয়ে গেছে।

বেদের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

পৈলা, বৈশম্পায়ন, জৈমিনি আর সুমন এনারা ব্যাসদেবের শিষ্য ছিলেন। এর আগে আমরা দেখেছি কিভাবে কৃষ্ণযজুর্বেদ আর শুক্লযজুর্বেদ সৃষ্টি হয়েছিল। যাজ্ঞবল্ক্য তাঁর গুরু বৈশম্পায়নকে ত্যাগ করে আলাদা ভাবে উপাসনা করে সূর্যের কাছে পুরো বিদ্যাটাই পেলেন যেটা তিনি ত্যাগ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণ আর শুক্ল যজুর্বেদে সেই একই জিনিস রয়েছে কিন্তু অধ্যায়গুলো আগে পরে করে আলাদা ভাবে সাজানো। যেমন তৈত্তরীয় শাখা, আর এর আছে বাৎসরীয় শাখা, এই দুটো শাখার সংহিতার অংশের অধ্যায়গুলোর সাজানটা আলাদা। যদি অধ্যায়গুলিকে আলাদা ভাবে সাজান হয়ে থাকে তাহলে তখন সেটা একটা আলাদা শাখা হয়ে যাবে। যেমন কঠোপনিষদকে বলা হয় পিপ্পলাদ শাখা। যদি পিপ্পলাদা শাখার বেদের শৌনক শাখা কোথাও পাওয়া যায় সেখানে কঠোপনিষদ থাকতে পারে আবার নাও থাকতে পারে।

শুক্লযজুর্বেদের শতপথ ব্রাহ্মণ খুব বিখ্যাত। অনেক কিছুর ব্যাখ্যা করার সময় শতপথ ব্রাহ্মণের কথা উল্লেখ করা হয়। শঙ্করাচার্যও গীতার ভাষ্যে অনেক জায়গায় কোন কথা বলে বলছেন – শতপথ ব্রাহ্মণে এভাবে বলা আছে বা শতপথ ব্রাহ্মণে আমরা এই কথা পাই। ব্রাহ্মণে যদিও প্রধানত যজ্ঞের কথাই বলা হয়েছে কিন্তু কিছু কথা ও কাহিনীও পাওয়া যাবে। সামবেদের প্রচুর ব্রাহ্মণ পাওয়া যায়। অথর্ব বেদের গোপদ ব্রাহ্মণও খুব নামকরা। অথর্ব বেদের ব্রাহ্মণ একটাই কিন্তু আরণ্যক কিছু নেই। অথর্ব বেদে মন্ত্র, ব্রাহ্মণ থেকে সোজা উপনিষদে চলে গেছে, মাঝখানে আরণ্যক নেই। অথর্ব বেদের উপনিষদ – প্রশ্ন, মুণ্ডক ও মাণ্ডুক্য। আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, অর্থশাস্ত্র এগুলিকে উপবেদ বলা হয়। এগুলোর মধ্যে আবার শুক্ল ও কৃষ্ণ যজুর্বেদের দুটোতে একই জিনিস পাওয়া যাবে। যেমন দুটোরই উপবেদ ধনুর্বেদ। এসব তথ্য যদিও কোন বিশেষ কাজে লাগবে না, কিন্তু বেদ পড়তে গেলে এই তথ্যগুলি জানা থাকলে বেদ পাঠ করতে অনেক সহজ হয়ে যাবে।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পুরোহিত। যজ্ঞের সময় ঋগ্বেদের যে পণ্ডিত আসন গ্রহণ করতেন তাঁকে বলা হত হোতা বা হোত্রি। যজুর্বেদ থেকে যিনি পুরোহিত হবেন তাঁকে বলা হয় অদ্বর্জু। যিনি অর্ঘ অর্পণ করেন তাঁকে অদ্বর্জু বলা হয়, যজ্ঞে তিনি খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ঋগ্বেদের ব্রাহ্মণ পর পর শুধু মন্ত্রগুলি বলে যাচ্ছেন, আর যজুর্বেদের ব্রাহ্মণ আহুতিটা যজ্ঞে ঢালতে থাকেন। সামবেদের ব্রাহ্মণকে বলা হয় উদ্গাতা বা উদ্গাত্রি, যিনি উদ্গীত গান করেন। উদ্গীতকেই বলা হয় সামগান। অথর্ব বেদের ব্রাহ্মণকে বলা হয় ব্রহ্মা, উনি হলেন পর্যবেক্ষক। ব্রহ্মা কিছুই করবেন না, কিন্তু যজ্ঞের সব কিছু ঠিক ঠিক ভাবে চলছে কিনা সব লক্ষ্য রাখেন। সেইজন্য অথর্ব বেদের পুরোহিতকে পুরোটাই জানতে হত। সামগান ঠিক সুরে ছন্দে হচ্ছে কিনা, যজ্ঞে আহুতি ঠিকমত হচ্ছে কিনা, আর ঋগ্বেদের ঋচাগুলি ঠিক ঠিক সুর লয়ে হচ্ছে কিনা, সব কিছুতে নজর রাখা ছিল ব্রহ্মার কাজ। ইদানিং কালে চারজনের পরিবর্তে দুজন থেকে গেছেন আর তাঁদের নামও পাল্টে গেছে –

পুরোহিত আর তন্ত্রধারক। কিন্তু উপনয়নের মত কিছু সামাজিক অনুষ্ঠানে বিশেষ করে পরম্পরা মতে যেসব অনুষ্ঠান হয় সেখানে তন্ত্রধারকের পরিবর্তে ব্রহ্মার ভূমিকাকে এখনও কোথাও কোথাও ব্যবহার করা হয়। তন্ত্রমতে যত পূজা হবে সেখানে তন্ত্রধারক বলা হয়। কিন্তু বৈদিক মতের অনুষ্ঠানে ব্রহ্মা থাকেন পর্যবেক্ষক হিসাবে, আর পুরোহিত সব ধরণের অনুষ্ঠানেই থাকে। তবে এখনও ভারতের কোন কোন জায়গায়, বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতে কেরল অঞ্চলে যজ্ঞ-যাগে হোতা, অদ্ধর্জু, উদ্‌গাতা ও ব্রহ্মা চারজন পুরোহিতকেই রাখা হয়।

সামবেদে একটা মজার ব্যাপার হল, সামবেদে বলছে এর হাজারটা শাখা কিন্তু মন্ত্রের সংখ্যা মাত্র ১৮৭৫, যেখানে ঋগ্বেদে ১০২৮টি সূক্ত আর ১০৪৬২টি ঋচা আছে। কিন্তু সামবেদের যে এতগুলো ব্রাহ্মণ – বংশ, জৈমিনীয়, তাণ্ডীয়, ছান্দোগ্য, সংবিধানীয়, ষট্‌বংশীয় ইত্যাদি, এর সব কটাই একজন মুখস্ত করবে না। হয়তো এর চারটেকে মুখস্ত করল আর বাকি চারটেকে বাদ দিয়ে দিল, তখনই এর শাখা আলাদা হয়ে যাবে। তেমনি কৃষ্ণযজুর্বেদে পাঁচটি উপনিষদ আছে, এর মধ্যে হয়তো সে তিনটে মুখস্ত করেছে বাকি দুটো করেনি তখন এর শাখা আলাদা হয়ে যাবে। এই ভাবে বিভিন্ন শাখা আলাদা হয়েছে।

বেদের ভাষা নিয়ে আমরা এর আগেও কিছু আলোচনা করেছি। বেদের ভাষা যে শুধু সংস্কৃত নয় খুবই প্রাচীন সংস্কৃত। ভাষার সুরকে তিন রকম করা হয়েছে – উদাত্ত, অনুদাত্ত আর স্বরিত। কখন সুরটা উপরে যায় আবার নীচে যায় আবার সমান থাকে, উদাত্তে সুর উপরে যাচ্ছে, অনুদাত্তে সুরটা নীচে আসে আর স্বরিততে সুর সমান থাকে। যাস্ক, যিনি ৭০০ খ্রীষ্টপূর্বে ছিলেন, তিনি বেদের শব্দগুলির অর্থকে ব্যাখ্যা করার জন্য নিরুক্ত রচনা করলেন। যাস্ক যে প্রথম নিরুক্ত লিখেছেন তা নয়, তাঁরও আগে পরম্পরা ছিল। যাস্ক নিজেই উল্লেখ করছেন যে তিনি এই নিরুক্ত কৌস্তভ বলে একজন ঋষি ছিলেন তাঁর লেখা নিরুক্তকে আধার করে লিখেছেন, কৌস্তভ আবার আরেকজনকে আধার করে লিখেছেন। এগুলোর পর পর উল্লেখ পাওয়া যায়। যাস্ক যখন এই নিরুক্ত লিখেছেন তখনই বেদের ভাষা খুব কঠিণ হয়ে গেছে। এই কারণেই বলে যে বেদ বোঝা অত্যন্ত কঠিণ।

বেদের কবিতা খুবই উচ্চমানের। এর মধ্যে একটা ছন্দ সব সময় থাকবে। আর ছন্দগুলি সুন্দর করে একেবারে বেঁধে দেওয়া আছে, এর বাইরে থাকবেই না। বেদের সবটাই ছন্দে বাঁধা। একটা কবিতাতে যদি চারটে লাইন থাকে তাহলে একটা লাইনে এক ধরণের কথা বলবে, পরের লাইনে অন্য কথা বলবে না। প্রত্যেকটা লাইনই এক অপরের পরিপূরক। যেমন ধরা যাক – জনগণমনধিনায়ক জয় হে ভারত ভাগ্যবিধাতা, এখানে একই জিনিস বলা হচ্ছে। কিন্তু কিছু কবিতা আছে যেখানে ভাবটা একই থাকবে কিন্তু চারটে লাইনে চার রকম কথা বলা হবে। বেদে কিন্তু এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়নি। আবার চারটে চারটে করে যদি পদ থাকে সেখানে সব পদের মধ্যে একটা যোগসুত্র পাওয়া যাবে। একটা পদ পাঠক-পাঠিকাকে আরেকটা পদে পৌঁছে দিচ্ছে। জনগণমনধিনায়কের মধ্যে পাঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা যে পদটা যেখানে আছে তাকে যদি আগে পরে করে দিই তাতে কবিতার কোন পরিবর্তন হবে না। তার অর্থ হল পদগুলি পরিপূরক নয়। আরও ভালো বোঝা যাবে যদি বলি রামকথার অধ্যায়গুলি আগে পরে করে দেব, তাহলে রাবণ আগে মরে যাবে আর সীতার বিয়ে পরে হবে। এটা আমরা কখনই করতে পারব না, অর্থাৎ এখানে অধ্যায়গুলো একে অপরের সাথে সংযুক্ত আছে। আবার এক একটা অধ্যায়ে যে ছোট ছোট ভাগ আছে সেগুলোও এক অপরের পরিপূরক। একটা পরিচ্ছেদ আরেকটা পরিচ্ছেদের দিকে এগিয়ে যায়। যেমন – দশরথ বশিষ্ট মুনিকে নিয়ে বসে আছেন, বিশ্বামিত্রের আগমন। আমরা কখনই এখানে বলতে পারব না যে বিশ্বামিত্র দশরথের আগে এসে বসে আছেন। এভাবে লেখা হলে কাহিনীটা ভেঙ্গে যাবে। বেদও ঠিক এই নিময়ই অনুসরণ করেছে। এটা এইজন্য বলা হচ্ছে না যে এগুলো ভালো আর ঐগুলো খারাপ, বেদের সাহিত্য রচনা কি পদ্ধতিতে লেখা হয়েছে সেটা আলোচনার জন্য শুধু বলা হল। আবার বেদের সব পদই যে একটার সঙ্গে আরেকটার সম্পর্ক থাকবে তা নয়, কিন্তু বেশির ভাগ পদেই সম্পর্ক বজায় রেখে রচিত হয়েছে।

পরবর্তি কালে ভারতে যত ধরণের কাব্য রচিত হয়েছে তা পুরোপুরি বেদের পদ্ধতিকে আধার করেই রচিত হয়েছে। প্রথম নিলেন বাল্মীকি, তিনি রামায়ণ রচনা করলেন, বেদের শৈলীকেকে অনুসরণ করেই রচনা

করেছেন। হনুমান এক ঘুঁষি মারল সে একশ যোজন দূরে গিয়ে ছিটকে পড়ল – যে কেউ এই কথা শুনলে বলবে বাল্মীকি অতিরঞ্জিত করে বাড়িয়ে বলছেন। এই ধরণের অতিরঞ্জিত ব্যাপার আমরা বেদেই পাই, যদিও অতিরঞ্জিত কিন্তু কাব্যের সৌন্দর্যের উৎকর্ষতাকে আরও বাড়িয়ে দেয়। কোন ধরণের কাজকে, কোন ভাবকে বোঝাবার জন্য কবিতার মধ্যে নতুন নতুন শব্দ আর ছন্দ দিয়ে এত সুন্দর করে সাজাবে যে পাঠকের মনের মধ্যে গেঁথে যাবে। বেদের কবিতাও ঠিক এই ধরণের। তাই বিশ্বের কাব্য রসিকরাও বেদের কবিতাকে অত উচ্চমানের বলে স্বীকার করেন। স্বামীজীও বেদের কবিতার মাধুর্যকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বলছেন যে বেদের কবিতার সামনে অন্য কোন কবিতা দাঁড়াতে পারেনা। নাসদীয় সূক্তের আলোচনাতে স্বামীজীর যে মন্তব্য করেছেন তাতেই এই প্রশংসার কথা আমরা জানতে পারি। নাসদীয় সূক্তে ঘন অন্ধকারের যে বর্ণনা করা হয়েছে তাতে স্বামীজী কালিদাসের তুলনা করে বলছেন যে কালিদাস বর্ণনা করছেন সুচীভেদ্য অন্ধকার, এমন ঘন অন্ধকার যে সেই অন্ধকারকে ছুঁচ দিয়ে ভেদ করা যায় না। আর এই ঘন অন্ধকারকেই বেদের নাসদীয় সূক্তে বলছে অন্ধকার অন্ধকারে ঢাকা। অন্ধকারকে কবি আর বোঝাতে পারছেন না, তাই বলছেন অন্ধকার অন্ধকারে ঢাকা। এখানে একটা সমস্যাও হয়, অন্ধকার অন্ধকারে আচ্ছাদিত এটা কি কবিতা না দর্শন? ভারতের পণ্ডিতরা বলবেন এটা কবিতা কোন সন্দেহ নেই কিন্তু এর মধ্যে রয়েছে এক উচ্চ দর্শন, এই তত্ত্বকে তোমাকে বাস্তব সত্য বলে তাত্ত্বিক অর্থে গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু পাশ্চাত্যের পণ্ডিতরা বলবেন এটা কবিতা ছাড়া আর কিছু না। ভারতীয় ঋষিদের ক্ষমতার ব্যাপারে এদের কোন ধারণাই নেই, কারণ তাদের একমাত্র ঋষি হলেন যীশু খ্রীষ্ট। কবিতা পুরো আলাদা একটা ক্ষমতা, কবিত রচনা করাটা একটা মেধা, সবার মধ্যে এই ক্ষমতা থাকেনা, যীশু খ্রীষ্ট, ঠাকুর এনাদের মধ্যে এই কবিত্ব ছিলনা, তাঁরা কোন কবিতা রচনা করেননি, কিন্তু স্বামীজীর মধ্যে কবিত্ব ছিল, তাঁর বাংলা কবিতাগুলি অত্যন্ত উচ্চমানের। ঠাকুর দু-চারটে গ্রাম্য ছড়া জানতেন, আর কিছু গান জানতেন, এর বাইরে তাঁর কবিতার ব্যাপারে বিশেষ কিছু জানা ছিল না। খ্রীষ্টানরা জানেই না যে দর্শনকেও কবিতার মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়। স্বামীজী নিজেও দর্শনকে কবিতার মাধ্যমে উপস্থাপনা করেছেন, বিশেষ করে তাঁর সন্ন্যাসীগীতি একদিকে উচ্চ দর্শন আবার অন্য দিকে খুবই উচ্চমানের কবিতাও। মানবজাতির যত মৌলিক দর্শন আছে তার সবটাই বেদ কবিতার মাধ্যমে লিপিবদ্ধ করে ভারতের সাহিত্য রত্নভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে গেছে।

বেদে অনেক ধরণের ছন্দ পাওয়া যায়। সাধারণ ভাবে চারটে পদে (স্তবক) বেদের একটা মন্ত্র পূর্ণ হয়, কিছু কিছু ক্ষেত্রে তিন বা পাঁচটি পদেও মন্ত্র রচনা করা হয়েছে, তবে ছয় পদের উপরে কোন কবিতা হয় না, ছয় পদের উপরে কবিতা গুলিকে সুর ও ছন্দে বাঁধা খুব কঠিণ হয়। আর প্রত্যেকটি পদে আট, এগারো বা বারোটা করে অক্ষর থাকবে, তবে কখন কোথাও অন্য সংখ্যাও থাকতে পারে। সংস্কৃতে দুই রকমের ছন্দ হয় একটা আক্ষরিক আর দ্বিতীয়টা মাত্রিক। সংস্কৃতে মূলতঃ আক্ষরিক মাত্রাকেই ব্যবহার করা হয়। এখানে অক্ষরের সংখ্যাকে গোণা হয় শব্দের উচ্চারণের মাত্রা অনুযায়ী, সেখানে দীর্ঘস্বর থাকুক, অক্ষর একা থাকুক কি যুক্ত থাকুক তাতে কিছু আসবে যাবে না, অক্ষর গোণার ক্ষেত্রে উচ্চারণই একমাত্র ভিত্তি। গীতার প্রথম শ্লোকেই জিনিসটা পরিষ্কার বোঝা যায় – *ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ* – এখানে ‘ধর্ম’ যুক্তাক্ষর, ‘ধ’ ও ‘ম’ দুটো অক্ষর, রেফ্‌কে অক্ষর হিসাবে ধরা হবে না, কিন্তু এটাকেই যদি ‘ধরম’ লেখা হত তখন তিনটে অক্ষর গোণা হবে। ঠিক সেই রকম ‘ক্ষে’ এর মধ্যে ‘ক’ আছে আর ‘ষ’ আছে আবার ‘এ’কার আছে, এটাকেও একটা অক্ষর গোণা হবে। আক্ষরিক ছন্দে ‘ক্ষে’কে একটাই অক্ষর ধরা হবে কিন্তু, যখন মাত্রিক মাত্রায় গোণা হবে তখন দুটো অক্ষর ধরবে।

চারটে করে পদ, প্রত্যেকটা পদে যদি এইভাবে আটটা করে অক্ষর থাকে (৮x৪) তখন এই ছন্দের নাম অনুষ্টুপ ছন্দ, গীতার বেশির ভাগ শ্লোক অনুষ্টুপ ছন্দের আর সমগ্র মহাভারত মোটামুটি অনুষ্টুপ ছন্দেই রচিত হয়েছে। ঠিক সেই রকম আট পাঁচ, আট ছয়ও হতে পারে, কিন্তু সাধারণত ছয়ের উপরে থাকে না। আর যেমন যেমন অক্ষরের সংখ্যা কম বেশি হবে আর পদের সংখ্যাও যেমন যেমন কম বেশি হবে তখন সেটাই এক একটা ছন্দ হবে। গায়ত্রী ছন্দে তিনটে লাইন আর আটটা করে মাত্রা বা অক্ষর থাকবে। পঙতি ছন্দে

পাঁচটা পদ আর আটটা অক্ষর, বেদে এই ছন্দ অনেকবার ব্যাবহার হয়েছে। জগতি ছন্দ এখনও খুব জনপ্রিয়। বেদে মোটামুটি এই চার ধরণের ছন্দ – অনুষ্টুপ, গায়ত্রী, পঙতি ও জগতি ছন্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

এখন 'অগ্নিমীডে পুরোহিতং(১) যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্(২)। হোতারং রত্নধাতমম্(৩)' ঋগ্বেদের প্রথম মন্ত্র, এক, দুই ও তিনটি পদের মাত্রাগুলি আটটা অক্ষরে সাজান হয়েছে। সংস্কৃতের ব্যাকরণ একবার বুঝে গেলে অক্ষর গোণার আর সমস্যা হবে না। সংস্কৃত ভাষা একেবারে ব্যাকরণের ছকে বাঁধা। এইটাই সংস্কৃতের শক্তি। তবে যার যেটা শক্তি সেটাই আবার তার দুর্বলতার জায়গা। ডাইনোসরাসের মত প্রাণীরা লুপ্ত হয়ে গেল কেন? এত বিশাল শরীর, কিন্তু যখন খাদ্য সংকট দেখা দিল প্রথমে ডাইনোসরাসরাই হারিয়ে গেল। এটাই প্রকৃতির নিয়ম, সেইজন্য বলে কোন কিছুই বেশি করতে নেই, একটা জায়গায় গিয়ে ইতি টানতে হয়। সংস্কৃত ভাষাকে এত বেশি নিয়ম-কানুনে আবদ্ধ করে দেওয়ার ফলে সংস্কৃতের জনপ্রিয়তা হারিয়ে যাচ্ছে।

বেদের পণ্ডিত, বেদের ছাত্র সবাইকে একটা প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়, বেদে নাকি অনেক জাগতিক ব্যাপার রয়েছে। কিন্তু বেদের পণ্ডিতরা বলেন বেদে জাগতিক ব্যাপার বলে কিছু নেই। যেমন অনেক বিবাহের কথা বেদে আছে। একটা খুব স্পর্শকাতর সূক্ত আছে যেখানে দেখান হয়েছে যে একটি অল্প বয়সী সদ্য বিধবা তার মৃত স্বামীকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে কাঁদছে, আর একজন কেউ এসে তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে, সে যে কেউই হতে পারে, মেয়েটিকে বিয়ে করতে চায় এমন কোন পুরুষ, বা তার ভাই হতে পারে, মৃত স্বামীর ভাই হতে পারে। সে খুব হৃদয়ের আবেগ দিয়ে মেয়েটিকে বোঝাচ্ছে – দ্যাখো, যে যাবার সে অন্য জগতে চলে গেছে, এখন তুমি তোমার বাকী জীবনের কথা ভাব। এই ধরণের কিছু কবিতা আছে যেগুলোকে অনেকে বলে এগুলো বেদের পার্থিব জগতের কবিতা। আরেকটা সূক্ত আছে সেখানে বলছে – ব্রাক্ষ্মণরা সামগান করছে আর এদের গানগুলো শোনাচ্ছে যেন বর্ষাকালে ব্যাঙগুলি গ্যাঁও গ্যোঁ করে আওয়াজ করছে। পণ্ডিতরা কিন্তু বলছেন এর কোনটাই জাগতিক কবিতা নয়, কারণ যদি কোথাও অনাবৃষ্টি চলতে থাকে তখন এই সূক্তটাই যদি কোথাও ঠিক ঠিক গান করা হয় তাহলে বৃষ্টি হবে। আর আগের যে সূক্তের কথা বলা হল, তার ব্যাপারে বলছে, মানুষ যদি কখন মৃত্যুজনিত কোন প্রচণ্ড আঘাত পায় তখন তাকে যদি এই মন্ত্রগুলি শোনান হয় তাহলে সে তার শোককে জয় করতে পারবে। ঠিক এই রকম আরেকটা সূক্ত আছে এক জুয়াড়িকে নিয়ে। একজন খুব জুয়া খেলে সব কিছু খুইয়ে নিঃস্ব হয়ে গেছে। ক্রন্দন করে বলছে – আমার এত দিনের যা কিছু সঞ্চয় ছিল সব শেষ হয়ে গেছে, আমি কি করে বাড়ি ফিরব, আমার স্ত্রী আর আমার মুখের দিকে তাকাবে না, আমার মা-বাবা, যাঁরা আমাকে এত স্নেহ করেন, তাঁরাও আমাকে উপেক্ষার দৃষ্টিতে এড়িয়ে যাবে। খুব মজার কবিতা, শেষে বলছে – ভাইরে ভাই, তোদের সবাইকে বলি, আর যাই করিস জুয়া যেন খেলতে না যাস। আপাত ভাবে শুনলে মনে হবে একেবারেই সাদামাটা জাগতিক কবিতা। কিন্তু পণ্ডিতরা বলছেন যাদের জুয়া খেলাতে প্রচণ্ড নেশা আছে তাদের এই সর্বস্বান্তক নেশাকে যদি ছাড়াতে হয় তাহলে এই মন্ত্রের দ্বারা যদি তাকে উপচার করা হয় তার জুয়া খেলার নেশা চলে যাবে।

বেদে আবার উর্বশী পুরুরবা সংবাদ নামে কিছু কিছু পৌরাণিক সংলাপও আছে। কিন্তু এগুলোরও পৌরাণিক মূল্য আছে শুধুই সাহিত্য নয়। ফ্রান্সের একজন খুব নামকরা সাহিত্যের গবেষক খুব কড়া ভাষায়, যদিও তিনি ফ্রান্সের লোক, বলছেন – বেদে সাহিত্য বলে কিছু নেই, যা কিছু বেদে আছে তা হয় ধার্মিক নয়তো আধ্যাত্মিক। শুধু যে কাহিনীই আছে তা নয়, খুব মজার ধাঁধাও আছে, একটা ধাঁধা আছে যেখানে দশটি দেবতার ব্যাপার নিয়ে। ইদানিং যেমন স্কুলে ছাত্রদের ভর্তির জন্য পরীক্ষা দিতে হয়, তখনকার দিনে গুরুর কাছে যখন শিষ্যরা বিদ্যার্জনের জন্য যেতেন তখন গুরুও ছাত্রকে অনেক পরীক্ষা করে শিষ্য করতেন। এখানে দশটি দেবতার নাম বলে তাদের চরিত্রের বর্ণনা করা হয়েছে, একটা নাম বলে তার চরিত্র বর্ণনা শুনে বলতে হবে কোন দেবতার কথা বলা হচ্ছে। তুমি বেদ পড়তে আসছ দেবতার সম্বন্ধে তোমার ধারণা কি রকম সেটা জানার জন্য এই ধরণের ধাঁধা বেদে দেখা যায়, এটাও অবশ্য একটা ব্যাখ্যা। এ ছাড়া ঐতিহাসিক, ভৌগলিক সংক্রান্ত অনেক তথ্যও বেদে আছে। ভৌগলিক তথ্য দ্বারা অনুমান করা যায় যে বৈদিক সভ্যতা পাঞ্জাবের কাছাকাছি কোথাও শুরু হয়েছিল। ঐতিহাসিক তথ্যের মধ্যে একটা জায়গায় দেখা যায় যে বলা হচ্ছে – তারা

দাসদের পরাজিত করেছে। দাসদের হারিয়েছে বলতে পণ্ডিতরা বলছেন আর্যরা এসে অনার্যদের হারিয়েছে। এরাই মহেঞ্জদারো হরপ্পা আবিষ্কারের পর বলতে শুরু করল মহেঞ্জদারো হরপ্পার বাসিন্দারা ছিল অনার্য, এদেরকেই আর্যরা হারিয়েছে। আরও গবেষণার পর সত্যটা জানা গেল, মহেঞ্জদারো হরপ্পা আর্যদেরই নাকি সভ্যতা ছিল। যদি মারামারি কাটাকাটি হত তাহলে কিছু মৃতদেহের কঙ্কাল পাওয়া যেত। সমগ্র মহেঞ্জদারোর খনন কার্য চালিয়ে ঘর, বাড়ি, বাসন, অস্ত্রশস্ত্র সবই পাওয়া গেছে কিন্তু একটা কোন প্রাণীর কঙ্কাল পাওয়া গেল না। তখন ঐতিহাসিকরা স্থির সিদ্ধান্তে এলেন, বন্যা বা অন্য কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে লোকজন অঞ্চল ছেড়ে অন্য নিরাপদ জায়গায় চলে গিয়েছিল। ঐতিহাসিক পণ্ডিতরা এক এক সময় এক একটা মত নিয়ে আসে। কিন্তু পরম্পরার পণ্ডিতরা বলেন – দাস মানে, যার মধ্যে আসুরিক বৃত্তি আছে। যদি কোন বাক্যে থাকে ইন্দ্র আক্রমণ করে দাসগুলিকে হারিয়ে দিল। একে যদি ঐতিহাসিক কবিতা বলে মনে করা হয় তাহলে এর অর্থ এক রকম হবে, আর যদি বলা হয় এটা একটা প্রার্থনা তখন এর অর্থ অন্য রকম করে বলবে, ইন্দ্র হলেন সেই দৈবী শক্তি আর আমাদের মধ্যে যে আসুরিক শক্তি আছে তাকে দমন করার জন্য প্রার্থনা করা হচ্ছে – হে ইন্দ্র তুমি আমাদের সাহায্য কর যাতে আমরা দাসগুলিকে হারাতে পারি। জীবন জীবিকার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বেদের সময় চারটে বর্ণ এসে গিয়েছিল। কিন্তু বাল্মীকি রামায়ণ বা মহাভারতের সময়ের মত বর্ণাশ্রম অতটা দৃঢ় ছিল না। যেমন একজন বলছে আমার বাবা ব্রাহ্মণ আমার মা ক্ষত্রিয় আর আমি নিজে শূদ্রের কাজ করি। তার মানে বেদে একই পরিবারের সদস্য কেউ ব্রাহ্মণের কাজ করছে কেউ ক্ষত্রিয়ের কাজ করছে।

এখন আমরা বেদের প্রথম সূক্ত নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি। বেদের প্রথম সূক্ত তাই আমাদের সবারই এর বক্তব্য জানা দরকার। একটা সূক্ত জানা থাকলে বেদের ঋচাগুলি কি রকম আর তা কিভাবে লেখা হয়েছে একটা ধারণা হবে। ঋষিদের পরম্পরা আমরা শুনে এসেছি যে যখন কোন যজ্ঞে দেবতাদের আবাহন করা হত তখন দেবতারা সশরীরে সেই যজ্ঞস্থলে হাজির হতেন। সমস্ত দেবতাদের তাঁদের পদমর্যাদা অনুযায়ী যজ্ঞের ভাগ দেওয়া হত। যজ্ঞের ভাগ নিয়ে আবার দেবতাদের মধ্যে বিবাদ বিতণ্ডার ঘটনাও অনেক আছে। আগেকার দিনে ভারতে ডাক্তারদের সম্মান খুব একটা ছিল না। ঠাকুরও ডাক্তারদের দেওয়া সামগ্রি স্পর্শ করতে পারতেন না। কেন জানা যায় না, ডাক্তারি পেশাকে খুব হেয় নজরে দেখা হত। দেবতাদের মধ্যেও ডাক্তারদের প্রতি এই হেয় মনোভাবটা বরাবরই ছিল। অশ্বিনীকুমারদ্বয় ছিলেন দেবতাদের ডাক্তার। দুই দেবতাদের যজ্ঞের কোন ভাগ দেওয়া হত না। পরে অবশ্য দুজনই যজ্ঞের ভাগ পাবার অধিকারী হয়েছিলেন। মহাভারতে এর এক লম্বা কাহিনী আছে। শিবও প্রথমের দিকে যজ্ঞ ভাগের অধিকারী ছিলেন না।

বেলুড় মঠে বা মঠের অন্যান্য কেন্দ্রে যজ্ঞের সময় বলা হয় – *শ্রীরামকৃষ্ণ সপার্ষদ ইহাগচ্ছ ইহ তিষ্ট ইহ সন্নিধি কুরু*। এটি একটি মন্ত্র, মন্ত্রে ঠাকুরকে আবাহন করে বলা হচ্ছে হে প্রভু শ্রীরামকৃষ্ণ আপনি আপনার পার্ষদের নিয়ে এই স্থানে আসুন এবং অবস্থান করুন। যদি কেউ প্রশ্ন করে এসব মন্ত্রের কি কোন প্রাসঙ্গিকতা বা মূল্য আছে? ঋষিরা কবে কি বলে গেছেন আর তার সত্যতাকে এখনও আমাদের অনেকের মনে সন্দেহের বাতাবরণ তৈরী করে। কিন্তু এই যুগে আমাদের কাছে আছে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন। ঋষিদের কথার সত্যতাকে যাচাই করার সব থেকে বড় মানদণ্ড ঠাকুরের জীবনের বহু ঘটনা। ঠাকুর যখন পূজো করতে বসতেন তখন তিনি হাতের তালুতে জল নিয়ে 'রং' বীজ মন্ত্রোচ্চারণ করে তাঁর চতুর্পার্শ্বে ছিটিয়ে দিতেন। পূজার সময় বাইরে থেকে যে সব বিঘ্ন হওয়ার সম্ভবনা থাকে এই বীজ মন্ত্রের দ্বারা সেই বিঘ্নকে নাশ করে দেওয়া হল। যে কোন ভালো জিনিস করতে গেলে নানা ধরণের বিঘ্ন আসবেই। ঠাকুর নিজের মুখে বলছেন তিনি যখন 'রং' বীজ মন্ত্রে চারপাশে জল ছিটিয়ে দিতেন তখন তিনি পরিষ্কার দেখতে পেতেন আগুনের একটা বলয় তাঁকে ঘিরে রেখেছে। অগ্নির ঐ বলয়কে অতিক্রম করে আর কেউ পূজাস্থলে প্রবেশ করতে পারবে না। আমাদের সেই চিত্তশুদ্ধি নেই, সেই পবিত্রতার পরাকাষ্টা আসেনি তাই আমরা এসব দেখতে পাইনা। ঠাকুরের জীবনের এটাই মাহাত্ম্য যে তিনি এগুলো পরিষ্কার দেখতে পেতেন। ঠাকুর তো নাম-যশের কাঙ্গাল ছিলেন না, তাঁর তো কোন প্রয়োজন নেই মিথ্যা কথা বলার। বেদের ঋষিরাও ত্যাগ তপস্যার দ্বারা এই পবিত্রাতে পৌঁছেছিলেন, ওনারা যখনই কোন দেবতাকে যজ্ঞের সময় আবাহন করতেন দেবতারা সশরীরে এসে হাজির হতেন।

অগ্নি দেবতা

ঋগ্বেদের সব থেকে বেশি মন্ত্র ইন্দ্রের নামে। পণ্ডিতরা তাই ইন্দ্রকে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ দেবতা বলছেন। ইন্দ্রের পরেই অগ্নি দেবতা। বলা হয় ইন্দ্র আর অগ্নির নাকি একই সাথে জন্ম আর দুজনের মধ্যে খুব বন্ধুত্ব। অগ্নির নামে প্রায় দুশটি সূক্ত রয়েছে। অগ্নিকে যজ্ঞের যে অগ্নি সেই অগ্নির সাক্ষাৎ স্বরূপ মনে করা হয়। আমরা যজ্ঞের যে অগ্নি দেখছি তাকে আমরা ভৌতিক অগ্নি রূপেই দেখছি। কিন্তু ঐ ভৌতিক অগ্নির পেছনে যে আধ্যাত্মিক শক্তি রয়েছে তাঁরই নাম অগ্নি। অগ্নি মানে আগুন কখনই নয়, অগ্নি দেবতার পূজা মানে আগুনের পূজা নয়। সেই সচ্চিদানন্দকে যখন আমরা অগ্নির লেন্সের মধ্য দিয়ে দেখছি, তখন সচ্চিদানন্দকে যে অগ্নি রূপে দেখাচ্ছে, এখানে সেই অগ্নির কথা বলা হচ্ছে। সেই অগ্নিরই মূর্ত রূপ এই ভৌতিক অগ্নি, বিশেষ করে যজ্ঞের সময় যে অগ্নিকে প্রজ্জ্বলিত করা হয়। অগ্নিকে অত্যন্ত পবিত্র রূপে দেখা হত। ঐতিহাসিকরা বলেন, মানব সভ্যতার আদিম যুগে অগ্নি ও চাকা এই দুটো জিনিসের আবিষ্কার মানুষকে পশু জাতি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে সভ্যতার ক্রমবিকাশে অনেক এগিয়ে নিয়ে চলে গেল। গ্রীক সাহিত্যে প্রমিথিউস নামে এক দেবতার নাম পাওয়া যায়, যিনি মানুষের কল্যাণের জন্য অগ্নিকে চুরি করে স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে নিয়ে এসেছিলেন। এই কাজের জন্য দেবতারা তাঁর উপর অভিশাপ দিয়ে দিলেন, কারণ অগ্নি এক দৈবী জিনিস। শাস্ত্রে মাতরিশ্ব এক দেবতার নাম পাওয়া যায়, যিনি মানুষের কল্যাণের জন্য অগ্নিকে নিয়ে এসেছিলেন।

অগ্নির অনেক নাম। দেবতাদের মধ্যে অগ্নিই প্রথম দেবতা, ইদানিং কালে গণেশকেই দেবতাদের মধ্যে প্রথম দেবতা বলা হয় কিন্তু বৈদিক যুগে প্রথমে অগ্নির পূজা করা হয়, তাই অগ্নির নামই ছিল অগ্রমনীয়তে, অর্থাৎ যত দেবতারা আছেন অগ্নি সবার আগে আগে চলেন। অগ্নিকে দেবতাদের পুরোহিত মনে করা হত। যজ্ঞের সময় পুরোহিতের যেমন বিরাট সম্মান ঠিক তেমনি অগ্নিরও খুব সম্মান। আগেকার দিনে রাজারা কোন শুভকর্মে যাওয়ার সময় রাজার অগ্রে অগ্রে রাজপুরোহিত গমন করতেন। ঈজিপ্সিয়ান ট্রাডিশানেও এই প্রথা দেখতে পাওয়া যায়। ক্ষেতে প্রথম বীজবপন করার জন্য রাজাকে আহ্বাণ করা হত। রাজা যখন বীজবপন করতে যেতেন তখন রাজার অগ্রে পুরোহিতরা যেতেন। ঠিক তেমনি দেবতারাও যখন কোন শুভ কাজে যান সবার আগে অগ্নি দেবতা থাকেন। সেইজন্য অগ্নির আরেকটি নাম অগ্রমীয়তে। অগ্নির আরেকটি নাম অগ্রণির্ভবতে, অগ্রণির অর্থ নেতা, নেতা যেমন সবার আগে থাকেন, তেমনি অগ্নি সবার আগে এগিয়ে এগিয়ে যান। আবার অগ্নি দেবতা সব দেবতাদের মধ্যে প্রথম, একই ভাব এখানেও আসছে। সেইজন্য অগ্নির আরেকটি নাম *প্রথমোদেবতানাম্*। শেষে অগ্নির আরেকটি নাম বলছেন, সমস্ত দেবতাদের আগে অগ্নির জন্ম। সব দিক থেকেই অগ্নি দেবতা প্রথম। এই কারণেই ব্যাসদেব হয়ত ঋগ্বেদে হাত দিয়ে অগ্নিসূক্তমকে প্রথমেই রেখেছেন। অগ্নি দেবতাকে নিয়ে এই সংজ্ঞাগুলি পরম্পরায় চলে আসছে, পরের দিকে বৈয়াকরণরা এই সংজ্ঞা দিচ্ছেন না। এগুলো আগে থাকতেই চলে আসছে। অগ্নির আরেকটি নাম জাতবেদস। অগ্নি দেবতার এই নাম এখনও প্রচলিত। জাতবেদসের অর্থ, যে জন্ম নিয়েছে তাকে অগ্নি দেবতা জানেন। আরেকটি নাম, বিশ্ববেদস, সম্পূর্ণ সৃষ্টিকে অগ্নি দেবতা জানেন। জাতবেদস আর বিশ্ববেদসের যদি এই অর্থ হয়, তাহলে স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন আসে ভগবান ছাড়া কি কেউ কোন কিছু জানতে পারে? অগ্নি দেবতার কথা বলা হচ্ছে, কিন্তু অগ্নির বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ভগবানের বৈশিষ্ট্যকে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে আমাদের পরম্পরাতে নানা রকমের কাহিনী জড়িয়ে আছে, একটা কাহিনীতে বলা হয় দেবতারা অগ্নিকে জন্ম দিয়েছেন। একদিকে বলছেন দেবতাদের মধ্যে অগ্নি দেবতার প্রথম জন্ম আবার বলছেন দেবতারা অগ্নি দেবতার জন্ম দিয়েছেন। দেবতাদের আবার অনেক শ্রেণীবিভাগ আছে, আমাদের কাছে দেবতার যত নথিবদ্ধ নাম আছে তাঁদেরও আগে কিছু দেবতা ছিলেন যাঁরা হারিয়ে গেছেন। এনাদের পরে যে দেবতারা এসেছেন তাঁদের মধ্যে অগ্নি দেবতার সবার আগে জন্ম হয়েছে। ইদানিং কালে বেদের সময় যত দেবতা ছিলেন, সব দেবতাই চলে গেছেন একমাত্র অগ্নি দেবতাই থেকে গেছেন, এখনও অগ্নি দেবতার পূজা হয়। অগ্নির আরেকটি নাম হব্যবাহ, যজ্ঞে যে হবি দেবতাদের উদ্দেশ্যে আহুতি দেওয়া হয় সেই হবিকে দেবতা পর্যন্ত অগ্নি নিয়ে যান বলে অগ্নির একটা নাম হব্যবাহ।

অগ্নির আরেকটি নাম বরডোয়ানা, এর মূল অর্থ সমুদ্রের অগ্নি। মহাভারতে একটি কাহিনীতে বলছে একজন ঋষি কোন কারণে খুব ক্রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন, তিনি রাগে সমস্ত সৃষ্টিকে ধ্বংস করে দিতে চাইছিলেন। তিনি তাঁর তপস্যার শক্তিতে যখন সৃষ্টিকে ধ্বংস করে দিতে যাচ্ছেন তখন দেবতারা এসে তাঁকে নিষেধ করলেন। তখন তিনি বলছেন 'আমি এই যে অগ্নি সৃষ্টি করেছি গোটা বিশ্বকে ধ্বংস করার জন্য এখন এই অগ্নিকে দিয়ে যদি সৃষ্টিকে না জ্বালিয়ে দিই তাহলে এই অগ্নি আমাকেই শেষ করে দেবে। এই অগ্নি হল ক্রোধাগ্নি, আমি রেগে গেছি। এখন এই ক্রোধাগ্নিকে আমি রাখব কোথায়'। মা যখন কারুর উপর রেগে যায় তখন যার উপরে রেগে গেছে তাকে কিছু না করতে পেরে নিজের ছেলেকেই মেরে দেয়, ছেলে হয়তো কিছুই করেনি। এই ধরণের সমস্যা আগেও ছিল এখনও আছে। বাড়ি থেকে স্ত্রীর সাথে ঝামেলা করে বেরিয়ে অফিসে এসে তার অধঃস্তন কর্মচারীর উপরে সেই ঝালটা মেটাবে। সেই কর্মচারী আবার আরেকজনের কাছে ঝাল মেটাবে। এই ভাবে হতে হতে শেষে দেখা যাবে অফিসের পিওনের কাছে এসে ঝালটা মেটাবে। অফিসের পিওন কার উপরে ঝাল মেটাবে? কাউকে না পেয়ে সে ইট তুলে একটা কুকুরকে মেরে ঝাল মেটাবে। যেখানে যা গোলমাল হোক শেষে ইটটা খাবে ঐ কুকুর বা বেড়াল।

ঋষির কথা শুনে তখন দেবতারা তাঁকে বললেন 'দেখুন এই যে জল, এই জলও সৃষ্টি, এই জল থেকেই সব কিছু সৃষ্টি, আপনি আপনার ক্রোধাগ্নিকে ঐ জলে স্থাপন করে দিন'। ঋষি তখন তাঁর ক্রোধাগ্নিকে জমিয়ে সমুদ্রে রেখে দিয়ে এলেন, সমুদ্রের আগুন এখনও জ্বলছে, সেই অগ্নির নাম হল বরডোয়া। বলা হয় সেই আগুন নাকি এখনও সমুদ্রে জ্বলছে, অগ্নির জন্ম ঐ বরডোয়া থেকে।

এরপর অগ্নি দেবতার শরীরের বর্ণনা করতে গিয়ে বলছেন, অগ্নির পিঠটা যেন পুরো ঘি, তাঁর চুল যেন অগ্নির শিখার মত, দাড়িও অগ্নিশিখার মত, চোয়াল প্রচণ্ড শক্ত ও তীক্ষ্ণ, দাঁতগুলি সব সোনার। অগ্নি দেবতার আবার দুটো রূপ, আকাশের সূর্য অগ্নি দেবতার একটি রূপ আর আকাশে যে বিদ্যুৎ চমকায় সেটাও অগ্নিরই রূপ। তার মানে, সূর্যের যে প্রচণ্ড তাপশক্তি, এই তাপশক্তির পেছনে যে দিব্য শক্তি আর বিদ্যুতের পেছনে যে দিব্য শক্তি এই দুটো শক্তিই অগ্নি দেবতার। ব্রাহ্মণরা রোজ সকালে অগ্নিহোত্র করতেন। অগ্নিহোত্রে ব্রাহ্মণদের অরণিমন্থন করতে হত, প্রতিদিন সকালে অরণি কাঠ ঘষে ঘষে নতুন করে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করতে হত। সেইজন্য অগ্নির নাম হয়ে গেলে চিরযুবক। রোজ সকালে অগ্নির নতুন করে জন্ম হচ্ছে। অগ্নি দেবতা আবার যাঁরা যজ্ঞ করছেন তাঁদের মধ্যে সব থেকে যিনি বৃদ্ধ তাঁর থেকেও প্রাচীন। কারণ প্রথম যজ্ঞ যখন শুরু হয়েছিল তারও আগে থেকেই অগ্নি দেবতা আছেন। যজ্ঞ করার আগেই অগ্নিকে থাকতে হবে তা নাহলে যজ্ঞ হবে কি করে! অগ্নি দেবতা একদিকে চিরযুবক আবার অন্য দিকে প্রাচীন থেকেও প্রাচীনতম। এই বিরোধী ভাবগুলো পরের দিকে গীতা উপনিষদাদিতেও এসেছে। এই বিরোধী ভাবগুলি দিয়ে তাঁর দিব্যশক্তিকে অভিব্যক্ত করা হয়। মাতরিশ্বা হলেন যিনি অগ্নিকে স্বর্গ থেকে নামিয়েছিলেন। মাতরিশ্বার অর্থ বায়ু, বায়ু আর অগ্নির সম্পর্ক আমাদের জানা আছে, জঙ্গলে যখন আগুন লাগে বায়ু সেই অগ্নিকে বৃদ্ধি করে। এই ব্যাপারটা মাথায় রেখে তাঁরা স্বর্গ থেকে অগ্নিকে বায়ু নিয়ে এসেছিলেন এই কাহিনী বানিয়েছিলেন কিনা আমাদের জানা নেই। কারণ ভারতীয়রা পৌরাণিক কাহিনী বানাতে শ্রেষ্ঠ, যে কোন জিনিসকেই ভারতীয়রা একটা পৌরাণিক কাহিনীতে দাঁড় করিয়ে দিতে পারেন। যাই হোক, এই হল অগ্নির বৈশিষ্ট্য, কিন্তু এর মধ্যে আরেকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল অগ্নি দেবতা মানুষের মধ্যে বাস করেন যাতে মানুষের সাংসারিক অভ্যুদয় হয় আর দেবতাদের সাথে তাদের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। মানুষ দেবতাদের উদ্দেশ্যে যা কিছু শ্রদ্ধাসহ নিবেদন করে সব অগ্নির মাধ্যমে দেবতাদের কাছে পৌঁছে যায়। অগ্নি দেবতা এখানে পোস্টম্যানের মত নন, পুরোহিতের মত। মানুষের যা কিছু মঙ্গল সব অগ্নি দেবতার উপরই নির্ভর করে। সেইজন্য ঋগ্বেদে প্রথমে অগ্নি দেবতাকে দিয়ে শুরু করা হয়েছে, তারপর পরের দেবতাদির দিকে নিয়ে গেছেন।

বৈদিক যুগে ধর্ম ও ধর্মানুষ্ঠান বলতে যা কিছু ছিল তাতে অগ্নি দেবতার একটা বিরাট ভূমিকা ছিল। যজ্ঞে যা কিছু আহুতি দেওয়া হচ্ছে অগ্নি সেই আহুতিকে দেবতাদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন। মানুষের ইচ্ছাকে আবার দেবতারা পুর্তি করেন। গীতায় ভগবান বলছেন *কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্*। মানুষের যা কিছু

হয় সব কর্ম দিয়েই হয়। আমরাও জানি চাকরি করলে, কাজ করলে টাকা-পয়সা উপার্জন করতে পারব। কিন্তু তখন তো এত কাজের সুযোগ ছিল না, ধর্ম কর্ম করা, যজ্ঞাদি করা এগুলোই মূলতঃ প্রধান কর্ম ছিল। তাঁদের আবার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে স্বর্গেই সব সুখ। দেবতারা আবার প্রত্যেকটি সুখের পেছনে শক্তি হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, তাই দেবতারা চাইলেই আপনাকে সুখ দিয়ে দেবেন। তার বদলে দেবতাদের সেবা করতে হবে। কি ভাবে সেবা করতে হবে? দেবতাদের উদ্দেশ্যে আহুতি দিয়ে। আহুতি দেওয়ার সব থেকে জনপ্রিয় আর প্রধান যে ধারণা ছিল তা হল অগ্নিতে আহুতি দেওয়া। তাঁদের বিশ্বাস যে অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হলে দেবতারা সবাই সেই আহুতি পেয়ে যাবেন। আমাদের যেমন একটা বিশ্বাস যে বেলুড় মঠের মন্দিরে ঠাকুরের বিশেষ প্রকাশ, দক্ষিণেশ্বরে মা কালীর বিশেষ প্রকাশ, তখনকার দিনেও এই ধরণের একটা দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে অগ্নিতে আহুতি দিলে দেবতারা অবশ্যই পেয়ে যাবেন। কিন্তু পরের দিকে যে ধর্ম এসেছে সেখানে ধর্ম পরমাত্মাকে কেন্দ্র করে দাঁড়িয়েছে, পরমাত্মার জন্য যজ্ঞের দরকার হয় না, মন থেকে পরমাত্মাকে ডাকলে বা ধ্যান করলেই হয়ে যায়। কিন্তু বৈদিক ধর্ম দেবতা কেন্দ্রিক ছিল আর তাঁদের বিশ্বাস ছিল দেবতাদের উদ্দেশ্যে আহুতি দিলে, দেবতাদের প্রার্থনা করলে দেবতারা শোনেন। দেবতারা মানুষের মতই ছিলেন, খাওয়া-পড়া, আচার-ব্যবহার সব মানুষের মত কিন্তু ক্ষমতা মানুষের থেকে অনেক বেশি। তাহলে কি দেবতারা আমাদের ইদানিং কালের ক্ষমতাবান নেতা, আমলা, মস্তানদের মত? না, তা কখনই নয়, দেবতারা সূক্ষ্ম দেহে থাকেন, সেই সূক্ষ্ম দেহে তাঁদের ক্ষমতা অনেক বেশি হয়। পিতৃদের অতৃপ্ত আত্মাকে খুশি করার জন্য যে পূজা করা হয়, ঝড়-বৃষ্টি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ভূত-প্রেতের যে ভাব নিয়ে পূজা করা হয়, দেবতাদেরও কি সেই ভাব নিয়ে পূজা করা হত? সেই অর্থে দেবতাদের পূজা করতেন না। যিনি ভগবান, বেদে যাঁকে পুরুষ রূপে বলা হচ্ছে, তাঁর বিশেষ শক্তি প্রকাশিত হচ্ছে প্রকৃতির এই সব শক্তি দিয়ে।

যদিও অগ্নি সব জায়গাতেই আছেন, কিন্তু মূলতঃ তিনি পৃথিবীলোকের বাসিন্দা। স্বর্গের দেবতা ইন্দ্র যেমন সব জায়গাতেই যেতে পারেন, ঠিক তেমনি অগ্নিও সব জায়গায় যেতে পারেন, কিন্তু তাঁর মূল আবাস পৃথিবীলোকে। অগ্নির আরেকটি বিশেষ গুরুত্ব হল, অগ্নির সব রকমের পূজা হত। তার মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হল অগ্নির নিত্যপূজা হত। এখন যেমন আমরা সকাল-সন্ধ্যা জপ-ধ্যান করি, বৈদিক যুগে ঠিক সেইভাবে অগ্নির উপাসনা করা হত, যেটাকে অগ্নিহোত্র বলা হয়। এটা গেল অগ্নির নিত্য উপাসনা, তেমনি বিশেষ দিনে বিশেষ ভাবে উপাসনা করা হত। আবার অনেক বছর পর কোন ক্ষমতাবান রাজা হয়ত রাজসূয় বা অশ্বমেধ যজ্ঞ করছেন সেখানেও অগ্নির উপাসনা হত। সেইজন্য নিত্য উপাসনা থেকে শুরু করে একশ কি দুশো বছর পর যে একটা বিশেষ পূজা হবে সব পূজা উপাসনাতে অগ্নি দেবতা উপর থেকে নীচ পর্যন্ত জড়িয়ে আছেন। বেদের সময় অগ্নি উপাসনা বলতে যা কিছু ছিল সেটাই এখন বাহ্যিক পূজা হয়ে গেছে।

আমাদের খুব ভালো করে জেনে রাখা দরকার, সন্ন্যাসীই হন আর যেই হন, বাহ্যিক পূজা, নিত্য পূজা সবারই জীবনে প্রচণ্ড মূল্যবান। পরমহংস হওয়ার আগেই যে পূজা-অর্চনা করা ছেড়ে দিয়েছে তাকে অবশ্যই সন্দেহ করা উচিৎ। কারণ উন্নত জীবনের দিকে চলা শুরুই হয় বাহ্যিক পূজা দিয়ে। বাহ্যিক পূজা করতে করতে মানসিক পূজা শুরু হয়, মানসিক পূজাও কিন্তু পূজা। আর মানসিক পূজা থেকে সাধনা শুরু হয়। সাধনা থেকেই সিদ্ধি আসা শুরু হয়। ঠাকুর বলছেন, সন্ধ্যা লয় হয় গায়ত্রীতে, গায়ত্রী লয় হয় প্রণবে। এরপর ঠাকুর বলছেন, প্রণব হল নাদ, ঋষিরা ওই নাদকে ভেদ করে পরমাত্মার সাক্ষাৎ করেন। ঠাকুর এখানে বাহ্যিক পূজা থেকে আরম্ভ করে পুরো সাধনার পদ্ধতিটা বলে দিলেন। আগে কর্ম করে করে কর্মকে জয় করতে হবে, তারপর সেখান থেকে করে করে নিজেকে উন্নত করার পর ত্রিসন্ধ্যায় লাগিয়ে দেবে। এরপর ত্রিসন্ধ্যা থেকে সরে এসে গায়ত্রীর উপর ধ্যান করা শুরু হল। গায়ত্রী থেকে আরও যখন গভীরে চলে গেল তখন শুধু প্রণব অর্থাৎ ওঁম্ তাতে একাগ্র হয়ে গেল। তারপর দেখছেন ওঁমএর নাদ্ ধ্বণিই সমগ্র জগতকে আবৃত করে রেখেছে। এই নাদ্ ধ্বণিকেও ভেদ করে চলে গেলে তিনি সেই পরমাত্মা বা ভগবানের সাক্ষাৎ করেন। এই যাত্রা সব সময় শুরু হয় বাহ্যিক পূজা অর্চনা থেকে। আর আজকের যে বাহ্যিক পূজা এসেছে বেদের সময়কার অগ্নি উপাসনা থেকে। সেই অগ্নি দেবতার উদ্দেশ্যে ঋগ্বেদের প্রথম সূক্তের প্রথম মন্ত্র বলছেন –

অগ্নিসূক্তম্

অগ্নিমীড্যে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম।
হোতারং রত্নধাতমম্।।১।।

যজ্ঞে যত দেবতারা উপস্থিত হন তাঁদের সবাইকে অগ্নিদেবতা নিয়ে আসেন। অগ্নি হলেন প্রধান মাধ্যম। দেবতাদের আবাহন করে যে আহুতি দেওয়া হত সেটাও অগ্নির মাধ্যমেই হত। ঋষিদের বিশ্বাস ছিল অগ্নি এই আহুতি সমূহ দেবতাদের কাছে পোঁছে দেন। ঋগ্বেদে প্রায় আড়াই'শ সূক্ত ইন্দ্রের নামে। ইন্দ্রের পরেই অগ্নি, অগ্নির উপর প্রায় দু'শটি সূক্ত আছে। বেদের প্রথম সূক্ত অগ্নিকে দিয়েই শুরু – নয়টি মন্ত্রে প্রথম সূক্ত। প্রথম মন্ত্রে অগ্নিকে দুটো শব্দ দিয়ে সম্বোধন করা হচ্ছে পুরোহিত আর হোতা। কোন যজ্ঞ বা পূজা যখন বাড়িতে পরিবারের জন্য করা হয় সেখানে যিনি পূজা করেন তাঁকে বলা হয় পুরোহিত। আর ঘরের বাইরে সর্ব সমক্ষে যে যজ্ঞ হয় তার প্রধানকে বলা হয় হোতা, হোতা থেকেই হোত্রি। বৈদিক যজ্ঞে ঋগ্বেদের ব্রাহ্মণ হোতার খুব গুরুত্ব, কারণ হোতা যদি না আবাহন করেন তাহলে কোন দেবতাই এগিয়ে আসবেন না। ঋগ্বেদের ব্রাহ্মণ যখন আবাহন করবেন তারপরেই দেবতারা আসবেন। ভারতে আগেকার দিনের এই প্রথাগুলির খুব সুন্দর তাৎপর্য ছিল। আগেকার দিনে প্রথা ছিল যখন কেউ কোন অনুষ্ঠান করত তখন অনুষ্ঠান কর্তা সব জায়গায় নিমন্ত্রণ করতে নাপিতকে পাঠাত। নাপিত যদি নিমন্ত্রণ না করে তাহলে সেই অনুষ্ঠানে কেউই নিমন্ত্রণ রক্ষা করবে না। যতই আয়োজন করা হোক না কেন, কেউই সেই অনুষ্ঠান বাড়ির অন্নজল গ্রহণ করতে যাবে না। নাপিতরাও নিমন্ত্রণের ব্যাপারে নিজের গুরুত্বটা ভালো করেই বুঝত, আর তাদের অবস্থাও ভালো ছিল না, দারিদ্রতাই তাদের জীবনের বৈশিষ্ট্য। দেখা যেত কোন বড়লোক বা সম্মানীয় কাউকে নিমন্ত্রণ করার সময় নাপিত বেঁকে বসত। নানান রকমের দাবী-দাওয়া শুরু করে দিত। কিন্তু যত বড়লোকই হোক না কেন সে কখনই গ্রামের কাউকে নিজে গিয়ে নিমন্ত্রণ করতে পারবে না, নাপিতকে দিয়েই করাতে হবে। নাপিত যদি নিমন্ত্রণ না করে গ্রামের কেউই খেতে আসবে না। এই নিয়ে তখনকার দিনে নাপিতের সঙ্গে দর কষাকষি থেকে লাঠালাঠি পর্যন্ত হত। অনুষ্ঠান বাড়িতে যদি কেউ না আসে বাড়ির কর্তার মান-মর্যাদা কোথায় যাবে কেউ ভাবতে পারবে? এই প্রথাগুলি রাখা হয়েছিল সামাজিক ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য। বেশ কয়েক বছর আগে ন্যাশানাল মেডিকেল কলেজে এক মহারাজের শরীর চলে গিয়েছিল। সন্ন্যাসীরা গেছেন মহারাজের মৃত শরীর নিয়ে আসার জন্য। কিন্তু ওখানে ডোমরা বেঁকে বসেছে যে ওদের দুশো টাকা দিতে হবে তবেই ওরা মৃত শরীর বার করে দেবে। হিন্দুদের নিয়ম আছে হাসপাতালে কেউ মারা গেলে মৃতের শরীর বিছানা থেকে নামাবার সময় কেউ স্পর্শ করতে পারবে না, এই কাজ করার জন্য একটা বিশেষ সম্প্রদায় আছে, তারাই শুধু নামাবে, আর এই কাজটা ডোমেরাই করে। সন্ন্যাসীরা বললেন – আমরা সন্ন্যাসী আমাদের এসব ছোঁয়াছুয়িতে কিছু যায় আসে না, তোমরা যদি না নামাও আমরা এই ডেডবডি নিয়ে চললাম। তারা তখন বলছে – ঠিক আছে আপনারাই সব করবেন কিন্তু আমাদের পঞ্চাশটি টাকা দিতে হবে, এটা আমাদের প্রাপ্য। তখন মহারাজরাই সরালেন কিন্তু ওদের পঞ্চাশটা টাকা দিলেন। এগুলোও দরকার, না হলে সমাজের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাবে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত হিন্দুদের জীবন নানা অনুষ্ঠান দিয়ে মোড়া, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, হাতেখড়ি, দীক্ষা, বিবাহ, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি অনুষ্ঠানের মধ্যে সমাজের যারা দরিদ্র সাধারণ মানুষ রয়েছে এভাবে তাদের ব্যবহার করে একদিকে আর্থিক ভাবে আর অন্য দিকে তাদেরও একটা সামাজিক মর্যাদা দিয়ে সচল রাখা হয়।

আবাহন হচ্ছে না অথচ যজ্ঞ-যাগ হচ্ছে বৈদিক যুগে এ জিনিস কেউ কল্পনাই করতে পারত না। তাই হোতার ভূমিকাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই মন্ত্রে অগ্নিকে বলছেন হোতা। মন্ত্রে অগ্নির কতকগুলি উচ্চ গুণের বর্ণনা করা হয়েছে। বৈদিক কাল থেকে অগ্নির স্তুতির প্রচণ্ড মাহাত্ম্য। যে কোন ইন্দো-আর্য সভ্যতাতে অগ্নিদেবতাকে খুব উঁচুতে রাখা হয়। যেহেতু পার্সিরা ইন্দো-আর্য সভ্যতা থেকে উদ্ভব হয়েছে তাই পার্সি সভ্যতাতেও অগ্নিকে খুব সম্মান করা হয়। এদের মন্দিরের নামই Fire Temple । মন্দিরের পুরোহিতকে (Custodian of Fire) আমাদের ব্রাহ্মণদের মত সম্মান দেওয়া হয়। যে কোন লোকই Custodian of

Fire হতে পারে না, যিনি Custodian of Fire উত্তরাধিকারে সূত্রে তার সন্তানই পরে Custodian of Fire হবে। যদিও আলাদা সম্প্রদায় কিন্তু এরা অগ্নি দেবতার পূজাতে হিন্দু ব্রাহ্মণদের মত একই নিয়ম প্রথা অনুশীলন করে। পৃথিবীর যে কোন প্রাচীন ধর্মে অগ্নিদেবতার মোটামুটি একই ধরণের ধারণা পাওয়া যাবে। আমাদের পূর্বপুরুষরা ছিলেন অগ্নির উপাসক। পৃথিবীর আদিম অবস্থায় অগ্নি ছিল না, অগ্নিকে স্বর্গলোক থেকে পৃথিবীতে অবতরণ করান হয়েছে। অগ্নিকে এই অবতরণের কৃতত্ব অঙ্গিরসকে (অঙ্গিরা) দেওয়া হয়। একটা মতে বলা হয় অঙ্গিরস কাঠ দিয়ে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করার বিদ্যাটা প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন। এই কারণে অঙ্গিরসের প্রতি সবারই খুব সম্মানের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল। আবার অগ্নির অনেক নামের মধ্যে একটা নাম অঙ্গিরস। অঙ্গিরস থেকেই অঙ্গার শব্দ এসেছে।

এখানে কিন্তু যজ্ঞে কোন আহুতি দেওয়া হচ্ছে না, কারণ এটি ঋগ্বেদের মন্ত্র। এই মন্ত্রই যখন যজুর্বেদে আসবে তখন এই মন্ত্র উচ্চারণ করে যজ্ঞে আহুতি দেবে। এখানে অগ্নিকে প্রার্থনা করা হচ্ছে, রোজ যদি এইভাবে অগ্নির প্রার্থনা করা হয় তাহলে কি হবে, তার ফল মন্ত্রের শেষে বলা হয়েছে, সেই ফলটা সে পেয়ে যাবে। বলছেন – ‘*অগ্নিমীডে*’, *ঈডে* স্তুতি বা প্রার্থনা বা অর্চনা করার অর্থে বলছেন। অগ্নিকে আমি স্তুতির দ্বারা সাদর অভ্যর্থনা করছি। অগ্নির কয়েকটি বিশেষণ ব্যবহার করছেন, প্রথমে বলছেন ‘পুরোহিতং যজ্ঞস্য’ তিনি (অগ্নি) হলেন যজ্ঞের পুরোহিত। ঘরের যে কোন পূজোর সব কিছু নির্ভর করে পুরোহিতের উপর, অগ্নি এই পুরোহিতের মত। বৈদিক যুগে যে কোন চাহিদার পূরণের জন্য যজ্ঞের দরকার, যজ্ঞ পুরোহিত ছাড়া হবে না। সেইজন্য তখনকার দিনে সম্মানের যে মাপকাঠি তাতে পুরোহিতের সম্মান ছিল সর্বোচ্চ। এই পুরোহিত কে? অগ্নি দেবতা। অন্য দিকে আবার তিনি দেবতাদেরও পুরোহিত। পুরোহিত ছাড়া যেমন রাজার গুরুত্ব হয় না, তেমনি অগ্নি দেবতা ছাড়া দেবতাদের গুরুত্ব নেই। কিন্তু এখন কাউকে পুরুতগিরি করে বললে অপমানিত বোধ করবে। এখানে অগ্নি দেবতাকে পুরোহিত সম্বোধন করে সর্বোচ্চ সম্মান দেওয়া হচ্ছে। বলছেন ‘*যজ্ঞস্য দেবম*’, এই যে যজ্ঞ তার দেবতা অগ্নি। সব কিছুরই একজন করে অধিষ্ঠাত্রি দেবতা আছেন, যজ্ঞের অধিষ্ঠাত্রি দেবতার নাম অগ্নি। ‘*ঋত্বিজম হোতারং*’, অগ্নি হলেন হোতাদের মধ্যে ঋত্বিক, আগেই বলা হয়েছে যে হোতার কাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, হোত্রি মানে যিনি ঋগ্বেদ পাঠ করেন। তবে পুরোহিত আর ঋত্বিকের মধ্যে বিশেষ কিছু পার্থক্য নেই, নিত্যপূজা, নিত্য যজ্ঞে যিনি আহুতি দেন তাঁকে পুরোহিত বলছেন আর বিশেষ বিশেষ দিনে যে বড় পূজা হয় বা বিশাল কোন যজ্ঞে যিনি আহুতি দেন তাঁকে ঋত্বিক বলছেন। এগুলি আসলে স্তুতিবাচক, প্রশংসা করার জন্য বলা হয়। এই যে ভাব, যেখানে বলছে যজ্ঞে যা কিছু আছে তার শ্রেষ্ঠ হলেন অগ্নি, এই ভাবটাই অগ্নি থেকে সরে গিয়ে চণ্ডীতে মায়ের উপর চলে গেছে, যাঁকে আমরা দূর্গা বলছি, কালী বলছি। বেদে অনেকবার আমরা এই ধরণের ভাব দেখতে পাব। গীতাতেও এই ধরণের ভাব দেখতে পাই, দশম অধ্যায়ে বিভূতিযোগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যাবতীয় যা কিছু আছে তার মধ্যে যেটা শ্রেষ্ঠ বস্তু আমি সেটা নিজে, যেমন বলছে *বেদানাং সামবেদোঽস্মি*, সমস্ত বেদের মধ্যে আমি সামবেদ। এই স্তুতিই অগ্নি থেকে সরে ভগবান বিষ্ণু ও শিবের দিকে চলে এসেছে। আজকের দিনে আমাদের যা কিছু স্তুতি হয় সব হয় শিবের নাহলে বিষ্ণুর আর তা নাহলে শক্তির। তাহলে যে অগ্নিকে বলছেন তিনি *পুরোহতিম্*, *যজ্ঞস্য*, *হোতারম্* আর *রত্নধাতমম্*, আর অন্য দিকে ভগবান বিষ্ণু, শিব আর শক্তির স্তুতির মধ্যে তফাৎ কোথায়? যদিও বেদের ঋষিরা মানুষকে দিব্যত্ব দিতে চাইছিলেন, তাকে দেহবোধের অবস্থা থেকে পূর্ণত্ববোধের দিকে নিয়ে যেতে চাইছিলেন, কিন্তু যে অগ্নিকে কামধেনুর মত ধরে নেওয়া হয়েছিল, সময়ের সাথে সেই অগ্নি হয়ে গেলেন একজন দেবতা। অগ্নির যে আরেকটি বিরাট স্বরূপ রয়েছে, তিনি যে পরমাত্মার প্রতীক, যাঁকে অবলম্বন করে মানুষ পরমাত্মা পর্যন্ত পৌঁছতে পারে, এই ভাবটা হারিয়ে গেল। সেইজন্য পরের ঋষিরা এসে বিষ্ণু দেবতা, রুদ্র দেবতা এই রকম কয়েকজন দেবতাদের উপর পুরোপুরি পরমাত্মার ভাবকে নিয়ে এলেন যাতে আর কারুর পরে কোন সংশয় না হয়। অন্য দিকে ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ পরবর্তি কালে হারিয়েই গেলেন। কিন্তু অগ্নি দেবতার ব্যাপারে আমাদের মানসিকতা এমন ভাবে দানা বেঁধে রয়েছে, যিনি আমাদের প্রার্থনা পূরণ করেন, আমাদের চাহিদার পুর্তি করেন, সেইজন্য আমাদের জীবনে অগ্নির স্থানের বিশেষ কোন হেরফের হয়নি। কিন্তু আধ্যাত্মিক উত্থানের জন্য ইন্দ্র, মিত্র,

বরুণাদি দেবতাদেরকে ছেড়ে দেওয়া খুব দরকার। মহম্মদ ঠিক এই কাজটাই করেছিলেন, উনিও মক্কাতে শুধু আল্লার মুর্তি রেখে বাকি সব দেবতার মুর্তি ভেঙে দিলেন। মহম্মদের আগমনের আগে আল্লা একজন ছোট্ট দেবতা ছিলেন। মহম্মদ এসে পরমাত্মার দিব্য সত্তাকে যখন আল্লার মাধ্যমে দেখছেন, তখন মহম্মদ সেই সান্তের মাধ্যমে অনন্তকেই দেখছেন। বৈদিক ঋষিরাও অগ্নির মাধ্যমে একই জিনিস করছিলেন। কিন্তু ওই দেখাটা স্ফটিকের মত এত স্বচ্ছ হয়ে গিয়েছিল যে, ফলে পরের দিকে ঋষিরা বিষ্ণু আর রুদ্রকে বেছে নিলেন এবং পরমাত্মার সব গুণ বিষ্ণুর উপর আরোপ করে দিলেন।

যজ্ঞস্য দেবম্, দেবতা শব্দের সায়নাচার্য ব্যাখ্যা দিচ্ছেন – দান, যিনি দান করেন, দ্বিতীয়ত *দীপন্* যিনি আলোকিত করেন, *দ্যোতন্*, দেবতাদের সূক্ষ্ম দেহটা যেন আলোর শরীর, দেবতাদের যদি কখন দর্শন হয় তখন একটা আলোর শরীর রূপেই দেখা যাবে। সেইজন্য দেবতাদের কোন ছায়া পড়ে না, স্থূল কিছু থাকলেই তার ছায়া পড়বে, কিন্তু দেবতাদের স্থূল কিছু নেই। দীপন্ আর দ্যোতন্ একই অর্থে হয়, কিন্তু দুটো শব্দের ধাতু আলাদা। দেবম্ শব্দের শেষ অর্থ বলছেন দ্যুস্থান, দেবতারা অন্তরীক্ষে থাকেন। স্বামীজীও বেদের উপর যে বক্তৃতা দিয়েছেন সেখানেও তিনি এগুলোর ব্যাখ্যা করেছেন। দ্যু মানে পৃথিবীর উপরে, অন্তরীক্ষই হোক বা আকাশই হোক। দান, দীপন্, দ্যোতন্ আর দ্যুস্থান, সবেতেই 'দ' 'দ' হয়ে নাম হয়ে গেল দেবতা। দেবতা মানেই এই তিনটে, যদিও চারটে বলা হয়েছে কিন্তু যেহেতু দীপন্ আর দ্যোতন্ শব্দের একই অর্থ তাই তিনটে বলে দিলেই হয়ে যাবে। দেবতারা দান করেন বলেই আমাদের জীবন চলছে, দেবতাদের শরীর আলোময়, সব সময় দেদীপ্যমান আর দেবতারা স্বর্গে বাস করেন। অগ্নি হলেন এই দেবতা। অগ্নি একজন সত্যিকারের দেবতা, কারণ তিনি দান করেন, পরে বলবেন আমরা যা কিছু পাই তা আপনার জন্যই পাই। অগ্নি দেবতা তো স্বাভাবিক ভাবেই দীপ্যমান। অন্য দেবতাদের আমরা দেখি আর নাই দেখি অগ্নি দেবতাকে স্থূল রূপে আমরা প্রতি মুহুর্তেই দেখছি। অগ্নি দেবতা স্বর্গে থাকেন, মাতরিশ্বা সেই অগ্নিকে স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে নিয়ে এসেছেন। তাঁর এক পুত্র, যাঁর নাম অঙ্গিরস, মুণ্ডকোপনিষদে অঙ্গিরসের নাম পাই। অঙ্গির জ্বলন্ত কাষ্ঠ, যেখান থেকে অঙ্গার শব্দ এসেছে। একজন বিদগ্ধ সন্ন্যাসী বলতেন, অরণি কাঠ দিয়ে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করার যে পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছিল তাতে অঙ্গিরস, যিনি একজন ঋষি ছিলেন, তাঁর বড় অবদান ছিল, সেইজন্য তাঁকে অগ্নির সন্তান বলা হয়।

'*রত্নধাতমম্*', আমাদের কাছে রত্ন মানে মূল্যবান বস্তু, সোনা, হীরে, মুক্তো ইত্যাদি। অগ্নি দেবতা আমাদের রত্ন দেন। সায়নাচার্য রত্নের অর্থ করছেন রমণীয়, যেটাই আমাদের পছন্দের, আমাদের মন যাতে রমণ করতে চাইছে সেটাই রত্ন। নিজের সন্তানকে মানুষ প্রচণ্ড ভালোবাসে, সন্তান হলে বলা হয় পুত্ররত্ন প্রাপ্তি। পুত্রে মানুষের মন রমণ করছে, যে জিনিসে মন রমণ করে তাকেই রত্ন বলা হয়। যেটাই মানুষের পছন্দ অগ্নির উপাসনা করলেই সেই রমণীয় বস্তুর প্রাপ্তি হবে, সেইজন্য বলছেন *রত্নধাতমম্*। আবার মনে করিয়ে দেওয়া হচ্ছে, এখানে যা কিছু বলা হচ্ছে এগুলো এখন পরমেশ্বরের উপাসনাতে চলে গেছে। ঈশ্বরের সাধনা করলে সব কিছুই পাওয়া যায়। কিন্তু কোথা থেকে এই ধারণা এসেছে জানতে হলে আমাদের বেদ দেখতে হবে। ঋগ্বেদের সংহিতার ভাষ্যে সায়নাচার্য আবার রত্নকে ব্যাখ্যা করছেন – রত্নধাতমের সহজ অর্থ ফল দেওয়া, যিনি ফল দাতা অথবা যিনি রক্ষা করেন বা যিনি আমাদের বরিষ্ঠ, কর্মিষ্ঠ, বলিষ্ঠ সন্তান দেন বা যিনি আমাদের প্রচুর খাদ্য-সামগ্রী দেন বা প্রচুর ধন-রত্ন দেন। একটা রত্ন শব্দের কত অর্থ করা হয়েছে। সায়নাচার্য রত্নের এতগুলি অর্থ কেন করলেন? বেদে যখন কোন শব্দকে ব্যবহার করা হয় তখন সেই শব্দকে কি অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে কেউ জানে না। রত্ন শব্দকেও বেদ কি অর্থে বলেছে আমরা এখন কেউ জানিনা, সায়নাচার্যও জানতেন না। সেইজন্য তিনি বললেন বেদে রত্নের অর্থ এটাও হতে পারে, ওটাও হতে পারে আবার অন্যটাও হতে পারে। রত্ন শব্দকে যদি আজকে বাংলায় লেখা হয় এবং যদি বলা হয় – তিনি কবিরত্ন, তখন পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে তিনি কবিদের মধ্যে রত্ন। আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর পরে কবিরত্নের অর্থ কত ভাবে পাল্টে যাবে আমরা এখন কি করে জানব, আর পাঁচ হাজার বছর পরে লোকেরাও বলতে পারবে না যে তখনকার দিনে এর আসল অর্থ কি ছিল। বেদের সময়ে রত্নের অর্থ কি হতে পারে যাস্কের আগে যে কৌশভ

ছিলেন তিনিই বলছেন এখন এই শব্দের অর্থ কঠিণ হয়ে গেছে, যাস্ক এসে এর নতুন ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলছেন যে এই এই রকমের অর্থ ছিল শুনেছি। আর যাস্কেরও হাজার বছর পরে এসে সায়ানাচার্য ঐগুলো দেখে দেখে একটা অর্থ বার করার চেষ্টা করেছেন। যার ফলে তিনি কোন শব্দেরই নির্দিষ্ট কোন অর্থ দিচ্ছেন না। সায়নাচার্য বলছেন – যিনি যজ্ঞ করছিলেন তিনি কি যজ্ঞ করছিলেন এই বলে যে – ওগো, তুমি আমাকে হীরা জহরৎ দিয়ে যাও। যিনি অন্ন চাইছেন তিনি অন্নের জন্য, যিনি সন্তান চাইছেন তিনি সন্তানের জন্য যজ্ঞ করছেন, এটা বলছেন না যে তুমি এটা পাবেই। তাই তিনি বলছেন বেদের সময়ে রত্নের অনেক অর্থ হতে পারে তাই এর সব রকম অর্থই হতে পারে।

বেদের সময় থেকে আমরা অনেক সরে এসেছি, সময়ের সাথে সাথে ভাষাও পাল্টাতে থাকে, সেইজন্য তিনি অনেকগুলি অর্থ দিচ্ছেন। এখন আমরা যে কোন জিনিসই চাইনা কেন আমরা এইভাবে স্তুতি করতে পারি। বেদের সময়ে দুহিতার অর্থ ছিল যে মেয়ে গরুর দুধ দোহন করত। সেখান থেকে পাল্টাতে পাল্টাতে দুহিতার অর্থ গিয়ে দাঁড়াল নিজের কন্যাতে। আবার সেখান থেকে এখন যে কোন মেয়েকে আমরা দুহিতা বলি। সায়নাচার্য বর্তমান কালে বেদের দুহিতার অর্থ করতেন – দুহিতার অর্থ যে মেয়ে গরুর দুধ দোহন করে, বা দুহিতা মানে নিজের মেয়ে বা দুহিতা মানে যে কোন মেয়ে। কিন্তু আজকের ভাষায় দুহিতা অর্থের কোন সংশয় নেই। শঙ্করাচার্যও যখন উপনিষদ ও গীতার ভাষ্য রচনা করেছেন তখন তিনি কোন কোন শব্দের অর্থ বলতে গিয়ে বলছেন – এর এই অর্থ হয় বা এটাও হতে পারে। কারণ শব্দের অর্থ পাল্টে গেছে। বৈদিক অভিধান নিরুক্ততে রত্নের যে অর্থ করা হয়েছে, সেই অর্থ সায়ানাচার্যের কাছে যখন এসেছে তখন আরও পাল্টে গেছে। আধুনিক যুগের কোন বৈদিক অভিধান যদি থাকে তাতে রত্নের সব কটির অর্থই দেওয়া থাকবে। কিন্তু বাংলা থেকে বাংলা অভিধানে রত্ন মানে হীরা, জহরৎ।

অগ্নিকে অনেক কিছুর সাথে তুলনা করে কল্পনা করা হয়েছে এবং অনেক উপমা দেওয়া হয়েছে। যেমন অগ্নিকে অনেক সময় বাজপাখির সঙ্গে তুলনা করা হয়। ঘোড়ার কাঁধে যে কেশর হয়, ইংরাজীতে mane আর হিন্দীতে আয়াল বলে, তার সাথে অগ্নির শিখার তুলনা করা হয়েছে। অগ্নি দেবতার অনেকগুলি রূপ আছে, যেমন পৃথিবীতে তিনি অগ্নি রূপে, সূর্যের মধ্যে তাপ রূপে। অগ্নির একটা নাম বিপ্র। বিপ্রের আসল অর্থ ব্রাহ্মণ। দেবতাদের মধ্যে অগ্নিকে ব্রাহ্মণ বলা হয় বলেই অগ্নির আরেক নাম বিপ্র। অগ্নির আরেকটি নাম কবি। যিনি ঠিক ঠিক ত্রিকালদর্শি তাঁকেই কবি বলা হয়। আমরা যা কিছু জ্ঞান আহরণ করি সবই ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে করি, কিন্তু যিনি কবি তাঁর কিছু জানার জন্য ইন্দ্রিয়ের কোন প্রয়োজন হয় না। বেদে কবি হলেন ভগবান, আর প্রথমে অগ্নিকে কবি বলে যে স্তুতি করা হচ্ছে এটা তাঁর আরেকটি নাম। দ্বিতীয় মন্ত্রে বলছেন –

অগ্নিঃ পূর্বেভিঋষির্ভিড্যো নুতনৈরুত।
সা দেবাঁ এহ বক্ষতি।।২।।

অগ্নি দেবতাকে প্রার্থনা করে অনুরোধ করা হচ্ছে, *সা দেবাঁ এহ বক্ষতি*, হে অগ্নি! আপনি সব দেবতাদের এখানে নিয়ে আসুন। কিছু দিন আগেও বিয়ের ব্যাপারে পাত্রীর বাড়ি থেকে পাত্রের বাড়িতে কথাবার্তা বলতে যেতেন হয় মেয়ের বাড়ির পুরোহিত তা নাহলে নাপিত। কুল পুরোহিত বা কুলগুরু গিয়ে প্রথম কথা শুরু করতেন। আর নিমন্ত্রণ করতে সব সময় পুরোহিতকে পাঠান হত, রাজাদের তো অবশ্যই পুরোহিতকে নিমন্ত্রণ করতে পাঠাতেন। আমি আমার পুরোহিতকে পাঠিয়েছি, যাঁকে নিমন্ত্রণ করা হচ্ছে এটাই তাঁকে সর্বোচ্চ সম্মান দেওয়া হয়ে গেল। এখানেও অগ্নি হলেন দেবতা আর যজমানের মধ্যেকার যোগসূত্র। একদিকে অগ্নি অগ্রমীয়তে, দেবতাদের আগে আগে চলেন আবার যজমানের তরফ থেকেও তিনি অগ্রে। এই কথাই মন্ত্রে বলছেন *সা দেবাঁ এহ বক্ষতি*, হে অগ্নি! আপনি সব দেবতাদের নিয়ে আসুন।

এর আগে সংহিতা পাঠ ও পদ পাঠ এই দুটো পাঠের কথা বলা হয়েছিল। পদ পাঠে সন্ধিগুলিকে ভেঙ্গে দেওয়া হয়, ভেঙ্গে ভেঙ্গে বললে বুঝতে সুবিধা হবে – *অগ্নিঃ পূর্বেভিঃ ঋষিভিঃ ঈড্যঃ নতুনৈঃ উত সা দেবাঁ আ ইহ বক্ষতি*। সন্ধি ভেঙ্গে দিলে অক্ষর বেড়ে যাওয়াতে ছন্দটা নষ্ট হয়ে যায় তাই সন্ধি সহ উচ্চারণ

করে ছন্দকে ধরে রাখা হয়, এটাই সংস্কৃতে সন্ধির উপযোগিতা। বলছেন, আমি যে অগ্নির স্তুতি করছি, পূজা করছি যত ঋষি আছেন তাঁরাও অগ্নির পূজা করেন, মানে অগ্নি সবারই পূজা পাওয়ার যোগ্য। অগ্নি আগেকার ঋষিদেরও পূজা পাওয়ার যোগ্য। তার মানে অগ্নি হলেন চির নতুন দেবতা। আদিবাসীদের অনেক রকম দেবতা আছে, এইসব দেবতারা এক সময় পূজা পেত কিন্তু পরে দেখা যায় এরা আর পূজা পায়না। যেমন ইন্দ্র, বরুণ বৈদিক যুগে পূজা পেতেন কিন্তু এখন আর আগের মত পূজা পাননা। কিন্তু ঋষি বলছেন – অগ্নি আগেকার ঋষিদের পূজার যেমন যোগ্য ছিলেন ইদানিং কালের ঋষিদেরও পূজা পাওয়ার যোগ্য।

এই মন্ত্র বেদের ঋষি বলছেন, তিনিই বলছেন আগেকার ঋষিরা পূজা করতেন, তার মানে তারও আগে থেকে ঋষিদের পরম্পরা চলছে। মানুষের যে আধ্যাত্মিক অনুভূতি হয় এটা তার মনের কল্পনা না সত্যিই তার এটা উপলব্ধি হয়েছে কি করে জানা যাবে? সেইজন্যই আমাদের ঋষিরা বলে গেছেন তোমার এই উপলব্ধি সত্যি কিনা জানতে হলে তোমার উপলব্ধিকে শ্রুতি, যুক্তি আর অনুভূতির উপর যে কোন একটাতে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। শ্রুতি মানে – পরম্পরা, আমার মাথায় একটা চিন্তা এসে গেল যে এই বৃক্ষকে পূজা করলেই আমাদের সব জ্ঞান হয় যাবে। যদি আমাকে প্রশ্ন করা হয় কোথা থেকে আপনার এই চিন্তাটা এলো, এর আগেও কি এভাবে কেউ জ্ঞান লাভ করেছে? আগেকার কোন ঋষিরা কি কেউ এই বৃক্ষকে পূজো করেছিলেন? এর কি কোন পরম্পরা, কোন ঐতিহ্য আছে? না, সে রকমতো কিছু জানিনা। তাহলে তুমি বাপু ঠিক বলছ না, কেননা তোমার এই কথার কোন পরম্পরা নেই। বেদের আগে কোন শাস্ত্র ছিল না, তা সত্ত্বেও এখানে বলছেন আগেকার ঋষিরাও অগ্নির পূজা করতেন। ঠাকুরও বলছেন – সনাতন ধর্মই থাকবে, বাকী সব আসবে যাবে। এটাকে অনেকে মনে করে যে ঠাকুর ইসলাম ও খ্রীশ্চান ধর্মকেই বলতে চাইছেন, কিন্তু আদপেই তা নয়, ইসলাম ও খ্রীশ্চানও সনাতন ধর্ম। ঠাকুর ব্রাহ্ম সমাজ, আর্য সমাজ এদের উদ্দেশ্য করে বলছেন। সনাতন ধর্ম মানে যার ঐতিহ্য ও পরম্পরা আগে থেকেই চলে আসছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ কি চিরদিন ধরে আছেন? না, এখানে তা বলছে না, শ্রীরামকৃষ্ণ যে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব, যে সত্যগুলিকে বলেছেন সেগুলি নতুন কিছু নয়, এগুলো আগে থেকেই বলা আছে। অনেকে খুব উচ্ছ্বাস নিয়ে বলেন শ্রীরামকৃষ্ণ এক নতুন দর্শন দিয়ে গেলেন। কি নতুন দর্শন ঠাকুর দিয়েছেন? নতুন কিছুই তিনি দেননি। স্বামীজীও একবারও কোথাও বলেননি যে ঠাকুরের কথায় নতুন কিছু আছে। ঠাকুর যেটা বলেছেন তা হল – আগেকার যাঁরা ছিলেন তাঁরা পুরানো হয়ে গেছে, কিন্তু এখন যাঁরা আছেন তাদের শক্তিটা নতুন। শ্রীশ্রীমাকে প্রশ্ন করছেন ঠাকুরের ধর্মসমণ্বয়টাকে কি নতুন বলা যাবে? মা বলছেন – ওগুলো আগেই ছিল, তবে তিনি ছিলেন ত্যাগের বাদশা, তাঁর ত্যাগটাই সব থেকে বড়। ত্যাগ দিয়ে বিচার করলেও ত্যাগটাও নতুন কিছু নয়, ভগবান বুদ্ধও ত্যাগ করেছিলেন, যীশুও ত্যাগ করেছিলেন। ঠাকুরের যদি কিছু নতুনত্ব থাকত তাহলে তো গোলমাল হয়ে যেত, তাহলেই বোঝা যেতে যে সেই পরম্পরা ঠাকুরের ছিল না। হিন্দু ধর্মের প্রধান নিয়ম শ্রুতি, যুক্তি আর অনুভূতি; শ্রুতি, যুক্তি আর অনুভূতিতে যদি না মেলে তবে হিন্দু ধর্মে সেই তত্ত্ব বা দর্শনের কোন মূল্যই নেই। ঠাকুর বলছেন ওরকম ধ্যানে দেখে কি হবে, সামনা সামনি ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলতে হবে। ঠাকুর নিজের আধ্যাত্মিক অনুভূতির কথা বলতে গিয়ে বলছেন – তাঁর সাথে দেখা হল, কত মজা হল, কত আঙ্গুল মটকানো হয়েছে। আধ্যাত্মিক চেতনার যখন উন্মেষ হয় তখন ভগবান সত্যি সত্যি সামনে এসে দাঁড়ান, তিনি কথা বলেন। অন্য লোক যখন ঠাকুরকে দেখছে তখন দেখছে ঠাকুর নিজের মনে হাসছেন, হাত নাড়ছেন। অনেকে তাই ঠাকুরকে পাগল ঠাওরাতো, নিজের মনে কথা বলছে। ঠাকুর দেখছেন তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলছেন, ঈশ্বর তাঁর আঙ্গুল মটকে দিচ্ছেন। এই ধরণের দর্শন যাঁর হয় তিনিই একমাত্র দেখতে পান, তাঁর আশেপাশে যারা থাকবে তাদের কাছে কিছুই মনে হবে না। এটা কোন অনুভূতি নয় এটাই সাক্ষাৎ দর্শন, আর এই ধরণের দর্শন দুজন একই রকম দেখেন না। কেউ চাইলেই শ্রীরামকৃষ্ণের যে দিব্যদর্শন হয়েছিল সেগুলিকে সেও দর্শন করে নিতে কখনই পারবে না। কারণ এটা কোন একটা ভাব রূপে সত্য (objective reality) নয়, ঠাকুরের দিব্যদর্শন হল subjective reality। তাহলে যদি বলা হয় রামপ্রসাদের মাকালীর দর্শন হয়েছিল, ঠাকুরেরও মাকালীর দর্শন হয়েছিল। মাকালীকে দুজনে ঠিকই দেখেছিলেন, কিন্তু একই রূপে

দেখেছিলেন কিনা সেটা কে জানে। আগামীকাল যদি আমার শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন হয়ে যায় আর অন্য কারুরও যদি দর্শন হয় তাহলে দুজনই শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন হয়েছে কিন্তু একই রূপে দর্শন হবে না। সেইজন্য ঋষিদের যে বর্ণনা আমরা পাই তাতে কোন দুটোর বর্ণনা এক হয় না। এতে তাঁদের নিজেদের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব তৈরী হয় না বরঞ্চ একে অপরের পরিপূরক হন। কবীর দাস ও সুরদাসের লেখা সম্পূর্ণ আলাদা কিন্তু এ নিয়ে কোন বিরোধ নেই উল্টে একে অপরকে পরিপূরণ করে। বাইবেলের কথা কোরানের কথা এক নয়, কোরানের কথা আর কথামৃতের কথা এক নয় আবার কথামৃতের কথা আর বেদের কথা এক নয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও কারুর মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নেই। এরমধ্যে সবাই যে যেমন ভাবে ঈশ্বরকে দেখেছেন তার কথাই বলা হয়েছে, কিন্তু কারুরই এক রকম দর্শন হয়নি। এই চশমাকে আমিও যাই দেখব অন্য লোকেও তাই দেখবে কিন্তু ঈশ্বর দর্শনে আমি আর সে এক দেখব না, কারণ spiritual reality always subjective not objective.

অগ্নিকে যে আগের ঋষিরাও দেখেছিলেন আর ইদানিং কালের ঋষিরা অগ্নিকে দেখছেন তাঁরা অগ্নিকে একই রূপে দেখছেন না। কিন্তু যাই দর্শন হোক না কেন, আমাদের কাছে প্রধান হল শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভূতি। আমার যাইই আধ্যাত্মিক অনুভূতি হোক না কেন, দেখতে হবে এটা কি বিচারে টিকতে পারবে। তারপরে বলবে আমারই কি প্রথম উপলব্ধি হয়েছে নাকি এর আগেও কেউ উপলব্ধি করেছে। যদি বলি ঠাকুরের কৃপায় আমিই প্রথম উপলব্ধি করেছি, তাহলে কিন্তু একে আর আধ্যাত্মিক অনুভূতি বলে মানা যাবে না, আমার মনের নিছক একটা কল্পনা মাত্র বলে সবাই উড়িয়ে দেবে। গীতার ভাষ্যে আচার্য শঙ্কর এই কথাই বলছেন – *অসম্প্রদায়বীৎ সর্বশাস্ত্রবেদোপি মুর্খবদেব উপেক্ষণীয়*, যে অসম্প্রদায়বীৎ, যে কোন গুরুর কাছে এই বিদ্যা পায়নি, বা তার গুরু তাঁর গুরুর কাছে এই বিদ্যা শোনেননি, মানে যার সম্প্রদায় নেই, এই রকম কেউ যদি সমস্ত বেদ সমস্ত শাস্ত্র ঝাড়া মুখস্ত করে নেয় তাহলেও তাকে মুর্খের মত উপেক্ষা করবে। গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে শঙ্করাচার্য এই কথা বলছেন। রামকৃষ্ণ মঠের যাঁরা সন্ন্যাসী বা যাঁরা দীক্ষা নিচ্ছেন তাঁরা তাদের যে গুরু থেকে দীক্ষা নিচ্ছেন সেই গুরু হয়তো ঠাকুরের কোন পার্ষদের কাছ থেকে দীক্ষা পেয়েছিলেন, তিনি পেয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ থেকে, শ্রীরামকৃষ্ণ তোতাপুরি থেকে, তোতাপুরি থেকে হয়ে হয়ে শঙ্করাচার্যে পৌঁছে যাচ্ছে, শঙ্কারাচার্যের আগে গোবিন্দাপাদ হয়ে হয়ে বেদে চলে যাচ্ছে। আমাদের প্রত্যেকের বিদ্যা এই ভাবে একটা সম্প্রদায়ের উপরে দাঁড়িয়ে আছে। যদি কেউ এসে আমাদের বলে যে এগুলো আপনাদের নিজেদের পড়া পাণ্ডিত্য দেখাচ্ছেন, তখন বলতে হয় যে আপনাদের বিদ্যা একশ বছরের আর আমাদের বিদ্যার পেছনে হাজার হাজার বছরের ঐতিহ্য রয়েছে। এখানে আমরা যে বিদ্যাই পাই না কেন সম্প্রদায় বিদ্যা পাচ্ছি।

বেদের দ্বিতীয় মন্ত্রেই সেই সম্প্রদায়ের কথা বলা হচ্ছে – আগেকার ঋষিরা আর ইদানিং কালের ঋষিরাও অগ্নির উপাসনা করেছেন। ঋষি প্রথমেই বলে দিচ্ছেন আমি কিন্তু আমার মনের খামখেয়ালে কোন কথা বলছি না, এর আগের আগের ঋষিরা এভাবেই অগ্নির স্তুতি করেছেন। অগ্নি দেবতা যে হারিয়ে গেছেন তা নয়, বর্তমান কালের ঋষিরাও অগ্নি দেবতার উপাসনা করছেন। তারপরে বলছেন '*নতুনৈঃ উত*', অগ্নি কোন অচল দেবতা নন, এখনও তিনি সচল, এখনও তাঁকে উপাসনা করা হচ্ছে। ঋষি বলছেন আমি যখন এই মন্ত্র রচনা করছি এখনও এই অগ্নি দেবতার পূজা হচ্ছে। আর বলছেন – '*স দেবাঁ এহ বক্ষতি*'। অগ্নি দেবতা যেন সব দেবতাদের আমার কাছে নিয়ে আসেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারায় অনেক স্মৃতিকথা লুকিয়ে আছে। বেলুড় মঠের মন্দির উদ্বোধনের সময় ঠাকুরের সন্তান স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজ অধ্যক্ষ ছিলেন, তিনি মূল মন্দিরের নক্সা তৈরী করেছিলেন। উদ্বোধনের দিন তিনি গর্ভমন্দিরে দরজা বন্ধ করে কিছুক্ষণ চুপচাপ ধ্যানে বসেছিলেন। পরে একজন সেবক মহারাজকে জিজ্ঞেস করছেন 'মহারাজ! ঠাকুর এসেছিলেন'? 'হ্যাঁ! এসেছিলেন'। 'আর কেউ এসেছিলেন'? 'স্বামীজী, রাজা মহারাজ সবাই এসেছিলেন'। এখনও বিশেষ পূজাতে যখন হোম হয় তখন বলা হয় 'শ্রীরামকৃষ্ণ সপার্ষদঃ', সবাইকে স্তুতি করা হচ্ছে। একটা খুব নামকরা স্তুতি আছে সেখানে বলা হচ্ছে হনুমানজী আপনি আসবেন, সঙ্গে লক্ষ্মণজী, শ্রীরামচন্দ্র ও মা সীতাকে নিয়ে আসবেন। এখানে স্তুতি রূপে বলা হচ্ছে, স্তুতিতে কাঙালের মত কোন চাহিদা থাকে না। স্তুতিতে হৃদয়ের ভেতর থেকে ঈশ্বরীয় যে সত্তা আর তাঁর যে শক্তি সেই সত্তার প্রতি আমাদের ভক্তি ভালোবাসাকে স্বতঃস্ফুর্ত ভাবে অভিব্যক্ত করা হচ্ছে।

স্তব আর মন্ত্রের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হল – স্তব হল কারুর গুণাবলীর প্রশংসা করে স্তুতি করা, যেমন আগেকার দিনে প্রজারা যখন রাজদরবারে রাজার সঙ্গে দেখা করতে যেত তখন প্রজা প্রথমে রাজার প্রশংসা করে স্তুতি করত। মন্ত্র গুরু-শিষ্যের মধ্যেই থাকবে, বাইরের কাউকে বলা যাবে না। এর অর্থ মন্ত্র গোপনীয়, এবং গুরু মুখেই শুনতে হবে, বেদেও তাই হত। বেদের পুরো সংহিতাকে মন্ত্র বলা হয়। মন্ত্র অত্যন্ত পবিত্র জিনিস। সেইজন্য আগেকার দিনে বেদের সংহিতা বা মন্ত্র অংশ শিষ্যকে গুরুর কাছে শুনে নিয়ে মুখস্ত করতে হত। মন্ত্রের আরেকটা বৈশিষ্ট্য মন্ত্রের একটা শক্তি আছে, কেউ যদি এই এই মন্ত্র রোজ পাঠ করে তার এই এই ফল হবে। বেদের সংহিতার এই দুটো বৈশিষ্ট্যই আছে – এগুলো কাউকে বলা যাবে না আর এর একটা শক্তি আছে। বেদে যেহেতু এই মন্ত্র অংশকে পবিত্র বলা হয়েছে তাই পরবর্তি কালে যেসব স্তোত্র বা স্তব পবিত্র বলে মনে হতে লাগল সেগুলোকেও মন্ত্র রূপে গণ্য করা হতে শুরু হল। কিন্তু মন্ত্র কখনই স্তব বা স্তুতিতে রূপান্তরিত হবে না। গীতার একাদশ অধ্যায়ে অর্জুন যখন শ্রীকৃষ্ণের প্রশংসা করে আপনি গুরুর গুরু, আপনি সকলের গুরু ইত্যাদি বলছেন তখন এটাই হয়ে যায় স্তুতি কিন্তু আমরা যখন এই স্তুতি পাঠ করব তখন এটাই স্তব হয়ে যাবে। এই ধরণের স্তুতি যারা রোজ পাঠ করে তাদের মধ্যে একটা পবিত্রতা ও মনের অনেক শক্তি আসে। স্তবের মূল জিনিস হল কারু স্তবন বা প্রশংস করা।

Impersonal God হলেন ঈশ্বরের অমূর্তরূপ। আমরা প্রায়ই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম, সর্বব্যাপী চৈতন্য এই ধরণের শব্দগুলি ব্যাবহার হতে দেখি। ঈশ্বরের চৈতন্য শক্তিকে যখন নির্গুণ-নিরাকার অমূর্ত রূপে চিন্তা করা হয় তখন সেটাই হয় Impersonal God, সেই চৈতন্য শক্তির যখন রূপ এসে যায় তখন তাকে বলছে Personal God তখন ঈশ্বরের একটা রূপ এসে তিনি সগুণ-সাকার হয়ে যান। বিভিন্ন ধর্মে ঈশ্বরকে বিভিন ভাবে কল্পনা করা হয়, কেউ তাঁকে পুরোপুরি সগুণ-সাকার রূপেই দেখেনে আবার কেউ পুরোপুরি নির্গুণ-নিরাকার রূপেই দেখেন। কিছু অল্প বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ আছেন যারা সগুণ-সাকারের উপাসকদের উপাসনাকে পৌত্তলিক উপাসক বলে। ইসলাম ধর্মে পুরোপুরি নির্গুণ-নিরাকার ঈশ্বরের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু স্বামীজী আপত্তি করে ইসলাম ধর্মের প্রচারকদের বলছেন – তোমরা যদি এতই মুর্তি পূজার বিরোধী হও তাহলে কাবাতে হজ করতে কেন যাচ্ছ? এগুলো আর কিছুই নয়, বড়রা কিছু বলে দিয়েছে ছোটরা সেটাকে না বুঝে মেনে নিয়েছে। খ্রীশ্চান ধর্ম কখন ঈশ্বরকে নির্গুণ-নিরাকার আবার কখন সগুণ-সাকার বলে।

বেদের মন্ত্রগুলির প্রথমে একজন ঋষির নাম দেওয়া থাকে, যেমন ঋগ্বেদের প্রথম মন্ত্র '*অগ্নিমীডে পুরোহিতং*' এই মন্ত্রের প্রথমে ঋষির নাম দেওয়া হয়েছে মধুছন্দা। এত হাজার বছর পর বলা খুবই মুশকিল যে মধুছন্দা ঋষি এই মন্ত্রের দ্রষ্টা নাকি এই মন্ত্র অন্য কোন ঋষি পেয়েছিলেন আর মধুছন্দা মন্ত্রকে সংকলন করেছেন। এক এক পণ্ডিত এক এক ভাবে বলবেন। তবে ঋগ্বেদের দ্বিতীয় মণ্ডল থেকে অষ্টম মণ্ডল পর্যন্ত ঋষির নাম প্রথম থেকেই নির্দিষ্ট করা হয়ে আছে। প্রথম মন্ত্রে যেখানে মধুছন্দা ঋষির নাম পাচ্ছি সেখানে বলা হয়েছে তিনি বিশ্বামিত্রের পুত্র, এমনও হতে পারে যে এই মন্ত্র বিশ্বামিত্র পরিবারে সংরক্ষিত হয়ে আসছিল। পরিবারে সংরক্ষিত হয়ে আসছিল বলে তার মানে এই নয় যে তাঁরা এই মন্ত্রের দ্রষ্টা হবেন, অনুমান করা হচ্ছে। কেননা বিভিন্ন দিক থেকে শিক্ষা পেতে পেতে একটা জায়গায় গিয়ে মন্ত্রগুলো জমা হচ্ছিল। এখন যিনি এই মন্ত্রকে প্রথম লিপিবদ্ধ করেছেন তার দুটো সম্ভবনা থাকতে পারে – হয়তো কোন পরিবারে ঠাকুরের মত কোন বিরাট মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছিল, তিনি একটা আধ্যাত্মিক তত্ত্ব আবিষ্কার করলেন, পরে তিনি নিজের শিষ্যদের এই মৌলিক সত্যটা দিয়ে বললেন যে – অগ্নিই সব। ছান্দোগ্য উপনিষদে এই ধরণের ঘটনা দেখা যায় যেখান এক একটা জিনিসকে নিয়ে বলছে এটাই ব্রহ্ম, যেমন ঋষি রৈক্ক বলছেন প্রাণই ব্রহ্ম। প্রাণ জীবনধারণের পক্ষে অত্যাবশ্যক শক্তি, এই শক্তিই পরবর্তিকালে রূপ পেল দুর্গা, কালী রূপে। রৈক্ক ঋষি খুব উচ্চকোটির ঋষি ছিলেন, তাঁর নামে প্রশংসা করে বলা হয় যে – দুটো পাখি পরস্পর কথা বলতে বলতে উড়ে যাচ্ছে, একটা পাখি জিজ্ঞেস করছে মানুষ যে এত তপস্যা করছে এর সব ফল কোথায় যাচ্ছে? অন্য পাখিটি বলছে তপস্যার ফল সব রৈক্ক ঋষির কাছে যাচ্ছে। রাজা পাখিদের কথা শুনতেই খুব আগ্রহ হয়ে জানতে চাইলেন কে এই রৈক্ক ঋষি যাঁর কাছে সবার তপস্যার ফল চলে যাচ্ছে। রাজা খোঁজ করতে করতে একটা

জায়গায় গিয়ে দেখে একটা গরুগাড়ির কাছে একজন ঋষি বসে গরু গাড়ির চাকাতে ঘষে ঘষে তাঁর পিঠ চুলকাচ্ছেন। কাছে গিয়ে দেখেন ঋষির পিঠে খোস-পাঁচড়ায় ভরে গেছে। রাজা ঋষির কাছে এসে দাঁড়িয়েছে কিন্তু রাজার দিকে তিনি কোন ভ্রুক্ষেপই করলেন না। রাজা আশ্চর্য হয়ে ভাবছেন যে কে এই ঋষি যে আমাকে কোন গুরুত্বই দিচ্ছেন না, নিশ্চয়ই কোন বিরাট ঋষি হবেন। তিনি তখন সেই ঋষিকে বলছেন – মুনিবর, আপনি আমাকে শিক্ষা দিন, আমি আপনার সেবার জন্য আমার এই মেয়েকে আপনাকে দিয়ে গেলাম। কোন পিতা তার মেয়েকে কাউকে দান করছে তার মানে তাঁকে কত সম্মান দেওয়া হচ্ছে! তখন রৈক্ক রাজাকে উপদেশ দিচ্ছেন – প্রাণই ব্রহ্ম। এই কথাকে যদি ঠাকুরের ভাষায় অনুবাদ করা হয় তখন তার অনুবাদ হবে কালীই ব্রহ্ম। প্রাণ ক্রিয়াশক্তি, কালীও ক্রিয়াশক্তি।

তৈত্তরীয় উপনিষদে সত্যকামের যখন হাজারটা গরু হয়ে গেছে তখন প্রধান ষাঁড় বৃষভ এসে বলছে – সত্যকাম এবার গুরুর কাছে চল, আমরা হাজারটা গরু হয়ে গেছি। এই কথা বলে বৃষভ সত্যকামকে একটা ব্রহ্মোপদেশ দিয়ে বলছে যে বাকীটা তুমি সন্ধ্যে বেলা অগ্নির কাছ থেকে শুনে নিও। সত্যকাম যে এতদিন ধরে গরুগুলির রক্ষণাবেক্ষণ করছিল, সে কিন্তু প্রতিদিননই অগ্নিহোত্রাদি কর্ম করে যাচ্ছিল। সেই রকম সন্ধ্যেবেলা সত্যকাম সংহিতা পাঠ করে যখন অগ্নিহোত্র কর্ম করছে তখন অগ্নি তাকে দ্বিতীয় একটা উপদেশ দিল। বেদ অনেক আগের উপনিষদ অনেক পরে এসেছে। এই যে ঘটনা, অগ্নি এসে সত্যকামকে ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ দিচ্ছেন, এই ভাবে বেদের সময়ে কোনও ঋষি হয়ত দেখেছিলেন যিনি অগ্নি তিনি যে শুধুই ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ দেন তা নয়, তিনি অন্য সব কিছুই দিতে পারেন, কি কি দিতে পারেন সেটা আমরা আগেই আলোচনা করেছি – তিনি সন্তান দিতে পারেন, তিনি রক্ষা করতে পারেন, সব সম্পদ দিতে পারেন ইত্যাদি। যিনি এটা প্রথম পেয়েছিলেন তিনিই হয়তো এই সূক্তকে সংকলন করে পরবর্তি বংশধরদের দিয়ে গেছেন, বা তিনি এটা তাঁর পূর্ব পুরুষ বা গুরুর কাছ থেকে সংকলন করেছেন। এগুলো আমরা শুধু অনুমান করতেই পারি। এখন এটাই লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে। যে ঋষি এই তত্ত্বটা পেয়েছিলেন তিনিই এটাকে এত সুন্দর ছন্দে অলংকারে কবিতায় লিপিবদ্ধ করবেন, ভাবলেই একটু অবাক লাগবে। স্বামী প্রেমেশানন্দজী অনেক সুন্দর সুন্দর গান লিখেছেন, যার মধ্যে একটা বিখ্যাত গান হচ্ছে – অরূপ সায়রে লীলা লহরী। গানের কথাগুলি রাজা মহারাজ শুনে বলছেন – যে এই গানটি লিখেছে তার ব্রহ্ম অনুভূতি হয়েছে। স্বামী প্রেমেশানন্দের তখন কি ব্রহ্মানুভূতি হয়েছিল? তখনও তাঁর ব্রহ্মানুভূতি আদৌ হয়নি। কিন্তু তিনি নিজে একজন বড় সাধক ছিলেন, কথামৃতের আধ্যাত্মিক তত্ত্ব কথাগুলি তিনি অনেকেবার পড়েছেন, সেগুলোকে অনুধ্যান করেছেন। তার ফলে এই আধ্যাত্মিক তত্ত্বগুলি তাঁর নিজস্ব কবিত্ব প্রতিভা আর আধ্যাত্মিক সাধনার সংমিশ্রণে কবিতা হয়ে তাঁর কলম থেকে বেরিয়ে এল। রাজা মহারাজের কথা অনুযায়ী যদি আমরা বিচার করি তাহলে অরূপ সায়রে এই গানটি একটি সিদ্ধ গান। এই কারণেই সিদ্ধ গান বলা যায়, যে আধ্যাত্মিক সত্য একজন কবির কবিতার মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসছে যিনি নিজেই একজন উচ্চ সাধক।

অগ্নিমীড়ে পুরাহিতং এটিও একটা সিদ্ধ মন্ত্র, কারণ হয় ঋষি এটাকে প্রত্যক্ষ করেছেন যে অগ্নি সেই দেবতা যিনি সব কিছুই দিতে পারেন, নয়তো যিনি প্রত্যক্ষ করেছেন তিনি তাঁর শিষ্যদের বলেছেন, পরে সেই শিষ্যরা আবার তাদের শিষ্যদের দিয়েছেন। কথামৃতে যত আধ্যাত্মিক সত্য আছে তার সব কটাকে যদি আমরা কবিতার আকারে রূপ দিই তাহলে অনেক বই হয়ে যাবে। বেদের সব মন্ত্রগুলিও তাই, আধ্যাত্মিক সত্যগুলিকে কবিতার আকারে ব্যক্ত করা হয়েছে। এমনও হতে পারে কোন ঋষি তাঁর গুরুর কাছে সত্যটাকে জেনে এই ভাবে কবিতার আকারে সাজিয়ে দিয়েছেন। তিনি আবার তাঁর শিষ্যদের বলে দিলেন – এটাই আধ্যাত্মিক সত্য, নিয়মিত তোমরা এর পাঠ করবে। নিয়মিত বেদ পাঠ আবার দুই রকমের হয়। এটা মনে রাখতে হবে ঋগ্বেদকে আধার করে কোন যজ্ঞ হয় না, যজ্ঞ হবে যজুর্বেদকে অবলম্বন করে। আবার যজুর্বেদের যত মন্ত্র আছে তার বেশির ভাগই ঋগ্বেদ থেকে এসেছে। অগ্নিমীড়ে এই মন্ত্র যদি যজুর্বেদে থাকে তাহলে এই মন্ত্র দিয়ে যজ্ঞ হবে, তবে আমরা যত দূর জানি এই মন্ত্রটি যজুর্বেদে নেই, এটি পুরোপুরি স্তুতি মন্ত্র। স্তুতি মন্ত্র মানে, যখন যজ্ঞ হবে, অগ্নিকে উপলক্ষ করেই যদি যজ্ঞ হয় তাহলে ঋগ্বেদের যিনি ব্রাহ্মণ তিনি তখন এই মন্ত্র পাঠ করতে

থাকবেন। ঋগ্বেদের ব্রাহ্মণ যিনি, তিনি নিজে ঠিক করে নেবেন অগ্নির কোন কোন মন্ত্র পাঠ করবেন, কেননা অগ্নির উপরে প্রচুর মন্ত্র আছে। মন্ত্র বেছে নিয়ে তিনি এখন এক এক করে সেই মন্ত্রগুলি পাঠ করতে থাকবেন।

ব্যাসদেবের আগে পর্যন্ত বেদের মধ্যে অনেক তত্ত্বই সংগ্রহিত হচ্ছিল। কারণ একই গুরু-শিষ্য চলতে চলতে মাঝখানে যদি কোন শিষ্য ব্রহ্মজ্ঞ হয়ে যায় তখন তাঁর বিদ্যাটাও বেদে অন্তর্ভুক্ত হত। এই ভাবে হতে হতে বেদের কলেবর বৃদ্ধি হয়েই যাচ্ছিল, তাছাড়া কিছু কিছু জিনিস অনেক জায়গায় ঘুরে ঘুরে পাওয়া যায়। ব্যাসদেব এসে এই সমস্যাটা ঠিক করলেন। ব্যাস হলেন বেদের আগে ও বেদের পরের বিভাজন রেখা। ব্যাসের আগে যিনি নতুন বিদ্যা পেতেন সেটা বেদে যোগ হয়ে যেত। ব্যাসদেব এসে বলে দিলেন – এতদিন যাবৎ যা যোগ হবার হয়ে গেছে, এর পরে আর কিছু বেদে যোগ করা হবে না। বেদে তো আর কিছু যোগ হবে না, কিন্তু এর পরেও যাঁরা আধ্যাত্মিক তত্ত্বগুলি আবিষ্কার করবেন সেগুলি কোথায় যাবে? তখন সেটা আলাদা গ্রন্থ হিসাবে গণ্য করা হবে। যেমন কথামৃতেও আধ্যাত্মিক তত্ত্বের ছড়াছড়ি রয়েছে সেগুলো কখনই বেদে যাবে না। কিন্তু ব্যাসদেবের আগে যদি কথামৃত হত তখন সেটা বেদের কোন সংহিতা বা ব্রাহ্মণ অংশে বা উপনিষদে থাকত। ব্যাসদেবের পরে যা কিছু তত্ত্ব আবিষ্কার হয়েছে সেগুলি একটা নতুন ধরনের আধ্যাত্মিক সাহিত্য হিসাবে প্রকাশিত হল।

বাল্মীকি আর ব্যাসদেব মধ্যে কালের খুব মারাত্মক একটা ব্যবধাণ নেই। এই কারণেই বাল্মীকি যখন রামায়ণ রচনা করলেন তখন সেটা আর বেদের পরম্পরাতে সংযুক্ত করা হল না। যার জন্য বাল্মীকি বেদের ঋষিদের মত অত সম্মান তখনকার দিনে পাননি। বশিষ্ট, বিশ্বামিত্র ও বাল্মীকি এই তিনজন ছিলেন একই সময়ের। বশিষ্ট ছিলেন শ্রীরামচন্দ্রের রাজগুরু আর বিশ্বামিত্র ছিলেন অস্ত্রগুরু। আর তার একটু পরেই বাল্মীকি, যিনি শ্রীরামচন্দ্রের জীবনের উপরে কবিতা রচনা করছিলেন। বশিষ্ট আর বিশ্বামিত্রের প্রচুর উল্লেখ আমরা বেদেই পাই। কিন্তু সমস্যা হল বশিষ্ট আর বিশ্বামিত্র একজন কোন নির্দিষ্ট ঋষির নাম নাকি কোন পরিবারের নাম, বলা খুব মুশকিল। যেমন অনেক ভট্টাচার্য পরিবার আছে কিন্তু নির্দিষ্ট করে বলা মুশকিল কে এই মন্ত্র আবিষ্কার করেছেন। বেদের ব্যাপারে আমরা যা কিছু ঐতিহাসিক তথ্য পাই এর সবটাই কয়েকজন মুষ্টিমেয় পণ্ডিত বেদের ব্যাপারে খোঁজ খবর নিয়ে তাঁদের যে বিচার ধারা দিয়েছেন সেটাকেই আমরা সত্য বলে মেনে নিচ্ছি। কিন্তু এগুলোকে নিয়ে বেশি নাড়াচাড়া করে আরও অনুসন্ধান যদি কেউ করতে যায় তাহলে দেখা যাবে একটা জায়গায় গিয়ে এঁদের তথ্যগুলিও আটকে যায়, তখন এমন কিছু প্রশ্ন আসে যার উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় না। কেউ যদি প্রশ্ন করে যে বেদে যে পরে অনেক সংযোজিত হয়েছে, সেটা কতবার আর কত দিন অন্তর অন্তর? এদের জেনে রাখা উচিত যে বেদে প্রথমে যা ছিল সেটাই বিশাল ছিল, পরবর্তি কালে ব্রাহ্মণরা পরম্পরা প্রথায় বেদ মুখস্ত করতেন। এই বিশাল বেদ মুখস্ত করতেই তাদের সারাটা জীবন কেটে যেত, এরপরে তাদের পক্ষে সম্ভব হত না যে নতুন কিছু আবিষ্কার করে বেদে সংযোজিত করবে। মানুষের বুদ্ধি এতটুকু, সেটাও বেদ মুখস্ত করতেই যদি চলে যায়, কাঠামো বাঁধা বিদ্যা আয়ত্ত করতেই জীবনের বেশির ভাগ সময় খরচ হয়ে গেলে কখন আর বেদ রচনা করবে। ব্রাহ্মণরা যে বেদের মন্ত্রগুলি মুখস্ত করে প্রত্যেক দিন নিষ্ঠাপূর্বক যে আবৃত্তি করতেন তাতে তাঁদের মধ্যে একটা শক্তি আসত। স্বামীজী বলছেন হাজার হাজার বছর গায়ত্রী মন্ত্র জপ করে করে ভারতের অন্তর্জগত দিব্যালোকে উজ্জ্বল হয়ে আছে। যে কেউ যদি দিনে এক হাজার গায়ত্রী মন্ত্র জপ করে তাহলে এক বছর পর তার সামনে কেউ দাঁড়াতে পারবে না। ঠাকুর বলছেন – যখন ঝগড়া ঝামেলা হয় তখন বড় গোঁফওয়ালা পালোয়ান থাকতে বিশ ক্রোশ দূরের অন্য গ্রাম থেকে পাল্কী করে রোগাপ্যাটকা এক ব্রাহ্মণকে নিয়ে আসে বিচারের জন্য। কেননা তাঁর সেই শক্তিটা আছে। এটাই বুদ্ধিজীবি ও সৃজনশীলতার প্রভেদ। আধ্যাত্মিকতা এদের থেকেও অনেক উপরে।

অগ্নিনা রয়িমশ্নবৎপোষমেব দিবেদিবে।
যশসং বীরবত্তমম্।।৩।।

তৃতীয় মন্ত্রে যজ্ঞে অগ্নির স্তুতি করে অগ্নির উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে, এই যজ্ঞ যিনি করছেন, যিনি যজ্ঞ করছেন বলতে পুরোহিতও হতে পারেন আবার যজমানও হতে পারেন, তিনি যেন রত্ন লাভ করেন। হোতা যিনি তিনিই যজ্ঞে এই স্তুতি করছেন, হোতা মানে যিনি ঋগ্বেদের পণ্ডিত। কার জন্য স্তুতি করছেন? যজমানের হয়ে। কারণ যজমানরা ব্রাহ্মণ হলেও সব কিছু জানতেন না। যজমান পুরোহিতকে ডেকেছেন, পুরোহিত এখন স্তুতি করছেন। পুরোহিত স্তুতি করছেন, হে অগ্নি! যজমানের হয়ে আমি প্রার্থনা করছি। *অগ্নিনা*, মানে অগ্নির হাত ধরে। *অশ্নবৎ*, অশ্ন শব্দের অর্থ এখন খাওয়ার অর্থে নেওয়া হয়, কিন্তু বেদের সময় অর্থ হত প্রাপ্তি। *রয়িম্* শব্দের অর্থ ধনদৌলত, *অশ্ন*, ধনদৌলতের প্রাপ্তি বা মানুষ যে জিনিসকে ভালোবাসে সেই জিনিসের যেন প্রাপ্তি হয়। পাণিনি আসার পর সংস্কৃতের শব্দের অর্থ আর পাল্টানো হয় না, পাণিনির আগে ছিল বৈদিক সংস্কৃত। বলছেন, হে অগ্নি! আপনার হাত ধরে আমার যজমানের যেন ধনরত্নের প্রাপ্তি হয়। ধনরত্ন পেলেই হবে না, *পোষমেব দিবে দিবে*, পাওয়ার পর খরচ হয়ে শেষ হয়ে যেতে পারে, নষ্ট হয়ে যেতে পারে, তা যেন না হয়। বলছেন যজমানের ধনরত্ন যেন দিনে দিনে বৃদ্ধি পেতে থাকে। আগে যেমন বলা হয়েছিল '*রত্নধাতমম্*' যার অর্থ অগ্নি রত্ন দেন। '*দিবেদিবে*' এই শব্দটা বেদের খুব প্রচলিত একটা ভাব – এখনও আমরা কারুর মঙ্গল কামনা করে বলি তোমার দিনে দিনে শ্রীবৃদ্ধি হোক। মীরাবাঈয়ের নামকরা ভজনে আছে – পায়ো জী ম্যায়নে রাম রতন, দিন দিন বাড়ত সবই। রামধন, রামভক্তি এমনই এক ধন, এই ধন চুরি হয় না, খরচ হয়ে যায় না আর তার সাথে দিনে দিনে রামের প্রতি ভক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে। '*রয়িম*' সম্পদ একবার দিয়ে দিল তাতে হচ্ছে না, এটা যেন দিনে দিনে বাড়তে থাকে, কখনই যেন এর হ্রাস না হয়। কি রকম সম্পদ? যেটাতে যশ বৃদ্ধি পায়, *যশসং* আর যেটাতে সন্তানাদি প্রাপ্তিতে সহায়ক হয়। অসদুপায়ে উপার্জিত অর্থ বা কালোটাকার যা গুণাবলী, এখানে সম্পদের যা বর্ণনা করা হয়ে ঠিক তার বিপরীত।

'*যশসং বীরবত্তমম্*' আমার এমন সম্পদ যেন হয় যে সম্পদে আমার যশ বৃদ্ধি হয়। অসদুপায়ে যে সম্পদ হয় তাকে মানুষ লুকিয়ে রাখে, এই ধরণের সম্পদে যশ তো হয়ই না, উল্টে কলঙ্ক হয়ে যেতে পারে। আমরা জীবনে যা কিছু অর্জন করতে চাইছি, যা কিছু আমাদের চাহিদা তাতে যেন এই তিনটে শর্ত লাগানো থাকে, প্রথমে *অশ্নম্* যেন পাই, দ্বিতীয় পোষম্, যেন বৃদ্ধি পায় আর *যশসম্*, এতে যেন আমার সম্মান বৃদ্ধি হয়। শুধু তাই না, চতুর্থ শর্ত হল এর যে পরিণাম হবে সেটা যেন *বীরবত্তমম্* হয় অর্থাৎ যজমানের যে সন্তান প্রাপ্তি হবে সে যেন বীর হয়, তার মধ্যে তেজ থাকবে, ওজস্বী হবে। ঠাকুর কৃপণদের নিন্দা করে বলছেন, হয়ত ছেলেগুলো বদ্ হয়ে গেল, সব টাকা-পয়সা উড়িয়ে দিল। ইদানিং কালে ইয়ং ছেলেমেয়েদের একটা রোগের নাম Borderline Personality Disorder (BPD)। বেশির ভাগ ছেলে-মেয়েরাই আজকাল বিপিডি, পাগল ঠিক নয়। নিজের যা যা ইচ্ছা সব ইচ্ছাই মেটাতে হবে। না মেটালে চেঁচিয়ে-মেচিয়ে, ফাটাফাটি করে, ভাঙচুর করে অস্থির করে সবাইকে অতিষ্ঠ করে তুলবে। এদের শান্ত করার কোন উপায় নেই। তাহলে এত টাকা-পয়সা রোজগার করে কি পরিণাম হল! কিন্তু এখানে বলছেন '*বীরবত্তমম্*' বীর্যবান হোক। এটাও একটা খুব প্রচলিত বৈদিক যুগের ভাব। ওনারা সব সময় চাইতেন আমার সন্তানরা যেন বীর্যবান হয়। *বীরবত্তমম্* শব্দের কোন ব্যাখ্যা করা হচ্ছে না যে কিসে সে বীর হবে, কেননা যাদের মেধা আছে তাদেরকেও তাঁরা বীর বলতেন আবার যার খুব সাহস ও বল থাকত তাকেও বীর বলতেন। বীর বলতে মেধা ও শক্তি দুটোকেই বোঝায়। আর *যশসং* তার যেন খুব সুনাম হয়, যজমানের ছেলের নয়, যজমানের নিজের সুনামের কথা এখানে বলা হচ্ছে। আমি সেই অগ্নির পূজা করছি যে অগ্নি এই সব সম্পদের দাতা। আমরা এখন বৈদিক যজ্ঞের ধ্যান ধারণা থেকে অনেক সরে এসেছি। কিন্তু প্রত্যেক বাড়িতেই ভোরবেলা অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করতে হয়, রান্নার জন্যই হোক আর ঠাকুর ঘরে পূজার সময় ধূপদীপ জ্বালানর জন্যই হোক, এখন অবশ্য উনুনের পরিবর্তে গ্যাসের ব্যবহার হচ্ছে। কেউ যদি গভীর ভাবে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে এই মন্ত্রগুলির অর্থ চিন্তা করে রোজ অগ্নিকে প্রজ্জ্বলিত করেন এবং অনেক দিন ধরে যদি করতে থাকেন তাহলে এর একটা শুভ ফল সে পাবেই পাবে। এগুলো কিন্তু শ্লোক নয়, এগুলো মন্ত্র, আর এর প্রত্যেকটি মন্ত্রেরই প্রচণ্ড শক্তি আছে। মন্ত্রশক্তি হল, এই মন্ত্র যখন আমরা উচ্চারণ করব, যখন এই মন্ত্রের উপরে ধ্যান করব, তখন এই মন্ত্রের যে বক্তব্য সেটা হাতেনাতে

ফল দেবে। যে কোন একটা কথা বলে দিল কেউ আর সেটার উপরে ধ্যান করলেই কিছু হবে না। কিন্তু এগুলো ঋষিরা ধ্যানের গভীরে দেখেছেন তাই বেদের সব মন্ত্রই সিদ্ধমন্ত্র।

আমি যদি কাউকে বলি ঠাকুর আপনার মঙ্গল করুন, এর একটা নিশ্চয়ই দাম আছে, কেননা আমি একজনের শুভ কামনা করে যেমন আমি নিজে পবিত্র হচ্ছি অপর দিকে যার মঙ্গল কামনা করছি তারও ভাল হবে। আবার স্বামীজী যখন বলছেন *'কৃত্যং করোতি কলুষং কুহকান্তকারী'* – শ্রীরামকৃষ্ণ ভগবান, আমাদের যে কলুষতা, পাপকর্ম তিনি যদি চান সেটাকেই কৃত্য করে দেন, মানে যেটা আমার পাপ, আমরা যেটা মন্দ এটাই আমাকে মহৎ করে দেবে। স্বামীজী যেটা বলছেন সেটা আর্ষবাক্য, ঋষির কথা। এটাকেই যদি আমরা রোজ উচ্চারণ করি বা ধ্যানের মধ্যে চিন্তা করি তখন আমাদের মধ্যে যে পাপবোধ, অপরাধবোধ আছে সেটা কমে যাবে, হঠাৎ অনুভব হবে যে আমার মধ্যে কোথা থেকে একটা শক্তি আসছে। স্বামীজী ছিলেন ঋষি, তিনি কোন কল্পনা করে এই কথা বলছেন না, ঠাকুরের গুণাবলীর যে বৈশিষ্ট্য সেটাকে স্বামীজী ছন্দোবদ্ধ করেছেন। ভগবানের এটাই গুণ বা স্বভাব, শ্রীরামকৃষ্ণ হলেন অবতার পুরুষ, তিনি মানুষের দুঃখকষ্টকে হরণ করে নেন। আমাদের অপরধবোধ, কলঙ্কবোধ সেটাকে তিনি শুধু সরিয়েই দেননা, এটাই আমাকে বিরাট করে দেবে। স্বামীজী ঠাকুরের সমস্ত গুণাবলীকে একত্রিত করে *'ওঁ হ্রীং ঋতম্ ত্বমোচলো গুণজিৎ গুণেড্য'* এই প্রার্থনা মন্ত্রের মধ্যে সন্নিবেশিত করে লিপিবদ্ধ করে দিলেন। ঠাকুরের ভক্তদের কাছে যেমন এই প্রার্থনা বেদবাক্য, ঠিক তেমনি *অগ্নিনা রয়িমশ্নবৎপোষমেব দিবেদিবে। যশসং বীরবত্তমম্।।* এটাও ঠিক একই বেদবাক্য। ঠিক ঠিক শ্রদ্ধা, ভক্তি, নিষ্ঠা ও একাগ্রতা নিয়ে যদি রোজ পাঠ করা হয় তাহলে সত্যি সত্যিই বাড়িতে ধনসম্পদ বৃদ্ধি পেতে থাকবে। চতুর্থ মন্ত্রে বলছেন –

অগ্নে যং যজ্ঞমধ্বরং বিশ্বতঃ পরিভূরসি।
স ইদ্দেবেষু গচ্ছতি।।৪।।

এখানে *অধ্বরম্* শব্দটি খুব তাৎপর্যপূর্ণ। *অধ্বরম্* শব্দের অর্থ নিয়ে পণ্ডিতদের অনেকগুলো মত আছে। সায়নাচার্য এর অর্থ করেছেন *হিংসারহিতম্*। এর একটা অর্থ করা যেতে পারে, আমি যে যজ্ঞ করছি এতে হিংসা নেই, অর্থাৎ এই যজ্ঞে ছাগবলি বা অন্য কোন পশুবলি নেই। পরের দিকে বেদের বিরুদ্ধে যে সমালোচনা করা হত তা হল, বেদের যজ্ঞে এত হিংসা করা হত যে, ছাগ থেকে শুরু করে সব কিছুর বলি হতেই থাকত। এই ব্যাপারটার বাইরে গিয়ে বলছেন এই যজ্ঞে কোন হিংসা নেই। কিন্তু এই শব্দের অর্থকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ঠিক ঠিক যে ব্যাখ্যা দিচ্ছেন তাতে বলছেন, রাক্ষসাদিরা এই যজ্ঞে হিংসা করতে পারে না। তবে *অধ্বরম্* শব্দের ঠিক ঠিক অর্থ হয় যে যজ্ঞে হিংসা নেই, কিন্তু ব্যাখ্যা করার সময় বলছেন, অগ্নি দিয়ে যে যজ্ঞ সম্পাদন করা হয়, অশুভ শক্তি সেই যজ্ঞে হিংসার দ্বারা কোন বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে না। বিঘ্ন করতে পারছে না বলেই যজ্ঞ সম্পূর্ণ হতে পারছে। যদিও সায়নাচার্য এই ব্যাখ্যা দিচ্ছেন, কিন্তু আমরা জানি বাল্মীকি রামায়ণে বিশ্বামিত্র এক যজ্ঞ করতে যাচ্ছেন সেখানে রাক্ষসাদিরা এসে বিঘ্ন করত বলে তিনি শ্রীরামচন্দ্র আর লক্ষ্মণকে নিয়ে এসেছিলেন, ওই যজ্ঞ বিশ্বামিত্র অগ্নি দিয়েই সম্পাদন করেছিলেন। যাই হোক, এখানে বলছেন যে যজ্ঞকে অগ্নি রক্ষা করছেন সেটা *অধ্বরম্*, অর্থাৎ কোন অশুভ শক্তি এই যজ্ঞে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারবে না আর যজ্ঞ যথারীতি সম্পূর্ণ হবে। এর কাছাকাছি আমরা এর অর্থ কার্যকর হতে দেখি, ঠাকুর যখন দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে মা ভবতারিণীর পূজা করতেন তখন তিনি রং বীজমন্ত্রে নিজের চারপাশে জল সিঞ্চন করতেন আর ঠাকুর নিজের চোখে দেখতে পেতেন তাঁর চারদিকে একটা অগ্নির বলয় সৃষ্টি হয়ে গেছে, তার মানে এই পূজাতে কোন অশুভ শক্তি বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারবে না। যেখানে অগ্নির দিব্য শক্তি বিরাজমান সেখানে এই ভৌতিক অগ্নি অশুভ শক্তিকে নাশ করতে পারবে। তাই এর পরিষ্কার ব্যাখ্যা হল যে যজ্ঞ অগ্নি দ্বারা সুরক্ষিত সেই যজ্ঞ *অধ্বরম্*, কোন অশুভ শক্তি যজ্ঞে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারবে না। যজ্ঞে বিঘ্ন না করতে পারলে যজ্ঞ ঠিক ঠিক ভাবে সম্পাদিত করা যাবে, যজ্ঞ সম্পাদিত হলে যজমান যে কামনা নিয়ে যজ্ঞ করছেন সেই কামনা পূরণ হবে। সেইজন্য এখানে স্তুতি করছেন, হে অগ্নি দেবতা! এই যে যজ্ঞ করা হচ্ছে এই যজ্ঞ যেন কোন ভাবেই বিঘ্নিত না হয়, তুমি একে রক্ষা কর। অর্থাৎ আমি এই যজ্ঞ করতে করতে মাঝপথে বন্ধ করে আবার অন্য কিছু করে

আবার যজ্ঞ শুরু করছি, এই ধরণের কোন বিরতি দেওয়া হচ্ছে না। হে অগ্নি তুমিই এই যজ্ঞকে চারিদিক থেকে ঘিরে রেখে একে বিঘ্ন শূন্য করছ। এটাকেই বলছেন *অধ্বরং*, অগ্নি হাত ধরে নিয়েছেন – আমি তোমার যজ্ঞের রক্ষা করব।

আর বলছেন *বিশ্বতঃ পরিভূঃ*, অগ্নি সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত। উপনিষদেও *পরিভূঃ* শব্দ পাই, যেখানে বলছেন – *পরিভূঃ স্বয়ম্ভূঃ*, যিনি ব্রহ্ম তিনি ঘিরে রেখেছেন। যখনই *পরিভূঃ* শব্দকে নিয়ে আসা হল, তখন আমরা অগ্নিকে যে একজন দেবতা রূপে দেখছি সেই অর্থে অগ্নি আর কিন্তু দেবতা থাকলেন না, তিনি সর্বব্যাপী হয়ে গেলেন। ভগবান ছাড়া কোন কিছুই সর্বব্যাপী হতে পারে না। তাহলে এখানে কার স্তুতি করা হচ্ছে? দেবতার স্তুতি করা হচ্ছে না। *পরিভূঃ* শব্দই দেখিয়ে দিচ্ছে, যিনি মন্ত্রদ্রষ্টা তিনি জানেন পরমাত্মাই সত্য। কিন্তু সাধারণ লোকেদের জন্য তিনি এমন ভাবে করে দিলেন মনে হচ্ছে যেন বাচ খেলা চলছে, এই অনন্তের দিকে যাচ্ছেন আবার ঘুরে সীমিতের মধ্যে অবস্থান করছেন। যিনি অনন্ত তাঁকে আমরা কি করে স্তুতি করতে পারি! কিন্তু ওই অনন্তের উপর যখন একটা মুখোস লেগে গেল তখন তাঁকে স্তুতি করা যাবে। নির্গুণ নিরাকারের মুখ কে? অগ্নি, এবার অগ্নিকে ভালো করেই স্তুতি করা যাবে। কি রকম স্তুতি করা যাবে? যেমনটি মুখ লাগানো হয়েছে, যেমনটি তাঁর চেহারার আকৃতি হয়েছে স্তুতিও তেমনটি হবে, যেমন দেবতা তেমন তার পূজো। আপনি সর্বব্যাপী, আপনি সব জায়গাতেই আছেন, *স ইদ্দেবেষু গচ্ছতি*, আপনি সব জায়গাতেই যান, স্বর্গেও যান, পৃথিবীতেও যান, অন্তরীক্ষেও যান। আমি যে ঘৃত দিয়ে যজ্ঞে আহুতি দিচ্ছি তা অগ্নির তেজকে বাড়ানোর জন্য ঢালছি না, আহুতিটা দেওয়া হচ্ছে দেবতার উদ্দেশ্যে, এই আহুতিকে অগ্নি ঘিরে রেখেছে এবং তিনি সর্বব্যাপী বলে এই আহুতি সেই দেবতার কাছেই পৌঁছে যাবে। গীতায় ভগবান বলছেন, যে যারই পূজা করুক না কেন সব পূজা আমার কাছেই আসে। এখানে বলা হচ্ছে অগ্নিকে দিলে সব দেবতার কাছে চলে যায়। বেদের এই বিচারগুলিই পরের দিকে ঈশ্বরের উপর চলে গেল। বেল পাতাতে ঘি লাগিয়ে *'ওঁ সর্বদেবদেবী স্বরূপায় শ্রীরামকৃষ্ণায় স্বাহা'* বলে আগুনের মধ্যে অর্পণ করছি। যে অগ্নিতে অর্পণ করা হচ্ছে সেই অগ্নির নাম *'শ্রীরামকৃষ্ণ নাম্নো অগ্নে'*। আমি একজন বিশেষ দেবতাদের উদ্দেশ্যে আহুতি দিলাম, যে কেউ এই এসে আহুতি গ্রহণ করে নিতে পারে, যেমন রাক্ষস, প্রেত, অসুর এরা সেই আহুতিটা নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু নিতে পারবে না। কেন পারবে না? অগ্নি একে ঘিরে রেখেছে যাতে অন্য আর কেউ এসে না নিয়ে যেতে পারে। আর এই যজ্ঞ বিরামহীন ভাবে করা হচ্ছে, মাঝখানে কোথাও বন্ধ করা হচ্ছে না। তাই *'স ইদ্দেবেষু গচ্ছতি'* আমি নিশ্চিত যে আমার সমস্ত আহুতি দেবতাদের কাছে পৌঁছে যাবে কারণ আপনি সর্বব্যাপী। তাহলে সম্পূর্ণ অর্থ দাঁড়াচ্ছে – হে অগ্নি! আমি শ্রীরামকৃষ্ণের নামে যে আহুতি দিলাম, সেই আহুতিকে তুমি আবৃত করে রেখেছ, সব জায়গাতেই তুমি বিরাজমান, তাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই আহুতি ঠিক ঠিক ভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছেই পৌঁছে যাবে। এখানে শ্রীরামকৃষ্ণের জায়গায় হবে ইন্দ্রাদি দেবতা। দেবতাদের আহ্বাণ করে নিয়ে আসা যায় কিন্তু ভগবানকে এভাবে আহ্বাণ করে নিয়ে আসা যায় না, কারণ তিনি সর্বব্যাপী। সেইজন্য বিষ্ণু, শ্রীরাম বা শ্রীকৃষ্ণের পূজাতে এটা হবে না। শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামকৃষ্ণ এনারা দেবতা নন, তাই এই তত্ত্ব অনুযায়ী এখানে কোন অবতার বা ঈশ্বরের নামে হবে না। দেবতা আর ভগবানের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে, দেবতারা মানুষেরই মত কিন্তু মানুষের থেকে দেবতাদের শক্তি অনেক বেশি। ভগবান সর্বব্যাপী ও সর্বশক্তিমান। ভগবানেরই একটা ক্ষুদ্র শক্তি নিয়ে দেবতারা দেবতা হয়েছেন, দেবতাদের থেকে আরেকটু কম শক্তি নিয়ে মানুষ। মানুষের আবার অন্য একটা বড় সুবিধা আছে তা হল, মানুষ ভগবানকে লাভ করতে পারে, যেটা দেবতারা পারে না। আবার দেবতারা অনেক কিছু করতে পারেন যেটা মানুষ করতে পারেনা। আবার ঈশ্বরের গুণ আরোপ করে বলছেন –

অগ্নির্হোতা কবিক্রতুঃ সত্যশ্চিত্রশ্রবস্তমঃ।
দেবো দেবেভিরা গমত্।।৫।।

পঞ্চম মন্ত্রে যে শব্দগুলি ব্যবহার করা হয়েছে পরে এই শব্দগুলিই উপনিষদে সগুণ ঈশ্বরের বর্ণনার সময় পাওয়া যাবে। ঋষিরা যেন এক এক জন করে দেবতাকে চিন্তা করেছেন আর ঈশ্বরের যত প্রকার গুণ হতে পারে সব গুণ সেই দেবতার উপরে বর্ষণ করেছেন। এইভাবে অনেক গুণ দেবতাদের উপরে ঢালার পর

দেখলেন ব্যাপারটা ঠিক যেন জমল না, তারপর সেটাকে আবার বাদ দিয়ে দিলেন। এরপর আরেকজন দেবতাকে ধরলেন, এইভাবে করতে করতে তারা ব্রহ্মের উপর এই গুণগুলি আরোপ করলেন। প্রথম থেকে অগ্নিদেবতার গুণগুলি বাড়াতে থাকছেন। প্রথমে বলেছেন – তুমি পুরোহিত, হোত্রি, এখানে এসে বলছেন *অগ্নির্হোতা*, মানে তুমি হলে হোতা, ঋগ্বেদের সংহিতা যাঁরা পাঠ করেন তাঁদের হোতা বলা হয়। যজ্ঞের যিনি প্রধান পুরোহিত তিনি হলেন হোতা, তিনি দেবতাদের স্তুতি করে আহ্বাণ করছেন। ঠিক তেমনি অগ্নিকে স্তুতি করে বলছেন, হে অগ্নি! তুমি প্রধান হোতা তাই তোমার সম্মান সব থেকে বেশি। কারণ অগ্নিই আবার দেবতাদের নিয়ে আসেন। হোতা অগ্নি দেবতার খুব নামকরা বিশেষণ। *কবিক্রতুঃ* তুমি ক্রান্তদর্শি কবি। কবি মানেই ক্রান্তদর্শি, যিনি জ্ঞাতা, ত্রিকালদর্শী, বই পড়া পণ্ডিত নয়। ক্রান্তদর্শি মানে, তিনি সব কিছুকে সম্পূর্ণ রূপে জানেন, সেইজন্য একমাত্র ভগবানেরই নাম কবি। গীতায় ভগবান *কবিং পুরাণমনুশাসিতারমণোরণীয়াম্*। যিনি ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যত তিনটেকে একসাথে জানেন। ইদানিং কালের যাঁরা কবি তাঁরা হলেন মেধাবী, যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এখানে যে কবি বলা হচ্ছে এই কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বলা হচ্ছে না। ক্রান্তদর্শি একমাত্র ভগবানই হন। গীতায় ভগবান নিজেকে বলছেন *বেদাহং সমতীতানি বর্তমানানি চার্জুন। ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাং তু বেদ ন কশ্চন।।* আমি প্রত্যেকটি জীবের ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যত জানি। কবি আর মেধাবী এক নয়, মেধাবী তাঁর থেকে অনেক নীচে। কিন্তু জগতে মেধার সর্বোচ্চ প্রকাশ যেটা হতে পারে তিনিই কবি। সম্মানার্থে তাঁকেও কবি নামে সম্বোধন করা হয়। ভগবানের একটি নাম কবি যেহেতু তিনি ক্রান্তদর্শি, কিন্তু কবিরা হন সূক্ষ্মদর্শি, তাঁরা অনেক সূক্ষ্ম জিনিস দেখতে পান। ভগবানকে যে অর্থে কবি বলা হয়, এখানে অগ্নিকেও সেই অর্থে কবি বলছেন।

কবি বলার পর বলছেন *ক্রতুঃ*, ক্রতুও ভগবানের একটা নাম। গীতায় ভগবান বলছেন *অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহহমমৌষধম্। মন্ত্রোহহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্।।* যজ্ঞে অনেক রকম জিনিস দরকার, অগ্নি, মন্ত্র, আহুতি, শস্য, পুরোহিত, যজ্ঞ আর যজ্ঞের যে ফল, যে কর্ম একেবারে শুভকর্ম সেই কর্মকে বলা হয় ক্রতু, যজ্ঞে এতগুলো জিনিস লাগছে। গীতায় ভগবান বলছেন আমিই সেই ক্রতু। এখানেও অগ্নিকে ক্রতু বলছেন। যজ্ঞ সম্পাদন করাকে বলছেন ক্রতু, সমাস করে অগ্নিকে বলছেন *কবিক্রতুঃ*। যদিও কবি আর ক্রতু দুটো আলাদা শব্দ, কিন্তু এখানে আলাদা করে বলছেন না। কবি মানে বলা হয়ে গেছে, বুদ্ধির দিক থেকে শ্রেষ্ঠ আর ক্রতু বলা মানে কর্মের দিক থেকেও শ্রেষ্ঠ। শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি দিয়ে যখন শ্রেষ্ঠ কর্ম করা হয় তখন তাঁকে বলছেন *কবিক্রতুঃ*। যেমন ডঃ আবদুল কালাম, তাঁর আগে থেকেই সুনাম ছিল, তিন যখন এ্যটম বোমা নিয়ে বিরাট কাজ করে দিলেন তখন তিনি হয়ে গেলেন *কবিক্রতুঃ*। একেই তিনি মেধাবী আবার একটা বিরাট কাজ সম্পাদন করেছেন। একজন লোক ধীমান হতে পারেন, বিরাট বুদ্ধিমান হতে পারেন কিন্তু বিরাট কিছু কাজ জীবনে করেননি বা কাজ করার সুযোগ পাননি। অন্য দিকে কেউ একটা বিরাট কাজ করে দিয়েছেন কিন্তু তিনি বিরাট মেধাবী নন, যেমন একজন রাজা রাজসূয় যজ্ঞ করে দিলেন বা যেন কোন একটা বড় কাজ করে দিলেন। স্বামীজী বলছেন পরিস্থিতি বশতঃ অনেক কাপুরুষও অনেক মহৎ কাজ করে দেয়। ক্রতু অর্থাৎ শুভকর্ম তো অনেকেই করছে কিন্তু কবি নাও হতে পারে। কবি আবার ভগবানের নাম, কিন্তু এখানে দুটোকে এক করা হচ্ছে, top most brain আর best of work করছেন, অগ্নিকে *কবিক্রতুঃ* বলছেন। স্বামীজী চিকাগোতে যে কাজ করলেন এটাই ঠিক ঠিক কবিক্রতুঃর কাজ, একেই তিনি কবি, ত্রিকালদর্শি আর এমন কাজ সম্পাদন করেছেন যার কোন তুলনাই হয় না, স্বামীজী *কবিক্রতুঃ*। *কবিক্রতুঃ* একটি শব্দ যে শব্দ মাঝে মাঝেই বেদে দেবতাদের উদ্দেশ্য সম্বোধন করা হয়। কাউকে যখন সর্বোচ্চ সম্মান দিতে হয় তখন বলবে *কবিক্রতুঃ*। সাহিত্যে এর থেকে বড় বিশেষণ ব্যবহার করা যায় না। কবিক্রতুঃর উপর একজনই, তিনি ভগবান, কিন্তু নির্গুণ নিরাকার ভগবান। সগুণ সাকার ভগবান শুধু কবিক্রতুই থাকবেন, ভগবানের নাম কবি, তাঁর কাজ হল ক্রতু, গীতায় ভগবান নিজেই বলছেন *অহং ক্রতুঃ*।

আমাদের জীবন ক্রতু ছাড়া আর কিছু থেকে শুরু হতে পারে না। গৃহস্থদের সব থেকে বড় শুভকর্ম কন্যাকে সুপাত্রস্থ করা। কন্যার জন্ম নেওয়া মানে কন্যা দায়গ্রস্ত হয়ে যাওয়া, সেইজন্য জীবনের সবচেয়ে বড়

কাজ হল মেয়ের বিয়ে দেওয়া। সাধারণ ভাবে গৃহস্থ জীবনে দুটোই বড় যজ্ঞ হয়, একটা বিয়ে আরেকটি শ্রাদ্ধ। এখন অবশ্য শ্রাদ্ধের গুরুত্ব আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে বিয়েটা বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু ঠিক ঠিক যজ্ঞ অর্থে নিলে মেয়ের বিবাহ নিষ্পন্ন হয়ে গেল মানে জীবনের সব থেকে বড় কাজ হয়ে গেল। এই যে নিষ্পাদন হয়ে গেল এটাই ক্রতু। কিন্তু আরও উচ্চ আদর্শ নিয়ে যে যজ্ঞ হয়, সেই যজ্ঞ যখন সম্পাদন হয়ে গেল এবং সেই যজ্ঞ রূপ শুভকর্মের যে ফল হয়, সেটাকে বলছেন ক্রতু। পৌত্তলিক দেবতা বা দেবী বলতে আমরা যা বুঝি, বিশেষ করে আদিবাসীরা যে দেব-দেবীর মুর্তি বা পাথরকে পূজা করে, অগ্নি কিন্তু একেবারেই তা নয়। অগ্নিকে এখানে বলছে 'কবিক্রতুঃ।'

আর বলছেন তিনি 'সত্য', এই সত্যই পরে হয়ে যাচ্ছে *সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্*, এই সত্যই পরে এসে *সচ্চিদানন্দম্* হয়ে যাচ্ছে। অগ্নির আরেকটি নাম সত্য বলছেন, এই সত্য কিন্তু সত্য কথার সেই সৎ নন। সায়নাচার্য সৎএর অর্থ করছেন স্বচ্ছ সাধু, অর্থাৎ একেবারে সৎ। কারুর নাম যদি সত্য হয় তাহলে এই সত্য মানে truth নয়, সত্য মানে সাধু। সৎ মানে হয় যেটা আছে, অস্তি, সেখান থেকে সাধু শব্দ এসেছে, সেখান থেকেই truth এসেছে। অগ্নির একটা নাম সত্য, ভগবানেরও একটা নাম সত্য। অগ্নিকে যখন পূজা করা হয় তখন যে অগ্নিকে আমরা প্রতিনিয়ত দেখছি এখানে সেই অগ্নির পূজা করা হচ্ছে না। অগ্নির পূজায় অগ্নিকে পূজা করা হয় না, অগ্নির রূপের মধ্যে দিয়ে ভগবানের পূজা হচ্ছে। একজন সন্ন্যাসীর বেড়াল খুব প্রিয়, তিনি সব সময় বেড়ালকে খাওয়ান, ঘুম পাড়ান, তাদের পরিষ্কার করেন, কোন বেড়াল কখন কোথায় যাচ্ছে আসছে এই নিয়েই তিনি ব্যস্ত। তাঁকে বেড়ালের ব্যাপারে কিছু বললেই তিনি জবাব দেন যে 'কেন ঠাকুর বেড়ালের মধ্যেও মাকে দেখতেন'। কিন্তু ঠাকুর বেড়ালের মধ্যে মাকে দেখেছিলেন আর ইনি বেড়ালকেই মা দেখেন, এই হল তফাৎ। যাজ্ঞবল্ক্য তাঁর স্ত্রীকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলছেন – মানুষ নিজের সন্তানকে যে ভালোবাসে সে তার নিজের সন্তান বলেই ভালোবাসে না, নিজের আত্মার ছবি সন্তানের মধ্যে দেখে বলে সন্তানকে ভালোবাসে। নিজের স্ত্রীকে স্ত্রীর জন্য ভালোবাসছে না, স্ত্রীর মধ্যে নিজের আত্মার ছবি দেখে বলেই ভালোবাসে। সমস্যা হল মানুষ যে নিজের আত্মার ছবি দেখছে, অতি ক্ষুদ্র একটা গণ্ডীর মধ্যেই দেখে, ওর বাইরে সে নিজের আত্মার ছবি দেখতে পায়না। কিন্তু যিনি ব্রহ্মজ্ঞানী তিনি সব কিছুতেই নিজের আত্মার ছবি দেখতে পান, সেইজন্য সর্বভূতেই তাঁর ভালোবাসা বিলিয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু মানুষ যত নিজেকে সংকীর্ণ করে নেয় ততই তার আত্মার ছবিও ছোট্ট হয়ে যায়, কেননা অতটুকুর মধ্যেই সে দেখছে, এমন কি অনেকে শুধু নিজেকে নিয়েই থাকে নিজের স্ত্রী সন্তানের ভালোমন্দেও দৃষ্টি দেয়না। একজন আমেরিকান মহিলা স্বামীজীকে বলছিলেন 'স্বামীজী আপনি সব সময় যে বলে যাচ্ছেন সব কিছুর মধ্যে আত্মাকে দেখতে, কিন্তু আমিতো আমার গয়না, সাজপোষাক, টাকা পয়সার মধ্যেই আমার স্বরূপকে দেখি'। স্বামীজী শুনে বললেন 'আপনি তাইই দেখতে থাকুন কোন আপত্তি নেই'। এগুলোওতো ভগবানের বাইরে নয়। স্বামীজী আরও বললেন – 'ওর মধ্যেই হাজার হাজার বছর ঘুরপাক খেতে থাকুন, কোন জন্মে গিয়ে যখন অনেক দুঃখ-কষ্ট পাবেন তখন আপনার মনে জাগবে যে এগুলোই শেষ কথা নয়, এর বাইরেও অনেক কিছু আছে'।

আরও বলছেন *চিত্রশ্রবস্তমঃ* অগ্নিকে ছবির মত বলা হচ্ছে, কারণ চিত্র হল সৌন্দর্যের প্রতীক। *চিত্রশ্রব* যেমন বলছেন তেমনি কঠোপনিষদে নচিকেতার বাবার নাম ছিল বাজশ্রব। আচার্য সেখানে শ্রব শব্দের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলছেন শ্রব শব্দের অর্থ অন্ন। যিনি যজ্ঞে প্রচুর অন্নদান করেছিলেন সেইজন তার নাম হয়েছিল বাজশ্রব। শ্রবের আরেকটা অর্থ হয় সুনাম। অন্ন আর যশ, এর ঠিক মাঝখানে আছে সম্পত্তি। শ্রব শব্দের অনেকগুলো অর্থ এসে যাচ্ছে, শ্রব মানে অন্ন, শ্রব মানে প্রচুর সম্পদ আর শ্রব মানে সুনাম। সায়নাচার্য এর খুব সুন্দর ব্যাখ্যা করছেন – *শ্রূয়তে ইতি শ্রব*, অর্থাৎ যাঁর কথা শোনা যায় তিনি শ্রব। সাপের একটা নাম চক্ষুশ্রবা, সাপের কান থাকে না, চোখ দিয়ে শ্রবণ করে। কারণ বস্তুর নড়াচড়া চোখ দিয়ে দেখে সাপ বুঝে নিতে পারে। তাহলে শ্রব মানে হয়ে গেল শোনা, *শ্রূয়তে* মানে যার সুনাম ছড়িয়ে আছে। সুনাম কার ছড়াবে? যার প্রচুর অন্ন, তখনকার দিনে অন্নই প্রধান সম্পদ ছিল বা প্রচুর ধনসম্পদ, যেমন রাজা কুবের। *চিত্রশ্রবঃ* শব্দ অত্যন্ত উচ্চমানের বিশেষণ, অগ্নি হলেন *চিত্রশ্রবঃ*, এনার সুখ্যাতি চারিদিকে শোনা যায়। অগ্নির তিনটে জিনিসই আছে

অন্ন, রত্ন আর সুনাম। চিত্রকলার আগেকার দিনে আরেকটা নাম ছিল ললিতকলা, ললিত মানে সুন্দর, যেটা সুন্দর সেটাকে চিত্র বলে, তাহলে *চিত্রশ্রবঃ* মানে যাঁর প্রচুর সুনাম, চারিদিকে যাঁর যশের কথা শোনা যায়। এখানে অগ্নিকে যেমন *চিত্রশ্রবঃ* বলছেন, ঠিক তেমনি চিত্রশ্রবা এই বিশেষণ মানুষের জন্যও ব্যবহার করা যায়, যাঁর কথা ঘরে ঘরে শোনা যায়, কলঙ্ক রূপে নয়, সুনাম রূপে। অগ্নিকে শুধু চিত্রশ্রবা বলছেন না, বলছেন *চিত্রশ্রবস্তমঃ*, যাঁদের প্রচুর সুনাম তাঁদের মধ্যে অগ্নি শ্রেষ্ঠ। *দেবো*, দেব শব্দ দ্যু ধাতু থেকে এসেছে, দ্যু শব্দের অর্থ আলোকিত, যে আলো বিস্ফুরিত হচ্ছে। খ্রীশ্চানদের মধ্যেও এই বিশ্বাস আছে, যীশু বা কোন মহাপুরুষের ছবি যখন আঁকে তখন ছবির পেছনে ওরা জ্যোতির বলয় দিয়ে দেয়। এখানেও অগ্নিকে বলছেন *দেবো*, অগ্নি হলেন আলোকময়, আর *দেবেভিরা গমৎ*, অগ্নিকে প্রার্থনা করে বলা হচ্ছে আপনি যেন দেবতাদের নিয়ে আসেন। প্রার্থনাকে নিয়ে নিন্দুকরা নানা রকমের কথা বলে, কিন্তু মানুষ যেমন অন্য মানুষের স্তুতি করে, স্ত্রী যেমন স্বামীর স্তুতি করে বেদের স্তুতি সেরকম নয়। যদি আমরা খুব গভীর ভাবে এই স্তুতিকে বোঝার চেষ্টা করি তাহলে বুঝতে পারব ভগবান ছাড়া বা দিব্য পুরুষ ছাড়া স্তুতির মাধ্যমে যে গুণের প্রশংসা করা হচ্ছে এই গুণ আর কারুর মধ্যে থাকতে পারে না। তবে আমিও ইচ্ছে করলে এই গুণগুলো নিজের উপর আরোপ করতে পারি, আমি হোতা অর্থাৎ সাধুপুরুষ, *চিত্রশ্রবঃ* আমার খ্যাতি যেন ঘরে ঘরে চলে যায়, *কবিক্রতুঃ*, আমি যেন মেধাবী হই, যদিও কবি মেধা থেকেও উপরে আর *ক্রতুঃ* আমার সব কাজ যেন যজ্ঞরূপে সম্পাদন হয়। আমরা বলছি ভগবান জগৎ সৃষ্টি করছেন, আমি আপনি তো জগৎ সৃষ্টি করতে পারব না, তাহলে ওই জগতস্রষ্টাকে দিয়ে আমার কি দরকার। কিন্তু আমরাও সৃষ্টি করতে পারি। কারণ মানুষ মাত্রই সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখে। কিভাবে করতে পারে? লেখালেখিতে অনেক কিছু সৃষ্টি করতে পারে, চিত্রকলা বা ভাস্কর্য শিল্প সৃষ্টি করতে পারে কিংবা ছোটখাট যে কাজ করছে, মায়েরা রান্না করছেন বা বিছানায় চাদর পাতছেন সেখানেও একটা সৃজনী থাকে যার মধ্যে একটা কলা থাকবে, অপরে দেখে বলবে বাঃ কী সুন্দর! আসলে স্রষ্টার সাথে আমরা এক হয়ে আছি, স্রষ্টার গুণ যদি আমাদের মধ্যে না আসে তাহলে স্রষ্টার গুণের ব্যাখ্যা করে কোন লাভ নেই। এই মন্ত্রগুলির যেমন একটা ধর্মীয় মূল্য আছে, যজ্ঞে এই সব মন্ত্রে স্তুতি করতে লাগে তেমনি এর আবার একটা আধ্যাত্মিক মূল আছে, যখন মন্ত্রের গুণগুলিকে আমরা নিজেদের উপর লাগাব। পরের মন্ত্রে বলছেন –

যদঙ্গ দাশুষে ত্বমগ্নে ভদ্রং করিষ্যসি।
তবেত্তৎসত্যমঙ্গিরঃ।।৬।।

একটা কাহিনী আছে যাতে অঙ্গিরস বা অঙ্গিরকে অগ্নির সন্তান রূপে বলছেন। অঙ্গিরসের জন্ম জ্বলন্ত কাঠের অগ্নি থেকে। অঙ্গিরস বা অঙ্গিরঃ শব্দ থেকে অঙ্গার শব্দ এসেছে। অঙ্গিরস অগ্নির সন্তান আর পিতা ও পুত্রের মধ্যে একটা ঐক্য থাকে বলে অগ্নিকে অনেক সময় অঙ্গির বা অঙ্গ নামেও সম্বোধন করা হয়। আমরা যে স্থুল অগ্নি দেখছি, জ্বলন্ত কাঠ বা জ্বলন্ত কয়লা সেটাও অগ্নিস্বরূপ। অঙ্গ, অঙ্গির, অঙ্গিরস এগুলো অগ্নিরই বিভিন্ন নাম। *যদঙ্গ দাশুষে ত্বম্*, হে অগ্নি! তুমি যা কিছু দেবে, কাকে দেবেন? এই যে যজ্ঞ করা হচ্ছে, যজ্ঞের ফল যজমান পাবে। কেউ হয়ত ধন-সম্পদ পাওয়ার জন্য যজ্ঞ করছে, কেউ সন্তান পাওয়ার জন্য করছে, একটা কিছু প্রাপ্তির আশা করেই সবাই যজ্ঞ করে। *অগ্নে ভদ্রং করিষ্যসি*, যজমান ভালো যা কিছু পাবে সেটা যেন ভদ্র হয়। এখানে ভদ্র শব্দের ব্যাখ্যা করা হচ্ছে, মানুষ যা কিছু পায়, টাকা-পয়সা, সন্তান, বাড়ি এটাকে বলছেন *ভদ্রম্*। সাধারণত ভদ্রলোক বলতে আমরা মনে করি বাবু বা gentle, বিদেশেও gentleman শব্দের মানেই ছিল তারা হাতের কাজ করবে না, তার মানে তাদের টাকা-পয়সা ঘরবাড়ি আছে। ভদ্রলোক আর gentleman দুটো একই রুট থেকে এসেছে। বাবু আর ভদ্রলোক একই অর্থ। বলছেন যজমানের যা কিছু ভদ্র করবে *তৎ ইত সত্যম্ অঙ্গিরঃ*, এগুলো বাস্তবিক অর্থে সবই তোমার। আপনি তাকে দিচ্ছেন, যজমান যে নিজের শক্তিতে পাচ্ছে তা নয়। যজমান যজ্ঞ করে তার যে সমৃদ্ধি হল, এই সমৃদ্ধিটা তার নিজের নয়, হে অঙ্গিরস, তুমি তার ওপরে কৃপা করেছ বলেই তার এই সমৃদ্ধি হয়েছে আর এগুলো সব তোমারই জিনিস। আমরা প্রায়শই বলি সবই ঠাকুরের ইচ্ছা, তাঁর ইচ্ছাতেই আমার যা কিছু হয়েছে, এই ভাবটা আজকের নয়, বেদেই প্রথম এই ভাব দেখতে পাওয়া যায়। বেশি দুঃখ-কষ্ট আসতে থাকলে, বিপদ লেগে থাকলে বলে –

ঠাকুরের নাম কর সব বিপদ, দুঃখ-কষ্ট কেটে যাবে। অগ্নিকে বলা হচ্ছে দাতা, যা কিছু আছে সব অগ্নিই দেন। আর স্তুতি করে বলা হচ্ছে, যজ্ঞ করে যজমান যা কিছু ফল পাচ্ছে সেই ফল অগ্নিই যজমানকে দেন, অগ্নি যা কিছু দিচ্ছেন সেটা আবার অগ্নিরই সম্পদ। এখনও ইউপি বিহারে কারুর বাড়িতে গিয়ে কোন বাচ্চা ছেলেকে দেখে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, ইয়ে বাচ্চা কৌন হ্যায়। বাড়ির মালিক বলবেন আপ হি কা ব্যাটা হ্যায়, অতিথিকে স্তুতি করে সম্মান দেওয়া হচ্ছে। এখানেও ঠিক তাই হচ্ছে, অগ্নিকে স্তুতি করে বলা হচ্ছে। কারণ যজ্ঞে অগ্নি প্রথম থেকেই জড়িয়ে আছেন, আপনিই দেবতাদের নিয়ে আসছেন, দেবতারা তো পরে দিচ্ছেন, সেইজন্য যা কিছু যজমান পাচ্ছে সব আপনারই। সপ্তম মন্ত্রে বলছেন –

উপ ত্বাগ্নে দিবেদিবে দোষাবস্তর্ধিয়া বয়ম্।
নমো ভরন্ত এমসি।।৭।।

অনেক সময় আমরা কাউকে বলি আমি এক সময় আপনার কত সেবা করেছি বা বলে থাকি, আমি তোমাকে কত ভালোবাসি তাও তুমি কেন এরকম ব্যবহার করছ! পুরোহিত অগ্নিকে ঠিক এই কথাই বলছেন। *উপ ত্বাগ্নে*, বেদে এর অর্থ হয় সম্বোধন করা হে অগ্নি, আমি তোমার কাছে উট্‌কো হাজির হয়ে গেছি তা নয়। রাস্থা দিয়ে সাইকেল বা বাইকে যেতে যেতে মন্দিরের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় ঠকাস্ করে একটা প্রণাম করে দেওয়ার মত ভক্ত আমি নই। আমি উড়ো খই গোবিন্দায় নমোর মত তোমাকে পূজা করি না। আমি সকাল বিকাল রোজ তোমার কাছে আহুতি দিতে আসি। *দোষাবস্তঃ*, এই শব্দটিও খুব জটিল একটি শব্দ। পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা এর এক রকম ব্যাখ্যা করেন আবার ভারতীয় পণ্ডিতরা অন্য রকম ব্যাখ্যা করেন। *দোষা* শব্দের অর্থ হয় রাত আর *অস্তঃ* শব্দের অর্থ হয় দিন। এভাবে অর্থ করলে *দোষাবস্তঃ* শব্দের অর্থ হবে রাতদিন। কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা অর্থ করতে গিয়ে বলছেন *দোষাবস্তঃ* শব্দের অর্থ হবে যিনি দোষের অবসান করেন। এগুলো খুব শাব্দিক অর্থ, আমাদের কাছে তত গুরুত্ব নয়। মূল অর্থ হল দিনে রাতে নিয়মিত রোজ আমি তোমার পূজা করতে আসি। পুরোহিতরা আর যাই করুন না কেন, কোথাও যজমানের বাড়িতে যজ্ঞ করতে যাওয়ার হলেও যজ্ঞের আগে নিজের অগ্নিহোত্রাদি কর্ম করবেন। সন্ন্যাসীদের যেখানেই নিয়ে যাওয়া হোক না কেন, সকালে উঠে উনি এক ঘন্টা কি দু ঘণ্টা নিজে আগে জপ-ধ্যান করবেন। তারপরে তিনি যখন ঠাকুরের কাছে যাবেন তখন ঠাকুরকে বলবেন, হে ঠাকুর! আমি কিন্তু যা তা লোক নই, আমি যেদিন থেকে সন্ন্যাস নিয়েছি সেদিন থেকে সকাল বিকেল তোমার জপ-ধ্যান করছি।

ঈশাবাস্যোপনিষদেও বলছেন *হিরণ্ময়েণ পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্। তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে।।* সেই তেজী ব্রাহ্মণ মৃত্যুর সময় প্রার্থনা করছেন, হে সূর্য! তুমি এই যে রশ্মি দিয়ে তোমাকে আবৃত করে রেখেছ, এই আবরণ তুমি সরিয়ে নাও, আমি তোমার মুখ দেখতে চাই। সারা জীবন আমি সূর্য দেবতার পূজা করে এসেছি মৃত্যুর আগে আমি সেই সূর্যের মুখ দেখতে চাই। আমি কোন উট্‌কো যা তা লোক নই, *সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে*, আমি সত্য ভাবকে, বেদে যে ধর্মের কথা বলা আছে সারা জীবন আমি সেই ধর্মে প্রতিষ্ঠিত ছিলাম, এটা আমার অধিকার আমি আমার উপাস্যের মুখ অবলোকন করতে চাই। আমার কিসের জোরে অধিকার হয়েছে? আমি ধর্মে প্রতিষ্ঠিত, আমি সত্যধর্মে প্রতিষ্ঠিত, আমি কোন যা তা লোক নই। ভারতের যেখানেই কোন সাধু সন্ন্যাসীকে দেখলেই লোকে কেন দৌড়ে এসে প্রণাম করে? কারণ এই মন্ত্রেই তার ভাব স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। সাধু মানেই লোকে জানে তিনি ধর্মে প্রতিষ্ঠিত, তিনি ঈশ্বরের কাছের লোক, সাধুকে ধরলে তিনি যদি আমার হয়ে কিছু বলে দেন ভগবান তাহলে শুনবেনই শুনবেন। এখানেও সেই কথা পুরোহিত অগ্নিকে বলছেন, *দিবে দিবে দোষাবস্তঃ*, রোজ নিয়মিত ভাবে সকাল বিকাল আমি তোমার কাছে যজ্ঞ করতে আসি, আমি তোমার অর্চনা করি, আমি তোমার পোষণ করেছি অর্থাৎ বর্ধন করেছি।

সত্যকামকে গুরু কয়েকটি গরু দিয়ে বলে দিলেন, এই গরুগুলো নিয়ে জঙ্গলে চলে যাও, হাজারটা গরু হয়ে যাওয়ার পর আমার কাছে ফেরত আসবে। উপনিষদে এরপর আর বর্ণনা নেই কিভাবে সত্যকামের দিন গুজরান হত, কিন্তু একটা জিনিস সত্যকাম করে যেতেন, সকাল বিকাল অগ্নিহোত্র যজ্ঞ করে যাচ্ছেন।

যেদিন হাজারটা গরু হয়ে গেল সেদিন বৃষভ এসে বলছে, সত্যকাম আমরা হাজারটা হয়ে গেছি। মানে সত্যকামের কর্ম সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। সত্যকাম এখন ক্রতু, যজ্ঞ সম্পাদন হয়ে গেছে। বলার পর বৃষভ তাঁকে ব্রহ্মজ্ঞানের একটি উপদেশ দিয়ে বলে দিল সন্ধ্যেবেলায় তুমি যখন অগ্নিহোত্রের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করবে, পরের উপদেশ সেই অগ্নি তোমাকে দেবে। সন্ধ্যাবেলা অগ্নি সত্যকামকে ব্রহ্মের ব্যাপারে সেই উপদেশ দিলেন। কি করে সম্ভব হল? ক্রতু, অর্থাৎ সত্যকাম যজ্ঞ সম্পাদন করে গেছেন, কিন্তু তার আগের যে কর্মগুলো সেগুলোও তিনি নিয়মিত করে গেছেন। এই কথাই যোগশাস্ত্রে বলছেন *স তু দীর্ঘকালনৈরন্তর্যসৎকারাসেবিতো দৃঢ়ভূমিঃ*। অনেক দিন ধরে করে যাচ্ছেন, শ্রদ্ধার সঙ্গে করে যাচ্ছেন তখন ওটাই দৃঢ়ভূমি হয়। এখানেও পুরোহিত এটাই বলছেন, *দিবেদিবে দোষাবস্তর্ধিয়া বয়ম্*, তার মানে তিনি বোঝাতে চাইছেন আমি অগ্নির একজন উত্তম সেবক, আমি অগ্নিহোত্র করেছি, অগ্নিহোত্র ব্রাহ্মণ যিনি তিনি সকাল বিকেল অগ্নিতে আহুতি দেন। তাই অগ্নিকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, হঠাৎ আমার খেয়াল হল আর অগ্নিতে একদিন আহুতি দিয়ে দিলাম আর কোন দিন দিলাম না তা নয়, হে অগ্নি আমি আপনার একনিষ্ঠ সেবক। আজকালকার দিনে ব্রাহ্মণরা সারা বছর কত রকম অন্য ধরণের কাজ করে বেড়ায় আর বছরে হয়তো একদিন কোন পূজাপার্বণে পুরোহিতের কাজ করতে চলে গেল। সারা বছর হয়তো ডাক্তারি করছে আর বছরে দেশের জমিদার বাড়িতে তিন দিন ধরে দুর্গাপূজাতে পুরোহিতের কাজ করছে। এখানে কিন্তু তা হচ্ছে না, রোজ সকাল বিকেল অগ্নির সেবা করে। ভগবানের উপরে অধিকার দেখাতে হলে, তাঁর উপরে জোর খাটাতে হলে আগে তাকে ভগবানের একনিষ্ঠ সেবক হতে হবে। ঠাকুর বলছেন – দেখা দিবি না মানে, দেখা দিতেই হবে। তুই কি আমার পাতান মা, তুই আমার আপনার মা। অগ্নির উপরেও এই আপনত্ব আরোপ করে বলা হচ্ছে – আপনার সাথে আমার একটা একত্ব ভাব আছে কেননা আমি রোজ সকাল বিকেল আপনার সেবা করি, তাই আমার অধিকার আছে আপনার কাছে কিছু দাবী করার। কিসের দাবী? *নমো ভরন্ত এমসি*, আপনি আমার পূজা গ্রহণ করুন, আমাকে রক্ষা করুন, আপনি সেই দেবতাদের নিয়ে আসুন, যে দেবতাদের উদ্দেশ্যে এই যজ্ঞ করা হচ্ছে। যদিও দেবতাদের উদ্দেশ্যে এই যজ্ঞ করা হচ্ছে, কিন্তু আমি জানি আমার যা কিছু ভালো হবে সবই আপনার মাধ্যমেই হবে। আমি চাকরি করছি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অফিসে, আমাকে মাইনে দিচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কিন্তু আমি জানি হে ঠাকুর এই যা কিছু আমার হচ্ছে, এরা যা মাইনে দিচ্ছে, তা তোমার জন্যই আমার সব কিছু হচ্ছে, সুখ সমৃদ্ধি যা কিছু আমি পাচ্ছি তুমিই এর দাতা, ‘*দাতা এক রাম*’। এই ধরণের যত ভাব আছে সবই বেদের প্রথম সূক্তেই এসে গেছে। স্তুতি করতে করতে আবার বলছেন –

রাজন্তমধ্বরাণাং গোপামৃতস্য দীদিবিম্।
বর্ধমানং স্বে দমে।।৮।।

অগ্নি দেবতার স্তুতি করতে গিয়ে আবার তাঁর কিছু কিছু গুণের কথা উল্লেক করে বলছেন, আমরা যে নিত্য আপনার কাছে আসি, সেই আপনি যিনি ‘*রাজন্তম্*’, ‘*অধ্বরাণাম্*’, ‘*গোপাম্*’, ‘*ঋতস্য*’, ‘*দীদিবিম্*’, ‘*বর্ধমানম্*’ ইত্যাদি। আগেকার দিনে বাড়ি তৈরী করার সময় সেখানে একটা আলাদা ঘর তৈরী করা হত, যেটাকে বলা হত যজ্ঞশালা। যজ্ঞশালা শব্দ শুনে মনে হতে পারে এটা কোন public place, কিন্তু বেশির ভাগ বাড়িতেই যজ্ঞশালা থাকত। ওখান থেকেই পরে বাড়িতে আলাদা করে ছোট্ট একটা ঠাকুর ঘর করার ব্যাপারটা এসেছে। ব্রাহ্মণরা যজ্ঞশালাতে যজ্ঞাদি করতেন আর যজ্ঞশালাকে সব সময় শুদ্ধ পবিত্র রাখতেন। ব্রাহ্মণদের সেই সময় অগ্নিহোত্রাদিই প্রধান পূজা ছিল, সকাল বিকেল অগ্নিতে আহুতি দিতেন আর তার সাথে গায়ত্রী মন্ত্রের জপ করতেন। ইদানিং বিগ্রহ স্থাপন করে ফুল চন্দন, নৈবেদ্যাদি দিয়ে যে পূজার প্রচলন এসেছে, এই জিনিস বেদের সময় ছিল না। ওনারা তখন অগ্নিহোত্র করতেন আর গায়ত্রী মন্ত্র জপ করতেন। এখানে বলছেন আমি রোজ যজ্ঞশালায় গিয়ে সকাল বিকেল অগ্নিতে যে আহুতি দিয়ে অগ্নিহোত্রাদি করছি, সেই অগ্নি কে? তিনি *রাজন্তম্*, ভাষ্যকার রাজন্তম্ শব্দের ব্যাখ্যা করছেন তিনি রাজার মত দীপ্যমান। দেবতারা যেমন দীপ্যমান, ঠিক তেমনি রাজাও দীপ্যমান। আসলে রাজা কে? যার তেজ আছে। সেখান থেকে এসেছে *রাজন্তম্*, যাদের জীবনে সাফল্য আসে তাদের চেহারার চমকটাই পাল্টে যায়। অগ্নিকে বলছেন *রাজন্তম্*। গীতাতে তেজের ব্যাখ্যা করতে

গিয়ে শঙ্করাচার্য বলছেন তেজ হল ওজঃ শক্তি, রাজার উপস্থিতিই বুঝিয়ে দেবে যে তিনি রাজা। ওর্‌হান পামুরের নোবেলজয়ী বই 'My Name is Red' বইতে তিনি এক রাজার বর্ণনা দিচ্ছেন, রাজা নিজের লাইব্রেরীতে ঢুকছেন, যত লোক সেখানে ছিল সবাই নিষ্প্রভ হয়ে গেল, রাজার যে তেজ, সেই তেজ বাকীদের সমস্ত তেজ হরণ কর নিয়েছে। যার মধ্যে ঈশ্বরের শক্তি কাজ করে তার প্রথম লক্ষণ তার তেজে সবার তেজ ম্রিয়মাণ হয়ে যায়। আকাশে চাঁদ উঠলে তারাগুলি নিষ্প্রভ হয়ে যায়, সূর্য উঠলে আবার চাঁদ নিস্তেজ হয়ে পড়ে। লোডশেডিং এর সময় মোমবাতি জ্বলছে, যেই কারেন্ট এসে টিউব লাইট জ্বলে গেল মোমবাতির আলো ক্ষীণ হয়ে গেলে। টিউব লাইট কি মোমবাতির আলোকে হরণ করে নিল? না, মোমবাতির আলো টিউব লাইটের আলোতে চাপা পড়ে গেল। রাজা যখন ঢুকবে তখন মন্ত্রী, সেনাপতি সবার তেজ রাজার তেজে চাপা পড়ে যাবে। সায়ণাচার্য তাই রাজার ব্যাখ্যাতে বলছেন '*দীপ্যমানম্*'। অগ্নিকেও তাই বলা হচ্ছে রাজা, সব সময় তুমি দেদীপ্যমান, তোমার তেজে তোমাকে সব সময় জ্বলজ্বল দেখাচ্ছে। আমরা সামনা-সামনি যে স্থূল অগ্নিকে দেখছি, সেই অগ্নি অন্ধকারকে বিদূরিত করে দিচ্ছে। এটা অগ্নির স্থূল রূপ কিন্তু দেবতা রূপে তাঁর যে বর্ণনা সেখানেও তাঁকে দিব্য রূপধারী রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। '*অধ্বরাণাং*' অধ্বর শব্দের অর্থ করা হয় যিনি হিংসা রহিত। কিন্তু *অধ্বরাণাং* শব্দের অর্থ করে বলছেন, যিনি যজ্ঞকে হিংসা থেকে রক্ষা করেন। রাক্ষসাদিরা এসে যে যজ্ঞে বিঘ্ন সৃষ্টি করবে অগ্নি সেটা হতে দেন না। সেইজন্য অগ্নিকে বলছেন *অধ্বরাণাং*। একেই তিনি *রাজন্তম্*, দেদীপ্যমান আবার তার সাথে *অধ্বারাণাং*। *গোপাম্*, গোপাম্ শব্দের অর্থও রক্ষক, যিনি রক্ষা করেন। এই যে যজ্ঞ সম্পাদন করা হচ্ছে, এটা একটা শুভ কর্ম, সমস্ত শুভ কর্মের যে ফল হবে সেই ফলকে তিনি রক্ষা করেন। *অধ্বারাণাং গোপাম্*, এর অর্থ হল যে যজ্ঞ সম্পন্ন করা হচ্ছে সেই যজ্ঞকে তিনি রক্ষা করছেন আর যজ্ঞের যে ফল সেটাও তিনি রক্ষা করেন বলে আমরা সেই ফল পাই।

ঋতস্য দীদিবিম্, *দীদিবিম্* শব্দের অর্থ হয় দ্যোতকম্, যিনি আলোময় অর্থাৎ যিনি প্রকাশমান করেন। আর *ঋতম্* শব্দের অর্থ, জিনিসটা মনে যেমনটি আছে তেমনটি যখন বচনে নিয়ে আসা হয় তখন তাকে বলে সত্যম্ আর ঋতম্ হল পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যে মহাজাগতিক নিয়ম বা একটা সিদ্ধান্তের উপরে চলছে, ওই সিদ্ধান্ত ভগবানের সঙ্গে এক। ভগবান যখন ইচ্ছা করলেন সৃষ্টি হোক তখন বেদ সৃষ্টি হয়ে গেল। কিন্তু যে সিদ্ধান্তে হবে সেটাকে বলছেন ঋতম্। যেমন গরু বাছুর দেওয়ার পর দুধ দেবে। কেন দুধ দেবে? ঋতমের জন্য। বসন্ত ঋতুতে আম গাছে মুকুল আসবে। কেন মুকুল আসবে? এটাই সিদ্ধান্ত, ঋতমের জন্য গাছে ফল আসবে। আম পেকে যাওয়ার পর গাছ থেকে যখন পড়বে তখন উপরে না গিয়ে নীচে কেন পড়ে? ঋতমের জন্য। ধোঁয়া কেন উপরের দিকে যাবে? ঋতমের জন্য। Law of gravity এটাও ঋতম্ আর law of buoyancy এটাও ঋতম্, ঋতম্ হল cosmic order। এই মহাজাগতিক নিয়মকে কেউ উল্লঙ্ঘন করতে পারে না। গীতার বিখ্যাত শ্লোক *যদা যদাহি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত* পড়লে মনে প্রশ্ন আসতে পারে কেন ভগবান এই কথা বলতে গেলেন। কারণ জগতের সবই ভগবানের, শুভটাও তাঁর অশুভটাও তাঁর, জীবনটাও তাঁর মৃত্যুও তাঁর। ঋতম্ বেদের একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ ধারণা, কিন্তু ঋতমও মাঝে মাঝে অনৃতম্ হয়ে যায়, অনৃতম্ হয়ে যাওয়া মানে cosmic orderকে পাল্টে দেওয়া হল। ঋতমকে অনৃতমে পাল্টানোর পেছনে কাজ করে একমাত্র আসুরিক শক্তি। দেবতারা সব সময় ঋতমের রক্ষক, অন্য দিকে অসুররা কোন নিয়মকেই গ্রাহ্য করবে না, যেখান থেকে হোক যেভাবেই হোক আমাকে লুটেপুটে খেতে হবে। দেবতাদের কাজ লড়াই করে অনৃতমকে দূর করে ঋতমকে প্রতিষ্ঠা করা। ঋতমের সবচেয়ে বড় রক্ষক বরুণ দেবতা, ইন্দ্র যদিও কখন সখন গোলমাল করে বসে কিন্তু বরুণ একেবারে ধর্মে প্রতিষ্ঠিত। বেদে অনেক কাহিনী আছে, যার কিছু কাহিনী পুরাণেও এসেছ। এই ধরণের কাহিনীতে আছে যে, দেবতারাও যখন অসুরদের সাথে পেরে ওঠে না তখন তাঁরা বিষ্ণুর সাহায্য নেন, এই বিষ্ণু আবার দ্বাদশ আদিত্যের একজন আদিত্য দেবতা, বিষ্ণু আবার ইন্দ্রের অধীন।

যিনি সচ্চিদানন্দ, তিনি নির্গুণ নিরাকার, তিনিই আছেন। তিনি যখন সগুণ সাকার হয়ে যান, যখন নির্গুণ নিরাকারের মধ্যে শোভন গুণগুলি এসে যায়, কিংবা যখন সচ্চিদানন্দের একটা রূপ আমরা দেখি তখন যাঁকে দেখছি তিনিই ঈশ্বর বা ভগবান। ভগ মানে ঐশ্বর্য, ভগবান মানে যিনি ঐশ্বর্যবান। সগুণ সাকার

সচ্চিদানন্দকে ঈশ্বর, আল্লা, গড্, ভগবান বিষ্ণু, শ্রীরামকৃষ্ণ, শিব যা খুশী বলতে পারি। নির্গুণ নিরাকারের কোন নাম থাকে না। কিন্তু শূন্যের সাথে যাতে কোন গোলমাল না হয়ে যায় সেইজন্য অনেক সময় তাঁকে সচ্চিদানন্দ বলা হয়। কিন্তু সচ্চিদানন্দও যা ঈশ্বরও তাই। শুধু যখন সীমিত মন দিয়ে দেখা হয়, যেমন চোখের সামনে টেলিস্কোপ লাগিয়ে দিলে যে জিনিসটা অদৃশ্য সেটাও দেখা যায়, কিন্তু দেখাটা সীমিত। যেমন টেলিস্কোপ দিয়ে যদি চাঁদ দেখি তখন চাঁদের একটা অংশকে দেখা যাবে, পুরো চাঁদ দেখা যাবে না, কিন্তু যেটাই দেখব সেটা বড় এবং অনেক স্পষ্ট দেখব। মন দিয়ে যখন ঈশ্বরকে দেখা হয় তখন বড় দেখায় কিন্তু স্পষ্ট। মনের ভেদ যখন চলে যায়, যখন আত্মা আত্মাকে বোধ করে তখন পুরোটাই দেখে। কিন্তু কি দেখে সেটা জানা যাবে না। কারণ তিনি বোধে বোধ করছেন। ঈশ্বর এসে যাওয়া মানে সৃষ্টিও এসে গেল। সৃষ্টিতে পোকামাকড়, পশুপাখি থেকে শুরু করে মানুষের মত নানান রকমের জীব যেমন আছে তেমনি অসুর আছে দেবতারাও আছেন, ঋষিরা আছেন, সিদ্ধরাও আছেন। প্রাণীদের মধ্যে সিদ্ধকে সব থেকে শ্রেষ্ঠ প্রাণী বলা হয়। ঠাকুর বলছেন, সমাধিতে মন অনেক উচ্চ অবস্থায় চলে গেল যেখানে দেবতারাও পৌঁছাতে পারেন না, ওটাই সিদ্ধলোক। যাঁরা প্রচুর তপস্যা করে খুব উচ্চ অবস্থায় চলে গেছেন, একমাত্র তাঁরা ছাড়া সিদ্ধলোকে কেউ প্রবেশ করতে পারে না। দেবতারাও তাঁদের তুলনায় অনেক নিকৃষ্ট। কিন্তু আমাদের থেকে অনেক উচ্চস্তরের, সেইজন্য তাঁদের ক্ষমতাও অনেক বেশি। দেবতাদেরও অনেক গুণ আছে, দেবতাদের মধ্যে একজন সাধারণ দেবতা হলেন বিষ্ণু। বিষ্ণুর একটা বিশেষ ক্ষমতা হল তিনি অনেক রূপ ধারণ করতে পারেন। বেদেই একটা কাহিনী আছে তাতে তিনি বামন রূপ ধারণ করে বলিরাজকে ছল করে পাতালে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। অন্য দিকে দেবতারা ঋতমকে রক্ষা করেন। এগুলো হল বৈদিক যুগের কাহিনী। এবার মহাভারত ও ভাগবতাদির মত শাস্ত্র এসে গেল, মহাভারতের ধর্ম বা ভাগবতের ধর্মকে অনেক পণ্ডিতরা নামই দিয়েছেন ভাগবত ধর্ম। তাঁদের বক্তব্য গীতা ভাগবত ধর্মের শাস্ত্র। বেদের সময় বিষ্ণু যিনি একজন সাধারণ দেবতা ছিলেন, ভাগবত ধর্মে এসে বিষ্ণুকে ভগবান করে দেওয়া হল। নির্গুণ নিরাকারকে সগুণ সাকার করে দিলেন, সগুণ সাকার ভগবানের নাম দিলেন বিষ্ণু। কারণ বিষ্ণুর নাম আগে থেকেই সবাই জানতেন, তিনি দেখতে সুন্দর, তাঁর অনেক ক্ষমতা। এবার এই বিষ্ণু দেবতা হয়ে গেলেন নির্গুণ নিরাকারের মুখ। কিন্তু বেদের বিষ্ণুর যা যা গুণ ও ক্ষমতা ছিল সেটা তার সঙ্গেই থেকে গেল, এরপর বর্ণনা যখন করা হচ্ছে তখন এই বর্ণনা আর সেই বর্ণনা মিলে দুটো এক হয়ে গেছে।

ঋতমকে যে সামলে রাখবে তার কাজ হল ধর্মকে ধরে রাখা। কিন্তু এটা ভগবানের কাজ নয়। এই কাজ দেবতাদের। দেবতারা ঋতমকে কিভাবে রক্ষা করেন? আসুরিক শক্তিকে পরাস্ত করে। ঋতমকে রক্ষা করা ভগবানের কাজ হতে পারে না। কারণ দেবতারাও ভগবানের আর অসুররাও ভগবানের। তাহলে গীতাতে ভগবান কেন এই শ্লোক নিয়ে এলেন? গীতা যদি না আনে তাহলে বেদের যে খুব গুরুত্বপূর্ণ ধারণা ঋতম্, ঋতমকে ধরে রাখা যে দেবতাদের কাজ, এই ব্যাপারটা হারিয়ে যাবে। আচার্য শঙ্কর যখন গীতার ভাষ্য লিখছেন তখন তাঁকে পুরো ব্যাপারটাকে একটা সমন্বয় করতে হবে। সেইজন্য একদিকে তিনি দেখাচ্ছেন ভগবান ধর্ম সংস্থাপন করছেন। ধর্ম সংস্থাপন তিনি কিভাবে করছেন? সেখানে আচার্য বলছেন *দ্বিবিধো হি বেদোক্ত ধর্মঃ, প্রবৃত্তিলক্ষণো নিবৃত্তিলক্ষণশ্চং জগতঃ স্থিতি কারণম্*, বেদের দুটি ধর্ম, প্রবৃত্তিলক্ষণ আর নিবৃত্তিলক্ষণ, এই দুটো ধর্ম দিয়েই জগতের স্থিতি রক্ষিত হয়। বেদ আবার ব্রাহ্মণদের হাতে। ব্রাহ্মণদের যদি ঠিক রাখা হয় তাহলে বেদ ঠিক থাকবে, বেদ যদি ঠিক থাকে তাহলে ধর্ম থাকবে। ব্রাহ্মণদের উপর যদি আক্রমণ আসে তাহলে ধর্মে গোলমাল লেগে যাবে। সেইজন্য ভগবান সব সময় অবতার হয়ে আসেন একমাত্র ব্রাহ্মণদের ব্রাহ্মণত্ব রক্ষা করার জন্য। কারণ ব্রাহ্মণই হল সাক্ষাৎ ধর্ম। যিনিই অবতার হবেন, সব অবতারেরই একটা বড় কাজ হল ধর্ম সংস্থাপন করা। ধর্ম সংস্থাপন এই নয় যে সব কিছু অধর্মের তুঙ্গে চলে গিয়েছিল, ধর্ম ও অধর্মের ভারসাম্যটা বিগড়ে গিয়েছিল। কিন্তু ঋতমের ক্ষেত্রে যখন ঋতমের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায় তখন ঋতমকে ঠিক করাটা দেবতাদের কাজ। বেদের সময় ভগবান এসে ধর্ম, অধর্মের ভারসাম্য ঠিক করবেন এই ধারণা ছিল না, এই কাজ ছিল দেবতাদের। পরে যখন ভগবানের ধারণা এসেছে তখন এই কার্যটা ভগবানের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। গীতার *ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত* এইসব শ্লোকের পশ্চাৎপট কি, কেন এসেছে,

কীভাবে এসেছে এগুলো নিয়ে আমাদের পণ্ডিতরা কোন চিন্তা ভাবনাই করেননি। রাম রাবণকে মারলেন আর ধর্ম সংস্থাপন হয়ে গেল, কৃষ্ণ কংসকে বধ করলেন আর ধর্ম সংস্থাপন হয়ে গেল, এগুলো বালবুদ্ধিদের জন্য ঠিক আছে। কারণ এগুলোর কোন অর্থই হয় না। কংসকে যদি অধর্মের প্রতীক রূপেও ভাবা হয়, কিন্তু সেটাও তো ভগবানেরই রূপ। ভগবান তো ধর্ম অধর্মের পারে, তাহলে তিনি কাউকে বধ করতে যাবেন কেন। সেইজন্য আচার্য শঙ্করের বিশ্লেষণই ঠিক ঠিক বিশ্লেষণ।

বেদের যে ধর্ম, এই ধর্ম অনেকদিন চলতে চলতে মানুষের মধ্য থেকে হারিয়ে যায়, ফলে তারা প্রবৃত্তিমার্গেও যায় না আর নিবৃত্তিমার্গে তো যাবেই না। তাহলে কোন মার্গে যায়? কামনী-কাঞ্চন মার্গে, তখন কামিনী-কাঞ্চনই ধর্ম হয়ে যায়। প্রবৃত্তিমার্গে কামিনী-কাঞ্চন থাকে না, কামিনী-কাঞ্চনটাই তখন সেখানে অর্থ আর কাম হয়ে যায়। অর্থ আর কাম যদি ধর্মে প্রতিষ্ঠিত না থাকে তখন এটাই হয়ে যায় কামিনী-কাঞ্চন। যখন ধর্ম অধর্মে রূপান্তরিত হয়ে যায়, অর্থ কাঞ্চনে পাল্টে যায় আর কাম কামিনীতে পাল্টে যায় আর মোক্ষ যখন পুরোপুরি আলস্যে পরিবর্তিত হয়ে যায় তখন বুঝতে হবে অধর্ম এসে গেছে। ভগবান তখন নিজে অবতার হয়ে এসে নিজের জীবন আদর্শ দিয়ে মানুষকে ধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকার শিক্ষা দেন। অবতার নিজে এমন এক আদর্শ নিয়ে আসেন যে আদর্শকে দেখে মানুষের মন আবার ধর্মের দিকে অনুপ্রাণিত হয়। অসুর নিধন করে বেড়ানো অবতারের কাজ নয়। কিন্তু যে ঋতমের কথা বলা হচ্ছে এই ঋতমকে ঠিক রাখার কাজ দেবতাদের। হে ঠাকুর! আমাদের এসে রক্ষা কর অমুক রাজা আমাদের উপর খুব অত্যাচার করছে। এগুলো ভগবানের কাজ নয়, এগুলো দেবতাদের কাজ। ইদানিং কেউ আর যজ্ঞ করছে না তাহলে দেবতারা কোথা থেকে এসে আমাদের রক্ষা করবেন? যবে থেকে বেদের যজ্ঞ ভারতে বন্ধ হয়ে গেছে তবে থেকে বিধর্মীরা এসে ভারতে হিন্দুদের মারতে শুরু করেছে। যত দিন যজ্ঞ হত তত দিন দেবতারা এসে হিন্দুদের রক্ষা করত। ঈশ্বর কখন শুধু হিন্দুদের রক্ষা করবেন না, কারণ বিধর্মীরাও ঈশ্বরের, হিন্দুরাও ঈশ্বরের কিন্তু দেবতারা হলেন শুধু হিন্দুদের। দেবতাদের ভাষা আবার সংস্কৃত, সংস্কৃত ছাড়া দেবতারা অন্য কোন ভাষা বুঝতে পারবেন না, সেইজন্য সংস্কৃতকে বলে দেবভাষা। দেবতাদের কাছে তাই সংস্কৃত ভাষায় প্রার্থনা করতে হবে। ঠাকুরের কাছে আমরা যে কোন ভাষায় প্রার্থনা করতে পারি। কারণ তিনি ভগবান, ভগবানের কাছে হিন্দী, বাংলা, ইংরাজী, সংস্কৃত সব সমান। ঠাকুর এই স্থূল শরীরের সব ভাষা বুঝতেন না কিন্তু সূক্ষ্ম শরীরে সব ভাষাই বুঝতে পারেন। মূল কথা ঋতমকে ঠিক রাখা দেবতাদের কাজ।

আমরা যা কিছু শুভ কর্ম করছি এই শুভ কর্মের ফলও ঋতম রূপে থেকে যায়। ঋতম রূপে যেটা থেকে যায় এটাই পরে আমাদের শুভ ফল দেয়। *ঋতস্য দীদিবীম্‌*, আমরা যে শুভ কর্ম করছি, হে অগ্নি! এই শুভ কর্মের ফল যেন হারিয়ে না যায়। এনারা আগে একটা শব্দ ব্যবহার করতেন অপূর্বতা, পরে দর্শনেও এই অপূর্বতা শব্দটি খুব গুরুত্ব পেয়েছে। আমরা যা কিছু শুভ কাজ করছি এগুলো সব জমা থাকল, সঠিক সময়ে ফল দেবে, এটাকেই বলছেন অপূর্বতা। পরের দিকে কর্মবাদের তত্ত্বের গুরুত্ব বৃদ্ধির সাথে অপূর্বতাই কর্মফলে রূপান্তরিত হয়ে গেল। পরবর্তি কালে হিন্দু ধর্মে যা কিছু এসেছে সব বেদ থেকেই এসেছে, তখন বেদের রূপটা অন্য রকম ছিল এখন শুধু তার ওই রূপ পাল্টে গেছে। কর্মফল অবশ্যম্ভাবী, কর্মের ফল সবাই পাবেই পাবে। অনেক সময় বদমাইশ দুষ্ট লোকেদের জাগতিক উন্নতি হতে দেখলে আমাদের মনে দুঃখ হয়, কিন্তু দুঃখ করার কিছু নেই, কারণ আগের আগের জন্মে এরা অনেক সকাম যজ্ঞ করেছিল, তার ফল এখন বেরোচ্ছে। ঠাকুরও বলছেন, তবে কি জানো আগের জন্মে অনেক দান-পূণ্য করা থাকলে এই জন্মে একটু সুখ স্বাচ্ছন্দ্য হয়। এই জন্মে টাকা-পয়সা হয়েছে মানেই গত জন্মে কিছু শুভ কর্ম করা আছে। মন্ত্রেও বলছেন *ঋতস্য দীদিবীম্‌*, ঋতমের ফল অবশ্যই আপনি পাবেন। এখানে অশুভ কর্মের কথা বলছেন না, যত শুভ কর্ম করেছেন তার সব ফল আপনি পাবেনই পাবেন। কেন পাবেন? অগ্নি দেবতা আছেন বলে। অগ্নি দেবতার এই বিশেষণকে পরে ভগবানের উপর লাগিয়ে দিয়ে এসে গেলেন বিধাতা। আমার কর্মের ফল যেন আমার কাছেই আসে, আপনার কর্মের ফল যেন আমার কাছে না এসে আপনার কাছেই যায়, এই কাজের দেখাশোনা করতেন দেবতারা কিন্তু পরে ভগবানের কাছে এই কাজের ভার চলে যায়, তখন তাঁকে বলছেন বিধাতা।

স্তুতি করে আবার বলছেন *বর্ধমানং স্বে দমে*, আপনার বাড়িতে আপনি দিনে দিনে বর্ধিত হচ্ছেন। এটাও অগ্নি দেবতার একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য। অগ্নির যে নিজের বাসস্থান, অগ্নির বাসথান কোথায়? যজ্ঞশালা, অগ্নি যজ্ঞশালাতে থাকেন সেখানে আপনি প্রতিদিনই বর্ধিত হচ্ছেন। সেইজন্য বলছেন, হে অগ্নি! আপনার যে এত গুণ সেতো আছেই কিন্তু তারপরেও আপনি আপনার নিবাসে দিনে দিনে বর্ধিত হচ্ছন। এটাই খুব মজার ব্যাপার, অগ্নির গুণের মধ্যে একটা আছে, অগ্নি যদিও পুরাতন কিন্তু একেবারেই নতুনের মত। কারণ, রোজই অগ্নির নতুন নতুন শুদ্ধ জন্ম হচ্ছে যেহেতু অরণি কাষ্ঠের দ্বারাই প্রতিদিন নতুন নতুন ভাবে অগ্নির জন্ম হচ্ছে। আবার অন্য দিকে পুরনো কারণ আদিম কাল থেকে অগ্নি চলে আসছে। তাছাড়া দিনে দিনে বৃদ্ধি হচ্ছে। রোজই তো যজ্ঞে আহুতি দেওয়া হচ্ছে, তাই অগ্নির ক্ষয় হবার কোন প্রশ্নই নেই, সেইজন্য দিনে দিনে বেড়েই চলেছে। পরে পুরাণেও এই ভাবটা এনে বলা হচ্ছে, পুরাণের সব আখ্যায়িকা পুরনো কিন্তু নতুনের মত। এখানে সায়নাচার্য ঋতমের অর্থ বলছেন – *সত্যস্য অবশ্যম্ভাবিনাঃ কর্মফলস্য*। কর্মফল হবেই হবে। এইভাবে স্তুতি করার পর সব শেষে বলছেন –

স নঃ পিতেব সুনবেহগ্রে সূপায়নো ভব।
সচস্বা নঃ স্বস্তয়ে।।৯।।

হে অগ্নি! আমরা যেন তোমাকে খুব সহজে পাই, তুমি আমাদের ছেড়ে কখনই চলে যেও না। কিভাবে সহজে পাব? বলছেন *পিতবে সুনবেহগ্র সূপায়নো ভব*। পিতা যেমন সন্তানের সঙ্গে এক, পিতা যেমন সন্তানের কিসে ভালোর হয় তার জন্য সর্বদা ব্যস্ত থাকে, ঠিক তেমনি তুমিও আমাদের সাথে পিতা-পুত্রের মত এক হও আর আমাদের যাতে মঙ্গল হয় তার জন্য তুমি তোমার কৃপাদৃষ্টি সব সময় আমাদের উপর দাও। ভগবানকে পিতা রূপে দেখা, এই ধারণা বেদের প্রথম মন্ত্রেই আমরা পাই। পিতার যে মহৎ গুণগুলো সন্তানের উপর আসে, ঠিক তেমনি আমরাও যেন তোমার গুণগুলো পাই। *সচস্বা নঃ স্বস্তয়ে*, তুমি আর আমি যেন এক হই। কিসের জন্য? *স্বস্তয়ে*, আমাদের মঙ্গলের জন্য। নিষ্কাম ভক্তি বা পরা ভক্তির যে কথা বলা হয়, যেখানে কোন চাহিদা নেই, তোমাকেই চাই, তোমাকে ভালোবাসি বলেই তোমাকে চাই, এটাই শ্রেষ্ঠতম ভালোবাসার নিদর্শন। একবার ঠাকুর নরেনের সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছেন। দক্ষিণেশ্বরে নরেন এলেই ওর দিকে তাকান না, ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেই ঠাকুর কথা বলতে শুরু করে দেন। নরেনকে তাচ্ছিল্য করে ঠাকুর নরেনকে দেখে নিচ্ছেন। নরেনও কিন্তু একবারও ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করলেন না, মশাই! কি হয়েছে? তাও তিনি দক্ষিণেশ্বরে আসা যাওয়া করতে থাকলেন। একদিন ঠাকুর নরেনকে জিজ্ঞেস করছেন 'হ্যাঁরে নরেন! আমি তো তোর সাথে কথা বলি না, তাও তুই এখানে আসিস কেন'? নরেন তখন বলছেন 'আমি আপনার কথা শুনতে আসি না, আপনাকে ভালোবাসি আপনাকে তাই দেখতে আসি'। এই হল পরা ভক্তি। খুব উচ্চমানের মন ও আধার না হলে এই অবস্থায় যাওয়া যায় না। ভগবানের প্রতি যে ভক্তি হবে সেটা এই ভক্তিরই কথা বলা হচ্ছে, হে প্রভু! তুমি আমার প্রার্থনা শোন আর নাই শোন, তুমি দেখা দাও আর নাই দেখা দাও, আমি তোমাকে ভালোবেসেছি আর আমি অন্য কাউকে ভালোবাসতে পারব না, আমার মন, প্রাণ সব তোমাকেই দিয়েছি। পরা ভক্তি, প্রেমা ভক্তির এই ভাব বেদের এখানেই পাওয়া যাচ্ছে না, কোথাও কোথাও একটু ছিটেফোঁটা পাওয়া যাচ্ছে। যেমন বলছেন *পিতবে সুনবে*, সহজে যেন তোমাকে পাই, ছেলে যেমন বাবাকে চাইলেই পায়। এর মধ্যে ভালোবাসা আছে। কিন্তু তারপরেই বলছেন *সচস্বা নঃ স্বস্তয়ে*, আমাদের যেন মঙ্গল হয়। কি মঙ্গল? জাগতিক মঙ্গল যেন পাই। কারণ যেখানে যজ্ঞ আর যেখানেই দেবতা সেখানেই ফলের কামনা থাকবে। আচার্য শঙ্কর পরে এই ভাব নিয়ে এলেন, যজ্ঞ করুন, দেবতাদের চিন্তন করুন কিন্তু নিষ্কাম ভাবে। বলছেন সকাম ভাবে করলে ফল দেবেন ঠিকই কিন্তু নিষ্কাম ভাবে করা হলে এই যজ্ঞই তাকে উপরের দিকে অর্থাৎ মুক্তি মার্গের দিকে নিয়ে যাবে।

এই হল ঋগ্বেদের প্রথম সূক্ত, যেখানে অগ্নি দেবতার প্রতি প্রার্থনা করা হচ্ছে। এর প্রত্যেকটি মন্ত্রই সিদ্ধ মন্ত্র। গায়ত্রী বা ইষ্টমন্ত্রের মত জপ করলে এর ফল পাওয়া যাবে। এই যে শেষে বলা হচ্ছে পিতা যেমন সন্তানকে রক্ষ করেন হে অগ্নি তুমিও আমাদের সেইভাবে রক্ষা কর। নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা ভক্তি নিয়ে অগ্নিসূক্তম্ পাঠ করলে দেবতারা আমাদের নিশ্চয়ই রক্ষা করবেন।

বেদের ধর্ম

বেদের ধর্ম অর্থাৎ বেদ কি বলতে চাইছে আরো বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করা হচ্ছে। চারটে বেদে মূলতঃ চার রকমের কথা বলা হয়েছে। দিব্যত্বকে শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করার প্রথম চেষ্টা করা হয়েছে বেদে। অন্যান্য যত ধর্মশাস্ত্র আছে সবই বেদের অনেক পরে এসেছে। ইলিয়ড ওডিসিই পাশ্চাত্য জগতের সব থেকে প্রাচীন পুস্তক। ওর মধ্যেও দেবী-দেবতার কথা আছে, কিন্তু দিব্যত্বের অর্থে এনারা কেউ দিব্য নন। ওখানে অতিমানব, মানুষের থেকে একটু উপরের স্তরের সত্তার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু ঠিক ঠিক দিব্যত্ব বা আধ্যাত্মিক জিনিসগুলিকে শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করার প্রথম প্রয়াস আমরা বেদেই পাই। সাধারণ মানুষ খাওয়া-পড়ার সুখ নিয়েই থাকতে চায়, নিজের শরীরের বাইরে সে কিছু জানে না। ঠাকুর বলছেন খালি পেটে ধর্ম হয় না। যার ক্ষুধার্ত পেটে দাবানল জ্বলছে সে কি করে ধর্মের কথা শুনবে! পেটের কথা না হয় ছেড়ে দিলাম, পেটের স্তর থেকে আরেকটু উপরে মনের স্তরে এসে যে প্রচুর আমোদ-আহ্লাদ করতে চাইছে, সেও তো তার মনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের পরিতৃপ্তি না হলে ধর্মের কথা কানে নিতে চাইবে না। কিন্তু ঋষিরা, যাঁরা ওই সত্যকে জেনে গেছেন, তাঁরা তো কাউকে বলতে পারবেন না যে এসব তোমার জন্য নয়, ওনাদের সবার জন্য বলতে হবে। ঋষিরাও জানতেন জগতে সব রকম মানুষই থাকবে, কিছু লোক ভোগের মধ্যে থাকবে, কিছু লোক তার থেকে একটু উপরে আবার কিছু লোক তারও উপরে। ঋষিরা যে সত্যগুলি ধ্যানের গভীরে প্রত্যক্ষ করলেন, সেগুলিকে দিব্য সত্তার প্রতি প্রার্থনা রূপে সাজিয়ে একই মন্ত্রকে এক এক ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সায়নাচার্য যেমন গায়ত্রী মন্ত্রকে তিন ভাবে ব্যাখ্যা করছেন, একটা অর্থ করলেন যাতে ভোগ্য সামগ্রী লাভ করে আমরা শান্তিতে থাকতে পারি, আরেকজনকে বললেন, তুমি অনেক পাপকর্ম করেছ, দিনে তিনবার করে গায়ত্রী মন্ত্র জপ করলে তোমার সব পাপ নাশ হয়ে যাবে। আর যিনি বলছেন, আমার জীবনের উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করা। তাঁকে বলে দিলেন, এই মন্ত্র দিয়েই তোমার আধ্যাত্মিক জ্ঞান আসবে। গায়ত্রী মন্ত্রের এটাই আসল অর্থ। যেহেতু ঋগ্বেদে এই মন্ত্র আছে, ঋগ্বেদে আছে মানেই স্তুতি হয়ে গেল, স্তুতি মানেই জাগতিক লাভ হওয়া।

ঋষিরা বেদে যে কথাগুলো বলে গেছেন সেগুলোকে বোঝার জন্য শরীর মনের অত্যন্ত পবিত্রতা চাই। শরীর মনের পবিত্রতা না হলে বেদ বিদ্যা আরম্ভই করতেন না। ওনারা সেইজন্য প্রচুর সংস্কার দিয়ে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষকে বেঁধে দিলেন। সংস্কার মানে শুদ্ধিকরণ। যেমন শিশুর জন্ম হল, তার সবটাই এখন অশুদ্ধ, তাই বাচ্চা বয়স থেকে শুরু হয়ে প্রত্যেকটি স্তরে তাকে সংস্কার করতে থাকতেন। ক্ষৌরকর্ম, নামকরণ, অন্নপ্রাশন এই ধরণের বিভিন্ন রকমের সংস্কার করা হত। যজ্ঞ উপবীতও একটা সংস্কার, এই সংস্কারের সাথে বেদারম্ভের সরাসরি যোগ রয়েছে। তুমি যদি বেদ অধ্যয়ন করতে চাও তোমাকে যজ্ঞোপবীত ধারণ করতে হবে। ঋষিরা এই ব্যাপারে স্পষ্ট ছিলেন, তোমার যদি ঠিক ঠিক সংস্কার না হয়ে থাকে, তুমি যদি এখনও পবিত্র না হয়ে থাক তাহলে ভাই তোমাকে এই বিদ্যা আমি দিতে পারবো না। আধ্যাত্মিকতা এবং ধার্মিকতার শিক্ষার মধ্যে এই পবিত্রতার ভাবকে যদি কোথাও ধরে না রাখা হয় তাহলে সেই বিদ্যাকে সন্দেহের দৃষ্টিতেই দেখতে হবে। শুধু বিদ্যার্জনের ক্ষেত্রেই নয়, সন্ন্যাসীরাও যখন খাওয়া-দাওয়া করেন তখন কখনই তাঁরা সংসারী বা অভক্তদের সাথে বসে খাবেন না। চৈতন্য চরিতামৃতেও আছে, বিজাতীয়কে দেখে প্রভু করেন ভাবসম্বরণ। বেদ হল পুরো একটা আধ্যাত্মিক ভাব, যাদের ওই ভাব নেই তাদের ওনারা বেদে ঢুকতে দিতেন না। বংশ পরম্পরায় ঋষিরা, ব্রাহ্মণরা এই পবিত্রতাকে ধরে রেখেছেন, এভাবেই বেদ ব্রাহ্মণদের কাছে নিজস্ব বিদ্যা সম্পদ হয়ে গিয়েছিল। বংশের পর বংশ পবিত্রতাকে বজায় রেখে এই আধ্যাত্মিক সম্পদকে তাঁরা রক্ষা করে যাচ্ছেন। এরপর কেনই বা তাঁরা অপাত্রে, অপবিত্রদের এই বিদ্যা দান করতে যাবেন! কিন্তু তাতেও তাঁরা বলছেন, তুমি যদি শূদ্রও হও, তাহলেও তোমাকে আমরা শুদ্ধিকরণ করে নেওয়ার সুযোগ দিচ্ছি। কিভাবে শুদ্ধিকরণ করবে? ব্রাহ্মণ বংশের কারুর সাথে তোমার মেয়েকে বিয়ে দাও, তার যে ছেলে হবে তার আবার ব্রাহ্মণ বংশে বিয়ে হতে হবে, এইভাবে সাতটা প্রজন্মে আমরা তোমাকে ব্রাহ্মণ বলে মেনে নেব। মূল হল, তোমাকে মনের দিক থেকে পুরো পবিত্র হওয়ার তীব্র ইচ্ছা থাকতে হবে। আমরা যেন ভুলে না যাই, এসব কথা চার-পাঁচ হাজার বছর আগেকার কথা। এখন অসবর্ণ বিবাহ হতে হতে বর্ণপ্রথা বলতে গেলে উঠেই গেছে।

ঠাকুরের সময় ডিরোজিওর নেতৃত্বে শুরু হয়ে গেলে ইয়ং বেঙ্গল মুভমেন্ট, তারপর হিন্দু ধর্মের অনেক কিছুর বিরুদ্ধে কত রকমের আন্দোলন চলল। কিন্তু তাতে কি হল? হিন্দু ধর্ম যেমন ছিল তেমনই আছে। মাঝখান থেকে খ্রীশ্চানদের দেশ ছেড়ে চলে যেতে হল। অনেক দিন আগে বেলুড় মঠে ব্রহ্মচারীদের শাস্ত্র অধ্যয়ন করাবার জন্য একজন বেদের পণ্ডিত এসেছিলেন। অনেক বয়স হয়ে গেছে, উনি এত আচারী ব্রাহ্মণ যে, মঠের মত জায়গায় ঠাকুরের ভোগের যে রান্না হত সেটাও খেতেন না, স্বপাক ছাড়া কিছু খাবেন না। গর্ভ মন্দিরে ঠাকুরকে যে ভোগ দেওয়া হয়, ওখান থেকে শুধু অন্নটুকু তিনি নিতেন। বাকি ডাল সেদ্ধ, আলু সেদ্ধ, কখন সখন কিছু আনাজ সিদ্ধ করে খেতেন। আর রোজ একই খাবার খেয়ে যাচ্ছেন। ওনার ঘরে কোন অব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীকেও ঢুকতে দিতেন না। তাঁর সেবার জন্য একজন ব্রহ্মচারীকে নিযুক্ত করা হয়েছিল, উনি বলেই দিয়েছিলেন কোন অব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারীকে যেন না দেওয়া হয়। এত আচারী, অথচ বেদের এত বড় পণ্ডিত যে কল্পনাই করা যায় না। সব শাস্ত্র ওনার মুখে। বেলুড় মঠের মন্দিরে গিয়ে রোজ সাস্টাঙ্গ দিচ্ছেন অথচ বেলুড় মঠের অন্ন খাবেন না। আমরা বলব, এগুলো পাগলামো ছাড়া কিছু না। অবশ্যই পাগলামো এতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁর মধ্যে যে পবিত্রতা, তাঁর যে নিষ্ঠা এটাকে তো আমাদের মানতে হবে। এরপর আমরা কি করে বলব, এক শূদ্র যে গরু খেয়ে এসেছে, তার সাথে তাঁকে বসতে হবে, সেকি কখন সম্ভব! এগুলোকে প্রশংসা করার জন্য আমাদের মানসিকতার উন্নতির দরকার। বেদের ব্রাহ্মণদের এটাই ছিল, ভাই! আমার কিছু লাগবে না, আমি নিজেকে পুরোপুরি শাস্ত্র আর ভগবানে অর্পণ করে দিয়েছি, আমি আমার মত এক রকম থাকব, এর বাইরে আর কিছু চাই না। একজন শ্রেষ্ঠতম ব্রাহ্মণের যে আদর্শ, এই একই আদর্শ তাঁরা দিয়েছিলেন বিধবাদের। স্বপাক খাবেন, পেঁয়াজ, রসুন, মাছ, মাংস, ডিম ব্রাহ্মণরা কল্পনাই করতে পারতেন না, একবস্ত্রা, ধর্ম পাঠ ছাড়া অন্য কিছু করবেন না, কোন বিয়েথা, সামাজিক অনুষ্ঠান, শৃঙ্গারের ধারে কাছে থাকতেন না। এটাই দেশের আদর্শ। খ্রীশ্চানরা এসে এসব দেখে তারা বুঝতেই পারত না ব্যাপারটা কি। যারা এগুলো মানতে চাইতেন না, তাঁরা মানতেন না। লক্ষ্মীবাঈও বিধবা ছিলেন, কিন্তু তিনি তো রাজ্য চালালেন। হিন্দুরা বলছেন, তোমার জন্য এই আদর্শ – ভগবানই সত্য, এখন তুমি যে কোন ভাবে ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম নিয়ে ফেলেছ এখন এই ধরণের জীবন-যাপন কর। কেউ যদি বলে ভুলে আমার এই বংশে জন্ম হয়ে গেছে, আমার দ্বারা এগুলো কিছুই পালন করা সম্ভব নয়, আমি ভোগ করতে চাই। তুমি যদি ভোগ করতে চাও কর, কেউ বারণ করছে না। কিন্তু এটাই আমাদের দেশের জাতীয় আদর্শ ছিল। কি আদর্শ? তুমি পুরোপুরি ভগবানের দিকে যাও। সমাজের মাথায় যারা বসে আছে তারা বলছে বিধবাদের উপর এত অত্যাচার হয়েছে, এগুলো বলুন। ঠিকই, বিধবাদের উপর অত্যাচার হয়েছে মানছি। কিন্তু ব্রাহ্মণদের উপর এত অত্যাচার হল এই নিয়ে তো কেউ কোন দিন কোন কথা বলে না। পুরো পাঁচ হাজার, ছয় হাজার বছর ধরে ব্রাহ্মণরা না খেয়ে, সুখ-স্বাচ্ছন্দ, সব রকম ভোগ ত্যাগ করে শুধু বেদ মুখস্ত করতে থাকলেন আর বংশ পরম্পরায় একটা উচ্চতম বিদ্যাকে ধরে রাখলেন। ম্যাক্সমূলার দেখে অবাক হয়ে গেলেন, ব্রাহ্মণরা পুরো বেদকে মাথায় ধরে রেখেছেন। আসলে মার্ক্সিস্ট আর বিদেশী ইতিহাসবিদরা ভারতের প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাসকে সঠিক ভাবে মূল্যায়ন করেননি, সচেতন ভাবেই করতে চাইছিলেন না।

ধর্মবিজ্ঞানীরা, যাঁরা ধর্মকে নিয়ে গবেষণা করেন, তাঁরা বলেন মানবজাতিতে ধর্ম শুরু হয়েছিল পিতৃদের উপাসনা দিয়ে। পিতৃ উপাসনায় সন্তান বাবা-মাকে ভালোবাসে, বন্ধুদের ভালোবাসে, এই ভালোবাসাকে অবলম্বন করে তারা ভগবান পর্যন্ত পৌঁছাতে চেষ্টা করে। বেদ বিশ্বের প্রাচীনতম ধর্মশাস্ত্র, বেদ পিতৃ উপাসনার ধারে কাছেও যায়নি। বেদে পিতৃ উপাসনার ঠিক উল্টোটাই ছিল। বেদের ঋষিরা আগে ভগবানের কাছে পৌঁছে গেছেন। পৌঁছে যাওয়ার পর তাঁরা চিন্তা করতে থাকলেন এই ভগবানকে জগতে সাধারণ মানুষদের কিভাবে বোঝান যেতে পারে। প্রথমে তাঁরা জগতে যা কিছু শুভ আছে, যা কিছু শক্তির প্রকাশ আছে সেগুলোকে আগে বেছে নিলেন। যেখানেই শক্তির প্রকাশ দেখছেন সেখানেই তাঁরা বলে দিচ্ছেন এটাই ভগবানের শক্তির প্রকাশ। আবার যেখানে শুভ বা সুন্দর বা সাত্ত্বিক কিছু দেখছেন, বলছেন এটাই ভগবানের একটা রূপ। কোন সুন্দর মুখ দেখলে যেমন আমরা বলি – আহা! কি সুন্দর! যেন দেবীর মুখ। পাশ্চাত্য জগতে ডিভাইন, হেভেনলি এই

শব্দগুলি ব্যবহার করে। পাশ্চাত্য জগতে ধর্ম শুরু হয়েছিল পিতৃদের উপাসনা দিয়ে। হিন্দুদের উপাসনা দিব্যত্ব থেকে শুরু হয়ে আস্তে আস্তে নীচের দিকে এসেছে। যেমন গায়ত্রী মন্ত্র, গায়ত্রী মন্ত্রের আধ্যাত্মিক তত্ত্বকে সাধারণ মানুষ নিতে পারছে না, তাই তাদের জন্য দেবীর তিনটে রূপ ঠিক করে দিলেন। মানুষ মাত্রই কামভোগ ছাড়া কিছু বোঝে না। সেইজন্য কিছু মন্ত্রকে দিয়ে বলে দিলেন তোমরা এই মন্ত্র দিয়ে যজ্ঞ কর, স্তুতি কর বা জপ কর এতেই তোমাদের কামভোগের তুষ্টি হবে। কিছু মানুষ আছেন যাঁরা নিজেদের পবিত্র রাখতে চান, এদেরও উপরে যাঁরা তাঁরা আত্মজ্ঞানের কথা ছাড়া কোন কথা শুনতেও চান না বলতেও চান না। যার ফলে বেদের মন্ত্রগুলি প্রচণ্ড বিভ্রান্তিকর মনে হয় আর বিপরীত মনে হবে, এখানে এক রকম বলছেন আরেক জায়গায় আরেক রকম বলছেন। আসলে সব কথা সবার জন্য নয়। ঋষিরা যে প্রার্থনাগুলো আমাদের জন্য দিয়ে গেছেন, বা তাঁদের শিষ্যরা যেসব প্রার্থনাকে সঙ্কলন করেছেন, তাঁরা সব কিছু চিন্তা ভাবনা করেই এগুলো দিয়েছেন। ঠাকুরও তাঁর বিশেষ ভক্তদের আলাদা ডেকে দরজা বন্ধ করে উপদেশ দিতেন। কিছু লোককে এক রকম কথা বলতে হয়, অন্যদের অন্য রকম বলতে হয়। এরপর সব কথা সংগ্রহ একটা জায়গায় যখন রাখা হবে তখন বিপরীত কথা মনে হবে। বেদ অধ্যয়নের প্রাথমিক অবস্থায় বেদের এই ব্যাপারটা অনেক সমস্যা তৈরী করে। আগেই বলা হয়েছে বেদ হিন্দুধর্মের মূল, বেদের বাইরে হিন্দুধর্মের কিছু নেই। বেদেরই বিভিন্ন ভাবগুলি আরো নানা ভাবে সম্প্রসারিত হয়ে পরবর্তি কালে হিন্দু ধর্মের অন্যান্য শাস্ত্রে জায়গা করে নিয়েছে।

ঋষিরা দেখছেন বৃষ্টি হচ্ছে, ঝড় হচ্ছে, এগুলো শক্তির প্রকাশ, এনারা তখন অনুসন্ধান করতে শুরু করলেন এই শক্তির পেছনে কোন দিব্য সত্তা আছেন কিনা। প্রথমতঃ তাঁরা প্রকৃতির বিভিন্ন কার্য দিয়ে দিব্য সত্তাকে দেখতে শুরু করেন। দ্বিতীয়তঃ দিব্য সত্তাকে প্রথমেই বুঝে নিয়েছেন তারপর প্রকৃতির বিশেষ বিশেষ শক্তির মাধ্যমে সেই দিব্য সত্তার শক্তির প্রকাশকে দেখানোর চেষ্টা করছেন।

এর আগে বলা হয়েছিল ধর্ম দুই প্রকার – প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম আর নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম। লক্ষণ মানে গুণাবলী, প্রবৃত্তি আর নিবৃত্তির গুণাবলী। বাংলাতে যখন কেউ বলে – তোমার কি রকম প্রবৃত্তি? অর্থাৎ তোমার মনটা কোন দিকে যাচ্ছে। প্রবৃত্তি হল একটা দিকে মন দেওয়া আর নিবৃত্তি মানে সেখান থেকে মনকে সরিয়ে আনা। যখন কোন কিছুতে আমি মন দিচ্ছি তখন সেটা হয়ে গেল প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম। যে কোন ধর্মই এই দুই প্রকারের। প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্মে কর্মই প্রধান আর নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্মে ত্যাগই মূল। যে কোন সমাজে বিভিন্ন ধরণের মানসিকতার মানুষ বাস করে, কিছু লোকের মধ্যে কর্মের তোড় বেশি, কর্ম ছাড়া তারা থাকতে পারেনা। যাদের দৈহিক মানসিক শক্তি খুব বেশি তারা সেই শক্তিকে ব্যয় করবার জন্য সব সময় ছটফট করছে। সেইজন্য যে কোন ধর্মকে যদি সাফল্য পেতে হয় তাহলে সবার আগে সাধারণ মানুষের মনকে আগে জয় করতে হবে। ইসলাম ধর্ম যেমন পুরো প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম। সকাল সন্ধ্যা পাঁচবার নমাজ পড়বে, এত দান করবে, জীবনে একবার হজ করবে। এগুলো সবই প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম। নিবৃত্তিতে আবার সব কিছু ছাড়ার কথা বলা হয়, ঈশ্বর ছাড়া আর কিছুর চিন্তা করা যাবে না। বৌদ্ধ ধর্ম পুরো নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম। নিবৃত্তিতে করার কিছুই নেই সবটাই ছাড়ার কথা। যদি কোন ধর্ম একটাতে বেশি জোর দিয়ে অন্যটাকে অবহেলা করে তখন সে ধর্মের অনেক দোষ এসে পড়ে। কারণ বিশেষ ধরণের লোকদের সেই ধর্মে মন তৃপ্ত হয় না। বেদে দুটো ধর্মই আছে, প্রবৃত্তিলক্ষণ ও নিবৃত্তিলক্ষণ এই দুটোকেই বেদ সমান ভাবে জোর দিয়েছে।

যদি কেউ জিজ্ঞেস করে বেদের ধর্ম কি? তখন বলতে হবে বেদের এটাই সৌন্দর্য যে বেদ দুটো ধর্মকেই সমান গুরুত্ব দিয়েছে। নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্মে বেদের বিশেষত্ব হল, বেদের ঋষিরা নিজেরাই বলছেন চরম নিবৃত্তিতে বেদকেও ছাড়িয়ে যায়। *তত্র বেদা অবেদা ভবতি*, সেখানে বেদ অবেদ হয়ে যাবে। অন্যান্য ধর্মে বিশেষ করে ইসলাম ও খ্রীশ্চান ধর্মের সাধনা করে একজন সাধক যত বড়ই হয়ে যাক না কেন সে কখনই বাইবেল আর কোরানের বাইরে যেতে পারবে না, কোরানের বাইরে চলে যাওয়ার কথা বললেই সে শেষ। হিন্দুদের ক্ষেত্রে এ জিনিস কখনই হবে না, চরম ত্যাগে তোমাকে বেদকেও অতিক্রম করে যেতে হবে, বেদকে শুধু ত্যাগই না, অবশ্যই ত্যাগ। তুমি যদি এখনও বেদকে ধরে থাক তাহলে বুঝতে হবে তোমার সাধনা এখনও শেষ হয়নি। ঠাকুর বলছেন – সন্ন্যাসীর কাছে কিছুই থাকবে না, একটা গীতা অবশ্যই থাকবে। গীতা

থাকবে মানে একটা প্রতীক রূপেই থাকবে। বেদ হল বিধি-নিষেধ, সন্ন্যাসী, যিনি নিবৃত্তি মার্গে আছেন তাঁর ক্ষেত্রে এই বিধি-নিষেধ প্রযোজ্য নয়, সেইজন্যই বলা হয় সন্ন্যাসী বেদকেও অতিক্রম করে যান।

বিধি আর নিষেধ মিলিয়ে যে ধর্ম হয় সংস্কৃতে তাকে বলা হয় প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম। সামগ্রিক রূপে বেদের পরিভাষা হল বেদ আমাদের ধর্মের দিকে প্রচোদিত করে। বেদের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছিল বেদ মানে মন্ত্র আর ব্রাহ্মণ, মন্ত্রের কাজ হল ধর্মের দিকে প্রচোদিত করা, ধর্ম মানেই বিধি নিষেধ, বিধি নিষেধ মানেই প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম। তার মানে, বেদের মানে প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম। প্রবৃত্তি মানেই কর্ম। কিন্তু মূল বেদেই কোথাও কোথাও এমন কিছু জিনিস দেখা যায় যেখানে কর্ম থেকে সরে আসার একটা ক্ষীণ আভাস পাওয়া যায়। সরাসরি বলা হচ্ছে না ঠিকই, আপনি যদি ধাপে ধাপে চিন্তা করে টেনে নিয়ে যান তবেই কর্ম থেকে সরে আসার এই ধারণাটা পাওয়া যাবে। এই বীজ থেকেই পরে পরে নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্মের মহিরূহ বেরিয়ে এসেছে। শেষ পর্যন্ত দুই প্রকার ধর্ম হয়ে গেল, প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম আর নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম। এই দুই প্রকার ধর্মকে নিয়েই পূর্বমীমাংসক আর উত্তরমীমাংসকদের মধ্যে বিবাদের সূত্রপাত। আচার্য শঙ্কর দুটো ধর্মকেই সমন্বয় করে তাঁর নিজস্ব একটা দর্শন দাঁড় করিয়ে দিলেন। তিনি দেখিয়ে দিলেন প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম আর নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম, এই দুটো ধর্মই বেদে আছে।

ঠাকুর বলছেন, ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রীতে লয় হয়, গায়ত্রী প্রণবে লয় হয় আর যোগীরা নাদ ভেদ করে সমাধিতে লয় হন। ঠাকুরে এই কথাকে যদি আমরা ভালো করি বুঝে নিতে পারি তাহলেই আমাদের বেদ সম্বন্ধে ধারণাটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। ত্রিসন্ধ্যা করা মানেই প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম করা, গায়ত্রী জপ করা মানেই প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম আর ওঁ জপ করা মানেও প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম। কিন্তু জপ করতে করতে মন যখন নিজে থেকেই স্থির হয়ে গিয়ে মন ঈশ্বর চিন্তনে হারিয়ে যায়, যখন জপ থেমে যাচ্ছে কিন্তু ঈশ্বর চিন্তনে ডুবে আছে, তখন সেই জায়গা থেকে কোথাও যেন নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম শুরু হয়ে যায়। আমি ধ্যান করছি এই বোধটুকুও তখন থাকে না। ওই অবস্থাকেই ছিঁড়ে একটা সময় সে বেরিয়ে গিয়ে ঈশ্বর জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এটাকেই বলছেন নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম। ঠাকুর শেষে বলছেন যোগীরা নাদ ভেদ করে সমাধিতে লয় হয়ে যান, এটাই নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম। মাঝখানের যে যাত্রাপথ সেই পথটাই ধাপে ধাপে পাল্টাতে থাকে।

বেদের দেবতা

বেদের একটা প্রধান বিশেষত্ব বেদে অনেক দেবতার কথা পাওয়া যাবে। বেদে যত দেবতার উল্লেখ আছে তার অনেক দেবতাই এখন হারিয়ে গেছে। বেদের দেবতাদের সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে সবাই মনে করে দেবতারা প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তিরই এক একটি মুর্ত রূপ। প্রকৃতিতে নানান ধরণের শক্তির প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়, বাতাসের শক্তি, জলের শক্তি, অগ্নির শক্তি, প্রকৃতির যে কোন শক্তিকে বেদ যেন একটা রূপ দিয়ে সামনে নিয়ে আসছে। ইদানিং কালে আণবিক শক্তি বা বিদ্যুৎ শক্তিকে যদি একটা মুর্ত রূপ দিয়ে তার একজন দেবতা ঠিক করে দেওয়া হয় তাহলে বেদের দেবতা আর এই দেবতার মধ্যে কোন পার্থক্য থাকবে না। মুর্ত রূপ দিয়ে দেওয়া মানে এটা কোন কবিতার মত কল্পনা নয়। ঋষিরা একটা জাগতিক বিষয়কে চিন্তা করতে করতে ধ্যানের গভীরে এমন একটা স্তরে চলে যেতেন যেখান থেকে আর সেই বিষয়ের পেছনে যেতে পারতেন না, তখন সেই জাগতিক শক্তি, যেমন বাতাস, বাতাসের পেছনে যে একটা দিব্য স্বরূপ আছে, সেই দিব্য স্বরূপের সন্ধান তাঁরা পেয়ে যেতেন। এখন যদি মনে করা হয়, অগ্নির যে দেবতা আর রান্নাঘরে যে গ্যাস ব্যবহার করা হয় তার সাথে কি সম্পর্ক আছে? এটা বলা খুবই মুশকিল যে এটা তাঁদের কল্পনা কিনা। কিন্তু সাধক যদি অগ্নির উপর ধ্যান করতে শুরু করেন, তারপর যত ধ্যানের গভীরে যেতে থাকবেন তত অগ্নির যে বাহ্যিক মুখোশগুলি রয়েছে সেগুলো অপসারণ হতে শুরু করে। অগ্নির উপর যে আবরণ রয়েছে সেটা অপসারিত হয় না, সাধকের মনের উপরে যে আবরণ গুলি রয়েছে আসলে সেগুলো একটা একটা করে সরে যেতে থাকে। তারপর একটা স্তরে গিয়ে তাঁর উপলব্ধি হয় যে এই উনুনের আগুন আর ঐ উনুনের আগুন দুটো এক। এখান থেকে আরো একটু এগিয়ে দেখছেন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যাবতীয় যত অগ্নি আছে সবটাই এক।

আমরা মনে করতে পারি ঋষি কি আর এমন বিরাট কথা বললেন। কিন্তু আমরা কি কখন মনে করতে পারি আমি, আপনি আর ওপাড়ার রাম, শ্যাম, যদু, মধু সব এক? কম্যুনিস্টরা বলে দুনিয়ার মজুর এক হও। ঠিক কথাই বলছে তারা, আমরা সবাই এক, বিপ্লব হয়ে গেল। যখনই মজুররা এক হয়ে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে নিল যারা নেতা ছিল তারা উঠে এল ওপরে, যারা মজুর ছিল তারা মজুরই থেকে গেল। তার মানে তোমার যে স্লোগান দুনিয়ার মজুর এক হও, এটা তোমার শুধু মুখের কথাই ছিল, এতটুকুও সত্য ছিল না। আমরা সর্বক্ষণ বলে চলেছি সবই ঠাকুরের ইচ্ছা, ঠাকুরের ইচ্ছা ছাড়া কিছুই হবে না। কিন্তু এই কথা বলার পরক্ষণেই সব কিছুতেই কি আমরা ঠাকুরের ইচ্ছাকে দেখি বা দেখার কখন চেষ্টা অন্তত করি? কখনই করি না, কেন না এগুলো আমাদের মুখের কথা। কিন্তু ঋষিরা যখন দেখেন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যত দাহিকা শক্তি আছে সবই সেই অগ্নি দেবতারাই শক্তি, তখন অগ্নিকে তাঁরা সামনে দেবতা রূপেই দেখেন। তাঁরা কখনই দেখেন না যে স্বর্গে একজন অগ্নি রূপে দেবতা আছেন আর তাঁর নিঃশ্বাসে এই আগুন জ্বলছে। তাঁরা দেখেন সেই অগ্নি, সেই দিব্যশক্তি, সেই দাহিকা শক্তি তাঁর ভেতরেও বিরাজমান আবার সবার মধ্যেও সেই একই শক্তি বিরাজ করছে।

যিনি এই সাধনা করছিলেন তাঁর ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণ ভাবে দিব্যশক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। সাধনা করে করে তাঁর আন্তর্জগতে এই যে রূপান্তর হচ্ছে তার ফলে তাঁর মধ্যে প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করবার শক্তি এসে যায়। অগ্নির গুণাবলী তাঁর মধ্যেই সঞ্চারিত হয়ে তাকে এক দিব্যশক্তিতে পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিক পুরুষে পরিণত করে দেয়। রাজযোগে বিভূতি-পাদে পতঞ্জলি উল্লেখ করেছে যখন সাধক ধ্যানের পরাকাষ্ঠা লাভ করে তখন সে এই এই জিনিসের উপরে ধ্যান করলে তাঁর এই এই শক্তি লাভ হবে। পতঞ্জলি এই তত্ত্বকে খুব বিজ্ঞান সম্মত ভাবে আলোচনা করেছেন। অগ্নি সম্পর্কিত যা যা শক্তি আছে সব অগ্নি উপাসকের মধ্যে এসে যাবে। তাই ঋষিরা বলছেন – তোমার বাড়িতে যে অগ্নিকে নিত্য ব্যবহার করছ সেই অগ্নিকে নিয়ে যদি তুমি ধ্যানের গভীরে যাও তাহলে তোমার মধ্যেও অগ্নির সমস্ত শক্তি ও গুণ চলে আসবে।

বেদে যত দেবতার নাম পাই সমস্ত দেবতাই প্রকৃতির এক একটি শক্তির মুর্ত রূপ। কিন্তু তাই বলে এটা ভাবা ভুল হবে যে বেদ প্রকৃতির উপাসনার কথাই বলছে। আমরা যে আগুন দেখছি বেদ সেই আগুনের পূজার কথা বলছে না। আদিবাসীরা কোন পাথর বা কোন বৃক্ষের সামনে আগুন জ্বেলে পূজা করছে। বেদের যে ঋষি আগুন জ্বেলে পূজা করছেন আর আদিবাসীরা যে আগুনের পূজা করছে এই দুটো পূজা কখনই এক নয়, সম্পূর্ণ আলাদা। আদিবাসীরা যখন পূজা করে তখন তাদের মনের মধ্যে অগ্নির স্থূল রূপকেই সে দেখে আর সেই মনোভাব নিয়েই পূজা করে। কিন্তু বেদের ঋষি যখন অগ্নির পূজা করছেন তখন তিনি অগ্নির স্থূল রূপ দেখছেন না, তিনি অগ্নির মধ্যে যে আধ্যাত্মিক সত্তা রয়েছেন তাঁকে তিনি দেখছেন। ঋষি পূজার সময় দেখছেন – জগৎ কোন মতেই ঈশ্বর ছাড়া নয়, ঈশ্বরেরই একটা রূপ মানুষ, একটা রূপ অগ্নি, ঈশ্বরেরই একটা রূপ বাতাস, তিনিই জগতের সব কিছু হয়েছেন। এটাই চরম সত্য। তিনি অগ্নিতে যে রূপে প্রকাশিত সেই রূপের স্তুতিই বেদের ঋষি করছেন। যখন এই রূপকে ঈশ্বরের রূপ বলে ধরে নেবেন তখন তিনি অগ্নির শক্তির সাথে এক হয়ে যাবেন।

একটা উপমা দিলে ব্যাপারটা ভালো বোঝা যাবে। এই চক আছে, চক দিয়ে অনেক কাজ হয়, চক দিয়ে লেখা যাবে, আবার সাদা রঙও করা যাবে। একজন সাধারণ মানুষ চকের ক্ষমতা এটুকুর মধ্যেই দেখে। একজন লেখাপড়া জানা মানুষ দেখবে এই চকের গঠন হয়েছে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট দিয়ে। যখন কেউ চকের রাসায়নিক গঠনটা জেনে যাবে তখন চকের ব্যাপারে তার অনেক ক্ষমতা এসে যাবে। এই রাসায়নিক গঠন দিয়ে সে এবার অনেক কিছুই করতে পারবে। আবার যে ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের পরমাণুর গঠনকে ধরে ফেলবে তখন তার ক্ষমতার মাত্রা অনেক বেড়ে যাবে। আকাশে বিদ্যুৎ চমকায় বিশ্বের সবাই জানে। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনরা যখন বললেন আকাশের এই বিদ্যুৎ আমাদের অনেক প্রাণহানির কারণ হয়, কিন্তু একে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। তারপরে ওনারা Lightning Conductor লাগিয়ে বজ্রপাত থেকে রক্ষা পেল। এতে আবার খ্রীশ্চান পাদরীরা পড়ে গেল মহা ফাঁপরে, কেননা সেই সময় যখন চার্চগুলির উপর বজ্রপাত হত তখন পাদরীরা সবাইকে বলত তোমরা সবাই পাপ কর তাই শয়তান চার্চের উপরে বজ্র ফেলে চার্চকে নষ্ট করার সুযোগ পেয়ে

যায়। লোকগুলি সহজ সরল মনে এটাই বিশ্বাস করে আতঙ্কিত হয়ে নিজেরাই টাকা পয়সা দিয়ে চার্চগুলি সারিয়ে দিত। বেঞ্জামিন যখন আবিষ্কার করলেন এগুলো মূলত তড়িৎ শক্তি আর তার আগেই static electricity আবিষ্কার হয়ে গেছে ঘুড়ি উড়িয়ে। তারপর মাইকেল ফেরারে এসে current electricity আবিষ্কার করলেন। আজ বিশ্বের মানুষ বিদ্যুৎ শক্তিকে এমন ভাবে করায়ত্ত করেছে যে একই বিদ্যুৎ শক্তি দিয়ে ঠাণ্ডাও করে দিচ্ছে আবার গরমও করে দিচ্ছে। পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত এমন কোন জিনিস আবিষ্কার করা সম্ভব হয়নি যে একই জিনিস দিয়ে ঠাণ্ডাও করা যায় আবার গরমও করা যায়, একমাত্র ইলেক্ট্রিকসিটির শক্তিই এটা করতে পারে। অথচ এই জিনিসটা আমাদের পূর্ব পুরুষরা জানতেন না। তারপরে এলেন আইনস্টাইন, তিনি বস্তুকে ভেঙ্গে তার অনু ও পরমাণুকে বার করলেন, সেই থেকে এলো আণবিক শক্তি, এই শক্তিকে দিয়ে এখন অনেক কিছুই করা যাচ্ছে, একদিকে মানবজাতির কল্যাণেও ব্যবহার করা যায় আবার মানবজাতিকে ধ্বংসের মুখেও ঠেলে দেওয়া যায়।

এটাই মজার, আমরা বস্তুর যত ভেতরে যাব, যতই এর রহস্য উদ্‌ঘাটন করে এর মৌলিকত্বকে বার করতে পারব ততই আমাদের ক্ষমতা বেড়ে যাবে। বস্তুর স্থূল অবস্থাকেই যদি ধরে থাকি, যতই পড়াশুনা করে বিশাল পণ্ডিত হই না কেন, দশটা বিষয়ে জ্ঞান হতে পারে কিন্তু তাতে কোন কাজ হবে না। বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিকে, কেউ রসায়নে, কেউ পদার্থে, এই ভাবে বস্তুর মৌলিকত্বকে জানবার জন্য বিজ্ঞানীরা প্রাণপাত করে দিচ্ছে। কেউ আবার জেনেটিক বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম অবস্থাকে বার করে নতুন নতুন প্রজাতির জন্ম দিচ্ছে। ঠিক একই জিনিস আধ্যাত্মিক জগতেও হচ্ছে, বাড়িতে আমরা যে আগুন জ্বালছি, সেই আগুনের আধ্যাত্মিক সত্ত্বাকে যেই আমরা জেনে নেব তখন অগ্নির গুণাবলীকেও আমরা আয়ত্ত করে নিতে পারব। কিন্তু পার্থক্য হল, বিদ্যুৎ শক্তির রহস্য অন্য লোককে শিখিয়ে দেওয়া যায় বা অন্যের কাজে লাগান যায়। কিন্তু অন্তর্জগতের ক্ষেত্রে সেটা হবে না, যার হয় তারই হয়। যিনি সাধনা করে অগ্নির গুণাবলীকে আয়ত্ত করে নিয়েছেন সেটা তাঁরই থাকবে, তিনিই শুধু বিশাল ক্ষমতাশালী হয়ে যাবেন। একেবারেই যে কিছু অন্যের জন্য করতে পারবেন না তা নয়, তিনি পথ দেখিয়ে দিয়ে অন্যকে এগিয়ে দিতে প্রেরণা দিতে পারেন, যেমন স্বামীজী এত কিছু করেছিলেন বলেই আজ আমরা আমাদের মননশীলতার ও বিচার বুদ্ধির ক্ষেত্রে এতটা উন্নত হতে পেরেছি।

বেদের প্রথমের দিকে তেত্রিশ দেবতার কথা বলা হয়েছে। সমস্ত দেবতাকে আবার তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম হল পৃথিবীর দেবতা, দ্বিতীয় অন্তরীক্ষের দেবতা আর তৃতীয় স্বর্গের দেবতা। দেবতারা এই তিন জায়গায় বাস করেন। দেবতারা কেউ অনাদি নন, তাঁদের সবারই জন্ম হয়েছে। হিন্দু ধর্মের পরম্পরাকে জানতে হলে দেবতা আর ঈশ্বরের মধ্যে মৌলিক পার্থক্যটা জানা দরকার। দেবতারা একটা সময়ে সৃষ্টি হয়েছেন, একটা এমন অবস্থা আসবে যখন দেবতারাও কেউ থাকবেন না, সবাই একটা সময়ের মধ্যে আবদ্ধ, কিন্তু ঈশ্বর অনাদি, তাঁর সৃষ্টিও নেই লয়ও নেই।

আমরা মরুৎ দেবতাদের জন্ম বৃত্তান্ত পুরাণে পাই। দৈত্যদের মা দিতি। ইন্দ্র সব সময় ছলে বলে দৈত্যদের হারিয়ে বধ করে দিত। দৈত্য জননী দিতি গেলেন খুব রেগে। ইন্দ্রকে জব্দ করার জন্য তিনি স্বামী কশ্যপ মুনির কাছে বর চাইতে গেলেন – আমাকে এমন এক পুত্র দিন যে একাই ইন্দ্রকে শেষ করে দেবে। কশ্যপ মুনি পড়ে গেলেন ফাঁপড়ে, ইন্দ্র যত খারাপ কাজই করুক, কিন্তু সে লোককল্যাণকারী। কশ্যপ তখন দিতিকে বললেন – আমি তোমাকে বর দেব যাতে তোমার এমন এক সন্তান জন্ম নেবে যাকে কেউ বধ করতে পারবে না, কিন্তু তার জন্য তোমাকে কতকগুলি ব্রত পালন করতে হবে। স্বামীর কথা মত দিতি অনেক ব্রত করতে শুরু করে দিল, এদিকে তার গর্ভও হয়েছে। অন্য দিকে ইন্দ্রের এখন মহা দুশ্চিন্তা, একদিকে দিতি ইন্দ্রের সৎ মা, আর দিতির যে সন্তান হবে তার কোন দিন নাশ হবে না। ইন্দ্র সুযোগ খুঁজতে লাগল কি ভাবে সন্তানের জন্মের আগে গর্ভের মধ্যেই তাকে বিনষ্ট করে দেওয়া যায়। একদিন দিতি রাত্রি বেলা পা না ধুয়ে বিছানায় শুতে গেছে, ব্যস ইন্দ্র সুযোগ পেয়ে গেছে, ব্রত ভঙ্গ হয়ে গেছে, সেই সুযোগে ইন্দ্র তার সৎ মার গর্ভে ঢুকে গর্ভে যে সন্তান ছিল তাকে সাতটা টুকরো করে দিল। কিন্তু কাশ্যপের বরে এই সন্তান অমর, তাই তার মৃত্যু হল না। সাতটা টুকরো করে দিতেই গর্ভের সন্তান কাঁদতে শুরু করল। ইন্দ্র তখন প্রত্যেক টুকরোকে

আরো সাতটা সাতটা করে টুকরো করে দিল, তারা কেউ মারা গেল না কিন্তু তাদের শক্তিটা কমে গেল। যখন কাঁদছিল তখন ইন্দ্র তাদের বলছে 'মা রুদ' 'মা রুদ', তোমরা কেঁদো না। তারা জিজ্ঞেস করল তুমি কে? ইন্দ্র বলল 'আমি তোমাদের দাদা'। তারা বলল 'ঠিক আছে, তুমি যখন আমাদের দাদা হও তাই আমরা সব সময় তোমার সাথে থাকব'। ইন্দ্র তখন একদিকে এদের শক্তি ক্ষয় করে দিল আর দ্বিতীয়তঃ ওদের ঊনপঞ্চাশ জনকে নিজের বন্ধু বানিয়ে নিল। এরাই পরে হল ঊনপঞ্চাশ মরুৎ, মরুৎ মানে বাতাস। প্রথমে 'মা রুদ' বলে ইন্দ্র সম্বোধন করেছিলেন বলে এদের নাম হয়ে গেল মরুৎ। এই কাহিনীটা বলা এই কারণে যে দেবতাদের এখানে জন্ম হল, একটা বিশেষ সময়ে তাদের জন্ম হয়েছিল। বেদে মরুৎএর কথা আসবে। পুরাণে আবার এই কাহিনীকেই আরো অনেক বিস্তার করে বলা হয়েছে।

আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল, সমস্ত দেবতাদের এক সঙ্গে জন্ম হয়নি, কারুর আগে আবার কারুর পরে জন্ম হয়েছে। এখনও দেবতাদের জন্ম হতে পারে, কেউ বিদ্যুতের উপরে ধ্যান করে করে হয়তো বিদ্যুতের দেবতার সৃষ্টি করে দিতে পারেন। বেদে দেবতাদের সংখ্যা কোন নির্দিষ্ট করা নেই, কোরান বাইবেলের আছে। যদি নতুন কোন দেবতার জন্ম হয়ে যায় তাহলেও আমাদের কোন সমস্যা হবে না। শুধু তাই নয়, বেদের প্রথম দিকে যেসব দেবতারা খুব ক্ষমতাবান ছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে পরের দিকে বেদেই উল্লেখ আছে সেই দেবতারাই আবার সব ক্ষমতা হারিয়ে সাধারণ হয়ে গেছে। দেবতারা কখন কখন খুব শক্তিশালী হয় আবার কখন কখন তারা অনেক দমে যায়। যে ইন্দ্রকে বেদ এত শক্তিশালী বলছে সেই ইন্দ্রই আবার মহাভারতে এসে শ্রীকৃষ্ণের কাছে নাস্তানাবুদ হয়েছেন। এখন ভারতে কোথাও কেউ আর ইন্দ্রের পূজা করে না। পরবর্তি কালে নতুন একটা ধারণা তৈরী হল যে, যেসব মানুষ খুব ভালো কাজ করে, অনেক পূণ্য করে তারাই মৃত্যুর পর দেবতা হয়ে জন্মায়। ইন্দ্র, বরুণ এগুলো সবই একটা পদ। যেসব দেবতার কথা বেদে বলা হচ্ছে এদেরকে মানবিক রূপেই দেখা হত। মানুষের এটাই স্বাভাবিক, তারা যখন ঈশ্বর বা দেবতার কিছু চিন্তা করে তখন তাদের মানবদেহধারী রূপেই মনে করে। এতে কোন দোষ নেই। দেবতারা যে কোন আকৃতি নিতে পারে, তাহলে মানুষের আকৃতি নিতে পারার মধ্যে কোন আপত্তি হওয়ার কিছু নেই। এভাবে চিন্তা করলে ধ্যান উপাসনা করতে মানুষের সুবিধা হয়। ছান্দোগ্য উপনিষদেও উপাসনার বিষয়ে যেখানে বলা হয়েছে সেখানে এই জিনিসটাকেই উল্লেখ করা হয়েছে। যখন কোন কিছুর উপাসনা করবে তখন তার উপর অনেক গুণ আরোপিত করে দিয়ে উপাসনা করবে।

এইভাবেই সূর্যের যে দেবতা আছেন তার হাতকে সূর্যের রশ্মি রূপে কল্পনা করা হয়। আবার অগ্নিকে যখন মানুষ রূপে কল্পনা করা হয় তখন অগ্নির শিখাকে তার জিহ্বা রূপে দেখা হয়। দেবতাদের যে গুণের কথা বলা হয় তা সব আলাদা আলাদা। যদিও দেবতাদের কোন বর্ণ নেই কিন্তু তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যতাকে কেন্দ্র করে এক এক জন দেবতাকে এক একটি বর্ণের সাথে যুক্ত করে দেওয়া হয়। যেমন ইন্দ্রকে একজন ক্ষত্রিয় যোদ্ধা রূপে দেখা হয়। অগ্নি আর বৃহস্পতির স্বভাব অনুযায়ী তাদের পুরোহিত রূপে দেখা হয়। দেবতাদের সবারই কিছু না কিছু একটা বাহন থাকবে। ঘোড়া, হাতি যেমন আছে তেমনি বিভিন্ন পশু পাখিও বাহন রূপে দেখা যায়। সাধারণত দেখা যায় মানুষ সে সব খাদ্যদ্রব্য ভালোবাসে দেবাতারাও সেই সব খাদ্য ভালোবাসেন। শ্রীমা যেমন বলছেন – ঠাকুর যখন বেঁচে ছিলেন তখন কেউ দেখল না, এখন ঠাকুর নেই কিন্তু নিজেরা যা খেতে ভালোবাসে সেই জিনিস দিয়েই ঠাকুরকে ভোগ দেয়। দেবতাদের যজ্ঞের মাধ্যমে খাদ্য সামগ্রী নিবেদন করা হয়, যে দেবতা যা যা খেতে ভালোবাসেন সেই সেই খাদ্য দ্রব্য সেই সেই দেবতার উদ্দেশ্যে যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি দেওয়া হয়। অগ্নি দেবতা সেই খাদ্যদ্রব্যের সার ভাগটা সেই সেই দেবতাদের উদ্দেশ্যে বহন করে নিয়ে যান। শ্রীমাকে একজন জিজ্ঞেস করছে – ঠাকুরকে যে ভোগ দেওয়া হয় ঠাকুর সেটা কিভাবে গ্রহণ করেন। শ্রীমা বলছেন – ঠাকুরের পটের সম্মুখে যে ভোগে দেওয়া হয় ঠাকুরের ছবি থেকে একটা জ্যোতি বেরিয়ে সেই ভোগের রসটুকু আস্বাদ করে নেন। দেবতারাও ঠিক তাই করেন। শ্রীমার কথা যদি আমরা বিশ্বাস করি তাহলে দেবতাদের এইভাবে খাদ্য রস আস্বাদনের ব্যাপারটাও মানতে হবে। বিদেশে একজন যুক্তিবাদী আছেন যার কাজ হল যত ধর্মীয় নেতারা আছেন তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করা। একজন খ্রীশ্চান ফাদার যিনি প্রচুর পড়াশুনা করা,

তাকে জিজ্ঞেস করছে – আপনি ভগবান মানেন? হ্যাঁ মানি। যুক্তিবাদী ফাদারকে আবার জিজ্ঞেস করছে – কেন মানেন? ফাদার বলছেন – Miracle is the proof of God. যুক্তিবাদী এবারে জিজ্ঞেস করছে – তাহলে মহম্মদ সাদা ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে স্বর্গে আল্লার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন এটা আপনি মানেন? ফাদার জবাব দিচ্ছেন – কোন মতেই মানিনা। যুক্তিবাদী – তাহলে আপনি মনে করেন এটা মিথ্যা? ফাদার – হ্যাঁ, পুরো মিথ্যা। এইভাবে যুক্তিবাদী একটা একটা করে আরো অনেক ধর্ম থেকে এই রকম কিছু অলৌকিক কাহিনী তুলে ফাদারকে জিজ্ঞেস করছে – এটাও কি আপনি মানছেন? ফাদার সব কটাকে মিথ্যা শুধু নয় একেবারে আজগুবি বলে উড়িয়ে দিলেন। মুসলমানরা যা বলছে সেটা মিথ্যা, হিন্দুরা যা বলছে সেটা মিথ্যা আর আপনার মিরাক্যালটা সত্য এটা কি করে হচ্ছে? ফাদার বলছে – কেন, তুমি একটা নোট দেখলে জাল, আরেকটা নোট দেখলে জাল, কিন্তু তার মধ্যে একটা নোটতো ঠিক থাকবে, আমরাই হলাম সেই সত্য নোট। এই ধরণের যাদের মনোভাব তাদের উপরে কার শ্রদ্ধা হবে! বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে ঢাকাতে ঠাকুর দেখা দিলেন। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ঠাকুরের গা টিপে টিপে দেখেছেন। এটাকে যদি একজন ঠাকুরের ভক্ত বিশ্বাস করতে পারে তাহলে সে অন্যান্য ধর্মে এই ধরণের যত অলৌকিক কাহিনী আছে সেগুলিকেও তাকে বিশ্বাস করতে হবে। অবতার মানেই তাঁরা এমন কিছু বিশেষ ক্ষমতা নিয়ে আসেন যা অন্য কারুর পক্ষে করা কখনই সম্ভব নয়। ঠাকুর যা যা করে গেছেন তার কিছু কিছু জিনিস কেউ পুনারাবৃত্তি করতে পারবে আবার এমন অনেক কিছু আছে যা কেউই পুনরাবৃত্তি করতে পারবে না। তেমনি ভগবান অনেক কিছু করতে পারেন কিন্তু দেবতারা করতে পারবেন না, যেমন ঈশ্বর সৃষ্টি করতে পারেন, যেটা আর কেউ করতে পারবে না। আমরা যে অনেকবার বলেছি যে যাই নতুন কোন তত্ত্ব বলে দিচ্ছে সেটাকে তখনই সত্যি বলে ধরা হবে যখন শ্রুতি, যুক্তি আর অনুভূতিতে মিলছে। কিন্তু আধ্যাত্মিক তত্ত্বের অনুভূতি একজনের এক ভাবে উপলব্ধি হবে অন্য কারুর আরেক ভাবে অনুভূতি লাভ হবে, কেননা শক্তির তারতম্য আছে। ঠাকুরের কোন এমন উপলব্ধি নেই যেটা আমরা কখনই উপলব্ধি করতে পারব না, কিন্তু একই লোক ঠাকুরের সব উপলব্ধি লাভ করে নেবে এটা কখনই সম্ভব হবে না। যেমন কেউ চেষ্টা করলে বিল গেট্স হয়ে যেতে পারে কিন্তু কুবের কোন দিন হতে পারবে না।

শ্রীমার কথা, ঠাকুরের ছবি থেকে জ্যোতি বেরিয়ে এসে নিবেদিত খাদ্যের সব রস আস্বাদ করেন, এটাকে বিশ্বাস করলে বেদে দেবতারা যে এসে যজ্ঞের আহুতির সব সার গ্রহণ করেন এটাও বিশ্বাস করতে হয় বা অগ্নি যে দেবতাদের নিয়ে আসেন এটাও মানতে হবে। যদি বলি আমি এগুলো মানিনা তাহলে শ্রীমায়ের কথাকেও ফেলে দিতে হবে, শ্রীমায়ের কথাকে ফেলে দিলে ঠাকুরকেও ফেলে দিতে হবে, তাতে কি হবে – আধ্যাত্মিকতার যে পুরো পরম্পরা সেটাই উড়ে যাবে। আমরা এখানে যা আলোচনা করছি এটাকে বিশ্বাস করার কথাও বলা হচ্ছে না, আবার অবিশ্বাস করার কথাও বলা হচ্ছে না, ঋষিরা যেভাবে জিনিস গুলো দেখেছেন সেটাই তুলে ধরা হচ্ছে। ঋষিদের কথাগুলো কতটা গালগপ্পো সেটা বোঝার জন্য আমরা ঠাকুরের কথা উল্লেখ করলাম, তাঁরা যা যা দেখেছেন সেটা ঠাকুরের জীবনেও পুনরাবৃত্তি হয়েছে।

দেবতাদের খুব প্রিয় জিনিস সোমরস। সোমরস প্রকৃত পক্ষে ঠিক কি বস্তু এখনও আমাদের জানা নেই, তবে বলা হয় যে পাহাড়ের উপরে এক ধরণের জড়িবুটি পাওয়া যেত, সেই জড়িবুটিকে ঘষে ঘষে রস বার করে কাপড় দিয়ে ছেঁকে নেওয়া হত, পরে তাতে আরও অন্য কিছু মিশিয়ে সোমরস প্রস্তুত করা হত, ইন্দ্রাদি দেবতাদের যা খুব প্রিয় পানীয় বস্তু ছিল। সোমরসের বিভিন্ন বিবরণ পড়ে অনেকে মনে করেন যে ভাঙ্ বা সিদ্ধিকেই সোমরস বলা হত। ভাঙ পাহাড়ী এলাকাতেই বেশি হয়। তবে এর বেশি সোমরসের বেশি বিবরণ পাওয়া যায় না, ওনারা বলেন এর পরিচিতি এখন হারিয়ে গেছে। তবে একটা জিনিস প্রায়ই অনেকে মনে করেন যে, সারা দেশ জুড়ে যে জিনিসটার এত কদর ছিল সেটা রাতারাতি হারিয়ে যেতে পারেনা, যেমন এখন সারা দেশ গম খাচ্ছে, পরে হাজার বছর গম চাষ হবে না এটা কখন হতে পারে না, তবে নাম যদি পাল্টে দেওয়া হয় তখন সেই নামেই তাকে জানবে। কয়েক প্রজন্মের পর বাবা শব্দটাই হারিয়ে যাবে, কেননা আজকালকার বাচ্চারা বাবাকে সব ড্যাডি বলে। এমন দিন আসবে, কোন বাচ্চাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়

তোমার বাবার নাম বল, বাচ্চা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করবে বাবা কাকে বলে। সেইজন্য সোমরসকে অনেকেই মনে করেন এটাই পরে ভাঙ বা সিদ্ধি জাতীয় পানীয় হয়ে এখনও টিকে আছে।

এরপর আসছে দেবতাদের গুণ ও ক্ষমতা। দেবতাদের সবচেয়ে যেটা বড় তা হল তাঁদের ক্ষমতা বা শক্তি। শ্রীরামকৃষ্ণ, বুদ্ধ এনারা অবতার, এনাদের আমরা কখন ক্ষমতার অধিকারী বলে বিশেষিত করিনা, আমরা তাঁদের উপরে করুণা, দয়া, ভালোবাসা, প্রেম ইত্যাদি এই গুণাবলী দিয়ে ভূষিত করি। বেদের দেবতাদের আমরা ক্ষমতাবান বলে উল্লেখ করি, প্রকৃতির বিভিন্ন কার্যকে নিয়ন্ত্রণ করার বিশেষ ক্ষমতা আছে। দেবতাদের কাজ হল প্রকৃতিকে ঠিক রেখে তাকে ঠিকভাবে কাজ করতে দেওয়া আর নিয়মবিরুদ্ধ কিছু হলে সেখানে সব কিছুকে নিয়মের মধ্যে নিয়ে আসা। ক্ষমতা অসুরদেরও ছিল কিন্তু তাদের সেই ক্ষমতাকে তারা অশুভ শক্তির প্রভাব বৃদ্ধি করে শুভ শক্তির বিনাশে কাজে লাগাত। বেদে এই ধারণাটা যেখানে বলা হচ্ছে দেবতারা যেখানে যেখানে অশুভ শক্তির বিকাশ হয় সেখানে সেখানে তাদের ক্ষমতার দ্বারা সেই অশুভ শক্তিকে দমন করতেন, এই ধারণাটাই পরে অবতারের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে – *যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানাং সৃজাম্যহম্।* বেদেও দেখা যায় যেখানেই অধর্ম হয় ইন্দ্রাদি দেবতারা সেখানেই সংগ্রামের দ্বারা অধর্মকে পরাভূত করে ধর্মকে রক্ষা করছেন। কিন্তু অবতাররা যখন অধর্মের প্রভাব বেড়ে যায় তখন ধর্ম সংস্থাপনের জন্য সেখানে গিয়ে তাঁরা মানব শরীরধারণ করে জন্ম গ্রহণ করেন।

দেবতাদের আরেকটা ক্ষমতা হল প্রকৃতিতে যত প্রাণী আছে সব প্রাণীর উপর তাঁদের নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা দেওয়া আছে, আর মানুষ যদি দেবতাদের পূজা করে তখন তাঁরা তাদের সব ইচ্ছাই পূরণ করে দিতে পারেন। গ্রীসদের দেবতা আর বৈদিক দেবতার মধ্যে একটা বিরাট পার্থক্য আছে। গ্রীস দেবতারা এক একটা অঞ্চলের এক একটা আদিবাসীদের দেবতা হতেন, আর তাদের ক্ষমতা একটা বিশেষ ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ, তাঁর বাইরে আর কোন ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু বেদের দেবতা ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে যে কেউ যে কোন বাসনা নিয়ে প্রার্থনা করে যদি ঠিক ঠিক আহুতি দেয়, ইন্দ্র তার সেই বাসনা পূরণ করে দেবেন। ঠিক তেমনি বেদের অন্যান্য দেবতাদেরও এই একই ক্ষমতা দেওয়া ছিল, যদি অগ্নির কাছে প্রার্থনা করে আহুতি দেওয়া হয় তাহলে অগ্নিও সেই প্রার্থনা পূরণ করে দেন। কিন্তু পরের দিকে মহাভারতে এসে দেবতাদের যত ক্ষমতা ছিল সব ক্ষমতা ভগবান নিজে নিয়ে নিলেন। যেমন আকবর বাদশা হবার আগে ভারতে অনেক ছোট ছোট রাজা ছিল, আকবর দিল্লীর মসনদে বসেই সব কটা রাজার ক্ষমতা নিজের হাতে নিয়ে নিলেন। ইংরেজরা যখন ভারত ছেড়ে চলে গেল তখন সারা ভারতে ৫৪২ জন সামন্ত রাজারা তাদের নিজেদের রাজ্যে আলাদা আলাদা শাসন ব্যবস্থা কায়েম রেখেছিল। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল সব কটা রাজাদের শাসন ক্ষমতা কেড়ে করে দিলেন Union of India. দেবতাদের ক্ষমতা ভগবান যে নিজের হাতে নিয়ে নিয়েছিলেন গীতার নবম অধ্যায়ে এই ব্যাপারটা আরও খুব পরিষ্কার করে বলা হয়েছে। ভগবান অর্জুনকে বলছেন – যখন কেউ অন্যান্য দেবতাদের পূজা করছে সেই পূজা আমার কাছেই আসছে। শঙ্করাচার্য এই শ্লোকের ভাষ্যে বলছেন – কি দুঃখের কথা, একই পরিশ্রম করে, ইন্দ্রের পূজা করলে যে পরিশ্রম ও সময় ব্যয় হবে, শ্রীকৃষ্ণের পূজাতেও সেই একই পরিশ্রম আর সময় যাবে কিন্তু ফল অনেক বেশি পাওয়া যাবে, তাও লোকেরা ইন্দ্র, বরুণাদির মত ছোটখাটো দেবতাদের পূজা করছে। যদি আমার সুযোগ থাকে বিডিও বা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার তখন একজন বিডিওর কাছে প্রার্থনা করে আমি যা ফল পাব মুখ্যমন্ত্রীর কাছে প্রার্থনা করলে জিনিসটা তখন অন্য রকমের দাঁড়িয়ে যাবে। দুজনের সাথে দেখা করতে আমার সময়ও একই লাগছে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর কাছে প্রার্থনা করলে জেলাশাসক থেকে শুরু করে আরও যত বড় বড় মাতব্বররা রয়েছে সবাইকেই আমি হাতে রাখতে পারব, কিন্তু বিডিও তার এক্তিয়ারে যতটুকু ক্ষমতা আছে সেটুকুর বাইরে যেতে পারবে না। গীতাতে ভগবান এই কথাই বলছেন – মানুষ কেন ভুল করে দেবতাদের পূজা করে, তারা সরাসরি আমাকেই পূজা করতে পারে। সর্ব অবস্থাতে অবতারেরই পূজা করতে হয়, এই ধারণা কিন্তু বেদের ধারণা থেকেই স্থানান্তরিত হয়ে এই অবস্থায় এসেছে।

দেবতাদের মানুষের প্রতি সব সময়ই একটা কৃপার দৃষ্টি থাকত। বিপরীত ভাবে অসুরদের সব সময় ছিল মানুষের ক্ষতি করার স্বভাব। আরেকটা বড় গুণ ছিল, দেবতারা সত্যে খুব দৃঢ় ছিলেন, আর সব সময়

মন-মুখ এক করেই চলতেন, মুখে একটা কথা বললাম আর কাজে অন্য রকম করলাম এ জিনিস দেবতাদের মধ্যে কখনই ছিল না। আরেকটা খুব অদ্ভুৎ বৈশিষ্ট্য দেবতাদের মধ্যে লক্ষ্য করার বিষয়, দেবতারা যখন জোড়ায় জোড়ায় চলেন তখন তাঁদের ক্ষমতা অনেক বেড়ে যায়। যেমন মিত্র-বরুণ, এই দুজন সব সময় এক সঙ্গে থাকেন। ইন্দ্রের সঙ্গী অগ্নি, দুজন বেশির ভাগ সময় এক সাথে থাকেন। ইন্দ্র আর অগ্নিও একসাথে চলার সময় তাঁদের ক্ষমতা অনেক গুণ বেড়ে যাবে। এগুলোর থেকেও যেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা হল, বেদের ধর্ম কখনই Monotheism বা একেশ্বরবাদ ছিল না, ভারতীয়রা কখনই এক দেবতার পূজা করত না। একজন মাত্র দেবতা, আর তাঁরই কেবল পূজা হচ্ছে, এ জিনিস ভারতে কখনই ছিল না, যদিও অন্য ধর্মে একেশ্বরবাদই বেশি দেখা যায়। একেশ্বরবাদীরা বেদের ধর্মকে বলত Polytheism মানে পৌত্তলিক, যারা অনেক দেবতাদের পূজা করে। কিন্তু পৌত্তলিক শব্দ যে অর্থে ব্যবহার করা হয় সেই অর্থে বৈদিক যুগের মানুষরা দেবতাদের পূজা করতেন না, তাই এনারা একটা নতুন শব্দ নিয়ে এলেন, বিশেষ করে ম্যাক্সমূলাররা নাম দিলেন Pantheism যার ভারতীয় নাম সর্বেশ্বরবাদ, একের মধ্যে বহুকে দেখা। ঈশ্বরেরই নানান রূপ হলেন ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র, অগ্নি আদি দেবতারা। সেইজন্য ভারতের আধ্যাত্মিকতার এই ধারণাকে অনুপম বলা হয়, একদিকে সেই এক ঈশ্বর আমরা তাঁর পূজা করছি আবার অন্য দিকে আমরা ঈশ্বরেরই অনেক রূপের পূজা করছি। এই দুটোর মধ্যে ভারতীয়রা কখনই কোন তফাৎ দেখতে পায় না। যেমন ঘরে অনেক জানালা রয়েছে, আমি এই জানালা দিয়ে আকাশ দেখতে পারি, আবার অন্য জানালা দিয়েও আকাশ দেখতে পারি, জানালাগুলো একই ঘরের জানালা, তেমনি ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ ভগবানরই এক একটি রূপ – এটাই ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার অনুপম বৈশিষ্ট্য।

মানুষ কত ভাবে ভগবানের পূজা করে বলতে গিয়ে গীতাতে ভগবান খুব পরিষ্কার করে বলছেন – *একত্বেন পৃথকত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্* - মানুষ যখন আমাকে পূজা করে তখন সে এক রূপে মানে আমিই শ্রীকৃষ্ণ ভগবান এই রূপে পূজা করে আবার ব্রহ্মা, বিষ্ণু বা মহেশ্বর রূপে আমাকেই পূজা করছে আবার এই পুরো বিশ্বে যত রূপ হতে পারে সব রূপেই আমাকে পূজা করতে পারে, বিশ্বের অনন্ত রূপে হতে পারে।

আমরা আগেই বলেছি তিন রকমের দেবতার কথা বেদে বলা হয়েছে, পৃথিবীর দেবতা, অন্তরীক্ষের দেবতা এবং স্বর্গের দেবতা। স্বর্গের দেবতারা হলেন দ্যু, বরুন, মিত্র, সূর্য, সবিতু, পূষণ, অশ্বিনী আর দেবীদের মধ্যে ঊষা আর রাত্রি। অন্তরীক্ষের দেবতারা হলেন ইন্দ্র, রুদ্র, বায়ু, মরুৎ, পর্জন্য আর বরুণ। আর পৃথিবীর দেবতারা হলেন পৃথ্বী, অগ্নি ও সোম। দেবতাদের যেমন একটা মুর্ত রূপ আছে ঠিক সেই রকম তাদের একটা বিমুর্ত রূপও আছে। যেমন আমরা যখন কোন জিনিসকে বোঝাবার জন্য বলি খুব বর্ণময়, তখন এই বর্ণময় শব্দটা জিনিসটার একটা বিমুর্ত রূপ দিয়ে দেওয়া হল। দেবতাদের অনেক গুণের কথা বলা হয়, পরে তার কোন একটা গুণকে আলাদা করে বার করে সেই গুণের একটা বিমূর্ত রূপ দিয়ে আরেকটা দেবতা বানিয়ে দিচ্ছে। যেমন ইন্দ্রের শক্তি আছে, এখন আমি এই শক্তিকে আলাদা করে টেনে নিয়ে সেই শক্তিকে একটা দেবতা বানিয়ে দিলাম। আমরা যেমন বলি এরা শাক্ত, অর্থাৎ এরা শক্তির পূজারী। শক্তিটা এখানে একটা বিমূর্ত রূপ, একটা ভাব, এর মা হলেন ইন্দ্র। যেমন বিদ্যা, বিভিন্ন যে দেবতা বা দেবী আছেন তাদের বুদ্ধি বা মেধাকে আলাদা করে নিয়ে পরে এটাই আলাদা একজন দেবী হয়ে গেলেন। এই দেবীই হলেন বাক্, পরে যাঁকে কখন মেধার সাথে বা কখন সরস্বতীর সাথে জুড়ে দেওয়া হল। ইন্দ্রের একটা গুণ ছিল ধাতা রূপে, পরে ধাত্রীই একজন দেবী হয়ে গেলেন, সেই দেবী যিনি সূর্য আর চন্দ্রমাকে সৃষ্টি করছেন। এইভাবে দেবতাদের গুণগুলিকে টেনে নিয়ে এক একটা দেবতা বা দেবী বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। একজন বাস্তব দেবতাকেই পরে একটা বিমুর্ত রূপ দিয়ে দিল। এটাও বেদের একটা অনুপম শৈলী। এখানে বিশ্বকর্মার উদাহরণও দেওয়া যেতে পারে, বিশ্বকর্মা, যিনি এই জগতকে নির্মাণ করেছেন, মানে ভগবান নিজের যে শক্তিতে এই জগৎ নির্মাণ করেন সেই শক্তিকে আলাদা করে তার নাম দিলেন বিশ্বকর্মা। সেই বিশ্বকর্মা পরে হয়ে গেলেন নির্মাণশিল্প, যন্ত্রপাতির দেবতা। ঠিক তেমনি মন্যু (ক্রোধের দেবী), শ্রদ্ধা, অনুমতি (দেবতাদের আনুকল্য পাওয়ার দেবী), নৈঋত্যি (রোগব্যাধির দেবতা) ইত্যাদি অনেক আলাদা আলাদা দেবতা ও দেবীর সৃষ্টি হল। শ্রদ্ধা সব মানুষের মধ্যেই থাকে আবার দেবতাদের মধ্যেও আছে, সেই শ্রদ্ধাকেই একজন দেবী বানিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু এদের মধ্যে

বিশেষ হল অদিতি নামে যে দেবীর কথা বলা হয়েছে। অদিতি একজন সম্পূর্ণ বিমুর্ত দেবী ছিলেন। মানুষের যত রকমের দুঃখ হতে পারে, শারীরিক দুঃখ-কষ্টই হোক, মানসিক কষ্টই হোক, কোন পাপ কাজ করার পর মন খুঁতখুঁত করছে, অদিতি দেবীর উপাসনা করলে এই ধরণের দুঃখ থেকে বেরিয়ে আসা যাবে। পরের দিকে এসে অদিতিকে দেবতাদের মা বানিয়ে দেওয়া হল, এখানে অবশ্য দ্বাদশ আদিত্যদের কথা বলা হচ্ছে।

দেবতাদের যাঁরা স্ত্রী ছিলেন তাঁরা কিন্তু দেবী রূপে স্থান পাননি। দেবতার সংখ্যা অনেক, তার সাথে কিছু দেবীর নামও আছে, দেবতাদের মা অদিতি আদির এনাদেরও নাম সম্মান দুটোই আছে। এমনকি অসুর বা দৈত্যদের মা দিতি আছেন, কুকুর শেয়ালদের মা সরমা আছেন, এনাদের সবারই সম্মান আছে কিন্তু দেবতাদের যাঁরা স্ত্রী ছিলেন বেদে কোথাও তাঁদের দেবী রূপে সম্মান নেই।

দেবতাদের ব্যাপারে আরেকটি জিনিস খুবই লক্ষণীয় যে, বেদে সব সময় দুজন করে দেবতাদের নাম আসে। এটা একটা নতুন জিনিস, অন্যান্য জায়গায় পাওয়া যায় না। এর মধ্যে খুব নামকরা হল মিত্র-বরুণ, মিত্র নাম এলেই বরুণ নাম আসবে। এই দুজন দেবতা সব সময় একসাথে থাকেন। সেখান থেকে আবার এসে গেল বন্ধুত্বের ব্যাপার, যেমন ইন্দ্র আর অগ্নি, এই দুই দেবতার মধ্যে বিরাট বন্ধুত্ব। ইন্দ্র থাকলে অগ্নি থাকবেন, অগ্নি থাকলে ইন্দ্র থাকবেন। কিন্তু যমজ দেবতার কথা যদি বলা হয় তাহলে মিত্র-বরুণ ঠিক ঠিক যমজ দেবতা। তেমনি দ্যাবা-পৃথিবী, বেদের কোন মন্ত্রে যদি দ্যু বা দ্যাবা এসে যায় সেখানে পৃথিবীর নামও আসবে, দ্যাবা মানে অন্তরীক্ষ আর পৃথিবী মানে মাটি, দ্যাবা পৃথিবী একসাথেই আসবে। তার সাথে আসে দলবদ্ধ দেবতাদের একটা গ্রুপ, এই দেবতারা সব সময় দলবদ্ধ হয়ে চলেন। এদের মধ্যে খুব নামকরা হলেন অষ্টবসু, তেমনি একাদশ রুদ্র। আরেকটি নামকরা দলবদ্ধ দেবতাদের নাম হল ঊনপঞ্চাশ মরুৎ, এক বাতাসেরই ঊনপঞ্চাশটি নাম। ঊনপঞ্চাশ মরুৎ দেবতাদের সৃষ্টি তো হয়ে গেছে, কিন্তু কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে সেটাও বলতে হবে। তাই নিয়ে পুরাণে বড় কাহিনী দাঁড় করান হয়েছে।

দেবতাদের আবার শ্রেণীবিভাগ ছিল, ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণাদি যত দেবতারা ছিলেন তাঁদের তুলনায় একটু নীচের স্তরে কিছু দেবতা ছিলেন, এই ধরণের দেবতাদের কিছু নাম আসে যেমন ঋভু, গন্ধর্ব, অপ্সরা। কিন্তু পরের দিকে মহাভারতে, পুরাণে এত রকম অপ্সরা ও গন্ধর্ব এসে গেছে যে গোলমাল লেগে যায়। সেইজন্য বলা হয় বেদের বাইরে কিছু নেই, সবটাই বেদে কোন না কোন ভাবে এসে গেছে, সেটাকেই পরে অন্যান্য শাস্ত্রে বাড়িয়ে চলে গেছে।

অসুর, দৈত্য, দানব

বেদে আসুরিক শক্তিকে দু ভাবে দেখান হয়েছে, একটা হল দৈত্য আরেকটা দানব। দানবরা দনুর পুত্র, দনুও আবার কশ্যপ মুনির স্ত্রী। কশ্যপ মুনি খুব উচ্চ ক্ষমতাবান ব্যক্তিত্ব ছিলেন, তাঁর ষাটজন স্ত্রী ছিলেন। প্রত্যেক স্ত্রীরা এক এক ধরণের প্রজাতির জন্ম দিয়ে গেছেন। কশ্যপের এক স্ত্রীর নাম ছিল দিতি, দিতির সন্তানদের বলা হত দৈত্য আর দনুর সন্তানদের বলা হত দানব। অদিতির সন্তানদের বলা হত আদিত্য। মজার ব্যাপার হল, অসুর হল সংস্কৃত শব্দ, কিছু কিছু জাতি অসুরের 'সু' ঠিকমত উচ্চারণ করতে পারে না, 'স' উচ্চারণটা হয়ে যায় 'হ'। যেমন সিন্ধু হয়ে গেল হিন্দু, সেখান থেকে এসে গেল হিন্দুস্থান, সেই রকম অসুর হয়ে গেল অহুর। ইরানের পার্সি বা জরাথ্রুস্ট ধর্মের প্রধান দেবতা অহুর মাজ্দা, তাদের কাছে দেবতা মানে বদমাইশ জাতি, দেব মানে দুষ্ট লোক। ওদের ধর্মেও ইন্দ্র আছে, সে হল দুষ্ট লোক, কিন্তু বৃত্র সে আবার ভালো লোক। সেইজন্য মনে হতে পারে, দুটো জাতি একই বাবার সন্তান ছিল, এক দিকে দেবতারা অন্য দিকে অসুররা। কোন কারণে দুটো জাতি আলাদা হয়ে একটা জাতি ইরাণের দিকে চলে গিয়েছিল আরেকটা জাতি ভারতবর্ষে চলে এল। অন্য একটা সম্ভবনাও থাকতে পারে, দুটো জাতি ভারতবর্ষেই সিন্ধু নদীর ধারে বসবাস করত। কোন বিবাদ, লড়াই হওয়াতে একটা জাতি ইরাণের দিকে চলে গেল। আমরা কেউ জানি না কিভাবে আলাদা হয়ে গিয়েছিল, ঐতিহাসিকরা এর উপর লিখেই যাচ্ছেন। এখান থেকেই একটা মতবাদ দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল যে একটা সাধারণ জাতি মধ্য এশিয়া থেকে বেরিয়ে এসেছিল, তাদের একটা শাখা ইরাণের

দিকে চলে গেল, আরেকটা শাখা ভারতের দিকে চলে গিয়েছিল। কিন্তু ইংরেজদের কয়েকজন এই মতবাদে আপত্তি করে বলছেন এরকম হতে পারে না, কারণ এরা যদি মধ্য এশিয়া থেকে এসে থাকে তাহলে আফগানিস্থানের বিস্তির্ণ মরু অঞ্চলে কোন খাবার-দাবারই ছিল না, সেইজন্য তারা ভারতবর্ষের দিকেই আসত। বলছেন যে, ওই দুঃখের দেশ থেকে তারা যখন সিন্ধু নদীর অববাহিকাতে এসে পৌঁছাল তখন তারা ওই প্রাচুর্য, শস্য, ধন-সম্পদ দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল। এই প্রাচুর্যই আলেকজাণ্ডারকে এখানে টেনে নিয়ে এসেছিল। মানুষ যখনই অবাক হয়ে যায় তখনই তার ভেতর থেকে কবিতা বেরিয়ে আসবে। অথচ মধ্য এশিয়ার ওই দুঃখের দেশ থেকে যে তারা সুখের দেশে এসে অবাক হয়ে গেল বেদে কোথাও এর বর্ণনা নেই। স্বামীজী এই ব্যাপারটা ধরতে পেরেছিলেন, আমরা যে ভারতের বাইরে থেকে এসেছি বেদে কোথাও এর বর্ণনা নেই, সত্যি হলে কবিতার মাধ্যমেই হোক বা অন্য কোন ভাবে এই ঘটনার আভাস কোন না কোন ভাবে অভিব্যক্ত হতই। মর্ত্যভূমি থেকে হঠাৎ স্বর্গভূমিতে পৌঁছে গেছে, এই আনন্দ প্রকাশের বর্ণনা কোথাও নেই। সেইজন্য আমরা ঠিক জানি না। আর এটাও ঠিক যে বেদে এমন অনেক শব্দ আছে যে শব্দগুলি জেন্দাবেস্তাতেও পাওয়া যায়। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে যে নামগুলো পাওয়া যায় তাদের চরিত্রগুলি বেদের চরিত্রের বিপরীত। বিপরীতে হলেও বেদের সাথে মিলে যাচ্ছে কারণ তারা সৎভাই ছিল। আর অসুর ও দেবতাদের সংগ্রাম অনবরত লেগেই থাকত। যাই হোক, দিতির পুত্র দৈত্য আর দনুর পুত্র দানব এদের সবাইকে একসাথে বলে অসুর।

অসুর আর সুরের মধ্যে আবার বিরাট পার্থক্য। বেদেই আছে যে, যারা সুর অর্থাৎ দেবতা তাদের সোমরস পান করার অধিকার ছিল, অসুরদের এই অধিকার কোন দিনই ছিল না। আচার্য শঙ্কর অসুর আর সুরের পার্থক্য অন্য ভাবে দিয়েছেন। আচার্য তাঁর ভাষ্যে বলছেন যারা প্রাণশক্তিকে বেশি বিশ্বাস করে। অসু মানে প্রাণ, নিজের ইন্দ্রিয়, নিজের মন, বুদ্ধির উপর যারা বেশি ভরসা করে তাদের অসুর বলা হয়। দেবতা শব্দ এসেছে দিব্ ধাতু থেকে, যাঁরা আত্মজ্ঞানের শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তাঁরা হলেন দেবতা। কিন্তু বেদের ব্রাহ্মণ অংশে দেখা যায় যখনই দেবতা আর অসুরদের লড়াই হত বেশির ভাগ সময়ই অসুরদের হাতে দেবতারা মার খেতেন। কারণ ইন্দ্রিয়ের শক্তি সব সময় আত্মজ্ঞানের শক্তি থেকে বেশি। বিদেশীরা চিরদিনই প্রাণশক্তির উপর জোর দিয়ে এসেছে। ভারত আবার জন্ম থেকেই আত্মজ্ঞানের উপর জোর দিয়ে এসেছে। তাই বিদেশীরা ভারতের উপর যখনই আক্রমণ করেছে ভারত সব সময় মার খেয়ে এসেছে। শুধু মার খায়নি, মার খেয়ে আবার প্রার্থনা করবে ঠাকুর রক্ষা কর। তখন তিনি আবার অবতার হয়ে এসে দু-চারটে অসুরকে মেরে ভারসাম্য ফিরিয়ে আনবেন।

আসুরিক শক্তির অধিকারীদের একটা হল দৈত্য ও দানব, একসাথে যাদের বলা হয় অসুর। এদের গতিবিধি অন্তরীক্ষে, আর ভূমির উপরে যে অসুররা থাকে তাদের বলে রাক্ষস। আমরা রাক্ষস, দৈত্য, দানব, অসুর সব কটাকে মিলিয়ে দিই। কিন্তু এদের মধ্যে একটা বড় পার্থক্য আছে। অসুররা অনেক উচ্চ শ্রেনীর প্রাণী। আমরা ভাবি অসুররা নরকে থাকে, আসলে পাতালে থাকে। আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা দয়ানন্দ সরস্বতী আবার পাতাল লোকের বর্ণনা করতে গিয়ে বলছেন পাতাল লোক হল সমুদ্রের পারে। আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড সমুদ্রের পারে সেইজন্য এগুলোকে তিনি পাতাল লোক বলে দিলেন। পাতাল লোকের বর্ণনাতেই আছে যে, পাতাল লোকের সুখ স্বর্গলোকের থেকে অনেক গুণ বেশি। রাক্ষসের সাথে সাথে পরে পরে আরেক ধরণের প্রাণী এল যাদের বলছেন পিশাচ। পিশাচরা কাঁচা মাংস খেয়ে বেড়াত। পরের দিকে সাহিত্যে পিশাচ, রাক্ষস, অসুর, দৈত্য, দানব সবাইকে এক করে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। অথচ যখন পুরাণ পড়ছি তখন দেখছি প্রহ্লাদ দৈত্য বংশের। তখন স্বাভাবিক ভাবেই সংশয় হবে প্রহ্লাদ দৈত্য বংশের তার মানে সেতো পিশাচ, তাহলে কি করে এত বড় ভক্ত হয়ে গেলেন! এখানেই আমরা ভুল করে বসি, আসলে দৈত্য, দানব বা অসুর এদের যে ধরণের গুণ আছে তাতে দেবতাদের অনেক গুণের সাথে মিলে যায়। তবে দেবতাদের তুলনায় এরা ইন্দ্রিয়ের উপর বেশি ভরসা করে। অসুরদের জীবন আরেকটু বেশি আত্মকেন্দ্রিক। পরের দিকে অনেক কাহিনীতে নানা রকমের অসুর বানিয়ে দেওয়া হয়েছে, যেমন মহিষকে অসুর বানিয়ে মহিষাসুর করে দেওয়া হয়েছে। বেদের

অসুরদের সব নাম পরিষ্কার করে দেওয়া আছে কারা কারা অসুর। শুধু অসুর বলে দিলেতো হবে না, তখন তাকে নানান রকমের হিংসাত্মক চরিত্র দিতে হবে তা নাহলে কাহিনী জমবে না। কিন্তু বেদে অসুরদের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে সেখানে বলছেন দেবতা আর অসুররা সৎভাই, আবার তাদের মায়েরা সবাই আপন বোন। সেইজন্য অসুরদের চরিত্র দেবতাদের চরিত্র থেকে খুব বেশি অন্য রকম হবে না।

দৈত্য বংশেও কেউ কেউ ভক্ত হয়েছিলেন, এর মধ্যে নামকরা ভক্ত হলেন প্রহ্লাদ। প্রহ্লাদ ছিলেন দৈত্য বংশের। পরের দিকে পুরাণ রচনার সময় দেখা গেল, বিশেষ করে পৌরাণিক ধারাকে অবলম্বন করে যারা পরবর্তি কালে শাস্ত্র রচনা করেছিলেন, তারা যত রকমের খারাপ মানবিক গুণ থাকতে পারে সেগুলিকে একত্র করে দানব, দৈত্যদের উপর চাপিয়ে দিলেন। সেইজন্য এখনও আমরা সবাই দানব, দৈত্য বলতে অধার্মিক, দুশ্চরিত্র মনে করি। এরা কিন্তু কেউই এই ধরণের ছিল না, বাস্তবে এরা অনেকেই দেবতাদের থেকেও অনেক বেশি শক্তিশালী ও ধার্মিক ছিল। এদের সাথে দেবতাদের সব সময়ই যুদ্ধ লড়াই লেগেই থাকত। দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্র ছিলেন একটু ঈর্ষাপরায়ণ, সব সময় সে অসুর, দানব ও দৈত্যদের থেকে ভয়ে ভয়ে থাকত।

দৈত্য, দানব, অসুররা ছিলেন স্বর্গের অধিবাসী। কিন্তু পরের দিকে দেবতারা অমৃতের সন্ধান পেয়ে গিয়েছিলেন, অমৃতের সন্ধান পেয়ে যাওয়াতে দেবতারা বেশি শক্তিশালী হয়ে ওঠে। যেহেতু দেবতারা ধর্মসাধন করতেন তাই তাঁরা বরাবরই ভগবানের বেশি কৃপাধন্য ছিল। ভগবানের কৃপাপাত্রের সুবাদে দেবতারা যে করেই হোক অসুর, দানব ও দৈত্যদের স্বর্গ থেকে পাতাল লোকে পাঠিয়ে দিয়েছিল। বেদে পাতাল লোকের যে ধরণের বর্ণনা আমরা পাই সেগুলো খুবই ঐশ্বর্যপূর্ণ। তবে পাতাল লোকের সব সময় উল্লেখ করা হয় পৃথিবীর নীচে। সেইজন্য পাতাল লোকে কেউ যেতে চায় না। বলি রাজা ছিলেন দৈত্য বংশের। সেই বলি রাজা এমন কঠোর তপস্যা শুরু করেছিলেন যে ইন্দ্র পর্যন্ত ঘাবড়ে গিয়েছিলেন এই ভেবে যে তাঁর হয়তো ইন্দ্রত্ব চলে যাবে। তখন ইন্দ্র ভগবানের সাহায্য চাইলেন। ভগবান তখন বামন অবতার ধারণ করে বলিকে কায়দা করে পাতাল লোকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। পাতালে যখন বলি রাজাকে পাঠিয়েই দেওয়া হল, তখন বলি ভগবানকে প্রার্থনা করলেন যে – হে প্রভু, আমি তো এমনিতে কোন দোষ করিনি, কিন্তু আমাকে আপনি অনুমতি দিন যাতে বছরে একটা দিন আমি পৃথিবীতে এসে মানুষদের মেলামেশা করতে পারি। কেরলে যে ওনম উৎসব হয়, লোকে বলে সেইদিন রাজা বলি নাকি পাতাল লোক থেকে পৃথিবীতে আসেন।

দৈত্য দানব ও অসুর ছাড়াও আরও এক ধরণের অধার্মিক ও দুশ্চরিত্র প্রাণীর কথা বেদে উল্লেখ করা হয়েছে। এরা হল রাক্ষস ও পিশাচ। এই রাক্ষস ও পিশাচরা পৃথিবীতেই ঘোরাফেরা করে আর এদের মধ্যে রাক্ষসদের লক্ষ্য ছিল মানুষ, বলা হয় এরা মানুষদের বেশি ক্ষতি করে। দৈত্য দানবদের সাথে মানুষের কোন লড়াই ছিল না, এদের লড়াই ছিল দেবতাদের সাথেই। পিশাচরাও এক ধরণের নরখাদক, ভূত প্রেতের মত এরাও কিছুটা অশরীরি। আমাদের এই কোর্সের নাম ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য, ভারতীয় চিন্তাধারাতে এই ভূত পিশাচের ভাবনা গুলো কিভাবে এসেছে এগুলোকে জানার প্রয়োজন আছে বলে এই ব্যাপারে কিছু আলোকপাত করা হল। ভূত পিশাচ এদের কথা আমরা বেদেই উল্লেখ পাই।

পিতৃগণ ও পিতৃলোক

পিতৃরা দেবতাদের মতই আরেকটি শ্রেনী, যদিও দেবতাদের থেকে একটু নীচে। পিতৃ শব্দের অর্থও অনেক বার পাল্টেছে। আগেকার যাঁরা পূর্বপুরুষরা ছিলেন, যাঁরা ভালো কর্ম করার পর মারা গেছেন তাঁদের সবাইকে পিতৃ শ্রেনীর মধ্যে গণ্য করা হত। পরের দিকে নিজের ঠাকুরদা, বাবা যাঁরা মারা যেতেন তাঁদেরকেও পিতৃ বলা শুরু হয়ে গেল। দেবতরা সবাই স্বর্গলোকে থাকেন, পিতৃরা কোথায় থাকবেন? পিতৃদের থাকার জন্য পিতৃলোক বানিয়ে দেওয়া হল। কারা কারা স্বর্গলোকে যাবে আর কারা পিতৃলোকে যাবে সেটাও আবার ঠিক করে দেওয়া হল। স্বর্গে যেতে হলে নানা রকমের যজ্ঞ-যাগ করতে হবে। যজ্ঞ-যাগ করেছে কিন্তু খুব বেশি না করে একটু কম করেছে, তারা তখন দেবলোকে না গিয়ে পিতৃলোকে যাবে। পরের দিকে এসে এই দুটো লোকের ব্যাপারে আরও অনেক কিছু যোগ হয়েছে। বলা হল স্বর্গলোক আর পিতৃলোকে যাওয়ার দুটো আলাদা

পথ, উত্তরায়ণ আর দক্ষিণায়ণ। উত্তরায়ণে গেলে স্বর্গলোকে যায় আর দক্ষিণায়ণে গেলে পিতৃলোকে যায়। কিন্তু পিতৃলোকের সুখ প্রায় স্বর্গলোকেরই মত, তবে স্বর্গলোক থেকে পিতৃলোকে বাসের মেয়াদ অনেক কম, আরও তাড়াতাড়ি সেখান থেকে নেমে আসতে হবে। যারা পিতৃলোকে যেতে চাইছে, নিজের পূর্বপুরুষদের সাথে থাকতে চাইছে তাহলে তাদের পিতৃপূজা করতে হবে। পিতৃপূজার সব থেকে বড় অঙ্গ শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া, পিণ্ডদান, আগেকার দিনে দুপুরে খাওয়ার সময় বাইরে একটু খাবার পিতৃদের উদ্দেশ্যে রেখে দিতেন, এই ভাবে পিতৃদের অন্ন দেওয়া হত, এরাই মৃত্যুর পর পিতৃলোকে যায়। যারা পিতৃলোকে যেতে চাইছে না তারা এই ধরণের পূজা বেশি করবে না। আর যারা মুক্তি চাইছে তারা তো কখনই এগুলো করবে না। ঠাকুর শ্রাদ্ধ বাড়ির অন্ন খেতে নিষেধ করছেন। ঠাকুর নিষেধ করছেন দুটো কারণে, যে জিনিস যাকে অর্পণ করা হয় সেই প্রসাদ খেলে তারই সত্তা পাবে। সেইজন্য কোন সাধু সন্ন্যাসীর গৃহস্থ বাড়ির রান্না করা খাবার খেতে নেই, খেলে সন্ন্যাসীর সত্তা নষ্ট হয়ে যাবে। শুধু খাবারই নয়, অপরের ব্যবহৃত জিনিসও সাধু সন্ন্যাসীদের নিতে নেই, মুখেরটা দিলেই এঁটো হয় না, অপরের ব্যবহার করা দ্রব্যও এঁটো। ঠাকুর শ্রাদ্ধবাড়ির অন্ন খেতে তাঁদের জন্যই নিষেধ করছেন যাঁরা খুব উচ্চমানের ভক্ত, আমার আপনার মত সাধারণ লোকেদের জন্য নয়। উচ্চমানের ভক্ত যাঁরা তাঁদের ঈশ্বরের প্রসাদ ছাড়া অন্য কোন কিছুই খেতে নেই। শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে পিতৃদের উদ্দেশ্যে অন্ন দেওয়া হয়, সেই অন্ন অনেক নিকৃষ্ট হয়ে যায়। কার জন্য নিকৃষ্ট? যাঁরা ভক্ত তাঁদের জন্য নিকৃষ্ট, সবার জন্য নয়। আসলে এই ধরণের অনুষ্ঠানে যা কিছু করা হয় সবের মধ্যে কামনা-বাসনা লাগানো থাকে, ওই জিনিসগুলোই যাঁরা ভক্ত তাঁদের পক্ষে প্রচণ্ড ক্ষতিকারক। স্বামী ভূতেশানন্দজীর কাছে দীক্ষা নেওয়ার পর এক মহিলা তাঁকে জিজ্ঞেস করছেন – মহারাজ, আমি কি শ্রাদ্ধবাড়ির অন্ন খেতে পারব? মহারাজ খুব অসন্তুষ্ট হলেন, তিনি সাধারণত কখন রাগতেন না, কিন্তু বেশ অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন – এত প্রশ্ন থাকতে তোমার এই একটা প্রশ্নই মনে পড়ল।

স্বর্গলোক আর এই পিতৃলোক, ইদানিং আবার একটা নতুন লোক হয়েছে যার নাম রামকৃষ্ণলোক। তাহলে রামকৃষ্ণলোকটা কি? বলা হয়, এই জীবনে আপনি যাঁর সাধনা করবেন মৃত্যুর পর আপনি তাঁরই সত্তা পাবেন। সায়নাচার্যও তাঁর ব্যাখ্যাতে বলছেন আপনি যে দেবতার যজন করবেন, মৃত্যুর পর আপনি সেই দেবতার সত্তা নিয়ে তাঁর কাছেই যাবেন। বৈদিক ধর্ম হল দেবতাদের ধর্ম। উপনিষদের ধর্ম হল সম্পূর্ণ নির্গুণ নিরাকারের ধর্ম। এই দুটোর মাঝখানে যে সগুণ সাকার ঈশ্বরের যে একটা সত্তা আছে, সেই জিনিসটা আমাদের পুরাণাদিতে এসেছে। ঠাকুর অনেক জায়গায় 'অখণ্ডের ঘর' শব্দ ব্যবহার করছেন, সচরাচর এই শব্দ পাওয়া যায় না। কিন্তু যিনি ঈশ্বর তাঁরও তো একটা ঘর থাকতে হবে, এই ধারণাও বেদ থেকেই এসেছে। যেমন পিতৃদের বাসস্থান আছে, দেবতাদের বাসস্থান আছে, তাহলে যিনি নির্গুণ নিরাকার যাঁকে সগুণ সাকার রূপে দেখাচ্ছে তাঁরও তো একটা বাসস্থান থাকতে হবে। সেখান থেকে এসে গেল ভগবান বিষ্ণুর বাসস্থান বিষ্ণুলোক, ভগবান শিবের বাসস্থান শিবলোক তেমনি ঠাকুরের বাসস্থান রামকৃষ্ণলোক। তবে এসব লোককে খুব বেশি গুরুত্ব দিতে নেই। আচার্য শঙ্কর বলছেন, এই যে স্বর্গের কথা, মৃত্যুর পরের কথা বলা হচ্ছে, এগুলো জানার কোন পথ নেই। সেইজন্য এগুলোকে প্রমাণিত করা যায় না, আবার অপ্রমাণিতও করা যায় না। কারণ এগুলো যুক্তিতর্কের বাইরে, ঋষিরা যেমনটি বলেছেন তেমনটি আমাদের মেনে নিতে হয়। না মেনে নিলে আধ্যাত্মিক যাত্রা শুরু হবে না। কারণ যিনি আধ্যাত্মিক যাত্রা শুরু করতে যাচ্ছেন তাঁর কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে যে এই ভৌতিকবাদী জীবন, সুখভোগের জীবন দিয়ে তিনি শান্তি পাবেন না। এবার তাহলে তুমি আধ্যাত্মিক জীবনে চল। আধ্যাত্মিক জীবন শুরু করতে গিয়ে প্রথমের দিকে তার অনেক ধরণের প্রশ্ন থাকে। ধর্মের আচরণ দু রকমের লোক করেন, সাধারণ মানুষ আর উচ্চ আধারের মানুষ। যারা সাধারণ, তাদের নানান রকম প্রশ্ন থাকে। প্রশ্ন থাকে কাদের কাছে? যারা উচ্চ আধার। তারা এখন কি আর করবেন! সংসারের জ্বালায় জ্বলেপুড়ে এই পথে এসেছে, তাকে যদি তার মনের মত একটা ভালো উত্তর না দেওয়া হয় তাহলে আবার সে ছিটকে আগের জীবনে ফিরে যাবে। এইভাবে তাকে একটা ভালো উত্তর দিয়ে দেওয়া হল।

প্রাচীন কাল থেকে একটা বিশ্বাস চলে আসছে যে, মানুষ যখন মারা যায় তখন তার কর্ম অনুসারে বিভিন্ন লোকে তাদের গতি হয়। তার মধ্যে একটি লোক পিতৃলোক। পিতৃলোক দেবতাদের বাসস্থান দেবলোক

থেকে অনেক নীচে। কিন্তু সাধারণত বিভিন্ন সময় এই পিতৃলোকের বাসিন্দারা দেবতাদের সাহায্য করে, আর যখন কেউ মারা যান তখন পিতৃলোকের বাসিন্দারা তাদের স্বাগত জানান। কিন্তু যাই হোক না কেন পিতৃলোক দেবলোক থেকে পুরো আলাদা, মেইন লাইন আর কর্ড লাইনের মত আলাদা। যারা একবার পিতৃলোকে প্রবেশ করে যায় তাদের পক্ষে দেবলোকে যাওয়া খুব কঠিণ হয়ে যায়।

গীতাতে শুক্লমার্গ আর কৃষ্ণমার্গ এই দুটো আলাদা পথের কথা বলা হয়েছে, এছাড়া দেবযান ও পিতৃযানের কথাও বলা আছে। যারা দেবলোকে যান তারা একটা অন্য পথে যান আবার যারা পিতৃলোকে যান তাদের যাওয়ার পথটা আবার আলাদা। পিতৃলোকের বাসিন্দারা চান তাদের বংশের লোকেরা এসে এই পিতৃলোকে বাস করুক। কিন্তু দেবলোকে যারা আছেন তাদের এই ব্যাপারে কোন মাথা ব্যাথা নেই যে কেউ এসে তাদের এখানে থাকুক, কেননা দেবলোকে বাস করার ইচ্ছুক লোকের সংখ্যা অনেক বেশি। শ্রাদ্ধাদি কার্যে যা কিছু অর্পণ করা হয় তা সব সময় পিতৃদের উদ্দেশ্যেই অর্পণ করা হয়। আবার যখন যজ্ঞ-যাগ করা হয় তখন যা অর্পণ করা হয় তা দেবতাদের উদ্দেশ্যে করা হয়। হিন্দুদের মধ্যে পূজা, যজ্ঞ-যাগই এই কারণেই বেশি করা হয়ে থাকে। পিতৃদের উদ্দেশ্যে সাধারণত আমাদের তিনটি কর্ম করা হয় – প্রথম যে কর্ম তা হল শ্রাদ্ধ, মৃত্যুর বারো বা তেরো দিন বাদে এই শ্রাদ্ধাদি কর্ম সম্পন্ন করতে হয়, তবে বিভিন্ন বর্ণে বিভিন্ন নিয়ম আছে। দ্বিতীয় কর্ম বার্ষিকী, প্রত্যেক বছর বাৎসরিক শ্রাদ্ধ করা হয়। বাৎসরিক শ্রাদ্ধ আবার দু রকমে করা হয়। সাধারণত যে তারিখে মৃত্যু হয়েছিল সেই দিনটিতে বাৎসরিক কর্ম করা হয়, আবার অনেক সময় যেদিন পিতৃপক্ষ শেষ হবে সেই দিন তর্পণ করা হয়। তৃতীয় যে কর্ম পিতৃলোকদের উদ্দেশ্যে করা হয় তা হল গয়াতে বিষ্ণু পাদপদ্মে পিণ্ড দান করা। গয়াতে যখন পিণ্ডদান হয়ে যাবে তখন সে তার পিতৃপুরুষদের প্রতি সমস্ত দায়বদ্ধতা থেকে মুক্ত হয়ে গেল। সন্ন্যাসীরা সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণের আগে পিণ্ড দান করে দেন। সন্ন্যাসীদের যাদের বাবা-মা জীবিত থাকেন তাদেরও পিণ্ড দান করা হয়, সেই পিণ্ড ভগবান বিষ্ণুর কাছে জমা থাকবে, বাবা-মা কেউ যখন মারা যাবেন তখন ভগবান বিষ্ণুর কাছ থেকে সেই পিণ্ড গ্রহণ করেন।

পিতৃদের উদ্দেশ্যে যখন কিছু অর্পণ করা হয় তখন মন্ত্রে স্বধা বলে অর্পণ করা হয়। আর দেবতাদের যজ্ঞে কিছু অর্পণ করার সময় স্বাহা বলা হয়। আমাদের প্রচলিত একটা ধারণা যে শ্রাদ্ধবাড়ির অন্ন খেলে নাকি পিতৃলোকের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হয় আর শ্রাদ্ধবাড়ির অন্ন খেলে ভক্তির হানি হয়। তবে এটা খুবই ঠিক যে, কোন দ্রব্য যখন কারুর নামে অর্পণ বা সংরক্ষিত করে দেওয়া হয় তখন সেই ব্যাক্তির মানসিকতা বা তার যে তন্মাত্রা সেই দ্রব্যের মধ্যে সংক্রামিত হয়ে যায়। সেইজন্য বলা হয় কোন জিনিস ছোটদের দিয়ে বড়দের দেওয়া উচিৎ নয়। ঠাকুরের জন্য কোন জিনিস নির্দিষ্ট করে রাখার পর কেউ যদি সেই দ্রব্যের প্রতি লোভ দেয় তাহলে সেটা আর ঠাকুরকে দিতে নেই, কেননা সেই দ্রব্যটা তখন নষ্ট হয়ে গেছে। স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর একটা খুব উল্লেখযোগ্য ঘটনা আছে। এক ভক্ত মহিলা তাদের বাগানের ভালো জাতের আম গাছে খুব ভালো আম হয়েছিল। মহিলা সেখান থেকে কিছু ভালো ভালো আম তার ছেলেকে দিয়ে মহারাজের জন্য পাঠিয়েছেন। রাস্তা দিয়ে আসতে আসতে ছেলেটি দুটো আম হাতে নিয়ে ভাবছে – এই সুন্দর আম দুটো যদি আমি খেতে পেতাম। মহারাজের কাছে এসে যখন আমের থলেটা ওনার হাতে দিয়েছে তখন মহারাজ ঠিক ঐ আম দুটো তুলে ছেলেটিকে বলছে – খোকা, তুমি এই আম দুটো খেয়ো। ছেলেটি অবাক হয়ে দেখছে যে দুটি আমের প্রতি সে দৃষ্টিপাত করেছিল ঠিক সেই দুটো আমই মহারাজ সরিয়ে দিলেন। ঠাকুর শ্রীশ্রীমায়ের নামে বলছেন – জয়রামবাটীতে রামচন্দ্রের মেয়ে কুটো বাঁধা আছে। কুটো বাঁধা মানে, ঠাকুরের জন্য শ্রীমা নির্দিষ্ট হয়ে আছেন। যে কোন জিনিস যখন কারুর জন্য নির্দিষ্ট করা থাকে তখন সেই জিনিসটা যদি অন্য কারুর কাছে চলে যায় তখন গোলমাল লেগে যাবে। হিন্দু ধর্মে এই ধারণাটা সুদৃঢ় ভাবে বসে আছে।

শ্রাদ্ধে যা কিছু নিবেদন করা হয় তার সব কিছু পিতৃদের জন্য নির্দিষ্ট। সেই দ্রব্য গ্রহণ করা মানে, যে গ্রহণ করছে তার ভেতরের সত্তাটা পিতৃলোকের জন্য তৈরী হয়ে যাচ্ছে। তাই বলে পিতৃলোক কি খুব খারাপ? আদপেই খারাপ নয়। কিন্তু পিতৃলোক হল দেবলোকের থেকে পুরোপুরি আলাদা। দেবলোক আবার ব্রহ্মলোক থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। আবার ব্রহ্মলোক মুক্তিমার্গ থেকে আলাদা। তবে দেবলোক, ব্রহ্মলোকের লাইনটা

ক্রমমুক্তির লাইনে মুক্তিমার্গের দিকে এগোতে থাকে কিন্তু পিতৃলোক সেই লাইন থেকে সরে যায়। বেদে কিন্তু এত বিশদ ভাবে এই পার্থক্যগুলিকে উল্লেখ করা নেই। বেদে প্রথম যে পার্থক্যটার উল্লেখ করা হয়েছে তা হল পিতৃলোক আর দেবলোকের ক্ষেত্রে। পিতৃলোককে পরিহার করার কথা প্রথম পরিষ্কার করে উল্লেখ করা হয়েছে মুণ্ডোক উপনিষদে। সেখানে স্পষ্ট করে বলা আছে, যারা আধ্যাত্মিক সাধক তাদের জন্য পিতৃলোক নয়।

বেদের সব ঋচাই সেই ঈশ্বরেকে উদ্দেশ্য করেই রচিত হয়েছে। বেদের ঋচাগুলি তিন চার ধরণের হয়। কিছু ঋচা প্রকৃতিতে যা কিছু আছে, নদী, পাহাড়, সমুদ্র এদের স্তুতি করছে, পিতৃপুরুষদের স্তুতি করে ঋচা আছে তাও নয়, ভগবানের স্তুতি করছে তাও নয়, বেশির ভাগ দেবতাদের উদ্দেশ্যে স্তুতি করছে। পুরাণে এসে দেখা যাবে সেখানে শুধু ভগবানেরই স্তুতি করা হচ্ছে।

তার সাথে আমরা যে স্থুল জগৎ দেখছি, এর বাইরে একটা সূক্ষ্ম জগৎ আছে। উপনিষদও বলছেন, ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ তার উপরে মহঃ, জনঃ, তপঃ আর তার উপরে সত্যলোক, সত্যলোক মানে শেষ লোক। সত্যলোকের পরে কি আছে কেউ জানে না। বিজ্ঞানীরা বলছেন বিগ ব্যাঙের পরে এর একটা লিমিট আছে। তাহলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সীমিত? পদার্থ বিজ্ঞানীদের প্রায়ই মজা করে জিজ্ঞেস করা হয়, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যে সীমা, সেখানে যদি কেউ দাঁড়ায় তাহলে ওখানে সে কি দেখবে? স্পেস যেটা আছে সেটা সীমিত, স্পেস যদি সীমিত হয় তাহলে ওই স্পেস কিসে সীমিত আছে? ওটা কি তাহলে মেটা-স্পেস? বিজ্ঞানীরা তখন বলেন, তা নয়, আমাদের যে গাণিতিক হিসাব আছে ওখানে এসে সব হিসাব থেমে যায়। তাই এরপর আর কোন উত্তর দেওয়া যায় না। এই কথাই তো আমাদের ঋষিরা হাজার হাজার বছর আগে থেকে বলে আসছেন, একটা অবস্থার পর আর প্রশ্ন করা যায় না। স্বামীজী ইডি স্টার্ডিকে চিঠিতে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলছেন, আপনি নিজেকে কি দেখছেন। আপনি দেখছেন আপনি এই শরীর, মরে গেলে এই শরীরের কি হবে? পুড়িয়ে দিলে ছাই হয়ে যাবে, সব খেলা শেষ। যদি আপনি নিজেকে জীবাত্মা রূপে দেখেন, আমার ভেতরে এক দিব্য আত্মা আছেন, যাঁর নাশ নেই। শরীরটা তো পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া হয়েছে, তাহলে এখন এই আত্মা কোথায় যাবেন? সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্ম স্তরে চলে যাবেন। আর যিনি নিজেকে শুদ্ধ আত্মা রূপে জানেন, যাঁর জন্ম নেই মৃত্যু নেই, মৃত্যুর পর তাঁর শুদ্ধ আত্মা কোথায় যাবে? কোথায় আর যাবেন! তিনি তো সর্বব্যাপী, তাই কোথাও যাবেন না, সত্যলোকেও যাবে না, রামকৃষ্ণলোকেও যাবে না। গীতায় ভগবান এই কথাই বলছেন *ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিত*, আত্মার জন্মও নেই মৃত্যুও নেই। কার নেই? পূর্ণ আত্মার, যিনি নিজেকে অখণ্ড সচ্চিদানন্দের সাথে এক দেখছেন। আর যিনি নিজেকে জীবাত্মা রূপে দেখছেন তাঁর জন্য *জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ*, তিনি জন্মাবেন মরবেন আবার জন্ম নেবেন আবার মরবেন। আপনি আগে বলছেন তাঁর জন্ম নেই মৃত্যু নেই, আবার বলছেন জন্মাবে মরবে, কি করে সম্ভব! আচার্য শঙ্কর পরিষ্কার বলছেন, ভগবান অর্জুনকে বলছেন তোমার তো নিজের কিছু একটা চিন্তা ভাবনা থাকবে, হয় তুমি নিজেকে শরীর মনে কর, নয়তো নিজেকে জীবাত্মা মনে কর আর তা নাহলে নিজেকে শুদ্ধ আত্মা মনে কর। নিজেকে শরীর মনে করলে জন্মেছ মরে গেলে এরপর ভাবাভাবির কি আছে, তুমি তোমার কর্ম করে যাও! যদি তুমি নিজেকে জীবাত্মা মনে কর, তাহলে মরে গেলে আবার তুমি জন্মাবে তাই চিন্তার কি আছে। আর শুদ্ধ আত্মা যদি মনে কর তাহলে তোমার জন্মও নেই, মৃত্যুও নেই, তাই তোমার এত ভাবনার কি আছে! কোন অবস্থাতেই নিজের ধর্ম ত্যাগ করা চলে না। নিজেকে যদি জীবাত্মা মনে করেন তাহলে আপনি যেমন কর্ম করেছেন সেই অনুসারে আপনি হয় পিতৃলোকে যাবেন নয়তো দেবলোকে যাবেন, আর গভীর ভাবে ও নিষ্ঠার সাথে ঠাকুরের সাধনা করে থাকেন তাহলে রামকৃষ্ণলোকে যাবেন, শিবের উপাসনা করলে শিবলোকে যাবেন। স্বামীজী বলছেন, মুক্তিপথগামী আত্মা এই জিনিসগুলিকে সত্যিকারের অনুভব করেন, কিন্তু অদ্বৈতের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে যদি দেখা হয় তখন তাঁর কাছে এই জিনিসগুলো দৃশ্যের মত ভেসে যেতে থাকে। সেখানে সে কখন নিজেকে আমি শরীর দেখছে, সেই শরীরের নাশ হয়ে গেল, আবার দেখছে জীবাত্মা, এই মারা গেলাম, তারপর এই বাড়ি সেই বাড়িতে, এই যোনি সেই যোনিতে জন্ম নিচ্ছি, আবার দেখছে পিতৃলোকে গেল, দেবলোকে গেল, খুব তপস্যা থাকলে দেখে সত্যলোকে বা বিষ্ণুলোকে গেল। কিন্তু যেই তাঁর পূর্ণজ্ঞান হয়ে যাবে তখন দেখেন যে, আরে আরে! এগুলো

তো কিছুই হচ্ছিল না, সবই তো আমি কল্পনা করছিলাম। এটাই অদ্বৈত। সেইজন্য রামকৃষ্ণলোক, বিষ্ণুলোক, শিবলোক মানলে সত্য, না মানলে সত্য নয়। আমাদের ক্ষেত্রে আমাদের এই মন বাচ খেলা করতে থাকে, কখন এই শরীরে মন থাকে আবার কখন বলে আমি জীবাত্মা, আমি এতেই অবস্থিত, আবার কিছু দিন ধরে অনেক প্রবচন শুনে, শাস্ত্র পড়ে, জপ-ধ্যান করে নিজেকে কখন পূর্ণব্রহ্ম রূপেও মনে করে। কিন্তু নেউলের লেজে ইট বাঁধা আছে, বেশিক্ষণ পূর্ণব্রহ্মে থাকতে পারে না। দেহাত্মা আর জীবাত্মা এই দুটোর মধ্যেই বেশির ভাগ মানুষের বাচ খেলা চলে। কিন্তু যিনি ইষ্টের চিন্তায় নিমগ্ন, ইষ্ট যদি শিব হন মৃত্যুর পর তিনি শিবলোকেই যাবেন, যিনি ঠাকুরের ধ্যানে নিমগ্ন তিনি মৃত্যুর পর রামকৃষ্ণলোকেই যাবেন। মৃত্যুর পরেই যে শিবলোকে যাবে তাও না, মৃত্যুর আগেও সে যেখানেই থাকুন না কেন মন তার শিবলোকেই আছে। শিবলোকে কে যাচ্ছেন? যিনি এই বিশ্বকে পুরো শিবময় দেখছেন। এই শরীরেই যদি সমগ্র জগতকে শিবময় না দেখে থাকেন তাহলে তিনি শিবলোকে যাবেন না। ঠাকুরের ভক্ত যদি রামকৃষ্ণময় জগৎ না দেখে, মৃত্যুর পর সে কিন্তু রামকৃষ্ণলোকে যাবে না। রামভক্ত কবি তুলসীদাস বলছেন সিয়ারামময় সব জগ জানু, সমস্ত জগতকে রাম আর সীতা রূপেই দেখছি। মৃত্যুর পর তুলসীদাস শ্রীরামলোকেই যাবেন। কারণ এখানেই তিনি শ্রীরামলোককে দেখছেন। ঈশ্বরের বাইরে কিছু নেই, এটাই রামকৃষ্ণলোক বা শিবলোক। যদি জীবাত্মা সত্য হয় তাহলে মৃত্যুর পর তাকে তো কোথাও না কোথাও গিয়ে থাকতে হবে। জীবাত্মা কি? যাঁর বোধ মৃত্যুর পরেও থেকে যায়, এই দেহের বোধ নেই কিন্তু সূক্ষ্ম দেহের বোধ আছে। ওই সূক্ষ্ম দেহে এটাই বোধ হবে যে, আমি সাক্ষাৎ ঠাকুরের সান্নিধ্যে আছি। ভক্তিশাস্ত্রে, বিশেষ করে ভাগবতাদি গ্রন্থে চার রকম মুক্তির কথা তো বলেই দিচ্ছে – সাযুজ্য, সামীপ্য, সারূপ্য আর সালোক্য। এখানে সাযুজ্য হবে না, কারণ সাযুজ্য মানে ঠাকুরের সাথে এক হয়ে যাওয়া। সামীপ্য, ঠাকুরের কাছে কাছে থাকবে। সালোক্য, ঠাকুর যেই লোকে আছেন সেই লোকে থাকবে আর সারূপ্য, ঠাকুরের রূপ পেয়ে গেছে। কিন্তু পূর্ণ জ্ঞান না হলে আবার ওখান থেকে নেমে আসতে হবে।

বেদের আচার পদ্ধতি ও বিধি-নিষেধ

আজ পর্যন্ত হিন্দু ধর্মে যত পূজা পদ্ধতি, আচার আচরণ, রীতি-নীতি যা কিছু আছে বা ইদানিং যা কিছু হচ্ছে তার সবটাই বেদ থেকে এসেছে। কোন হিন্দুই বেদের বাইরে কক্ষণ যেতে পারবে না। বেদে আমরা দু ধরণের আচার পাই – একটা গৃহ্য আরেকটি শ্রৌত। এগুলো থেকেই পরের দিকে এক শ্রেণীর সাহিত্যের জন্ম নিয়েছিল যার নাম হল কল্পসূত্র আর গৃহ্যসূত্র। গৃহ্যসূত্রে যে সব পূজার আচার বিধির কথা বলা আছে তাতে পুরোহিতের প্রয়োজন হত না। আর শ্রৌত আচার ছিল সামাজিক অনুষ্ঠান, এখানে পুরোহিতের দরকার পড়ত। যেমন যাদের বাড়িতে নিত্যপূজাদি হয়, যে পরিবারে কোন বিগ্রহ আছে, সেখানে বাড়ির লোকেরাই পূজা করে নিতে পারে। কিন্তু যখন দুর্গাপূজা, কালীপূজা করা হয় তখন পুরোহিতের দরকার পড়বে। বাড়ির লোকেরাও যদি দুর্গাপূজা বা কালীপূজা করে তখন তাকে বাইরের পুরোহিতকে দিয়েই পূজা করাতে হয়।

এরপর আসছে খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় – বিধি-নিষেধ। যে কোন ধর্মকে তার অনুগামীদের বলে দিতে হয় সে কি করবে আর কি করবে না। প্রত্যেক ধর্মেই বিধি-নিষেধ একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। বেদেও অনেক বিধি-নিষধের উল্লেখ করা হয়েছে। বিধি মানে যেটা সবাইকে করতে হবে আর নিষেধ হল যে জিনিসগুলি করা যাবে না। যেমন কারুর ক্ষতি করবে না, কাউকে হত্যা করবে না – এগুলো নিষেধাত্মক। আবার যখন বলবে সকালে উঠে স্নান করবে, এটা হয়ে গেল বিধি। বেদে নিষেধাত্মক কর্ম আবার দুই রকমের – কতকগুলি সাধারণ বুদ্ধিতেই করা যায় না, যেমন যে পশু বা পাখিকে বিষযুক্ত তীর দ্বারা বধ করা হয়েছে সেই পশু বা পাখির মাংস খাওয়া যাবে না। আবার কিছু বড় বড় নিষেধ আছে। কিন্তু বিধিই সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ। বিধি আবার চার প্রকার – ১) নিত্যকর্ম, ২) নৈমিত্তককর্ম, ৩) কাম্যকর্ম এবং ৪) প্রায়শ্চিত্ত কর্ম।

নিত্যকর্ম হল, যে কর্ম সবাইকে প্রত্যেক দিন করতে হবে – যেমন পূজা করা, জপ করা ইত্যাদি। নিত্যকর্ম বাধ্যতামূলক। গীতা আর উপনিষদে নিত্যকর্মের একটা বিরাট ভূমিকা আছে। গীতা উপনিষদ বলছে যারা সাধক, এখনও যারা সিদ্ধি পাননি, তারা নিত্যকর্ম যেন অবশ্যই করে। গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে ভগবান

বলছেন – *নিয়তং কর্ম, নিয়তং কর্ম* মানে নিত্য কর্ম। যারা এই নিত্য কর্ম করবে না, তারা কখনই ধার্মিক হতে পারবে না। বিভিন্ন সম্প্রদায়ে নিত্যকর্ম বিভিন্ন রকমের হবে, বৈষ্ণবদের নিত্যকর্ম এক রকম হবে, আবার শাক্ত পরিবারের নিত্যকর্ম আরেক রকম হবে। নিত্যকর্ম একমাত্র করেন না যিনি পরমহংস ও পরিব্রাজক। যেমন ঠাকুর, তিনি কোন ধরণের নিত্যকর্ম করবেন না। দক্ষিণেশ্বরে মাস্টারমশাই প্রথম এসেছেন। সন্ধ্যেবেলা ঠাকুরের ভেজানো দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ভাবছেন ভেতরে যাবেন কিনা, বৃন্দে ঝি বলছে ভেতরে গিয়ে বসতে। কিন্তু মাস্টার ইতঃস্তত করছেন। আস্তে করে ভেতরে ঢুকে দেখেন ঠাকুর খাটের উপর একাকি বসে আছেন। কিছুক্ষণ পরে মাস্টারমশাই বলছেন – আপনি এখন সন্ধ্যা করবেন তবে আমরা এখন আসি। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন – না – সন্ধ্যা – না এমন কিছু নয়। কিন্তু তার আগেই ঠাকুর এক ঘরের লোকের সামনে বলছিলেন – যখন একবার হরি বা রামনাম করলে শরীর রোমাঞ্চ হয়, অশ্রুপাত হয় – তখন নিশ্চয়ই জেনো সন্ধ্যাদি কর্ম আর করতে হবে না। তখন কর্মত্যাগের অধিকার হয়েছে – কর্ম আপন-আপনি ত্যাগ হয়ে যাচ্ছে, তখন কেবল একবার রামনাম কি হরিনাম কিংবা শুদ্ধ ওঁকার জপলেই হল। সন্ধ্যা গায়ত্রীতে লয় হয় আর গায়ত্রী ওঁকারে লয় হয়।

যাঁরা পরমহংস তাঁরা নিত্যকর্মের উর্দ্ধে চলে যান। নৈমিত্তিক কর্ম হল বিশেষ কোন দিনে কিছু কর্ম করতে হয়, বিশেষ দিন বলতে যেমন সন্তান হয়েছে, এখন সন্তানের অন্নপ্রাশন দিতে হবে, তার উপনয়ন দিতে হবে। অন্নপ্রাশন বা উপনয়ন যদি না করা হয় তাহলে সেটা তখন পাপ হবে। এই কর্মগুলিকে বলা হয় নৈমিত্তিক কর্ম। বাবা কিংবা মা মারা গেছেন, এখন শ্রাদ্ধ কর্ম করতে হবে, এটা হল নৈমিত্তিক কর্ম। অথবা বাড়িতে দুর্গা পূজা করছে কিংবা কালী পূজা করা হচ্ছে তখন সেটাও নৈমিত্তিক কর্ম। নৈত্তিমিক কর্ম আরেক ভাবেও হয়, আমি মনে মনে ঠিক করে নিলাম যে আমার ছেলের যদি চাকরি হয়ে যায় বা আমার ছেলে যদি ভালো ভাবে পাশ করে তাহলে আমি বাড়িতে সত্যনারায়ণ পূজা বা অন্য কোন পূজা দেব, তখনও সেটা নৈমিত্তিক কর্ম হয়ে যাবে। নৈমিত্তিক শব্দের মধ্যেই এর অর্থ আছে, একটা নিমিত্ত আছে, একটা কারণের জন্য পূজা হচ্ছে আর রোজ না করে একটা বিশেষ দিনে এই নৈমিত্তিক কর্মাদি সম্পন্ন করা যেতে পারে। ঠাকুর যে গলিত হস্ত, মানে তিনি তর্পণ করতে গিয়ে তাঁর হাতের ফাঁক দিয়ে জল গলে যাচ্ছে, এটা নৈমিত্তিক কর্ম। পরমহংস বিধি নিষেধের পারে, তর্পণ করাটা নৈমিত্তিক কর্ম, তর্পণ করাটা নিত্য বা প্রত্যেক দিন করতে হয় না। যিনি পরমহংস তিনি নিত্য আর নৈমিত্তিক দুটো কর্মের পারে চলে যান। তিনি যদি নিত্য বা নৈমিত্তিক কর্ম করতেও চান তাহলেও পারবেন না, যেমন ঠাকুর তর্পণ করতে যাচ্ছেন কিন্তু পারছেন না, আপনা আপনি তাঁর আঙ্গুল ফাঁক হয়ে জল গলে যাচ্ছে। আবার যারা আধ্যাত্মিক পথের সাধক, তাদের জন্য এই নৈমিত্তিক কর্ম শাস্ত্রে কঠোর ভাবে নিষেধ করা আছে। নিত্যকর্ম সবাই করবে একমাত্র পরমহংস বাদে। নৈমিত্তিক কর্ম পরমহংস তো করবেনই না কিন্তু যারা সাধক তারাও করবে না। এখানে সাধক মানে যারা উচ্চ সাধক, কর্মমার্গী নন, যেমন সন্ন্যাসী তাঁরাও নৈমিত্তিক কর্ম করবেন না।

তৃতীয় হল কাম্যকর্ম, একটা কিছু কামনা করে যখন কোন কর্ম করা হয়। যেমন কোন শত্রুর নাশ করতে হবে, তখন কোন ব্রাহ্মণকে ধরে কোন যজ্ঞ করছে তখন সেটা কাম্য কর্মের মধ্যে পড়ে যাবে। যে কোন আধ্যাত্মিক সাধক, উচ্চকোটিই হোক বা আধ্যাত্মিক সাধনার প্রথম অবস্থায় আছে, কোন ভাবেই কাম্য কর্ম করতে পারবে না। সাধারণ মানুষের মন যাতে ধর্ম পথে আসে তাদের বলা হয় তুমি যদি এই এই চাও তাহলে এই এই ভাবে নিষ্ঠা পূর্বক এই এই কর্ম কর। কেউ চাকরি খুঁজছে কিন্তু পাচ্ছে না, কারুর মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না, বাড়িতে অশান্তি লেগেই আছে তারা যদি বাড়িতে এই এই যজ্ঞ করে তাহলে সেই ব্যাপারে ফল পেয়ে যাবে। কিন্তু যারা আধ্যাত্মিক সাধক তারা এগুলো করবে না। তাদের সংসারেও তো দুঃখ-কষ্ট আসবে, কিন্তু তারা জীবন ধারণের ক্ষেত্রে যা কিছু আসছে, ভালো মন্দ যাই আসুক, তাতেই সন্তুষ্ট থাকবে।

চতুর্থ প্রায়শ্চিত্ত কর্ম। পরমহংস ছাড়া প্রায়শ্চিত্ত কর্ম সবাইকেই করতে হবে। আমরা সবাই সব সময় জান্তায় বা অজান্তায় অনেক ভুল কাজ করে ফেলি, অজ্ঞানত অনেক দোষ করে ফেলি, জানিই না যে এটা দোষের। এই সব কর্মের কর্মফল থেকে বাঁচার জন্য তার সাথে কিছু পূণ্য অর্জন করার জন্য প্রায়শ্চিত্ত কর্মের

কথা বলা হয়। এত লোক যে তীর্থে যাচ্ছে, কুম্ভস্নানে যাচ্ছে এগুলোর পশ্চাতে এই ধারণাটাই কাজ করে। হরিদ্বারে যে কুম্ভস্নান চলে, হরিদ্বার খুবই ছোট জায়গা যেখানে মহারাজদেরই স্নান করে বেরিয়ে আসতে সাত-আট ঘন্টা লেগে যায়, সাধারণ মানুষের আরও কত সময় লাগবে। এই যে দীর্ঘকাল লাইনে কষ্ট করে দাঁড়িয়ে থেকে স্নান করছে এটাই একটা বিরাট তপস্যা হয়ে যাচ্ছে। এই তপস্যা কেন করা হচ্ছে? একটা বলে যে এই জন্মে বা আগের আগের জন্মে অজ্ঞানবশতঃ যে পাপ কাজ করা হয়েছে, এই তপস্যার ফলে ঐ পাপগুলো ধুয়ে গেল। আর পাপ যদি না থাকে তাহলে এই তপস্যাটাই পূণ্য হয়ে গেল। বেদের এই ধারণাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ষড়দর্শনের পূর্বমীমাংসকরা অর্থাৎ কর্মকাণ্ডীরা মনে করে বেদের একমাত্র উদ্দেশ্য বিধি-নিষেধ জীবনে প্রতি ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা। দ্বিতীয়তঃ পূর্বমীমাংসকরা বলে বেদে যত মন্ত্র আছে সবই কোন না কোন ভাবে বিধি-নিষেধের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে আছে। যেমন যদি বলা হয় এই বোতলের জল এখানে কেন রাখা হয়েছে, নিশ্চয়ই স্নান করার জন্য রাখা হয়নি, জল পান করার জন্যই রাখা হয়েছে। তাহলে এই জল দিয়ে আমি কি স্নান করতে পারি? কেন স্নান করা যাবে না, নিশ্চয়ই যাবে। এখন বেদ কেন, বেদের উদ্দেশ্য কি, বেদের উপযোগিতাটা কি? এই জিনিসগুলিকে যখন ব্যাখ্যা করা হয় তখন বেদের যারা সব থেকে বড় পণ্ডিত, পূর্বমীমাংসকরা বলে বেদের প্রধান উদ্দেশ্য এই যে চারটে বিধি-নিষেধের কথা বলা হল, এই বিধি-নিষেধকে ঠিক করা, আর বেদের মন্ত্রগুলি কোন কোন বিধি-নিষেধে প্রয়োগ করা হবে, সেটাকে ঠিক করে দেওয়া। কিন্তু বেদান্তীরা বেদ সম্বন্ধে পূর্বমীমাংসকদের এই ধারণাকে উপেক্ষা করেন। বেদান্তীরা বলেন বেদে যে নিত্যকর্মের কথা বলা আছে সেগুলো আমরা অনুশীলন করব, নৈমিত্তিক কর্ম যারা সাধারণ গৃহস্থ তারাই করতে পারে, কাম্য কর্ম আমরা কোন অবস্থাতেই করব না। আর নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম যেটা করবে সেটাও অনাসক্ত ভাবে করবে, কোন উদ্দেশ্য থাকবে না। একদিকে বলা হচ্ছে অনাসক্ত ভাবে কর্ম করতে, তোমার কোন চাহিদা থাকবে না, আবার অন্য দিকে কাম্য কর্ম করছি সেখানে কোন চাহিদা থাকবে না, সেটাতো হতে পারেনা। কাম্য কর্ম করা আর অনাসক্ত হয়ে কর্ম করা দুটোই পরস্পর বিরোধী। সেইজন্য প্রত্যেক আধ্যাত্মিক সাধকের জন্য কাম্য কর্ম নিষিদ্ধ। কিন্তু পূর্বমীমাংসকদের কাছে কাম্য কর্ম বাধ্যতামূলক, তাদের কাছে বেদের সামগ্রিক উদ্দেশ্যই হল কাম্য কর্ম। কাম্য কর্মের মধ্যে পড়ছে যেমন পুত্রেষ্টি যজ্ঞ, সন্তান চাই। এখানেই বেদান্তী বলবে সন্তান যদি হবার থাকে হবে, যদি না হওয়ার থাকে তাহলে হবে না, কিন্তু কামনা করবে না। যদি সন্তান হয়ে যায় তাহলে সেই সন্তানের প্রতি তোমার কর্তব্য পালন করে তাকে মানুষ কর। তোমার সামনে যে কর্তব্য এসে গেছে আগে সেটা সম্পন্ন কর, নতুন করে কর্তব্য তৈরী করো না। রাজসূয় যজ্ঞ, আমি রাজা হয়ে থাকব, অশ্বমেধ যজ্ঞ, মৃত্যুর পর আমি স্বর্গের দেবতা হব – এই ধরণের কামনা বেদান্তীদের মতে কখনই করা উচিৎ নয়।

শেষ পর্যন্ত ভারতে এই দুই জনই থেকে গেল। পূর্বমীমাংসকদের কিছু কিছু কর্ম থেকে গেল, বিশেষ করে প্রায়শ্চিত্ত কর্মাদি আর বেদান্ত যেটাতে জোর দিয়েছিল যে কাম্য কর্মকে উৎখাত করতে, সেই কর্মগুলি আবার বন্ধ হয়ে গেল। সেইজন্য এখন আর রাজসূয় যজ্ঞ, অশ্বমেধ যজ্ঞ, স্বর্গারোহণাদি যজ্ঞ ইত্যাদি হাজার রকমের যজ্ঞ কাউকে আর করতে দেখা যায় না। কিন্তু কেউ যদি করতে চায় করতে পারে, কেননা এখনও এগুলোর নিয়ম-কানুন লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। যার জন্য কেরালাতে এখনও দেখা যায় সেখানে কিছু কিছু জায়গায় কেউ কেউ এগুলো করছে।

বেদের নৈতিকতা

এরপরে আসছে বেদের নৈতিকতা। বেদের নৈতিকতাকে হল, যেমন একটা বড় জিনিস আছে তার মধ্য থেকে একটা ছোট জিনিসকে নিয়ে আসা হয়েছে। বেদে সব থেকে উচ্চতম নৈতিকতাকে ঋতম্ এই শব্দ দ্বারা উল্লেখ করা হয়েছে। ঋতমের একটা ছোট অংশ হল নৈতিক আচরণের বিধি বা moral code। গোটা ব্রহ্মাণ্ড একটা সুসংবদ্ধ নিয়মের মধ্য দিয়ে চলছে, পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করছে, চাঁদ পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে, আবহাওয়ার পরিবর্তন হচ্ছে, সময়ে গাছপালা ফুল ফল দিচ্ছে, ঘাস হচ্ছে, গরু সেই ঘাস খাচ্ছে, দুধ দিচ্ছে, সব কিছুর প্রেরণা হল ঋতম্। যে নিয়মে জগৎ চলছে আর যে নিয়ম মানবিক আচরণ বিধিকে ঠিক মত চালাচ্ছে সবই ঋতমের জন্য। পারস্পরিক সম্পর্ককে সুসংহত করতে যে আচরণ বিধিকে

সবাইকে অনুসরণ করতে হচ্ছে, আর যে আচরণ বিধিগুলি ঋতম্ থেকে সরাসরি এসেছে সেটাই সত্যিকারের নৈতিকতা। যার জন্য দেখা যায় সত্যিকারের নৈতিকতার কোন দিনই পরিবর্তন হয় না। কিন্তু যে আচরণ বিধিগুলো, সমাজের যে নিয়মগুলি ঋতমের বাইরে সেগুলো একটা সময়ের পর পাল্টে যায়। যেমন সংবিধান, ভারতীয় পেনাল কোড প্রতি দিন সংশোধন হয়েই চলেছে। এগুলোকে কখনই নৈতিকতার মাপকাঠি দিয়ে বিচার করা হয় না, এগুলো হল Legal Code। লিগাল কোড আর নৈতিকতার মধ্যে অনেক পার্থক্য। নৈতিকতা সব সময় সার্বজনীন, যেমন সত্য আর সততা ঋতমেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সেইজন্য সততাই নৈতিকতা, না বলে কারুর জিনিস নিয়ে নেওয়াটা অনৈতিকতা।

বেদ ও আত্মার ধারণা

মৃত্যুর পর যদি সব কিছু শেষ হয়ে যেত তাহলে ধর্মের আর কোন প্রয়োজন থাকত না। এটাই সব থেকে আশ্চর্য যে, আমরা অপরের মৃত্যুর কথা সব সময় ভাবি কিন্তু নিজেও যে একদিন মারা যাব কিছুতেই আমাদের মাথায় আসে না। যদি মৃত্যুতেই সব কিছুর পরিসমাপ্তি হয় তাহলে যে কোন ধর্ম, সে হিন্দুই হোক, খ্রীশ্চান হোক, ইসলাম হোক, বৌদ্ধ, কি জৈন, কি শিখ, কি জুরাথ্রীস্ট সব অর্থহীন হয়ে যাবে। যে কোন ধর্ম দাঁড়িয়ে আছে এই একটি বিশ্বাসের উপরে – জীবন কোন না কোন আকারে বা রূপে চলতেই থাকে।

এখানে এসে আমরা দুটো চিন্তাধারা পাই। একটা প্রাচ্য বা Oriental Thinking আরেকটা সেমেটিক বা পাশ্চাত্য চিন্তাধারা Occidental Thinking, মানে ভারতীয় চিন্তাধারা আর অভারতীয় চিন্তাধারা। ভারতীয় চিন্তাধারাতে মৃত্যুর পরেও জীবন চলতে থাকে। মৃত্যুর পর জীবনকে যে নীতি বহন করে চলেছে, সেটা সব সময় সমান ভাবে থাকে, সেই নীতিটা হল আত্মা, আত্মাই আবার জন্ম নিচ্ছে। সেমেটিক, মানে খ্রীশ্চান, ইসলাম, জুদাইজম্ চিন্তাধারাতে যখনই মৃত্যু হয়ে গেল সেখানেই সব কিছু শেষ হয়ে গেল। মজার ব্যাপার হল জুরাথ্রীস্টরা, যারা সেমেটিকদের থেকেও অনেকাংশে হিন্দুদের সঙ্গে মেলে, তারাও একটা জন্মকেই বিশ্বাস করে, জন্মান্তরবাদকে তারা বিশ্বাস করে না।

আমাদের আলোচ্য বিষয় বেদ, বেদ বিশ্বাস করে যে কোন প্রাণী যখন মারা যায় তখন তার জীবাত্মা সূক্ষ্ম শরীরটা নিয়ে স্থূল শরীর থেকে বেরিয়ে আসে, আর সে যেমন যেমন কর্ম করেছিল সেই অনুসারে বিভিন্ন লোকে গিয়ে ভোগ করে, কর্মফলের ভোগ শেষ হয়ে যাওয়ার পর সে আবার এই পৃথিবীতে এসে জন্ম নেয়। এই আসা আর যাওয়া চলতেই থাকে। তবে মাঝে মাঝে তাদের পতনও হয়। মজার ব্যাপার হল নরক সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা মনের মধ্যে বসে আছে, বেদে কিন্তু নরকের কোন ধারণার উল্লেখ নেই। আমাদের নরকের বর্তমান ধারণাটা পরবর্তি কালে পৌরাণিক কাহিনী গুলোর মাধ্যমে আর আরও পরে ভারতে ইসলাম ও খ্রীশ্চানদের অনুপ্রবেশের পর তাদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের ফলে এসেছে। বেদের মতে আত্মা জীবাত্মা হয়ে পৃথিবীতে আছে, মৃত্যুর পর স্বর্গে গেল, আবার নেমে এল, আবার গেল। এর মধ্যে শুধু তার শরীরটাই পাল্টাচ্ছে, পৃথিবীতে একটা শরীর নিচ্ছে, স্বর্গে গিয়েও শরীর পাল্টে যাচ্ছে। এর মধ্যে সব থেকে যেটা খারাপ হবার তা হল – সে যদি কোন খারাপ কাজ করে তখন সে স্বর্গে না গিয়ে নিম্নযোনিতে জন্ম নেয়। বেদের মতে নিম্নযোনিতে জন্ম নেওয়াটা খুবই জঘন্য শাস্তি। এই চিন্তাধারাটাই আমরা গীতাতে পাই যেখানে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে একটা মত হিসাবে বলছেন – *জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ* – যার জন্ম হয়েছে তার মৃত্যু হবেই, যার মৃত্যু হয়েছে তার জন্ম হবেই। এই চিন্তাধারাটা এসেছে বেদ থেকে। অনেকে এটাকে গীতার নিজস্ব মত বলে মনে করে। কিন্তু গীতা বলছে না যে যে মরেছে তার জন্ম হবেই, এটা গীতার দর্শনই নয়। মহাভারতের সময়ে জন্ম-মৃত্যুর ব্যাপারে তিনটে মত ছিল, শ্রীকৃষ্ণ তারই একটা মত উল্লেখ করে অর্জুনকে বলছেন – যদি তোমার এই মত হয় যে, যে মারা গেছে তার জন্ম হবেই। আসলে বেদের কর্মকাণ্ডীদের এটাই মত – যে জন্ম নিয়েছে তাকে মরতেই হবে আর যে মরেছে তাকে জন্ম নিতেই হবে, চক্রাকারে এটা চলতেই থাকবে।

বেদান্ত যখন পূর্বমীমাংসকে আক্রমণ করে তখন এই মতবাদে এসেই পূর্বমীমাংস চুপসে যায়। তাদের যখন বলা হয়ে বেদেই যে অনেক জায়গায় মুক্তির কথা বলা হয়েছে সেটাকে তুমি কি বলবে? এই প্রশ্নের কোন

উত্তর তাদের কাছে নেই। বেদের ঋষিরা দেখলেন পৃথিবী আর স্বর্গ, স্বর্গ আর পৃথিবী এটাই সব কিছু নয়, এর বাইরেও একটা অস্তিত্ব আছে। সেই অস্তিত্বের কথা বলতে গিয়ে বলা হচ্ছে যে আত্মাই ব্রহ্ম। *অহং ব্রহ্মাস্মি*, *তত্ত্বমসি*, এই তত্ত্বগুলির মধ্য দিয়েই বেদ কিন্তু ইঙ্গিত করছে স্বর্গ ও পৃথিবী, জন্ম-মৃত্যুর পারেও একটা কিছু আছে যার কোন জন্ম-মৃত্যু নেই। এই চিন্তাধারা আর কোন ধর্মেই পাওয়া যাবে না। ধর্মের চিন্তাধারার মধ্যে যে বিবর্তন আসে সেটা হিন্দু ধর্মে খুব স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। খ্রীশ্চান বা ইসলাম ধর্মের কোন বিবর্তন হয়নি, প্রথমে যা ছিল এখনও তাই আছে। জুদাইজিমে অল্প একটু বিবর্তন হয়েছিল কিন্তু তারাও মোটামুটি সেই পুরনো ধ্যান-ধারণাকেই আঁকড়ে রেখেছে। বিবর্তনের দিক দিয়ে শিখধর্ম পুরো অন্ধকারেই রয়ে গেছে। বৌদ্ধ ধর্ম এক সময় evolve করেছিল কিন্তু পরে সেটাও বন্ধ হয়ে যায়। একমাত্র হিন্দু ধর্মই তার আদর্শ ও চিন্তাধারাতে evolve করেই চলেছে। হিন্দী, হিন্দু আর হিন্দুস্থানকে কোন দিনই ব্যাখ্যা করা যাবে না। তার কারণ এই তিনটেই খুবই আল্গা, স্বাধীনতার পর হিন্দু ধর্ম এখন সবার জন্য খুলে গেছে, ভারতও সবার জন্য খুলে গেছে, আর হিন্দী ভাষাও এখন সবাই ব্যবহার করছে। সবার জন্য খুলে যাওয়াতে কি হয়েছে, স্পঞ্জ যেমন জলকে শুষে নেয়, এই তিনটেই এখন স্পঞ্জের মত বিশ্বের সমস্ত রকমের ভাব, আচার, অনুষ্ঠান, ভাষাকে নিজের মধ্যে শুষে নিচ্ছে। এর ফলে সব থেকে মজার ব্যাপার হল, যারা খ্রীশ্চান তারা খ্রীশমাস কতটা পালন করছে জানা নেই কিন্তু প্রত্যেক হিন্দু এখন পালন করছে। হিন্দু ধর্মের সাথে খ্রাইস্টের কি সম্পর্ক আছে? খ্রীস্টানরা যীশুকে ভগবান মানুক আর না মানুক হিন্দুরা তাঁকে ভগবান বানিয়ে দিয়েছি। মৌলবীদের ফতোয়া আর আতঙ্কবাদীদের ভয় আছে কিন্তু যদি সুযোগ পেত হিন্দুরা এত দিনে আল্লাকে ভগবান বানিয়ে দিয়ে রীতিমত বারোয়ারী পূজা করতে শুরু করে দিত। হিন্দুদের মত সমস্ত ভাবধারকে হজম করার মত শক্তি আর কোন ধর্মের লোকেদের নেই। হিন্দী, হিন্দু আর হিন্দুস্থান এই তিনটেই পৃথিবীর যে কোন কিছুকে, সে সংস্কৃতিই হোক, ধর্মীয় প্রথা বা অনুষ্ঠানই হোক, বা পৃথিবীর যে কোন ভাষাই হোক সব হজম করে নিজের মত করে নেবে।

শঙ্করাচার্যের পর থেকে হিন্দু ধর্মে আর কোন সেই ধরণের খুব একটা বিবর্তন হয়নি, হিন্দু ধর্মে যদি বিবর্তন না হয়ে থাকে তাহলে হিন্দু ধর্ম আর ইসলাম ও খ্রীশ্চান ধর্মের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকবে না। বিবর্তনের শক্তি ও ক্ষমতার উপরেই হিন্দু ধর্মের বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তা দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু ঠাকুর আসার পর হঠাৎ করে হিন্দু ধর্মের অনেক কিছু নতুন করে খুলে গেছে। এখন আবার প্রচণ্ড ভাবে হিন্দু ধর্ম সব ধরণের ভাব হজম করতে আরম্ভ করে দিয়েছে।

বেদে আছে জন্ম হলে মৃত্যু হবে মৃত্যু হলে স্বর্গে যাবে সেখান থেকে আবার পৃথিবীতে এসে জন্মাতে হবে। বেদেরই একটি অংশ উপনিষদ আবার এই মতের বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়াল, *তত্র বেদা অবেদা ভবতি*, উপনিষদই এই কথা বলছে। একটা অবস্থা আসবে যেখানে বেদ অবেদ হয়ে যাবে, বেদের তখন আর কোন মূল্যই থাকবে না। তখন কি হবে? আত্মাই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই সব কিছু। এইই অদ্বৈত তত্ত্ব। যেখানেই দ্বৈত সেইখানেই নিয়ম-কানুন থাকবে। যদি সংহিতা আর মন্ত্রকেই একমাত্র বেদ বলে মনে করা হয় তাহলে বেদের মত হল জন্মালে মরতে হবে মরলে জন্মাতে হবে আর পৃথিবী আর স্বর্গের মধ্যে আসা-যাওয়া চলতেই থাকবে। যদি উপনিষদকেই বেদ বলে ধরা হয় তাহলে নতুন এক ভাব আমরা পাব, যে ভাব হল আত্মাই ব্রহ্ম। বর্তমান হিন্দুধর্মে এই দুটো মত ও ভাবই চলছে। এখনও সাধারণ মানুষ যখন কোন ভালো কাজ করে তখন সে বলে স্বর্গে যাবার ব্যবস্থাটা পাকা হয়ে গেল। রামকৃষ্ণ মঠের ভক্তরা যেমন বলে মরার পর রামকৃষ্ণলোকে জায়গা পাকা করা আছে। রামকৃষ্ণলোক স্বর্গেরই একটা অন্য রূপে কল্পনা। কুম্ভে যদি একটা ডুব মারতে পারি তাহলে আমার স্বর্গ গ্যারান্টি। আবার অন্য ধরণের মানুষও দেখা যায় যাদের একমাত্র লক্ষ্য মুক্তি।

এই যে বেদ বলছে শরীর থেকে শরীরে স্বর্গ থেকে পৃথিবী আবার পৃথিবী থেকে স্বর্গে আত্মা পরিভ্রমণ করে চলেছে, স্বাভাবিক ভাবেই তাহলে এমন কিছু আছে যা তাকে শরীর থেকে শরীর, পৃথিবী থেকে স্বর্গে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। সেই বস্তুটি কি? বেদ বলছে এটাই কর্ম। পরের দিকে এই কর্ম-বিধানই হিন্দু ধর্মের প্রধান কাণ্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেউ যদি প্রশ্ন করে হিন্দু ধর্মের সাথে অন্যান্য ধর্মের মৌলিক পার্থক্যটা কোথায়? তখন বলা যেতে পারে যে কর্মই হিন্দু ধর্মের সব কিছু। যদি কর্ম-বিধানকে মেনে নিতে পারে তাহলে হিন্দু ধর্মের

বাকি যা কিছু আছে সব এক লাইনে এসে দাঁড়িয়ে যাবে। কর্মফলের অনুসারেই একজন কখন মানুষ যোনিতে আবার কখন নিম্ন যোনিতে জন্ম নিচ্ছে আবার এই কর্মানুসারেই কখন স্বর্গে আবার কখন পৃথিবী বা অন্য লোকে জন্ম নিচ্ছে। একবার কর্মকে যদি কেউ অতিক্রম করে যেতে পারে তখনই তার এই জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। কর্মবাদই হিন্দু ধর্মের বিশিষ্টতা আর এই কর্মবাদই অন্যান্য ধর্ম থেকে হিন্দু ধর্মকে আলাদা করে দেয়। কর্মবাদকে যদি একবার বুঝে নিতে পারে তাহলে সে হিন্দু ধর্মের বাকি সব কিছু বুঝে নিতে পারবে। অন্য ধর্ম কর্মবাদকে মানে না।

কর্মবাদ এবং কার্য ও কারণের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। কার্য-কারণ কর্মবাদেরই একটা ছোট্ট অংশ, বাকিটা অদৃশ্য। কর্মবাদে এই বিরাট অদৃশ্য বস্তুর ভূমিকাই বেশি। কার্য-কারণে একটা কাজ করলাম তার একটা ফল পেলাম। কর্মবাদ তখন বলবে কার্য-কারণ হল সমুদ্রের গর্ভে ডুবে থাকা পাহাড়ের চূড়ার একটু অংশ যেন দেখা যাচ্ছে, পাহাড়ের বেশির ভাগটাই থাকে জলের গভীরে অদৃশ্য রূপে। সেই অদৃশ্য বস্তুটাই হল যে কর্মের পুটলি তুমি জন্ম থেকে জন্মান্তরে বহন করে চলেছ। কর্মবাদ বলবে – নরেন্দ্র মোদি বিজেপি করেন বলেই দেশের প্রধানমন্ত্রী হননি, এর আগের আগের জন্মে তিনি এমন এমন কর্ম করেছিলেন যেটা তাঁকে বাধ্য করেছে বিজেপিতে যোগ দিতে আর সেই কর্মই তাঁকে পরবর্তি কালে দেশের কর্ণধার রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এই কর্মবাদ ধীরে ধীরে বিবর্তিত হতে থাকে এবং কর্মবাদ ঋতমেরই অঙ্গ।

বেদে জিনিসগুলি এভাবে সাজান হয়েছে – বিধি-নিষেধ, ঋতমের ধারণা, আত্মার ধারণা, কর্মবাদের ধারণা, স্বর্গ-পাতালের ধারণা। সবার শেষে আসছে মুক্তির ধারণা। মুক্তি হল আগে যত ধারণার কথা বলা হল সেগুলোকে অতিক্রম করে যাওয়া, যেখানে পৃথিবী, স্বর্গ, পাতাল, কর্ম, অকর্ম, বিকর্ম, জন্ম-মৃত্যু সব কিছুকে পার করে যাচ্ছে। মুক্তি হল সেই পরম সত্তা, সচ্চিদানন্দের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া। তখন হয়ে যায় তত্ত্বমসি, তুমিই সেই ব্রহ্ম, আত্মা যখন ব্রহ্মনের সাথে এক হয়ে যায় তখনই মুক্তি হয়।

অনেকের মনে প্রশ্ন আসে, আত্মাকে আগুনে দগ্ধ করা যায় না, জলে আর্দ্র করা যায় না, আত্মা কোন খাবার খান না, তাহলে শ্রাদ্ধের সময় আত্মার উদ্দেশ্যে কেন পিণ্ড দান করা হয়। আমাদের স্থূল দেহটা রক্ত, মাংস, মজ্জা, হাড় দিয়ে তৈরী। স্থূল দেহের পেছনে রয়েছে আরেকটি সূক্ষ্ম শরীর। আবার এই সূক্ষ্ম শরীরের পেছনে রয়েছেন আত্মা। আমরা যে বলি আত্মা স্বর্গে যাচ্ছে, নরকে যাচ্ছে, আসলে এই সূক্ষ্ম শরীরটাই যায়। সূক্ষ্ম শরীরের আরেকটি নাম জীবাত্মা, আত্মা যখন জীবের ধর্মকে নিয়ে নেয় তখন তাকে জীবাত্মা বলছে। এই জীবাত্মাই আসা যাওয়া করে। খ্রীশ্চান বা ইসলামে যে স্বর্গ নরকের কথা বলা হয়, সেখানে মৃত্যুর পর যে চিরস্থায়ী ভাবে অবস্থান করছে তার সাথে এই জীবাত্মার মিল আছে, আবার পূর্বমীমাংসারা যে বলছে আত্মার মুক্তি নেই, আত্মার জন্ম ও মৃত্যু চিরন্তন, এখানেও সেই জীবাত্মারই কথা বলছে। আমাদের যত প্রকার ধর্মের কথা বলা হয় তখন এই সূক্ষ্ম শরীরকে কেন্দ্র করেই সব কিছু বলা হয়। কিন্তু আধ্যাত্মিকতা সব সময় সূক্ষ্ম শরীরে যে আত্মা রয়েছেন তাঁর দিকেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলা হয়। মানুষ যখন এই আত্মার দিকে এগিয়ে যায় তখন সে দেখতে পায় আমার মধ্যে যে আত্মা আছেন, সেই আত্মা সবার মধ্যেই রয়েছেন। তাই বলে আমার দেহ আর অপরের দেহ এক নয়। একজন পুরুষ একজন নারী। শুধু এই স্থূল শরীরটাই আলাদা নয়, সূক্ষ্ম শরীরটাও এক নয়। কিন্তু যখন আত্মার স্তরে চলে যাবে তখন দেখে আমার মধ্যে যেমনটি আছে অপরের মধ্যেও ঠিক ঐ রকমটিই আছে। এই স্তর থেকে যখন অদ্বৈত স্তরে পৌঁছে যাবে তখন দেখে স্থূল, সূক্ষ্ম, জড় বলে কিছুই নেই সবটাই সেই আত্মা, আত্মা ছাড়া আর কিছুই নেই। যখন বলছে আত্মাকে জ্বালাতে পারেনা, ভেজাতে পারেনা, অস্ত্র দিয়ে ছেদন করা যায় না, তখন তারা এই আত্মার কথাই বলছে। দ্বৈতবাদীরা যখন আত্মজ্ঞানের কথা বলে তখন তারা আসলে নিজের ভেতরে যে আত্মা আছেন অন্তত তাকে জানার চেষ্টা করে। যখন পূণ্য, পাপের কথা বলা হয় তখন সূক্ষ্ম শরীরের কথাই বলছে, পাপ-পূণ্য সূক্ষ্ম শরীরকেই প্রভাবিত করে। সূক্ষ্ম শরীরকে প্রভাবিত করলে স্থূল শরীরেরও তার প্রতিক্রিয়া হবে। যারা খুব পাপকর্ম করে তাদের শরীর এক রকম হয়ে যায় আবার যারা খুব পূণ্য কর্ম করে তাদের শরীর অন্য রকম হয়ে যায়। সূক্ষ্ম শরীর গঠিত হয় দশটি ইন্দ্রিয় আর মন নিয়ে। আমাদের এই শরীরটা একটা গাড়ীর মত, যাকে চালাচ্ছে পুরোপুরি

সূক্ষ্ম শরীর, আবার এই সূক্ষ্ম শরীরকে চেতনা দিচ্ছে আত্মা। মানুষ স্থূল দেহের থেকে মনটাকে সরিয়ে ইন্দ্রিয়ের উপরে নিয়ে আসে, ধ্যানের মাধ্যমে সত্যিই মানুষ তার সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়গুলিকে স্পষ্ট দেখতে পায়। তারপর সেখান থেকে ধীরে ধীরে সেই চৈতন্যে চলে যায়, এখানে এসেই বেশির ভাগ সাধকের সাধনা শেষ হয়ে যায়। কচিৎ কয়েকজন একশ বছরে বা হাজার বছরে দু চারজন অদ্বৈত ভূমিতে পৌঁছে যান, তখন দেখেন আত্মা ছাড়া কিছু নেই। এত দিন এগুলো যা ছিল সবই কল্পনা।

কর্মবাদ ও মুক্তির ধারণা

কর্ম ছাড়া মানুষ থাকতে পারে না, কর্ম না থাকলে সে নিজেই কর্ম তৈরী করে নেবে, তাই সাংসারিক ধর্মের প্রতি অর্থাৎ প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্মের উপর বেদে এত জোর দেওয়া হয়েছে। সংসারে কিভাবে উন্নতি লাভ করে জাগতিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করতে হয় সেই ব্যাপারে বেদে অনেক রকম যজ্ঞের কথা বলা হয়েছে। প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম বলতে আমরা বুঝি, তুমি কর্ম কর আর কর্মের ফলে যা কিছু উদ্ভব হবে, ভালো মন্দ, সব ভোগ কর। বেদে প্রথম দিকে তাই ত্যাগের দৃষ্টান্ত খুব বেশি পাওয়া যাবে না। আমার ধন-সম্পদ হোক, আমার জমি-জায়গা হোক, আমার অনেক গৃহপালিত পশু হোক, যেখানে আমি জীবন-যাপন করছি এই জীবনে এখানে যেন আমার কোন দুঃখ-কষ্ট, দারিদ্রতা না হয়, মৃত্যুর পর আমি যেন ভালো স্বর্গে যেতে পারি, এগুলোই ছিল বেদের মূল লক্ষ্য, এই দিকেই বেদে বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। স্বর্গে যাচ্ছি, সেখান থেকে আবার ফিরে এসে জন্ম নিয়ে আবার সেই একই প্রার্থনা, এভাবে বারবার আসা-যাওয়ার মধ্য থেকেই আত্মার ধারণার জন্ম নিল। এই আত্মার ধারণা যখন এসে গেল, সেখান থেকে আবার এসে গেল কর্মবাদ।

কর্মবাদ যখন এসে গেলে তখন কর্মবাদ থেকে স্বাভাবিক ভাবে কর্ম থেকে মুক্তির ধারণারও জন্ম নিল। ঋষিরা যত ধ্যানের গভীরে যেতে শুরু করলেন, সেখানে তাঁদের ধ্যানে কিছু প্রশ্ন জেগে উঠছে, যে প্রশ্নের উত্তর তাঁরা যজ্ঞ-যাগ করে পাচ্ছেন না। যজ্ঞ আমাকে সুখ দিচ্ছে, সন্তান দিচ্ছে, অর্থ-সম্পদ সবই দিচ্ছে ঠিকই কিন্তু উচ্চ ভাবনা চিন্তা থেকে যে প্রশ্ন আসছে তার উত্তর পাওয়া যাচ্ছে না। তখন ঋষিরা তাঁদের অনুসন্ধানটা ভেতরের দিকে ঘুরিয়ে দিলেন। অনুসন্ধান দুই ভাবে হয়, একটা বহির্জগতের অনুসন্ধান আরেকটি অন্তর্জগতের অনুসন্ধান্দ। আমি জগতের রহস্য জানতে চাই, জগতের রহস্যকে জানতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা কত রকমের যন্ত্রপাতি দিয়ে বাইরের দিকে অনুসন্ধান করেন। বায়োলজিতে বিজ্ঞানীরা জগতে প্রাণের রহস্যকে জানতে চাইছেন। ঋষিরাও প্রথমে বেদের যজ্ঞ করে করে ভেবেছিলেন বাইরে থেকে জগতের রহস্য উন্মোচন করতে পারবেন। তাঁরা বুঝে গিয়েছিলেন যে দেবতারা আছেন আর দেবতাদের সন্তুষ্ট করলে তার বিনিময়ে দেবতারা মানুষকে সুখ সমৃদ্ধি দিয়ে ভরিয়ে দেবেন। কিন্তু দেখলেন তাতে জীবনে প্রকৃত চিরস্থায়ী শান্তি জুটছে না। তখন ঋষিরা তাঁদের দৃষ্টিটা ঘুরিয়ে ভেতরের দিকে করে দিলেন। ভেতরের দিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেওয়ার পরেই প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম থেকে ধীরে ধীরে তাঁরা সরে এসে নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্মের দিকে চলে গেলেন। যত তাঁরা ভেতরের দিকে অনুসন্ধান করতে শুরু করলেন ততই তাঁরা বিলক্ষণ বুঝতে পারলেন যে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির ক্ষমতা খুবই সীমিত, এই ইন্দ্রিয় দিয়ে বেশি দূর এগোন যাবে না, তখন তাঁরা বুঝলেন যে বোধে বোধ করা ছাড়া কোন উপায় নেই, বোধে বোধ করার পর দেখছেন বাইরের জগতে কিছু নেই যা কিছু আছে সব ভেতরেই আছে। ভেতরের জগতে কি কি আছে সেটাই বেদান্ত বর্ণনা করছে।

বেদ আর বেদান্ত, বেদ মানে কর্মের প্রাধান্য আর বেদান্ত মানে বেদের অন্ত। বেদান্তকে দুটো দিক দিয়ে পরিভাষিত করা হয়, প্রথম পরিভাষিত করা হয়, বেদের শেষে যেটা আসে সেটাই বেদান্ত, দ্বিতীয় পরিভাষা যা কিনা বেদান্তীরা বলেন তা হল, বেদের যেখানে পরিসমাপ্তি conclusion of Veda, বেদের শেষ কথা মানে বেদান্ত। কিন্তু মীমাংসকরা বলেন, বেদের শেষে উপনিষদ, বইয়ের শেষ যেমন পরিশিষ্ট থাকে, উপনিষদ ঠিক সেই রকম বেদের পরিশিষ্ট। আচার্য শঙ্করের এটাই প্রতিভা যে তিনি মীমাসংকদেরই যুক্তিতর্ককে আধার করে দেখিয়ে দিলেন বেদের তাৎপর্য হল বেদান্ত। বেদের যে যজ্ঞাদি ছিল সেগুলোই ধীরে ধীরে বেদান্তের দিকে ঢুকে গেল। ঋষিরা দেখলেন সব কিছুর উত্তর ভেতরেই পাওয়া যাবে, বাইরে কিছু পাওয়া যাবে না। অন্তর্জগত পুরো

আলাদা একটা জগৎ। অন্তর্জগতের আস্বাদ একবার হয়ে যাওয়ার পর সেই অন্তর্জগতকে যদি পরিস্থিতির চাপে চিরদিনের জন্য ভুলে যেতে হয় আর পরে যদি অন্তর্জগতের সেই আস্বাদের কথা মনে পড়ে তখন তার কষ্ট ছাড়া কিছুই হবে না। সেইজন্য সব থেকে ভালো অন্তর্জগতের কথা ভাবাই ছেড়ে দাও, তুমি বহির্জগতকে নিয়েই থাক। বহির্জগৎ থেকে যাঁরা অন্তর্জগতে ঢুকে পড়েন তাঁদের বহির্জগতের কথা মনের মণিকোঠায় ভেসে উঠলে কোন কষ্ট হবে না, কিন্তু অন্তর্জগতের একটু আস্বাদ পাওয়ার পর বহির্জগতে আবার যদি ফিরে আসে আর তখন যদি সেই আস্বাদের কথা মনে পড়ে তখন তাঁর প্রচণ্ড কষ্ট ছাড়া আর কিছুই হবে না। জগতের যে কোন রহস্য, এ কেন এত শক্তিশালী, এর কেন এত টাকা-পয়সা হয়েছে, আপনার এত নাম-যশ কেন, যা কিছু জানতে চান, আমি কোথা থেকে এসেছি, আমি কোথায় যাব? এত কিছু রহস্যের উত্তর বাইরে কোথাও নেই, সব উত্তর ভেতরেই আছে। তাহলে সরাসরি ভেতরের দিকে ঢুকে গেলেই তো হয়। কিন্তু না, তা কখনই করতে পারবে না। কর্ম না করে কেউ কখন সরাসরি নিবৃত্তিতে যেতে পারবে না।

তাহলে বেদের গুরুত্ব কোথায় থাকল? দুদিক দিয়ে গুরুত্ব আছে। যখন বেদকে সমগ্র ভাবে নেওয়া হচ্ছে তখন প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম আর নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম দুটোই থাকছে। বেদের মন্ত্র আর ব্রাহ্মণ অংশকে যখন শুধু নেওয়া হচ্ছে তখন বুঝছি যে, জীবনে আমাকে যদি কিছু পেতে হয় তখন বেদের যজ্ঞ করলেই হবে। কিন্তু বেদের সব যজ্ঞ এখন outdated হয়ে গেছে। যজ্ঞের আনুষাঙ্গিক জিনিসই এখন আর পাওয়া যায় না, মন্ত্রের উচ্চারণও ঠিক ভাবে হয় না আর যজ্ঞের যাঁরা ব্রাহ্মণ তাঁদের মধ্যে আগেকার মত ত্যাগ তপস্যা নেই। সেইজন্য বেদের যজ্ঞগুলি ধীরে ধীরে অন্যান্য উপাসনাতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। কিন্তু কেউ যদি মনে করে আমি বেদের রীতিতেই সব কিছু পেতে চাই, তাহলে তাকে বেদের যজ্ঞেই ফিরে যেতে হবে। তবে ঠাকুরও বলছেন কলিযুগে বেদমত চলে না। সত্যযুগ ছাড়া বেদ চলবে না।

পরের দিকে দেখা যায় বেদে যে যে জিনিসগুলিকে মূলতঃ ভালো বলেছে উপনিষদ তার সব জিনিসকে সরিয়ে দিল। যেমন বেদে দেবতার স্থান খুব উঁচুতে কিন্তু উপনিষদে দেবতাদের কোন স্থান নেই, তারপর বেদে জাগতিক অভ্যুদয় মানে সাংসারিক উন্নতি, যাতে বেশি সুখ স্বাচ্ছন্দ্য হতে পারে তার দিকে নজর দিয়ে হাল্কা করে নিঃশ্রেয়ের কথা বলেছে, কিন্তু উপনিষদ সাংসারিক সুখ সুবিধাকে পুরোপুরি উড়িয়ে দিয়ে নিঃশ্রেয়সকেই জোর দিয়ে মুক্তির ধারণাকে বেশি করে সামনে নিয়ে এসেছে। বেদ যেটাতে বেশি জোর দিয়েছে উপনিষদ সেটাকে পুরো বাতিল করে দিয়ে বেদ যেটাকে হাল্কা করে বলেছে সেটাতেই অনেক জোর দিয়েছে। এই ব্যাপারটাতে দোষের কিছু নেই। পরে শঙ্করাচার্য বেদ ও উপনিষদের সব কিছুকে সমণ্বয় করে লৌকিক ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করে দিলেন।

শঙ্করাচার্য বেদে ও উপনিষদের দর্শনকে সমন্বয় করে দেখাচ্ছেন জগতে তিন ধরণের লোক আছে – এক ধরণের মানুষ আছে যারা কোন ধর্মকর্মে বিশ্বাস করেনা, এরা মনে করে আমি বেঁচে থাকব, ভালো করে সব সুখভোগ করব, দরকার পড়লে লুটেপুটে খাব, বাকী কার কি হচ্ছে তাতে আমার কিছু যায় আসে না। ধর্ম এদের জন্য নয়। আমাদের যত শাস্ত্র আছে বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, তন্ত্র, এসব কোন শাস্ত্রই এদের জন্য নয়।

দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ আছে যারা বলে – আমি ধর্ম করতে রাজী আছি কিন্তু আমার মনে এখনও প্রচুর ভোগ বাসনা রয়েছে। বেদ তখন এদের জন্য অভ্যুদয়ের কথা শোনালেন – তোমার যা যা ভোগের ইচ্ছা রয়েছে সবটাই আমরা পূরণ করে দেব, তোমার ভালো স্ত্রী চাই, পেয়ে যাবে, অর্থ চাই, পেয়ে যাবে, সন্তান চাই, সন্তান হয়ে যাবে। সব পেয়ে যাবে কিন্তু তুমি শুধু যজ্ঞ করে যাও। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে অনেকেই নানা রকমের জাগতিক সমস্যা নিয়ে আসতেন, কেউ বলছেন আমার চাকরির উন্নতি হোক, আমার একজনের প্রতি আকর্ষণ আছে। এই সব লোকদের কি ঠাকুর ধুর্ শালা বলে তাড়িয়ে দিতেন? ঠাকুর কক্ষনই তা করতেন না। একজন এসে ঠাকুরকে বলছে – আমার মনটা সব সময় আমার স্ত্রী টেনে নিচ্ছে। আবার কেউ একজন এসে বলছে – আমি কিছুতেই মদ খাওয়া থেকে সরে আসতে পারছি না। অন্য একজন এসে বলছে – আমার পুরো মনটা আমার ভাইপোর উপরেই পরে থাকে। এরা সবাই কিন্তু ঠাকুরের কথা শুনতে রাজী আছে কিন্তু তাদের মনের মধ্যে এই ব্যাপার গুলো ঘুরপাক খাচ্ছে। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে ঠাকুর প্রত্যেককে এমন একটি বীজ

মন্ত্র দিয়ে দিচ্ছেন তাতেই তার জীবনের মানচিত্র পুরো পাল্টে যাচ্ছে। যে বৃদ্ধা তার ভাইপোকে ছাড়া কিছু দেখছে না তাকে ঠাকুর বীজ মন্ত্র দিয়ে দিলেন – তোমার ভাইপোর মধ্যে তুমি গোপালকে দেখ। ঠাকুরের কথা কিনা সেই কথার ফল হতে বাধ্য। প্রথমের দিকে গোপাল আসেনা ভাইপোই থাকে কিন্তু ধীরে ধীরে মনটা সেই ভাইপো থেকে সরে আসতে থাকে, তারপর একটা সময় আসবে ভাইপো চলে যাবে কিন্তু গোপাল থেকে যাবে। বেদেরও ঠিক এই উদ্দেশ্য। যার খুব ভোগের ইচ্ছা আছে বেদ তাকে বলে দিল এই এই যজ্ঞ কর। তারপর সে লাগিয়ে দিল বারো বছরের এক যজ্ঞ। যখন যজ্ঞ শুরু হবে তখন তাতে এত বেশি যজ্ঞ কর্মের মধ্যে ডুবে যাবে ভোগ করার সময়ই পাবে না। তাছাড়া যজ্ঞ চলাকালীন কতকগুলি বিধি-নিষেধ থাকার জন্য জীবনটা খুব নিয়ন্ত্রিত হওয়ার ফলে তার দৈনন্দিন জীবনচর্চাতে সংযমের অভ্যাসটা দৃঢ় হতে থাকে। তখন তার মন অন্য দিকে যাবে না। কিছু দিন পরে দেখা যায় তার মন পুরোপুরি ধর্মের দিকে চলে গেছে। এটাই ছিল বেদের উদ্দেশ্য, যে করেই হোক লোকের মনকে একটা উচ্চ চিন্তার দিকে নিয়ে আসা, বাকি জিনিসটা সে নিজেই বুঝে নেবে। উচ্চ চিন্তা করার ফলে মন খুব শক্তিশালী হয়ে ওঠে। একটা অবস্থার পরে মনই হয়ে যায় গুরু। মনই বলে দেবে আমাদের কি করতে হবে কি করতে হবে না।

তৃতীয় ধরণের লোক হল তারা বেদের সব রকম যজ্ঞ, ধর্ম-কর্ম, বিধি-নিষেধ পার করে একমাত্র ব্রহ্মের চিন্তা করে মুক্তির দিকে এগিয়ে যায়। বেদে মুক্তির কথা একটা সময় থেকে আসতে শুরু হয় কিন্তু সেটাই পরে ধীরে ধীরে উপনিষদের প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। এটাই বেদের মূল দর্শন, যাকে শঙ্করাচার্য খুব সুন্দর সমন্বয় করে বলছেন অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়।

সৃষ্টির ব্যাপারে বেদের দুটি মত

সৃষ্টির কথা বলতে গিয়ে নাসদীয়সূক্তম্ ও পুরুষসূক্তম্ এই দুটো দর্শনকে বেদ নিয়ে এসেছে, দুটোর মধ্যে নাসদীয়সূক্তম্ নৈর্ব্যক্তিক সৃষ্টির বর্ণনা করে আর পুরুষসূক্তম্ হল ভগবানের থেকে সব সৃষ্টি হচ্ছে। নাসদীয়সূক্তমে প্রকৃতিই সব সৃষ্টি করছে, পুরুষসূক্তম্ বলছে ভগবানই সৃষ্টি করছেন। এই দুটো দর্শন থেকে ভারতে আলাদা আলাদা দর্শনের জন্ম নিল। নাসদীয়সূক্তম্ থেকে জন্ম নিল কপিলের সাংখ্যদর্শন, সাংখ্য দর্শনকে নিল যোগ ও বেদান্ত। বেদান্তে আবার ভক্তিমার্গের সাধকরা পুরুষসূক্তম্‌কে গ্রহণ করল। কিন্তু পরের দিকে বেদান্তের যত ছোট ছোট বই রচিত হয়েছে সেখানে এই দুটো সূক্তম্‌কে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেখানে বলছে ভগবানরই দুটো প্রকৃতি – একটা পরা আরেকটি অপরা প্রকৃতি, অপরা প্রকৃতিতেই সৃষ্টিটা হয়। হিন্দু ধর্ম কোন কিছুকে বাতিল করে দেবে না, আমরা আগেও এক জায়গায় বলেছি যে হিন্দু ধর্ম সব সময় নিজেকে বিস্তার করে চলেছে। পুরুষসূক্তমে দেবতারা সেই ভগবান অর্থাৎ আদি পুরুষকে নিয়ে এসে বলি দিলেন। বলি দেওয়ার পর সেই পুরুষের শরীরের এক একটি অঙ্গ এক একটি বস্তুর সৃষ্টি করল। পুরুষসূক্তমের মূল অন্তর্নিহিত তত্ত্ব হল – বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ঈশ্বর বাদে কিছু নেই। নাসদীয়সূক্তম্ বলছে – *কো অদ্ধা বেদ*, আমরা বাপু জানিনা সৃষ্টি কিভাবে হয়, আর কে জানে সৃষ্টি কিভাবে হয়েছে? জড় বস্তু আছে আর শক্তিও আছে, শক্তি এই জড়ের উপরে আঘাত করে তারপরে একটা থেকে আরেকটা হতে থাকে।

শঙ্করাচার্য যে বেদান্ত দর্শন আমাদের দিয়ে গেছেন সেখানে তিনি এই দুটো সূক্তম্‌কে গীতার শ্লোককে ভিত্তি করে সমন্বয় করে দিলেন। গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন – *অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্। জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ।।(৭৫)* ভগবানেরই দুটি রূপ, একটা অপরা আরেকটি পরা। ভগবানের অপরা প্রকৃতি, যেটাকে নিকৃষ্ট প্রকৃতি বলছে সেখানেই সৃষ্টির খেলা হয়। কিভাবে হয়? নাসদীয়সূক্তমের মতে যেমন বলা হয়েছে সেইভাবে সৃষ্টি এগোতে থাকে। একটা কথাই বিভিন্ন ভাবে বলতে চাইছেন, ভগবান যিনি তিনিই সব কিছু নিজে হয়েছেন। কিন্তু ভগবান সৃষ্টির প্রক্রিয়াতে প্রত্যক্ষ ভাবে যুক্ত নন। গীতার নবম অধ্যায়ে এই তত্ত্বের বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে প্রথমে ভগবান বলছেন আমিই সব করি, তারপরে বলছেন আমিই করি কিন্তু আমি এর ভালো মন্দের কোন কিছুতেই লিপ্ত নই, আর শেষে বলছেন আমি

আদপেই কিছু করি না। পরপর তিনটে শ্লোকে তিনটি পরস্পর বিরোধী কথা বললেন। আসলে পরা প্রকৃতি আর অপরা প্রকৃতির যে ধারণা বেদে দেওয়া আছে সেটাকেই গীতায় সমন্বয় করে বলা হয়েছে।

কল্পের ব্যাপারে বেদ বলছে মানুষের গড় একশ বছর আয়ু ধরে তার একটা জীবন নিয়ে দেবতাদের একটা দিন, দেবতাদের একশ বছরে ব্রহ্মার একটা দিন হয়। ব্রহ্মার একটা দিন আর একটা রাত মিলিয়ে একটা কল্প। ব্রহ্মা যখন রাত্রে ঘুমিয়ে পড়েন তখন সৃষ্টির সব কিছু লয় হয়ে শেষ হয়ে যায়। কিন্তু ব্রহ্মা যখন আবার সকাল বেলা জেগে ওঠেন তখন সব আবার যে রকম ছিল সেইভাবে জেগে ওঠে। এই ভাবে চলতে চলতে ব্রহ্মার যখন একশ বছর হয়ে গেল তখন ব্রহ্মাও লীন হয়ে যান। ব্রহ্মার লীন হয়ে যাওয়ার পর আবার কবে, কিভাবে সৃষ্টি হবে এই ব্যাপারে কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। কিন্তু আবার সৃষ্টি হবে। তার মানে এই নয় যে ব্রহ্মা একশ বছর বেঁচে থাকার পর যখন লীন হয়ে গেলেন তারপরে সৃষ্টির প্রক্রিয়া শুরু হতে একশ বছর অপেক্ষা করে থাকতে হবে।

সৃষ্টি নিয়ে ফিজিক্সে তিনটে থিয়োরি আজ পর্যন্ত এসেছে। একটা থিয়োরি মতে ব্রহ্মাণ্ডে যা আছে এইটুকুই আছে, এর মধ্যেই যা হবার হবে আর এই রকমই হবে, এই থিয়োরির নাম Steady Stayed Theory, যেমন এই বাড়ি আছে এটাই চিরস্থায়ী হয়ে আছে, এর মধ্যেই আমি কোথাও পাখা লাগালাম, আর তাও এখান থেকে খুলে ওখানে লাগালাম, মানে বাইরে থেকে কিছু হচ্ছে না। পরে এই থিয়োরিটা সম্পূর্ণ ভুল প্রমাণিত হল। ফিজিক্সের দ্বিতীয় থিয়োরি অনেকটা জিউস্‌দের ধারণার মত, যে ধারণাকে খ্রীশ্চানরা নিল, ঈশ্বর একদিন এই জগৎ সৃষ্টি করে দিয়েছেন, তবে থেকে এই জগতটাই চলে আসছে। প্রথমের দিকে লোকেরা এই থিয়োরিকে খুব একটা বুঝত না। পরের দিকে বিজ্ঞানীরা তৃতীয় একটা থিয়োরি নিয়ে এলেন, যার মধ্যে আইনস্টাইনের মত বিজ্ঞানীরও আছেন, এই থিয়োরির নাম দিলেন বিগ্‌ব্যাঙ। এই থিয়োরির মতে একটা সময় কিছুই নেই, কিন্তু সেই কিছু নেই থেকেই সৃষ্টিটা বেরিয়ে এলো। কিন্তু পরের দিকে ফিজিক্সের বিজ্ঞানীরা গাণিতিক নিয়ম ও ফিজিক্সের বিভিন্ন তত্ত্বগুলিকে বিশ্লেষণ করতে করতে গিয়ে দেখছেন, এই কিছুই নেই সেখান থেকে সৃষ্টি বেরিয়ে এলো, এই থিয়োরিতে অনেক কিছুকে মেলানো যাচ্ছে না, নানা রকম গোলমাল বেরিয়ে আসছে। সেইজন্য বিজ্ঞানীরাও বিগব্যাঙ থিয়োরিকে পুরোপুরি মেনে নিতে পারলেন না। কিছু বছর আগে আরেকটি থিয়োরি বাজারে আসতে শুরু করেছে, এই থিয়োরির নাম দিলেন Cyclic Theory of Universe, যদিও এই থিয়োরি এখন দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কারণ যে কোন থিয়োরিকে প্রতিষ্ঠিত করার পেছনে অনেক রকমের তথ্য সংগ্রহের প্রক্রিয়া থাকে, নতুন কি কি থিয়োরি আসতে পারে সব নিয়ে আগাম ভাবনা চিন্তা করতে হয়। তাই একটা নতুন থিয়োরিকে প্রতিষ্ঠিত হতে পনের-কুড়ি বছরের মত সময় অপেক্ষা করতে হয়। তবে অনুমান করা যাচ্ছে যে এখন পর্যন্ত সৃষ্টির ব্যাপারে বিজ্ঞান যত থিয়োরি দিয়েছে তার মধ্যে এই থিয়োরিটাই শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে যাবে। এই থিয়োরির যাঁরা প্রবক্তা, এনারাও খুব বড় পদার্থ বিজ্ঞানী এবং নামকরা গণিতজ্ঞ। এই থিয়োরির বিজ্ঞানীরা একটা বই লিখেলেন On Cyclic Universe, তাতে বলছেন বিগব্যাঙ থিয়োরিতে যা বলছে ঠিকই বলা হয়েছে। কিন্তু স্টিফেন হকিংওএর the universe come out of nothing, এই থিয়োরিকে মানলেন না। বলছেন, কোন কিছুই নেই সেখান থেকে কি করে সৃষ্টি হবে! তার বদলে যে থিয়োরি এনারা দিলেন, আশ্চর্যের ব্যাপার, হিন্দুরা কয়েক হাজার বছর আগে ঠিক এই থিয়োরিই দিয়ে রেখেছেন। কিছুক্ষণ আগে আমরা বললাম মানুষের একশ বছর দেবতাদের একটা দিন, দেবতাদের একশ বছর ব্রহ্মার এক দিন, ঠিক এই জিনিসটাই অন্য ভাবে বিজ্ঞানের সূত্র দিয়ে এই থিয়োরিতে বলা হয়েছে।

বিগব্যাঙ থিয়োরিকে নিলে হিন্দুদের সৃষ্টির তত্ত্বের সঙ্গে কয়েকটি ছোট খাটো জিনিস ছাড়া বেশির ভাগ জিনিসই মিলবে না। কোন হিন্দুই, যে একটু শাস্ত্র জানে, সে কখনই স্টিফেন হকিং এর থিয়োরি আর বিগব্যাঙ থিয়োরির সাথে একমত হবে না। অভাব থেকে সৃষ্টি এই থিয়োরি হিন্দুরা কখনই মানবে না। হিন্দুরা বলবে যা আছে সেটাকেই তুমি নানান আকার ও রূপ দিতে পার, কিন্তু অভাব থেকে কিছু সৃষ্টি তুমি করতে পারবে না। অথচ খ্রীশ্চানরা, মুসলমানরা এটাকেই ধরে আছে। কারণ ওদের ওল্ড টেস্টামেন্টেই এই কথা বলছে যে creation come out of nothing, আমাদের মূল দর্শনেই তা সম্ভব নয়।

বর্তমান যে সময়ে আমরা এই ব্রহ্মাণ্ডে রয়েছি এর বয়স পনের বিলিয়ন। হিন্দুরা ব্রহ্মার একটা কল্পের যে কথা বলছে তার বয়স হয় মোটামুটি দশ বিলিয়ন বছরের কিছু বেশি। বর্তমান বিজ্ঞানীরা আজকের দিনের নানান অত্যাধুনিক প্রযুক্তি, গণিতের সাহায্যে যে হিসেব দিচ্ছে সেই হিসেবের সাথে ভারতের ঋষিরা ধ্যানের গভীরে গিয়ে বসে বসে যে হিসেব দিলেন তাদের হিসেবের সাথে এই মিলটা খুবই আশ্চর্যের। দশ আর পনেরতে ঐ বিরাট মাত্রায় গিয়ে খুব একটা বড় পার্থক্য থাকে না। ব্রহ্মার একশ বছর শেষ হয়ে যাওয়ার পর আবার কবে সৃষ্টি হবে এই ব্যাপারে বেদ বা পুরাণ নীরব, ফিজিক্সের যে নতুন থিয়োরি এসেছে তাতে বিজ্ঞানীরাও বলছেন একবার লয় হয়ে যাওয়ার পর আবার কবে সৃষ্টির কাজ শুরু হবে অনুমান করা যাবে না। পরের দিকে বিজ্ঞানীরা সৃষ্টির ব্যাপারে বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রগুলো কি বলছে অনুসন্ধান করতে শুরু করলেন। হিন্দুদের শাস্ত্রে এই থিয়োরিটা পাওয়ার পর আশ্চর্য হয়ে দেখলেন আমাদের থিয়োরি এদের সাথে মিলে যাচ্ছে। সব থেকে বড় যে মিল পাওয়া গেছে তা হল cyclic creation, যে জিনিসটা আজকে হয়েছে পরের সৃষ্টিতে ঠিক সেটাই হবে। স্বামীজী এক জায়গায় বলছেন, আমি কতবার এই কথাগুলো তোমাদের সামনে বলেছি, তোমরা কতবার এই কথা আমার কাছে শুনেছ। এখানে স্বামীজী সেই concept of cyclic universe এর কথাই বলছেন। অবাক কাণ্ড যে স্বামীজী জোর গলায় আমেরিকাতে এই কথাগুলো বলেছিলেন, কারণ আমেরিকানরা তখনকার দিনে এসব কথা কল্পনাই করতে পারত না।

খ্রীশ্চান বা জুদাইজিমদের কাছে একটা মানুষ জন্ম নেয়, কিছু কাজ করে, তারপর মরে যায়, খেলা শেষ। বাবা-মার মিলন থেকে এক সন্তানের জন্ম হল, ভগবানের ইচ্ছাতে হয়েছে ঠিক আছে, একবার হল, তারপর মরে গেল, ওখানেই সব শেষ হয়ে গেল। কিন্তু হিন্দুদের কাছে এটাই চক্রাকারে চলতে থাকে – দিন রাতে পরিবর্তিত হয়, রাত দিনে পরিবর্তিত হয়, তার মানে একটা থেকে আরেকটার পরিবর্তন হচ্ছে, কিছু একটা থেকে আরেকটা কিছু আসেছে। সেমেটিক ধর্মে বলছে – না, একবার যা হয়ে শেষ হয়ে গেল সেটা ওখানেই শেষ, আবার যেটা আসবে সেটা শূন্য থেকেই আসবে। এই দুই ধরণের মত। বেদান্তের অনেক শাখা আছে, তার মধ্যে একটা শাখা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ, এই শাখা অনেক কিছুকে নিয়েছে আবার অনেক কিছুকে ছেড়ে দিয়েছে। স্বামীজী বারবার বলেছেন – creation out of nothing is not accepted। তাই বলে হিন্দুদের কি এই মত নেই? নিশ্চয়ই আছে, একটা ছোট্ট শাখা হয়ে কোথাও পড়ে আছে। কিন্তু যেহেতু স্বামীজী creation out of nothing কে অসম্ভব বলে অস্বীকার করেছেন সেইজন্য আমাদের কাছে স্বামীজী কথাকেই বেদবাক্য বলে মানতে হবে।

অনন্তের ভাবনা

বেদের অনন্তের ভাবনা একটি খুবই উল্লেখযোগ্য ধারণা। এই ধরণের ভাবনা আমরা আর কোন ধর্ম শাস্ত্রে পাইনা। মানুষ যখন ভগবানের সঙ্গে বা কোন উচ্চ আধ্যাত্মিক সত্তার সাথে সম্পর্ক তৈরী করে, তখন সে কিভাবে সেই সম্পর্ক তৈরী করে? বন্ধুত্ব করতে গেলে দুজন পরস্পর হাতে হাত মেলায়, বিয়ের সময় বর ও কনেকে কাপড়ের সাথে বেঁধে দিয়ে বলে তোমাদের জীবনকে একসাথে বেঁধে দেওয়া হল। মানুষ ভগবানের সাথে যে ভাবে নিজেকে বেঁধে নেয় সেটাই ধর্ম। একজন ভগবানকে যে উপায়ে ধরার চেষ্টা করছে সেই উপায়টাই ধর্ম। ধর্ম সব সময় মানুষই তৈরী করে। অনেকে একাদশীর দিন উপবাস করছে, বা অন্য অন্য তিথি পার্বণে মেয়েরা উপবাস করছে, মন্দিরে যাওয়া, মন্দিরে গিয়ে প্রণাম করা, গঙ্গা স্নান করা, এগুলো সবই ধর্মীয় কাঠামো। এই ধর্মীয় কাঠামোর মধ্য দিয়ে মানুষ সব সময় ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক করতে চাইছে, তাঁকে ধরার চেষ্টা করছে। কিন্তু আধ্যাত্মিকতায় এই ধরা ধরির চেষ্টাটা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। আধ্যাত্মিকতায় মানুষ অনুভব করে যে ঈশ্বর তাঁর মধ্যেই আছেন বা সে ঈশ্বরের মধ্যেই আছে। স্বামী-স্ত্রী যখন একসাথে দীর্ঘ চল্লিশ পঞ্চাশ বছর ধরে আছে, তখন তাদের মধ্যে ঐ বোধটা আসেনা যে আমি আলাদা তুমি আলাদা, এটা তোমার ওটা আমার এই মনোভাবটা চলে যায়। প্রথমের দিকে নানা রকমের ভেদাভেদ জ্ঞান থাকে, এই শাড়িটা আমি বাপের বাড়ি থেকে এনেছি, এই শাড়িটা আমার শ্বশুড় বাড়ি থেকে দিয়েছ, এই ধরণের হিসাব-কিতাব চলে। ধর্মীয় ক্ষেত্রে প্রথমের দিকে নিজের সম্বন্ধে যে ধারণা থাকে সেই ধারণার মধ্য দিয়েই সে ঈশ্বরীয় সত্তাকে

বোঝার চেষ্টা করে। কিন্তু একেবারে অন্তিমে যখন দেখে যে ঈশ্বর আর আমি আলাদা নই, ঈশ্বরের সঙ্গে যখন একত্ব অনুভব করে তখনই প্রকৃত আধ্যাত্মিকতার জন্ম হয়। যীশু যখন জিউসদের সমালোচনা করে আক্রমণ করলেন তখন তিনি বলছেন – Your religion is of man, my religion is of my Father. সেই সময় কি অবস্থা হয়, এতদিন ধরে যা যা করে আসছিল, এত পূজো করতে হবে, এত বলি দিতে হবে, তীর্থে যেতে হবে এসব করে করে সে ঈশ্বরকে ধরার চেষ্টা করছে, কিন্তু এখানে যীশু ঈশ্বরকে ধরে রাখার আর কোন চেষ্টাই করছেন না, কারণ তিনি দেখছেন – I am in my Father and my Father is in me. ঠাকুরের জীবনেও একই জিনিস দেখতে পাই। প্রথমের দিকে ঠাকুরের সব ধরণের সাধনাই ছিল ধর্মীয় সাধনা – এই ভাবে পূজো করতে হবে, এই ভাবে মন্ত্র পড়তে হবে, এই এই করতে হবে, সবই ছিল ধর্মীয় আচার পদ্ধতি অনুসারে সাধনা। কিন্তু যেদিন তিনি মায়ের দর্শন পেলেন সেদিন থেকে তিনি সমস্ত ধরণের আচার উপাচার ত্যাগ করে দিলেন। তিনিও দেখছেন মা তাঁর মধ্যেই আর তিনিও মায়ের মধ্যে বিরাজ করে আছেন। ধর্মসাধন আর আধ্যাত্মিকতার মধ্যে এটাই পার্থক্য।

মনে করা যাক আমি এইভাবে বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ঈশ্বরকে ধরার চেষ্টা করছি, করতে করতে আমি ঈশ্বরের সাথে একত্ব অনুভব করলাম। আমার এই প্রচেষ্টা শুরু করা, মাঝপথে সাধনা করা পরে সাধনার চরমে আত্মানুভূতি বা আমার ঈশ্বর দর্শন লাভকে দেখে অন্য একজন পুরো ব্যাপারটাকে তথ্যগত ও তত্ত্বগত ভাবে সাজিয়ে একটা আকার দিলেন, এই যে এটাকে একটা আকার দেওয়া হল এটাই হয়ে গেল দর্শন। Religion is community affair, spirituality is your individual affair, philosophy is academic affair. মানে ধর্ম হল গোষ্টিগত দিক, আধ্যাত্মিকতা ব্যক্তিগত দিক আর দর্শন হল শিক্ষার দিক। মানুষ যখন কোন নিয়মকে মেনে একটা ধর্ম স্রোতের দিকে অগ্রসর হয় তখন প্রথমে তাকে দর্শনের সাহায্যেই তাদের বক্তব্যটা বুঝতে হবে। দর্শনের সাহায্যে বুঝে নিয়ে ধর্ম পথে যাত্রা শুরু করে। শেষে সে আধ্যাত্মিকতার অবস্থাতে পৌঁছায়। আধ্যাত্মিকতার দর্শন শাস্ত্র আগে বলে দিচ্ছে সাধক যখন ঐ স্তরে পৌঁছাবে তখন সে কি দেখবে? বলে দিচ্ছে *অহং ব্রহ্মাস্মি*। এই *অহং ব্রহ্মাস্মি* অবস্থাতে যাওয়ার জন্য যে যে পদ্ধতি আমি অনুসরণ করেছি সেটাই ধর্মীয় দর্শন, আর অহং ব্রহ্মাস্মির অবস্থাতে পৌঁছে আমার যা যা ধারণা হচ্ছে সেটাই আধ্যাত্মিক দর্শন।

বেদে অনন্তের ধারণা ঠিক এভাবেই এগিয়েছে। প্রথমে প্রকৃতিকে নিয়ে যাত্রা শুরু হয়। দেখছে আকাশে পুঞ্জিভূত মেঘ জমেছে, মেঘকে সব থেকে ক্ষমতাশালী মনে করছে। কেন মনে করছে? মেঘে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, মেঘ থেকে বর্ষণ হচ্ছে, সেই জলে মাটি সরস হচ্ছে, মাঠে ফসল হচ্ছে, সেই ফসল সমস্ত প্রাণী খাদ্য রূপে আহরণ করছে। সমস্ত প্রাণীর জীবন এই মেঘের উপরেই নির্ভর করে আছে। এরপর সে এই মেঘের নির্বিশেষ গুণগুলি কে নিয়ে বানিয়ে দিচ্ছে ইন্দ্র দেবতা। তারপর অনন্তের যত গুণ থাকতে পারে সব একত্রে ইন্দ্রের উপরে আরোপ করে দিচ্ছে। কিছু দূর পর্যন্ত গিয়ে দেখছে যে ব্যাপারটা ঠিক তেমন জমছে না। অনন্তের ধারণা একটা জায়গা পর্যন্ত গিয়ে যেন আটকে যাচ্ছে। তখন ইন্দ্র দেবতাকে ছেড়ে আরেক দেবতাকে সে ধরল। এবার এই দেবতার ওপরেও অনন্তের সব গুণ আরোপ করে দিল, এখানেও পরে গিয়ে দেখছে যে কোথায় যেন একটা গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। তাঁরা বুঝলেন যার একটা নাম আছে, যার একটা রূপ আছে সে কখনই অনন্ত হতে পারেনা। শঙ্করাচার্য গীতার *মচ্চিত্ত মৎপরঃ* শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলছেন – একটা ছেলে একটা মেয়েকে ভালোবাসে, ছেলেটি মেয়েটিকে বলবে তুমিই সেই দেবী, তোমার মত আর কেউ সুন্দরী নেই। এইভাবে যত রকম গুণ থাকতে পারে সব গুণ দিয়ে তাকে বিভূষিত করে দেবে। তারপর দেখে এরও রাগ হয়, এরও ক্রোধ হয়, এরও শরীর খারাপ হয়, এ তো দেবী হতে পারেনা। তখন তার মোহ ভঙ্গ হয়। এভাবেই বৈদিক দর্শনের ধর্মের আবরণগুলো খুলতে খুলতে আধ্যাত্মিকতার বিকাশ হতে লাগল। পরের দিকে *সচ্চিদানন্দেকম্*, সচ্চিদানন্দই আছেন তাছাড়া আর কিছুই নেই, এই ধারণা দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়ে এই দর্শনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। কিন্তু ওনারা প্রথমেই এখানে পৌঁছে যাননি।

ইসলাম ধর্মে যেমন প্রথমেই সোজা বলে দেয় যে 'লা ইলা ইল্লাহা' এক আল্লাই আছেন, হিন্দু ধর্মে এভাবে বলা হয়নি। মহম্মদ জিউস্ ধর্ম আর খ্রীশ্চান ধর্ম দুটোই আগে থাকতে জানতেন। কিন্তু বেদে প্রথমে প্রকৃতিকে নিয়ে তার উপরেই অনন্তের সব গুণ আরোপ করল, কিন্তু তখন দেখছে অনেক কিছু খাপ খাচ্ছে না। তখন প্রকৃতিকে ছেড়ে আরেকটাকে ধরল। এই করে করে যখন শেষে বুঝল যে এক ছাড়া আর কিছু নেই, একই বহু রূপে প্রকাশিত হচ্ছে, এই ধারণটাই নিয়ে গেল নৈর্ব্যক্তিক ব্রহ্মের ধারণাতে। এটাকেই পরে তাঁরা খুব সুন্দর ভাবে অভিব্যক্ত করছেন – *একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি*। ঐ যে অনন্ত, সেই অনন্তের উপরে একটা একটা করে মুখোশ লাগিয়ে গেছেন। একটা মুখোশ ইন্দ্র, একটা মুখোশ বরুণ। তাঁরা কিন্তু আগে জানতেন না যে এটাই অনন্ত। তার আগে তাঁরা ইন্দ্র একটা মুখোশ ধরে সেটাকে নিয়ে অনন্তের দিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন। যখন দেখলেন ইন্দ্র একটা সাকার রূপ, একে চলবে না, অনন্তে যাওয়ার আগেই হারিয়ে যাচ্ছে তখন আরেকটা মুখোশকে নিলেন, দেখলেন এটাও সাকার একেও অনন্তের সঙ্গে মেলান যাচ্ছে না। এইভাবে এক সময় তারা বুঝতে পারলেন অনন্ত সেই এক, আর এই মুখোশ গুলো সব আলাদা, সেই অবস্থাতে তাঁরা এটাই উপলব্ধি করলেন যে *একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি*। সৎ সেই এক, এখানে এই সৎ বোঝাচ্ছে সেই অনন্তকে, আর বহুধা হচ্ছে ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ ইত্যাদি দেবতারা।

ঠাকুরও বলছেন মত আর পথ, ঠাকুর বেদের বাইরে নতুন কিছু বলছেন না। সব ধরণের মত যতক্ষণ আছে, মতের অমিল থাকবেই, কিন্তু সবই সেই এক সত্যের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আমি আপনি কখনই এক হব না কিন্তু আমি আপনি সেই সচ্চিদানন্দরই প্রকাশ। মানুষ, জীব, পুরুষ হিসেবে আমি আপনি যেমন এক ঠিক তেমনি চৈতন্যস্বরূপের দিক থেকেও আমরা এক। কিন্তু ব্যক্তি সত্তা হিসেবে আমরা সবাই আলাদা আলাদা। ঠাকুর বলছেন পথ যেখানে নিয়ে যাচ্ছে সেখানে গিয়ে সবাই এক, পথ আলাদা হতেই পারে, বিভিন্ন পথ সেই একের দিকেই নিয়ে যায়। একজন সিঁড়ি দিয়ে ছাদে উঠছে, আরেকজন মই বেয়ে ছাদে উঠছে, সিঁড়ি আর মই কখনই এক হবে না। আমরা মুর্খের মত বলে বেড়াই হিন্দুও যা খ্রীশ্চানও তাই, হিন্দুও যা মুসলমানও তাই, তা কখনই নয়। সব ধর্মই আলাদা আলাদা পথ, কোন ধর্মই অন্য ধর্মের সাথে এক নয়, কিন্তু যেটা সাধারণ তা হল সব ধর্ম যে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে দিচ্ছে, সেই লক্ষ্যটা সব ধর্মের এক। যে কোন ধর্মের পথকে ঠিক ঠিক ধরে থাকলে সেই সচ্চিদানন্দে গিয়েই পৌঁছাবে। বেদে যে এত দেবতার কথা বলা হয়েছে তাই বলে ওনারা যে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে এত দেবতার জন্ম দিলেন তা নয়, তাঁরা সেই অনন্তের সন্ধানে একটা সান্ত সাকার রূপকে ধরে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে গেছেন। পরে দেখলেন সান্ত দিয়ে অনন্তকে ধরা ছোঁয়া যায় না, তখন তারা অনন্তকে দিয়েই অনন্তের সন্ধানে ডুব দিলেন। অনন্তের সন্ধানে ডুব দেওয়ার পর তাঁদের উপলব্ধি হল যে আত্মাই ব্রহ্ম।

ভয় ও পাপবোধের ধারণা

বেদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা একেশ্বরবাদ। বেদে যদিও একেশ্বরবাদের ধারণা পরের দিকে আসতে শুরু করেছিল, কিন্তু তার আগে আমাদের জানা দরকার ভয়, ভীতি আর পাপবোধ থেকে ধর্মের শুরু। অনেকে ব্যঙ্গ করে বলে, যাদের বেশি পাপ আছে তারাই ধর্ম করতে যায়। বেদেও কিন্তু এই বোধটা এসেছিল। বরুণ দেবতাকে এমন এমন সব ক্ষমতা দেওয়া ছিল, আর বরুণের নামে বলা হয় যে সব দিকে বরুণ দেবতার চর ঘুরে বেড়ায়, চররা সব ঘুরে ঘুরে খবর রাখে কে কি খারাপ কাজ, পাপ কাজ করছে। সেইজন্য বয়োঃজেষ্ঠ্যরা সবাইকে সাবধানে থাকতে বলতেন। এটা হল ভয় দেখিয়ে ধর্ম করতে বলা। কিন্তু যে কারণেই হোক ঋষিরা এই বোধটাকে খারাপ বলে একেবারেই বাতিল করে দিলেন।

অন্ধকারে হয়তো কোথাও যাচ্ছি, হঠাৎ সেই অন্ধকারে কোন কিছুর উপস্থিতি অনুভব করলাম, বুঝতে পারছি যে সে আমার দিকেই এগিয়ে আসছে। মনের মধ্যে নানান ধরণের চিন্তা উঠতে শুরু করে দিয়েছে। এসব মুহুর্তে কি কি হতে পারে এই ধরণের সম্ভবনা গুলিকে মন সরিয়ে দিতে থাকে। যেমন প্রথমে বলব এটা কুকুর নয় কারণ যে আসছে সে দু পায়ে আসছে। মস্তিষ্ক এত দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে থাকে যে সেই সময় যা যা সম্ভবনা হতে থাকে সেই সম্ভবনা গুলোকে বাতিল করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত চারটি কি পাঁচটা সম্ভবনাতে গিয়ে

দাঁড়ায়। সেই পাঁচটা থেকে তারপর একটাতে গিয়ে দাঁড়ায়। অন্তিমে যখন বাস্তবতার সম্মুখীন হয় তখন হয় বাস্তবের সাথে ঐ একটি সম্ভবনা মিলে যাতে পারে, নাও মিলতে পারে। যদি বাস্তবের সঙ্গে সম্ভবনাটা না মেলে তাহলে বুঝতে হবে যে ঐ সম্ভবনাকে আমি ঠিক বিবেচনা করিনি। এই পদ্ধতিটাই হল নেতি নেতি।

আমরা সবাই কিন্তু সারাদিন সব সময় অজান্তে নেতি নেতি অনুশীলন করে যাচ্ছি। খুবই আশ্চর্যের যে অদ্বৈত বেদান্ত যে বলছে এটা নয়, এটা নয় এটাই আমরা সারাদিন ধরে করে চলি। কিন্তু এই ব্যাপারে আমরা কখনই সচেতন নই। ছোটবেলায় অঙ্ক শেখানোর সময় বলা হত দুই যোগ দুই চার। আমরা মনে করি এটাই নিশ্চিত উত্তর, কিন্তু তা নয়। আসলে এটাই non-negativity, বাচ্চা বয়সে যখন অঙ্ক শেখানো হয় তখন বলে দুই যোগ দুই এক হবে না, দুই যোগ দুই পাঁচ হবে না, এই ভাবে নানা রকম non-negativity থেকে সরিয়ে সরিয়ে একটা জায়গায় গিয়ে দাঁড় করান হয়। আমাদের যত রকমের জ্ঞান হয়, জানা হয় সব সময় তা এই non-negativity পদ্ধতিকে অনুসরণ করেই হয়, non-negativity পদ্ধতি হল যেটা নয় সেটাকে বাতিল করে করে আসলটাকে ধরা – একটা জিনিস সামনে এসেছে, তখন তাকে প্রথমে বলবে এটা এই জিনিসটা নয়, এটা নয়, শেষে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে non-negativity সেটাকে আর বাতিল করা যায় না। শার্লক হোমস্ তার সহকারী ওয়াটসনকে একটা জায়গায় বলছেন – যখন তুমি যে জিনিসগুলো সম্ভব নয় সেই জিনিসগুলিকে বাদ দিয়ে দিয়ে যেটা থাকল সেটা যতই অসম্ভব বলে মনে হোক না কেন সেটাই একমাত্র সত্য। ফিজিক্সও ঠিক এই থিয়োরিকেই অনুসরণ করে। ফিজিক্সে প্রথমে যে থিয়োরি গুলো সম্ভব নয় সেগুলো বাদ দিয়ে যখন শেষে দেখলো তিনটে থিয়োরিতে গিয়ে দাঁড়িয়েছে তখন তারা এই তিনটে থিয়োরিকেই রেখে দেয়। পরে যখন অন্যান্য তথ্য আসতে থাকে তখন সেই তথ্যের ভিত্তিতে একটা থিয়োরি বাদ চলে যাবে। তখনও যদি দেখে কোথাও কিছু অমিল ঠেকছে তখন তারা intuition এর সাহায্য নেয়, আমার মন বলছে এটা হবে। কেমেস্ট্রি, বায়োলজিতে বেশি থিয়োরি থাকে না, এদের কয়েকটা ডাটাকে নিয়েই থিয়োরি দাঁড়িয়ে যায়, কিন্তু বিজ্ঞানের মূল যে থিয়োরিগুলি আসা যাওয়া করে সেটা ফিজিক্সের ক্ষেত্রেই করে। সেইজন্যই এর নামই হল Theoretical Physics। এরা সংশয় হলে এইভাবে এগিয়ে গিয়ে যখন কোন থিয়োরিকে ধরবে তখন তারা বলবে আমার মন বলছে এটাই হবে। কয়েক ক্ষেত্রে দেখা গেছে দুটো তিনটে থিয়োরি এসে গেছে, এই তিনটে থিয়োরিকে নিয়ে নামকরা বিজ্ঞানীরা তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে তুমুল বাগবিতণ্ডা লাগিয়ে দেবে, যেমন অদ্বৈত আর বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীর মধ্যে বিতর্ক হয়। তারপর এরা বসে থাকবে কোথাও থেকে যদি কোন ডাটা আসে। আইনস্টাইনের নিজের Theory of Relativity, যার থেকে আরেকটা নতুন থিয়োরির জন্ম নিল, তিনি নিজে সেই থিয়োরিকে বাতিল করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিলেন। অন্যান্য বিজ্ঞানীরা আইনস্টাইনের কাণ্ড দেখে হাসছেন – আপনার থিয়োরিকে ভিত্তি করে আজকে আণবিক বোমা বেরিয়ে গেছে। কিন্তু আইনস্টাইন কিছুতেই মানবেন না, শেষ পর্যন্ত দেখা গেল সেই থিয়োরি থেকে একটা নতুন কিছু আবিষ্কার হয়ে গেল, তখন আইনস্টাইনের পক্ষে সেই থিয়োরিকে মেনে নেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। তিনি নিজেও জীবনের শেষের দিকে বলেছিলেন – এটা আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল। কিন্তু তিনি যদি বেদান্তের এই নেতি নেতি মানে এটা নয়, এটা নয়, এই পদ্ধতিকে অনুসরণ করতেন, তাহলে তাঁর এই সমস্যা হতো না।

আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে এই ধরণের জিনিসই প্রতিনিয়ত হচ্ছে। একটা কোন খবর এলেই আমরাও এটা হতে পারে, এটা হতে পারে না, এই করে করে তাড়াতাড়ি একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছানই নেতিবাচক সম্ভবনাকে বাতিল করা। কার কত বড় মস্তিষ্ক এখানেই ধরা পড়ে। It is the power of brain canceling out the negative, আমাদের পূর্বজরা ঠিক এই জন্যই ভয়ের আর পাপের ধারণাকে একটা সময় নিয়ে এসেছিলেন যেখানে বলা হয়েছিল একজন মানুষ ভয় ও পাপবোধের জন্য ঈশ্বরে ভক্তি করবে। কিন্তু তারপরেই এই ধারণটা দূর করে দিলেন, ভয় আর পাপবোধ নিয়ে ভগবানকে কখনই ঠিক ঠিক ভক্তি করা যায় না। যদিও ঋগ্বেদে বরুণ দেবতার উদ্দেশ্যে মন্ত্রে বলা হচ্ছে বরুণ দেবতার চরদের ভয়ে সবাই কাঁপছে। কেন কাঁপছে? বরুণ দেবতার চরেরা সর্বত্র ছড়িয়ে সবার সব কিছুর উপর নজর রাখছে।

আমরাও মনে করি যে ভগবান সব কিছু দেখতে পান, আমরা লুকিয়ে চুরিয়ে যা কিছু খারাপ কাজ করি না কেন ভগবানের দৃষ্টি এড়িয়ে কিছুই করতে পারব না। একবার এক ভদ্রমহিলা দীক্ষার পর এক মহারাজকে জিজ্ঞেস করছেন ‘মহারাজ আমি একটা বিরাট সমস্যায় পড়েছি। আমার ঘরে ঠাকুরের ছবি টাঙানো, ওই ঘরে আমি কি করে ঠাকুরের ছবির সামনে শাড়ি পাল্টাবো’? মহারাজ তখন ভদ্রমহিলাকে বলছেন ‘কেন, আপনি যখন বাথরুমে স্নান করেন তখন কি শাড়ি পড়েই স্নান করেন? সেখানে কি ঠাকুর নেই’! ভদ্রমহিলা সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠেছেন ‘এই ব্যাপারটা তো কখন ভেবে দেখিনি’। মজার ব্যাপার হল খ্রীশ্চান নানরা কখনই স্নানের সময় বাথরুমে জামা কাপড় ছাড়েন না। নানদের মনের মধ্যে বদ্ধ হয়ে আছে যে যীশুর চোখ তাদের দিকে রয়েছে। সেইজন্য ওরা বাথরুমেও কাপড় ছাড়ে না। কিন্তু নানরা একবারও ভাবেন না যে যীশুর মনে যদি ইচ্ছে হয় তোমাকে যে কোন অবস্থাতে দেখবেন, তাহলে কি তাঁর সেই ক্ষমতা নেই যে তোমাকে যে কোন অবস্থাতে দেখে নিতে পারবেন না। এগুলো হল মুর্খামি। একটা মানুষ না খেয়ে মরে গেল, একটা মানুষ বিনা চিকিৎসায় মারা গেল, তখন বলবে সব ঠাকুরের ইচ্ছা। মদ খেয়ে মত্ত হয়ে অন্ধকার রাত্রে ফুল স্পীডে গাড়ি চালাচ্ছে, বলে ভগবানই নাকি গাড়ি চালাচ্ছেন, তারপর দুর্ঘটনায় প্রাণটা চলে গেল তখন বলবে ভগবানের ইচ্ছাতেই মরেছে। এগুলো একেবারেই ধর্মও নয় ঈশ্বরে বিশ্বাসও নয়। মানুষকে ঠকানোর জন্য এই সব উদ্ভট বোকা বোকা কথা বলতে হয়। গলা টিপে একটা শিশুকে হত্যা করছে সে হল খুনি আবার আরেকটি শিশু অযত্নে অবহেলায় মারা যাচ্ছে তখন সেটাকে নিয়ে যাচ্ছে ভগবানের ইচ্ছাতে, ভগবানকে কত বড় খুনি বানিয়ে দিচ্ছে এই ধরণের ধার্মিক লোকেরা। এটাই ধর্ম আর আধ্যাত্মিকতার তফাৎ। যখন মানুষ মানুষকে ঠকাতে চাইবে তখন ধর্ম তাকে অনেক সুযোগ সামনে যোগান দেয়। কিন্তু আধ্যাত্মিকতা মানুষকে কখনই খারাপ কর্মের সুযোগ করে দেয় না। আমি ঘরে ঠাকুরের ছবি রেখেছি, ঠাকুর এই ঘরের মধ্যে সব কিছু দেখছেন তাই এই ঘরে আমি খারাপ কিছু করব না, এই ধরণের কথা যারা বলে তারা সত্যি সত্যি বোকা, আহাম্মক কিংবা ধাপ্পাবাজ। কিন্তু শাস্ত্র যখন বলে দিচ্ছে, এটা ভুল কাজ, এটা ঠিক কাজ, শাস্ত্র যদি বলে থাকে ঠাকুরের ছবি দেখে তুমি অন্যায় কাজ বন্ধ কর, সেটাকে কেউ না করছে না, তাহলে সেই বাক্যকে অন্য জায়গাতেও মানা উচিৎ।

আমাদের বক্তব্যের উদ্দেশ্য ভগবানের নজর সব সময় সব জায়গাতে আছে। বেদের এই একটি ধারণা যখন এসেছে বরুণের চর তোমাকে লক্ষ্য রাখছে, আবার তাদেরই মনে পরে যখন অনুভব হল এই ধারণাটা ঠিক নয় তক্ষুনি ভয় এবং পাপবোধের ধারণাকে পরিত্যাগ করে দিলেন। কিন্তু পরবর্তি কালে খ্রীশ্চান ধর্ম পাপ বোধের ধারণার উপরেই বেশি জোর দিল। পাপ বোধের ধারণাকে যদি খ্রীশ্চান ধর্ম থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় তাহলে খ্রীশ্চান ধর্মের আর কোন অস্তিত্বই থাকবে না। যখন কোন পাপ খুঁজে না পায় তখন এরা সেই আদি পাপকে নিয়েই পড়ে থাকবে। প্রথম পাপ হল আদম আর ইভের পরস্পরের প্রতি যে আকর্ষণ জন্মেছিল, সেই থেকে মানবজাতির সৃষ্টি, সেই আদি পাপ এখন আমাদের কাঁধে চেপে গেছে। যীশুকে ক্রুসিফাই করার পুরো দোষটা খ্রীশ্চানরা জিউসদের উপরে চাপিয়ে দিয়ে দু হাজার বছর ধরে লক্ষ লক্ষ জিউসদের খুন করে যাচ্ছে। এদের ধর্মের প্রধান প্রবক্তারাও এই খুনের সমর্থন করে যাচ্ছে। যার জন্যে হিটলার লক্ষ লক্ষ ইহুদিদের গ্যাস চেম্বারে ঢুকিয়ে হত্যা করে দিল। কিন্তু আজকে যে মাদার মেরীকে খ্রীশ্চানরা পূজা করছে তিনি নিজেও ইহুদী ছিলেন, তারা ভুলে গেল যীশুও ইহুদি ছিলেন, তাঁর বাবা, ভাই, সবাই ছিলেন ইহুদী। কেন তারা এই কাণ্ডটা করল? এর একমাত্র কারণ পাপবোধ। ঠাকুর বলছেন – যে শালা নিজেকে পাপী পাপী মনে করে সেই পাপী হয়ে যায়। হিন্দুধর্মেও কখনই পাপবোধকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়নি, ভগবানকে ভয় থেকে পূজা করাকে কখনই হিন্দুরা সমর্থন করে না। হিন্দুদের কাছে ভগবানের সঙ্গে তার সম্পর্ক একমাত্র ভালোবাসার সম্পর্ক। উচ্চ অবস্থায় ভগবানের জন্য হৃদয়ের সর্বস্ব ভালোবাসাকে উজাড় করে দেওয়া আর উচ্চতম অবস্থায় আত্মজ্ঞান। স্বামীজী বারবার বলেছেন যে জগতে পাপ বলে কিছু নেই, যা হয়েছে সেটা ভুল হয়ে গেছে।

মহাভারতে একটা কাহিনী আছে বিশ্বামিত্র এত বড় ঋষি তিনি চণ্ডালের বাড়ি থেকে মরা কুকুরের মাংস চুরি করছেন। চণ্ডাল বলছে – কে হে তুমি, যে চণ্ডাল অস্পৃশ্য, কুকুর তার থেকে আরও অস্পৃশ্য, মরা কুকুর

তো একেবারেই অস্পৃশ্য, তার আবার পেছনের অংশকে তুমি চুরি করতে যাচ্ছ? সব দিক থেকে যেটা জঘন্যতম সেটাই তুমি চুরি করতে এসেছ? বিশ্বামিত্র যদি বলেন আমার কাছে এই শরীরই প্রধান, তাহলে যে মানুষ ক্ষুধার্ত হয়ে চুরি করে সেই মানুষকে কি আমি পাপী বলব? ধর্মের পরাকাষ্ঠায় মহাভারত এটাকে কিভাবে দেখছে? মহাভারতে পাপ বলে কখনই দেখছে না, এটা একটা ভ্রান্তি। কিসের ভ্রান্তি? লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য। আমাদের লক্ষ্যটা কি, আমরা কোন লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছি? আমি যদি বলি আমার লক্ষ্য আত্মজ্ঞান, আমি সত্যি সত্যি জানি যে আমার লক্ষ্য ঈশ্বর দর্শন। সমস্যা হল আমরা কেউই সৎ নই। গীতায় ভগবান বলছেন *চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জুন। আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতবর্ষভ।।* চার রকম মানুষ আমাকে ভজনা করে, তারা কারা কারা? আর্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু আর জ্ঞানী। তিন ধরণের মানুষের দেখা পেলেও পাওয়া যেতে পারে কিন্তু সত্যিকারের চতুর্থ ধরণের মানুষ পাওয়া যাবে না, যে চুরি করে বলতে পারে যে আমি চুরি করেছি, মিথ্যে কথা বলে বলতে পারে আমি মিথ্যে কথা বলি, চরিত্র যদি খারাপ থাকে অথচ বলতে পারে আমার চরিত্র ভালো নয়, কিন্তু আমার পথ মুক্তির পথ, আমি জানি আমি যদি এগুলো না করি তাহলে আমার শরীর বিধ্বস্ত হয়ে যেত, আমার যাত্রা এখানেই শেষ হয়ে যাবে।

মহাভারতে বিভিন্ন কাহিনীর মাধ্যমে এই মূল্যবোধগুলিকে খুব সুন্দর ভাবে উপস্থাপনা করা হয়েছে। এক ঋষি দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে এক জনপদের মধ্য দিয়ে এক রাজার কাছে যাচ্ছেন। উদ্দেশ্য, রাজার ওখানে গেলে কিছু অর্থ পাওয়া যাবে। যেতে যেতে পথে তার প্রচণ্ড ক্ষুধা পেয়েছে। তিনি চলতে পারছেন না, খুব কষ্ট করে শরীরটা টেনে টেনে চলেছেন। রাস্তায় এক জায়গায় গিয়ে এক মাহুতের সঙ্গে দেখা হয়েছে। মাহুত ভেজান ছোলা খাচ্ছে। ঋষি গিয়ে মাহুতকে বলছে – ভাই তুমি যে ছোলা খাচ্ছ ওখান থেকে আমাকেও দুটো ছোলা দাও। মাহুত বলছে – স্বামী! আমি নিচু জাত, আর এটা আমার মুখের এঁটো, আমি কি করে আপনাকে আমার মুখের এঁটো দিতে পারি। ঋষি বলছেন – না, আমাকে তাই দাও, আমার শরীর রক্ষার জন্য তাই খেতে হবে। ভেজান ছোলা খাওয়ার পর মাহুত ঋষিকে তার এঁটো জলটা এগিয়ে দিয়েছে। ঋষি তখন বলছেন – আমিতো এই জল খেতে পারিনা, এটা তোমার মুখের জল। মাহুত অবাক হয়ে বলছে – এই মাত্র আপনি আমার এঁটো ছোলা খেয়ে নিলেন, তাহলে জল কেন পান করবেন না। ঋষি বলছেন – আমার খাবার কিছু ছিল না বলে তোমার এঁটোটা খেলাম, জলতো পাওয়া যাচ্ছে, তাই কেন তোমার মুখের এঁটো জল খেতে যাব! এই ঘটনাকে যদি কোন খ্রীশ্চান, কোন মুসলিমের কাছে বা অন্য কোন ধর্মের লোকের বা যুক্তিবাদীদের কাছে বলা হয়, সবাই বলবে হিন্দুরা চিরকালই এই রকম প্রচণ্ড ধাপ্পাবাজ, এদের নিজেদের পছন্দমত সুবিধামত মূল্যবোধ বানিয়ে রেখেছে। কখনই না, এটাই সত্যিকারের মূল্যবোধের পরিচয়। আমার লক্ষ্য হল মুক্তি। এই শরীর থাকতে থাকতেই যদি আমি মুক্তির লক্ষ্যে পৌঁছাতে না পারি, মৃত্যুর সময় মনের মধ্যে কোন্ ধরণের চিন্তা ভাবনা আসবে কোন ঠিক নেই, মৃত্যুর পর সেই চিন্তার ফলে আমি বেড়াল হয়ে কুকুর হয়ে কোন যোনিতে চলে যাব, কত জন্ম পিছিয়ে পড়ব কোন ঠিক নেই। একজন সন্ন্যাসী মরে গিয়ে যদি আবার সন্ন্যাসী হয়, সে সন্ন্যাসী হয়ে আবার সাধনাই করতে থাকল, এইভাবে আরও দু চার জন্ম লেগে গেল তাতে কোন সমস্যা নেই। কিন্তু সন্ন্যাসীর মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত তার পেছনে যে কর্মের পুটলি বাঁধা রয়েছে সেখান থেকে কোন কর্ম সংস্কার মৃত্যুর সময় প্রবল হয়ে সন্ন্যাসীকে হয়ত বেড়াল বানিয়ে দিল। তারপর সে এই বাড়ি সেই বাড়ি থেকে মাছ চুরি করে খাচ্ছে, দুধ চুরে করে খাচ্ছে, তখন আবার নতুন করে অনেক কর্মের বোঝা তার ঘাড়ে চেপে গেল। ফলে এক জন্মে যেটা হয়ে যেত সেটাই পূর্ণ করতে হয়তো চার হাজার জন্ম লেগে যাবে। সেইজন্য এই শরীর থাকতে থাকতে এই জন্মেই যত তাড়াতাড়ি মুক্তি পাওয়া যায় তার উপর বেশি নজর দিতে হবে। সব সময় সজাগ ও সতর্ক থাকতে হবে যেন কোন ধরণের দুর্ঘটনার মধ্যে পড়ে নিম্ন যোনিতে না চলে যাই। আমি এখন অভুক্ত, আমার মাথায় শুধু খাওয়া আর খাদ্যের চিন্তাই কিলবিল করছে। মৃত্যুর সময় যা চিন্তা করে মরবে সে সেই রকম যোনিতে জন্মাবে, এই প্রচণ্ড ক্ষুধা নিয়ে মরলে মরার পর সে হয়তো ইঁদুর হয়ে জন্মাবে। ঋষি যদি এঁটো খেয়ে থাকেন তাতে কি ভুল করেছেন? ঠিক কাজই করেছেন।

যখন মুসলমানরা ভারতে হিন্দুদের ধরে ধরে ধর্মান্তর করছিল তখন যারা সৎ ব্রাহ্মণ ছিলেন, যাঁরা মুসলিম ধর্ম কিছুতেই গ্রহণ করবেন না, মুসলমানরা তাঁদের বলছে হয় তুমি মুসলমান হও নয়তো তোমার গর্দান যাবে। সেই ব্রাহ্মণ বলছেন তুমি আমার গর্দান নিয়ে নাও, আমি মুসলমান হব না। মোঘল আমলে এইভাবে লক্ষ লক্ষ হিন্দুদের হত্যা করা হয়েছিল। এরা নিজেদের ধর্মের জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত, উচ্চ মূল্যবোধের জন্য আমি সমস্ত কিছু ত্যাগ করতে পারি এই শরীরতো অতি তুচ্ছ, তুমি আমার জীবন নিয়ে নাও। এটা একটা আলাদা বিষয়। কিন্তু মনের কোন চাহিদা নিয়ে যদি কেউ মরে তাহলে কিন্তু সমস্যা হয়ে যাবে।

একটি ছেলে একটি মেয়েকে ভালোবেসে হয়ত মেয়েটিকে পেলো না, সে তখন ভাবছে আমার জীবনটাই ব্যর্থ হয়ে গেল, তারপরেই আত্মহননের পথ বেছে নিল। সে না পাবে এই জীবন ফিরে, না পাবে আর কোন মনুষ্য জন্ম। কোথায় কত লক্ষ লক্ষ বছর পরে থাকবে কেউ বলতে পারবে না। হিন্দু ধর্মের এই যে একটা সঙ্গতিপূর্ণ পথ, যে পথ ধরে এগিয়ে গেলে মুক্তির লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে, এখানে কোন পাপ বোধ, ভয় বোধ, অপরাধ বোধ কাজ করে না, ভ্রান্তি আসবে, সেই ভ্রান্তিকে দূর করবার জন্য তোমাকে সুযোগ দেওয়া হবে, কিন্তু কোন ভাবেই লক্ষ্য থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিও না। সেইজন্য সেমেটিক ধর্মে পাপবোধ, ভয়বোধের খুঁটিকে আকড়ে থাকার জন্য অনেক সমস্যা এসে যায়। ভয় আর পাপ এদেরকে নাচিয়ে যাচ্ছে।

হিন্দুরাও যে এই জিনিসকে নিয়ে নাড়াচাড়া করেনি তা নয়, তাদের মধ্যেও এই ধরণের ভাবনা চিন্তা এসেছিল। কিন্তু আগে যেটা বলা হয়েছিল নেতে নেতি, একটা আইডিয়া মাথায় এলো তখন সেটাকে তারা নেতি নেতি করে দেখে নিয়ে বাতিল করে দেবে। কিছুক্ষণের জন্য একটা আলো নাচছে, তারপর দেখলে যে এটা একটা কাঁচের টুকরো, যেই দেখলো এটা কাঁচ সেই মুহুর্তে ওটাকে ফেলে দিয়ে এগিয়ে যাবে। বেদ বেদান্তে এই একই পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে। খুব দ্রুততার সাথে এনারা নেতি নেতি কর বেরিয়ে এসেছেন। এক আধটা কথাতে বোঝা যায় যে এই ধরণের একটা আইডিয়া হিন্দু ধর্মের কোথাও কোথাও এক সময়ে ছিল। মানে, যখনই কোন নতুন একটা আইডিয়া তারা নিয়েছিলেন সেটার ওপরে খুব গভীর ভাবে চিন্তা ভাবনা করে আইডিয়াটাকে বিচার করলেন। তারপর দেখলেন এই আইডিয়াতে তাদের লক্ষ্য থেকে সরিয়ে দিচ্ছে তক্ষুণি তাঁরা এগুলি খুব দৃঢ়তার সাথে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। সেইজন্য সাধারণ মানুষের যেসব ধর্ম ভাবনা ভারতে দেখা যায় তার প্রত্যেকটিই স্পষ্ট ও দৃঢ়, আমাদের নতুন করে বাজিয়ে দেখার দরকার পড়ে না। মাধ্বাচার্যের যে অনন্ত নরকের আইডিয়া, এই আইডিয়া এসেছিল মুসলমান আর খ্রীশ্চানদের সঙ্গে পরস্পরের মেলামেশা ও ভাবনা চিন্তার আদান প্রদান থেকে। হিন্দু ধর্মের আর কোন শাখাতে মাধ্বাচার্যের এই অনন্ত নরকের আইডিয়া পাওয়া যাবে না। হিন্দুরাও মাধ্বাচার্যের এই আইডিয়াকে বাজিয়ে দেখেছিল, দেখেই এটাকে নেতি নেতি করে ছেড়ে দিয়েছে। মজার ব্যাপার হল, হিন্দুরা নেতি নেতি পদ্ধতিতে যে জিনিসগুলিকে ফেলে দিয়েছে অন্যান্য ধর্ম সেগুলোকেই কুড়িয়ে তাদের ধর্মের প্রধান একটা পদ্ধতি বানিয়ে নিল।

বহির্জগৎ থেকে অন্তর্জগতের দিকে যাত্রা

সব কিছুর পেছনে আমরা একজন স্রষ্টাকে খুঁজি। এই বোতল আছে, কেউ একে সৃষ্টি করেছে, আমি আছি, আমার বাবা-মা আমাকে সৃষ্টি করেছেন। স্বাভাবিক ভাবে এই যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে এরও একজন স্রষ্টা আছেন। হিন্দু মনেও এই সৃষ্টির পেছনে যিনি স্রষ্টা রয়েছেন, তাঁর অনুসন্ধানের ইচ্ছা জেগেছিল। তারপর তারা বাইরের দিকে খুঁজতে আরম্ভ করল, কিন্তু একটা সময় দেখল বাইরে অনুসন্ধান করে স্রষ্টাকে কখন জানা যাবে না। তারপর তারা ভেতরের দিকে মানে অন্তর্জগতের দিকে নজর দিল, তখন বুঝলো, যে প্রশ্নের উত্তর পেতে তারা বাইরের দিকে ছোটাছুটি করছিল সেই প্রশ্নের উত্তর নিজের অন্তরের মধ্য থেকেই পাওয়া যেতে পারে।

মনে করা যাক একটা ঘর আছে, আর সেই ঘরে বিভিন্ন রকম সোনার অলঙ্কার রাখা আছে। এবার মনে করা যাক একটা ছোট্ট পিঁপড়ের মধ্যে মানুষের চৈতন্য দেওয়া হয়েছে, সেই ছোট্ট পিঁপড়েটা দেখতে শুরু করল এই ঘরে কি আছে, একটা ছোট্ট নাকছাবি হাতে নিল তারপরেই একটা নেকলেস নিল। দুটোকে যদি সে মেলাতে যায় কিছুতেই মেলাতে পারব না। এরপর ঘরে যত অলঙ্কার আছে সব কটাকে সে ছোট থেকে বড়

একটা তালিকা বানাতে শুরু করেছে, দেখছে এক একটা এক এক রকমের বাহারের, বিভিন্ন আকারের। পিঁপড়েটা অবাক হয়ে ভাবছে এগুলো কি। এইভাবে বস্তুর রহস্য সে কোন দিনই খুঁজে পাবে না। কিন্তু এদের উপাদানকে যদি সে জেনে যেতে পারে তাহলে দেখবে সব কিছুর উপাদান হল সোনা। যদি সোনা কি জিনিস একবার সে জেনে যায় তাহলে ঘরে যত অলঙ্কার আছে সব কটাকেই সে জেনে যাবে। এখন পিঁপড়ে তার মনুষ্য চৈতন্য নিয়ে জানতে চেষ্টা করল সোনা কি বস্তু। একটা সময়ে সে সোনাকে জেনে নিল, বুঝে নিল যত অলঙ্কার আছে এগুলি যদি একসাথে গলিয়ে দেওয়া যায় তাহলে সবই সোনা হয়ে যাবে। সোনার জড় উপাদান, রাসায়নিক উপাদান তার জানা হয়ে গেল, এবার এই সোনা থেকে সব ধরণের অলঙ্কার তৈরী করা যাবে। অলঙ্কারের বিভিন্ন আকার দেখে এখন আর সে অবাক হয়ে যাবে না, কারণ অলঙ্কারের রহস্য তার কাছে উদ্‌ঘাটিত হয়ে গেছে। ধর্মের ক্ষেত্রেও ঠিক এই ব্যাপারটাই হয়েছে। বহির্জগতের সমস্ত নক্ষত্র, গ্রহ, তারাপুঞ্জ দেখছেন, সবটাই তাঁর কাছে রহস্যময়, তিনি এর সৃষ্টি কর্তার অনুসন্ধান শুরু করলেন। অনুসন্ধানের ফলে অনেক ধরণের তত্ত্ব তাঁদের সামনে এল, কিন্তু কোন সদুত্তর পেলেন না। শেষে ঠিক করলেন অন্তর্জগতে অনুসন্ধান করা যাক। যখনই তাঁরা অন্তর্জগতে অনুসন্ধান করতে শুরু করলেন তখন জগতের সমস্ত রহস্য তাঁদের উন্মোচন হতে থাকল, বস্তুর উপাদানকে তারা পেয়ে গেলেন। এটাকে জেনে নিয়েই তাঁরা সন্তুষ্ট হয়ে গেলেন, এতেই তাঁদের সমস্ত কিছু পরিষ্কার হয়ে গেল। আমরা এখন সবাই জানি এই ব্রহ্মাণ্ড কি উপাদান দিয়ে সৃষ্টি হয়েছে। এখন যদি কেউ তাঁদের জিজ্ঞেস করতে যায় – আপনি কি জানেন এই সৃষ্টি কি ভাবে হয়েছে? তাঁদের উত্তর দিতে বয়ে গেছে, তাঁরা বলবেন এই ব্যাপারে আমার কোন আগ্রহ নেই, আমি জেনে গেছি কি দিয়ে এই সৃষ্টি হয়েছে। যে অলঙ্কার গুলি নিয়ে তুমি এতো লাফালাফি করছ এগুলো সোনা ছাড়া আর কিছু নয়, সোনা থেকে কিভাবে অলঙ্কার তৈরী করা হয়েছে সেটা জানার ব্যাপারে আমার কোন মাথা ব্যাথা নেই। হৃদয়রাম আর ঠাকুর কলকাতার রাস্থা দিয়ে যাচ্ছেন, হৃদয়রাম লাট সাহেবের বাড়ি দেখিয়ে বলছে – মামা এটা লাট সাহেবের বাড়ি। ঠাকুর বলছেন – মা আমাকে দেখিয়ে দিলেন একটা ইটের ঢিপি। তাহলে এটা কি লাট সাহেবের বাড়ি নয়, নিশ্চয়ই লাট সাহেবের বাড়ি, আমার আপনার মত সাধারণ মানুষের কাছে। আগামীকাল যদি কলকাতায় একটা বিশাল ভূমিকম্প হয়ে যায় তাহলে লাট সাহেবের বাড়ির যা দশা হবে তার পাশে একটা বস্তিরও সেই একই দশা হবে। দুটোই ইটের ঢিপিতে পর্যবসিত হয়ে যাবে।

বৈদিক ঋষিরা বহির্জগতের দিকে অনুসন্ধান বন্ধ করে অন্তর্জগতের দিকে দৃষ্টি দিলেন। উপনিষদের ঋষি তাই বলছেন – *কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মনমৈক্ষদ্* – তুমি যদি অমৃতের সন্ধান পেতে চাও, তুমি যদি সমস্ত কিছুর রহস্য জানতে চাও তাহলে *আবৃত্ত চক্ষুঃ*, মানে চোখকে ঢেকে দিতে হবে। চোখ ঢাকা দেওয়া মানে ইন্দ্রিয়গুলিকে ঢেকে দেওয়া। যে ইন্দ্রিয় আমাদের চেতনাকে বার বার বাইরের দিকে টেনে নিয়ে আসছে সেই ইন্দ্রিয়ের উপরে কর্তৃত্ব করা। ঠাকুরের একবার খুব ইচ্ছে হয়েছে মাইক্রোস্কোপ জিনিসটা কি দেখার। কিন্তু মাইক্রোস্কোপ যখন ঠাকুরের কাছে নিয়ে আসা হল তখন তাঁর আর দেখা হল না। ভেতর থেকে মনটাকে বাইরে নিয়ে এসে যে মাইক্রোস্কোপ দেবেন সেই ইচ্ছেই আর হল না। আবার একদিন মাস্টারমশাই মাটিতে আঁকিবুকি টেনে ঠাকুরকে বোঝাচ্ছেন চন্দ্র গ্রহণ সূর্য গ্রহণ কিভাবে হয়। কিন্তু ঠাকুর একটু দেখেই তাঁর মনটা হারিয়ে গেছে, বলছেন আমার মাথা ঝিম্‌ঝিম্‌ করছে। কারণ তিনি সব কিছুর রহস্য বুঝে গেছেন। তিনি কি সূর্য গ্রহণ চন্দ্র গ্রহণের রহস্য জেনে গেছেন? তা মোটেই নয়। তিনি বুঝে গেছেন জগতের রহস্যের সমাধান সূর্য গ্রহণ আর চন্দ্র গ্রহণকে জেনে হবে না। এগুলোকে জানার দরকার অবশ্যই আছে, যাদের দরকার আছে তাদের কাছে থাকুক, আমার লাগবে না। আমরা এখানে আরও বৃহৎ বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি।

এর আগে ফিজিক্সের যে cyclic creation থিয়োরির কথা বলা হয়েছিল, আমাদের পৌরাণিক সৃষ্টিতত্ত্বের সাথে সেই থিয়োরির অনেক মিল আছে। বৈদিক ঋষিরা যে জগতের রহস্যকে ধরতে পেরেছিলেন, কি সেই রহস্য? একটা অবস্থার পর এই সৃষ্টির রহস্যকে জানা যায় না, এটাকেই ওনারা ধরতে পেরেছিলেন। কোন অবস্থার পর? সেই বৃহৎকে জানার পর। বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের একটা পরিমাপ তাঁরা দিয়েছেন আর তা আধুনিক বিজ্ঞানের ধারণার সাথে অনেক মিলে যাচ্ছে। আমরা বলতে চাইছি না যে হিন্দু ধর্ম আর বিজ্ঞান এক

কথা বলছে। হিন্দু ধর্মের সাথে বিজ্ঞানের ধারণার মিল বার করা উদ্দেশ্যও এখানে নেই। কিন্তু এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ডকে যখন তারা ধরে নিলেন তখন এটাও বুঝতে পারলেন যে এরপর যে সীমারেখা আছে তাকে কখনই অতিক্রম করা যাবে না। হিন্দু ধর্মের ঋষিরা যে বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের ধারণা আমাদের দিয়েছেন বিজ্ঞান এখনও তার ধারে কাছেই যায়নি, তার আবার সীমারেখাকে ধরাতো অনেক দূরের কথা। এই সীমার বাইরে কি আছে জানতে চাইলে তুমি কখনই এর উত্তর জানতে পারবে না, কিন্তু যদি তুমি এর উত্তর পেতে চাও তাহলে তোমাকে তোমার অন্তর্জগতে ডুব দিতে হবে। কঠোপনিষদে এই কথাই বলা হয়েছে – *পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূস্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্*, তুমি যদি বাইরে কিছু জানতে চাও তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই, কারণ ইন্দ্রিয়গুলোকে এভাবেই সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু *কশ্চিদ্ধীরাঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদ্*, ইতিহাসে মুষ্টিমেয় কয়েকজন মাত্র আছেন যাঁদের মনে এই রহস্যের সত্যিকারের সমাধান জানতে ইচ্ছে হয়, তাঁরা এই বহির্জগতের দিক থেকে দৃষ্টিটাকে ঘুরিয়ে ভেতরের দিকে ফেলেন।

বেদের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে দেখলাম তাঁরা সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে কি বলছেন, দেবতাদের কি কি বৈশিষ্ট্য, দেবতাদের সম্বন্ধে বিভিন্ন যে ধারণা ছিল। সেখান থেকে দেখলাম তাঁরা কিভাবে একটা সময় একজন দেবতাকে ধরে সেই দেবতার মধ্যে অনন্তকে কল্পনা করতে চেষ্টা করছেন, অনন্তকে ধরতে না পেরে সেই দেবতাকে ছেড়ে আরেকজন দেবতাকে বেছে নিলেন, সেই দেবতাকেও অনন্তের দিকে টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে বিফল হয়ে গেলেন, সেই দেবতাকেও ছেড়ে আরেকজন দেবতাকে ধরলেন। তাঁরা তখন বুঝতে পারলেন দেবতারা কেউই অনন্ত নয়। দেখলেন বহু বলে কিছু নেই, সেই একই আছেন আর তিনি অনন্ত। সেই অনন্ত আর আমার ভেতরে যে অনন্ত এই দুটো এক। সেই অনন্তকে আমার ভেতরেই পাব, বাইরে তাঁকে ধরা যাবে না। বেদের মূল ধর্ম যজ্ঞ, যজ্ঞ মানেই বাইরের ক্রিয়া। তাই তাঁরা ভেতরের দিকে সব ক্রিয়াকে ঘুরিয়ে দিলেন। এটাই পরে বেদান্ত দর্শনে প্রতিষ্ঠিত হল। যতক্ষণ বাইরের কর্ম করছি ততক্ষণ বৈদিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে থাকছি। যখন অন্তর্মুখী হচ্ছি তখন সেটাই বেদান্ত ধর্ম হয়ে যাচ্ছে। এই কারণেই বেদের ধর্মকে দু ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে – প্রবৃত্তিমার্গ লক্ষণ ধর্ম আর নিবৃত্তিমার্গ লক্ষণ ধর্ম – অর্থাৎ যজ্ঞের পথ আর সাধনার পথ। বহির্জগতের অনুসন্ধান আর অন্তর্জগতের অনুসন্ধান দুটোই বেদে আছে।

কিন্তু বেদান্ত বা উপনিষদকে বেদ থেকে যদি আলাদা করে দেখা হয় তাহলে বেদ আর উপনিষদের মাঝখানে একটা বিভাজন রেখা এসে যায়। একদিকে জাগতিক অভ্যুদয়, সামাজিক উন্নতি, সংসারে কিভাবে বেশি টাকা পয়সা উপার্জন করতে হবে, সুখ-স্বাচ্ছন্দ কিভাবে আসবে, স্বর্গে কিভাবে যাব, এটাই হল আনন্দকে বাইরে অনুসন্ধান করা। লাইনের এই দিকটায় অনুসন্ধান ভেতরের দিকে হতে থাকে, যেখানে সমস্ত কিছুকে পরিত্যাগ করে দিচ্ছে, যে জিনিসগুলিকে বৈদিক সময় ভালো বলে বিবেচনা করা হত সেগুলোকে ছেড়ে তাঁরা অন্তর্জগতে ডুব দিলেন। এভাবেই ঋষিরা বহির্জগৎ থেকে অন্তর্জগতের দিকে যাত্রা শুরু করলেন।

বেদের পরবর্তি কালে বেদের প্রভাব

আগেই আলোচনা করা হয়েছে বেদকে অপৌরুষেয় বলা হয়। ফলে যা কিছু দর্শন আছে, তার বাইরে বেদে যা কিছু বলা হয়েছে সেই অনুসারে world viewকে উপাস্থাপনা করা হয়। World view মানে জগতটা কি। দর্শন মানেই এই তিনটে জিনিস জীব, জগৎ আর ঈশ্বরের ব্যাখ্যা। জীব জগতকে ব্যাখ্যা করতে গেলে তার সাথে আরও অনেক কিছুই স্বাভাবিক ভাবে আসতে থাকবে। ঋষিরা বেদকে আধার করেই জীব, জগৎ আর ঈশ্বরের ব্যাখ্যা করেছেন। বেদে যা বলা হয়েছে ঋষিরা তার বাইরে যাবেন না। তাঁরা জানতেন বেদ মন্ত্রের যাঁরা দ্রষ্টা ছিলেন তাঁরা সবাই খুব উচ্চমানের ঋষি, তাঁদের কোন কথাই কখন ভুল হতে পারে না। আমরা যেমন বলি, কথামৃতে ঠাকুর এই কথা বলেছেন বা স্বামীজীর রচনাবলীতে স্বামীজী এই কথা বলছেন তখন ঠাকুর বা স্বামীজীর কথার উপর আর কোন কথা চলবে না। অনেকেই প্রশ্ন করেন, বেদের কথাকে কেন শেষ কথা বলতে হবে! প্রত্যেক ধর্মেই তার নিজের ধর্মগ্রন্থই শেষ কথা, আমাদের কাছে যেমন ঠাকুরের কথাই শেষ কথা। মুসলমানদের কাছে কোরান, খ্রীশ্চানদের কাছে বাইবেল শেষ কথা। তেমনি ভারতবর্ষে বেদের

কথাই শেষ কথা। বেদের কথাকে শেষ কথা বলে যিনি মানবেন না, তাঁকে অন্য ধর্মে চলে যেতে হবে। বৈদিক দর্শনের নাম হল আস্তিক দর্শন। আস্তিক মানে বেদে যার বিশ্বাস আছে। আর যারা বেদের কথাকে শেষ কথা বলে মানে না, তাদের দর্শনকে বলা হয় নাস্তিক দর্শন। চার্বাক, বৌদ্ধ আর জৈনরা বেদের কথাকে শেষ কথা বলে মানে না, তাই এই তিনটে দর্শনকে নাস্তিক দর্শন বলা হয়। ভারতের মূল দর্শন ছটি দর্শনকে কেন্দ্র করে চলে, এই ছটি দর্শনকে একত্রে ষড়দর্শন বলা হয়। ষড়দর্শন বেদকে প্রভাবিত করেনি, বেদের উপরই এই ছটি দর্শন দাঁড়িয়ে আছে। বেদকে সরিয়ে দিলে ষড়দর্শনের প্রত্যেকটি দর্শন পড়ে যাবে। যেমন বেদান্ত, বেদান্ত থেকে বেদ সরিয়ে দিলে বেদান্ত আর দাঁড়াতে পারবে না। স্বামীজী যে বেদান্তের কথা বলছেন, বেদ ছাড়া এই বেদান্ত দাঁড়াবে না। তবে মজার ব্যাপার হল ঠাকুরের কথাগুলো উপনিষদ বা বেদের উপর দাঁড়িয়ে নেই। ঠাকুর যদিও বেদ, উপনিষদ, বেদান্তের কথা বলছেন, কিন্তু ঠাকুর একটি কথাও বেদান্তকে আধার করে বলছেন না, ঠাকুরের কথা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অথচ বেদের সঙ্গে কোথাও কোন বিরোধ নেই। তবে ঠাকুরের কথামৃতটাই বেদ। ভবিষ্যতে ঠাকুরের কথাকে আধার করে যখন দর্শন লেখা হবে তখন ঠাকুরের দর্শন আর ষড়দর্শনের মধ্যে বিচার হবে। তবে ঠাকুরের দর্শন ষড়দর্শনের মধ্যে পড়ে না। স্বামীজী যে কথাগুলো বলেছেন সেগুলো আবার বেদান্তের দ্বারা প্রভাবিত, বেদান্ত আবার বেদের উপর আধারিত।

বেদে যেসব দেবতাদের নাম আমরা উল্লেখ পাই সেই সব দেবতাদের নিয়ে অনেক ধরণের গবেষণা করা হয়েছে। আর বেদের দেবতাদের নিয়ে অনেক আলোচনা, প্রবন্ধমূলক গ্রন্থও পাওয়া যায়। এই ধরণের যত বড় বড় কাজ সব বিদেশীরাই বেশি করেছে। বেদ ও পুরাণের উপরে ক্যাম্বেল কয়কটি খণ্ডে একটা বই লিখেছেন। ঠিক তেমনি বেদ পুরাণের বিভিন্ন বিষয়কে নিয়ে অনেকে অনেক কাজ করেছেন। যে কাজগুলি তারা করেছেন সব গুলোই অনেক বিস্তারিত ভাবে করেছেন, একটা দুটো কথাতে সেরে ফেলেননি। এর মধ্যে একটা নামকরা কাজ Golden Bough, এই বইটিতে সারা বিশ্ব জুড়ে বিভিন্ন ধর্মের যত রকমের রীতি নীতি ও পদ্ধতি আছে সবটাকে নিয়ে এক বিশাল কাজ করা হয়েছে। অনেক আগেকার বই হলেও এখনও এই বইকে ক্লাসিক বই বলে মনে করা হয়। যারাই বিশ্বের বিভিন্ন ধর্মীয় আচার ব্যবহার, অতিন্দ্রীয়বাদ, অধ্যাত্মবাদ নিয়ে গবেষণা করতে যান তাদের এই বইগুলো অধ্যয়ন করতে হয়। এই বইগুলো তুলনামূলক হিসাবে পড়াশুনা করলে বোঝা যায় ধর্ম কিভাবে বিবর্তিত হয়েছে। বিশ্বে বিভিন্ন পরম্পরা আছে যেমন ইন্দো-ইউরোপিয়া, ইন্দো-ইরানিয়ান আর কিছু কিছু আছে গ্রীক দেশের। আদিম অবস্থা থেকে বিভিন্ন জায়গায়, নানান সভ্যতা যখন প্রসারিত হতে থাকল তখন তাদের ভাষা, তাদের সংস্কৃতি, তাদের ধর্ম আর সেই সব ধর্মের যেসব বিশ্বাস ছিল সেগুলো কিভাবে বিভিন্ন গোষ্ঠির মধ্যে আদান-প্রদান হতে হতে সংস্কৃতি, ধর্মের মধ্যে পরিবর্তন হয়েছে তার এক বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে আমরা এই দেবতাদের কথাও পাই।

বৈদিক দেবতা ও পার্সিদের দেবতাদের সাথে সব থেকে বেশি মিল পাওয়া যায়। জিউস, পার্সি আর হিন্দু এই তিনটে ধর্মের লোকেরা অন্য ধর্ম থেকে নিজেদের ধর্মে ঢুকতে দিতেন না। একমাত্র জন্মসূত্রেই তুমি এই ধর্মের লোক হতে পারবে। এই কারণে জহুদের সংখ্যা অনেক কমে গেল। পার্সিরা তো একেবারে তলানিত এসে গেছে। পার্সিদের ধর্মে প্রচুর নিয়ম-কানুন আছে, আর এরা কোন মতেই অন্য ধর্মে বিয়ে করবে না। যখন কোন সমাজে লোকসংখ্যা কমে যায় তখন inbreeding হতে শুরু করে। স্বামীজীও বলেছেন যে হিন্দু ধর্মে inbreeding করে করে জাতিটা দুর্বল হয়ে পড়ছে। আগেকার দিনের ব্রাহ্মণরা বিয়ের ব্যাপারটা নিজেদের একটা ছোট্ট গণ্ডির মধ্যেই বেঁধে রেখেছিল, পরে তারা সেখান থেকে ছড়িয়ে যায়, অন্য বর্ণের মধ্যেও বিয়েটা ছড়িয়ে দিয়েছিল। এখন তো ভারতে intercast বিবাহ অনেক বেড়ে গেছে। Inbreeding মানে একটা ছোট্ট গোষ্ঠির মধ্যে যখন বিবাহ চলতে থাকে তখন ঐ ছোট্ট গোষ্ঠির মধ্যে নানা জেনেটিক রোগের প্রাদুর্ভাব হতে থাকে, যে রোগগুলো নিরাময় করা যায় না। আবার যখন cross-breeding হতে শুরু করবে তখন ঐ রোগগুলো নির্মূল হতে থাকে। এই কারণেই পার্সিদের সংখা খুব দ্রুত কমে আসছে।

ভারত হল ধর্মের দেশ। কিন্তু ধার্মিক লোক, আধ্যাত্মিক পুরুষ শুধু যে হিন্দু ধর্মেই আছে তা নয়, প্রত্যেক ধর্মে, প্রত্যেক দেশেই ধার্মিক ও আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব আছে। কিন্তু তফাৎটা একটা জায়গায়। ভারতের

এটাই ঐতিহ্য যে ভারতের যাঁরা নেতা হয়েছিলেন তাঁরা সবাই আধ্যাত্মিক বা ধার্মিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন, অন্যান্য দেশে এই ব্যাপারটা দেখা যায়নি। অন্যান্য দেশে বিজ্ঞানী, দার্শনিক, সাহিত্যিকদের থেকেই নেতারা এসেছে কিন্তু ভারত সাধুপুরুষদেরই নেতার আসনে বসিয়েছে। আর ভারতের যে সমাজ তারা সাধুকেই অনুকরণ করে। যার জন্যে গান্ধীজী যখন ভারতের জনজীবনের দৃশ্যপটে আবির্ভাব হলেন তখন পুরো দেশ গান্ধীজীকেই অনুসরণ করতে থাকল। নেহরু খুব সুন্দর একটা কথা বলেছিলেন – If I want to convince India I only have to convince Gandhi. গান্ধীজী যদি বলে দেন এটাই হোক, সারা দেশ বলবে এটাই হোক। সবাই কিন্তু এক বাক্যে স্বীকার করেন যে সারা দেশ গান্ধীজীকে মেনেছে সাধু হিসাবে। কারুর গায়ে যদি সাধুর তকমা লাগিয়ে দেওয়া যায় তার কথা সারা দেশ শুনবে, যতই সে ভণ্ড হোক। বেদে ঋষিরা দেবতাদের যেভাবে চিত্রণ করেছেন দেশের সমস্ত লোক সেভাবেই ভেবেছে। কিন্তু অন্যান্য দেশে যেহেতু আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বদের নেতার আসনে বসান হয়নি তাই এই ধরণের আধ্যাত্মিক বা ধর্মীয় চিন্তা ভাবনা গুলো যে স্তর পর্যন্ত নিয়ে যাবার কথা সেই স্তর পর্যন্ত ওনারা নিয়ে যেতে পারেননি। কিন্তু ভারতে হাজার হাজার বছর ধরে একের পর এক ঋষিরা এসে এই জিনিসগুলোকে ঠেলতে ঠেলতে এত দূর নিয়ে গেছেন যে তারপর আর কিছু বলার থাকে না। ম্যাক্সমূলার তাই বলছিলেন – বেদের ঋষিরা যেন পাহাড়ের চূড়ায় উঠতে শুরু করেছেন, শুধু যুক্তি বিচারকে অনুসরণ করে উঠতে উঠতে ওনারা এমন উঁচুতে চলে গিয়েছিলেন সেখানে সাধারণ লোকেদের অক্সিজেনের অভাবে বুক ফেটে যাবে, কিন্তু এনারা সেখানেও পৌঁছে গিয়েছিলেন। একটা অবস্থার পর যুক্তি দিয়ে বিচার করতে গেলেই বুক ফেটে যাবে।

এই কারণেই ভারতকে আধ্যাত্মিক দেশ বলা হয়। তার প্রথম কারণ দেশের জনসংখ্যার শতকরা হিসাবে বেশির ভাগ মানুশ ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতায় উৎসর্গিকৃত, আর দ্বিতীয় কারণ, ভারতের বেশির ভাগ মানুষই সাধারণ ভাবে ধর্মীয় নেতাদেরই অনুসরণ করে। অন্যান্য দেশে ধর্মীয় নেতাদের অনুসরণ করা হয় না।

ঋষিরা প্রকৃতির একটা বিষয়কে নিয়ে তার উপরে ধ্যান করতে শুরু করলেন। ধ্যান করতে করতে একেবারে শেষ অবস্থায় তাঁরা সেই শক্তির কাছে পৌঁছে যেতেন। যেমন কালবৈশাখীর ঝড়, এই ঝড়কে নিয়ে তাঁরা ধ্যানে বসে গেলেন, ধ্যান করতে করতে এই ঝড়ের পেছনে কোন আধ্যাত্মিক শক্তি থাকতে পারে কিনা সেই পর্যন্ত চলে যেতেন। সেই শক্তির উপরে ধ্যান করতে করতে তাকে অতিক্রম করে দেখছেন এই শক্তিই প্রাণ। এই প্রাণ সমস্ত প্রাণীর যে প্রাণ সেই প্রাণকে বলছেন না। এই প্রাণ হল vital energy, স্বামীজী সৃষ্টির বর্ণনা করতে গিয়ে বার বার যে আকাশ ও প্রাণের কথা বলছেন এখানে সেই প্রাণের কথা বলা হচ্ছে। সেই অবস্থায় ঋষি দেখছেন প্রাণের যখন এই রকম প্রকাশ হয় তখন এটাই হয়ে যায় ঝড়। উপনিষদেও তাই প্রাণের পূজা এসেছে, প্রাণকেই ওনারা আত্মা মনে করছেন। ঋষিরা ঝড়ের শক্তির উপর একটা দিব্য ব্যক্তিত্বকে বসিয়ে দিচ্ছেন। এটা কোন কবির কল্পনা নয়। ধ্যানের গভীরে যেতে যেতে অপ্রয়োজনীয় ফালতু জিনিসগুলো ফেলে দিচ্ছেন, তারপর একটা অবস্থায় এই দিব্য ব্যক্তিত্বকে ইন্দ্র, বরুণ ইত্যাদি দেবতার উপর বসিয়ে দিচ্ছেন। ঋষিদের আধ্যাত্মিক যাত্রা শুরু হয়েছিল প্রাকৃতিক ঘটনা গুলোকে নিয়ে। এই কারণে যে কোন লোকের মনে দ্বিধা দ্বন্দ্ব চলে আসাটা খুবই স্বাভাবিক। যেমন বৃষ্টির দেবতা ইন্দ্রকে করে দেওয়া হল, মনে হবে ঋষিরা মেঘ দেখে কল্পনা করতে লাগলেন যে মেঘের পেছনে এক দৈবী শক্তি আছে সেখানে থেকে ইন্দ্র দেবতার সৃষ্টি হয়ে গেল, আদপেই কিন্তু সেই ভাবে হচ্ছে না। ধ্যানের গভীরে গিয়েই তাঁরা এটা প্রত্যক্ষ করেন, আর যে কেউ যদি ঋষিদের পদ্ধতি অনুসরণ করে ধ্যানের শক্তিতে ইন্দ্রের উপাসনা করে তাহলে বৃষ্টি হবেই।

গীতাতে এসে ভগবানই প্রকৃতির সব কিছুর মালিক হয়ে গেলেন, দেবতাদের জায়গায় ভগবানই সব কিছুর অধীশ্বর হয়ে গেলেন, সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণ বলে দিলেন ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ ইত্যাদি দেবতাদের আর উপাসনা করার দরকার নেই। সাক্ষাৎ ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলে একই জিনিস হবে। দেবতা থেকে ভগবানে উত্তরণের এই ব্যাপারটা একটা আলাদা গবেষণার বিষয়। মহাভারতে আরও ভালো করে বোঝা যায় মানুষের চিন্তা-ভাবনা কিভাবে পরিবর্তন হতে হতে এগিয়ে চলেছে।

ঋষিরা চরমে গিয়ে দেখছেন অনন্ত ছাড়া আর কিছুই নেই, ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অগ্নি, যম, আদিত্য দেবতারা সবাই সেই অনন্তের মুখ। ঋষিরা ভাবলেন যদি অনন্তেরই মুখ হয়ে থাকে তাহলে দেবতাদের আমি কেন ধরতে যাব, দেবতাদের জায়গায় আমি অনন্তকেই ধরব। কিন্তু সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে সমস্যা হয়ে যায়, সাধারণ মানুষের মধ্যে যারা ধর্মের দিকে যেতে চান তাদের প্রত্যেকরই চিন্তা, ভাবনা, মানসিক গঠন আলাদা আলাদা। কিছু লোক দেবতাদের কীর্তি-কলাপ, বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনীর কথা শুনতে চায় – অর্থাৎ তারা পৌরাণিক কাহিনীগুলোকে জানতে চান, পুরাণের নানান রকমের গালগপ্প না থাকলে তাদের মন ভরে না। বেদ হল পুরাণের স্বর্ণখনি। বেদে এমন অনেক ছোট ছোট কাহিনী আছে যেখান থেকে বিরাট পৌরাণিক কাহিনী তৈরী করা যায়। আমাদের পুরাণে যত ধরণের আখ্যায়িকা আছে তার শেকড় বেদেই পাওয়া যাবে।

ঋষিরা যখন দেবতাদের ছেড়ে অনন্তকে ধরলেন তখন আমরা ঋষির মুখে শুনতে পাই সেই তত্ত্বের অভিব্যক্তি – *একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি*। সবাই সেই এক, সবাই সেই অনন্ত, তাঁকে ঋষিরা বিভিন্ন নামে ডাকছেন। ইন্দ্র, বরুণ, যে দেবতার নামই বলা হোক না কেন এরা বহুধা, কিন্তু আসলে তাঁরা সকলে এক। এই উপলব্ধির পর ঋষিরা কিন্তু দেবতাদের পরিত্যাগ করে দিলেন না, দেবতাদেরও ঋষিরা ধরে রাখলেন। তার মধ্যে কিছু কিছু দেবতা পরবর্তি কালেও টিকে ছিলেন আবার নতুন নতুন দেবতাদেরও জন্ম হয়েছে কিন্তু মূল ভাব থেকে ঋষিরা কখনই সরে আসেননি। আজকের দিনেও গ্রামের সাধারণ মানুষ যখন কোন গাছের পূজা করছে, পাথরের পূজা করছে, নদীর পূজা করছে, তখন তারা জানে যে আমি পাথর কিংবা গাছের পূজা করছি না, এই পাথর শিবের প্রতীক, এই পাথর শিবকে মনে করিয়ে দিচ্ছে, আর শিব হলেন সেই অনন্ত। সাধারণ লোক জানে গঙ্গাজল আর কূয়োর জলের রাসায়নিক উপাদান এক, অথচ সারা ভারতের লোকেদের বিশ্বাস যে গঙ্গাজল একটু মুখে দিলে আর মাথায় ছিটিয়ে দিলে গত চব্বিশ ঘন্টায় যত অপবিত্র কাজ করেছি তার সব পবিত্র হয়ে যাবে। কারণ যারা গঙ্গাজল ছেটাচ্ছে তারা জানে যে আমি এটা কোন মামুলি জল ছেটাচ্ছি না, পবিত্র করার যত রকমের উপায় হয় তার মধ্যে এটি সব থেকে মাহাত্মপূর্ণ। শ্রীমায়ের জীবনীতে আছে, মায়ের ভাইঝি নলিনীর ছিল শুচিবাঈ। নলিনীর মাথায় নাকি কাকে পেচ্ছাপ করেছে, তাই রাত্রিতে সে স্নান করতে যাবে। শ্রীমা নলিনীকে বলছেন মাথায় গঙ্গাজল ছিটিয়ে নিতে। সে মানবে না। তখন শ্রীমা বলছেন – ঠিক আছে, তুই আমাকে ছুঁয়ে দে তাহলেই তুই পবিত্র হয়ে যাবি। এটা মায়ের কত বড় কথা।

যদি কেউ এই পবিত্রতার উপর ঠিক ঠিক ধ্যান করতে থাকে, শেষে গিয়ে পবিত্রতার যে আধ্যাত্মিক রূপ সে দেখবে সেই রূপটাও অনন্ত। অনন্তের সঙ্গে যে নিজেকে এক করে নেবে চিরদিনের মত সে পবিত্র হয়ে যাব। ঠাকুর নরেনের নামে বলছেন – নরেনের মধ্যে আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে কলাগাছ দিলেও পুড়ে যাবে। তার মানে নরেনের মধ্যে পাপ বলে কিছু নেই। কেন নরেনের মধ্যে পাপ নেই? কারণ নরেন অনন্তের সাথে নিজেকে এক করে রেখেছে। যে মুহূর্তে কেউ অনন্তের সাথে নিজেকে এক করে ফেলতে পারে তখন সচ্চিদানন্দের যত রূপ হতে পারে সব রূপের সাথেও এক হয়ে যাবে। সচ্চিদানন্দের প্রথম রূপ সৎএর সাথে যখন এক হয়ে যাবে তখন তার মৃত্যু ভয় চলে যাবে, সচ্চিদানন্দের চিৎ রূপের সাথে এক হয়ে গেলে সমস্ত সংশয়, দ্বিধা চলে যাবে, আর আনন্দের সাথে এক হয়ে গেলে জগতে এমন কোন জিনিস নেই যেটা থেকে তার দুঃখ, হতাশা আসবে, মানুষ তখন সমস্ত শোক আর মোহকে অতিক্রম করে যায়। শোক মোহকে পার করে গেলে তাকে আর অপবিত্রতা স্পর্শ করতে পারবে না, সেই যাই করুক না কেন, কোন ভাবেই সে আর অপবিত্র হবে না। এটাই আমরা গীতাতে পাই – *ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে*। কারুর গলা যদি সে কেটে দেয় তার জন্য তার কোন অনুতাপ হবে না, আবার কেউ যদি তার গলা কাটতে আসে তাতেও তার কিছু আসবে যাবে না। কারণ সে তখন সৎএ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। আর আনন্দে আছে বলে কারুর গলা কেটে দিলে তার কোন দুঃখ হবে না। ঠাকুর বলছেন – শুচি অশুচির পারে চলে যায়। তখন গঙ্গাজল আর নর্দমার জল এক মনে হবে। কথামৃতে কতবার এই কথাগুলো আমরা পড়ি কিন্তু এগুলোকে ধারণা করা অত্যন্ত কঠিণ। কোন মানুষ যদি একবার মনে করে আমি অপবিত্র, আমি পাপী তাহলে আজ কিংবা আগামীকাল সে পাগল হয়ে যাবে। তার পাপবোধই তাকে শেষ করে দেবে। একটা বাচ্চা ছেলেরও যদি একবার মনে হয় তার গায়ে নোংরা লেগে

আছে, সে অনবরত মার পেছন পেছন দৌড়াবে আর চেঁচাতে থাকবে – মা আমাকে পরিষ্কার করে দাও। কোন মানুষই মনের মধ্যে অপবিত্রাকে বহন করতে পারেনা। অনন্তের সাথে নিজেকে এক করে নিতে পারলে তখন এই জিনিসগুলো তাকে আর স্পর্শ করতে পারবে না।

কিন্তু যারা এখনও নিজেদের অনন্তের সাথে এক করতে পারেনি তাদের কি হবে? যতক্ষণ না অনন্তের সাথ এক হচ্ছে ততক্ষণ অনন্তের যে কোন একটা মুখ তাকে ধরে থাকতে হবে। অনন্তের একটা মুখই তার পবিত্রতার ভাবকে রক্ষা করবে। অনেকে গঙ্গাজলের নমুনা পরীক্ষা করে গঙ্গাজলের পবিত্রতাকে খুঁজতে যায়। আবার অনেকে মনে করে ঋষিরা গঙ্গার তীরে তপস্যা করেছিলেন বলে গঙ্গাজল পবিত্র, আবার অনেকে মনে করে হিমালয়ের অনেক জড়িবুটি গঙ্গাজলে মিশে থাকে বলে গঙ্গাজলে পোকা ধরেনা, এটা ঠিকই যে গঙ্গাজল ঘরে যত দিনই রেখে দেওয়া যাক, যেমন ছিল তেমনটিই থাকে, কোন পোকা ধরে না। এগুলোর কোন গুরুত্ব নেই, গুরুত্ব হল কত নদীই তো আছে, নর্মদা, যমুনা, গোদাবরী আছে, কিন্তু ঋষিরা যখন ধ্যান করছেন তখন ওনারা উপলব্ধি করলেন যে গঙ্গাজলের যে আধ্যাত্মিকতা তাতে সমস্ত কিছুকে পবিত্র করার শক্তি আছে। অনেক মহারাজ জয়রামবাটীর সিংহবাহিনী মন্দিরের মাটি কাছে রাখেন, রোজ একটু করে সেই মাটি তাঁরা খান। মঠের যাঁরা ঋষিরা ছিলেন তাঁরা ধ্যানের গভীরে দেখলেন যে সিংহবাহিনী মাটির মধ্যে যে আধ্যাত্মিকতা আছে তাতে এই মন্দিরের মাটি খেলেও তুমি পবিত্র হবে। আমাদের মত সাধারণ মানুষ এত কিছু বুঝতে পারব না, আমরা শুধু জানি এগুলো ঋষিরা করতেন আর আমরাও যাতে করি সেই অনুসারে তাঁরা বলে গেছেন। রাজা মহারাজের অসুখ করেছে ঠাকুর বলছেন – নে একটু জগন্নাথের আট্‌কে প্রসাদ খা, রোগ ভালো হয়ে যাবে। ঋষিরা যেটা বলে গেছেন সেটাই বেদবাক্য হয়ে গেছে। একাধিক ঋষিরা বলে গেছেন যে গঙ্গাজলে আমাদের মানসিক অপবিত্রতা, শারীরিক অপিবত্রতা দূর হয়, সেইজন্য সারা ভারত এখনও এটাকে ধরে রেখেছে। এখন গঙ্গাজল আমাদের কিভাবে পবিত্র করছে আমরা বলতে পারব না, সেটা বুঝতে গেলে আমাদের ঋষি হতে হবে।

এটাই ধারা, যে ধারা অনুসারে আমাদের মধ্যে কোন জিনিসের প্রতি আধ্যাত্মিকতার ভাব জন্মেছে। কিন্তু এই ভাবধারাও পাল্টাতে থাকে। যেমন ঠাকুর ও শ্রীমার আগমনের আগে সিংহবাহিনী মন্দিরের মাটির প্রতি এই ভাব ছিল না। আর ভারতের মাটি খুব বিচিত্র, এই মাটিতে যেটা একবার এসে পড়ে সেটা আর কখন নষ্ট হয় না। যেমন পার্সি ধর্ম, সারা বিশ্ব থেকে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে কিন্তু ভারতে মুষ্টিমেয় কয়েকজন এখনও রয়ে গেছে। যে কোন ধর্মীয় ভাব একবার ভারতে ঢুকে পড়লে সেটা আর কখন নষ্ট হবে না।

ইন্দ্র দেবতা

বেদের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ দেবতা হলেন ইন্দ্র। ঋগ্বেদ, চারটে বেদের মধ্যে যেটি সবচেয়ে বড়, তার এক চতুর্থাংশ মন্ত্র ইন্দ্রের প্রতি উৎসর্গ। সচরাচর আমরা ইন্দ্রকে যে ভাবে কল্পনা করি এবং পুরাণে ইন্দ্রকে যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে বেদে সেভাবে ইন্দ্রকে দেখা হয় না। অনন্তের যে শক্তিকে ভাবা হয়, ইন্দ্র সেই শক্তির রূপ। পার্সিদের ধর্মগ্রন্থ জেন্দাবেস্তাতেও ইন্দ্র, মিত্র বরুণ দেবতাদের নাম পাওয়া যায়। ইন্দ্রের প্রধান অস্ত্র বজ্র। পুরাণে বর্ণনা আছে ইন্দ্র এই বজ্র দিয়ে বৃত্রাসুরকে বধ করেছিলেন। বৃত্রাসুর জলকে ধরে রাখে। এর তাৎপর্য হল – আমরা সবাই জানি মেঘ জলকে ধরে রাখে। কিন্তু আকাশে মেঘ হলেই বৃষ্টি হয় না। কিন্তু যখন বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল, মেঘের গর্জন হতে থাকল তখন মেঘ থেকে জল ঝরতে শুরু করে। অনেকে ব্যাখ্যা করে ইন্দ্র আর বৃত্রাসুরের কল্পনা এভাবেই এসেছে। বৃত্রাসুর অসুর, তার শরীরের রঙ কালো, সে জলকে ধরে রেখেছে, ছাড়বে না। কিন্তু জল না পেলে প্রাণী জগৎ, বৃক্ষ জগৎ নাশ হয়ে যাবে। তখন ইন্দ্র বিশ্বকর্মাকে দিয়ে বজ্র তৈরী করালেন। এবার এই বজ্র যখন বৃত্রাসুরের উপর চালালেন তখন সে ছিটকে পড়ে গেল, যে জলকে সে ধরে রেখেছিল এখন সেটাই বর্ষণ হয়ে জীব জগতের প্রাণ রক্ষা হল। বেদের এই একটি আখ্যায়িকার উপরে যে কত ধরণের ব্যাখ্যা আছে, আর এখনকার পণ্ডিতরাও এর উপরে নতুন নতুন ব্যাখ্যা দিয়ে যাচ্ছেন। আমরা যারা Indian Spiritual Heritage কে জানতে চাইছি, তাদের এই জায়গাটা খুব ভালো করে বোঝা দরকার। অনন্তের যদি কোন মুখ থাকে তাহলে সেই মুখ হলেন ইন্দ্র। মানুষের মধ্যে যারা মহৎ, যারা ভালো

লোক, তাদের ভালোর জন্য ইন্দ্র সব সময় নিজের কাজ করে যাচ্ছেন। অনেক পণ্ডিত ও ঐতিহাসিকরা ইন্দ্রের পরিচিতিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, যখন আর্যরা ভারতে প্রবেশ করেছিল তখন আর্যরা ভারতের সেই সময়কার জাতি উপজাতিদের মেরে কেটে অঞ্চল দখল করেছিল, সেই আর্যদের যে রাজা ছিল তাকেই পরে ইন্দ্র রূপে চালিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পরে এই ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। বাল্মীকি রামায়ণ এবং পুরাণেও আমরা ইন্দ্রকে পাই, কিন্তু বেদের ইন্দ্র হলেন খুব উচ্চমানের দেবতা।

পুরাণে একটা খুব সুন্দর কাহিনী আছে। দৈত্য আর দেবতাদের অশান্তি সব সময় লেগেই থাকত। দৈত্যরা সবাই মিলে ঠিক করল যে করেই হোক ইন্দ্রকে হারাতে হবে। দৈত্যরা তাদের পিতা কশ্যপ মুনির কাছে গিয়ে ইন্দ্রের নানা রকমের অন্যায় কাজের কথা জানিয়ে দিল, বোঝাতে চাইল যে ইন্দ্র খুবই গোলমেলে দেবতা। কশ্যপ সব শুনলেন, তিনি দেখলেন দৈত্যরা যা বলছে ঠিকই বলছে, আমিও জানি ইন্দ্র বরাবরই গোলমেলে কিন্তু বাকী যারা আছে তারা ইন্দ্রের থেকে আরও অনেক বেশি গোলমেলে। সেইজন্য ইন্দ্রকে দৈত্যদের দিয়ে পিটিয়ে, মার খাইয়ে হারিয়ে দেওয়াটা কখনই সঠিক কাজ হবে না। মনে রাখতে হবে ইদানিং অসুর দৈত্য সম্বন্ধে যে সব ধারণা, বেদের দৈত্য অসুরেরা সেরকম ছিল না। দৈত্য, অসুর দেবতা সবাই একই পিতার সন্তান। পরের দিকে সাহিত্যিকরা তাদের কল্পনা আর কলমের জোরে দৈত্য অসুরদের নীচে নামিয়ে দিয়েছে। তবে ইন্দ্রের সব থেকে যেটা গোলমেলে ছিল তা হল, যদি দেখত কেউ অনেক ক্ষমতার অধিকারী হয়ে যাচ্ছে তখন ইন্দ্র ছলবলে তার ক্ষমতাকে কেড়ে নিত কিংবা তার পতনের একটা ব্যবস্থা করে দিত। তার জন্য ইন্দ্র যে কোন ধরণের অসদুপায় অবলম্বন করতে কোন দ্বিধা করত না। মানে মানবীয় যত রকমের খারাপ গুণ থাকতে পারে সবই ইন্দ্রের মধ্যে ছিল। কিন্তু অন্যরা আরও খারাপ। সেইজন্য কশ্যপ মুনি দৈত্যদের কথায় কান দিলেন না। ইন্দ্রের প্রথম পরাজয় শুরু হয় যখন শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক সাহিত্যগুলো আসতে আরম্ভ করল, অর্থাৎ মহাভারত, ভাগবতাদি আসতে শুরু হল। মহাভারত থেকেই বৈদিক দেবতাদের পতন শুরু হয় এবং আঞ্চলিক দেবতাদের প্রাধান্য বৃদ্ধি পেতে থাকল।

যেখানেই কোন কিছুর আধিক্য দেখবে সেখানেই ইন্দ্র নাক গলাবে, যদি দেখে কারুর সৌন্দর্যের আধিক্য সেখানে ইন্দ্র ঝাঁপিয়ে পড়বে, যদি দেখে কারুর শক্তির আধিক্য ইন্দ্র সেখানে গিয়ে তার শক্তির আধিক্যকে খর্ব করার জন্য সব রকম চেষ্টাতে নিজেকে নামিয়ে দেবে। মানে যার যেটা বেশি আছে সেটাই ইন্দ্রের চাই। ইন্দ্রের এই দুর্বলতাটা খুব বেশি মাত্রায় ছিল। কিন্তু যদি কেউ নিজেকে সর্বোচ্চ না ভাবে তাহলে ইন্দ্র কোন ঝামেলা করবে না, তখন সে পরোপকারী, উদার, বিপদে লড়াই পর্যন্ত করবে। এমনিতে ইন্দ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য সব সময় চেষ্টা করবে। শুধু যদি কেউ একশবার অশ্বমেধ যজ্ঞ করে দেয় তখন সে হয়ে যাবে ইন্দ্র, ঐ ভয়ে ইন্দ্র তার ঘোড়াটাই হয়তো লুকিয়ে দেবে।

বরুণ দেবতা

অগ্নিসূক্তম্ আলোচনা করার আগে অগ্নি দেবতার উপর আলোকপাত করা হয়েছে। বরুণ দেবতাকে বলা হয় upkeeper or Ritam, ব্রহ্মাণ্ডে যে সব কিছু একটা সুনিয়ন্ত্রিত নিয়মের মধ্য দিয়ে চলে এরও উৎস কিন্তু সেই অনন্ত। বিভিন্ন জিনিসকে যে নিয়মের মধ্যে ধরে রাখা হয়েছে তার যে দেবতা তিনি হলেন বরুণ দেবতা। ঠিক সময়ে ঋতুর পরিবর্তন হওয়া, ঠিক সময়ে বৃক্ষে ফুল আসা, ফুল থেকে ফল হওয়া, এই জিনিসগুলো যে ঠিক সময়ে ঠিক ভাবে হয়ে যাচ্ছে তার কারণ ঋতম্। পরিবার ও সমাজে সুস্থ ও স্বাভাবিক ভাবে সবাইকে বসবাস ও চলাফেরা করা জন্য কতকগুলি নিয়ম মেনে চলতে হয়, ঠিক তেমনি ব্রহ্মাণ্ডের যা কিছু হচ্ছে তারও কিছু প্রাকৃতিক নিয়ম বিধি আছে, যেগুলো আমাদের সবাইকে মেনে চলতে হয়। এই নিয়মের জোরেই নিত্য সূর্য উদয় হয়, ঠিক সময়ে ঋতুর আবির্ভাব হয়, গরু দুধ দেয়। কে এই নিয়মগুলির দেখভাল করছেন? সমাজ ও দেশের নিয়মগুলিকে দেখভাল করার জন্যে একটা সরকার যদি না থাকত তাহলে সবাই লুটেপুটে খেত, সবলের অত্যাচারে দেশ উচ্ছন্নে চলে যেত। ব্রহ্মাণ্ডের যা কিছু নিয়ম আছে সেগুলোকে

দেখাশুনোর জন্য যদি কেউ একজন না থাকে তাহলে কেউ আর নিয়মকানুন মানবে না। ব্রহ্মাণ্ডের এই নিয়মকানুনকে বলা হয় ঋতম্, আর ঋতমের আচরণ-বিধিকে পালন করা হয় বরুণের মাধ্যমে।

বিষ্ণু ও রুদ্র দেবতা

বেদে বিষ্ণু একজন খুব ছোট দেবতা, বেদে বিষ্ণুর খুব একটা দাম নেই। পুরাণে হিরণ্যকশ্যিপু দৈত্যরা বিষ্ণুকে গ্রাহ্য করত না। উরুক্রম বিষ্ণুরই আরেকটা নাম, তিন পাদ বিশিষ্ট, এই বিষ্ণুই পুরাণে বামন অবতারে উল্লেখিত হয়েছেন। মহাভারতে এসে বিষ্ণুর অবস্থানটা পাল্টে গেল, ইন্দ্র, বরুণ, মিত্রকে নীচে করে দেওয়া হল আর বিষ্ণুকে উপরে নিয়ে আসা হয়েছে। তবে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী যে নারায়ণের কথা আমরা জানি এই বিষ্ণু কিন্তু সেই বিষ্ণু নন। বেদের বিষ্ণু এক অতি সাধারণ দেবতা। পরেও যে বিষ্ণুকে আমরা পাই তিনিও কিন্তু ভগবান নন। ভগবান আর দেবতার মধ্যে অনেক পার্থক্য। ভগবানকে বেদে পুরুষ রূপে দেখা হতে, যেটা আমরা পুরুষসূক্তমে দেখি, দেবতারা তাঁর থেকে অনেক অনেক নীচে। বিষ্ণুও এই রকম একজন দেবতা, তাও আবার ইন্দ্রের অধীনে। কিন্তু মহাভারতে এসে পুরোটাই বিপরীত হয়ে গেল। বিষ্ণু চলে এলেন ওপরে আর ইন্দ্রের তো এখন কোথাও পূজোই হয় না। ভারতের ঋষিরা ইন্দ্রকেও মূল্য দেন না, বিষ্ণুকেও মূল্য দেন না, আবার ইদানিং কালের যাঁরা মহাত্মা তাঁদেরকেও ভারত মূল্য দেয়না, ভারত মূল্য দেয় সেই অনন্তকে। অনন্তকে আমরা কোন রূপে দেখব তাতে কিছুই যায় আসে না। যদি ইন্দ্রকে এক ব্যক্তিত্ব হিসাবেই দেখা হত তাহলেই কিন্তু এই ছোট বড় করাটা অন্য রকমের হয়ে পছন্দ অপছন্দের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াত। শ্রীরামকৃষ্ণকে যদি আমরা একজন মানুষ বা ব্যক্তি রূপে দেখি তাহলে কিন্তু আমাদের অনেক সমস্যা হবে। ঋষিরা সব দেবতাকে দেখছেন অনন্তের এক একটি রূপে। অনন্তের একটি রূপে দেখলে আমরা কাকে দেখছি সে নিয়ে কোন সমস্যা হবে না। কাল যদি হঠাৎ আমরা বলি সেই সচ্চিদানন্দই একমাত্র সত্য, ইন্দ্র সেই সচ্চিদানন্দ, তখন কাল থেকে ইন্দ্রের পূজা আরম্ভ হয়ে যাবে। মহাভারতে ইন্দ্রকে চিত্রণ করার সময় তাঁকে একজন ব্যক্তিত্বের আধারে, সত্ত্বগুণী আধার রূপে চিন্তা করে চিত্রিত করা হয়েছে। কিন্তু মহাভারত বিষ্ণুকে পুরোপুরি অনন্তের সঙ্গে এক করে দিল। ভারতের এটাই বৈশিষ্ট্য, যাকেই ভারতে অনন্তের সঙ্গে এক করে দেওয়া হবে সেইই ভারতে প্রাধান্য পাবে। মহাভারতে বিষ্ণুকে এটাই করা হয়েছে, অনন্তের যে রূপ সেই রূপকে বিষ্ণুর মধ্য দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে, ইন্দ্রকে তুলে ধরার জন্য কেউ ছিল না সেইজন্য ইন্দ্র নীচে পড়ে গেলেন। আজকে আমরা যখন শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের দিকে তাকাই তখন দেখি তিনি মা কালীর মধ্যে অনন্তকে দেখেছিলেন, কিন্তু আমরা শ্রীরামকৃষ্ণকে অনন্তের সঙ্গে এক করে দিচ্ছি।

এখন যদি কেউ এসে বলে শ্রীরামকৃষ্ণ মা কালীর আরাধনা করেছিলেন কিন্তু বেলুড় মঠে কেন কোন কালী মন্দির বা কালীর পূজা হয় না। এর কি উত্তর দেবে? কোন উত্তর নেই। আমি শ্রীরামকৃষ্ণকে অনন্ত রূপে দেখছি তাই সেখানে আর কোন কিছুর দরকার লাগবে না। এটাই ভারতের বৈশিষ্ট্য এখানে যার সঙ্গে অনন্তকে জুড়ে দেওয়া হবে সেই প্রাধান্য পাবে। বেদে ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ এনারা সবাই কিন্তু অনন্তের সঙ্গে এক। সাধক যে জিনিসকে অনন্তের সাথে জুরে দিয়ে জোর দেবে তার উপর নির্ভর করবে সারা ভারতের দৃষ্টি কোন দিকে যাবে। আমরা যে বলছি ইন্দ্র, বরুণ নীচে চলে গেলেন আর বিষ্ণু উপরে চলে গেলেন এটা কোন শক্তির তারতম্যের জন্য উপর নীচ হয়ে যায়নি, কবি বা লেখকের দৃষ্টিভঙ্গীতে তিনি যাকে অনন্তের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন সেইই উপরে চলে গেলেন। ব্যসদেব ইন্দ্রকেও গুরুত্ব দিচ্ছেন না আবার বিষ্ণুকেও গুরুত্ব দিচ্ছেন না, তিনি জোড় দিচ্ছেন অনন্তের উপরে। মহাভারতের সময়ে ব্যসদেব দেখলেন ইন্দ্রের উপর সাধারণ মানুষ এত বেশি ব্যক্তিত্বের আরোপ করেছে আর ইন্দ্রের চরিত্রে এত বেশি গণ্ডগোল রয়েছে তিনি তখন ইন্দ্রকে ছেড়ে দিয়ে অন্য একটি আদর্শকে নিয়ে আসাটা প্রয়োজন মনে করলেন। এই কারণে তিনি ইন্দ্রকে ছেড়ে বিষ্ণুকে নিয়ে এলেন। ব্যাসদেব কোন ভুল করেননি, কারণ সব দেবতাই অনন্তের মুখ, আমি কাকে পছন্দ করছি কি করছি না তাতে কিছুই যায় আসে না। বেদের ইন্দ্র আর মহাভারত বা পুরাণের বিষ্ণুর ধারণার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তবে মহাভারতে যে পার্থক্যটা করা হয়েছে তা হল, মহাভারতে বিষ্ণুকে পুরুষের সঙ্গে এক করে দেওয়া হয়েছে, সেখানে বলছে বিষ্ণুই আদি পুরুষ, আর ইন্দ্রকে একজন সীমিত ব্যক্তিত্বের আধারে নামিয়ে

দিয়েছে। আবার পুরাণে বিষ্ণু আর শিবকে অনন্তের সাথে এক করে দিয়েছে। যারা বিষ্ণু ভক্ত তারা বিষ্ণুকে অনন্ত মনে করে আবার যারা শিব ভক্তরা শিবকে অনন্ত মনে করে। আর যারা শক্তির ভক্ত তারা শক্তিকে অনন্ত মনে করে। আমাদের কাছে ঠাকুর হলেন অনন্তের মুখ, সেইজন্য অন্যান্য দেব-দেবীর সম্বন্ধে ধারণার ব্যাপারে আমাদের মনে কোথায় যেন একটা ঘাটতি থেকে যায়।

রুদ্রও বেদের খুব সাধারণ এক দেবতা। অথচ রুদ্রের উপর বিখ্যাত মন্ত্র বেদেই পাওয়া যায়, যেমন *ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্ধনম্*। পরে একাদশ রুদ্রের যে দলপতি তাঁর সঙ্গে শিবকে এক করে দেওয়া হয়েছে। শিব, শঙ্কর, রুদ্রকে এক করে দিয়ে সেই অনন্তের সঙ্গে এক করে দিয়েছে। বেদে শিব বলে কিছু নেই বিষ্ণু আর রুদ্রকেই বেদে পাওয়া যাবে। তবে এনারা দুজনেই ইন্দ্রের অধীনে খুবই সাধারণ দেবতা। ভারত কিন্তু দেব-দেবীর পূজারী নয় দেব-দেবীর মধ্য দিয়ে আসলে ভারত অনন্তেরই আরাধনা করে আসছে। কিন্তু অনন্তকে এই ভাবে পূজা করা যায় না বলে তারা একটা মুখকে ধরে নিয়ে সেই মুখকেই অনন্তের মুখ ধরে নিয়ে সমস্ত পূজা করে যাচ্ছে।

বেদের ঋষি

সংস্কৃতের প্রাচীন অভিধানে ঋষি শব্দকে পরিভাষিত করতে গিয়ে বলছেন – *ঋষ্যতি জ্ঞানেন সংসার পারম্*। *ঋষ্যতি* মানে পৌঁছান, যিনি জ্ঞানের দ্বারা সংসারের পারে যান। 'জ্ঞান', 'সংসার', 'পারে যাওয়া', এই কথাগুলো আসার জন্য ঋষি শব্দের অনেকগুলো অর্থ হয়ে যায়। অনেক সময় বলা হয় যিনি দ্রষ্টা তিনিই ঋষি বা যিনি অনুভূতি পেয়েছেন তাঁকে ঋষি বলা হয়। এইভাবে ঋষির অনেকগুলো অর্থ হয়, কিন্তু মূল ব্যাপারটা একটা জায়গাতেই কেন্দ্রিত থাকে। বর্তমান কালে বড় বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে চেতনার উপর প্রচুর গবেষণার কাজ চলছে। পাশ্চাত্যের চিন্তাবিদরা চৈতন্যকে অনেক ভাবে ব্যাখ্যা করেন। রজার পেনরোজ একজন নামকরা পদার্থ বিজ্ঞানী, চৈতন্যের উপর তাঁর খুব জনপ্রিয় বইয়ের নাম The Emperor's New Mind। অনেক মোটা বই কিন্তু কেউই বুঝতে পারেন না উনি ঠিক কি বলতে চাইছেন। বইটিতে তিনি চেতনার উপর প্রচুর আলোকপাত করেছেন। আসলে পদার্থ বিজ্ঞানীরা পঞ্চভূতের খেলাকেই বেশি মান্যতা দেন। এনাদের কাছে চেতনা মানে বস্তুকে জানার ক্ষমতা। বিজ্ঞানীদের মতে মস্তিষ্কে নিউরোন, কেমিক্যালসের যে ক্রিয়াকলাপ হয় সেই ক্রিয়ারই পরিণতি হল চেতনা। আমি দরজা দিয়ে এই ঘরে প্রবেশ করলাম, আমি আছি বলেই দরজা দিয়ে ঘরের ভেতরে ঢুকলাম, এখানে দরজার কোন ভূমিকা নেই। কেউ যদি বলে দরজা ছিল বলেই আমি এসেছি, জিনিসটা ঠিক বলা হবে না। তবে উপমা দিয়ে কখনই সত্যকে প্রমাণ করা যায় না। বেশির ভাগ ধর্মীয় বক্তারা একটা উপমাকে নিয়ে সেই উপমাকে আধার করে একটা সত্যে উপনীত হন। উপমা একটা সত্যকে ধারণা করতে একটা অবস্থা পর্যন্ত সাহায্য করে, কিন্তু এর পর যতক্ষণ চিন্তার গভীরে না যাওয়া যায় ততক্ষণ পর্যন্ত সত্যকে উদ্‌ঘাটন করা যায় না। কোন ঋষি বা আচার্য বিষয়ের অন্বেষণ করে করে যখন সত্যে পৌঁছান, তখন তিনি তাঁর শিষ্যকে বোঝানোর জন্য একটা উপমা নিয়ে আসেন। ইদানিং পপুলার হিন্দু ধর্ম বলতে আমরা যা বুঝি তাতে একটা উপমাকে নিয়ে নেওয়া হয়, উপমাকে নিয়ে সত্যের দিকে যায়।

যিনি চৈতন্যকে নিয়েই সব সময় থাকেন তিনিই ঋষি। ঋষিরা ঠিক কি উপলব্ধি করছেন বা ধারণা করছেন, তিনি ঠিক কি দেখছেন, কি অনুভব করছেন এগুলোকে আমাদের পক্ষে বোঝা খুব কঠিন। সাধারণ স্তরে নেমে এসে ঋষিরা তাঁদের যে অভিজ্ঞতার কথাগুলি বলছেন, বিজ্ঞানীরা সেগুলোকে কিছুতেই বুঝতে চান না, মানতেও চান না। এই কলমকে আমি আমার ইন্দ্রিয় দিয়ে দেখছি। ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে মস্তিষ্কে একটা ইমেজ যাচ্ছে, সেখানে নিউরোন গুলি কাজ করছে আর তাতে আমার একটা বোধ হচ্ছে যে, আমি এই কলম দেখছি। আমার কাছে কলমটা সত্য। যে মস্তিষ্ক দিয়ে বোধ হচ্ছে কলমটা সত্য, এই জগৎ সত্য বলে মনে হচ্ছে, সেই মস্তিষ্ক দিয়েই ঋষির কাছে ঈশ্বরকে সত্য বলে বোধ হচ্ছে। ঋষির জ্ঞানকে যদি প্রশ্ন করা হয় তাহলে আমার জগতের জ্ঞানকেও প্রশ্ন করতে হবে। প্রশ্ন করতে হলে দুটোকেই প্রশ্ন করতে হবে। ঠিক যদি মনে হয় তাহলে দুটোকেই ঠিক মনে করতে হবে। বেদান্ত এই কথাই বার বার বলে যাচ্ছে, আমার ঈশ্বর জ্ঞান যদি ভুল হয়

তাহলে তোমার জগৎ জ্ঞানটাও ভুল। তাহলে এই জগতকে নিয়ে এত লাফালাফি করারই বা কী আছে আর এত কান্নাকাটি করাই বা কেন? কিন্তু এখানে ঋষি শব্দকে পরিভাষিত করতে গিয়ে বলছেন, যিনি সংসারের পারে যান। এই সংসারটা কি? সংসারের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে আবার অনেক সমস্যার উদ্ভব হয়। আচার্য শঙ্কর সংসারের পরিভাষাকে খুব ব্যবহারিক স্তরে নামিয়ে এনে বলছেন, শোক আর মোহ এটাই সংসার। জ্ঞানের সাহায্যে মানুষ শোক আর মোহের পারে চলে যায়। জ্ঞান ছাড়া মানুষ শোক মোহের পারে যেতে পারে না। ঋষিরা যত রকমের শোক মোহ হতে পারে চিরদিনের মত সব রকম শোক মোহের পারে চলে যান। এখানে ঋষিরা কিন্তু সন্ন্যাসী নন। সন্ন্যাসীরা কোন কিছুতে নিজেকে জড়াবেন না। সন্ন্যাসীরা খুব সেয়ানা, জালের ধারে কাছেই যাবেন না। অথচ বেশির ভাগ ঋষিরা আবার সংসারেই থাকতেন। ঋষিদের স্ত্রীও থাকত, সন্তানও হত, জমি-জায়গাও থাকত কিন্তু তাতেও তাঁরা এগুলোর পারে। হিন্দু ধর্মের মূল দর্শন জন্ম-মৃত্যুর চক্রকে কেন্দ্র করেই দাঁড়িয়ে আছে। আচার্য শঙ্কর খুব সুন্দর ছন্দে বলছেন, *পুনরপি জননং পুনরপি মরণং পুনরপি জননীজঠরে শয়নং। ইহ সংসারে খলু দুস্তারে, কৃপয়াহপারে পাহি মুরারে।।* জন্ম আর মৃত্যু বারংবার ঘুরে ঘুরে আসে, পুনরায় মাতৃজঠরে বাস করতে হয়, হে মুরারি! এই দুরতিক্রম সংসার থেকে আমাকে কৃপাপূর্বক উদ্ধার কর। এটাই হিন্দু ধর্মের দর্শনের মূল কেন্দ্রবিন্দু, জ্ঞান না হলে আবার জন্ম নিতে হবে। তাছাড়া এমন এমন অনেক ঘটনা আছে তাতে মনে হয় পুনর্জন্মটাই সত্য। বৌদ্ধ ধর্মেও জন্ম-মৃত্যুর উপর খুব জোর দেওয়া হয়েছে। ঋষি শব্দের মূল অর্থ হল যিনি শুধু মাত্র জ্ঞানের সাহায্যে লৌকিক দৃষ্টিতে শোক আর মোহের পারে চলে যান আর পারমার্থিক দৃষ্টিতে জন্ম-মৃত্যুর পারে যান। স্বামীজী আবার এক জায়গায় বলছেন, আমি সেই ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না যিনি আমাকে এখানে এক টুকরো রুটি দিতে পারেন না আর মৃত্যুর পরে অনন্ত স্বর্গ দেবেন। সত্যিই তো তাই, ভগবান আমাকে এখানে খেতে দিলেন না, শান্তিতে থাকতে দিলেন না আর তাঁকে ভালোবাসলে তিনি নাকি আমাকে অনন্ত স্বর্গ দেবেন, এই ধরণের ভগবানকে নিয়ে আমি কি করব! অথচ গোটা ইসলাম আর খ্রীশ্চান ধর্ম এই কথাই উপরই দাঁড়িয়ে আছে। আল্লার ইচ্ছায় আমাদের একবারই জন্ম হয়েছে আর জন্ম হবে না, আমাদের যা দুঃখ কষ্ট, ভালো-মন্দ সব আল্লার ইচ্ছাতেই হয়, এই জন্যে আমি যদি আল্লা বা ঈশ্বরের নাম করি তিনি আমাকে অনন্ত স্বর্গ দেবেন। হিন্দু ধর্মে তাও কর্মবাদ নিয়ে এসেছে, আমাদের কর্মের জন্যই সব কিছু হয়। তাই শুধু যদি পারমার্থিক দৃষ্টিতে দেখা হয় তাহলে সেই ধর্ম মানুষের কোন কাজে লাগবে না। বৌদ্ধ ধর্মেও বলে দুঃখ নিবৃত্তি, দুঃখ নিবৃত্তি মানেই আচার্যের কথা অনুযায়ী শোক আর মোহের নাশ।

বেদের ঋষিরা খুবই উচ্চমানের আধ্যাত্মিক পুরুষ ছিলেন। যাঁরাই বেদ নিয়ে অধ্যয়ন করেছেন তাঁরা সবাই ঋষিদের কথা ভেবে অবাক হয়ে গেছেন। এমনকি ম্যাক্সমুলারও ঋষিদের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলছেন, বেদের ঋষিরা এমন অবস্থায় পৌঁছেছিলেন, ওই উচ্চ অবস্থার কথা সাধারণ মানুষ কল্পনাও করতে পারে না। সৎ বুদ্ধি অসৎ বুদ্ধি সব বস্তুতেই দেখা যায়, যেটাই সৎ সেটার ব্যাপারেই আমাদের চেতনা হয়, আমরা ওই বস্তুকে জানতে পারি। যে জিনিসকে আমরা জানি সেই জিনিসকেই আমরা ভালোবাসি। যেমন গভীর নিদ্রাতে আমাদের যে শুদ্ধ অস্তিত্বের অনুভূতি হয়, সেই শুদ্ধ অস্তিত্বের প্রতিই আমাদের এত ভালোবাসা। সৎ বুদ্ধি, অসদ্বুদ্ধি, সৎ, চিৎ, আনন্দ এগুলোর উপর বেদান্তের সিদ্ধান্তগুলি নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে করতে মনের গভীরে যাওয়ার পর মনের মধ্যে এমন এমন প্রশ্ন আসতে শুরু করবে তখন মাথা ঝিমঝিম করতে শুরু করে দেবে। ধর্মের দুটো রূপ, একটা খুব সহজ সরল, ঈশ্বর আছেন, তাঁর ইচ্ছাতেই সব কিছু হয়, আমার খাওয়া-পড়ার ব্যবস্থা করছেন, এটা খুব সহজ সরল ধর্ম, এই ধর্ম কোন ধর্মই নয়। কিন্তু যেমনি এর ভেতরে ঢুকতে শুরু করা হবে তখনই বিচিত্র বিচিত্র রকমের সিদ্ধান্ত আসতে শুরু হয়ে যাবে। এই সিদ্ধান্তগুলিকে ধরার চেষ্টা করলে নিজেরই আতঙ্ক লেগে যায়, তখন নিজের অস্তিত্বকে নিয়েই প্রশ্ন এসে যায়। ঋষিরা এভাবেই এগিয়েছিলেন। এটা কোন cross-word puzzle খেলার মত বুদ্ধি বিলাস নয়। এ এমনই এক জ্ঞানের অন্বেষণ যে, এই অন্বেষণে পুরো জীবনটা উৎসর্গীকৃত। এই জ্ঞানে তাঁদের জীবনেও প্রতিফলিত হয়ে যায় বলে সবটাই তাঁদের কাছে সত্য রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। ওই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে তাঁরা তাঁদের উপলব্ধিকে ভাষার মাধ্যমে যা কিছু প্রকাশ করেছেন সেটাই বেদ রূপে আবির্ভূত হয়েছে।

ঋগ্বেদের দ্বিতীয় মণ্ডল থেকে অষ্টম মণ্ডলগুলি বিভিন্ন ঋষিদের ঘরানায় দেওয়া হয়েছে। নবম মণ্ডল দেওয়া হয়েছে সোমকে উদ্দেশ্য করে। প্রথম দশম মণ্ডলে বিভিন্ন ঋষিদের নাম পাওয়া যায়। এরমধ্যে একজন নামকরা ঋষি হলেন অঙ্গিরস। কন্ব ঋষির নাম যদিও বেদে এসে গিয়েছিল কিন্তু কণ্ব ঋষির নাম আরও পরের দিকে গিয়ে বিখ্যাত হয়েছে। বশিষ্ট, বিশ্বামিত্র ঋষির নামও আমরা বেদে পাই। কিন্তু এনাদের মধ্যে অঙ্গিরস, অথর্ব, ভৃগু খুব বিখ্যাত ঋষি ছিলেন। বেদের যাঁরা নামকরা ঋষি ছিলেন তাঁদের স্বর্গে স্থান দেওয়াটা যেন ঠিক শোভা পায় না, তাই তাঁদের সম্মান দেওয়ার জন্য সপ্তর্ষিমণ্ডলে পাঠিয়ে দিলেন। আচার্য শঙ্করও সপ্তর্ষিমণ্ডলের উল্লেখ করে বলছেন এনারা সপ্তর্ষিমণ্ডলের ঋষি। তবে বিভিন্ন পুরাণে সপ্তর্ষিমণ্ডলের ঋষিদের নামগুলো পাল্টাতে থাকে। কোন উচ্চমানের ঋষিকে সম্মান দিতে হলে বলা হত, ইনি সপ্তর্ষিমণ্ডলের ঋষি। স্বামীজীর সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ঠাকুরও বলছেন, আমি ওকে সপ্তর্ষিমণ্ডল থেকে নিয়ে এসেছি। বেদের ঋষিদের মধ্যে বশিষ্ঠ আর বিশ্বামিত্রের নাম পরের দিকে খুব বেশি প্রচলিত হয়েছে। বশিষ্ঠের নামে ঠাকুরের একটা খুব বিখ্যাত কথা আছে, ঠাকুর বলছেন এনারা জ্ঞানী, জ্ঞানী ভয়তরাসে।

বেদের ঋষিরাও তিনটে গুণের মধ্যে যেন বাঁধা ছিলেন। তাঁদের মধ্যেও কিছু জাগতিক দুর্বলতা দেখা যেত। দেখা যায়, কোন শোক মোহ এলে তাঁরাও কখন-সখন নড়ে যেতেন। যাঁরা ত্রিগুণাতীত, যেমন শুকদেব, তাঁরা নড়বেন না। সন্ন্যাস বৃত্তি যাঁরা নিয়েছিলেন তাঁরাও কোন ভাবেই নড়বেন না। যদিও বেদ ও শাস্ত্রের উপর ব্যাসদেবের বিরাট অবদান, কিন্তু তাঁকে ত্রিগুণাতীত বলে কোথাও উল্লেখ করা হয় না। কিন্তু সাধনা করে করে ঋষিরা এমন একটা অবস্থায় চলে গেছেন যেখানে তাঁরা আধ্যাত্মিক সত্যগুলিকে প্রত্যক্ষ করতে পেরেছেন। ঋষিরাও তাই তাঁদের রচনাকে কখনই নিজের রচনা বলে মনে করতেন না। তাঁরা জানতেন ঈশ্বর যেমন চিরন্তন, এই সত্যগুলিও চিরন্তন। ঋষিদের চরিত্রের মূল বৈশিষ্ট্য হল, কোন পরিস্থিতিতেই তাঁরা ধর্ম, যজ্ঞ এগুলোর বাইরে যেতেন না। কথামৃতে ঠাকুরও বলছেন, আগেকার ঋষিরা কত খাটতেন, সকাল হতেই কুঠিয়া থেকে বেরিয়ে জঙ্গলে গিয়ে ধ্যানাদি করতেন আর সন্ধ্যেবেলা কুঠিয়ায় ফিরে একটু ফলমূল খেতেন।

বেদে ঋষিদের সাথে অনেক ঋষিকাদেরও নাম পাওয়া যায়। একদিকে যেমন দেবীসূক্তমের দ্রষ্টা একজন ঋষিকা ছিলেন অন্য দিকে উপনিষদে আমরা গার্গি, মৈত্রেয়ীর নাম পাই। তাছাড়া ঋষিদের স্ত্রীরাও খুব উচ্চমানের ছিলেন, যেমন অগস্ত্য মুনির স্ত্রী লোপমুদ্রার খুব নাম ছিল। ঋষিকাদেরও তখন অনেক সম্মান ছিল। অনেকে যে বলেন বেদে মেয়েদের অধিকার নেই, এগুলো সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। ঋষিকাদের অনেকেই মন্ত্রদ্রষ্টা ছিলেন আবার মন্ত্রদ্রষ্টা না হলেও তাঁরা বেদ জানতেন, তাই ঋষিদের স্ত্রী বা কন্যারা সবাই বিদুষী ছিলেন। লোপমুদ্রার নাম ছাড়াও আরও অন্যান্য অনেক ঋষিকাদের নাম পাওয়া যায়, যাঁদের মধ্যে রোমশ, সরস্বতী, অপালা, শ্রদ্ধা, ঘোষা, পূর্বশী, সরমা, পৌলমী এনারা সবাই খুব নামকরা ঋষিকা ছিলেন।

বৈদিক সময় মুনি শব্দ ব্যবহার না করে ঋষি শব্দই ব্যবহার করা হত। মুনি মানে যিনি মনন করেন অথবা যিনি মৌন হয়ে গেছেন। ঋষি আর মুনির মধ্যে কোন বাঁধাধরা পার্থক্য করা হয় না। ঋষিরা বেশির ভাগ সময় যজ্ঞাদি করতেন। যজ্ঞাদি করতেন বলে তাঁদের সাধারণ মানুষের মধ্যে থাকতে হত। মুনিরা যজ্ঞাদি ত্যাগ করে ধ্যানের গভীরে বেশি চলে যেতেন। মুনিরাও যজ্ঞ-যাগাদি জানতেন কিন্তু করতেন না। সন্ন্যাসীর ধারা মুনিদের পরম্পরা থেকেই এসেছে। ঋষিরাও ধ্যানের গভীরে থাকতেন কিন্তু তার সাথে তাঁরা নিয়মিত যজ্ঞাদিও করতেন এবং করাতেন। ঋষিরা পুরোপুরি অনাসক্ত ছিলেন কিনা বলা খুব মুশকিল, কারণ তাঁরাও যে যজ্ঞাদি করতেন সেখানে তাঁদেরও কিছু পাওয়ার আকাঙ্খা থাকত। ঠাকুর বলছেন জ্ঞানী ভয়তরাসে।

বেদের যজ্ঞ

বেদের প্রধান বিষয় যজ্ঞ। যজুর্বেদের মন্ত্রগুলি যজ্ঞে ব্যবহৃত হত। ঋগ্বেদের মন্ত্র স্তুতির কাজে ব্যবহার করা হত। সামবেদের মন্ত্র গানের জন্য, সামবেদের মন্ত্রগুলিকে তাই সামগান নামে অভিহিত করা হত। হিন্দুদের ধর্মই যজ্ঞ প্রধান। যখন কোন মানুষ, কোন সমাজ বা কোন দেশ কোন ধর্মীয় কাজ করে, কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান করে তখন তাকেই আমরা যজ্ঞ বলি। ধর্মমূলক বা ধর্মভাব নিয়ে যাই করা হবে সেটাই যজ্ঞ। আমরা

সারাদিনে অনেক রকম কাজ করে থাকি, খাওয়া, শোওয়া, বসা, হাঁটা চলা, থুতু ফেলা সবই কাজ, কিন্তু এই কাজগুলিকে আমরা সাধারণত বলি জাগতিক কাজ। এমনকি যাদের মন এখনও নিয়ন্ত্রিত হয়নি, তাদের কাছে এগুলো জাগতিক কাজ রূপেও ধরা হয় না, এগুলোকে গর্হিত কর্ম রূপেই গণ্য করা হয়ে থাকে।

সাধারণ মানুষ সারাদিন যা কাজ করে তাদের সব কাজ জাগতিক থেকে গর্হিত কর্মের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। মানব জীবন জাগতিক কর্ম আর গর্হিত কর্মের মধ্যেই ঘোরাফেরা করে। কিন্তু যে কোন কাজই, জাগতিক হোক কিংবা গর্হিত হোক, যখনই ধর্মের মনোভাব নিয়ে করা হবে বা কোন কাজের পেছনে ধর্মের যোগান লাগিয়ে দেওয়া হয় তখন সেই কাজটাই যজ্ঞ হয়ে যাবে। আগেকার দিনে, এখনও কোথাও কোথাও কৃষিকার্যের শুরুতে চাষীরা ভগবানের নাম করতে করতে বীজ বপন করে, বৃক্ষাদির চারা বপন করার সময়ও ভগবানের নাম নিয়ে চারা লাগান হয়। বেদে বৃক্ষ রোপণের আলাদা মন্ত্র আছে। শ্রীমায়ের জীবনে তেলেভুলো মাঠের ডাকাত বাবা মার কাহিনী সবাই জানি। ডাকাতি করতে যাচ্ছে তখনও মায়ের নাম করে ডাকাতি করতে যাচ্ছে। ডাকাতি কর্ম অত্যন্ত গর্হিত কর্ম, কিন্তু তার কাছে এসব কিছুই নয়, মাকালীর পূজা দিয়ে সে ডাকাতি করতে যাচ্ছে, তার মনে এর জন্য কোন পাপ বোধ নেই। কেন তার মনে পাপ বোধ নেই? কারণ সে ওটাকে যজ্ঞ রূপে নিচ্ছে। কোন পশুকে বলি দেওয়াটাও একটা গর্হিত কর্ম, কিন্তু বলিটা যজ্ঞ রূপে নিচ্ছে। যখনই কোন কর্মের পেছনে ধর্মের শক্তিকে লাগিয়ে দেবে, তা যতই গর্হিত কর্ম হোক না কেন, সেটাই যজ্ঞ হয়ে যাবে।

গীতাতে ভগবান বলছেন যে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস অত্যন্ত সাধারণ জিনিস, সেটাও যজ্ঞ রূপে করতে বলছেন। যে মানুষ মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে শেষ নিঃশ্বাস ফেলার জন্য অপেক্ষা করছে আর যে শিশু জন্ম নিয়েই নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নিতে শুরু করল, সেই নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসকেও যজ্ঞ রূপে নিতে বলা হচ্ছে। এই নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসকে কিভাবে যজ্ঞ রূপে নিতে বলছেন? এই নিঃশ্বাস প্রশ্বাসকে যখন আধ্যাত্মিক রূপ দিয়ে দেয় তখন সেটাই হয়ে যায় প্রাণায়াম। *অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাঽপরে। প্রাণাপানগতী রুদ্ধ্বা প্রাণায়ামপরায়ণঃ।।*(৪/২৯)। আমরা যে যজ্ঞের কথা বলছি গীতার তৃতীয় আর চতুর্থ অধ্যায়ে যজ্ঞের এই ভাবকে শ্রীকৃষ্ণ ব্যাখ্যা করেছেন। স্বামী স্ত্রী যখন এক সঙ্গে থাকাটাও যজ্ঞ রূপে নিতে বলা হচ্ছে। সমস্ত কর্মকেই যজ্ঞ রূপে নিতে বলছেন। এমন কোন কর্ম আমাদের জানা নেই যে যেটাকে যজ্ঞ রূপে করা যায় না, শুধু ঐ কর্মের সঙ্গে ভগবানকে জুড়ে দিতে হবে। ঠাকুর কালিপদ ঘোষকে বলছেন – মদ খাবি তো মাকে নিবেদন করে খাস্। যেই মাকে অর্পণ করে খাবে তখন মদ খাওয়াটাও যজ্ঞ হয়ে গেল। গ্রামের লোকেরা যখন ওজন করে তখনও রাম নাম নিয়ে ওজন করছে।

যতদিন সমস্ত কর্মকে যজ্ঞে না রূপান্তরিত করা যাবে ততদিন জীবনে অশান্তির শেষ হবে না। যারই জীবনে অশান্তি লেগে আছে বুঝে নিতে হবে সে তার কর্মগুলি যজ্ঞের মনোভাব নিয়ে করছে না। যেদিন থেকে প্রত্যেকটি কাজ যজ্ঞের মনোভাব নিয়ে করতে শুরু করবে, থুতু ফেললাম যজ্ঞ, স্নান করলাম যজ্ঞ, খাচ্ছি যজ্ঞ, ঝগড়া করছি যজ্ঞ আর যে কাজ করতে গিয়ে আমার যজ্ঞ বোধ হবে না সেই কাজ আমি কখনই করতে যাব না, জীবনে তার কখনই অশান্তি আসতেই পারবে না। আমরা এখানে শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে এসেছি, আমাদের কেউ কাউকে চিনতাম না, কিন্তু আমরা সবাই ঠাকুরকে জানি, ঠাকুরকে কেন্দ্র করেই আমাদের সম্পর্ক তৈরী হয়েছে আর এখানে আমরা শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে এসেছি, এই কর্মের পেছনে আছে ঠাকুর, তাই এটাও একটা যজ্ঞ। আমাদের সব কর্মকেই এইভাবে দেখতে হবে। আমি একজনকে পছন্দ করিনা, কিন্তু সে আমার সাথে কথা বলতে চাইছে, আমি যদি তার সাথে কথা বলাটাকে যজ্ঞ হিসাবে না নিতে পারি তাহলে আমার উচিৎ তাকে পরিহার করে চলা। যজ্ঞ রূপে না নিলে আমার মন বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে, আমার মনে অশান্তি চলে আসবে। যদি যজ্ঞ রূপে নিয়ে তার সাথে কথা বলি তাহলে কখনই মনের মধ্যে কোন ধরণের বিকার আসবে না।

আমরা এখানে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা করতে যাচ্ছি। কারণ সমগ্র বেদ আর তার পুরো সাহিত্য একটা দিকেই ইঙ্গিত করছে, সেটা হল যজ্ঞ। Yajna is the consecration of the mundane to the divine, জাগতিক যা কিছু আছে সব কিছুকে ঈশ্বরের অর্পণ করে দেওয়াটাই যজ্ঞ। স্বামী ব্রহ্মানন্দের একজন দক্ষিণ ভারতীয় মহিলা শিষ্যা চেন্নাই মঠে গুরুকে প্রণাম করতে গেছেন। প্রণাম করে মহিলা

রাজা মহারাজকে বলছেন ‘মহারাজ, আমি আপনাকে কিছু দিতে চাই, আপনি বলুন আপনাকে আমি কি দিতে পারি’। স্বামী ব্রহ্মানন্দজী খুব মুডি লোক ছিলেন, হয়তো শুনলেন কেউ একজন তাঁর সাথে দেখা করতে আসছে, তিনি চাইছেন না লোকটির সাথে দেখা করতে, তিনি দু জনকে ধরে তাস বার করে তাস খেলতে শুরু করে দিতেন। লোকটি যখন এসে দেখবে যে যাঁর নামে এত কথা শুনেছি, উনি নাকি শ্রীরামকৃষ্ণের সন্তান, উনি আবার তাস খেলছেন। তাস খেলছে দেখেই ভদ্রলোক চলে যেত। আরেকবার শুনলেন কেউ আসছে, তার সাথে কথা না বলতে হয় তাই উনি তাড়াতাড়ি ছিপ নিয়ে মাছ ধরতে বসে গেলেন। তাস খেলা, ছিপ দিয়ে মাছ ধরা এগুলো ছিল তার কিছু লোককে কাটাবার একটা কৌশল। তখন রাজা মহারাজ ভদ্রমহিলার কথা শুনে বললেন ‘তুমি এক কাজ কর, তোমার সবচেয়ে যেটা প্রিয় জিনিস সেটা আমাকে দিও’। ভদ্রমহিলা ছিলেন অত্যন্ত বিদুষী, অনেক চিন্তা ভাবনা করার পর উনি বলছেন ‘মহারাজ, আমার অমুক ছেলে আমার সবচেয়ে প্রিয়, এই নিন আমি ওকেই আপনাকে দিলাম’। মানে অর্পণ করে দিলেন। পরবর্তিকালে ঐ ছেলেই সাধু হয়ে স্বামী তপস্যানন্দ হলেন। পরে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন। ওনার অনেক লেখা বই আছে। এইটাই consecration, এ আমার সন্তান, আমার সবচেয়ে প্রিয়, আমি আমার গুরুকেও ভালোবাসি, তাই সবচেয়ে প্রিয় জিনিসটাই গুরুকে অর্পণ করে দিলাম।

এটাই ঠিক ঠিক ঈশ্বরে অর্পণ, যে অর্পণ করছে সে মহৎ হয়ে যায়, যে জিনিসটা অর্পণ করছে সেটাও মহৎ হয়ে যায়। অথচ আমরা যখন অর্পণ করি তখন কত হিসেব কষে ভগবানকে দেই। একজন সাধুকে তার ভাষণ শোনার পর এক ভক্ত এক টাকা প্রণামী দিচ্ছে তাও বলছে ষোল আনা দিতে হয় তাই দেওয়া। রাস্থার ভিখারীও এক টাকা নিতে চায়না। আমাদের জীবনে তাই অশান্তিরও শেষ নেই। এটা কখনই consecration নয়। যজ্ঞ যখন করতে যাব তখন এই consecration এর মনোভাব নিয়েই যজ্ঞ করতে হবে। আমার যা কিছু জাগতিক আছে, সেটাকে অর্পণ করে দিতে হবে, হে ঈশ্বর এ আমার নয়, এ তোমারই জিনিস। গর্হিত জিনিসকে অত্যন্ত পবিত্র জিনিসে এইভাবে রূপান্তরিত করে দিতে হবে। মাংস খাওয়া, মদ খাওয়া এগুলো গর্হিত, তারপর নারী-পুরুষের যে সম্পর্ক সেটাও গর্হিত, এগুলো একেবারেই করতে নেই। কিন্তু যখন যজ্ঞের মনোভাব নিয়ে করা হবে তখন এগুলোই পবিত্র কর্মে রূপান্তরিত হয়ে যাবে, তন্ত্রে এটাই করা হয়, মাছ, মাংস, মদ, মৈথুন এগুলোকে মায়ের কাছে consecrate করে দেওয়া হয়।

একটি হল জাগতিক দুনিয়া আরেকটি আধ্যাত্মিক দুনিয়া। কিন্তু যাঁরা খুব উচ্চস্তরের, যেমন ঠাকুর, এনাদের কাছে জাগতিক বলে কিছু নেই তাঁদের কাছে সবটাই আধ্যাত্মিক, তাঁরা দেখেন একমাত্র আত্মাই আছেন, আত্মা ছাড়া কিছু নেই। আমাদের মত সাধারণ লোকের দু রকমের দৃষ্টি – একটা জাগতিক আরেকটা আধ্যাত্মিক। জাগতিক থেকে আধ্যাত্মিকে যাওয়ার যে সেতু তা হল যজ্ঞ। যজ্ঞ হল জাগতিক ও আধ্যাত্মিকতার সেতুবন্ধন। পাড়ার ইয়ং ছেলেদের কত এনার্জী, সারাটা বছর রকে আড্ডা মারছে, কত রকমের ইয়ার্কি ফাজলামি করে সময় কাটাচ্ছে, কিন্তু যেই দুর্গাপূজা এসে যাবে এরা কী উৎসাহ নিয়ে পূজার কাজে নেমে গেল। নাচুক, গান করুক, ঢাক পেটাক যাই করুক, কিন্তু কোথাও তার মনের মধ্যে একটা সুর বাজতে থাকবে যে মা দুর্গার পূজা হচ্ছে। দশ বছর পর যখন সে বিদেশে চলে যাবে তখন দুর্গাপূজার সময় তার মনে পড়ে যাবে আমিও এক সময় দুর্গাপূজা করতাম। খুব সাধারণ জিনিসই জীবনকে পাল্টে দেবে। কিভাবে? যে কোন জিনিসকে যখনই ধর্মের সাথে জুড়ে দেবে, সেখান থেকেই জীবনটা পাল্টাতে থাকবে, একদিনে হয়তো হবে না, সময় লাগবে, কিন্তু হবেই। এটাই যজ্ঞের মহিমা, জাগতিককে আধ্যাত্মিকতার সাথে জুড়ে দিচ্ছে যজ্ঞ।

আমি নিজেকে সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছি, আমি নিজেকে একটা দ্বিপদ বিশিষ্ট মানুষ রূপে ভেবে রেখেছি, আমার শীত লাগে, আমার গরম লাগে, আমার দুঃখ হয়, আমার আনন্দ হয়, আমার কষ্ট আছে, আমার সুখ আছে। প্রকৃতি যেন আমাকে ছোট করে থাকতে বাধ্য করছে। অথচ শাস্ত্র বারবার একটা কথাই বলে যাচ্ছে, তুমি সেই পূর্ণ আত্মা। একটা বাঘকে জঙ্গল থেকে ধরে এনে খাঁচার মধ্যে রেখে খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দিলাম। তারপর যখন না খেয়ে খেয়ে দুর্বল হয়ে যাবে তখন তাকে খুব করে পেটাতে থাকলাম। এরপর একটা বাচ্চা ছেলে যদি একটা ঝাঁটার কাঠি নিয়ে খাঁচার কাছে গিয়ে খোঁচা দেয় তাতেই সে ভয়ে ঠক্

ঠক্ করে কাঁপতে শুরু করবে। আমাদের দেশের উচ্চবর্ণের লোকেরা এইভাবে নিম্নবর্ণের লোকেদের না খেতে দিয়ে, যে কোন অজুহাতে অত্যাচার করে করে এদের ব্যক্তিত্বকে একেবারে শেষ করে দিয়েছিল। তাদেরকে ছোট হতে বাধ্য করা হয়েছিল। কিছু দিন আগেও কোন মেয়েকে বিয়ে করে ঘরে আনার পর থেকেই সেই বধুর উপর নির্যাতন করে করে তার মানসিকতাকে, তার ব্যক্তিত্বকে ক্ষুদ্র বানিয়ে দেওয়া হত। আজ গ্রামের লোকেদের পেটে দুটো অন্ন যেতে শুরু করেছে এখন তারাও উল্টে আক্রমণ করতে শুরু করেছে। ঐ বাঘকেই অত অত্যাচার করার পর তাকে কয়েক দিন খুবসে মাংস খাওয়ার পর তাকে একবার খোঁচা দিতে গেলেই সে এমন গর্জন করতে থাকবে যে পিলে চমকে যাবে। তার মানে, যাকে জোর করে ছোট করে রেখেছিলাম সে এখন জাগ্রত হতে শুরু করেছে। যিনি সর্বব্যাপী, যিনি অনন্ত তাঁকে জোর করে এই শরীরের মধ্যে ছোট্ট করে রাখা হয়েছে। আমরা সবাই খাঁচার বাঘের মত, আমাদের প্রকৃত স্বরূপ হল, আমি সেই সর্বব্যপী আত্মা, কিন্তু প্রকৃতি আমাকে জোর করে ছোট করে রেখেছে আর আমরাও জগতের কান্না দেখে কাঁদছি, জগতের হাসি দেখে খিক্ খিক্ করে হাসছি। কারণ আমাদের পেটে অন্ন নেই, আবার উপর থেকে মার খেয়েই চলেছি, পেটে অন্ন নেই মানে, দিব্য আধ্যাত্মিক রসদ যেটা আমাকে পুষ্টি দেবে সেটা যাচ্ছে না, আর অন্য দিকে জগতের সুখ-দুঃখ আমাকে মারছে। ফলে একটু কিছুতেই আমরা ভয়ে কাঁপতে থাকি। কিন্তু যজ্ঞের ভাব যখন এসে যায়, তখন এই যজ্ঞ কি করে? মুক্তির মার্গটা দেখিয়ে দেয়। যজ্ঞ যেই এসে যাবে তাকে যেটা জোর করে ছোট করে রেখেছিল সেটা সরে যেতে থাকে আর ততই সেই নিজেকে প্রসার করে অনন্তের সঙ্গে একাত্ম হতে থাকে।

যজ্ঞ তাহলে কি কি কি করছে? It consecrates the mundane to the divine, transforms the profane in the sacred, is the bridge between material and spiritual and instrument to convert the belittled in the exalted. অর্থাৎ, জাগতিক যা কিছু আছে যজ্ঞ তাকে আধ্যাত্মিকতাতে পরিবর্তন করে দিচ্ছে, গর্হিত কর্মকে পূণ্য কর্মে রূপান্তরিত করছে, যজ্ঞ হল জাগতিক থেকে আধ্যাত্মিকতায় উত্তীর্ণ হবার সেতু, আর আমার ক্ষুদ্রত্বকে বৃহৎএর সাথে মহতের সাথে এক করে দেবার যন্ত্র হল যজ্ঞ। এই হল যজ্ঞের কাজ।

আধ্যাত্মিক জীবনে আধ খ্যাচড়া বলে কিছু নেই। হয় আমি পুরোটাই আধ্যাত্মিক তা নাহলে একেবারেই আধ্যাত্মিক নই। এখন কিছুটা আধ্যাত্মিক আর বাকি সময়টা জাগতিক এই ধরণের কিছু নেই। যারা আধ্যাত্মিক তারা চব্বিশ ঘন্টাই আধ্যাত্মিক ভাবে থাকেন। ধর্ম সাধনের ক্ষেত্রে হতে পারে, সকালে এক ঘন্টা ধর্ম সাধন করল আর বাকী তেইশ ঘন্টা ধর্ম সাধন করল না, সারাদিন গোলমাল করে বেড়ালো। আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে তা হবে না। যে একবার আধ্যাত্মিক ব্যক্তি হয়ে গেলে সে কিন্তু জীবনে আর কোন দিন অনাধ্যাত্মিক হবে না। যে একবার মন প্রাণ ভগবানের চরণে দিয়েছে সে চব্বিশ ঘন্টাই সেই ভাব নিয়ে থাকবে। যে এখনও মন প্রাণ ভগবানকে দেয়নি বুঝতে হবে সে সেই আধ্যাত্মিকতার অবস্থায় যায়নি। সে এখনও ধর্ম সাধনের চেষ্টা করে যাচ্ছে। যার মধ্যে সত্যিকারের আধ্যাত্মিকতা এসে গেছে তার প্রত্যেকটি কাজ, আচার, ব্যবহারের মধ্যে আমূল পরিবর্তন এসে যাবে। কোন ভালো সাধুর কাছে গেলে দেখতে পাবো তাঁর প্রত্যেকটি কাজ, জামা-কাপড় ভাঁজ করা থেকে, বই-পত্র সাজান, দাঁত মাজা, খাওয়া-শোওয়া-বসা সবটাই মনে হবে যেন পূজা করছেন। আমি যদি বলি আমার ধ্যান খুব গভীর হয় কিন্তু ঐ দিয়ে আমার আধ্যাত্মিকতার বিচার হবে না, আমি ঝাঁটাটি কেমন দিচ্ছি, খাবার পর থালাতে এঁটো গুলো কেমন ভাবে রাখা আছে, খাবার সময় কত আবর্জনা থালায় পড়ে থাকে, সব কিছুই বিচার্যের মধ্যে তখন এসে যাবে। খাবার ছেড়ে যখন উঠবে থালা দেখে মনে হবে যেন কেউ মেজে রেখেছে। জীবনের উদ্দেশ্য যদি আধ্যাত্মিক হওয়া হয়, জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ এটা যে বুঝে নিয়েছে তাহলে ঘুম থেকে রাতে শুতে যাওয়া পর্যন্ত প্রত্যেকটি কর্মই তার যজ্ঞ হবে।

যজ্ঞের এই ধারণা আমরা পুরুষসূক্তমেই পাই। পুরুষসূক্তমের পুরো বক্তব্য যজ্ঞ নিয়ে, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের যা কিছু সৃষ্টি হচ্ছে সবটাই যজ্ঞ থেকে। ঈশ্বরের ইচ্ছাতে সৃষ্টি হয়েছে বলে পুরো ব্যাপারটাকে যেভাবে হাল্কা করে দেওয়া হয় এখানে কিন্তু সেভাবে বলা হচ্ছে না, সেখানে বলা হচ্ছে এই সৃষ্টিটাই একটা যজ্ঞ। সৃষ্টির সব কিছুই যজ্ঞ। খুব সামান্য জিনিস নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়া থেকে আরম্ভ করে সৃষ্টি পর্যন্ত যা কিছু হচ্ছে সবটাই

যজ্ঞ। এই কথা কে বলছে? বেদ। তার মানে পুরো ব্যাপারটাই আধ্যাত্মিক। আমাদের মত সাধারণদের পক্ষে চব্বিশ ঘন্টা আধ্যাত্মিক হওয়া সম্ভব নয়, কারণ আধ্যাত্মিকতায় অংশ বলে কিছু হয় না। তাই আমাদের বাঁচানোর জন্য বেদ যজ্ঞের এই ধারণাকে নিয়ে এসেছে। বেদ জানে আমরা সব কিছু যজ্ঞ রূপে করতে পারব না, যজ্ঞ রূপে না নিতে পারলে আমিও আধ্যাত্মিক পুরুষ হতে পারব না। বেদ তাই বলল ঠিক আছে তোমাকে আধ্যাত্মিক পুরুষ হতে হবে না কিন্তু মাঝে মাঝে তুমি যজ্ঞ কর। তোমার সন্তান চাই? তুমি যজ্ঞ কর। তুমি ধন সম্পদ চাও, তুমি এই এই যজ্ঞ কর। কিন্তু তোমার লক্ষ্য হবে সব কর্মকে যজ্ঞ রূপে নিয়ে আধ্যাত্মিকতার চরমে পৌঁছান, অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লাভ। সেখানে পৌঁছাতে হলে মাছের কাঁটাটিও যজ্ঞ মনোভাবে খাওয়ার পাতে সাজিয়ে রাখতে হবে।

বর্তমান প্রেসিডেন্ট স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ এক সময়ে স্বামী বিরজানন্দজীর সেবক ছিলেন। উনি একটা খুব সুন্দর ঘটনার কথা বলতেন। শ্যামলাতালে উনি দেখতেন ওখানকার রাঁধুনি প্রত্যেক দিন একটা থালাতে আনাজ, মশলাপাতি খেলনার মত সাজিয়ে স্বামী বিরজানন্দজীর ঘর থেকে নিয়ে রান্নাঘরে যেত। একদিন রাঁধুনিকে মহারাজ জিজ্ঞেস করছেন ব্যাপারটা কি। রাঁধুনি তখন ব্যাপারটা পরিষ্কার করে বলছে আমি চাল, ডাল, তরি-তরকারি সব মহারাজের কাছে নিয়ে যাই, মহারাজ কি খাবেন, কতটা খাবেন উনি সেটা নির্দিষ্ট করে দেন। উনি নিজে হাতেই সব ঠিক করে থালাতে সুন্দর করে সাজিয়ে দেন। এত সুন্দর করে সাজাতেন মনে হবে যেন বাচ্চাদের কোন খেলনা সাজান আছে। এটাই স্বামী বিরজানন্দের কাছে একটা যজ্ঞের মত ছিল।

দুই ধরণের যজ্ঞের কথা বলা হয় – একটা ব্যক্তিকেন্দ্রিক যজ্ঞ আরেকটি অনেকে মিলে সর্ব সাধারণের মধ্যে যজ্ঞ। বর্তমান কালের নিরিখে বলতে পারি ঘরের পূজা আর বারোয়াড়ির পূজা। দ্বিতীয় যেটা এনারা করলেন তা হল জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনকে নানা রকমের ক্রিয়াকর্ম দিয়ে বেঁধে দিলেন। অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ, শ্রাদ্ধ, সন্ন্যাস নেওয়া, কোন জিনিসের প্রাপ্তি হল, দুঃখ হল ইত্যাদি যত রকমের ঘটনা আছে সব কটাকে আস্তে আস্তে এক একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের মধ্যে বেঁধে দেওয়া হল। এইভাবে বেঁধে দিয়ে সব অনুষ্ঠানকে যজ্ঞে রূপান্তরিত করে দিলেন। যেমন, হিন্দুদের মধ্যে এখনও বিবাহের অনুষ্ঠান যজ্ঞ রূপেই সম্পন্ন করা হয়, অগ্নি প্রজ্বলন করে, অগ্নিকে সাক্ষী রেখে কন্যাকে সম্প্রদান করা হয়। আবার মন্দিরে বিগ্রহের সামনে দেবতাকে সাক্ষী রেখেও বিবাহ করে। মন্দিরে গিয়ে বিবাহ করলেও সমাজ ও সরকার এই বিবাহকে স্বীকৃতি দেয়। কিন্তু দুজন বন্ধুকে সাক্ষী রেখে বিয়ে করলে কেউ এই বিয়েকে মানবে না। হয় অগ্নিকে সাক্ষী রেখে অথবা দেবতাকে সাক্ষী রেখে নয়তো কোর্টের অনুমোদিত কোন ব্যক্তির সামনে বিবাহ করতে হবে।

জীবনের প্রত্যেকটি শুভ ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে অনুষ্ঠান হয়, যেমন জন্ম, মৃত্যু, বিবাহে যে অনুষ্ঠান হয় এই সব ক্রিয়াগুলিকে সংস্কার বলা হয়, আরেকটাকে বলা হল যজ্ঞ। এইভাবে দুই ধরণের যজ্ঞ প্রচলিত হল একটা সংস্কার আরেকটি হল যজ্ঞ। বেদের সময়ে জাতকর্ম, চূড়াকরণ, বিবাহ, শ্রাদ্ধ এই রকম চৌষট্টিটি সংস্কার ছিল। পরের দিকে চৌষট্টি থেকে আঠারোটি সংস্কারে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল, মনুস্মৃতিতে এসে ষোলটিতে দাঁড়িয়েছিল, তখন বলা হত ষোড়শ সংস্কার। তন্ত্র আবার আরও কমিয়ে দশটি সংস্কারে দাঁড় করিয়ে দিল। দশকর্মা ভাণ্ডার এই দশটি সংস্কার থেকেই নাম করণ করা হয়েছে। কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এসে এই দশটি সংস্কারও কমে গেছে। বেদের প্রথমে সবটাই যজ্ঞ ছিল কিন্তু পরের দিকে সংস্কার আর যজ্ঞ এই দুটো আলাদা আলাদা পথে চলতে থাকল।

সংস্কার বাদে যে যজ্ঞগুলো থেকে গেল সেই যজ্ঞগুলিও অনেক ধরণের ছিল। তার মধ্যে একটাতে দেবতাদের উদ্দেশ্যে আহুতি দেওয়া হত। দ্বিতীয় ধরণের যজ্ঞে পিতৃদের উদ্দেশ্যে অর্পণ করা হত বা অন্যান্য যেসব ছোটখাটো দেবতারা ছিলেন, অসুর, নিরুক্তি, রাক্ষস এদের সন্তুষ্টির জন্যও অর্পণ করা হত। দেবতাদের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করার সময় যেটা অর্পণ করা হত তাকে বলা হয় হবিঃ। এটাই যখন পিতৃগণকে দেওয়া হয় বা অন্যান্য ছোট ছোট দেবতাদের দেওয়া হয় তখন তাকে বলা হয় বলি। হবিঃ আর বলি দুটোই আলাদা। দেবতাদের উদ্দেশ্যে যখন অর্পণ করা হয় তখন স্বাহা মন্ত্রে অর্পণ করা হয় আর পিতৃদের উদ্দেশ্যে যখন অর্পণ

করা হয় তখন স্বধা মন্ত্রে অর্পণ করা হয়। হবিঃ যখন দেওয়া হয় তখন তা সব সময় অগ্নিতেই আহুতি দেওয়া হয়, যাকে প্রচলিত কথায় বলা হোম। হোমের বৈশিষ্ট্য হল – অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হয়, হোমের যেটা অর্পণ করা হয় তার নাম হবিঃ এবং হোমে যা অর্পণ করা হয় তা একমাত্র দেবতাদের উদ্দেশ্যেই অর্পণ করা হয়। বলিতে যাই দেওয়া হয় সেটা মাটির উপরে কুশ ঘাস পেতে তার উপর দেওয়া হয়। বেদেই এই বিধানগুলো আছে। বেদ যেটা মেনেছে সেটাই হিন্দুদের মধ্যে আজও চলে আসছে, ওর বাইরে কিছুতেই যাবে না।

আমরা এখানে সংস্কার ছাড়া অন্যান্য যজ্ঞের বিষয় আলোচনা করছি। অগ্নি প্রত্যেক যজ্ঞের অবশ্যম্ভাবি অঙ্গ। দেবতা বা অন্য যাদের উদ্দেশ্যে যা কিছু অর্পণ করা হবে সেটা অগ্নি বহন করে উপরে নিয়ে যান। দেবতাদের ছাড়া অন্য যাদের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করা হবে সেখানে যা দেওয়া হবে মাটিতেই দেওয়া হয়। বেদের সময় অসুর, রাক্ষস, ভূত, প্রেত এদের উদ্দেশ্যেও অর্পণ করা হত। এখন আর অসুর, রাক্ষসাদিদের দেওয়া হয় না, কিন্তু কালীপূজার সময় শিবা ইত্যাদিকে বলি দেওয়া হয়, সেই বলিও মাটিতে দেওয়া হয়। আবার অনেক সময় বলি মাটিতে না দিয়ে নদীর জলে বা কোন জলাশয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। একটা মতে বিশ্বাস করে যে আগেকার দিনে দেবতাদের যে হবি দেওয়া হত সেটাও মাটিতে দেওয়া হত। কিন্তু পরে এই ভাবে দেবতাদের হবি দেওয়াটা বন্ধ হয়ে যায়। মহাভারতে আছে অগ্নি এসে দুঃখ করে বলছে অগ্নিতে যজ্ঞে এত ঘি ঢালা হত যে ঘি খেয়ে খেয়ে অগ্নি দেবতার অজীর্ণ হয়ে গেছে। আগের নিয়ম থেকে সরে এসে ঠিক করা হল যা কিছু হবি মাটিতে দেওয়া হচ্ছিল এখন থেকে সব অগ্নিতে অর্পণ করা হবে। এই যে পরিবর্তন এসে গেল এটাকেই খুব মজার আকারে মহাভারতে কাহিনীর মাধ্যমে উপস্থাপনা করা হয়েছে। অগ্নির এত ঘি খাওয়ার অভ্যেস ছিল না, আর এত এত যজ্ঞ হচ্ছে আর এত এত ঘি খেয়ে খেয়ে তাঁর অজীর্ণ রোগ হয়ে গেছে। এখন অগ্নি দেবতা শ্রীকৃষ্ণ আর অর্জুনকে এসে একটা ওষুধের ব্যবস্থা করতে বলছেন। কি ওষুধ খাবেন অগ্নি দেবতা? অগ্নি দেবতাই বলছেন আমি যদি পুরো খাণ্ডব বনকে খেতে পারি, পুরো মানে, খাণ্ডব বনে যত গাছপালা, পশু, পাখি যা আছে সব কিছুকে আমার খাওয়ার ব্যবস্থা যদি করে দেওয়া যায় তাহলে আমার অজীর্ণ রোগটা সেরে যাবে।

এইভাবেই এক একটা ব্যবস্থার পরিবর্তন হতে থাকে। প্রথমের দিকে সব কিছুই যজ্ঞ ছিল। সেই যজ্ঞই আবার ভাগ হয়ে গেল – সংস্কারগুলি একদিকে চলে গেল আর যজ্ঞগুলো অন্য দিকে চলে গেল। যজ্ঞগুলোর আবার দুটো ভাগ হয়ে গেল – একটা যজ্ঞ দেবতাদের উদ্দেশ্যে আর অন্য যজ্ঞ দেবতা ছাড়া অন্যান্য ছোট ছোট দেবতা, পিতৃদেব, অসুর, রাক্ষস ইত্যাদিদের উদ্দেশ্যে। দেবতাদের যজ্ঞটা শুরু হল অগ্নিতে আর অন্যদের মাটিতে। শ্রাদ্ধাদির সময় সাধারণত জলের কাছাকাছি করা হয়। আজকের দিনে আমরা যে যজ্ঞ করি সব সময় অগ্নিতে দেবতাদের অর্পণ করাকেই বুঝি। অগ্নির মাধ্যমে দেবতাদের যে আহুতি দেওয়া হয় যজ্ঞ বলতে সেটাই বোঝায়। কিন্তু গীতাতে আমরা অনেক ধরণের যজ্ঞের উল্লেখ পাই, যেমন দ্রব্যযজ্ঞ, জপযজ্ঞ ইত্যাদি, কিন্তু যজ্ঞের আগে একটা শব্দকে বসাতে হবে। শুধু যজ্ঞ শব্দ থাকলে বুঝতে হবে যে একটা হোম হচ্ছে সেখানে দেবতাদের নামে কিছু আহুতি দেওয়া হচ্ছে।

বেদে যখন সংস্কারের কথা বলা হয় তখন এটাই হয়ে যায় বাধ্যতামূলক, যেমন শিশুর জন্ম হলে তার জাতকর্ম করতেই হবে, বাবা-মা মারা গেলে শ্রাদ্ধ করতেই হবে, এগুলোকে কর্তব্যের মধ্যে গণ্য করা হয়, না করলে পাপ হবে। কিন্তু বেদে যখন যজ্ঞের কথা বলা হয় তখন সংস্কারের থেকে অনেক পার্থক্য রেখেই বলা হয়। যজ্ঞ সব সময়ই কিছু কামনা নিয়ে করা হয়। যজ্ঞ হল ঠিক কেউ বড়লোকের কাছে কিছু আশা করে দেখা করতে যাওয়ার মত। যজ্ঞ হল কিছু কামনা করে দেবতাদের কাছে আহুতির দেওয়ার মধ্য দিয়ে প্রার্থনা করা। যজ্ঞ যেন জাগতিক আর আধ্যাত্মিকতার মধ্যে একটা যোগসূত্র। আমরা হলাম জাগতিক লোক আর দেবতারা আধ্যাত্মিক জগতের। যজ্ঞের পুরোহিত হলেন এই যজ্ঞকর্মের যজমানের প্রতিনিধি আর একই সাথে দেবতাদের মুখপাত্রের কাজ করেন। যজ্ঞে তাই পুরোহিতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যজ্ঞ শেষে পুরোহিত যজমানকে বলেন – দেবতারা খুশি হয়েছেন তাঁরা আপনার মন কামনা পূর্ণ করবেন। আবার দেবতাদের কাছে যজমানের হয়ে পুরোহিত প্রার্থনা করেন। পুরোহিত ছাড়া দেবতাদের উদ্দেশ্যে যজ্ঞে কোন আহুতি দেওয়া যাবে না।

ধর্ম মানেই যেখানে পারমার্থিক ও পারলৌকিক ব্যাপার জড়িয়ে আছে। জগতকে নিয়ে কখনই ধর্ম হয় না। যদি কেউ বলে, মানবজাতিই আমার কাছে সত্য, মানবজাতির সেবা করাই আমার কাছে সত্য, মানব সেবাই আমার কাছে যজ্ঞ, মানুষই শেষ কথা, মানুষই ঈশ্বর, মানুষের সেবা করাটাই যজ্ঞ। এই ভাব নিয়ে যাই করা হোক না কেন, সেটা কখনই যজ্ঞ হবে না, কখনই সেটা পূজা হবে না। যজ্ঞ মানেই ধর্মীয় কাজ, ধর্ম মানেই মৃত্যুর পরে কিছু একটা আছে, আর তার সাথে আমাদের যোগসূত্র স্থাপন হয় ধর্মের মাধ্যমে। অথচ যিনি ঈশ্বরকে মানছেন, পুনর্জন্মকে মানছেন এরপর তিনি মানুষের সেবা করছেন আর ভাবছেন এতেও আমার পূণ্য হবে এবং এই পূণ্যের ফলে আমার পরের জন্ম ভালো হবে, তখন এটাই পূজা হয়ে যাবে, এটাই তখন যজ্ঞ রূপে গণ্য হবে। বিজ্ঞানীরা ঈশ্বর বিশ্বাস করেন না, ঈশ্বরের কথা বললে তাঁরা বলেন বিজ্ঞানই আমার কাছে ঈশ্বর, বিজ্ঞানের গবেষণা করা, বিজ্ঞানের সেবা-পূজা করাটাই আমার কাছে যজ্ঞ। কিন্তু এটাও যজ্ঞ রূপে গণ্য করা হবে না। যজ্ঞ মানেই ধর্মীয় কার্যকলাপ। মৃত্যুর পরেও কিছু আছে, এটাকে যদি না মানা হয়, এই বিশ্বাসকে মাথায় রেখে যদি কিছু না করা হয় তাহলে ঠিক ঠিক যে অর্থে ধর্ম হয়, সেই অর্থে এটা কোন ধর্ম হবে না। আমরা সাধারণত যা কাজ করছি এগুলো সবই জাগতিক কর্ম। শাস্ত্রানুসারে বিচার করলে, মানব সেবা, বিজ্ঞানের সেবা এগুলো সবই জাগতিক কর্মের মধ্যে পড়বে। এমনকি আমরা যে প্রতিনিয়ত নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছি, খাওয়া-দাওয়া ঘুমনো যা কিছু করছি সবটাই জাগতিক কর্ম। কিন্তু ঠিক ঠিক আধ্যাত্মিক পুরুষের কাছে নগণ্যতম সাধারণ কর্মও যজ্ঞ হতে হবে। আমাদের কাছে পূজো করাটাও সাধারণ কাজের মধ্যে পড়ে যায়, যেমন পুরোহিতরা যে পূজো করে বেড়ায় সেখানে পূজো কাজের মধ্যে পড়ছে। কোন মহারাজকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় আপনার এখন পোস্টিং কোথায়? অমুক সেন্টারে। ওখানে আপনাকে কি কাজ দেখতে হয়? পূজোর কাজ। তার মানে পূজোটাও তাঁর কাছে কাজের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে। কাজের মধ্যে পড়ে গেলে তখন তা জাগতিক ব্যাপারই হয়ে গেল। তারপর একদিন হয়তো অধ্যক্ষকে গিয়ে বলছেন, মহারাজ! আমার কোমড়ে ব্যাথা হচ্ছে পূজোর কাজ আমার দ্বারা হবে না। এখানেও বোঝা যাচ্ছে পূজোটাও একটা কাজের মধ্যে পড়ে গেছে। অথচ আধ্যাত্মিক জীবন মানে যা কিছু করা হচ্ছে সবটাই যজ্ঞ। জাগতিক জীবনে পূজোটাও কাজ আর আধ্যাত্মিক জীবনে ছোট থেকে ছোট কাজও যজ্ঞ হয়ে যায়, আধ্যাত্মিক জীবনে প্রত্যেকটি কাজই পূজো। আধ্যাত্মিক জীবনে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়াটাও পূজো, গীতায় ভগবান বলছেন, *অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেহপানং তথাপরে,* চোখের চাহনিটাও পূজো, খাওয়া-দাওয়া করাটাও পূজো, যা কিছুই করা হচ্ছে সবটাই পূজা।

এইভাবে সব কাজকে পূজা বা যজ্ঞ রূপে করা কি কখন সম্ভব? বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলছেন, স্বামী-স্ত্রীর যে সমাগম সেটাও যজ্ঞ, নারী এক অগ্নি সেই অগ্নিতে পুরুষ আহুতি দিচ্ছে। এটা কি কখন সম্ভব? কত সাধনা, তপস্যা করা হলে তবে গিয়ে ওই ভাব জাগবে, যেখানে সব কিছু পূজা বা যজ্ঞ বলে মনে হবে। কিন্তু কোথাও তো আমাদের শুরু করতে হবে। কোথা থেকে শুরু করবে? তখন ওনারা বলছেন স্থূল যজ্ঞ দিয়েই শুরু কর। কথামৃতে ঠাকুর বলছেন তীর ছোঁড়ার অনুশীলনে প্রথমে কলাগাছ বিঁধতে শেখায়, প্রথমেই উড়ন্ত পাখিকে তীর মারা শেখায় না। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ছোট ছোট কাজকে প্রথম থেকেই যজ্ঞ রূপে করা যাবে না। ছোট ছোট কাজকে যজ্ঞ রূপে করার আগে স্থূল যজ্ঞ করতে হবে। বলা হয় বেদে যে এত যজ্ঞের কথা বলা হয়েছে তার উদ্দেশ্যই হল মানুষের মনকে আধ্যাত্মিক তৈরী করা। এখন আর বেদের যজ্ঞ করা সম্ভব নয়, কিন্তু এখনকার যজ্ঞ হল, জপ-ধ্যান, পূজা, পাঠ ইত্যাদি। আমরা গানে খুব সহজ ভাবেই বলে দিতে পারি, আহার করছি যেন মাকে আহুতি দিচ্ছি, নিদ্রায় মার ধ্যান করছি, যখন হাঁটছি তখন মাকে পরিক্রমা করছি, কিন্তু জীবনে পালন করা খুব কঠিন। আমরা গান করে যাচ্ছি কিন্তু জীবনে কোন পরিবর্তন আসছে না। প্রথম অবস্থায় কিছু দিন ধর্মের কথা শুনলে মনে হবে সব বুঝে ফেলেছি, প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসও এসে যাবে। কিছু দিন সাধনা করার পর আগের দশ শতাংশও বিশ্বাস থাকবে না। এক নাপিত যার যেখানেই ফোঁড়া হয়েছে শুনলেই খুড় দিয়ে খ্যাঁচ খ্যাঁচ করে কেটে দিত, আর লোকেদের সেরেও যেত। একজন ডাক্তার শোনার পর নাপিতকে বলল, চল তোকে ডাক্তারির ব্যাপারে, শরীরের কোথায় কি নার্ভ আছে শিখিয়ে দিই। শিখিয়ে দেওয়ার পর দেখা গেল নাপিতের আর সেই ফোঁড়া কাটার ক্ষমতা নেই। পরে ডাক্তার একদিন দেখতে এল নাপিত কেমন

খুড় চালাচ্ছে, জিজ্ঞেস করছে কেমন চালাচ্ছে। নাপিত বলছে, না স্যার এখন খুড় চালাতে গিয়েই মনে হয় এখানে এই নার্ভ আছে সেই নার্ভ আছে, যখন জানতাম না তখন দুমদাম্ চালিয়ে যেতাম। টিভিতে, রেডিওতে সবাই এত উপদেশ দিয়ে যাচ্ছে, এরা কিছু জানে না বলেই এত উপদেশ দিয়ে যাচ্ছে, জানলে আর উপদেশ দিতে পারবে না। দীর্ঘ দিন ধরে যদি প্রচুর উপাচার মূলক ধর্ম পালন না করা থাকে, ভোর তিনটের সময় ঘুম থেকে উঠে পড়, গঙ্গাস্নান ও অন্যান্য প্রাতঃকর্ম করার পর মঙ্গলারতিতে যাও, তারপর টানা দেড় ঘন্টা জপ-ধ্যান করার পর অন্যান্য কাজকর্ম কর, স্বাধ্যায় কর, সন্ধ্যারতিতে যাও, আবার টানা দু ঘন্টা জপ-ধ্যান কর, আবার স্বাধ্যায় কর, এভাবে টানা দশ বছর বারো বছর উপাচার মূলক ধর্মজীবনের মধ্য দিয়ে চলতে থাকলে মন একটা প্রস্তুতি নিতে শুরু করে। আমরা মুখে সব ধর্মীয় উপদেশ দিচ্ছি, উপনিষদের কথা বলছি কিন্তু জীবনে কাজে লাগাতে পারছি না, এর প্রধান কারণ একটাই, আমরা কেউই এভাবে প্রস্তুতি নিইনি। এই ব্যাপারটা ঋষিরা বুঝতে পেরেছিলেন, সেইজন্য তাঁরা যজ্ঞের উপর জোর দিলেন। যজ্ঞ যে শুধু কিছু প্রাপ্তির জন্যই করা হত তা নয়, যজ্ঞের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে আধ্যাত্মিক মনস্কতায় নিয়ে যাওয়া। যদিও জপ-ধ্যানও উপাচারের মধ্যেই পড়ে, কিন্তু শুধু জপ-ধ্যানেই হয় না। অনেক ধরণের উপাচার পালন করতে হয়, গঙ্গাস্নানও করতে হবে, মন্দিরেও যেতে হবে, আটকে প্রসাদও খেতে হবে। অনেক কিছু দীর্ঘকাল ব্যাপি করতে করতে গিয়ে মন একটা প্রস্তুতি নিতে শুরু করে। তখন শাস্ত্রের কথা ভেতরে দাগ কাটতে শুরু হয়।

বেদে যজ্ঞের অগ্নির অনেক রকম নাম ছিল। বাড়িতে যে যজ্ঞ হত সেই যজ্ঞের অগ্নির নাম ছিল গার্হ্যপত্য অগ্নি, গৃহপতি থেকে গার্হ্যপত্য। যজ্ঞে অর্পিত দ্রব্যের মধ্যে রন্ধন করা দ্রব্য থাকলে তা এই গার্হপত্য অগ্নিতেই রন্ধন করা হত, বাড়ির উনুনে রান্না করা হত না। ব্রাহ্মণরা বাড়িতে যে অগ্নি রাখতেন সেই অগ্নিও দুই প্রকার। এর মধ্যে একটাই অগ্নি থাকত, যে অগ্নির দ্বারা ওনারা অগ্নিহোত্রাদি করতেন। দ্বিতীয় অগ্নিতে তিনটে অগ্নির কথা বলা হয়, কিছু কিছু যজ্ঞাদিতে এখনও তিনটে অগ্নির প্রথা চলে আসছে। গার্হপত্য অগ্নি বাড়িতে সব সময়ই জ্বলতে থাকত, এই অগ্নিকে কখনই নির্বাপিত করা হত না। কারুর বাড়িতে অগ্নি নিভে যাওয়া মানে খুবই অশুভ। গুরুর কাছ থেকে অগ্নিকে নিয়ে এসে এই গার্হ্যপত্য অগ্নিকে স্থাপন করা হত আর যখন সে মারা যাবে, এই অগ্নি থেকেই অগ্নি নিয়ে গিয়ে তার চিতায় অগ্নি সংযোগ করা হত, তারপর সেই অগ্নিকে নির্বাপিত করে দেওয়া হত। মনুস্মৃতিতে গার্হ্যপত্য অগ্নিকে নিয়ে অনেক প্রশ্ন করা হয়েছে। কেউ যদি বিদেশে চলে যায় তখন এই গার্হ্যপত্য অগ্নিকে কি করা হবে বা বিদেশে গিয়ে যদি সে মারা যায়, এই ধরণের নানান রকম প্রশ্ন তোলা হয়েছে। যত রকমের আহুতি অর্পণ করা হত সব এই অগ্নিতেই অর্পণ করা হত। গার্হপত্যের ঠিক দক্ষিণ দিকে আরেকটি অগ্নি প্রজ্বলিত থাকে, তাকে বলা হয় দক্ষিণা অগ্নি। যজ্ঞ সমাপ্তের পর এই অগ্নিকে দক্ষিণ দিকে নিয়ে আসা হত। ইদানিং আর এভাবে দক্ষিণা অগ্নি রাখা হয় না, বদলে যখন হোম করা হয় তখন অগ্নিকে প্রার্থনা করে বলা হয় – হে অগ্নি আপনি এখন দক্ষিণা মুখি হন। আমরা আগে বলেছিলাম অগ্নির জন্ম সমুদ্রে। সমুদ্র যেহেতু ভারতের দক্ষিণে দিকে, আর আমাদের বেশির ভাগ ঋষিরাই পাঞ্জাব, দিল্লীর দিকের ছিলেন বলে তাদের কাছে সমুদ্র দক্ষিণ দিকেই হয়, তাই যজ্ঞের শেষে অগ্নিকে দক্ষিণ দিকে ঠেলে দিয়ে বলা হত আপনি আপনার নিজ বাসস্থানে গমন করুন। অগ্নিকে বিদায় জানাবার জন্য যে অগ্নিকে স্থাপন করা হয় তাকে দক্ষিণাগ্নি বলছেন। যে জিনিস মানুষ বেশি ব্যবহার করে সেই জিনিসের প্রকার অনেক রকম হয় আর তার নামও অনেক রকম হয়। যেমন আইসল্যাণ্ডে বরফের অনেক নাম আছে। নদীমাতৃক অঞ্চলে নৌকার অনেক নাম থাকে। এনাদের কাছে অগ্নির প্রচণ্ড গুরুত্ব ছিল বলে অগ্নিরও অনেকগুলো নাম হয়েছে।

এতক্ষণ বাড়ির যজ্ঞের ব্যাপারে বলা হল। বাড়ির বাইরে যেসব যজ্ঞ ছিল সেই যজ্ঞও দুই রকমের ছিল একটা হল Private আরেকটা Public হল। ঘরের ভেতরে যে যজ্ঞগুলো করতেন সেই যজ্ঞের নাম ছিল গৃহ্যযজ্ঞ। ঘরের বাইরে যে যজ্ঞ করা হত সেই যজ্ঞকে শ্রৌত যজ্ঞ বলা হত। গৃহ্যযজ্ঞে পুজারী থাকতেন না, গৃহ্যযজ্ঞে গৃহকর্তাকেই আহুতি দিতে হত। শ্রৌত যজ্ঞে পূজারী অবশ্যই থাকতে হবে। পূজারী থাকা মানে শ্রৌত যজ্ঞ, আর পূজারী নেই মানে গৃহ্যযজ্ঞ। ইদানিং অনেক বাড়িতে গৃহদেবতা থাকা সত্ত্বেও নিজেরা পূজা না করে মাসোহারা দিয়ে একজন পুরোহিতকে ঠিক করা থাকে, সকাল বিকাল এসে সেই পুরোহিত গৃহদেবতার পূজা

করে যায়। এগুলো ভালো নয়, বাড়ির গৃহদেবতার পূজা নিজেদেরই করা উচিৎ। পঞ্চমহাযজ্ঞেও পূজারীর দরকার পড়ে না। পঞ্চমহাযজ্ঞ গৃহযজ্ঞেরই অন্তর্গত। গৃহ্যযজ্ঞাদি পরের দিকে নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম, শুদ্ধিকরণের জন্য বিভিন্ন সংস্কারের মধ্যে মিশে গেল। শ্রৌত যজ্ঞও আবার দুই রকমের হত। একটা হবির্যজ্ঞ আরেকটি হল সোমযজ্ঞ। হবির্যজ্ঞে ঘৃত ও নানাবিধ অন্ন, যেমন গম, যব, দুধ, ঘি মিশিয়ে করা হত, এরই নাম পুরোডাসা। সোমযজ্ঞে সোমরস অর্পণ করা হত। শ্রৌত যজ্ঞগুলি সবটাই পরে নৈমিত্তিক কর্মে এসে গিয়েছিল।

গৃহ্য যজ্ঞের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল যত ধরণের জাতকর্ম বা ব্যক্তিগত সংস্কারগুলো করা হত সেগুলো সবই গৃহ্য যজ্ঞের মধ্যেই পড়ে। এ ছাড়া পূজাদি, আচমন, শুদ্ধিকরণ যত আছে সবই এই গৃহ্য যজ্ঞের অন্তর্গত। কিছু কিছু গৃহ্যযজ্ঞ আছে যেগুলো প্রাত্যহিক, যেমন পঞ্চ মহাযজ্ঞ, যার কাজই হল গৃহকর্তাকে শুদ্ধ করা। নিত্য শাস্ত্র অধ্যয়ন, পশুদের কিছু খাওয়ানো, দেবতাদের পূজা করা এই ধরণের সব কাজই পঞ্চ মহাযজ্ঞের মধ্যে পড়ে। আর শেষে আসছে সাত রকমের পাকজন্য। আগেকার দিনে রান্না করা যজ্ঞ হত, এই যজ্ঞ সাত রকমে করা হত। বর্তমানে এগুলো আর হয় না, কিন্তু এগুলো সবই গৃহ্য যজ্ঞের মধ্যে ধরা হত। এখন তার বদলে গৃহদেবতা, কারুর নারায়ণ শিলা আছে, কারুর বাড়িতে শিবলিঙ্গ আছে, এই সব গৃহদেবতার পূজাতেই গৃহ্য যজ্ঞ দাঁড়িয়ে আছে। এর সাথে সাথে এখন যেটা করা হয় জপ করা, আচমনাদি করা, কুল দেবতার পূজা করা, অতিথি সেবা ইত্যাদি। বর্তমানে হিন্দুদের পরিবারে যা যা করা হয় সবই শঙ্করাচার্য প্রচলিত করে গেছেন।

যত রকম যজ্ঞের আলোচনা করা হল সংস্কার থেকে শুরু করে যত যজ্ঞের কথা বলা হল এই সমস্ত যজ্ঞকে আবার চার ভাগে ভাগ করা হয় – ১) নিত্য, ২) নৈমিত্তিক, ৩) কাম্য ও ৪) প্রায়শ্চিত্ত। এগুলো আমরা এর আগে আলাদা ভাবে আলোচনা করেছি। নিত্য কর্ম প্রত্যেক দিন করতেই হবে, বলা হয় অকরণে প্রত্যবায়, যদি না করা হয় তাহলে পাপ লাগবে। যারা আধ্যাত্মিক হতে চান তাদের আবার কাম্য করণে প্রত্যবায়, অর্থাৎ কাম্য কর্ম করলে পাপ হবে। নৈমিত্তিক কর্ম কোন একটা বিশেষ দিনে করা হয়। নৈমিত্তিক কর্মও অবশ্যই করতে হবে। নৈমিত্তিক কর্ম, সন্তান হয়েছে এখন অন্নপ্রাশন দেওয়া, এছাড়া জাতকর্ম যা আছে সবটাই নৈমিত্তিক কর্ম। না জেনে, না বুঝে বা বাধ্য হয়ে যে দোষগুলো করা হয় সেই দোষ থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য প্রায়শ্চিত্ত কর্ম করা হয়।

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য যজ্ঞের কথা বলা হচ্ছে। এর মধ্যে **অগ্নিহোত্র যজ্ঞ** সকালে ও বিকালে দিনে দুবার করা হয়। পরের দিকে এটাই কুলদেবতার পূজাতে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। প্রাচীন কালে বাড়িতে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় অগ্নিকে সংরক্ষিত করে সেই অগ্নিতে দুধ দিয়ে আহুতি দেওয়া হত। অনেক জায়গায় নিজেরা না করে একজন পুরোহিত ঠিক করা থাকত। অগ্নিহোত্র যজ্ঞের কাজ হল পবিত্র করা আর অগ্নিহোত্র নিত্যকর্মের মধ্যে পড়ে। নিত্যকর্ম সব সময় শুদ্ধিকরণের জন্যই করা হয়। নিত্যকর্মের ব্যাপারে সংস্কৃতে একটা খুব সুন্দর কথা বলা হয় – অকরণে প্রত্যবায়, নিত্যকর্ম না করলে দোষ আর যদি করা হয় তাতে কোন কৃতিত্ব নেই। এর পর আসছে **দশপৌর্ণমাস** যজ্ঞ – অমাবস্যা আর পূর্ণিমা এই দুটো তিথিতে বিশেষ যজ্ঞ করা হত তাকে বলা হয় দশপৌর্ণমাস যজ্ঞ। **চাতুর্মাস্য যজ্ঞ** নামে একটা যজ্ঞ হত, বছরে চারটে মাসের শেষে বিশেষ করে কোন ঋতু আসছে যেমন বসন্ত, শীত ও বর্ষার শুরুতে এই যজ্ঞ করা হত। যখন যজ্ঞ শুরু হত তখন সেটা চার মাস ধরে চলত। এখনও চাতুর্মাস্য হয়, কিন্তু অন্য ভাবে করা হয়। চাতুর্মাস্যের প্রথা বেদেই ছিল, সেখান থেকে এনারা যখন দেখলেন সাধুরা যাঁরা চারিদিক ঘুরে ঘুরে বেড়ান বর্ষাকালে কোথায় আর ঘুরে ঘুরে বেড়াবেন, তখন এনারা কোন বড়লোকের বাড়িতে বা কোন মন্দিরে গিয়ে আশ্রয় নিতেন। সেখানে ওনারা অগ্নিতে আহুতি দিয়ে চারমাস ধরে যজ্ঞাদি করতেন। বসন্তকালে একটা যজ্ঞ করা হত যার নামে **অগ্নিষ্টোভ যজ্ঞ**। তারপর **অগ্রায়ণ** যজ্ঞ – বছরে যখন নতুন ফসল উঠে আসে, বিশেষ করে চাল, গম, যব ইত্যাদি, সেই অন্ন দিয়ে যজ্ঞে আহুতি দেওয়া হয়। বর্তমানে এই যজ্ঞের নাম নবান্ন। তারপর আছে **প্রবজ্ঞ** যজ্ঞ – প্রবজ্ঞ যজ্ঞ আগেকার দিনেই করা হত, এই যজ্ঞ অশ্বিনীদ্বয় দেবতাদের উদ্দেশ্যে আর ছাগলের দুধ দিয়ে আহুতি দেওয়া হত। তারপরে **বাজপেয়** যজ্ঞ – যখন কোন রাজা বড় একটা যুদ্ধ জয় করে আসত তখন সেই রাজা এই বাজপেয় যজ্ঞ করতেন। এই রকম আরেকটি যজ্ঞের নাম হচ্ছে **রাজসূয়** যজ্ঞ – কোন রাজার চারিদিকে খুব নামডাক

হয়েছে, এখন সেই রাজা দেখাতে চাইছেন আমি একজন বিরাট রাজা হয়েছি, দেখাবার জন্য রাজসূয় যজ্ঞ করতেন। তিনি যখন একবার রাজসূয় যজ্ঞ করে নিতেন তখন সেই রাজা যত দিন বেঁচে থাকবেন ততদিন অন্য কোন রাজা এই রাজসূয় যজ্ঞ করতে পারবে না। দুর্যোধন এই যজ্ঞ করেছিলেন। তারপরে আসছে **অশ্বমেধ** যজ্ঞ – কোন রাজা একটা বিশেষ দিনে নিজের রাজ্য থেকে লোকজন দিয়ে একটা বলিষ্ঠ ঘোড়া ছেড়ে দিতেন, ঘোড়া যদি সব রাজ্য ঘুরে ঘুরে নিজের রাজ্যে অক্ষত ফিরে আসত তখন সেই রাজাকে বলা হত চক্রবর্তী। অশ্বমেধ যজ্ঞ যে শুধু রাজ্য জয় করার জন্যই করা হত তা নয়। শ্রীরামচন্দ্র সমস্ত রাজ্যকে জয় করে নিয়েছেন, তিন বছর পর তিনি আবার যদি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন তখন তিনি কি জয় করবেন, সব তো জয় করাই আছে। আসলে অশ্বমেধ যজ্ঞে অনেক কিছু শর্ত থাকত, এত এত দান করতে হবে, এই এই জিনিসের ব্যবস্থা করতে হবে, যার ফলে অশ্বমেধ যজ্ঞ ছিল বিপুল ব্যয় সাপেক্ষ। রাজা যেসব ছোট ছোট রাজ্য জয় করতেন তাদের কাছে থেকে যজ্ঞের খরচের জন্য দান নিতেন। কিন্তু তারা কত দেবে তাদেরও তো অত সম্পদ নেই। সেইজন্য বলা হত যদি কেউ একশ বার অশ্বমেধ যজ্ঞ করে নিতে পারে সে ইন্দ্রত্ব পদ লাভ করবে। এই কারণে ইন্দ্রও ভয়ে সব সময় তটস্থ হয়ে থাকত যাতে কেউ একশ বার অশ্বমেধ যজ্ঞ না করতে পারে। মহাভারতে ভগীরথের কাহিনী আমাদের জানা আছে, সগর রাজা নিরানব্বই বার অশ্বমেধ যজ্ঞ করে নিয়েছিলেন, একশবার করার সময় ইন্দ্র যজ্ঞের ঘোড়াকে কপিল মুনির আশ্রমে লুকিয়ে রাখলেন। তারপরে আসছে **সর্বমেধ** যজ্ঞ – এই যজ্ঞ যিনি করছেন তিনি তাঁর যা কিছু আছে সব কিছু দান করে দিতেন। বিশ্বাস ছিল যে সর্বমেধ যজ্ঞ করলে অনেক কিছুর উপরে সে জয় পেয়ে যায়। রাজা হর্ষবর্ধণ, যিনি খুব বিখ্যাত হিন্দু রাজা ছিলেন, তিনি এই যজ্ঞ করতেন, আর সেই যজ্ঞে হর্ষবর্ধণ সব কিছুই দান করে দিতেন। বেদে হাজার হাজার যজ্ঞের কথা আছে, আমরা এখানে দু-চারটে যজ্ঞের কথা মাত্র উল্লেখ করলাম।

শাস্ত্রের প্রথম সংজ্ঞা

বেদের সব কিছু যজ্ঞকে নিয়েই আবর্তিত হত। ইদানিং মন্দিরে বিগ্রহাদির সম্মুখে আমরা যেভাবে ও যে ধরণের স্তব করি, প্রার্থনা করি, বেদের সময় থেকেই স্তব, প্রার্থনাদি বিবর্তিত হচ্ছিল। অনেক ধর্ম অনুষ্ঠান সর্বস্ব যেমন তন্ত্র, জুরাসথ্রুস্টরা। আবার অন্য দিকে খ্রীশ্চান ধর্ম, ইসলাম ধর্ম প্রার্থনা সর্বস্ব। বেদে যজ্ঞ যেমন চলার চলছিল কিন্তু অন্য দিকে যজ্ঞের সাথে সাথে যজ্ঞ সম্বন্ধীয় অনেক ধরণের প্রার্থনা হতে শুরু হয়ে গেল। প্রথমের দিকে যজ্ঞের সঙ্গে মন্ত্রের একটা যোগসূত্র থাকত। আরেকটা ছিল, যজ্ঞ চলাকালীন সাথে সাথে সামগানও চলতে থাকত। কিন্তু পরের দিকে একটা প্রথা চালু হয়ে গেল, এত দিন ধরে যজ্ঞের সময় যেসব মন্ত্র দিয়ে যজ্ঞ করা হত সেই মন্ত্রের শুরুতে ওঁ লাগিয়ে দিয়ে খুব সুন্দর করে স্তব করতে থাকলেন, ওঁ যুক্ত হওয়ার পর যজ্ঞের এই সব মন্ত্রগুলি একটা আলাদা আধ্যাত্মিক মাত্রা পেয়ে গেল। যেমন গায়ত্রীমন্ত্র, প্রথমে গায়ত্রীমন্ত্রকে যজ্ঞের মন্ত্র রূপেই ব্যবহার করা হত, পরে গায়ত্রীমন্ত্রের প্রথমে ওঁ লাগিয়ে একটা সুন্দর প্রার্থনা হয়ে গেল। যজ্ঞের মন্ত্রগুলিতে আসলে যে দেবতাকে আহুতি দেওয়া হচ্ছে তাঁর স্তুতি করা হত। এর পরে এই স্তুতির আগে একটা ওঁ দিয়ে সেই স্তুতিকে আবৃত্তি করতেন। এই জিনিসটাকে এনারা বলতে শুরু করলেন শাস্ত্র। যদিও পরের দিকে শাস্ত্রের অনেক রকম ব্যাখ্যা হয়েছে, কিন্তু মূল যেটাকে শাস্ত্র বলা শুরু করা হয়েছিল বেদের এই ধরণের আবৃত্তি গুলিকে। তাহলে শাস্ত্রের প্রথম সংজ্ঞা পাই – যজ্ঞের স্তুতি গুলির প্রথমে ওঁ লাগিয়ে দিয়ে সুর করে আবৃত্তি করা।

মানসিক যজ্ঞ

এরপর আরেকটা জিনিস ধীরে ধীরে খুব গভীর ভাবে মানুষের মধ্যে ধারণা হতে থাকল, যেটা আরণ্যকে গিয়ে পূর্ণতা পেয়েছিল, সেটা হল মানসিক যজ্ঞ। বৈদিক চিন্তাধারায় এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিবর্তন। বেদের ঋষি বা ব্রাহ্মণদের কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিছু বাস্তব সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছিল। যেমন একজন ব্রাহ্মণ রোজ অগ্নিহোত্র কর্ম করছেন। কোন কারণে হঠাৎ তাকে দূর দেশে যেতে হবে। সেই ব্রাহ্মণের মন এখন আকুপাকু করবে, দূর দেশে গিয়ে আর যাতায়াতের পথে আমি কি করে অগ্নিহোত্রাদি কর্ম করব। এখান থেকেই

শুরু হল মানসিক ভাবে অর্থাৎ মনে মনে যজ্ঞ করা। এই ধরণের আপৎকালীন অবস্থায় সেই ব্রাহ্মণ কোন এক নির্জন জায়গায় বসে চিন্তা করছে আমি অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করলাম, এবার আমি মন্ত্রোচ্চারণ করে আহুতি দিচ্ছি। যজ্ঞের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ অগ্নিতে বেলপাতা অর্পণ করা আর তার সাথে সাথে মন্ত্রোচ্চারণ করা। যজ্ঞ ব্যাপারটাই দাঁড়িয়ে আছে action and words এর উপর, ক্রিয়া আর শব্দের উপর। কিন্তু যখন মানসিক যজ্ঞের ধারণা শুরু হয়ে গেল, সেই ব্রাহ্মণ এখন সময়ে বাড়ি ফিরতে পারবেন না, বসে গেলেন মানসিক যজ্ঞ করবার জন্য তখন অগ্নি আর মন্ত্রের থেকে গুরুত্ব এসে গেল চিন্তার প্রক্রিয়াতে। ক্রিয়া আর শব্দের মধ্যে সব থেকে যে বিবর্তন এসেছে তা হল চিন্তা। যজ্ঞ ও প্রার্থনার মধ্যে সব থেকে প্রধান পার্থক্য হল যজ্ঞে ক্রিয়া আর শব্দ অবশ্যম্ভাবি, কিন্তু প্রার্থনার ক্ষেত্রে তিনটেই বাধ্যতামূলক – ক্রিয়া, শব্দ আর চিন্তা। সেইজন্য পরের দিকে যত প্রার্থনা এসেছে সেখানে *মনসা বাচা কর্মণা* এই ধরণের উল্লেখ আসে।

আধ্যাত্মিকতায় উত্তরণ

মানসিক যজ্ঞ শুরু হওয়ার সাথে সাথে একটা নতুন ধর্ম আসতে শুরু করল। বৈদিক ধর্ম আর নতুন যে ধর্ম আসতে শুরু করে দিল এই দুই ধর্মের মধ্যে একটা প্রধান পার্থক্য হল, বৈদিক ধর্ম ছিল যজ্ঞ আর তার আনুষাঙ্গিক নিয়ম বিধি আর নতুন ধর্মে এসে গেল মানসিক প্রক্রিয়া বা চিন্তা। এখান থেকে আধ্যাত্মিকতা শুরু হয়ে গেল। আমরা একে জ্ঞানযোগও বলতে পারি, জ্ঞানযোগে বাইরের আর কোন আচার আচরণ থাকে না। জ্ঞানযোগ বা জ্ঞানযজ্ঞ যখন আরম্ভ হয়ে গেল তখন কোথাও তার একটা ঈশ্বরবোধ এসে গেছে। যারা শাস্ত্র অধ্যয়ন করছে আবার যারা শাস্ত্র অধ্যয়ন করছে না কিন্তু রোজ গঙ্গায় স্নান করছে, এখানে ধর্মের দিক থেকে এদের কোথাও কোন পার্থক্য নেই। দুজনেই ধার্মিক আচরণ করছে, একজন শাস্ত্ররূপী গঙ্গায় ডুব দিচ্ছে আরেকজন গঙ্গারূপী নদীতে ডুব মারছে। যন্ত্রের মত ধর্মের আচরণ করে যাচ্ছে কিন্তু আধ্যাত্মিকতার দিক থেকে এগুলো তাদের হৃদয়কে স্পর্শ করেনা। এতে কোন দোষ নেই, এই ভাবে লেগে থাকতে থাকতে কোন না কোন সময়ে মনের মধ্যে আধ্যাত্মিকতা জেগে উঠবে। সমুদ্রে এত ঝিনুক আর এত বালি কিন্তু সব ঝিনুকেই মুক্তা হয় না। ঝিনুকে যখন একটা বালির কণা যাবে তখন মুক্তা হয়। ঝিনুককে যদি সমুদ্র থেকে সরিয়ে নেওয়া হয় তখন যাও একটা সুযোগ ছিল সেটাও নষ্ট হয়ে যাবে। যতক্ষণ এই শাস্ত্ররূপী গঙ্গাতে ডুবে থাকছে ততক্ষণ তার সুযোগ থেকে যাচ্ছে, এটাও যদি ছেড়ে দেয় তাহলে এই সুযোগটাও চলে যাবে। আমরা যা কিছু করছি, পূজা, জপ, প্রার্থনা, শাস্ত্র পাঠ আমাদের কাছে এগুলো সব কর্ম আর শব্দের জাল, তাই এর মর্মার্থ আমাদের চিন্তাতে কোন রেখাপাত করছে না।

যেদিন চিন্তার জগতে এসে এগুলো ধাক্কা মারবে সেদিন থেকে ধর্ম আর ধর্ম থাকবে না, সেদিন ধর্মটাই আধ্যাত্মিকতায় উত্তরণ হবে। এটাই ধর্ম আর আধ্যাত্মিকতার পার্থক্য। মানুষ যখন আধ্যাত্মিকতাতে চলে যায় তখন তার পুরো জীবনটা ধর্মীয় অনুষ্ঠান থেকে সরে প্রার্থনা কেন্দ্রিক হয়ে যায়, আর জ্ঞানযোগও প্রার্থনারই একটা দিক মাত্র, তখন আত্মার প্রতিই প্রার্থনা হতে থাকে। কিন্তু আগে যে কর্ম ও শব্দ চিন্তাকে স্পর্শ করতে পারছিল না, প্রার্থনাতে এসে চিন্তাকে স্পর্শ করছে। রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত তাঁদের গানে মাকালীকে প্রার্থনা করে যে গান গাইতেন সেগুলি যদি একবার চিন্তার মধ্যে আসে যে মাকালীকে যা যা বলা হচ্ছে এগুলি কি সত্যি? তখন সে পাগল হয়ে যাবে। আমাদের কানের কাছে যতই আধ্যাত্মিক কথা হাজার বার বলা হোক না কেন আমাদের চিন্তাকে কখনই স্পর্শ করে না। কিন্তু যেদিন চিন্তার মধ্যে অনুরণিত হবে সেদিন সব দিক থেকেই এক অন্য মানুষ হয়ে যাবে। এখান থেকেই আধ্যাত্মিকতার যাত্রা শুরু হয়।

ঠাকুর কথামৃতে গল্পাকারে এই জিনিসটাকে বলেছেন। এক পণ্ডিত মশাই রাজাকে ভাগবত শোনাতে যেতেন। রোজ ভাগবত পাঠ করার পর পণ্ডিত মশাই রাজাকে জিজ্ঞেস করতেন ‘কি রাজা মশাই বুঝেছেন’? রাজা মশাই বলতেন ‘আগে আপনি বুঝুন’। পণ্ডিত মশাই খুব দুশ্চিন্তায় পড়েছেন, আমাকে কেন বলছে আগে আপনি বুঝুন। রাতদিন চিন্তা করতে থাকলেন। একদিন হঠাৎ পণ্ডিত মশাইর চোখ খুলে গেল, দেখছেন ভাগবতে যা বলছে সবই তো সত্য। তিনি রাজা মশাইর কাছে যাওয়া বন্ধ করে দিলেন। এদিকে অনেক দিন

পণ্ডিত আসছে না দেখে রাজা মশাই পণ্ডিতের কাছে লোক পাঠিয়েছেন। রাজার লোককে পণ্ডিত মশাই বলছেন ‘তুমি গিয়ে রাজা মশাইকে বলে দাও আমি এবার বুঝেছি’। আধ্যাত্মিকতাতে আমি নিজে ঈশ্বরের মধ্যে আছি আর ঈশ্বর আমার মধ্যে আছেন এই ভাবনাটা তাকে ঘিরে ফেলতে থাকে। এর পর থেকেই আধ্যাত্মিক জীবন শুরু হয়। আমি ঈশ্বরের মধ্যে আর ঈশ্বর আমার মধ্যে এই বোধ যতক্ষণ ঠিক ঠিক না হবে ততক্ষণ আমাদের ঢাক বাজাতে হবে, ঘন্টা নাড়তে হবে, গঙ্গায় স্নান করতে হবে, শাস্ত্র পাঠ করতে হবে, আরতি করতে হবে। আধ্যাত্মিকতা হল অন্তর্জগতের ব্যাপার বহির্জগতের ব্যাপারের সাথে তার কোন সম্পর্কই নেই।

প্রার্থনা

এই আধ্যাত্মিক ভাব যাতে সাধারণ ভক্তদের মধ্যে আসে সেইজন্য বড় বড় সাধুরা বলেন তুমি যা কিছু করবে তার সব ফল ঈশ্বরকে অর্পণ করবে। যখনই ঈশ্বরকে অর্পণ করা হয় তখন সেইটাই হয়ে যায় যজ্ঞ। স্থূল যজ্ঞে অগ্নিতে দেবতার নামে আহুতি দেওয়া হয়, কিন্তু এনারা দেখলেন এই জিনিসটাই যদি অন্তর্জগতে করা হয় তখন তার একই ফল হবে। *মনসা বাচা কর্মণা* – এই তিনটেই তুমি ঈশ্বরকে অর্পণ করে দাও। বেদের সময় থেকে শাস্ত্রের ধারণা হতে শুরু হয়েছে, শাস্ত্র মানে যজ্ঞের সব স্তুতিতে প্রথমে ওঁ দিয়ে সেটাকে আলাদা ভাবে প্রার্থনা করে স্তব করতে আরম্ভ করল। এর ফলে ধীরে ধীরে বাইরে অগ্নি প্রজ্বলিত করে যে যজ্ঞ করা হত আর মনে মনে যে যজ্ঞ করা হত এই দুটোই কমতে থাকল আর প্রার্থনা নিজস্ব স্বকীয়তায় খুব দ্রুত প্রবল থেকে প্রবলতর হতে থাকল। সন্ন্যাস দেওয়ার সময় একটা বিশেষ যজ্ঞ করা হয়, যার নাম বিরজা হোম। রজ বলতে ধুলোও বোঝায় আবার শরীর মনের সমস্ত রকমের মলিনতা বা আবর্জনকেও বোঝায়। বিরজা মানে জন্ম জন্মান্তরের যত আবর্জনা শরীর মনের মধ্যে লেগে আছে, এই যজ্ঞের মাধ্যমে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দেওয়া হয়। সন্ন্যাস গ্রহণের দিনই এই বিরজা হোম করে সন্ন্যাস দেওয়া হয়। যাঁরা সন্ন্যাস পান তাঁদের নিত্য বিরজা হোম করতে বলে দেওয়া হয়। কিন্তু প্রত্যেক দিন বিরজা হোম করা অসম্ভব, রোজ অত আনুষাঙ্গিক জিনিস জোগাড় করাও সম্ভব নয় আর সময়ও প্রচুর লাগে। তাই মনে মনে রোজ বিরজা হোম করার কথা বলা হয়। কারণ সন্ন্যাসীকে কর্মের খাতিরে বিভিন্ন মানুষের সংস্পর্শে আসতে হচ্ছে, সমাজে অনেক জায়গায় যেতে হয় আর এভাবে সে নিত্য অনেক আবর্জনা নতুন করে জুটিয়ে নিচ্ছে। এই যে রোজ বিরজা হোম মনে মনে করা হচ্ছে, ধীরে ধীরে এমন একটা অবস্থা আসবে যখন সে আধ্যাত্মিকতাতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে, তখন বাইরে যজ্ঞ হচ্ছে কি হচ্ছে না এই ব্যাপারটা মাথা থেকে সরে যাবে। মানুষ যখন এই ভাবে অন্তর জগতে প্রবেশ করতে শুরু করে দেয় তখন বাইরের জগৎটাও সেই ভাবে খসে যেতে থাকে। ঠাকুর খুব সুন্দর উপমা দিয়ে বলছেন – নারকেলের জল শুকিয়ে গেলে নারকেলের মালা আর শাঁস আলাদা হয়ে যায়, নারকেলকে নাড়লে ঢপর ঢপর আওয়াজ করে। আধ্যাত্মিক পুরুষের সত্যিকারের এই রকমই হয়, জগতের সাথে তার আর কোন ধরণের সম্পর্ক থাকে না। যে ক্ষুদ্র আমিটা শরীর মনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে সেটা শরীর মন থেকে পুরো আলাদা হয়ে যায়।

ঋষিরা বহির্জগত থেকে মনকে গুটিয়ে এনে নিজের মনের উপর কেন্দ্রিভূত করেন। বিষয়াসক্ত লোকেদের পক্ষে, ঋষিরা যে তাঁদের মনকে নিজের মনের উপর কেন্দ্রিত করছেন, এই ব্যাপারটা ধারণা করা অসম্ভব। যত দিন একটা উচ্চ আধ্যাত্মিকতার সংস্কার না তৈরী হয় তত দিন ঠিক বোঝা যায় না মানুষ কিভাবে নিজের মনকে সংসারের নানা রকম প্রলোভন থেকে সরিয়ে এনে শুধু নিজের মনের উপরই একাগ্র করছেন। সত্যিই খুব কঠিন। পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের দর্শনকে নিয়ে যখনই আলোচনা হয় তখনই পাশ্চাত্য দার্শনিকরা প্রাচ্যের দর্শনকে মানতে চায় না। পাশ্চাত্য দর্শন পুরোপুরি বিশ্লেষণাত্মক। ওরা একটা জিনিসকে নিল, নিয়ে তার বিশ্লেষণ করল। বিশ্লেষণ করে যেটা পেল সেটাকে আরও বিশ্লেষণ করছে, এইভাবে বিশ্লেষণ করতে করতে যেখানে গিয়ে দাঁড়ায়, সেটাই তাদের কাছে সত্য রূপে দাঁড়ায়। ভারতীয় দর্শন অপরিহার্য রূপেই সাংশ্লেষাত্মক। তাঁরা সত্যটা আগে দেখেন, সত্যকে দেখে নিয়ে সেখান থেকে সিদ্ধান্তগুলিকে বার করতে শুরু করেন। সেইজন্য পাশ্চাত্যের দার্শনিকরা ভারতীয় দর্শনকে দর্শন রূপে মানতেই চান না। প্লেটো, এমনকি বার্টাণ্ড রাসেল এনারা যে কোন সামান্য একটা জিনিস, যেমন সাম্রাজ্য, রিপ্লাবিক এই ধরণের জিনিসকে নিয়ে বিশ্লেষণ

করতে নেমে যাবেন, বিশ্লেষণ করতে করতে যেখানে গিয়ে দাঁড়াবে, বলবেন এটাই সত্য। ভারতীয় দর্শনে এভাবে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াকে কোন অবস্থাতেই অনুমতি দেবে না। স্বামীজী এক জায়গায় বলছেন, একজন ব্রাহ্মণের সাথে, ব্রাহ্মণ মানে তখনকার দিনের পণ্ডিত, একজন গ্রীক দার্শনিকের দেখা হয়েছে। গ্রীক দার্শনিক ব্রাহ্মণকে যখন জগতের দর্শনের গুরুত্ব নিয়ে বলছেন, তখন এই ব্রাহ্মণ খুব অবাক হয়ে বলছেন, but how can you explain world without knowing God? জ্ঞান আহরণের ব্যাপারে এটা একটা বিরাট বড় সমস্যা। যখন কোন পাশ্চাত্য দার্শনিক চৈতন্যকে ব্যাখ্যার করতে যায় তাঁরা সব সময় সব কিছু এইভাবে বিচার করবে – আমি এই কলমকে দেখছি। এই দেখার ব্যাপারটা কিভাবে কাজ করে? এর উপর তাঁরা বিশ্লেষণ করতে করতে যেখানে গিয়ে থামবেন সেটাই তাঁদের মতে চৈতন্য। আমাদের কাছে জিনিসটা তা নয়।

ঋষিরা বলবেন, আগে তুমি ঈশ্বরকে জান, জানার পর তুমি এর ব্যাখ্যা দিতে থাক। ঈশ্বরের কথা আবার সবাই জানে না। আমাদের কাছে কথামৃত, স্বামীজীর রচনাবলী ছাড়া আর কোন স্বতন্ত্র শাস্ত্র নেই। তার মানে যদি কোন দর্শনকে দাঁড় করাতে হয় তাহলে আমাদের কথামৃত আর স্বামীজীর রচনাবলীকে আধার করেই দাঁড় করাতে হবে। বেদও ঠিক তাই, ঋষিরা যেটা দেখেছেন, তাঁরা যা কিছু উপলব্ধি করেছেন ওগুলোকে লিপিবদ্ধ করে দেওয়া হল। শুধু এটুকু পার্থক্য, ঠাকুরের ক্ষেত্রে শুধু ঠাকুর ও স্বামীজীর কথা আছে কিন্তু বেদে বিভিন্ন ঋষিদের কথা আছে। বেদ আর ঠাকুরের কথামৃতে আরেকটি বড় পার্থক্য হল, কথামৃতে অনেক রকম বর্ণনা আছে, যেটা বেদে পাওয়া যায় না। অনেক রকম বর্ণনা থাকার জন্য কথামৃত বুঝতে সুবিধা হয়। কিন্তু বেদ বুঝতে গেলে ভাষ্যের সাহায্য নিতে হয়। ধ্যানের গভীরে ঋষিরা ঠিক কি দেখেছিলেন আমাদের পক্ষে ধারণা করা খুব মুশকিল। তবে বিভিন্ন পণ্ডিতদের কথা শুনে আমরা দুটো জিনিস জানতে পারছি, প্রথমত ঈশ্বরের ব্যাপারে জানতে পারছি। কিন্তু তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ যে জিনিসের ব্যাপারে আমরা জানতে পারছি, যার ব্যাপারে আমরা বেশি আলোচনা করি না, তা হল জগৎ। জগৎ সম্বন্ধে তাঁরা কি জানতেন, জগৎ সম্বন্ধে তাঁরা কি বলতে চাইছেন, এটা বুঝতে পারলে তখন বোঝা যায় যজ্ঞ জিনিসটা কি আর প্রার্থনা জিনিসটা কি।

কথামৃতে একটা বর্ণনা আছে, যেখানে বলছেন কিছু শিখ সিপাহী দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে এসেছেন। প্রসঙ্গক্রমে সিপাহীরা ঠাকুরকে বলছেন ঈশ্বর দয়াময়। ঠাকুর তাদের জিজ্ঞেস করছেন, ঈশ্বর দয়াময় কেন? তখন তারা বলছে, তিনি আমাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন, আলো বাতাস দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছেন ইত্যাদি। ঠাকুর শুনে বলছে, এতে আর কি বাহাদুরী! বাপ-মা নিজের ছেলেমেয়েদের খাওয়াচ্ছে তাতে কী এমন বাহাদুরী হল, বাপ-মা না দেখলে কি পাড়ার লোক এসে খাওয়াবে! ঠাকুরের এটি একটি অত্যন্ত মূল্যবান মন্তব্য। আরেকটি বর্ণনায় আছে, ঈশ্বর আছেন কিনা এই নিয়ে লাটু মহারাজের সঙ্গে একজনের খুব তর্ক হয়েছে। ঠাকুর পরে শুনে বলছেন, তুই বললি না কেন এই যে জগৎ হয়েছে, গাছপালা, সূর্য চন্দ্র হয়েছে ঈশ্বর যদি না থাকতেন তাহলে এগুলো হল কি করে? শিখ সিপাহীদের ঠাকুর যে কথা বলছেন আর লাটু মহারাজকে যে কথা বলছেন এই দুটো কথার মধ্যে একটা আপাত বিরোধ হয়ে যাচ্ছে। শিখ সিপাহীদের ঠাকুর দাবিয়ে দিচ্ছেন আর লাটু মহারাজকে শিখ সিপাহীদের কথাকে একেবারে জোর দিয়ে বলছেন। শাস্ত্রে এই জিনিসটাকে বলা হয় তটস্থ লক্ষণ। তটস্থ লক্ষণ হল, নদীর তীরে দাঁড়িয়ে দেখছি নদীর ওপারে আগুন জ্বলছে, আগুন দেখে বোঝা গেলে ওখানে মানুষ আছে। আগেকার দিনে ভারতবর্ষে প্রচুর বন জঙ্গল ছিল, সেখানে যদি ধুয়ো দেখা যেত তখন লোকেরা বুঝত যে ওখানে মানুষ আছে বলেই আগুন জ্বলছে। আগুনের লক্ষণ দেখে একটা প্রমাণ পাওয়া গেল, যদিও পরোক্ষ প্রমাণ কিন্তু এই পরোক্ষ প্রমাণই ঈশ্বরকে জানার ক্ষেত্রে একটা বড় ভূমিকা নেয়। এই যে গাছপালা, মানুষ, জন্তু ইত্যাদি বিশিষ্ট যে জগতকে দেখছি, এই জগতের একজন স্রষ্টা আছেন। এর স্রষ্টা কে? ঈশ্বরই এর স্রষ্টা। এই কথা কে বলেছেন? শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন। এই কথার কি কোন দাম আছে? এর পেছনে কি কোন যুক্তি আছে? নৈয়ায়িকরা ভগবানের অস্তিত্বকে ঠিক এভাবেই প্রমাণ করেন। সৃষ্টি থাকলে স্রষ্টা থাকবে। যদি ঘট থাকে তাহলে কুম্ভকারকেও থাকতে হবে। জগৎ যদি থাকে তাহলে জগৎকারও আছেন। এই যুক্তি কি অকাট্য যুক্তি রূপে নেওয়া যাবে? কখনই নেওয়া যাবে না। কারণ যেখানে যুক্তি এই ধরণের সিদ্ধান্তে চলে যায় তখন সেই যুক্তি সব সময়ই দুর্বল যুক্তি হবে। কারণ এখানে একটা উপমাকে বৃহৎ একটা

সত্যের উপর দিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে। তাহলে মা, ঠাকুরের যুক্তিকে আমরা অযৌক্তিক বলব? কখনই বলা যাবে না, কথামৃতের একটি কথাও অযৌক্তিক নয়। যাঁদের ঈশ্বর দর্শন হয়েছে, তাঁরা কোন অবস্থাতেই অযৌক্তিক হবেন না। যদি তাঁর কথায় কোথাও কোন অযৌক্তিক থাকে বা ভ্রান্ত যুক্তি থাকে তাহলে বুঝতে হবে তাঁর ঈশ্বর দর্শনে কোথাও গোলমাল আছে। কারণ জ্ঞানী মানেই তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে এক হয়ে গেছেন। তাহলে ঠাকুর শিখদের এক রকম বলছেন আবার লাটু মহারাজকে অন্য রকম বলছেন? দু রকম কথা হলেও দুটো ক্ষেত্রেই কোন অযৌক্তিক নেই। কারণ ঠাকুর বাস্তবিক দেখছেন ঈশ্বর আছেন। কিন্তু ঠাকুরের কাছে অপরিচিত অজানা লোক, যাঁরা তাঁর ভক্ত নয় তাঁদের সামনে কখনই ঠাকুর এই যুক্তি ব্যবহার করবেন না। ঠাকুর এই যুক্তিটা দেখাচ্ছেন তাঁকে যিনি তাঁর নিজের লোক, নিজের শিষ্য বা অন্তরঙ্গ ছাড়া তিনি এই যুক্তি কখনই নিতে যাবেন না। এখানে আমাদের আরেকটা ব্যাপার বুঝতে হবে। পুরনো যে ধর্মগুলি ছিল তারা কখনই ধর্মান্তরণ করত না। হিন্দু, জুইস, জুরাসথ্রোসিয়ানরা কখনই ধর্মান্তরণ করবে না। ইদানিং ঈশ্বরের ব্যাপারে যত রকম কথা হয়, এগুলোকে কখনই যুক্তিতর্ক দিয়ে বোঝান যায় না। একমাত্র শঙ্করাচার্য পুরো ব্যাপারটা প্রচণ্ড যুক্তি দিয়ে নিয়ে গেছেন, শঙ্করাচার্যের যুক্তি ছাড়া আর কোন ভাবেই এটাকে যুক্তি দিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় না। আর শঙ্করাচার্যে কথাকে নিয়ে রামানুজাদিরা কত রকম আপত্তি করছেন। আমরা সাধারণ ভাবে এখন বুঝতে পারছি ধর্মের কোন জিনিসকে যুক্তিতর্ক দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। আপনি একটা যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করে দেবেন, তারপর আপনার থেকে বুদ্ধিমান আরেকজন এসে আপনার যুক্তিকে উল্টে ফেলে দেবে। সেইজন্য আগেকার দিনে ঋষিরা কখনই কারুর কাছে গিয়ে বলতেন না যে তোমাকে আমি ধর্ম শেখাব। যদিও বা কেউ যান তাহলে তিনি নিজের ব্যক্তিত্বের জোরে যাবেন, যেমন ভগবান বুদ্ধ গেলেন বা স্বামী বিবেকানন্দ দেশে-বিদেশে গেলেন। ওনাদের ব্যক্তিত্বের মধ্যে একটা আকর্ষণ আছে, ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে আকর্ষিত হয়ে লোকেরা যখন তাঁদের কাছে আসে তখন তাঁরা তাঁদের ভেতরের কথা বলেন। সেখানে আর কোন যুক্তির অবতারণা করতে দেবেন না। তিনি বলবেন আমি সত্যকে এই ভাবে দেখেছি, তুমি যদি আমার পথ অবলম্বন করতে চাও এস, আর যদি না করতে চাও তাহলে বাপু এসো। আপনাদের কাছেও অনেকে অনেক রকম যুক্তি নিয়ে আসবে। আপনাকে তাই একটা মূল যুক্তিকে বুঝতে হবে তা হল, শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে একমাত্র সত্য হল ঈশ্বর, উনি জানেন ঈশ্বর এই। যারাই ঠাকুরের কাছে যেত সবার সাথেই ঠাকুর কথা বলছেন। কিন্তু কি কথা বলছেন? আমি এই রকমটি দেখেছি যে! একবার একজন এসে ঠাকুরের সঙ্গে তর্ক করছে। ঠাকুর খুব বিরক্ত হয়ে বলছেন – তোমার কথা কী শুনব! আমি তো দেখছি এই রকম। এরপরেও বেশি তর্ক কেউ যদি করতে আসত তখন ঠাকুর তাকে একটু ছুঁয়ে দিলেন। ছুঁয়ে দিতেই তার সমস্ত ধারণাটাই পাল্টে যাচ্ছে। কারুকে একটু ছুঁয়ে দিয়ে, কারুর জিভে কিছু লিখে দিয়ে তার সব ধারণাকে পাল্টে দিতেন। কারুর ক্ষেত্রে আবার ঠাকুর পারছেন না, তিনি তখন মা কালীকে বলছেন – মা! ওকে এখান থেকে সরিয়ে দে। হাজরাকে সরে যেতে হল।

অবতার দক্ষিণেশ্বরে মা কালীর মন্দিরে বিরাজ করছেন। অবতারের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে তিনজন প্রায় প্রথম থেকেই ছিলেন, আর তিনজনই ব্রাহ্মণ, হাজরা, হৃদয়রাম আর হলধারী (three ‘H’), তিনজনই ঠাকুরের নিজের লোক – হাজরা জপ করে, হলধারী শাস্ত্রের পণ্ডিত আর হৃদয় সেবা করে, তার মানে ভক্তি, জ্ঞান আর কর্ম। ভগবান তিনজনের উপর এমনই বিরক্ত হয়ে গেলেন যে তিনজনকেই দক্ষিণেশ্বর ছেড়ে চলে যেতে হল। ভগবানের কাছে তাহলে কে যাবে? এই তিনজনের থেকে কত আর বেশি গুণ থাকবে, তিনজনেই ব্রাহ্মণ, তিনজনই ঠাকুরের সঙ্গে যুক্ত, তিনজনেই ঠাকুরের আত্মীয়, তিনজনই দক্ষিণেশ্বরে মা কালীর মন্দিরে ঠাঁই পেয়েছে, ঠাকুরের যত রকমের আধ্যাত্মিক অনুভূতি হয়েছে তিনজনের সামনেই হয়েছে। তথাপি তিনজনকেই ভগবান সরিয়ে দিলেন। কেন সরিয়ে দিলেন? কারণ ঠাকুর অনুভূতির যে জায়গায় পৌঁছে বলছেন সত্য এই, তোমরা এটা নাও। তারা কেউ মানবে না। স্বামীজীর নামে আমরা কত কিছুই বলি, সিস্টারস এণ্ড ব্রাদার্স বললেন, লোকের উঠে দাঁড়িয়ে করতালি দিচ্ছে। কিন্তু কারুর যদি নিউ ডিসকভারিজ্ খুব মন দিয়ে পড়া থাকে তাহলে তিনি দেখবেন সেখানে এই রকম একটা ব্যাপার আছে। স্বামীজী ক্লাশ নিচ্ছেন। একজন উঠে বলছে ‘স্বামী! আপনার কথা আমি মানতে পারলাম না’। স্বামীজী তখন বলছেন ‘তাহলে এই কথাগুলো

আপনার জন্য নয়'। স্বামীজী তার সঙ্গে কোন রকম তর্ক করতে গেলেন না, তিনি যে তর্ক করে তাকে বুঝিয়ে দেবেন, তিনি তা করছেন না। শুধু একটি কথা বলে দিলেন, এই কথা তোমার জন্য নয়। অথচ স্বামীজীর এত কিছু বলেছেন, সমগ্র রচনাবলীতে যা কিছু আছে তাতে একটিও অযৌক্তিক কোন কথা পাওয়া যাবে না। তাহলে এনাদের কথা কে বুঝতে পারে না? যাদের মনের প্রস্তুতি নেই। মনের প্রস্তুতি যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ ধর্মীয় আচার্যের কাছে গিয়ে তার কোন লাভ হয় না। ঠাকুর যে লাটু মহারাজকে বলছেন, জগৎ যেখানে আছে তার পেছনে একজন জগৎকারও আছেন। এটা ঠাকুরের কোন মুখের কথা নয়। কথামৃতে আমরা তিন রকমের কথা পাই – একটা হল গ্রাম্য কথা যেটা ঠাকুর নিজে গ্রামের বিভিন্ন লোকের কাছে শুনেছেন, যেমন মুখ খলসা, দীঘল ঘোমটা, এগুলো ঠাকুরের কথা নয়। দ্বিতীয় হল, কিছু কিছু কথা তিনি সাধু মহাত্মাদের কাছে শুনেছেন, যাঁরা দক্ষিণেশ্বরে আসতেন, ঠাকুরের সাথে আলাপ আলোচনাদি করতেন। কিন্তু ঠাকুর যখন বলছেন তখন আমাদের মেনে নিতে হবে ঠাকুরই বলছেন, কারণ ঠাকুর ওই কথা গুলোকে অনুমোদন করে গেছেন। তৃতীয় হল, যে কথাগুলো কথামৃতে বেশি জায়গা করে নিয়েছে, সেটা ঠাকুরের নিজের অনুভূতি। ঠাকুর যে বলছেন, এই যে গাছপালা, ফুল, ফল হয়েছে, ঈশ্বর না থাকলে এগুলো কি করে হয়েছে? এই কথা ঠাকুরের শোনা কথা নয় বা কোন দর্শনের তত্ত্ব ভেবে বলছেন না, তিনি নিজে এটাকে প্রত্যক্ষ দেখছেন। অথচ ব্রাহ্ম সমাজের বাবুদের ব্যঙ্গ করে বলছেন, বাবুরা দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমনির বাগানে বেড়াতে এসে বলে 'ঈশ্বর কি বিউটিফুল ফুল করেছেন'! কারণ বাবুদের এটা মুখের কথা। ঠাকুর যেভাবে বলছেন জগতের পেছনে একজন জগৎকারও আছেন, ঠিক সেইভাবে ঋষিরা দেখছেন এই জগতে যাবতীয় যা কিছু আছে এর পেছনে একটা ঈশ্বরীয় শক্তি আছে। আগুন জ্বলছে তার পেছনে ঈশ্বরীয় শক্তিকে দেখছেন, সূর্য আছে তার পেছনেও ঈশ্বরীয় শক্তি আছে, জগৎ চলছে তার পেছনে ঈশ্বরীয় শক্তি আছে, ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে, শিশুর জন্ম হচ্ছে, মৃত্যু হচ্ছে, দিন হচ্ছে রাত হচ্ছে, সবের পেছনে তাঁরা সেই ঈশ্বরীয় শক্তিকে দেখছেন। বিভিন্ন কার্যের পেছনে যে ঈশ্বরীয় শক্তি আছে ঋষিরা তার এক একটা নাম দিয়ে দিলেন। তাহলে কত দেবতা হতে পারে? যদি এভাবে দেখেন তাহলে কত দেবতা হবে? হাঁচি দিচ্ছি সেই হাঁচিরও একজন দেবতা থাকতে হবে, থাকতে বাধ্য। কারণ ঈশ্বর যদি সব কিছুর পেছনে থাকেন তাহলে ছোট ছোট যা কিছু হচ্ছে তার পেছনেও ঈশ্বরীয় শক্তি আছে। সেই ঈশ্বরীয় শক্তিকে মানলে দোষের কিছু নেই।

এটাকে বোঝানোর জন্য খুব সহজ যুক্তি আছে, কিন্তু মেনে নেওয়া খুব কঠিন। একমাত্র হিন্দুরাই এই যুক্তিকে গ্রহণ করে, আর কোন ধর্মই এই যুক্তিকে মানবে না। গীতাতে ভগবান বলছেন, *স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ*, যা কিছু স্থাবর আছে তার মধ্যে আমি হিমালয়। কারণ হিমালয় স্থাবর পদার্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম, ভগবান বলছেন আমি সেখানে আছি। গীতার দশম অধ্যায়ে শুধু এই কথাই বলে গেছেন, যেখানে যা যা শ্রেষ্ঠ জিনিস আছে তার মধ্যে আমি আছি। ছলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হল জুয়া খেলা, ভগবান বলছেন সেটাও আমি। ভালোটাও তিনি অত্যন্ত বাজেটাও তিনি। যজ্ঞ যখন হচ্ছে তখন তাঁরা স্থূল ভাবে ওই দিব্য শক্তিরই পূজা করছেন, যাতে আমাদের এই জিনিসটা ঠিক থাকে। ঠাকুরের কথা যদি মনে থাকে, জগতের পেছনে ঈশ্বর আছেন, তাহলে সব কিছুর পেছনেই ঈশ্বরীয় শক্তি আছে। আপনার টাকা-পয়সা তার পেছনেও ঈশ্বরীয় শক্তি আছে, আপনার ছেলের যে ভালো কিছু হবে তার পেছনেও ঈশ্বরীয় শক্তি আছে, আপনার মধ্যে যা যা দোষ আছে সেই দোষের পেছনেও ঈশ্বরীয় শক্তি আছে। বেদের একটি নামকরা সূক্তম্ হল সভাসূক্তম্, পরে সভাসূক্তম্ নিয়ে আলোচনা করা হবে। আপনি একটা সভাতে যাচ্ছেন, সভাতে গিয়ে আপনি কথা বলবেন কিন্তু অপরে আপনার কথাকে দাবিয়ে দিতে পারে, আপনার কথাকে কেউ হয়তো শুনতে চাইবে না, আপনার সম্মান হানি হয়ে যেতে পারে। সভাসূক্তমে সেই দিব্য শক্তির কাছে প্রার্থনা করা হচ্ছে আমি যে সভাতে যাচ্ছি সেখানে আমার কথাকে যেন সবাই গুরুত্ব দেয়। ঠাকুরের জীবনে এর খুব ভালো উদাহরণ আছে। ঠাকুর যখন দক্ষিণেশ্বরে আছেন সেই একজন পণ্ডিত দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে এসে সব পণ্ডিতদের তর্ক করে হারিয়ে দিতে। তর্ক করার আগে সেই পণ্ডিত হা রে রে রে করে বিকট চিৎকার করত। আসলে নিজের শক্তিকে জাগাতে আর সামনের লোকটির শক্তিকে হরণ করার জন্য পণ্ডিত ওই রকম হা রে রে করে চিৎকার করতে থাকত। একবার এই রকম ঠাকুরের সঙ্গে

তর্ক করতে আসার আগে সেই পণ্ডিত হা রে রে করেছে, সেই শুনে ঠাকুরও হার রে রে করতে শুরু করেছেন। ওদিক থেকে পণ্ডিত হা রে রে করছে আর এদিক থেকে ঠাকুরও হা রে রে করছেন। সামনের লোকটির শক্তিকে জয় করার জন্য আপনাকেও হা রে রে করে তাকে দাবিয়ে দিতে হবে। চিকাগো যাওয়ার আগে স্বামীজী কিন্তু সভাসূক্তম্ পাঠ করে যাননি, কিন্তু তাঁর কাছে ছিল আধ্যাত্মিক দিব্য শক্তি। ওই দিব্য শক্তিতে ভরপুর হয়ে তিনি পাঁচটা মাত্র শব্দ বলছেন, Sisters and brothers of America স্বামীজী জয়ী হয়ে বেরিয়ে এলেন। কিন্তু যিনি আগে থেকে একটা প্রস্তুতি নিয়ে সভাতে গিয়ে শ্রেষ্ঠ হতে চাইছেন, তাঁকে সভাসূক্তম্ পাঠ করে যেতে হবে।

এইভাবে বেদে যদিও যজ্ঞ প্রধান ছিল, কিন্তু যজ্ঞের পাশাপাশি প্রার্থনার গুরুত্ব পাওয়া শুরু হয়ে গেল। প্রার্থনা বেদের মূল জিনিস ছিল না। এক একটা ধর্মশাস্ত্রের এক একটা বৈশিষ্ট্য থাকে। যেমন কোরানে প্রার্থনার উপর খুব জোর দেওয়া হয়েছে, খ্রীশ্চানদের কিছু কিছু সম্প্রদায়ের মধ্যেও প্রার্থনার বিরাট গুরুত্ব ছিল। কিন্তু সেই তুলনায় প্রার্থনার খুব বেশি গুরত্ব ভারতে ছিল না, কিন্তু পরবর্তিকালে ভক্তি পথের প্রভাব যেমন যেমন প্রসার পেতে শুরু করল তেমন তেমন প্রার্থনার গুরুত্বও প্রচণ্ড ভাবে বাড়তে থাকল। তবে অন্যান্য ধর্ম থেকে হিন্দুদের কাছে প্রার্থনার ধারণা প্রথম থেকেই আলাদা। প্রার্থনার কথা বললেই আমরা সবাই মনে করি, রাজার মত কেউ একজন আছেন তাঁর কাছে গিয়ে এটা ওটা দেওয়ার জন্য আর্জি জানানো। ভগবানের কাছে আর্জি জানালে তিনিই আমাদের সব অভাব মিটিয়ে দেন। প্রার্থনার ব্যাপারে এই রকম ধারণা হিন্দুদের কখনই ছিল না। হিন্দুরা বলবে, আমি আমার মত সব কিছু করছি, কিন্তু ত্রিবিধ বিঘ্ন আমাকে পদে পদে বিঘ্ন সৃষ্টি করে যাচ্ছে। ত্রিবিধ বিঘ্ন মানে আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক। আধিভৌতিক হল, লোকজন বা জীব-জন্তু থেকে যে বিঘ্ন আসছে, আধ্যাত্মিক মানে ভেতর থেকে যে বিঘ্ন আসে, একটা বড় কাজ করতে যাচ্ছে কিন্তু তার জ্বর হয়ে গেল। আর তৃতীয় হল আধিদৈবিক। আধিদৈবিক বিঘ্নকে হিন্দুরা খুব ভয় করত, দেবতারা না আমার কোন কিছুর বিঘ্ন করে দেন। আমাদের পরম্পরাতে একটা দৃঢ় ধারণা যে, কেউ সন্ন্যাসী হয়ে যাবে দেবতারা একেবারেই পছন্দ করেন না, সেইজন্য সন্ন্যাসী হওয়ার আগে দেবতারা নানান রকমের বিঘ্ন সৃষ্টি করেন। শুভ কাজেও বিঘ্নের আশঙ্কা থাকে। বাড়িতে যদি বিয়ের ঠিক হয়ে যায় তখন গণেশের পূজো দিয়ে শুরু হয়, কারণ তিনি বিঘ্ননাশক, তারপর বয়োঃজ্যেষ্ঠ বা আত্মীয়দের জানানো হয়, আপনারা একটু আশীর্বাদ করুন।

বেদের ধর্ম যজ্ঞ ভিত্তিক, যা কিছু আছে সব যজ্ঞ। আর বেদের যে কোন যজ্ঞের সময় ব্রাহ্মণদের এই ধরণের মনোভাব কাজ করত যে, আমি পবিত্র, আমি এত দিন পূজাদি করে আসছি, যা করেছি সব কিছু নিষ্ঠাপূর্বক করে এসেছি সেইজন্য আমি যা প্রার্থনা করছি সেটা আমার প্রাপ্য। অগ্নিসূক্তমেও ঋষি এইভাবে বলছেন। ঈশাবাস্যোপনিষদে ঋষি বলছেন *সত্য ধর্মায় দৃষ্টয়ে*। ব্রাহ্মণ মৃত্যুর মুখে এসে সূর্যের কাছে প্রার্থনা করেছেন, হে সূর্য! আমি এই পৃথিবী ছেড়ে চললাম, তোমার যে আধ্যাত্মিক রূপ, *যত্তে রূপং কল্যাণতম*, তোমার কল্যাণতম রূপ আমাকে দেখাও। আমি কোন কাঙালী ভিখারী নই, তোমার কাছে আমি কৃপা ভিক্ষা চাইছি না, আমি তোমার সত্য রূপ দেখতে চাইছি, এটা আমার ন্যায্য অধিকার। অধিকারের ভিত্তিটা কি? *সত্য ধর্মায় দৃষ্টয়ে*, একজন ব্রাহ্মণ হয়ে সারা জীবন আমি সত্য আর ধর্মে প্রতিষ্ঠিত থেকেছি, তোমার প্রকৃত আধ্যাত্মিক রূপ দেখার যোগ্য আমি, আমাকে দেখাও। ঋষিদের কাছে প্রার্থনা সব সময় এটাই। আমার যা করার সব নিষ্ঠাপূর্বক ঠিক ঠিক ভাবে করে এসেছি, তাই আমার যেন কোন বিঘ্ন না আসে আর আমার প্রাপ্য আমি যেন অবশ্যই পাই। আমি যেটা পাওয়ার যোগ্য তার বাইরে আমি অন্য কিছুই চাইছি না। কিন্তু আমাদের কাছে প্রার্থনার সব সময় অর্থ হল, যেটা আমি পাওয়ার যোগ্য নই সেটাকে চাওয়া। প্রার্থনা মানে, আমি আমার কর্তব্যে প্রতিষ্ঠিত আছি, আমি আমার কর্তব্য কর্ম নিষ্ঠা সহকারে করেছি, কিন্তু আমার নানান রকমের যে বিঘ্ন আছে এই বিঘ্নগুলি যে নাশ হয়ে যায়। এই প্রার্থনা ছাড়া অন্য কোন রকম প্রার্থনা হয় না। বেদের সময় ব্রাহ্মণদের একটা খুব সুন্দর প্রার্থনা ছিল, আমি যে এই যজ্ঞ করছি, এই যজ্ঞের যে ফল আমি পাব সেটা যেন বীর্যতর হয়, বলতে চাইছেন আরও যেন ভালো হয়। কেমেস্ট্রিতে একটা থিয়োরী আছে যখন দুটো জিনিসে react করে তখন দুটো নিজেই স্বাভাবিক ভাবেই react করে, যেমন হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন আছে তাতে

যদি জিঙ্ক অক্সাইড দিয়ে দেওয়া তখন দুটো ভালো মত react করবে, কেমেস্ট্রিতে এটাকে বলা হয় catalyst। বেদের ঋষিদের কাছে প্রার্থনা হল এক ধরণের catalyst। Catalystএ আপনাকে full impact দিয়ে দেবে, প্রার্থনাতেও ঠিক তাই হয়, আপনার যেটা পাবার কথা তার পুরোটাই পেয়ে যাবেন। যেমন আমরা এর আগেও আলোচনা করেছি, যজ্ঞ মানেই যজুর্বেদ, যজ্ঞে যা কিছু আহুতি দেওয়া হত তার সব মন্ত্র যজুর্বেদ থেকে নেওয়া হত।

ওনারা ঋগ্বেদ থেকে পাঠ করতেন ঠিকই, কিন্তু বেশ কিছু মন্ত্র ছিল যেগুলো আবৃত্তি করতে থাকতেন আর আবৃত্তির মাঝে মাঝে ওঁ এই প্রণব উচ্চারণ করতে থাকতেন। যেমন ঋগ্বেদে গায়ত্রী মন্ত্র এইভাবে আছে *ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ*, সেখানে শেষে ওঁ নেই। কিন্তু পরে *প্রচোদয়াৎ*এর শেষে ওঁ লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। যখন আমরা *ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ* বলছি তখন এটা বেদের মন্ত্র, কিন্তু ওঁ লাগিয়ে দিলে এটাই প্রার্থনা হয়ে যাবে, তখন এটি একটি সিদ্ধ মন্ত্র হয়ে গেল। যতক্ষণ না ওঁ লাগানো হবে ততক্ষণ কখনই প্রার্থনা হবে না। প্রার্থনা মানে, বেদের মন্ত্রে ওঁ লাগাতে হবে। যে মন্ত্রগুলিকে যজ্ঞে ব্যবহার করা হত সেই মন্ত্রগুলিকেই ওনারা আবার আবৃত্তি করে যেতেন। আবার অনেক সময় রীতিমত elaborate chanting করা হত, ওটাকে শাস্ত্র বলা হত। এর ভালো দৃষ্টান্ত হল ঈশাবাস্যোপনিষদ। ঈশাবাস্যোপনিষদ যজুর্বেদে এসেছে, আর যজুর্বেদের মন্ত্রে যজ্ঞে আহুতি দেওয়া হয়। মজার ব্যাপার হল, যজুর্বেদের প্রথম ঊনচল্লিশটা অধ্যায় যজ্ঞে ব্যবহার করা হয় কিন্তু চল্লিশতম অধ্যায়টি যজ্ঞে ব্যবহার করা হত না, এই চল্লিশতম অধ্যায়টিই হল ঈশাবাস্যোপনিষদ। কিন্তু ওনারা বিশ্বাস করতেন কোন বিশেষ যজ্ঞ করার সময় ওঁ সহ যদি ঈশাবাস্যপনিষদ পাঠ করা হয় তাহলে সেই যজ্ঞের ফল খুব ভালো হবে। ওঁ লাগিয়ে লাগিয়ে বেদের মন্ত্র পাঠ করাকে ওনারা বলতেন প্রার্থনা।

ঋষিদের আরেকটা ব্যাপারে ধারণা ছিল, যেটা আমরা বেদেই পাই, তা হল যদি কেউ বাইরে থাকে, কিংবা খুব তাড়াহুড়ো থাকার জন্য যজ্ঞ করতে পারছে না, তখন মনে মনেও যজ্ঞ সম্পাদন করা যেত। মানসিক ভাবে যখন যজ্ঞ সম্পাদন করা হত তখন এই প্রার্থনার গুরুত্ব প্রচণ্ড বেড়ে যেতে। কিন্তু পরের দিকের ঋষিরা প্রার্থনাকে যজ্ঞ থেকে পুরো আলাদা করে দিলেন। কর্মণা মনসা বাচা, এই ভাব এখন খুব বেশি করে আমাদের মধ্যে এসে গেছে। যখন ধর্ম সাধন হয় তখন কর্ম দিয়ে, মন দিয়ে আর বচন দিয়ে এই তিনটে জিনিসকে নিয়ে যদি সাধনা চলে তখন তার ফল অনেক ভালো হয়। যজ্ঞের ক্ষেত্রে কর্ম খুব বেশি এবং ভালো মত চলে তার সাথে বচনও ভালোই চলে, কারণ সব ব্রাহ্মণরা বেদ মন্ত্রের উচ্চারণ করতে থাকেন। কিন্তু মন সেখানে কোন কাজ করে না। কিন্তু প্রার্থনার উপর যখন চলে যাচ্ছে তখন মনের গুরুত্ব প্রচণ্ড বেড়ে যায়। ধীরে ধীরে যজ্ঞের ব্যাপার অনেক কমে গেল। যজ্ঞের জায়গায় এখন অনেক রকমের সাধনার পদ্ধতি এসে গেছে।

পরের দিকের সাধনার পদ্ধতিতে বলা শুরু হল, তুমি তোমার নিজের কাজ করে যাও, কাজ করার সময় তিনটে জিনিসকে লাগাও – কর্মণা, মনসা ও বাচা। এই দৃষ্টিভঙ্গীকেই আজকের দিনে এসে বলা হচ্ছে – জীবনের দৈনন্দীন সব কাজ আধ্যাত্মিকতার মানসিকতা নিয়ে করে যাও। বাড়িতে কাপড় কাচার কাজটাও আধ্যাত্মিক মনোভাব নিয়ে করতে হবে। বৈদিক যুগে এই দৃষ্টিভঙ্গী ছিল না। কাপড় কাচার সময় মনে করছি আমি ঠাকুরের কাপড় কাচছি অথবা আমি ঠাকুরের ভক্ত, মন্দিরে ঠাকুরকে প্রণাম করতে যাওয়ার সময় আমাকে শুদ্ধ পরিষ্কার বস্ত্র পরিধান করে যেতে হবে। তখন কাপড় কাচাটাও আমার সাধনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হয়ে গেল। এবার আমি কাপড় কাচছি আর মনে মনে আমার ইষ্টমন্ত্র জপ করে যাচ্ছি। তাহলে কি দাঁড়াল? আমার মন আমার ইষ্টের চিন্তন করছে, বাণী মনে মনে ইষ্টমন্ত্র জপ করছে আর কর্ম যেটা সম্পাদন করা হচ্ছে সেটা আমার ইষ্টের জন্যই করছি। এই তিনটে, মন, বাণী আর কর্ম মিলে একটা ঐকতান তৈরী হচ্ছে। আধ্যাত্মিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে এর পরিণাম যে কত ফলপ্রদ হবে, এ ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই। আমাদের মন স্বাভাবিক ভাবেই চঞ্চল, ঠিকমত জপ-ধ্যান করতে পারি না, বেশিক্ষণ শান্ত হয়ে বসতে পারি না। এই সমস্যার সমাধানের খুব সহজ পথ আমাদের কাছেই আছে। যে কোন কাজই করি না কেন, রান্না করছে, বাসে করে কোথাও যাচ্ছে, রাস্তা দিয়ে হাঁটছে, আধ ঘন্টা সময় এই কাজ করতে লাগবে, এর মধ্যে মনে অনেক রকম

চিন্তা আসবে। এবার সে ঠিক করে নিল এই আধ ঘন্টা আমি মনে মনে প্রার্থনা করতে থাকব। কি প্রার্থনা করবে? ইষ্টমন্ত্রের জপ ছাড়া আর কোন বড় প্রার্থনা হয় না। বাসে যেতে যেতে সারাটা পথ এবার ইষ্টমন্ত্রের জপ করতে থাকল। তাও হবে না, দু মিনিটও জপ করতে না করতেই জপ থেমে গিয়ে মন অন্য চিন্তায় ঢুকে যাবে। ঢুকে যাবেই, কিছু করার নেই। কিন্তু যতই ছিটকে যাক আবার মনকে টেনে জপে লাগিয়ে দিতে হবে। বৈষ্ণবরা রাস্তাঘাটে মালা জপ করতে করতে যায়, মালা জপ করছে ঠিকই কিন্তু তাতেও মন একাগ্র থাকে না। মন সব থেকে বেশি একাগ্র হয় যদি ইষ্টমন্ত্রের শব্দ নিজের কানে শোনার চেষ্টা করে।

'The Pilgrims Progress' খ্রীশ্চানদের একটা নামকরা বই। একজনের খুব জানার ইচ্ছে হল কিভাবে প্রার্থনা করতে হবে, আধ্যাত্মিক জীবনে কিভাবে আমি এগোব। সবাইকে সে জিজ্ঞেস করে যাচ্ছে। কারুর কাছ থেকে লোকটি সন্তোষজনক উত্তর পাচ্ছিল না। শেষে একজন সাধুর সাথে দেখা হতে তাকে জিজ্ঞেস করা হলে সেই সাধু তাকে বলছেন – The prayer first should reach your ears। বক্তব্য হল তোমার প্রার্থনা আগে তোমার কানে প্রবেশ করুক তারপর ঈশ্বরের কানে যাবে। আমরা প্রার্থনা বলতে মনে করি, হে ঠাকুর! আমাকে টাকা দাও, অমুক দাও, তমুক দাও ইত্যাদি। ঠাকুর এই ধরণের প্রার্থনার আগাগোড়া নিন্দা করে গেছেন। তবে এটা ঠিকই, আমাদের দুঃখ-কষ্ট লেগেই আছে, দুঃখ হলে আমি কাকে আমার দুঃখের কথা জানাব! ঠিকই, ঈশ্বরকেই বলতে হবে। কিন্তু এগুলোকে কখনই প্রার্থনা বলে মনে করা হয় না। প্রার্থনা মানে, আমার সাথে ঈশ্বরীয় শক্তির যে বিশেষ সম্পর্ক, প্রার্থনার মাধ্যমে আমাকে সেই সম্পর্কের কথা স্মরণ করতে হবে। আর প্রার্থনাতে অবশ্যই একটা mystic formula থাকবে। Mystic formula মানে অতি গুহ্য কোন জিনিস, যেটা অত্যন্ত গোপনীয় এবং অন্যেরা কেউ জানতে পারবে না। যেমন গায়ত্রী মন্ত্র বা যার যার ইষ্টমন্ত্র, এটাই mystic formula। যখন এভাবে ইষ্টমন্ত্রের জপ করা হয় তখন প্রার্থনা প্রচণ্ড ফলপ্রদ হয়। এই ধারণাটাই বেদে অন্য ভাবে এসেছিল। তাঁরা মনে করতেন যজ্ঞের সময় উপনিষদের মন্ত্রগুলিকে যদি ওঁ লাগিয়ে লাগিয়ে আবৃত্তি করা হয় তাহলে যজ্ঞের ফল আরও ভালো হবে। সেখান থেকে ধীরে ধীরে এই ধারণা এসে গেল, কেউ যদি বিশেষ প্রয়োজনে এই মন্ত্রগুলিকেই প্রার্থনা রূপে আবৃত্তি করে যায় তখন এটাই যজ্ঞের মত একই ফল দেবে। এখান থেকে ধীরে ধীরে যজ্ঞ আর প্রার্থনা আলাদা হয়ে গেল। পৌরাণিক কাহিনী আসার সাথে সাথে যজ্ঞ আর প্রার্থনা পুরোপুরি আলাদা হয়ে গেল, বিশেষ করে যজ্ঞ তো মোটামুটি উঠেই গেল, থেকে গেলে শুধু প্রার্থনাটুকু। আজকের দিনে আধ্যাত্মিক জীবনে প্রার্থনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

যতই বিবর্তন হোক না কেন, মূল ধারণায় কোথাও কিছু মাত্র পরিবর্তন হবে না। ঠাকুর যেমন বলছেন জগৎ আছে জগতের পেছনে জগৎকর্তা আছেন, বেদের ঋষিরাও একই জিনিস দেখছেন, প্রকৃতিতে যা কিছু হচ্ছে সব কিছুর পেছনে ঈশ্বরীয় শক্তি আছে। কিন্তু প্রার্থনা করার সময় তাঁরা মনে করতেন, আমি যদি অগ্নির উপাসনা করি তাহলে আমি ধন পাব, ইন্দ্রের উপাসনা করলে আমি সম্পদ, ঐশ্বর্য এইসব পাব। এরপর তাঁরা যজ্ঞ করছেন, তখন তাঁরা দেখলেন যজ্ঞের সময় বেদ মন্ত্রের যদি পাঠ করা হয় তাহলে যজ্ঞের ফল আরও ভালো হবে। সেখান থেকে বিবর্তন হতে হতে প্রার্থনার ব্যাপারটা বেশি গুরুত্ব পেয়ে গেল। সময়ের সাথে সাথে মানুষের চিন্তা-ভাবনা যত উন্নত হতে থাকে তত এই জিনিসগুলো ক্রমাগত পাল্টাতে থাকে কিন্তু মূল জায়গাটা কোন অবস্থাতেই পাল্টাবে না। আধ্যাত্মিক তত্ত্বের মূল জিনিসগুলো যদি পাল্টে যায় তাহলে বুঝতে হবে আধ্যাত্মিকতার কোথাও কোন ভ্রান্তি ঢুকে গেছে। আধ্যাত্মিকতার মূল জিনিসগুলো বেদের সময় যা ছিল আজও সব একই রকম আছে। মূল জিনিস হল – জগতের পেছনে ঈশ্বর আছেন।

সমবেত প্রার্থনার ধারণা হিন্দু ধর্মে কোন দিনই ছিল না, group prayer খ্রীশ্চানদের প্রচলিত ধারণা। হিন্দু ধর্ম সব সময়ই ব্যক্তিকেন্দ্রিক। এর আগেও আমরা আলোচনা করেছি যে, বেদের কিছু যজ্ঞ গৃহের মধ্যেই করা হয়, কিছু যজ্ঞ বাইরে সবার সামনে করা হত। গৃহ্য যজ্ঞ পারিবারিক যজ্ঞ আর শ্রৌত যজ্ঞ public যজ্ঞ, যেমন রাজসূয় যজ্ঞ, অশ্বমেধ যজ্ঞ এগুলো শ্রৌত যজ্ঞের অন্তর্গত, সেখানে তখন অনেকে মিলে নানা রকম পাঠ, গান, কাহিনীর বর্ণনা করতে থাকে। কিন্তু আধ্যাত্মিক সাধনায় যজ্ঞ কখনই আমাদের কাছে public জিনিস ছিল না। এর মধ্যে আবার অনেক ব্যাপার জড়িত থাকে। যেমন দুটো পৃথক সমাজের মধ্যে যখন মেলামেশা

শুরু হয় তখন অনেক কিছু পাল্টাতে থাকে। যেমন খ্রীশ্চানদের প্রার্থনা সব সময়ই community prayer, মুসলিমদেরও community prayer, বেদের সময়ও শ্রৌত যজ্ঞ কতকটা community prayerএর মত ছিল। কিন্তু সেখানে প্রার্থনার থেকে যজ্ঞের প্রাধান্য বেশি ছিল। কয়েকটা ব্যাপার যদি আমরা মনে রাখি তাহলে এগুলো বুঝতে সুবিধা হবে। প্রথমত মনে রাখতে হবে ব্যষ্টি মন কখনই শান্ত disciplined হতে চায় না। স্কুলের হোস্টেলের ছাত্রদের দিয়ে এই জিনিসটা ভালো বোঝা যায়। হোস্টেলের ছেলেদের খেলার সময় যখন হবে তখন ওদের energy level অনেক বেড়ে যাবে, কিন্তু সকালে পিটি করতে চাইবে না। কোন কারণে যদি সকালে বলা হয় আজকে ড্রিল না হয়ে খেলা হবে, সঙ্গে সঙ্গে ওদের সবার উৎসাহ বেড়ে যাবে। এর কারণ কি? আমরা কেউই disciplined হতে চাই না। খেলা মানে, যার নিয়ম আমিই তৈরী করব আর যার নিয়ম আমিই ভাঙব। মানুষ কোন অবস্থাতেই নিজেকে disciplineএ আবদ্ধ রাখতে চায় না। মানুষকে তাই প্রার্থনার দ্বারা অন্তর্মুখীর দিকে ঠেলে দেওয়া একেবারেই অসম্ভব। তাহলে তাকে বাঁধবে কি করে? Community prayer এই ক্ষেত্রে খুব কার্যকরী ভূমিকা নেয়। Community prayerএ সবাইকে ভয় দেখিয়েই হোক আর লোভ দেখিয়েই হোক বাধ্য করছে তোমাকে এতটা থেকে এতটা চার্চে এসে প্রার্থনা করতে হবে। ওখানে আর যাই হোক, ঈশ্বরীয় কথাই তো হচ্ছে। ঠাকুর বলছেন অমৃত সাগরের জল তুমি নিজে পান কর আর কেউ ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিক, অমৃত সাগরের জল পান করলে তুমি অমরই হবে, সে তুমি যেভাবেই পড় না কেন। ঈশ্বরীয় কথা তুমি একা একা কর আর সমবেত ভাবেই কর ফল একই হবে। তবে এই যে বিবর্তন, যজ্ঞ থেকে প্রার্থনা, প্রার্থনা থেকে ধ্যান এগুলোই স্বাভাবিক উন্নতির পদ্ধতি। ঠাকুর বলছেন ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রীতে লয় হয়, গায়ত্রী প্রণবে লয় হয়, যোগীর সেই নাদ ভেদ করে পরমাত্মার সঙ্গে এক হন।

যজ্ঞ হল বহিরঙ্গের সাধনা আর মন্ত্র হল অন্তরঙ্গ সাধনা, কিন্তু পরমাত্মার সঙ্গে এক হতে হলে আমাদের এই মন্ত্রকেও পার করে যেতে হবে। তার আগে যত সাধনাই করা হোক না কেন সেখানে একটা কথা খুব ভালো করে মাথায় বসিয়ে রাখতে হবে, আধ্যাত্মিকতা বলতে একটা জিনিসকেই বোঝায় – আমাদের প্রত্যেকটি কাজ, প্রত্যেকটি পদক্ষেপকে যজ্ঞ হতে হবে। রাবাইয়া ছিলেন সুফি সম্প্রদায়ের একজন খুব নামকরা উচ্চ সাধিকা। মুসলমান ধর্মে শয়তানকে নিন্দা করার ব্যাপার আছে। একজন রাবাইয়াকে জিজ্ঞেস করছে ‘আপনি কখন শয়তানের নিন্দা করেন না কেন’? রাবাইয়া বলছেন ‘হ্যাঁ, আমারও খুব ইচ্ছে করে শয়তানের নিন্দে করতে, শয়তান জিনিসটা খুব বাজে। কিন্তু আল্লাকে প্রার্থনা করতেই আমার সব সময় চলে যায়, একটু যদি ফাঁক পাই তবেই তো আমি শয়তানের দিকে মন দেব, তার ব্যাপারে ভাববো, তাকে গালাগালটা দেব। কিন্তু আমার ফুসরৎই নেই’। এটাই ঠিক ঠিক আধ্যাত্মিকতা, আমাদের জীবনের প্রতিটি সেকেণ্ডকে যজ্ঞে উৎসর্গ করতে হবে। চোখেড় পাপড়ি নড়া, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস পড়া থেকে যা কিছু হচ্ছে সবটাই যজ্ঞ। এই ভাব নিয়ে সব কিছু যতক্ষণ তুমি করতে না পারছ, ততক্ষণ তোমার মধ্যে আধ্যাত্মিকতার কিছুই নেই বুঝতে হবে। কিন্তু একদিনে কেউ আধ্যাত্মিকতার রাস্থায় পা রাখতে পারবে না। একটা জায়গা থেকে তাকেও শুরু করতে হবে। সমাজ এখন ভোগসর্বস্বতায় নিমজ্জ, টিভি, সিনেমা, ইন্টারনেট, মোবাইল এত কিছুর রমরমা। এই সমাজ থেকেই তো ভক্তরা বেলুড় মঠে ঠাকুরের কাছে আসছেন, এই সমাজ থেকেই তো কিছু যুবক এসে বলছে আমি বেলুড় মঠের ব্রহ্মচারী। সংসারীরা এত ব্যস্ততার মধ্যেও মন্দিরে আসছেন, আরতি দর্শন করছেন, পাঠ শুনছেন আর কিছু যুবক সব ভোগ-বাসনা ত্যাগ করে এসে বলছে আমি ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর পথে নামলাম। এরপর আমরা প্রত্যাশা করছি পরের দিনই সবাই সমাধিবান পুরুষ হয়ে যাবে। তা কি কখন সম্ভব! আধ্যাত্মিকতার যাত্রা পথ বিশাল, দীর্ঘ প্রক্রিয়ার পথ ধরে এই যাত্রা পথে এগিয়ে চলতে হয়। এই প্রক্রিয়ার প্রথম শুরু হয় যজ্ঞ দিয়ে। যজ্ঞের মাধ্যমে শুদ্ধিকরণ হতে হতে প্রার্থনাতে চলে আসে, প্রার্থনায় চলে আসার পর যজ্ঞও ধীরে ধীরে পুরোপুরি খসে পড়ে। আজকের দিন তাই যজ্ঞ গৌণ আর প্রার্থনা মুখ্য হয়ে গেছে। আচার্য শঙ্কর গীতার ভাষ্যে এক জায়গায় কর্ম নিয়ে খুব সুন্দর আলোচনা করে বলছেন, যাঁরা জ্ঞানী সন্ন্যাসী তাঁদেরও নিত্যকর্ম করা উচিত। আমাদের কাছে এখন নিত্যকর্ম মানে জপ-ধ্যান আর বৈদিক যুগে নিত্যকর্ম মানে অগ্নিহোত্রাদি কর্ম, অর্থাৎ যজ্ঞে আহুতি দেওয়া। আচার্য শঙ্কর সেখানে খুব সুন্দর উপমা দিয়েছেন, যতক্ষণ ভৃত্য ও মালিক এই

সম্পর্ক থাকে ততক্ষণই ভৃত্য মালিকের সেবা করে। কিন্তু ভৃত্য যেদিন জেনে যাবে আমি আর মালিক এক সেদিন সে আর কেন সেবা করতে যাবে! খুব সরল যুক্তি। জ্ঞানী যেদিন জেনে গেলেন আমি আর ঈশ্বর এক তখন সে কাকে আর ভক্তি করবে, কার কাছে প্রার্থনা করতে যাবে! কথামৃতে বর্ণনা আছে সন্ধ্যাবেলা ঠাকুর ধূপধুনো নিয়ে ঘরের প্রতিটি ঠাকুর-দেবতাদের পটের সামনে দেখাচ্ছেন, স্তুতি করছেন। ঠাকুর আত্মারাম, আত্মারাম এভাবেও আনন্দকে আস্বাদ করেন, আনন্দের আস্বাদ করতে গিয়ে দুটো কথা বলছেন মাত্র। এখানে sense of agency নেই, sense of agency মানে আমি প্রার্থনা করছি, এই প্রার্থনা করলে আমি এই ফল পাব, এই ভাব নিয়ে আত্মারাম কোন প্রার্থনা করেন না।

অনেকে মনে করে যার ঈশ্বর দর্শন হয়ে গেছে তার তো সবই হয়ে গেল, এখন প্রারব্ধ বশতঃ যতটুকু চলার চলবে। কিন্তু যার জ্ঞান হয়ে গেল তার আবার প্রারব্ধ কিসের। জ্ঞান হয়ে যাওয়া আর তারপরের যে প্রারব্ধ এর মধ্যেকার পার্থক্যগুলো এত সূক্ষ্ম যে সাধারণ বুদ্ধিতে একেবারেই ধরা যায় না, কিন্তু এই সূক্ষ্ম প্রভেদ গুলো না ধরতে পারলে অনেক কিছুতে গোলমাল হয়ে যাবে। ঠাকুর বলছেন – একজন বলছিল আমার মামার গোয়ালে অনেক ঘোড়া আছে। এখন গোয়ালে ঘোড়া তো থাকতেও পারে। কিন্তু ঠাকুরের কথাতে এত সূক্ষ্ম একটা তথ্য লুকিয়ে আছে ধরা খুব মুশকিল। কি হয়, যাঁর ঈশ্বর দর্শন হয়ে গেছে, যাঁর জ্ঞান লাভ হয়ে গেছে, তাঁর যে শরীর আছে সেই শরীরের একটা গতি আছে, সেই গতিতে তার শরীর এখন চলতে থাকবে। কিন্তু প্রারব্ধ বলতে আমরা যেটা বুঝি, একটা কিছুতে নিজেকে একাত্ম ভাবা, আমার এই কষ্ট হচ্ছে, আমার এটা ভালো লাগছে, জ্ঞান লাভ হয়ে গেলে এই আমি বোধটা একেবারে আলাদা হয়ে যায়। তখন যে সুখ-দুঃখ আসে সেটা প্রারব্ধ বশতঃ আসে না, আমি অমুক অমুক জন্মে এই এই করেছি তার জন্য এই সুখ দুঃখ আসছে, তখন এভাবে আসে না, সেই সময় তার যেমন যেমন সঙ্গ হবে সেই অনুসারেই সুখ-দুঃখ আসবে। একবার শরীর মন থেকে আত্মাকে আলাদা বোধ করে নিলে জগতের কোন কিছুই তাকে স্পর্শ করবে না। প্রারব্ধ বশতঃ চলে শরীর মন ইন্দ্রিয়, কিন্তু তার এখন শরীর, মন, ইন্দ্রিয়েরই বোধ নেই। যেমন একটা বস্ত্র, তার নিজস্ব একটা প্রারব্ধ আছে, সেটা নিজের মত একটা সময়ে ছিঁড়ে যাবে, তাই বলে কি আমার কিছু হচ্ছে? কিন্তু একটা বাচ্চার জামা যদি ছিঁড়ে যায় সে চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করে দেবে। কিন্তু একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষের জামা যদি ছিড়ে যায় তার মন খারাপ হবে কিন্তু বাচ্চার মত আমার সব শেষ হয়ে গেল বলে মাথায় হাত দিয়ে হতাশ হয়ে পড়বে না।

বেদে যখন আত্মজ্ঞানের ধারণা দৃঢ় হতে শুরু হল, তখন তাঁরা বুঝতে পারলেন যজ্ঞের সাথে আত্মজ্ঞানের কোন সম্পর্কই নেই। যিনি আত্মজ্ঞানী তিনি ইচ্ছে করলে যজ্ঞ করতে পারেন, নাও করতে পারেন কিন্তু তিনি ভালো ভাবেই জানেন যে আত্মজ্ঞানের জন্য যজ্ঞের কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। আত্মজ্ঞানের জন্য সব থেকে প্রয়োজনীয় হল জ্ঞান, আমি কে, এই জ্ঞান। যে ঋষিরা এতদিন যজ্ঞ করে আসছিলেন তাঁরা যখন প্রার্থনার মাধ্যমে নিজেদেরকে ঈশ্বরের সাথে যুক্ত করতে শুরু করলেন তখন তাঁরা দেখলেন প্রার্থনার মধ্যে দিয়ে তাঁরা এক অন্য ধরণের জীবনের আস্বাদ পাচ্ছেন, তখন থেকে তাঁরা ধীরে ধীরে যজ্ঞের আধিক্যকে কমাতে থাকলেন। ঠাকুর বলছেন – যে মিছরির শরবত খেয়েছে তার আর চিটে গুড়ের পানা ভালো লাগেনা। একবার যে প্রার্থনার জীবনের আস্বাদ পেয়ে যাবে, আত্মজ্ঞানের আস্বাদ পেয়ে যাবে, এরপর যজ্ঞ সর্বস্ব জীবনের দিকে সে আর আকৃষ্ট হবে না। একবার এই আস্বাদ পেয়ে গেলে সে পুরোপুরি প্রার্থনার জীবনে, আত্মজ্ঞানের পথে নিজেকে নিবিষ্ট করে দেবে। এখানে এসে তাদের প্রথম প্রার্থনা শুরু হয় আত্মার প্রতি, আত্মজ্ঞানের জন্য প্রার্থনা, এই প্রার্থনাগুলি অত্যন্ত উঁচু মানের প্রার্থনা, এর আগের প্রার্থনাগুলো ছিল আনুষ্ঠানিক প্রার্থনা। জাগতিক প্রার্থনা থেকে তাঁরা চলে এলেন অন্তরমুখী প্রার্থনাতে। যজ্ঞের সময় *ওঁ ঐং সর্বদেবদেবীস্বরূপায় রামকৃষ্ণায়* স্বাহা বলে যে আহুতি দেওয়া হয় এটাও একটা প্রার্থনা কিন্তু এটা একটা আনুষ্ঠানিক প্রার্থনা। দীক্ষা নেওয়ার পর জপ করছে ওঁ নমঃ শিবায়, এটাও একটা মামুলি প্রার্থনা। কারণ এই মুহূর্তে এই প্রার্থনা কখনই আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করছে না। হৃদয়ের স্পর্শ নিয়ে এত বছর জপ করলে আমরা সবাই মহাযোগী হয়ে যেতাম, কিন্তু তা হচ্ছি না। কারণ প্রার্থনা আমাদের অন্তর থেকে হচ্ছে না, বহির্মুখী মন যন্ত্রের মত জপ করে যাচ্ছে। কিন্তু জপ করতে

করতে এটাই যখন অন্তর থেকে হতে শুরু করবে তখন আমাদের জীবন চিরতরের জন্য আধ্যাত্মিকতার খাতে প্রবাহিত হতে শুরু করবে। বহির্মুখী মনে প্রার্থনা করা আর আচার সর্বস্ব প্রার্থনার মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। এখন কেউ ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের চিরহরণ কাহিনী, যেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের বস্ত্র নিয়ে চলে যাচ্ছেন, উচ্চঃস্বরে পাঠ করছে, সেই সময় যদি হিন্দু ধর্মের পরম্পরা যারা কিছুই জানে না, তারা যদি কেউ জিজ্ঞেস করে – এখানে কি পড়া হচ্ছে? শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে স্নানের সময় মেয়েদের কাপড় নিয়ে পালিয়ে গেল তার কাহিনী পড়া হচ্ছে। সে তো শুনে আঁতকে উঠবে। রাসলীলা হিন্দু ধর্মের বাইরের কেউ শুনলেই আঁতকে উঠবে। অথচ যারা সত্যিকারের ভক্ত তারা কত ভক্তি সহকারে ভাগবত পাঠ শুরু করার আগে ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় বলে আবৃত্তি করে শুনছে। তাদের মনে কোন ধরণের কুভাব আসে না, এটাই তাদের কাছে একটা প্রার্থনা। বলা হয় শ্রীকৃষ্ণের চিরহরণ, রাসলীলা একমাত্র তাঁদেরই জন্য যাঁরা আধ্যাত্মিক স্তরে অনেক উঁচুতে উঠে গেছেন, সাধারণ মানুষের জন্য এগুলো নয়।

ঠাকুর ছোটবেলায় পাঠশালা থেকে পালিয়ে আমবাগানে বন্ধুদের সাথে যাত্রা করতেন, এই কাহিনীকে যদি সুন্দর পদ্যের আকারে লিপিবদ্ধ করে ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায় বলে পাঠ শুরু করা হয় এটাই তখন প্রার্থনা হয়ে যাবে। কিন্তু গতানুগতিক ভাবে যন্ত্রের মত পাঠ করলে কোন বিশেষ ফল হবে না, যখন অন্তর থেকে করা হবে তখনই তা আধ্যাত্মিকতার সোপান অতিক্রমে সাহায্য করবে। আমরা এখানে বেদের প্রার্থনা আলোচনা করছি। বেদের প্রথম প্রার্থনা আসছে নিজের প্রকৃত স্বরূপ আত্মাকে নিয়ে, এই জায়গা থেকেই উপনিষদের আবির্ভাব। সমগ্র উপনিষদ, যে কটি উপনিষদ আছে, তার সবটাই মূলত আত্মার প্রতি প্রার্থনা, আমরা অন্য ভাবে বলি জ্ঞানযোগ। ভক্ত প্রার্থনা করার সময় বলে, হে প্রভু তুমিই সব, আমি অকিঞ্চন, আত্মার ক্ষেত্রেও তাই বলা হয় – হে আত্মা, তোমা ছাড়া আর কিছু নেই, তুমিই সত্য বাকি সব মিথ্যা, আমার মনকে যেন পুরোপুরি তোমাতে লাগাতে পারি। জ্ঞানযোগ আর ভক্তিযোগে কোন তফাৎ নেই। যারা মুর্খ তারাই তফাৎ দেখে। সেইজন্য দেখা যায় বৈদিক প্রার্থনাই ঔপনিষদিক তত্ত্ব ও চিন্তায় রূপান্তরিত হয়েছে।

প্রত্যেক ধর্মই দুটো নিয়মে চলে। দুটো নিয়মে চলে মানে একটা Open System আরেকটি Closed System। System যখন closed হয়ে যাবে, যেমন পার্সিদের ক্ষেত্রে, জুদাইদের ক্ষেত্রে হয়েছে, সেই ধর্মের গতি থেমে যায়। আর যদি Open System থাকে, তখন হিন্দুদের মত বেদ থেকে উপনিষদে উত্তরণ হবে। বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠান থেকে অন্তরমুখী আচার অনুষ্ঠানে উত্তরণ ঘটবে। আবার অন্তরমুখী আচার অনুষ্ঠান থেকে অন্তরমুখী প্রার্থনাতে উত্তরণ, অন্তরমুখী প্রার্থনা থেকে উপনিষদের তত্ত্ব ও দর্শনে উত্তরণ ঘটে। এটাই আধ্যাত্মিক চিন্তার স্বাভাবিক বিবর্তন। অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা মনে করে উপনিষদ বেদের ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে ক্ষত্রিয়দের ক্ষোভের উদ্‌গার। যারাই আধ্যাত্মিকতার এই স্বাভাবিক বিবর্তনকে বোঝে তাদের কাছে এগুলো কোন সমস্যা হয় না আর এই ধরণের বোকার মত মন্তব্য করে না। নিউ টেস্টামেন্টের অনেক অধ্যায় পড়লে মনে হবে যেন উপনিষদ পড়ছি, ঠিক সেই রকম কোরানের যখন প্রথম অধ্যায় পড়লে মনে হবে যেন উপনিষদ পড়ছি, আবার বুদ্ধের উপদেশ পড়লে মনে হবে উপনিষদই পড়ছি। যে মুহূর্তে জীবনের সব রকম কর্ম, চিন্তা ভাবনা, প্রার্থনা অন্তরমুখী হয়ে ভেতরে চলে যাবে তখন জীবনটাই উপনিষদ হয়ে যাবে। এটাই স্বাভাবিক পরিণতি, ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে ক্ষত্রিয়ের কোন বিদ্রোহের পরিণতি উপনিষদ নয়। ভারত হল প্রচণ্ড Orthodox এখানে একমাত্র বিবর্তনের মাধ্যমে যে উত্তরণ হয় তাকেই গ্রহণ করা হয়, কোন ধরণের বিদ্রোহের মাধ্যমে নতুন কোন পরিবর্তনকে গ্রহণ করা হয় না।

ধর্ম আর আধ্যাত্মিকতার মধ্যে পার্থক্য কোথায়? ধর্মে মানুষ ঈশ্বরকে ধরার চেষ্টা করে, আধ্যাত্মিকতা যখন আসে তখন সে মনে করে আমি ঈশ্বরের মধ্যে আছি আর ঈশ্বর আমার মধ্যে আছেন, এখানে তার উপলব্ধি হয়ে যায়নি, কিন্তু সে অনুভব করছে। যারা ঢাকঢোল পেটাচ্ছে, কালী পূজায় পাঠাবলি দিয়ে পাঠার মাংস খুব করে চিবিয়ে যে আনন্দ পায় সেটা অন্য ধরণের আনন্দ। আর যারা অনুভব করছে আমি ঈশ্বরের মধ্যে আছি আর ঈশ্বর আমার মধ্যেই আছেন তাদের আনন্দ একেবার অন্য ধরণের।

যে ঢাকঢোল পেটাচ্ছে সে ভালো, না যে ধ্যান করছে সে ভালো? এখানে ভালো মন্দের প্রশ্ন আসছে না। প্রশ্ন আসলে লোকটা কি ধরণের, তার স্বভাবে যদি ধর্মাচরণ প্রবল হয় তার পক্ষে ঢাকঢোল পেটানোটাই ভালো, কিন্তু তার স্বভাবে যদি আধ্যাত্মিকতা থাকে তাহলে ঢাকঢোল পেটান, এত বলি, এত পুষ্পাঞ্জলী দিতে হবে এসব ব্যাপারে তার কোন মাথা ব্যাথাই থাকবে না। যার স্বভাবে আধ্যাত্মিকতা আছে তার এই সব ধর্মীয় আচরণে কোন ধরণের আপত্তি থাকে না। ঠাকুর বলছেন – একঘেঁয়েমি আমার ভালো লাগেনা। যিনি চোখ বন্ধ করে ধ্যান করছেন এটা যেমন তার একটা সাধনা, আবার অন্যদিকে ঢাকঢোল শোনাটাও একটা সাধনা, যে পেটাচ্ছে সেটাও তার একটা সাধনা। বেলুড় মঠকে স্বামীজী আধ্যাত্মিকতার যত রকমের ভাব থাকতে পারে তার সমস্ত ভাবের সমণ্বয় কেন্দ্র রূপে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। এখানেও কত সময় ঢাক ঢোল পেটানো হচ্ছে, কত রকমের ধর্মীয় আচার আচরণ পালন করা হচ্ছে। এটাই হওয়া উচিৎ, উপনিষদের কোথাও বলা নেই যে তুমি কোন ধরণের ধর্মীয় আচরণ পালন করবে না বা প্রশ্রয় দেবে না। আধ্যাত্মিক পুরুষরা কখন ফুল দিয়ে পূজা করবে না, ঘন্টা নাড়বে না, পাঁচ রকমের ভোগ দেবে না, যারা অধম আচার্য তারাই এই ধরণের কথা বলেন। উত্তম আচার্য কক্ষণই এসব করতে নিষেধ করবেন না, উপরন্তু তাঁরা বলবেন, তুমি যদি এগুলোই করতে থেকে যাও তাহলে তোমার আর আধ্যাত্মিক উন্নতি হবে না। ঠাকুর বলছেন – তুমি মন্দিরে ঠাকুর দর্শন করতে যাচ্ছ, কিন্তু পথে কাঙালিদের পয়সা আর খাওয়া বিলি করতেই থেকে গেলে তোমার আর ঠাকুর দর্শন হবে না। যারা সমাজসেবা করতেই থেকে যায়, নারী কল্যাণ সমিতি চালানোই যাদের একমাত্র কাজ, অনাথদের সেবা করাই একমাত্র উদ্দেশ্য তাদের একবার অন্ততঃ ভাবা উচিৎ আমার মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর দর্শন। এগুলো কি সন্ন্যাসীর কর্ম? আদপেই নয়। সন্ন্যাসীর একটাই কাজ আত্মজ্ঞান লাভ। বিধবার চোখের জল মোছা, অনাথের সেবা করা এগুলোও সন্ন্যাসী করবে মানুষকে অনুপ্রাণিত করার জন্য। এসব তার লক্ষ্য নয় এগুলো হল by products। যারা ঠিক ঠিক আধ্যাত্মিক লোক তাদের এসব কাজে কোন আপত্তি থাকে না, কিন্তু তারা ভালো মতই জানে যে এই কাজ দিয়ে আমার আসল কাজটি হবে না। রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীরা এই ব্যাপারটা খুব ভালোভাবেই জানেন। যারা এখনও আধ্যাত্মিক সাধনার জন্য প্রস্তুত হয়নি, যাদের মধ্যে এখনও কামনা-বাসনা গিজ্‌গিজ্‌ করছে তাদের জন্য প্রথমে এই কাজগুলো নিঃস্বার্থ ভাবে করা দরকার। এই কাজও যদি সে না করে তাহলে তার দ্বারা ধর্মও হবে না, আধ্যাত্মিকতার তো কোন প্রশ্নই নেই।

হাজার হাজার বছর ধরে ভারত আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য তৈরী করে গেছে, এই আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের মধ্যে ঢাক বাজানওটা দরকার। যারা এখনও সাধারণ অবস্থাতে পড়ে আছে, ধর্মীয় আচরণের মাধ্যমে তাদের মধ্যে ধর্ম ভাবকে জাগ্রত করবার জন্যই এই সবের আয়োজনের ব্যবস্থা আমাদের মুনি ঋষিরাই করে গেছেন। কিন্তু এটাকেই সারা জীবন যদি ধরে রাখে, বুড়ো বয়সেও ঢাকের সাথে নৃত্য করে তাহলে বুঝতে হবে এর অনেক গোলমাল আছে। বেদের যে উপনিষদে উত্তরণ, যাঁরা দিন রাত, বছরে হাজারটা যজ্ঞ করতেন তাঁরা কিভাবে উপনিষদের দর্শনে পৌঁছালেন এটাই ভারতের আধ্যাত্মিকতার ঐতিহ্য। এই উত্তরণের সেতু হল প্রার্থনা। বেদের যে মন্ত্রগুলিকে যজ্ঞের জন্য ব্যবহার করা হত, সেখান থেকে আস্তে আস্তে সরে এসে তাঁরা উপনিষদের দর্শনে জোর দিলেন।

মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ

সংহিতা বা মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ এই চারটেকে নিয়েই বেদের সব কিছু, কিন্তু বেদের মূল শুধু এর মন্ত্রের অংশটুকু। বেদের ধর্ম, দর্শন, বেদের দেবতা যাবতীয় যা কিছু আলোচনা সবটাই বেদের মন্ত্রকে নিয়ে।

মন্ত্রের পরে বেদের যে দুটো ভাগ আসছে তা হল ব্রাহ্মণ আর আরণ্যক। পরের দিকে যেভাবে মন্ত্র অংশ প্রসার পেয়েছে, বেদের এই দুটো অংশ সেই ভাবে প্রসার লাভ করেনি। মন্ত্র অংশের মূল দর্শন চলে এল উপনিষদে। পরবর্তি কালে উপনিষদই বেশি প্রসার পেতে থাকল, আর এখনও উপনিষদ উত্তোরত্তর প্রভাব বিস্তার করেই চলেছে। উপনিষদের মন্ত্রগুলো ছাড়া মন্ত্রের বাকি অংশ ব্যবহার হতে থাকল পূজা অর্চনাতে।

ব্রাহ্মণ আর আরণ্যকের প্রভাব যদিও খুব কমে গেছে কিন্তু এখনও পূজার বিভিন্ন উপাচারে এর কিছু কিছু মন্ত্র প্রয়োজনে ব্যবহার হতে লাগল এবং এর ব্যবহার এখনও হয়ে চলেছে। অবশ্য যারা বেদ পাঠ করেন তাঁরা পুরো বেদই পাঠ করেন।

যে কোন জিনিসই যখন নিজের স্বাভাবিক গতিতে দাঁড়িয়ে গিয়ে মানুষের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে, তখন মানুষ সেই জিনিসটাকে নিয়ে অনেক রকম চিন্তা ভাবনা করে এবং তাকে ব্যাখ্যা করতে চায়, তার শ্রেণীবিন্যাস করতে চায়, কিন্তু তাদের সব চিন্তা, ভাবনা, ব্যাখ্যা দাঁড়িয়ে যাওয়া জিনিসটার সব কিছুর সঙ্গে খাপে খাপে মিলবে না। বেদের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হয়েছিল। বেদের যখন ব্যাখ্যা হতে থাকল তখন তার অনেক রকমের ব্যাখ্যা বেরিয়ে এসেছে। বেদকে যাঁরা প্রাথমিক ভাবে দাঁড় করিয়েছিলেন তাঁরা তখন কখনই ভাবেননি যে বেদকে নিয়ে ভবিষ্যতে এত কিছু হতে পারে, কারণ বেদ নিজের মত তার স্বাভাবিক নিয়মে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

বেদের যে ব্রাহ্মণ আজ পাওয়া যাচ্ছে, আগেকার পণ্ডিতরা এর অনেক ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছিলেন। এর মধ্যে ভট্ট ভাস্বর বলে একজন খুব নামকরা পণ্ডিত বললেন – বেদের যজ্ঞকে যে শাস্ত্র ব্যাখ্যা করে তাকে বলা হয় ব্রাহ্মণ। বেদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যজ্ঞ, যজ্ঞে মন্ত্রের দরকার, মন্ত্র আর যজ্ঞকে যা ব্যাখ্যা করছে তার নাম ব্রাহ্মণ। যজ্ঞ হল কার্য, আর এই কার্য সম্পাদনের জন্য দরকার মন্ত্র। যেমন সংহিতাতে শুধু মাত্র সেই মন্ত্রগুলোই রয়েছে যেটা দিয়ে যজ্ঞ করা হবে। কিন্তু মন্ত্রগুলোর ব্যাখ্যা তাতে করা হয়নি। আবার আরেকজন বিখ্যাত পণ্ডিত রাজশেখর বললেন – বেদের যেখানে বিধি, নিষেধ আর অর্থবাদ করা হয় সেটাই ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ হল বিধি ও নিষেধ, যজ্ঞ করতে গেলে কিভাবে করতে হবে ব্রাহ্মণ অংশে তার ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যদিও ওনারা আলাদা করে নিষেধ শব্দকে নেন না, নিষেধ না বলে শুধু বিধি বলে দেন। সেইজন্য ওনাদের খুব নামকরা একটা শব্দ আছে – বিধি-অর্থবাদ। নিষেধ বিধির মধ্যেই এসে যায়। বিধি সব সময় হয় সাকারাত্মক আর নিষেধ নাকারাত্মক। সাধারণতঃ দেখা যায় যেখানেই ধর্মের কথা আসবে সেখানে দুটোই চলে, তুমি এই রকমটি করিবে, আবার অনেক সময় বলা হয় এই রকম করিবে না। বেদের দর্শনের পেছনে যে মানসিকতা কাজ করে সেটাকে নিয়ে খুব বেশি আলোচনা হয় না। তবে এর একটি খুব মজার দৃষ্টান্ত আছে। স্বামীজী বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠা করার পর অনেক ব্রহ্মচারী মঠে যোগ দিতে আসছেন। যেখানেই দশ জন লোক জড়ো হয়ে যায় সেখানেই কিছু নিয়মকানুন তৈরী করতে হয়, নিয়মাবলী তৈরী না করলে সংগঠন চালানো যাবে না। স্বামীজীও বেলুড় মঠ স্থাপিত করার পর ঠিক করলেন এখানকার জন্য একটা নিয়মাবলী তৈরী করতে হবে। একদিন ওনার এক শিষ্যকে বললেন, আমি নিয়মগুলি বলে যাচ্ছি তুমি লিখে যাও। স্বামীজী প্রথমেই বলছেন, নিয়মাবলীতে নিষেধাত্মক কিছু থাকবে না, সবই সাকারাত্মক ও আদেশাত্মক হবে, তার মানে তুমি এই রকমটি করবে, এই রকমটি করা হবে ইত্যাদি। একটা মজার ঘটনা আছে। স্বামীজী বলছেন, রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের সাধুরা মদ, গাঁজা, আফিং খাবে না। নিয়মাবলীতে যদি বলা হয় সন্ন্যাসী মদ খাবে না, গাঁজা খাবে না, তাহলে তো সেটা নিষেধাত্মক হয়ে গেল। স্বামীজী বলছেন আমাদের সবটাই সাকারত্মক হবে, তাহলে কি করে বলা হবে মদ, গাঁজা সেবন করা যাবে না! এখানে এসে স্বামীজী কিছুক্ষণের জন্য থেমে গেলেন। একটু চিন্তা করে স্বামীজী শিষ্যকে বললেন, লেখো, মাদক দ্রব্যের মধ্যে শুধুমাত্র তামাকু সেবন করা যাবে। এটাই আদেশাত্মক হয়ে গেল। তামাকের বাইরে কোন নেশা রাখা যাবে না। স্বামী-শিষ্য সংবাদেও এই ঘটনার উল্লেখ আছে। আপাতভাবে মনে হবে এটা এমন কিছুই নয়। বেলুড় মঠের নিয়মাবলীতে এত নিয়মকানুন আছে কিন্তু কোথাও নাকারত্মক কিছু নেই, এটা করবে না, বলে কিছু নেই। এটাই outlookএর ব্যাপার, যেখানেই outlook হয় সেটাকেই বলে বিধি। মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে আদেশাত্মক আর নিষেধাত্মকের মধ্যে একটা বড় পার্থক্য আছে, যদিও এটাকে নিয়ে বেশি যুক্ততর্ক করা যাবে না। মানুষের মধ্যে কিছু না কিছু দুর্বলতা থাকবেই, এসব দুর্বলতার দিকে বেশি তাকাতে নেই। কিন্তু তোমাকে আমরা আদেশাত্মক রূপে কিছু বিধির কথা বলে দেওয়া হল, এই বিধিগুলিকে তুমি যদি পালন করে যাও তাহলে তুমি একদিন মহৎ হয়ে যাবে। যখন তুমি মহৎ হয়ে যাবে তখন তোমার এই ছোটখাটো দুর্বলতা গুলো আপনা থেকেই খসে পড়ে যাবে। আর যদি থেকেও যায়

তাতে কিছু আসে যায় না। চাঁদে যে কলঙ্ক আছে তার জন্য চাঁদের সৌন্দর্যের কোন হানি হয় না। বাইবেলের টেন কমান্ডসে যীশুর যে কথাগুলো আছে বা সাধারণ ভাবে আমরা যে নিয়মকানুন তৈরী করি, যেমন আমাদের পেনাল কোড, এগুলো সবই নিষেধাত্মক। কিন্তু ধর্মগ্রন্থে যখনই কোন আদেশ আসে সেই আদেশ সব সময়ই সাকারাত্মক হওয়ারই কথা। যেমন তুমি অধ্যয়ন কর, তুমি নিজের চরিত্র গঠন কর, তুমি মহৎ হওয়ার চেষ্টা কর এরপর কেউ যখন এগুলো পালন করবে তখন একটা ইতিবাচক শক্তি তৈরী হবে। যখন বলা হচ্ছে তুমি চুরি করবে না, অপরের স্ত্রীর দিকে তাকাবে না, এভাবে সব কিছুতে যদি না না করা হয় তখন জীবনে বড় হওয়ার ব্যাপারটার আর গুরুত্ব থাকে না, সেখানে potential forceএর গুরুত্ব হয়ে যায়। ঠাকুর বলছেন চারাগাছ অবস্থায় বেড়া দিতে হয় তা নাহলে গরু ছাগলে খেয়ে যাবে, গাছ বড় হয়ে গেলে ওই বেড়া সরিয়ে দিতে হয়। ঠাকুর যখন এই কথা বলছেন তখন তিনি নিজের শক্তি সংরক্ষণের কথা বলতে চাইছেন, নিজের শক্তি যখন পেয়ে যায় তখন তাতে হাতিও বেঁধে দেওয়া যেতে পারে। স্বামীজী খুব জোর দিয়ে বলছেন, পরে যদি এই বেড়াকে না সরিয়ে দেওয়া হয় তাহলে সে কিন্তু আর বেড়ে উঠতে পারবে না। প্রথম অবস্থায় বেড়ে দেওয়া আর পরে যদি বেড়া সরিয়ে না দেওয়া হয় যখন সে যখন বড় হবে তখন ওই বেড়ার মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে থেকে যাবে। এটাই পরে গিয়ে স্বামীজীর খুব বড় উক্তি হয়েছে It is good to be born in a Church but it is very bad to die there। চার্চ মানে একটা সীমার মধ্যে যখন থাকছে তখন তাকে বড় হতে সাহায্য করছে। কিন্তু যে জিনিসটা তাকে বড় হতে সাহায্য করছে সেই জিনিসটাই পরে তাকে সীমাবদ্ধ করে রাখবে, এগোতে দেবে না। যে কোন প্রথায়, যে কোন সমাজের এটাই নিয়ম। মানুষ কখনই বাঁধন দিয়ে বড় হয় না, মানুষকে সব সময় এগিয়ে যেতে বলতে হবে আর তার দোষ-ক্রুটির দিকে তাকাতেই নেই। সে যখন বড় হতে শুরু করবে ধরমড় করে সেগুলো নিজেই খসে পড়ে যাবে। এক আধটা দোষ-ক্রুটি যদি থেকেও যায় তাতে কিছু আসে যায় না।

গান্ধীজীর ব্যক্তিত্বে অনেক দোষ-ক্রুটি ছিল। মানুষ মাত্রেই কিছু না কিছু দোষ-ক্রুটি থাকবে। কিন্তু গান্ধীজী বলে দিলেন আমি সত্য আর অহিংসাকে নিয়ে এগোব, আমি মিথ্যা কথা আর বলব না। পরে যখন ওনাকে কিছু রাজনীতি করতে হচ্ছে সেখানে তিনি অনেক রকম প্যাঁচ খেলছেন, অনেক কায়দা করছেন। যদি প্যাঁচ না ধরতে পারেন তাহলে আপনি ফেঁসে যাবেন, কিন্তু উনি মিথ্যা কথা কখনই বলতেন না। গান্ধীজী তাই কত মহৎ হয়ে গেলেন। একটা আদর্শকে যদি কেউ ধরে নেয়, তাকে মহৎ হওয়া থেকে আর কেউ আটকাতে পারবে না। যা কিছু নিষেধাত্মক হয় তা কখনই আদর্শ হয় না। আমাদের অত্যন্ত দুর্ভাগ্য যে আমাদের আইন প্রণেতারা, ধর্মের শিক্ষকরা এই ব্যাপারটা ভুলে যান। সারা ভারত পরিক্রমা করার পর স্বামীজী কন্যাকুমারীতে গিয়ে ছোট্ট দ্বীপে বসে ভাবতে শুরু করলেন দেশের এই দুরবস্থা কেন। তারমধ্যে তিনি দুরবস্থার একটা কারণ খুঁজে পেলেন – too much civil laws, ভারতে এত বিধি আর নিষেধ হয়ে আছে যে বিধি-নিষিধের অষ্টপাশে মানুষ হাঁকপাক করছে। আমাদের কাছে গান্ধীজীর জীবন সব থেকে সহজ সরল। তিনি বললেন, আমি অত শত জানিনা বাপু আমি যা কিছু বলব সত্য বলব, যা কিছু করব অহিংসা করব। আমাকে মারতে এলেও আমি কিছু করব না। খুব সামান্য দুটি জিনিসকে ধরে তিনি এগিয়ে গেলেন। এরপর যা যা দোষক্রুটি থাকার থাকবে ওতে তাঁর আর কিছু আসে যায় না।

স্বামীজী বেলুড় মঠের নিয়মাবলী তৈরী করার সময় ঠিক এই দৃষ্টিভঙ্গীকেই অনুসরণ করলেন। এখানে নিষেধাত্মক কিছু থাকবে না। বেদও নিষেধকে কোন ধর্তব্যের মধ্যে নেননি, ওনারা খুব সাধারণ একটা শব্দ নিয়ে এলেন যার নাম বিধি – এই রকমটি করবে। একটা হয়ে গেল বিধি, আরেকটি হয় অর্থবাদ। এই যে যজ্ঞ করা হবে, মন্ত্র পাঠ করা হবে বা যেসব উপাচার আছে বা বিভিন্ন রকমের যে কর্তব্য আছে এগুলোকে পালন করে আমার কি লাভ? যদি গান্ধীজীকে কেউ জিজ্ঞাসা করে, আচ্ছা মশাই সত্য কথা বলে আমার কি লাভ? গান্ধী তাকে কি বলবেন? আমার ভালো লাগে, এটাই আমার ধর্ম, আমার ধর্মের বাইরে আমি অন্য কিছু করতে পারব না। কিন্তু সাধারণ মানুষ গান্ধীজীর মত বলতে পারবে না। তারা সব সময় লাভ-লোকসান খোঁজে। তখন তাদের জন্য বলবে, সত্য কথা বললে বাক্ সিদ্ধ হয়, সত্য কথা বললে মোক্ষ লাভ হয় বা সত্য

কথা বললে ব্যবসাতেও লাভ হয়। এটাই অর্থবাদ। আমাদের উদ্দেশ্য ব্যবসাতে কিছু টাকা আয় করা। আমরা সবাই জানি সত্যি কথা বলতে হয়। তাও আমরা মিথ্যা কথা বলি, ব্যবসাতে লোকদের ঠকিয়ে বেশি আয় করতে চাই। কারণ এদের কাছে টাকা আয় করাটা বেশি দামী। যদি বলা হয়, সত্যি কথা বললে তোমার অনেক টাকা হবে সেই তখন সত্যি কথা বলবে। ঠাকুর-দেবতাদের কাছে মানত করলে যদি টাকা হয় তখন ওটাই করবে। ধর্মের দিক থেকে গেলে মূল্যবোধটাই গুরুত্ব। কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে মূল্যবোধের থেকে বেশি গুরুত্ব তার নিজের জগৎ, নিজের পরিবার। কারণ তারা কামিনী-কাঞ্চনে পুরোপুরি আসক্ত, নানা রকম কামনায় তাদের মন গিজগিজ করছে। সেই বলবে আপনার মূল্যবোধ এখন থাক, আপনারাই তো বলছেন পুনর্জন্ম হবে, সামনে আমার অনেক জন্ম পড়ে আছে, ধর্ম করার অনেক সুযোগ পাব আমাকে কয়েক জন্ম আগে ভোগ করতে দিন। তার জন্য যদি আমাকে চারটে জন্ম ঘুরতে হয় তাও ঘুরব, আমার এখনও ক্ষুধা মেটেনি। একটা নামকরা মজার গল্প আছে, এক ফাদার একটি ছেলেকে জিজ্ঞেস করছে, ঈশ্বরের কাছে যদি প্রার্থনা করতে বলা হয় তাহলে তুমি কি প্রার্থনা করবে। ছেলেটি বলছে, কি আর প্রার্থনা করব! বলব ভগবান আমাকে প্রচুর টাকা দাও, ভালো কয়েকটা স্ত্রী দাও, দামী গাড়ি, বাড়ি দাও। ফাদার বলছেন, ছিঃ! ঈশ্বরের কাছে এরকম বলতে আছে! ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে হয়, হে প্রভু! আমাকে জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও, বৈরাগ্য দাও। ছেলেটি তখন বলছে, যার যেটার অভাব সে ঈশ্বরের কাছে সেটাই তো চাইবে। আমার টাকা-পয়সার অভাব আমি টাকা পয়সা চাইছি। আপনি ফাদার, আপনার জ্ঞান, বৈরাগ্যের অভাব তাই আপনি জ্ঞান বৈরাগ্য চাইছেন। সাধারণ মানুষ নিজের শরীর বোধ, নিজের প্রিয়জনের প্রতি যে আসক্তি এর বাইরে তারা কিছুতেই যেতে পারে না। সেইজন্য সর্ব ক্ষেত্রে, যখন সাধু মহাত্মার কাছে যাবে তখনও, বড়লোকদের কাছে যাবে তখনও, মন্দির মসজিদে যাবে তখনও সব সময় একটাই চিন্তা আমার কিসে লাভ হবে। আর ভাষাটা একটু ভালো হলে বলবে, সত্য বললে মোক্ষ প্রাপ্তি হয়, সত্য বললে জ্ঞান লাভ হয়, প্রাপ্তি, লাভ এগুলো তাতেও থাকবে। আচার্যরা জানেন এটা পাওয়া-পাওয়ির ব্যাপার নয়, পুরো অন্য জিনিস। সেইজন্য সাধারণ মানুষদের প্রলোভন দেওয়া হয়। যেমন বাচ্চা ছেলেকে দুধ খাওয়ানোর সময়, ওষুধ খাওয়ার সময় প্রলোভন দেওয়া হয়। বাছা তুমি দুধ খেয়ে নাও তোমার গায়ের রঙ ফর্সা হবে বা বলবে দুধ খেলে তোমার কালো লম্বা চুল হবে। বাচ্চাও তখন একদিকে দুধ খেতে থাকে অন্য দিকে চুলে হাত দিয়ে দেখে বড় হচ্ছে কিনা। এটাই অর্থবাদ বা বিদ্যাস্তুতি। বিদ্যাস্তুতি শাস্ত্রের খুব নামকরা প্রচলিত প্রথা। অধ্যাত্ম রামায়ণের প্রত্যেকটি অধ্যায়ের শেষে বলা হচ্ছে যিনি এই অধ্যায় নিয়মিত পাঠ করেন তার এই এই লাভ হয়। কারণ এই প্রলোভনটুকু দেওয়া হলে সাধারণ মানুষের মন একটু ওই দিকে যাবে। ঠাকুর বলছেন জোঁকে ধরলে একটু নুন দিলে জোঁকটা আস্তে আস্তে ছাড়ে। প্রলোভন দিলে একটু একটু করে তার আসক্তিগুলো ছাড়তে থাকে। এরপর আস্তে আস্তে শাস্ত্রের আরও গভীরে ঢুকতে থাকে, তখন সে ধীরে ধীরে বুঝতে শুরু করে এগুলো আমার জীবনে গুরুত্ব নয়, আমার গুরুত্ব হল জীবনে এগিয়ে যাওয়া। এরপর আস্তে আস্তে অর্থবাদ থেকে মনটা সরে এসে বেদের আসল তাৎপর্যের দিকে মন যেতে শুরু করে। আচার্য শঙ্কর বেদের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলছেন, যেটা দিয়ে পরমাত্মাকে পাওয়া যায়। অর্থবাদ ব্যাপারটা আস্তে আস্তে খসে গিয়ে পরমাত্মা প্রাপ্তির দিকে মন যায়। পরমাত্মা প্রাপ্তি মানে, নিজের যে প্রকৃত স্বভাব সেই স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকা।

ব্রাহ্মণ প্রধানতঃ এই দুটো জিনিস, বিধি আর অর্থবাদকে নিয়ে চলে। কিন্তু বেদ পড়ার সময় ধরা খুব মুশকিল কোন জায়গায় মন্ত্র শেষ হচ্ছে আর কোন জায়গা থেকে ব্রাহ্মণ শুরু হচ্ছে। তবে মন্ত্র আর ব্রাহ্মণের মধ্যে সব থেকে বড় পার্থক্য, মন্ত্র অংশে যত মন্ত্র আছে তার বেশির ভাগটাই পদ্যের আকারে ছন্দোবদ্ধ ভাবে তৈরী করা হয়েছে, আর ব্রাহ্মণের যত মন্ত্র আছে তার বেশির ভাগই গদ্যাকারে। এই পার্থক্য ছাড়া এর বিষয় বস্তুকে দেখে বোঝার উপায় নেই কোনটা মন্ত্র অংশের আর কোনটা ব্রাহ্মণ অংশের। মন্ত্র আর ব্রাহ্মণকে আলাদা করে দেখার ব্যাখ্যা একটাই, বেদের ঋষিরা যেটা বলে দিয়েছেন এবং পরম্পরাতে যেটাকে সংহিতা বা মন্ত্র বলছে সেটা বেদের মন্ত্র অংশ আর বেদের যেটাকে ব্রাহ্মণ বলে দিয়েছেন সেটা ব্রাহ্মণ অংশ, এ ছাড়া আমাদের আর কোন ব্যখ্যার রাস্তা নেই। কিন্তু চুলচেড়া বিচার করে দুটোর মধ্যে কি পার্থক্য আছে ধরা খুব মুশকিল।

ব্রাহ্মণের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, ব্রাহ্মণ যজ্ঞের নিয়মাবলি আর তার আচার-অনুষ্ঠান প্রণালীর বিজ্ঞান। ঋষিরা যেমন যেমন ধ্যান করেছেন, ধ্যানের গভীরে যা যা পেয়েছেন তা ওনারা শিষ্যদের বলে চলে গেছেন। এইভাবে বেদের কলেবর বৃদ্ধি পেতে থেকে গেছে। বেদের কলেবর বৃদ্ধি পাওয়া মানে আরও অনেক যজ্ঞের উদ্ভব হওয়া। এখন ঐ যজ্ঞগুলি কিভাবে হবে তার বর্ণনা যেখানে দেওয়া হচ্ছিল তারও কলেবর বাড়তে থাকল। যজ্ঞের কলেবর বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে এক একটি যজ্ঞের যে কত রকমের জটিলতা তৈরী হল কল্পনাই করা যাবে না। এত যজ্ঞের জন্য একটা ম্যানুয়াল দরকার, যার ফলে ব্রাহ্মণের আকারও বৃদ্ধি পেতে শুরু করল। যত রকম যজ্ঞ, যজ্ঞের যত রকমের উপাচার সবটাই এই ব্রাহ্মণে আসা শুরু হল। ব্রাহ্মণের মূল কিন্তু বিধি আর অর্থবাদ। প্রথমের দিকে বিধি আর অর্থবাদের মধ্যেই আরণ্যক ঢুকতে শুরু হয়ে গিয়েছিল। কারণ তখনকার দিনে ঋষিরা যা কিছু চিন্তন করেছেন সেটাকে সবাই বেদ বলে মেনে নিয়েছেন। বেদের মধ্যে দেখা গেল কিছু জিনিসকে যজ্ঞে ব্যবহার করা যাবে, কিছু জিনিসকে যজ্ঞে ব্যবহার করা যাবে না। যেগুলো যজ্ঞের মন্ত্রে কাজে লাগানো যাবে সেগুলোকে মন্ত্র অংশে নিয়ে আসা হল আর বাকি মন্ত্রগুলো ব্রাহ্মণে এসে গেল। যেমন ঠাকুরের যে কথাগুলো কথামৃতে রয়েছে, তার মধ্যে ঠাকুরের কিছু কথা সরাসরি মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি কিভাবে হবে তাই নিয়ে বলা আছে। আবার অন্যান্য অনেক ধরণের কথাও আছে। ঠাকুরের এই দুই ধরণের কথাগুলোকে যদি আলদা করা হয়, এখানে যা হবে বেদের সময়ও ঠিক তাই হয়েছিল। যেটা সরাসরি যজ্ঞে লাগবে সেটা চলে গেল মন্ত্রে আর বাকি সব কিছু চলে গেল ব্রাহ্মণে। পরের দিকে আমাদের পূর্বজরা ব্রাহ্মণকে আবার বিভাজন করে দিলেন – ব্রাহ্মণের প্রধান অংশ যেখানে যজ্ঞের বর্ণনাদি করা হয়েছে সেটা মূল ব্রাহ্মণে চলে গেল, যেখানে speculation আছে সেটাকে আরণ্যকে নিয়ে গেলেন আর যেখানে শুধু মূল দর্শনের কথা রয়েছে সেটাকে নিয়ে চলে গেলেন উপনিষদে। কিন্তু এর আগেও আমরা বলেছি যে, এই ধরণের বিভাজন যে একেবারে কাঁটায় কাঁটায় এভাবেই করা হয়েছে তা নয়। পরম্পরাতে যেভাবে বলে দেওয়া হয়েছে সেভাবেই আমাদের মেনে নিতে হয়। কিন্তু বর্তমান যুগের কিছ পণ্ডিতরা মন্ত্র ব্রাহ্মণ এগুলোর একটা ব্যাখ্যা দিয়ে যুক্তি সম্মত রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু সেভাবে কেউ সফল হতে পারেননি।

ব্রাহ্মণে যে শুধু যজ্ঞের নিয়মাবলীর কথাই বলা আছে তা নয়, নিয়মাবলী ছাড়া ব্রাহ্মণে অনেক পৌরাণিক কাহিনীও পাওয়া যাবে। এর মধ্যে হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী আছে, বিভিন্ন রাজার কাহিনী আছে, কিছু কিছু ঋষিদের জীবন কাহিনী আছে, বশিষ্ঠ মুনিকে নিয়ে কাহিনী আছে। বেদের এই পৌরাণিক কাহিনীগুলিই পরে বিভিন্ন পুরাণে গিয়ে আরও বিস্তার লাভ করেছে। পুরাণ পুরোপুরি নিজেকে এই পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যেই নিয়োজিত করে দিল। ব্রাহ্মণের এই পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যে কিছু আঞ্চলিক কাহিনী ও ঘটনাও যুক্ত হয়েছিল। পৌরাণিক কাহিনীগুলো মূলতঃ কাল্পনিক হত, যখন ভগবান বিষ্ণু বা শিব বা ব্রহ্মাকে নিয়ে কোন কাহিনী রচনা করছেন, ইন্দ্রকে নিয়ে কাহিনী বলছেন তখন এগুলো সব হয়ে যাবে পৌরাণিক। কিন্তু যখনই রাজা রামচন্দ্রকে নিয়ে, কিংবা যুধিষ্ঠির বা অর্জুনকে নিয়ে কোন কাহিনী রচনা করছেন তখন সেটা আর পৌরাণিক কাহিনী থাকবে না, সেটা তখন হয়ে গেল লোকগাথা বা লোককাহিনী। যদিও এগুলো খুবই সূক্ষ্ম তফাৎ কিন্তু শাস্ত্র অধ্যয়ণের ক্ষেত্রে এই তফাৎ গুলোর ব্যাপারে ওয়াকিবহাল হওয়া দরকার। বেদের মধ্যেই পাওয়া যাবে পৌরাণিক আবার বেদের মধ্যেই পাওয়া যাবে লোককাহিনী। এর মধ্যেই পাওয়া যাবে ইতিহাসের বর্ণনা আবার এর মধ্যেই এমন অনেক কাহিনী যা সম্পূর্ণ পৌরাণিক।

এছাড়া তখনকার দিনে যে ধরণের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করা হত, তার কথা ব্রাহ্মণে উল্লেখ করা হয়েছে। আর সেগুলো কেন করা হত, এই ধরণের ধর্মীয় আচার পালনের পেছনে কি কি যুক্তি থাকতে পারে তার বর্ণনাও সাথে সাথে ব্রাহ্মণে করা হয়েছে। বেদের গুরুত্বের কথা উল্লেখের সাথে সাথে আমরা পাই সমাজে ও পরিবারে বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানুষের কি কি কর্তব্য, পরের দিকে যেটা বর্ণাশ্রম ধর্মে প্রাধান্য পেয়েছিল। এই জিনিসগুলো সংহিতার অংশে পাওয়া যাবে না। তখনকার দিনে কিছু কিছু সামাজিক প্রথার বিবরণ ব্রাহ্মণে দেওয়া আছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বর্ণনা, কিছু কিছু ঐতিহাসিক তথ্যও ব্রাহ্মণে পাওয়া যায়।

বেদের মূল হল এতে ঋচা থাকবে, মন্ত্র থাকবে আর বিভিন্ন যজ্ঞের বর্ণনা থাকবে, ব্রাহ্মণে এসবের থেকে কিছুটা সরে এসেছিল অথচ বেদের সব কিছুই ছিল বলে ব্রাহ্মণকে পুরোপুরি আলাদা করে দেওয়া হল। শুধু তাই নয়, পরের দিকে কিছু ব্রাহ্মণকে বেদের কোন একটা ব্রাহ্মণ অংশকে দিয়ে বলে দেওয়া হল আপনারা এই ব্রাহ্মণ অংশকে পরম্পরা ভাবে সামলে রাখুন। মীমাংসকদের মত বেদের সংজ্ঞা হল – মন্ত্র আর ব্রাহ্মণই বেদ। এই সংজ্ঞাতে বোঝা যায় যে এনারা মন্ত্র বা সংহিতাতে যা আছে তার বাইরে যা কিছু বেদে আছে তার সবটাকে মিলে ব্রাহ্মণ বলে ধরে নিয়েছিলেন। তার ফলে সেই ব্রাহ্মণের মধ্যে আরণ্যক উপনিষদ সবই এসে যাচ্ছে। কিন্তু পরের দিকে অনেক পণ্ডিত উপনিষদকে ব্রাহ্মণ বলে মানতে চাইলেন না, শুধু ব্রাহ্মণ অংশকেই ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করে নিয়েছেন।

আমরা আগেও বলেছি যে বেদের অনেক সংহিতা হারিয়ে গেছে আর ঐ সংহিতার সঙ্গে যুক্ত যে ব্রাহ্মণ গুলি ছিল সেগুলিও হারিয়ে গেছে। এখনও পর্যন্ত যে কটি ব্রাহ্মণ পাওয়া গেছে তার মধ্যে উল্লেখনীয় হল ঐতেরেয় ব্রাহ্মণ, কৌশিতকী/সাংখ্যায়ন ব্রাহ্মণ, তাণ্ড্য মহা ব্রাহ্মণ, সদ্বিংশ ব্রাহ্মণ, জৈমিনি ব্রাহ্মণ, ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ, সংবিধানা ব্রাহ্মণ, দেবতাধ্যানা ব্রাহ্মণ, বংশ ব্রাহ্মণ, সংহিতোপনিষৎ ব্রাহ্মণ, শাত্যায়না ব্রাহ্মণ ইত্যাদি। শুক্ল যজুর্বেদে একটা খুব নামকরা ব্রাহ্মণ আছে যার নাম হচ্ছে শতপথ ব্রাহ্মণ। এখন পর্যন্ত যত গুলো ব্রাহ্মণ পাওয়া গেছে তার মধ্যে শতপথ ব্রাহ্মণ সব থেকে বিখ্যাত ব্রাহ্মণ।

মন্ত্র অংশে প্রথম দিকে যেসব মন্ত্র ছিল তার বেশির ভাগই ছিল যজ্ঞের জন্য, আর এই যজ্ঞ সবই ছিল বাহ্যিক ও বহির্মুখি সাধনার অঙ্গ। কিন্তু দিনে দিনে মানুষের চিন্তা ভাবনার পরিবর্তনের সাথে সাথে যজ্ঞ, যা বাহ্যিক ও বহির্মুখি সাধনা ছিল, বিবর্তিত হতে হতে ধর্মীয় আদর্শটা অন্তর্মুখীনতার দিকে সরে এসে মানসিক প্রক্রিয়াতে চলে যেতে শুরু হল। ব্রাহ্মণ অংশে এসে এই ধর্মীয় ভাবের মধ্যে অনেক পরিবর্তন এসে গেল। পরিবর্তনের মধ্যে থেকে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ একটি ধর্মীয় সাধনার প্রক্রিয়ার জন্ম নিল তা হল জপ। আজকে যে জপের কথা আমরা এত শুনছি সেটা বেদের ব্রাহ্মণ অংশেই এসে গিয়েছিল, আর জপের মাহাত্মকে অনেক উঁচুতে স্থান দেওয়া হয়েছিল।

তারপর তারা দেখলেন আমি যদি এত যজ্ঞ যাগ না করি, যদি একমাত্র প্রার্থনাই করে যাই তাহলেও আমার প্রার্থনার ফল আমি পেয়ে যাব। ঠিক তাই হল। আমরাও যদি দেখি শুধু ভগবানের নাম বা জপ করেই সব কিছু পেয়ে যাই তাহলে এত সময় সাপেক্ষ, ব্যয় সাপেক্ষ, শ্রম সাপেক্ষ, অর্থ সাপেক্ষ এত কঠিণ যজ্ঞ করার কি প্রয়োজন! ঋষিরাও দেখলেন প্রার্থনাতেই সব কিছুর সমাধান হয়ে যাচ্ছে, তাই এনারা প্রার্থনার প্রক্রিয়াতে আরও বেশি বেশি করে সময় দিতে আরম্ভ করলেন। প্রার্থনার ব্যাপারটা নিয়ে আসার পর তাঁরা দেখলেন যে এই যে আমি প্রার্থনা করছি এটা তো শুধু একটা মন্ত্র, যেমন গায়ত্রীমন্ত্র, এই গায়ত্রীমন্ত্র দিয়ে গায়ত্রী যজ্ঞ হতে পারে, কিন্তু এই গায়ত্রীমন্ত্রকে শুধু মন্ত্র হিসাবে জপ করতে শুরু করে আমি যদি সব ফল পেয়ে যাই, তখন আমি কেন এত যজ্ঞ করতে যাব। এভাবেই জপ ব্যাপারটা হিন্দুদের মনের মধ্যে গভীর ভাবে মাহাত্ম্য পেয়ে গেল, জপটাই চিরস্থায়ী হয়ে গেল।

উপনিষদে মানুষ আরও গভীর ভাবে অন্তর্মুখীনতার দিকে ঝুঁকে গেল। অন্তর্মুখি সাধনায় মনের কার্যের পরিধি অনেক বিস্তার হয়ে যায়। কিন্তু সাধারণ মানুষ মনের গতিবিধিকে আধ্যাত্মিক সাধনায় ব্যবহার করার কৌশল ঠিক ভাবে আয়ত্ত না করার জন্য একটা সমস্যা থেকে যায়। এই সমস্যা প্রত্যেক ধর্মেই দেখা যায়। একটা খুব সহজ উপায় যদিও বা কেউ বলে দেয় কিন্তু তাতে সমস্যা চলে যাবে না। ঠাকুর অনেকবার বলেছেন যে, ভক্ত তিন রকমের হয়, সাত্ত্বিক ভক্ত, রাজসিক ভক্ত ও তামসিক ভক্ত। তামসিক ভক্তিতে ডাকাত পড়ার ভাব। সব ধর্মেই কিছু লোক থাকবেই যারা চাইবে খুব করে পাঠা বলি হবে, ঢাকঢোল বাজান হবে। আমাদের ঋষিরা দেখলেন একই ধরণের আধ্যাত্মিক সাধনা সবার জন্য চলবে না। দাঁত পড়ে গেলে লোকেরা এই ধরণের জাঁকজমকের দিকে আর যেতে চায় না, কিন্তু আবার কিছু লোক আছে যাদের ছোটবেলা থেকেই জাঁকজমকের প্রতি আকর্ষণ কম থাকে। কিছু লোকের আকর্ষণ নেই কিন্তু তাই বলে সবারই আকর্ষণ চলে গেছে

তা নয়। হিন্দু ধর্মের এটাই বিশেষত্ব। সময়ের কষ্টিপাথরে বিচার করে দেখলে একই সাধনা সবার জন্য নির্দিষ্ট করলে চলবে না। সেইজন্য প্রথমে যজ্ঞের খুব রমরমা, যজ্ঞ থেকে ধীরে ধীরে প্রার্থনা এল, প্রার্থনা থেকে এসেছে জপ, জপ থেকে ধ্যান। কিন্তু পরে দেখলেন এভাবে হবে না। তখন তাঁরা আবার যজ্ঞে ফিরে গেলেন কিন্তু যজ্ঞ যাগটা পূজাতে পাল্টে গেল। ইদানিং কালে আমরা যে দুর্গা পূজা, কালী পূজা দেখছি এগুলো যজ্ঞেরই নতুন সংস্করণ। আবার যারা জপ করার তারা জপ করছে, আবার একই লোক সব রকমই করছে। ঠাকুর বলছেন – আমি একঘেঁয়ে হব কেন।

বেদের এতসব তথ্য থেকে এটা বোঝা যাচ্ছে যে ঋষিরা এসব নিয়ে অনেক চিন্তা ভাবনা করেছিলেন। সেখান থেকে তাঁরা কিছু একটা নতুন পদ্ধতি নিয়ে এলেন কিন্তু তাই বলে তাঁরা পুরনো পদ্ধতিগুলোকে বাতিল করে দিলেন না, কারণ কিছু লোকের জন্য পুরনো পদ্ধতি গুলোও দরকার। আসলে যজ্ঞ করার পেছনে ছিল কিছু পাওয়া। এবার একজন দেখলেন আমি লাখ টাকা খরচ করে অনেক দিন ধরে যজ্ঞ করলাম কিন্তু তার বদলে আমি যদি ঘরে বসে চুপচাপ এক মাস, দুই মাস ধরে জপ করি তাতে আমার একই ফল হবে। তখন সে কেন আর যজ্ঞ করতে যাবে। যজ্ঞের গুরুত্বটা কমে গেল কিন্তু মানুষের মনের চাহিদার বৈচিত্র্যতা থেকে গেল, সেইজন্য যজ্ঞটাও থেকে গেল কিন্তু অন্য একটা রূপে থেকে গেল।

ব্রাহ্মণের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য তপস্যা। প্রজাপতি যখন সৃষ্টি করলেন তখন তিনি তপস্যা করলেন। বেদের মন্ত্র অংশে যেখানে সৃষ্টির কথা আসছে সেখানে বলা হচ্ছে সৃষ্টি যজ্ঞ থেকে এসেছে। কিন্তু যখন ব্রাহ্মণে ঢুকে পড়ল তখন বলছেন তপস্যা থেকে সৃষ্টি। সংহিতা অংশে আমরা সৃষ্টির কথা নাসদীয়সূক্তম্ আর পুরুষসূক্তমে পাই। পুরুষসূক্তম দেখাচ্ছে ভগবান, যাঁকে বেদে পুরুষ বলা হচ্ছে, সেই পুরুষকে যজ্ঞের পশু করে বলি দেওয়া হচ্ছে। পুরো সৃষ্টিটাই একটা যজ্ঞ। সেই যজ্ঞে পুরুষকে যে বলি দেওয়া হল, সেই পুরুষের বিভিন্ন অঙ্গ থেকে জগতের বিভিন্ন জিনিসের সৃষ্টি হয়ে গেল। ব্রাহ্মণ অংশে এসে সৃষ্টির এই ধারণাটা পাল্টে গেল। এখানে দেখতে পাই সৃষ্টি প্রজাপতি করছেন। কিভাবে? *স তপোতপ্যত স তপস তপ্ত্বা*। এখানে প্রজাপতি তপস্যা করছেন সৃষ্টির জন্য। আগে ধারণা ছিল যজ্ঞ থেকে সব কিছু পাওয়া যাবে। সৃষ্টিটাও একটা যজ্ঞ। যাবতীয় যা কিছু হচ্ছে সবই যজ্ঞ, আমি নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নিচ্ছি সেটাও যজ্ঞ। আমি যা কিছু পেতে চাই যজ্ঞের দ্বারাই সব পেয়ে যাব, মন্ত্র শক্তিতেই সব পেয়ে যাব। বেদের ব্রাহ্মণ অংশে এসে এই ধারণাটা পাল্টাতে শুরু করল, এই পরিবর্তনটাই উপনিষদের রূপ নিয়ে নিল, সেই রূপটা হল, যজ্ঞের বদলে তপস্যা এসে গেল।

তপঃ মানে তাপ, আমি ঠিক করে নিলাম আমি একটা জিনিস করতে থাকব, এখন এই কাজটা একাগ্র ভাবে দীর্ঘ দিন করতে থাকলে আমার শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক একটা তাপ সৃষ্টি হতে থাকবে। এই তাপ থেকেই যেটা পাওয়ার জন্য কার্য করছিলাম সেটার প্রাপ্তি হয়ে যাবে। উপনিষদ যখনই সুযোগ পেয়েছে তখনই যজ্ঞকে নিন্দা করেছে আর অন্য দিকে তপস্যার প্রশংসা করে গেছে। আবার বাল্মীকি রামায়ণে কথায় কথায় তপস্যার কথা বলছে। যজ্ঞ থেকে তপস্যাতে স্থানান্তর বেদের ব্রাহ্মণ থেকেই আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তি কালে যত শাস্ত্র এসেছে, রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, ভাগবত, সব শাস্ত্রেই তপস্যাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, সাথে সাথে যজ্ঞের গুরুত্বও অনেক কমে গেছে।

যজ্ঞে অনেক মন্ত্র দরকার, কিন্তু তপস্যার ক্ষেত্রে একটি কি দুটি মন্ত্রই যথেষ্ট। তপস্যা পুরোপুরি ব্যক্তির নিজস্ব ব্যাপার, কিন্তু যজ্ঞে অনেকে মিলে অংশ গ্রহণ করে। তাই যজ্ঞ হল সমষ্টিগত ব্যাপার আর তপস্যা যে যার ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু যজ্ঞ যে একেবারেই চলে গেল তা নয়, বিবাহ, উপনয়ন, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি ক্ষেত্রে যজ্ঞ এখনও চলে আসছে। আবার যখন সন্ন্যাস দেওয়ার সময় অগ্নি প্রজ্বলিত করে সেখানে আহুতি দেওয়া হয়। যজ্ঞ অনেক ভাবেই থেকে গেছে তবে আগের মত কথায় কথায় যে কোন ব্যাপারে যে যজ্ঞ করা হত, সেটা বন্ধ হয়ে গেছে। এভাবেই তপস্যা আর স্বাধ্যায়ের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেল। আগে যেমন সবাই মিলে মন্ত্রোচ্চরাণ করত, কিন্তু পরের দিকে স্বাধ্যায়ের ব্যাপার যখন এসে গেল তখন যে যার নিজের মত গুরুর কাছে মন্ত্রোচ্চারণ শিখে নিয়ে আলাদা নিজস্ব ভাবে অনুশীলন করতে থাকল। সংহিতা অংশে কেউ আলাদা ভাবে ধর্মীয় জীবন যাপন করতে

চাইলেও পারত না। তখন যজ্ঞ হোক বা কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান হোক সেখানে নিজের স্ত্রীকে নিয়ে অংশ গ্রহণ করতে হবে। এখন কিন্তু একা একা করা যায়। তপস্যার সাথে সাথে আরেকটি জিনিস আধ্যাত্মিক সাধনার অঙ্গ হিসাবে এসে গেল, তা হল আত্মবিচার – কোনটা ঠিক, কোনটা ভুল এই বিচার শুরু হল।

ব্রাহ্মণ অংশে আমরা আরেকটি জিনিস পাই, যেখানে বলছেন মানুষের ভালো কাজ ও মন্দ কাজকে দাঁড়িপাল্লা দিয়ে মাপা হয়। এই ধারণাটাই কিছুটা আমরা খ্রীষ্টান ধর্মে Day of Judgment এ পাই। মৃত্যুর পর মানুষের ভালো মন্দ কাজের হিসেব করা হয়। বরুণ দেবতাকে একবার পাতাল ও নরকাদি লোকে পাঠান হল দেখার জন্য সেখানে কি আছে আর কি হয়। দেখে এসে বরুণ দেবতা বর্ণনা দিচ্ছেন – যারা বৃক্ষাদিকে কাটে তাদের মৃত্যুর পর এই গাছেরাই এদেরকে টুকরো টুকরো করে কাটে। এই ধারণাটাই পরে আমাদের কর্মবাদে চলে এল, সেখানে বলা হচ্ছে তুমি যাকে কষ্ট দিয়েছ সেই আবার তাকে পরের জন্ম কষ্ট দেবে। এখন একটা কুকুরকে আমি ঢিল মেরেছি, আগামী জন্মে আমি কুকুর হয়ে জন্মাব আর সে মানুষ হয়ে আমাকে ঢিল মারবে। আর এই জন্মে আমি মশাও মেরেছি আবার কুকুরও মেরেছি পরের জন্মে আমি কি হব? শুধু তাই নয়, মানুষ কত মাছ মেরে খেয়েছে, আর মানুষের পেটে কত ছাগল ঢুকেছে তার ইয়ত্তা নেই। এখন আগামী জন্মে তাকে কোন যোনিতে নিয়ে যাওয়া হবে এই নিয়ে রীতিমত টানা হ্যাঁচড়া চলবে। এগুলো খুব জটিল আর সমস্যার ব্যাপার। প্রথমে খুব সহজ একটা নিয়ম বলে দিলেন, তুমি যদি গাছ কাট এই গাছ আগামী জন্মে তোমাকে কাটবে। খুব সহজ কথা, এখনও সাধারণ লোকেরা কর্মবাদের তত্ত্ব বলতে গিয়ে এটাই বলবে। আসলে এটা কোন তত্ত্বই নয়। জেলেরা সারা জীবন হাজার হাজার মাছ ধরে চালান করছে। তাহলে এই তত্ত্ব অনুসারে আগামী জন্মে জেলে হবে মাছ আর মাছ হবে মানুষ। এখন প্রত্যেকটা মাছ মানুষ হতে সময় লাগবে, আর মাছেদের মধ্যে তীব্র লড়াই শুরু হয়ে যাবে কে আগে ঐ জেলে ব্যাটাকে ধরবে। একজন সন্ন্যাসী অনেক অনেক জন্মের আগে প্রত্যেকটা জন্মে কোন একটা নারীর সঙ্গে ছিল, যে জন্মে মশা ছিল তখন তার সাথে একটা মেয়ে মশাও ছিল, যখন কুকুর ছিল তখন একটা মেয়ে কুকুরও ছিল। কিন্তু এখন সন্ন্যাসীর পথে এই সংস্কার তো ঘুরে ঘুরে আসবে। তাহলে তো একই জিনিস চলতেই থাকবে কোন দিন শেষই হবে না, মুক্তির ব্যাপার বলে তো কিছুই থাকছে না। এই কথাগুলো যে অত্যন্ত বোকা বোকা এনারা পরে ধরতে পারলেন। পতঞ্জলি যোগসূত্রে এই ব্যাপারটা পুরোপুরি পরিষ্কার হয়ে যাবে। সেখানে বলা হচ্ছে আমি কি করলাম সেটার কোন মূল্য নেই, ঘটনার প্রাসঙ্গিকতার কোন দাম নেই। আমার ভেতরে যে সংস্কারটা থেকে গেলে সেটাই প্রধান। আমি একজনকে গালাগালি দিলাম, গালাগালি দিতে গিয়ে আমার মধ্যে যে হিংসা ভাবের উদয় হল এটাই আমার ভেতরে একটা দাগ হয়ে সংস্কার রূপে থেকে যাবে। কোন একটা জন্মে গিয়ে যখন সুযোগ পাবে তখন এই হিংসার সংস্কারটা বেরিয়ে আসবে।

ব্রাহ্মণে তারা প্রথমে বলে দিলেন মানুষের কর্মকে দাঁড়িপাল্লা দিয়ে হিসেব করা হয়। সেখান থেকে এসে গেল চিত্রগুপ্তের খাতা রাখা। তোমার ভালো মন্দ সব কাজের হিসাব চিত্রগুপ্তের খাতায় লেখা আছে, মৃত্যুর পর সেই অনুসারে যমরাজের কাছে তোমার বিচার হবে। সেইজন্য প্রথমে বলা হয়েছিল তুমি পূণ্য কর যাতে যমরাজার শাস্তি থেকে বাঁচতে পার। কিন্তু পরের দিকে দেখলেন – না এই ভাবে চলবে না। ব্রাহ্মণ অংশেই আবার আমরা দেখতে পাই *অসতো মা সদ্গময়*র মত ধারণা – আমাকে অসত থেকে সৎ এর দিকে নিয়ে যাও। আমি যদি কারুর প্রতি অসৎ কর্ম করে থাকি তাহলে নরকে গিয়ে সে আমার প্রতি অসৎ কর্ম করবে এই ধারণাটা থেকে এনারা সরে এলেন।

এটাই হিন্দু ধর্মের সাথে অন্যান্য ধর্মের মধ্যে পার্থক্য। হিন্দু ধর্ম অত্যন্ত উন্মুক্ত। উন্মুক্ত ধর্ম হওয়াতে যখনই দেখেন কোন তত্ত্ব বা ধারণাতে কিছু গোলমাল আছে তখনই তারা সেটকে সংশোধন করে নেন। কিভাবে সংশোধন করেন? ধারণাটাকে কোন পরিবর্তন করে নয়, হিন্দু ধর্ম কখনই বলবে না যে তুমি যদি খারাপ কাজ কর তুমি শাস্তি পাবে, বা কখনই বলবে না যে তুমি ভক্তি বা মুক্তি পেয়ে যাবে। কিন্তু আগে যেটা বলেছিল যে প্রত্যেকটা খারাপ কাজের জন্য একটা একটা করে বদলা নেওয়া হবে, এই ধারণাটাকে তারা পাল্টে দিলেন। তার বদলে নতুন তত্ত্ব এনে বললেন, এটাই তোমার সংস্কার রূপে থেকে যাবে, যখনই ঠিক

ঠিক সুযোগ পায়ে যাবে এই সংস্কারটাই তাকে আবার খারাপ কাজের দিকে ঠেলে দেবে। এইভাবে পুরনো ধ্যান ধারণাগুলো কিভাবে বিবর্তিত হয়ে হয়ে একটা নতুন দর্শনের জন্ম নিল আমরা দেখলাম। আমরা এখানে আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যকে নিয়ে আলোচনা করছি, আলোচনাতে এগুলো জানা আমাদের খুবই আবশ্যক, কিভাবে একটা ধারণা থেকে আরেকটা ধারণা উঠে এল।

বেদে একটা মন্ত্র আছে, যার আলোচনা মন্ত্র প্রসঙ্গে করা হবে, যেখানে বিশ্বদেবাকে বলা হচ্ছে আমি যে মুহূর্তে মাতৃগর্ভে এলাম সেই মুহূর্তে তোমার সঙ্গে আমার যোগ হয়ে গেল। এখানে দেখান হয়েছে যে হিন্দুদের মধ্যেও এই ধারণা ছিল যে শূন্য থেকে আমার জন্ম হয়েছ। বৈজ্ঞানিকরাও এই কথা বলছেন যে তোমার জন্ম হবার আগে তুমি ছিলে না। তোমার বাবা আর মার সংযোগ হয়েছে, একটা ঘটনাচক্রে তোমার জন্ম হয়েছে। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের যত বস্তু আছে সব জড়, কিন্তু বিজ্ঞানে প্রাণের কি ব্যাখ্যা করছে? বলছে accidental combination of molecules, যে তত্ত্বে বিজ্ঞান এখন পৌঁছেছে বেদও সাত আট হাজার বছর আগে বিশ্বাস করত, I am an accidental product, যে মুহূর্তে আমি মাতৃগর্ভে এলাম সেই মুহূর্তেই তোমার সাথে আমার যোগ হল, এই বলে প্রার্থনা করছেন – হে বিশ্বদেব, তুমি আমায় রক্ষা কর। এখানে যে ঋষি এই মন্ত্রটা বলছেন তাঁর যে চিন্তাধারা নিয়ে এই তত্ত্বটা বলছেন তখন তার আগে এই নিয়ে আর কোন তত্ত্ব ছিল না। যেমন মুর্খ মানুষরা ভাবে মৃত্যুর পরে কিছু নেই, দেহটা পুড়িয়ে দেওয়ার পর সব শেষ হয়ে গেল। ঠিক তেমনি মাতৃগর্ভে আসার আগে আমার কোন অস্তিত্ব ছিল না, এই ধারণাটাই চিরদিন লোকেরা করে এসেছে এবং এখনও অনেকেই এই ধারণাকে ধরে আছে। এই ধারণাকেই ইঙ্গিত করে গীতায় ভগবান বলছেন – *অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত। অব্যক্তনিধানান্যেব তত্র কা পরিদেবনা।*।(২/২৮)। আমি জন্মের আগে ছিলাম না, শূন্যে ছিলাম, মরে যাব শূন্যে চলে যাব, মাঝখানে এই কটি বছরের জন্য এখানে এসেছি তার জন্য এত লাফালাফি করার কি দরকার। এটা গীতার মত নয়, মহাভারতের সময় অনেকের এই মত ছিল, তাদের কথা বলে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন – তুমি যদি এই মতকেও বিশ্বাস কর তাহলেও তো তোমার শোক করার কিছু নেই। মানুষ যদি সত্যিই বিশ্বাস করত যে মৃত্যুর পরেও আমি থাকব আর জন্মের আগেও আমি ছিলাম তাহলে তো কখনই খারাপ কাজ করত না।

বিদেশে বাচ্চারা যখন জিজ্ঞেস করে মা আমি কোথা থেকে এলাম? মা বাচ্চাকে বলে তোমাকে সারস পাখি তুলে এনে আমাদের বাড়িতে রেখে গেছে। পাশ্চাত্যে এটা একটা খুব প্রচলিত ধারণা। ওখানকার বাচ্চারা জানে যে আমাকে সারস পাখি দিয়ে গেছে। পরে বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে বলা শুরু হল এসব আজগুবি গপ্পো যেন বাচ্চাদের না বলা হয়। একটা ছোট বাচ্চা যদি মাকে জিজ্ঞেস করে – মা আমি কোথা থেকে এলাম? মা বলল 'তুমি ভগবানের বাড়ি থেকে এসেছ'। 'ভগবানের বাড়ি কোথায়?' 'অনেক উপরে'। 'তাহলে আমি কিভাবে এলাম'? 'ভগবান তোমাকে আমার পেটে দিলেন'। 'কিভাবে দিলেন'? বেশি প্রশ্ন করলে মা বিরক্ত হয়ে বলবে 'এখন ঘুমিয়ে পড় বাকিটা কালকে বলব'। বিভিন্ন ধর্মে, সমাজে জন্মের ব্যাপারে এই ধরণের বিভিন্ন ধারণা প্রচলিত হয়ে আছে। হিন্দুদেরও জন্মের ব্যাপারে অনেক রকম ধারণার মধ্যে একটি ধারণা যে আমরা জন্মের আগেও ছিলাম আবার মৃত্যুর পরেও থাকব। তাই বলে এই ধারণাকে সবাই বিশ্বাস করত তা নয়। আমরা যদি ঠিক ঠিক বিশ্বাস করি, আজ আমি যা হয়েছি সেটা আমার পূর্ব জন্মের জন্য, এই জন্মে আমি যা যা করছি সেটাই ঠিক করে দেবে আগামী জন্ম আমার কি হবে, তাহলে আমাদের জীবনটাই পাল্টে যেত। একটা মিনিটও আমি বাজে ভাবে নষ্ট হতে দেব না। কিন্তু আমরা বেশির ভাগই মনে করি এই তো জীবনের কটা দিন, এখন যে করেই হোক চুরি করেই হোক, কাউকে ঠকিয়েই হোক আর মিথ্যে কথা বলেই হোক আনন্দ স্ফুর্তিতে কাটিয়ে দিলেই হল। উচ্চ আদর্শে নিজেকে সব সময় প্রতিষ্ঠিত রাখা খুবই কঠিণ হয়ে যাবে। আমি কে, আমি কোথা থেকে এলাম, আমি কোথায় যাব? এই প্রশ্নগুলো আধ্যাত্মিক দর্শনের চরমতম প্রশ্ন। এগুলোকেই বিভিন্ন ঋষিরা বিভিন্ন ভাবে দেখেছেন। সাধারণ মানুষ এসব প্রশ্ন নিয়ে কখন চিন্তা ভাবনাই করেনা। চিন্তা করার জন্য যে পরিমাণ বুদ্ধির দরকার, তার ছিটেফোটাও সাধারণ লোকের নেই। এইতো এতটুকু বুদ্ধি তাও আবার বেশি নাড়াচাড়া করলে খরচ হয়ে যাবে। জল যেমন বেশি ঢালাঢালি করলে

জল কমে যায় আমাদের বুদ্ধিও সেই রকম। আমরা যদি কখন চুপচাপ বসে চিন্তা করি আমি কে? আমি কোথা থেকে এলাম? আমি কোথায় যাব? দু মিনিট পরেই মস্তিষ্ক আর চিন্তা করতে পারবে না, সব থেমে যাবে।

প্রকৃত জ্ঞান, প্রকৃত দৃঢ় প্রত্যয় আসে আমি যেটা নিজে খেটে, পরিশ্রম করে জেনেছি, আমি যেটা নিজে অর্জন করেছি সেটাই একমাত্র আমার থাকে, সেইজন্য পৈত্রিক সম্পত্ত কেউ ধরে রাখতে পারেনা। কিন্তু যেটা আমি নিজে পরিশ্রম করে অর্জন করেছি সেটা কিছুতেই হাত থেকে বেরিয়ে যেতে দেব না। একই ব্যাপার শিক্ষা, জ্ঞান, ধ্যান ধারণার ক্ষেত্রে হয়, যেটাকে আমি খেটে খেটে মাথা কুটে বার করেছি সেটাতেই আমি দক্ষ হব। কিন্তু যেটা শুনে শুনে এসেছে সেটা থাকবে না, কিছু দিন পরেই বেরিয়ে যাবে, কিছুতেই থাকবে না। আমাদের কাছে পুরো ধর্ম, দর্শন হচ্ছে শুনে শুনে। সেইজন্য ভেতরে সব ফাঁকা।

বিভিন্ন ঋষিরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকম ধারণা দিয়ে চলে গেছেন। পরের দিকে তাঁরা বুঝলেন পুরো তত্ত্বটাই ভ্রান্ত। তাঁরা দেখলেন আমি যে কর্মগুলো করছি এগুলো কোথায় যাবে? এখান থেকে কর্ম ফলের ধারণার জন্ম নিল, যেখান থেকে তাঁরা বললেন – যে ভালো কাজ করবে, যজ্ঞাদি করবে সে স্বর্গে যাবে। কিন্তু যারা খারাপ কাজ করছে তার কোথায় যাবে? এখান থেকে তাদের নরকের ধারণার জন্ম হল। আবার এই জায়গাতেই তাঁদের এই ধারণা আটকে থাকল না। তুমি ভালো কাজ করে স্বর্গে গেলে, সেখানে গিয়ে অনেক সুখ ভোগ করল, এটা তাদের মনের মত উত্তর হচ্ছে না। তারপর এনাদের মধ্যে পুনর্জন্মবাদের ধারণা এল। একজন মানুষ, হয়তো সে by chance এসেছে, কিন্তু সে যজ্ঞাদি করে স্বর্গে গেল বা খারাপ কাজ করে নরকে গেল, তারপর তার কি হবে? এবারে জন্ম আর মৃত্যুর খেলা শুরু হয়ে গেল। আর মৃত্যুর পরে স্বর্গ কিংবা নরক বা নিম্ন যোনি। এই জন্ম আর মৃত্যুর চক্র চলতেই থাকল। স্বর্গেও জন্ম হচ্ছে মৃত্যু হচ্ছে। এখন মনে করুন আমরা অনেকে স্বর্গে আছি সেখানে দেখলাম একজন নতুন মানুষ এসে গেছে, কিভাবে এল? ভালো কাজ করেছে তাই স্বর্গে এসেছে। আবার দেখছি আমাদের একজনকে আর স্বর্গে দেখা যাচ্ছে না, স্বর্গ থেকে ভ্যানিশ হয়ে গেছে, মানে তার ভালো কাজের কোটা শেষ হয়ে গেছে তাই স্বর্গ থেকে তাকে বিদায় নিতে হয়েছে। যেমন পৃথিবী লোকে মৃত্যু হচ্ছে স্বর্গ লোকেও একই ভাবে মৃত্যু হচ্ছে। স্বর্গের জন্ম-মৃত্যুর খেলা কে দেখেছে? এগুলো আদপে কেউই দেখেনি। এগুলো ঋষিদের কাল্পনিক চিন্তার পরিণাম। মহাভারতে তাই আমরা দেখতে পাই যেখানে বড় বড় ঋষিরা তাঁদের থেকে আর বড় বড় ঋষিদের জিজ্ঞেস করছেন – প্রভু স্বর্গে কি হয়? তখন ওনারা এগুলো বলছেন। এগুলো কতটা কবির কল্পনা আর কতটা বাস্তব আমরা কেউই বলতে পারব না। কিন্তু এটাই হিন্দু ধর্মের পরম্পরার যা কিছু।

আবার পরের দিকে ঋষিরা বলছেন, যাঁরা খুব উচ্চকোটির ঋষি তাঁরা একমাত্র দেখতে পান মৃত্যুর সময় তার স্থূল শরীর থেকে সূক্ষ্ম শরীর বেরিয়ে যাচ্ছে। যেমন ঠাকুর, তাঁর ভাইপো অক্ষয় মারা যাওয়ার সময় দেখছেন যেমন খাপ থেকে তরোয়াল বেরিয়ে আসে সেই রকম সূক্ষ্ম শরীর এই স্থূল দেহ থেকে বেরিয়ে এল। কিন্তু ঠাকুর কোথাও পুনর্জন্মাদি নিয়ে বেশি কিছু বলছেন না। স্বামীজী এত বক্তৃতা দিলেন কোথাও কিন্তু পুনর্জন্ম নিয়ে বেশি কিছু বলছেন না। আবার পুনর্জন্ম হয়না তাও বলছেন না। সাধারণ লোক পুনর্জন্মের ব্যাপারে কিছু রচনা করতে গেলে ঠাকুরের এই ঘটনাকেই উল্লেখ করবে, কিন্তু তাদের তো অনুভূতি নেই, তারা তো আর খাপ থেকে তরোয়াল বেরিয়ে আসতে দেখছে না। তাহলে সে কি করে লিখবে? তখন তাকে কল্পনার আশ্রয় নিয়েই লিখতে হবে। ঠাকুর হিন্দু সমাজে বড় হয়েছেন, সেখান থেকে শুনে সেই বিশ্বাস থেকে বলছেন, না তিনি সত্যিই দেখে বলছেন আমরা কিছুই জানিনা। কিন্তু ঠাকুর নিজে দেখেছেন এর উল্লেখ আমরা পাই। অনুভূতিহীন কোন সাধারণ লোক এই ব্যাপারে যদি কিছু রচনা করতে যায়, ঠাকুরের এই অনুভূতিকে অবলম্বন করে সহজেই লিখে দিতে পারে, কিন্তু যদিও এটা তথ্যগত ভাবে ঠিক হবে কিন্তু এটাই যখন বিস্তার করে বলতে যাবে তখন পুরোটাই ভ্রান্ত একটা তত্ত্বে দাঁড়িয়ে যাবে। আমরা কোন ঋষির মুখে শুনিনি যে তিনি বলছেন স্বর্গটা এই রকম, নরকটা এই রকম। তাঁরা বলছেন মৃত্যুর পর একটা কিছু থেকে যায়। এখন যারা নিম্ন আধারের সাহিত্যিক বা কবি তারা ঐটাকে আধার করে চট জল্‌দি একটা উপন্যাস লিখে দেবে অথবা একটা বড় কবিতা রচনা করে দেবে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন উপনিষদ পড়লেন তখন তিনি সেখানে কিছু কিছু তত্ত্ব পেলেন, সেই

তত্ত্বগুলির উপরে ভিত্তি করে তিনি সুন্দর সুন্দর কবিতা রচনা করে দিলেন। তাই বলে কি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উপনিষদের তত্ত্বগুলি উপলব্ধি করেছিলেন? এখন পর্যন্ত কেউ বলেননি যে তিনি উপনিষদের তত্ত্বগুলিকে উপলব্ধি করেছিলেন। ঋষিরা উপনিষদে যে তত্ত্বগুলি দিয়ে গেছেন সেগুলো আবার ওনারা ব্যাখ্যা করে যাননি। ব্যাখ্যা করাটা পরবর্তি প্রজন্মের কবি, সাহিত্যিকরা নিয়ে নিলেন, বড় বড় ঋষিদের তত্ত্বের সারটাকে গ্রহণ করে এনারা বিভিন্ন কবিতা রচনা করলেন, কিন্তু তাঁরা ঋষিদের মত উপলব্ধিবান ছিলেন না, ফলে এই ধরণের গোলমাল তৈরী হয়েছিল।

স্বর্গ নরকের ক্ষেত্রে উচ্চ ঋষিরা দেখলেন মানুষ দিন রাত বড্ড বেশি স্বর্গ আর নরক করে যাচ্ছে, খুব বাড়াবাড়ির পর্যায়ে চলে যাচ্ছে, মূল আদর্শ থেকে ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছিল। মূল আদর্শ হল সত্যকে জানতে হবে, এগুলো সবই অনিত্য, অনিত্য থেকে নিত্যে যেতে হবে, নিত্য বলে একটা কিছু আছে। তাহলে কোনটা সৎ আর কোনটা অসৎ? তখন তাঁরা অসৎ থেকে সৎ এর দিকে দৃষ্টি ফেরাবার জন্য বললেন এই জগৎটাই অনিত্য আর ঈশ্বরই সত্য। ভারতীয় চিন্তাধারা সব সময় বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে, কখন স্বর্গ নরকের ধারণাকে সামনে এনে আবার কখন সৎ আর অসৎ, বস্তু অবস্তুর ধারণাকে সামনে এনে সর্বক্ষণ আধ্যাত্মিক চিন্তার জগতে ঠেলে দিচ্ছে। ভারতের চিন্তা জগতের বিবর্তন বেদের ব্রাহ্মণ অংশ থেকেই বেশি শুরু হয়। ব্রাহ্মণের এই ভাব গুলিই আরণ্যকে এসে আরো বিস্তার লাভ করে, আরণ্যক থেকে উপনিষদে এসে একটা স্থিতিশীল দর্শনে প্রতিষ্ঠিত হল। উপনিষদে এসে বৈদিক যুগের যে ভাব ধারণাগুলো ছিল সেগুলো পুরোপুরি ভাবে থেমে গেল।

এক দিক থেকে আরণ্যক হল ব্রাহ্মণ থেকে উপনিষদে দুটি যুগের পরিবর্তনের সংযোগ স্থল। মন্ত্র অংশ হল পুরো বিভিন্ন যজ্ঞের মন্ত্র, দার্শনিক চিন্তা ভাবনা আর কিছু আচরণ বিধির সমাবেশ। ব্রাহ্মণ অংশে বলা হয়েছে যজ্ঞ কিভাবে করা হবে, তার সাথে কিছু কিছু কাল্পনিক কাহিনী। উপনিষদে এসে একেবারে পুরো অদ্বৈত তত্ত্ব নিয়েই বলা হয়েছে। একমাত্র অবতার পুরুষ ছাড়া সবারই চিন্তার জগতে বিবর্তন হয়ে থাকে। এমনকি যিনি অবতার, তত্ত্বের দিকে তাঁর কিছুই পাল্টাবে না কিন্তু তিনি যে তথ্যগুলো দেবেন সেই ব্যাপারে তাঁর মত অনেক পাল্টাবে। যেমন তিনি হয়তো জাগতিক বিজ্ঞানের ব্যাপারে কিছু একটা ভাবছেন কিন্তু পরে দেখা যাচ্ছে সেটা অন্য রকমের হয়ে যাচ্ছে। স্বামীজী প্রথম লণ্ডনে গিয়ে একটা ভাষণে বলছেন – আগে ইংরেজ জাতীর ব্যাপারে আমরা অনেক বিতৃষ্ণা ছিল, কিন্তু এখানে এসে আমার সেই ধারণাটা পাল্টে গেছে। এই ধরণের মত পাল্টাতে পারে। কিন্তু তত্ত্বের ব্যাপারে কোন কিছুই পাল্টাবে না। যাঁরা বেদ রচনা করেছিলেন তাঁরা যে সবাই অবতার পুরুষ ছিলেন তা নয়। একটা সমাজ ও দেশের চিন্তার মূল যে কেন্দ্র স্থল সেখানে বিবর্তন হয়ে থাকে, একই চিন্তা ভাবনা সব সময় থাকে না, একটা সময়ে এসে তার পরিবর্তন হয়ে থাকে। যদি ঠিক ঠিক বিচার করে বলা যায় তাহলে মন্ত্র আর উপনিষদকেই বেদ বলে ধরা হবে, যদিও মীমাংসকরা মন্ত্র আর ব্রাহ্মণকে বেদ বলছে। মূলতঃ শেষ পর্যন্ত সংহিতা আর উপনিষদই অস্তিত্ব নিয়ে টিকে আছে। বেদের ব্রাহ্মণ আর আরণ্যককে বলা যেতে পারে যোগ সূত্র।

যজ্ঞের প্রভাব যত কমতে থাকল বেদের ব্রাহ্মণ অংশের প্রভাবও তত কমতে থাকল কিন্তু ব্রাহ্মণের অনেক কিছু পরবর্তি কালে হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন শাস্ত্রে জায়গা করে নিয়েছে। আরণ্যকের ক্ষেত্রে কি হল, যাঁরা এত দিন ধরে যজ্ঞযাগ করে এসেছেন বা করিয়ে এসেছেন তাঁরা দেখলেন বয়স বাড়ার সাথে সাথে তাঁদের গৃহস্থের ধর্ম কর্ম করার ক্ষমতাও কমে আসছে। অন্য দিকে তাদের মন আরও অন্তর্মুখী হচ্ছিল। অন্তর্মুখীনতা তাঁদেরকে নির্জনতার দিকে ঠেলে দিচ্ছিল। লোকালয়ে থেকে তাঁরা আস্তে আস্তে সরে এসে বাইরে একটা কুঠিয়ার মত করে থাকতে শুরু করলেন। আবার অনেকে কোন তীর্থস্থানে গিয়ে বসবাস করতে থাকলেন। সন্ন্যাস নিতেন না কিন্তু নির্জনে একান্তে নিজের অন্তর্জগতে ডুবে থাকতেন। কোন বড় ঋষি হয়তো ছিলেন তিনি তাঁর নিজের বাসস্থান ছেড়ে অন্য কোথাও নির্জনে একটা কুঠিয়াতে চলে যেতেন। তাঁর যে অন্তরঙ্গ শিষ্যরা ছিল, তারাও তাঁর পেছনে পেছনে কুঠিয়াতে চলে যেত। কিন্তু আগের মত ব্যস্ত জীবন আর কাটাতেন না।

এতদিন তাঁরা যে গ্রামে বা লোকালয়ে থেকে যজ্ঞ গুলো করতেন, লোকালয়ের বাইরে এসে সেই সব যজ্ঞ তখন আর করা সম্ভব হত না। কিন্তু তাঁরা সেই সব যজ্ঞই করতেন যে যজ্ঞগুলি লোকালয়ে থাকাকালীন করতেন, কিন্তু ধ্যানের প্রক্রিয়ায় করা হত। ধ্যানমূলক যজ্ঞের সব থেকে বড় নমুনা হল পুরুষসূক্তম্, যেখানে পুরুষকে যজ্ঞের পশু করে বলি দেওয়া হচ্ছে। এটা একটা মনের চিন্তন, সত্যি সত্যি যে পুরুষকে পশু বানান হচ্ছে, আর বলি দেওয়া হচ্ছে তাতো নয়। অশ্বমেধ যজ্ঞ যখন চিন্তনের মাধ্যমে করা হত তখন বলা হত – সকালে ঘুম থেকে উঠে তুমি সূর্যের দিকে তাকাও, সেই যে রক্তিম সূর্য পূর্ব দিগন্ত থেকে উঠছে সেটাকে মনে করবে অশ্বমেধ যজ্ঞের যে ঘোড়া হবে তার মস্তক। একজন মা, তার একটিই সন্তান। সন্তান মারা গেছে। এখন সেই সন্তানহারা মাকে কিভাবে সান্ত্বনা দেওয়া হবে? হয়তো তাকে বলা হবে তোমার সন্তান ভগবানের কাছে আছে, নয়তো বলবে এই গ্রামের যত সন্তান আছে তাদের সবাইকে তুমি নিজের সন্তান মনে করো। এই চিন্তার প্রক্রিয়ার মধ্যে একটা বিরাট বড় রূপান্তর এসে গেল। একজন বিধবার একটিই সন্তান, সে মারা গেলে ঐ মা কিভাবে মনে শান্তি পাবে? তার ভেতরের ভালোবাসা তো মরে যায়নি। যদি তাকে বলে দেওয়া হয় গ্রামের যত সন্তান সব তোমারই সন্তান, এখন সে যাকে দেখছে তাকেই আদর করে শান্তি পাচ্ছে। এই যে চিন্তার স্থানান্তকরণ হচ্ছে, একটা জায়গা থেকে তুলে আরেকটা জায়গায় দিয়ে দিল, ঠিক তেমনি, ব্রাহ্মণরা জীবনের একটা সময় নানা যজ্ঞ করেছেন, হেন যজ্ঞ নেই যে তাঁরা করেননি। ব্রাহ্মণের বয়স হয়ে গেছে, তার শারীরিক ক্ষমতা কমে গেছে, এত যজ্ঞ আর করতে পারছেন না। অথবা একটা সময়ে এসে সে বুঝে গেলেন যে আমার আর যজ্ঞের কোন প্রয়োজন নেই। কারণ তিনি বুঝে গেছেন আমি যদি ধ্যান বা প্রার্থনা করি, যজ্ঞ করে যে ফল পাচ্ছিলাম, এতেও সেই একই ফল পাচ্ছি। ব্রাহ্মণ অংশে এসে আমরা দেখছি এই রূপান্তরটা ইতিমধ্যে এসে গিয়েছিল। যেমন গায়ত্রী যজ্ঞ, গায়ত্রী মন্ত্র জপ করে আমি যদি সব কিছু পেয়ে যাই তাহলে আমি কেন অত ঢাকঢোল পিটিয়ে গায়ত্রী যজ্ঞ করতে যাব। ঠিক তেমনি যদি আমার জপ ধ্যান করে সব হয়ে যায় তাহলে আমি অত বড় যজ্ঞ করতে যাব কেন।

কিন্তু পুরনো সংস্কার যেতে চায় না। ঠাকুর খুব সুন্দর উপমা দিচ্ছেন – এক ধোপা মরে রাজার বাড়িতে রাজকুমার হয়ে জন্ম নিল। বন্ধুদের সাথে খেলা করতে গিয়ে কি আর সে খেলবে, আগের জন্মে সারা জীবন কাপড় কেচে এসেছে, তাই বন্ধুদের বলছে 'আমি উপুর হয়ে শুই আর তোরা আমার পিঠে হুস্ হুস্ করে কাপড় কাচ'। যিনি সারা জীবন যজ্ঞযাগ করে এসেছেন আর করিয়ে এসেছেন, বৃদ্ধ বয়সে বলছেন আমি এখন বাণপ্রস্থে চললাম। এখনও তিনি সন্ন্যাস নেননি, কিন্তু ভেতরে যজ্ঞযাগের সংস্কার গিজ্‌গিজ্ করছে, শরীর মন যজ্ঞযাগ করার জন্য ছটফট করছে। ঋষিরা তখন বিধান দিলেন – তুমি যে এতদিন ধরে যজ্ঞযাগ করে এসেছ সেটা আর করতে পারছ না ঠিক আছে, তুমি যজ্ঞযাগকে এখন এই ভাবে মনে মনে চিন্তন কর। যেটা external objective reality ছিল সেটাকেই এখন নিয়ে আসা হচ্ছে চিন্তনের জগতে। তারপর তাঁকে বলে দেওয়া হল তোমার মনকে এখন ওখানে নিবদ্ধ রাখ। এর পরের ধাপে তোমার মনকে আস্তে আস্তে মূল যে সার রয়েছে সেটাতে নিয়ে যাও। যেমন তোমার সন্তানকে তুমি খুব ভালোবাসতে, সন্তান মারা গেছে, তোমার শোককে জয় করার জন্য পাড়ার যত সন্তান আছে সবাইকে তোমার সন্তান বলে মনে কর, এটা প্রথম ধাপ। দ্বিতীয় ধাপ হল, আসলে তোমার ভেতরে ভালোবাসা আছে, সেই ভালোবাসাটাই সার, তুমি নিজের ছেলেকে ভালোবাসো আর পাড়ার ছেলেকে ভালোবাস, এই ভালোবাসার উপরে মনকে নিবদ্ধ কর। এই ভালোবাসার উপরে ধ্যান করে করে তুমি সেই সচ্চিদানন্দেই পৌঁছে যাবে, যিনি সমস্ত ভালোবাসা, সমস্ত শান্তি, সমস্ত আনন্দের উৎস। সেই সচ্চিদানন্দে পৌঁছে গেলে দেখে যিনি আত্মা তিনিই ব্রহ্ম। দুটো ধাপের কথা বলা হচ্ছে – প্রথমে external objective realityকে চিন্তন জগতে নিয়ে আসতে হবে, দ্বিতীয় ধাপে সেই objective realityর যে সার, সেটাকে বার করে তার উপরে ধ্যান করতে হবে, তারপর সেই যে সচ্চিদানন্দ, যিনি সব কিছুর সার তাঁর উপরে পুরোপুরি ছেড়ে দিচ্ছে, বাহ্যিক সত্তার আবরণ তার সম্পূর্ণ শেষ হয়ে গেল। সংহিতা থেকে ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ থেকে আরণ্যক আর আরণ্যক থেকে উপনিষদে গিয়ে এই উত্তরণটাই হয়েছে। তাই প্রথমে সব যজ্ঞযাগ, যজ্ঞের ব্যাখ্যাদি, তারপর সেখান থেকে বাহ্যিক আচরণ সরে গিয়ে আগে যেটা করা হচ্ছিল তার

উপর চিন্তন ও ধ্যানে চলে এল, শেষে সেটাও সরে গিয়ে শুধু মূল জিনিসটা থেকে গেল, আর এখান থেকে উপনিষদের জন্ম হল।

আরণ্যকের পেছনে দুটো তত্ত্ব পাওয়া যায়। একটা মতে – যারা ব্রহ্মচারী ছিলেন তাঁরা বেদ মুখস্ত করতেন, গৃহস্থরা ব্রাহ্মণের উপর জোর দিতেন, যাঁরা বাণপ্রস্থি তাঁরা জঙ্গলে গিয়ে আরণ্যকের অনুশীলন করতেন। আর যাঁরা সন্ন্যাস নিয়ে নিতেন তাঁরা উপনিষদ অধ্যয়ন করতেন। এগুলো পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের উদ্ভট্ মত। এই মতটা সঠিক নয়। ছান্দোগ্য উপনিষদে পাই – একজন ব্রাহ্মণকে তার ছেলে আত্মার কথা জিজ্ঞেস করছে তখন পিতা বলছেন আত্মার ব্যাপারে আমার পরিষ্কার ধারণা নেই, তবে শুনেছি অমুক দেশে এক রাজা আছেন তিনি এই ব্যাপারে জানেন। রাজার কাছে গেছে, রাজা ব্রাহ্মণ পুত্রকে দেখে বলছেন – তুমি আত্মার ব্যাপারে শিক্ষা লাভের জন্য এসে খুব ভালো করেছে, কারণ এই বিদ্যা ব্রাহ্মণদের কাছে কখন ছিল না, এই বিদ্যা বরাবর ক্ষত্রিয়দের কাছেই ছিল। কাহিনী যাই হোক, মূল কথা হল সন্ন্যাসী হলেই যে উপনিষদের জ্ঞান থাকবে তা কখনই নয়। সেইজন্য এই ধরণের মতকে বেশি গুরুত্ব দিতে নেই, কিন্তু যেহেতু আমরা বেদের ব্যাপারে জানতে চাইছি তাই বেদের চারটি অংশের ব্যাপারে এই ধরণের একটা সিদ্ধান্ত চালু আছে এটা জানিয়ে দেওয়া হল – যারা বাণপ্রস্থি তারা আরণ্যক পড়ত আর যারা সন্ন্যাসী তাঁরা উপনিষদ পড়তেন। কিন্তু বেদের বিভিন্ন ঘটনার সাথে এই ধরণের সিদ্ধান্তের কোন সামঞ্জস্য পাওয়া যায় না। কিন্তু আরেকটি গ্রহণযোগ্য মত আছে যেখানে বলা হচ্ছে – যারা সমাজে থাকতেন তাঁরা সংহিতা আর ব্রাহ্মণকে অনুশীলন করতেন, যাঁরা সমাজ থেকে সরে গিয়ে নির্জন অরণ্যের দিকে চলে যেতেন তারা ধ্যানশীল জীবন যাপন করতেন, ওখান থেকেই আরণ্যকের জন্ম হয়। কারণ আরণ্যকে আমরা যজ্ঞ বা যজ্ঞ সম্পর্কিত কোন কিছুর কথার উল্লেখ পাইনা, কিন্তু মূল যেটা পাওয়া যায় তা হল, আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে অতিন্দ্রীয়তার যে বিষয়গুলি ছিল তার উপর ধ্যানের কথা। অতিন্দ্রিয় মানে যে জিনিসগুলিকে দশটি ইন্দ্রিয় দিয়ে জানা যায় না। আরণ্যকে ইন্দ্রিয়াতীত সত্তার উপরে বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আরণ্যকে অতিন্দ্রীয়তার থেকেও তপস্যার উপরে অনেক জোর দেওয়া হয়েছে। আরণ্যকে তপস্যা প্রচণ্ড বেড়ে গেছে। তপসা, তপঃ এই শব্দগুলো বেদের সংহিতাতে, ব্রাহ্মণেও এসেছে, কিন্তু যখন আরণ্যক এসে গেল তপস্যার গুরুত্ব অনেক বেড়ে গেল। আর উপনিষদে তো তপস্যার বাইরে কিছুই নেই।

খুব নামকরা আরণ্যক তৈত্তরীয় আরণ্যকে একটা ঘটনার কথা বলা হচ্ছে – কয়েকজন সাধারণ ঋষি একজন খুব বড় ঋষির কাছে এসে বলছেন – আমরা আপনার কাছে শিক্ষা নিতে এসেছি, আপনি আমাদের কিছু শিক্ষা দিন। ঋষিরা যখন একে একে বড় ঋষিকে প্রশ্ন করছেন তখন তিনি তাদের কোন উত্তরই দিলেন না। ঋষি তাদের তপস্যা করতে পাঠিয়ে দিলেন, তোমাদের মধ্যে এখন কোন শ্রদ্ধা ভক্তি নেই, শ্রদ্ধা আর তপস এই দুটো আগে অর্জন করে এসো, তারপর তোমাদের প্রশ্নের উত্তর দেব। প্রশ্নোপনিষদেও এই প্রসঙ্গ এসেছে। সেখানেও কয়েকজন নামকরা ঋষিপুত্র তখনকার দিনের বিখ্যাত ঋষি পিপ্পলাদের কাছে পরব্রহ্মের ব্যাপারে কিছু প্রশ্ন নিয়ে হাজির হয়েছেন। প্রশ্ন শোনার আগেই পিপ্পলাদ বলছেন 'তোমরা ইন্দ্রিয়সংযম, ব্রহ্মচর্য পালন করে এক বৎসর এখানে তপস্যা কর তারপর তোমাদের যা জানার আছে প্রশ্ন করবে আর সেই প্রশ্নের উত্তর যদি আমার জানা থাকে তবেই আমি তোমাদের প্রশ্নের উত্তর দেব'। এখানেই আমরা কত পরিবর্তন দেখতে পাই। যে কোন লোকই যজ্ঞ করিয়ে দিতে পারত। কিন্তু আরণ্যকে এসে পুরো অন্য রকম হয়ে যাচ্ছে। প্রশ্ন করতে এসেছে সেখানেই তাকে আটকে দেওয়া হচ্ছে, তোমার শ্রদ্ধা আছে কিনা, তোমার তপস্যা আছে কিনা জানা দরকার। আপনি বললেন হ্যাঁ আমার তপস্যা আছে। মুখের কথায় হবে না, আমি আমার চোখের সামনে দেখব, আমার আশ্রমে থেকে এক বৎসর তপস্যা কর, তারপর তুমি তোমার প্রশ্ন করবে। এরপর যদি তোমার প্রশ্নের উত্তর আমার জানা থাকে তবেই আমি উত্তর দেব। প্রশ্ন এখনও শোনাই হয়নি, প্রশ্নটা তুমি পরে করবে। কারণ আপনি ঋষির মুখ থেকে যে উত্তরগুলো শুনবেন, আপনার পাত্রতা যদি না থাকে কিছুই নিতে পারবেন না, সব ছিটকে বেরিয়ে যাবে। তারপর তারা অনেক দিন তপস্যা করে চিত্তশুদ্ধি করে যখন ঋষির কাছে এসেছেন তখন তিনি উত্তর দিলেন। যজ্ঞে যেটা কর্মপ্রধান ছিল, সেটাই আস্তে করে সরে গিয়ে চলে এল

শ্রদ্ধা ও তপস। আর আজকের দিনে তপস্যা শ্রদ্ধা এগুলো খুব গুরুত্ব পেয়ে গেছে। ধর্ম মানেই শ্রদ্ধা ও তপস্যা। বেদের আরণ্যক থেকেই প্রথম এই ধারণাগুলো আসা শুরু হয়ে গেছে। পরে গীতাতেও শ্রদ্ধা ও তপস্যাকে অনেক উঁচুতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, সেখানে শ্রদ্ধা তিন রকমের, তপস্যা তিন রকমের বলছেন।

আরণ্যকে আরেকটি জিনিসের খুব গুরুত্ব বেড়ে গিয়েছিল, সামাজিক নৈতিকতা। বেদের প্রথম দিকে সমাজে নৈতিকতা খুব একটা দৃঢ় ছিল না। আসলে বেদ বিরাট, এখানে অনেক কিছুই আমরা পেয়ে যাব, কিন্তু এক একটা অংশে একটা বিশেষ জিনিসের প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে, তখন মনে হবে যেন বেদ এটাই বলতে চাইছে। যেমন আরণ্যকে যখন আসছে তখন সত্যের প্রতি জোরটা অনেক বৃদ্ধি পেয়ে গেছে, তাই বলে সংহিতা, ব্রাহ্মণে সত্যকে মানছে না তা নয়, পুরোপুরি মানা হচ্ছে, কিন্তু তখন বলা হয়েছিল তুমি যজ্ঞযাগ কর তোমার সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু এখানে এসে যজ্ঞযাগের থেকে সরে এসে সত্যের উপরে বেশি করে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। সত্যই তপস্যা সত্যই ধর্ম, সত্যের মত কিছু হয় না।

তখনও কিন্তু কিছু কিছু মূল্যবোধের কথা বলা হচ্ছিল, যেমন যদি কেউ কারুর টাকা পয়সা আত্মসাৎ করে নেয় তারা কিভাবে নরকে গিয়ে পড়ে, আবার যারা দুশ্চরিত্র তাদের কিভাবে পতন হয়। কিন্তু এই জিনিসগুলি থেকে আস্তে আস্তে সরে এসে নজর দেওয়া হল আধ্যাত্মিক জ্ঞানের বিকাশে। গীতাতে এই ধারণাকে খুব সুন্দর ভাবে তুলে ধরা হয়েছে – *যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা* (৪।৩৭) – বিরাট কাঠের স্তুপ আছে সেখানে একটু আগুন লাগিয়ে দিলে পুরো স্তুপিকৃত কাঠ ভস্মিভূত হয়ে যাবে। ঠিক তেমনি কর্ম, সে ভালো হোক আর মন্দ হোক, জ্ঞানাগ্নিতে সব পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। জ্ঞানাগ্নি একটাই, সত্যকে জানা, নিজের আত্মস্বরূপকে জানা, আমি কে, এই জ্ঞান। আমি যে সেই আত্মা, এই জ্ঞান হলেই সব কর্মরাশি ভস্মিভূত হয়ে যায়। হিন্দু ধর্ম ছাড়াও অন্যান্য ধর্মে বিভিন্ন খারাপ কর্মের জন্য প্রায়শ্চিত্তের কথা বলা হয়। তুমি এই পাপ করেছ, তোমাকে এই যজ্ঞ করতে হবে, এই পাপ করেছ তুমি এই প্রায়শ্চিত্ত কর। আরণ্যকে এসে নৈতিকতার ব্যাপারে খুব সজাগ হয়ে গেল আর অনৈতিকতার নিন্দা শুরু হয়ে যায়। বেদের সময় কোনগুলো অনৈতিকতা ছিল আমাদের জানা নেই। যখনই বলবে বেদে এই কথা বলছে, তখনই বুঝবেন বেদের মন্ত্র অংশে এই জিনিসগুলো থাকার কথা নয়, হয় ব্রাহ্মণে আছে নয়তো আরণ্যকে আছে। উপনিষদে যদিও থাকে কিন্তু কোন প্রসঙ্গক্রমে থাকতে পারে, আত্মতত্ত্ব ছাড়া উপনিষদ আর কোন কিছুরই আলোচনা করবে না। সেইজন্য যখনই বলবে বেদে আছে তখনই বুঝতে হবে হয় ব্রাহ্মণে আছে নয়তো আরণ্যকে আছে। মূল্যবোধের উপর যদি কিছু থাকে তাহলে বুঝবেন আরণ্যকে আছে আর সামাজিক ব্যাপারে যদি কিছু হয় তাহলে বুঝবেন ব্রাহ্মণে আছে। এই দুটোর মধ্যে যে কোন জায়গায় থাকতে পারে। অনৈতিকতা তখনকার দিনে কতটা ছিল আর কি রকম ছিল আমাদের জানা নেই, কিন্তু অনৈতিকতাকে এখানে নিন্দা করা হচ্ছে। অনৈতিকতাকে আরণ্যকে যে নিন্দা করা হয়েছে সেটা as universal, as general, as abstract। ওনাদের কাছে immorality খুব particular। General আর particularএর যে পার্থক্য সেটা খুব জটিল পার্থক্য। ভাগবতে এসে শুকদেব খুব সুন্দর বলছেন, যাঁরা খুব শক্তিমান হন তাঁরা অনেক সময় নিজের শক্তির দরুণ মর্যাদা রেখার উল্লঙ্ঘন করেন, কিন্তু সাধারণ লোকের পক্ষে সেটা চলবে না। শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার বর্ণনা শুনে খুব মর্মাহত হয়ে রাজা পরীক্ষিৎ শুকদেবকে জিজ্ঞেস করছেন 'অপরের স্ত্রীর সঙ্গে, অপরের মেয়েদের সাথে ভগবান কী করে এসব করতে পারলেন'। শুকদেব সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষিৎকে আটকে দিয়ে এই কথা বলছেন। বলার পর আবার শিবের দৃষ্টান্ত এনে বলছেন 'শিব হলাহল পান করেছিলেন কিন্তু সাধারণ লোক এক ফোঁটা বিষ পান করলেই মরে যাবে'। স্বামীজী এক জায়গায় বলছেন, আমি যা বলি সেটা শোন, আমি যা করি সেটা করবে না, এই শিক্ষার দিন চলে গেছে। স্বামীজী একটা বিশেষ প্রসঙ্গে যারা অসৎ আচার্য বা শিক্ষক তাদের নিন্দা করার জন্য এই কথা বলছেন। লোকেরা আচার্যের আচরণকেও দেখতে চায়। ঠাকুর সেইজন্য বলছেন আমি যদি দাঁড়িয়ে প্রস্বাব করি তোরা তাহলে ঘুরে ঘুরে প্রস্বাব করবি। আবার বলছেন তাদের বেতালা পা পড়বে না। শিষ্যকে বলে দেওয়া হচ্ছে তুমি গুরুর আচরণকেও দেখবে। কাউকে উপদেশ দিতে গেলে এই কথা অনেকেরই শুনতে হয় 'উপদেশ দেবেন না, আগে নিজে আচরণ করে দেখান'। এই বিষয়কে নিয়ে দুজন মহারাজ একবার নিজেদের

মধ্যে আলোচনা করছিলেন, সেখানে এক যুবক সন্ন্যাসী বলছিলেন ঠাকুর যা করে গেছেন আমিও তাই করব। যুবক সন্ন্যাসীকে একজন মহারাজ বললেন, ঠাকুর বা স্বামীজী তাঁরা যখন যা করেছিলেন তখন তাঁরা সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন না, সেইজন্য তাঁকে নকল করা যাবে না। সিদ্ধ পুরুষ হওয়ার পর যা করেছেন বা বলেছেন সেটাই নকল করা যাবে, আগেকার কথাগুলো চলবে না। পরে অন্য মহারাজ বললেন – ঠাকুর তো সাধনার সময় অপরের বিষ্ঠা খেয়েছিলেন, তুমি খাবে? ভাগবতে শুকদেব ঠিক এই কথা বলছেন, শক্তিমান পুরুষরা কিছু কিছু এমন জিনিস করেন যেটা সাধারণ লোকেদের জন্য নয়।

কিন্তু যখন আরণ্যকে আর উপনিষদে প্রবেশ করছে, আর যত দর্শন আছে যেগুলো উপনিষদের দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত, যেমন গীতা, যেমন স্বামীজী, স্বামীজীর সমগ্র জীবন উপনিষদের দর্শনের উপর দাঁড়িয়ে আছে, স্বামীজী বলছেন – পাপ বলে কিছু নেই ভ্রান্তি হতে পারে, মানুষ পাপ করে না, মানুষ ভুল করে, মানুষ দোষ করে না, মানুষ ভুল করে। এটাই উপনিষদের মূল ভাব, পৌরাণিক ভাব নয়। বৈদিক ধারণায় প্রায়শ্চিত্ত কর্মের কথা বলা হয়েছে। স্মৃতি, তন্ত্র শাস্ত্রেও এই প্রায়শ্চিত্ত কর্মকে অনেকবার বলবে। কিন্তু একজন জ্ঞানীর কাছে প্রায়শ্চিত্ত কর্মের কোন প্রশ্নই নেই। আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অগ্নি সমস্ত কর্মকে ভস্মিভূত করে দেয় এই ধারণা প্রথম আসতে শুরু করেছে আরণ্যকে। আরণ্যক থেকে যখন উপনিষদে প্রবেশ করছে তখন সেখানে আত্মজ্ঞান ব্যতিরেকে অন্য কিছুই নেই।

যাঁরা চিন্তাবিদ্, যাঁরা সাহিত্যের দর্শন, সঙ্গীতের দর্শন, কলার দর্শন লেখেন আরা যারা দর্শনের দর্শন লেখেন, তাঁদের কাছে একটা বিরাট প্রশ্ন – মানুষ কেন অমরত্বের সন্ধান করে? হয়তো পরবর্তি কালে নিউরো বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করবেন আমাদের মস্তিষ্কে যে সেল গুলো আছে সেগুলো এমন ভাবে সাজান আছে যার জন্য মানুষ সর্বদা অমরত্বের সন্ধান করে চলেছে। প্রত্যেক মানুষই অমর হতে চাইছে। অমর হতে চাওয়া আর অমরত্বের ধারণা এই দুটো কিন্তু পুরো আলাদা। খ্রীষ্টান ধর্মে eternal heaven এর ধারণা আছে, ইসলামে জন্নৎ এর ধারণা আছে। বৈদিক যুগে এই একই ধরণের ধারণা হিন্দুদের মধ্যেও ছিল, ঠিক ঠিক যজ্ঞ করলে তুমি স্বর্গে যাবে। এখন কোন হিন্দুকে বা মুসলমানকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় স্বর্গ কি, জন্নৎকে কে জানে, কে স্বর্গে যাচ্ছে? এই ব্যাপারে বেশির ভাগ হিন্দুরাই অজ্ঞ আর মুসলমানরা অন্ধকারে।

আমাদের স্থূল দেহের মধ্যে আরেকটি শরীর আছে যাকে বলছেন সূক্ষ্ম শরীর। স্থূল দেহের যখন নাশ হয়ে যায় তখন সূক্ষ্ম শরীরটা স্থূল দেহ থেকে বেরিয়ে এসে সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। যখন সে সুযোগ পায় তখন সে বাইরের জড় বস্তু দিয়ে আরেকটা স্থূল শরীর বানিয়ে নেয়। যখন স্বর্গলোকে যায় তখন স্বর্গলোকের যে বস্তু আছে তাই দিয়ে সে তার শরীর বানিয়ে নেয়। পৃথিবী লোকে গেলে পৃথিবীর বস্তু দিয়ে বানিয়ে নেয়, পাতাল লোকে গেলে সেখানকার বস্তু দিয়ে বানিয়ে নেয়। তাই এই চোখ, কান, নাক, হাত, পা, মাথা দিয়ে যে শরীর এটা আসলে কিছুই নয়, এটা একটা মুখোশের মত। তাই দুঃখ-কষ্ট, পাপ-পূণ্য যা আছে সূক্ষ্ম শরীরের সাথে এগুলোর কোন সম্পর্ক নেই। যীশুকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে – এই অন্ধটি কার পাপে অন্ধ হয়েছে, নিজের পাপে না অন্যের পাপে? এই প্রশ্ন হিন্দুদের মনেও উদয় হয়, একজন লোক দেখতে সুন্দর আরেকজন কুৎসিৎ, একজন বুদ্ধিমান আরেকজন বোকা, কেন এই ধরণের বৈপরিত্য? স্থূল শরীরের মাধ্যমে সব জমা হচ্ছে, স্থূল শরীরের এতে কিছু হচ্ছে না, আসলে যত কর্ম, চিন্তা ভাবনা করছে এগুলো সূক্ষ্ম শরীরকে প্রভাবিত করছে। এটা ঠিক কম্প্যুটারের সফট্ওয়ার আর হার্ডওয়ারের মত। হার্ডওয়ার, যেটা ভেতরে আছে সেটাই আসল, সফট্ওয়ার কিছু নয়। কিন্তু সফট্ওয়ারে যদি কোন ভাইরাস ঢুকে যায় সেটা হার্ডওয়ারকেও নষ্ট করে দেবে। কম্প্যুটারে এই ভাবেই একে অপরকে নষ্ট করে দিচ্ছে। স্থূল শরীর সব সময় সূক্ষ্ম শরীরকে ভাইরাস দিয়ে যাচ্ছে, সূক্ষ্ম শরীরের যখন ক্ষতি হচ্ছে তখন আবার স্থূল শরীরেও তার প্রতিক্রিয়া হচ্ছে। তারপর একটা সময়ে এই স্থূল শরীরটা নষ্ট হয়ে যাবে, আর সূক্ষ্ম শরীরটা বেরিয়ে যাবে। বেরিয়ে গিয়ে সূক্ষ্ম শরীর তার উপযুক্ত আরেকটা শরীরের খোঁজ করতে থাকবে।

হয়তো এই ভাবে সূক্ষ্ম শরীর পৌঁছে গেল নরকে, সেখানে গিয়ে সেখানকার যা বস্তু আছে সেখান থেকে সে শরীর তৈরীর উপাদান দিয়ে আরেকটা স্থূল শরীর বানিয়ে নিল। তারপর সেখানেও একদিন সেই স্থূল

শরীর পড়ে গেল, সেখান থেকে হয়তো সে চলে গেল স্বর্গে, সেখানেও গিয়ে একই ভাবে আরেকটা শরীর বানিয়ে নিল। এইভাবে সূক্ষ্ম শরীরটা ঘুরে বেড়াচ্ছে। এইভাবে কত দিন ঘুরে বেড়াবে? বলছেন, যত দিন এই সৃষ্টি চলতে থাকবে।

উপাচার, প্রার্থনা, জপ ও তপস্যার বিবর্তন

বেদ মানেই যজ্ঞ, আর যজ্ঞ মানে সেখানে প্রচুর ক্রিয়া হবে। সাধারণতঃ মানুষ কাজ করতে করতে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তার চিন্তা-ভাবনার মধ্যে একটা পরিপক্কতা আসে। বয়স হয়ে যাওয়ার পর একটা সময় তাদের কাজ করার ক্ষমতা যখন থাকে না, তখন তারা নীতি নির্ধারকের ভূমিকা পালন করে। আধ্যাত্মিক জীবনও ঠিক এভাবেই চলে। কম বয়সে বুদ্ধির পরিপক্কতা থাকে না, তখন মানুষ কাজ করে। শরীরে যত দিন ক্ষমতা থাকে ততদিন মানুষ নানা রকমের পূজা অর্চনা করে, তীর্থে তীর্থে ঘুরতে থাকে, ভক্ত সম্মেলনে যাবে। এই কাজগুলোর পেছনে একটা কর্তব্য বোধের প্রেরণা থাকে। কর্তব্য বোধ যখন থাকে তখন সব কিছুই রুটিন মাফিক চলতে থাকে। কিন্তু একজন সন্ন্যাসীর এই মনোভাব থাকে না। একবার একজন মহারাজকে কোন এক কাজের দায়ীত্ব দেওয়া হয়েছিল। সেখানে পৌঁছাতে মহারাজের একটু দেরী হয়ে গিয়েছিল। সেখানকার মহারাজ দেরী হওয়ার কারণ জানতে চাইলে এই মহারাজ বলছেন 'আসার আগে মন্দির প্রণামটা সেরে নিলাম'। শুনেই ওখানকার মহারাজ খুব অসন্তুষ্ট হয়ে বলছেন 'আপনি সন্ন্যাসী! আপনি এই ভাষা ব্যবহার করতে পারেন না। এই ভাষা গৃহস্থরা ব্যবহার করতে পারে, সন্ন্যাসীরা কখনই করবে না। মন্দির প্রণাম সেরে নিলাম মানে! কে আপনাকে বলেছে প্রণাম করতে, এটা কি আপনার কর্তব্য নাকি? আপনাকে তো কেউ বাধ্য করেনি মন্দিরে প্রণাম করার জন্য, আপনি করবেন না। প্রণামটা সেরে নিলাম বলার অর্থ দাঁড়ায়, আমার ইচ্ছে নেই, ঝামেলার কাজ, এই ঝামেলাকে মিটিয়ে দেওয়ার জন্য আমি প্রণামটা সেরে নিচ্ছি'। মহারাজ শুনে চমকে উঠেছেন 'আমরা সবাই তো এই ভাষাই ব্যবহার করি'। 'আপনি এখনও সে রকম লোকের পাল্লায় পড়েননি তাই এখনও নিজেকে শোধরাতে পারেননি। কিন্তু আপনাকে আমি স্নেহ করি তাই বলছি। আপনার চিন্তা-ভাবনাই যে শুধু ঠিক থাকবে তা নয়, আপনি যে শব্দের ব্যবহার করবেন সেই শব্দও যেন সঠিক ভাবে প্রযোজ্য হয়'।

আমরা অনেক সময় বলি, মুখে আমি যাই বলি ভেতরে আমার শ্রদ্ধা আছে। ভেতরের শ্রদ্ধা দিয়ে শুধু চলবে না, ভাষাতেও শ্রদ্ধা থাকা চাই। বলা হয়, ভালোবাসা বিশেষ্য নয়, ভালোবাসা সব সময়ই ক্রিয়া, ভালোবাসা করে দেখাতে হয়। আপনার ভেতরে যদি শ্রদ্ধা থাকে শ্রদ্ধা আপনাকে করে দেখাতে হবে। ভক্তদের মধ্যেও দেখা যায়, কেউ হয়ত কোন মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে, দেখা করতে যাওয়ার আগে বলবে, দাঁড়াও বাপু! মন্দিরের প্রণামটা সেরে আসি। সেরে নেওয়া মানেটা কী! আপনাকে কে বলেছে মন্দিরে প্রণাম করতে। আসলে আমাদের কারুর মধ্যে আধ্যাত্মিকতার পরিপক্কতা আসেনি। আধ্যাত্মিকতার পুষ্টি না আসার জন্য সব কিছু আমাদের কাজের মধ্যে পড়ে যায়। মন্দিরে ঠাকুরকে প্রণাম করে নিলাম, যেন একটা বিরাট কাজ করে ফেলেছি। আমার পূজা করার কথা, করে দিয়েছি। রান্নাবান্না সেরে ফেললাম, অগ্নিহোত্রাদি সেরে ফেলেছি। খুব ভালো করেছেন, আধ্যাত্মিক পরিপক্কতা না আসা পর্যন্ত এগুলোরও অনেক দাম আছে। আধ্যাত্মিকতার ভাবের উন্নতি হওয়া মানে, নিজেকে নিজের সাথে রাখা। আপনি কি কখন বলেন আমি ঘুমটা একটু সেরে নি? যে কোন মানুষ ঘুমের সময় সব থেকে বেশি করে নিজের কাছে যায়। যাঁরা সমাধিবান তাঁরা যান, যাঁরা ধ্যান করেন তাঁরা যান। সাধারণ মানুষের কাছে সব থেকে নিজের কাছে যাওয়া হয় যখন সে ঘুমের জন্য বিছানায় যায়। কারণ ঘুমে একটা সুষুপ্তির যে অবস্থা তৈরী হয় তখন সে আত্মার সাথে রমণ করে। সেইজন্য কখন কেউ বলে না যে, আমি ঘুমটা একটু সেরে নিচ্ছি। খুব রসিক লোক না হলে এই ভাষা ব্যবহার করবে না। দেশ ও সমাজে যখন একটা আধ্যাত্মিকতার পরিপক্কতা থাকে তখন ঐ জিনিসই হয়। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীশ্চান যে কোন ধর্মের লোককে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় ধর্ম মানেটা কি, তাদের কাছে ধর্ম মানে, হিন্দু বলবে আমি মন্দিরে গেলাম, খ্রীশ্চানরা বলবে রবিবার দিন আমি চার্চে যাই আর ফাদার একটা লেকচার দেন সেটা শুনি আর মুসলমান বলবে আমি দিনে পাঁচ বার নমাজ পড়ি, এখানেই সবার ধর্ম শেষ হয়ে যাচ্ছে। এগুলো সব তাদের কাজের মধ্যে পড়ছে। এটাই হল sign of spiritual immaturity বা early stages

of spirituality। Early stages of spirituality মানে religious practices। Religious practices সব সময় spiritual immaturityর লক্ষণ। আধ্যাত্মিক পরিপক্কতা যখন আসে তখন কাজ থেকে ধীরে ধীরে সরে এসে অন্য দিকে যেতে শুরু করে।

কাজ থেকে সরে প্রথম যেখানে যায় তাকে বলছেন বাক্। যেমন বলছেন মনসা বাচা কর্মণা, যজ্ঞ মানে কর্ম, আজকে আমরা যে পূজাদি করছি সবই কর্ম, বাহ্য পূজা যতক্ষণ আছে ততক্ষণ কর্মের স্তরেই থাকছে। এই বোধ যতক্ষণ কাজ করছে, আমার জপটা সেরে নিই, ঠাকুরের এই পূজো করাটা সেরে ফেলছি, তার মানে এখনও সে আধ্যাত্মিকতার অনেক নিম্ন স্তরে পড়ে আছে। এখান থেকে আরেকটু উপরে আসার পর এবার সে প্রার্থনার স্তরে চলে আসে। প্রার্থনার স্তরে আসার পর বাহ্যিক ক্রিয়াদি অনেক খসে যায়, আর প্রার্থনার মধ্যে যে নানান রকম ভাব আছে সেই ভাবগুলি নিয়ে প্রার্থনার দিকে যদি জোর দেয় মন অনেক অন্তর্মুখী হয়ে যায়। আধ্যাত্মিক জীবনে যারা প্রথম অনুপ্রবেশ করছে, তারা যদি কাজ না করে প্রার্থনাই করে তারা কখনই এগোতে পারবে না। প্রথমে যদি ঔপাচারিক না হয় আর রীতিমত অনেক দিন ধরে প্রচুর উপাচার পালন করে কাজ না করা হয়, তার আগে কিন্তু কারুরই আধ্যাত্মিক জীবন শুরু হবে না। একটা জাতি বা দেশ যখন কোন ধর্মকে গ্রহণ করছে সেখানেও এই একই পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। দ্বিতীয় ধাপে আসছে প্রার্থনা। বেদের ঋষিদের কাছে অনন্ত ছাড়া কিছুই ছিল না, ওই অনন্তের উপর নানান রকমের চেহারা লাগিয়ে দিয়েছেন, যাতে সাধারণ মানুষ অনন্তকে ধরতে পারে বা বুঝতে পারে।

প্রার্থনায় বাক্এর ব্যবহার অপরিহার্য, মুখে উচ্চারণ করা হচ্ছে। কিন্তু ঋষিরা দেখলেন প্রার্থনা করেও পুরোপুরি সন্তোষ আসছে না, কোথায় যেন একটা ফাঁক থেকে যাচ্ছে। মানুষ একটা জিনিসই সারা জীবন খুঁজে যাচ্ছে, তা হল সন্তুষ্টি। মানুষ দুঃখকে মেনে নেবে, অভাবকেও সহ্য করে নেবে কিন্তু অসন্তোষ নিতে পারে না, মানুষ অশান্ত হয়ে যাবে কিন্তু অসন্তোষ নিয়ে থাকতে পারে না। বাইরের লোকেরা সন্ন্যাসীদের দেখলেই বলে 'কী মহারাজ! শান্তি পেয়েছেন, শান্তিতে আছেন তো'? শান্তি পাওয়ার জন্য কে সন্ন্যাস নিয়েছে! আর কে পেয়েছে শান্তি? ঠাকুরের জীবন তো সব সময় অশান্তই ছিল, স্বামীজীর জীবন তো অশান্ত অবস্থাতেই কেটে গেল, সারাটা জীবন বিশ্ব জুড়ে দৌড়ে বেরিয়ে গেলেন। জগতে শান্তি পেতে কে এসেছে? চিতায় না ওঠা পর্যন্ত কারুর শান্তি হয় না। চিতায় মনেরও শান্তি হয় না, শরীরটার শান্তি হয়। কিন্তু সন্তুষ্টি জিনিসটা এমনই এক জিনিস যেটা ছাড়া মানুষ থাকতে পারে না। অসন্তোষই আবার মানুষকে ঠেলে উপরের দিকে নিয়ে চলে যায়, যেমন যার জীবনে একটা উচ্চ আদর্শ আছে, আমি সেই উচ্চ আদর্শে পৌঁছতে পারছি না, এই অসন্তোষই তাকে ঠেলে তার আদর্শের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। ঠেলার মধ্য দিয়ে একটা একটা করে ধাপ যখন পেরিয়ে যায় তখন নতুন কিছু পাওয়ার জন্য একটা সন্তুষ্টি আসে। ভেতরে অসন্তোষ যদি না থাকে মানুষ কখনই ধর্ম পথে আসবে না। ঠাকুর বলছেন, পায়ের উপর পা তুলে বসে আছে আর গোফ চাপরাচ্ছে, এদের দ্বারা কিছুই হবে না। ধর্ম মানেই ভেতরে সাংঘাতিক অসন্তোষ। কিন্তু এখান থেকেই যখন একটা একটা করে ধাপ এগোবে তখন তার মধ্যে একটা সাময়িক সন্তুষ্টি আসবে। কিছু দিন পর আবার তার মধ্যে অসন্তোষ শুরু হয়ে যাবে।

প্রথমে মানুষ দেখছে আমি যেভাবে জীবন-যাপন করছি এতে আমার সন্তুষ্টি হচ্ছে না। তখন দেবতাদের ধারণা আসতে শুরু হল। দেবতারা আসতেই যজ্ঞ হতে শুরু হল। মন অনেকটা তুষ্টি পেয়ে শান্তি পেল। অনেক লোকের শান্তি হল কিন্তু সবারই শান্তি হল না। এর পরের ধাপে এসে গেল প্রার্থনা। কিন্তু প্রার্থনাও সবাইকে সন্তুষ্টি দিতে পারেনি। কারণ ঠিক ঠিক সন্তুষ্টি আসে যখন আত্মা আত্মার সাথে রমণ করে। আত্মাতে আত্মার রমণ যজ্ঞাদির দ্বারাও হবে না আর প্রার্থনা দিয়েও হবে না। তখন পরের ধাপে এল জপের ধারণা। প্রার্থনাগুলি আগে যজ্ঞে ব্যবহার হচ্ছিল, যেমন গায়ত্রী মন্ত্র প্রথমে যজ্ঞে ব্যবহার করা হচ্ছিল, ওটাই পরের ধাপে প্রার্থনা এসে গেল। *অগ্নিমীড়ে পুরোহিতং* মন্ত্র যজ্ঞের মন্ত্র, এই মন্ত্রই যখন আবৃত্তি করা হচ্ছে তখন সেটাই প্রার্থনার রূপ পেয়ে গেল। এটাই যখন ঠোঁট, জিহ্বা না নাড়িয়ে বার বার মনে মনে বলতে থাকবে তখন জপ হয়ে যাবে। জপ আর প্রার্থনার মধ্যে প্রধান পার্থক্য হল, প্রার্থনাতে মন্ত্রের পুনরাবৃত্তি করা হয় না, জপে বার বার একই মন্ত্র পুনরাবৃত্তি করা হয়। প্রার্থনার সময় যে প্রার্থনা করছে সে যেমন নিজের মন্ত্রের উচ্চারণ ধ্বণি শুনতে পাবে

আবার পাশের লোকও শুনতে পাবে। আর যদি মনে মনেও প্রার্থনা করে সেখানেও কিন্তু একই মন্ত্রের পুনরাবৃত্তি করবে না।

আমাদের আধ্যাত্মিক বিবর্তনে শেষ পর্যন্ত তিনটে জিনিস থেকে গেল। আজকেও এই তিনটে জিনিস বহাল তবিয়তে আছে। একটা হল উপাচার, মানে ঠাকুরের পূজা করা, মন্দিরে যাওয়া, গঙ্গা স্নান, তীর্থ করা, এগুলো করেও আমি ফল পাব। দ্বিতীয় প্রার্থনা এখনও চলছে, মানুষের দৃঢ় বিশ্বাস যে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করলে, ঠাকুরের স্তব স্তুতি করলে ফল পাওয়া যাবে। তৃতীয় হল জপ, আমার অত কিছু করার দরকার নেই, শুধু জপ করলেই আমি ফল পেয়ে যাব। ফল পায় কিনা আমাদের জানা নেই, কিন্তু ঠাকুর বলছেন, কেশব সেনের ধ্যানটুকু ছিল বলে এত কিছু হল। এতে একটা জিনিস পরিষ্কার এবং এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যারা বেশি উপাচার নিয়ে থাকে তাদের কামনা-বাসনার খুব বেশি পরিবর্তন হয় না কিন্তু যারা প্রার্থনা করছে তাদের মনের অনেক পরিবর্তন হয় আর যারা দীর্ঘ দিন ধরে জপ করছে সাধারণত দেখা যায় ধীরে ধীরে তাদের কামনা-বাসনা গুলি কমে যায় আর ঠিক ঠিক জ্ঞান ভক্তির উদয় হয়। তখন আর বাইরের জগৎ, বাহ্যিক বস্তু বা ক্রিয়া তাদের সেভাবে আকর্ষণ করতে পারে না। আধ্যাত্মিকতার মূলই হল মনকে ভেতরের দিকে নিয়ে গিয়ে কিভাবে আমি ঈশ্বরের দিকে যেতে পারি। জপাদিও সবার জন্য নয়, আধ্যাত্মিকতার রাজ্যে একটু অগ্রসর না হলে জপ হবে না। সেইজন্য তাদের জন্য পূজা, অর্চনা, পাঠ ইত্যাদি উপযুক্ত।

বেদের সময়েই জপের ব্যাপার এসে গিয়েছিল। হিন্দুদের জপের মন্ত্রে ওঁ অবশ্যই থাকতে হবে। শাক্ত বা তন্ত্রে জপের মন্ত্রের সঙ্গে হ্রীং, ক্লীং ইত্যাদি বীজ যুক্ত করে দেওয়া হয়। পরের দিকে তন্ত্রের ভাবধারা উন্নত হয়ে যাওয়ার পর তারাও জপের মন্ত্রে ওঁ নেওয়া শুরু করে। তারপর থেকে ওঁ আবশ্যিক হয়ে গেল, জপ মানে তাতে ওঁ থাকবেই। ওঁ সচ্চিদানন্দরই ধ্বণি রূপ। জপের একটাই উদ্দেশ্য ঈশ্বর প্রাপ্তি। আর সাধারণ লোকেরা যখন প্রচুর চাহিদা, নানা রকমের দুঃখ-কষ্ট নিয়ে আসে তাদেরও বলা হয় তোমরা জপ কর। সাধুদেরও দৃঢ় বিশ্বাস যে জপ করলে অনেক সমস্যা দূর হয়ে যায়। যজ্ঞের ব্যাপারে যেমন বলা হয়, তুমি এই যজ্ঞ কর এই ফল পাবে, ওঁ এর ব্যাপারেও এই ধরণের অনেক কিছু বলা হয়। যেমন 'অ' 'উ' আর 'ম'য়ের মধ্যে 'অ' সিদ্ধি হয়ে গেলে এই রকম হবে, 'উ' সিদ্ধি হলে এই হবে, 'ম' সিদ্ধি হলে এই এই হবে। এগুলোকে বলা হয় অর্থবাদ। জপের আধ্যাত্মিক ব্যাপারে একটাই লক্ষ্য আত্মাকে আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত করা। সাধারণ লোকেদের মন ঈশ্বরের দিকেও যায় না, আত্মার ব্যাপারে তো কোন ধারণাই নেই, তাদের মন রয়েছে পরিবারের উপর। তখন তাদের মনের শান্তির জন্য বলা হয় তুমি ওঁ জপ কর তাহলে তোমার এই এই হবে। তোমার ছেলের রোগ ভালো হচ্ছে না, জপ কর, তোমার ছেলে রোগা হয়ে যাচ্ছে, জপ কর, তোমার মেয়ে মোটা হয়ে যাচ্ছে, জপ কর শীর্ণ হয়ে যাবে, জপের উপরই সব চলছে। সাধুরাই যে ভক্তদের এই কথা বলছেন তা নয়, বেদের সময় থেকেই এই জিনিস চলে আসছে।

জপের সঙ্গেই আসে তপস্যা। তপস্যার ব্যাপারটাও বেদের সময় থেকেই চলে আসছে। একদিকে সেই অনন্ত আবার অন্য দিকে সীমিত বা সান্ত জগৎ। মুদ্রার দু পাশে যেমন হেড আর টেল থাকে তেমনি একদিকে অনন্ত অন্য দিকে সান্ত। কিন্তু যিনি অনন্ত তিনিই সান্ত। একদিকে সংসার অন্য দিকে যাঁর সংসার তিনি, সংসারও যা সংসার-কর্তাও তাই। তপস্যা যদি করা হয় তখনও একই জিনিস বলা হয়, তপস্যা করলে তোমাকে সংসার-কর্তার দিকে অর্থাৎ ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যাবে, আত্মাকে আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত করে দেবে। কিন্তু এখানে তার উল্টোটাও হবে। যদি তুমি মনে করে সংসারে আমি অনেক ফল পেতে চাই, তাহলে তুমি তপস্যা কর। দেবতা আর অসুরদের মধ্যে যখনই লড়াই হত তখনই দেবতারা অসুরদের হাতে শুধু মার খেত। শতপথ ব্রাহ্মণে প্রায়ই বর্ণনা করছে, অসুররা প্রচণ্ড শক্তিশালী। অসুরদের হাতে মার খেয়ে দেবতারা সবাই মিলে ব্রহ্মার কাছে যায়, হে প্রভু! আমাদের এখন কী হবে? ব্রহ্মাও দেবতাদের তপস্যা করতে বলেন, তোমরা তপস্যা কর। যিনি জ্ঞান লাভ করতে চাইছেন, তাঁকেও তপস্যা করতে বলা হয়, *তপসা চীয়তে ব্রহ্ম*। সৃষ্টিও তপস্যা থেকে হয়েছে। সব কিছুতেই তপস্যা লেগে আছে। এই যে চারিদিকে নানা রকমের সমস্যা, দুষ্ট লোকদের হাতে সব ক্ষমতা চলে যাচ্ছে, বদমাইশ লোকগুলো সব ক্ষমতার শীর্ষে গিয়ে বসছে, এখন উপায় কি? উপায় একটাই,

তপস্যা করে নিজের শক্তি বাড়াও। দুষ্ট লোকদের দমন করার একটাই অস্ত্র তপস্যা, কারণ দুষ্টরা সব কিছু করবে তপস্যা করতে চাইবে না, আপনার হাতে তপস্যার অস্ত্র আছে, এটাকে এবার কাজে লাগান। তপস্যার ব্যাপারটা আমাদের খুব প্রাচীন ধারণা, আর তপস্যার মধ্যে যে জপের ব্যাপার সেটাও খুব প্রাচীন। প্রার্থনা আর জপ বা যজ্ঞ আর জপ এই দুটোর মধ্যে একটা বড় পার্থক্য হল, জপ পুরোপুরি নির্ভর করে আছে মনের উপর, জপ পুরোটাই মনের উপর চলে। মনের মুখোমুখি হওয়া অত্যন্ত কঠিন। মানুষ সব কিছু করে নেবে কিন্তু সে নিজের মনের সামনে দাঁড়াতে পারে না। যার জন্য আমরা শান্ত হয়ে বসে থাকতে পারি না, আমরা একা কখন বেশি সময় থাকতে পারি না। কারণ তখন আমাদের মনের সাথে লড়াই করতে হয়। মনের সাথে মানুষ একেবারেই লড়াই করতে পারে না। নিজের সাথে নিজের লড়াইও কেউ করতে চাইবে না। অথচ এই মন আমাদের বাণীকে চালাচ্ছে, আমাদের ক্রিয়াকে চালাচ্ছে। একটা কাহিনীতে বলছে, একবার বাণী আর মনের মধ্যে জোর বিবাদ লেগে গেছে, কে শ্রেষ্ঠ। যজ্ঞে যে মন্ত্রগুলি উচ্চারিত হচ্ছে, সেই মন্ত্রের অসীম ক্ষমতা তারা দেবতাদেরও টেনে নিয়ে আসে। সেইজন্য বাণী বলছে আমার ক্ষমতা বেশি। মন তখন বলছে, আমি না থাকলে তুমি কোথা থেকে আসবে। বাণী বলছে, তুমি থাকলেও তুমি তো কিছু করতে পার না, আমি যখন প্রার্থনা রূপে আসি তখনই সব জিনিসগুলো হয়। বাণী আর মন এইভাবে ঝগড়া করতে করতে শেষে প্রজাপতির কাছে গেলেন। প্রজাপতি দুজনের সব কথা শোনার পর বললেন, মনই সব। যে জিনিস যত দামী সেই জিনিসকে পাওয়া তত কঠিন হয়। মন হল সাংঘাতিক ক্ষমতাবান, মনকে যে জয় করে নিতে পেরেছে, সে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকেও জয় করে নেবে। আর বাণীকে যে জয় করতে পেরেছে সে তার তুলনায় অনেক কম লাভবান হবে। আর যে ক্রিয়াকে জয় করেছে সে আরও কম পাবে। সেইজন্য কর্মকে জয় করা সব সময় সহজ। এই যে অনেকে বলে, আমি কাজ ছাড়া থাকতে পারি না, আমি কাজ করতে করতে মরে যেতে চাই, মৃত্যুর আগেও যেন আমি কাজ করে যেতে পারি, এগুলো আদৌ কোন বাহাদুরী কথা নয়, অত্যন্ত লজ্জার কথা। তার মানে, জীবনে আপনি আর উঠতে পারলেন না। যদি কেউ বলে, আমি পড়াশোনার জগৎ নিয়েই থাকতে পারি, তাহলে বুঝতে হবে সে অনেকটা উপরে উঠে এসেছে। আর কেউ যদি বলে আমার কোন কিছুই লাগবে না, আমি আমার মনের সাথেই আছি, বুঝবেন সে মহা শক্তিমান লোক। এবার আপনি বলতে পারেন যারা কুড়ে, আলসে, ঠাকুরের কথায় যারা কুমড়ো কাটা বটঠাকুর, তারা তাহলে কি? এরা অপদার্থ, পাথরের মত নীরেট এরা মানুষের পর্যায়ে নেই। এরাও কিছু না কিছু করে যাচ্ছে, হয় ভুরর ভুরর করে তামাক টানছে, না হয় বিড়ি টানছে, না হয় তাস খেলছে। কাজ ছাড়া মানুষ থাকতে পারবে না।

জপ পুরোপুরি মনের উপর চলে, অন্য দিকে মনের মুখোমুখি হওয়া খুব কঠিন, তাই জপ করাও খুব কঠিন। তপস্যার ক্ষেত্রেও একই জিনিস হয়ে যায়। তপস্যা মানেই টানা আপনি অনেকক্ষণ জপ করে যাচ্ছেন। আর একদিন দুদিন নয়, বেশ কয়েক মাস, কয়েক বছর ধরে। মানুষ এই কাজ করতে পারবে না। সেইজন্য বাহ্যিক জিনিসগুলোকে নিয়ে আসা হয়। যেমন উপোস করছে, উপোস করাটাও তপস্যা। কিংবা কেউ ঠিক করে নিল, আমি আজ থেকে মাছ খাবো না, মিষ্টি খাবো না, এই ধরণের অনেক কিছু হতে পারে। তপস্যা মানেই তাপ সৃষ্টি করা। কোন জিনিস করলে শরীরে যে তাপ সৃষ্টি হয়, সেটাই তপস্যা। কোন জিনিস করা মানেই সংযম, সংযমের জন্য যদি তাপ সৃষ্টি হয় সেটাই তপস্যা। কোন মা বলল আমার ছেলের মঙ্গলের জন্য আমি আর কোন আমিষ খাব না, তখন সেটাই তপস্যা হয়ে গেল। কারণ এতদিন মাছ খেতে ভালোবাসত, এখন বাড়িতে কত রকম মাছ আসছে, খেতে ইচ্ছে করছে কিন্তু মা খাচ্ছে না, মাছ দেখে তার ভেতরে একটা তাপ সৃষ্টি হচ্ছে। তপস্যার জন্য সংযম খুব গুরুত্ব। এগুলো সবই কায়িক তপস্যা। জপ করে শরীরের মধ্যে যে একটা তাপ সৃষ্টি করবে, সেটাও মানসিক না করে কায়িক তপস্যায় চলে যায়। কায়িক, বাচিক ও মানসিক এই তিন রকম তপস্যা। বেদে যে যে ধারণাগুলো নিয়ে আসা হয়েছে তার সবটাই কিন্তু দেখা যাবে এই তিনটে স্তরে চলছে। কায়িক তপস্যা শরীরের স্তরে চলে, বাচিক তপস্যা বাণীর স্তরে চলে আর মানসিক তপস্যা মনের স্তরে চলে। বেদের যজ্ঞাদি অনেক কমে গেছে, কিন্তু জপ আর তপস্যা পুরোদমে থেকে গেছে।

মানসিক তপস্যা সাধারণ মানুষ পারে না। জপ আর তপস্যার মধ্যে কেউ যদি প্রবেশ করে গেল তার মানে সে এবার মনের জগতে ঢুকে গেল। মনের জগতে ঢুকে যেতেই আত্মবিশ্লেষণ খুব বেড়ে গেল। বেদের সময়েই বিশেষ করে আরণ্যকে নিজেকে বিশ্লেষণ করার উপর পুরোপুরি জোর দেওয়া শুরু হয়ে যায়। আমি কে? কেন আছি? কোথা থেকে আমি এসেছি? কোথায় যাব? আরণ্যকে গিয়ে এই প্রশ্নগুলো উঠতে শুরু হয়ে যায়। আর উপনিষদে এসে পুরোদমে এর উপরই চলতে থাকে। নিজেকে জানা, আত্মবিশ্লেষণের ব্যাপারটা উপনিষদে খুব গুরুত্ব পেয়ে গেল।

শতপথ ব্রাহ্মণে একটা বর্ণনাতে বলছেন, মৃত্যুর পর মানুষের ভালো কর্ম আর মন্দ কর্মগুলিকে দাঁড়িপাল্লাতে ওজন করা হয়। দাঁড়িপাল্লার ওজনের উপর নির্ভর করবে মৃত্যুর পর সে কোন দিকে যাবে। এগুলো খুব স্থূল চিন্তাধারা। বেদান্ত এই ধরণের চিন্তা ভাবনাকে মানবে না। তাঁরা বলতে চাইছেন এগুলো মূলতঃ আত্মবিশ্লেষণ, কোনটা সৎ আর কোনট অসৎ, কোনটা নিত্য কোনটা অনিত্য এগুলোকে নিয়ে বিচার করতে থাক, সৎ অসতের বিচার, নিত্য অনিত্যের বিচারটাই আসল। আরণ্যক আর উপনিষদে এই বিচার জিনিসটার গুরুত্ব পেতে শুরু হয়ে গেল।

আত্মবিশ্লেষণাদি হতে যখন শুরু হল, আমি মৃত্যুর পর স্বর্গে যাব, সেখানে আমি সুখে আনন্দে থাকব, এই জিনিসগুলোর ধারণা যদিও প্রথমের দিকে বেদের পরিষ্কার ভাবে ছিল না, কিন্তু এই ধারণাগুলোই আরও পরিশ্রুত হয়ে হয়ে পুনর্জন্মবাদের ধারণাতে পাল্টাতে শুরু হয়ে গেল। পুনর্জন্মবাদের ধারণা বেদে খুব হাল্কা ভাবে কোথাও এসেছিল, মহাভারতে এসে বেদের থেকে আরও স্পষ্ট ভাবে এসে গেল, আর পুরাণে এসে পুনর্জন্মবাদ পাকাপাকি ভাবে বসে গেল। বিদেশীরা অনেকে তাই প্রশ্ন করে, বেদে যেহেতু পুনর্জন্মবাদের ধারণা ছিল না, সেইহেতু মৃত্যুর পরে আবার জন্ম হয় এই ধারণা হিন্দুদের নিজস্ব নয়। কিন্তু বেদে এই ধারণা হাল্কা ভাবে আগেই এসে গিয়েছিল। যুক্তির দিক দিয়েও আমাদের ঋষিরা পরিষ্কার ছিলেন, পুনর্জন্মবাদ না মানলে ধর্মেরও কোন প্রয়োজনীয়তা থাকবে না। এগুলো খুবই স্বাভাবিক, যেমন একজন মানুষের ধীরে ধীরে আধ্যাত্মিক বিকাশ হতে থাকে, ঠিক তেমনি সমাজেরও আধ্যাত্মিক বিকাশ হয়। সমাজে প্রথমে যজ্ঞাদি হচ্ছে, যজ্ঞ থেকে সরে ধীরে ধীরে প্রার্থনার দিকে এগোচ্ছে, প্রার্থনা থেকে জপ এসে গেল, জপ আসতেই আত্মবিশ্লেষণ শুরু হয়ে গেল, আত্মবিশ্লেষণ থেকে চলে গেল আত্মবিচারে। আত্মবিচারে যখনই নামছে তখন দেখছে যেগুলোর মধ্যে ভালো মন্দের ব্যাপার জড়িয়ে আছে, সব কিছুই স্থূল, এগুলোর কোন মূল্যই নেই, একটাই মূল্য ঈশ্বরে নিজের মনকে অবস্থিত করে রাখা, এছাড়া আর কিছুর গুরুত্ব নেই। যা কিছু ঈশ্বর থেকে মনকে সরিয়ে দেয়, ঈশ্বরের বাইরে বাকি যা কিছু আছে বোধ হবে, তৎক্ষণাৎ সব ত্যাগ করা।

জীবনে আমরা যা কিছু করছি সবটাই এই তিনটের মধ্যেই ঘুর্ ঘুর্ করি – কর্ম, বচন আর চিন্তন, বেদও তাই যজ্ঞ, প্রার্থনা আর জপ। জপে নামলেই আত্মবিচার। আত্মবিচারে নামলেই পুনর্জন্ম, কর্ম এই জিনিসগুলো একটা নতুন গুরুত্ব পেয়ে যায়।

অমরত্বের সন্ধান

প্রথমের দিকে অমরত্বকে যখন খুঁজতে লাগল তখন তারা শরীরের দিকে তাকিয়ে অমরত্বের অনুসন্ধান শুরু করেছিল। দেখলেন স্বর্গেই শরীরের অমরত্ব পাওয়া যাবে। কিন্তু পরে দেখলেন যুক্তিতে এই ধারণাটা দাঁড়াতে পারেছে না। তারা বুঝলেন দুটো ভালো কাজ করলে আর কয়েকটা যজ্ঞ করে তুমি স্বর্গে গিয়ে অমর হয়ে যাবে, এটা কখনই সম্ভব নয়। স্বর্গ থেকেও নেমে আসতে হচ্ছে, তাহলে তো আর অমরত্ব থাকল না। সেখান থেকে সরে এসে অর্থাৎ এই স্থূল শরীরের অমরত্বের অনুসন্ধান ছেড়ে তাঁরা আত্মার অমরত্বের অনুসন্ধানে ব্যাপ্ত হলেন। ভারতীয় ধর্মের সাথে অন্যান্য ধর্মের এটাই প্রধান পার্থক্য। ভারতীয় ধর্ম বলতে হিন্দু, শিখ, জৈন, বৌদ্ধ সব ধর্মকেই বোঝাচ্ছে। এরা যে অমরত্বের কথা বলছে সেই অমরত্ব হল আত্মার কিন্তু জুহুদি, পার্সি, খ্রীশ্চান ও ইসলামরা যে অমরত্বের কথা বলে সেটা এই স্থূল শরীরের। সেইজন্য এরা কবরে শরীরটাকে খুব যত্ন করে রেখে দেয়। কারণ যেদিন Judgment Day আসবে সেই দিন এই শরীরটা কবর থেকে উঠে

আসবে, তাদের আত্মা এসে সেই শরীরের সাথে জুড়বে। বিচারের পর যারা স্বর্গে যাবে, সেখানে তাদের মধ্যে যারা পুরুষ তাদের তিরিশ বত্রিশ বছর হবে আর মেয়েদের পঁচিশ বছর বয়স হবে। এগুলো ভুল না ঠিক আমরা জানি না, আমাদের একমাত্র কাজ বিভিন্ন ধর্মের শাস্ত্র কি বলছে সেটা জানা। কিন্তু যেহেতু আমরা যুক্তি নিয়ে চলি, সেইহেতু যদি যুক্তি দিয়ে কাঁটাছেঁড়া করি, তাহলে এই ধরণের মতবাদের কোন মূল্যই আমাদের কাছে থাকবে না। স্বামীজী এই জিনিসগুলির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নিউটনের Laws of Motions এর থিয়োরি দিয়ে বলছেন তুমি যতটা শক্তি প্রয়োগ করবে ততটাই থাকবে। আবার অন্য দিকে ঈশ্বরের ইচ্ছায় এই নিয়ম কানুন চলে না। আমরা দেখেছি বেদ এই জিনিসগুলিকে কিভাবে ব্যাখ্যা করেছে।

অন্যান্য ধর্মের মত বেদও প্রথমে স্থুল শরীরের অমরত্বের কথা বলছে, কিন্তু পরেই ওনারা বুঝলেন এই তত্ত্ব যুক্তিতে দাঁড়াচ্ছে না। তখন তাঁরা স্থুল শরীরের অমরত্বের চিন্তা থেকে সরে আত্মার অবিনশ্বরত্বের তত্ত্বকে আবিষ্কার করে তার অনুসন্ধানেই পুরো প্রচেষ্টা লাগিয়ে দিলেন। বেদ বললেও, হিন্দুদের সব শাখাই আত্মার অমরত্বের ভাবনাকে পুরোপুরি গ্রহণ করেনি, আত্মা যে শুদ্ধ, চৈতন্য এই ভাবনাকে গ্রহণ করেনি। আত্মা শুদ্ধ চৈতন্য অবিনাশী এই ভাবের বেশির ভাগটাই অদ্বৈত বেদান্ত গ্রহণ করেছে, আর বাকিরা অন্য ভাবে গ্রহণ করেছে। তাবে যারা যাই নিয়ে থাকুক সবাই মেনে নিলেন যে স্থুল শরীরের অমরত্ব কোন মতেই সম্ভব নয়, আত্মাই অমর। কিন্তু অন্যান্য ধর্ম স্থুল শরীরের অমরত্বকে এখনও বিশ্বাস করে।

ত্যাগ বৈরাগ্যের ধারণা

আরণ্যক থেকেই বৈরাগ্যের ধারণা আসতে শুরু করে। ঋষিরা বয়সের একটা সন্ধিক্ষণে এসে আস্তে আস্তে জঙ্গলের দিকে যেতে শুরু করলেন, এখান থেকেই আরণ্যকের ধারণা গুলো আসতে শুরু হয়। ঋষিদের কাছে তখন শরীর মনটা আবর্জনার মত মনে হত, কারণ এই শরীর মনেতেই যত কামনা বাসনা জন্মাচ্ছে আর সেই বাসনা নানা কর্মের মধ্যে তাঁকে বেঁধে ফেলছে। শরীর মনকে পরিষ্কার করার শ্রেষ্ঠ উপায় ত্যাগ ও বৈরাগ্য। মন্ত্র অংশে বলা হয়েছিল তুমি যজ্ঞ কর, যজ্ঞ তোমাকে পবিত্র করবে কিন্তু এখন সেই যজ্ঞ থেকে সরে এসে ত্যাগ ও বৈরাগ্যের উপর জোর দেওয়া হল। পরের দিকে যত শাস্ত্র রচিত হয়েছে, বিশেষ করে গত দুশ তিনশ বছর ধরে হিন্দু ধর্মে যেসব চিন্তা ও ধারণাগুলো সামনে এসেছে, তার মধ্যে যজ্ঞ ও ত্যাগ-বৈরাগ্য এই দুটো ভাবনাই সব ক্ষেত্রে কাজ করছে। তুমি পূজা কর, অর্চনা কর, যজ্ঞ কর তুমি শুদ্ধ হয়ে যাবে আবার এটাও বলা হচ্ছে তুমি বৈরাগ্য অনুশীলন কর, বৈরাগ্য মানে বিরজা হোম করে সন্ন্যাস নেওয়া, সংসার ছেড়ে কোন আশ্রমে গিয়ে তপস্যা করা ইত্যাদির ধারণা। কুম্ভ স্নানের সময় সবাই কুম্ভে গিয়ে ডুব মারতে চাইছে, এটাও এক ধরণের যজ্ঞ, যে কোন পূজা, উপাচারই যজ্ঞের পরিমার্জিত রূপ। যজ্ঞ আস্তে আস্তে প্রার্থনার দিকে রূপান্তরিত হয়েছে। কুম্ভে কেন স্নান করতে চাইছে? বিশ্বাস আছে যে কুম্ভে ডুব দিলে আমি শুদ্ধ হয়ে যাব। কিন্তু সাধারণ ভাবে হিন্দু ধর্মের প্রত্যেক প্রায়শ্চিত্ত কর্মে বৈরাগ্য অনুশীলনের উপরেই জোর দেওয়া হয়। সেইজন্য বেদের আরণ্যকে এসে এই বলে প্রেরণা দেওয়া হত যে, তোমার এই জীবনে যা পাওয়ার পেয়ে গেছ, জগতে তোমার যা হওয়ার হয়ে গেছে, বয়স হয়ে গেছে, শারীরিক ক্ষমতা কমে গেছে, এখন তুমি কাশী, বৃন্দাবন, হরিদ্বারে গিয়ে ঈশ্বর চিন্তন কর আর তোমার শেষ দিনের জন্য অপেক্ষা করতে থাক। সমস্যা যেটা ছিল তা হল এর জন্য সবাই মানসিক ভাবে আগে থেকে প্রস্তুতি নেয় না। বয়স হয়ে গেছে তখনও বলছে আমি বৈরাগ্য চাইনা, কিছু ছাড়তে চায়না। কত বৃদ্ধ বৃদ্ধা রয়েছেন যাদের কেউ নেই, দূরের কোন ভাইপো এসে বলল চল তোমাকে বৃন্দাবন ঘুরিয়ে নিয়ে আসে। সেখানে নিয়ে কোথাও একটা জায়গায় বসিয়ে দিয়ে বলল, তুমি এখানে বস আমি এক্ষুণি আসছি, এই বলে বৃদ্ধকে ছেড়ে দিয়ে চলে আসত। এখনও বৃন্দাবন কাশীতে এইসব বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের নিয়ে প্রচুর সমস্যা। তবে এখন মানুষ পড়াশুনা জানে বলে খোঁজ খবর করে ফিরে আসতে পারে। কিন্তু আগেকার দিনের লোকেদের অত পড়াশুনা ছিল না আর যানবাহনও এখনকার মত উন্নত ছিল না, তাই তারা অকুল পাথারে পড়ে যেত। কাশীর সেবাশ্রমের কাজই শুরু হয়েছিল এই ধরণের বিধবাদের রাস্তা থেকে তুলে এনে থাকা খাওয়া আর চিকিৎসার ব্যবস্থা করার মধ্য দিয়ে। কাশী, বৃন্দাবনে স্বামীজী বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের অবস্থা দেখার পর এদের নিয়ে খুব গভীর ভাবে চিন্তা ভাবনা করেছিলেন, তিনিও চেয়েছিলেন এই অবস্থার পরবর্তন

আনতে। স্বামীজী ভারতে ফিরে আসার পর তিনি তাঁর শিষ্যদের এই কাজে লাগালেন। শিষ্যরা রাস্তা থেকে বিধবাদের তুলে এনে তাদের সেবা করতে শুরু করলেন, সেই থেকে কাশী সেবাশ্রমের কাজ শুরু হয়েছিল।

আরণ্যকের এই ধারণার মূল উৎস এই চিন্তা থেকেই – তোমার এখন বয়স হয়ে গেছে, জীবনে যা সুখ ভোগ করার হয়ে গেছে, এবার তুমি অন্য দিকে মন দাও, উচ্চ চিন্তনে নিজেকে ব্যস্ত রাখ। কিন্তু যে লোক সারা জীবন ভোগের জন্য দৌড়াদৌড়ি করেছে, ভোগের সংস্কার অত সহজে কি করে যাবে, ত্যাগের দিকে তার এক পয়সা মন নেই, এখন তাকে অরণ্যে পাঠিয়ে দিলে সে তো পাগল হয়ে যাবে। আমাদের শাস্ত্র বলছে শুদ্ধতা, পবিত্রতা অর্জনের শ্রেষ্ঠ পথ বৈরাগ্য, কিন্তু মানুষ বৈরাগ্যের কথা, ত্যাগের কথা শুনলে আঁতকে ওঠে, কারণ বৈরাগ্য অত সহজে হয় না, মনের মধ্যে কামনা বাসনা এত গিজ্‌গিজ্‌ করছে যে বৈরাগ্যে নেওয়া তো অনেক দূরের কথা, বৈরাগ্যের কথা শুনতেও চাইবে না। ঠাকুর বলতেন – যদি একবার কোন দোষ করে থাক তাহলে শুধু একটি বার বলে দাও আমি আর করব না, ব্যাস্‌ ওতেই শুদ্ধ হয়ে গেল। এটাই প্রকৃত বৈরাগ্য। আমার একটা জিনিসের প্রতি প্রচণ্ড দুর্বলতা আছে, আমি ঠাকুরের সামনে দাঁড়িয়ে বললাম আমি কাল থেকে আর এটা করব না। সেই মুহুর্তে সব কিছু মাফ হয়ে গেল। এটা কথামৃতেরই কথা। মানুষ যত ভুল করে, অন্যায় করে সবই কামনা বাসনা থেকেই করে, কামনা বাসনা প্রতিহত হলেই ক্রোধ আসে। মানুষ যত পাপ কর্ম করে এই দুটো কারণেই করে। এখন যে মনে মনে ঠিক করে নিল – অনেক হয়েছে আর নয়, ঠাকুর অনেক অন্যায় করেছি, আর নয়। তার মানে মনের মধ্যে যে কামনার জন্য সে অন্যায় করেছিল সেই কামনাকে সে বৈরাগ্য দিয়ে দিল। বৈরাগ্য এসে গেলে আর কোন অন্যায় কাজ, পাপ কাজ করতে হবে না, এই জন্যই বলা হয় যে পবিত্রতা অর্জনের একমাত্র শ্রেষ্ঠ উপায় বৈরাগ্য। যার বৈরাগ্য এসে গেছে তাকে আর কোন কিছু স্পর্শ করতে পারবে না। কিন্তু মানুষ পারেনা।

আবার কিছু ভক্ত আছে, তারা পাপ করছে কিন্তু ছাড়তেও পারছে না, এদিকে অপরাধ বোধটাও আছে, এরাই কুম্ভে গিয়ে ডুব মারতে যায়। এত দিন যা পাপ করেছি সব কুম্ভে গিয়ে পরিষ্কার করে এলাম। তারপর আবার পাপ কাজে জড়িয়ে পরে। যারা একবার বলে দিয়েছে আমি আর পাপ কাজ করব না সে একেবারে শুদ্ধ হয়ে গেল, আর যারা বলছে এতদিন যা পাপ কাজ করেছি কুম্ভে স্নান করে সেগুলো পরিষ্কার হয়ে গেছে, এখন আবার নতুন করে করা যাবে। যারা বৈরাগ্যকে বরণ করতে পারে না তারাই কুম্ভে যাবে, উপোস করবে, মন্দিরে পূজা দেবে, এগুলো করা মানে যা করেছি সেগুলিকে পরিষ্কার করে দিয়ে আবার নতুন খাতা খোলার ব্যবস্থা করে নেওয়া।

ঐতেরিয় আরণ্যক খুব নামকরা, বৃহদারণ্যক উপনিষদের নামই বৃহৎ আরণ্যক, এই দুটো ছাড়াও প্রচুর আরণ্যক এখনও পাওয়া যায়, তবে পড়ার যদি সুযোগ পাওয়া যায় তাহলে এই দুটি আরণ্যক অধ্যয়ন করলে অনেক কিছু জানা যেতে পারে।

আরণ্যকের পর আসে উপনিষদ। আর উপনিষদের মূল বক্তব্য সংক্ষেপে বলতে গেলে বলা যায় – এই জগতে যেটা সত্য, যেটা নিত্য তাকেই স্পষ্ট করে বলা। এতদিন ঋষিরা যাঁকে সংহিতা, ব্রাহ্মণ ইত্যাদিতে অস্পষ্ট করে বলছিলেন, কখন পুরুষ, কখন বিরাট বলে উল্লেখ করছিলেন, যে সত্যকে বিভিন্ন দেবতাদের মধ্যে অনুসন্ধান করছিলেন, তাঁকেই উপনিষদে এসে ব্রহ্ম বলে উল্লেখ করছেন। ব্রহ্মই নিত্য, তিনিই সত্য, তাঁর বাইরে আর কিছু নেই। নিত্য সেটাই যার কোন ধরণের রূপান্তর হয় না, সেখানে কোন পরিবর্তন নেই। যা কিছুরই পরিবর্তন হয় সেটাই অনিত্য। স্থূল শরীরের অনবরত পরিবর্তন হচ্ছে, মন অহরহ বিভিন্ন রকম রূপ নিচ্ছে, তাই শরীর মন অনিত্য, আত্মাই একমাত্র নিত্য, এর কোন পরিবর্তন হয় না। আমাদের ভেতরে আত্মাই আছেন যিনি নিত্য, যাঁর কখন পরিবর্তন হয় না। ঠিক তেমনি বহির্জগতে ব্রহ্ম যিনি তাঁর কখন পরিবর্তন হয় না। সেইজন্য জীবাত্মা আর পরমাত্মা এই দুটি শব্দকে ব্যবহার করা হয়।

আবার ধ্যানের গভীরে গিয়ে উপলব্ধিতে ধরা পরে যে যিনি জীবাত্মা তিনিই পরমাত্মা, যিনিই পরমাত্মা তিনিই সমস্ত জীবের মধ্যে জীবাত্মা রূপে বিরাজ করছেন। উপনিষদ এরই উপর সমস্ত জোর দিয়ে বলছে

আত্মাই ব্রহ্ম, *অহং ব্রহ্মাস্মি*, অহং মানে এই শরীর, মন রূপী আমি নয়, আত্মা রূপী আমির কথাই বলা হচ্ছে। শরীর রূপে, মন রূপে, বুদ্ধি রূপে কেউ কখন ব্রহ্ম হতে পারে না। শরীর, মন ও বুদ্ধি রূপে কখনই উচ্চ আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায় না, সাধারণ জিনিস যেমন হয়, শরীর, মন, বুদ্ধির সঙ্গে একাত্ম আমিটাও সাধারণ জিনিস। যখন কেউ নিজেকে আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত করে দেবে তখন সে বলতে পারবে *অহং ব্রহ্মাস্মি*। যত চৈতন্যের বিস্তার হবে ততই সে মহৎ হতে থাকবে। উপনিষদে এই জিনিসগুলিকেই বিভিন্ন ভাবে বলা হয়েছে।

এখানেই আমাদের বেদের যাবতীয় আলোচনা শেষ হয়ে গেল। এর পরে আসছে বেদান্ত। বেদ বলতে মোটামুটি মন্ত্র আর ব্রাহ্মণকেই বোঝায়, আর উপনিষদকেই বেদান্ত বলা হয়, বেদের অন্ত। যদিও বেদের অন্ত বলতে উপনিষদকে বোঝাচ্ছে, কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ করা হয় – The Vedantins do not see Upanishads as the end of the Vedas, but as the final aim of the Vedas. অর্থাৎ বেদের অন্তে এসেছে বলেই উপনিষদকে বেদান্ত বলা হচ্ছে তা নয়, বেদান্তের গূঢ় অর্থ হল বেদ যে চরম লক্ষ্যের দিকে সবাইকে নিয়ে আসছে সেটাই বেদান্তের উদ্দেশ্য। বেদের উদ্দেশ্য আত্মাই ব্রহ্ম, এটাই সমগ্র বেদের বক্তব্য, পুরো বেদ যেখানে গিয়ে *উপক্ষয়ঃ*, মানে নিজেকে নিঃশেষে খালি করতে করতে ধীরে ধীরে একটা দিকে নিয়ে যাচ্ছে। বেদের যে এই চারটি ভাগ মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক আর উপনিষদ, এতেই বোঝা যায় যে উপনিষদই লক্ষ্য, সেই কারণে উপনিষদকে বলা হয় বেদান্ত। আর যদি আক্ষরিক অর্থে বেদান্তের ব্যাখ্যা করতে হয় তাহলে বলা যায় বেদের শেষে উপনিষদ এসেছে তাই উপনিষদকে বেদান্ত বলা হচ্ছে।

বেদাঙ্গ

বেদাঙ্গ বেদের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ এবং জ্যোতিষ এই ছটি বিষয় নিয়ে বেদাঙ্গ।

শিক্ষা মানে আমরা শিক্ষা বলতে যা বুঝি সেই শিক্ষা নয়। বেদের শিক্ষা মানে মন্ত্রের সঠিক উচ্চারণের বিজ্ঞান ও কৌশল। শুদ্ধ উচ্চারণের ব্যপারটা বেদে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বেদে উচ্চারণকে কেন এত গুরুত্ব দেওয়া হয় এই নিয়ে আমরা আগেও আলোচনা করেছি। স্বামীজী বলছেন একটা জিনিসকে যদি ঠিক ঠিক উচ্চারণ করা যায় তখন ঐ জিনিসটা তৈরী হয়ে যাবে। স্বামীজীর কথা শুনে শিষ্য শরৎ চক্রবর্তী বলছেন – আমি যদি এই ঘটিকে ঘটি ঘটি বলি তাহলে ঘটি তৈরী হয়ে যাবে? স্বামীজী বলছেন হ্যাঁ হবে যদি তুমি তার ঠিক ঠিক উচ্চারণ করতে পার। বেদের সময়ে ঋষিরা এই কারণে শিক্ষাকে খুব গুরুত্ব দিতেন। মন্ত্রের ঠিক ঠিক উচ্চারণ যদি হয় তবেই মন্ত্রের শক্তি কাজ করবে। এত লোক মন্ত্র জপ করে যাচ্ছে কিন্তু কিছুই হচ্ছে না, তার কারণ মন্ত্রের যে উচ্চারণ হওয়ার কথা সেই উচ্চারণটা যতক্ষণ না ঠিক মত হবে ততক্ষণ মন্ত্রের শক্তি কাজ করবে না। উচ্চারণ কিভাবে ঠিক হয়? বলছেন উচ্চারণ চার রকমের হয় – একটা হয় মুখ থেকে, একটা হয় গলা থেকে, একটা হয় পেটের নীচ থেকে আরেকটা নাভি থেকে হয়। দীক্ষার সময় গুরু মন্ত্রের উচ্চারণ কিভাবে করতে হবে বলতে গিয়ে বলে দেন ঠোঁট নড়বে না, জিহ্বা নড়বে না। কিন্তু আমাদের প্রায় সবারই হয় ঠোঁট নড়বে নয়তো জিভটা নড়ার জন্য ছটফট করতে থাকে। যখন মন ঠিক ঠিক শান্ত হয়ে যায় তখন ঠোঁট জিভ নড়া বন্ধ হয়ে যায় তখন গলার কাছে স্বরনাড়িটা নড়তে থাকে। এই নড়ার জন্য জপের গতি ধীরে চলে, নড়া বন্ধ হয়ে গেলে জপের গতিও হাজার গুণ বেড়ে যাবে। আগে একশ আট বার জপ করতে যেখানে দু-তিন মিনিট লাগত এখন সেই একশ আট বার জপ করতে কয়েক সেকেণ্ড লাগবে, তখন লক্ষ লক্ষ জপ হতে শুরু করবে। এরপরই আসে পূর্ণ নীরবতা। এই নিস্তব্দতার অবস্থায় যখন চলে তখন মন্ত্রের ঠিক ঠিক উচ্চারণ কি বুঝতে পারে। যখনই ওঁ নমঃ শিবায় ঠিক ঠিক উচ্চারণ হবে তখনই শিবের দর্শন হয়ে যাবে। ঠোঁট নড়া, জিভ নড়া থেকেই আমরা বেরোতে পারছি না। দীর্ঘকাল ধরে দু-তিন ঘন্টা টানা জপ ধ্যান করলে এগুলো বোঝা যায়। শিক্ষা একটা স্বয়ং সম্পূর্ণ শাখা যেখানে মন্ত্রের ঠিক ঠিক উচ্চারণ শেখান হত।

একবার ত্বস্টা দেবতা ইন্দ্রের উপরে খুব রেগে গিয়েছিলেন, ঠিক করলেন ইন্দ্রকে বধ করতে হবে। তখন সে একটা যজ্ঞ করবে বলে ঠিক করল। যজ্ঞের সময় আচমন করে মন্ত্র উচ্চারণ করা হবে – *ইন্দ্রসতুর*

বরদ্ধস্ব, যার অর্থ ইন্দ্রের যে শত্রু তার বৃদ্ধি হোক, মানে ইন্দ্রকে যে মারবে তার শক্তি, বল সব বৃদ্ধি হোক। এখন মন্ত্রের মধ্যে উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত এই তিন রকমের স্বর ওঠানামা করে, মন্ত্রও সেইভাবে উচ্চারণ করা হয়। ত্বস্টা যেখানে উদাত্ত হওয়ার কথা ছিল সেখান উদাত্ত না করে স্বরিত করে দিল, আর তাতেই শব্দের অর্থ পাল্টে গেল। যেখানে অর্থ হওয়ার কথা ছিল ইন্দ্রের শত্রুর বল বৃদ্ধি হোক, সেটা না হয়ে অর্থ হয়ে গেল ইন্দ্রের শক্তি বৃদ্ধি হোক। তার ফলে যে বিরাট যজ্ঞ হল তার ফল উল্টো হয়ে ত্বস্টাই মারা গেল। প্রাচীন ফোনেটিক যে বই আছে সেই বইগুলোকে বলা হয় প্রাতিসখ্য। চারটে বেদের যে বিভিন্ন শাখা আছে তার জন্য আলাদা আলাদা প্রাতিসখ্য ছিল। অনেক আগেই এই বইগুলো হারিয়ে গেছে এখন আর এই বই পাওয়া যায় না। নারদীয় শিক্ষা নামে উচ্চারণের একটি বই এখনও পাওয়া যায়, কিন্তু এই বইও বেদের সময়ের অনেক পরের দিককার। শিক্ষার এই ব্যাপারকেও আজ আর বিশেষ ভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয় না।

বেদাঙ্গের ব্যাকরণ হল বৈদিক গ্রামার। পরের দিকে পাণিনির ব্যাকরণ আসার পরে বৈদিক গ্রামারের গুরুত্বও চলে গেছে এখন আর এই বৈদিক গ্রামারও চোখে পড়ে না। তবে পাণিনির ব্যাকরণই এখন বৈদিক গ্রামারের কাজ করে দিচ্ছে।

তারপর আসছে ছন্দ। কবিতা বা গান লেখার সময় তার শব্দ ও অক্ষর কতকগুলি বিশেষ নিয়মে সাজান হয়ে থাকে সেটাকেই ছন্দ বলছে। কিন্তু পরের দিকে যে সাম গান হত সেই সাম গান থেকে সাতটা সুরের সৃষ্টি হল। এই সাতটা সুর নিয়েই পরে গন্ধর্ব বিদ্যার আবির্ভাব হয়ে সেইভাবে ছন্দ এগিয়ে গেল। বেদ বেদাঙ্গের এই বিদ্যাগুলো মুস্টিমেয় কয়েকজনের কাছেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু পরের দিকে সাধারণ লোকের জন্য সহজ করে এই জিনিস গুলিকেই তৈরী করা হয়েছিল। যেমন বৈদিক ব্যাকরণ পাণিনির ব্যাকরণে চলে এল। বৈদিক যুগে যে ছন্দ বিদ্যা ছিল সেই ছন্দও তেমনি পরে রূপান্তরিত হয়ে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে চলে এসেছে। বৈদিক যুগের ছন্দকে আজকের যুগে আর দেখা যায় না, এখন যে ছন্দ আছে তার সাথে বৈদিক যুগের ছন্দের সাথে কোন মিল নেই। আপ্তের একটি বৈদিক অভিধান আছে সেখানে কত রকমের ছন্দ আছে তার একটা বিরাট তালিকা দেওয়া আছে কিন্তু এই সব ছন্দ এই যুগের, বৈদিক যুগে ছন্দ ছিল একটা আলাদা শিল্প কলা, এখন এর পুরোটাই হারিয়ে গেছে।

বেদের প্রধান কর্ম ছিল যজ্ঞ যাগ, যজ্ঞ করতে গেলে একটা বিশেষ সময় বা তিথির মধ্যে করতে হবে, এই এই নক্ষত্র থাকতে হবে। এই জিনিসটাকে ঠিক করার জন্য বৈদিক যুগে জ্যোতিষ শাস্ত্রের সৃষ্টি হয়েছিল। একটা যজ্ঞ ব্রাহ্ম মুহূর্তে করতে হবে, ব্রাহ্ম মুহূর্তের সময়কে নির্ধারণ করার জন্য একটি আলাদা বিজ্ঞান তৈরী হয়ে বেদের একটা নতুন শাখা তৈরী হল, তাদের যে শাস্ত্র হল সেটাকেই জ্যোতিষ শাস্ত্র বলা হয়। বৈদিক যুগের একমাত্র জ্যোতিষ শাস্ত্রই এখনও একই ভাবে চলে আসছে। আমাদের এখনও যে জ্যোতিষ শাস্ত্র অনুসরণ করে কুষ্টি, ঠিকুজি তৈরী হয় এটা সেই বৈদিক যুগের জ্যোতিষ শাস্ত্রকেই ভিত্তি করে করা হয়। সব থেকে আশ্চর্যের ব্যাপার যে বৈদিক যুগে যা যা তিথি নক্ষত্রের হিসেব যে পদ্ধতিতে দিয়ে গেছেন এখনও এটাকেই সঠিক পদ্ধতি মেনে নিয়ে এখনকার জ্যোতিষ বিজ্ঞানীরা সব হিসেব করে যাচ্ছেন।

আর্যভট্ট আজ পর্যন্ত যত সূর্য গ্রহণ চন্দ্র গ্রহণ হয়েছে ভবিষ্যতে যত গ্রহণ হবে সব হিসেব করে বলে গেছেন। তখনকার দিনে কোন দূরবীন যন্ত্র ছিল না, কিন্তু ওনারা এগুলো কিভাবে হিসাব করেছিলেন ভাবলেও আশ্চর্য হয়ে যেত হয়, শুধু তাই নয় একেবারে নিখুঁত হিসাব। তাছাড়া সূর্যের গতির সাথে পৃথিবীর গতির তুলনা, চাঁদের গতির সাথে পৃথিবীর গতির তুলনা একেবারে নিখুঁত ভাবে করে গেছেন, কোন বছরে কোন তারিখে কি কি গ্রহণ হবে।

তারপরে আসছে কল্প – কল্প হল যজ্ঞের বিভিন্ন নিয়ম কানুন আর সংস্কারের বর্ণনা, সংস্কার হল জাতকর্ম কিভাবে করান হবে, যেমন বিবাহ কিভাবে করান হবে। এত এত মন্ত্র, নিয়ম কত মনে রাখবে তাই এগুলোকে সংক্ষিপ্ত আকারে ম্যানুয়াল করে রাখা হত, এটাকেই বলা হয় কল্প। কল্পকে আবার কয়েকটি বিভাগে ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল। তারমধ্যে কিছুকে বলা হয় গৃহ্যসূত্র, আর কিছুকে বলা হত স্মার্তসূত্র ও

শ্রৌতসূত্র। মনুস্মৃতিতে এগুলো আরো বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হয়েছে। বারোয়ারী যে যজ্ঞ করা হত সেই যজ্ঞে এবং সামহিক পূজা যেখানে হত সেখানে শ্রৌতসূত্রের দরকার পড়ত। দ্বিতীয় হল গৃহ্যসূত্র, বাড়িতে যে যজ্ঞগুলো হত তার বিধি-বিধান এবং অন্যান্য অনেক কিছু জানার জন্য গৃহ্যসূত্র লাগত। তৃতীয় ধর্মসূত্র, সমাজে, পরিবারে যত রকমের আচার আচরণ পালন করা হত, যেমন ব্রাহ্মণরা কি করবে, ক্ষত্রিয়দের কি কি কাজ, যজমানদের কি কাজ আর তাদের কি কর্তব্য, কি অকর্তব্য এই সব কিছুকে ধর্মসূত্রে আলোচনা করা হয়েছে। চতুর্থ আরেকটি আছে সুল্বসূত্র, সুল্বসূত্রে যজ্ঞের যে বেদী করা হত সেই বেদীর জ্যামিতিক ব্যাপারগুলো, যেমন কোন যজ্ঞে বেদীর কত উচ্চতা, কত চওড়া, কটা কোণ থাকবে এগুলোর বর্ণনা। এই চারটে সূত্রের উপর প্রচুর বই আছে, এরমধ্যে আবার এক পণ্ডিত এটাকে মানবে না, অন্য পণ্ডিত ওটাকে মানবে না। '1857' একটা খুব মজার বই আছে, বইটির লেখক পাণ্ডুরাম। প্রচুর পড়াশোন করা লোক, কিন্তু বাড়িতে খুব অভাব। তিনি অর্থ উপার্জন করার জন্য মহারাষ্ট্র থেকে বেরিয়ে এলেন। মহারাষ্ট্র থেকে যখন বেরিয়ে এলেন কিছু দিন পরেই ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের বিখ্যাত সিপাহী বিদ্রোহ শুরু হয়। বেচারীর এমনই কপাল যেখানে যেখানে যাচ্ছেন সেখানে সেখানেই মিউটিনি হচ্ছিল। ঝাঁসির রাণী যখন নিজের হাতে সব কিছু রক্ষা করছিলেন তখন সেখানেও এই ভদ্রলোক ছিলেন। ঝাঁসির রাণীকে তিনি নিজের চোখে পালিয়ে যেতে দেখেছেন। ঝাঁসির রানী পালিয়ে যেতে সেখানকার লোকগুলোও প্রাণ ছেড়ে পালিয়েছে। এই বেচারীও মরতে মরতে কোন রকমে বেঁচে ফিরেছিলেন। গরীব ব্রাহ্মণ, মাঝে মাঝে কিছু টাকা পেয়ে যেত আবার সেই টাকা চলে যেতেও বেশি সময় লাগত না। তিন চার বছর পর শেষ পর্যন্ত যখন বাড়ি ফিরেছে তখন খুব একটা টাকা নিয়ে ফিরতে পারেনি। কানপুর, বিঠুরে যখন যখন যা ঘটেছিল তখন তিনি সেখানেই ছিলেন। উজ্জয়িনী, মালোয়ার, ইন্দোর সব জায়গাতেই ঘুরেছেন, তখন তো সেখানে আগুন জ্বলছে। তিনি বইটা লিখলেন কিন্তু ছাপালেন না। লেখার পর দুটো কপি করে একটা এক বন্ধুকে গিয়ে বললেন আমি মারা গেলে বইটা ছাপিও, তা নাহলে ইংরেজরা আমাকে জেলে ঢুকিয়ে দিতে পারে। বইটির এক জায়গায় একটা বর্ণনা আছে, এক জায়গায় যজ্ঞ হবে। সেও সেখানে কি করে পৌঁছে গেছে। ওখানে আবার কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণদের মধ্যে কি নিয়ে ঝগড়া বেঁধে গেছে। উনি গিয়ে দেখলেন এমন কিছুই নয়, যজ্ঞের বেদী নিয়ে ব্রাহ্মণদের মধ্যে ঝামেলা বেঁধেছে। কোন বইকে অনুসরণ করা হবে এই নিয়ে জোর তর্ক চলছে। এই দল কিছু বইয়ের তালিকা দিচ্ছে আবার অন্য দল আবার অন্য কতকগুলি বইয়ের তালিকা দিচ্ছে। ওখানে লেখক কত বইয়ের যে নাম উল্লেখ করেছেন যে বইয়ের নাম আমরা কখন শুনিইনি, অথচ সব বইয়ের হদিস ব্রাহ্মণদের মাথায় বসে আছে। শেষ পর্যন্ত একটা বইকে দু পক্ষই মানতে রাজী হয়েছে। তখন তো বই ছাপা হয়নি, সবই পুঁথি আকারে পাওয়া যেত। পরে জানা গেলে কিছু দূরে এক ব্রাহ্মণ আছে তাঁর কাছে এই বই থাকতে পারে। আবার লোক দৌড়াল, যাই হোক তাঁর কাছে বইটা পাওয়া গেল। ব্রাহ্মণদের মাথায় সব বইয়ের হদিস বসে আছে। বেদ জানে না, কিন্তু এই যে বিভিন্ন সূত্রের কথা বলা হচ্ছে এগুলো সবটাই তাদের মুখস্ত। বেদের ব্যাপারে কেউ বলতে যাবে না, কারণ বিভিন্ন বেদের যাঁরা পণ্ডিত ছিলেন সেখানে ধর্মসূত্র বা সুল্বসূত্র এগুলো পাল্টাবে না।

কতকগুলি কল্পসূত্র খুব উল্লেখযোগ্য, তারমধ্যে আপস্তাম্বের কল্পসূত্র খুব বিখ্যাত কল্পসূত্র। এছাড়া অশ্বালয়মের কল্পসূত্র, সাংখ্যায়নের কল্পসূত্র, গোভিলা, কাত্যায়ন, হিরণ্যাকেশি, বোধয়ণ, ভরদ্বাজাদির কল্পসূত্রও খুব নামকরা। কল্পসূত্র বেদের খুব বিশাল ও সুন্দর এবং খুব বিখ্যাত কাজ। কিন্তু বেদাঙ্গের অন্যান্য জিনিসের মতও এই কল্পসূত্রও পরিবর্তিত হয়ে পরে স্মৃতিশাস্ত্রে চলে গেছে। কল্পসূত্রের বৈদিক যুগের বইগুলো এখনও আছে কিন্তু ব্যবহার হয় না, কিন্তু স্মৃতিশাস্ত্র রূপে এখনও এগুলো ব্যবহৃত হয়ে চলেছে।

বেদাঙ্গের সব শেষে আসে নিরুক্ত। নিরুক্ত বেদের শব্দ প্রকরণের বিজ্ঞান। সহজ ভাষায় নিরুক্ত বেদের অভিধান। যাস্ক ঋষিই একমাত্র যিনি বেদের এই অভিধান সঙ্কলন করেছিলেন, তাও বেদ রচিত হবার প্রায় দু-হাজার বছর পর। এর আগে বেদের শেষ অভিধান হল নিঘন্টু। যাস্কের নিরুক্তকে নিঘন্টুরেই ব্যাখ্যা বলা যেতে পারে। এই হল বেদের মোটামুটি বিবরণ। এরপর আমরা বেদের কয়েকটি প্রচলিত মন্ত্র ও সূক্তমের উপর আলোচনা করা হবে, সেখানেও বেদের আরও অনেক কিছু আমাদের স্পষ্ট হয়ে যাবে।

~ বেদ-মন্ত্র ~

কথামৃতে ঠাকুর সাধক কত রকম হতে পারে আলোচনা করতে গিয়ে কিছু শব্দ ব্যবহার করেছেন, বৈষ্ণবদের পরম্পরা থেকে তিনি শব্দগুলো নিয়ে থাকতে পারেন। কারণ আমাদের মূল কোন ধর্মগ্রন্থেই শব্দগুলি আসেনি। ঠাকুরের কাছে অনেক ধরণের সাধুরা আসতেন, শব্দগুলো তিনি তাঁদের কারুর কাছেও শুনে থাকতে পারেন। ঠাকুর বলছেন, ধর্মপথে যারা আছে তাদের চারটে থাক। এই চারটে থাকের মধ্যে তত্ত্বগত কিছু পার্থক্য আছে। পার্থক্য গুলি জেনে নেওয়া এই কারণেই ভালো তাহলে বোঝা যায় আমি ঠিক কোন জায়গাতে দাঁড়িয়ে আছি। প্রথম থাক হল প্রবর্তক। আমরা সবাই হলাম প্রবর্তক। প্রবর্তক মানে, কারুর কাছে শুনেছে ঈশ্বর বলে কেউ আছেন, আর একটু বিশ্বাসও আছে। এই বিশ্বাসটুকু আছে বলেই তিলক কাটে, মন্দিরে যায়, গলায় তুলসী বা রুদ্রাক্ষের মালা ধারণ করে। আধ্যাত্মিকতার নিরিখে এরা এখনও আধ্যাত্মিক জীবনে প্রবেশ করেনি। বেশির ভাগ সময় আমরা যে সাধনা বা সাধকের কথা বলি আসলে আমরা প্রবর্তকের কথাই বলতে চাইছি। দ্বিতীয় থাক হল সাধক। যিনি সাধক হয়ে যান, তাঁর বাহ্যাড়ম্বর অনেক কমে যায়। তিলক কাটা, মালা পড়া, মন্দিরে যাওয়া এসব নিয়ে তিনি আর ভাবতে চান না। দিব্য সত্তার প্রতি তাঁর ভেতর থেকে যে প্রার্থনা বেরিয়ে আসে সেই প্রার্থনার মধ্যে তাঁর মন অনেক ডুবে যায়। ধর্ম আর আধ্যাত্মিকতার একটা সংজ্ঞা আছে, ধর্ম মানে অপরের আধ্যাত্মিক অনুভূতিকে নিয়ে বেশি লাফালাফি করা। লাফালাফি অনেক কিছুকে নিয়েই হতে পারে, ঠাকুরের জন্মতিথি পালন করা, ঠাকুরের গান করা, মন্দিরে যাওয়া, সবই ধর্মাচরণের অঙ্গ, স্বামীজী যাকে বলছেন external aspects, ritualistic aspcts। Ritualistic aspect মানে অপরের যে আধ্যাত্মিক অনুভূতি হয়েছে আর তার জন্য তাঁর যে একটা অমানবীয় ব্যক্তিত্ব তৈরী হয়েছে, সেই ব্যক্তিত্বে নিজেকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা। আধ্যাত্মিকতা হল নিজে অনুভূতি সম্পন্ন হওয়া। Religion is achievements of others and spirituality is your own achievement। সামান্য একটুও যদি কারুর অনুভূতি হয়ে থাকে তাহলে বুঝতে হবে জগতের বাঁধন তিনি ছেড়ে দিয়েছেন। আধ্যাত্মিকতা তখনই শুরু হয় যখন সে মনে করে এতে আমার নিজের কি উপলব্ধি হয়েছে। এই জায়গাতে এসে প্রবর্তক আর সাধকের মধ্যে তফাৎ হয়ে যায়। প্রবর্তক সব সময় মনে করছে, নিয়মিত আমি যে ঠাকুরের কাছে আসছি, কথামৃত পড়ছি, জপ করছি, এটাই অনেক। আগে আমি কি ছিলাম! কত মদ খেতাম, কত কুকর্ম করতাম। কথামৃতে এর খুব সুন্দর সুন্দর বর্ণনা আছে। এগুলোই প্রবর্তকের লক্ষণ। এখানে তার নিজস্বতা বলে কিছু নেই, নতুন একটা বিষয় পেয়ে গেছে সেটাকে নিয়েই এখন লাফাচ্ছে। আমাদের মধ্যে যাবতীয় যা কিছু দেখা যায়, যত উদ্দীপন, লাফালাফি সব প্রবর্তকের লক্ষণ।

কিন্তু সাধক যখন হয়ে যায় তখন আর সে এগুলো নিয়ে বেশি মাতামাতি করতে যাবে না। সবই করবে, মন্দিরেও যাবে, চরণামৃতও খাবে, কিন্তু কে আমাকে দেখল, কে বড় বলল এসব নিয়ে সে আর ভাবতে যাবে না। সাধকের বাহ্যিক আড়ম্বর কমে গিয়ে শুধু প্রার্থনাতে তার মন ঢুকে যায়। প্রার্থনার গভীরতা যত বাড়তে থাকবে তত সে তার নিজস্ব কিছু অনুভূতি লাভের জন্য ছটফট করতে থাকে। এরপরেই আসে তৃতীয় থাক, তিনি হলেন সিদ্ধ। সিদ্ধ মানে, তিনি ঈশ্বরকে অনুভব করেছেন। তিনি বোধে বোধ করেছেন যে ঈশ্বরই আছেন। সাধকেরও ঈশ্বর আছেন, ঈশ্বরকে নিয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। সাধকও জানেন ভালো মন্দ যা কিছু হচ্ছে সব তিনিই করছেন। সেইজন্য নিজের জীবন ধারাকেও তিনি সেইভাবে পাল্টে দেন।

আমাদের এই 'আমি'টা যে কি জিনিস ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়। 'আমি'কে নিয়ে বেশি চিন্তা-ভাবনা করলে মাথা খারাপ হয়ে যাবার জোগাড় হবে। শাস্ত্রে যখন আমিকে নিয়ে বিচার করতে শুরু করে তখন প্রথমে দেখেন পঞ্চভূত। পঞ্চভূতের জন্ম আকাশ থেকে। আকাশ থেকে বায়ু, বায়ু থেকে অগ্নি ইত্যাদি, সব কিছু মিলে মিলে এই শরীর তৈরী হচ্ছে। গ্রীক দেশের বিজ্ঞানীরা যে ঈথারের কথা বলেছিলেন, ওই ঈথারের সাথে আমাদের আকাশের মিল আছে। তারপর ধীরে ধীরে অনেক কিছুর ধারণা পাল্টে গেল। এরপর এল নিউটনের থিয়োরি, সেখানে three dimensional spaceএর ধারণা এল। সেখান থেকে আইনস্টাইন

আরেক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বললেন, স্পেস আর টাইম মিলিয়ে স্পেস। ইদানিং আবার ফিজিক্সে একটা নতুন থিয়োরি এসেছে হাইপার স্পেস। আমাদের ঋষিরা যে আকাশের কথা বলছেন আর বিজ্ঞানীরা যে স্পেসের কথা বলছেন এই দুটোতে মিল কোথায় চিন্তা করতে করতে একটা জিনিস পরিষ্কার বোঝা যায় যে, বিজ্ঞান কোন না কোন একদিন ওই জায়গাতেই যাবে যেখানে আমরা আকাশ বলতে যে জিনিসটাকে বুঝি। আকাশ আমাদের কাছে কোন তত্ত্ব নয়, আকাশ হল সব কিছুর মা, সেখান থেকেই সব কিছু বেরিয়েছে। হাইপার স্পেস নিয়ে বিজ্ঞানীরা বলছেন, স্পেস যেন নিজের উপরে নিজেকে ফোল্ড করছে। যেমন শাড়িটা টান টান আছে, এবার একটা জায়গাকে কুচকে দিলেন কিন্তু শাড়ির বাকি জায়গাটা সমান আছে। যে জায়গাটা কুঁচকে আছে সেটাই যেন পদার্থ, বাকিটা স্পেস। শাড়ি ছোট্ট জিনিস বলে আমাদের অন্য রকম মনে হতে পারে। যে বিজ্ঞানী হাইপার স্পেস নিয়ে লিখছেন, তিনি বলছেন এর ফিলজফিক্যাল ইমপ্লিকেশান মারাত্মক, তার মানে আমি, আপনি, তুমি, সে কেউই বাস্তবিক নেই। তাহলে এগুলো কি? কিছুই না, শুধুই স্পেস। আকাশ যেটা রয়েছে ওরই যেন কিছু জায়গা সলিডিফিকেশান হয়ে গেছে। একটা সলিডিফিকেশান আমি, আরেকটি সলিডিফিকেশান আপনি। তাহলে আত্মা বলতে যেটা বলা হচ্ছে সেটা কি? বেদান্তের কাছে হাইফার স্পেস কিছুই নয়, বেদান্তের কাছে খুব পরিষ্কার, তিনি ছাড়া কিছুই নেই। মায়ার দরুণ ওটাই আকাশ দেখাচ্ছে, ওই আকাশ যখন চারটে স্টেপে নামছে, ওটাই ফোল্ডিং, ফোল্ডিং মানে কুঁচকে যাওয়াটাই ম্যাটার রূপে দেখাচ্ছে। কিন্তু মাঝখান থেকে এই আমি ব্যাপারটা কোথা দিয়ে ঢুকে যাচ্ছে এটাই রহস্যের। আমরা যত দূর জানি, যতটুকু বুঝি তাতে এই কলম আছে কিন্তু কলমের আমি বোধটা নেই, কিন্তু আমার আমি বোধ আছে। কিন্তু আমরা যেদিক দিয়েই বিশ্লেষণ করতে যাই না কেন, পদার্থের দিক থেকে আলোচনা করতে যাই তখন এগুলো কিছুই না, আকাশ তত্ত্ব দিয়ে বিশ্লেষণ করতে যাই তাহলেও কিছুই না আর এই হাইফার স্পেস দিয়ে বিশ্লেষণ করতে গেলেও কিছুই না, অথচ আমি আপনি সবাই মনে করছি আমি একজন সাংঘাতিক লোক। আমাদের অহংকারের এমন জোর যে কাউকেই কেয়ার করা খুব আমাদের পক্ষে খুব মুশকিল হয়ে যায়। কোথা দিয়ে যে এই আমিটা ঢুকে যায় আজও রহস্য। ঢুকে যাওয়ার পর মনে হয় আমিই সব কিছু করছি, জগৎ আমার ইচ্ছাতেই চলছে।

সাধকদের এই আমিটা পাল্টে যায়। যা কিছু খেলা চলছে, মনের যে খেলা, বুদ্ধির যে খেলা এটাও তাঁর ইচ্ছাতেই হচ্ছে। সাধক এটা বোধে বোধ করে বলছেন না, এটাই তাঁর বিশ্বাস। দ্বিতীয় ধাপে গিয়ে সাধক দেখেন আরে তাই তো! তিনিই তো শুধু আছেন। ঠাকুর এরপর একটা খুব unusual শব্দ ব্যবহার করছেন, যে শব্দটি শাস্ত্রের কোথাও কোথাও পাওয়া যায়, বলছেন সিদ্ধের সিদ্ধ। সিদ্ধ মানেই তো ঈশ্বর দর্শন হয়ে গেছে, কিন্তু ঠাকুর বলছেন সিদ্ধের সিদ্ধ। ঠাকুর এই সিদ্ধের সিদ্ধ শব্দটা কোথায় পেলেন? এটা কি বৈষ্ণবদের কোন শব্দ, নাকি অন্য কোন সম্প্রদায়ের সাধুদের কাছ থেকে শুনেছেন, আমাদের জানা নেই। কারণ আমাদের পরম্পরার যে শাস্ত্র তাতে এই শব্দ কোথাও আসে না, তবে ভাগবতাদির মত গ্রন্থের কোথাও কোথাও থাকতে পারে। কিন্তু ভাগবতাদির যত ক্লাশ হয়, পাঠ হয় সেখানে এই রকম সিদ্ধের সিদ্ধ শব্দ আমরা আজ পর্যন্ত শুনিনি। সিদ্ধের সিদ্ধ এই ব্যাপারে ঠাকুর বলছেন, যিনি সিদ্ধের সিদ্ধ তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ আলাপ করেন। কথামৃতে বেশ কয়েকবার ঠাকুর বলছেন তিনি কথা কন। ঠাকুর আবার বলছেন ধারণা করে কি হবে, তাঁকে সাক্ষাৎ দর্শন করতে হবে। দর্শনের কথা বলার পর থেকে আবার ঠাকুর বলছেন শুধু দর্শন নয় তাঁর সাথে আলাপ করতে হয়। মানুষ ঠাকুরের এই কথাকে কত গভীর ভাবে গ্রহণ করবেন, কত গভীর ভাবে চিন্তা করবেন আমাদের ধারণা নেই, কিন্তু ঠাকুরে এই কথা যে কত উচ্চমানের কথা আমাদের ধারণার বাইরে।

ঈশ্বর দর্শন, জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর দর্শন, এই ধরণের কথা কতবার শুনে এসেছি। এখানে আবার বলতে হচ্ছে যে, ম্যাজিকের মত ঠাকুর বা শ্রীকৃষ্ণ এসে আমার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে গেলেন, ঈশ্বর দর্শন মানে তা নয়। শ্রীমা বলে গেছেন ছায়া কায়া সমান, অর্থাৎ ঠাকুরের মুর্তি আর ঠাকুর এক। বেলুড় মঠের মন্দিরে স্বামীজী ঠাকুরকে বসিয়ে গেছেন, ঠাকুরও স্বামীজীকে বলে গেছেন তুই আমাকে যেখানে মাথায় করে বসাবি আমি সেখানেই থাকব। মন্দিরে গিয়ে দুবেলা ঠাকুরের দর্শন এমনিতেই হচ্ছে, তাতে আমার কী হল! আসলে তা নয়, ঈশ্বর দর্শন মানে বোধে বোধ করা, তিনি যে চৈতন্যময় সেই চৈতন্যময়কে তিনি অবশ্যই চোখ

বন্ধ করেই বোধ করেন। শ্রীমা বলছেন, এই চোখ দিয়ে কজন তাঁকে দেখেছে, এক নরেন দেখেছে! তার মানে নরেন হলেন সিদ্ধের সিদ্ধ। শ্রীমা এই কথা অনেক আগে বলেছিলেন, সেইজন্য ঠাকুরের অন্যান্য পার্ষদ সন্তানরা ছিলেন তাঁদের কথা উল্লেখ করছেন না। এর উপর আরেকটি মজার আলোচনা আছে। স্বামী তুরিয়ানন্দজীকে স্বামীজী বিদেশে যাওয়ার জন্য বলছেন, কিন্তু তুরিয়ানন্দজী বিদেশে যেতে চাইছেন না। তখন স্বামীজী তুরিয়ানন্দজী মহারাজকে বলছেন 'এটা মা কালীর আদেশ'। হরি মহারাজ তখন উপহাস করে বলছেন 'এটা মা কালীর কথা নাকি তোমার নিজের কথা'? স্বামীজী খুব মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে বলছেন 'না! এটা মা কালীর কথা। তিনি সাক্ষাৎ বলেন'। স্বামীজী ঠিক এইভাবে বলছেন 'তিনি সাক্ষাৎ বলেন'। কি অদ্ভূত ব্যাপার! ঠাকুরও ঠিক এইভাবেই বলছেন 'তিনি সাক্ষাৎ কথা কন'। হরি মহারাজ জীবনমুক্ত পুরুষ, তিনি সিদ্ধ পুরুষ, অত্যন্ত উচ্চমানের সন্ন্যাসী এই ব্যাপারে কারুর কোন সন্দেহ নেই, আবার ঠাকুরের সাক্ষাৎ সন্তান। অথচ তিনিও কিন্তু স্বামীজীর কথায় সন্দেহ করছেন। ঠাকুর যখন মা কালীর সঙ্গে কথা বলছেন তখন সেটাকে হরি মহারাজ কখনই সন্দেহ করছেন না, কিন্তু নরেন যখন বলছেন এটা মায়ের আদেশ, মা বলছেন, তখন হরি মহারাজের সন্দেহ হচ্ছে, বলছেন 'মায়ের কথা না তোমার কথা'? স্বামীজী জোর গলাতে বলছেন 'না! মা আদেশ করেন, মা সাক্ষাৎ কথা বলেন'। এই সিদ্ধের সিদ্ধ যে থাক এনারই unusal থাক, এনারাই হলেন আসল ঋষি। বেদের যে ঋষিদের কথা আমরা বলছি, এই ঋষিরাই হলেন সিদ্ধের সিদ্ধ থাক।

সিদ্ধের সিদ্ধ থাকের মূল হল আলাপ। যিনি সিদ্ধ তিনি বোধে বোধ করে নিয়েছেন, তাঁর সব কিছুই পাল্টে যাবে, মুক্তিও হয়ে যাবে কারণ তাঁর ঈশ্বরের জ্ঞান হয়ে গেছে। কিন্তু একটা বিশেষ অবস্থা বাকি থেকে যাচ্ছে, সিদ্ধের সিদ্ধ সেটা কিন্তু আলাদা একটা অবস্থা। এই অবস্থা মুষ্টিমেয় কয়েকজন সিদ্ধের জন্য। সিদ্ধের সিদ্ধরাই জগৎগুরু হন। ঠাকুর বলছেন যাঁরা সিদ্ধের সিদ্ধ তাঁদের অনেক রকমের ভাব থাকে, কখন বাৎসল্য ভাব, কখন সখ্য ভাব, কখন মধুর ভাব ইত্যাদি। এই কথা বলার পর বলছেন তাঁর ভাবকে ইতি করা যায় না, তারও বাড়া তারও বাড়া আছে। অন্য এক জায়গায় তিনি পাখির উপমা দিয়ে বলছেন, অনন্ত আকাশে পাখি উড়ে যাচ্ছে, তার ওড়ারও শেষ নেই পথেরও শেষ নেই। তার মানে ভক্তের সাথে ঈশ্বরের যে কত ভাবে সম্পর্ক হতে পারে তার ইতি করা যাবে না। ঈশ্বর কি সখা? ঈশ্বর কি স্বামী? ঈশ্বর কি প্রভু? ঈশ্বর কি বন্ধু? ঈশ্বর কি স্ত্রী? ঈশ্বর কি সন্তান? ঈশ্বর সবটাই, যে কোন ভাব নিয়ে তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক করা যায়। যতটা ঈশ্বরকে আমরা ভেবে নিতে পারব, তিনি তারও বাইরে থাকবেন। আরেকজন যিনি সিদ্ধের সিদ্ধ আসবেন তিনি ঈশ্বরকে আবার অন্য ভাব নিয়ে দেখবেন। বেদের ঋষিরা ঈশ্বরকে ঠিক এভাবেই দেখেছেন। তার ভেতর থেকে কয়েকটি মন্ত্রকে বেছে নিয়ে আমরা দেখব তাঁরা সেই ঈশ্বরকে বা ঈশ্বরীয় সত্তাকে কিভাবে দেখেছেন। সিদ্ধের সিদ্ধ পুরুষরা যে ভাবগুলিকে রেখে গেছেন, সাধকরা যখন সাধনার রাজ্যে প্রবেশ করেন তখন তাঁরা ওই ভাবেরই কোন একটা ভাবকে অবলম্বন করে নেন। ঠাকুরের যেমন সন্তান ভাব ছিল, যারা ঠাকুরের ভক্ত তারাও চেষ্টা করে সন্তান ভাবকে অবলম্বন করতে। কিন্তু কেউ যদি বলে আমি অন্য ভাব অবলম্বন করে সাধনা করতে চাই, তাতে কোন দোষ নেই। কিন্তু যখন ধর্মের মধ্যে থাকবে তখন কিন্তু এই জিনিস চলবে না। কারণ ঠাকুরের যেটা ছিল সেটা ছিল আধ্যাত্মিকতা। আমরা যা কিছু করব সেটাই হয়ে যাবে ধর্ম। ধর্ম হলেই তখন ঠাকুর যেটা করেছিলেন সেই ছাঁচে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা। ঠাকুর বলছেন কোন একটা ভাব অবলম্বন কর। আমরাও তখন কোন একটা ভাব অবলম্বন করে এগোবার চেষ্টা করছি। কিন্তু সিদ্ধের সিদ্ধ যিনি তাঁর ওটা কোন আর ভাব থাকে না। এখন আমরা প্রবর্তককে আর নিয়ে আসছি না, কিন্তু যিনি সাধক তিনি একটা ভাব অবলম্বন করে নিচ্ছেন, ওই ভাবটাই কোন একজন সিদ্ধের সিদ্ধ অবলম্বন করে গেছেন। ওই ভাবকে অবলম্বন করে যদি কেউ সাধনা করেন তিনিও এগোতে থাকবেন। কিন্তু ভাগ্যক্রমে তিনি যদি সিদ্ধ হয়ে যান তাহলে তিনি ওই ভাব নিয়েই সিদ্ধ হবেন। কিন্তু এরপর তিনি যদি সিদ্ধের সিদ্ধ হয়ে যান তাহলে কিন্তু আর ওই ভাব থাকবে না। কারণ তখন তিনি সেই অনন্তের সঙ্গে এক হয়ে যাচ্ছেন, ওই অনন্তের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার পর তাঁর সাথে কী সম্পর্ক চলবে সেটাকে আর ইতি করা যাবে না। সেইজন্য ঠাকুর বলছেন তারও বাড়া তারও বাড়া। সিদ্ধের সিদ্ধ তিনি সবটাই করবেন, এটাও করবেন ওটাও করবেন। অন্য দিকে সাধকের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা উল্টো হয়ে

যায়। ঠাকুর বলছেন, মা পাঁচ রকমের মাছ রান্না করেন, যার পেটে যেমন সয় তিনি তাকে তেমনটি দেন। এটা সাধকদের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে। এখানে সিদ্ধের সিদ্ধ যাঁরা তাঁদের বর্ণনা করা হয়েছে। এই জিনিসটাই বেদের কয়েকটি মন্ত্রকে আলোচনার মাধ্যমে আমরা বুঝতে চেষ্টা করব। বেদের সব মন্ত্রকে নিয়ে এই ক্ষুদ্র পরিসরে আলোচনা করা সম্ভবই নয়। যেভাবে আমরা ব্যাখ্যা করে করে বেদ আলোচনা করছি, এভাবে চললে আমাদের দশ বারো বছরেও বেদ শেষ করা যাবে না।

বেদের ঋষিরা ছিলেন সিদ্ধের সিদ্ধ, শত শত সিদ্ধের সিদ্ধ ঋষিদের উপলব্ধ সত্যকে বেদের মন্ত্রে রাখা হয়েছে। বেদের সব মন্ত্রই তাই সিদ্ধ মন্ত্র। বেদ হল সেই সব মন্ত্রের স্বর্ণ খনি। কয়েক জন্মেও আমরা বেদের সব মন্ত্র পড়ে অনুধাবন করতে পারব না। কয়েকটি খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রচলিত মন্ত্র ও সূক্তমকে বেছে নিয়ে আমরা তার ব্যাখ্যা করতে যাচ্ছি। কয়েকটি মন্ত্র ও সূক্তমে ঠিক ঠিক ভাবে বুঝে নিলে একটা ধারণ হবে বেদ মূলতঃ কি বলতে চাইছে, বেদের দর্শন কি ভাবে এগিয়েছে। প্রথমেই একটি বিখ্যাত শান্তি মন্ত্রকে নিয়ে বলা হচ্ছে –

ওঁ সহ নাববতু। সহ নৌ ভুনক্তু। সহ বীর্যং করবাবহৈ।
তেজস্বি নাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ।।

উপনিষদের গুরু শিষ্যকে পাঠ শুরু করার আগে এক একটি উপনিষদে এক একটি শান্তি মন্ত্র পাঠ করাতেন। একটা মতে বলা হয়, যে কোন উপনিষদের বক্তব্যের সার সেই উপনিষদের শান্তি মন্ত্রে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এর একটি অন্য দিকও আছে, প্রত্যেকটি শান্তি মন্ত্রের যেমন একটা বিশেষ অর্থ থাকে তার সাথে শান্তি মন্ত্রের উচ্চারণেরও একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে। যে কোন কাজ করার পূর্বে যদি প্রার্থনা করা হয় তখন সেই কাজ আর কাজের ফল আরও বীর্যতর হয়ে যায়। যে কোন কাজ করার আগে আমরা একটা প্রস্তুতি নিয়ে থাকি, আমরা মনে করছি সব দিক দিয়ে প্রস্তুতি নিয়েই কাজ শুরু করতে যাচ্ছি, কিন্তু প্রত্যেক কাজের মধ্যেই কিছু না কিছু বিঘ্ন লেগে থাকে। কি ধরণের বিঘ্ন হবে, কোথা দিয়ে কিভাবে বিঘ্ন আসবে আমাদের জানা নেই। এই বিঘ্নগুলিকে কাটাবার জন্য প্রার্থনা করা হয়। কিন্তু আমরা হলাম অত্যন্ত আহাম্মক আর মুর্খের দল, আমরা মনে করি প্রার্থনা করলেই সব হয়ে যাবে। সারা বছর পড়াশোনা করে পরীক্ষার কোন প্রস্তুতি নেবে না, ভাবছে প্রার্থনা করলেই ঠাকুর পরীক্ষায় খাতায় ঢেলে নম্বর দিয়ে যাবেন। স্বামীজী তাই বলছেন, তেত্রিশ কোটি দেবী-দেবতাকে যদি বিশ্বাসও কর কিন্তু নিজের প্রতি যদি বিশ্বাস না থাকে তোমার দ্বারা কোন কাজই হবে না। কাজের সব রকম প্রস্তুতি আমাকে নিজের থেকেই নিতে হবে, মন থেকে ঠিক ঠিক প্রার্থনা করলে কাজের পেছনে যে অজানা বিঘ্নগুলি আছে সেগুলো কেটে যায়। কিন্তু কিছুই করব না প্রার্থনা করে যাব, এতে কিছুই হবে না। এই মন্ত্রটি বেশির ভাগ উপনিষদে শান্তি মন্ত্র রূপে পাঠ করা হয়ে থাকে। গুরু শিষ্য দুজন একত্রেই এই মন্ত্রের পাঠ করেন। কিছু কিছু মন্ত্র আছে যা গৃহস্থরাই শুধু পাঠ করে, আবার কিছু কিছু মন্ত্র শুধু সন্ন্যাসীরাই পাঠ করেন। এই মন্ত্র সেই অর্থে খুবই ব্যাতিক্রম এই কারণে যে, গুরু শিষ্য দুজন একসাথে প্রার্থনা করছেন। সায়নাচার্য যেভাবে মন্ত্রের অর্থ করেছেন সেই অর্থ অনুসারে এই মন্ত্রের আলোচনা করা হচ্ছে।

সহ নাববতু, শিষ্যের কাছে কোন বিষয়বস্তুকে নিয়ে আলোচনা শুরু করার আগে গুরু আর শিষ্য দুজনে মিলে প্রার্থনা করে নিচ্ছেন, আমাদের পরস্পরের আনুকুল্য যেন সিদ্ধ হয়। এখানে একবারও বলা হচ্ছে না যে, গুরু শ্রেষ্ঠ আর শিষ্য নিকৃষ্ট। যে কোন বিদ্যা চর্চাতে যে শুধু শিষ্যরই মঙ্গল হয় তা নয়, বিদ্যা চর্চাতে গুরুরও মঙ্গল হয়। তাহলে নরেনকে যখন শ্রীরামকৃষ্ণ শিক্ষা দিতেন তখন কি শ্রীরামকৃষ্ণেরও মঙ্গল হত? না, কারণ শ্রীরামকৃষ্ণ আচার্য নন, তিনি হলেন অবতার। আচার্য আর অবতারকে এক করা যায় না, দুজনের মধ্যে তফাৎ আছে। কিন্তু আচার্য যখন শিষ্যদের উপনিষদ বা গীতার ব্যাখ্যা করছেন তখন তাঁরও মঙ্গল হচ্ছে। গীতায় ভগবান বলছেন, গীতার আলোচনা করা, গীতার ব্যাখ্যা করাটাও সিদ্ধির একটা উপায়। তবে আচার্যের সিদ্ধি একটু অন্য ধরণের হয় আর শিষ্যের সিদ্ধিটাও অন্য ধরণের হয়। প্রার্থনা করা হচ্ছে পরস্পরের আনুকুল্য যেন সিদ্ধ হয়। আনুকুল্যের বিপরীত হয় প্রাতিকুল্য, এই প্রাতিকুল্যের প্রভাব যেন না আসতে পারে।

বেদের যে কোন মন্ত্র পাঠ করার সময় ওঁ দিয়ে শুরু করা হয়। ওঁ এর ব্যাখ্যা আমরা পরে পরে করতে থাকব। খুব সংক্ষেপে ওঁ এর অর্থ হল, পরমার্থ সত্তা যাঁকে আমরা ঈশ্বর বলছি তাঁর বাচক ওঁ। বাচক মানে যে ইঙ্গিত করে। নাম আর বাচক দুটো আলাদা জিনিস। আপনার নাম আনন্দ, আনন্দ নামের কেউ বলতে আপনার দিকে আঙুল দিয়ে দেখাবে এই লোকটি আনন্দ। যখন ব্রহ্ম বলা হচ্ছে তখন ব্রহ্ম তাঁর নাম নয়। ব্রহ্ম তাঁর বাচক, তাঁকে আঙুল দিয়ে ইশারা করা হচ্ছে। নাম বলা মানে এটা আর বাচক নয়, মানে ওটাই। বাচককে দূর থেকে ইশারা করে দেওয়া হল, এরপর বাকিটা তুমি নিজে বুঝে নাও। লোকেরা ব্রহ্মকে ভুল করে যাতে নাম মনে না করে সেইজন্য ব্রহ্মকে ওঁ দিয়ে বলা হয়। ব্রহ্ম যেমন কোন নাম নয় ঠিক তেমনি কালী, কৃষ্ণ, দুর্গা এগুলোও বাচক। ঠিক তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণ যিনি ব্যক্তি তিনি কি করে ভগবান হবেন! শ্রীরামকৃষ্ণও তাই ঈশ্বরের বাচক। নাম আর বাচকের এই তত্ত্ব না বুঝলে অবতার তত্ত্বও কখনই বোঝা যাবে না। ওঁ হল ব্রহ্মের বা ঈশ্বরের বা যে কোন শুভ জিনিসের বাচক। বেদের সব মন্ত্রই ওঁ দিয়েই শুরু হয়।

সহনাববতু, *নৌ* আর *অবতু* সন্ধি করলে *নাববতু* হয়ে যায়। *নৌ* মানে আমাদের উভয়কে, *সহ নৌ অবতু*, আমাদের দুজনকে রক্ষা করুন। এখানে কোন ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা হচ্ছে না। তবে যিনি ঈশ্বর তিনিই সচ্চিদানন্দ। যদিও কারুর নাম করে বলা হচ্ছে না, কিন্তু সহজেই বোঝা যায় যে ব্রহ্মের কাছে প্রার্থনা করা হচ্ছে। বেদের সময় ঈশ্বর বা ঈশ্বরের অবতারের কোন ধারণা ছিল না। ওনাদের কাছে ছিলেন ব্রহ্ম, ব্রহ্ম বলতে অন্তর্যামী, আমাদের ভেতরে চৈতন্য রূপে যিনি আছেন তিনিই অন্তর্যামী। ভেতরে যিনি চৈতন্য আর বাইরে সর্বব্যাপী যিনি চৈতন্য দুটো এক। যিনি আত্মা তিনিই পূর্ণব্রহ্ম। ব্রহ্মের কাছেই কেন প্রার্থনা করা হচ্ছে? আমাদের যে কোন দর্শন বা শাস্ত্রে দুটি সত্তার কথা বলা হয়, চৈতন্য সত্তা আর জড় সত্তা। ঋষিরা বলেন চৈতন্য সত্তাই জড় সত্তাকে চালিত করে। কিন্তু আমাদের এতই দুর্ভাগ্য যে আমরা সব সময় নিজেদের জড় সত্তার সাথে জুড়ে রেখেছি। শ্রীরামকৃষ্ণ যখন বলছেন, মায়ের ইচ্ছাতেই সব হয়, তখন তিনি আসলে বলতে চাইছেন চৈতন্যের ইচ্ছাতেই সব হয়। আমাদের কাছে জড়ের সত্তাটাই সত্য বলে মনে হয়, চৈতন্য সত্তা সম্বন্ধে আমাদের কোন ধারণাই নেই। ধ্যান করা মানে জড় সত্তা থেকে আস্তে আস্তে সরে এসে চৈতন্য সত্তায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া। আমরা যদি দিনের পর দিন এভাবে প্রার্থনা করে যাই, পুনরাবৃত্তি করতে থাকি, অনুশীলনের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে একটা স্তরে গিয়ে একদিন দেখা যাবে আমরা জড় সত্তা থেকে চৈতন্য সত্তায় চলে গেছি। এখানে এই যে প্রার্থনা করা হচ্ছে, এখানেও নিজেকে জড় সত্তা থেকে সরে চৈতন্য সত্তার কাছে প্রার্থনা করা হচ্ছে। কারণ আসল শক্তি সব সময় চৈতন্য সত্তার কাছেই থাকে। আমরা সাধারণ মানুষ অত কিছু বুঝি না, আমরা বুঝি বল, বুদ্ধি আর ভরসা। কিন্তু বল, বুদ্ধি, ভরসা কোনটাই কাজে দেয় না, কাজে দেয় একমাত্র চৈতন্য সত্তা। স্বামীজী বলছেন তোমার মধ্যেই অনন্ত শক্তি, তোমার মধ্যেই অনন্ত জ্ঞান। স্বামীজীর এই কথাকে কি আমরা শুধু positive thinking বলে লেকচার দিয়ে যাব! স্বামীজী একটা সত্যকে বলে দিচ্ছেন – তোমার বাস্তবিকতা হল তুমি শুদ্ধ আত্মা। যিনি শুদ্ধ আত্মা তিনিই পূর্ণব্রহ্ম। পূর্ণব্রহ্ম আছেন বলেই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চলছে। তার মানে পুরো বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের শক্তি ব্রহ্মে, আর তুমি সেই পূর্ণব্রহ্ম, তাই তোমার মধ্যেই অনন্ত শক্তি রয়েছে। জ্ঞান মানে চিৎ, সচ্চিদানন্দের চিৎ মানে চৈতন্য, সেই চৈতন্যই ব্রহ্ম, সেই চৈতন্যই আত্মা আর তোমার আসল সত্য যেটা সেটাই আত্মা, তাই তোমার মধ্যেই পূর্ণ জ্ঞান বিদ্যমান। কিন্তু আমরা সবাই এই শুদ্ধ আত্মার সঙ্গে না জুড়ে আমাদের মনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে আছি, মন নিজে জড় তাই তার ক্ষমতাও সীমিত যার ফলে আমি নিজেকে দুর্বল মনে করছি, মনের সঙ্গে নিজেকে জুড়ে রাখার জন্য ভেতরের জ্ঞান বাইরে প্রকাশিত হতে পারছে না। চৈতন্য সত্তার উপর থেকে আবরণ যত সরাতে থাকবে তত জ্ঞানরাশি প্রকাশ পেতে থাকবে।

এখানে বাক্ শক্তি বা মনের শক্তির কাছে প্রার্থনা করা হচ্ছে না, প্রার্থনা করা হচ্ছে সেই চৈতন্য শক্তির কাছে, তিনি যেন *অবতু*, আমাদের রক্ষা করেন। গুরু চৈতন্য ও জড় সত্তাকে জানেন কিন্তু শিষ্য জানে না, প্রার্থনার দ্বারা গুরু চৈতন্য সত্তাকে শিষ্যের মধ্যে উন্মুলিত করার জন্য নিয়মিত অনুশীলন করিয়ে যাচ্ছেন। এইভাবে প্রার্থনা করতে করতে একদিন শিষ্যের মধ্যে একটা ধারণা হয়ে যাওয়ার পর সে সাধনার পথে নেমে ধ্যান-ধারণা করতে শুরু করে দেবে। তারপর একদিন এই সত্যটা শিষ্যের মধ্যে উদ্ভাসিত হয়ে যাবে। যিনি

গুরু তিনি ব্রহ্মজ্ঞানী হতে পারেন আবার ব্রহ্মজ্ঞানী নাও হতে পারেন। ব্রহ্মজ্ঞানী যদি হয়ে থাকেন তাহলে তিনি বুঝেই প্রার্থনা করছেন। মানুষ শেষ পর্যন্ত নিজেকেই প্রার্থনা করে। কর্পোরেট ওয়ার্ল্ডে একটি ইয়ং ইঞ্জিনিয়ার যখন তার বসকে গুডমর্নিং বলছে তখন সে নিজেকেই গুডমর্নিং বলছে। কারণ, তার নিজের একাত্মতা চাকরির সাথে, প্রমোশনের সাথে আরে টাকার সাথে, তার মুর্তরূপ হল কোম্পানির বস্। কাল চাকরি ছেড়ে দিলে বসকে আর গুডমর্নিং করতে যাবে না। যার সাথে আমরা নিজেদের জুড়ে রাখি তাকেই আমরা শ্রদ্ধা জানাই। সেখানেই আমাদের শ্রদ্ধা যেখানে আমি নিজে আছি। যেখানে আমি নেই, সেখানে আর শ্রদ্ধা হয় না। ব্রহ্মজ্ঞানী নিজেই জানেন আমিই সব কিছুতে আছি, তাই নিজেকেই তিনি প্রার্থনা করছেন এটা যেন ঠিক থাকে। তবে সচারচর দেখা যায় ব্রহ্মজ্ঞানীরা এই ধরণের আচার্যের কাজ করেন না। যদি করেও থাকেন তাতে কোন দোষ নেই। যাঁরা ব্রহ্মজ্ঞানী নন কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানের নিষ্ঠাতে প্রতিষ্ঠিত, তাঁরা নিশ্চয়ই প্রার্থনা করবেন। তবে প্রার্থনার ব্যাপারে গুরুর ধারণা আর শিষ্যের ধারণার মধ্যে অনেক তফাৎ থাকবে।

গুরু কে হবেন আর শিষ্য কে হবে, এই ব্যাপারেও ব্যাখ্যা করা হয়। উপনিষদের একটা লক্ষ্য, মুক্তি। মুক্তি মানে, শরীর, মন, ইন্দ্রিয়ের সাথে আমরা নিজেদের জুড়ে রেখেছি, এগুলো থেকে সরে এসে আমাদের যে বাস্তবিক স্বরূপ সেই স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। শিষ্য কে হবে? এই মুক্তি পথের যে পথিক। যে বলছে জগতে আমার কিছুই লাগবে না, আমি মুক্তির পথের পথিক। তখন সে গুরুর কাছে যায়। মুক্তির পথ গুরু ছাড়া কেউ দেখাতে পারেন না। উপনিষদের জ্ঞানকেই মুক্তির পথ বলা হয়। যারা ঠিক ঠিক নিজের ক্ষুদ্র সত্তা থেকে, ঠাকুর যাকে কাঁচা আমি বলছেন, সেই কাঁচা আমি থেকে বেরিয়ে এসে মুক্তির পথে যেতে চাইছে, অর্থাৎ পাকা আমির দিকে যেতে চাইছে, তাকেই ঠিক ঠিক শিষ্য বলা হবে। আর গুরু কে হবেন? শ্রোত্রিয়, খুব উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ হতে হবে, আর তাঁকে যে শুধু বেদের পারঙ্গব হতে হবে তা নয়, বেদের যে অন্তর্নিহিত অর্থ, বেদের আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্থাৎ বেদ আসলে কি বলতে চাইছে এই ব্যাপারে তাঁকে পারঙ্গব হতে হবে। বেদের পণ্ডিত দু রকমের, একজনের বেদ পুরো মুখস্ত, অন্যজন বেদের অর্থটাও জানেন। এখানে আচার্য তিনিই হবেন যিনি বেদের অর্থ, বেদ কি বলতে চাইছে সেটাকে যিনি জানেন। তার সাথে বলা হচ্ছে, বেদের বক্তব্য অপরকে বোঝানোর ক্ষমতা তাঁর মধ্যে থাকতে হবে। অনেকে শাস্ত্রের কথা খুব ভালো জানেন কিন্তু অপরকে বোঝাতে পারেন না, এখান তা হলে চলবে না, নিজের জানা থাকা চাই, তার সাথে অপরকেও বোঝানোর ক্ষমতা থাকা চাই। বেদের অর্থ জানতে হবে, অপরকে বেদের বক্তব্য ভালো করে বুঝিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা থাকতে হবে। এর সাথে আচার্যের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হল তাঁর ব্রহ্মনিষ্ঠা, মানে চব্বিশ ঘন্টা ব্রহ্মের চিন্তনে থাকা, যখন শিষ্যদের পড়াচ্ছেন না, নিজে পড়ছেন না তখনও নিজেকে ব্রহ্মের চিন্তনে মগ্ন রেখেছেন, ধ্যানের গভীরে ডুবে আছেন, কদাচিৎ তিনি বহির্মুখী হবেন না। চৈতন্য মহাপ্রভুও বলছেন ভক্ত কখনই গ্রাম্য কথা শুনবে না আর আলোচনা করবে না। গ্রাম্য কথা মানে, জাগতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করা, কারুর ভালোটাও আলোচনা করবে না, মন্দটাও আলোচনা করবে না। জাগতিক আলোচনায় নেমে যাওয়া মানেই মন বহির্মুখী হয়ে যাওয়া। যিনি আচার্য তিনি কখনই বহির্মুখী হবেন না। এবার ভাবুন যে মানুষটি সারাদিন বেদ পড়িয়ে যাচ্ছেন, নিজে অধ্যয়ন করছেন আর ফাঁকা সময়ে ধ্যানের গভীরে হারিয়ে আছেন, এরপর তিনি কোথায় কিভাবে নিজের পরিবারের খোঁজ নেবেন, কোথা থেকে গরু-বাছুর, জমি-জায়গা সামলাবেন। সেইজন্য আগেকার দিনে বলাই হত, ব্রাহ্মণকে দরিদ্র হতে হবে। শাস্ত্রের এটাই নিয়ম হয়ে আছে। শাস্ত্রই বলে দিচ্ছে যে ব্রাহ্মণের টাকা-পয়সা আছে সেই ব্রাহ্মণকে কখনই বিশ্বাস করা যাবে না। কথামৃতেই ঠাকুর একটা কাহিনীর মধ্যে বলছেন, যে ভাগবত পণ্ডিতের হেলে গরু আছে অমন ভাগবত পণ্ডিতের আমার দরকার নেই। আচার্যের এই কটি গুণাবলী – বেদ জানবেন, বেদের অর্থ জানবেন, বেদের অর্থকে শিষ্যদের বোঝানোর ক্ষমতা থাকবে আর ব্রহ্মনিষ্ঠা, সব সময় ব্রহ্ম চিন্তনে থাকবেন, কোন অবস্থায় মন বহির্মুখী হবে না। শিষ্যের একটাই লক্ষ্য, আমাকে মুক্তি পেতে হবে। এই ধরণের আচার্য আর শিষ্য এই প্রার্থনা করছেন।

কোন জিনিসকে প্রাপ্ত করার পর সেটাকে রক্ষা করাকে বলা হয় ক্ষেম। যোগ আর ক্ষেম, যোগ হল একটা জিনিসকে পাওয়া আর ক্ষেম মানে সেই জিনিসকে ধরে রাখা বা তার রক্ষণা-বেক্ষণ করা। গুরু আর

শিষ্য উভয়ে প্রার্থনা করছেন, আমরা যে বিদ্যাকে নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি সেই বিদ্যাকে যেন আমরা উভয়েই ধরে রাখতে পারি। *সহ নাববতু*, আমরা যে বিদ্যা অর্জন করতে যাচ্ছি সেই বিদ্যা যেন আমাদের রক্ষা করতে থাকে। *সহ নৌ ভুনক্তু, ভুনক্তু* এসেছে ভুক্ ধাতু থেকে, ভুক্ ধাতু খাওয়ার অর্থে বলা হয়, অর্থাৎ রক্ষণ, পোষণ, পালন করার অর্থে বলা হচ্ছে। শিষ্যের মনে এই ভাব, গুরু যেভাবে আলস্য ত্যাগ করে আমাকে জিনিসটা বোঝানোর চেষ্টা করছেন, আমি যেন এটা ঠিক ঠিক বুঝতে পারি। এখানে উপলব্ধি করার কথা বলা হচ্ছে না, জিনিসটাকে ধারণার করার কথা বলছেন। বিদ্যাকে গুরুর কাছ থেকে গ্রহণ করলাম, এবার আমি যেন এই বিদ্যাটা ধারণা করে ধরে রাখতে পারি। মেধার সংজ্ঞাও তাই, *গ্রহণ ধারণ সামর্থম্*। বিদ্যাকে গ্রহণ করার ক্ষমতা থাকা আর গ্রহণ করার পর সেই বিদ্যাকে ধরে রাখার ক্ষমতা, এটাই মেধা। আমরা আজ যে বিদ্যার কথা শুনলাম, শুনে খুব ভালো করে বুঝে নিলাম, কিন্তু দুদিন পর ভুলে যাচ্ছি। তার মানে গ্রহণ ঠিকই হচ্ছে কিন্তু ধারণটা হচ্ছে না। এখানে উভয়েই প্রার্থনা করছেন আমরা যেন বিদ্যাকে ধারণ করে রাখতে পারি। শুধু ধারণ করা রাখছি তাতে হবে না, পরে পরেও যেন এই বিদ্যাটা ঠিক থাকে। একে বলে পালন। গ্রহণ, ধারণ আর পালন এই তিনটে ধাপের কথা বলছেন। বিদ্যাকে গ্রহণ করতে পারা, বিদ্যাকে ধারণ করার ক্ষমতা থাকা আর উত্তরকালে বিদ্যাকে পালন করে যাওয়া, যাতে বিদ্যা দিনে দিনে আরও ফলবতী হতে থাকে। তার জন্য তাঁকে আরও আলোচনা করতে হবে, আরও অনেক কিছু অধ্যয়ন করে যেতে হবে আর এই বিদ্যাতেই যেন থাকতে পারে। এটা কি এমনি এমনি হয়ে যাবে? না, কখনই হবে না। তাই পরেই বলছেন –

সহ বীর্যং করবাবহৈ, আমাদের দুজনের যেন সেই বীর্য লাভ হয়। বীর্যের সংজ্ঞা দিচ্ছেন, নিজের প্রয়োজনকে সিদ্ধ করার সামর্থ, যে কাজে আমি নেমেছি সেই কার্য সিদ্ধির যেন আমার সামর্থ থাকে। যুদ্ধাদি করার জন্য এক ধরণের বীর্যের দরকার, বিদ্যার্জনের জন্য আবার অন্য ধরণের বীর্য দরকার আবার শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য পুরো অন্য ধরণের বীর্যের প্রয়োজন। সেই চৈতন্য সত্তার কাছে, যিনি সবারই রাজা, তাঁর কাছে এই প্রার্থনাই করা হচ্ছে, এই সামর্থটা যেন আমাদের উভয়ের মধ্যে হয়। এই সামর্থ যদি না থাকে শাস্ত্রের অর্থ কোন দিনই গ্রহণ করা যাবে না।

তেজস্বি নাবধীতমস্তু। গ্রন্থের বিদ্যা যতক্ষণ আমাদের কাছে নিজেকে প্রকাশ না করে, আমরা কোন দিন বিদ্যাকে জানতে পারবো না। এই তেজস্বি বাংলার তেজস্বী নয়, বাংলার তেজস্বীতে দীর্ঘইকার কিন্তু এই তেজস্বি হ্রস্বইকার। সায়নাচার্য তেজস্বি শব্দের অর্থ করছে *স্ব অর্থ প্রকাশনম্*। ছোটবেলা থেকে আমরা স্কুলে, বাড়িতে শিক্ষক ও বড়দের কাছে শুনে এসেছি, বই পড়ে যাও, মুখস্ত করতে থাক। কোন বিদ্যাই এভাবে রপ্ত হয় না। বিদ্যা নিজেকে স্বপ্রকাশিত করে দেয়। বিদ্যা নিজেকে উন্মোচন করে যতক্ষণ না দেখিয়ে দেয় ততক্ষণ বিদ্যাকে জানাই যাবে না। বর্ষার মেঘের গর্জনে ময়ূর নৃত্য করতে করতে যতক্ষণ নিজের পেখম মেলে না দেয় ততক্ষণ ময়ূরের পাখার যে কী অপরূপ সৌন্দর্য, ময়ূরের পেখমের বিস্তার যে কত মনোরম হতে পারে আমরা কোন দিন কল্পনাই করতে পারবো না। আমি কঠ, মুণ্ডক, ঈশো সব উপনিষদ মুখস্ত করে নিতে পারি, গুরুর কাছে হাজার বছর ধরে অধ্যয়ন করে যেতে পারি কিন্তু শাস্ত্র যতক্ষণ নিজে কৃপা করে নিজেকে উন্মোচন না করছে ততক্ষণ শিষ্যের কিছুই হবে না, কুয়োর মধ্যে পড়ে থাকা পাথরের মত হয়ে থাকবে। ঠাকুর বলছেন, সাধুর কমণ্ডলু সাধুর সাথে চার ধাম করে আসে তবু সে যেমন তেতো তেমন তেতোই থাকে। অনেক দিন ধরে গ্রন্থের সেবা করে যেতে যেতে একদিন গ্রন্থই প্রসন্ন হয়ে নিজেকে প্রকাশ করে দেয়। এটাকে বলে শাস্ত্র কৃপা। *তেজস্বি নাবধীতমস্তু, তেজস্বি নৌ অধি*, অধি মানে গ্রন্থের ভেতর যে বিদ্যাটা আছে, এই বিদ্যা যেন নিজেকে আমাদের উভয়ের কাছে প্রকাশ করে দেন। কারণ শাস্ত্র কৃপা করে নিজেকে প্রকাশ না করলে কোন দিন বিদ্যার্জন হবে না। শুধু উপনিষদই নয়, যে কোন বিদ্যার্জন শাস্ত্র কৃপা ছাড়া কখনই হবে না। যে কোন বিদ্যা তখনই কৃপা করে যখন প্রচুর নিষ্ঠা নিয়ে শাস্ত্রের সেবা করা হয়।

মা বিদ্বিষাবহৈ, আমাদের পরস্পরের মধ্যে যেন কখন কোন দ্বেষ না হয়, গুরু যেন শিষ্যের প্রতি কোন দ্বেষ না করে আর শিষ্যের মধ্যেও গুরুর প্রতি যেন কোন বিদ্বেষ না থাকে। জগতে সবাই সবাইকে দোষ দেয়। বেদান্ত বলছে, আজ তুমি যা কিছু পাচ্ছ সব তুমি নিজের জন্যই পাচ্ছ। স্বামীজী বলছে, take the blame

on yourself। গান্ধীজী বলছেন – দেশের যে এত সমস্যা এর জন্য দায়ী আমি। দেশে এত দারিদ্রতা, এত রোগ এর জন্য আমিই দায়ী, তাই আমি প্রায়শ্চিত্ত করব। কিভাবে প্রায়শ্চিত্ত করবেন? আমি উপোস করব, আমি এর জন্য শহিদ হয়ে যাব। কারণ আমি যদি এভাবে নিজেকে শুদ্ধ করতে পারি তাহলে দেশটা শুদ্ধ হয়ে যাবে। আমরা তা না করে নিজেরা যে দোষ করছি সেটাও অপরের উপর চাপিয়ে দিচ্ছি। তাই আমার নাম বাড়ি লোক আর কয়েকজন মুষ্টিমেয় বন্ধু-বান্ধবরা ছাড়া কেউ জানে না, আর গান্ধীজীর নাম দেশের প্রত্যেকটি মানুষ জানে। আমাকে যদি কেউ বলে তুমি কিছু জানো না কেন? আমি বলি, গ্রামের স্কুলে পড়শোনা করেছি তখনকার গ্রামের মাস্টারগুলো কিছু জানতো না। তাহলে এপিজে আবদুল কালাম কি করে সব জানলেন? উনিও তো গ্রামের স্কুলে পড়াশোনে করেছিলেন। আমরা নিজেরা কিছু জানতে চাই না, পড়াশোনা করতে চাই না আর আমার অজ্ঞতার জন্য অপরকে দোষ দিচ্ছি, গুরু আমাকে ভালো করে বোঝাতে পারেন না, স্কুলে শিক্ষকরা ফাঁকি মারেন, বাবা-মা আমার জন্য কিছু করল না। গুরুরা আবার শিষ্যদের উপর দোষারোপ করে বলেন, শিষ্যরা আমাকে ভালো করে সেবাযত্ন করে না, ভালো ভাবে আমাকে প্রণাম প্রণামী দেয় না, ইত্যাদি। পরস্পরের প্রতি এই দোষারোপ করা, এই বিদ্বেষ ভাব থাকলে বিদ্যা কী করে অর্জন হবে! তাই বলছেন, *মা বিদ্বিষাবহৈ*, এই বিদ্বেষ ভাব যেন আমাদের কারুর মধ্যে না আসে।

শেষে বলছেন *ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ*। মন্ত্রোচ্চারণের শেষে তিনবার শান্তি বলা হয়। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক আর আধিদৈবিক এই তিনটে থেকে আমাদের সব সমস্যা উৎপন্ন হয়, তিনবার শান্তি বলা মানে এই তিনটেরই যেন শান্তি হয়, এই তিনটে থেকে যেন কোন সমস্যা না তৈরী হয়। তিনবার শান্তি বলাকে সায়নাচার্য এভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন। আমাদের শরীরের একটি নাম অধ্যাত্ম। শরীর থেকে আমাদের অনেক সমস্যা তৈরী হয়, যেমন শারীরিক ব্যাধি হয়ে যাওয়া। হে ঠাকুর! এই বিদ্যার্জন করার সময় আমার যেন শরীরে কোন ব্যাধি না হয়। দেবতারাও অনেক সময় বিঘ্ন সৃষ্টি করেন, ভূমিকম্প হয়ে গেল, বন্যা হয়ে গেল, বিরাট ঝড় এসে গেল এগুলো যেন না হয়। গরমের সময় গরম পড়বে, শীতের সময় ঠাণ্ডা পড়বে, এখানে এই প্রার্থনা করা হচ্ছে না যে গরমের সময় গরম না পড়ে, বলছেন এগুলো থেকে যেন আমার কোন বিঘ্ন না আসে। গ্রীষ্মকালে গরম পড়াটা স্বাভাবিক, কিন্তু এটা যেন বিঘ্ন রূপে না আসে। আর বলছেন আধিভৌতিক, ভূত মানে জীবের কথা বলা হচ্ছে। বৃক্ষের তলায় বসে গুরুর কাছে শিষ্যরা অধ্যয়ন করছে, হঠাৎ সেখানে একটা বিষধর সাপ এসে গেল, একটা বিঘ্ন এসে গেল। বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাসে-ট্রেনে করে ক্লাশে আসছি, দেখছি কিছু লোক রাস্থা বা ট্রেন অবরোধ করেছে। সব কিছু বন্ধ, আমি আর ক্লাশে আসতে পারলাম না। প্রার্থনা করলে কি বাস-ট্রেন অবরোধ হওয়া থেকে আমি কি বাঁচতে পারবো? অবশ্যই বাঁচতে পারবো। স্বামীজী বলছেন, Be establish on your self and the world will organize itself for your help। সব কিছুর মালিক ঈশ্বর, সেই ঈশ্বরের সত্তার সাথে আমার সত্তা যখন এক হয়ে যাবে তখন প্রকৃতিও নিজের নিয়মকে পাল্টে দেবে। কিন্তু তার জন্য নিষ্ঠাও সেই রকম হওয়া চাই। উপনিষদে কিছু কিছু কাহিনী পাই, যেমন সত্যকামকে গুরু বলে দিলেন – এই কটি গরু নিয়ে যাও, এরা যখন হাজার হয়ে যাবে তখন নিয়ে আসবে। সত্যকাম গুরুবাক্য নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতে লাগলেন, একদিন হাজারটা গরু হয়ে গেল আর তিনিও সেখানেই জ্ঞান পেয়ে গেলেন। পূর্ণ জ্ঞানে যিনি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যান তাঁর কথা সারা বিশ্ব শুনতে বাধ্য থাকবে। বিদেশে যাওয়ার আগে স্বামীজী বারাণসী গিয়েছিলেন, সেখানে তিনি বলছেন – Next time I come to this city, before that I will explore the society like a bomb and the society will follow me like a dog। তখন স্বামীজীকে কেউ জানত না, ঠাকুরের মহাসমাধির পর তিনি এক অজ্ঞাত পরিচয় কপর্দক শূন্য সন্ন্যাসীর বেশে ভারতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তিনি বলছেন, আগামীবার যখন আসব তার আগে আমি এই সমাজে বোমার মত ফেটে পড়ব আর এই সমাজ কুকুরের মত আমার পেছনে পেছনে ঘুরবে। আমরা সবাই এখন কুকুরের মত স্বামীজীকে অনুসরণ করে যাচ্ছি। স্বামীজী কি করে এই কথা বলতে পারলেন? সেই চৈতন্যের সত্তায় প্রতিষ্ঠিত হয়েই তিনি বলতে পারলেন। আমরা যদি সেই চৈতন্য সত্তায় প্রতিষ্ঠিত নাও হই, কিন্তু শুধু নিষ্ঠার সঙ্গে সেই চৈতন্য সত্তার কাছে প্রার্থনা করা হয়, আর সত্যি সত্যিই আমি সেই বিদ্যাকে

পেতে চাইছি তাহলে সেই চৈতন্য সত্তাই আমাদের অনেক বিঘ্নকে কাছে আসতে দেবেন না। আমরা যে এখানে বিদ্যা অর্জন করতে আসছি এর পেছনে কোন কামিনী-কাঞ্চনের উদ্দেশ্য নেই, আর বিদ্যা সাধনা হল শ্রেষ্ঠতম সাধনা, সেই বিদ্যার জন্য যখন প্রার্থনা করা হচ্ছে, হে ঠাকুর! তুমি রক্ষা করা, এই বিদ্যার্জনে আমার যেন কোন বিঘ্ন না আসে, তখন পথ অবরোধ, ঝড়-বৃষ্টি যাই হোক ওর ভেতর থেকেই প্রকৃতি একটা পথ বার করে আমাকে এই বিদ্যার্জনের রাস্তাকে পরিষ্কার রাখবে। কামিনী-কাঞ্চন ভোগেয় এই প্রার্থনা কোন কাজ করবে না, তখন প্রকৃতি নিজের নিয়মেই চলতে থাকবে। বিদ্যাচর্চার সময়, সচ্চিদানন্দের চিন্তনের সময় প্রকৃতির নিয়ম-কানুন গুলো পাল্টে যায়, তখন অন্য নিয়মে সব চলতে থাকে। এটার জন্যই তিনটে শান্তির কথা বলছেন – বিদ্যা চর্চার সময় আমার শরীরে যেন কোন ব্যাধি না আসে, বিদ্যা চর্চায় দেবতাদের থেকে যেন কোন বিঘ্ন না হয় আর অন্য প্রাণীরা যেন আমাদের এই বিদ্যা চর্চায় কোন প্রতিবন্ধকতা না সৃষ্টি করতে পারে। তাই বলে কি সাপ-বিছা বা হিংস্র প্রাণীরা আক্রমণ করা বন্ধ করে দেবে? আক্রমণ তারা করবে, আক্রমণ না করলে তারাও তো বাঁচতে পারবে না, কিন্তু বিদ্যা অর্জনের সময় তারা কোন উপদ্রব করতে পারবে না। প্রার্থনা করলেই যে কোন রকম বিঘ্ন আসবে না তা নয়, প্রার্থনা করে নেওয়া হল এরপর বাকিটা নিজের চেষ্টাও করে যেতে হবে। গুরু আর শিষ্য দুজনে মিলে যখন অর্থ অনুধাবন করে প্রার্থনা করছেন তখন এই বিদ্যা আরও বীর্যতর হয়। আরেকটি শান্তিমন্ত্রে বলছেন –

ওঁ শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ। শং নো ভবত্বর্যমা। শং ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ। শং নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ। নমো ব্রহ্মণে নমস্তে বায়ো। ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি। ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি। ঋতং বদিষ্যামি। সত্যং বদিষ্যামি। তন্মামবতু। তদ্বক্তারমবতু। অবতু মাম্। অবতু বক্তারাম্।। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।।

ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অর্যমা, বৃহস্পতি সবাই বেদের বিভিন্ন দেবতা। বিষ্ণুও একজন দেবতা, বিষ্ণুকে বলছেন *উরুক্রমঃ*, যিনি বিরাট লম্বা পদক্ষেপণ করেন। বামনাবতারে তিনি এক দুই পাদ দিয়ে তিন লোককে মেপে নিয়েছিলেন। *শং নঃ*, অর্থাৎ এই সব দেবতারা আমাদের কাছে সুখপ্রদ হোন। ব্রহ্মরূপী বায়ুকে নমস্কার, হে প্রত্যক্ষ বায়ু তোমাকেও নমস্কার। তুমিই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম, তোমাকে প্রত্যক্ষ ব্রহ্মরূপে বলব, ঋতস্বরূপে বলব, সত্যস্বরূপে বলব। সেই ব্রহ্ম আমাকে রক্ষা করুন, সেই ব্রহ্ম আমার গুরুকেও রক্ষা করুন, আমাকেও রক্ষা করুন, গুরুকেও রক্ষা করুন। ওঁ শান্তি শান্তি শান্তি। এই শান্তিমন্ত্রও আগের মন্ত্রের মত শিষ্য আর আচার্য দুজন একসাথে মিলে প্রার্থনা করছেন।

ইন্দ্র, মিত্রাদিরা সবাই দেবতা আবার এনারাই এক একটা জিনিসের অভিমানী দেবতা। যে সরস্বতী দেবীর মাটির মুর্তির পূজা করা হয়, আমরা মনে করছি সরস্বতী দেবীর একটা জীবন্ত মুর্তি আছে আর মানুষ যেমন পৃথিবীর একটা জায়গায় বাস করে তেমনি তিনিও স্বর্গের কোথাও থাকেন। সরস্বতী দেবীর উদ্দেশ্যে আমরা যা প্রার্থনা করি সব প্রার্থনা তাঁর কাছে পৌঁছে যায়। তিনিও আমাদের জন্য স্বর্গ থেকে ভালো কিছু করে দেন। আসলে তা নয়, সরস্বতী হলেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যত বিদ্যা আছে সব বিদ্যার মুর্তরূপ। ঠিক তেমনি ইন্দ্রও একটা বিশেষ শক্তির মুর্তরূপ। বেদে দুটো রূপই নিয়ে আসা হয়েছে। একদিকে যেমন বলা হয়েছে অন্তরীক্ষের কোথাও দেবতারা বাস করেন, যদিও বেদ সেই সব দেবতাদের অর্চনার কথা বলছে, কিন্তু ওনাদের অর্চনা সব সময় হয় পরমাত্মার। দেবতাদের দুটো রূপ, একটা হল দেবতারা সব সময় মানুষের থেকে উচ্চ শ্রেণীর হন। আগের জন্মে কেউ হয়ত বিশেষ যজ্ঞ-যাগ করেছেন, কোন বিশেষ সাধনা তপস্যা করেছেন, সেখান থেকে তাঁরা একটা দিব্য সূক্ষ্ম শরীর প্রাপ্ত হয়ে স্বর্গাদিতে বাস করছেন আর আমাদের দেখাশোনা করেন। এনাদেরও সন্তুষ্টির জন্য অনেক কিছু করা হয়। তবে ইদানিং বেদের দেবতাদের অর্চনা করার রেওয়াজ উঠে গেছে। কিন্তু দেবতাদের একটা দ্বিতীয় দিক আছে, সেখানে বলা হয় যিনি ঈশ্বর তিনিই এই সব কিছু হয়েছেন। ঈশ্বরের যে জ্ঞানের রূপ, সেই রূপের প্রতিনিধিত্ব করছেন সরস্বতী দেবী।

এখানে যে যে দেবতাদের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করা হচ্ছে, বেদে এই সব দেবতাদের বর্ণনা আছে। আর প্রত্যেক দেবতাদের নামে কিছু না কিছু সূক্তম্ আছে, যাতে দেবতাদের অর্চনা করা হয়েছে। বেদের সময়

একটা বিচিত্র মত ছিল, যে মতটা এখনও কোন কোন জায়গায় চলে। এই ধরণের মতকে মেনে চলাটা যার যার ব্যাপার। তবে যেখানে আমাদের বুদ্ধি কাজ করে না তখন এগুলোকে মেনেই চলতে হয়। আচার্য শঙ্কর যিনি হিন্দু ধর্মকে একটা মার্গ দিয়েছেন আর ধর্মে যত রকমের জটিলতা হতে পারে সব জটিলতাকে তিনি পরিষ্কার করে সহজ করে দিয়েছেন, উনি বলছেন এই জিনিসগুলো খুব সূক্ষ্ম ব্যাপার, এগুলোকে মন বুদ্ধি দিয়ে জানা যায় না। সেইজন্য আগেকার ঋষিরা যেমনটি বলে দিয়েছেন সেটিকে মেনে নিতে হয়। আমাদের বুদ্ধির দৌড় সীমিত, এই সীমিত বুদ্ধি দিয়ে বিচার করতে গেলে এগুলোকে আমরা গুলিয়ে ফেলব। বুদ্ধি কখন ভালো থাকবে কখন মন্দ থাকবে। আমরা আমাদের বুদ্ধি দিয়ে একটা ধারণা করে নিয়েছি, এরপর একজন বড় বুদ্ধির লোক এসে আমাদের বুদ্ধিকে কাটিয়ে দেবেন। সেইজন্য বুদ্ধির উপর ভরসা করা উচিত হবে না। শুদ্ধ বুদ্ধির মন দিয়ে তাঁরা যেটা দেখেছেন আর সেই অনুসারে যদি কিছু বলে থাকেন, তাতে যদি ভুলও কিছু বলে থাকেন সেটাও আমাদের ভালোর জন্যই বলেছেন। বেদে এমন অনেক কিছু আছে দেখে মনে হবে জিনিসটা ভুল, কিন্তু আমাদের ওটাই করতে হবে। কারণ ঋষিরা বলে গেছেন। বেদের দুটো অঙ্গ, একটা অঙ্গ হল তুমি যজ্ঞ-যাগ করে যাও, দেবতাদের আহুতি দিয়ে যাও আর তার বিনিময় তুমি ধন-ধান্য পাবে। কিছু দিন এভাবে করার পর কিছু লোক বিরক্ত হয়ে বলতে শুরু করল, এগুলো আমার চাই না। তখন ওনারা বেদের দ্বিতীয় অঙ্গ জ্ঞানকাণ্ডে ঢুকে গেলেন। জ্ঞানকাণ্ড মানে যেখানে শুধু উপাসনা করার কথা বলা হচ্ছে, যেখানে আত্মজ্ঞানের দিকে এগোবার কথা বলছেন। কর্মকাণ্ড আর জ্ঞানকাণ্ডের মধ্যে একটা চিরন্তন লড়াই লেগে আছে। এই লড়াই আজকের নয়, বেদের সময় থেকেই এই লড়াই চলে আসছে। যজ্ঞ-যাগ করা হবে, নাকি যজ্ঞ-যাগ না করে সরাসরি জ্ঞানকাণ্ডে চলে যাবে। সাধু সন্ন্যাসীদের সবাই সম্মান করে, কিন্তু নিজের বাড়ি থেকে কেউ যদি সন্ন্যাসী হয়ে যায় তখন বাড়িতে তুলকালাম লেগে যায়। বাবা-মা মঠে নিয়মিত যাতায়াত করছে, সাধুদের প্রণাম করছে, প্রণামী দিচ্ছে। কিন্তু নিজের ছেলে যদি সন্ন্যাসী হয়ে যায় বাবা-মা দুজনেই ভেঙে পড়বে। কারণ গৃহস্থ ধর্ম আর সন্ন্যাস ধর্মের ভেতরে কোথাও একটা খটাখটি লেগে আছে। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের শুরুতেও একই সমস্যা হল, সন্ন্যাসীরা কাজ করবে কি করবে না এই নিয়ে দুটো আলাদা দল তৈরী হয়ে গেল। কথামৃতকারও সন্ন্যাসীদের কাজের বিরোধী ছিলেন, অথচ স্বামীজী কর্ম আর উপাসনাকে সমন্বয় করে গেছেন। উপনিষদের বাণীর যত প্রাধান্য পেতে শুরু করল কর্মকাণ্ডীরা জ্ঞানকাণ্ডীদের তত নিন্দা করতে শুরু করে দিল। কর্মকাণ্ডীদের এই নিন্দা করাটা হাজার বছর ধরে চলেছে। শেষ পর্যন্ত ষষ্ঠ শতাব্দীতে গিয়ে এর মীমাংসা হল, যখন আচার্য শঙ্কর তখনকার দিনের নামকরা কর্মকাণ্ডী কুমারিল ভট্ট, মণ্ডন মিশ্রদের শাস্ত্রার্থে পরাজিত করলেন।

কিন্তু কর্মের ধারা তো শেষ হয়ে যাবে না, সংসারীদের তো থাকতে হবে, সংসারী না থাকলে সন্ন্যাসী আসবে কোত্থেকে! কর্মকাণ্ড মানে যজ্ঞ-যাগ, যজ্ঞ-যাগ মানে দেবতাদের আহুতি দেওয়া। আমি বলে দিলাম আমি আর আহুতি দেব না, সরকারকে যদি কর দেওয়া বন্ধ করে দেন সরকার তাকে ছেড়ে দেবে না। সরকার নানা রকম উৎপীড়ন করতে শুরু করবে। যেমন বাড়ির কেউ সন্ন্যাসী হয়ে গেলে বাড়ির লোকরা উৎপাত শুরু করে দেয়। মা-বাবা কত আশা করে ছেলেকে বড় করেছে, ছেলে বড় হয়ে বাবা-মার সেবা করবে। সেবা করা তো পরে হবে তার আগে বাবা-মা ছেলেকে লুটেপুটে খাবে। পুরাণে একটা নামকরা গল্প আছে, একটা ছেলে জাতিস্মর ছিল সে জন্ম নিয়েই মায়ের দিকে তাকিয়ে হাসছে আর বলছে 'ওই যে বেড়ালটা বসে আছে, ও যদি আমাকে খেয়ে নেয় এক মুহুর্তে আমার খেলা শেষ আর যদি বেঁচে থাকি সারা জীবন তুমি আমাকে লুটতে থাকবে। আমি ভাবছি আমার জন্য কে বেশি বিপজ্জনক, ওই বেড়ালটা নাকি তুমি'। এসব কথা শুনলে আমরা আঁতকে উঠব কিন্তু এটাই বাস্তব। আজকালকার ইয়ং মেয়েদের বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর একটা সন্তান হলেই হঠাৎই মা-বাবার প্রতি তাদের ভক্তি-শ্রদ্ধা বেড়ে যায়। কারণ তার সন্তানকে কে সামলাবে? নিজের সন্তানকে সামলানোর তো ফুসরৎ নেই, সারা জায়গা চষে বেড়াতে হবে। সে চায় মা-বাবা যেন এসে বাচ্চাকে সামলায়। ফোনে কত মিষ্টি মিষ্টি করে বলবে – মা! তুমি কত দিন আসনি। এগুলো কিছু না, চাইছে তুমি এখানে এসে ঝিয়ের কাজ কর। তখন মা-বাবার প্রতি তার ভালোবাসা উথলে পড়ে। মানুষকে ফাঁসানোর অনেক বিদ্যা বুদ্ধি আছে। জগতের যত রকম সম্পর্ক আছে, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কই হোক আর মা-সন্তানের সম্পর্কই হোক সবই এক

অপরকে শোষন করার সম্পর্ক। আমি তোমাকে শোষণ করব, তুমিও সুযোগ পেলে আমাকে শোষণ করবে। যজ্ঞ-যাগ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে দেবতাদের সমস্যা হয়ে গেল, তাঁরা দেখছেন মানুষগুলো ছিটকে জ্ঞানকাণ্ডের দিকে চলে যাচ্ছে। কর্মকাণ্ড ছেড়ে সবাই যদি জ্ঞানকাণ্ডের দিকে চলে যায়, দেবতারা আর কোথা থেকে আহুতি পাবে! যজ্ঞে যে আহুতি দেওয়া হয় সেই আহুতির সার অংশ গ্রহণ করেই দেবতারা বলীয়ান হন। দেবতারা তাই যখনই দেখেন কেউ জ্ঞানকাণ্ডের দিকে চলে যাচ্ছে, আত্মতত্ত্ব অর্থাৎ আত্মার ব্যাপারে কেউ জানতে চাইছে তখনই তাঁরা নানা রকমের বিঘ্ন সৃষ্টি করতে শুরু করে দেবেন। কেউ সন্ন্যাস নিতে গেলেই দেবতারা বিঘ্ন সৃষ্টি করবেন। আপদ-বিপদ তখন আর সাপ বিছে থেকে আসে না, ভূত-প্রেত থেকে বিপদ আসে না, সব বিপদ তখন আসে দেবতাদের থেকে।

আচার্য ও শিষ্য দুজনই উপনিষদ অধ্যয়ন করতে যাচ্ছেন, আত্মতত্ত্ব জানতে চাইছেন, এরমধ্যে কর্মকাণ্ডের অধ্যয়ন করবেন ঠিকই, আসলে তো তাঁরা তত্ত্বটা জানতে চাইছেন। তত্ত্ব জেনে গেলেই দেবতাদের গোলমাল লেগে যাবে, তখন দেবতারা সেখানে অবশ্যই বিঘ্ন সৃষ্টি করবেন। ঠাকুর বলছেন, শব সাধনার সময় কোন প্রেতাত্মা ওই শবের মধ্যে ঢুকে গিয়ে নানা রকম ভয় দেখাতে শুরু করে, কখন মুখটা হাঁ করে উঠবে। সেইজন্য শব সাধনায় চাল ভাজা, ছোল ভাজা রাখতে হয়, শবের মুখে একটু দিয়ে দিলে শান্ত হয়ে যায়, তখন সে নিশ্চিন্তে জপ করতে থাকে। আমাদের কাছে এই সংসার হল শব সাধনার মত, মাঝে মাঝে অশান্তি হলে একটু কিছু দিয়ে দাও। স্ত্রী খুব উৎপাত করছে, একটা ভালো শাড়ি দিয়ে তাকে শান্ত করে দিয়ে আবার সাধনা করতে থাক। স্বামী খুব গোলমাল করছে, একদিন ভালো ভালো রান্না করে খাইয়ে দাও।

দেবতাদেরও ঠিক এইভাবে শান্ত করে দিতে হয়, বলছেন *শং নো মিত্র শং বরুণঃ*। বলছেন, হে মিত্র! হে বরুণ! তোমরা আমাদের প্রতি কৃপাবান হও। দেবতাদের কাছে এই কৃপা প্রার্থনা করছেন না যে, আপনি কৃপা করুন যাতে আমি জ্ঞানী হই, বলছেন আপনারা দয়া করে বিঘ্ন সৃষ্টি করবেন না। সায়নাচার্য বলছেন যজ্ঞাদির সময় এই মন্ত্র পাঠ করা হয় না। কেন করা হয় না? কারণ যজ্ঞাদি তো দেবতাদের জন্যই করা হচ্ছে, সেইজন্য ধরেই নেওয়া হয়েছে দেবতারা কোন বিঘ্ন করবেন না। যজ্ঞে অন্য ধরণের বিঘ্ন হয়, তখন ভূতশুদ্ধি করে ভূত, প্রেত এদের অপসারণ করা হবে। কিন্তু যখন জ্ঞান যজ্ঞ হবে, শাস্ত্র অধ্যয়ন, চিন্তন, ধ্যান হবে তখন এই মন্ত্রের পাঠ করা হবে।

সেই রকম অর্যমা একজন দেবতা, তাঁর কাছেও প্রার্থনা করা হচ্ছে, *শং নো ভবত্বর্যমা*। ইন্দ্রকেও প্রার্থনা করে বলছেন *শং ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ*। সায়নাচার্য আবার বলছেন দেবতারা কর্মকাণ্ডে কখনই বিঘ্ন করবেন না, কিন্তু জ্ঞানকাণ্ডে যে বিঘ্ন করেন সেই বিঘ্নকে সরাসরি দেখা যায় না। যেমন, বিদ্যা অর্জন বা জ্ঞানকাণ্ডে সব থেকে বড় বিঘ্ন হল বিদ্যার প্রতি অরুচি। বিদ্যার প্রতি অরুচির ব্যাপারটা কথামৃতে খুব সুন্দর দেখা যায়। ঠাকুরের কাছে দুজন বন্ধু গেছে। একজন বন্ধু খুব মনযোগ দিয়ে ঠাকুরের কথা শুনে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পর অন্য বন্ধু তাকে ঠেলতে শুরু করেছে – এই! আর কতক্ষণ বসবি, অনেক তো শুনলি। তাতেও বন্ধুর কোন হেলদোল হচ্ছে না দেখে তখন বলছে – তুই তাহলে শুনতে থাক ততক্ষণ আমি নৌকাতে গিয়ে বসছি। অবতারের কথা সেই কথারই কোন প্রভাব এর উপর পড়ছে না, কতটা জড় বুদ্ধি সম্পন্ন হতে পারে ভাবাই যায় না। আর সেখানে অবতার না হয়ে সাধারণ কেউ যদি ঈশ্বরীয় কথার ব্যাখ্যা করে লোকেরা কতক্ষণ শুনবে! কিছুই শুনতে চাইবে না, যদিও শোনে এক কান দিয়ে ঢুকবে আরেক কান দিয়ে বেরিয়ে যাবে।

এই যে বিদ্যার প্রতি অরুচি, এই অরুচি কেন হয়? সায়নাচার্য বলছেন – জন্ম জন্মান্তর ধরে মনের মধ্যে পাপ সঞ্চিত হচ্ছে তো হচ্ছেই। পাপ কর্ম মানে চুরি করা মিথ্যা কথা বলা নয়, সংসারের প্রতি আসক্তিটাই পাপ। ঈশ্বরের প্রতি মন অভিমুখী হওয়াটাই পূণ্য। জন্মজন্মান্তর ধরে ঈশ্বর অভিমুখী না হয়ে সংসারের প্রতি মন দিয়ে দিয়ে পাপের পুটলি এত বড় হয়ে গেছে যে, এরপর আর কি করে বিদ্যার দিকে মন দিতে পারবে! ব্রহ্মবিদ্যার দিকে তো কখনই তাদের রুচি হবে না। মঠ-মিশন থেকে কত লোকই দীক্ষা নিচ্ছে কিন্তু কজন শাস্ত্রের কথা শুনতে চায়, বিদ্যার প্রতি কজনের রুচি আসছে! তাহলে এই পাপ নাশ হবে কি করে?

তখন বলছেন, এই পাপ নাশ হবে যদি যজ্ঞ করা হয়। গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে ভগবান সবটাকেই যজ্ঞ বলছেন, সারাদিন আমরা যা করছি সেটাই যজ্ঞ, নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নিচ্ছি সেটাও যজ্ঞ। কিন্তু সব কাজই যজ্ঞ রূপে করা হবে তখনই যখন প্রত্যেক কাজের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীকে পাল্টে দেব। ওই দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে খাওয়া-দাওয়াটাও যজ্ঞ হয়ে যাবে। এই খাওয়া-দাওয়াই যখন কামনা বাসনা নিয়ে করা হবে তখন তা আর যজ্ঞ রূপে থাকবে না। নিষ্কাম ভাবে যা কিছু করা হয় সেটাই যজ্ঞ হয়ে যায়। যজ্ঞ যখন নিষ্কাম ভাবে করা হয় তখন যজ্ঞের ফল ঈশ্বরের সমর্পণ করে দিচ্ছে। গীতায় এই কথাই ভগবান বার বার বলছেন, হয় নিষ্কাম ভাবে কর আর নয়তো ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধি দিয়ে সব কাজ কর, তখন এটাই তোমার চিত্তশুদ্ধির কারণ হবে। আর সেখান থেকে দ্বিতীয় যেটা হয় তা হল উপাসনা, অর্থাৎ জপ, ধ্যান, তপস্যাদি। তার মানে দুটো জিনিস এক সঙ্গেই চলে। আমরা সবাই কর্মযোগী, কারণ আমাদের এখনও উপনিষদ, গীতা বোঝার মত সেই বুদ্ধি বা নিষ্ঠা কোনটাই তৈরী হয়নি। আমাদের মানসিকতা হল শুধু যজ্ঞ আর উপাসনা করার মানসিকতা। আমাদের মন এখনও অশুদ্ধ, ভেতরে কামিনী-কাঞ্চন গিজগিজ করছে। এই অশুদ্ধ মন নিয়ে আমরা যে পরিস্থিতিতেই থাকি না কেন, সেখান থেকেই যদি আমরা সব কাজকে যজ্ঞ রূপে নিতে থাকি, আর তার সাথে উপাসনা, তা যে কোন উপাসনাই হোক না কেন, জপ-ধ্যান, পূজা অর্চনা যেটাই করা হোক না কেন সেখান থেকেই এই অশুদ্ধ মন শুদ্ধ হতে শুরু হয়। যজ্ঞ আর তপস্যা এই দুটো জিনিস দিয়েই মন শুদ্ধ হয়।

আমরা কি করে বুঝব আমাদের মন শুদ্ধ হয়েছি কিনা? এই ব্যাপারে সায়নাচার্য একেবারে পরিষ্কার, কারণ এনারা কোন দার্শনিক নন যে কোন তত্ত্ব দিচ্ছেন, এনারা হলেন ঋষি। সায়নাচার্য বলছেন, তোমার মন শুদ্ধ হয়েছে কি হয়নি এর একটাই লিঙ্গম্ অর্থাৎ চিহ্ন। কি চিহ্ন? বিষয়বৈরাগ্য। একমাত্র ভোগ বিষয়ের প্রতি বৈরাগ্য দিয়ে বোঝা যায় মন শুদ্ধ হয়েছে কিনা। এই শুদ্ধের পেছনে রয়েছে যজ্ঞ, তপস্যা, উপাসনা, সাধনা। বিষয় হল এই জগৎ, পুরো জগতটাই বিষয়। ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য লেখার সময় আচার্য আরও বিশেষিকরণ করে বলছেন যুস্মদ্ আর অস্মদ্ প্রত্যয় – আমি বোধ আর জগৎ বোধ। যুস্মদ্ বলতে যদিও বোঝায় তুমি কিন্তু যুস্মদ্ জগতকেই বোঝায়। আমি আলাদা আর জগৎ আলাদা, এই আলাদা বোধ সব সময়ই আছে। যেখানেই জগৎ বোধ সেখানে সেটাই বিষয়। জগতের কোন জিনিসের প্রতি আসক্তি মানেই বিষয়ের প্রতি আসক্তি। যদি কেউ যজ্ঞ রূপে সব কিছু করে, এখানে যজ্ঞ বলতে বেদের ঋষিরা যে যজ্ঞের কথা বলেছেন সেই যজ্ঞের কথা বলা হচ্ছে না, গীতাতে কর্ম আর যজ্ঞের যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে সেই যজ্ঞের কথা এখানে বলা হচ্ছে। প্রতিনিয়ত আমরা যা কিছু করছি সবটাই যজ্ঞ, স্নান করছি সেটাও যজ্ঞ, খাচ্ছি সেটাও যজ্ঞ, জামা কাপড় পড়ছি সেটাও যজ্ঞ। আপনি কি করছেন? আমি এখন বস্ত্র পরিধান যজ্ঞ করছি। যজ্ঞ রূপে যখন সব কিছু করা শুরু হয় তখন এই কর্মই আমাদের মনকে পরিষ্কার করতে শুরু করে, আর তার সাথে যদি উপাসনাও করতে থাকে তাহলে বোঝা যাবে যে মনের অশুদ্ধতা এবার মোটামুটি পরিষ্কার হয়ে যাবে। পরিষ্কার হওয়াটা বোঝা যাবে বিষয়ের প্রতি পূর্ণ বৈরাগ্য দিয়ে। বিষয় বলতে পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। জগতের কোন কিছুই নেই যার আরাধণা করবে, সৌন্দর্যের আরাধণা, সঙ্গীতের প্রতি আসক্তি, সাহিত্য, শিল্প, খেলা কোন কিছুর প্রতিই তার দৈহিক স্তর থেকে, মানসিক স্তর থেকে বিন্দুমাত্র অনুরাগ থাকবে না।

সমস্ত জগতের প্রতি বৈরাগ্য আসার পরই কোন কিছুর প্রতি একাগ্র চিত্ত হওয়ার সম্ভবনা তৈরী হয়। একাগ্র চিত্ত না হলে সাধনা কখনই করা যাবে না। এই একাগ্র চিত্ত নিয়ে সে এখন সাধনায় নামতে যাচ্ছে, ভেতরের বিঘ্নগুলিও শান্ত হয়ে গেছে, এবারে সে প্রার্থনা করছে দেবতারা যেন বিঘ্ন সৃষ্টি না করেন। আমাদের শরীরের প্রত্যেকটি অঙ্গে একজন করে অভিমানী দেবতা আছেন। এখানে মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র, বৃহস্পতি আদি দেবতাদের অভিমানী দেবতার রূপে বোঝান হচ্ছে। আমাদের দুই বাহুর যে শক্তি এর অভিমানী দেবতা ইন্দ্র, বুদ্ধি, বাক অর্থাৎ কথার অভিমানী দেবতা বৃহস্পতি। তেমনি বিষ্ণু দেবতা পাদদ্বয়ের অভিমানী দেবতা, তার সাথে তিনি *উরুক্রমঃ*। যাঁকে আমরা দেবতা বলে মনে করছি তিনি আবার আমাদের শরীরের বাস করেন, তিনিই আবার অন্তরীক্ষেও বাস করেন। কিন্তু বিষ্ণু একজন আশ্চর্য দেবতা, যাঁর তিনটে রূপ। বিষ্ণু দেবতা এক রূপে আমাদের শরীরের বাস করছেন, আমাদের পাদদ্বয়ের যে শক্তি এই শক্তি বিষ্ণুরই শক্তি। অন্য দিকে বিষ্ণু

দেবতা ইন্দ্রের একজন সঙ্গী, ইন্দ্র কয়েকজন দেবতাকে একসাথে নিয়ে চলেন, তাঁদের মধ্যে বিষ্ণু একজন। পরমাত্মাকেও আবার বিষ্ণু নামে সম্বোধিত করা হয়। মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র, অর্যমা সবার বাস অন্তরীক্ষে আবার আমাদের শরীরেও বাস করেন, এই দুটো রূপ। যখন সাধনা করতে নামছে বা উপনিষদ অধ্যয়ন করতে যাচ্ছে তখন এই দেবতারা যেন কোন বিঘ্ন সৃষ্টি না করেন। হাতে ব্যাথা হয়ে যেতে পারে, পায়ে ব্যাথা হয়ে যেতে পারে, শরীরে যে কোন ব্যাধি হয়ে যেতে পারে, মন চঞ্চল হয়ে যেতে পারে, এগুলো যেন না হয়।

দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করার পর বলছেন, *নমো ব্রহ্মণে*। এখানে ব্রহ্ম সোপাধিক ব্রহ্ম, সোপাধিক মানে উপাধি সহিত যিনি ব্রহ্ম। কারণ যিনি নির্গুণ নিরাকার, যাঁর কোন উপাধি নেই, সেই নিরুপাধিক ব্রহ্মকে তো আর প্রণাম হয় না। অবতারবাদ আসার পর আমরা শ্রীরামকৃষ্ণকে বা শ্রীরাম বা শ্রীকৃষ্ণকে সোপাধিক ব্রহ্ম রূপে অর্চনা করছি। নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মের অবধারণা করা যায় না। কিন্তু যে ব্রহ্মের উপাধি এসে যায়, যাঁকে আমরা বলছি *সত্যম্ জ্ঞানম্ অনন্তম্*, তাঁকে আমরা আরাধনা করতে পারি। সোপাধিক ব্রহ্মেরও উপাসনা করা খুব কঠিন। কিন্তু অবতারের ধারণা, ঈশ্বরের ধারণা আমাদের কাছে এখন খুব পরিষ্কার ভাবে এসে গেছে, অবতার এবং ঈশ্বরের চিন্তা দিয়েও তাঁকে ধারণা করা যায়। এখানে যে *নমো ব্রহ্মণঃ* বলছেন, বায়ু দেবতা, যিনি অন্তরীক্ষের একজন দেবতা তাঁকে এই ব্রহ্ম রূপে বলছেন, যে বায়ুকে আমরা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস রূপে নিচ্ছি সেই বায়ু দেবতাকে বলছেন, *নমো ব্রহ্মণে নমস্তে বায়ো*, হে বায়ু! তুমি সব থেকে কাছাকাছি যাঁকে আমরা সোপাধিক ব্রহ্ম রূপে আরাধনা করতে পারি। কারণ, আমাদের যিনি অন্তর্যামী রূপে আছেন তাঁকে আমরা প্রার্থনা করতে পারি, কিন্তু তাঁকে দিয়ে কোন ক্রিয়া হবে না। কিছু জিনিসকে বোঝাবার জন্য আমরা যে সব সময় উপমার ব্যবহার করে থাকি, উপমা সর্বদা একদেশীয়, সেইজন্য উপমাকে নিয়ে বেশি টানাটানি করতে নেই। অন্তর্যামীর এই ব্যাপারটা বোঝাবার জন্য আমরা বিদ্যুতের উপমা নিতে পারি, তারের ভেতর দিয়ে হাই ভোল্টেজের বিদ্যুৎ যাচ্ছে, ওই বিদ্যুৎ আমাদের কোন কাজে লাগছে না। কিন্তু মেশিনের মধ্যে যখন এই বিদ্যুৎকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তখন তার কাজ শুরু হয়। অন্তর্যামী যিনি তিনিও কোন কাজে লাগেন না আর কোন কাজে লাগতেও পারবেন না, কারণ তিনি হলেন আলোর মত, আলো কোন কাজ করে না। কিন্তু আলো আছে বলে আমরা অনেক কাজ করতে পারি, বিদ্যুৎ নিজে কোন কাজ করে না, কিন্তু বিদ্যুৎ থাকলে অনেক কাজ হয়। সোপাধিক ব্রহ্ম যে কাজ করছেন বা করাচ্ছেন, এর সব থেকে কাছাকাছি যেটা আমরা দেখি সেটা বায়ুর মাধ্যমে। কথা বলছি, কাজ করছি, শরীরের অঙ্গ সঞ্চালন হচ্ছে, কিসের জন্য? প্রাণ আছে বলে। কেউ মারা গেলে আমরা বলি তার প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেছে। যেখানে গতি বা নড়াচড়া হয় বুঝতে হবে সেখানে প্রাণশক্তি কাজ করছে। বায়ু সব সময় গতিমান, সেইজন্য বায়ু হল প্রাণ। বেদ উপনিষদ প্রাণকে খুব উচ্চস্থান দিয়েছে। কারণ প্রাণন ক্রিয়াই সব থেকে কাছাকাছি বস্তু যেখানে আমরা ঈশ্বরের শক্তির প্রকাশ দেখতে পাই। ঈশ্বরের শক্তির প্রকাশ অন্য জায়গায় এত স্পষ্ট রূপে দেখা যায় না। সেইজন্য যেখানেই শক্তির বিশেষ প্রকাশ বুঝতে হয় ঈশ্বর আছেন। প্রাণন ক্রিয়াতেই আমাদের পুরো শরীর চলছে, শরীরের যেখানে যেখানে প্রাণন ক্রিয়া কমে যাবে সেখানেই নানা রকম রোগের প্রাদুর্ভাব হবে। বায়ুই সব থেকের কাছের যেখানে আমরা সোপাধিক ব্রহ্মের চিন্তন করতে পারি। স্থূল শরীরের সাথে সাথে মন, বুদ্ধি যে কাজ করবে সেখানেও প্রাণ শক্তির দরকার। এই বায়ু, যার দ্বারা আমাদের শরীর চলছে, এখানেই আমাদের অন্তর্যামীর প্রথম অনুভূতি হয়, সেইজন্য বলছেন *নমো ব্রহ্মণে নমস্তে বায়ো*। অন্তর্যামীকে প্রণাম করা যাবে না, কারণ অন্তর্যামীকে বোঝাই যায় না। আমাদের জীবনে যখন দুঃখ-কষ্ট আসে তখন আমরা প্রার্থনা করি, হে ঠাকুর! তুমি রক্ষা কর, তখন এই প্রার্থনা অন্তর্যামীর কাছেই করা হয়। মনে মনে কিছু ভাবছি, তখন সেই অন্তর্যামীর সঙ্গেই আমি কথা বলছি। এই অন্তর্যামীকে আমরা স্থূল চোখে দেখতে পাই না, কিন্তু তাঁর পরিষ্কার রূপ আমরা দেখতে পাই বায়ু রূপে, বায়ু বাইরেও কাজ করছে আবার ভেতরেও কাজ করছে। একটি সদ্যোজাত শিশু এখনও তার শরীরে কোন কিছুই ঠিকমত কাজ করা শুরু করেনি কিন্তু বায়ু তার মধ্যে কাজ করে যাচ্ছে। আবার বৃদ্ধ মানুষ অসুস্থ শরীরে অচেতন হয়ে পড়ে আছে কিন্তু তখনও তার মধ্যে বায়ু কাজ করে চলেছে।

ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি, হে বায়ু! তুমিই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম। একদিকে নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মের কথা বলা হয় অন্য দিকে সোপাধিক ব্রহ্মেরও কথা বলা হয়, কিন্তু বায়ু একেবারে প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম। বায়ুর কার্যকে পরিষ্কার চোখের সামনে দেখা যাচ্ছে। আমরা যেমন বলি বেলুড় মঠে ঠাকুর আছেন। তাহলে কি ঠাকুর বেলুড় মঠেই আবদ্ধ হয়ে আছেন? আর কোথাও কি ঠাকুর নেই? ঠাকুরেরও তিনিটে রূপ, একটা নিরুপাধিক নির্গুণ নিরাকার রূপ, দ্বিতীয় সোপাধিক, যেখানে ঠাকুর সূক্ষ্ম শরীরে আছেন আমাদের ভালো মন্দ সব দেখছেন আর তৃতীয় বেলুড় মঠে তাঁর প্রত্যক্ষ আভাস। ঠাকুরও নিজেই বলছেন, একজন বাবুর বাগানবাড়ি আছে, বাবুকে সব জায়গাতেই পাওয়া যায় কিন্তু বৈঠকখানায় বাবুকে বিশেষ ভাবে পাওয়া যায়। ঠিক তেমনি বেলুড় মঠের মন্দির ঠাকুরের বৈঠকখানা, এখানে বিশেষ ভাবে পাওয়া যায়। বায়ু প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম, এখানে ব্রহ্মকে বেশি কল্পনা করতে হয় না। তাহলে মিত্র, বরুণ, অর্যমা এনারা কি? তাঁরাও ব্রহ্ম, ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ বোধে বায়ুতে বেশি পাওয়া যায়।

এবার বলছেন *ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি*, হে বায়ু! তোমাকে আমি প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম রূপেই বলব। বায়ুর স্তুতি করা হচ্ছে, *ত্বাম্* মানে তোমাকে, তোমাকেই আমি প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম বলব। *ঋতং বদিষ্যামি*, তোমাকে আমি যে কথাগুলো বলছি এগুলো আমি ঋতম্ রূপে বলছি। *ঋতম্* একটা বিরাট গভীর এবং আলাদা আলোচ্য বিষয়। ঋতমের খুব সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সায়নাচার্য বলছেন, যে জিনিসটির যেমনটি ভাব ঠিক ওই ভাব যখন মনে আসে মনের ওই ভাবকে তখন বলছেন *ঋতম্*। আর মনে যেমনটি ভাব এসেছে মুখ দিয়েও ঠিক তেমনটি ভাব প্রকাশ করাকে বলছেন *সত্যম্*। *ঋতম্* আর *সত্যম্* এবং তার আগে *প্রত্যক্ষম্*, বলছেন এই তিনটে পরস্পর সংযুক্ত। *ঋতম্* যা, *সত্যম*ও তাই আর *প্রত্যক্ষম্*ও তাই। তোমাকে প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম বলব, তার মানে অবধারণা তোমাকে প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম রূপেই করব। সোপাধিক ব্রহ্মকে যেমন ভাবে উপাসনা করা হবে উপলব্ধিও ঠিক তেমটিনই হবে। জীবদ্দশায় যে যেভাবে দেবতাদের উপাসনা করবে মৃত্যুর পর তার সেই রকমই উপলব্ধি হবে। যেমন যিনি ঠিক ঠিক ইন্দ্রের উপাসনা করে গেছেন মৃত্যুর পর তিনি ইন্দ্রলোকেই যাবেন। যে যে দেবতার উপাসনা করছে মৃত্যুর পর সে সেই দেবতারই ভাব পায়। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ইন্দ্রের কথা ভেবে যাচ্ছে, মৃত্যুর পর সে ইন্দ্রের ভাবই পাবে। আর যে স্ত্রী-পুত্র সংসারের কথা ভেবে যাচ্ছে, মৃত্যুর পর সে সংসার ভাবকেই প্রাপ্ত করবে। আর যিনি ঠাকুরের নাম করে বলছেন *প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি*, ঠাকুরকে ব্রহ্ম রূপে চিন্তা করে যাচ্ছি তখন তাঁর চিন্তার ধারাটা ঋতম্ হয়ে যাবে, তখন ঠাকুরকেই ব্রহ্ম রূপে, সর্বোপরি দেখছেন। যখন কথাবার্তা বলছেন তখন ওটাই সত্য হয়ে মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসবে, তাই বলছেন *সত্যং বদিষ্যামি*। ঠাকুরকে সোপাধিক ব্রহ্ম রূপে চিন্তন করার পর মৃত্যুর পর তিনি সোপাধিক ব্রহ্মকেই পাবেন।

তারপরেই বলছেন, এই বিবেকের যেন আমাদের অভাব না হয়, অর্থাৎ উপনিষদ অধ্যয়নের সময় ঋতম্, সত্যম্ যেন সব সময় ঠিক থাকে। এখানে কিন্তু বায়ু দেবতা রূপে প্রার্থনা করা হচ্ছে না, প্রার্থনা করা হচ্ছে অন্তর্যামীকে, বায়ু যেন একটা মাধ্যম। শুকদেব যেমন পরীক্ষিৎকে মাধ্যম করে ভাগবতের কথা বলছেন, এখানেও বায়ুকে মাধ্যম করে অন্তর্যামীকে প্রার্থনা করা হচ্ছে। প্রার্থনা করে বলছেন *তন্মাববতু*, হে বায়ু! তুমি আমাদের রক্ষা কর, ব্রহ্মবিদ্যার্জনের সময় আমাদের যেন কোন বিঘ্ন না হয়। *তদ্বক্তারমবতু*, বক্তা যিনি অর্থাৎ যিনি আচার্য তাঁকেও রক্ষা কর। শেষে বলছেন ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক আর আধিভৌতিক এই তিনটে থেকে যেন আমাদের শান্তি হয়। এখানে ব্রহ্মকে দুটো রূপে বলছেন, বায়ু রূপ যে প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম আর যিনি অন্তর্যামী রূপে পরোক্ষ ব্রহ্ম। বায়ুকে চোখে দেখা যাচ্ছে কিন্তু অন্তর্যামীকে চোখে দেখা যাচ্ছে না তাই তিনি পরোক্ষ ব্রহ্ম। কিন্তু তিনিই আসল ব্রহ্ম, যাঁর প্রত্যক্ষ রূপ বায়ু।

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ।
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনুভির্ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ।।
স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পুষা বিশ্বদেবেদাঃ।
স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু।।

এটিও একটি বিখ্যাত শান্তি মন্ত্র। শান্তিপাঠ রূপে এই মন্ত্রকে অনেক জায়গায় পাঠ করা হয়ে থাকে। মন্ত্রে ইন্দ্রাদি দেবতাদের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করা হচ্ছে। তখনকার দিনে সবাইকে অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞাদি করতে হত, আর ব্রহ্মচারীদের কাছে ধর্ম কার্য ছাড়া অন্য কিছু ছিল না। তখন তাঁরা এই প্রার্থনা করছেন, *ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা*, দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করে হচ্ছে, শুভ কল্যাণকর কথা ছাড়া আমরা যেন কর্ণ দিয়ে অন্য কিছু না শ্রবণ করি। দৈনন্দিন জীবনে আমাদের কর্ণ হল যেন একটা ডাস্টবিন্। দুনিয়ার যত আবর্জনা, যত রকম পরনিন্দা, পরচর্চা, লৌকিক কথাবার্তা কানের মধ্যে ঢেলে যাচ্ছি। এই জিনিসকে বন্ধ করতে বলছেন, *ভদ্রং কর্ণেভিঃ*, কান দিয়ে সব সময় যেন ভালো কথা, শুভ কথাই শ্রবণ করতে পারি। এই *ভদ্রং* জিনিসটা কি? শুভকে কিভাবে আমরা ব্যাখ্যা করব? সোজা বলে দিচ্ছেন, শ্রুতি-স্মৃতি বাক্য ছাড়া বাকি যা কিছু বাক্য আছে সবই অভদ্র বা অশুভ বাক্য। মূল বক্তব্য হল, ঈশ্বরীয় কথা বাদে যা কিছু শুনছি, পড়ছি সবই অভদ্রং।

ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ, এই যে আমরা এখন যজ্ঞ করছি এই যজ্ঞের সময় চক্ষু দ্বারা আমাদের যেন সব সময় শুভ কল্যাণকর জিনিসেরই দর্শন হয়। অর্থাৎ, যে জিনিস আমাকে আধ্যত্মিক ভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবে, সেই জিনিসের বাইরে অন্য কোন জিনিস যেন আমার দৃষ্টিতে না পড়ে। পুরোহিত যজ্ঞ করছেন বা পূজা অর্চনা করছেন তখন তাঁর নজর কত প্রণামী পড়ছে, কত ভক্তের সমাগম হয়েছে, এগুলোই অভদ্রং দৃষ্টি। ভদ্রং মানে একমাত্র শুধু ঈশ্বরের ধ্যান, ঈশ্বর ছাড়া আর কোন দিকে দৃষ্টি নেই।

স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভির্ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ, যদিও উপনিষদে সাধারণত দেবতাদের কথা থাকে না, কিন্তু যে উপনিষদে এই মন্ত্রকে শান্তিমন্ত্র রূপে ব্যবহার করা হয় সেই উপনিষদে দেবতাদের কথাও থাকে। যজ্ঞের সময় দেবতাদের স্তুতি করে প্রার্থনা করা হচ্ছে, যজ্ঞ সব সময় দেবতাদের উদ্দেশ্যেই করা হয়। প্রার্থনা করে বলছেন যজ্ঞের সময় *স্থিরৈরঙ্গৈঃ*, আমাদের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি দৃঢ় থাকে। মানুষ এক জায়গায় কখন স্থির ভাবে বেশিক্ষণ বসে থাকতে পারে না, কিছুক্ষণ বসার পড় থেকে পা নাড়তে থাকবে, এদিক-ওদিক তাকাতে থাকবে। যজ্ঞের সময় আমাদের এই জিনিস যেন না হয়। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নড়াচড়া অত্যন্ত অশান্ত মনের লক্ষণ। হরি মহারাজ (স্বামী তুরীয়ানন্দজী) একবার এক মাড়োয়ারির বাড়ি চাঁদা সংগ্রহের জন্য গিয়েছিলেন। হরি মহারাজের সামনে বসে মাড়োয়ারি ভদ্রলোক তার পা নাড়িয়েই যাচ্ছিল। হরি মহারাজ হঠাৎ এমন চেঁচিয়ে বলে উঠলেন ‘পা নাড়া বন্ধ করুন’। এরপর শেঠজী আর চাঁদা দেয়! চাঁদা না নিয়েই হরি মহারাজ সেখান থেকে চলে এলেন। যাঁরা সমাহিত চিত্ত তাঁদের সামনে বসে কেউ পা নাড়ালে সেটাও তাঁরা সহ্য করতে পারেন না। এগুলোই অশান্ত চিত্তের লক্ষণ, তোমার চিত্ত এখনও সমাহিত নয়। *স্থিরৈরঙ্গৈঃ* মানে শরীরের প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একেবারে স্থির। শরীর যতক্ষণ না স্থির হয় মন কখনই স্থির হবে না। মন স্থির না হলে কোন বড় কাজ করা কখনই সম্ভব হবে না। জীবনে আমাদের দুটো কাজকে সব সময় বড় মনে হয়। একটা হল বিদ্যাকরণ আর দ্বিতীয় নিজের প্রাণ দিয়ে দেওয়া। বিদ্যা মানে অধ্যাত্ম বিদ্যা। যোগবিদ্যায় প্রথমেই বলে দেওয়া হয় – যম, নিয়ম, আসন। আসন মানে হাত, পা কোন কিছুই নড়বে না। কিভাবে বসতে হবে? *স্থিরসুখামাসনম্*। দীর্ঘকাল সুখে যে আসনে আপনি বসতে পারবেন সেটাই *স্থিরসুখামাসনম্*। *স্থিরসুখামাসনম্* না হলে যোগ সাধনা কোন দিন হবে না। মিলিটারিতে সৈন্যদের কাজ হল নিজের প্রাণ দিয়ে দেওয়া। এর জন্য প্রথম দিন থেকে লেফট-রাইট করিয়ে করিয়ে এমন প্রশিক্ষণ দিয়ে দেওয়া হয় যে যখন দাঁড়িয়ে থাকবে একটা পাথরের মুর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকবে। শত্রুপক্ষ যখন গুলি চালায় তখন সে পালিয়ে যাওয়ার কথা ভাবতেই পারে না, মন এমন তৈরী হয়ে যায় পালানোর চিন্তা মাথাতেই আসে না। শৃঙ্খলিত শরীর মানেই শৃঙ্খলিত মন, শৃঙ্খলিত মন মানেই শৃঙ্খলিত শরীর, শরীরের কোন অঙ্গ নড়বে না। শরীরের কোন অঙ্গ নড়ছে না কিন্তু তখনও তার মন পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘুরে বেড়াতে পারে আবার নাও ঘুরতে পারে। কিন্তু শরীরের অঙ্গ নড়া মানে নিশ্চিত যে তার মন চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। উপনিষদে তাই প্রথমেই শান্তিমন্ত্রে বলে দিচ্ছে অধ্যাত্ম বিদ্যার্জনে, তপস্যায় অঙ্গ সঞ্চালন, অঙ্গ চপলতা strictly prohibited।

ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ, প্রজাপতি, অনেক সময় ব্রহ্মাকেও প্রজাপতি বলা হয়, তিনি আমাদের সবারই জন্য একটা আয়ু নির্ধারিত করে রেখেছেন, ওই নির্ধারিত আয়ু পর্যন্ত আমরা যেন দেবতাদের উদ্দেশ্যে

যজ্ঞাদি করে আমাদের জীবন ঠিক ঠিক চালাতে পারি। হিন্দুদের কাছে পুরো জীবনটাই একটা যজ্ঞ। আমাদের কাছে সব কাজই যজ্ঞ, খাওয়া-দাওয়া করাটাও যজ্ঞ, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়াটাও যজ্ঞ। এমনকি সন্তানোৎপত্তিও একটি যজ্ঞ। স্মৃতিশাস্ত্রাদিতে গর্ভাধান একটি সংস্কারের মধ্যে গণ্য করা হয়ে থাকে। একটা প্রার্থনা হল আমরা যেন যজ্ঞের দ্বারা জীবন চালনা করতে পারি আর দ্বিতীয় আরেকটি প্রার্থনা হল অপঘাতে আমাদের যেন মৃত্যু না হয়। আসলে মৃত্যুর পর কি আছে আমাদের জানা নেই, কিন্তু এই জীবনের ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত ভাবে জানি। যতটা আয়ু পেয়েছি, এই আয়ুকে ঠিক ভাবে যেন আমরা কাজে লাগাতে পারি। ঠিক ভাবে কাজে লাগানো মানে সব কিছুই যেন যজ্ঞ রূপে সম্পাদন করতে পারি।

স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ, বৃদ্ধশ্রবা মানে, যাঁর কথা বৃদ্ধরাও শুনেছেন অর্থাৎ আগের আগের ঋষিরা, যাঁদের কথা পুরাণেও আসে। পরম্পরা অনুযায়ী বৃদ্ধশ্রবার আরেকটি অর্থ হল ইন্দ্র, ইন্দ্রের এক নাম বৃদ্ধশ্রবা। এখানেও একই অর্থ হয়, ইন্দ্র বৈদিক কালের একজন নামকরা দেবতা, যাঁর কথা আমার বাপ-ঠাকুর্দাও শুনেছেন। অর্থাৎ ইন্দ্র ইদানিং কালের কোন নতুন দেবতা নন। *স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ*, পূষাও একজন দেবতার নাম, তবে পূষার ব্যাপারটা খুব একটা পরিষ্কার নয়, কারণ পূষা দেবতাকে বেশির ভাগ জায়গায় সূর্যের সাথে এক করে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর বলছেন *স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ*, এখানে গরুড়ের উপাসনার কথা বলা হচ্ছে। এই গরুড় আর ভগবান বিষ্ণুর বাহন যে গরুড়, এই দুজন তখনও এক হয়ে যাননি। গরুড় হলেন সমস্ত পক্ষিকুলের রাজা। গরুড় আবার সর্পজাতিদের শত্রু, এর পেছনে আবার একটা লম্বা কাহিনী আছে। এখানে সেই কাহিনীর সাথে কোন সম্পর্ক নেই, গরুর গাড়ির চাকায় একটা লোহার রিং লাগানো থাকে যার ফলে কাঠের চাকাটা ঘর্ষণে নষ্ট হয়ে যায় না, ঠিক সেই ভাবে গরুড় যেন আমাদের রক্ষা করেন। সাপেদের থেকে নয়, এলেমেলো হয়ে যাওয়া থেকে, যেরকম লোহা কাঠের চাকাকে রক্ষা করে। আর বলছেন, *স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু*, বৃহস্পতি, যিনি বিদ্যা ও জ্ঞানের দেবতা তিনি যেন আমাদের মঙ্গল করেন। এই শান্তিপাঠ করলে চোখ দিয়ে, কান দিয়ে আমাদের মধ্যে যে বিদ্যা আসছে সব কিছু সংরক্ষিত হয়ে যাবে।

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।।

যিনি ব্রহ্ম, তিনি হলেন পূর্ণ, তিনি কারণ ব্রহ্ম। কারণ ব্রহ্ম থেকে যে কার্য ব্রহ্ম এসেছে, অর্থাৎ এই যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড রূপে যে সৃষ্টিকে আমরা দেখছি এই সৃষ্টিও সেই ব্রহ্ম থেকেই বেরিয়েছে, তাই এটিও পূর্ণ। *পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং*, কারণ ব্রহ্ম তিনিও পূর্ণ আর তাঁর থেকে যে এই সৃষ্টি বেরিয়েছে সেটাও পূর্ণ। অন্য দিক দিয়েও ব্যাখ্যা করা যায়, যিনি নির্গুণ নিরাকার তিনিও পূর্ণ আবার যিনি সগুণ সাকার তিনিও পূর্ণ। তবে সৃষ্টিকে আমরা যেভাবে দেখি ঋষিরা সেভাবে দেখতেন না, তাঁরা বলতেন কার্য ব্রহ্ম। যিনি অনন্ত তাঁর সবটাই অনন্ত হবে, অনন্তের কখন কোন অংশ হয় না। ভাগবতে বলা হয় অংশাবতার, কলাবতার, কিন্তু এখানে বলছেন, যিনি পূর্ণ তাঁর সবটাই পূর্ণের, পূর্ণের কোন অংশ বা কলা হতে পারে না। সেইজন্য উপনিষদের মন্ত্র অত্যন্ত বলিষ্ঠ, কোথাও অযৌক্তিকতার কিছু পাওয়া যাবে না। কিন্তু পরের দিকে শাস্ত্রে যুক্তি তর্কে অনেক fallacy এসে যায়।

পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে, এই কার্য ব্রহ্মও সেই কারণ ব্রহ্ম থেকেই বেরিয়েছে। পূর্ণ থেকে যেটা বেরিয়ে আসে সেটাও পূর্ণ, অনন্ত থেকে যেটা বেরোবে সেটাও অনন্ত হবে। সৃষ্টি যদিও বলা হচ্ছে, কিন্তু সৃষ্টি মানে কার্য ব্রহ্ম, অব্যক্ত থেকে ব্যক্ত হচ্ছে। যিনি অব্যক্ত তিনি পূর্ণ, যিনি ব্যক্ত তিনিও পূর্ণ। যখন পূর্ণ অব্যক্ত থেকে পূর্ণ অব্যক্ত বেরিয়ে আসছে তখন কি থেকে যাবে? বলছেন, *পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে*, তখনও পূর্ণই থেকে যাবে। ঈশ্বর যখন সৃষ্টি করেন তখন তিনি নিজের ভেতর থেকেই সৃষ্টি করছেন, তার জন্য ঈশ্বরের ওজনে কখন কম পড়বে না। অন্যান্য ধর্মে যে সৃষ্টি তত্ত্বের কথা বলা হয়েছে সেখানে অনেক প্রশ্ন করা হয়। যেমন ভগবান যে সৃষ্টি করছেন, তিনি কোথা থেকে সৃষ্টি করছেন? ঈশ্বর তাঁর বাইরে থেকে কিছু দিয়ে সৃষ্টি করছেন যদি বলা হয়, যেমন কুম্ভকার আর মাটি আলাদা। তাহলে তো ঈশ্বর আর পূর্ণ হলেন না। আর ঈশ্বর যতটুকু আছে সেখান থেকে যতটুকু দিয়ে সৃষ্টি করে বাইরে নিয়ে আসছেন তাহলে ঈশ্বর তো ততটুকু কমে

গেলেন। এই মন্ত্রে সৃষ্টির এই ধরণের তত্ত্বকে নাকচ করে দেওয়া হচ্ছে। তিনি পূর্ণ, এই কার্য ব্রহ্মাণ্ড পূর্ণ, এই পূর্ণকে সেই পূর্ণ থেকে নিয়ে আসা পর যেটা থেকে যায় সেটাও পূর্ণ। এটি একটি অত্যন্ত উচ্চমানের শান্তিমন্ত্র। জগতের কোন কিছুই অংশ বা কলা রূপে নেই, যেটাই আছে সেটাই পূর্ণ। একটা সূক্ষ্ম অনুও পূর্ণ ব্রহ্ম, একটা মানুষও পূর্ণ ব্রহ্ম। সেটাই এখানে বলছেন *পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং*, ওটাও পূর্ণ এটাও পূর্ণ। ওখান থেকে টানতে টানতে নিয়ে আসার পর দেখা যাবে দুটোই পূর্ণ। এগুলো তত্ত্ব রূপে শুনতে গেলে খুবই ভালো লাগে কিন্তু ধারণা করা খুব কঠিন। সাধন-ভজন, জপ-ধ্যান, তপস্যাদি করতে করতে একদিন হঠাৎ পুরো জিনিসটা স্পষ্ট হয়ে যায়।

আলমোড়ার কাছে কাঁকড়িঘাটে স্বামীজী তাঁর গুরুভাইয়ের সাথে তপস্যা করছিলেন। সেখানে স্বামীজী একদিন ধ্যান করছিলেন। ধ্যান থেকে উঠে স্বামীজী তাঁর গুরুভাইকে জড়িয়ে ধরে বলছেন, ভাই! আজ আমি এক নতুন অনুভূতি পেলাম। কি সেই অনুভূতি? Microcosm and macrocosm are built on same plan, অনু আর মহৎ দুটো একই প্ল্যানে নির্মিত, একটা অনুতে যা আছে পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেও তাই আছে। আমরা বাইরে যে জগৎ দেখছি, নক্ষত্রপূঞ্জ আছে, সবাই এক অপরকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে, তাদের মাঝে মাঝে আবার অন্য অনেক কিছু আছে, একটা এ্যাটমে ঠিক এই একই জিনিস আছে। *পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং* হলে Macrocosm যদি অনন্ত হয় তাহলে এ্যাটমও অনন্ত হবে। কিন্তু এ্যাটম কি করে অনন্ত হবে? এ্যাটমকে তো পদার্থ বিজ্ঞানীরা মেপে বলে দিচ্ছেন এই এ্যাটমের এই সাইজ। এটাই নাম রূপের খেলা। যেমনি নাম আর রূপ থেকে ওকে বার করে দেখা হবে তখন দেখবে ওটাও অনন্ত। ওই অনন্তকে দেখাটাই আধ্যাত্মিক সাধনার লক্ষ্য।

সংজ্ঞানা সূক্তম্

সংজ্ঞানা সূক্তমের বিশেষত্ব হল এটি ঋগ্বেদের শেষ সূক্তম্। ঋগ্বেদের প্রথম সূক্তম্ হল অগ্নিসূক্তম্। চারটি বেদের প্রত্যেকটির চারটি করে ভাগ – মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক আর উপনিষদ। বেদের মন্ত্র অংশই ঠিক ঠিক অর্চনার কাজে লাগে। ঋগ্বেদের মন্ত্র অংশের একেবারে শেষে আসে এই সংজ্ঞানা সূক্তম্। ঋগ্বেদকে দশটি মণ্ডলে সাজান হয়েছে, দশম মণ্ডলের শেষে তিনটি মন্ত্রে এই সংজ্ঞানা সূক্তম্ দেওয়া হয়েছে।

সং গচ্ছধ্বং সং বদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্।
দেবা ভাগং যথা পূর্বে সঞ্জানানা উপাসতে।।ঋ- ১০/১৯১/২।।

বেদে যত প্রার্থনা আছে তাতে দেখা যায় কোন একজন ঋষি ধ্যানের গভীরে গিয়ে কোন একটা আধ্যাত্মিক সত্যকে দেখার পর সেই সত্যকে একটি বাক্যে বলে দিলেন। ঋষির মধ্যেই হয়তো কবি প্রতিভা আছে তিনি সেই প্রতিভা দিয়ে তাঁর কোন শিষ্য বা সন্তানকে সেই বাক্যটিকে একটা ছন্দে আবদ্ধ করে বলে দিলেন। ছন্দোবদ্ধ করে দেওয়ার পর সেটাই প্রার্থনার রূপ পেয়ে গেল। এখানে ঋষি ধ্যানের গভীরে দেখছেন সব কিছুতেই যেন একটা ঐকতান থাকে, ঐকতান যদি না থাকে তাহলে সব কিছু এলোমেলো হয়ে যাবে। যজ্ঞে বিভিন্ন ধরণের পুরোহিতরা এসেছেন, ঋষিরা এসেছেন, এই সূক্তমে তাঁদের সবাইকে উদ্দেশ্য করে যেন বলা হচ্ছে তোমরা সবাই একসাথে সম্মিলিত হয়ে এই যজ্ঞের সমাধান কর। অনেকের মনে হতে পারে এখানে যেন কোন নির্দেশিকা দেওয়া হচ্ছে, অথবা মনে হতে পারে এটি যেন একটা কবিতা। যজ্ঞে পুরোহিতদের মধ্যে মতভেদ, মতভেদ থেকে বাক-বিতণ্ডা আর সেখান থেকে মনোমালিন্য হওয়ার সম্ভবনা খুবই প্রবল। আগেকার দিনে গ্রাম দেশে যত ঝগড়া বিবাহ, শ্রাদ্ধ, উপনয়নের সময়ই হত। পাঁচজন একটা বড় কাজে জড়ো হলে পাঁচ রকম মত, পাঁচ রকম কথা উঠবে। তার মধ্যে কেউ বেশি সম্মান পাবে কেউ কম সম্মান পাবে। যজ্ঞের সময় চারজন পুরোহিত এসেছেন, অন্যান্য কাজের জন্য আরও পুরোহিত জড়ো হয়েছেন। কোন কারণে একজন পুরোহিত রেগে গেলেন, তার দক্ষিণা কম হচ্ছে বা তিনি একটা নিয়মে কিছু করতে চাইছেন, অন্যরা তাতে আপত্তি করছে। তখন তিনি রেগেমেগে যজ্ঞ থেকে বেরিয়ে গেলেন। এই ধরণের অনেক রকম গোলমাল লেগেই যেতে পারে। আমরা সবাই চাই জীবন চালাতে গিয়ে যেন কোন ঝগড়া-বিবাদে না পড়তে হয়। সংজ্ঞানা সূক্তম্ পাঠ করলে এই ধরণের অশান্তি হওয়ার সম্ভবনা থেকে আমরা বেঁচে যাব। এমনকি কোন কর্পোরেট সেক্টরেও

এর অর্থ বুঝিয়ে যদি রোজ আবৃত্তি করা হয় তাহলে দেখা যাবে ঝগড়া-বিবাদ, মতের অমিল এগুলো ধীরে ধীরে কেটে যাবে। স্কুলে অশান্তি, হাসপাতালে অশান্তি, অফিসে অশান্তি সর্বত্র অশান্তি লেগেই আছে। এসব কিছুই থাকবে না, সবাইকে বলুন, আমাদের সবাইকে *সং গচ্ছধ্বং সং বদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্* আবৃত্তি করতে হবে। এরপর দিনের পর দিন, মাসের পর মাস আবৃত্তি করে যাচ্ছে, তারপর এর প্রার্থনা শক্তি কাজ করতে শুরু করে দেবে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে পাণ্ডব আর কৌরবদের মধ্যে যে লড়াই এখানেও ঐক্য আর অনৈক্যের লড়াই। পাণ্ডবরা প্রথম দিন থেকে ঐক্যবদ্ধ ভাবে লড়াই চালিয়ে গেল, যুদ্ধের সময় কখনই তাঁদের ঐক্যে কোন ফাটল ধরেনি। অন্য দিকে কৌরবদের মধ্যে সব সময় অনৈক্য লেগেই থাকল, যার জন্য ক্ষমতা বেশি থাকা সত্ত্বেও যুদ্ধে সাফল্য পেল না। এমন পরিস্থিতি হয়ে গেল যে কর্ণ বলেই দিল পিতামহ ভীষ্ম যত দিন সেনাপতি থাকবেন ততদিন আমি যুদ্ধ করব না। পরে আবার শল্য আর কর্ণের মধ্যে ঝগড়া।

আমাদের জীবনের ক্ষেত্রে অনৈক্যের প্রতিক্রিয়া আরও মারাত্মক। অনৈক্যের প্রভাবে অনেক প্রতিভাবান ব্যক্তিত্বও জীবনে কিছুই করতে পারেন না। যদিও এই প্রার্থনা একটা যজ্ঞকে সফল করার জন্য করা হচ্ছে; কিন্তু বেদের কোন প্রার্থনাই শুধু একটা স্তরেই আবদ্ধ থাকে না, এর মধ্যে অনেকগুলো স্তর থাকে। আমাদের জীবনটাই একটা যজ্ঞ, ইন্দ্রিয়গুলি হল পুরোহিত, আর আমরা যদি চাই আমাদের জীবনে সব রকম সাফল্য আসুক তাহলে এই তিনটি মন্ত্র রোজ সকালে যদি পাঠ করা হয় আর দুটো মিনিট যদি চিন্তা করি মন্ত্রে কি বলতে চাইছে আর সারাটা দিন এই ভাব নিয়ে যদি চলি আমাদের জীবন যেন ছন্দহীন না হয়। আমাদের সবারই জীবনে ছন্দের অভাব। আমাদের মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, শরীর সব সময়ই সামঞ্জস্য বিহীন হয়ে চলছে, কোন ঐকতান নেই, জীবনে তাই সাফল্যও আসে না। যাঁদের মধ্যে প্রতিভা আছে তাঁরাও কিছু দিন পরে মুখ থুবড়ে পড়েন, কারণ তাঁদের মধ্যে বাকি যে জিনিসগুলি আছে সেগুলো হারমনিতে নেই। সেইজন্য দেখা যায় স্কুল জীবনে যারা ভালো রেজাল্ট করে বড় হয়ে জীবনে তারা এই সাফল্যটা ধরে রাখতে পারে না। কারণ জীবনে তারা হারমনিকে বজায় রাখতে পারে না। যারা মধ্যম শ্রেণীর হয় তারাই জীবনে সফল হয়। কারণ তাদের জীবনে একটা হারমনি থাকে, যারা খুব প্রতিভাবান হয় তাদের হারমনি থাকে না। একসূত্রে ছন্দে যখন জীবন বাঁধা থাকে তখন সব সময়ই সাফল্য আসবে।

প্রথম মন্ত্রের ভাষ্য দিতে গিয়ে সায়নাচার্য *স্তোতারাঃ* এই শব্দটা যোগ করেছেন। *স্তোতারাঃ* মানে, তোমরা যারা এই যজ্ঞে অংশ নেওয়ার জন্য সমবেত হয়েছ, তোমাদের উদ্দেশ্যে *সং গচ্ছধ্বং সং বদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্* বলা হচ্ছে। তোমরা এই যজ্ঞে যা কিছু করবে একসাথে করবে, যা কিছু বলবে সব একই সুরে একই কথা বলবে, অর্থাৎ স্তোত্র যে পাঠ করা হবে সেটা যেন একসাথে উচ্চারিত হয়। তোমরা এক সঙ্গে থাকবে আর পরস্পর বিরোধী কথা বলবে না। এক রকম কথা বলা যে শুধু যজ্ঞের ক্ষেত্রেই বলা হবে তা নয়, রাজনীতির ক্ষেত্রে, প্রশাসনের কার্য চালাবার সময় সবাই যেন এক রকম কথা বলে। রাজনৈতিক দলের নেতারা যদি পরস্পর বিরোধী কথা বলে, সেই রাজনৈতিক দল কোন দিন দাঁড়াতে পারবে না। প্রশাসনের ক্ষেত্রেও চারজন প্রশাসক যদি চার রকমের কথা বলে সেখানেও প্রশাসন দিশা হীন হয়ে পড়বে। কর্পোরেট জগতেও একটা বিরাট কর্ম যজ্ঞ চলছে। সেখানে যদি একজন বলে এই প্ল্যানে কাজ হবে, আরেকজন বলছে আমার প্ল্যানটাই ঠিক, চারজন চার রকমের প্ল্যান দিচ্ছে, কর্পোরেট জগতও মুখ থুবড়ে পড়বে। আগেরকার দিনেও এই নিয়ে খুব ঝামেলা হত। সেখানে কেউ বলছে আমরা এই শাস্ত্র মানি, এই শাস্ত্র মতে এই ভাবে যজ্ঞ করতে হবে, অন্য আরেকজন বলছে ওটা কোন শাস্ত্রই নয়, আমার কাছে এই শাস্ত্র আছে। এখানে বলছেন, তোমরা সবাই এক সঙ্গে এক মত হয়ে যজ্ঞ কর। নানা মুনির নানা মতে যজ্ঞ সম্পাদনে যেন বিঘ্ন না এসে যায়। *সং বো মনাংসি জানতাম্*, শুধু তাই না, তোমাদের সবারই মন যেন এক হয়। মন মানে, যে কাজটা হতে যাচ্ছে সেই কাজের ব্যাপারটা ভালো করে বোঝা, তোমরা যেটা বুঝবে এই বোঝাটা যেন সবার একই রকম হয়।

দেবা ভাগং যথা পূর্বে সঞ্জানানা উপাসতে, আগেকার দিনে যজ্ঞে দেবতারা যখন উপস্থিত হয়ে যজ্ঞের ভাগ গ্রহণ করতেন তখন তাঁদের মধ্যেও যজ্ঞের ভাগ নিয়ে কোন রকম মনোমালিন্য ও বাগ-বিতণ্ডা হত না। ঠিক তেমনি তোমাদের যখন দক্ষিণা প্রদান করা হবে তখন সেই নিয়ে কোন রকম বাগ-বিতণ্ডা করবে না। দেব

মনোভাব আর অসুর মনোভাব একসাথে যেখানে থাকবে সেখানে ঝগড়া বিবাদ থাকবেই। সরকারি অফিসে বা প্রাইভেট অফিসেও যারা ঘুষ নেয় তারা সবাই অসুর মনোভাবের। দেব মনোভাব হলে সে জানে আমার কাছে যে লোকটি কাজের জন্য আসছে তার কি প্রাপ্য আর আমার কি প্রাপ্য। আমার প্রাপ্য মানে আমি মাসের শেষে যে বেতন পাচ্ছি ওটাই আমার প্রাপ্য। দেবতাদের এত কাহিনী আছে কিন্তু কোথাও এমন একটি কাহিনীও পাওয়া যাবে না যেখানে তাঁরা যজ্ঞের ভাগ নিয়ে ঝগড়া বিবাদ করছেন। যজ্ঞের ভাগ নিয়ে ওদের মধ্যেও অনেক ঝগড়া ঝামেলা লাগত কিন্তু সেটা লাগত দেবতা আর অসুরদের মধ্যে। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে এর অনেক বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায়। সেখানে আছে অসুররা গায়ের জোরে দেবতাদের যজ্ঞের ভাগ কেড়ে নিচ্ছে। দেবতারা কেন এত সফল হয়? কারণ তাঁরা তাঁদের যজ্ঞ ভাগের ব্যাপারে খুব সচেতন, যে দেবতার যেটা প্রাপ্য সেই দেবতা সেটাই পাবেন, ওটাকে তাঁরা কোন ভাবেই উল্লঙ্ঘন হতে দেবেন না। আমাদের সমস্যা হল, আমাদের যেটা প্রাপ্য আমরা তার থেকে বেশি আশা করি। সন্ন্যাস জীবনে প্রবেশ করার সময় ব্রহ্মচারীদের বয়স্ক সন্ন্যাসীরা বলে দেন, পঙ্গতে যা দেবে সেটাই খাবি, নিজের ঘর নিজে পরিষ্কার করবি, নিজের জামা-কাপড় নিজেই পরিষ্কার করবি, তাহলে সাধু জীবনে আর কোন দিন তোকে কষ্টের মধ্যে পড়তে হবে না। যাঁরা এই তিনটে জিনিসকে ধরে রাখতে পারেন না তাঁদের অনেক ঝামেলার মধ্যে পড়তে হয়। সাধারণ জীবনেও ঠিক তাই হয়, আপনার নিজের প্রাপ্যের বাইরে আপনি যদি কোন কিছু আশা না করেন তাহলে দেখবেন আপনার জীবনে কোন ধরণের অশান্তি আসবে না। সেইজন্য এখানে বলছেন, তোমাদের যখন দক্ষিণা দেওয়া হবে তখন দক্ষিণার ব্যাপারে কখনই তোমরা দ্বিমত করবে না।

আমরা যেন মনে না করি এটি কোন উপদেশাত্মক মন্ত্র, এটা একটা প্রার্থনা। যজ্ঞ শুরু হওয়া থেকে শেষ পর্যন্ত কোন পরিস্থিতিতেই আমাদের কারুর মনে যেন অন্য ধরণের কোন রকম ভাব না আসে। আমি কি পেলাম সেটা দেখে কখন অশান্তি আসে না, অশান্তি আসে অপরে কি পেল সেই দেখে। অপরে আমার থেকে বেশি পেলে আমার মনে কষ্ট হবে, কম পেলে মনে আনন্দ হবে। এটাই আমাদের স্বভাব। প্রার্থনা করা মানে এই ভাবটা যেন আমার মন থেকে চলে যায়। শেষ কথা হল আমার মন যেন পবিত্র থাকে।

সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানং মনঃ সহ চিত্তমেষাম্।
সমানং মন্ত্রমভি মন্ত্রয়ে বঃ সমানেন বো হবিষা জুহোমি।।ঋ- ১০/১৯১/৩।।

যজ্ঞ করতে গেলে মন্ত্র দরকার, মন্ত্রোচ্চারণ করে আহুতি দেওয়ার দরকার। *সমানো মন্ত্রঃ*, যখন তোমরা মন্ত্রোচ্চারণ করবে তখন তোমাদের মন্ত্রোচ্চারণ যেন এক সুরে হয়। এক সুরে বলা মানে বেসুরোর অর্থে বলা হচ্ছে না। তোমরা যে সুরেই মন্ত্রোচ্চারণ করো না কেন সবারই মধ্যে যেন একই সুরের ঐক্য থাকে। একজন এক সুরে মন্ত্রোচ্চারণ করছেন, অন্যজন অন্য সুরে উচ্চারণ করছেন, তখন আগের জনের মন তার পাশের লোকের সুরের দিকে চলে যাবে, এতে মনের একাগ্রতা ভঙ্গ হয়ে যাবে। মনের একাগ্রতা চলে গেলে মনের পবিত্রতার ভাব নষ্ট হয়ে যাবে, পবিত্রতার ভাব চলে গেলে যজ্ঞও সুচারু রূপে আর সম্পন্ন করা যাবে না। সেইজন্য বলছেন মন্ত্রের উচ্চারণ যেন সবারই এক রকমের হয়। সায়নাচার্য মন্ত্রকে এখানে ব্যাখ্যা করে বলছেন মন্ত্র মানে স্তুতি আর বলছেন শাস্ত্রের যা কিছু আবৃত্তি করা হবে সেটাও যেন একমত হয়। আর মন্ত্র বলতে মন্ত্রণাও বলছেন, অর্থাৎ পুরোহিতরা নিজেদের মধ্যে যে আলোচনা করছেন সেখানেও যেন তোমরা সবাই সহমত পোষণ কর, কখনই যেন তোমাদের মধ্যে দ্বিমত না হয়। *সমিতিঃ সমানী*, *সমিতিঃ* মানে প্রাপ্তি, তোমাদের যে প্রাপ্তি সেটাও যেন একই রকম হয়। *সমানং মনঃ সহ চিত্তমেষাম্*, মনন সাধনের জন্য যে অন্তঃকরণ, সেই অন্তঃকরণ যেন তোমাদের একই রকম থাকে। সায়নাচার্য বলছেন, বিচারের দ্বারা যে জ্ঞান প্রাপ্তি হয় আর যখন একটা জিনিসকে নিয়ে গভীর ভাবে যে চিন্তা করা হয় সেটাকে বলছেন মন। বলছেন, তোমাদের চিত্ত, মন সব যেন সমানতা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ অন্তঃকরণ এক হোক আর তোমাদের বিচার্য জ্ঞান হোক।

সমানং মন্ত্রমভি মন্ত্রয়ে বঃ সমানেন বো হবিষা জুহোমি, ঋষি বা আচার্য তাঁর শিষ্যদের বলছেন – একই মন্ত্র আমি আরেকবার তোমাদের বলছি আর একই হবিষা আরেকবার আহুতি দিচ্ছি, তোমরা সবাই যেন একজোট হয়ে থাকতে পার। সেটাই আবার পরের মন্ত্রে বলছেন –

সমানী ব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসাহাসতি।।ঋ-১০/১৯১/৪।।

হে ঋত্বিকগণ! তোমরা যে এখানে যজ্ঞের জন্য সমবেত হয়েছে *সমানী ব আকূতিঃ*, তোমাদের সঙ্কল্প সমান হোক। *আকূতিঃ* মানে সঙ্কল্প বা অধ্যবসায়। আকূতিটা আমাদের জীবন থেকে ছিটকে যায়। ঠাকুর বলছেন, এই বলছে মাছ খাবো না, পরের দিনই আবার মাছ খায়। একটা সঙ্কল্পে যে লেগে থাকা এই লেগে থাকাটা আমাদের খুবই অভাব। কোন সঙ্কল্প নেওয়ার পর সেই সঙ্কল্পে লেগে থাকার জন্য যে শক্তির দরকার সেই শক্তি আমাদের মধ্যে নেই। এই শক্তিরই নাম ধৃতি, যে শক্তিতে সঙ্কল্পকে ধরে রাখা হয়। বলছেন তোমাদের সঙ্কল্প যেন একই রকম থাকে। *সমানা হৃদয়ানি বঃ*, তোমাদের সবার হৃদয়ও যেন একই রকম হয়। *সমানমস্তু বো মনো*, তোমাদের সবার মন যেন এক থাকে। সায়নাচার্য মন বলতে বলছেন, চিন্তা বা বিচার, এই বিচার যেন সবার একই থাকে। *যথা বঃ সুসাহাসতি*, এইভাবে তোমাদের সবারই মধ্যে যেন একটা ঐকতান তৈরী হয়ে সব সুশোভন হয়। সব কিছু যেন ছন্দোবদ্ধ ভাবে চলে, তোমাদের মধ্যে যে কোন ধরণের অশান্তি না সৃষ্টি হয়। *সুসাহ* মানে শোভন, সাহিত্যের আরেকটি পরিভাষা হল শোভন, যার সব কিছুই সুন্দর।

জীবনে সাফল্য কিভাবে আসবে? এখানে যজ্ঞের মাধ্যমে সাফল্য লাভের উপায়টা বলে দেওয়া হল। তোমার চলাফেরা সমান হতে হবে, তোমার কথাবার্তা একই রকম হবে, তোমাদের মন সমান থাকতে হবে। আর তোমাদের সঙ্কল্প যেন এক হয়। হৃদয় অর্থাৎ তোমাদের মনের আবেগ যেন সমান হয়। আর তোমাদের সাফল্যও যেন সুশোভন হয়। ব্যক্তিগত জীবনেই হোক আর সমষ্টি জীবনেই হোক, একটা unified life না হলে সাফল্য আসবে না। আমরা এখন পাঁচজন মিলে ঠিক করলাম আমরা সবাই একসাথে থাকব, একসাথে এক মত হয়ে চলব। আমরা কি পারবো একসাথে চলতে? ঋষিরা বিশ্বাস করতেন না, এভাবে দুম্ করে ঠিক করে নিয়ে একসাথে চলা যায় না। যতক্ষণ আধ্যাত্মিক উত্তরণ না হয় ততক্ষণ একসাথে কেউ চলতে পারবে না। আধ্যাত্মিক উত্তরণ মানেই তোমাকে প্রার্থনা করতে হবে। কোন ঋষি হয়ত তাঁর শিষ্যদের বলে দিয়েছেন তোমরা একসঙ্গে এই ভাবে প্রার্থনা করবে। সেটাকেই পরে ছন্দোবদ্ধ করে বলছেন *সং গচ্ছধ্বং সং বদধ্বং*। এটাই আমাদের ঋগ্বেদের শেষ সূক্ত, যার নাম সংজ্ঞানা সূক্তম্, যেখানে বলা হচ্ছে তোমরা যারা যজ্ঞে এসেছ তোমরা সবাই যেন একজোট হয়ে একই ছন্দে, একই রকম চিন্তন, একই রকম সঙ্কল্প নিয়ে যজ্ঞকে সাফল্যমণ্ডিত করতে পার।

বেদের সূক্তম্ বা মন্ত্রগুলিকে বেদে যেভাবে সাজানো হয়েছে এর পেছনে কি কোন যৌক্তিকতা আছে? যদি থাকে কি যৌক্তিকতা থাকতে পারে? পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা এর উপর প্রচুর গবেষণা করেছেন। ঋগ্বেদের দশটি মণ্ডল, তাঁরা দেখলেন যে মন্ত্রগুলি যজ্ঞে প্রচুর ব্যবহার করা হয় সেই মন্ত্রগুলিকে প্রথম মণ্ডলে সাজিয়ে গেছেন। দুই থেকে নবম মণ্ডল বিভিন্ন ঋষিদের পরিবারকে দিয়ে রাখা হয়েছে। যেমন বিশ্বামিত্রের পরিবার, একটা মণ্ডলের পুরোটাই তাদের পরিবারকে দিয়ে রেখেছে। যেসব মন্ত্রকে এভাবে শ্রেণীবিন্যাস করা যাবে না সেই সব মন্ত্রকে দশম মণ্ডলে রাখা হয়েছে। অফিসে যেমন Miscellaneous File থাকে, যে কাগজপত্র কোথাও রাখা যাবে না সেগুলোকে miscellaneous fileএ দিয়ে দাও। সেই রকম দশম মণ্ডল হল miscellaneous। এটা কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের ধারণা। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের চিন্তাধারার উপর খুব বেশি ভরসা করা যায় না। আমাদের পণ্ডিতদের যদি জিজ্ঞেস করা হয় তাঁরা বলবেন, পদ্ধতিটা মোটামুটি ঠিকই আছে, কারণ দেখা যায় দ্বিতীয় মণ্ডল থেকে নবম মণ্ডল পর্যন্ত হল বিভিন্ন পরিবারের। সেখানে যদি প্রশ্ন করা হয় এই ঋষির পরিবার আগে কেন এই ঋষির পরিবার পরে কেন? এগুলো কিছুই না, এগুলো শুধু একটা codification মাত্র। এখানে বর্ণানুক্রমিক কিছু নেই, বড় ঋষি থেকে ছোট ঋষির পরিবার দেখে সাজানো হয়েছে, সেরকমও কিছু

নেই। আমাদের পরম্পরাতে সবাই জানেন ব্যাসদেব বেদকে সাজিয়ে ছিলেন। ব্যাসদেব বিশেষ কোন কিছু মাথায় রেখে সাজাননি, যে বেদ ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল সেটাকে তিনি একটা জায়গাতে সংরক্ষিত করে দিলেন। বেদকে সাজানোর সময় তিনি বিশেষ কোন পদ্ধতি নিয়েছিলেন কিনা পরম্পরাতে কোন উল্লেখ পাই না। কিন্তু পণ্ডিতরা দেখতে দেখতে তাঁরাও খুঁজে পেলেন যে সাজানোর মধ্যেও একটা বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে, কিন্তু সব ক্ষেত্রে একই পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে না। যজুর্বেদে প্রথম ঊনচল্লিশটা অধ্যায় যজ্ঞে ব্যবহৃত হত কিন্তু চল্লিশ অধ্যায় যজ্ঞে ব্যবহৃত হত না, যেখানে ঈশাবাস্যোপনিষদ এসেছে। বিশেষ কোন কারণ নেই, পরম্পরাতে এভাবেই চলে এসছে। আমরা বলে যাচ্ছি মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক এবং আরণ্যকের পরে উপনিষদ। কিন্তু যজুর্বেদে মন্ত্রের পরেই উপনিষদ এসে গেছে। ম্যাক্সমূলারও প্রথম দিকে এগুলো কিভাবে সাজানো হয়েছে ব্যাখ্যা করতে গিয়েছিলেন, কিন্তু পরে দেখলেন অন্য ভাবে যদি একে classify করা হয় তখন আরও বেশি অসামঞ্জস্য বেরিয়ে আসবে। সেইজন্য উনিও যেমনটি আছে তেমনটিই রেখে দিলেন।

বেদ মানেই যজ্ঞ, যজ্ঞ ছাড়া বেদে কিছু নেই। এরপর আমরা বেদের যা অর্থই করতে যাই না কেন সবটাই বেকার। যজ্ঞ মানেই সেখানে দেবতাদের স্তুতি থাকতে হবে। ডেভিড ফ্রাউলি ও আরও কয়েকজন মিলে একটা নতুন আন্দোলন শুরু করেছেন যার নাম দিয়েছেন Voice of India। এনারা বেদের মধ্যেকার অনেক কিছুকে নিয়ে এমন উদ্ভট উদ্ভট ব্যাখ্যা দিতে শুরু করলেন যে যার কোন অর্থ আমরা বুঝতে পারব না। ডেভিড ফ্রাউলির নামই দিয়েছেন বেদাচার্য্য, সহজে কাউকে বেদাচার্য্য বলা হয় না। ভদ্রলোক একা হিন্দু ধর্মের হয়ে লড়াই করে যাচ্ছেন। বেদের উপর ওনার প্রচুর বই আছে। বেদের এ্যস্ট্রনমির উপর যেসব কথা তিনি লিখেছেন সেগুলো আমাদের মত সাধারণ লোক কিছুই বুঝতে পারব না, অথচ তিনি একজন বিদেশী। গোঁড়া হিন্দুদের কাছে ওনার বইগুলি প্রচুর সমাদৃত। ডেভিড ফ্রাউলের লেখার মধ্যে অনেক বুদ্ধির খেলা আছে। বেদ মন্ত্রের এমন এমন অর্থ বার করেছেন পড়লে অবাক হয়ে যেতে হয়। তন্ত্রেও এক একটা মন্ত্র আছে সাধারণ ভাবে পড়তে গেলে কিছু অর্থ বোঝা যায় না, অথচ ভাষ্য সহকারে পড়লে অর্থ পরিষ্কার হয়ে যায়। এগুলোকেই বলা হয় গুহ্য বিদ্যা। তন্ত্র গুহ্য বিদ্যা ঠিকই বেদ কিন্তু আদপেই গুহ্য বিদ্যা নয়। কিন্তু উনি গায়ের জোরে বেদকে গুহ্য বিদ্যা রূপে দেখাচ্ছেন। গুহ্য বিদ্যা মানেই শব্দ নিয়ে খেলা করা। সেইজন্য সায়নাচার্য যে অর্থ করে গেছেন তার বাইরে আমাদের যাওয়া উচিৎ নয়। ঠিক তেমনি উপনিষদে আচার্য শঙ্কর যা ব্যাখ্যা দিয়েছেন তার বাইরে যেতে নেই। কিন্তু কেউ যদি ব্যাখ্যা করতে চায় অবশ্যই ব্যাখ্যা করতে পারে, আর ব্যাখ্যারও শেষ নেই। যে যেভাবে পারে এখনও বেদের কত রকম ব্যাখ্যা দিয়ে যাচ্ছে। বাল্মীকি রামায়ণে বেদে একটা যজ্ঞের বর্ণনা আছে, সেখানে বলছেন, যজ্ঞে এক হাজার ঋত্বিক রয়েছেন, ব্রাহ্মণ জুটেছেন এক লাখ। আবার রাজসূয় যজ্ঞে একসাথে হাজার খানেক যজ্ঞকুণ্ড জ্বলত। এখনও সন্ন্যাসের সময় তিনখানা যজ্ঞকুণ্ড প্রজ্বলিত করতে হয়। তিনটে যজ্ঞকুণ্ড মানে তিনজন আহুতি দিচ্ছেন, তিনজন মন্ত্র পাঠ করছেন। সেখানে হাজার খানা যজ্ঞকুণ্ডে হাজার জন আহুতি দিচ্ছেন, হাজার জন ব্রাহ্মণ একসাথে মন্ত্রোচ্চারণ করছেন। এত ব্রাহ্মণ, এত ঋত্বিক যেখানে জড়ো হয়ে এক বিরাট যজ্ঞ করছেন সেখানে গোলমাল তো কিছু হবেই, আর বেদের যজ্ঞে কিছু গোলমাল হওয়া মানেই সবটাই পণ্ড হয়ে যাওয়া। তাহলে কী করবে? ভগবানের সাহায্য দরকার। তার জন্য প্রার্থনা কর। উপনিষদ অধ্যয়নের প্রারম্ভে গুরু-শিষ্য একসাথে সহনাববতু করছেন যাতে যাজ্ঞবল্ক্যের গুরু-শিষ্যের মত গোলমাল না লেগে যায়। বেদের ঋষিদের কাছে ভগবান বলে কিছু ছিল না, কার কাছে প্রার্থনা করবেন! তাই যজ্ঞ কর আর যজ্ঞের সময় স্তুতি কর, যজ্ঞের স্তুতি যখন করবে তখন সংজ্ঞানা সূক্তম্, সগচ্ছদ্ধং সংবদদ্ধং। এই যজ্ঞ করে দেওয়া হল এবার সব কিছু ঠিকঠাক চলবে। এটাকেই আমরা এখন ঘুরিয়ে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করছি। ঋগ্বেদে যা কিছু আছে সবটাই দেবতাদের স্তুতি। যজ্ঞের সময় ঋগ্বেদ থেকে পাঠ করা হত। বেদে হাজার হাজার যজ্ঞ আছে, সংজ্ঞানা সূক্তম্ ঠিক কোন যজ্ঞে ব্যবহার করা হত আমাদের জানা নেই।

যে কোন ধর্মকেই মৃত্যুর পর জীবন কোন না কোন ভাবে চলতে থাকে, এই ব্যাপারটা মানতে হয়। যে রূপে চলছে সেই রূপকেই খ্রীশ্চানরা বলছে সোল, হিন্দুরা বলে আত্মা বা জীবাত্মা। আত্মাকে যদি না মানা হয় তাহলে ধর্মের কোন অর্থই থাকে না। বর্তমান কালে মানবতাই ধর্ম এই নিয়ে অনেক আন্দোলন চলছে। এরা

বলছে খ্রীশ্চান বা মুসলমান ধর্মের পরিবর্তে মানবতাই ধর্ম। কিন্তু এদের মানবতা কোন ধর্মই হতে পারে না। কারণ ধর্মের প্রথম শর্তই হল, মৃত্যুর পরেও জীবন কোন না কোন ভাবে চলতে থাকে। মৃত্যুর পরেও জীবন চলে, যদি এই জিনিসটা কোন ধর্ম না মানতে চায় তাহলে সেই ধর্মকে কখনই ধর্ম বলা যাবে না। এটাই ধর্মের পরিভাষা। সেইজন্য বিজ্ঞানকে কখনই ধর্মের পরিভাষাতে গণ্য করা হয় না। কারণ বিজ্ঞান মৃত্যুর পরবর্তি জীবনকে কখনই মানে না। এই শরীরের পেছনে একটা সত্তা আছে, এই সত্তাকে যদি কেউ না মানে সেটা আর যাই হয়ে থাকুক ধর্ম কখনই হতে পারে না। মানবিকতা জীবনের একটা পথ, ধর্ম কখনই নয়। চার্বাক দর্শনও জীবনের একটা পথ, ধর্ম কখনই হতে পারবে না। ধর্ম মানেই তাকে আত্মার অস্তিত্বকে মানতে হবে। আত্মার অস্তিত্ব মানলেই স্বর্গ নরকের অস্তিত্বকেও মানতে হবে।

বেদের স্বর্গের নাম ছিল সুকৃত লোক। সুকৃত লোকের অর্থ হল যারা ভালো কাজ করেছে মৃত্যুর পর তারা সবাই সুকৃত লোকে যায়। পরের দিকে এসে সুকৃত লোককে আরও শ্রেণী বিভাগ করে দেওয়া হল, সেখান থেকে নাম হয়ে গেল পিতৃলোক, দেবলোক। সেখান থেকে পরে এসে গেল স্বর্গলোকের ধারণা। এরপর এসে গেল সপ্তলোকের ধারণা, উপরের দিকে সাতটি লোক আর নীচের দিকে সাতটি লোক, এই নিয়ে চতুর্দশ ভুবনের ধারণা তৈরী হয়ে গেল। বেদে নরক বলে কিছু ছিল না, নরক পুরাণে খুব ভালো মত জায়গা করে নিয়েছে। অনেকে মনে করেন গ্রীকদের প্রভাব থেকে ভারতে নরকের ধারণা এসেছে। বেদের পাতাল লোক মানে যেখানে অসুরদের বাসস্থান। পুরাণে নরকের যে বর্ণনা পাওয়া যায় সেই অনুসারে পাতাল কিন্তু কখনই নরক নয়। আমাদের প্রথম যে লোকের ধারণা ছিল তাকে সুকৃতলোকই বলা হত। যাদের সুকৃতি বেশি না থাকে তারা কোথায় যাবে? সেখান থেকে পিতৃলোক এসে গেল। যারা বেদ মানে না বা বেদের ধর্মানুসারে জীবন চালায় না তাদের লোককে আলাদা করে পাতাল লোক বানিয়ে দেওয়া হল।

জন্মমৃত্যুর চক্র আর সেখান থেকে মুক্তির ধারণা, আজকের দিনে হিন্দু ধর্মে যা হল মূল স্তম্ভ, কিন্তু জন্মান্তরবাদ বা পুনর্জন্মবাদ এবং মুক্তির ধারণা বেদে সেভাবে সরাসরি ছিল না। সুকৃতি থাকলে মৃত্যুর পর সুকৃতলোকে যাবে কিন্তু তারপরে কি হবে, এই জিনিসগুলো বেদে খুব বেশি স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করা ছিল না। বেদে না থাকারই কথা কারণ বেদের মন্ত্র হল প্রার্থনা। কিন্তু মন্ত্রের পরে বেদের যে অন্যান্য অংশ যেমন ব্রাহ্মণ, আরণ্যক সেখানে কিছু কিছু এই ধারণাগুলো আসতে শুরু করে। উপনিষদে এসে এই ধারণা খুব জোর এসে গিয়েছিল। যেমন কঠোপনিষদেই বলছেন *যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ। স্থাণুমন্যেঽনুসংযন্তি যথাকর্ম যথাশ্রুতম্*, জীবের যেমনটি জ্ঞান আর যেমনটি কর্ম করা থাকে সেই অনুসারে তার বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন যোনিতে গিয়ে জন্ম হয় আবার অপর কেউ কেউ গাছপালা বা পাথর হয়ে স্থাবরত্ব প্রাপ্ত হয়।

হিরণ্যগর্ভ সূক্তম্

বেদের ধর্ম হল দেবতা কেন্দ্রিক। দেবতা কেন্দ্রিক হওয়ার জন্য বেদে নৈর্ব্যক্তিক জিনিসটা খুব কম, যদিও নাসদীয় সূক্তম্ কোন বিশেষ দেবতাকে নিয়ে বলছে না। তবে দেবতাদের মাধ্যমে সেই অনন্তেরই যেন পূজা করা হচ্ছে, এই ভাবটা বেদে প্রবল ভাবে এসেছে। সেখান থেকে এই ধারণা বেরিয়ে এল, যিনি এক তিনিই বহু রূপে সামনে বিরাজ করছেন। ইসলাম ও খ্রীশ্চান বা জরাথ্রুষ্ট ধর্ম যে একেশ্বরবাদকে নিয়ে চলে, সেই একেশ্বরবাদের ধারণাও বেদের কিছু মন্ত্র বা সূক্তমে এসে গিয়েছিল। বাংলা শব্দকে নিয়ে একটু এদিকে ওদিক করলে ভারতের ধর্ম আর বিদেশের ধর্ম একটি শব্দেই পরিষ্কার হয়ে যায়। একেশ্বর মানে এক ঈশ্বর, একজনই ঈশ্বর আছেন এই কথাকে এক অর্থে নিলে সেটাই ইসলাম বা খ্রীশ্চান ধর্ম হয়ে যাবে। আর আমাদের ভাষাতে যদি বলি ঈশ্বর এক, অর্থাৎ যত রকম ঈশ্বরের কথা বিভিন্ন ধর্মে বলা হয় সব ঈশ্বরই এক, তখন এটাই ভারতীয় ধর্ম হয়ে যায়। একজন ঈশ্বরই আছেন, আল্লাই আছেন তখন এটাই একেশ্বরবাদ হয়ে যায়। আর যদি বলা হয় ঈশ্বর এক, তাঁকে তুমি আল্লা বল, রাম বল, গড্ বল তাতে কিছু যায় আসে না, তখন এটাই ভারতের ধর্ম হয়ে যায়। তবে ভারতের ধর্মকে অন্যান্য ধর্মের মত নির্দিষ্ট ভাবে categorise করা যায় না। সেইজন্য ম্যাক্সমূলার একটি নতুন শব্দ নিয়ে এলেন, যে শব্দটি অনেক দিন চলার পর আবার হারিয়ে গেল,

এই শব্দটি হল Pantheistic, এর অর্থ যিনি এক তিনিই নানান ভাবে দেখাচ্ছেন, তিনিই সব কিছু হয়েছেন। কিন্তু ভারতের ধর্ম ঠিক তাও নয়। এই ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার করে বোঝা দরকার।

ভারতের মূল ধর্ম চারটি, হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ও শিখ। এই চারটি ধর্ম এক ভাবে চলে আর অন্য দিকে বিশ্বের বাকি চারটি ধর্ম, ইসলাম, খ্রীশ্চান, পার্সিদের ধর্ম আর জুদাইজম্ অন্য ভাবে চলে। শেষের চারটি ধর্মে একজন ঈশ্বর আছেন, তাঁর নীচে দেবতারা আছেন, দেবতাদের নীচে আবার সাধুরা আছেন। আমাদের এখানেও একেশ্বরবাদ এসেছিল কিন্তু বেশি দিন চলতে পারল না। একেশ্বরবাদকে নিয়ে এলে ধর্মটা প্রথমেই গোঁড়া হয়ে যায়। বৈষ্ণবরাও একজন ঈশ্বরকেই মানে এবং বৈষ্ণবরাও প্রচণ্ড গোঁড়া। তাহলে বৈষ্ণবরা কি একেশ্বরবাদী? একেশ্বরবাদীতে কৃষ্ণ ছাড়া আর কেউ নেই, এই পর্যন্ত বৈষ্ণবরা ঠিক আছে। কিন্তু এর পর একেশ্বরবাদের পরিণাম যেটা সেটা আরও ভয়ঙ্কর, এখানে পাপ আর পূণ্যটাই সত্য হয়ে যায়। হিন্দু ধর্মের যে ধারা তাতে পাপ-পূণ্যকে স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করা যায় না। বলা হয় যে sin against God and sin against society এই দুটোকে তফাৎ করা হয় না। এই জায়গাতে এসে একেশ্বরবাদ আর হিন্দু ধর্মে তফাৎ হয়ে যায়। বাইবেলে যেখানে বলা হচ্ছে, তুমি এটা করিবে না, তখন সেটাই হয়ে গেল পাপ আর যেখানে বলা হচ্ছে, তুমি এটা করিবে, সেটা হয়ে গেল পূণ্য। কোরানেও ঠিক এভাবেই পাপ আর পূণ্যকে পরিষ্কার ভাবে লাইন টেনে দেওয়া হয়েছে, তুমি এই রকম করিবে না, সেটা হয়ে গেল পাপের শেষ কথা আর যেখানে বলে দিল তুমি এমনটি করিবে, সেটাই হয়ে গেল পূণ্যের শেষ কথা। কিন্তু এটুকু দিয়েও তো সমাজ চলতে পারবে না, কারণ সমাজে আরও অনেক কিছু হয়। সমাজকে চালাতে গিয়ে পাপের পর আইন-কানুন এসে যায়। আইন-কানুনের নীচে এসে যায় more। More মানে, সমাজে প্রচলিত কিছু জিনিস আছে যেগুলো আইনগত ভাবে দোষের নয়। তারও নীচে আসে প্রথা। বিদেশীদের কাছে এটা খুবই আপত্তিজনক যে, হিন্দু ধর্মে সুস্পষ্ট ভাবে এগুলো অনুপস্থিত। আমাদের কাছে সবটাই পাপ, তার কারণ, হিন্দু ধর্মের কোন শাস্ত্রে পূণ্যকে কোথাও ব্যাখ্যা করা হয় না আর পাপকেও কোথাও ব্যাখ্যা করা হয় না। কিন্তু হিন্দুদের কাছে ধর্মটাই সত্য। ঋষিরা বিভিন্ন সময়ে পরিভাষিত করে বলে দেন, তুমি যদি ধর্ম পথে যেতে চাও তাহলে এই এই জিনিসগুলি করবে। কিন্তু এই পরিভাষা কখনই শেষ কথা নয়, এগুলো সবই আপেক্ষিক। পরেই অন্য কোন ঋষি এসে আগের পরিভাষাকে পাল্টে দিচ্ছেন। তার ফলে হিন্দু ধর্মে চরম পাপ আর চরম পূণ্য বলে কিছু নেই। যেমন ঠাকুর বলছেন, সত্য হল কলির তপস্যা। যাঁদের কাছে ঠাকুর ধ্যান-জ্ঞান তাঁদের কাছে এটাই হয়ে গেল বেদ বাক্য। কিন্তু হিন্দু ধর্ম এভাবে চলে না। মহাভারতই আবার এক জায়গায় বলছে, সত্য সবারই উপরে কিন্তু কয়েকটি পরিস্থিতিতে সত্য কথা বলা যাবে না। তাই বৃহত্তর হিন্দু ধর্মে শেষ কথা বলে কিছু নেই। কিন্তু ব্যক্তি বিশেষে গিয়ে তার একটা শেষ কথা থাকতে হবে। সেইজন্য একেশ্বরবাদ আর হিন্দু ধর্মে বিরাট পার্থক্য হয়ে যায়। যার জন্য হিন্দু ধর্মের পাপের শাস্তি বলে কিছু নেই। স্বামীজীকেও বিদেশে অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছিল, তারা স্বামীজীকে প্রশ্ন করছে – How can there be a religion without sin, যেখানে পাপ বলে কিছু নেই সেখানে ধর্ম কি করে হবে? স্বামীজী বলছেন, ঠিকই আমাদের পাপ বলে কিছু নেই, আমরা পাপ না বলে বলি ভুল বা ত্রুটি। বিদেশে পাপ বলতে যা বোঝায় সেটা আমাদের কাছে পাপ নয়, আমাদের কাছে ভুল। ভুলকে শুধরে নিলেই হয়ে গেল। ঠাকুর তো আরও অনেক জোর দিয়ে বলছেন, যতই পাপ তুমি করে থাক দুর্গা নাম নিতেই সব পাপ কেটে গেল। ঠাকুর আবার বলছেন, কোন দোষ করার পর ঈশ্বরকে যদি বলে দেয়, হে ঈশ্বর! এ রকমটি আর করব না। ওখানেই পাপ শেষ হয়ে গেল। এখন কেউ হাজারটা মিথ্যা কথা বলার পর ঈশ্বরকে গিয়ে বলছে, হে ঠাকুর! বিভিন্ন কারণে অনেক মিথ্যা কথা বলতে হয়েছে, এই শেষ মিথ্যা কথা বলে দিয়েছি আজ থেকে আর মিথ্যা কথা বলব না। ওখানেই সব শেষ হয়ে গেল। তাহলে এত দিন ধরে যে এত এত মিথ্যা কথা বলেছে তার কী হবে? কী আর হবে! কিছুই হবে না। একজন বলবে, কেন কিছু হবে না! ঠাকুর বলে গেছেন সত্যই কলির তপস্যা, সুতরাং তোমার অনেক পাপ হয়ে গেছে। তার উত্তরে আরেকজন বলবে, কেন তা হবে! ঠাকুরই বলেছেন একবার তাঁর নাম করলে সব পাপ কেটে যায়। এবার দুজনে মিলে লড়াই করতে থাকুক। কিন্তু ঠাকুরের কাছে একবার যদি বলে দেয় তাহলে সে সব দোষ থেকে মুক্ত হয়ে গেল।

একেশ্বরবাদে এটাই সব থেকে বড় সমস্যা। একেশ্বরবাদ দাঁড়িয়েই আছে পাপ আর পূণ্যের জোরে। আর তার সাথে জোট বেঁধেছে গোঁড়ামি। পাপ, পূণ্য আর গোঁড়ামি এই তিনটিই একেশ্বরবাদ বৃক্ষের ফল। ভারতের ধর্মে এই তিনটিই অনুপস্থিত। কিছু কিছু পণ্ডিতরা বলেন, বেদে এমন এমন কয়েকটি মন্ত্র আছে যাতে একেশ্বরবাদের একটা ক্ষীণ আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু পরের দিকে ঋষিরাই ওই আভাসকে বেশি পল্লবিত করে এগিয়ে নিয়ে যেতে দিলেন না। এবার আমরা দেখব যে একেশ্বরবাদকে ঋষিরা চলতে দিলেন না, সেই একেশ্বরবাদ বেদের একটি সূক্তমে কীভাবে এসেছে। হিরণ্যগর্ভসূক্তম্ এমন একটি সূক্তম্ যেখানে একেশ্বরবাদ যেন মাঝে মাঝে উঁকি দিচ্ছে। হিরণ্যগর্ভসূক্তমের ভাব একেশ্বরবাদের ভাবকেই যেন এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে, অথচ এই হিরণ্যগর্ভসূক্তমই আবার সেই যজ্ঞেই ব্যবহার করা হয়।

দশটি মন্ত্র নিয়ে হিরণ্যগর্ভসূক্তম্। দশটি মন্ত্রের মধ্যে প্রথম নয়টি মন্ত্রের শেষে বলা হচ্ছে *কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম*। পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা এর অর্থ করেন, ঋষি যেন অবাক হয়ে প্রশ্ন করছেন আমরা কোন দেবতার উদ্দেশ্যে আহুতি দেব। আমাদের যত প্রচলিত অনুবাদ আছে তাতেও *কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম* এই অর্থ করা হয়েছে, কোন দেবতাকে আমরা আহুতি দেব। এর মধ্যে যেন একটা জিজ্ঞাসা আছে। এনার থেকে কে শ্রেষ্ঠ আছেন? অথবা এটাও হতে পারে, এনাকে ছাড়া আর কাকে অর্ঘ্য দেওয়া হবে? অর্থাৎ তোমা ছাড়া আর কাকে ভালোবাসব! কিন্তু ভারতীয় ভাষ্যকাররা এই অর্থ করেন না, তাঁরা জানেনও না যে বিদেশীরা এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। সায়নাচার্য তাঁর ভাষ্যে এর অর্থ করছেন 'ক' মানে প্রজাপতি, প্রজাপতির আরেকটি নাম হিরণ্যগর্ভ, সেইজন্য সূক্তমের নাম হিরণ্যগর্ভ। তাহলে এর অর্থ হবে, হিরণ্যগর্ভকে আমরা এই আহুতি প্রদান করছি। সংস্কৃতের ব্যকরণ অনুযায়ী *কস্মৈ* হল চতুর্থী। কিন্তু সায়নাচার্য ব্যকরণের নিয়ম দিয়ে দেখাচ্ছেন, এখানে *কস্মৈ* শব্দ চতুর্থী না হয়ে দ্বিতীয়ার অর্থে এসেছে। দ্বিতীয়া মানে যার উপর ক্রিয়া হয়। পাশ্চাত্যের যে পণ্ডিতরা এইসব অনুবাদ করেছেন তাঁরাও বিরাট পণ্ডিত, তাঁরা সংস্কৃত শিখেছেন, বেদ শিখেছেন, কত পরিশ্রম করে এগুলোকে অনুবাদ করেছেন। কিন্তু বিদেশী পণ্ডিতদের একটা সমস্যা হল, অনেক সময় এনারা একটা বিশেষ উদ্দেশ্যকে মাথায় রেখে সব কিছুর অনুবাদ করতেন। বিশেষ করে ওনারা তখনকার দিনে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হয়ে কাজ করেছিলেন। সেই সময় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারত থেকে এত টাকা লুট করেছিল যে কল্পনা করা যায় না। এই নিয়ে বৃটেনের পার্লামেন্টে অনেক প্রশ্ন উঠেছিল। তখন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে দেখাতে হল যে আমরা যে শুধু টাকা লুট করে গেছি তা নয়, ভারতের কল্যাণের জন্যও আমরা অনেক কিছু করেছি। তার মধ্যে একটা হল ম্যাক্সমূলারকে টাকা দিয়ে বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্রের অনুবাদ করার দায়ীত্ব দেওয়া। বলা হয় যে, এক একটি পাতা অনুবাদ করার জন্য তখনকার দিনেই ম্যাক্সমূলারকে একশ পাউণ্ড করে দেওয়া হত। বিদেশী পণ্ডিতরা যখন সব কিছুর অনুবাদের কাজে নামলেন তখন সবাই চমকে উঠল যে এত গভীর চিন্তার জগৎ ভারতীয় দর্শনে লুকিয়ে আছে। সেখান থেকে তাঁদের আরেকটা বড় সমস্যা হয়ে গেল, এগুলোকে মেনে নিলে খ্রীশ্চান ধর্ম অনেক ছোট হয়ে যাবে। সেইজন্য কোথাও একটু ফাঁক পেলেই বিদেশীরা নিজেদের মত ঢুকিয়ে দিতেন। যেমন এখানে হয়েছে, যতক্ষণ সায়নাচার্যের ভাষ্য না পড়া হবে ততক্ষণ আমাদের সবারই *কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম*, এর অর্থ হবে, কোন দেবতাকে আমরা হবিষা প্রদান করব।

ভারতীয় পণ্ডিতদের কাছে 'ক' মানে ব্রহ্মা। উপনিষদ ও অন্যান্য শাস্ত্রেও বলা হয় কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্ম, ক মানে যেমন ব্রহ্মা তেমনি খ মানে আকাশ, আকাশকে ব্রহ্ম বলা হয়। আবার বলা হয় *অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ*, অন্নই ব্রহ্ম, *প্রাণো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ*, প্রাণই ব্রহ্ম, *মনো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ*, মনই ব্রহ্ম। তপস্যা করে করে একটা একটা যা সামনে আসছে তাকেই ব্রহ্ম বলছেন। সবই ব্রহ্মের ব্যাখ্যা। কিন্তু ব্রহ্মের ঠিক ঠিক অর্থ কি হতে পারে? যে কোন জিনিসের যখন পাঁচ খানা ব্যাখ্যা চলে আসে তখন বুঝতে হবে কোনটাই ঠিক নয়, তার মানে এর এমন কোন একটা অর্থ আছে যে অর্থ সব জায়গাতে গিয়ে প্রযোজ্য হয়ে যেতে পারে। যেমন পরিবারের কোন মহিলাকে কেউ বলছে মা, কেউ বলছে স্ত্রী, কেউ বলছে মেয়ে, এগুলো সবই মহিলাটির ব্যাখ্যা। তার মানে মহিলার এমন কিছু একটা সাধারণ অর্থ আছে যার রূপ এই সব কটির ব্যাখ্যা। একটা কলমকে আমরা অন্য কিছু বলতে পারি না, কলমের যা নাম সেটাই তার পরিভাষা, সেটাই তার কার্য, কলমের

সব কিছুই সেখানে শেষ হয়ে যায়। কিন্তু ব্রহ্মের ক্ষেত্রে এভাবে একটা জায়গায় ইতি টেনে দেওয়া যাবে না। ঈশ্বরের ক্ষেত্রেও একটা সীমারেখা টেনে দেওয়া যায়, ঈশ্বর মানে যিনি সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার করেন, ভক্তদের কামনা-বাসনার পুর্তি করেন। এই সংজ্ঞাকে আর পাল্টানো যাবে না। ব্রহ্ম আর ঈশ্বরে এখানে একটা বড় তফাৎ আছে। ব্রহ্ম শব্দ এসেছে বৃ ধাতু থেকে, যিনি বৃহৎ, যাঁর থেকে আর বৃহৎ কিছু নেই।

একটা কুয়োর ব্যাঙের কাছে বৃহৎ কি? কুয়োটাই তার কাছে বৃহৎ, ওটাই কুয়োর ব্যাঙের কাছে ব্রহ্ম। যে ব্যাঙ পুকুরে বাস করে তার কাছে পুকুরটাই ব্রহ্ম, সমুদ্রের ব্যাঙের কাছে সমুদ্রই ব্রহ্ম। যে শুধু অন্ন খেয়ে বেঁচে আছে তার কাছে অন্নই ব্রহ্ম। যে মনে করছে প্রাণই সব তার কাছে প্রাণই ব্রহ্ম। এইভাবে দেহকেও আত্মা বলা হয়ে, দেহাত্মা। মনকেও আত্মা বলা হয়, বুদ্ধিও আত্মা আবার আত্মা সর্বব্যাপী। আত্মাকে সবাই জানে, এমনকি যে বলছে আমি আত্মা-টাত্মা কিছুই মানি না সেও কিন্তু আত্মাকে মানে, একটা পিঁপড়েও আত্মাকে মানে। শুধু জানে, আমি যে দেহ এটাই আত্মা। তাহলে দেহতো বিনাশশীল তাই আত্মাও বিনাশশীল হয়ে গেলেন। এই কথা শাস্ত্রের সঙ্গে মিলবে না। শাস্ত্র বলছে আত্মা ঠিক ঠিক সেটাই যেটা বিনাশরহিত। দেহের উপর মন, তাহলে মনটাই আত্মা। যে মনে করছে মনটাই তার সব কিছু, তাতেও সে কিন্তু ভুল কিছু বলছে না, ঠিকই বলছে। আত্মা মানে হয় সার আর ব্রহ্ম মানে বৃহত্তম, তাঁর বাইরে আর কিছু নেই। যখন আপনি জেনে গেলেন আপনার ভেতরের যেটা সার সেটাই বৃহত্তম তখন আত্মা ব্রহ্ম হয়ে যাবে।

সৃষ্টি কোথা থেকে হয় এর উত্তর আমরা যদি আমাদের সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে বিচার করি তখন দেখতে পাই সব কিছু এ্যানার্জি থেকে সৃষ্টি হচ্ছে। বাংলায় এ্যানার্জিকে বলা হয় উর্জা আর সংস্কৃতে বলা হয় প্রাণ। সব কিছুর সৃষ্টি প্রাণ থেকেই হয়। তাহলে প্রাণই ব্রহ্ম হয়ে যাওয়ার কথা। তাহলে প্রাণই কি শেষ কথা হতে পারে? এখানে এসে অনেক সমস্যা দাঁড়িয়ে যায়। যদি আমরা খুব সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে যাই তাহলে প্রাণই ব্রহ্ম। বেদান্তেও বলছে প্রাণই ব্রহ্ম, এটি একটি বিরাট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিজ্ঞানীদের কাছে এ্যানার্জিই শেষ কথা, সেইজন্য তাঁরা দেখছেন আমাদের জীবনের যাত্রাপথ বিগ ব্যাঙ থেকে ব্ল্যাঙ্কের মধ্যে চলে। বিজ্ঞানীরাও ভুল কিছু বলছেন না। আইনস্টাইন এসে প্রমাণিত করলেন এ্যনার্জি আর ম্যাটার, ম্যাটার আর এ্যনার্জি সব কিছু এর মধ্যেই ঘুরপাক করছে। আইনস্টাইনের আগে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীদের কাছে এই ব্যাপারে কোন ধারণাই ছিল না, অথচ চার-পাঁচ হাজার বছর আগে উপনিষদেই এই ধারণা এসে গিয়েছিল। শাস্ত্রাদিকে নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমাদের অবাক হয়ে যেতে হয় ঋষিরা এই ধারণায় পৌঁছালেন কী করে! ঋষিরা পদার্থের কথাই আনছেন না, বলছেন সৃষ্টি কোথা থেকে আসছে? প্রাণ থেকে আসছে। তাহলে শেষ কথা প্রাণ, বৃহত্তম হল প্রাণ, তাই প্রাণই ব্রহ্ম। এতক্ষণ চিন্তার জগৎ থেকে দেখলেন প্রাণ থেকেই সব কিছুর সৃষ্টি হচ্ছে। এরপর যখন ধ্যানের গভীরে যাচ্ছেন তখন দেখছেন প্রাণের সৃষ্টি আরও পেছন থেকে আসছে। প্রাণ আছে, কিন্তু কোথায় আছে? প্রাণ কাজ করবে, কিন্তু কাজ করার জন্য একটা জায়গা দরকার। তখন তাঁরা নিয়ে এলেন আকাশ। আকাশ দুটো অর্থে হয়, একটা স্পেসের অর্থে যেখানে সূক্ষ্মতম পদার্থ আছে। সেইজন্য আকাশ আর প্রাণ এই দুটো শব্দকে এনারা প্রায়ই একসঙ্গে নিয়ে চলেছিলেন। আইনস্টাইনও পদার্থকে উড়িয়ে দিচ্ছেন কিন্তু ম্যাটার, টাইম আর স্পেস এই তিনটেকে বাদ দিচ্ছেন না। এ্যনার্জি থাকলেই টাইম আর স্পেসকে থাকতে হবে, টাইম আর স্পেসের মধ্যেই এ্যনার্জিকে কাজ করতে হবে। আইনস্টাইনের কালকে তন্ত্র নিয়ে আর ঋষিরা প্রাণ আর আকাশকে নিয়ে আরও এগিয়ে গেলেন। সেইজন্য উপনিষদে প্রাণ ব্রহ্ম আর আকাশও ব্রহ্ম। আকাশের একটা নাম খ, তাই বলছেন খং ব্রহ্ম।

এরপর আরও যখন ধ্যানের গভীরে যাচ্ছেন তখন দেখছেন আকাশেরও একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন, তিনি হলেন প্রজাপতি বা হিরণ্যগর্ভ। প্রজাপতিকে বলছেন ব্রহ্ম, কং ব্রহ্ম, প্রজাপতিরই একটা নাম ক। কিন্তু প্রজাপতিকে আমরা এই প্রকাশ্যমান বিশ্বব্রহ্মাণ্ড রূপে বর্ণনা করছি। তাহলে আমরা সামনে যে জগৎ দেখছি এটাই যদি প্রজাপতি হয়ে থাকেন তাহলে এই জগতের বাইরেও কিছু আছে। এইভাবে তাঁরা এক অনন্ত দিব্য অস্তিত্বের সন্ধান পেলেন যাঁকে কেউ প্রকাশ করতে পারে না। তাহলে ব্রহ্ম কি? যেখানে গিয়ে মুখ বন্ধ হয়ে যায়। কথামৃতাদি পড়ে টিয়া পাখির মত আমরা মুখে বলে দিই, ব্রহ্ম মানে যেখানে মন বাণী চুপ হয়ে যায়।

ঠিকই বলা হচ্ছে কিন্তু তারও আগে আমাদের নীচ থেকে আত্মা কি, ব্রহ্ম কি বোঝা শুরু করতে হবে। দেহ থেকে আত্মার শুরু, আমিই এই শরীর, তাই দেহই আত্মা। ব্রহ্ম কোথা থেকে শুরু হয়? অন্ন থেকে, অন্নই ব্রহ্ম। অন্ন দিয়েই এই দেহ চলে। দেহ আর অন্নকে নিয়ে প্রথম চলা শুরু হল, আমার সার আর জগতের শেষ কথা। এই দুটোকে নিয়ে চলা শুরু হওয়ার পর একটা ভেতরের দিকে ঢুকছে আরেকটা বাইরের দিকে যাচ্ছে। বাইরে যেখানে বৃহত্তমে চলে যাচ্ছে সেখানে গিয়ে মন বাণী চুপ হয়ে যাচ্ছে, ভেতরে যেখানে যাচ্ছে সেখানেও একটা জায়গাতে গিয়ে মন, বাণী চুপ মেরে যাচ্ছে। তখন দেখছেন দুটো একই জিনিস, আত্মাও যা ব্রহ্মও তাই। সারা জগৎ আত্মাকেও জানে ব্রহ্মকেও জানে, কিন্তু আত্মাকে দেহ রূপে জানছে আর অন্নকে ব্রহ্ম রূপে জানছে। কেউ ভুল কিছু জানছে না, সবটাই ঠিক। কিন্তু সমস্যা হল, ধর্মের প্রধান কাজ আমাকে শোক মোহ থেকে টেনে নিয়ে আসবে, পারমার্থিক দৃষ্টিতে জন্ম-মৃত্যুর পারে নিয়ে যাওয়া। প্রধান কাজ শোক মোহ থেকে যে দুঃখ কষ্ট হয় সেই দুঃখ-কষ্ট থেকে বার করে নিয়ে আসা। দেহ আর অন্নকেই আত্মা আর ব্রহ্ম জেনে পরে থাকলে এই শোক মোহের মধ্যে শুধু হাবুডুবু খেয়ে যেতে হবে।

দেহকে যখন আত্মা রূপে জানছে তখন দেহাত্মা, ঠিকই জানছে। দেহ অন্ন দিয়ে চলে তাই অন্নই ব্রহ্ম, ঠিকই বলছে। পরের ধাপে গিয়ে দেখছে আমি হলাম আমার মন মনই ব্রহ্ম, তখনও ঠিক বলছে। পরের ধাপে দেখছে প্রাণ দিয়েই সব কিছু চলে, তখন বলছেন প্রাণই ব্রহ্ম। তখনও ঠিক বলছে। যখন বলছেন আকাশ ব্রহ্ম, তখনও ঠিক বলছে। প্রজাপতি ব্রহ্ম, সেটাও ঠিক। আর যেখানে মন, বাণী বন্ধ হয়ে যায় সেটাই ব্রহ্ম, সেটাও ঠিক। কিন্তু তারপরে তার আর যাওয়ার কোন জায়গা নেই। শাস্ত্র প্রত্যেকটি ধাপকে নিয়েই এগিয়ে গেছে, কোন ধাপকেই ছেড়ে দেয়নি। আপনি এখন ভেবে দেখুন কোন ধাপে আপনি নিজেকে পরিতৃপ্ত মনে করছেন। যে জায়গাতে আপনার শান্তি হয় সেই জায়গাতে গিয়ে দাঁড়ান। আমরা এখন যে হিরণ্যগর্ভসূক্তম্ নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি, এখানে একেবারে উপরের কথাও বলা হচ্ছে না আবার একেবারে নীচেও নেই, এখানে মাঝামাঝি ধাপের কথা বলা হচ্ছে, যেখানে প্রজাপতিকে ব্রহ্ম রূপে আরাধনা করা হচ্ছে। প্রজাপতিকেই পরের দিকে ব্রহ্মা বলা হচ্ছে।

এখন প্রশ্ন হল প্রজাপতিকে কি ব্রহ্ম রূপে আরাধনা করা যেতে পারে? কেন করা যাবে না! আমরা যদি শ্রীরামকৃষ্ণকে ব্রহ্ম রূপে আরাধনা করতে পারি, প্রজাপতিকেও করতে পারি, দোষের কিছু নেই। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণকে বা শ্রীকৃষ্ণকে বা শ্রীরামচন্দ্রকে যে ব্রহ্ম বলছি তখন দেখতে হবে আমি কী রূপে বলছি! ঠাকুর কামারপুকুরে জন্ম নিলেন আর কাশীপুরে দেহত্যাগ করলেন, তিনি কী করে ব্রহ্ম হতে পারেন! এর থেকে মুর্খ ধারণা আর কিছু হতে পারে না। যে জন্মাচ্ছে আর মরছে সে কি কখনও ব্রহ্ম হতে পারে! কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের যে সারবস্তু, ওই সারবস্তুর দিকে যদি যাওয়া শুরু হয় তখন এই আত্মা আর ব্রহ্মকে নিয়ে যে যাওয়ার কথা বলা হল, এখানেও ঠিক সেই জিনিসই হবে। ঋষিরা ধ্যানের গভীরে যেতে যেতে অবাক হয়ে দেখছেন, আরে তাই তো! আমি দেহ ঠিকই কিন্তু এরও পেছনে একটা শক্তি আছে। যেখানেই শক্তি তার পেছনেও আরেকটা শক্তি আছে। বাইরের দিকে প্রাণ থেকেই সব সৃষ্টি। বিজ্ঞানে যেমন সব কিছুর সৃষ্টির মূলে এ্যনার্জির কথা বলা হয় সেখানে ভুল কিছুই বলছে না। ঋষিরাও একই কথা বলছেন কিন্তু তার সাথে বলছেন প্রাণের পেছনেও আরেকটি বৃহত্তম সত্তা আছে। ঋষিরা ধ্যানের গভীরে যা কিছু দেখছেন সেটা যুক্তিতেও দাঁড়িয়ে যাচ্ছে, তা নাহলে চৈতন্যের ব্যাপারটাই আসবে না। বিজ্ঞান এখনও তাই চৈতন্যের কোন ব্যাখ্যা দিতে পারছে না, বিজ্ঞানীরা বলে দিচ্ছে সব কিছু মিলে যায় তখনই চৈতন্য হয়ে যায়। এটা কোন উত্তরই নয়। কিন্তু ঋষিরা বলছেন এর পেছনে একটা সমষ্টি মন আছে। সমষ্টি মনকেও ওই আকাশের মধ্যেই আসতে হচ্ছে। তাহলে সেটাও জড় হয়ে যাচ্ছে, তখন তাঁরা আরও পেছনের দিকে গিয়ে দেখছেন কোন এক চৈতন্য আছেন যিনি এগুলোর মালিক, কিন্তু তিনি জড়ের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন। এটাই প্রজাপতি, এটাই ঈশ্বর, এটাই ব্রহ্মা।

জড়ের সাথে জড়িয়ে আছে মানে নিশ্চয়ই এখানেও কিছু গোলমাল থাকতে বাধ্য। তখন আরেক ধাপ পেছনের দিকে চলে গেলেন, কিন্তু সেখানে যেতেই মন বাণী সব থেমে গেল। সেই অবস্থাকে বলছেন ওঁ, ব্রহ্ম বলছেন। এটা হলে বাইরের যাত্রা, অন্তরের যে যাত্রা সেই যাত্রা যেখানে গিয়ে শেষ হয় তাঁকে বলছেন আত্মা।

আরও ভালো করে বোঝার জন্য এটা মনে রাখতে হবে, দুটো সত্য আছে, একটা বহির্জাগতিক সত্য আর আরেকটি অন্তর্জাগতিক সত্য। আমি আর তুমি, একটা হল অস্মদ্ প্রত্যয় আরেকটা যুস্মদ্ প্রত্যয়। প্রত্যয় মানে বোধ, অস্মদ্ প্রত্যয় মানে আমি বোধ আর যুস্মদ্ প্রত্যয় মানে তুমি বোধ বা জগৎ বোধ। আমি বোধ যখন চলে তখন তার চলা দেহকে দিয়ে শুরু হয়, তারপর ধীরে ধীরে সেখান থেকে ভেতরের দিকে যেতে থাকে। আর যুস্মদ্ প্রত্যয়, এই যে বহির্জগতের বোধ, এই বোধ শুরু হয় খুব সাধারণ স্তর খাওয়া-দাওয়ার স্তর থেকে। সেখান থেকে ধীরে ধীরে এগোতে থাকে, তখন একটা স্তরে গিয়ে দেখে এই যে প্রাণ, তা সে যত রকমের প্রাণ হতে পারে, সমস্ত প্রাণের যে সমষ্টি, সেই সমষ্টি প্রাণই শেষ কথা। তখন সেটাই তার কাছে ব্রহ্ম। প্রাণকে ছেড়ে দিয়ে যখন আরও এগোতে থাকল তখন দেখছে আকাশই শেষ কথা, আকাশ থেকেই প্রাণের জন্ম, তারপর দেখে প্রজাপতি আর শেষ ধাপে আসে নির্গুণ ব্রহ্ম। ভেতরে দিকে যখন যাচ্ছে তখন দেখে আমি এই দেহ, এই দেহের পেছনেও রয়েছে মন, মনের পেছনে আছে বুদ্ধি, বুদ্ধির পেছনে সেই আত্মা। তারপরে দেখছে এই আত্মাও যা আর ওই নির্গুণ ব্রহ্মও তাই। এই বোধ আসার পর দেখছে যাবতীয় যা কিছু দেখছি সেই নির্গুণ ব্রহ্মই সব কিছু হয়েছেন, তিনি ছাড়া আর কিছু নেই। এসব কথা একবার দুবার শুনলে কিছুই ধারণা হয় না, দীর্ঘদিন ধরে শুনতে শুনতে একটা অস্পষ্ট ধারণা হতে শুরু করে। এরপর যত সাধনা করা হবে তত সেই ধারণা স্পষ্ট হতে থাকে। ঠাকুর তাই বলছেন শুনে রাখা ভাল।

কথামৃতে ঠাকুর অদ্বৈত বেদান্তী কি রকম হবেন বলছেন – জ্ঞানীর হাত কেটে দর দর করে রক্ত ঝরছে কিন্তু তিনি বলছেন, কই আমার তো কিছু হয়নি। কথামৃতের এই জায়গাটা প্রথম প্রথম পড়লে কিছুতেই মাথায় ঢোকে না, একজনের হাত কেটে গেলে কি তার ব্যাথা অনুভব হবে না! অবশ্যই তাঁর ব্যাথা অনুভব হবে। ঠাকুরের হাত ভেঙে গেছে, ঠাকুর জগন্মাতার কাছে গিয়ে কাঁদছেন আর বলছেন, মা বড্ড লাগছে। কিন্তু যখনই বলবেন আপনার কি ব্যাথা লাগছে? তখন বলবেন, না শরীরের লাগছে। শরীরের নার্ভ সেন্টারগুলি তো মরে যায়নি, কিন্তু আমি বলতে উনি জানেন আমি দেহ নই, আমি বলতে জানেন আমি মন নই। তাহলে ব্যাথা কার হচ্ছে? শরীরের হচ্ছে। বাচ্চার জামা ছিঁড়ে দিলে সে চিৎকার করতে শুরু করে দেবে। বাচ্চা তার নিজের জামার সঙ্গে একাত্ম বোধ করে রেখেছে। সব বাচ্চা জানে আমি আর আমার খেলনা এক, একটা খেলনা ভেঙে গেলে বা সরিয়ে দিলে বাড়ির সবাইকে অস্থির করে তুলবে। ঠিক তেমনি আমরা মনে করি আমি আর আমার দেহ এক। দেহের শুধু ব্যাথা হলেই নয়, দেহের সামান্য একটু এদিক সেদিক হয়ে গেলেই আমরা ভীত হয়ে পড়ি। দেহের সঙ্গে আমিত্বটা জুড়ে আছে। দেহের নাশ হয়ে গেলে আমার আমিত্বের নাশ হয়ে যাবে। এই আমিত্ব নাশই ভয়ের প্রধান কারণ। ভয় মানেই হল আমিত্ব নাশের সম্ভাবনা। টাকা-পয়সাকে যখন আমি ভাবছি তখন টাকা-পয়সা চুরি হয়ে গেলে মনে করছি আমার আমিত্ব নাশ হয়ে গেল।

জ্ঞানীর হাত কেটে রক্ত বেরোলে তাঁরও কষ্ট হবে, তাঁকেও ডাক্তারের কাছে গিয়ে ব্যাণ্ডেজ লাগাতে হবে। কিন্তু যদি জিজ্ঞেস করা হয় আপনার কি ব্যাথা লাগছে? না আমার কিছু লাগছে না, শরীরের লাগছে, আমি তো আত্মা, আত্মা তো নির্বিকার। জ্ঞানী জানেন তিনি আলাদা শরীর আলাদা। ঠাকুর বলছেন, নারকেল শুকিয়ে গেলে যেমন শাঁস আর মালা আলাদা হয়ে যায়, নাড়ালে ঢপর ঢপর আওয়াজ করে। জ্ঞানীরও জ্ঞানাগ্নিতে সব বিষয়রস শুকিয়ে গিয়ে আত্মা আর দেহ রূপ খোল আলাদা হয়ে যায়। বাস্তবিক এই রকমই হয়। আমরা এগুলো কান দিয়ে শ্রবণ করছি মাত্র, কিন্তু ঠাকুরের কাছে এগুলোই ছিল সাক্ষাৎ অনুভূতি, এগুলোই সত্য, এই সত্যের মধ্যেই তিনি দিবারাত্রি বিচরণ করতেন। রোমা রোঁলা ঠাকুরের জীবনী লিখতে লিখতে একটা জায়গায় থেমে গিয়ে বলছেন – আমরা এখন বিংশ শতাব্দীতেই আছি নাকি মধ্য যুগের কোন এক সময়ে আছি। ঠাকুরের এই কথাগুলো বিশ্বাস করা যায় না যে, কিছু দিন আগে দক্ষিণেশ্বরে এই জিনিসগুলি হয়েছিল। ঠাকুর ক্যান্সারে ভুগে ভুগে জীর্ণ, শরীরটা কঙ্কালসার, আর কদিন মাত্র বাঁচবেন। খেতে পারছেন না, জলটুকুও গিলতে পারছেন না, বিছানায় পড়ে আছেন। সেই সময় হরি মহারাজ এসেছেন, ঠাকুরকে দেখে বলছেন 'কোথায় তাঁর কষ্ট, দেখছি তিনি তো আনন্দে আছেন, সচ্চিদানন্দ সাগরে ভাসছেন'। ঠাকুর শুনে বলছেন 'ওরে শালা! ধরে ফেলেছে রে'। এটাই বাস্তব, তাঁর মন শরীরে নেই। দেহবোধে যদি মন নেমে আসে

তাহলে কষ্ট হবে, তাও ক্ষণিকের জন্য আসবে। শরীরে যদি মন না রাখেন তাহলে খাওয়া-দাওয়া হবে না, খাওয়া-দাওয়া না হলে শরীরটা আস্তে আস্তে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে শেষ হয়ে যাবে। যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অবতারের আসা বা তাঁর সঙ্গীদের আসা সেই উদ্দেশ্যটাই তখন নষ্ট হয়ে যাবে। সেইজন্য মহাপুরুষদের শরীরকে বিশেষ ভাবে যত্ন নিয়ে সামলে রাখা হয়। শরীরটা তাঁর আধার, আধারটাই যদি না থাকে তাহলে যে জিনিসের মাধ্যম দিয়ে তাঁর কার্যের প্রকাশ হবে, সেটাই আর হবে না। সোলার আলোতে সোলার প্যানেল যদি না থাকে সূর্যের আলো থাকলেও সোলার আলো স্টোর হবে না। অবতার বা মহাপুরুষরা হলেন ওই সোলার প্যানেল। যাঁরা ওই সুর্যের রশ্মিকে ধরে বিদ্যুতে রূপান্তরিত করেন। ঠাকুরের শরীরটা হল একটা বিশাল আকৃতির সোলার প্যানেল, যেখানে সেই সর্বব্যাপী চৈতন্যকে ধরছেন, ধরার পর মানুষের কাজে লাগার মত সেইভাবে রূপান্তরিত করে পরিবেশন করে দিচ্ছেন। সেইজন্য আমাদের প্রেসিডেন্ট মহারাজদের শরীরের প্রতি সবাইকে বিশেষ নজর দিয়ে সামলে রাখতে হয়, কারণ তাঁরাও এক একটা সোলার প্যানেল।

যাই হোক আমরা হিরণ্যগর্ভ সূক্তমের আলোচনায় ফিরে আসছি। আলোচনা করার আগে পুরুষসূক্তমের প্রসঙ্গ নিয়ে কিছু কথা বলে নিলে ভালো হবে। পুরুষসূক্তমে অধিপুরুষের কথা বলা হয়েছে, অধিপুরুষ মানে যিনি অধিকরণ করে রয়েছেন। একটা হল পুরুষ, যিনি সচ্চিদানন্দ। সচ্চিদানন্দ যখন তাঁর নিজের মায়াকে আশ্রয় করেন তখন তিনি এই জগৎ রূপে দেখান। ঈশ্বরকে দেখার দুটি পথ, একটা পথ হল, যোগ সাধনা করতে করতে বা জপ-ধ্যান করতে করতে হঠাৎ একদিন মনটা একটু একাগ্র হল। একাগ্র হওয়ার পর তাঁর চৈতন্য জ্যোতির দর্শন হল। চৈতন্য জ্যোতি দর্শনে তাঁর মনে হত লাগল যে এই যে ভৌতিক জগৎ আমি দেখছি, এই জগতের বাইরেও কিছু একটা আছে। সেখান থেকে আরও সাধনা করতে করতে একদিন দেখছেন, সেই একই চৈতন্য জ্যোতি সবারই ভেতরে আছে, আর সেটাই তাঁর বাস্তবিক সত্তা। অভিনয় করার সময় যেমন অভিনেতাকে চট্ করে বোঝা যায় না, কে এই অভিনয় করছে। কিন্তু মেক-আপ সরিয়ে দেওয়ার পর বোঝা যায় যে আসল লোকটি কে। আত্মা বা সচ্চিদানন্দের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হয়। ব্যক্তিত্বের উপর যে অনেক রকম আবরণ চাপান আছে, এই আবরণের মধ্যে আসল ব্যক্তিত্বটা চাপা পড়ে আছে। ওই আবরণের মধ্যে আত্মা হারিয়ে আছে। একটা একটা করে আবরণ সরিয়ে দেওয়ার পর আসল সত্তার প্রকাশটা ধরা পড়ে। আত্মার সুর কর্ণেন্দ্রিয় দিয়ে শ্রবণ করা যায় না, আত্মার স্বরূপকে জানা যায় না। কিন্তু ধ্যানের গভীরে যেতে যেতে একটা একটা করে পর্দা সরে যেতে থাকে, সব পর্দা সরে যাওয়ার পর যে সত্তার অস্তিত্ব থেকে যায়, তখন সে বোধে বোধ করে এই সেই আত্মা। এরপর সে ইচ্ছা করলে আবার পর্দা ফেলে দিয়ে আড়াল করে নিতে পারে, কারণ সে এখন আত্মার স্বরূপ জেনে গেছে। ঠাকুর খুব সুন্দর উপমা দিচ্ছেন, পদ্মলোচন বলে একজন বহুরূপী বাঘের মুখোস পড়ে ভয় দেখাচ্ছিল। একজন তাকে চিনতে পেরে বলছে – ওরে তুই আমাদের পোদো না! তখন সে তাকে ছেড়ে আরেকজনকে ভয় দেখাতে চলে গেল।

সাধক ধ্যানের গভীরে এভাবেই আত্মজ্যোতির দর্শন করেন, এই আত্মজ্যোতিই আত্মা, এটাই জ্ঞান। এরপর একটা অবস্থায় গিয়ে দেখেন সবারই ভেতর সেই একই আত্মজ্যোতি বিরাজ করছে, তার মানে আমিও যা তুমিও তাই। কিন্তু এখনও পৃথক সত্তা রূপে দেখাচ্ছে, আমার ভেতরে এক আত্মা, তোমার ভেতরে আরেক আত্মা। আরও গভীরে গিয়ে দেখেন পুরোটাই একটা চৈতন্যের মহা সমুদ্র। শেষ অবস্থায় দেখেন সচ্চিদানন্দের মহাসমুদ্র ছাড়া আর কিছু নেই। যা কিছু দেখছি এগুলো সব খোলস মাত্র, এর কোন মূল্য নেই। ঈশ্বরকে বোধে বোধ করার এটা একটা দিক। দ্বিতীয় আরেকটি দিক হল, এতক্ষণ নীচ থেকে উপরে গেছেন, দ্বিতীয়টি উপর থেকে নীচে। সচ্চিদানন্দই আছেন, কিন্তু এই সচ্চিদানন্দ কীভাবে এই জীব, জগতের স্তরে পৌঁছেছেন? তিনি শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ, শুদ্ধ সচ্চিদানন্দকে আমরা ধারণাই করতে পারি না। আমাদের কাছে এগুলো শব্দ মাত্র। ঠাকুর বলছেন, ঈশ্বরই সব হয়েছেন। ঘটি-বাটি সব ঈশ্বর এই নিয়ে নরেন হাজরার সঙ্গে হাসি-মজা করছেন, ঠাকুর গিয়ে নরেনকে ছুঁয়ে দিলেন, নরেন দেখছেন সবটাই চৈতন্য। বাড়িতে হরিণের মাংস রান্না হয়েছে নরেন খেতে পারছেন না। মা নরেনকে জিজ্ঞেস করছেন, তোর কি শরীর খারাপ? নরেন কোন উত্তরও দিচ্ছেন না। অস্থির হয়ে হেদুয়ায় গিয়ে রেলিংএ মাথা ঠুকে দেখছেন মাথায় লাগছে কিনা। মাথায় তো লাগবেই, কিন্তু দেহবোধ

নেই। তিন দিন পর মন যখন দেহবোধে নেমে এল তখন দেখছেন মাথাটা ফুলে গেছে। নরেন এই তিন দিন সত্যিকারের ঠিক কি দেখছিলেন আমাদের পক্ষে ধারণা করা অসম্ভব। নরেনের মত আধার তিনিও প্রথমে বুঝতে পারছেন না। সেই শুদ্ধ চৈতন্য থেকেই তো এই নিরেট জগৎ এসেছে। এ কথা শুধু হিন্দুরা বলছে না, প্রত্যেক ধর্মই একই কথা বলছে, প্রত্যেক ঋষি একই কথা বলছেন। এনারা বলছেন সেই যে শুদ্ধ চৈতন্য, কোথাও একটা অবস্থা থেকে সেই শুদ্ধ চৈতন্যের solidification শুরু হল। চৈতন্য কিভাবে সলিড হয় আমাদের ধারণার বাইরে, উপমার জন্য বলতে পারি জল ঠাণ্ডায় জমে বরফ হল। কিন্তু চৈতন্য কিভাবে বরফের মত সলিড হয় আমরা জানি না। শুদ্ধ চৈতন্যে এত কিছু যদি হয়ে থাকে তাহলে তো চৈতন্য দোষযুক্ত হয়ে যাবে, চৈতন্য তো তাহলে বিকার ধর্মী হয়ে গেল। বিকার ধর্মী মানে আত্মার মৌলিক বৈশিষ্ট্যের বিরোধী হয়ে যাওয়া। শাস্ত্র বলছে আত্মা অবিকারী। তাহলে এই জগৎ মায়া ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। মায়া এমন একটা শক্তি যেটা আছে অথচ নেই। এই শক্তি যখন আসে তখন যিনি সচ্চিদানন্দ তিনি জগৎ রূপে দেখান। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে সমষ্টি রূপে দেখাচ্ছে, পুরো জিনিসটা এক, সেটাই ঈশ্বর রূপ। ঈশ্বর দর্শন বলতে আমাদের সাধারণ একটা ধারণা হল, ঠাকুর যে মা কালীর দর্শন করলেন বা যে কেউ যখন তাঁর ইষ্টের দর্শন পান তখন জগৎ একদিকে আর মাঝখানে আলোকিত কোন কিছুর দর্শন হচ্ছে। ঈশ্বর যেন আলোময় কোন পুরুষ বা নারীর রূপ ধারণ করে সামনে এসে দাঁড়িয়ে যান। এগুলো সব বোকা বোকা ধারণা, অথচ আমরা এই ধারণা নিয়েই বসে আছি। ভগবান মানেই সব কিছুর সমষ্টি। জীব, জগৎ, চতুর্বিংশতিতত্ত্ব যা কিছু আছে এর সমষ্টি হলেন ঈশ্বর। ঈশ্বরকে আমরা সব সময়ই দেখছি, এই যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যা কিছু দেখছি সবটাই ঈশ্বরেরই রূপ। কিন্তু আমরা দেখছি চৈতন্য রহিত স্থূল রূপে। বিজ্ঞানীরা বলছে যা কিছু পদার্থ আছে সব জড় পদার্থ। তাই আমরাও সব সময় ঈশ্বরকে জড় রূপেই দেখছি। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকেই যখন চৈতন্য রূপে বোধ হয় তখন সেটাই ঈশ্বরের রূপ, এখানে কল্পনা বলে আর কিছু থাকে না, বাস্তবিক দেখেন। এরপর আবার যদি এক ধাপ পেছনের দিকে যাই, তখন দেখছি চৈতন্য থেকে দুম্ করে তো এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বেরিয়ে আসবে না, একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতিকে অনুসরণ করেই সব কিছু সৃষ্টি হবে। এই জিনিসটাকেই পুরুষসূক্তম্ বর্ণনা করছেন।

সৃষ্টির প্রথম যে জায়গাটাকে বোধ করা যাবে, ওই জায়গাকে ওনারা একটা ডিমের সাথে উপমা দিচ্ছেন। কারণ তাঁরা দেখছেন ডিম থেকেই সব কিছু উৎপত্তি হয়। সেইজন্য এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও যেন ডিম থেকে উৎপত্তি হয়েছে, যে ডিম থেকে পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বেরিয়ে আসবে সেই ডিম কোন সাধারণ ডিম হতে পারে না, তাই ঋষিরা নাম দিলেন সোনার ডিম। সোনার এক নাম হিরণ্য, তাই সোনার ডিমের অর্থ হয়ে গেল হিরণ্যগর্ভ। সোনার ডিম ভগবানেরই একটা রূপ। তিনিই আবার তার মধ্যে চৈতন্য রূপে প্রবেশ করেন। হিরণ্যগর্ভসূক্তমে যে *কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম* বলছেন, কস্মৈ শব্দের 'ক' মানে প্রজাপতি বা হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মা অর্থাৎ আমরা আমাদের হবিষা হিরণ্যগর্ভকে আহুতি দিচ্ছি। *কস্মৈ দেবা* বলতে কোন দেবতাকে আমরা যজ্ঞের আহুতি দেব এই অর্থও করা যায়, কিন্তু তখন আবার পুরো সূক্তমের ভাবের সাথে মেলাতে গেলে খাপছাড়া হয়ে যাবে। হিরণ্যগর্ভসূক্তমের প্রথম মন্ত্রে বলছেন –

হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ।
স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম।।১

পৃথিবী যখন সৃষ্টি হল তখন হিরণ্যগর্ভই ছিলেন। *পতিরেক আসীৎ*, হিরণ্যগর্ভ সব কিছুর মালিক, পতি মানে হয় মালিক। পৃথিবী আর আকাশ এই দুটোকে তিনি ধারণ করে আছেন। সেই দেবতা যিনি সৃষ্টির প্রথমে ছিলেন, যিনি সব কিছুর মালিক, সব কিছুকে যিনি ধারণ করে আছেন তাঁকেই আমরা আমাদের হবিষা প্রদান করলাম। সুবর্ণের আরেকটা অর্থ শুদ্ধ। ওনাদের অভিজ্ঞতায় দেখতেন সোনা কখন কলুষিত হয় না, সোনাকে যেমন আছে তেমন ছেড়ে দিলে একই ভাবে পড়ে থাকবে তাতে কোন রকমের কিছু মলিনতা আসবে না। পাশ্চাত্য জগতে নিউটনের মত বিজ্ঞানীদের কাছেও সোনার একটা আধ্যাত্মিক মূল্য ছিল। সোনাকে মানুষ জাগতিক ভোগ্য বস্তু বলে মনে করে, কিন্তু সোনা আসলে তা নয়। সুবর্ণের একটা আধ্যাত্মিক দিক আছে। মূল্যবান ধাতু বলেই নয়, ওর মধ্যে একটা পবিত্রতার ভাব রয়েছে। আমরা যাকে ভালোবাসি তাকে সোনা বলে

ডাকি, বাচ্চাদেরও অনেক সময় লক্ষ্মী সোনা বলে সম্বোধন করে থাকি। এখানেও সোনাকে মূল্যবান ধাতু বলে সম্বোধন করা হচ্ছে না। সোনার মধ্যে পবিত্রতার ভাব আছে বলে ওই ভাবে সম্বোধন করা হচ্ছে। খাঁটি সোনা দিয়ে অলঙ্কার তৈরী করা যায় না, খাঁটি সোনাতে খাদ মেশাতে হয়, যা খুবই কষ্টকর। এমনকি মাটির তলায় খাঁটি সোনাকে যদি অনেকদিন রাখা হয় আর হাজার বছর পর বার করলে যেমন ছিল তেমনই থাকবে।

হিরণ্যগর্ভ থেকে যাঁর জন্ম তিনিই প্রজাপতি। সৃষ্টির ব্যাপারে বলা হয়, ভগবান যখন পদার্থ আর আকাশ সৃষ্টি করলেন তখন তিনি তার মধ্যে আবার প্রবেশ করে গেলেন। ভগবান যে প্রবেশ করলেন, তিনি যেন সুবর্ণ বীজ রূপে ওর মধ্যে ঢুকে গেলেন, সেইজন্য হিরণ্যগর্ভ বলা হয়। এই দৃশ্যমান জগতের শ্রেষ্ঠ কাকে বলা হবে? যিনি প্রথম জাত হলেন, যিনি সব কিছুর মালিক, তাঁকে আমরা যে নামেই সম্বোধিত করি না কেন, তাঁর একটা নাম হিরণ্যগর্ভ, একটা নাম প্রজাপতি, পরের দিকে আরেকটি নাম হল ব্রহ্মা, আরও পরে বলছেন বিষ্ণুই ব্রহ্মা হয়েছেন, আবার বলছেন যিনি ঈশ্বর তিনিই সেই, পরে বললেন যিনি নির্গুণ ব্রহ্ম তাঁকেই মায়ার দরুণ সগুণ ব্রহ্ম রূপে দেখাচ্ছে। আধ্যাত্মিক দর্শনের চিন্তা-ভাবনার যখন বিবর্তন হতে শুরু হয় তখন অনেক রকম ধারণা যেগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে সেগুলোকে আস্তে করে এক জায়গায় নিয়ে আসা হয়। হিরণ্যগর্ভের ব্যাপারটা কে কিভাবে দেখবে সেটা তার ব্যাপার। সে দেখতে পারে, যিনি সচ্চিদানন্দ তাঁর উপর যেন একটা মায়ার আবরণ পড়েছে, ওই মায়ার আবরণ দিয়ে তাঁকে যেটা দেখাচ্ছে সেটাই হিরণ্যগর্ভ। দ্বৈতবাদীদের মত সে যদি সৃষ্টিকে সত্য বলে মনে করে, তাহলে এই সৃষ্টিতে প্রথম যিনি জাত হয়েছেন, যিনি সব কিছুর মালিক তিনিই হিরণ্যগর্ভ। এরপর তাঁকে যে নামেই সম্বোধিত করা হোক, হিরণ্যগর্ভই বলুন, প্রজাপতিই বলুন, মনুই বলুন তাতে কিছু আসে না। মূল কথা, দৃশ্যমান জগৎ যখন সৃষ্টি হল তখন এই সৃষ্টিতে তিনিই সব কিছু, তাঁর থেকেই সব কিছু এবার বেরোতে আরম্ভ করবে, সেইজন্য তিনি হলেন সব কিছুর রাজা, *পতিরেক আসীৎ*। আরও পরে গীতায় এসে এই ভাবকেই ভগবান এইভাবে বলছেন, *পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ*। ভগবান বলছেন, এই জগতের আমি পিতা। কারণ চৈতন্য রূপে তিনিই পিতা হয়ে প্রবেশ করেছেন। ডিমে যেমন ফার্টিলাইজেশান হয় তেমনি প্রকৃতিও একটা ডিমের মত, প্রকৃতিতে ফার্টিলাইজেশান তখনই হয় যখন পুরুষ অর্থাৎ চৈতন্য প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ করে। সেইজন্য তিনি জগতের পিতা। আবার বলছেন আমি জগতের মা, কারণ ওই যে প্রকৃতি সেটাও আমি। ভগবান ছাড়া দ্বিতীয় কারুর অস্তিত্ব নেই। ধাতা, আমিই সব কিছুকে ধারণ করে আছি, সবার রসদ আমিই যোগান দিচ্ছি। আমি আবার পিতামহ। কারণ প্রকৃতির যা কিছু আছে, যার থেকে সব কিছুর সৃষ্টি হচ্ছে, তারও বাবা আমি। হিরণ্যগর্ভও ঈশ্বর, কিন্তু সাধারতঃ ঈশ্বরের ব্যাপারে আমাদের যে ধারণা তা ঈশ্বরের প্রকৃত ধারণার বাইরে। ঈশ্বরের ধারণা করা আমাদের ক্ষমতার বাইরে, সেইজন্য হিরণ্যগর্ভের মাধ্যমে সেই ধারণাকে আরও ঘনীভূত করে দিলেন। খ্রীশ্চানদের যে গড্ তাঁর সাথে হিরণ্যগর্ভ পুরোপুরি মিলে যায়। মুসলমানরা যখন আল্লা বলে তার মধ্যে নৈর্ব্যক্তিক ভাবটা খুব প্রবল। কিন্তু মুসলমানদের আল্লার ব্যাপারে যে সাধারণ বিশ্বাস ও ধারণা তার সাথেও হিরণ্যগর্ভ পুরোপুরি মিলে যায়। যখনই নামকরণ হয়ে যাবে তখন আপনি যে কোন নামেই তাঁকে সম্বোধিত করা যেতে পারে, তাঁকে ব্রহ্মা বলতে পারি, বিষ্ণু বলতে পারি, শ্রীরামকৃষ্ণ বলতে পারি। কিন্তু তাঁর মধ্যে কয়েকটি শর্ত থাকতে হবে, যিনি এই জগতকে জন্ম দিয়েছেন, যিনি এই জগতকে ধারণ করে আছেন, যিনি সব কিছুর মালিক আর ধ্যানের গভীরে যাঁকে উপলব্ধি করা যাবে। হিরণ্যগর্ভের বৈশিষ্ট্য হল, ধ্যানের গভীরে তাঁকে উপলব্ধিও করা যায় আর তাঁকে আহুতিও দেওয়া যায়। নির্গুণ ব্রহ্মকে কখনই আহুতি দেওয়া যায় না।

আজ আমরা যেভাবে এক লাফে নির্গুণ ব্রহ্ম, সগুণ ব্রহ্ম বলে দিচ্ছি, ঋষিরা এক ধাপে নির্গুণ ব্রহ্মে আসেননি। তাঁরা আলাদা আলাদা ধ্যান করেছেন, নিজের নিজের মত চিন্তন-মনন করেছেন সেই অনুসারে তাঁরা নিজেরা উন্নিত হয়েছেন। শাস্ত্র অধ্যয়ন করছি বলে আমরা সবাই সাধক। ঠাকুর যেটা স্বাভাবিক ভাবে করতেন সেটাই আমাদের চেষ্টা করে, করার ইচ্ছে নেই তাও কষ্ট করে করতে হয়। সেইজন্য পরমতত্ত্বকে আমাদের বিভিন্ন ভাবে আগে দেখে নিতে হয়, কখন ঐদিক থেকে কখন এই দিক থেকে। কৃষ্ণকথা জানার জন্য আমাদের ভাগবত দেখতে হয় আবার শ্রীরামকৃষ্ণের কথা দেখার জন্য কথামৃত দেখতে হয়। তাঁরই কথা

আমাদের পুরুষসূক্তমে দেখতে হয়, তাঁরই কথা আবার হিরণ্যগর্ভসূক্তমে দেখতে হয়। আমাদের পূর্বজরা সেই এক পরমসত্ত্বাকে কত ভাবে দেখেছেন আর কত ভাবে বর্ণনা করেছেন সেগুলোকেও আমাদের জানতে হবে। তত্ত্বের দিক থেকে সবটাই এক কিন্তু বর্ণনার দিক থেকে সব আলাদা আলাদা। সাধনার অঙ্গ রূপে প্রত্যেকটি জিনিসকে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে দেখা উচিৎ, যাতে আধ্যাত্মিক সাগরে ডুবে থাকা যায়। ইয়ং ছেলেমেয়েরা তোতাপাখির মত বলে ঈশ্বর এক। ঠিকই বলছে, ঈশ্বর যা আল্লাও তাই। কিন্তু তার আগে একটাকে অন্তত দর্শন করুক তবেই বলতে পারবে সবটাই সমান। তার আগে পুরুষসূক্তম্, হিরণ্যগর্ভসূক্তম্, গীতা, ভাগবত, উপনিষদ, কথামৃত সবটাই দেখতে হবে। তারপর নিজের রুচি অনুযায়ী যে কোন একটা আবকে অবলম্বন করে নিজের সাধনায় ডুবে গিয়ে নিজেকে উপলব্ধি করতে হয়। কিছুই দেখা নেই কিন্তু বলে দিচ্ছি ঈশ্বর এক। অনুভূতি না হওয়া পর্যন্ত সবটাই আলাদা মনে হবে। আজকের দিনে ভগবান বলতে যা বোঝায়, হিরণ্যগর্ভ বলতে ঠিক তাই বোঝায়। বেদে ভগবান শব্দ নেই, ঈশ্বর শব্দও বেদে নেই, ব্রহ্ম শব্দ বেদে নেই। এই শব্দগুলি আমাদের ধর্মশাস্ত্রে পরের দিকে এসেছে। আমরা অধ্যয়ন করছি বেদ, বেদের শব্দের সাথে এখনকার শব্দের অনেক তফাৎ। শব্দের তফাৎ থাকাতে শব্দের যে অর্থ তারও একটু একটু তফাৎ আছে। আজকের ভাষায় যদি *কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম* এই কথার অনুবাদ করা হয় তখন বলা হবে আমরা সেই ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি যিনি এই জগৎ সৃষ্টি করলেন, যিনি সব কিছুর মালিক, যিনি পৃথিবী আর আকাশকে ধারণ করে আছেন। খ্রীশ্চান ধর্মে সৃষ্টির বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়, ভগবান সাত দিনে এই পৃথিবীকে সৃষ্টি করলেন, তিনি বললেন Let there be a light সেখান থেকে তিনি পৃথিবীর সৃষ্টি করলেন, চন্দ্রমার সৃষ্টি করলেন। ঠিক এই জিনিসটাই এখানে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। হিরণ্যগর্ভ একটি শব্দ মাত্র।

প্রথম মন্ত্রের প্রথম লাইনে বলছেন, *হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে*। নাসদীয় সূক্তে বলছেন *নাসাদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং*, তখন সৎও ছিল না অসৎও ছিল না বা উপনিষদে বলছেন *আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ*, সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ একমাত্র আত্মস্বরূপেই বর্তমান ছিল। কিন্তু এখানে বলছেন সৃষ্টির প্রথমে হিরণ্যগর্ভই ছিলেন। সৃষ্টির প্রথমে হিরণ্যগর্ভ ছিলেন, এই তথ্য কিভাবে জানা গেল? ধ্যানের গভীরে ঋষিদের জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে। এই জ্ঞান যদি মনের কল্পনা হয়, ভুলভাল হয়? আমাদের কিছু করার নেই। মনের কল্পনা অবশ্যই হতে পারে। তাহলে প্রমাণটা কি? এটাই প্রমাণ যে, ঋষিরা ছিলেন একেবারে শুদ্ধ হৃদয়ের, তাঁদের মধ্যে কোন স্বার্থবুদ্ধি ছিল না, তদুপরি একাধিক ঋষি একই ধরণের সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। সেইজন্য আমাদের মানতে হয়। যদি বলেন আমি মানতে পারছি না, তাহলে আপনাকে মানতে হবে না, এটা আপনার জন্য নয়। ধ্যানের গভীরে গিয়ে তাঁরা দেখছেন বহির্জগতে প্রাণই শেষ কথা। তারপর আরও ধ্যানের গভীরে যাওয়া শুরু করলেন, একটা জায়গায় গিয়ে দেখছেন সমষ্টি বুদ্ধি বা মহৎ এটাই সব। সেখান থেকে আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে দেখছেন যিনি স্রষ্টা তিনিই সব হয়েছেন। কিন্তু উপনিষদে এসে স্রষ্টাই যে সব এটাও থাকবে না, সেখানে আরেক ধাপ পিছিয়ে চলে যাবেন।

আগেই আমরা বললাম এই সূক্তে ধ্যানও করা যায় আবার আহুতিও দেওয়া যায়। নির্গুণ ব্রহ্মকে আহুতি দেওয়া যাবে না। হিরণ্যগর্ভসূক্তম্ হল বেদ, বেদ মানে আহুতি দেওয়া যাবে। আহুতি দেওয়ার জন্য একজন দেবতা থাকতে হবে, দেবতা না থাকলে আহুতি দেওয়া যাবে না। এখানে এই আহুতি দিচ্ছেন প্রজাপতিকে, যাঁর আরেকটি নাম হিরণ্যগর্ভ আবার তাঁকে শুধু ক নামেও সম্বোধিত করা হয়। *সমবর্ততাগ্রে*, একেবারে সমান রূপে তিনিই একমাত্র ছিলেন। ইসলাম বা খ্রীশ্চান ধর্মে সৃষ্টির বর্ণনাতে আকাশও যে সৃষ্টি হয়, এই ব্যাপারটা কোথাও উল্লেখ নেই। ওনাদের মতে আকাশ আছে, ভগবান ওই আকাশের মধ্যেই আছেন। মহাশূন্যের মধ্যে ভগবান সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী ও তারকাগুলিকে বসিয়ে দিলেন। কিন্তু ঋষিরা এভাবে দেখছেন না, এই থিয়োরীকেও তাঁরা মানছেন কিন্তু তার সাথে বলবেন সৃষ্টির আগে আকাশ বলে কিছু ছিল না। প্রথম যখন স্পেস সৃষ্টি হল তখন তা একটা ছোট্ট সোনার ডিমের মত, এটাই হিরণ্যগর্ভ আর সেই সুবর্ণ ডিম বড় হতে শুরু করল, অর্থাৎ আকাশ বিস্তার হচ্ছে। যেমন যেমন আকাশ বা স্পেস বিস্তার লাভ করছে তেমন তেমন স্পেস তৈরী হচ্ছে। নীচ থেকে আকাশকে তলবৎ দেখায়, একটা কড়াইকে উল্টে দেওয়ার পর নীচ থেকে আকাশকে

ঠিক এই উল্টে রাখা কড়াইয়ের মত দেখা। ঋষিরাও এটা জানতেন কিন্তু বলছেন তোমার দৃষ্টিভ্রমের জন্য আকাশকে তলবৎ দেখছ। বেদান্তে সব সময় এই তলবৎ বলবৎ শব্দকে নিয়ে আসা হয়, সেখানেও তাঁরা বলছেন আকাশকে যে তলবৎ বলবৎ দেখাচ্ছে এটা তোমার মনের ভুল। আর মলবৎ, আকাশের যে রঙ দেখাচ্ছে এটাও মনের ভুল। কিন্তু আকাশ এই রকমই দেখায় বলে আমরা মেনে চলি।

বিজ্ঞান আজ বলছে স্পেস সীমিত আর আমরা চিরদিনই মানি যে আকাশ সীমিত। স্পেস সীমিত হওয়া মানে কোথাও না কোথাও গিয়ে আকাশেরও তল হতে হবে। পৃথিবী যেমন গোলাকার তেমনি স্পেসকেও ওই রকম হতে হবে। তাহলে স্পেসের বাইরে কি আছে? এই প্রশ্ন হয় না। এখানে বলছেন, পুরো স্পেসের যে নিট যোগফল (sum total) যার ভেতরে সব কিছু আছে, এর সবটা মিলিয়েই হিরণ্যগর্ভ। তার মানে সৃষ্টি মানেই হিরণ্যগর্ভ। তিনি ওটার ভগবান, তিনি ওটার সমষ্টি রূপ আর তাঁরই সৃষ্টিগুলি এক একটা আলাদা আলাদা। এটাকে ধারণা করা একটু কঠিন হয়ে যায়। স্পেস যেটা সেটাও তিনি, জীব-জন্তুর সমষ্টি যেটা সেটাও তিনি আর জীব-জন্তুর যিনি স্রষ্টা সেটাও তিনি। তাহলে আমি যে জন্ম নিয়েছি, আমার স্রষ্টা কে? আবার আমরা একই প্রশ্নে চলে যাচ্ছি, ব্রহ্ম কে? বৃহৎই ব্রহ্ম। আমার বাবা-মা আমাকে জন্ম দিয়েছেন। কিন্তু আমার ঠাকুর্দা ঠাকুরমা এনারা যদি না থাকতেন তাহলে আমার বাবা-মাও আসতেন না। আমার ঠাকুর্দা আর ঠাকুরমারও বাবা-মার অবদান আছে আমার জন্ম হওয়ার পেছনে। এইভাবে পেছনের দিকে ঠেলে ঠেলে নিয়ে গিলে শেষে আসবেন সেই হিরণ্যগর্ভ, তাহলে হিরণ্যগর্ভই বা ঈশ্বরই সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা। কিন্তু আরেক ধাপ পেছনে গেলে ব্রহ্ম থেকেই সব কিছু বেরিয়েছে। আমিও তাহলে সেই ব্রহ্ম, আমার জন্মও নেই মৃত্যুও নেই। নির্ভর করে আমি কোন দৃষ্টিভঙ্গী ও অনুভূতির স্তরে দাঁড়িয়ে আছি। আমার দৃষ্টিভঙ্গী যেমন হবে তার পরিণাম ও ফলও সেই রকমই হবে। প্রথম হল তোমার আগে কে ছিল? তোমার বাবা-মা ছিল। তার আগে কে ছিল? ঠাকুর্দা ছিলেন। এই করে করে আগে কোথায় যাবে? এ্যনার্জিতে যাবে। এ্যনার্জির পেছনে কে ছিলেন? হিরণ্যগর্ভ ছিলেন। তাঁর পেছনে কে ছিলেন? বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবাল্ক্যকে গার্গী যেমনি এই প্রশ্ন করেছেন যাজ্ঞবল্ক্য বলছেন – এর উপরে গেলে তোমার মাথা খসে পড়ে যাবে। হিরণ্যগর্ভের পেছনে কে আছেন? আর এই প্রশ্ন হয় না। যদি বলেন আত্মা আছেন, এটা কোন উত্তরই নয়। ভৌতিক জগৎ বলতে আমরা যাকে জানছি, এই ভৌতিক জগতের শেষ কথা সব সময় হিরণ্যগর্ভ বা প্রজাপতি বা ব্রহ্মা, আজকের দিনে আমাদের ভাষায় ঈশ্বর।

ভূতস্য জাতঃ, সৃষ্টি যখন হয়নি তখন মায়াধ্যাক্ষ রূপে প্রজাপতি ছিলেন, তখন তিনি করলেন কি, যাবতীয় যা কিছু আছে, এ্যটম থেকে শুরু করে উপরের দিকে দেবতা পর্যন্ত সব কিছুর তিনি জন্ম দিলেন। সেটাই এখানে বলছেন তিনি *ভূতস্য জাতঃ*। *ভূতস্য জাতঃ* যখন বলছেন তখন বলছেন পরমাত্মাই হিরণ্যগর্ভ। কিন্তু সৃষ্টি কার্যের মধ্যে বিভিন্ন কার্যের যে প্রকারভেদ এসে গেছে সেইজন্য নামটা আলাদা করে বলা হচ্ছে। সায়নাচার্য তাঁর ভাষ্যেও বলছেন, ঈশ্বর কখন সরাসরি সৃষ্টিকার্য করেন না। ঠাকুরকে একজন বলছে, ঈশ্বর কাউকে বড় কাউকে ছোট করেছেন, ঈশ্বরের মধ্যে বৈষম্য দোষ আছে। শুনে ঠাকুর খুব রেগে গিয়ে বলছেন, তোমার তো মহা বেনে বুদ্ধি। পরমাত্মার উপর যাতে বৈষম্য দোষ না আসে তাই সৃষ্টিকার্য সব সময় একটা ধাপ নীচ থেকে করান হয়। এগুলো অতি সাধারণ ব্যাপার তাই এর কোন মূল্য নেই। কিন্তু তিনিও যে সৃষ্টি করেন সেটা করেন আগের আগে যে কর্মগুলি জমেছিল সেই কর্মের অনুসারে। বলছেন যাবতীয় যা কিছু সৃষ্ট হচ্ছে সব হিরণ্যগর্ভই সৃষ্টি করছেন। আমাদের মনে রাখতে হবে বাস্তবে হিরণ্যগর্ভই পরমাত্মা, কিন্তু যেহেতু কার্য করছেন তাই তাঁকে এভাবে দেখানো হয়েছে। যেমন একজন লোক, অফিসে তিনি অফিসার আবার বাড়িতে তিনি বাবা, কাজ বিশেষে তাঁকে আলাদা আলাদা ভাবে সম্বোধন করা হচ্ছে।

পতিঃ, সব কিছুর তিনি মালিক। *একঃ*, তিনি একা। *একঃ* কেন বলছেন? অদ্বিতীয়, তিনি ছাড়া দ্বিতীয় আর কিছু নেই। হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মার স্তরে তিনি ছাড়া আর কেউ নেই, যদিও পুরাণাদিতে কাহিনী রূপে অনেক কিছু নিয়ে আসা হয়েছে। যেমন বলা হয়, সৃষ্টির যখন সময় হল তখন হঠাৎ ক্ষীরসাগরে অনন্তনাগের উপর শায়িত ভগবান বিষ্ণুর নাভি থেকে একটা পদ্ম প্রস্ফুটিতে হয়ে গেল, আর সেই পদ্মের উপর ব্রহ্মাকে দেখা যাচ্ছে। ব্রহ্মা চারিদিকে তাকিয়ে দেখছেন কোথাও কিছু নেই। ভগবান তখন তাঁকে আদেশ করলেন তুমি

তপস্যা কর। তপস্যা করার পর তিনি সৃষ্টি করতে শুরু করলেন। কি রকম সৃষ্টি করলেন? আগের আগের কল্পে যে রকমটি সৃষ্টি হয়েছিলে তারই অনুরূপ সৃষ্টি করলেন। সৃষ্টিতে তিনি *একঃ আসীৎ*, তিনি অদ্বিতীয়। অদ্বিতীয় কি করে হবেন, ভগবান বিষ্ণু তো আছেন? ব্যাপারটা তা নয়, যিনি ভগবান তিনিই মায়ার দরুণ আরেক রূপে দেখাচ্ছেন। সৃষ্ট জগৎ, যেখানে সৃষ্টি হয়ে গেছে সেখানে তিনি একাই আছেন। তারপরে যা আছে, সেটাকে নিয়ে কথা চলে না, হিসাবের মধ্যেও আনা যায় না। নাসদীয়সূক্তে বলছেন *নাসাদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং*, তখন সৎও ছিল না অসৎও ছিল না, এখানে এসে পাল্টে গেল। সৎ মানে যেটা ইন্দ্রিয় দিয়ে জানা যায়, সেটা ছিল না। অসৎ মানে, একেবারে যে কিছু ছিল না তাও বলা যাবে না। হিরণ্যগর্ভসূক্তমে এসে নির্দিষ্ট করে দিয়ে বলছেন *একঃ*। যে মুহুর্তে তাঁকে *একঃ* বলে দেওয়া হল, তখন তিনি কিন্তু একেশ্বরবাদীদের ঈশ্বর হয়ে গেলেন।

একেশ্বর বলতে বোঝায় একজন ঈশ্বর আছেন। একজন যে ঈশ্বর আছেন তিনিই একেশ্বরবাদীদের ঈশ্বর। হিরণ্যগর্ভসূক্তমকে তাই একেশ্বরবাদী সূক্ত বলা হয়, যেখানে একজন ঈশ্বরের কথা বলা হচ্ছে। ঈশ্বর এক আর এক ঈশ্বর, এই দুটো কথাতে অনেক তফাৎ। এক ঈশ্বর বলা মানে একজন ঈশ্বর আছেন, এটাই একেশ্বরবাদ যেটা খ্রীশ্চান আর ইসলামদের গড্ বা আল্লা। আর যখন বলা হবে ঈশ্বর এক তখন সেটাই হিন্দু ধর্ম হয়ে যাবে। ঈশ্বর এক বলে দেওয়ার পর এবার তাঁকে শ্রীরামই বলুন, শ্রীকৃষ্ণই বলুন আর শ্রীরামকৃষ্ণই বলুন তার অর্থ একই হবে তিনিই সব। কিন্তু এক ঈশ্বর বললেই হয়ে যাবে আল্লা ঈশ্বর বা গড্ ঈশ্বর, এখানে বলছেন হিরণ্যগর্ভ *একঃ আসীৎ*। বেদেই একেশ্বরবাদ ধারণা এসেছিল, কিন্তু এই ধারণাকে তাঁরা পরে রাখলেন না। তবে সূক্ত রূপে থেকে গেছে, কেউ যদি হিরণ্যগর্ভের স্তুতি করতে চায় তাতে কোন দোষ নেই।

তারপরে বলছেন *স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং*, *দাধার* বলছেন ধারণ করার অর্থে। হিরণ্যগর্ভ পৃথিবী আর তার উপরে যে আকাশ তাকে ধারণ করে আছেন। তিনি ধারণ করে আছেন বলেই কোন কিছু নিজের নিজের জায়গা থেকে ছিটকে বেরিয়ে যাচ্ছে না। এই জিনিসগুলো একশ বছর আগেও আমরা বুঝতে পারতাম না। বিজ্ঞানের দৌলতে এখন অনেক কিছু পরিষ্কার হয়ে গেছে। এই যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ছড়িয়ে আছে, সেখান থেকে কোন কিছু ছিটকে বেরিয়ে যাচ্ছে না, যে যার নিজের কক্ষপথকে ধরে একটা নির্দিষ্ট পন্থায় এক অপরকে প্রদক্ষিণ করে যাচ্ছে, পৃথিবী সূর্যের দিকে ছুটে যাচ্ছে না, চন্দ্র পৃথিবীর দিকে ধাবিত হচ্ছে না, কোন কিছুই ফেটে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে না, বা এক অপরের মধ্যে ধাক্কা লেগে সব ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে না, এটা কি করে সম্ভব হচ্ছে? আমরা বলব মাধ্যাকর্ষণের জন্য। ঠিকই, কিন্তু এই মাধ্যাকর্ষণের শক্তি, যে শক্তির জন্য এক অপরকে প্রদক্ষিণ করে যাচ্ছে, কেউ তার কক্ষপথ থেকে ছিটকে অন্য কিছুর মধ্যে ভেঙে পড়ছে না, এই শক্তিও ভগবানেরই শক্তি। ভগবানের শক্তিই সব কিছু নির্দিষ্ট একটা দূরত্বে অবস্থান করে প্রদক্ষিণ করে যাচ্ছে, এটাকেই বলছেন *স দাধার*। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যত যা কিছু আছে সব কিছুকে আমিই ধরে রেখেছি। এখানে বলছেন হিরণ্যগর্ভ সব কিছুকে ধরে আছেন, তিনিই ভৌতিক শক্তি রূপে সব কিছুকে ঠিক ঠিক ভাবে চালিত করছেন। পরের দিকে কাহিনী তৈরী করে বলছেন ভগবান দশজন দিগ্‌গজ সৃষ্টি করে অর্থাৎ দশটি হাতিকে দিয়ে দশ দিকে দাঁড় করিয়ে পৃথিবীকে ধারণ করে রেখেছেন। ব্যাপারটা তা নয়, এনাদের বক্তব্য হল যে শক্তি সব কিছুকে ধারণ করে আছে, সেই শক্তি ভগবানেরই শক্তি।

মন্ত্রের শেষে বলছেন *কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম*। পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা এর অর্থ করেন, কোন একজন দেবতা আছেন যিনি এর সব কিছুর জন্য দায়ী, আমরা কোন দেবতার উদ্দেশ্য আহুতির প্রদান করব? কিন্তু আমাদের পরম্পরার যে অর্থ তাতে পরিষ্কার বলা হয়, এর জন্য দায়ী হিরণ্যগর্ভ বা প্রজাপতি, প্রজাপতির আরেকটি নাম 'ক', সেই 'ক'কে আমরা প্রণাম করছি বা আহুতি প্রদান করছি। ভাষ্যকার বলছেন 'ক' মানে অনির্জ্ঞাত, অনির্জ্ঞাত মানে যাঁকে জানা যায় না। ঈশ্বরকে জানা যায় না, সেইজন্য ঈশ্বরের নাম 'ক'। 'ক'এর দ্বিতীয় অর্থ করছেন, যিনি কামনা করেন। হিরণ্যগর্ভ কামনা করলেন, আমি এক আমি বহু হব, এই কামনার জন্য সৃষ্টি হল, সেইজন্য তাঁর নাক 'ক'। 'ক'এর তৃতীয় অর্থ *কম্*, *কম্* মানে সুখ, ঈশ্বর সুখস্বরূপ। যেমন বলা হয় তিনি রসস্বরূপ, *রসো বৈ সঃ*, ঠিক সেই রকম তিনি সুখস্বরূপ সেইজন্য তাঁর নাম 'ক'। 'ক'এর চতুর্থ

অর্থ কারণস্বরূপ, সব কিছুর তিনি কারণ, সব কিছুকে তিনি জন্ম দিয়েছেন। তাঁকে জানা যায় না, তিনি কামনা করেছেন, তিনি সুখস্বরূপ আর তিনি কারণস্বরূপ এই চারটের জন্য যিনি স্রষ্টা, যিনি প্রজাপতি তাঁকে ‘ক’ বলা হয়। সেইজন্য *কস্মৈ* শব্দের অর্থ কখনই কোন দেবতা হয় না। *কস্মৈ* মানে, সেই প্রজাপতিকে আমরা আহুতি দিচ্ছি। *কস্মৈ দেবায়* যখন বলছেন তখন আরও বিশেষ করে বলছেন প্রজাপতি দেবতা। পুরুষসূক্তমে বলছেন তিনি দেবতাদিদের রচনা করেছেন, এখানে এক ধাপ নেমে এসে সগুণ ঈশ্বরের কথা বলতে গিয়ে দেবতার কথা বলছেন। তিনি দান করেন সেইজন্য দেবতা, তিনি সব কিছুকে দীপ্যমান করেন সেইজন্য তিনি দেবতা।

ব্যাকরণের অনেক নিয়ম থাকার জন্য অন্য অনেক পণ্ডিত এর অনেক রকম ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু এখানে একেবারে পরিষ্কার, *কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম* এর অর্থ সায়নাচার্যের মত ভাষ্যকাররা এভাবেই করেছেন, প্রজাপতিকে আমরা আহুতি দিচ্ছি। বেদান্তের দৃষ্টিতে বলবে, যিনি ভগবান তিনিই তাঁর মায়ার শক্তিতে ঈশ্বর রূপে দেখান। ঈশ্বর রূপে যখন দেখান তখন তিনিই বাকি সব কিছু সৃষ্টি করতে শুরু করেন। তবে এখানে যিনি ঈশ্বর তিনিই হিরণ্যগর্ভ বললে জিনিসটা সেভাবে দাঁড়াবে না। কারণ বেদের সময়ের যে হিরণ্যগর্ভ আর আজ ঈশ্বরকে যেভাবে বলা হয় এই দুটোর মধ্যে বোঝার একটা তফাৎ আছে। তাহলে শ্রীরামকৃষ্ণকে কি আমরা হিরণ্যগর্ভ বলতে পারি? না, বলতে পারি না, কারণ শ্রীরামকৃষ্ণ সৃষ্টিতে প্রথম নন।

সৃষ্টিতে প্রথম যাঁকে দেখা যায় বেদে তাঁকেই হিরণ্যগর্ভ বলছে, আবার অনেক সময় প্রজাপতিও বলা হয়, পুরাণে এসে তাঁকে ব্রহ্মা নামে বলছেন আর ইদানিং কালে তাঁকে ঈশ্বর রূপে সম্বোধিত করছে। ব্রহ্ম শুদ্ধ চৈতন্য, মায়ার আবরণ দিয়ে যখন শুদ্ধ চৈতন্যকে দেখছি তখন তাঁকেই আমরা ঈশ্বর বলছি। ব্রহ্ম আর ঈশ্বরের মধ্যে এটাই মূল তফাৎ। মায়ার আবরণ দিয়ে দেখা মানেই সৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। হিরণ্যগর্ভ সূক্তে তাঁরই স্তুতি করা হচ্ছে। সেই অনন্তের মধ্যে যেন একটা স্থান ও কাল এসে গেল, স্থান ও কাল এসে যাওয়া মানে সৃষ্টির বীজ এবার আকারে বড় হতে শুরু করেছে। অনন্ত সমুদ্রের কল্পনা যদি করা হয়, যে সমুদ্রের কোন কুল কিনারা নেই। যেদিকেই যাই শুধু সমুদ্র আর সমুদ্র, কোথাও কিছু নেই। এটাই সচ্চিদানন্দ সমুদ্র, এর বেশি কল্পনা বা অর্থ করতে যাওয়া ঠিক হবে না। চৈতন্যের কোন বিভাজন নেই, তিনি আছেন মাত্র আর তিনি চৈতন্য স্বরূপ ও আনন্দ স্বরূপ। এবার সেই চৈতন্য থেকে যেন সৃষ্টি হবে। হঠাৎ একটা বীজ তৈরী হয়ে গেল। বীজটা যেমন যেমন আকারে বড় হতে থাকছে তেমন তেমন চৈতন্য যেন সরে সরে যাচ্ছে। এটাকে বোঝার জন্য একটা ঘরের কল্পনা করা যেতে পারে, যে ঘরটা পুরো ধোঁয়াতে ভরে আছে, ধোঁয়াটাও কল্পনা, কারণ ধোঁয়ার অনেক পার্টিকেলস থাকে, চৈতন্যের কোন পার্টিকেলস হয় না। এবার একটা বেলুন নিয়ে সেই ঘরে গিয়ে ফুঁ দিয়ে ফোলাচ্ছি, বেলুনটা যেমন যেমন বড় হচ্ছে তেমন তেমন ওই জায়গার স্পেসটা অন্য রকম হতে শুরু করেছে। অথচ বেলুনের বাইরে ভেতরে ওই বাতাসই আছে। যে জায়গাতে বীজটা এসেছে আর ওই বীজ যে বড় হতে শুরু হল, এটাকেই বলছেন ব্রহ্মাণ্ড। এই ব্রহ্মাণ্ড তো সাধারণ কোন অণ্ড নয়, সেইজন্য বলা হয় হিরণ্যগর্ভ, হিরণ্য মানে সুবর্ণ, সুবর্ণময় গর্ভ। এই যে সৃষ্টি শুরু হল, এর মধ্যে চৈতন্যের বীজ এই বীজ হিরণ্ময়। কারণ ভগবানের যে চৈতন্য সেই চৈতন্যের বীজ গেছে বলে ব্রহ্মাণ্ড বড় হতে শুরু করেছে।

ব্রহ্মাণ্ড বড় হতে শুরু হওয়া মানে যিনি সমস্ত জীবের সমষ্টি তিনি এবার একটা প্রক্রিয়াতে সৃষ্টি করতে থাকলেন। তিনি কিভাবে সৃষ্টি করেন আমাদের জানার কথা নয়। বেদের ঋষিরা ধ্যানের গভীরে গিয়ে দেখছেন জিনিসটা এই রকম। জিনিসটাকে জানার পর এবার তাঁরা ধ্যানের গভীর থেকে নেমে এসে তাঁকে তাঁদের শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন। মানব জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হল ক্ষুদ্র আমিকে বৃহৎ আমিতে নিয়ে যাওয়া। ক্ষুদ্র আমি থেকে বৃহৎ আমিতে রূপান্তরিত হওয়াকে আমরা দু ভাবে দেখতে পারি। একটা হল ক্ষুদ্র আমি থেকে আমি বৃহৎ আমি হয়ে যাচ্ছি। আরেকটি হল, আমি সব সময় বৃহৎই আছি কিন্তু নিজেকে ক্ষুদ্র মনে করছি, এই ক্ষুদ্র মনে করাকে বন্ধ করে দেওয়া। বেদান্ত যদিও দ্বৈত, বিশিষ্ট ও অদ্বৈত সবাইকে নিয়েই চলে আর বেদান্তই একমাত্র ধর্ম, সেই বেদান্তের অদ্বৈত বেদান্তকে নিয়ে যাঁরা চলেন তাঁরা সব সময় মনে করেন আমি আসলে বৃহৎই আছি কিন্তু নিজেকে ক্ষুদ্র মনে করছি, এই মনে করাটা কোন ভাবে আমাকে বন্ধ করে দিতে হবে। বেদান্তের যাঁরা দ্বৈতবাদী যাঁরা ভগবানকেই সব কিছু মনে করেন, তাঁরা মনে করেন, আমি ক্ষুদ্র এবং আমি ভগবান থেকে আলাদা হয়ে

গেছি, আমাকে কোন রকমে জো সো করে ভগবানের কাছে যেতে হবে। আচার্য শঙ্করের ভাষ্যাদি পড়ে বিচার করলে দেখা যাবে এই দুটোর মধ্যে তফাৎ বিশেষ কিছু নেই।

স্বামীজীর যে বিখ্যাত উক্তি Each soul is potentially divine, এখন এই divinity আমার within আছে নাকি without আছে তাতে কিছু আসে যায় না। আমি সেই পূর্ণ ব্রহ্ম হতে পারি, আমি আগে থেকেই পূর্ণ ব্রহ্ম আছি নাকি জো সো করে চেষ্টা করে হতে পারি, তাতে কিছু আসে যায় না। এরপর স্বামীজী যেটা বলছেন, do this either by work or worship or psycic control or by knowledge, অর্থাৎ যেভাবেই হোক আমাকে করতে হবে। বেদের ঋষিরা যজ্ঞের পথ বার করলেন। যজ্ঞ সব থেকে সহজ পথ, অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা হয়েছে, বড় বড় ঋষিতুল্য পুরোহিতরা আছেন, অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হচ্ছে, সেখানে কল্পনা করা হচ্ছে এই যে অগ্নি দেবতা তিনি দেবতাদের কাছে আমার আহুতি নিয়ে যাবেন। আজও আমরা তাই করছি, দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে মা ভবতারিণীর পূজো দিচ্ছি, পূজো দিলে মা আমাদের কামনাগুলি পূরণ করে দেবেন, মা আমাদের জীবনের সব রকম কষ্ট নিবারণ করে দেবেন। বেদের ঋষিরাও প্রথমের দিকে মনে করতেন দেবতারাই আমাদের সব রকমের সুখ ও সমৃদ্ধি দেন। দেবতাদের উদ্দেশ্যে যদি আহুতি দেওয়া হয় তাহলে দেবতারা তৃপ্ত হবেন, যদিও দেবতারা এমনিতেই আমাদের অনেক কিছু দেন, তৃপ্ত হলে আরও ভালোভাবে দেবেন। সেখান থেকে কোন কোন ঋষির মনে সন্দেহ হতে শুরু করল, জীবনের সুখ সমৃদ্ধি তো আমাদের জীবনের শুধু উদ্দেশ্য হতে পারে না। ঋষিদের মনে অনেক ধরণের প্রশ্ন উদয় হল, সাথে সাথে দেবতাদের বর্তমান ধারণাটা তাঁদের পাল্টাতে শুরু হল। দেবতাদের সম্বন্ধে তাঁদের প্রথমে ধারণা ছিল দেবতারা মানুষের মতই তবে তাঁদের ক্ষমতা অনেক বেশি। পরের দিকে এই ধারণাটা সরে গিয়ে ঋষিরা দেখছেন সেই অনন্তেরই মুর্ত রূপ হলেন দেবতারা। বেদের কিছু কিছু যজ্ঞে যে সব মন্ত্র বা সূক্তকে ব্যবহার করা হয়, সেই সব মন্ত্রে দেবতাদের মনে করা হচ্ছে ক্ষমতার দিক দিয়ে তাঁরা যেন মানুষেরই বৃহৎ রূপ, আবার অনেক মন্ত্রেই পরিষ্কার ভাবে বোঝা যায় সেই অনন্তেরই যেন পূজা করা হচ্ছে।

অনন্তের চিন্তন করা, চিন্তন করে অনন্তের ধারণা করা খুব কঠিণ ব্যাপার। বর্তমান ইংরাজীতে idea বলতে যা বোঝায় বেদের সময়ে শব্দ বলতেও তাই বোঝাত, আমাদের ভাষায় বলতে পারি বিচার বা ভাব। কিন্তু আমাদের কাছে শব্দ মানে কতকগুলি অক্ষরের বিন্যাস। বিচার করলে দেখা যাবে, একটা তত্ত্ব আছে, সেই তত্ত্বের একটা আইডিয়া আছে আর তার একটা শব্দ আছে। যখন ‘শ্রীরাম’ বলছি, তখন শ্রীরাম একটা তত্ত্ব, শ্রীরাম একটি আইডিয়া এবং শ্রীরাম একটি শব্দ। শ্রীরামচন্দ্রের সাধনা করে যিনি শ্রীরামচন্দ্রকে সাক্ষাৎ করেছেন, তিনিই জানেন শ্রীরাম তত্ত্বটা কি। শ্রীরাম তত্ত্বকে তিনি যখন কাউকে বলছেন, তখন শ্রোতাদের মধ্যে যাঁর আধার ভালো তিনি সেটাকে আইডিয়া রূপে নিয়ে নেন, আধার যদি সাধারণ হয় তিনি সেটাকেই শব্দ রূপে নেবেন। যে কোন তত্ত্ব এই তিনটে স্তরে চলে – শব্দ, আইডিয়া আর সত্য। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে যা কিছু আধ্যাত্মিক তত্ত্ব আছে সেগুলো তত্ত্ব রূপেই তাঁর কাছে আছে। ঠাকুর যখন বলছেন ঈশ্বরই আছেন, তাঁর কাছে এটাই সত্য। এই সত্যকে ঠাকুর যখন ভক্তদের বলছেন তখন তিনি ওই তত্ত্বকে একটা বিচার রূপে সবার সামনে রাখছেন। ভক্তদের মধ্যে যাঁরা ঠাকুরের কথা সরাসরি শ্রবণ করছেন তাঁদের সবার গ্রহণ ধারণ করার ক্ষমতা সমান ছিল না। যেমন নরেন ঠাকুরের কথা আইডিয়া রূপে নিচ্ছেন বাকিরা শব্দ রূপে নিচ্ছেন। যাঁরা শব্দ রূপে নিচ্ছেন, তাঁদের অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে আইডিয়ার লেভেলে যেতে হয়। আইডিয়া থেকে তত্ত্বের লেভেলে যাওয়া কচিৎ কখন কয়েকজন মুষ্টিমেয় সাধকের পক্ষে সম্ভব। বেদ শব্দের মহাসমুদ্র। যিনি তত্ত্বজ্ঞানী, সত্যকে সাক্ষাৎ করেছেন, তিনি সবাইকে সেই তত্ত্ব বললেন, দেখছেন তাঁর সামনের ব্যক্তি সেটা বুঝতে পারলো না, তখন তিনি আরেক ভাবে ঘুরিয়ে বলছেন, সেটাও না বুঝতে পারলে অন্য ভাবে বলছেন, যাকে বলছেন সেও শুধু শব্দের জালে জড়িয়ে যাচ্ছে। আরও বেশি বাজে অবস্থা হয় যখন ঋষিদের শিষ্যরা অন্যদের বলেন তখন আরও বেশি শব্দের জাল তৈরী হয়ে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত সবাই এই শব্দ জালের মধ্যে হারিয়ে যায়।

বেদের এই বিখ্যাত সূক্তগুলো অধ্যয়ন করার সময় আমাদেরও কখনই শব্দের দিকে না গিয়ে আইডিয়া অর্থাৎ ভাবের দিকে যেতে হবে। ব্রাহ্মণরা সারা জীবন শুধু বেদ মুখস্ত করতেই থাকতেন, মুখস্ত করতে করতে

আইডিয়াগুলিকে নিয়ে চিন্তন করার সময়ই পেতেন না। আইডিয়ার চিন্তন না করে আবার যখন কিছু লেখালেখি করছেন সেটাও একটা শব্দ জালের সৃষ্টি হয়ে যেত, সেই লেখার উপর যখন আবার অন্য একজন ভাষ্য দিচ্ছেন সেটাও শব্দ জাল। বেদের সব মন্ত্রই রচিত হয়েছে তত্ত্বদর্শিদের দ্বারা, যে তত্ত্বগুলিকে তাঁরা সাক্ষাৎ দর্শন করেছেন সেটাকেই কয়েকটি শব্দের মাধ্যমে একটা আইডিয়া রূপে রেখে দিলেন। এরপর তাঁরা শিষ্যদের বলছেন সেই যে পরমপুরুষ, যিনি জগতস্রষ্টা প্রজাপতি ইত্যাদি। এবারে আমরা এখন জগৎস্রষ্টা বলতে মনে করি শ্রীরামকৃষ্ণ জগতস্রষ্টা। কিন্তু বেদের ঋষিদের কাছে যখন এটাই তত্ত্ব রূপে সাক্ষাৎ হচ্ছে তখন দেখছেন যে জায়গাতে সৃষ্টিটা শুরু হল, সেই সৃষ্টিতে যিনি প্রথম তিনিই স্রষ্টা। কিন্তু আমরা এখন ব্রহ্মার যে কাজ সেই কাজও ঠাকুরের উপর চাপিয়ে দিয়েছি, শিবের যে কাজ বিনাশ করা সেটাও ঠাকুরের উপর চেপে গেছে আর বিষ্ণুর পালনকর্তা রূপে যে কাজের দায়ীত্ব ছিল সেই দায়ীত্বও এখন ঠাকুরের কাঁধে চেপে গেছে। এতে যে দোষের কিছু আছে তা নয়, শুধু বেদে আলাদা আলাদা নাম ছিল। কিন্তু আইডিয়ার দিক দিয়ে বা বিচারের ভেতর দিয়ে যদি যাওয়া হয় তখন সেই একই জিনিস থাকবে। সেই শুদ্ধ চৈতন্যের উপর মায়ার আবরণ এসে যেতেই যখন সৃষ্টির কাজ শুরু হচ্ছে তখন যিনি সৃষ্টি করছেন তাঁর নাম ব্রহ্মা বা প্রজাপতি বা হিরণ্যগর্ভ বা ঈশ্বর বা শ্রীরামকৃষ্ণ। যখন বিনাশের সময় এসে গেল তখন যিনি বিনাশ করে দিচ্ছেন তাঁর নাম শিব, তাঁরই নাম শ্রীরামকৃষ্ণ। তাহলে শিব সৃষ্টি করতে পারেন কিনা? অবশ্যই পারবেন, শুধু নামটা পাল্টে দিতে হবে। মায়ার আবরণের পরে যিনি স্রষ্টা আপনি তাঁকে বলছেন শিব, কোন অসুবিধা নেই। ব্রহ্মা নাশ করতে পারবেন কিনা? অবশ্যই পারবেন। তবে ব্রহ্মার ক্ষেত্রে একটা সমস্যা হয়ে যাবে, পুরাণে ব্রহ্মার ব্যক্তিত্বকে এত বেশি স্বচ্ছ করে দেওয়া হয়েছে যে তাঁকে আর বিনাশের কাজে নেওয়া যায় না। তাহলে শিব কি করে সৃষ্টি করতে পারবেন? কারণ শিবকে ঈশ্বরের সঙ্গে এক করে দেওয়া হয়েছে, ঈশ্বর তিনটিই করেন, সেইজন্য কোন দোষ নেই। তার মানে শব্দের কোন প্রাধান্য নেই। শব্দ কি ইঙ্গিত করছে সেটাকে না ধরে আমরা শব্দের মধ্যেই হারিয়ে যাচ্ছি। মা তার বাচ্চাকে চাঁদ দেখাচ্ছে। মা চাঁদের দিকে আঙুল রেখে বাচ্চাকে বলছে, আমার আঙুলের ডগার দিকে দেখ, আঙুলের সোজা যেটা দেখা যাচ্ছে সেটা চাঁদ। বাচ্চা আঙুলের ডগাকেই দেখে বলছে, বুঝেছি তোমার আঙুলটাই চাঁদ। আমাদেরও বাচ্চার মত অবস্থা। আঙুলটা চাঁদ নয় আঙুলের ডগা যেদিকে নির্দেশ করছে সেটাই চাঁদ। দৃষ্টিটা চাঁদে দিতে বলা হচ্ছে, আঙুলের ডগায় নয়। শব্দকে দেখা মানে আঙুলের ডগাকে দেখা, চাঁদ দেখা মানে ভাবকে বোঝা।

সৃষ্টি যখন শুরু হয়ে গেছে তখন তার একটা নাম দেওয়াই যেতে পারে, কারণ এখন নাম-রূপের এলাকায় এসে গেছে, মায়া মানেই নাম-রূপের এলাকা। নাম-রূপের এলাকায় এসে যাওয়ার পর এর যা খুশি নাম দেওয়া যেতে পারে। নাম দেওয়ার সময় শুধু মনে রাখতে হবে যে তাঁর বৈশিষ্ট্যগুলি যেন নামের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকে। যাঁকে আমি হিরণ্যগর্ভ নাম দিলাম তাঁর কি বৈশিষ্ট্য? বলছেন *ভূতস্য জাতঃ*, তিনি সবাইকে জন্ম দেন। *একঃ*, তিনি একা ওখানে আর কেউ নেই। উপনিষদে বলছে *একোহম্ বহুস্যাম্ প্রজায়িমি*, আমি এক আমি বহু হব। শুধু একাই নন, *পতিরেক*, সবারই মালিক তিনি, তাঁর আর কেউ মালিক নেই। পুরাণের কাহিনী অনুযায়ী বিষ্ণু ব্রহ্মার মালিক। এর মধ্যে আবার অনেক ব্যাপার আছে, সব বিষ্ণু পুরাণে এটাই বেশি পাওয়া যায়। দ্বিতীয় আরেকটি ব্যাপার হল, মানুষ যাতে ভুল না ভাবে যে হিরণ্যগর্ভই শেষ কথা সেইজন্য বিষ্ণু আর ব্রহ্মাকে আলাদা রাখা হয়েছে। আবার একজন বিষ্ণু আছেন যিনি পালনকর্তা, আবার আরেকজন বিষ্ণু আছেন যিনি আদিত্যদের মধ্যে একজন দেবতা। এতগুলো বিষ্ণুকে নিয়ে যাতে কোন সংশয় না হয় তাই বিষ্ণুর আরেকটি নাম দিলেন নারায়ণ। নারায়ণ মানে সেই ঈশ্বর, নারায়ণই আছেন, নারায়ণ ছাড়া কিছু নেই। শুদ্ধ চৈতন্যের উপর যখন মায়ার আবরণ আসে তখন স্রষ্টাকে যেন দেখা যায়, সেই স্রষ্টাকে পুরাণ বলছে ব্রহ্মা। মায়ার আবরণে যিনি পালক হয়ে যান তাঁকে বলছেন বিষ্ণু। সেই মায়ার মধ্যে যিনি সংহার করছেন তাঁকে বলছেন শিব। তত্ত্ব একই থাকছে। তাঁকে যদি হিরণ্যগর্ভও বলেন, ব্রহ্মা বলেন, ঈশ্বর বলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন তাতে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু এক একটা নামের সাথে বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য জড়িয়ে থাকে বলে আমরা সব

সময় সব নাম ব্যবহার করি না। কিন্তু ব্যবহার করতে কোন দোষ নেই, শুধু দেখতে হবে এই লক্ষণগুলো আছে কিনা, তিনি স্রষ্টা, তিনি ধারণ করে আছেন, তিনি এক আর তিনি সব কিছুর পতি, জগৎপতি, জগতের মালিক।

য আত্মদা বলদা যস্য বিশ্ব উপাসতে প্রশিষং যস্য দেবাঃ।
যস্য চ্ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম।।২

দু নম্বর মন্ত্রটি খুব নামকরা মন্ত্র, প্রায়ই এই মন্ত্রকে বিভিন্ন জায়গায় উল্লেখ করা হয়। *য আত্মদা*, যিনি সবার ভেতরে আত্মচৈতন্য দেন। বায়োলজিতে প্রথমেই প্রশ্ন করে living and non-livingএর মধ্যে কি পার্থক্য। আমাদের শাস্ত্রানুসারে livingএর একটাই লক্ষণ, প্রাণী মাত্রেই আমি ভাব থাকবে। আমি ভাব মানেই হয় অভিনিবেশ, অভিনিবেশের অর্থ সে মরতে চাইবে না, যে কোন প্রাণীকে মৃত্যুর দিকে নিয়ে গেলে সে কিন্তু প্রতিক্রিয়া করবেই। বায়োলজিতে সংজ্ঞা দিচ্ছে response to stimulate, তবে মনে হয় এই সংজ্ঞাতে কোথাও একটা ভুল আছে। তবে পণ্ডিতরা যে বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করেছে, সেই বিষয়ের উপর আপনি যদি কিছু ভুল বার করতে যান আপনাকে দাবিয়ে দেবে। নেপোলিয়নের আগে ফ্রান্স খুব ধর্মীয় দেশ ছিল, সবাই ক্যাথলিক ছিল। তখনকার দিনে সেখানে একজন নাস্তিক এসে প্রমাণিত করে দিচ্ছে যে ঈশ্বর বলে কিছু নেই। সেই সময়কার রাজা খুব মুশকিলে পড়ে গেছে, একে কি করে দাবাতে হবে ভেবে যাচ্ছেন। ফ্রান্সে সেই সময় একজন নামকরা গণিতজ্ঞ ছিলেন। তাঁকে খবর দেওয়া হল, আপনি এসে এই সমস্যার কিছু একটা সমাধান করে দিন। সেই গণিতজ্ঞ সোজা এসে রাজদরবারে লোকটিকে ডেকে আনালেন। আসার পর গণিতজ্ঞ অঙ্কের ফর্মুলা দিয়ে বলছেন $(a+b)^2/c=d$, so God exists। নাস্তিক ভদ্রলোক গণিত জানতই না, তার উপর বীজগণিত আরও বিচিত্র জিনিস। সে বেচারী কিছু বুঝতেই পারছে না কি বলছে! ততক্ষণে সবাই হো হো করে দিয়েছে। বেচারী তখন প্রাণ নিয়ে পালিয়ে গেল। কাউকে যদি দাবাতে হয় তখন এমন ভাষায় বলতে হবে যে সে যেন কিছু না বুঝতে পারে। সংস্কৃতের পণ্ডিতদের কিছু বলতে গেলেই চারটে শ্লোক এমন ঝেড়ে দেবে যে আপনি পালাবার রাস্তা পাবেন না। বায়োলজির পণ্ডিতরাও জিন, ডিএনএ নিয়ে এমন বিচিত্র বিচিত্র সংজ্ঞা দিতে শুরু করবে যে আপনি এর মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারবেন না। যদি আপনি ধর্মশাস্ত্রের দিক দিয়ে প্রশ্ন করেন সজীব আর নির্জীবের মধ্যে কি পার্থক্য, তখন এনারা একটা কথাই বলবেন – তুমি আগে দেখ জীবনের প্রতি তার আসক্তি আছে কিনা। জীবনের মধ্যে যদি আসক্তি থাকে তাহলে সে living। তাহলে গাছ কি সজীব না নির্জীব? পুরোপুরি সজীব। ইদানিং নতুন যে মেশিন বেরিয়েছে তাতে রেকর্ডিং করতে গিয়ে স্পষ্ট ধরা পড়ছে একজন লোক কুড়ুল নিয়ে গাছ কাটতে আসছে দেখে গাছেরা রীতিমিত চেঁচাতে শুরু করে দিয়েছে, এক গাছ অপর গাছকে সঙ্কেত পাঠাতে থাকে, দেখো দেখো আমাকে কাটতে আসছে। একজন লোক গাছের তলায় একটা খুন করেছিল। সেই মেশিন নিয়ে ওই লোকটিকে নিয়ে যখন গাছের তলায় গেছে গাছটি তখন চিৎকার করতে শুরু করে দিয়েছে। আদালত অবশ্য এই প্রমাণকে গ্রাহ্য করেনি। তাহলে পাথরের মধ্যেও কি প্রাণ আছে? পাথরও প্রতিরোধ করে, অবশ্যই প্রাণ আছে কিন্তু অত্যন্ত ক্ষীণ অবস্থায়। জড় বা নির্জীব মানেই আমাকে রক্ষা করতে হবে এই বোধটা নেই। ভাইরাস থেকে শুরু করে সমস্ত প্রাণীর মধ্যে এই বোধ আছে যে আমাকে নিজেকে রক্ষা করতে হবে, প্রাণী অনুসারে রক্ষা করার বিভিন্ন পদ্ধতি থাকে। প্রাণ থাকা মানেই সেখানে defence mechanism থাকবে, কিন্তু পাথর, মাটি, ধুলো, বালি এদের defence mechanism থাকে না। আমিত্বকে রক্ষা করার চেষ্টা যেখানেই থাকবে সেখানেই জীবন থাকবে। *য আত্মদা*, যিনি এই বোধটা প্রাণীদের মধ্যে দিচ্ছেন, আমাকে বাঁচতে হবে, আমাকে নিজেকে রক্ষা করতে হবে। মানুষের কথা ছেড়ে দিন, একটা ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া এদের সবারই এই বোধ আছে, ওদের কাউকে মারতে গেলে সেও বাঁচার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবে। পিঁপড়েকে মারতে গেলে সেও একটা মরণ কামড় দিয়ে বাঁচার চেষ্টা করে যাবে।

যোগসূত্রে পতঞ্জলি এটাকেই বলছেন অভিনিবেশ, আমি মরব না। তিনি সমস্ত প্রাণীদের মধ্যে এই আত্মচৈতন্য দিয়ে রেখেছেন সেইজন্য সে কখনই মরতে চাইছে না। *বলদা*, আত্মচৈতন্য দেওয়ার সাথে সমস্ত প্রাণীর মধ্যে তিনি শক্তিও দিয়ে দেন, যে শক্তির সাহায্যে সে নিজেকে রক্ষা করতে পারবে। প্রথমে দিচ্ছেন আমিত্ব, তারপরে দিচ্ছেন বাঁচার সুযোগ। আমাদের মধ্যে যে আমি বোধ বা আত্মচৈতন্য অর্থাৎ আমি বোধটা

দিয়ে রেখেছেন, সাথে *বলদা*, বল দিয়ে দিলেন, সেটা কে দিয়েছেন? এবার আপনি ভাবতে থাকুন তিনি কে। তিনি ঈশ্বর হতে পারেন, হিরণ্যগর্ভ হতে পারেন, ব্রহ্মা বলতে পারেন, প্রজাপতিও বলতে পারেন। এখানে এই মন্ত্রের দেবতা হিরণ্যগর্ভ। হিরণ্যগর্ভ কি করছেন? তিনি সব কিছুর স্রষ্টা, আজকে আমি যে আছি আর আমার যা কিছু আছে সব হিরণ্যগর্ভের জন্য আছে। আমার মধ্যে তিনি আমিত্ব বোধ দিয়েছেন, আমি মরতে চাই না, বাঁচার চেষ্টা করার শক্তি দিয়েছেন। মানুষের নামে কলঙ্ক দিলে সে বাঁচার চেষ্টা করবে, খুন করতে গেলে সে বাঁচার চেষ্টা করবে, দরকার হলে সে আপনার পায়ে পড়ে যাবে। কিন্তু যদি কোনঠাসা করে দেন, যদি সে বুঝে যায় আমার আর বাঁচার কোন পথ নেই এবার তোমাকেই আমি শেষ করে নিজে শেষ হয়ে যাব। এটাই *বলদা*, তিনি বল দিয়ে রেখেছেন। যে মানুষের মধ্যে শক্তি নেই, মিনমিনে পিনপিনে, এদের উপর ঈশ্বরের কৃপা নেই।

যস্য বিশ্বে উপাসতে, যিনি সবাইকে আত্মচৈতন্য দিচ্ছেন, বল দিচ্ছেন তাঁর সামনে সবাই মাথা নত করে, সবাই তাঁরই উপাসনা করে। *প্রশিষং যস্য দেবাঃ*, দেবতারাও তাঁর শাসনে থাকেন। আজকের দিনে বেদান্ত থেকে আমরা ঈশ্বর, ভগবান এই শব্দগুলি বলছি কিন্তু তখনকার দিনে এই শব্দগুলি ছিল না, তখনকার দিনে ছিল সৃষ্টিতে যাঁর প্রথম জন্ম তিনিই সব কিছুর মালিক। আজ বেদান্ত সব কিছুকে সুন্দর ভাবে সমন্বয় করে দেওয়ার জন্য আমরা জানি হিরণ্যগর্ভ ঈশ্বরেরই একটা রূপ। সেই ঈশ্বর যখন সৃষ্টি করেন তখন তিনিই সব কিছুর মধ্যে আত্মচৈতন্য রূপে প্রবেশ করে তাঁকে শক্তি দিচ্ছেন, একটা পিঁপড়ের মধ্যেও তিনি শক্তি দিচ্ছেন। একমাত্র মানুষই কাপুরুষ হয়ে দাঁড়ায়। কোন জীবই নিজের স্বভাবকে ছেড়ে দেয় না, একমাত্র মানুষই তার স্বভাবকে ছেড়ে দেয়।

যস্য চ্ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ, সেই হিরণ্যগর্ভের ছায়া অমৃত আর সেই হিরণ্যগর্ভের ছায়াই আবার মৃত্যুও। কবিতা রূপে এই লাইনটি অতি উচ্চমানের কবিতা। ভগবানের স্বরূপের বর্ণনা করতে গিয়ে বলছেন, যাঁর ছায়া অমৃত যাঁর ছায়া মৃত্যু। মৃত্যু ছায়ার মত তাঁর পেছনে পেছনে চলতে থাকে, তার মানে মৃত্যু তাঁর কাছে খড়কুটোর মত। এখানে এটা বলতে চাইছেন না যে মৃত্যু তাঁর সঙ্গী, বলতে চাইছেন মৃত্যু তাঁর কাছে কিছুই না। আমি আছি আর আমার ছায়া আছে, আমার ছায়ার কি কোন মূল্য আছে! ছায়া ছায়ার মত আছে এই ছায়াকে নিয়ে আমি কী করব! সেই রকম যমরাজ তাঁর কাছে খড়কুটো। মৃত্যুর বিপরীত হল অমৃত। অমৃতকে এখানে মুক্তি মনে করে ভুল করলে চলবে না, কারণ মুক্তিটা তাঁর স্বভাব, সৎ স্বরূপটাই তাঁর স্বভাব, এখানে সেটার কথা বলা হচ্ছে না। অদ্বৈত তত্ত্বে ঈশ্বরের কোন রকম দ্বন্দ্ব আসতে পারে না, যেটা বিপরীত সেটা কখনই চলবে না। জীবন ও জগতের কোন কিছুই পরিভাষিত করা যায় না। এই জীবনকে, জগতকে যদি আমরা পরিভাষিত করতে চাই তখন জগতের কোন কিছুর ব্যাপারেই আমরা দৃঢ় ভাবে বলতে পারি না। কিন্তু একটা জিনিসকে নিশ্চিত করে বলা যেতে পারে তা হল, জীবনের একটাই ধ্রুব সত্য হল মৃত্যু। আর কে নারায়ণ একটা সুন্দর কথা বলছেন, Separation is the eaternal law of life, জীবনের একটাই নিয়ম সেটা হল বিচ্ছেদ। মৃত্যু তারই একটা রূপ। তুমি যতই হাস, যতই কাঁদ মৃত্যু তোমাকে একদিন টেনে নিয়ে চলে যাবে। সূর্যোদয় নাও হতে পারে, আকাশে চন্দ্রের উদয় নাও হতে পারে কিন্তু মৃত্যু থাকবেই। বিজ্ঞানীরা বলছেন গ্রহ নক্ষত্র, গ্যালাক্সি যা কিছু আছে সব কিছু একদিন ব্ল্যাকহোলে চলে যাবে, ব্ল্যাকহোলে চলে যাওয়া এটাও মৃত্যু। মৃত্যু কি অদ্বৈত ভাব? না, মৃত্যুর উল্টো হল অমৃত। কিন্তু এখানে আপেক্ষিক ভাবে বলতে চাইছেন। অমৃত এখানে মুক্তিকে বলা হচ্ছে না। দেবতাদের জীবন বা ব্রহ্মার জীবন যেমন মানুষের তুলনায় কোটি কোটি গুণ লম্বা; আচার্য শঙ্কর উপনিষদের কয়েক জায়গায় এর উল্লেখ করে বলছেন এসব জায়গায় দর্শনের দিক থেকে আপেক্ষিক মুক্তির কথা বলা হচ্ছে, আপেক্ষিক মুক্তি মানে ব্রহ্মা বা দেবতাদের মত অনেক দিন। ঈশোপনিষদে যেখানে বলছেন *বিনাশেন মৃত্যুং তীর্ত্বা*, সেখানেও মৃত্যু আর অমৃতের কথা বলছেন বা যেখানে *বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুত* বলছেন সেখানেও একই কথা বলছেন। ঈশোপনিষদে যেখানে যেখানে মৃত্যু আর অমৃতের কথা আসছে আচার্য বলছেন সেখানে আপেক্ষিক মুক্তির কথা বলা হচ্ছে। মানুষের থেকে দেবতাদের জীবন যেমন অনেক বেশি, দেবতাদের থেকে আবার সিদ্ধদের জীবন অনেক লম্বা, এখানে সেই অনন্তের কথা বলছেন। এই কথাই বলছেন, মৃত্যু আর অমরত্ব দুটোই তাঁর কাছে ছায়ার মত, কিছুই নয়। যে সত্যিকারের

ভগবানকে চাইছে সে মৃত্যুকেও কামনা করে না অমরত্বেরও কামনা করে না, অমরত্ব মানে আপেক্ষিক অমরত্বের কথা বলা হচ্ছে। ভগবান মৃত্যু আর অমরত্ব এই দুটোরেই পারে।

কঠোপনিষদে একটি মন্ত্রে ব্রহ্মকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যমরাজ বলছেন *যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চ উভে ভবত ওদনঃ। মৃত্যুর্যস্যোপসেচনং ক ইত্থা বেদ যত্র সঃ।।* মৃত্যু যাঁর কাছে *উপসেচনং*, উপসেচন মানে আচার বা চাটনি। ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব, ক্ষত্রিয়ের যে শৌর্য এগুলো তার খাবার আর মৃত্যু, জগতে যার ভয়ে সবাই তটস্থ, সেই মৃত্যু তাঁর কাছে চাটনির মত। এখানে এই ভাবটাই এনে বলছেন মৃত্যু আর অমরত্ব তাঁর কাছে ছায়ার মত। ছায়ার কোন মূল্যই নেই, আলো যতক্ষণ আছে ছায়া থাকছে, আলো চলে গেলে ছায়া শেষ। *কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম*, সেই যিনি দেবতা, সেই প্রজাপতিকেই আমরা আহুতি দিচ্ছি। পরের মন্ত্রে বলছেন –

যঃ প্রাণতো নিমিষতো মহিত্বৈক ইদ্‌রাজা জগতো বভূব।
য ঈশে অস্য দ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম।।৩

আমাদের চোখের সামনে যে বাস্তবিক জগতকে দেখছি, এই জগতের যিনি মালিক, যিনি ভগবান বা ঈশ্বর, তাঁর কি কি লক্ষণ, কি কি গুণ? *যঃ প্রাণতো নিমিষতো মহিত্বা*, জগতে যা কিছু আছে, স্থাবর জঙ্গম সব মিলিয়ে জগৎ। তার মধ্যে যাদের প্রাণন ক্রিয়া চলছে, চোখের পাপড়ি বন্ধ হচ্ছে আর খুলছে; প্রাণন ক্রিয়াই জীবনের লক্ষণ আর নিমেষ চোখের পাতা বন্ধ হওয়া আর খোলা এটাও জীবনের লক্ষণ, *এক ইদ্‌রাজা জগতো বভূব*, এই সব কিছুর উপর একমাত্র তিনিই স্বমহিমায় রাজা হয়ে বিরাজ করছেন। বলতে চাইছেন, জগতে যে কোন প্রাণী, যে প্রাণীরই আমরা চিন্তা করি না কেন, সব প্রাণীর রাজা ঈশ্বর, তাঁর উপরে কেউ যেতে পারে না। ঈশাবাস্যোপনিষদেও শুরুতেই ঠিক এই ভাবটাই বলছেন *ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ*, জগতে যা কিছু চলছে, জড় জিনিসের রাজা যে কেউ হতে পারে, প্রাণী জগতের রাজা হওয়া খুব কঠিন, জগতে যা কিছু জাত হয়েছে তিনি হলেন সব কিছুর রাজা।

য ঈশে অস্য দ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ, দ্বিপদ, দুই পায়ে চলে আর চতুষ্পদ, চার পায়ে চলে এই রকম জগতে যত রকম প্রাণী আছে, এদের সবার মালিক তিনি, তিনিই সবার রাজা। ঈশ শব্দের অর্থ ঐশ্বর্য হয় আবার ঈশ শব্দের অর্থ শাসনে, যিনি শাসন করেন। দ্বিপদ, চতুষ্পদ বলে দিলে সব কিছুকেই একসাথে বলে দেওয়া হল, ছয়পাদ অষ্টপাদ বিশিষ্ট যত প্রাণী আছে সবাই এর মধ্যে এসে গেল। কবিতা হল ভাব প্রধান, যেমন একজনের নাম বলে দিলে বাকি সবাইকে ধরা হয়ে যায়। ন্যায় শাস্ত্রে এটাকে বলে ছত্রী ন্যায়, ন্যায় মানে তুল্য। একজন লোক ছাতা মাথা দিয়ে যাচ্ছে। আগেকার দিনে বিশিষ্ট লোকেরাই মাথায় ছাতা নিয়ে চলতেন, তাঁর সাথে আরও দশজন লোক যাচ্ছে। তখন বলছেন ছত্রী যাচ্ছে, অর্থাৎ মাথায় ছাতা দেওয়া কেউ যাচ্ছেন বা রাজা যাচ্ছেন বা পুরোহিত যাচ্ছেন। বলছেন ছত্রী, কিন্তু তাতেই বাকি সবাইকে বোঝা যাচ্ছে। এখানে দ্বিপদ বা চতুষ্পদ বলে দেওয়া হয়ে গেল, এরপর সব রকম প্রাণীকেই যুক্ত করা হয়ে গেল। জগতে যাবতীয় যা কিছু আছে, যে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছে, চোখ পিটপিট করছে, মাটিতে চলছে, জলে চলছে, আকাশে চলছে, দুই পায়ে চলছে, চার পায়ে চলছে, ডানা দিয়ে চলছে সব কিছুর রাজা, সব কিছুর মালিক আর সব কিছুর ভাগ্যবিধাতা হলেন সেই হিরণ্যগর্ভ, সেই প্রজাপতি।

যস্যেমে হিমবন্তো মহিত্বা যস্য সমুদ্রং রসয়া সহাহুঃ।
যস্যেমাঃ প্রদিশো যস্য বাহূ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম।।৪

প্রথমের দিকে বললেন যাদের মধ্যে প্রাণ আছে তাদের মধ্যে তিনি আত্মচৈতন্যের বোধটা দিয়েছেন, শক্তি তিনি দিয়েছেন আর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে জুড়ে নিয়ে এলেন মৃত্যু আর অমৃতের কথা, সেখান থেকে সরে এসে আরও একটু কাছে এনে বলছেন, জগতে যত রকম প্রাণী আছে সবারই তিনি মালিক, সবাই তাঁর শাসনে। সেখান থেকে আরেক ধাপ এগিয়ে চোখের সামনে যে জিনিসগুলি প্রতি নিয়ত আমরা দেখছি সেগুলিকে এনে বলছেন *যস্যেমে হিমবন্তো মহিত্বা*, যাঁর মহিমার প্রকাশ হল এই উত্তুঙ্গ হিমালয়। *হিমবন্তঃ*, বরফাচ্ছাদিত হিমালয়ের কথাই বলা হচ্ছে। *যস্য সমুদ্রং রসয়া সহাহুঃ*, রস মানে হয় জল, যে জিনিস প্রবাহিত হয়। যত নদী

আছে, যত সমুদ্র আছে সবটাই তাঁর সম্পত্তি। পাহাড়, হিমালয় যেমন তাঁর সম্পত্তি, নদী সমুদ্র সহ যত রকম জলাশয় সবই তাঁর সম্পত্তি। *যস্যেমাঃ প্রদিশো যস্য বাহূ*, দশ দিক যেন তাঁর বাহু, সেই হিরণ্যগর্ভকে আমরা আহুতি প্রদান করছি। ভাষ্যকার বলছেন হিমালয় বলে দেওয়াতে যত পাহাড় আছে সবটাই ধরে নেওয়া হচ্ছে। আর সমুদ্র ও নদী বলে দেওয়াতে নীচু জায়গায় যেখানে যেখানে জল জমে সবটাকেই ধরে নেওয়া হয়েছে।

যেখানে *আত্মদা বলদা* বলে দেওয়া হল, জগতের সব কিছুর মধ্যে তিনি আত্মচৈতন্য দিচ্ছেন আর নিজেকে রক্ষা করার শক্তিটাও দিচ্ছেন তখন আর এত কিছু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বলার কী দরকার ছিল? আসলে দেবতা বা ভগবানের স্তুতি একটা বাক্যে হয় না। উপনিষদে একটা বাক্যেই বলে দেবেন, কারণ দর্শনের তত্ত্ব একটি বাক্যের বেশি বলা হয় না। কিন্তু স্তুতির ক্ষেত্রে একটা বাক্যে বললে সেটা আর স্তুতি হবে না। স্তুতির ব্যাপার ছাড়াও এভাবে বলার পেছনে আরেকটি খুব গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য হল শব্দ আর বিচার। আচার্য শঙ্কর বলছেন, উত্তম শিষ্যকে একটা কথা একবার বললেই বুঝে নেয়, মধ্যম শিষ্যকে অনেক ভাবে বোঝাতে হয় আর অধম শিষ্য বিপরীত বুঝে নেয়। ঈশ্বরের মহিমা আমরা ধারণা করতে পারবো না। ঠাকুর বলছেন, ঈশ্বরই আছেন তিনিই সব কিছু হয়েছেন। যিনি ব্রহ্মজ্ঞানী তিনি সঙ্গে সঙ্গে বুঝে যাবেন ঠাকুর কি বলতে চাইছেন, তাঁকে আর আলাদা করে বোঝাতে হবে না। কিন্তু যাঁরা একটু সাধারণ স্তরের তাঁদের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বলতে হয়, একই কথা বার বার বলতে হয়। মানুষ ঈশ্বরের ব্যাপারে ধারণা করতে পারে না। কেন ধারণা করতে পারে না, এই নিয়ে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। সত্য আছে, আইডিয়া আছে আর শব্দ আছে। নরেনের মত উচ্চকোটির আধারের শিষ্যকে ঠাকুর একটু ছুঁয়ে দিলেন সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অদ্বৈতের উপলব্ধি হয়ে গেল। নরেনের থেকে যাঁরা আরেকটু নীচের ধাপে তাঁদেরকে ঠাকুর আইডিয়াটা দিয়ে দিলেন, সেই আইডিয়াকে নিয়ে চিন্তন করতে করতে তাঁর সত্য উপলব্ধি হয়ে যাচ্ছে। বাকিদের ক্ষেত্রে শব্দ ছাড়া আর কিছু থাকে না। শব্দের আঘাত হতে হতে মস্তিষ্ক একটা সময় প্রস্তুতি নিয়ে তৈরী হয়ে যায়। তৈরী হয়ে যাওয়ার পর তার মধ্যে যদি শ্রদ্ধা, ভক্তি, বিশ্বাস উদয় হয়, তখন ওই শব্দ বিচার রূপে পাল্টে যায়। বিচারে রূপান্তরিত হয়ে যাওয়ার পরই তাঁর সাধনা শুরু হয়। মানুষ জেনেশুনে কখনই ভুল বলে না, মানুষ যেমনটি জানে তেমনটিই সবাইকে বলে, তেমনটিই সে করে। জেনেশুনে যদি কেউ ভুল বলে তার জন্য একটা বিশেষ কারণ থাকে। আমি যদি বলি আপনারা যে ঠাকুরের মন্ত্র জপ করছেন সবাই শব্দ সাগরেই ডুবে থাকেন। এবার আপনি যদি জেনে যান আমি ভুল বলছি তাহলে সঙ্গে সঙ্গে আপনি নিজেকে ঠিক করে নেবেন। যে জানে আমি ভুল পথে যাচ্ছি সে কি আর ভুল পথে যাবে! কখনই যাবে না। শব্দ সাগরে থাকতে থাকতে হঠাৎ একদিন ঈশ্বরের মহিমা আপনার কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে। তখন ইষ্ট মন্ত্র আর শব্দ থাকবে না, সেটাই তখন একটা আইডিয়াতে বা বিচারে রূপান্তরিত হয়ে গেল, এখান থেকেই আপনার তত্ত্বের দিকে যাত্রা শুরু হয়ে গেল। পঞ্চম মন্ত্রে বলছেন –

যেন দ্যৌরুগ্রা পৃথিবী চ দৃঢ়া যেন স্বঃ স্তম্ভিতং যেন নাকঃ।
যো অন্তরিক্ষে রজসো বিমানঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম।।৫

বর্তমান কালে ধ্যানের মাহাত্ম্য অনেকে বেড়ে গেছে। ধ্যানে সব থেকে বড় জিনিস হল নিজের স্বরূপ চিন্তনটা বেশি হয়। পূজার সময় ভগবানের বিরাট রূপের উপর দৃষ্টিটা বেশি দেওয়া হয়। ভগবানের বিরাটের চিন্তন পূজাতে যেমন দরকার তেমনি ধ্যানের ক্ষেত্রেও এর একটা মাহাত্ম্য আছে। দক্ষিণেশ্বরে বড় বড় বৃক্ষ ফুলে ফুলে ছেয়ে আছে, ঠাকুর দেখছেন বিরাটের পূজো হচ্ছে। এই মন্ত্রে ভগবানকে বিরাটের রূপে বর্ণনা করছেন। যেন *দ্যৌরুগ্রা*, উগ্র বলতে আমরা বাংলায় যেভাবে মনে করি, সেভাবে বলা হচ্ছে না। ভাষ্যকাররা উগ্রের অর্থ করছেন বিশালের অর্থে। চোখের সামনে যে অন্তরীক্ষ দেখছি বিশাল রূপেই দেখছি। বড় বাড়ির যেমন প্রশংসা করা হয়, ঠিক তেমনি এখানে প্রশংসা করে বলছেন এই বিরাট যার কোন শেষ নেই আর তার সঙ্গে পৃথিবী *চ দৃঢ়া*, পৃথিবী দৃঢ় ভাবে স্থিত হয়ে আছে যার জন্য এই পৃথিবীর উপর আমরা সবাই বাস করতে পারছি। বিজ্ঞানের দৌলতে আমরা এখন পৃথিবীর অনেক স্বরূপের কথা জেনে গেছি, পৃথিবী যে গোলাকার, এর ইকুইয়েটর, পোল, এই ধারণাগুলো তখনকার দিনে এত পরিষ্কার ছিল না। এখানে পৃথিবীকে নিয়ে আলোচনা করছেন না, পৃথিবীর যে দৃঢ়তা এটাই তার বৈশিষ্ট্য, এই বৈশিষ্ট্য এসেছে ভগবানের জন্য।

যেন স্বঃ স্তম্ভিতং যেন নাকঃ, স্বঃ মানে অন্তরিক্ষ বা স্বর্গলোক, অন্তরীক্ষ যেন স্থির হয়ে আছে যার মধ্যে সূর্য, চন্দ্র এবং অন্যান্য সব নক্ষত্ররা পরস্পরকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে। কেউ নিজের কক্ষ পথ থেকে ছিটকে বেরিয়ে যাচ্ছে না, সবাই নিজের নিজের পথে একটা নির্দিষ্ট গতিতে চলছে। *যো অন্তরিক্ষে রজসো বিমানঃ,* রজস শব্দকে অনেক অর্থে নেওয়া যেতে পার, রজস মানে ধুলো হতে পারে আবার পঞ্চ তত্ত্বের জল, বায়ু ইত্যাদির অর্থেও নেওয়া যেতে পারে। এই বিরাট অন্তরিক্ষে যা কিছু আছে, জল, বায়ু সব কিছুর নির্মাতা সেই হিরণ্যগর্ভ। বিরাট আকাশের দিকে তাকিয়ে ঈশ্বরের মহিমাকে যদি অনুভব করতে চাই তখন প্রথমেই মনে হবে এই যে বিরাট আকাশ এই আকাশে অন্তরীক্ষ আছে, *স্বঃ* আছে আর তার মধ্যে সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র সব ঘুরছে। *নাকঃ* মানে আদিত্য। এই যে সব কিছু বিরাটের মধ্যে চলছে, তার মধ্যে আবার সবাই নিজের নিজের মধ্যে স্থিত, কোন কিছুই এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে না, একটা জিনিস আরেকটার মধ্যে পড়ে যাচ্ছে না, যে শক্তিতে যিনি এগুলোকে ধারণ করে আছেন তিনি প্রজাপতি তাঁকেই আমরা হবিষা অর্পণ করছি। এখানে স্তুতি করা হচ্ছে, স্তুতি করার সময় একই ভাবকে বিভিন্ন ভাবে বলা হয়। এই ধরণের স্তুতিগুলি যখন পাঠ করা হয় তখন আস্তে আস্তে আমাদের মনে বিরাটের ব্যাপারে একটা ধারণা তৈরী হতে থাকে। গীতার দশম অধ্যায়ে যেমন ভগবান নিজের স্বরূপের ব্যাপারে বলতে গিয়ে অনেক কিছুর কথা বলছেন, অমুকের মধ্যে এটা, তমুকের মধ্যে আমি সেটা। এত কথা না বলে ভগবান তো বলে দিতে পারতেন সব কিছুর সার আমি। কিন্তু এটুকু বলে দিলে আমাদের মনে ধারণা হবে না, ধারণা করার জন্য ভগবানকে বিভিন্ন ভাবে বলতে হচ্ছে। একবার ধারণা হয়ে যাওয়ার পর কোন জিনিস যখন চোখে পড়বে তখন হঠাৎ মনে পড়বে ভগবান গীতায় বলছেন এই জিনিসের মধ্যে আমি এটা। তখন ভগবানের কথা মনে পড়ে যায়, ঈশ্বরের ব্যাপারে একটা ভাব জেগে ওঠে। যাদের মন্দ বুদ্ধি তাদের বিভিন্ন ভাবে শুনতে হয়। এই ভাবকেই পুনরাবৃত্তি করে বলছেন –

যং ক্রন্দসী অবসা তস্তভানে অভ্যৈক্ষেতাং মনসা রেজমানে।
যত্রাধি সূর উদিতো বিভাতি কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম।।৬

ক্রন্দসী শব্দের অর্থ হয় উজ্জ্বল আলোতে জ্বল জ্বল করা। ভাষ্যকার *ক্রন্দসী*র অর্থ করছেন *রোদিতমান,* কান্নার অর্থে রোদিত বলা হচ্ছে না, আলোর অর্থে বলছেন। এখানে স্বঃ বা দ্যুলোক আর পৃথিবীলোকের কথা বলা হচ্ছে। আগের মন্ত্রে অন্তরীক্ষ আর দৃঢ় পৃথিবীকে আনা হয়েছিল, এই মন্ত্রে দুটোর প্রশংসা করে বলছেন এরা যেন দীপ্যমান দুই দেবতা। স্থুল চোখ দিয়ে আমরা পৃথিবীলোক আর দ্যুলোককে অবলোকন করতে পারি, তাই এই দুটোর একটা বিশেষ মাহাত্ম্য আছে। দ্যুলোক আর পৃথিবীলোক এই দুই দিব্য সত্তা যখন চিন্তন করতে শুরু করলেন তখন তাঁরা দেখেছেন তাঁদের যে ক্ষমতা, তাঁদের যে দীপ্যমানতা, তাঁদের যে সম্মান সব হিরণ্যগর্ভের জন্য। তিনি আছেন বলেই আমাদের এত সম্মান, আমরা এত দীপ্যমান, আমাদের এত ক্ষমতা। জল, আকাশ, পৃথিবীকে আমরা জড় বলে মনে করি, তাঁরাও এগুলো জড় বলেই জানতেন, কিন্তু এদের পেছনে যে আধ্যাত্মিক সত্তা আছে, যখন দ্যু বলছেন বা পৃথিবী যখন বলছেন তখন তাঁরা এই পৃথিবী যেখানে আমরা রয়েছি এই পৃথিবীর কথা বলছেন না, এই পৃথিবীর পেছনে যে আধ্যাত্মিক সত্তা আছে তাঁর কথা বলছেন। দ্যুলোক, পৃথিবী এরাও বিরাট, কিন্তু এনারাও যখন চিন্তন করলেন তখন দেখলেন আমরা নিজেদের ক্ষমতায় এত মাহাত্ম্য পাইনি, আমাদের পেছনে সেই প্রজাপতির ক্ষমতাই কাজ করে চলেছে। তিনি এগুলোকে ধারণ করে আছেন। যেমন গীতায় ভগবান বলছেন নদীর মধ্যে আমি জাহ্নবী, এটাই যদি কাব্যিক দৃষ্টিতে বর্ণনা করে বলা হয় তখন বলা হবে, গঙ্গা নদী নিজে যখন চিন্তন করছেন তিনি দেখছেন আমি সব কিছুকে পবিত্র করি। গঙ্গা বিচার করে দেখলেন তাঁর এই পাবকী শক্তি কারণ ঈশ্বর তাঁর মধ্যে বিদ্যমান। এই ব্যাপারটাই এখানে বলা হচ্ছে, এই যে পৃথিবী দৃঢ়, এই যে অন্তরীক্ষ এত মহৎ, তাঁরা যেন ক্রন্দসী, আলোর দীপ্তিতে জ্বল জ্বল করছে, এনাদের যে এত মাহাত্ম্য কারণ তাঁদের পেছনে হিরণ্যগর্ভ বা ঈশ্বর আছেন বলে। এই ভাবটাই একটু অন্য ভাবে কেনোপনিষদেও এসেছে, অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র দেবতারা অহঙ্কার করছেন আমাদের শক্তিতে আমরা জয়ী হয়েছি। তখন বলছেন, তা নয়, ব্রহ্মের শক্তিতেই তোমরা জয়ী হয়েছ। ঈশ্বরকে কেউ ভক্তি করুক আর নাই করুক, ঈশ্বরের কৃপা না হলে মানুষ কোন মহৎ কাজ করতে পারে না। যাদের ভেতরে ক্ষমতা আছে কিন্তু

বড় কাজ করতে পারছে না, তখন তারা একটু জপ-ধ্যান করলে এই বিঘ্ন গুলি কেটে যাবে। যাদের মধ্যে ক্ষমতা নেই, তারাও প্রার্থনাদি করলে আস্তে আস্তে শক্তি সঞ্চয় হয়ে যাবে। তাহলে সবাই রোজ এত এত প্রার্থনা করে যাচ্ছে কিন্তু তাও তো কারুরই কিছু হচ্ছে না, কেন হচ্ছে না? আমাদের একটা কথা মনে রাখতে হবে, রাজা একমাত্র রাজার ব্যাটাকেই দেন কাঙালীকে দেন না। কাঙালীকে রাজবাড়িতে ঢুকতেই দেবে না, দূর থেকেই দারোয়ান দিয়ে তাড়িয়ে দেবে। কথামৃতে এই নিয়ে ঠাকুর কত কথা বলছেন। বড়লোকের বাড়িতে যদি কেউ চাহিদা নিয়ে যায় তাকে ঢুকতেই দেওয়া হয় না। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করার সময় চাহিদার একটা লম্বা তালিকা নিয়ে যাচ্ছি তখন সবাই কাঙালী হয়েই যাচ্ছি। ঠাকুরও জানেন আমাদের চাহিদার শেষ নেই। রাজার ব্যাটা বলে তুমি যা আমিও তাই। এই ভাব কখন আসবে? যখন স্বরূপ চিন্তন করা হবে। স্বরূপ চিন্তন করে যখন গভীর ধ্যানে চলে যায় তখনই ওই ক্ষমতা আসে। ঠাকুরও বলছেন, কেশবের ওই ধ্যানটুকু ছিল বলে তার এত নাম-যশ। যতক্ষণ ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্ম বোধ না হয় ততক্ষণ টাকা-পয়সাও হবে না, নাম-যশও হবে না। আমাদের যা কিছু হয় সব জগতের নিয়মানুযায়ীই হয়ে থাকে। যখনই দেখা যাবে ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও জীবনে প্রচুর মার খেয়ে যাচ্ছে বুঝবেন তার উপর ঈশ্বরের কৃপা নেই। ঈশ্বরের কৃপার জন্য নিষ্কাম ভাবে জপ-ধ্যান করে যেতে হবে। আর কাঙালীর মত নয় রাজার ব্যাটার মত তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে হবে। কদিন পরেই ভেতরে শক্তি জাগরিত হয়ে যাবে। সেটাই এখানে বলছেন, পৃথিবী আর দ্যু এরা এত বড় হয়েছে কেন? ঈশ্বরের কৃপা আছে বলে। দেবীসূক্তমে বলছেন, আমি যাকে কৃপা করি সে মহৎ হয়ে যায়, আমিই কাউকে ব্রাহ্মণ বানাই, কাউকে ক্ষত্রিয় বানাই। কাকে বানান? যে সাধনা করেছে। আমরা তো সাধনা করি না, প্রার্থনার নামে ঈশ্বরের কাছে চাহিদা পূরণ করার প্রয়াস করি। পরের মন্ত্রে বলছেন –

আপো হ যদ্ বৃহতীর্বিশ্বমায়ন্ গর্ভং দধানা জনয়ন্তীরগ্নিং।
ততো দেবানাং সমবর্ততাসুরেকঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম।।৭

সেই হিরণ্যগর্ভের জন্ম কোথা থেকে হয়েছে? *আপো হ*, জল থেকে। বলা হয় *আপো নারায়ণঃ*, আপ হল নারায়ণ। আপ শব্দ দুটো অর্থে হয়, এর একটা অর্থ হল জল, আরেকটি অর্থ হল কারণ সলিল, যেখান থেকে সৃষ্টি হয়। যে কারণ সলিলে নারায়ণ শয়ন করে থাকেন, অগ্নি দেবতার জন্ম সেই সলিল থেকে। এগুলো নিয়ে আমাদের অনেক রকম সংশয় হওয়া স্বাভাবিক, কারণ অগ্নিসূক্তমে যে অগ্নির জন্মের কথা বলা হয়েছে সেখানে বলছে অগ্নির জন্ম অনেক জায়গা থেকে হয়েছে, তার মধ্যে একটা বলছেন, অগ্নির জন্ম সমুদ্র থেকে। তবে এই সমুদ্র থেকে জন্ম নয়, আপ থেকেই জন্ম হচ্ছে, আপ হল কারণ সলিল। কারণ যে কোন দিব্য শক্তির জন্ম সেই সচ্চিদানন্দ থেকেই হবে। এখানেও বলছেন অগ্নির যেখানে জন্ম হল সেটাই নারায়ণ, আর সেখানেই এই হিরণ্যগর্ভের বীজ পড়েছিল। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যে কারণ সলিলে আবৃত ছিল সেই কারণ সলিলেই যেমন অগ্নির জন্ম ঠিক তেমনি এই প্রজাপতি বা হিরণ্যগর্ভের জন্মও সেই কারণ সলিলে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে প্রত্যেকটি জীবের তিনিই একমাত্র নিঃশ্বাস, একমাত্র প্রাণ। এর তাৎপর্য হল, জগতে যেখানেই যত জীবন আছে আর সেখানে যা কিছু প্রাণনক্রিয়া হচ্ছে সমস্ত জীবের পুরো প্রাণ এক। সেইজন্য সূক্ষ্ম জগতে যখন যায় তখন হিরণ্যগর্ভের একটা নাম সূত্রাত্মা। সূত্র মানে সুতো, প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যে যে প্রাণ চলছে এই প্রাণ যেন সুতো দিয়ে সমস্ত প্রাণীর সঙ্গে জুড়ে আছে। সেই সূত্রটা হলেন ভগবান নিজে। এই সূত্রাত্মার জন্ম সেই কারণ সলিলে, যেখান থেকে অগ্নির জন্ম। এই জিনিসটাকেই আবার বলা হয়, সেই যে নারায়ণ কারণ সলিলে শায়িত, সেই নারায়ণ থেকে প্রজাপতির জন্ম, এই প্রজাপতির থেকে সব কিছুর সৃষ্টি। আর তিনি পৃথিবীতে যে সমুদ্রের সৃজন করলেন সেখান থেকে অগ্নির জন্ম আর প্রত্যেকটি প্রাণীর মধ্যে তিনি একমাত্র প্রাণ। আমার মধ্যে যে প্রাণ সেটাও তিনি, আপনার মধ্যে বা জগতের সমস্ত প্রাণীর মধ্যে যে প্রাণ সব প্রাণই তিনি। গীতায় ভগবান যেমন বলছেন *সূত্রে মণিগণা ইব*, একটা নেকলেসে যতগুলো মণি আছে তাকে একটা সুতো দিয়ে এক জায়গায় ধরে রাখা হয়েছে, এই সুতোটা আমি। আমাদের হিন্দু শাস্ত্রে কোন ধর্মগ্রন্থে কোন কথা আসতে পারে না, যদি ওই কথা বেদে না থাকে। এটাই এখানে বলছেন, প্রত্যেকটি প্রাণীর মধ্যে যে প্রাণ সেটা প্রজাপতিই হয়েছেন। ওনারা এই মন্ত্রগুলিকে বহির্পূজায় লাগাতেন, যজ্ঞের আহুতির সময় প্রার্থনা করতেন, গীতায় ভগবান সেটাকেই

অন্তর্মুখী পূজায় নিয়ে চলে গেছেন। বেশির ভাগ মানুষ ধ্যান-ধারণা করতে পারে না, বহির্পূজাই তারা করতে পারে। বহির্পূজা যাঁরা করেন তাঁরা এভাবেই বলবেন, সেই প্রজাপতিকে আমরা হবি প্রদান করি। গীতায় ভগবান সব জায়গায় অহম্ অহম্ করে বলছেন, বহির্পূজায় তো অহম্ অহম্ করে পূজা হয় না। বহির্পূজায় সব সময় আহুতি দেওয়া হয় – হে ভগবান! তোমার এই এই স্বরূপ আমি তোমাকে আহুতি দিলাম। সেইজন্য বেদই বহির্পূজার ঠিক ঠিক গ্রন্থ। সৃষ্টি যখন প্রথম শুরু হল তখন কি রকম ছিল, সেটাই অষ্টম মন্ত্রে বলছেন –

যশ্চিদাপো মহিনা পর্যপশ্যদ্ দক্ষং দধানা জনয়ন্তীর্যজ্ঞং।
যো দেবষ্বধি দেব এক আসীৎ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম।।৮

সচ্চিদানন্দ সাগরে একটা ছোট্ট ডিম এস পড়ল আর সেটাই আস্তে আস্তে বিরাট হয়ে গিয়ে সচ্চিদানন্দ সাগরের স্পেসটাকে সরিয়ে দিল। এই যে পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে একক ক্ষমতায় ধরে রেখেছেন, মনে হচ্ছে যেন এই কারণ সলিলে একটা স্পেস তৈরী করে পুরো সৃষ্টিকে ধরে আছেন আর তাঁর মধ্যেই সৃজন শক্তি ছিল। এটাই হল প্রথম যখন সৃষ্টি হয়েছিল তার বর্ণনা। সৃজন শক্তি যজ্ঞ রূপে ছিল। ওনাদের ধারণা ছিল যজ্ঞ করলে মানুষের সব চাহিদাই পূরণ করা যায়। তিনি সব কিছু সৃষ্টি করে তার সাথে যজ্ঞকে দিয়ে দিলেন যার দ্বারা সব কিছু পাওয়া যাবে। গীতার তৃতীয় অধ্যায়েও এই ভাবটাই নিয়ে আসা হয়েছে, *সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ। অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্।।* প্রজাপতি প্রথম যখন সৃষ্টি করলেন তখন *সহযজ্ঞা*, যজ্ঞের সাথেই সৃষ্টি করলেন। যজ্ঞ সৃষ্টি করে তিনি বলে দিলেন এই যজ্ঞ তোমাদের কামধেনু হোক, এই যজ্ঞ দিয়েই তোমরা সব কিছুকে প্রাপ্ত করবে। যজ্ঞ মানুষের কোন কল্পনাপ্রসূত নয়, এই যজ্ঞ তিনিই দিয়েছেন। এখন যজ্ঞ জপ যজ্ঞের মধ্যেই ঢুকে গেছে, জপ করলেই সব যজ্ঞের ফল হয়ে যায়।

তার সাথে বলছেন, যত দেবতারা আছেন তাঁদের সবার মধ্যে তিনি অদ্বিতীয়, অর্থাৎ সব দেবতাদের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ। ঠাকুরের ভক্তরা যেমন বলেন *সর্বদেবদেবীস্বরূপায় শ্রীরামকৃষ্ণায় স্বাহা*, অর্থাৎ ঠাকুর সমস্ত দেব ও দেবীর স্বরূপ। এর মধ্যে কিছুটা এই মন্ত্রের ভাব পাওয়া যাচ্ছে। মন্ত্রে বলছেন যত দেবী দেবতা আছেন তাঁদের সবার মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ। আমরা আলাদা আলাদা ভাবে অগ্নিকে আহুতি দিতে পারি বা ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবতাদের আহুতি দিতে পারি ঠিকই, কিন্তু প্রজাপতিকে যদি আহুতি দেওয়া হয় তাহলে সেই আহুতিই শ্রেষ্ঠতম হবে। গীতাতেও ভগবান বলছেন, আমাকে দিলে বাকি সবাই পেয়ে যায়। এখানে প্রজাপতিকেই শ্রেষ্ঠ বলা হচ্ছে। এই ভাবটা অন্যান্য বেদে সাধারণত পাওয়া যাবে না, একজন দেবতাকে স্তুতি করতে গিয়ে অন্য দেবতার সাথে তুলনা করা হয় না। কিন্তু এখানে একেবারে পরিষ্কার বলে দেওয়া হচ্ছে তিনিই শ্রেষ্ঠতম। মুসলমানদের কাছে যেমন আল্লাই শ্রেষ্ঠতম বা খ্রীশ্চানদের কাছে গড শ্রেষ্ঠতম, এই ভাবটাই এখানে এসেছে। যদিও এখানে একজনকে শ্রেষ্ঠতম বলে দেওয়া হল, কিন্তু পরের দিকে এই ভাব সেই রকম প্রতিষ্ঠা পায়নি, একেশ্বরবাদকে এনারা উৎসাহিত করলেন না। সেইজন্য হিন্দুদের মধ্যে কেউ যদি বলে শ্রীকৃষ্ণই সব, তাদের এই কথাকে সবাই গোঁড়ামি বলে উড়িয়ে দেবে। মা কালী আর শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ বিচার করাটা তাই হিন্দু ভাবের বিরুদ্ধে চলে যায়। কিন্তু এই মন্ত্রে যখন বলছেন *যো দেবষ্বধি দেব এক আসী*, প্রত্যেকটি দেবতাদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ, তখন এই ভাবটা এসে যায়।

মা নো হিংসীজ্জনিতা যঃ পৃথিব্যা যো বা দিবং সত্যধর্মা জজান।
যশ্চাপশ্চন্দ্রা বৃহতীর্জজান কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম।।৯

একেশ্বরবাদের একটি বৈশিষ্ট্য হল এর মধ্যে একটা ভয়ের ব্যাপার থাকে, আল্লাকে মানুষ ভয় পায়। কিন্তু আমরা ঠাকুরকে ভয় পাই না, আমরা শ্রীকৃষ্ণকে বা শ্রীরামচন্দ্রকে ভয় পাই না, আমরা ভালোবাসি, ভালোবাসার সম্পর্ক থাকলে ভয়ের ব্যাপার আর আসবে না। ভয়ের ধর্ম আর ভালোবাসার ধর্মের মধ্যে অনেক তফাৎ হয়ে যায়। এ্যব্রাহিমিক ধর্মে ভগবান হলেন একজন রাজার মত, রাজাকে ভয় পেতে হয়। এখানেও ভয়ের ভাব নিয়ে আসা হয়েছে, *মা নো হিংসীজ্জনিতা*, হে ভগবান! আমার প্রতি তুমি হিংসার ভাব রেখো না, আমার ক্ষতি করে দিও না। কারণ তুমি এই জগতের পিতা, তুমিই সব কিছুকে জন্ম দিয়েছ আর তুমি সব

কিছুর আধার। *যশ্চাপশ্চন্দ্রা বৃহতীর্জজান*, এখানে ব্রহ্মাণ্ডের পঞ্চ তন্মাত্রার ব্যাপারে বলছেন অথবা ব্রহ্মাণ্ডের সমষ্টি জীবনের অর্থেও বলতে পারেন। তুমিই সব কিছু সৃষ্টি করেছ, তুমিই সব কিছুর মালিক, আমাদের প্রতি তোমার যেন কোন হিংসার ভাব, কোন ক্রোধের ভাব না আসে। একেশ্বরবাদের এটি একটি ধর্ম, যেখানে বলা হয় ভগবান আমাদের প্রতি যেন কখন রুষ্ট না হন। শেষ মন্ত্রে এসে বলছেন –

প্রজাপতে ন ত্বদেতান্যন্যো বিশ্বা জাতানি পরি তা বভূব।
যৎকামাস্তে জুহুমস্তন্নো অস্তু বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীণাম্।।১০

প্রজাপতিকে প্রার্থনা করে বলছেন – হে প্রজাপতি! তুমি ছাড়া আর কেউই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে পরিচালনা করে না। জগতে যত প্রাণী আছে সবারই তুমি মুখ্য প্রাণ। তুমি ধরে আছ বলেই জীবন চলছে। হে প্রজাপতি! আমরা প্রার্থনা করছি এই যে আমরা তোমাকে যজ্ঞে আহুতি প্রদান করছি তার জন্য আমাদের যত কামনা আছে, যত চাহিদা আছে সব চাহিদা পূরণ করে আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর।

বেদের যজ্ঞ মানেই কিছু কামনা জড়িয়ে থাকবে, নিষ্কাম যজ্ঞ বেদে কখনই হবে না, বেদে যজ্ঞ মানেই সকাম। আমাদের বিভিন্ন কর্মের বিধান দেওয়া আছে, তার মধ্যে নিত্যকর্ম, নৈমিত্তিক কর্ম আর প্রায়শ্চিত্ত কর্ম হল শুদ্ধিকরণের জন্য। তখনকার দিনে নিত্যকর্ম মানে সকাল-বিকাল অগ্নিহোত্রাদি করা, পরের দিকে ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী জপাদি নিত্যকর্ম হয়ে গেল আর ইদানিং কালে আমরা জপ-ধ্যান করাকে নিত্যকর্ম বলতে পারি। নিত্যকর্ম প্রত্যেক দিন করতে হবে, নিত্যকর্ম করা কখনই ছাড়তে নেই। গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে নিত্যকর্মের আলোচনা করার সময় ভগবান বলছেন সন্ন্যাসীদের জন্য নিত্যকর্ম নয়, সন্ন্যাসীর জন্য কোন কর্মই নয়। জগতে চারটে ধাপে মানুষ কাজ করে, প্রথম ধাপে যেখানে মানুষ নিজের কাম-ক্রোধ, লোভ-মোহ ছাড়া কিছু জানে না, কোন ধর্মাধর্ম মানে না, ইদানিং আমরা চারিদিকে যা দেখছি। দ্বিতীয় ধাপে মানুষ ধর্মের অনুসারে কাজ করছে, যজ্ঞাদি করছে, দানাদি করছে আর আশা করছে আমি আমার কর্মের ফল পাব। আমার কিছু চাহিদা আছে, অর্থপ্রাপ্তি, ভোগপ্রাপ্তির আকাঙ্খা আছে, কিন্তু বেদ বা ধর্মশাস্ত্রে যেমন ভাবে বলা হয়েছে আমি সেই ভাবে পেতে চাইছি। এর থেকে আরেক ধাপ উপরে তৃতীয় ধাপে বলছে আমার আর কোন চাহিদা নেই, আমি আমার আত্মশুদ্ধির জন্য আর জগত হিতের জন্য শুধু নিত্যকর্ম করব। চতুর্থ ধাপে যিনি সন্ন্যাসী হয়ে গেলেন তাঁর নিত্যকর্মটাও বন্ধ হয়ে গেল। সন্ন্যাসীদের জন্য হল চব্বিশ ঘন্টা ঈশ্বর চিন্তন নিয়ে থাকা, আত্মচিন্তন আর ঈশ্বর চিন্তনে সদা রমন্ত। আত্মচিন্তন থেকে যাঁর মন এক মুহূর্তের জন্য নেমে আসতে পারছে না, একমাত্র তিনিই নিত্যকর্ম ত্যাগ করতে পারেন, এর বাইরে সবাইকেই নিত্যকর্ম করে যেতে হবে। তবে গেরুয়াধারী সন্ন্যাসীরা যাঁরা আছেন তাঁরা বেশির ভাগই বিবিদিষ সন্ন্যাসী, অর্থাৎ গেরুয়া আগে ধারণ করা হয়ে গেছে আর সাধনাটা পরে হচ্ছে। তাই এনাদেরও নিত্যকর্ম, জপ-ধ্যান চিন্তন এগুলো করে যেতে হয়।

বেদ মানেই সকাম। হিরণ্যগর্ভসূক্তে দুটো দিক, একটা দিক হল আমার এই এই চাহিদা পূরণ করতে হবে দ্বিতীয় দিক দর্শনের ব্যাপার, যেমন এখানে ঈশ্বরের যে যে রূপ ও গুণের চিন্তন করতে হবে তারই একটা রূপ ও গুণের বর্ণনা করা হয়েছে।

অভয়সূক্তম্

অভয়সূক্তম্ বেদের খুব বিখ্যাত সূক্ত। অভয়সূক্তম্ আলোচনা শুরু করার আগে ভালো করে বোঝা দরকার ভয় জিনিসটা কি। ভয় ব্যাপারটা ভালো করে জানা না থাকলে অভয়সূক্তম বোঝা যাবে না। ভয় জিনিসটাকে বিশ্লেষণ করতে করতে একটা জায়গাতে গিয়েই শেষ পর্যন্ত দাঁড়ায়, তা হল আমিত্ব নাশের ভয়। অনেকে মনে করেন অজ্ঞতা থেকেই ভয় আসে অথবা একটা জিনিস ভুলে গেছি, এই ভুলে যাওয়াটাও ভয়ের একটা কারণ। কিন্তু অজ্ঞতা থেকে ভয়, ভুলে যাওয়া থেকে ভয় এগুলোও সেই আমিত্বের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। সমাজে, বন্ধু-বান্ধবদের মাঝখানে আমার অজ্ঞতা ধরা পড়ে যাবে, ক্লাশে শিক্ষকের প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারলে বন্ধুদের মধ্যে একটা খারাপ ধারণা হয়ে যাবে, এখানেও সেই আমিত্বর ব্যাপারটা জড়িয়ে আছে। আমি মনে মনে আমার একটা আত্মসম্মান বানিয়ে রেখেছি, সেই সম্মানের হানি যেন না হয়ে যায়। আত্মসম্মান

হারানোর ভয় খুবই মারাত্মক ব্যাপার। ভগবান গীতায় বলছেন, *সম্ভাবিতস্য চাকীর্তির্মরণাদতিরিচ্যতে*, যাঁরা সম্মানিত ব্যক্তি তাঁদের নামে যদি কোন কলঙ্ক হয়ে যায়, তাঁরা মনে করেন এর থেকে মরে যাওয়া অনেক ভালো। কলঙ্কিত হয়ে যাওয়া, লাঞ্ছিত হওয়াতে এমন ভয় যে সে মনে মনে বলছে আমি মরে যাব। এখানেও সে নিজের আত্মসম্মানের সাথে নিজের আমিত্বকে জুড়ে রেখেছে। আমরা কেউই মরতে চাই না, আমি মারা যাব এই চিন্তা আমরা কখনই করতে চাই না, মৃত্যুজনিত ভয় সব সময় আমাদের ঘিরে রেখেছে। এখানেও সেই আমিত্ব জড়িয়ে আছে, মরে যাওয়া মানে আমার আমিত্বটাই চলে যাওয়া। যিনি পূর্ণজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত, যিনি জানেন আমি আত্মা, আত্মা ছাড়া আমি অন্য কিছু নই, আত্মজ্ঞানী ছাড়া বাকি সবারই মৃত্যুভয় আছে। এমন কি যিনি ঈশ্বরের ভক্ত তাঁকেও মৃত্যু ভয় ছাড়বে না, ঈশ্বরের ভক্ত এই ভেবে চিন্তিত যে, আমি যদি মরে যাই তাহলে এই শরীর দিয়ে আমি আর ঈশ্বরকে আস্বাদ করতে পারব না। আবার মুসলমানরা বলে মৃত্যুর পর আমি স্বর্গে যাব। কিন্তু ওদের ধর্মে আবার বলা হয় জাজমেন্ট ডে না আসা পর্যন্ত সবাইকে কবরে শুয়ে থাকতে হবে। বৈষ্ণবরা আবার ভাবে মৃত্যুর পর আমি সরাসরি বৈষ্ণবলোকে যাব। দেহটা যাদের কাছে বোঝা স্বরূপ হয়ে গেছে, আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে তাদের বাইরে তুমি যত বড় ভক্তই হও আর জ্ঞানী হও, মুখে তুমি যাই বল তোমার কিন্তু মৃত্যু ভয় থাকবেই।

আমিত্ব নাশের ভয়কে টানলে আমাদের সব রকম ভয়ই আমিত্ব নাশের মধ্যে এসে যাবে। এর বাইরেও কিছু কিছু ভয় আছে যেমন পূজো আদিতে ত্রুটি হয়ে যাওয়া, বিঘ্ন এসে যাওয়ার ভয় আছে। সেইজন্য যে কোন পূজা বা শুভ কাজ করার আগে গণেশের পূজা করা হয়, গণেশ হলেন বিঘ্ন নাশক। এই ভয়ের মধ্যেও আমিত্ব কোন ভাবে জড়িয়ে থাকে। সাধারণ ভাবে যত রকমের ভয় আছে তাকে তিনটে শ্রেনীতে ভাগ করা হয়, ভয় মানেই বিঘ্ন। বিঘ্ন থেকেই ভয় আসে, জীবন খুব মসৃণ ভাবে চলছিল সেখানে একটা বিঘ্ন এসে জীবনটা এলোমেলো হয়ে গেল। এই তিনটে হল আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক আর আধিদৈবিক। আধিদৈবিক ভয় হল, প্রকৃতির কারণে বা দৈবাৎ কারণে যখন কিছু বিঘ্ন আসে। বাড়িতে বিবাহের অনুষ্ঠান হবে, কিন্তু সেদিন এমন ঝড়-বৃষ্টি হল যে প্যাণ্ডেল উড়ে গেল, নিমন্ত্রিত লোকজন অনেক আসতে পারল না, খাবার-দাবার নষ্ট হয়ে গেল অথবা আগুন লেগে সব কিছু পণ্ড হয়ে গেল। আধিভৌতিক ভয় সব থেকে মারাত্মক। প্রাণী জগৎ থেকে অশান্তির সৃষ্টি হয়, আমার বাড়ির লোকজন, বন্ধু-বান্ধব, প্রতিবেশীরা অশান্তি সৃষ্টি করছে। তারপর আছে জীব-জন্তু, পোকা-মাকড়, সাপ-বিছে, হিংস্র পশুদের থেকে আমাদের অনেক ভয় হয়। তৃতীয় আধ্যাত্মিক, আমার নিজের ভেতর থেকেই কিছু গোলমাল তৈরী হচ্ছে। আধ্যাত্মিক বিঘ্ন থেকে ভয়ের পরিমাণটা খুব কম থাকে। অত্যন্ত জরুরী কোন কাজ আছে, এই কাজ করার উপর আমার অনেক কিছু দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু তার আগে আমার শরীরে এমন এক ব্যাধি এসে গেল যে আমি নড়াচড়াই করতে পারছি না। আমাদের সব থেকে ভয় আসে আধিভৌতিক থেকে। আধ্যাত্মিক বিঘ্ন থেকে অতটা ভয় আসে না, আধিদৈবিক থেকেও খুব ভয় আসে না, কিছু বিঘ্ন হয়ে যাওয়ার একটা আশঙ্কা থাকে। কিন্তু আধিভৌতিক, ভূত মানে প্রাণী, প্রাণী জগৎ থেকেই আমাদের বেশি ভয় আসে। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক আর আধিদৈবিক এই তিন ধরণের ভয়ের বাইরে আরেক ধরণের ভয় আছে, তা হল অজানা, অচেনা বিষয়কে নিয়ে মানুষের মনে একটা ভয় থাকে। মনস্তাত্ত্বিক বিজ্ঞানে fear of the unknown একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই ভয়ের সাথে আমিত্ব নাশেরও কোন সম্পর্ক নেই। অজানা দেশ, অজানা পরিস্থিতি, অচেনা লোক সবটাতেই একটা ভয় থাকে। ভূতের ভয়টাও fear of the unknown।

প্রকৃত রূপে ভয় দুই ধরণের, বাস্তব এবং কাল্পনিক। বাস্তবিক ভয় সব সময় হয় আমিত্ব হারানোর ভয় আর কাল্পনিক ভয় সব সময় মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার। সেইজন্য fear of the unknown পুরোপুরি মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার। আমিত্ব হারানোর প্রধান ভয়টাই আসে আধিভৌতিক থেকে। আধিদৈবিক ভয় কোন কোন সময় আধিদৈবিক থেকে হয় আবার কোন কোন সময় আমিত্ব হারানোর ভয় থেকে আসে। যেমন বন্যা হয়ে গেল, জীবন বিপন্ন হয়ে গিয়ে মনে একটা ভয় এসে গেছে, আমি হয়তো বাঁচব না, এখানে আমিত্ব হারনোর ভয়টা

আছে। আবার অনেক সময় আমরা কল্পনা করছি, আমাকে তো ওখানে যেতে হচ্ছে শুনেছি ওদিকে নাকি বন্যা হয়। আসলে সেখানে কোন বন্যাই হয় না, আমি কল্পনা করে নিচ্ছি।

মনস্তাত্ত্বিক কারণে শুধু যে fear of the unknown থেকেই ভয় হবে তা নয়, মনস্তাত্ত্বিক কারণে ভয় অনেক রকমের হতে পারে। মনস্তাত্ত্বিক বিজ্ঞানে আরেকটি ভয়ের কথা বলা হয় Post Trauma Distress Syndrom(PTDS)। কোন মানুষ যখন অনেক দিন ধরে প্রচুর দুঃখ-কষ্টের মধ্যে দিয়ে যেতে থাকে তখন তার মধ্যে এই ট্রমা এসে যায়। আসলে তখন মস্তিষ্কের স্নায়ু আতঙ্কের মধ্যে চলে যায়। কেন যায়? আমিত্ব হারানোর ভয়ে। মস্তিষ্কে একটা বড় রকমের disorder হয়ে যায়। বাংলায় একটা প্রবাদ আছে, পোড়া গরু সিঁদুরে আকাশ দেখলে ভয় পায়, এটাই PTDS। একবার গাড়ি করে যাওয়ার সময় একটা বড় রকমের দুর্ঘটনা হয়ে গিয়েছিল, আপনি বেঁচে গেলেন কিন্তু আপনার সামনেই চারজন লোক মারা গিয়েছিল। মস্তিষ্ক তখন সঙ্গে সঙ্গে এই ছবিগুলো নেওয়া বন্ধ করে দেয়, কারণ মস্তিষ্ক বেশি ছবি নিয়ে নিলে আপনি পাগল হয়ে যাবেন। কিন্তু অল্প একটু ছাপ থেকে যায়, ওই অল্প একটু ছাপ থেকেই মারাত্মক মনস্তাত্ত্বিক ভয় তৈরী হয়ে যাবে। আপনি দেখেছেন একজনকে কুকুর কামড়ে দিয়েছে, পরে তাকে চৌদ্দ খানা ইঞ্জেকশান নিতে হয়েছে। এই যে আপনি কোন বিভৎস কিছু দেখেছেন বা বিভীষিকাময় বর্ণনা শুনেছেন তাতে আপনার মস্তিষ্কে একটা বড় ধাক্কা লেগেছে, এটা হল ট্রমা। সেখান থেকে একটা distress এসে গেছে, ফলে তখন আপনি অপরকেও সাবধান করে দিতে গিয়ে অপরের মনে একটা ভয় ঢুকিয়ে দিচ্ছেন। ভয় যে সব সময় খারাপ জিনিস তা নয়। আঙুলে একটু ছুঁচ ঠেকলেই আমরা কি চিৎকার করি, ফুটিয়ে দিচ্ছে না, শুধু একটু ঠেকে গেছে তাতেই চিৎকার করে উঠছি। শরীরের ব্যাথা ব্যাপারটাই খুব বাজে, কিন্তু অন্য দিক দিয়ে দেখতে গেলে ব্যাথা অনুভব হচ্ছে বলেই আমাদের শরীরটা ঠিকঠাক ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। কুষ্ঠ রোগ মানে শরীরের ব্যাথা যন্ত্রণার অনুভূতিটাই চলে গেছে। ব্যাথা জ্বালার অনুভূতি না থাকলে শরীরের কোন অঙ্গে অজান্তে যদি আগুন লেগে যায় আপনি জানতেই পারবেন না যে আগুনে আপনার শরীরের একটা অঙ্গ পুড়ে যাচ্ছে। ব্যাথা, জ্বালা, যন্ত্রণার অনুভূতি শরীরের ব্যাপারে আমাকে সজাগ করে দেওয়া হচ্ছে। যার ব্যাথার বোধ যত বেশি শরীরের রক্ষণা-বেক্ষণ করার ক্ষমতা তার তত বেশি। যাদের মন খুব অনুভূতি সম্পন্ন একটুতে তারা খুব কষ্ট পেয়ে যায়।

ভয় জিনিসটাও মানুষকে রক্ষা করে। কিসের থেকে রক্ষা করে? Self preservation থেকে। কিন্তু তার self জিনিসটা ক্রমাগত পাল্টাতে থাকে। ভিন্ন ভিন্ন মানুষের কাছে 'আমি' মানে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। একটা বাচ্চা ছেলে মাকে বলছে 'মা! আমি তোমাকে ভালোবাসি'। মা বলছে 'আমিও ভালোবাসি'। ছেলেটি পনের-ষোল বছর বয়সে মাকে গিয়ে বলছে 'মা! আমি তোমাকে ভালোবাসি'। মা তখন বলছে 'আমার কাছে আজ পয়সা নেই'। পঁচিশ বছরে গিয়ে একদিন সেই ছেলেটি মাকে বলছে 'মা! আমি তোমাকে ভালোবাসি'। মা বলছে 'মেয়েটির নাম কি? কোথায় থাকে? কোন জাতের'? পঁয়ত্রিশ বয়সে গিয়ে ছেলে আবার মাকে গিয়ে একদিন বলছে 'মা! আমি তোমাকে ভালোবাসি'। মা বলছে 'সেদিনই বলেছিলাম ওই প্রেতনিটাকে বিয়ে করিস না'। পঞ্চান্ন বয়সে গিয়ে ছেলে মাকে বলতে এসেছে আমি তোমাকে ভালোবাসি, বলার আগেই মা বলছে 'তুমি যতই ভালোবাসার কথা বল কোন কাগজেই আমি সই করছি না'। এটি একটি মজার গল্প ঠিকই, কিন্তু এখানে ছেলের আমিত্ব অনবরত পাল্টে যাচ্ছে। প্রথমে ছেলের আমিত্বটা ছিল মায়ের সঙ্গে জড়িয়ে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ছেলে বড় হয়ে গেছে এখন অনেক বন্ধু-বান্ধব, বাইরে গাড়ি করে ঘোরাটোরা এসবের সঙ্গে আমিত্বটা জুড়ে গেছে। তারপরে একটা মেয়েকে ভালোবেসেছে, সেই মেয়ের সাথে আমিত্ব জুড়ে গেছে। তারপর মেয়েটি এমন জ্বালাতে শুরু করেছে যে ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচির অবস্থায় চলে গেছে। শেষে হয়ত ছেলেপুলে হয়ে গেছে, এখন নিজের নামে সম্পত্তি দরকার। এভাবে আমাদের সবার আমিত্বটা ক্রমাগত পাল্টাতে থাকে। আমিত্ব নাশের ভয়, আমিত্ব, ভয় এগুলোকে এভাবে বিশ্লেষণ না করলে অভয়সূক্তমের মত বেদের অনেক মন্ত্র আমরা বুঝতে পারবো না।

আসক্তি আর অভিষঙ্গি এই দুটোকে মিলিয়ে আমিত্ব তৈরী হয়। অভিষঙ্গি মানে, আমার কাছের জন, স্বামী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, নাতি, নাতনী আর আমার জিনিসপত্র, বাড়ি, গাড়ি ইত্যাদি এই জিনিসগুলোর সাথে

নিজেকে জুড়ে নিয়ে মনে করছি, ওর ভালো মানে আমার ভালো, ওর খারাপ মানে আমার খারাপ। ইয়ং ছেলেরা মোটর সাইকেল ভালোবাসে, একটু ফাঁক পেলেই সোজা মোটর সাইকেলের কাছে গিয়ে পালিশ করবে, এটা সেটা খুটুরখাটুর করতে থাকবে। মোটর সাইকেলটাই তার প্রাণ। কথায় কথায় প্রায়ই আমরা বলি এই জিনিসটা আমার প্রাণ, প্রাণ মানে ওই জিনিসে আমার আমিত্বটা লেগে আছে। এই আমিত্বের মধ্যে একটু যদি পিন ফুটিয়ে দেওয়া হয় মনে করবে আমার জীবনের সব কিছু চলে গেল।

ভয় থেকে বেরনোর পথ কি? আমাদের যে আমিত্বটা দেশ ও কালের মধ্যে সীমিত হয়ে আছে, সীমিত থেকে সরিয়ে যে জিনিসটা নাশবান নয়, সেই চিরন্তন জিনিসে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে তার আর ভয় থাকবে না। আলেকজাণ্ডার ব্রাহ্মণকে বলছেন 'তোমাকে আমাদের দেশে নিয়ে যাব, যদি না যাও তোমাকে শেষ করে দেব'। ব্রাহ্মণ তখন আলেকজাণ্ডারকে বলছেন 'জীবনে তুমি এর থেকে বড় মিথ্যা কথা বলোনি'। তার মানে! ব্রাহ্মণের যে আমিত্ব, সেই আমিত্ব তাঁর যা স্বরূপ সেই আত্মাতে গিয়ে বসে গেছে। তিনি জেনে গেছেন আমার আমিত্বের নাশ কোন দিন হবে না। ভয় থেকে বেরনোর এটা গেল প্রথম উপায়, আত্মজ্ঞান হয়ে গেলে ভয় থাকবে না। কিন্তু আমরা অতি সাধারণ মানুষ, আত্মজ্ঞান হওয়ার সম্ভবনা আমাদের আপাততঃ সুদূর পরাহত। তাহলে দ্বিতীয় কি উপায়? একটাই উপায়, যেখানেই ভয়ের কিছু মনে হবে সেখান থেকে যত তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসা। ভয়কে যে না করেছে জয় তারই হয় পরাজয় – The moment you fear you are nobody। সিনেমার খুব নামকরা ডায়লগ, যো ডর গিয়া ও মর গিয়া। কিন্তু যে ভয়কে জয় করতে পারছে না সে কি করবে, তার জন্য কি উপায়? একটাই উপায়, ভয়ের ওই পরিস্থিতি থেকে সরে আসা। সরে না আসতে পারলে মরতে হবে। অফিসার তার কেরানীকে ক্রমাগত ভয় দেখিয়ে যাচ্ছে 'তোমার এসিআর কিন্তু আমি খারাপ করে দেব'। এখন বেচারা কেরানী কি করবে। কেরানী এসে বলতে পারে 'আপনার যা করার করে নিন'। তার মানে সে ভয়কে জয় করে নিয়েছে। আর তা নাহলে কেরানীকে সেই অফিসারের কাছ থেকে সরে আসতে হবে। ভয় মানে হয় আপনাকে পালাতে হবে, না হলে লড়াই করতে হবে। ভয় থেকে বেরনোর এই দুটোই পথ fight or fly। ভয় একটা মারাত্মক জিনিস, মানুষকে শেষ করে দেয়।

কিন্তু এর একটা মাঝারি পথ আছে, যেমন বলা হয় ভয় কাটানোর একটা ভালো উপায় হল নিয়মিত যদি চণ্ডী পাঠ করা হয়। আসলে ভয় মানে দুর্বলতার লক্ষণ। দুর্বল মনের অধিকারি মানুষই ভয় পায়। যিনি আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত তার মানে তাঁর ভেতরে পূর্ণশক্তির বিকাশ। দুর্বল মানুষ ছাড়া কেউ ভয় পায় না। একটা ছেলে মেয়েকে ভালোবেসেছে, ছেলেটির ভয় মেয়েটি যদি আমাকে ছেড়ে দেয়। আরে ভাই তোমার মধ্যে শক্তি যদি থাকে, তোমাকে ছেড়ে যাওয়া দূরে থাক আর দশটা মেয়ে তোমার পেছনে দৌড়াবে। ভেতরে যে শক্তির জাগরণ হবে, যে শক্তির জাগরণে ভয় চলে যাবে, সেই শক্তির জাগরণ চণ্ডী পাঠে আসে। সেইজন্যই বলা হয় চণ্ডী পাঠ করলে ভয় চলে যায়। কিন্তু সরাসরি শক্তি বাড়ানোর জন্য বেদের অভয়সূক্তম্। এখানে কিছু কিছু জিনিস ছাড়া যায় না। ভয় জিনিসটা যে চলে যাবে তা নয়, ভেতরে শক্তিটা বেড়ে যাবে। শক্তি দেখাতে গিয়ে যদি ঝামেলা হয়ে যায়? ঝামেলা হলে হবে, মরে গেলে মরে যাবে। বীরপুরুষ একবারই মরে কাপুরুষ হাজার বার মরে। এই হাজারবার মৃত্যুটা বন্ধ হয়ে যাবে। যেটা থেকে আমি পালাতে পারছি না, যেটাকে জয়ও করতে পারছি না, অথচ ভয় পেয়ে মরে আছি, এই মাঝারি অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য, ভেতরে শক্তির জাগরণের জন্যই অভয়সূক্তম্। আমরা এখন অথর্ব বেদের অভয়সুক্তম্ নিয়েই আলোচনা করতে যাচ্ছি। ছটি মন্ত্র নিয়ে অভয়সূক্তম্।

অভয়সূক্তম্ বেদের খুব ব্যতিক্রমি সূক্ত। বেদে এই ধরণের সূক্ত খুব বেশি পাওয়া যায় না, যেখানে একই সূক্তের মধ্যে ব্যক্তি ও নৈর্ব্যক্তিক ভাবে প্রার্থনা করা হয়েছে। যেমন এর প্রথম চারটি মন্ত্রে ইন্দ্রকে প্রার্থনা করা হচ্ছে। আর শেষ দুটি মন্ত্রে মন্ত্রকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, এখানে আর ইন্দ্রের প্রাধান্য নেই। পাঁচ আর ছয় নম্বর মন্ত্র পুরোপুরি নৈর্ব্যক্তিক, এই দুটি মন্ত্রকে যে কোন দেবতা বা ইষ্টের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যেতে পারে। সেইজন্য বলা হয় পাঁচ আর ছয় নম্বর মন্ত্রের মন্ত্রই দেবতা। মুসলমানরা যদি এই দুটি মন্ত্র পাঠ করে তাতেও দোষ নেই আবার শিবের ভক্তরাও যদি করে তাতেও কোন দোষ নেই।

উপনিষদে বলে অভয় একমাত্র অদ্বৈত অবস্থাতেই হয়। উপনিষদেই এক জায়গায় আছে যেখানে বলা হচ্ছে, প্রজাপতির জন্ম হওয়ার পরেই তিনি ভয় পেয়ে গেছেন। ভয় পেয়ে তিনি কাঁদতে শুরু করলেন। তারপর তিনি বিচার করতে শুরু করলেন, বিচার করে করে দেখছেন জগতে আমি ছাড়া তো আর কেউ নেই, তাহলে আমি কাকে ভয় করছি আর কার থেকেই বা ভয় পাচ্ছি, আমি কার ভয়ে কাঁদছি? তখনই বলছেন *অদ্বৈতম্ এবা অভয়ম্*। অর্থাৎ একমাত্র অদ্বৈত অবস্থাতেই অভয় হয়। যেখানেই দুই সেইখানেই ভয়। যেখানেই এই বোধ, আমি আলাদা সে আলাদা, সেখানেই ভয় থাকবে। জগতে যত রকমের সম্পর্ক আছে তার মধ্যে একটি সম্পর্কের মধ্যে ভয়ের কোন ব্যাপার থাকে না। নিজের মাকে কোন সন্তানই ভয় পায় না। কোন একটা অবস্থায় এসে বাবাকে ভয় পাবে কিন্তু মায়ের প্রতি ভয় কোন অবস্থায় হবে না। এর যে ব্যতিক্রম নেই তা নয়, সাধারণ ভাবে বিচার করলে দেখা যায় মায়ের প্রতি ভয় থাকে না। মায়ের সাথে সন্তানের একত্ব বোধটা থাকে বলে ভয় থাকে না। যেখানেই একত্ব বোধ থাকবে সেখানে ভয় থাকবে না। দ্বিতীয় গুরু বা কোন সাধুপুরুষকে মানুষ ভয় পায় না। কোন সাধুকে দেখে যদি কেউ ভয় পায় তাহলে বুঝতে হবে সাধুর ভেতর কিছু গোলমাল আছে। সন্ন্যাস নেওয়ার সময় সন্ন্যাসীদের অনেক রকম মন্ত্রোচ্চারণ করতে হয়, তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্র আছে যেখানে সন্ন্যাসীকে অঙ্গীকার করে বলতে হয় *অভয়ং সর্বভূতেভ্যঃ*, জগতে যত প্রাণী আছে সবাইকে আমি অভয় দিলাম, আমার কাছ থেকে কারুর ভয় উৎপন্ন হবে না। অভয় হল সন্ন্যাসীদের মূল ভাব। সন্ন্যাস মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশটাই অত্যন্ত মূল্যবান, *মত্তঃ সর্বং প্রবর্তন্তে*, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আমার থেকেই বেরিয়েছে। এটাই অদ্বৈতের শেষ কথা। আমার থেকেই যদি সব কিছু বেরিয়ে থাকে তাহলে আমার থেকে কারুরই ভয় পাওয়ার কথা নয় আর আমিও কাউকে ভয় পাবো না। বাঘ, বিছে, সাপ সব আমার থেকেই বেরিয়েছে, আতঙ্কবাদীরা বোমা মেরে যাচ্ছে তারাও আমার থেকেই বেরিয়েছে। এগুলো কোন কবির কল্পনা নয়, এটাই বাস্তব। অদ্বৈতের এই অবস্থায় পোঁছান কঠিন ঠিকই কিন্তু তাই বলে যেটা সত্য সেটাকে তো আমি না করে দিতে পারি না। একটা জিনিসকে আমি মানতে পারছি না, বুঝতে পারছি না, তাই বলে সত্যকে তো অস্বীকার করা যাবে না। এই জগৎ আমার থেকেই বেরিয়েছে, এটি অত্যন্ত উচ্চ ভাবের উচ্চ কথা, যেখানে ক্ষুদ্র আমিত্ব বৃহতে চলে গিয়ে দেখছেন *সর্বং খল্বিদং* বা *অহং ব্রহ্মাস্মি*, আমিই সেই। আমিই সেই যখন বোধ হয়ে যাবে তখন তিনি কাকে ভয় করবেন!

পরমহংসোপনিষদে সন্ন্যাসীদের লক্ষণের কথা গিয়ে বলা হচ্ছে, *যৎ আয়াতু তৎ আয়াতু যৎ প্রয়াতু প্রয়ান্তু তৎ*, যেটা আসার সেটা এসেছে, যেটা চলে যাওয়ার সেটা চলে গেছে, এর জন্য চিন্তা করার কী আছে! শরীর এসেছিল শরীর চলে গেছে, এর জন্য ঘাবড়াবার কিছু নেই। মুশকিল হল এমন একটা কোন জিনিস নেই যেটা আমরা সারা জীবন আঁকড়ে ধরে রাখতে পেরেছি। সব কিছুই নিজের মত আসছে আবার নিজের মত চলে যাচ্ছে। মাঝখান থেকে আমাদের মনের মধ্যে একটা ভাব তৈরী হয়ে গিয়ে মনে করছি আমি ওটাকে ধরে রেখেছি। আমাদের ক্ষুধা, তৃষ্ণাও নিজের মত আসে নিজের মত চলে যায়। সুখ, দুঃখ সব কিছুই কালবৈশাখী ঝড়ের মত নিজের মত এসে দু ফোঁটা জল ফেলে দিয়ে চলে গেল। জীবনে সব কিছুই নিজের মত আসে নিজের মত চলে যায়। আমি না চাইলেও আসবে, চাইলেও আসবে। কিন্তু মাঝখান থেকে সব কিছুর জন্য মাথা খারাপ করে আমরা অস্থির হয়ে পড়ি। অভয়ের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হয়। আমরা নিজেদের শরীরের সঙ্গে, আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবদের সাথে একাত্ম করে রেখেছি। যার ফলে শরীরের কিছু হলে, নিজের লোকদের কিছু হলে চোখের জল ফেলতে থাকি। ভয়ের এটা একটা দিক, যেখানে আমিত্ব নাশের ভয়, এটা হল ভয়ের মনস্তাত্ত্বিক দিক। মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়ে দেখতে গেলে আবার দুটো ব্যাপার হয়ে যায়। মস্তিষ্কের কিছু কিছু এমন মেকানিজম্ আছে যার জন্য প্রাণীর আচরণের হেরফের হয় আর দ্বিতীয় হল, মস্তিষ্কের কিছু রাসায়নিক বিক্রিয়ার জন্যও আচরণের এদিক সেদিক হয়ে যায়। অনেক সময় কোন কারণ নেই মস্তিষ্ক থেকে রাসায়নিক স্বরণ হতে থাকে। সব প্রাণীদের মস্তিষ্কে এ্যমিগডালা নামে একটা ছোট্ট অংশ আছে। সাপ, ব্যাঙ, ইঁদুর জাতীয় যত ছোট ছোট প্রাণী আছে তাদের মস্তিষ্কে এ্যমিগডালা ছাড়া আর কিছু নেই। এরা শুধু জানে এর সঙ্গে আমাকে লড়াই করতে হবে আর এর কাছ থেকে আমাকে পালাতে হবে। ওরা অন্য প্রাণী দেখলেই বুঝতে পারে এর সাথে লড়াই করতে পারব কি পারব না, যদি বুঝতে পারে লড়াই করতে পারব তখন লড়াই করতে নেমে পড়বে,

আর যদি দেখে পারব না তখন পালাবে। Flight আর fly এই দুটো কাজ ছাড়া এরা আর কিছুই জানে না। ভয়ের ভাবটাই প্রাণীদের বাঁচায়। একবার কিছু প্রাণী বিজ্ঞানী কয়েকটি ইঁদুরকে ইঞ্জেকেশান্স দিয়ে মস্তিষ্কের রাসায়নিক বিক্রিয়াটা পাল্টে দিলেন। ইঁদুরগুলি এখন তেতে গেছে। পাড়ার ফুঁকো মস্তানগুলোর গায়ে মাংস নেই, রোগা-প্যটাকা ঘাটের মড়া। কিন্তু মস্তানি করার সময় কত লম্ফ-ঝম্ফ, হয়ত গাঁজা-ফাজা খায় যার ফলে মস্তিষ্ক তেতে থাকে। ইঁদুরগুলোও এখন এত তেতে গেছে যে বেড়াল দেখেও ভয় পাচ্ছে না। বেড়ালগুলোও আনন্দে ইঁদুরের ভোজে নেমে পড়েছে। ফেয়ার মেকানিজমই প্রাণীকে রক্ষার কাজ করে, ফেয়ার মেকানিজমই ইঁদুরকে বেড়াল থেকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করে। কিন্তু ইঞ্জেকশান দেওয়া আছে বলে ভয়ের ব্যাপারটাই উড়ে গেছে। প্রাণী জগতে যত বিবর্তন হতে থাকে তত এ্যমিগডালার সাইজ ছোট হতে থাকে আর মস্তিষ্কটা বড় হতে থাকে। কোন একটা পরিস্থিতি এসে গেলে মস্তিষ্ক বিচার করতে থাকে। বাইরে থেকে বা ভেতর থেকে মস্তিষ্কে যত তথ্য আসতে থাকে তার মধ্যে শতকরা আটানব্বুই থেকে নিরানব্বুই মস্তিষ্কের প্রসেসিং এর মধ্যে দিয়ে যায়। ছোট্ট একটা অংশ এ্যমিগডালা দিয়ে যায়। এ্যমিগডালা কোন বিচার করবে না, হয় সে পালাবে নয়তো লড়াই করবে। লড়াই আর পালানো ছাড়া এ্যমিগডালা কিছু জানে না। সেইজন্য যারাই খুব ঝগড়া করে, একটু কিছু হলেই লড়াই করতে নেমে পড়ে, বুঝবেন তারা খুব ভীতু প্রকৃতির লোক, এ্যমিগডালার সাইজটা বড়। কোন মানুষের উপর যদি অনেক আপদ-বিপদ আসে বা অন্য কোন শারীরিক ঘাটতি হয়ে যায়, জীবনে প্রচুর মার খেয়েই যাচ্ছে বা সবাই তাকে দাবিয়ে রেখেছে, যেমন শূদ্রদের চার পাঁচ হাজার ধরে দাবিয়ে রেখেছে, এটা তাদের Racial Memoryতে ঢুকে গেছে। কোন কিছু হলেই তাদের আতঙ্ক হয়ে যায়, কারণ এ্যমিগডালাটা তাদের এই রকমই হয়ে গেছে।

ভয়ের ব্যাপারে এগুলো হল খুব সহজ ও সাধারণ বিশ্লেষণ। কিন্তু ভয় থেকে আমাকে বাঁচতে হবে, আমার অদ্বৈত জ্ঞান নেই আমি জানি, এই জন্মে আদৌ হবে কিনা জানি না। আমাকে বাঁচতে হবে। তাহলে ভয় থেকে বাঁচব কি করে? এটাও জানি যে ভয় একটু না থাকলে জীবন চলবে না। গাঁজা, ভাঙ খেয়ে নিলে ভয়-টয় চলে যায়, কারণ মস্তিষ্কের রাসায়নিক ক্ষরণগুলো পাল্টে যায়। কিন্তু এটা কোন পথ নয়। তাই মাঝামাঝি একটা পথ আছে, মস্তিষ্ককে শান্ত করা তার সাথে এ্যমিগডালার কার্যকলাপটা আস্তে আস্তে কমিয়ে নিয়ে আসা। জপ-ধ্যান করলে, বিচার করলে, যদিও বিচার ধ্যানেরই অঙ্গ আর প্রার্থনা যদি করা হয় তাহলে মস্তিষ্ক শান্ত হয়ে এগুলো কমে যায়। আমরা জানি এই মন্ত্রের প্রার্থনা হল ভয় থেকে মুক্তি পাওয়া, এই প্রার্থনা করলেও ভয় চলে যায়। ছোটবেলা থেকে আমরা শুনে আসছি দুর্গা নাম করে যাত্রা করলে যাত্রা পথে কোন আপদ-বিপদ আসে না। তাহলে মা দুর্গার নাম করে যারা বাড়ি থেকে যাত্রা করছে তাদের মা রক্ষা করবেন আর যারা মা দুর্গার নাম না করে বেরোবে মা তাদের রক্ষা করবেন না? তা কি কখন হয় নাকি! মালয়শিয়ার প্লেনের যে দুর্ঘটনা হল তাতে দক্ষিণ ভারতীয় কয়েকজন ছিলেন, তারা অবশ্যই নানা রকম দেবী-দেবতার নাম নিয়ে যাত্রা করেছিল কিন্তু তারাও মরেছে আর যারা কিছুই মানে না তারাও মরেছে। আসলে এসব প্রার্থনা করলে নিজের আত্মবিশ্বাসটা সজাগ হয়ে যায়, মনোবলটা বেড়ে যায়। কিছু কিছু বিচিত্র ঘটনার কথা শোনা যায় যেখানে অবিশ্বাস্য ভাবে অনেকে বিরাট ঝামেলা থেকে বেরিয়ে আসেন। জিম করবেটের একটা খুব নামকরা বই আছে যার নাম Maneater of Rudraproyag। এক সময় রুদ্রপ্রয়াগে একটা মানুষখেকো চিতা বাঘ প্রচুর মানুষ মেরে বেড়াচ্ছিল। সেই সময়ে কিছু তীর্থযাত্রী চারধাম করার জন্য রুদ্রপ্রয়াগে গেছে। তীর্থযাত্রীদের চিতা বাঘের কথা বলা হয়েছে। ওদের মধ্যে একজন মহিলা চিতা বাঘের কথা শোনার পর থেকেই একটা ভয় তাকে গ্রাস করে ফেলেছিল। সবাই তাকে আশ্বাস দিয়েছে, আমরা এত লোক আছি চিতাবাঘ এখানে কিছু করতে পারবে না। আতঙ্ক মহিলাকে তবুও ছাড়েনি। রাত্রিবেলা যখন সবাই ঘুমিয়েছে তখন মহিলাকে সবার মাঝখানে রেখেই ঘুমিয়েছে। মাঝ রাত্রে চিতা বাঘ এল, ঘরে ঢুকল, ঢুকে সবার মাঝখান থেকে ওই মহিলাকেই তুলে নিয়ে চলে গেল, কেউই টের পেল না। সকালবেলা উঠে সবাই দেখছে মহিলাটি নেই। অত লোকের মাঝখানে চিতা বাঘ ঢুকেছে কেউ টেরই পেল না। জিম করবেট লিখছেন ভয়েরও যেন একটা গন্ধ আছে। এখন কিন্তু বিজ্ঞানীরাও বলতে শুরু করেছেন যে, fear has a smell। মস্তিষ্কের কিছু রসায়ন যদি একটু এদিক সেদিক হয়ে যায়

তখন মানুষের মধ্যে ভয় উৎপন্ন হয়। রাসায়নিক পদার্থ মানেই গন্ধ থাকবে। বাঘ ওই গন্ধে ধরতে পারছে এই মানুষটি ভয় পেয়ে গেছে। কুকুরও পরিষ্কার ভয়ের গন্ধ বুঝতে পারে। কেউ ভয় পেলেই কুকুর তার গায়ে লাফিয়ে উঠবে। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের একজন বিদেশী মহারাজ ছিলেন, বিদেশেই থাকতেন। এখন তাঁর শরীর চলে গেছে। শেষের দিকে তিনি কথাই বলতেন না, শুধু মা, মা, মা দুর্গা মা দুর্গা করতেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তিনি সৈন্যবাহিনীতে ছিলেন। যুদ্ধে একবার জাপানী সৈন্যদের হাতে বেশ কয়েকজনের সাথে তিনিও ধরা পড়েন। সবাইকে ধরে নিয়ে গিয়ে ফায়ারিং স্কোয়াডে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে। যদিও তিনি তখন সন্ন্যাসী হননি কিন্তু আধ্যাত্মিকতার কিছু কিছু ভাব তাঁর মধ্যে তখনই ছিল। সৈন্যরা ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড়িয়ে কাঁদছে, তিনি তাদের বলছেন Why are you taking this jokes so seriously।, মৃত্যুটা একটা মজার জিনিস এটাকে এত seriously নিচ্ছ কেন? তিনিও ফায়ারিং স্কোয়াডে মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন, সেখানে দাঁড়িয়ে এই কথা বলছেন। তারপর কিভাবে সেখানে জাপানী কমাণ্ডারসরা এসে ওনাকে জিজ্ঞেস করল, তুমি কি কর? উনি বললেন আমি রেডক্রসে কাজ করি। ওনার ব্যাজ দেখলেন, সত্যিই তাই, ইনি রেডক্রসের লোক। ওনাকে বাইরে চলে আসতে বললেন। বাকি সবাইকে ফায়ারিং স্কোয়াডে গুলি করে মেরে দিল। তারপর ওখান থেকে কিভাবে কিভাবে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। ওনার কাছে মৃত্যু যেন একটা খেলা মাত্র, কোন ভয়ই নেই।

এগুলো বিচার করতে করতে ভয় কেটে যায়। বিচারও যদি না করতে পারে আবার অনেকে বলবে সবই বুঝি জানি কিন্তু ভয়কে সামলাতে পারি না। তখন এই মন্ত্রগুলি কাজে আসে। নিয়মিত এই সূক্তগুলি পাঠ করতে করতে মনের মধ্যে একটা নির্ভয়তার ভাব জেগে ওঠে। যদিও আমাদের শাস্ত্র মানুষের ভয় আর অশান্তির মূলে সংক্ষেপে তিনটে জিনিসের কথা বলছে, কিন্তু মানুষের ভয় যে কত ভাবে, কত রকমের হতে পারে তার কোন শেষ নেই। বেশির ভাগ ভয়ই হল মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার, অন্ধকার দিয়ে যাচ্ছি কোথাও কিছু নেই কিন্তু তাও ভয় পাচ্ছি। আবার ক্ষমতাবান লোকেরা চারিদিকে ছড়িয়ে আছে তাদেরকে নিয়ে ভয় হয়, রাস্তায় চোর-ডাকাতকে নিয়ে ভয় আর সাপের ভয়, কুকুরের ভয়, বিছের ভয় সব কিছু থেকেই ভয়। আমাদের জীবন-যাত্রা ভয় থেকে শুরু হয়ে ভয়ের দিকেই যাচ্ছে। বাচ্চা বয়সে মাস্টারের ভয়, পাশ-ফেলের ভয়, বড় হতে হতে চারিদিক থেকে শুধু ভয় আর ভয় এসে আমাদের ঘিরে ফেলে। চাকরি না পাওয়ার ভয়, চাকরি পেলে চাকরি চলে গেলে ভয়, বিয়ে হলে ডিভোর্সের ভয়, সন্তান হলে সন্তানকে নিয়ে ভয়। এই ভয় থেকে অভয়ের দিকে যাওয়ার জন্যই এই অভয়সূক্তম্। অভয়সূক্তম্ অথর্ব বেদে এসেছে। তবে এর কিছু কিছু সামবেদ ও ঋকবেদেও আছে। বেদের প্রধান দেবতা ইন্দ্র। এখন আমরা দেবতাদের অনেক নীচে নামিয়ে দিয়েছি, ভগবান সবার উপরে, ভগবানের নীচেই একটা যেন অন্য জগৎ আছে সেখানে দেবতারা থাকেন। সেই জগতের যিনি রাজা তাঁকেই ইন্দ্র বলা হয়। মহাভারতে বলা হয় যে, যিনি একশটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করবেন মৃত্যুর পর তিনি ইন্দ্র হন। সেইজন্য ইন্দ্র কখনই আদিকর্তা হতে পারেন না। বেদে আদিকর্তা হলেন পুরুষ। এখন আমরা যাঁকে ভগবান বলছি বেদের সময় তাঁকে পুরুষ বলা হত। ইন্দ্রের মধ্যে বাকি সব কিছু আছে, তিনি সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান সবই আছে কিন্তু ভগবানের আদিকর্তা নেই। সেই অর্থে ইন্দ্র আদিকর্তা নন। আদিকর্তা যদি না হন তাহলে তিনি হয়েছেন, হয়েছেন মানে তাঁকেও মরতে হবে। তার মানে ইন্দ্রও বিনাশশীল, ইন্দ্রের একটা আদি আছে একটা অন্ত আছে। যার আদি আছে আর অন্ত আছে তাকে নিয়ে আমরা হাজারটা কাহিনী বানিয়ে দিতে পারি। অথচ দর্শনের দৃষ্টিতে যখন দেখছি তখন তিনি ভগবান। বেদে ইন্দ্রের নামেই বেশি স্তুতি আছে। ভয় থেকে মুক্ত হয়ে অভয় পাওয়ার জন্য সেই ইন্দ্রকেই স্তুতি করে বলছেন –

যত ইন্দ্র ভয়ামহে ততো নো অভয়ং কৃধি।
মঘবং ছগ্ধি তব ত্বং ন উতিভির্বি দ্বিষো বি মৃধো জহি।।অ-১৯/১৮/১।।

জীবনে আমরা অনেক কিছুকেই ভয় পাই, হে ইন্দ্র! আমরা যে জিনিসগুলি থেকে ভয় পাই সেটা থেকে আমাদের মুক্তি দাও। শুধু মুক্তি নয়, আমাদের তুমি অভয়ে প্রতিষ্ঠিত করে দাও। ইন্দ্রের একটি নাম মঘবন, মেঘ থেকে মঘবন, অর্থাৎ যিনি মেঘের জন্ম দেন। প্রাচীন সংস্কৃতে মঘবনের শব্দের আরেকটি অর্থ যিনি

সম্পদাদি দেন। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ, দেশের যা কিছু সম্পদ তৈরী হয় তা কৃষির জন্যই হয়। কৃষিকার্য পুরোপুরি নির্ভরশীল বৃষ্টির উপর, মেঘ না হলে বৃষ্টি হবে না, এইভাবে সব কিছু মিলিয়ে মঘবন শব্দের কখন সেই অর্থ কখন এই অর্থ করা হয়। এখানে যিনি অর্থ করেছেন তিনি বলছেন, যিনি সম্পদ দেন। এখনও আমাদের এই বিশ্বাস যে, মানুষ যা কিছু সম্পদ পায় সব দেবতাদের কৃপাতেই পায়। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, যেখানে যেখানে যত দেবতার যত পূজা হয় সব পূজা আমার কাছেই আসে। কিন্তু ভগবান গীতাতেই বলছেন *সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ। অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্।।* তোমাদের যজ্ঞগুলি যেন কামধেনুর মত কাজ করে। যজ্ঞ মানেই দেবতাদের উদ্দেশ্যে আহুতি, সেই যজ্ঞের ফল রূপে তুমি যা কিছু কামনা করবে তার সব ফল তুমি পাবে। এখন আর বেদের নিয়ম মেনে যজ্ঞ করা যায় না, যজ্ঞের যে উপকরণ দরকার তারও অনেক কিছু আর পাওয়া যায় না। স্বামীজী বলছেন যা কিছু তুমি করবে সবটাই যজ্ঞ রূপে কর। গীতাতেই এই ভাব এসে গিয়েছিল। আমরা যারা এখানে শাস্ত্র অধ্যয়ন করছি, এটাও যজ্ঞ। যজ্ঞ করলে যজ্ঞের ফলস্বরূপ সমৃদ্ধি আসে। সমৃদ্ধি চাইলে যজ্ঞ করতে হবে। কাজ করা আর যজ্ঞ করার মধ্যে বিরাট তফাৎ আছে। আগেকার দিনের ব্রাহ্মণরা বা অন্যান্য যাঁরা ছিলেন, তাঁরা বাড়িতে যে কাজই করুক না কেন, ওনারা জানতেন এটা বাড়ির কাজ আর এটা যজ্ঞ। যে কোন কাজকে যদি যজ্ঞ রূপে করা হয় তখন তার ফল পুরোপুরি আলাদা হয়ে যাবে। স্কুলে শিক্ষক ছাত্রদের পড়াচ্ছেন, তিনি যদি মনে করেন পড়ানোটাই যজ্ঞ, তখন তার ফল অন্য রকম হয়ে যাবে। যজ্ঞের ভাব নিয়ে যা কিছুই করা হবে তার সব কিছুই আলাদা হয়ে যাবে, তার প্রস্তুতি এক রকম হবে, তার ফল এক রকম হবে। ওই কাজটাই যখন কাজ ভেবে করা হবে তখন পুরো জিনিসটাই অন্য রকম হয়ে যাবে। দেবতার উদ্দেশ্যে যখন কোন স্তুতি করা হয় তখন এক রকম হয়, সেই স্তুতিকেই যখন কবিতা রূপে পাঠ করা হয় তখন জিনিসটা অন্য রকম হয়ে যায়। যজ্ঞ আর সাধারণ কর্মে যে পার্থক্য, বেদের মন্ত্র আর কবিতায় ঠিক একই পার্থক্য। যার জন্য প্রথমের দিকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা বেদের ব্যাখ্যা করতে শুরু করলেন তাঁরা গুলিয়ে ফেললেন, তাঁরা মনে করলেন বেদের মন্ত্রগুলি কবিতা। কিন্তু বেদের মন্ত্র কোন আধুনিক কবিতা নয়। ঋষিরা ধ্যানের গভীরে যে সত্যগুলিকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন সেই সত্যগুলিকে কয়েকটি শব্দের মাধ্যমে আমাদের কাছে ব্যক্ত করলেন। মন্ত্রের মধ্যে যে আধ্যাত্মিক শক্তিগুলি রয়েছে, সেই শক্তির নামে আমরা যে স্তুতি করছি তাতে আমাদের মধ্যে সেই শক্তি প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে।

যেমন এখানে বলছেন, *মঘবং ছগ্ধি তব ত্বং ন উতিভির্বি দ্বিষো বি মৃধো জহি,* হে মঘবন্! আমরা আপনার কাছে প্রার্থনা করছি আমাদের যারা অপছন্দ করে, *দ্বিষো বি*, আমাদের যারা দ্বেষ করে, *মৃধো জহি*, তাদের আপনি নাশ করে দিন। আমাদের ক্ষতি কে করতে পারে? কার কাছ থেকে আমরা ভয় পেতে পারি? যারা আমাকে দ্বেষ করে। সাপ, বিছে, বাঘের মত বিষাক্ত হিংস্র প্রাণীকেও যদি নিয়ে আসা হয় সেখানেও একই ব্যাপার থাকবে। আমার প্রিয়জন কখন আমার ক্ষতি করবে না, আমার যদি কিছু হয়েও যায় সে আমাকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে। এখানে প্রিয়জনদের নিয়ে কিছু বলা হচ্ছে না। আমাদের যারা দ্বেষ করে, যারা আমাদের অপ্রিয় তাদেরকে আপনি নাশ করে দিন। কিন্তু এখানেও একটা সমস্যা এসে যায়, কারণ *মৃধো জহি* কথার দুটো অর্থ হতে পারে। একটা অর্থ তাকে নাশ করে দিন, দ্বিতীয় অর্থ হয় তার মনে আমার প্রতি যে বৈরী ভাব সেটা যেন নাশ হয়ে যায়। বেদের ব্রাহ্মণরা এখানে খুব উচ্চমানের একটা প্রার্থনা করছেন, হে ইন্দ্র! জগতে অনেক কিছু থেকে আমাদের ভয়, এই ভয়টা যেন আমাদের চলে যায়, *ততো নো অভয়ং কৃধি*, তুমি আমাদের অভয় দাও। এখানে অদ্বৈত তত্ত্বকে নিয়ে আসা হচ্ছে না। এখানে ভয় হল, যাদের মধ্যে দ্বেষ ভাব আছে তারা অনেক সময় আমাদের ক্ষতি করে দিতে পারে। যাদের মধ্যে দ্বেষ ভাব আছে হয় তাদের যেন নাশ হয় অথবা আমার প্রতি তাদের দ্বেষ ভাবটা যেন চিরতরে চলে যায়।

কিছু কিছু ধর্মীয় সাহিত্যে কিছু লেখা পাওয়া যায় যেখানে খুব সুন্দর কথা বলছেন, যে তোমাকে দ্বেষ করে, তোমার ক্ষতি করতে চাইছে সে যদি পুরুষ হয় তাকে তুমি শিব রূপে দেখ বা শ্রীরামকৃষ্ণ ভাব আর সে যদি নারী হয় তাকে পার্বতী বা মা সারদা রূপে দেখ, আর দিবারাত্রি প্রার্থনা করতে থাক। এইভাবে যদি সব সময় ভাবা হয়, ভাবতে ভাবতে কিছু দিন পর ওর প্রতি তোমার কোন ভয় থাকবে না, আর তার ভেতর যে

বিষটা আছে সেটা আস্তে আস্তে চলে যাবে। দংশনটা থাকবে কিন্তু বিষ থাকবে না। কিন্তু এই ভাব সত্যিকারের হতে হবে, কোন রকম দ্বিচারিতা থাকলে চলবে না। স্বভাবেই মানুষ নিজেকে সীমিত মনে করে, স্বভাববশতই মানুষ নিজেকে শরীর মনে করে। যেদিন থেকে ভারতে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি প্রবেশ করতে শুরু করেছে সেদিন থেকে এই ধারণাগুলি আরও বেশি আমাদের মধ্যে ঢুকে গেছে। যার ফলে যখনই আমাদের কোন সমস্যা আসে তখনই আমরা এই সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য একটা জাগতিক উপায় খুঁজতে থাকি। আমার মধ্যে ভয় এসেছে, এর একটা জাগতিক উপায় বার করতে হবে, অশান্তি চলছে, এর থেকে বেরোবার জন্য একটা জাগতিক উপায় অবলম্বন করতে হবে। হিন্দুদের কাছে কখনই এই ধরণের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল না। হিন্দুরা সব কিছুতেই, যে কোন সমস্যাতেই আধ্যাত্মিক সমাধান খুঁজতেন। তোমার ভেতরে প্রচুর কামভাব আছে, ঠিক আছে, জগতের সব মেয়েকেই তুমি জগন্মাতা রূপে দেখ। কোন মেয়ের মধ্যে কামভাব আছে, সব পুরুষকেই সাক্ষাৎ ঠাকুর রূপে দেখতে থাক, কিছু দিন পরে দেখবে তোমার কামভাব চলে গেছে।

অনেক দিন আগেকার একটা সিনেমার কাহিনীতে দেখাচ্ছিল এক বাড়িতে চোর এসেছে, সেই বাড়ির দেওয়ালে স্বামীজীর ছবি টাঙানো ছিল। চুরি করার আগে চোর স্বামীজীর মুখটা ঘুরিয়ে দেওয়ালের দিকে করে দিয়েছে। চোর ভাবছে স্বামীজী আর চুরি করা দেখছেন না। কারণ স্বামীজী দেখলে সে আর চুরি করতে পারবে না। আমরা নিজেরাই প্রতিনিয়ত চারিদিকে নানা রকমের গোলমাল করে বেড়াচ্ছি, ফলে আমরা ভয়ে মরছি, কুণ্ঠায় মরছি, লোভে মরছি। জীবনে আমাদের চাহিদার শেষ নেই। কারণ জীবনের প্রতি আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গীটাই আমাদের চলে গেছে। কিন্তু বেদের সময় তাঁরা জাগতিক দৃষ্টিভঙ্গীটা জানতেনই না। শত্রুকেও যদি মারতে হয় আমাকে বেদের যজ্ঞ করতে হবে। আমার সন্তান চাই, যজ্ঞ করতে হবে। টাকা চাই, যজ্ঞ কর, সবটাই আধ্যাত্মিক। কে ঠিক বলছে আমরা কি করে জানব! আজ যে চিন্তাবিদ যে কথা বলছেন, কাল অন্য একজন চিন্তাবিদ এসে সেটাকে পাল্টে দিচ্ছেন। পুরো মার্ক্সবাদ দাঁড়িয়ে আছে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের উপর। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ নিয়ে এসেছিলে হেগেল নামে একজন জার্মান দার্শনিক। শ্যপেনওয়ার তারই প্রবর্তক ছিলেন। পরে তিনিই আবার হেগেলের নামে বলে গেছেন he stands as monument of German stupidity। জার্মানরা যে কত stupid হয় তার মনুমেন্ট হলেন হেগেল। হেগেলের ফিলজফির উপর দাঁড়িয়েছে মার্ক্সবাদ। তাহলে স্টুপিড কে? শ্যপেনওয়ার না হেগেল? আমার কী করে বলব! তবে আমরা এটা জানি যে ঋষিরা এক অপরকে কখনই স্টুপিড বলেন না। এদের কাছে বস্তুবাদই সব, ম্যাটারিয়ালিজম্ ছাড়া কিছু জানে না। ঠাকুর বলছেন মূলো খেলে মূলোর ঢেকুর ওঠে, নিজেরাও সব জড়বাদী অপরকেও জড়বাদী বানাচ্ছে। ঋষিরা ছিলেন আধ্যাত্মিক পুরুষ সব কিছুতে তাই আধ্যাত্মিকতার দৃষ্টিতে দেখতেন। ভয়ের মধ্যেও আধ্যাত্মিকতাকে আবিষ্কার করছেন। আগের মন্ত্রকেই টেনে নিয়ে দ্বিতীয় মন্ত্রে বলছেন –

ইন্দ্রং বয়মনুরাধং হবামহেহনু রাধ্যাস্ম দ্বিপদা চতুষ্পদা।
মা নঃ সেনা আররুষীরূপ গুর্বিষূচিরিন্দ্র দ্রুহো বি নাশায়।।অ-১৯/১৫/২।।

ভয় সম্পর্কিত আমাদের অনেক রকম সমস্যা। হে ইন্দ্র! তুমিই সবাইকে যা কিছু শুভ আছে দাও। *রাধ্যাস্ম দ্বিপদা চতুষ্পদা*, রাধা শব্দের অর্থ ভালোবাসা, রঞ্জনাত্মক। রাধা, আরাধনা একই ধাতু থেকে এসেছে, মানুষ যেটাকে চায় সেটাকে পাওয়ার জন্য যে আরাধনা করা হয়। দ্বিপদা বলতে মানুষকে বোঝাচ্ছে আর চতুষ্পদার অর্থ চতুষ্পদী প্রাণী। ব্যাখ্যাকাররা বলছেন যে মানুষের মধ্যে শক্তি আছে, শক্তি থাকলে ভয় পাবে না আর ভয় না থাকলে তার সম্পদ হবে। তখনকার দিনে সম্পদ মানে তার অনেক গবাদি পশু থাকা। তাহলে এর পুরো অর্থ এইভাবে দাঁড়ায়, যে মানুষের মধ্যে শক্তি থাকে তার অনেক গবাদি পশু হবে আর তার অধীনে অনেক মানুষ থাকবে। আলেকজাণ্ডারের মধ্যে এই ক্ষমতাটা ছিল। আলেকজাণ্ডার যে ঘোড়ার পিঠে বসে যুদ্ধ করতেন, প্রথমে সেই ঘোড়াকে বড় বড় যোদ্ধারাও কব্জা করতে পারছিল না। যে কাছে যাচ্ছে তাকেই ঘোড়া উল্টে ফেলে দিচ্ছে। আলেকজাণ্ডার কিছুক্ষণ ঘোড়াকে লক্ষ্য করলেন, লক্ষ্য করার পর তিনি সোজা গিয়ে ঘোড়ার লাগামকে ধরে ওর মুখটা ঘুরিয়ে দিলেন। সেদিন থেকে সারাটা জীবন তিনি ওই ঘোড়ার পিঠে বসেই বিশ্ব জয় করেছিলেন। ভারতে আসার পর একটা যুদ্ধে ঘোড়াটা মারা যায়। ঘোড়ার শরীর এত বিশাল ছিল যে

সূর্যের আলোতে ঘোড়ার ছায়াটা বিরাট দেখাচ্ছিল। নিজের ছায়াকে দেখেই ঘোড়া ভয় পেয়ে যাচ্ছিল। ভয় পেয়ে ছিল বলে কেউ কাছে গেলেই তার উপর রেগে যাচ্ছিল। আলেকজাণ্ডার গিয়ে ঘোড়ার মুখটা সূর্যের দিকে করে দিলেন। সূর্য সামনে এসে যাওয়াতে ছায়াটা আর দেখতে পাচ্ছিল না বলে ভয়টা কেটে গেল। এই যে শক্তি, হে ইন্দ্র! আমি যেন এই শক্তি লাভ করতে পারি যাতে মানুষ পশু সব কিছুই আমার মুঠোয় আসে। শক্তি না থাকলে কীট পতঙ্গের মত পরে পরে মার খেয়ে যেতে হবে। আমাদের যত শাস্ত্র আছে, সব শাস্ত্র বারবার বলছে, শক্তিহীনদের জন্য জগৎ নয়, এই জগৎ হল বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। আমাদের মধ্যে কাউকেই দেখা যায় না, যে বলছে শাস্ত্র পড়ে আমার মধ্যে শক্তি জেগেছে এবার আমি জগৎ জয় করতে চললাম। শক্তির অভাব মানেই ভয়, যার শক্তি আছে তার আবার কিসের ভয়! পরের দিকে শক্তির উপাসনাকে ওনারা পুরো আলাদা দিকে নিয়ে গেলেন। আমাদের ভেতরেই শক্তি, শক্তিকে জাগাতে হবে। সব জায়গায় বক্তারা ভাষণ দিয়ে যাচ্ছে আর আমরাও শুনে যাচ্ছি তুমি সেই পূর্ণ ব্রহ্ম, তোমার মধ্যেই অনন্ত শক্তি কিন্তু আচরণে শুধু শক্তিহীনতার প্রকাশ। আমাদের তাই ভয়েরও শেষ নেই। ইন্দ্রের কাছে এই শক্তিরই প্রার্থনা করা হচ্ছে, দ্বিপদ, চতুষ্পদ সব কিছুই যেন আমার অধীনে আসে।

শুধু তাই না, *মা নঃ সেনা আররুষীরূপ*, শত্রুর সেনাও যদি চলে আসে আমি যেন তাদের মুখোমুখি হতে পারি। কিন্তু তারও আগে আমি প্রার্থনা করছি শত্রু সেনারা যেন আদপেই সামনে না আসে, দূরেই যেন তাদের গতিপথ থেমে যায়। আর প্রার্থনা করছেন, কোন অশুভ শক্তিই আমার কাছে যেন আসতে না পারে। যারা আমাকে দ্রোহ করে, আমার কাছে আসার আগেই তাদের মুখগুলো যেন ফিরে যায়। ব্রাহ্মণরা এই মন্ত্রগুলো পাঠ করতেন, ব্রাহ্মণরা তো আর লড়াই, মারামারি করতে চাইতেন না। সেইজন্য বলছেন আগেই যেন সব কিছু মিটে যায়। মূলতঃ এই মন্ত্র হল শক্তির মন্ত্র, আমাদের এমন শক্তি হয় যাতে টাকা-পয়সা, মানুষ, পশু সব আমার বশে থাকে। আমাদের এত বিশাল শাস্ত্র কিন্তু একমাত্র উপনিষদেই বৈরাগ্যের কথা পাওয়া যায়, তাও আবার সেটা সন্ন্যাসীদের জন্য বলছেন। কয়েকজন মুষ্টিমাত্র মানুষ যাঁরা একেবারে কঠোর ভাবে সন্ন্যাসী, যাঁদের হাতে ধর্ম থাকবে তাঁদের জন্যই উপনিষদ। কিন্তু ভারতের এমনই দুর্ভাগ্য যে উপনিষদের সব বৈরাগ্য নিয়ে নিয়েছে গৃহস্থরা, না করে পয়সার উপার্জন, না করে ভোগ, ভোগ করার ক্ষমতা নেই, খেলে পেট খারাপ হয়ে যায়, মেয়েদের পেছনে দৌড়ালে মার খেয়ে মরে। এগুলো কোন বৈরাগ্যই নয়। আগে শক্তি অর্জন করতে হবে। গৃহস্থরা সন্ন্যাসীর ধর্ম নিয়ে নিয়েছে, গৃহস্থ ধর্ম তাহলে কে নেবে? সন্ন্যাসীরাই নিয়ে নিয়েছে, এক একজন সন্ন্যাসীর হাজার হাজার কোটি টাকা। হিন্দু ধর্ম তা নয়, হিন্দু ধর্মে সন্ন্যাসীরা ত্যাগে প্রতিষ্ঠিত হবে আর বাকিরা ধর্ম, অর্থ আর কামে প্রতিষ্ঠিত হবে। এখানে বড় বিঘ্ন ভয়, এই ভয়টা যেন না থাকে।

পাপ জিনিসটা কি? পাপ বলে কিছু আছে নাকি! ঠাকুর পাপের সংজ্ঞা দিচ্ছেন, যে কাজ করলে মন খুঁত খুঁত করে সেটাই পাপ, যদি খুঁত খুঁত না করে তাহলে কিছুই নয়। কিন্তু যারা পেশাদার খুনী প্রতি নিয়ত খুন করছে, তারা পাপ করছে কি করছে না? বেদান্তের দৃষ্টিতে কিছু করছে না। অন্য দিকে বলা হয় চিত্রগুপ্ত বসে আছেন তোমার সব রেকর্ড রাখছেন। এগুলো বলা হয় যাতে তোমার মনের খুঁত খুঁতানিটা বাড়ে। মনের মধ্যে যদি সব সময় খুঁত খুঁত করতে থাকে তাহলে তুমি শেষ। পাপের খুঁত খুঁত আর ভয় এই দুটো মানুষকে শেষ করে দেয়।

ইন্দ্রস্ত্রাতোত বৃত্রহা পরস্ফানো বরেণ্যঃ।
স রক্ষিতা চরমতঃ স মধ্যতঃ স পশ্চাৎস পুরস্তান্ নো অস্তু।।অ-১০/১৫/৩।।

ইন্দ্রের খুব প্রচলিত একটি নাম বৃত্রহা। বেদে দুটি জাতির কথা বলা হয়, দেবতা আর অসুর। দুজন একই বাবার সন্তান আবার মায়েরাও সবাই বোন। দুই বোনের একই স্বামী হলে যা হয়ে থাকে, বোনেদের মধ্যে ঈর্ষা, ঝগড়া লেগেই থাকত। পরে এদের সন্তানরাও সারা জীবন ঝগড়া করতেই থেকে গেল। দেবতা আর অসুর এই দুই জাতির ঝগড়া, বিবাদ, মারামারি নিয়ে আমাদের পরম্পরাতে প্রচুর কাহিনী ছড়িয়ে আছে। দেবতা আর অসুরের লড়াই এর কতটা কাহিনী কতটা সত্য আমাদের জানা নেই। ভালো ও মন্দের লড়াই

চিরন্তন, ঋষিরা দেখলেন ভালো ও মন্দের লড়াইকে সাধারণ মানুষের কাছে রাখতে হলে কাহিনীর মাধ্যমে রাখতে হবে, তা নাহলে মানুষ নিতে পারবে না। এগুলো হল শাস্ত্র, শাস্ত্রের কাহিনীগুলোকে খুব বেশি আক্ষরিক ভাবে নিতে নেই। কাহিনীর মধ্যে যে তত্ত্ব আছে সব সময় সেই তত্ত্বটা নিতে হয়। ঠাকুরও বলছেন শাস্ত্রে চিনিতে বালিতে মিশে আছে, চিনিটুকু নিয়ে বালিটুকু ছেড়ে দিতে হয়। ইন্দ্রের বৃত্রহা নাম হওয়ার পেছনেও একটা কাহিনী আছে। এই কাহিনী বেদে যেমন এসেছে তেমনি মহাভারত এবং অন্যান্য শাস্ত্রেও এসেছে। বৃত্রাসুর ছিলেন অসুরদের রাজা। বৃত্রাসুর এতই ক্ষমতাবান ছিল যে তাকে পরাজিত করা খুব দুরূহ ছিল। কিন্তু ইন্দ্র এই বৃত্রাসুরকে বধ করেছিলেন, সেই থেকে ইন্দ্রের আরেকটি নাম হয়ে গেল বৃত্রহা। বৃত্রাসুরকে মারার জন্য অনেক রকম কায়দা করতে হয়েছিল, সেইজন্য এক বিশেষ বজ্র তৈরী করতে হয়েছিল, সেই বজ্র তৈরী করতে গিয়ে দধীচি মুনির শুদ্ধ হাড়ের দরকার হয়েছিল। এগুলো নিছকই কাহিনী। আবার অনেকে এগুলোকে প্রতীক রূপে দেখিয়ে থাকেন। ইন্দ্র হলেন মেঘের দেবতা, মেঘ আবার জলের দেবতা। জল মেঘের মধ্যে কোন কারণে আটকে গেছে, সে বেরোতে পারছে না। বিদ্যুৎ চমকায় মানে, ইন্দ্র বজ্র মেরে মেঘ ভেঙে দিচ্ছেন।

ইন্দ্রস্ত্রাতোত, ত্রাতা শব্দটি বেদের একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ শব্দ, নানা রকম সমস্যা থেকে যিনি ত্রাণ করেন তাঁকেই বলছেন ত্রাতা। ইন্দ্র হলেন ত্রাতা, তিনি আবার বৃত্রাসুরকে বধ করেছিলেন। হে ইন্দ্র! আপনি ত্রাতা, বৃত্রাসুরের বধকারী, আপনি আমাদের *বরেণ্য*। বরেণ্য মানে, যিনি বরণ করার যোগ্য, বরণীয়। হে ইন্দ্র! আপনি বরেণ্য, আপনাকে আমরা বরণ করছি। তার বদলে আপনি আমাদের জন্য কি করবেন? *স রক্ষিতা চরমতঃ*, দুঃখের পরিস্থিতি যখন চরমে চলে যাচ্ছে, অর্থাৎ চরম সমস্যায় আপনি যেন আমায় রক্ষা করেন। এই প্রার্থনা যে কোন দেবতার উদ্দেশ্যেই করা যেতে পারে। সন্ন্যাস মন্ত্রেও এই ধরণের মন্ত্র ব্যবহার করা হয়। তবে সেখানে ইন্দ্র, মিত্র, অগ্নি দেবতার নাম না করে যার যিনি ইষ্ট সেই ইষ্টের নামে প্রার্থনা করা হয়। এখানে এই প্রার্থনাই করা হচ্ছে, হে ইন্দ্র! আমাদের চরম যে দুঃখ বা ভয় সেই দুঃখ থেকে আমাদের রক্ষা করুন। শুধু চরম দুঃখেই নয়, *স মধ্যতঃ স পশ্চাৎস পুরস্তান্ নো অস্তু*। আপনি আমাদের মাঝখান থেকেও রক্ষা করুন, পেছন থেকেও রক্ষা করুন আর অগ্র ভাগ থেকেও রক্ষা করুন। রক্ষা কবচেও ঠিক এভাবেই প্রার্থনা করা হয়। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে যে দেবীকবচ আছে, দেবীকবচ বেদের অভয়সূক্ত থেকেই প্রভাবিত হয়ে রচনা করা হয়েছে। হিন্দু ধর্মে এমন কিছু নেই যেটা বেদ থেকে নেওয়া হয়নি। একটা আইডিয়া বেদে যদি আগে থেকে না থাকে সেই আইডিয়া হিন্দুরা কখনই গ্রহণ করবে না। একবার যখন এখানে ইন্দ্রকে প্রার্থনা করা হচ্ছে, আপনি আমাদের রক্ষা করুন, এরপর এই প্রার্থনা যে কোন দেবী বা দেবতার দিকে চলে যাবে। প্রথম তিনটি মন্ত্রে ইন্দ্রের কাছে প্রার্থনা করে বলা হচ্ছে, হে ইন্দ্র! আমাকে শত্রু থেকে, চরম দুঃখ থেকে রক্ষা করুন, আমাকে চারিদিক থেকে রক্ষা করুন। কিন্তু ঠিক পরের মন্ত্রেই সুরটা পাল্টে যায়।

উরুং নো লোকমনু নেষি বিদ্বানৎস্বর্যজ্জ্যোতিরভয়ং স্বস্তি।
উগ্রা ন ইন্দ্র স্থবিরস্য বাহূ উপ ক্ষয়েম শরণা বৃহন্তা।।অ।১১/১৫/৪।।

প্রার্থনা করে বলছেন, হে ইন্দ্র! তুমি আমাকে সেই বৃহতের দিকে নিয়ে চল যেখানে শুধুই জ্যোতি আর জ্যোতি। স্বঃ মানে অন্তরীক্ষ। কিন্তু স্বঃ এখানে আলোর অর্থে বলছেন, আমাকে সেই লোকে নিয়ে চল যেখানে শুধু আলো। কিসের আলো? অভয়ের আলো। মানুষ মাত্রই অন্ধকারকে ভয় পায়। মানুষের জীবনে যা কিছুই নেতিবাচক সেটাকেই অন্ধকারের সঙ্গে যোগ করে দেয়। বলা হয়, একমাত্র মানুষই মৃত্যুর সময় আলোর দিকে যায়, বাকি সব প্রাণী অন্ধকারের দিকে যায়। যার জন্য বনে জঙ্গলে বা অন্য কোথাও পশু পাখির মৃত শরীর দেখতে পাওয়া যায় না। মৃত্যুর সময় যখন আসে তখন এরা আস্তে করে অন্ধকারে চলে যায়। একমাত্র মানুষই এমন এক প্রজাতি যারা মৃত্যুর সময় আলো খোঁজে, মৃত্যুর সময় তাই তাকে বলতে দেখা যায়, জানলার পর্দা সরিয়ে দাও, আলো আসতে দাও অথবা বলবে আমাকে বাইরে নিয়ে যাও। কারণ তখন সে আলো খুঁজতে থাকে। এখানে সেই কথাই বলছেন, হে ইন্দ্র! আমাকে সেই অনন্ত লোকের দিকে নিয়ে চল যেখানে শুধু আলো আর আলো। কিন্তু এখানে আলো বলতে জ্ঞানের আলোর কথা বলা হচ্ছে, ভৌতিক আলোর কথা বলছেন না।

ওখানে আর কি কি থাকবে? *বিদ্বানৎস্বর্যজ্জ্যোতিরভয়ং স্বস্তি,* হে ইন্দ্র! আমাকে সেই লোকে নিয়ে চল যেখানে আলোময়, যেখানে অভয় আর স্বস্তি আছে। ব্যাখ্যাকাররা স্পষ্ট করে বলছেন না যে, এই মন্ত্র মৃত্যুর প্রার্থনা নাকি জীবনের প্রার্থনা। মৃত্যুর প্রার্থনা হবে না, কারণ যেখানে মৃত্যুর জন্য প্রার্থনা করা হয় সেখানে আস্তে আস্তে মৃত্যুর বর্ণনার দিকে নিয়ে চলে যাবে, এখানে তা করা হচ্ছে না। এটা যদি ঋষির নিজেরই প্রার্থনা হয় তাহলে এর এই অর্থই হবে আমাকে ভয় থেকে অভয়ে নিয়ে যাও, যার মধ্যে অভয় এসে গেছে সেই মহৎ হয়ে গেছে। স্বামীজী বলছেন, The moment you fear you are nobodhy। Nobody মানে তুমি সীমিত হয়ে গেল। যার ভয় চলে গেছে সে অসীম হয়ে গেল। .ঠিক তেমন অশান্তি যখন হয়ে যায় তখন মানুষ নিজেকে সঙ্কুচিত করে ফেলে। অশান্তি থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য শ্রীমা বলছেন – 'যদি শান্তি চাও মা, কারও দোষ দেখো না। দোষ দেখবে নিজের। এই জগতে কেউ পর নয়'। যেখানেই ভয়, যেখানেই অশান্তি সেখানেই জগতকে পর দেখে। যেখানে সবাই আমার আপনার লোক এই দৃষ্টিভঙ্গী সেখানে অশান্তি আর ভয় থাকে না, কিন্তু যেখানে পর মনে হবে সেখানেই অশান্তির সম্ভবনা থাকে। শ্রীমা বলছেন জগতে কেউ পর নয়। পর দেখলেই দোষ দেখা শুরু হবে, দোষ দেখলেই অশান্তি হবে। যদিও মনের যে কোন আবেগই নেতিবাচক, আবেগ কখনই ইতিবাচক হয় না। ভয় আদি নেগেটিভ ইমোশানগুলি তখনই আসে যখন জগতকে পর বলে বোধ হয়। জগতকে যদি পর বলে বোধ না হয় তখন মনের কোন আবেগ কখনই নেগেটিভ হবে না। পরের দোষ দেখা, ভয় পাওয়া, অশান্তি হওয়া, এই জিনিসগুলো আসবে না। আরও টেনে নিয়ে গেলে তখন লোভ আসবে না, মোহ আসবে না। ঈশোপনিষদে বলছেন, *তত্র কো মোহঃ কঃ শোকঃ একত্বমনুপশ্যতি,* যেখানে একত্ব দেখছে সেখানে কী করে লোভ আসবে, কিসের প্রতি লোভ আসবে! সবটাই তো আমারই জিনিস। নিজের জিনিসের প্রতি কেউ কি কখন লোভ করে? আমার পকেটে এই কলম আছে, আমি আর এই কলম এক, আমি আমার কলমের জন্য কখনই লোভ করতে পারি না। যখন একত্ব বোধে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তখন জগতের সব কিছুই নিজের জিনিস দেখছে। এটাই বলছেন, হে ইন্দ্র! আমাকে সেই অসীম লোকে, সেই আলোর দিকে নিয়ে চলুন, যেখানে গিয়ে আমার অভয় আর স্বস্তি হবে। এখানে উপনিষদের অদ্বৈত সিদ্ধান্তের ব্যাপারে সরাসরি কিছু বলছেন না। কারণ বেদ মানেই উপাচার, বেদ মানেই যজ্ঞ, বেদ মানেই স্তুতি। এই ধরণের স্তুতির দৃষ্টি অদ্বৈতের দিকে, Personal God বলতে আমরা যেভাবে বুঝি, গোঁড়া বৈষ্ণবরা, মুসলমানরা বা খ্রীশ্চানরা যেভাবে প্রার্থনা করেন, এখানে প্রার্থনা সেভাবে নয়। বেদের এই ধরণের প্রার্থনা যেন থেকে থেকে অধ্যাত্মের উচ্চতম তত্ত্বের একটা ঝলক দিচ্ছে।

আবার বলছেন *উগ্রা ন ইন্দ্র স্থবিরস্য বাহু,* হে ইন্দ্র! তোমার বাহুতে প্রচণ্ড শক্তি। উগ্র এখানে বাংলা বা সংস্কৃতের উগ্র নয়, বেদে উগ্র মানে powerful, mighty, শক্তিশালী। *উপ ক্ষয়েম শরণা বৃহন্তা,* হে ইন্দ্র! তুমি দেবতাদের রাজা, তুমি বৃত্রাসুরকে বধ করেছ, তুমি ত্রাতা, তোমার শক্তিশালী বাহুর শরণাগত হয়ে যেন থাকতে পারি, তোমার ছত্রছায়ায় যেন আশ্রয় পাই। দ্বৈতভাব যেখানেই আসবে, আমি আলাদা ঠাকুর আলাদা এই ভাব যেখানেই আসবে সেখানেই ভক্তির ভাব আসবে। ভক্তি ভাবের চরম অবস্থা হল শরণাগতির ভাব। অদ্বৈত ভাবে শরণাগতির প্রশ্নই ওঠে না, যার মধ্যে একত্ব বোধ এসে গেছে সেখানে কে কাকে শরণ দেবে! দ্বৈতের শেষ কথা শরণাগতি আর এর অন্য দিকে প্রেমাভক্তি। যদি ভক্তি ভাব নিয়ে এগোয় তখন সেই ভাব শরণাগতিতে চলে যায় আর যখন ভালোবাসা নিয়ে এগোয় তখন সেটাই প্রেমাভক্তির দিকে চলে যায়। সেই দিক থেকে শ্রীরাধার ভক্তি শরণাগতি নয়। যশোদার বাৎসল্য ভাবেও প্রেমাভক্তি। শরণাগতি আর প্রেমাভক্তিতে একই জিনিস হয়। শরণাগতিতে আমি ভাবটা নাশ হয়ে যায়, আমার মধ্যে কিছু করার ক্ষমতা আছে এই বোধটা থাকে না। এর উপমা দেওয়ার জন্য ঠাকুর খুব সুন্দর গল্প বলছেন। বৈকুণ্ঠে ঠাকুর শয়ন করে আছেন। হঠাৎ ঠাকুর দৌড়ে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পরেই আবার বৈকুণ্ঠে ফিরে এসে শুয়ে পড়লেন। লক্ষ্মী জিজ্ঞেস করেছেন, হঠাৎ করে কোথায় চলে গিয়েছিলেন। ঠাকুর তখন বলছেন, আমার এক ভক্ত আমার নাম করতে করতে বিভোর হয়ে যাচ্ছিল, যেতে যেতে ধোপারা কাপড় শুকোচ্ছিল সেগুলো মাড়িয়ে চলে গেছে। তাই দেখে ধোপারা আমার ভক্তের দিকে তেড়ে মারতে এসেছে দেখে দৌড়ে গিয়েছিলাম রক্ষা করতে। লক্ষ্মী আবার

জিজ্ঞেস করছেন, কিন্তু আবার ফেরত চলে এলেন কেন? ঠাকুর বলছেন, আমার ভক্ত সেও একটা পাথর তুলে নিয়েছে ধোপাদের মারার জন্য। এগুলো কাহিনী, কিন্তু এটাই শরণাগতির ভাব। শরণাগতিই ভক্তির শেষ কথা, যেখানে আমি ভাবের নাশ হয়ে যাচ্ছে। আমি ভাব থাকলে পূর্ণ শরণাগতি হবে না। ভালোবাসার ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হয়, যখন আমি ভাব থাকে তখন পূর্ণ ভালোবাসা বা প্রেমাভক্তি হয় না। আমি ভাব যখন চলে যায় তখনই প্রেমাভক্তির উদয় হয়, তখন আমি আর তুমি বলে কিছু জানে না। এখানেও ঠিক তাই বলছেন, হে ইন্দ্র! আমি তোমার শক্তিশালী বাহুর শরণাগত নিলাম, আশা করি তুমি আমায় রক্ষা করবে। রক্ষা করে কি করবে? স্বস্তি আর অভয় এই দুটোতে তুমি আমাকে প্রতিষ্ঠিত করে দেবে। কোথায় নিয়ে প্রতিষ্ঠিত করবে? এমন এক লোকে যে লোক অনন্ত আর যেখানে শুধু আলো আর আলো। বেদে যে লোকের কথা বলা হয় সেখানে ভৌতিক লোকের কথাই বলা হয়। কিন্তু আমরা যখন এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা করব তখন এভাবে করতে হবে, আমাদের মন যেন আলোময় হয়ে ওঠে, আর আমাদের মনের মধ্যে যেন সব সময় অভয় আর স্বস্তির ভাব থাকে, যেখানে পর বলে কোন বোধ থাকবে না। এই ভাবটাই আমরা গায়ত্রী মন্ত্রে পাই। মূল চিন্তা-ভাবনা একই থাকে কিন্তু তার প্রকাশটা পাল্টে যায়।

প্রথম চারটি মন্ত্রের দেবতা ইন্দ্র। কিন্তু শেষ দুটি মন্ত্রের মন্ত্রই দেবতা। এই দুটো মন্ত্র খুবই নৈর্ব্যক্তিক মন্ত্র। বেদের অনেক মন্ত্র আছে যেখানে প্রার্থনাগুলো নৈর্ব্যক্তিক প্রার্থনা, এই মন্ত্র যে কোন দেবতা, যে কোন ধর্মের লোক যার যার ইষ্টের উদ্দেশ্যে করতে পারে। এখন এই দুটি মন্ত্রকে নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে –

অভয়ং নঃ করত্যন্তরিক্ষমভয়ং দ্যাবাপৃথিবী উভে ইমে।
অভয়ং পশ্চাদভয়ং পুরস্তাদুত্তারাদধরাদভয়ং নো অস্তু।।অ-১৯/১৫/৫//

অভয়সূক্তমের শেষ দুটি মন্ত্রকে যদি খুব নিষ্ঠা সহকারে স্নান করে পাঠ করা হয় তাহলে তার মন থেকে সমস্ত রকমের ভয় চলে যাবে। বেদের প্রত্যেকটি মন্ত্রই সিদ্ধ মন্ত্র, সিদ্ধ মন্ত্রের ফল অবশ্যম্ভাবি। *অভয়ং নঃ করত্যন্তরিক্ষম্*, অন্তরিক্ষ যেন আমাদের অভয়ে প্রতিষ্ঠিত করে। *অভয়ং দ্যাবাপৃথিবী উভে ইমে*, দ্যুলোক আর পৃথিবী যেন আমাদের অভয় দেয়। ঋষিদের কাছে এই তিনটে লোক খুব গুরুত্ব পেয়েছে, পৃথিবী লোক, দ্যুলোক বা স্বর্গলোক আর মাঝখানে অন্তরীক্ষ লোক, ভূঃ, ভুবঃ আর স্বঃ। যখনই এনারা লোককে নিয়ে প্রার্থনা করতেন তখনই তাঁরা এই তিনটে লোককে এক সঙ্গে নিয়ে আসতেন। গায়ত্রী মন্ত্রেও আমরা দেখি আর এখানেও একই জিনিস পাই। অন্তরীক্ষ যেন আমাদের অভয় প্রদান করে, আর দ্যাবা, দ্যাবা মানে স্বর্গলোক, স্বর্গলোককে অনেক সময় আলোকিত লোকও বলেন, দ্যু ও দিবা একই ধাতু থেকে এসেছে। দ্যাবা আর পৃথিবী দুই দেবতা একসাথেই চলেন, প্রার্থনা করার সময়েও দুজনের নাম এক সঙ্গেই উচ্চারিত হয়। আর বলছেন –

অভয়ং পশ্চাৎ, পশ্চাৎ দিক থেকে যেন আমি অভয় থাকি। তাই না *পুরস্তাদুত্তারাদধরাদভয়ং নো অস্তু*, সামনে থেকে যেন ভয় না হয়, উপর থেকে এবং নীচ থেকে যেন ভয় না হয়। ভয় কোন দিক থেকে আসবে কারুর জানা নেই। অন্তর্ঘাতের কথা আমরা প্রায়ই শুনে থাকি, পেছন থেকে মারা। হিন্দীতে আবার খুব নাম করা শায়ের আছে, আপনো নে মুঝে মারা গহরো মে কাঁহা দম্ থা, আপন লোকেই মারলো, অপরের মধ্যে মারার দম কোথায়! কে মারবে বলা খুব মুশকিল, আপনলোকও মারে, পর যে সেও মারে। তবে পিস্তলের গুলি কাছে যে থাকে তারই লাগে, দূর থেকে মারলে গুলি লাগে না। প্রার্থনা করছেন, আমার পেছন থেকে যেন রক্ষা হয়, সামনে থেকে যেন রক্ষা হয়। সামনে থেকে রক্ষার কথা সরাসরি অর্থেই বলছেন, আর সামাজিক অর্থে নিলে পর হবে, কারণ পর যারা তারা সামনে থেকেই মারে, আপনলোকরা সব সময় পেছন থেকে মারে। শেষ মন্ত্রে বলছেন –

অভয়ং মিত্রাদভয়মমিত্রাদভয়ং জ্ঞাতাদভয়ং পুরো যঃ।
অভয়ং নক্তমভয়ং দিবা নঃ সর্বা আশা মম মিত্রং ভবন্তু।।অ-১৯/১৫/৬।।

অভয়ং মিত্রাৎ, যারা আমার মিত্র তাদের থেকে যেন অভয় থাকে, তার মানে, যারা আমার আপন তারা যেন আমাকে আঘাত না করে। *অভয়ন্ত অমিত্রাৎ*, অমিত্র শব্দটাও অনেক প্রাচীন, ভাষ্যকাররা অমিত্রের অনুবাদ করছেন শত্রু। অমিত্র যে সব সময় আমার শত্রুই হবে তা কখন হয় না, যাদের সাথে আমার পরিচয় নেই তাদেরকেও অমিত্র বলা যায়। বলছেন, যারা আমার খুব কাছের তাদের কাছ থেকেও যেমন আমার অভয় থাকে আর যারা খুব কাছের নয়, তাদের কাছ থেকেও যেন অভয় থাকে। *জ্ঞাতাদভয়ং পুরো যঃ*, যেটার ব্যাপারে আমার জানা আছে সেটার থেকেও যেন আমার অভয় থাকে। অজ্ঞাত জিনিস থেকে ভয়টা বেশি হয়, বিশেষ করে ষাট পয়ষট্টি বয়সের পর ইন্দ্রিয়ের শক্তি হ্রাস পেতে শুরু করলে মানুষের মনে অজ্ঞাত ভয় আসতে থাকে। এখানে অজ্ঞাত ভয়ের কথা না বলে উল্টোটা বলছেন, যে জিনিসের ব্যাপারে আমার জানা আছে সেই জিনিস থেকে আমি যেন ভয় না পাই। ভাষ্যকাররা এসব ক্ষেত্রে আমাদের পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করে দেন, জ্ঞাত জিনিসটাকে যখন বলে দেওয়া হয়েছে তখন অজ্ঞাত জিনিসটাকেও বলা হয়ে যায়।

অভয়ং নক্তমভয়ং দিবা, রাত্রেও যেন আমার ভয় না থাকে, দিবাকালেও আমার যেন ভয় না থাকে। *নঃ সর্বা আশা মম মিত্রং ভবন্তু*, এই জগতে যাবতীয় যা কিছু আছে, যত জায়গা আছে সবটাই যেন আমার বন্ধু হয়। যেমন আমি যদি বিদেশেও যাই সেখানেও যেন আমার বন্ধু থাকে, কেউ যেন আমার প্রতি হিংসা বা দ্বেষ ভাব না রাখে। *সর্বা আশা*, *আশা* এখানে জায়গার অর্থে বলছেন। যেখানেই আমি চলে যাই না কেন, অজানা, অচেনা জায়গায় চলে গেলে সেখানেও যেন আমার মিত্র থাকে। কিন্তু তার আগে বলছেন আমি আমার পরিচিত যে জায়গাতে আছি বা জানা জিনিস যেগুলো আছে, সেগুলো থেকে আমার যেন ভয় না থাকে। অমিত্রের ভাব থেকে মানুষ কুণ্ঠা বোধ করে, মানুষ ছোট হয়ে যায়। মনের মধ্যে ভয়ের ভাব থাকলে কেউ কোন প্রশ্ন করলে তার উত্তরগুলো মাথার মধ্যে ঠিক আসে না, চিন্তা ভাবনাগুলিও ঠিক ভাবে হয় না। দ্বিতীয়তঃ মানুষের মনে আমিত্ব নাশ হয়ে যাওয়ার একটা সাধারণ ভয় সব সময়ই থাকে।

নিজের মধ্যে যদি শক্তির পূর্ণ বিকাশ চাই তাহলে আগে অভয়ে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। যে শিক্ষককে ছাত্ররা ভয় পায়, সেই শিক্ষকের কাছ থেকে ভালো ভাবে শিক্ষা লাভ করতে পারে না, ছাত্ররা স্বাধীন ভাবে শিক্ষকের সাথে মিশতে পারে না বলে সব সময় কুণ্ঠিত হয়ে থাকে। স্বামীজী বলছেন, Freedom is the first condition of growth। কাউকে যদি ভবিষ্যতে বড় করতে চান তার জন্য দরকার স্বাধীনতা। ভয় হল স্বাধীনতার বিপরীত। অভয়সূক্তমের পুরোটাই আমাদের ভয় থেকে মুক্ত করে দেয়। আমরা সবাই বলি বটে আমাদের স্বাধীনতা দিতে হবে, কিন্তু মানুষ স্বাধীন হতে চায় না, স্বাধীন ভাবকে নিতেই পারে না। বেশির ভাগ সংসারে দেখা যায় সুযোগ দিলেই কেউই সংসারের দায়ীত্ব নিতে চায় না, মায়েরাই বেশির ভাগ জায়গায় দায়িত্ব নেয়। সেইজন্য পুরুষরা নিজের স্ত্রীর উপর খুব নির্ভর করে থাকে। স্ত্রী মানেই কয়েক বছর পর স্বামী থেকে শুরু করে বাড়ির সবার প্রতি তার মাতৃত্বের ভাব এসে যায়। আমরা মনে করছি আমি এখন মুক্ত হয়ে গেলাম যেহেতু বাড়ির দায়ীত্বটা একজন নিয়ে নিয়েছে। কিন্তু মুক্তি আর নির্ভরতা দুটো আলাদা। দুদিন বাইরে একা একা থাকতে গেলে অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে। মানুষ মাত্রই অপদার্থ, দুর্বল। আমরা চাই আমাদের যাবতীয় দায়ীত্ব অপর কেউ নিয়ে নিক। হয় সরকারের উপর সব দায়ীত্ব চাপিয়ে দিচ্ছি, সব দায়ীত্ব যেন সরকারের। মূল্যবোধের যে শিক্ষা দেওয়া হবে সেটাও সরকারের কাঁধে চাপিয়ে দিতে চাইছি। আজকালকার বাবা-মায়েদের সময়ই নেই যে সন্তানকে সত্যি কথা বলার, ভালো ব্যবহার, ভদ্র আচরণের শিক্ষা দেবে। চিন্তা-ভাবনা করাটা ছেড়ে দিয়েছে বুদ্ধিজীবিদের উপর। বুদ্ধিজীবিরাও যত রাজ্যের আবর্জনা দিয়ে যাচ্ছে, আমরাও সেগুলোকে গোগ্রাসে গিলে মন খারাপ করে একে ওকে গালাগালি দিয়ে যাচ্ছি। যদি ভালো করে বিচার করে দেখি আমরা কেউই একটা কোন দায়ীত্ব নিই না, এই দায়ীত্বটা আমার, এই কাজটা আমার জীবনের অঙ্গ, এইভাবে আমরা কোন দায়ীত্ব নিয়ে রাখিনি। আর যেটা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ আধ্যাত্মিক দায়ীত্ব, জপ-ধ্যান করাটাও গুরুর উপর ছেড়ে দিয়েছি। যেদিন থেকে ইন্টারনেট এসে গেছে সেদিন থেকে বই পড়ার দায়ীত্বটাও গুগুল সার্চের উপর দিয়ে দেওয়া হয়ে গেছে। আমরা সবাই এখন রোবট হয়ে গেছি। অপদার্থ মানেই তার মধ্যে শক্তির অভাব। ভেতরে যদি কোন কিছু করার শক্তি থাকে, চিন্তা-ভাবনা করা হোক, জপ-ধ্যান করা হোক,

অন্তত নিজস্ব কাজ গুলো করার ক্ষেত্রেই হোক, কিন্তু কিছুই শক্তি নেই। শক্তি নেই তাই সব দায়ীত্ব অপরের উপর চাপিয়ে রেখেছি। তার মানে আমরা ক্রমশ দুর্বল হয়ে যাচ্ছি। দেবতারাও এই রকম দুর্বল লোককেই চায়, শাস্ত্রেও আছে মানুষ যেমন গাধা ঘোড়াকে বোঝা বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যবহার করে, দেবতারাও ঠিক এই ভাবে বোঝা বহন করাবার জন্য মানুষকে দিয়ে যজ্ঞ করায়, প্রার্থনা করায়। মানুষের তো ভয় হবেই। ভয় থেকে আসবে হতাশা, হতাশা, ভয়, এগুলো সব মনেরই নানা রকম আবেগ। শাস্ত্র আদি পড়লে, এই ধরণের মন্ত্র পাঠ করলে ভেতরে শক্তি আসে। ভেতরে শক্তি এলে মনের আবেগ গুলিকে বাগে আনবার ক্ষমতা হয়।

সভাসূক্তম্

সভাসূক্তম্ অথর্ব বেদের আরেকটি খুব বিখ্যাত সূক্ত। সভা ও সমিতি এই দুটো শব্দ অনেক আগেই বেদে এসে গেছে। বেদ এত পুরনো কিন্তু এটাই আশ্চর্যের যে সেখানেও সভা সমিতির ধারণা এসে গিয়েছিল। ইদানিং সভা সমিতির ব্যাপারে সবাই পরিচিত। সভা হল বড় সমাবেশ আর সমিতি ছোট সমাবেশ। অথর্ব বেদের সভাসূক্তমে সভা ও সমিতি দুটোকে মিলিয়েই বলা হয়েছে। একজন ব্রাহ্মণ সভাতে যাচ্ছেন, সেই সভাতে ব্রাহ্মণকে সম্মান পেতে হবে। সভাতে নানান রকমের আলোচনা, বিতর্ক হবে। বিতর্ক হলে কেউ কাউকে ছেড়ে কথা বলবে না। বৃহদারণ্যক উপনিষদে সভার খুব সুন্দর বর্ণনা আছে। রাজা জনক এক সভার আয়োজন করেছেন। সেখানে ভারতের শ্রেষ্ঠ মনীষীরা এসেছেন। তাঁরা পরস্পর আলোচনা করবেন আর আলোচনা করে নিজেকে তখনকার দিনের ব্রহ্মবিদদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রমাণিত করতে হবে। আজকের দিনে ব্রহ্মবিদের অর্থ হল যাঁর ব্রহ্মজ্ঞান আছে। কিন্তু আগেকার দিনে ব্রহ্মবিদ বলতে বোঝাত যিনি শাস্ত্রজ্ঞ। উপনিষদে যে আত্মবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যার কথা বলা হয়েছে সেই ব্রহ্মবিদ্যাকে যিনি জানেন তাঁকে ব্রহ্মবিদ বলা হত। ব্রহ্মবিদদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ তাঁকে বলা হয় ব্রহ্মবিদবরিষ্ঠ। পরের দিকে ব্রহ্মবিদবরিষ্ঠ না বলে মহামহোপধ্যায় বলা হত। মহামহোপধ্যায় মানে, তখনকার দিনের যত পণ্ডিত ছিল কেউ তাঁকে হারাতে পারেননি। রাজা জনক এই রকম এক বিরাট বড় সভার আয়োজন করেছেন। সভায় যাঁরা আসবেন তাঁদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিদ রূপে নির্বাচিত হবেন তাঁকে হাজারটি গরু দেওয়া হবে, আর গরুর ভরণপোষণের জন্য সাথে দুটো করে স্বর্ণমুদ্রা দেওয়া হবে। হাজারটি গরু আর সোনা পাওয়ার জন্য ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শত শত ব্রাহ্মণ রাজা জনকের আহুত সভায় উপস্থিত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে যাজ্ঞবল্ক্যও আছেন। পণ্ডিতদের সভা শুরু হয়েছে। সভায় যিনি নিজেকে শ্রেষ্ঠ বলে দাবী করবেন তাঁকে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় বসিয়ে দেওয়া হবে, আর চারিদিক থেকে সব পণ্ডিতরা ক্রমাগত তাঁকে প্রশ্ন করে যাবেন।

তিব্বতে যে ধর্মগুরু দালাই লামার নির্বাচন করা হয় সেখানেও এই ধরণের একটা মজার ব্যাপার হয়। যাঁকে দালাই লামা করা হবে তাঁকে খুব বাচ্চা বয়সেই নিয়ে আসা হয়। এরপর তাঁকে চৌদ্দ পনের বছর ধরে বৌদ্ধদের সমস্ত রকম শাস্ত্র অধ্যয়ন করানো হয়। সব শাস্ত্র অধ্যয়ন হয়ে যাওয়ার পর একটা সভা ডাকা হয়, সেই সভাতে তিব্বতের সব সাধুরা সমবেত হন, যিনি দালাই লামা হবেন তাঁকে প্রশ্ন করার জন্যও আর দেখার জন্যও। যিনি দালাই লামা হতে যাচ্ছেন তাঁর বয়স মাত্র সতের কি আঠারো, পণ্ডিতরা সবাই তাঁকে শাস্ত্র থেকে প্রশ্ন করতে শুরু করেন। দালাই লামাকে সব প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়ে গেল, কিন্তু তাতেও দালাই লামার নির্বাচন হয়ে যাবে না। এবার দালাই লামা পণ্ডিতদের পাল্টা প্রশ্ন করবেন। প্রশ্নের মধ্যে এমন কিছু প্রশ্ন থাকতে হবে যার উত্তর কোন পণ্ডিত দিতে পারবেন না। দালাই লামা হওয়ার জন্য শাস্ত্র আদ্যোপান্ত খুব ভালো ভাবে জানতে হবে।

যে সভাতে দালাই লামার যখন নির্বাচন হচ্ছিল তখন সেখানে একজন জার্মান উপস্থিত ছিলেন। এর উপর 'Seven Years in Tibet' নামে তাঁর খুব নামকরা বই আছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি পর্বতারোহী হয়ে তিব্বতে এসেছিলেন, যুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়াতে তাঁকে বন্দী করে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু জেল থেকে তিনি পালিয়ে যান। তিব্বত সীমান্তের কাছে যেতে না যেতেই আবার ধরা পড়ে যান। আবার তিনি কোন ভাবে পালিয়ে যান। এবারে তিনি তিব্বতের সীমান্তে পৌঁছে গেলেন কিন্তু তিব্বত থেকে তাকে ঢুকতে দেওয়া

হল না। কিন্তু তাও তিনি এমন দুর্গম পথ দিয়ে কোন রকমে লুকিয়ে পালিয়ে তিব্বতের ভেতরে ঢুকে কোন রকমে লাসায় পৌঁছে গিয়েছিলেন। লাসার লোকেরা বিশ্বাসই করতে পারছিল না এরা দুজন এখানে এলো কী করে। বিরাট মোটা বই আর তাতে সব রোমাঞ্চকর বর্ণনা আছে। তিনিই একমাত্র বিদেশী যিনি দালাই লামার ওই সভাতে সব কিছু প্রত্যক্ষ করতে পেরেছিলেন। দালাই লামার সাথে বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল বলে তিনি সেই সভাতে থাকতে পেরেছিলেন। সেখানে তিনি দেখছেন, সব পণ্ডিতরা এক এক করে দালাই লামাকে শাস্ত্রের বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রশ্ন করে যাচ্ছেন আর তিনি এক এক করে সব উত্তর দিয়ে যাচ্ছেন। জনক রাজার সভাতে যাজ্ঞবল্ক্যকে নিয়ে ঠিক এই ঘটনাই হয়েছিল। সভাতে জনক রাজা বলছেন – আপনাদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ তিনি এসে আমার এই হাজার গরু আর গরু প্রতি দুটি করে স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে যাবেন। সেখানে সব নামকরা বড় বড় ঋষিরা বসে আছেন, কিন্তু কারুরই সাহস হচ্ছে না যে নিজেকে শ্রেষ্ঠ বলে প্রতিপন্ন করবেন। কেউই যখন কোন সাড়া দিচ্ছেন না, তখন যাজ্ঞবল্ক্য তাঁর শিষ্যদের বললেন – চল বাপু! এই গরুগুলো আমিই নিয়ে যাই। সঙ্গে সঙ্গে সব পণ্ডিতরা রে রে করে তেড়েফুড়ে উঠেছেন – তোমার এত দুঃসাহস যে তুমি নিজেকে ব্রহ্মবিদ বরিষ্ঠ বলতে চাইছ! যাজ্ঞবল্ক্য তখন বলছেন – ব্রহ্মবিদদের শ্রীচরণে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম। না, তাহলে তুমি গরুগুলো কি করে নিয়ে যেতে চাইছ? যাজ্ঞবল্ক্য একটু স্মিত হাসি দিয়ে বলছেন – আমার গরুর খুব দরকার তাই নিয়ে যেতে চাইছি। এগুলো হল হিউমার। যাজ্ঞবল্ক্য বলছেন – আমি নিজেকে কখনই ব্রহ্মবিদ বরিষ্ঠ মনে করি না, আমার গরু দরকার তাই গরুগুলো নিয়ে যেতে বলেছি। পণ্ডিতরাও বলছেন – আমাদের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে তুমি এভাবে গরু নিয়ে যেতে পারবে না। যাজ্ঞবল্ক্য তখন বললেন – ঠিক আছে, আপনারা প্রশ্ন করুন। এরপর প্রশ্ন করা শুরু হল আর যাজ্ঞবল্ক্য তার উত্তর দিতে থাকলেন।

সভাতে গিয়ে যে একজনকে লড়াই করতে হচ্ছে, এর জন্য যে তাঁর শাস্ত্র জ্ঞান দরকার এতে কোন সন্দেহই নেই। কিন্তু শাস্ত্র জ্ঞান থাকলেই যে সব সময় সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিতে পারবেন তা কখন সম্ভব নয়। দয়ানন্দ সরস্বতী যখন আর্য সমাজকে নিয়ে অনেক কিছু করছিলেন তখন তাঁকে বলা হল সভাতে কাশীর পণ্ডিতদের যতক্ষণ পরাস্ত না করতে পারছেন ততক্ষণ ভারত তাঁকে মানবে না। দয়ানন্দ সরস্বতীও কাশীর পণ্ডিতদের মাঝখানে গেছেন। পণ্ডিতরা ছাড়াও আরও অনেকে এসেছেন দেখার জন্য দয়ানন্দ সরস্বতী শাস্ত্রের অর্থ কিভাবে করছেন। এই সভা নিয়ে একটা বিতর্ক আছে। বিতর্কটা হল, দয়ানন্দজীকে কাগজে একটা শ্লোক লিখে দিয়ে শ্লোকের অর্থ করতে বলা হয়েছে। দয়ানন্দ সরস্বতী কয়েক সেকেণ্ডের জন্য চিন্তা করছেন জিনিসটা কি, আর তখনই সব পণ্ডিতরা চিৎকার চেঁচামেচি করতে শুরু করে দিয়েছে, দয়ানন্দ যেহেতু এই শ্লোকের উত্তর দিতে অক্ষম তাই দয়ানন্দ যা কিছু বলেছে তার সবটাই মিথ্যা। পুরো পণ্ডিত সমাজ একদিকে আর অন্য দিকে দয়ানন্দ সরস্বতী একা। তখন তিনি রেগেমেগে সভা থেকে বেরিয়ে গেলেন। চারিদিকে খবর ছড়িয়ে গেল দয়ানন্দ সরস্বতী পরাজিত। একটা মতে বলা হয়, দয়ানন্দ সরস্বতীকে কাগজ দেওয়া হয়েছিল ঠিকই আর উনি ভেবেছিলেন সেটাও ঠিক। আসল কথা হল ওই জায়গায় আলো কম ছিল, আলো কম থাকাতে কাগজে কি লেখা আছে একটু দেখার সঙ্গে সঙ্গে সব পণ্ডিতরা হৈ হৈ করে উঠেছে। এটাই ঘটনা।

সভা ও সমিতিতে জয়ী হওয়ার কি কোন পথ আছে? হ্যাঁ পথ আছে, সভাসূক্তম্ যদি পাঠ করা হয়, সভাসূক্তম্ যদি কারুর মন্ত্রসিদ্ধ হয়ে যায় তাহলে সভা সমিতিতে কেউ আর তাঁকে পরাস্ত করতে পারবে না। চারটি মন্ত্র নিয়ে সভাসূক্তম্। প্রথম মন্ত্রে বলছেন –

সভা চ মা সমিতিশ্চাবতাং প্রজাপতের্দুহিতরৌ সংবিদানে।
যেনা সংগছা উপ মা স শিক্ষাচ্চারু বদানি পিতরঃ সংগতেষু।।অ-৭/১২/১।।

দুহিতা, আগেকার দিনে যাঁর দুগ্ধ দোহন করতেন তাঁদের দুহিতা বলা হত। দুহিতা শব্দের অর্থ আবার কন্যা। সভা আর সমিতি এরা দুজন প্রজাপতির কন্যা। সভা ও সমিতিকে প্রজাপতির কন্যা বানিয়ে দেওয়াটা আমাদের কাছে আজগুবি মনে হতে পারে। কিন্তু জিনিসটাকে এভাবে দেখা উচিৎ, যেখানে সভা বা সমিতি হচ্ছে, বেদের ঋষিদের কাছে সেই সভা বা সমিতিরও একটা স্বতন্ত্র ব্যক্তি সত্তা আছে। ওই ব্যক্তিত্বকে যদি

প্রসন্ন না করা হয় তাহলে সভা ও সমিতিতে আমি আপনি কেউই জয়ী হতে পারব না। দয়ানন্দ সরস্বতীর ক্ষেত্রে যেমন হয়েছে। আপনি বলবেন ‘দয়ানন্দ সরস্বতীকে তো কায়দা করে হারানো হয়েছে, এখানে আধ্যাত্মিক ব্যাপার কোথা থেকে আসছে? যাজ্ঞবল্ক্যের ক্ষমতা ছিল তাই তিনি জয়ী হয়েছেন। আমাদের পরম্পরার ঐতিহ্য অনুযায়ী আমরা আপনার এগুলোকে মানতে পারি না’। যে কোন ব্যাপারে আমাদের যে সাফল্য আসে সেটা শুধু যে আমার আপনার বুদ্ধির জোরে আসছে তা নয়। এর পেছনে একটা আধ্যাত্মিক ব্যাপারও থাকে। আধ্যাত্মিক ব্যাপার বলতে বোঝায়, সব কিছুর সাফল্যের পেছনে একটা দৈবী শক্তির ব্যাপার থাকে। দৈবী শক্তিকে প্রসন্ন না করা হলে যে ফল পাওয়ার কথা সেই ফল পাবে না। দৈবী শক্তিকে প্রসন্ন করার উপর ঠাকুরও খুব জোর দিয়েছেন, পালোয়ান হনুমান সিং কুস্তির সাত দিন আগে থেকে খুব সাত্ত্বিক ভাবে জীবন-যাপন করে দৈবী শক্তিকে প্রসন্ন করে গেছে। আমাদের মধ্যে যে দৈবী শক্তি আছে, এই শক্তিকে যদি ঠিক সময় আর ঠিক ভাবে কাজে লাগাতে হয় তার জন্য আধ্যাত্মিক প্রার্থনা অবশ্যই করতে হবে। আমরা জানি বিদ্যার্জনের জন্য আমাদের সরস্বতীর আরাধনা করতে হয় যাতে বিদ্যার্জন সুগম হয়। অজানা, অচেনা বিভিন্ন বিঘ্নকে নাশ করার জন্য বিনায়কের আরাধনা করতে হয়।

বেদের সময় সভা সমিতির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। বেদের কালে ব্রাহ্মণদের কাছে খুব একটা টাকা-পয়সা থাকত না। ব্রাহ্মণদের টাকা-পয়সার একটাই উৎস ছিল, রাজার আনুকুল্যতা। রাজাকে খুশী করার জন্য বাহ্মণদের কাছে একটাই পথ ছিল, রাজার সভাতে গিয়ে দেখাতে হবে আমি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ। সাধু-সন্ন্যাসীরাও যদি সাধারণ হয়ে থাকেন তাঁরাও ভক্তদের কাছ থেকে এক টাকা দু টাকার বেশি প্রণামী পান না। আর ঋষিরা যদিও কখনই বিষয়ী ছিলেন না কিন্তু তাঁদেরও টাকা-পয়সার দরকার হত। কিন্তু কবে কোন রাজা, কোন শেঠজী, কোন বড়লোকের বাড়িতে একটা উপনয়ন, অন্নপ্রাশন, বিবাহ হবে, সেখানে গিয়ে ঋষিরা স্বস্তিবচন করবেন তারপর একটা কি দুটো টাকা পাওয়া যাবে, এভাবে তো জীবন চলবে না। তাই তাঁকে সভাতে যেতে হবে, সেখানে নিজের শ্রেষ্ঠত্বকে প্রমাণিত করতে হবে। কিন্তু সভাতে গিয়েই যে পাণ্ডিত্যের জোরে জিতে যাবে তাও তো হবে না। সভা সমিতির পেছনে একটা যে দিব্য শক্তি রয়েছে, সেই দিব্য শক্তিকে তাঁরা তখন প্রসন্ন করার জন্য সভাসূক্তম্ পাঠ করতেন। এখানে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে এটি সম্পূর্ণ একটি জাগতিক প্রার্থনা। আমরা যেন কখনই ভুলে না যাই যে, যজ্ঞ মানেই কিছু প্রাপ্তির আশা। প্রাপ্তির আশা না থাকলে যজ্ঞও হবে না। এই কারণেই বৈদিক যজ্ঞের প্রভাব ধীরে ধীরে কমে গেল। কারণ ভারতের চিন্তা জগৎ যেমন যেমন বিবর্তিত হয়ে এগিয়ে গেছে তেমন তেমন যজ্ঞ দিয়ে প্রাপ্তি ব্যাপারটার গুরুত্ব কমতে থেকেছে। ত্যাগের মহিমা বৃদ্ধির সাথে সাথে যাঁরা পূর্ণ ত্যাগী পুরুষ তাঁদের মান অনেক বেড়ে গেছে। যিনি ত্যাগে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছেন, তিনি এখন বলছেন আমার অন্ন-বস্ত্র লাগবে না, আমার স্ত্রী লাগবে না, আমার টাকা-পয়সা লাগবে না। এবার তিনি কী করবেন? ওনারা তখন মন্ত্রের সোজাসাপ্টা অর্থ গুলিকে পাল্টাতে শুরু করে দিলেন। যদি সোজা পথে অর্থ করি, যেমন গায়ত্রী মন্ত্রের *ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং*, এর পরিষ্কার অর্থ হয় আমি যেন অন্ন পাই। এর দ্বিতীয় অর্থ, আমার মন যেন পবিত্র থাকে, পাপ যেন আমাকে স্পর্শ করতে না পারে। কিন্তু তৃতীয় অর্থ হল আমার যেন আধ্যাত্মিক কল্যাণ হয়। গায়ত্রী মন্ত্রের এই তৃতীয় অর্থ সায়নাচার্যের দেওয়া, যিনি চৌদ্দশ শতাব্দীতে এসেছেন। বৈদিক যুগে গায়ত্রী মন্ত্রে যে আহুতি দেওয়া হত সেখানে তার প্রথম অর্থটাই ছিল, আমার যেন টাকা-পয়সা ইত্যাদি হয়। যজ্ঞ মানেই কিছু জাগতিক প্রত্যাশা। সভাসূক্তও পুরোপুরি লাভের প্রত্যাশায় করা হচ্ছে, আমি যখন সভা সমিতিতে যাব তখন আমি যেন সম্মান পাই। পরের দিকে যে সভা হত তাতে কয়েকজন বাছাই করা পণ্ডিতদের ডাকা হত। কিন্তু সভাতে গিয়ে নিজেকে প্রমাণিত না করতে পারলে কোন সম্মানই পাওয়া যাবে না।

মন্ত্রে তাই বলছেন, হে সভা ও সমিতি! আমি তোমাদের জানি, তোমরা হলে প্রজাপতির দুই কন্যা। আমি যে সভা ও সমিতিতে যাচ্ছি সেখানে যে আলোচনাদি হবে তাতে প্রজাপতি যেন আমাকে রক্ষা করেন। আর বলছেন, *যেনা সংগছা উপ মা স শিক্ষাচ্চারু বদানি পিতরঃ সংগতেষু*, সেখানে যাদের সাথে আমার দেখা হবে তারা যেন ঠিক ঠিক ভাবে আমাকে গাইড করেন, অর্থাৎ তর্ক করতে গিয়ে আমি যেন ভুল পথে না চলে

যাই। এর আগে পিতৃলোক আর দেবলোক নিয়ে আলোচনা করার সময় বলা হয়েছিল; দেবলোকের বাসিন্দাদের যেমন সম্মান তেমনি পিতৃলোকের বাসিন্দাদেরও সাংঘাতিক সম্মান। দেবতাদের যেমন পূজা করা হয়, ঠিক তেমনি শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া মানে পিতৃদের পূজা। ঠাকুরের আগমনের পর এবং বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবের ফলে শ্রাদ্ধের গুরুত্ব অনেক কমে গেছে। কারণ দেবতাদের তুলনায় পিতৃরা অনেক নীচের। দেবতারা আবার ভগবানের তুলনায় অনেক নীচে। পরম্পরাতে এটি একটি প্রচলিত মত যে, যে যার অন্ন খায় সে তার সত্তা পায়। কিন্তু বেদের সময় এই কথা বলা যেত না। বেদের সময় পিতৃদের প্রচুর সম্মান দেওয়া হত। মন্ত্রে তাই পিতৃদের কাছে প্রার্থনা করে বলছেন *পিতরঃ*, হে পিতৃগণ! তর্ক বিচারের সময় আমার মুখ থেকে যেন *চারু বদানি*, সুন্দর সুন্দর কথাই বেরিয়ে আসে, আমার কথাতে সবাই যেন প্রভাবিত হয়। পরের মন্ত্রে বলছেন –

বিদ্ম তে সভে নাম তরিষ্টা নাম বা অসি।
যে তে কে চ সভাসদস্তে মে সন্তু সবাচসঃ।।অ-৭/১২/২।।

বিদ্ম তে সভে, হে সভা আমি তোমাকে জানি। *নাম তরিষ্টা নাম বা অসি*, মানুষ সভাতে সম্মান পেতে চায়। ব্রাহ্মণরাও জানতেন সভা কোন মামুলি জিনিস নয়, সভাতে যদি জয়ী হওয়া যায় তবেই আমার সম্মান ও প্রতিপত্তি আসবে। সব জায়গাতেই এই জিনিসই হয়। জুলিয়াস সীজারেও আছে মার্ক এ্যন্টনি যখন ভাষণ দিতে শুরু করেছেন তখন সভার পরিবেশটাই পাল্টে গেল। সভাতে যদি আপনি নিজেকে প্রভাবিত না করতে পারেন তাহলে আপনার কোন সম্মান হবে না, তাই বলছেন *যে তে কে চ সভাসদস্তে মে সন্তু সবাচসঃ*, সভাতে যারা আসবে তারা সবাই যেন আমার বক্তব্যের সাথে একমত হয়।

এষামহং সমাসীনানাং বর্চো বিজ্ঞানমা দদে।
অস্যাঃ সর্বস্যাঃ সংসদো মামিন্দ্র ভগিনং কৃণু।।।অ-৭/১২/৩।।

সভাতে যাঁরা উপস্থিত আছেন আমি যেন তাঁদের বুদ্ধি ও জ্ঞান পাই। সভাতে যাঁরা বসে আছেন তাঁরা যেন আমাকে যশস্বী করে দিতে পারেন। শেষে বলছেন –

যদবো মনঃ পরাগতং যদবদ্ধমিহ বেহ বা।
তদ্‌ব আ বর্তয়ামসি ময়ি বো রমতাং মনঃ।।অ-৭/১২/৪।।

সভাতে যাঁরা বসে আছেন, কোন কারণে তাঁদের মন যদি অন্য দিকে চলে যায় অথবা কোন একটা মতে যদি আবদ্ধ হয়ে থাকে যেটা আমার বক্তব্য নয়, তা সত্ত্বেও তাদের মন যেন ঘুরে আমার বক্তব্যের দিকে চলে আসে। মূল বক্তব্য হল, সভাতে আমি যেমনটি বক্তব্য রাখতে চাইছি ঠিক সেই বক্তব্যই আমি যেন বলতে পারি, আমার বক্তব্যের জন্য আমি যেন যশ পাই আর অন্যদের বুদ্ধি ও তেজকে আমি যেন হরণ করে নিতে পারি। এই জিনিসটা আমরা অনেক জায়গাতেই দেখতে পাই। কোথাও একটা সভা হচ্ছে, সভাতে অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিরা বসে আছেন, তাঁদের সবারই ব্যক্তিত্বের একটা তেজ আছে। কিন্তু সভাতে যদি প্রধানমন্ত্রী এসে যান তখন প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিই সবার তেজকে হরণ করে নেবে। প্রধানমন্ত্রী এমনি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন তখন তাঁর তেজ বোঝা যাবে না। কিন্তু কোন সভাতে অনেক মন্ত্রী আমলারা আছেন আর সেখানে যেই প্রধানমন্ত্রী এসে পড়লেন তখনই তিনি সবারই তেজকে টেনে নেন।

ঋগ্বেদের এক চতুর্থাংশ মন্ত্র ইন্দ্রের নামে। আজ থেকে সাত-আট হাজার বছর আগে যখন ইন্দ্রাদি দেবতাদের উপাসনা হয়েছিল, ওনারা দেবতাদের ঠিক কি হিসাবে দেখতেন আমরা কেউই পরিষ্কার ভাবে জানি না। তবে একটা ব্যাপার খুব ভালো বোঝা যায়, ইন্দ্রকে ঋষিরা একজন দেবতা রূপে দেখছেন আবার সাথে সাথে ইন্দ্রকে যেন ভগবান রূপেও দেখছেন। ইন্দ্রের ব্যক্তিত্বকে বোঝার জন্য আমরা ইন্দ্রের উপর কয়েকটি মন্ত্রকে নিয়ে আলোচনা করছি। ঋগ্বেদেরই একটি মন্ত্রে ইন্দ্রকে যেমন বলছেন –

ইন্দ্রস্য নু বীর্যাণি প্র বোচং যানি চকার প্রথমানি বজ্রী।
অহন্নহিমিন্বপস্ততর্দ প্র বক্ষণা অভিনৎপর্বতানানাম্।।ঋ-১/৩২/১

অহি মানে জল আর *অহন্* মানে হনন করার অর্থে বলা হয়। ঋষি বলছেন, ইন্দ্রের যে শক্তি আমি সেই শক্তির বর্ণনা করব। জগৎকে প্রথম কে নিজের শক্তি দেখিয়েছিলেন? *প্রথমানি বজ্রী*, যাঁরা অস্ত্র চালান তাঁদের মধ্যে তিনি প্রথম। বজ্রী শব্দের অর্থ হয় যিনি বজ্র চালান, কিন্তু এখানে যিনি অস্ত্র চালান সেই অর্থেও হবে। বেদে ইন্দ্রের বর্ণনার মধ্যে দেখা যায় অস্ত্র চালনার ক্ষমতা তাঁর মত আর কারুর মধ্যে ছিল না। অস্ত্র চালনার সময় কেউই তাঁর সামনে দাঁড়াতে পারবে না। বৃত্রাসুরের একটা রূপ এখানে দিচ্ছেন। বৃত্রাসুরকে একটা সাপের রূপে দেখান হচ্ছে, সেই সাপ যেন জলকে আটকে রেখেছে। ইন্দ্র তাঁর বজ্রের শক্তি দিয়ে সেই সাপের মুণ্ডুটা কেটে দিয়েছেন। পরের দিকে বৃত্রাসুরের যত কাহিনী পুরাণে এসেছে তার কোনটার সাথেই কোনটার পুরোপুরি মিল নেই। ঋগ্বেদের মন্ত্রে এমন কিছু কিছু শব্দ আছে যেগুলো গুহ্য শব্দ বলা যেতে পারে, বাইরে থেকে এক রকম দেখায় কিন্তু ভেতরে আরেকটি কথা আছে। বেদের এই ধরণের গুহ্য কথার জন্য বোঝা খুব কঠিন হয়ে যায় কি বলতে চাইছেন। পরের দিকে ঋষিরা এগুলোর অন্য ভাবে ব্যাখ্যা দেন যেটা আমরা বুঝতে পারি না, অনেক সময় মনে হয় ব্যাখ্যাটা ঠিক নয়। কিন্তু বেদের কথা ব্যাখ্যা করার জন্য আবার ঋষির দরকার, ঋষি ছাড়া বেদের কথা কে আর ব্যাখ্যা করবেন। তাঁরা বেদের এই ধরণের অনেক ভাবেই ব্যাখ্যা করেন। যেমন একটা ব্যাখ্যা আছে, আমাদের জীবনে যে আধ্যাত্মিক শক্তিগুলি রয়েছে, সেই শক্তির বিকাশে যে যা কিছু বাধা স্বরূপ হয়ে আছে সেই বাধাকে মুক্ত করা মানুষের ক্ষমতা নেই। একমাত্র ইন্দ্রই এই বাধাগুলিকে মুক্ত করতে পারেন। তখন প্রশ্ন হতে পারে তাহলে ইন্দ্রকে কেন আমাদের ধ্যান-ধারণার বাইরে চলে যেতে হল? তার কারণ, একটা সময় কোন দেবতার উপর যে অনন্তের মুখোশ লাগান হয়েছিল, পরে দেখা যাচ্ছে সেই মুখোশ দিয়ে অনন্তের ছবিটা পরিষ্কার ধারণার মধ্যে আসছে না, তখন সেই দেবতাকে সরিয়ে দেওয়া হল। এখন ইন্দ্রের ব্যক্তিত্বকে আমরা যেভাবে জানছি, তাতে দেখা যাচ্ছে ইন্দ্রের যে আরও কিছু ক্রিয়াকলাপ আছে সেই ক্রিয়াকলাপের সাথে পরমাত্মার বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মেলানো যাচ্ছে না। তখন তাঁরা ইন্দ্রিকে সরিয়ে আরেকজনকে নিয়ে এলেন। পুরাণে বিষ্ণু একজন অপরিচিত দেবতা, অপরিচিত দেবতা বলে তাঁর দোষত্রুটি গুলিও অজানা, আর পরমাত্মার গুণগুলো আগে থেকেই জানা আছে, পরমাত্মার সব গুণ বিষ্ণুর উপর লাগিয়ে দিলেন। আধ্যাত্মিক বিবর্তনের এই ধারাগুলি জানা না থাকলে বেদের অনেক কিছুই আমাদের কাছে অস্পষ্ট লাগবে। এনারা ব্যাখ্যা করছেন, যিনি বৃত্রহন্তা, তিনি বৃত্রকে বধ করে জলকে মুক্ত করে দিলেন। বেদ মন্ত্রের অর্থ যদি এতই সহজ হত তাহলে ঋষিরা এত দিন ধরে এগুলোকে মুখস্ত করে যেতেন না। যদিও আমরা মানছি এসব মন্ত্র যজ্ঞের কাজে ব্যবহৃত হয় আর বলছি বটে যজ্ঞে আমাদের ইচ্ছা ও কামনা করতে হয়। কিন্তু তাও অনেক সময় মনে হয় এতটুকুর জন্য এনারা এত কষ্ট করবেন কেন, এই ব্যাপারে একটু সন্দেহ হয়। নিশ্চয়ই এই সব মন্ত্রের অন্য কোন গুহ্য অর্থ আছে আর যার জন্য পরের দিকে অনেক সাধক এই ধরণের মন্ত্রের উপর প্রচণ্ড গুরুত্ব দিয়ে সাধনা করে গেছেন। তখন মনে হয় ওনাদের ব্যাখাটাই ঠিক ঠিক। বেদের মন্ত্রকে যদিও আমরা বলছি যজ্ঞের সময় যেমন ব্যবহার করা হত আবার প্রার্থনা রূপেও করা যায়। সব মন্ত্রকে তো আর প্রার্থনা রূপে ব্যবহার করতে পারবেন না। আরেকটি মন্ত্রে আবার বলছেন –

যশ্যাশ্বসঃ প্রদিশি যস্য গাবো যস্য গ্রামা যস্য বিশ্বে রথাসঃ।
যঃ সূর্য য উষসং জজান যো অপাং নেতা স জনাস ইন্দ্রঃ।।ঋ-২/১২/৭

এর আগের মন্ত্রে যেমন ইন্দ্রকে পৌরাণিক চরিত্র রূপে নিয়ে আসা হয়েছে, যেখানে ইন্দ্র বিশ্ব শক্তির সম্পদকে যে আটকে রেখেছে তাকে শেষ করছেন, যাতে জল মুক্ত হয়ে পৃথিবীর বুকে বর্ষিত হয়। এই মন্ত্রকে যারা কবিতা রূপে দেখবে তারা বলবে, আকাশে যে বিদ্যুতের গর্জন হয় সেটা যেন ইন্দ্রের বজ্র। মেঘ জল ছাড়ছে না, মেঘের জলকে যেন একটা সাপ আটকে রেখেছে, ইন্দ্র বজ্র দিয়ে সেই সাপের মুণ্ডুটা কেটে দেওয়ার পর মেঘ থেকে জল বর্ষণ শুরু হয়ে গেল। কিন্তু ব্রাহ্মণরা চার-পাঁচ হাজার ধরে সারা জীবন না খেয়ে না পড়ে, নিজে অভুক্ত থেকে, নিজের পরিবারকে অভুক্ত রেখে মামুলি কতকগুলি কবিতা মুখস্ত করে গেছেন! এটাকে মন মানতে চায় না। মনে হয় এর ভেতর আরও কিছু রহস্য আছে যার জন্য পুরো একটা জাতি বেদের প্রতি নিজের জীবনকে পুরোপুরি উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন।

এখানেও জলের কথা বলছেন। *অপাং নেতা*, জলের আরেকটা নাম অপ, অপাং নেতা মানে জলকে যিনি নিয়ন্ত্রণ করেন। নেতার আরেকটা শব্দ যিনি সবাইকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যান। নেতা শব্দ আমাদের বেদেই এসে গেছে। যিনি জলকে নেতৃত্ব দেন বা পথ দেখান। সেইজন্য ইন্দ্রকে আকাশে যে জল সেই জলের দেবতা বলে মানা হত। *যশ্যাশ্বসঃ প্রদিশি যস্য গাবো যস্য গ্রামা যস্য বিশ্বে রথাসঃ*, যাঁর আদেশ সবাই মেনে চলেন। কারা কারা তাঁর আদেশ মেনে চলেন? ঘোড়া হোক, গরু হোক, গ্রাম হোক, রথ হোক যেই হোক না কেন, ইন্দ্রের আদেশ সবাই মানে। রথ যে চলছে, সেও ইন্দ্রের আজ্ঞাতেই চলে। তারপর গ্রাম, শুধু গ্রাম নয়, গ্রামে যে হাতি আছে, ঘোড়া আছে এই রকম যা কিছু আছে সব ইন্দ্রের আজ্ঞাতে চলে। শুধু আমরা মানুষই যে তাঁর আদেশ অনুযায়ী চলছি তা নয়, সবাইকেই তাঁর ইচ্ছাতেই চলতে হয়।

যঃ সূর্য য উষসং জজান, জজান শব্দের অর্থ জন্ম দেওয়া। ইন্দ্র কাকে কাকে জন্ম দিচ্ছেন? সূর্যকে তিনিই জন্ম দিয়েছেন, ঊষাকেও তিনিই জন্ম দেন। ঊষা আমাদের ঐতিহ্যে খুব গুরত্ব পেয়েছে। ঊষা কাল হল, চারিদিক ফর্সা হয়ে গেছে কিন্তু এখনও সূর্য আসেননি। বেদের উপর বাল গঙ্গাধর তিলক অনেক কাজ করেছেন। বেদের মন্ত্রগুলিকে নিয়ে উনি কয়েকটি তত্ত্ব দাঁড় করিয়েছেন। তার মধ্যে তিনি ঊষাদেবীর প্রার্থনাকে নিয়ে খুব গুরত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন। এখনও যে ঊষা কীর্তন হয়, এই ব্যাপারটা বেদ থেকেই এসেছে। হিন্দু ধর্মের ঊষার প্রচুর বন্দনা করা হয়। বেদে ঊষাকালের অনেক যজ্ঞ আছে, যে যজ্ঞগুলি সম্পন্ন করতে অনেক সময় লাগে। ঊষাকালে একটা যজ্ঞ করতে নাকি ছয় থেকে আট ঘন্টা সময় লাগে। তিলক দেখাচ্ছেন যে ভারতবর্ষে সব থেকে বেশি সময় ধরে ঊষাকাল হয় সেটা গ্রীষ্মকালেই হয়ে থাকে, তাও খুব জোর আধ ঘন্টা মত স্থায়ী হয়। তিলক বলছেন এত কম সময়ে এত লম্বা সময় ধরে যজ্ঞ হতে পারে না। এই যজ্ঞ সম্পাদন একমাত্র সম্ভব হবে যাঁরা যজ্ঞ করছেন তাঁরা যদি নর্থ পোলের কাছাকাছি কোন জায়গায় থাকেন। উত্তরমেরুতে ঊষা কাল আরও লম্বা হয়। এসব দেখে তিলক একটা তত্ত্ব দাঁড় করালেন, তিনি বলছেন, অবশ্যই এই ঋষিরা এমন এক জায়গায় ছিলেন যেখানে ঊষাকাল ছয় থেকে আট ঘন্টা স্থায়ী হবে। কারণ এই যজ্ঞ ঊষাকালের মধ্যে আরম্ভ করে সূর্যোদয়ের আগেই শেষ করতে হবে। রাত্রেও কোন যজ্ঞ শুরু করা যাবে না, ঊষাকালের মধ্যে শুরু হয়ে ঊষাকালের মধ্যেই শেষ করতে হবে, অথচ ছয় ঘন্টা লাগবে। তাহলে বলতে হবে এই যজ্ঞ কখনই হত না। কিন্তু তাহলে বেদ ঊষা যজ্ঞের কথা কেন বলতে যাবে। তাহলে এটাই স্বাভাবিক যে, যেখানে ঊষাকাল লম্বা হয় সেখানেই এই যজ্ঞ করা হত। সেটা সম্ভব হবে আমাদের পূর্বপুরুষরা যদি নর্থ পোলের দিকে থাকতেন। এই ধরণের নানা রকমের মতবাদ আছে, কেউ বলেন বেদের ঋষিরা আগে উত্তরমেরুর কাছাকাছি ছিলেন। প্রচণ্ড তুষারপাত, বন্যার জন্য ক্রমশ তাঁরা নীচের দিকে সরে এসেছেন। আবার অন্য দিকেও এর একটা বর্ণনা আছে, যদি আর্যরা বহিরাগত হয়ে থাকে তখন আফগানিস্থানের মত শুষ্ক প্রাণহীন জায়গা অতিক্রম করে ভারত ভূমিতে পা রাখলেন তখন এই যে বর্ণনা, এই রকম একটা প্রাণদায়ী সতেজ ভারত ভূমিতে এলেন এর কোথাও কোন বর্ণনা নেই। একদিকে আফগানিস্থানের মত শুষ্ক জীবন বিরোধী শক্তি আর তারপরেই ভারতে জীবনদায়িনী শক্তির কোথাও কোন উচ্ছাস নেই। স্বামীজীও এই জিনিসটাকে ধরেছিলেন। স্বামীজী তো গবেষক পণ্ডিত ছিলেন না আর এগুলো তাঁর কাজও নয়। কিন্তু ঊষা আর সূর্য বেদে প্রচণ্ড গুরুত্ব পেয়েছিল। এখানে বলছেন, সূর্যের জন্ম দিয়েছেন ইন্দ্র আর ঊষারও সৃষ্টি করেছেন সেই ইন্দ্র। তিনি আবার জলেরও পথপ্রদর্শক, বর্ষাকালে যে বৃষ্টি হয় সেই বৃষ্টিরও মালিক ইন্দ্র।

আগের মন্ত্রে বললেন বৃত্র জলকে আটকে রেখেছে, ইন্দ্র বৃত্রকে বধ করে দিলেন তারপর জল আসা শুরু হল। সেখান থেকে সরে এসে পরের মন্ত্রে বলছেন, গরু, ঘোড়া, রথ যা কিছু আছে সবাই ইন্দ্রের আদেশ মেনে চলে। তিনি সূর্যকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি ঊষাকে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই আবার জলের নেতা, জল কিভাবে প্রবাহিত হবে তিনিই ঠিক করে দেন। এখানে এসে ইন্দ্রের ক্ষমতা পুরো পাল্টে গেছে। একজন পৌরাণিক নায়কের চরিত্রকে যেভাবে আমরা জানি, সেখান থেকে সরে এসে যখন বলছেন তিনি সূর্যের স্রষ্টা, তিনি ঊষার স্রষ্টা তখন তিনি আর দেবতা থাকছেন না, তাঁকে ভগবানের পর্যায়ে নিয়ে চলে গেলেন। এই ব্যাপারটাকে স্বামীজী যেভাবে বিশ্লেষণ করেছেন এই রকম বিশ্লেষণ অন্যান্য জায়গায় পাওয়া যায় না।

এগুলোকে বিশ্লেষণ করতে গেলে একটা স্বতন্ত্র প্রজ্ঞা দরকার, যেখানে আপনার বেদের প্রতি শ্রদ্ধা থাকবে অথচ বেদের বন্ধন থেকেও আপনি মুক্ত। স্বামীজী বলছেন, ঋষিরা যখন সেই অনন্তকে প্রত্যক্ষ করছেন, প্রত্যক্ষ করার তিনি যখন অন্যের কাছে প্রকাশ করতে চাইছেন তখন যেন তিনি একটা একটা করে রূপকে অবলম্বন করে নিচ্ছেন। কিছুক্ষণ একটা রূপকে ধরে রাখছেন, তারপর দেখছেন কতকগুলি জিনিসে খাপ খাচ্ছে না, তখন সেই রূপটাকে ফেলে দিয়ে আরেকটা রূপকে ধরে নিচ্ছেন। দোকানে আমরা যেমন জামা-কাপড় কিনতে গিয়ে একটা একটা করে গায়ে দিয়ে দেখি আমার শরীরের মাপে হচ্ছে কিনা, যখন দেখলাম ফিট করছে না তখন আরেকটা জামা বেছে নিচ্ছি। এখানে ঋষিরা একই জিনিস করছেন, অনন্তকে প্রকাশ করার জন্য একটা একটা রূপকে বেছে নিয়ে ছেড়ে দিচ্ছেন। কিন্তু তাতে বেদের মন্ত্রের যে শক্তি সেই শক্তির কখনই হেরফের হবে না। আবার একটা মন্ত্রে বলছেন –

ন যং জরন্তি শরদো ন মাসা ন দ্যাব ইন্দ্রমবকর্শয়ন্তি।
বৃদ্ধস্য চিদ্বর্ধতামস্য তনু স্তোমেভিরুক্থৈশ্চ শস্যমানা।।ঋ-৬/২৪/৭

বছর ইন্দ্রের কোন ক্ষতি করতে পারে না, মাসও তাঁকে ক্ষতি করতে পারে না আর দিনও তাঁর ক্ষতি করতে পারে না। জগতের সমস্ত বস্তু যে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, সময়ের জন্যই সব কিছু ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। কাল শব্দ দুটো অর্থেই হয়, সময়ের অর্থেও হয় আবার ক্ষয়ের অর্থেও হয়। আমরা প্রায়ই বলি, কাল তোমাকে গ্রাস করতে এগিয়ে আসছে। ইন্দ্র যিনি দেবতাদের রাজা, তাঁকেও কি কাল গ্রাস করতে পারবে? কাল যদি গ্রাস করে তাহলে কালের একটা রূপ থাকতে হবে। কালের কি রূপ হবে? খুব সাধারণতম রূপ হল দিন, আরেকটু বড় হলে মাস হবে, তারও বড় হলে অয়ন হবে, অয়ন মানে ছয়টি মাস। ইদানিং আর অয়ন রূপে হিসাব করা হয় না। সংবৎসর অর্থাৎ বছরও ইন্দ্রের ক্ষয় করতে পারে না। ইন্দ্রকে দিন, মাস ও বছর ক্ষয় করতে পারে না। দিন, মাস ও বছর যাকে ক্ষয় করতে পারে না, সেটাই তো চিরন্তন। বক্তব্য হল, কাল ইন্দ্রের ক্ষয় করতে পারে না, তাহলে হয় তিনি পরমাত্মা বা ভগবান, কাল পরমাত্মার ক্ষয় করতে পারে না, আর তা নাহলে তিনি এমনই অসাধারণ ব্যক্তিত্ববান পুরুষ যাঁকে সময় স্পর্শ করতে পারে না।

বৃদ্ধস্য চিদ্বর্ধতামস্য, ইন্দ্রের একটি নাম বৃদ্ধ, বৃদ্ধ মানে যিনি উচ্চতম শ্রদ্ধাবান পুরুষ, বৃদ্ধজন মানেও তাই। আমরা বৃদ্ধ বলতে বুঝি যার অনেক বয়স হয়ে গেছে, কিন্তু বেদে বৃদ্ধের অর্থ যাঁরা আমাদের থেকে শ্রেষ্ঠ। আমরা অনেক সময় বলি জ্ঞানবৃদ্ধ, জ্ঞানবৃদ্ধেরও একই অর্থ জ্ঞানে যিনি শ্রেষ্ঠ। ইন্দ্রের এই যে বৃদ্ধ ভাব এই ভাব যেন দিনে দিনে বৃদ্ধি পেতেই থাকে, কোন দিনও যেন না কমে। কিভাবে বৃদ্ধ ভাব বৃদ্ধি পেতেই থাকবে? কারণ আমরা যে ইন্দ্রের এত স্তুতি করছি, যজ্ঞে ইন্দ্রের নামে যে আহুতি দিচ্ছি, আমরা যে ইন্দ্রের এত প্রার্থনা করছি এই শক্তিতে যেন তাঁর বৃদ্ধত্ব বাড়তেই থাকবে। অথবা যাঁর আমরা স্তুতি আদি করছি তাঁর যেন কখন কোন ভাবে বৃদ্ধ ভাব না কমে। এই মন্ত্রটি এই কারণেই খুব মজার, এখানে দুটো ভাব একসাথে চলছে। প্রথমে ইন্দ্রকে চিরন্তন করে দিলেন, কাল তাঁকে ক্ষয় করতে পারবে না। অন্য দিকে তাঁকে আবার অচিরন্তন করে দেওয়া হচ্ছে, তাঁর এই বৃদ্ধ ভাব যেন না কমে। কোথাও যেন তাঁর মনে হচ্ছে হয়তো কমে যেতেও পারে। এটা বেশি মনে হয় যখন আমরা হিমালয়ের দিকে তাকাই, হিমালয়কে একদিকে আমাদের চিরন্তন মনে হয়, আবার অন্য দিকে মনে হয় হিমালয় যেমন আছে এই রকমই যেন থাকে। আমরা যাকে ভালোবাসি তাকে বলি, তোমাকে কি সুন্দর লাগছে, চিরদিন তোমাকে যেন এই রকমই দেখতে পাই। চিরদিন এই রকমই যেন থাকে মানেই হল, কোথাও যেন আমার সন্দেহ হচ্ছে। কিন্তু তার আগে বলে দিচ্ছেন তিনি চিরন্তন। এই ভাব নিয়েই ইন্দ্রকে দেখা হত। ইন্দ্রের নামে আরেকটি বিখ্যাত মন্ত্রে বলছেন –

রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায়।
ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপো ঈয়তে যুক্তা হ্যস্য হরয়ঃ শতা দশ।।ঋ-৬/৪৭/১৮

The Form Behind All Forms ইন্দ্রের নামে বেদে যত মন্ত্র আছে প্রায় সব মন্ত্রেই ইন্দ্রের শক্তির ব্যাপারটাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। ইন্দ্র এই করতে পারেন, সেই করতে পারেন, তাঁর আদেশের

বাইরে কে যেতে পারে না ইত্যাদি ব্যাপার গুলোকেই মন্ত্রে বেশি তুলে ধরা হয়েছে। এটা খুবই মজার যে, খ্রীশ্চানরা ভেতর থেকে স্বভাবে খুব মারকুটে কিন্তু তাদের আদর্শ হল ভগবান যীশু, যিনি শান্তির দূত। স্বামীজী বলছেন, পাশ্চাত্যের লোকেরা যখন তাদের পূর্বপুরুষের উৎসের খোঁজ নেয় তখন দেখা যায় কোন এক দস্যু থেকে তাদের পূর্বপুরুষ শুরু হয়েছে। অথচ তারা পূজো করে যীশুকে আর মুখেও তাই বলে। হিন্দুদের ঠিক উল্টো। হিন্দুদের ধর্ম খুবই শান্তির ধর্ম, এখানকার লোকেরা খুব শান্ত প্রকৃতির হয়, খুব দুর্বল প্রকৃতিরও হয়। হিন্দুদের পূর্বপুরুষ যাঁরা ছিলেন সেই ঋষিরাও খুবই নরম প্রকৃতির ছিলেন। এই সব দুর্বলতার জন্য হিন্দু জাতিকে বলে মেয়েলী জাত। ইংরেজরা ভারতে আসার পর যখন বাংলায় এসে পৌঁছেছে তখন তারা বাংলার ব্যাপারে বলতে গিয়ে লিখছে – ইওরোপের তুলনায় ভারতের লোকেদের মেয়েলী ভাব বেশী আর ভারতের তুলনায় বাংলার লোকগুলি আরও মেয়েলী। এদেরকে জয় করা খুব সহজ। নিজেদের এই দুর্বলতার কথা হিন্দুরাও জানে। হিন্দুদের মধ্যে পৌরুষের অভাব। সেইজন্য একটু কিছু হলেই হিন্দুরা পৌরুষের পূজো করতে শুরু করে। ভাগ্যের খুবই পরিহাস যে আমাদের সবটাই শান্তি আর শান্তি। আমাদের পূর্বজরা ঋষি ছিলেন, ওনারা বেদ সঙ্কলন করেছেন, সবই করেছেন, অথচ যখন পূজো করে তখন স্বামী বিবেকানন্দের পূজাই করে, তিনি শক্তির প্রতীক। গান্ধীজী এত কিছু করলেন, কিন্তু ইয়ং জেনারেশন নেতাজীকেই বেশী মানে। হিন্দুদের নিজেদের কোন ক্ষমতা নেই, একটা কেউ যদি কোন হিন্দুকে মারতে আসে তার কোন দম নেই যে সে উল্টে তাকে মারবে। কিন্তু হিন্দুদের হয়ে কেউ যদি লড়াই করে তখন তাকে ভগবান বানিয়ে দেবে। হিন্দুদের এই মানসিকতা চিরদিনের। শ্রীরামচন্দ্র তাই, শ্রীকৃষ্ণও তাই, বুদ্ধ সেটা করলেন না বলে বুদ্ধকে হিন্দু ধর্ম মানলই না, কিন্তু যেখানেই তাদের হয়ে কেউ তলোয়ার বার করেছে, শ্রীরামচন্দ্রের অস্ত্র আর শ্রীকৃষ্ণের চক্র বেরিয়েছে চারিদিকে তাঁদেরই পূজো হচ্ছে। আমাদের দেশে এত ঋষি, মহাত্মা জন্মেছিলেন, কারুরই পূজা হয় না, পূজা শুধু হয় শ্রীকৃষ্ণ আর শ্রীরামচন্দ্রের। ঠাকুরকে দেশের লোক জানে না, কিন্তু স্বামীজীকে সবাই জানে। এটাই ভারতের চরিত্র। বিদেশীদের মধ্যে এ জিনিস নেই, যেভাবে আমরা হিরোর পূজা করি সেভাবে বিদেশীরা কখনই হিরোর পূজা করে না। ভারতে যেখানেই শক্তি সেখানেই পূজো, আর যেখানেই পূজো সেখানেই শক্তি। বেদের সময় ইন্দ্রের কেন পূজো করছে? ইন্দ্র বজ্র চালাতে পারেন, বৃত্রাসুরের গলা কেটে দিতে পারেন। আর এখন যতই মানুষ খোল-করতাল নিয়ে কীর্তন করুক আর যাই করুক মনে মনে কিন্তু স্বামীজীকেই আদর্শ করে রেখেছে। বেদের মন্ত্রে ইন্দ্রের পৌরুষত্ব যেন ফেটে ফেটে বেরোচ্ছে। আধ্যাত্মিকতার সব কিছু আমাদের আছে, আমাদের উপনিষদ আছে, আমরা সবই বলব, আত্মা বলব, ব্রহ্ম বলব কিন্তু যখন স্তুতি করবে তখনই বলবে *কংসচাণূরমর্দনম্*, শ্রীকৃষ্ণ কংসকে মেরেছিলেন, চাণূরকে মেরেছিলেন, শ্রীরামচন্দ্র সব অসুরদের সাথে রাবণকেও বধ করেছিলেন। স্বামীজীও বলছেন – আমাদের বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণকে চাই না, আমরা চাই কুরুক্ষেত্রের শ্রীকৃষ্ণকে। ঋষিদের আরও দুরবস্থা, রাক্ষস, দৈত্য সব সময় তাঁদের কেটে খেয়ে ফেলত। বিশ্বামিত্র রাজা দশরথের কাছ থেকে বাচ্চা শ্রীরামচন্দ্রকে নিয়ে যাচ্ছেন – তুমি চল, অসুরদের হাত থেকে আমাদের রক্ষা করবে। এই সমস্যা আমাদের অনেক পুরনো সমস্যা। এখানকার মানুষ আধ্যাত্মিক ভাবে চলে যেতে চায়, আধ্যাত্মিক ভাবে চলে যাওয়া মানেই এখন সে নিজের ব্যাপারে উদাসীন হয়ে গেল। ঠাকুরেরও কি দুরবস্থা গেছে, হৃদয়রাম যত দিন ছিল সে একাই ঠাকুরকে সামলাতো, হৃদয়রাম চলে যাওয়ার পর ঠাকুর খুব দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছেন। শ্রীমা এসে সামলাতে শুরু করলেন। স্বামীজীরও একই অবস্থা হয়েছিল। প্রথমের দিকে অনেক কিছু নিজেই সামলে নিয়েছিলেন, কিন্তু পরের দিকে উনি চাইছিলেন তাঁর ঝামেলাগুলো অন্যরা এসে যেন এবার সামলায়। হিন্দুরা যখন আধ্যাত্মিক জীবনে ঢুকে যান তখন তাঁদের এই সমস্যা গুলো এসে যায়, অন্য কেউ এসে যেন তাঁর রক্ষণাবেক্ষণের দায়ীত্ব নেয়। এখনকার দিনের সাধু সন্ন্যাসীদের জীবনযাত্রা নির্বাহের সব কিছু উপকরণই এসে যায়, তাঁদের দেখাশোনার জন্যও অনেকেই থাকে। কিন্তু তখনকার দিনে ঋষিদের কী প্রচণ্ড দুরবস্থা গেছে। একজন স্ত্রী, একটি পুত্রও থাকতে পারে। নিজে শাস্ত্র চর্চা আর ধ্যানের গভীরে ডুবে আছেন, এখন কে তাঁর পরিবারকে সামলাবে! সেইজন্য সব সময় শক্তিরই উপাসনা সবাই করতে চাইছে। আর বিদেশীরা প্রথম থেকেই বর্বর, বর্বরতা ওদের ভেতরেই, কিছু হলেই মারামারিতে নেমে যাবে। সেইজন্য তাদের এই ধরণের শক্তির উপাসনা চলে না, তাদের দরকার যীশু, যিনি শান্তিপ্রিয়। খ্রীশ্চানরা যখন ভারতে ভ্রাতৃত্বের

শিক্ষা দিতে এল তখন ভারতীয়রা বলছে, তোমাকেই তো ভ্রাতৃত্বের শিক্ষা দেওয়ার দরকার। কারণ ভ্রাতৃত্ব, সহনশীলতা, সব কিছুকে গ্রহণ করে নেওয়া এগুলো আমাদের স্বাভাবিক। আমাদের অভাব পৌরুষের।

ইন্দ্রের শক্তি, ইন্দ্রের পৌরুষের বর্ণনা একদিকে যেমন রয়েছে, তার সাথে বলছেন *রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব* ইত্যাদি। সায়নাচার্য তাঁর ভাষ্যেও ইন্দ্রকে পরিষ্কার দুটো স্তরে দেখাচ্ছেন, একটা হল সামান্য দেবতার স্তরে আবার ভগবান বা পরমাত্মার স্তরেও নিয়ে যাচ্ছেন। দুটো স্তরে দেখা হলে কি হতে পারে? চারজন যজমান চার জায়গায় ইন্দ্রের পূজা করছেন, তাহলে চার জায়গায় ইন্দ্র কিভাবে পূজা গ্রহণ করবেন? তাই বলছেন, ইন্দ্র মায়াবী। এখানে মায়া মানে ছল নয়, মায়াকে এখানে শক্তি রূপে বলা হয়েছে। মায়া শক্তি দিয়ে ইন্দ্র অনেক রূপ ধারণ করে সব জায়গায় চলে যাচ্ছেন। কিন্তু তারপরেই সায়নাচার্য বলছেন ইন্দ্র হলেন পরমাত্মা, পরমাত্মা তাঁর মায়াশক্তির দ্বারা সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন। জগতে যত রূপ আছে সব রূপ ইন্দ্রেরই রূপ। ভগবানও তো তাই, ভগবানের কথা যখন বলা হয় তখনও এই কথাই বলা হয় সব কিছু ভগবানই হয়েছেন। *বভূব*, তিনি হয়েছেন। কি হয়েছেন? যত রূপ আছে সব তিনিই হয়েছেন। তারপরেই বলছেন *তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায়*, শুধু তাই না, ইন্দ্রের যত রূপ আছে এগুলো প্রতিচক্ষণায়, ঈক্ষণ মানে দেখা, প্রতিচক্ষণ মানে এই রূপকে চোখ দিয়ে দেখা যায়। তাহলে ইন্দ্রের আরও অনেক রূপ আছে যে রূপগুলো সামনা-সামনি আসে না বা দেখা যায় না। ঠাকুর যেমন ঈশ্বরের ব্যাপারে বলতে গিয়ে বলছেন, তিনি এক, তিনি দুই, তিনি আরও অনেক কিছু, তাঁকে ইতি করা যায় না। ঈশ্বরের কথা বলতে গিয়ে আমরা বলি তিনি অদৃশ্য, তাঁকে এই চোখ দিয়ে দেখা যায় না। কিন্তু ঠাকুর যখন বলছেন এই যে গাছ, ফুল, ফল, মানুষ, জীব, জন্তু সব তিনিই করেছেন। এটাই ঈশ্বরের প্রতিচক্ষণ রূপ। তার মানে, যা কিছু দেখা যাচ্ছে সেটাই তিনি।

জগতে যা কিছু দেখা যাচ্ছে সব ইন্দ্রেরই রূপ। কিভাবে ইন্দ্র এত রূপ হয়েছেন? *ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপো ঈয়তে*, মায়ার শক্তিতে তিনি সব কিছু হন। *যুক্তা হ্যস্য হরয়ঃ শতা দশ*, ইন্দ্রের যে রথ, সেই রথ হাজার হাজার অশ্ব দ্বারা সংযুক্ত। সব কিছু তিনিই হয়েছেন এই ভাবকে আমরা যদি সরিয়ে সরাসরি মন্ত্রের অর্থ করি তাহলে দাঁড়াবে ইন্দ্র একজন মায়াবী পুরুষ, তাঁর রথে অনেক ঘোড়া লাগানো আছে। এটাকেই যদি আমরা এবার পৌরাণিক ভাবধারায় নিয়ে যাই তাহলে হবে, ইন্দ্রের একটি রথ আছে, সেই রথ প্রচণ্ড শক্তিশালী তাতে অনেক ঘোড়া লাগানো থাকে, আর *মায়াভিঃ*, মায়া মানে মিথ্যা, চালাকি, *পুরুরূপো ঈয়তে*, চালাকি করে অনেক রকম রূপ ধারণ করেন। এটাই ইন্দ্রের ব্যাপারে পরে সাধারণ একটা ধারণা হয়ে আছে। যখনই ইন্দ্রের কোন কিছু ভোগ করার ইচ্ছে হত তখন একটা রূপ ধারণ করে নিতেন। অহল্যাকে দেখে ইন্দ্রের লোভ হয়েছে, তখন অহল্যার স্বামী গৌতম মুনির রূপ ধারণ করে নিলেন। যদিও বাল্মীকি রামায়ণে অন্য ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। বেদে মায়া শব্দ এখানেই প্রথম আসে, স্বামীজী এর উল্লেখ করে বলছেন আজকে মায়া বলতে যা বুঝি এই ধারণা বেদের সময় ছিল না। *ইন্দ্রো মায়াভিঃ* অর্থাৎ তাঁর মায়া দিয়ে অর্থাৎ ম্যাজিকের সাহায্যে অনেক রূপ ধারণ করে নিতে পারতেন। সেই থেকে ম্যাজিকের একটা নাম হয়ে গেল ইন্দ্রজাল। সেইজন্য বলা হয় বেদের মন্ত্র কখনই নিজের মন মত ব্যাখ্যা করতে নেই। ভাষ্যকারের ব্যাখ্যা ছাড়া বেদের কোন মন্ত্রেরই ব্যাখ্যা গ্রহণ করা একেবারেই উচিৎ। সায়নাচার্যের ভাষ্যের ব্যাপারে একটা আপত্তি হতে পারে, যেহেতু তিনি আচার্য শঙ্করের অনুগামী ছিলেন সেইহেতু তাঁর ভাষ্যে কোথাও কোথাও বেদান্তের ভাবটা বেশি মাত্রায় এসে গেছে। কিন্তু তাতে কোন দোষ নেই। কারণ এখনও পর্যন্ত সায়নাচার্যের মত অত বড় পণ্ডিত কেউ হননি। স্বামীজীও ম্যাক্সমুলারের সঙ্গে দেখা করার পর তাঁকে সম্মান জানিয়ে বলছেন সায়নাচার্যই যেন এবার ম্যক্সমুলার হয়ে জন্ম নিয়েছেন। স্বামীজী ম্যাক্সমুলারকে বলছেন, আপনি একবার অন্তত ভারতে আসুন। ম্যাক্সমুলার বলছেন ভারতে গেলে আমার শরীর আর থাকবে না। সায়নাচার্যের কাছে পরম্পরার বিদ্যা ছিল, আর তিনি এত বড় পণ্ডিত ছিলেন যে পাশ্চাত্যের পণ্ডিতরা সায়নাচার্যের কিছু কিছু শব্দের অর্থের ব্যাপারে প্রথমে প্রচণ্ড আপত্তি করার পর পরে অনেক হিসাব করে যখন দেখছেন সায়নাচার্যের এই অর্থকে না নিলে পুরোটাই অমিল হয়ে যাবে, তখন তাঁরাও সায়নাচার্যের পাণ্ডিত্যের ব্যাপারে খুব উচ্চ ধারণা করতে শুরু করলেন।

এই মন্ত্রের অর্থ করতে গিয়ে সায়নাচার্য বলছেন, অগ্নি, বরুণ, মিত্রাদি যত দেবতা আছেন ইন্দ্রই এই সব দেবতা হয়েছেন। বেদেই একটি মন্ত্র আছে *একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি*, সৎ এক কিন্তু ঋষিরা সেই সৎকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ব্যক্ত করেন, ওই সৎ হলেন ইন্দ্র। সৎ মানে অস্তিত্ব, যাঁর অস্তিত্ব চিরন্তন, সব সময় আছেন, তাঁকেই অগ্নি রূপে দেখাচ্ছে, বরুণ রূপেও দেখাচ্ছে। সেই ঈশ্বরকেই এখানে ইন্দ্র নামে ডাকা হচ্ছে, তিনিই আবার নানান দেবতার রূপ ধারণ করেছেন। আমরা যদি ঠাকুরের সব ভক্তদের সরিয়ে দিই, তাহলে থাকছে সাধারণ মানুষরা। সাধারণ মানুষরা ঠাকুরকে দেখবে একজন ভক্ত রূপে, আরেকটু উন্নত হলে ঠাকুরকে একজন ঋষি রূপে ভাববে। কিন্তু ঠাকুরের ভক্তরা ঠাকুরকে অবতার রূপে দেখেন। ইন্দ্রের ক্ষেত্রেও ঠিক একই ব্যাপার হয়েছে। সাধারণ অবস্থায় ইন্দ্রকে দেখা হচ্ছে দেবতা রূপে, কিন্তু বেদে থেকে থেকে ইন্দ্রকে দেখান হচ্ছে সেই অনন্ত রূপে। বিদেশীরা যতই বলুক ভারতের লোকেরা পৌত্তলিক, কিন্তু ভারতের লোকেরা কোন দিনই পৌত্তলিক ছিল না। প্রথমে মুসলমানরা আর পরে খ্রীশ্চানরা ভারতে আসার পর ওদের মধ্যেও প্রচণ্ড সংশয় হয়েছিল। একদিকে ওরা দেখছে এখানকার লোকের মুর্তি পূজা করছে অন্য দিকে এদের শাস্ত্রে যখন ঢুকছে তখন দেখছে অন্য রকম কথা বলছে, আরেক দিকে হিন্দুরা ক্রমাগত বলে যাছে আমরা পৌত্তলিক নই। পৌত্তলিক উপাসনা আর দিব্য উপাসনার মধ্যে প্রধান পার্থক্য হল, পৌত্তলিক উপাসক বলছে আমার ইষ্টের এই বিগ্রহই সব কিছু হয়েছেন। আমি যে মুর্তির পূজা করছি, ইনিই আমার ভগবান, ইনিই সব কিছু হয়েছেন। দিব্য উপাসকরা বলেন, যিনি সেই দিব্য সত্তা তিনিই এই বিভিন্ন মুর্তির মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছেন। যেমন ঠাকুরের কাছে মা কালীর মুর্তি কোন মামুলি একটা মুর্তি নন, যিনি শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ, যিনি অনন্ত তাঁরই মুখ হল মা কালী। অনন্তকে আমরা কোন দিন জানতে পারব না, কিন্তু অনন্তের উপর যদি মুখোশ লাগিয়ে দেওয়া হয় তখনই আমরা অনন্তকে জানতে পারব। মা কালী হলেন সেই অনন্তের উপর একটা মুখোশ। ঠাকুর নিজেই উপমা দিচ্ছেন, একটা প্রাচীর আছে সেই প্রাচীরের ওপারে ধূ ধূ তেপান্তর, যার কোন শেষ নেই। সেই প্রাচীরের গায়ে যদি একটা ছোট্ট ছিদ্র করে দেওয়া হয়, তখন ওই ছিদ্রে চোখ রাখলে প্রাচীরের বাইরের সেই অনন্তের সৌন্দর্যকে আস্বাদ করা যাবে। অনন্তের উপর যে একটা মায়ার দেওয়াল রয়েছে মা কালী সেই দেওয়ালের একটা ফুটো, এই ফুটো দিয়ে সেই অনন্তকে জানা যায়। এখানে ইন্দ্রও ঠিক তাই, সেই মায়ার দেওয়ালে ইন্দ্র যেন একটা ফুটো, যেটা দিয়ে সচ্চিদানন্দকে জানা যায়।

এবার এই মন্ত্র থেকে ইন্দ্রকে সরিয়ে দিয়ে ইন্দ্রের জায়গায় যদি শ্রীরামকৃষ্ণ বা শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে আসা হয় তাহলে কি হবে? ছন্দকে ঠিক রাখলে তখনও এর একই অর্থ দাঁড়াবে। এখানে যাঁকে খুশি লাগিয়ে দেওয়া যেতে পারে তাতে মন্ত্রের অর্থের কোন হেরফের হবে না। কিন্তু যদি বলি মা কালীকে দাও পাঠাবলি, তারপর মা কালীকে সরিয়ে সেখানে যদি শ্রীকৃষ্ণ বলি তাহলে এর কোন অর্থই হবে না। কারণ শ্রীকৃষ্ণকে পাঠাবলি দেওয়া হয় না, শিবকেও পাঠাবলি দেওয়া হয় না। এখানে মা কালীকে নৈর্ব্যক্তিক রূপে, একটা ভাবের প্রতীক রূপে না ভেবে একজন ব্যক্তি রূপে ভাবা হচ্ছে। আপেক্ষিক জগতে ঈশ্বরের সর্বোচ্চ প্রকাশ কেমন হতে পারে সেটাকেই বেদের এই মন্ত্রে অভিব্যক্ত করা হয়েছে। মন্ত্রে ইন্দ্র একটি শব্দ মাত্র, ইন্দ্রকে সরিয়ে যে কোন শব্দ নিয়ে আসা যেতে পারে তাতে মন্ত্রের অর্থ ও ভাব কোথাও ক্ষুণ্ন হবে না। ঠাকুর কতবার বলছেন যে কালী সেই কৃষ্ণ, যে কৃষ্ণ সেই কালী। কারণ যিনি অনন্ত, যিনি অখণ্ড তাঁর উপর একটা মুখোশ লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

বলছেন যজমানরা যত দেবতাদের সাক্ষাৎ রূপে পূজো করছেন সব দেবতাই তিনি। এখানে একটা মজার ব্যাপার উত্থাপিত করা হয়, যেটাকে নিয়ে ব্রহ্মসূত্রেও আলোচনা করা হয়েছে। মনে করুন আপনি একটা যজ্ঞ করছেন এবং যজ্ঞে ইন্দ্রের নামে আহুতি দিচ্ছেন, ইন্দ্রের নামে যদি আহুতি দেওয়া হয় তাহলে ইন্দ্রকে তো সেখানে হাজির থাকতে হবে। একই সময় অন্য এক জায়গায় ইন্দ্রের নামে একটা যজ্ঞ করা হচ্ছে, ইন্দ্রকে সেখানেও থাকতে হবে। ঠাকুরের মন্দিরে গিয়ে আপনি ধ্যান করছেন, আপনার পাশে আরেকজনও ঠাকুরের ধ্যান করছেন। দুজনেই হৃদয়ে ঠাকুরের ধ্যান করছেন। তাহলে ঠাকুরকে আপনার হৃদয়েও থাকতে হবে আবার আপনার পাশে যে ধ্যান করছে তার হৃদয়েও ঠাকুরকে থাকতে হবে। এটা কি করে সম্ভব হবে? ধ্যানের ব্যাপারটা না হয় ভাব জগতের ব্যাপার কিন্তু যজ্ঞের ক্ষেত্রে ঋষিরা বলছেন দেবতারা সশরীরে সাক্ষাৎ সেখানে

হাজির হন। বাল্মীকি রামায়ণেও বর্ণনা আছে, রাজা দশরথ যখন পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করছেন সেখানে সব দেবতারা এসে হাজির হয়েছেন আর সবাই নিজের নিজের যজ্ঞ ভাগ গ্রহণ করছেন। আর এটাও বেদে স্পষ্ট করে বলছে দেবতারা সেখানে হাজির থেকে নিজের নিজের যজ্ঞ ভাগ গ্রহণ করেন। এখন দশ জায়গায় যদি একই সঙ্গে যজ্ঞ হয় তাহলে ইন্দ্র দেবতা দশ জায়গায় কি করে যাবেন? সেইজন্য বলছেন *ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপো ঈয়তে*, মায়ার শক্তিতে তিনি অনেক রূপ ধারণ করতে পারেন। কত রূপ নিতে পারেন? অনন্ত রূপ পরিগ্রহ করতে পারেন। সেইজন্য যত জায়গায় যজ্ঞ হবে সব জায়গায় তিনি থাকবেন। ঠাকুরের মন্দিরে একশ জন্য যদি ঠাকুরের ধ্যান করেন তখন ঠাকুর সবারই মধ্যে বিরাজমান। আর যদি তাঁদের চৈতন্য জ্যোতি জেগে যায়, যেখানে সাক্ষাৎ ঠাকুরকে দেখতে পাচ্ছেন তখন কজন ঠাকুরকে দেখতে পারবেন? অনন্ত ঠাকুর দেখতে পারবেন, আর শুধু এখানেই নয় কাশ্মীরেও দেখতে পারবেন কন্যাকুমারীতেও দেখতে পারবেন। কারণ ঠাকুর *মায়াভিঃ পুরুরূপো ঈয়তে*, শ্রীরামকৃষ্ণ মায়ার দরুণ অনেক রূপ ধারণ করেন আর যাঁরাই তাঁর ভক্ত, যাঁরাই তাঁর পূজা বা ধ্যান করছেন তাঁরাই ঠাকুরকে দেখতে পারবেন। ইন্দ্র যদি স্বর্গের রাজা হন, তিনি একটা জায়গাতেই থাকতে পারবেন, একের বেশি কোন জায়গায় একসাথে থাকতে পারবেন না। এমনকি ব্রহ্মসূত্রেও যখন এর উপর তত্ত্বমূলক আলোচনা হচ্ছে সেখানেও এই কথাই বলা হচ্ছে দেবতারা কি করে একই সাথে অনেক জায়গায় থাকতে পারবেন। মায়ার দ্বারা বিভিন্ন রূপে থাকেন। তাহলে এই মায়াটা কি? মায়াকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমরা সব সময় অবিদ্যা, অজ্ঞান এই শব্দগুলিই ব্যবহার করে। যিনি নির্গুণ নিরাকার, তাঁর উপর যখন অজ্ঞানের একটা আবরণ এসে যায় তখনই সৃষ্টির খেলা শুরু হয়ে যায়। যখন আমরা ঘুমিয়ে পড়ছি তখন আমাদের মধ্যে একটা আবরণ এসে যাচ্ছে, তখন আমি এক কিন্তু অনেক কিছু দেখছি এটাই অজ্ঞানের অবস্থা। যখন কোন কিছুর কল্পনা করছি সেটাও তখন অজ্ঞানের অবস্থা। বলা হয় ঈশ্বরের উপর যখন অনেক রকম অবিদ্যা এসে যায়, যে অবিদ্যা তাঁর নিজেরই শক্তি, তখনই সৃষ্টি হয়। আচার্যের বিরোধীরা আচার্যের বিরুদ্ধে বলেন – ঈশ্বরের আবার অবিদ্যা কিসের? আচার্য শঙ্কর কিন্তু কখনই অবিদ্যা বলেন না, তিনি বার বার বলছেন এটা ঈশ্বরেরই একটা শক্তি। ঈশ্বরের এই শক্তিকে আমরা জানতে পারি না, জানতে পারা যায় না বলে এটাকে মায়া বলা হয়। সায়নাচার্য এখানে মায়াকে ব্যাখ্যা করে খুব সুন্দর বলছেন জ্ঞান শক্তি। ঈশ্বরের উপর যখন অনেক উপাধি এসে যায়, অর্থাৎ তিনি যখন অনেক রূপ ধারণ করে নেন, তখন সেখানে বলছেন *ইন্দ্রঃ পরমাত্মা*, তিনি আকাশবৎ ও সর্বগত, তিনি সব জায়গায় যেতে পারেন। এগুলো কিভাবে সম্ভবায়িত হচ্ছে? মায়ার দ্বারা, মায়াকেই এখানে সায়নাচার্য বলছেন জ্ঞান শক্তি। এখানে একটু বোঝা দরকার।

মায়াকে যেভাবে অবিদ্যা, অজ্ঞান বলা হয়, পৌরণিক পরম্পরাতে সেভাবে কখনই মানবে না। তাঁদের মতে ঈশ্বরের তিনটি শক্তি – জ্ঞান শক্তি, ক্রিয়া শক্তি আর ইচ্ছা শক্তি। ইচ্ছা শক্তিকে অনেক সময় সঙ্কল্প শক্তিও বলা হয়। যাঁর জ্ঞান আছে তিনি সেই জ্ঞানের দ্বারা সব কিছু পেতে পারেন। যীশু বাইবেলে বলছেন The knowledge make you free। জ্ঞানের দ্বারাই মুক্তি আসে, একমাত্র জ্ঞানই মুক্তি দেয়। যেমন একজন ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার ইলেক্ট্রিক্যালের সব কিছুই জানার কথা, কিন্তু এমন কোন ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার নেই যিনি ইলেক্ট্রিক্যালের সবটাই জানেন। কিন্তু ভগবান যদি একজন ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হয়ে আসেন, তিনি ইলেক্ট্রিক্যালের সবটাই জানবেন আর ওই জ্ঞান দিয়ে তিনি যা খুশি করে দিতে পারবেন। সেইজন্য বলা হয় জ্ঞানই শেষ কথা, জ্ঞানই সেই শক্তি দেবে যে শক্তির সাহায্যে সে যে কোন কিছু করে দিতে পারবে। বাচ্চা ছেলে যখন অ আ ক খ লিখতে শুরু করে তখন তাকে একটা কলম বা চক দিয়ে দিলে যেখানে সেখানে অ আ ক খ লিখতে থাকবে, কারণ তার বর্ণের জ্ঞান এসে গেছে। যাঁর কাছে পুরো বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের জ্ঞান এসে যায় সাথে সাথে তাঁর মধ্যে ক্রিয়া শক্তি ও ইচ্ছা শক্তির সবটাই এসে যায়। ইসলামিক ঐতিহ্যে যেখানে ক্যালিগ্রাফির কথা বলা হয়, সেখানে তাঁরা বলেন, আল্লা যখন সৃষ্টি করেছেন তখন তাঁর মনে একটা ধারণা ছিল। যেমন ঘোড়া সৃষ্টি হওয়ার আগে আল্লার মনে একটা ঘোড়ার ধারণা আছে, ওই ঘোড়াটাই আইডিয়াল ঘোড়া। আল্লার ওই ঘোড়ার ধারণা থেকে যখন ঘোড়ার সৃষ্টি হচ্ছে তখন ঘোড়ার মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য আসতে শুরু হয়। এই পার্থক্যটাই অসম্পূর্ণ, আর এই অসম্পূর্ণতাই একটা স্টাইল হয়ে যায়। একজন শিল্পী

যদি ঘোড়া আঁকেন, তিনি ইচ্ছে করলে অনেক রকমের ঘোড়া আঁকতে পারেন, ঘোড়ার পা এক রকম করে দিতে পারেন, নানা রকম রঙের ঘোড়া আঁকতে পারেন উড়ন্ত ঘোড়া এঁকে দিতে পারেন। কিন্তু আল্লার মনে যে আদর্শ ঘোড়া ছিল সেই আদর্শ ঘোড়ার সাথে যদি শিল্পী একাত্ম হয়ে যান তখন তিনি যে কোন রকমের ঘোড়া এঁকে দিতে পারবেন। আমাদের জীবনের সব কিছুতেই আমরা অসম্পূর্ণতাকে আশ্রয় করে আছি। অসম্পূর্ণতাকে আশ্রয় করে আমরা সম্পূর্ণতাকে পেতে চাইছি, যা খুবই দুসাধ্য। শব্দের ক্ষেত্রে, বিচারের ক্ষেত্রে, চিন্তনের ক্ষেত্রে, রান্নাবান্না, খাওয়া, কাজকর্ম সব ক্ষেত্রেই আমরা অসম্পূর্ণতাকে ধরে সম্পূর্ণতাকে পেতে চাইছি। ভগবান হলেন শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ, তাঁর মনে একটা আদর্শ ছবি আছে, তাঁর ভেতর সেই জ্ঞানটা আছে একজন প্রকৃত মানব কি জিনিস, সেখান থেকে মানবের যে কোন রূপ বেরিয়ে চলে আসে। এই ব্যাপারটাকে ঠাকুর খুব সুন্দর একটা উপমার সাহায্যে বুঝিয়ে দিচ্ছেন, একজনের কাছে একটা রঙের গামলা আছে। একজন এসে বলল আমার এই কাপড়টা নীল রঙের করে দাও। লোকটি গামলায় চুবিয়ে দিল কাপড়টা নীল রঙের হয়ে গেল। একজন বলল আমাকে সবুজ রঙের কাপড় করে দাও, সেই একই গামলায় কাপড় চুবিয়ে দিতেই সবুজ রঙ হয়ে গেল। যে লাল বলছে তাকে লাল রঙে ছুপিয়ে দিচ্ছে। কল্পতরুর ধারণাও এখান থেকেই এসেছে। কল্পতরুর তলায় এসে যে যা চাইবে সেটাই পেয়ে যাবে। একটা এমন কিছু সম্পূর্ণতা আছে যেখানে যে কোন জিনিস গিয়ে যে কোন জিনিস হয়ে যেতে পারে। এই সম্পূর্ণতা একমাত্র ঈশ্বরেরই হয়। কারণ তাঁর মধ্যে জ্ঞান শক্তি আছে।

একটা মজার গল্প আছে। একজন ডাক্তার ছিল যে শুধু মাথা ব্যাথা সারাতে পারত। পায়ের ব্যাথা নিয়ে একজন রোগী গেছে সেই ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার তাকে জিজ্ঞেস করছে, তোমার মাথা ব্যাথা হয়? রোগী বলছে, না ডাক্তারবাবু আমার পায়েই ব্যাথা হয়। 'কখন সখন কি মাথা ব্যাথা হয়'? 'না ডাক্তারবাবু কখনই মাথা ব্যাথা হয় না'। 'আরে কখন না কখন তো মাথা ব্যাথা হয়েছে'! 'না ডাক্তারবাবু শুধু পায়েই ব্যাথা হয়'। তখন ডাক্তার খুব রেগে গেছে, রেগে গিয়ে বাঙাল ভাষায় বলছে 'হয়, হয়, বুঝতে পারো না'। ডাক্তার একটা ব্যাপারেই জানে, মাথা ব্যাথার অসুখটাই জানে। কিন্তু যে ডাক্তার পুরো ডাক্তারী শাস্ত্রকে জেনে গেছেন তিনি সব রোগের চিকিৎসাই করতে পারবেন। ইলেক্ট্রিসিটির ব্যাপারটা ভাবুন, ফ্রীজে গিয়ে এই তড়িৎ শক্তি সব কিছু ঠাণ্ডা রাখছে আর মাইক্রো ওভেনে গিয়ে সব কিছুকে গরম রাখছে। জ্ঞান শক্তি ঠিক এভাবেই কাজ করে। এ্যাটমিক শক্তি বোমা হয়ে সব কিছু ধ্বংস করে দিতে পারে আবার থার্মালে সেই এ্যাটমিক শক্তি তড়িৎ শক্তি উৎপন্ন করে জগতের কল্যাণের কাজে নিয়োজিত হচ্ছে। যখন একটা জিনিসের জ্ঞান কারুর মধ্যে চলে আসে তখন তা দিয়ে সে যে কোন কিছু করে দিতে পারে। এখানে মায়াকে এই জ্ঞান শক্তি বলছেন। এই জ্ঞান শক্তির জন্য তিনি যে কোন রূপ ধারণ করে নিতে পারছেন। সায়নাচার্য ব্যাখ্যা করে আরও বলছেন, বিভিন্ন উপাধি দিয়ে, উপাধি মানে আবরণ, এই আবরণ দিয়ে তিনি বিভিন্ন রূপ ধারণ করে নেন। খুব সুন্দর বলছেন, ইন্দ্রের শক্তি পরমেশ্বরের শক্তি, পরমেশ্বরের শক্তি বলে জগতে যা কিছু আছে সব তিনিই হয়েছেন।

ইন্দ্রের রথে যে হাজার হাজার ঘোড়া সংযুক্ত, সায়নাচার্য এর ব্যাখ্যা করে শেষের দিকে বলছেন, ঘোড়াগুলো হল ইন্দ্রিয়ের প্রতীক। কঠোপনিষদেও এই উপমা নিয়ে আসা হয়েছে। ইন্দ্রিয়গুলি যেমন তাদের বিষয়ের দিকে ধাবিত এই ধাবিত হওয়াটা যেন ঘোড়া দৌড়াচ্ছে। আমার হাতে একটা মোবাইল ফোন আছে, আমি জানি এটা আমার মোবাইল আর আমি খুব সচেতন মোবাইলটা যেন হারিয়ে না যায়। মোবাইলের ব্যাপারে আমি কিভাবে সচেতন হচ্ছি? বিজ্ঞানীরা খুব সহজ ভাবে বলে দেবেন, বস্তু আছে, বস্তুর উপর আলো পড়ছে, সেই আলো প্রতিফলিত হয়ে চোখ দিয়ে গিয়ে মস্তিষ্কে গিয়ে একটা অনুভূতি তৈরী হচ্ছে, সেই অনুভূতি থেকে মনে একটা আকৃতি তৈরী হচ্ছে ইত্যাদি। বেদান্তে তা কখনই হয় না। বেদান্ত বলে, মন আছে, মন ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে। চক্ষু একটা ইন্দ্রিয়, কর্ণ একটা ইন্দ্রিয়, চৈতন্য শক্তি এই ইন্দ্রিয়গুলি দিয়ে ক্রমাগত বেরিয়ে আসে। তার মানে, বিজ্ঞানীরা যে স্থূল আলোর কথা বলছেন, এই আলোর কোন গুরুত্ব নেই, গুরুত্ব হল চৈতন্যের আলো। ঋষিরাও জানতেন আলো যখন থাকে তখন বস্তুকে দেখা যায় আর আলো না থাকলে বস্তুকে দেখা যায় না। তাহলে ঋষিরা চৈতন্য, চৈতন্যের আলো এসব শব্দ কেন ব্যবহার করছেন? এই কলম আমি যে দেখছি, স্থূল দেখার ব্যাপারটা ওনাদের কাছে কোন গুরুত্ব নেই, গুরুত্ব হল জানার ব্যাপারটা। কলম আছে আর

কলমটা আমার, এই বোধ, এই জানাটাই গুরুত্ব। ঋষিরা বলেন, চেতনা বাইরে থাকে আসে না, চেতনা সব সময় ভেতরে থেকেই আসে। আমাদের ভেতরে যে চৈতন্য শক্তি আছে, সেই চৈতন্য শক্তি ইন্দ্রিয় দিয়ে বাইরে আসছে। চোখ দিয়ে ওই চেতনা বেরিয়ে আসছে, বেরিয়ে এসে চৈতন্য শক্তি বস্তুকে ঢেকে ফেলে। এইভাবে প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে চৈতন্য বেরিয়ে এসে বস্তুকে জানছে। চক্ষু ইন্দ্রিয়ে দিয়ে সব থেকে বেশি চৈতন্য শক্তি বেরিয়ে আসে, চক্ষুর পরেই কর্ণেন্দ্রিয়, কর্ণেন্দ্রিয়ের থেকে নাসিকার শক্তি আরও কম, জিহ্বা তার থেকেও কম, ত্বক দিয়ে যাওয়ার সময় চৈতন্য একেবারে জিরো হয়ে যায়, স্পর্শ না হওয়ার পর্যন্ত সে জানতে পারে না এটা কি বস্তু। চৈতন্য ইন্দ্রিয়ের ভেতর দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসছে, বেরিয়ে এসে একটা বস্তুকে ঢেকে ফেলছে, ঢেকে ফেলার পর ওই বস্তুর ব্যাপারে জেনে যাচ্ছে, বেদান্তের এটি একটি মৌলিক সিদ্ধান্ত, এই সিদ্ধান্তকে বেদান্ত থেকে সরিয়ে দিলে বেদান্ত দর্শন সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়বে। পদার্থ বিজ্ঞানের দেখা আর বেদান্তের জানার ব্যাপার এই দুটো পুরো আলাদা। বেদান্ত এই ব্যাপারে পুরো যুক্তি দিয়ে এগিয়ে যায়। আমাদের ভেতরে আত্মা যিনি আছেন, তাঁর যে আলো এই আলো কোন স্থূল আলো নয়, এটাই চৈতন্যের আলো। এই চৈতন্যের আলো প্রতি মুহূর্তে ইন্দ্রিয়গুলির মাধ্যমে বাইরে বেরিয়ে আসছে। জোঁক তার শূরটা ঘোরাতে থাকে, যেমনি সে তার বস্তুকে পেয়ে যাবে তেমনি সেটাকে ধরে নেবে। ধরে নিয়ে জোঁক শুষতে থাকে। যদি রক্ত না পায় সেই বস্তুকে সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দেবে। আমার চোখ দিয়ে যে চেতনা বেরিয়ে আসছে, সেও চারিদিকে নিরীক্ষণ করতে থাকে। চোখটা ঘুরিয়ে দেখে নিল, এবার সে বিচার করতে শুরু করে এদের মধ্যে কে কে আমার বন্ধু, কাদের আমি ভালোবাসি, কার কার সাথে আমার সম্পর্ক, মন সেখানে গিয়ে স্থির হয়ে বসে যায়। এই যে চেতনা ইন্দ্রিয় দিয়ে বেরোচ্ছে, সেটাকে এনারা বলছেন হাজারটা, হাজার মানে অনন্তের অর্থে, এগুলো যেন হাজারটা ঘোড়া। আর প্রত্যেকটি শরীর হল পরমাত্মারই রথ, যত ইন্দ্রিয়গুলি কাজ করছে সব পরমাত্মারই ইন্দ্রিয়। এই ব্যাপারটাই ভগবান গীতায় বলছেন *সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্*, জগতে যত ইন্দ্রিয় আছে সব ইন্দ্রিয় দিয়ে তিনিই যাচ্ছেন অথচ সব কিছু থেকে তিনি অনাসক্ত। রথের সাথে ঘোড়া জুড়ে আছে মানে শরীরের সাথে ইন্দ্রিয়গুলি জুড়ে আছে, রথ হল শরীর আর ইন্দ্রিয়গুলি ঘোড়া। তাই বলে এখানে দশটা ঘোড়া বলছেন না, অনন্ত ঘোড়া। যত জীব আছে, যত মানুষ, যত জীবজন্তু আছে তার যত ইন্দ্রিয় আছে, তার সবটাই যেন ইন্দ্রের রথের ঘোড়া। যিনি সেই ইন্দ্র তাঁর জ্ঞান শক্তি আছে, ক্রিয়া শক্তি আছে আর ইচ্ছা শক্তি আছে। তাই দিয়ে তিনি সব দেবী দেবতা হয়েছেন, যত জীব, মানুষাদি হয়েছেন। আর সব ইন্দ্রিয় দিয়ে যে জগতকে জানা হচ্ছে সেটাকেই এখানে ঘোড়ার সঙ্গে তুলনা করছেন।

একদিকে ইন্দ্রকে দেখাচ্ছেন তিনি শক্তির প্রতীক, শক্তিকে একটা পৌরাণিক শক্তির সাহায্যে দেখাচ্ছেন ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে হনন করছেন। সেখানে থেকে এগিয়ে এসে দেখাচ্ছেন সব কিছু ইন্দ্রে আদেশে চলছে। আবার দেখাচ্ছেন, যাঁরাই ইন্দ্রের পূজো করে, স্তুতি করে তিনি তাঁদের সব ইচ্ছাই পূর্ণ করেন আর তাঁদের তিনিই রক্ষা করেন। রক্ষা করার এই ভাবটা ইন্দ্রের উপর অনেকবার নিয়ে আসা হয়েছে। ইন্দ্রের উপর মন্ত্রগুলি যদি ভালো করে অধ্যয়ন করা হয় তাহলে এগুলো থেকে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বেরিয়ে আসবে। আর্য আর দস্যুদের যে লড়াই হয়, এদের লড়াইয়ে ইন্দ্র সব সময় আর্যদের পাশে থেকে সাহায্য করেন। এই ধারণা থেকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা একটা নতুন তত্ত্ব পোষণ করতে শুরু করে দিলেন। তাঁদের মত যে আর্যরা, আজকে আমরা আর্য বলতে যা বুঝি, ভারতের মূল ভুখণ্ডের কেউ ছিল না, আর দস্যু বলতে পরিষ্কার ভেবে নিলেন ভারতের আদি ভূখণ্ডে প্রথম থেকে যারা বসবাস করে আসছিল। এরপর বলতে শুরু করলেন, আর্যরা সাইবেরিয়া বা উত্তরমেরু অঞ্চল থেকে ভারতে প্রবেশ করেছে। এরপর ঐতিহাসিক ঘটনা, মন্ত্র, কাহিনী, পৌরাণিক চিন্তা-ভাবনা সব মিলিয়ে একটা ধারণা রূপ পেয়ে গেল, সেটা হল ইন্দ্র যেন আর্যদের একজন সেনাপতি ছিলেন, তিনি সবাইকে নিয়ে ভারতের কালো চামড়া আদিবাসীদের কেটে শেষ করে দিয়েছেন। ইন্দ্রের নামও পুরন্দর, পুরন্দর মানে যিনি নগরকে ধ্বংস করেন। একেবারেই ঠিক নয়। বেদের ব্যাখ্যার মধ্যেই পরিষ্কার বলছে, দস্যু মানে মনের মধ্যে নোংরা ভাব আর আর্য মানে শুদ্ধ ভাব। অর্থটা একবার বুঝে নিলে দেখা যাবে একই জিনিস সব জায়গাতেই প্রযোজ্য হবে। ব্যাখ্যাতে বলছেন, মনের অশুদ্ধ ভাব আর শুদ্ধ ভাব অর্থাৎ দস্যু ভাব আর আর্য

ভাবের মধ্যে সব সময় লড়াই লেগে আছে। আরে দেখা যায় প্রার্থনা করল ইন্দ্র এসে এই লড়াইতে শুদ্ধ ভাবকে সাহায্য করে। গায়ত্রী মন্ত্রে সূর্যের কাছে যেমন প্রার্থনা করে বলা হচ্ছে আমার পাপ যেন নাশ হয়ে যায়, ইন্দ্রকেও ঠিক সেই ভাবে প্রার্থনা করা হয়। ইন্দ্রকে পুরন্দর নামে যখন সম্বোধন করা হয় তখন পুরন্দর শব্দকে ওই অর্থেই বলা হয়, আমাদের ভেতরে পাপের একটা নগর যেন দাঁড়িয়ে আছে সেই নগরকে তিনি ভেঙে চুরমার করে দেন। আধ্যাত্মিক ভাব নিয়ে যে স্তুতি করা হচ্ছে, এই স্তুতির ফলে একটা দিব্য শক্তি এসে আমাদের ভেতরে যে কুপ্রবৃত্তি আদি রয়েছে সেগুলোকে নাশ করাতে সাহায্য করে। জীবনে মানুষকে অনেক কিছুর বিরুদ্ধে প্রচুর লড়াই করতে হয়। কিছু কিছু এমন অশুভ শক্তি আছে যার বিরুদ্ধে আমরা নিজেদের শক্তিতে লড়াই করতে পারি না। লড়াই করে একটা অশুভ শক্তিকে জয় করার পর আমাদেরও মনে হয়, আমি কি করে পারলাম! আমরা জীবনে অনেক মারাত্মক ভুল করে বসি, তখনও মনে হয় আমি কি করে এই ভুল কাজ করতে পারলাম, আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তিন চার বছরের বাচ্চারা কখন নিজেদের উপর দোষ নেয় না, ওরা বুঝে নেয় দোষ করা মানে আমি শেষ। মনস্তাত্ত্বিক বিজ্ঞানেও বলে যে, মনে যদি কোন অপরাধ বোধ এসে যায় একটা সময় সে পাগল হয়ে যাবে। মানুষ অপরাধ বোধ নিতে পারে না, তার জন্য সে প্রায়শ্চিত্ত করে করে মরে যাবে। সেইজন্য আমাদের মস্তিষ্কের মেকানিজম্ এমন ভাবে নির্মিত যে সে দেখে এই অপরাধ আরও অনেকে করেছে। সেটা মনে না করতে পারলে বলে, পাপ পুরুষ আমাকে দিয়ে করিয়েছে। মানুষের স্বভাব অমৃতের, সে অপরাধ বোধ নিতে পারে না। কিন্তু এর উল্টোটাও হয়, অমৃত পুরুষ কখনই অহঙ্কার নিতে পারে না। বড় কাজ করার পর সেই কাজের জন্য অহঙ্কার নিতে পারে না, সেইজন্য বলে এই কাজ আমার দ্বারা সম্ভবই হতে পারে না, ঈশ্বরীয় শক্তিতেই হয়েছে। পাপের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই মনে হয়, কেউ যেন আমাকে দিয়ে এই পাপ কাজ করাচ্ছে। দাস বা দস্যু ভাব আর আর্য ভাব এই দুটোর মধ্যে লড়াই চলে তখন যেন মনে হয় আমার দ্বারা কোন শুভ কাজ হতে পারে না। তখনই সে সেই আধ্যাত্মিক শক্তির কাছে প্রার্থনা করে তিনি যেন আমাকে সাহায্য করেন। যা কিছু হয় নিজের শক্তিতেই হয়, কিন্তু তাও জানে এই জিনিস আমার ক্ষমতার বাইরে। ইন্দ্রের প্রতি এই ধরণের প্রার্থনার উপর খুব জোর দেওয়া হয়েছে। এটা যেমন ইন্দ্রের প্রতি প্রার্থনা। আরও একটা মজার প্রার্থনা করা হচ্ছে, যেখানে রাত্রিদেবীর প্রতি প্রার্থনা করা হচ্ছে। কয়েকটি মন্ত্র মিলে রাত্রিদেবীর প্রতি যে প্রার্থনা করা হয় এটাই বিখ্যাত রাত্রিসূক্তম্। আগেকার দিনে রাত্রিবেলা বেদ পাঠ করা হত না, তবে অনেক মনে করেন রাত্রিসূক্তম্ পাঠ করে বেদপাঠ করা যায়।

রাত্রিসূক্তম্

বেদে কয়েকজন যমজ দেবতা আছেন, অর্থাৎ দুজন দেবতা সব সময় একসাথে চলেন। রাত্রিদেবীও এই রকম যমজ দেবতা, রাত্রিদেবীর সাথে যে দেবী সব সময় থাকেন তিনি হলেন ঊষাদেবী, রাত্রীদেবী আর ঊষাদেবীর একসঙ্গে বৈদিক নাম ঊষানক্তম্, নক্তম্ মানে রাত্রি, ঊষা আর রাত্রি একসঙ্গে সন্ধি করে বলা হয় ঊষানক্তম্। রাত্রিদেবীর জন্ম দ্যুলোক থেকে, ঊষাদেবীর জন্মস্থানও দ্যুলোক। আগেও বলা হয়েছে দেবতারা তিনটে লোক পৃথিবী, অন্তরীক্ষ আর দ্যুলোকের হতে পারেন। রাত্রিদেবী আর ঊষাদেবী দ্যুলোকের দেবী। রাত্রিদেবীর নাম শুনলে মনে হবে তাঁর গায়ের রঙ কালো, কিন্তু মজার ব্যাপার তিনি কিন্তু কালো নন। অমাবস্যার রাতের আকাশে উজ্জ্বল তারাগুলো যেমন ঝলমল করে, তেমনি তারার ঝলমলে আলোর মত রাত্রিদেবীর রূপ। রাত্রি মানে আমরা কালো অন্ধকার মনে করি, রাত্রিদেবী এর পুরো বিপরীত, উজ্জ্বল তারার মত তিনি সব সময় ঝলমল করেন। আরও মজার ব্যাপার, রাত্রিদেবীর আভরণ সমূহের মধ্যে ঐশ্বর্যের প্রকাশ। এই ঐশ্বর্যে তিনি অন্ধকারকে বিদূরিত করে দেন। দেবীর নাম রাত্রি অথচ তিনি রাতের অন্ধকার দূর করেন। কারণ তিনি দেবী, তাই তাঁর এই দিব্য রূপ। প্রকৃতির রূপে রাতটাই হয়ে যাবে অন্ধকারের রূপ।

রাত্রিদেবীর অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য। রাত্রিবেলা বনে জঙ্গলে নেকড়ে আদির মত হিংস্র জন্তুরা যারা বিচরণ করে দেবী তাদের আমাদের থেকে দূরে রাখেন, রাত্রিবেলা যারা চুরি করতে আসে তাদের থেকে আমাদের যেন কোন ক্ষতি না হয় রাত্রিদেবী আমাদের রক্ষা করেন। দিনান্তে মানুষ যে নির্বিঘ্নে বাড়ি ফিরে আসে, গরু, ছাগল,

ভেড়া গবাদি পশুরা যে মাঠ থেকে তাদের ঘরে ফিরে আসে, পাখিরা যে তাদের নীড়ে ফিরে যায় আর রাত্রিবেলা সব প্রাণীরা যে সুখে নিদ্রা যায়, রাত্রিদেবীর এই ঐশ্বর্যের জন্যই এই কাজগুলো সুচারু রূপে করা সম্ভবপর হয়। প্রাণীর ঘুম, প্রাণীর বিশ্রাম যা কিছু রাত্রিদেবীর জন্যই হয়। বেদে যেমন রাত্রিসূক্তমে দেবীর বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু শ্রীশ্রীচণ্ডীতে এসে এই রাত্রিসূক্তমই একটা বিশেষ গুরুত্ব পেয়ে গেছে। চণ্ডীতে রাত্রিসূক্তমে দেবীকে মা কালী রূপে আরাধনা করা হয়। রাত্রি যেন মা কালীরই একটা রূপ। মা কালীর কাছ থেকে বা দৈবী শক্তির কাছ থেকে মানুষ যা যা আশা করবে তার সবটাই এই রাত্রিসূক্তমে বর্ণনা করা আছে। রাত্রিসূক্তমের মন্ত্রগুলি পড়তে গেলে মনে হবে কবিতার মত, কিন্তু শক্তির উপাসকরা যখন এই মন্ত্রগুলিকেই ব্যাখ্যা করেন তখন পুরো জিনিসটাই অন্য রকম হয়ে যায়। প্রথম মন্ত্রে বলছেন –

রাত্রী ব্যখ্যাদায়তী পুরুত্রা দেব্যক্ষভিঃ।
বিশ্বা অধি শ্রিয়োঽধিত।।ঋ-১০/১২৭/১।।

সূর্যাস্তের পর রাত্রি এগিয়ে আসছে তাই রাত্রিদেবী *পুরুত্রা দেব্যক্ষভিঃ*, চোখ দিয়ে চারিদিকে এক নজর তাকিয়ে দেখে নিলেন সব কিছু ঠিক আছে কিনা। রাত আসা মানে অন্ধকার ঘনিয়ে আসা, অন্ধকার মাত্রই মানুষের শত্রু। রাত্রিদেবী তাই রাত আসার আগে সবটাই দেখে নিচ্ছেন। রাত্রিদেবী তো কোন সাধারণ একজন নারী নন যে তিনি চারিদিকে ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখবেন! আকাশে চন্দ্রমা থেকে শুরু করে যত তারা নক্ষত্র আছে, তাদের সবার যে আলো সেই আলো দিয়ে তিনি দেখে নিচ্ছেন। *বিশ্বা অধি শ্রিয়োঽধিত*, দেবীর পরিধেয় বস্ত্রসমূহ এবং আভূষণাদি সব অত্যন্ত মনোরম। কিন্তু শক্তির উপাসকরা যখন এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা করেন তখন তাঁরা বলেন – হে মা! তুমিই সেই আদ্যাশক্তি, তুমিই মূলাবিদ্যা। মূলাবিদ্যা, অবিদ্যার মূল, রাত্রিকে এখানে বলছেন অবিদ্যা। তার সাথে বলছে, মা হলেন আদি, সব কিছুর শুরু মা থেকেই আবার তিনিই সব কিছুর শেষ, তিনি সব কিছুর নিয়ন্ত্রিণী, তিনি যেমন সব কিছুকে বন্ধনে রাখেন আবার তিনিই সবাইকে মুক্তি দেন। যাঁর এই বৈশিষ্ট্য তাঁর কাছে প্রার্থনা করে বলছেন 'হে মা! রাত্রি আসছে তুমি আমাদের কাছে এসো, এসে আমাদের রক্ষা কর'। আসলে রাত্রিকাল সবার কাছেই খুব ভয় আর আতঙ্কের। হিংস্র পশুরা শিকারে বেরোয়, পেঁচাগুলো পাখির বাসাতে আক্রমণ করে। জিম করবেট বলছেন, রাত বারোটা থেকে চারটে জঙ্গলে পশুদের কোন রকম চলাফেরা হয় না। যে পশুরা শিকার করে তারাও রাত বারোটার মধ্যে যা শিকার করার করে নেয়। আর যারা সকালে শিকার করে তারাও চারটের পর শিকারে বেরোয়। প্রকৃতিতে এমন একটা ছন্দ বা নিয়ম বেঁধে দেওয়া হয়েছে যে জঙ্গলে বারোটা থেকে চারটে কোন পশুরাই আর চলাফেরা করে না। এই চার ঘন্টা বাঘ, সিংহ, নেকড়ে, চিতা কেউ কাউকে আক্রমণ করে না, এই চার ঘন্টার মধ্যে সমস্ত পশুদের ঘুমটাও নির্বিঘ্নে হয়ে যায়। ঘুমিয়ে সবাই যখন তরতাজা হয়ে গেল, এরপর আবার সবাই নিজের নিজের জীবন যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। কিন্তু রাত্রিবেলা সবাই ঘুমিয়ে আছে, আর সেই সময় সবার উপর যদি আক্রমণ চালায় তাহলে প্রকৃতির পুরো ভারসাম্যটাই নষ্ট হয়ে যাবে। রাত্রিবেলায় প্রকৃতির এই যে ভারসাম্য ঠিক থাকে, এই ঠিক থাকাটা হয় রাত্রিদেবীর জন্য। দ্বিতীয় মন্ত্রে বলছেন –

ওর্বপ্রা অমর্ত্যনিবতো দেব্যুদ্বতঃ।
জ্যোতিষা বাধতে তমঃ।।ঋ-১০/১২৭/২।।

বিশ্বের যত অধোগামী বা নীচু যা কিছু আছে সেখান থেকে শুরু করে ঊর্ধ্বমুখী যা কিছু আছে সেই পর্যন্ত রাত্রিদেবী ব্যাপ্ত হয়ে আছেন। আর যেখানেই অন্ধকার সেখানেই সেই রাত্রিদেবীর জ্যোতি পৌঁছে গিয়ে সেই অন্ধকারকে নাশ করে দেন। এই জ্যোতি এমনি কোন জ্যোতি নয়, এটা রাত্রিদেবীর জ্যোতি। এই মন্ত্রকেই শক্তি উপাসকরা এই ভাবে ব্যাখ্যা করেন – *ওর্বপ্রা অমর্ত্য*, যত লোক আছে সব লোকে মা তুমিই ব্যাপ্ত হয়ে আছ। যেখানে বলছেন রাত্রিদেবীর জ্যোতি অন্ধকারকে অপসারিত করে দিচ্ছেন, এর অর্থ করে শক্তির উপাসকরা বলেন – যেখানে অজ্ঞান অন্ধকার সেখানে তুমি জ্ঞানের আলো দিয়ে সেই অজ্ঞান অন্ধকারকে নাশ করে দাও। ওখানে বলছেন রাত্রের যে অন্ধকার সেই অন্ধকারকেও তারাকারাজি আর চন্দ্রের আলো দিয়ে

রাত্রিদেবীই সরিয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু শক্তির উপাসকরা এর অর্থ করছেন জীবের মধ্যে যে গভীরতম অজ্ঞানের অন্ধকার সেই অন্ধকারকে রাত্রিদেবী অর্থাৎ মা কালী জ্ঞানের জ্যোতি দিয়ে সরিয়ে দেন।

নিরু স্বসারমস্কৃতোষসং দেব্যায়তী।
অপেন্দু হাসতে তমঃ।।ঋ-১০/১২৭/৩।।

বেদের ভাষ্যানুযায়ী এর ব্যাখ্যা করলে এই ভাবে দাঁড়ায় – রাত্রিদেবী যেমন যেমন এগিয়ে আসেন ঠিক তেমন তেমন ঊষাদেবীও অগ্রসর হন। ঊষাদেবী আগমনের সাথে সাথে এই অন্ধকার পুরোপুরি চলে যাবে। এই মন্ত্রকেই আবার অন্য ভাবে ব্যাখ্যা করে বলছেন, মা! মুক্তি একমাত্র তুমিই দিতে পার। রাত্রির অন্ধকারের মত অজ্ঞান অন্ধকার আছে, রাত্রিদেবী এগিয়ে এলেন আর তারকা, চন্দ্রের আলো এসে গেল, এগুলো যেন জ্ঞানেরই আলো। এই জ্ঞানের আলো যখন আসতে শুরু হয়ে গেল এরপরেই আসবে মুক্তির প্রকাশ। রাত্রিদেবীর পরেই ঊষার আগমন, ঊষা মানেই সূর্যের আবির্ভাব, সূর্য মানেই মুক্তির প্রকাশ। আমরা যে এই অজ্ঞান অন্ধকারে পড়ে আছি, এখান থেকে বেরিয়ে আসার একটাই পথ মুক্তির প্রকাশ। সে প্রকাশ কিভাবে আসবে? জ্ঞানের আলোর মাঝখান দিয়ে যে রাস্থা সেই পথ ধরেই মুক্তি প্রকাশ এগিয়ে আসবে। রাতের আলো বললে আমাদের কাছে খুব বিসদৃশ লাগতে পারে, কিন্তু রাত্রিদেবীকে যে অর্থে তাঁরা বলছেন তা হল রাতের পরিষ্কার আকাশে যে নক্ষত্ররাজির কিরণ শোভা আর তার সাথে চন্দ্রিমার যে স্নিগ্ধ আলো এই আলো যেন এগিয়ে আসছে, এই আলো যেন জ্ঞানরাশি। এই জ্ঞানরাশির পরেই আসে আত্মজ্ঞানের প্রকাশ। ঊষার আলোই যেন আত্মজ্ঞানের প্রকাশ হয়ে এগিয়ে আসছে। পরের মন্ত্রে আবার বলছেন –

সা নো অদ্য যস্যা বয়ং নি তে যামন্নবিক্ষ্মহি।
বৃক্ষে ন বসতিং বয়ঃ।।ঋ-১০/১২৭/৪।।

বেদের অনুবাদে বলছেন – হে রাত্রিদেবী! আপনি আমাদের উপর প্রসন্না হয়েছেন। আপনি কৃপা করে যখন এসেছেন আমরা তখন আমাদের ঘরে প্রবেশ করে গেলাম, যেভাবে পাখিরা সন্ধ্যেবেলা তাদের বাসায় ফিরে যায়। শক্তির উপাসকরা বলছেন, মা! তোমার করুণা যেন আমাদের জন্য আশ্রয় হয়। সন্ধ্যে হলে পাখিরা যেমন নিজেদের বাসায় ফিরে যায়, ঠিক তেমনি এই সংসার অনলে দগ্ধগ্রস্ত আমরা যেন তোমার করুণাতে আশ্রয় পাই। এখানে তিনটে উপমা নিচ্ছেন, পাখিরা যেমন সন্ধ্যেবেলা বাসায় ফিরে আসে, সেটাকে বলছেন রাত্রি হয়েছে তাই আমরা এখন বাড়ি ফিরে এসেছি। কিন্তু এত সহজ কথা তো বেদ বলবে না, বেদের কথাকে আরও গভীর হতে হবে। সেটাকেই এনারা এইভাবে দেখছেন – হে আদ্যাশক্তি রূপিণী মা! তোমার এই যে করুণা, যখন তুমি রাত্রিদেবীর মত কারুর দিকে এগিয়ে এলে আমরা যেন তোমার সেই করুণায় আশ্রয় পাই, যেভাবে রাত্রিদেবী এগিয়ে এলে আমরা সবাই বাসায় ফিরে যাই।

নি গ্রামাসো অবিক্ষত নি পদ্বন্তো নি পক্ষিণঃ।
নি শ্যেনাসশ্চিদর্থিনঃ।।ঋ-১০/১২৭/৫।।

রাত্রিদেবীর আগমনে গ্রামের সবাই নিজের নিজের ঘরে ঢুকে গেছে, বনে যত হিংস্র পশু আছে তারাও নিজ নিজ আস্তানাতে আশ্রয় নিতে ঢুকে গেছে, গবাদি পশু, পাখি, কীটপতঙ্গ, কাজে কর্মে যারা বাইরে বেরিয়েছিলেন, এমনকি শ্যেন, গৃধ্র পাখিরা সবাই যার যার বাসায় ঢুকে গিয়ে এবার সুখে নিদ্রা যাবে, হে দেবী! আমরাও যেন তোমার আশ্রয় পাই। এই ধরণের মন্ত্র যে কেউ শুনলে মনে করবে কোন কবির কবিতা। যতক্ষণ এই মন্ত্রকে প্রার্থনা রূপে না দেখা হয়, এর গভীর আধ্যাত্মিক সত্যকে না দেখার চেষ্টা হবে ততক্ষণ কবিতার মতই লাগবে। রাত্রিসূক্তম্ ঋগ্বেদের খুব বিখ্যাত মন্ত্র আর ঋগ্বেদের মন্ত্র মানেই স্তুতির জন্য যজ্ঞে অবশ্যই ব্যবহার হবে। শক্তির উপাসকরা এই মন্ত্রকে দেখাচ্ছেন, মা আমরা যেন তোমার আশ্রয় পাই। মা! আমরা যেন তোমার আশ্রয় পাই, এই ভাবটা খুব ভালো করে বোঝা দরকার।

যাবয়া বৃক্যং বৃকং যবয় স্তেনমূর্ম্যে।
অথা নঃ সুতরা ভব।।ঋ-১০/১২৭/৬।।
উপ মা পেপিশত্তমঃ কৃষ্ণং ব্যক্তমস্থিত।
উষ ঋণেব যাতয়।।ঋ-১০/১২৭/৭।।
উপ তে গা ইবাকরং বৃণীষ দুহিতর্দবঃ।
রাত্রি স্তোমং ন জিগ্যুষে।।ঋ-১০/১২৭/৮।।

বলছেন, হে রাত্রিময়ী দেবী তুমি চিৎস্বরূপা! আমাদের মনে যত রকমের বাসনা এগুলো হল বাঘ, বাঘ যেমন তার শিকারকে ছিন্নভিন্ন করে ভক্ষণ করে নেয়, তেমনি শত শত বাসনা আমাদের জীবনকে ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে, তুমি আমাদের এই পাপরূপ বাসনার বাঘেদের থেকে রক্ষা কর। যে উদগ্র কাম আমাদের বিবেক বুদ্ধিকে হরণ করে নেয়, সেই তস্কররূপ কাম আমাদের মন থেকে দূর করে দাও আর আমাদের সংসার সাগর থেকে উদ্ধার কর, কারণ তুমিই একমাত্র মোক্ষদায়িনী। তারপর উষাকে বলছেন রাত্রীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তুমি যেমন তোমার ভক্তকে ধনসম্পদ দিয়ে তাকে ঋণমুক্ত হওয়ার সুযোগ করে দাও, ঠিক তেমনি আমার চারিদিকে যে গাঢ় অন্ধকারময় অজ্ঞানতা উপস্থিত হয়েছে জ্ঞানদান দ্বারা এই অজ্ঞানকে সরিয়ে দাও। হে রাত্রিদেবী! তুমি অসামন্যা দেবী! কারণ সেই সর্বব্যাপী পরমাত্মারই তুমি কন্যা। তোমাকে প্রসন্ন করার জন্য আমরা তোমার কাছে এসে তোমার স্তুতিজপাদি করছি। তোমার কৃপায় আমরা কামাদি শত্রুকে জয় করেছি। তুমি স্তোমরূপ আমাদের প্রদত্ত এই হবিষ্যও কৃপা করে গ্রহণ করে আমাদের ধন্য কর।

আমরা যে কাজই করি না কেন, সব কাজের মধ্যে যদি আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গী না থাকে তাহলে কিন্তু জীবনে আমাদের অনেক দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হবে। পরের দিকে গীতাতেও সব রকম কর্মকে যে যজ্ঞ রূপে দেখার কথা বলা হয়েছে, তার পেছনেও একটাই উদ্দেশ্য, আধ্যাত্মিকতার বাইরে কিছুই নেই।

এখানে বলছেন, মা! তোমার যে করুণা, সেই করুণার আশ্রয় যেন আমরা পাই। যে কোন মানুষের প্রকৃত শান্তি আধ্যাত্মিকতা ছাড়া হয় না। একজন খুব মজা করে বলতেন, গৃহস্থ গৃহস্থকে দেখে জ্বলছে, গৃহস্থ সন্ন্যাসীকে দেখে জ্বলছে, সন্ন্যাসী সন্ন্যাসীকে দেখে জ্বলছে আর সন্ন্যাসীরা গৃহস্থকে দেখে জ্বলছে। যিনি এই কথা বলছেন তিনি মজা করেই বলছেন। কিন্তু বাস্তবিক এটাই আমাদের সবার সাধারণ সমস্যা। আমরা সবাই মনে করছি অন্যরা আমার থেকে যেন বেশি সুখী। একটু নাড়াচাড়া করলে দেখা যাবে আমরা সবাই কোন না কোন ভাবে দুখী। আসলে সংসারের সবটাই ভাসা ভাসা, সবটাই উপর উপর দিয়ে চলে। আচার্য শঙ্কর তো আরও কড়া ভাষায় বলছেন, সংসারে সুখের গন্ধটুকুও নেই। একটা মজার গল্প আছে, আগেকার দিনে জাহাজে করে পদ্মানদী পার হতে হত। জাহাজে মাঝিদের কাছে দু রকম দামে মাছ-ভাত পাওয়া যেত, একটা হয়তো চার টাকা আরেকটা হয়তো এক টাকা। মাছভাতের দু রকম রেট কেন জিজ্ঞেস করলে মাঝিরা বলত – মাছটা চুইষ্যা খাইবেন, না চিবাইয়া খাইবেন। মাছটা চুষে খাওয়া মানে, মাছকে চুষে নিয়ে ছেড়ে দিতে হবে, ওটাই আবার আরেকজন খদ্দেরকে দেওয়া হবে। চার টাকার রেটে মাছের টুকরোটাকে চিবিয়ে চিবিয়ে খেতে পারবে। যে চুষে খাচ্ছে মাছের গন্ধেই তার এক থাল ভাত উঠে যাবে। কিন্তু সংসারে সুখের গন্ধেরও লেশ মাত্র নেই।

আরেকটা মজার গল্প আছে। পূর্ববঙ্গের চট্টগ্রাম জেলার একটি মেয়ের বিয়ে হয়েছে এক বৈষ্ণব পরিবারে। চট্টগ্রামের লোকেদের মাছা ছাড়া ভাত মুখ দিয়ে যাবেই না। সেই মেয়ের দুর্ভাগ্যবশতঃ বিয়ে হয়েছে বৈষ্ণব বাড়িতে। মেয়েটি এখন খাবে কি দিয়ে! মেয়েটির মা আসবার সময় শুটকি মাছ গুড়ো করে একটা কৌটো করে সঙ্গে দিয়ে দিয়েছে। খাওয়ার সময় আড়ালে একটু করে গুড়ো খাবারের মধ্যে ছিটিয়ে দিত। একদিন শাশুড়ি ছিল না, নতুন বউকে বলেছে রান্না করতে। রান্না করার সময় সে পাউডারটা তরকারিতে মিশিয়ে দিয়েছে। বাড়িতে সবাই সেই রান্না খেয়ে খুব খুশী। সবাই বলছে বউমা ছাড়া আর রান্না হবে না। শাশুড়ি গেছে খেপে। বউমাকে ধরেছে, তুমি এমন কি করেছ যে সবাই তোমার রান্নায় পঞ্চমুখ। তখন খোঁজ নিয়ে জানতে পারল বউমার কাছে একটা ডিব্বা আছে যাতে শুটকি মাছের গুড়ো রাখা আছে। সেখান থেকে

একটু ছিটিয়ে দেয় আর তার গন্ধেই সবাই তৃপ্তি করে খেয়ে নেয়। যাই হোক স্ক্যাণ্ডাল ধরা পড়ে গেছে, তারপর যা হবার তা হয়েছে। বৈষ্ণব পরিবারে শুটকি মাছ খাওয়ানো! আসলে তাই, খাওয়া-দাওয়া থেকে শুরু করে জীবনে আমাদের যা কিছু আছে সবটাই শুষ্ক। শুষ্কতাকে সতেজ করার জন্য আমরা সবাই একটু করে শুটকির গুড়ো ছিটিয়ে দিচ্ছি। ওই গন্ধেই জীবন চলে যাচ্ছে। জীবনে এছাড়া আর কিছু নেই। শান্তি আসে একমাত্র আধ্যাত্মিকতায়। আগেকার দিনে জীবনের সব কিছুই আধ্যাত্মিকতার দৃষ্টিতে দেখা হত। বিয়ের পর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে সম্পর্ক তৈরী হবে সেটাও আধ্যাত্মিকতার ভাব দিয়ে তৈরী হত। জীবনে যা কিছু আসছে সব ঈশ্বরের ইচ্ছায় আসছে, যেটা চলে যাচ্ছে সেটাও তাঁর ইচ্ছাতে চলে যাচ্ছে। এই ভাব থাকার জন্য জীবনের সব কিছুই গ্রহণযোগ্য ছিল, যেমনটি আছে তেমনটি গ্রহণ করে নেওয়াই আধ্যাত্মিকতা। মা আছেন আর মায়ের করুণায় আছি এই ভাব না আসা পর্যন্ত সব কিছুকে গ্রহণ করার শক্তি জাগ্রত হবে না। রাত্রিসূক্তমে বলছেন, রাত্রিদেবীর আগমনে সবাই নিজের নিজের বাসায় ফিরে এসেছে। কেউ বলতে পারে, দিনের আলো তো জ্ঞানের আলো, সেই জ্ঞানের আলো থেকে সবাই এখন অন্ধকারের বাসায় ফিরছে। না তা নয়, উপমা সব সময় একদেশীয় হয়। একটা গান আছে, কাজ ফুরালে সন্ধ্যাবেলায় মা নেবেন কোলে। এই গানেও সেই একই ভাব, সারা জীবন কাজ করার পর বয়স হয়ে যাওয়ার পর যখন আর কিছু করার ক্ষমতা থাকবে না, তখন মা যেন আমাকে কোলে তুলে নেওয়ার জন্য অপেক্ষা করে বসে আছেন। এই ভাব, যখন মায়ের আশ্রয়ে চলে যাব তখনই প্রকৃত শান্তি। আমাদের ভেতরে যে বিভিন্ন রকমের জ্বালা, কামনা-বাসনার জ্বালা, এই জ্বালা জুড়াবার জন্য একটাই জায়গা, মায়ের কোল। মা! শান্তি একমাত্র তোমার কাছেই পেতে পারি। তোমার কাছ থেকেই আমার জ্ঞানের আলো আসবে আর সেই জ্ঞানের আলো আসার পর তোমার কৃপাতেই আমরা মুক্তির আনন্দ পাব। দূর্গাসূক্তমের একটি মন্ত্রে বলছেন –

জাতবেদসে সুনবাম সোমমরাতীয়তো দহাতি ব্যাদঃ।
স নঃ পর্ষদতি দুর্গাণি বিশ্বা নাবেব সিন্ধুং দুরিতাত্যগ্নিঃ।।ঋ-১/৯৯/১।।

মা দূর্গার যে ধারণা আমাদের পরম্পরাতে গড়ে উঠেছে এই মন্ত্র থেকেই সেই ভাব তৈরী হয়েছে। দূর্গা দুর্গতিহারিণী, যিনি এই দুর্গম সাগরের পারে নিয়ে চলে যান এই ধরণের সব কথা এই মন্ত্রকে আধার করেই সৃষ্টি হয়েছে। অথচ মন্ত্রে অগ্নির প্রতি স্তুতি করা হচ্ছে। অগ্নির একটি নাম জাতবেদসে। সায়নাচার্য জাতবেদসের অনেকগুলি অর্থ করেছেন। জাতবেদসের একটা অর্থ, যারা জন্ম নিয়েছে তাদের সবাইকে যিনি জানেন। অগ্নি সবাইকে জানেন কারণ সব কিছুতেই অগ্নি আছে। জাতবেদসের দ্বিতীয় অর্থ, যারাই জন্ম নিয়েছে তাদের যা কিছু সম্পদ, বিদ্যা সম্পদ, অর্থ সম্পদ সব সম্পদ তিনিই দেন।

সোমরস তৈরী করার জন্য সোমলতাকে পিষে ভেড়ার লোমের কাপড় দিয়ে ছেঁকে নেওয়া হত। *সুনবাম্* শব্দের অর্থ, এই যে সোমরস আমরা অগ্নির জন্য তৈরী করেছি, এই সোমরস অগ্নিকে আমরা অর্পণ করছি। অগ্নিকে যে আমরা সোমরাস অর্পণ করছি, অগ্নি তার জন্য কী করবেন? খুব সুন্দর বলছেন *সুনবাম্ সোমম্ অরাতীয়তো*, *অরাতীয়তোর* অর্থ, যারা আমাদের প্রতি বন্ধুত্বের ভাব রাখে না, যারা আমাদের শত্রু, যারা আমাদের অশুভ কামনা করে অগ্নি যেন তাদের *দহাতি ব্যাদঃ*, যা কিছু তাদের আছে, প্রজ্ঞা, বিদ্যা, টাকা-পয়সা সব কিছুকে দহন করে নাশ করে দেন। অগ্নিই সব কিছু দেন, তাই বলে সব সময় ভালো কিছু চাইতে হবে তা নয়, যারা আমাদের শত্রু তাদের অমঙ্গলটাও তো চাইতে হবে।

একটা গল্প আছে, একজন শিবের খুব তপস্যা করেছে। শিব খুশি হয়ে বললেন, তুমি যা চাইবে সব পেয়ে যাবে, তবে একটা শর্ত আছে, তোমার যা যা ভালো হবে তোমার প্রতিবেশীর সেই ভালোটাই দ্বিগুণ হয়ে যাবে। বেচারী প্রথমে না বুঝে বলে দিয়েছে আমার টাকা-পয়সা লাগবে, পাশের বাড়ির লোকটির তার দ্বিগুণ টাকা-পয়সা হয়ে গেছে। সে বলল আমার দোতালা বাড়ি চাই। দোতালা বাড়ি হয়ে গেল, অন্য দিকে পাশের বাড়ি চারতলা হয়ে গেছে। তখন সে ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বলল আমার বাড়ির সামনে একটা কুয়ো হয়ে যাক, পাশের বাড়ির সামনে দুটো কুয়ো হয়ে গেল। তাতেও লোকটির শান্তি নেই। সে তখন বলল আমার

একটা চোখ কানা হয়ে যাক। কিন্তু পাশের বাড়ির লোকটির তো দুটো চোখ যাবে না। এর যেটা একটা থাকবে পাশের বাড়িতে দুটো থাকবে। লোকটির এখন একটা চোখ থাকল পাশের বাড়ির লোকটির দুটো চোখই থেকে গেল। শুধু নিজের ভালো হলেই মানুষ শান্তি পায় না। আপনি খুবই ভালো লোক কোন সন্দেহ নেই, আপনার মধ্যে হয়তো একটু আধ্যাত্মিক চেতনার উন্মেষ হয়েছে, সবই ঠিক আছে মানছি। কিন্তু আপনার যিনি সমকক্ষ, খুবই কাছের লোক, তার যদি একটা অবস্থা থেকে মারাত্মক ভালো কিছু হয়ে যায়, আপনার আর কিন্তু সহ্য হবে না। যদি দেখেন আপনার সহ্য হয়ে যাচ্ছে তাহলে বুঝতে হবে আপনার মাথায় কিছু গণ্ডগোল আছে। কারুর মধ্যে একটুও যদি ঈর্ষার ভাব না থাকে তাহলে তার মধ্যে মারাত্মক ধরণের গোলমাল থাকতে বাধ্য। ঈর্ষা খারাপ জিনিস নয়, ঈর্ষা মানেই আপনার মধ্যে একটা অসন্তোষ আছে, অসন্তোষ মানেই এই অসন্তোষ সব সময় ঠেলা মেরে আপনাকে বাধ্য করছে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে। আপনার মধ্যে ঈর্ষা নেই মানে আপনি পাথর হয়ে গেলেন। আমাদের একটা ভুল ধারণা যে আমরা সবাই মনে করছি আমার মধ্যে কোন ঈর্ষা নেই। স্বামীজী বলছেন, দেখো ভাই! আমার মধ্যে যে দুর্গুণই থাকুক না কেন হিংসে আমার মধ্যে নেই।

কখন আপনার হিংসে হবে না? যখন আপনার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী থাকবে না। যখন মানুষ জয়ী হয়ে যায় তখন তার হৃদয়টা বিশাল হয়ে যায়। যে মাটিতে পড়ে আছে তার হৃদয় বিশাল কী করে হবে! হিংসা বা ঈর্ষাকে জয় করার দুটো পথ, প্রথম পথ আপনি যে বিষয়কে নিয়ে এগোচ্ছেন সেই বিষয়ে যদি আপনি শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে নেন আপনার কোন দিন ঈর্ষা হবে না। আপনার কোন প্রতিদ্বন্দ্বীই নেই আপনি কাকে হিংসা করতে যাবেন! স্বামীজী যখন বলছেন তাঁর কোন হিংসা নেই, তিনি কাকে ঈর্ষা করবেন, তাঁর ধারে কাছে তাঁর কোন সমকক্ষ নেই। শ্রেষ্ঠ বক্তা, আধ্যাত্মিক জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ, দেখতে সবার থেকে সুন্দর, কাকে তিনি ঈর্ষা করতে যাবেন! ঈর্ষা করার কোন প্রশ্নই উঠছে না। দ্বিতীয় পথ, যারা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারছে না, তারা কী আর করবে! পাড়ার বাড়িতে আগুন লাগাতে থাকুক। এনারা তাই বলছেন, হে অগ্নি! আমি আর পারছি না, *সুনবাম সোমমরাতীয়তো দহাতি ব্যাদঃ*, অগ্নির জন্য আমরা সোমরস তৈরী করছি। কেন অগ্নির জন্য সোমরস তৈরী করছি? *অরাতীয়তো দহাতি ব্যাদঃ*, আমার প্রতি যার বিদ্বেষ ভাব আছে তার সব কিছু দহন হয়ে যাক। মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার শক্তি আসে হিংসা থেকে। এখন কেউ যদি নচিকেতার বাবার গরুর মত হয়ে যায়, *পীতোদকা জগ্ধতৃণা দুগ্ধদোহা নিরিন্দ্রিয়াঃ*, জল খাওয়া হয়ে গেছে, ঘাস খাওয়া হয়ে গেছে, দুধ দেওয়া হয়ে গেছে, বাচ্চা দেওয়া হয়ে গেছে, তাই বলে কি তার মধ্যে হিংসা থাকবে না? পুরোদমে থাকবে। একটা বুড়ি যদি আরেকটা বুড়িকে দেখে, আর তাকে যদি দামী শাড়ি পরে থাকতে দেখে তখন জিজ্ঞেস করবে, তুমি এই শাড়ি দানে পেয়েছ নাকি বৌমা দিয়েছে? ভেতরে ভেতরে জ্বলন হচ্ছে, গায়ের জ্বালা মেটাবার জন্য জানতে চাইছে। এখন উনি যদি এই মন্ত্র পাঠ করতে থাকেন *জাতবেদসে সুনবাম সোমমরাতীয়তো দহাতি ব্যাদঃ*, দামি শাড়িতে এবার আগুন লেগে যাবে। কিন্তু সমস্যা হল এখানে বলছেন অগ্নিকে সোমরস দেব, সোমরস এখন পাবেন কোথায়! যারা পাঠ করে তারা তো আর সোমরস দিতে পারে না, শুধু পাঠ করে যায়। কিন্তু বেদের মন্ত্রে যদি যজ্ঞ না করা যায় তাহলে সেই মন্ত্র জপের মত পাঠ করে প্রার্থনা করে যায় তাতেই যজ্ঞের ফল হয়ে যাবে। এখানে বেদ তিনটে অর্থেই হয়, জ্ঞানের অর্থে হয়, সম্পদের অর্থে হয়, জানার অর্থে, প্রজ্ঞার অর্থে হয়, *দহাতি ব্যাদঃ*, মানে ওর সব কিছুই দহন করে দাও, ওর টাকাটাও যেন না থাকে, বিদ্যাবুদ্ধিও যেন না থাকে, সম্মানও যেন না থাকে, সবটাই পুড়িয়ে দাও।

আমার শত্রুর তো সব দহন করে দিতে বলা হল, উল্টে অগ্নি আমার জন্য কী করবেন? *স নঃ পর্ষদতি দুর্গাণি বিশ্বা নাবেব সিন্ধুং দুরিতাত্যগ্নিঃ*। দুর্গাণি শব্দের অর্থ করেছেন, দুঃখ কষ্ট থেকে ত্রাণ করেন যিনি। সায়নাচার্য দুঃখ-কষ্টকে ব্যাখ্যা করে বলছেন, পাপ হল দুঃখের হেতু। তার মানে, আপনি যদি পাপ করে থাকেন তাহলে আপনার দুঃখ হবে। যেখানেই দুঃখ বুঝতে হবে সেখানেই পাপ আছে। মানুষের অনেক কিছুর অভাব থাকতে পারে, টাকা-পয়সার অভাব থাকতে পারে, মান-সম্মানের অভাব থাকতে পারে কিন্তু অভাব থেকে দুঃখ হবে না। গরীবের মুখেও হাসি দেখা যায় আবার ধনীলোকের মুখেও বিষাদের ছায়া পড়ে। দুঃখ আর অভাব দুটো জিনিসই আলাদা। কালো কাপড়ে কালি লাগলে বোঝা যায় না, কাপড় কাচার সময় বোঝা

যায়। কিন্তু সাদা কাপড়ে একটু কালির ফোঁটা লাগলে দূর থেকেই বোঝা যাবে। ভালো মানুষ কোন পাপ কাজ করার পর তার চেহারায় যে ছাপ পড়ে সেটা দূর থেকেই বোঝা যাবে, আর যারা গোলমেলে তাদেরও বোঝা যাবে কিন্তু দেরীতে। কাপড় আজ হোক কাল হোক একদিন কাচতে তো হবে, তখন সব কালি বেরিয়ে আসবে। পাপ না হলে কক্ষণ দুঃখ হবে না। ভিখারী ভিক্ষা করতে গেলে সবাইকে তার দুঃখের কথাই শোনায়, সন্ন্যাসী সেও ভিখারী কিন্তু সন্ন্যাসীর মনে কোন দুঃখ নেই। যারই চোখে জল তারই পাপ আছে বুঝতে হবে। এর কোন ব্যতিক্রম হবে না। চোখের জল মানেই পাপ। শ্রীমাকে একজন বলছিলেন – মা! আশীর্বাদ করুন ঠাকুরের নাম করতে করতে যেন পাগল হয়ে যেতে পারি। তাকে শ্রীমা বলছেন 'সে কি বাবা! কত পাপ করলে মানুষ পাগল হয়'। দুঃখ জিনিসটা আপনাকে মারতে মারতে এমন করে দেবে যে একটা সময় আপনাকে পাগল করে দেবে। যখন মানুষ খুব দুঃখের মধ্যে থাকে তখন সে আবার পাপ করবে। তার মানে, পাপের জন্য মানুষ দুঃখে পড়ে, আর ওই দুঃখের জন্য সে আবার পাপ করে। পাপ আর দুঃখের এই vicious cycle চলতেই থাকবে। এর খুব জ্বলন্ত উদাহরণ হল, একজন লোক নিজের বাচ্চাকে খুব ভালোবাসে। এখন তার পাপকর্মের জন্য এমন এক পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে আছে যেটাকে সে মেনে নিতে পারছে না, টাকা-পয়সা কম থাকলে যা হয়। আগেকার দিনে ছেলেমেয়েদের হাতে পয়সা কম থাকলে এমন কোন মারাত্মক কিছু হয়ে যেত না, বেশি কিছু চাইতে গেলে বাবা-মায়েরা এক চড় মেরে দিতেন। এখন পরিস্থিতি পাল্টে গেছে, কিছু বললে গলায় দড়ি দিয়ে দেবে। লোকটিরও দুঃখ ছেলেকে আমি কিছুই দিতে পারছি না। তখন ভাবলো আমার হাতে তো ক্ষমতা আছে, ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে কিছু টাকা ঘুষ নিতে শুরু করি। দ্রোণাচার্য বললেন, অস্ত্রবিদ্যা আমার চাই। এই পর্যন্ত ঠিকই ছিল। কিন্তু তারপর দেখলেন অর্থের অভাবে সন্তানের দুধ জোগাড় করতে পারছেন না। তখন তিনি অন্য ধর্ম গ্রহণ করলেন। অস্ত্রবিদ্যা একটা বিদ্যা, আমি এই বিদ্যা অর্জন করতে চাই, এ পর্যন্ত ঠিকই ছিল। কিন্তু সন্তানের দুঃখে নিজের ধর্ম ত্যাগ করে এক ক্ষত্রিয়ের দাসত্ব গ্রহণ করে পয়সা রোজগার করতে নেমে পড়লেন। ক্ষত্রিয়ের টাকা গ্রহণ করে নিজের ঐশ্বর্য বাড়াতে নেমে পড়ল, এবার পাপে ফেঁসে গেল। এখানে প্রার্থনার মধ্যে একটা হল নিজের যেন ধন-সম্পদ হয় কিন্তু দ্বিতীয়টি হল আমার পাপকর্ম থেকে আমি যেন বাঁচতে পারি। গায়ত্রী মন্ত্রও তাই, *ভর্গো দেবস্য ধীমহি*, প্রথমে বলছেন আমাদের যেন প্রচুর অন্ন হয়, দ্বিতীয় বলছেন আমি পাপ থেকে যেন মুক্তি পাই। প্রার্থনা, যজ্ঞাদি বা প্রায়শ্চাদির মত যত ধর্মীয় কর্ম করা হয় এই দুটো জিনিস সেখানে থাকে, একটা হল আমার যেন ধন সম্পদ প্রাপ্তি হয় আরেকটা হল এই দুঃখ থেকে যেন আমি বেরোতে পারি। বাচ্চা ছেলে কোন দোষ করলে আপনি যদি তাকে মারেন একটু কাঁদবে ঠিকই, কান্না থামতে না থামতে আবার ওই একই দোষ করবে। কারণ তার মধ্যে পাপ বোধ নেই। আমার জীবন যে দুঃখের সমুদ্রে নিমজ্জ হয়ে আছে এই সমুদ্র থেকে আমাকে পার কর। বড় হতে হতে তার ভেতরে পাপ বোধটা বাড়তে থাকে, পাপ বোধ বেড়ে যায় বলে পাপ করলে ভেতরে প্রচুর দুঃখ জমতে শুরু করে।

এই কথাই বলছেন, *স নঃ পর্ষদতি দুর্গাণি বিশ্বা নাবেব সিন্ধুং দুরিতাত্যগ্নিঃ*, হে অগ্নি! আমার যা দুষ্কর্ম, আমার যত পাপ, যে আমাকে দুঃখ দিচ্ছে, আর যে দুঃখের জন্য সেই পাপের বৃদ্ধি হয়েই চলেছে, এটা থেকে আপনি কৃপা করে পার করে দিন। মন্ত্রে যে দুর্গাণি শব্দ এসেছে পরে এই দুর্গাণি শব্দ থেকেই দুর্গার ধারণা তৈরী হয়ে আজকে যে দুর্গাদেবীকে আমরা পূজা করি সেই দুর্গার সৃষ্টি হয়ছে। সেখানেও একই জিনিস বলা হয়, সংসার রূপী যে দুরতিগম্য দুঃখের সাগর, সেই দুঃখের সাগরকে মা দূর্গা আমাদের পার করে দেন। বিষ্ণুর একটা খুব নামকরা মন্ত্র আছে, যে মন্ত্র আমাদের সবারই জানার কথা –

তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।
দিবীব চক্ষুরাততম্।।ঋ-১/২২/১৮।।

পূজাদিতে এই মন্ত্র আবশ্যক, আবার অনেকে সূর্যের সামনে দাঁড়িয়ে বিষ্ণুর প্রণাম মন্ত্র রূপেও ব্যবহার করেন। বিষ্ণুকে বলছেন *সূরয়ঃ*, স্বামীজীর প্রণাম মন্ত্রেও বলা হয় *বিবেকান্দ সূরয়ে*। সূরয়ের অর্থ বিদ্বান, ঋষি। *তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদং*, বিষ্ণুর যে পরমপদ সেই পরমপদ হল স্বর্গ বা পরে যাকে বিষ্ণুলোক বলছেন। গীতা, উপনিষদেও এই পরমপদ কথা অনেকবার এসেছে। ঋগ্বেদেই পরমপদ এসে গিয়েছিল। বলছেন, ঋষিরা,

জ্ঞানিরা বিষ্ণুর ওই পরমপদ সব সময় পরিষ্কার দেখতে পান। কি রকম স্পষ্ট দেখতে পান? *দিবীব চক্ষুরাততম্, দিবী* শব্দকে এখানে আকাশের অর্থে নেওয়া হয়েছে, *দিবী* মানে অন্তরীক্ষ, আকাশে সূর্যের যখন প্রকাশ হয় তখন যদি কোন বাধা না থাকে সূর্যকে পরিষ্কার দেখা যায়। চোখের সামনে কোন রকম বাধা নেই, সূর্যের আলোতে পুরো অন্তরীক্ষকে একেবারে প্রত্যক্ষ দেখা যাচ্ছে, কোথাও কোন সন্দেহ নেই। ঠিক সেই রকম বিষ্ণুর যে পরমপদ জ্ঞানীরা পরিষ্কার দেখতে পান, কোথাও কোন সন্দেহ, সংশয়ের কিছু থাকে না। মজার ব্যাপার হল, ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের মন্ত্র, এই মন্ত্রও যজ্ঞে ব্যবহার হয়। যজ্ঞে ব্যবহার ছাড়া এই মন্ত্রের যেমন প্রার্থনা হয় তেমনি এই মন্ত্রের জপও হয়।

আমি যখন চিন্তা করছি বা প্রার্থনা করছি বা জপ করছি, যে বিষ্ণুর পরমপদ ঋষিরা পরিষ্কার দেখতে পান, তখন ধীরে ধীরে সেই জ্ঞানের অবস্থা বা স্বর্গের বা বিষ্ণুলোকের অস্তিত্ব আমার মনেও ভেসে উঠবে। বিষ্ণুর স্থান সেই পরমপদ, এই পরমপদকে কে কিভাবে নেবেন সেটা তার উপর নির্ভর করছে। কেউ যদি মনে করে পরমপদ মানে স্বর্গ, তাহলে তাই, যদি মনে করে মুক্তি তাহলে তাই বা পরমপদ মানে বিষ্ণুধাম তাহলে তাই হবে। ঋষিরা বিষ্ণুর এই পরমপদ সব সময়ই দেখেন, যে কেউ সেই পরমপদ দেখতে পারে। যার প্রত্যক্ষ হয়ে গেল পরমপদ মানে মুক্তি বা স্বর্গ বা বিষ্ণুলোক, তারপর সে কেন আর ছোট পদে পড়ে থাকবে। বড়কে ছেড়ে ছোটকে কেন নিতে যাবে! এখন তার কাছে পরমপদ হল নিজের বাড়ি, নিজের ঘরসংসার, কিন্তু প্রত্যক্ষ যখন দেখছে পরমপদ বিশাল, এই ক্ষুদ্র বাড়ি কেন হতে যাবে, তখন সে কেন ক্ষুদ্রে পড়ে থাকতে যাবে!

বেদে দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে বিষ্ণুও একজন দেবতা। দেবতা মানে তাঁর সীমাবদ্ধতা আছে, আবার দেবতাদের রাজা হলেন ইন্দ্র। সব দেবতারা ইন্দ্রের অধীনে। তাই দেবতারা দুদিক থেকে মার খেয়ে যাচ্ছেন, একটা হল দেবতারা সীমিত আর দ্বিতীয় কারুর অধীনে। বিষ্ণু দেবতাও সীমিত আর ইন্দ্রের অধীনে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিষ্ণু দেবতার মধ্যে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন তিন পায়ে তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে মেপে নেন। বিষ্ণুর এই অন্যতম বৈশিষ্ট্যই পরে পুরাণে বলিরাজার কাহিনীতে এসে মিথ্ রূপে দাঁড় করান হয়েছে। মন্ত্র আগে এসেছে মিথ্ পরে সৃষ্টি হয়েছে –

ত্রীণি পদা বি চক্রমে বিষ্ণুর্গোপা অদাভ্যঃ।
অতো ধর্মাণি ধারয়ন্।।ঋ-১/২২/১৮।।

ত্রীণি পদা বি চক্রমে, বিষ্ণুর তিনটে পা কিন্তু মজার ব্যাপার সবাই বিষ্ণুর দুটি পাই দেখতে পায়। কারা দুটি পা দেখতে পায়? মানুষরা দেখতে পায়, অসুররা দেখতে পায়, দেবতারা দেখতে পায়, বিষ্ণুর তৃতীয় পা কেউ দেখতে পায় না। এই জিনিসটাই পরে পুরাণে কাহিনীর রূপে নিয়ে আসা হল, বলি রাজা যজ্ঞ করছে আর প্রচুর দান করছিল। বিষ্ণু সেখানে বামন রূপ ধারণ করে এসেছেন। বলিরাজ বামনকে দান দেবেন। তিনি জিজ্ঞেস করেছেন আপনাকে আমি কি দান করব? তখন বামন রূপী বিষ্ণু বললেন আমি মাত্র তিন পাদ জমি চাইছি। বলিরাজ দিয়ে দিলেন। প্রথম পা দিয়ে বিষ্ণু পৃথিবী লোক আর দ্বিতীয় পা দিয়ে অন্তরীক্ষলোক ঢেকে দিলেন এবার তৃতীয় পা কোথায় রাখবেন বিষ্ণু বলিরাজকে জিজ্ঞেস করেছেন। বলিরাজ বললেন, আমার মাথায় রাখুন। কারণ বিষ্ণুর তৃতীয় পাদ কেউ দেখতে পায় না। বিষ্ণুর এই যে বৈশিষ্ট্য, তিনি লম্বা পা দিয়ে সব কিছু মেপে নিতে পারেন সেইজন্য বিষ্ণুর বেশ কয়েকটি নাম আছে। তার মধ্যে একটি নাম উরুগায়, বিরাট শরীর নিয়ে তিনি লম্বা পা দিয়ে সব কিছুকে মেপে নিতে পারেন। বিরাট শরীর না হলে লম্বা পা হবে না, তাই শরীরটাও তিনি বিশাল করে নেন তাই বিষ্ণুর আরেকটি নাম উরুক্রম। এই রকম ক্ষমতা দেবতাদের রাজা ইন্দ্রেরও নেই। সেইজন্য যখনই সেই রকম কোন দরকার হলে, বিশাল আকৃতি ধারণ করতে হবে, দরকার হলে আকৃতিকে ক্ষুদ্র করতে হবে তখন বিষ্ণুকে সেই কাজে লাগিয়ে দিতেন। পরের দিকে বাল্মীকি রামায়ণে বিষ্ণুকে যখন বলা হল তাঁর শক্তিতে দশরথের পুত্র রাম হয়ে জন্ম নিতে তখন সেখানে বিষ্ণু কিন্তু ভগবান নন। পরের দিকে পৌরাণিক রচনাদি শুরু হওয়ার পর তাঁরা দেখলেন বিষ্ণুর ক্ষমতা অনেক সীমিত, এই সীমিতকে দিয়ে অনন্তকে দেখানো যাবে না। বিষ্ণু দেবতা অনেক আগে থেকেই আছেন আর বিষ্ণুর কোন রকম কুকীর্তি

ছিল না, তাছাড়া দুটো পা দিয়ে পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে তিনি মেপে নিচ্ছেন, ব্যাপারটা খুব শক্তিশালী মনে হয়, তাই পরে তাঁকেই অনন্তের রূপ দিয়ে সবার আগে নিয়ে এলেন।

বিষ্ণুর্গোপা অদাভ্যঃ, বিষ্ণুর কেউ কোন রকম ক্ষতি করতে পারে না। তার সাথে তিনি *অতো ধর্মাণি ধারয়ন্*, তিনি সব কিছুকে ধারণ করে আছেন। ধর্মকে অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি রূপ যত বেদের কর্ম আছে তাকে তিনি ধরে আছেন। বিষ্ণুকে যজ্ঞের অভিমানী দেবতাও হলা হয়। বিভিন্ন জিনিসের যেমন দেবতা আছেন, জলের দেবতা যেমন ইন্দ্র, তেমনি যজ্ঞ জিনিসটার দেবতা হলেন বিষ্ণু। যার জন্য বলা হয় *যজ্ঞবৈ বিষ্ণুঃ*, বিষ্ণুই যজ্ঞ। তাই যজ্ঞের যে ফল সেই ফল বিষ্ণুই দেন, এই ভাবটাই গীতাতে এসে আরও বিস্তার পেয়েছে, যেখানে ভগবান বলছেন *অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্*।

আমরা সবাই জীবনে সাফল্য পেতে চাই। কিন্তু আমরা কি জানি এই সাফল্য কীভাবে আসে? যে কোন কিছুতে সাফল্যের পেছনে থাকে জ্ঞান। সাফল্য নেই মানে জ্ঞানের অভাব। জ্ঞান কীভাবে আসে? To know is to love, to love is to know। তাহলে দাঁড়াল, যদি কোথাও সাফল্য পেতে চাই তাহলে জ্ঞান থাকতে হবে, জ্ঞান পেতে গেলে ভালোবাসা চাই। এখানেই উঠে আসে মূল প্রশ্ন। How do you love? ভালোবাসা জিনিসটা কী? ভালো কী করে বাসবো? আমাদের মধ্যে কেউ নেই যে বলবে আমি ভালোবাসা জানি না। আমরা সবাই বলছি আমি আমার ছেলেকে ভালোবাসি, আমার মেয়েকে ভালোবাসি, ঠাকুরকে ভালোবাসছি। তাহলে কেন আমি সদর্পে বলতে পারছি না যে আমি একজন সফলতম ব্যক্তি? ভালোবাসা থাকলেই জ্ঞান আসবে, জ্ঞান থাকলেই ভালোবাসা আসবে। জীবনে সাফল্য নেই মানে নিশ্চয়ই আমাদের ভালোবাসায় কিছু গোলমাল আছে। আমাদের প্রত্যেক ভালোবাসাতে একটা মারাত্মক গোলমাল হয়ে আছে। আমরা এখানে সাফল্য নিয়ে আলোচনা করছি, সাফল্য মানেই কর্ম, কর্ম মানেই জ্ঞান, জ্ঞান মানেই ভালোবাসা। কর্ম, জ্ঞান ও ভালোবাসা এই তিনটে এক সঙ্গেই চলে। তিনটে এক সঙ্গে চলার জন্য এখানে আবেগের কোন ব্যাপার আসবে না। তাহলে ভালোবাসার কোথায় গোলমাল? আসলে আমাদের ভালোবাসাতে active ভালোবাসার ব্যাপারটাই নেই, আমাদের ভালোবাসা সব সময়ই passive ভালোবাসা। টেলিভিশন দেখা, বই পড়া সব থেকে নামকরা passive ভালোবাসা, ছেলে আর মেয়ের ভালোবাসা এর থেকে passive ভালোবাসা আর কিছু হতে পারে না, এগুলোর থেকে আরও জঘন্য passive ভালোবাসা হল জপ-ধ্যান। আমি যদি বই পড়ি বাড়ির লোক গালাগাল দেবে, কাজকর্ম ছেড়ে এখন নাটক নভেল পড়ছে, টিভি দেখলে গালাগাল দেবে, খেলা দেখলে গালাগাল দেবে আর জপ-ধ্যান করলে সবাই প্রশংসা করবে। যতক্ষণ না active ভালোবাসা হচ্ছে, যেমন এখানে আমরা শাস্ত্রের কথা শুনতে আসছি, আমাদের রজোগুণটা একটু এবার জেগেছে, এই active ভালোবাসা না আসা পর্যন্ত কোন কিছুই জীবনে হবে না। Active ভালোবাসা নেই মানে knowledge নেই knowledge নেই মানে ভালোবাসা নেই, knowledge নেই বলে action হয় না, action হয় না বলে জীবনে কোন success নেই। সমগ্র মানবজাতীর এটাই প্রধান সমস্যা।

এই active ভালোবাসা কীভাবে আসবে? আমার মধ্যে কোন বন্ধন নেই, এই ভাব থেকে। Active ভালোবাসা মানুষকে মুক্ত বিহঙ্গ করে দেয়, active ভালোবাসা কখন বন্ধন তৈরী করে না, পরোক্ষ ভাবে এই active ভালোবাসা জ্ঞানে রূপান্তরিত হয়। আপনি ছেলেকে বা নাতিকে ভালোবাসছেন খুব ভালো কথা, কিন্তু এই ভালোবাসাতে আপনার নতুন কী জ্ঞান আসছে? তার মানে ভালোবাসায় কিছু গোলমাল আছে। নাটক নভেল যখন পড়ছি তখন কিসের জ্ঞান বৃদ্ধি হচ্ছে, খেলা দেখে সিনেমা দেখে কি জ্ঞান হচ্ছে, কিছু তথ্য জমছে জ্ঞান কিছুই বাড়ছে না। আমাদের মধ্যে যাঁরা চিন্তক তাঁদের কাছে অনেকগুলো সমস্যা এসে গেছে, কিছু মানুষ সাফল্য পায় কিছু মানুষ পাচ্ছে না, এটা এক বিরাট বড় সমস্যা। অনেকে বলেন এর মধ্যে কর্মের ব্যাপার আছে। কিন্তু কিসের কর্ম? একই সাথে স্কুলে ঢুকছে, স্কুলে সবাইকে একসাথে পড়াশোনা করান হচ্ছে তাও কেন এই রকম হয়। তখন বলছেন আগের আগের জন্মের কর্মের ফের, এছাড়া আর কোন উপায় নেই। কেউ বলবে ঠাকুরের ইচ্ছা, কেউ বলবে ভাগ্যের ব্যাপার। কেউ বলবে কপালে এই রকমই ছিল। এই চিন্তা আদিমকাল থেকে মানুষকে ব্যতিব্যস্ত করে রেখেছে, কেউ এত সাফল্য কেন পাচ্ছে, কেউ কোন সাফল্য কেন পাচ্ছে না?

কোথাও কষ্ট, কোথাও কষ্টের অভাব, কোথাও সুখ, কোথাও সুখের অভাব এই প্রশ্নগুলি মানুষের চিন্তার জগতে সেই আদিমকাল থেকে আলোড়ন সৃষ্টি করে রেখেছে। এই নিয়ে মনীষীরা নানা রকম চিন্তা ভাবনা করেছেন। বিজ্ঞানীরা চিন্তা করে বললেন এটা চান্স, কট্টর ভক্ত বলছেন ঠাকুরের ইচ্ছাতে হয়, যাঁরা একটু জ্ঞানের দিকে বিচরণ করছেন, যাঁদের নিজেদের উপর একটু আত্মবিশ্বাস জন্মেছে তাঁরা বলছেন যেমন কর্ম করেছে সেই কর্মানুসারেই সব হয়। যদিও বেদে স্তুতি করে বলছেন কর্মফল রূপে আমি যেন সফল হই, কিন্তু সেখান থেকে ধীরে ধীরে কর্মফলের ধারণাটা বিমূর্ত হতে শুরু করেছে। বিমূর্ত মানে, এটা থেকে সরাসরি এটা হয়, এই কর্ম থেকে এই কর্ম হচ্ছে, এই ধারণা থেকে সরে এসে কার্য কারণে চলে এসেছে, দেখলেন কার্য আর কারণে একটা সম্পর্ক আছে। আপনি আপনার সন্তানকে খুব ভালোবাসেন, সন্তানের প্রতি আপনার এই ভালোবাসা খুবই মুর্ত ভালোবাসা। মুর্ত ভালোবাসা যদি হয় তাহলে আপনি সত্যিই খুব ভালো লোক হয়ে গেলেন। সন্তান ছাড়া যে কোন মানুষের প্রতি আপনার ভালোবাসা যদি মুর্ত ভালোবাসা হয়ে যায় তাহলে আপনি সত্যিই একজন ভালো লোক। ছেলের প্রতি এই ভালোবাসাই যখন বিমূর্ত হয়ে যায় তখন ছেলে আর থাকবে না, তখন শুধু ভালোবাসাই থাকবে, তখন আপনি একজন মহৎ।

যে কোন দর্শন শুরু হয় মূর্ত রূপ থেকে। আকাশে কালো মেঘ জমেছে, আমরা জানি এখন ঝড় হবে। যখন বর্ণনা করা হচ্ছে কালো মেঘ জমল তারপর ঝড় হল, এটাই মূর্ত। কিন্তু যখন বলছি কালো মেঘ জমলেই ঝড় হয়, তখন এটাই বিমূর্ত হয়ে গেল। একটা বিশেষ থেকে সেটা সাধারণীকরণ করা হয়। সাধারণীকরণটাই অনেক সময় বিমূর্ত হয়ে যায় তখন ওই সংজ্ঞাটাই সব জায়গায় প্রযোজ্য হয়ে যাবে। কর্ম জিনিসটাই বিমূর্ত। লঙ্কা খেলে ঝাল লাগবে, এটাই বাস্তব। কর্ম আর কর্মফল এই দুটোর একটা সম্পর্ক আছে, এটাই বিমূর্ত। বেদের যজ্ঞে বিশেষ করে মন্ত্র অংশে এই ভাবটা ছিল না। ব্রাহ্মণ অংশে গিয়ে এই ভাবটা ধীরে ধীরে ঢুকে গেছে। সাধারণীকরণ বা বিমূর্তে কিছু কিছু সমস্যা আসে। কিছু কিছু মস্তিষ্ক মূর্তকেই নিতে পারে, অন্য দিকে কিছু কিছু মস্তিষ্ক বিমূর্তকে নিতে পারে। গণিতে দুইয়ে দুইয়ে চার সবাই করতে পারবে কিন্তু গণিতের আরও উচ্চস্তরে সবাই ঢুকতে পারবে না, উচ্চস্তরের গণিতে ঢুকতে গেলে মস্তিষ্ককে অন্য রকম হতে হবে। কিছু দিন আগে নিউইয়র্কে একটা লোককে গুণ্ডারা খুব মারধোর করেছিল। মারধোর করাতে লোকটির মস্তিষ্কের গঠনে কি একটা পরিবর্তন হয়ে গেল তাতে সে রাতারাতি বিরাট গণিতজ্ঞ হয়ে গেল। একদিন দোকানে জ্যামিতির নানা রকম আকৃতি, ডায়াগ্রাম এঁকে রেখেছে, একজন পদার্থ বিজ্ঞানী এসে জিজ্ঞেস করছেন এগুলো কে এঁকেছে। দোকানদার বলছে, আমাদের রাস্থা যে পরিষ্কার করে সে এঁকেছে। লোকটি অতি সাধারণ লোক, রাস্থা দিয়ে যাচ্ছিল গুণ্ডারা ছিনতাই করতে এসে ওকে পিটিয়ে দিয়েছে তাতে মাথায় একটু চোট লেগেছে, সেখান থেকে মস্তিষ্কের কাঠামোতে কিছু একটা পাল্টে যেতে সে এখন গণিতজ্ঞ হয়ে গেছে। সেই পদার্থ বিজ্ঞানী বলছেন, বড় বড় গণিতজ্ঞরাও এই ধরণের জিনিস আঁকতে পারবে না। বিজ্ঞানী লোকটিকে ধরে এনে বললেন, চলো তোমাকে একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়ে দিচ্ছি, ওখান থেকে তুমি ফর্মাল ট্রেনিংটা নিয়ে নাও। এই খবরটা কিছু দিন আগে নিউজপেপারে বেরিয়েছিল। এখন সারা বিশ্ব থেকে নিউরো বিজ্ঞানীরা নিউইয়র্কে জড়ো হয়েছে ওকে পরীক্ষা করে দেখতে, জিনিসটা কী করে হল! একটা অতি সাধারণ লোক রাস্থা পরিষ্কার করে, তাকে পিটিয়েছে আর সেখান থেকে এখন সে নামকরা abstract mathematician হয়ে গেছে, তাকে study করার জন্য বিশ্বের বড় বড় বিজ্ঞানী, নিউরোলজিস্টরা আসছে। আমাদের মস্তিষ্ক একটা যন্ত্র, এই যন্ত্র কিছু কিছু জিনিসকে ধরতে পারে আবার কিছু কিছু জিনিসকে ধরে পারে না। কিছু মস্তিষ্ক আছে যারা abstraction জিনিসটা ধরতে পারে, কিছু একটা জিনিসকে একবার দেখে নিল, সেখান থেকেই পুরো জিনিসটাকে সে টেনে নেয়, টেনে নিয়ে সেটাকে আবার অন্য জায়গাতে প্রয়োগ করে দেবে। যেমন একজন মা ছেলেকে খুব ভালোবাসে, ছেলের খাওয়া ঠিক মত হচ্ছে কিনা, ঘুম হচ্ছে কিনা, লেখাপড়া ঠিক মত হচ্ছে কিনা সব দিকে মায়ের নজর। ছেলে কম খেলে মায়ের চিন্তা আমার ছেলে রোগা হয়ে যাচ্ছে। যার মস্তিষ্ক abstraction জিনিসটা ধরতে পারে সে দেখবে এটাই মায়ের স্নেহ, এরপর একটা জায়গায় এসে মা খসে পড়ে যাবে শুধু স্নেহটা থেকে যাবে। সেখান থেকে একজন চিন্তা করতে লাগলেন, এই স্নেহটা যদি পুরো দেশের প্রতি লাগিয়ে

দেওয়া যায় বা ভগবানের দিকে লাগিয়ে দেয়, তখন কি হবে? তখন সেও ঠিক এভাবেই বলবে এই গরমে আমার ঠাকুরের কত কষ্ট হচ্ছে। অনেকে হয়ত ভাববে, এই স্নেহ দিয়ে তার কী হবে? কিন্তু এটা শুরু হয়েছে খুব concrete একটা জিনিস দিয়ে, যেটা চোখে দেখা যাচ্ছে। পুরো দর্শন বা বিজ্ঞান যে এগিয়ে চলেছে, এভাবেই এগিয়ে চলে। গাছ থেকে আপেল পড়ল, এটা একেবারে মূর্ত, concrete। এই concreteকে নিয়ে নিউটন সোজা চলে গেলেন abstractionএ, যেখান থেকে বেরিয়ে এল Law of Gravitation।

বেদের ঋষিরাও দেখলেন কার্য কারণে একটা সম্পর্ক হচ্ছে, সেটাকে নিয়ে গেলেন বিমূর্তে। বিমূর্তে এটাই লাভ, বিমূর্ত থেকে ওনারা আবার বিশেষে নামিয়ে নিয়ে আসতে পারেন। প্রথম মূর্ত দেখছেন, সেখান থেকে সেটাকে নিয়ে গিলেন বিমূর্তে, এই বিমূর্তকেই নামিয়ে অন্য জায়গাতে নিয়ে গিয়ে মূর্ত করে দিচ্ছেন। বিমূর্তকে যে কোন জায়গায় লাগানো যেতে পারে। কর্ম জিনিসটাও ধীরে ধীরে একটা generalized form নিয়ে একটা abstraction হয়ে আবার concretisationএর দিকে নামতে শুরু হয়ে গেল। শতপথ ব্রাহ্মণে খুব সুন্দর একটা বর্ণনা আছে, ভৃগু ঋষির সন্তান বারুণি। পিতা-পুত্রের মাঝে মাঝেই অনেক আলোচনা হত, বেদেও পিতা-পুত্রের আলোচনা অনেক জায়গায় এসেছে। ভৃগু পুত্র বারুণির কিছু কারণে অনেক অহঙ্কার হয়েছিল। ভৃগু এবার তাঁর পুত্রকে, যে আবার একাধারে তাঁর শিষ্যও, শিক্ষা দেবেন। ভৃগু যোগসিদ্ধ ঋষি, তিনি কিছু একটা করে দিতেই বারুণির নিশ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়াতে ধীরে ধীরে বারুণির একটা অস্থায়ী মৃত্যুর মত হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ পর ভৃগু আবার পুত্রের নিঃশ্বাস নেওয়াটা খুলে দিলেন।

পুত্রের প্রাণ ফিরে আসার পর ভৃগু জিজ্ঞেস করছেন 'এতক্ষণ তোমার কি হয়েছিল'? 'আমি অন্য এক জগতে চলে গিয়েছিলাম'। 'সেখানে তুমি কি দেখলে'? বারুণি যা কিছু দেখেছে তার ব্যাপার স্যাপার সে কিছুই বুঝতে পারেনি। যা যা সে দেখেছে তার লম্বা বিবরণ দিয়ে বলছে 'এক জায়গায় গিয়ে দেখছি কয়েকজন লোক মিলে একটা লোককে টুকরো টুকরো করে কেটে যাচ্ছে। আরেকটা জায়গায় গিয়ে দেখছি একটা লোক আরেকটা লোককে গিলে খাচ্ছে আর সেই লোকটি চিৎকার করে যাচ্ছে। অন্য এক জায়গায় যাওয়ার পর সেখানে দেখছি একটা লোক খুব কষ্ট পাচ্ছে আর চেঁচাচ্ছে কিন্তু মুখ দিয়ে তার কোন আওয়াজ বেরোচ্ছে না। আরেক জায়গায় গিয়ে দেখছি দুজন মহিলা একটা ধনরত্নের ভাণ্ডার পাহাড়া দিচ্ছে। আবার একটা জায়গায় দেখছি কোথা থেকে রক্তের স্রোত আসছে আরে সেখানে একজন লোক লাঠি নিয়ে পাহাড়া দিচ্ছে। ওর মধ্যেই একটা জায়গায় দেখছি পাঁচটা নদী বয়ে যাচ্ছে, জলের বদলে নদীতে সব মাখন বয়ে যাচ্ছে'। এই ধরণের নানা রকম দৃশ্যের বর্ণনা দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বারুণি কিছুই বুঝতে পারছিল না। তখন সে ভৃগুকে জিজ্ঞেস করল। ভৃগুও এটাই চাইছিলেন, তুমি যে মনে করছ জগতের সব কিছু বুঝে ফেলেছ আসলে তা নয়, জগতের বাইরেও অনেক অজানা জিনিস আছে। এরপর ভৃগু দৃশ্যগুলির ব্যাখ্যা করছেন। প্রথম দৃশ্যের ব্যাখ্যাতে বলছেন, যারা এই জীবনে গাছ কেটে বেরায় পরলোকে গিয়ে তাদের গাছেরা কাটে। কাটার পর গাছগুলো তাদের খেতে থাকে। অন্য দৃশ্যের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলছেন, যারা ছাগল কাটে পরলোকে গিয়ে ছাগলগুলো মানুষদের কাটে, ছাগলগুলো যেমন কাটার সময় চেঁচাত, মানুষগুলোও সেই রকম চেঁচাতে থাকে আর ছাগলরা তাদের খায়। অন্য একটা দৃশ্যের ব্যাখ্যাতে বলছেন মানুষ যখন ভাত খায়, গম, চাল এরাতো চেঁচাতে পারে না, তেমনি মানুষগুলো চেঁচাতে পারছে না কিন্তু কষ্ট পেয়ে যাচ্ছে। দুজন মহিলা হলেন একজন শ্রদ্ধা আরেকজন অশ্রদ্ধা। তারপর যারা রাগ করে তাদের চেহারা পরলোকে গিয়ে কেমন হয়ে যায়, যারা যজ্ঞাদি করে তাদের চেহারা কি রকম হয়ে যায় এসব ব্যাপারে বলছেন।

যদিও কাহিনী রূপে বলা হল, কিন্তু এর মধ্যে দু-তিনটে জিনিস এসে গেছে। প্রথম এসেছে কর্মের বিধান, যেমনটি কর্ম করবে তেমনটি ফল পাবে। কর্ম এখনও খুব concrete formএ আসেনি, কিন্তু কর্মের বিধান মহাভারতে এসে একটা রূপ নিয়ে নিল। মহাভারতে কর্মের বিধান যে একটা রূপ পেল এর বীজ শতপথ ব্রাহ্মণেই এসে গিয়েছিল। এর সাথে কিছু কিছু গুণ, যজ্ঞে যেমন গুণের ব্যাপার ছিল না, ব্রাহ্মণের মধ্যে যে পবিত্রতা ওই পবিত্রতা থাকলেই হয়ে যেত। এখন গুণ আসতে শুরু হয়েছে, যেমন কাউকে কষ্ট দিতে নেই, অপ্রয়োজনে গাছ কাটা, পশু বধ এগুলো করতে নেই। তাহলে যে ভাত গম খাওয়া হচ্ছে এদেরও তো নাশ

হচ্ছে? এগুলোর কি ব্যাখ্যা দেবেন? সাধারণীকরণে এই সমস্যা এসে যায়। সাধারণীকরণে মনের অনেক সংশয় মেটে ঠিকই, কিন্তু আমরা এত বেশি সাধারণীকরণ করে দিই তাতে অনেক গোলমাল লেগে যায়। নাসিম নিকোলাস তালেব নামে এক ভদ্রলোকের একটা বই আছে যার নাম Fooled by Randomoness, তাতে তিনি দেখাচ্ছেন যা কিছু আছে সবই random, যেভাবে চান্সের কথা বলা হয়। কিন্তু মানুষ কখনই randomness নিয়ে থাকতে পারে না, তারা চায় generalize করে একটা shapeএ নিয়ে আসতে। একটা shapeএ যখন নিয়ে আসা হয় তখন মানুষের মনে শান্তি হয়। কিন্তু shapeএ যদি আনতে যান, যেমন বলছেন যদি বাপু তুমি ছাগল কাট পরের জন্মে ছাগল তোমাকে কাটবে। তাহলে এত এত ভাত রুটি মাংস খাওয়া হচ্ছে, মাংস খেতে একটা ছাগলই না হয়ে গেছে কিন্তু যে কাড়ি কাড়ি ভাত রুটি খাচ্ছি তার জন্য কি খেসারত দিতে হবে? বলছেন, তোমাকে চোখের জল ফেলতে হবে, তোমার মুখ দিয়ে তখন কোন আওয়াজ বেরোবে না। শতপথ ব্রাহ্মণের এই যুক্তিতে নিশ্চয়ই গোলমাল আছে, তা নাহলে মানুষ খাবে কি, না খেতে পেয়ে তো মানুষ মরেই যাবে। প্রথম হল শরীর রাখতে গেলে খাওয়া-দাওয়া করতে হবে। অথচ এই যুক্তিটাই আরও জোরাল হয়েছে মহাভারতে এসে, বিশেষ করে ধর্মব্যাধ গীতায় ব্যাধ এই যুক্তিকেই নিয়ে এসেছেন, ব্যাধ বলছেন, কোন উপায় নেই আমাকে পশুর মাংস বিক্রী করেই জীবন ধারণ করতে হবে। সেইজন্য ওনারা শাস্ত্রেই খাদ্য ও অখাদ্যের বিচার করে বিধি-নিষেধ করে দিলেন যাতে মানুষের কোন সংশয় না হয়, মনে কোন উদ্বেগ সৃষ্টি না হয়। তাও মানুষের খুঁতখুঁতানি কমবে না। ঋষিরা তাই পঞ্চ মহাযজ্ঞের বিধান নিয়ে এলেন। শরীর রক্ষার্থে তোমাকে খাওয়া-দাওয়া করতেই হবে, সৃষ্টি থাকা মানেই খাদ্য গ্রহণ করতে হবে। পঞ্চ মহাযজ্ঞ করে তুমি সবার ঋণ শোধ করে দাও। সবার মাথার উপর পাঁচ রকম ঋণ চেপে আছে, দেবঋণ, ঋষিঋণ, পিতৃঋণ, ভূতঋণ ও নৃঋণ, পঞ্চ মহাযজ্ঞ করে তুমি দেবতাদের ঋণ শোধ কর, ঋষিদের প্রতি তোমার যে ঋণ আছে শোধ কর, মা-বাবার প্রতি ঋণ, সমাজের প্রতি ঋণ আর ইতর প্রাণীদের প্রতি যে ঋণ সব ঋণ তুমি শোধ কর, তাহলে যত রকমের তোমার দোষ হচ্ছে, সব দোষ কেটে যাবে। সৃষ্টিতে প্রাণীকে বেঁচে থাকার জন্য অন্য প্রাণীর জীবন নাশ হবেই, কিন্তু তার বদলে অনেক কিছু জিনিস করতে নেই। আর তোমার জন্য যাদের জীবন নাশ হচ্ছে, ক্ষতি হচ্ছে, এই ক্ষতিপূরণের জন্য যজ্ঞাদি করতে হবে।

শতপথ ব্রাহ্মণ প্রথমে কর্মের বিধানকে এগিয়ে নিয়ে গেল, তুমি যাকে মেরেছ সেও তোমাকে মারবে। এটাকেই পরের দিকে আস্তে আস্তে concrete formএ নিয়ে যাবে, আর কর্মের এই ব্যাপারটা যেমনটি করবে তেমনটি ফল পাবে, আজকে হিন্দু ধর্মের একটা প্রধান স্তম্ভ রূপে দাঁড়িয়ে গেছে। এরই পরিণতি হল পুনর্জন্মবাদ। কিন্তু বেদে আমরা পুনর্জন্মের ধারণা পাই না। ব্রাহ্মণ মানেই যজ্ঞের ব্যাখ্যা, যজ্ঞের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অন্য অনেক কিছুকে যেমন পবিত্রতা, অপবিত্রতা, চরিত্র এই ধরণের নানান জিনিসের ব্যাখ্যাও করছে। কিন্তু ব্রাহ্মণে কোন ধরণের বিমূর্ত জিনিস পাওয়া যাবে না। আরণ্যক থেকেই ঠিক ঠিক বিমূর্ত জিনিসগুলি আসতে শুরু করে আর উপনিষদে গিয়ে পূর্ণতা পেয়ে যায়। উপনিষদে কর্মের আর কোন ব্যাপার থাকবে না, পুরোপুরি মনের উপর চলে যায়।

সোমরসকে উদ্দেশ্য করে বেদে কয়েকটি খুব সুন্দর মন্ত্র আছে। একটি মন্ত্রে যেমন বলছেন –

সত্যেনোত্তভিতা ভূমিঃ সূর্যেণোত্তভিতা দ্যৌঃ।
ঋতেনাদিত্যাস্তিষ্ঠন্তি দিবি সোমো অধি শ্রিতঃ।।ঋ-১০/৮৫/১

পৃথিবীকে সত্য ধারণ করে আছে আর অন্তরিক্ষকে সূর্য ধারণ করে আছে। আর স্বর্গলোকে ঋতম্ সোমকে অধিষ্ঠিত করে রেখেছে যার জন্য সব কিছু আশ্রয় পেয়ে যাচ্ছে। বেদে সোমরসের অনেক স্তুতি আছে, তার মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যেটা আরেকটি মন্ত্রে বলা হয়েছে –

সোমং মন্যতে পপিবান্যৎসম্পিংষন্ত্যোষধিম্।
সোমং যং ব্রহ্মাণো বিদুর্ন তস্যাশ্নাতি কশ্চন।।ঋ-১০/৮৫/৩।।

সোমরস যাঁরা পান করেন তাঁরা মনে করেন সোমরসের পাতার যে রস এটাই শক্তি দেয়। কিন্তু যাঁরা ঠিক ঠিক জ্ঞানী তাঁরা যে জিনিসকে সোম বলে জানেন সেটাকে কেউ পান করতে পারে না। এখানে সোমরসের দুটো দিক বলছেন – একটা সোম পাতা রূপে আরেকটি বলছেন সোম জ্ঞান রূপে। কোন একটা উচ্চ ধারণাকে ভৌতিক রূপে নিয়ে আসার ব্যাপারটা আমাদের শাস্ত্রের অনেক জায়গায় পাওয়া যায়। মন্ত্রে সেই ধারণাটাই স্থান পেয়েছে, যাঁদের কাছে দিব্য জ্ঞান আছে তাঁরা জানেন আসল সোমকে পান করা হয় না।

সোমেনাদিত্যা বলিনঃ সোমেন পৃথিবী মহী।
অথো নক্ষত্রাণামেষামুপস্থে সোম আহিতঃ।।ঋ-১০/৮৫/২।।

আদিত্যগণ যে এত বলশালী সোমের জন্য, পৃথিবী যে এত শক্তিমান সেও সোমরসের জন্য আর দেবতারা যে স্বর্গের বাসিন্দা হয়েছেন তাও সোমেরই জন্য। বেদে সোমরসকে নিয়ে যে ধারণা ছিল, এই ধারণাটাই মহাভারতে গিয়ে সোমের জায়গায় অমৃত রূপে এসে গেছে। মহাভারতেই আবার কোথাও কোথাও অমৃতকে বলছেন জ্ঞান। ত্যাগের দ্বারা যে আত্মজ্ঞান হয় এই আত্মজ্ঞানই অমৃত। আবার এই অমৃতকেই ভৌতিক রূপে পৌরাণিক কাহিনীতে নিয়ে আসা হয়েছে, যেখানে সমুদ্র মন্থনের কাহিনীতে অমৃতের কথা বলা হয়েছে। শাস্ত্রে অমৃতের কথা বলার সময় অমৃতকে দুটো স্তরে উপস্থাপনা করা হয়েছে। প্রথম স্তরে দেখানো হয় সাধারণ মানুষকে বোঝানোর জন্য, যেখানে বলছেন অমৃত পান করলে অমরত্ব পাওয়া যায়। দ্বিতীয় স্তরে বেদ বা উপনিষদ যখনই অমৃতত্ত্বের কথা বলা হচ্ছে সেখানে সব সময়ই অমৃতত্ত্ব বলতে দিব্য জ্ঞানের কথাই বলা হয়। সোমের মন্ত্রেও ঠিক সেইভাবে সোমকে দেখানো হয়েছে। এখানে সোমের যে স্তুতি করা হচ্ছে তাতে সাধারণ মানুষ মনে করতে পারে যে আদিত্য বা দেবতাদের যে শক্তি এই শক্তি এসেছে সোমরস পান করার জন্য। এই সোমরস ভৌতিক, কিন্তু জ্ঞানটাই আসল। এই জিনিসটাকেই কয়েকটি মন্ত্রে নিয়ে আসা হয়েছে। তার সাথে সোমরসের কতকগুলি দ্রব্য গুণ নিয়ে বলছেন, যেমন যে অন্ধ সে যদি সোমরস পান করে তাহলে তার দৃষ্টি শক্তি ফিরে আসে, যে খঞ্জ সে হাটতে শুরু করে দেয় ইত্যাদি।

এর আগেও আমরা আলোচনা করেছি যে বেদের মন্ত্র যজ্ঞে যেমন ব্যবহার করা হত তেমনি প্রার্থনা রূপেও বেদ মন্ত্রকে নেওয়া যেতে পারে আবার ধ্যানেও ব্যবহার করা যায়। এর সব থেকে ভালো দৃষ্টান্ত হল গায়ত্রী মন্ত্র, গায়ত্রী মন্ত্র যজ্ঞেও ব্যবহার হয়, প্রার্থনা রূপেও ব্যবহার হয় আবার গায়ত্রী মন্ত্রের উপর ধ্যানও করা যায়। আমরা এখন যে মন্ত্র নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি এটিও তিনটেতেই ব্যবহার করা যেতে পারে।

ত্রাতা নো বোধি দহশান আপিরভিখ্যাতা মর্ডিতা সোম্যানাম্।
সখা পিতা পিতৃতমঃ পিতৃণাং কর্তেমু লোকম্ উশতে বয়োধাঃ।।ঋ-৪/১৭/১৭।।

মন্ত্রের দেবতা ইন্দ্র। বেদের মন্ত্রে ইন্দ্র যেমন দেবতা রূপে আসেন ঠিক তেমনি ঈশ্বরের রূপেও আনা হয়। স্তুতিও দুটো রূপেই হয়, দেবতা রূপেও স্তুতি করা হয় আবার ঈশ্বর রূপেও স্তুতি হয়। কে কিভাবে নেবে সেটা তার মানসিকতার উপর নির্ভর করবে। বলছেন, হে প্রভু! আপনি ত্রাতা, সব কিছু থেকে আপনি আমাদের ত্রাণ করেন, সেইজন্য আপনি আমাদের যজ্ঞে আসেন। *অভিখ্যাতা মর্ডিতা সোম্যানাম্*, যাঁরা আপনার স্তুতি করছেন, যজ্ঞে যাঁরা আপনাকে আহুতি দিচ্ছেন তাঁদের প্রতি আপনি কৃপা দৃষ্টি দিন। আপনার কি গুণ? *সখা পিতা পিতৃতমঃ পিতৃণাং*, এটি একটি অসাধারণ ভাবের অভিব্যক্তি। আপনি বন্ধু, আপনি বাবা আর *পিতৃতমঃ পিতৃণাং*, আমাদের যাঁরা পূর্বপুরুষ আপনি তাঁদেরও বাবা। এই ভাবটাই গীতাতে নবম অধ্যায়ে ভগবান বলছেন *পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ*। আমরা যে কোন শাস্ত্রেই যাই না কেন, বেদের বাইরে কোন শাস্ত্রই কিছু বলছে না, বেদের মধ্যেই সব কিছু আছে। গীতাতে এই ভাব আসছে ভক্তি রূপে। ভগবান যখন গীতাতে বলছেন এই জগতের আমি পিতামহ, আমি পিতা, মাতা, ধাতা সবই আমি তখন প্রচণ্ড ভক্তি ভাব। অথচ একই জিনিস উল্টো দিক থেকে ঋষি ইন্দ্রকে বলছেন, আপনি সখা, পিতা, পিতৃদেরও পিতা, আমার পরম্পরা যেখান থেকে এসেছে আপনি তারও আদি উৎস। ইন্দ্রকে এখানে ঈশ্বর রূপে দেখছেন।

কর্তেমু লোকম্ উশতে বয়োধাঃ, যারা আপনার উপাসনা করছে তাদের আপনি আয়ু দেন। এখানে এসেই অনেক রকম বিতর্ক শুরু হয়। পরের দিকে পণ্ডিতরা যখন ভক্তির দিক দিয়ে ব্যাখ্যা করেন বা ভক্তিশাস্ত্রে ভক্তির স্তুতি করতে গিয়ে যে কিছু কিছু কথা বলছেন সেখানে বলছেন ঈশ্বরের প্রার্থনা যদি তুমি কর তাহলে তুমি অনেক দিন আয়ু পাবে। এসব জায়গায় এসে অনেক রকম ভুল ব্যাখ্যা হয়ে যায়। একজন সত্যিকারের ভক্ত খুব মিষ্টি করে ভগবানকে বলবে – হে ঠাকুর! আমার যা কিছু আছে সব তোমারই দেওয়া। কারণ সে ঠাকুর ছাড়া কিছুই দেখছে না। একজন রাজা সেও সত্যিকারের ঠাকুরের ভক্ত, ঠাকুরের কাছে সেও প্রার্থনা করছে – হে ঠাকুর! আমার যা কিছু আছে, আমি যে রাজা হয়েছি, আমার রাজ্য, সম্পদ, ঐশ্বর্য সব তোমারই দেওয়া, তুমিই আমাকে সব দিয়েছে। কোন বোকা মুর্খ ভক্ত রাজার প্রার্থনা শুনে ভাবছে – ও! তিনিই সব দেন, আচ্ছা আমিও তাহলে প্রার্থনা করি, হে ঠাকুর! আমাকে টাকা-পয়সা দাও, আমাকে যশ প্রতিপত্তি দাও। ঠাকুর কি এদের প্রার্থনা শুনে সব দিয়ে দেবেন? এখানে এসেই আমাদের অনেক ভ্রান্ত ধারণা তৈরী হয়। ভালোবাসা যেখানে আছে সেখানে দুজনের মধ্যে একটা একত্বের বোধ থাকবে। আমি যা কিছু করছি সব কার জন্য করছি? যার সঙ্গে আমার একত্ব বোধ আছে। স্ত্রী, সন্তান, পরিবারের জন্যই সবাই সব কিছু করে। বাবা ছেলেকে বলে আমার যা কিছু আছে সবই তোমার। মাও তার সন্তানকে বলে, আমার যা কিছু আছে সবই তো তোমার। আবার ছেলে বড় হয়ে প্রচুর অর্থ রোজগার করে গাড়ি বাড়ি করেছে সেও তখন বলে, মা! আমার যা কিছু হয়েছে সব তোমার আশীর্বাদেই হয়েছে। অনেক গাড়িতে বা বাড়িতে লেখা দেখা যায় 'মায়ের আশীর্বাদ'। জীবনের সাফল্যে ওর মধ্যে মানবিকতা জেগে গেছে। একত্ব বোধ আর এই মানসিকতার মেল বন্ধন যখন হয়ে যায় তখনই একমাত্র এই উদ্গীরণ হবে – *কর্তেমু লোকম্ উশতে বয়োধাঃ*, আমরা আয়ু যে পাচ্ছি, শুধু আয়ু নয়, যা কিছু আমরা পাচ্ছি, হে ইন্দ্র! সব আপনার জন্যই পাচ্ছি, আপনি আমাদের সখা, পিতা, *পিতৃতমঃ পিতৃণাং*। যাঁদের মধ্যে সত্যিকারের এই আধ্যাত্মিক মানসিকতা থাকে তাঁরা এভাবেই দেখেন। ঠাকুর বলছেন, গাছের পাতা পর্যন্ত তাঁর ইচ্ছাতেই নড়ছে। কারণ ঠাকুর ঈশ্বর বই আর কিছু দেখছেন না। একটা সামান্যতম নড়াচড়া সেখানেও তিনি দেখছেন ঈশ্বরের ইচ্ছা। প্রার্থনা বলতে আমাদের যে ধারণা হয়ে আছে আর এখানে যে প্রার্থনা করা হচ্ছে তার মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। আমার যা কিছু সবটাই তোমার, তোমার যা কিছু সবটাই আমার, একত্ব বোধ আছে বলেই এই প্রার্থনা করা যাচ্ছে। গীতায় ভগবান যে বলছেন *ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে* বা *নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ*, এই কথাগুলি দিয়ে কী বলতে চাইছেন? *স্বক্রিয়া অভাবাৎ*, নিজের উপর ক্রিয়ার অভাব। সেইজন্য ভগবানও আত্মার নাশ করতে পারেন না। কারণ ভগবান আত্মা, আত্মার উপর আত্মার ক্রিয়া হতে পারে না। *ন কর্তুম কশ্চিৎ বিনাশ কর্তুম্ শক্যতে* – আত্মার বিনাশ কেউ করতে পারবে না, ভগবানও পারবেন না। আমাকে তাই কে নাশ করবে, কারুর ক্ষমতাই নেই! তবে হ্যাঁ, আগে তুমি বিচার কর তুমি কে, কিসের উপর নিজেকে একত্ব করে রেখেছ। তুমি যদি মনে কর আমি শরীর, তাহলে তোমার মাথায় একটা পাথর দিয়ে আঘাত করলেই তুমি শেষ। আর তুমি যদি মনে কর তোমার যে আমি, তোমার যে আত্মভাব, তোমার আত্মবিশ্বাস এই শক্তি আসছে তোমার ভেতরে যে আত্মা আছেন সেই আত্মশক্তি থেকে, আত্মশক্তি আর ঈশ্বরের মধ্যে কোন তফাৎ নেই, তখন তোমাকে কে নাশ করবে! কিন্তু আত্মার সঙ্গে একত্ব বোধ না করে আমরা আমাদের শরীর, মন, ইন্দ্রিয়ের সাথে একাত্ম হয়ে আছি। জঙ্গলের পশু সাপ, ব্যাঙ, বাঘ, সিংহ, গরু, মোষ, ছাগল সবাই তাই, সবাই নিজের শরীর আর ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে এক হয়ে আছে। পশু আর আমাদের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। ভগবানের সঙ্গে একত্ব বোধ হয়ে গেলে আর কেউ তাকে নাশ করতে পারবে না। এরপরেও যে দুঃখ-কষ্ট জীবনে আসবে না তা নয়, দুঃখ আসবে, আনন্দ আসবে, সুখ আসবে, যন্ত্রণা আসবে সবই আসবে, কিন্তু একটু নাড়া খেয়ে আবার সোজা দাঁড়িয়ে যাবে। ভক্তির দিক দিয়েই হোক, জ্ঞান পথেই হোক, যোগ বা কর্ম দিয়েই হোক ভগবানের সঙ্গে একত্ব বোধ হয়ে গেলে তাকে আর কেউ মাটিতে ফেলে দিতে পারবে না।

স্বামীজী বার বার উপনিষদের উপর জোর দিয়ে গেছেন, কারণ উপনিষদে ভয়, কাপুরুষতার লেশ মাত্র নেই। যেখানে দুই সেখানেই ভয়, যেখানে এক সেখানে ভয় থাকে না। যিনি ঈশ্বর, যিনি বস্তু জগৎ, চিন্তা জগৎ

সব চালাচ্ছেন, তিনিই তোমার ভেতরে অন্তর্যামী রূপে আত্মা রূপে অবস্থান করছেন। তাহলে কার ক্ষমতা আছে তোমার ক্ষতি করবে, কাকে তুমি ভয় করবে? এরপর তোমার মধ্যে দুর্বলতা, কাপুরুষতা কোথা থেকে আসবে? স্বামীজী আমাদের জন্য গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে করে রক্ত বার করে দিয়েছেন, ওঠো! জাগো! তোমার ভেতরের সিংহকে জাগাও। কিন্তু আমরা কি করছি! শুধু কোটেশান মুখস্ত করে গেছি। একবারও কি ভেবে দেখেছি, এর প্রত্যেকটি কথা বর্ণে বর্ণে সত্য। সাপের মাথায় মণি কিন্তু সারা জীবন মরা ব্যাঙ খেয়ে মরে।

ঋষি এই কথাই বলছেন, যখন তোমার এই একত্ব বোধ আসবে, তুমি যখন মনে করবে তুমি তাঁর সাথে এক তখন তুমি দেখবে আমার যা কিছু আছে সব তাঁরই। আমার আমিটা কে? তিনিই, তিনি ছাড়া তো আর কিছু নেই। তাহলে এগুলো কার দেওয়া? তাঁরই দেওয়া। এগুলো কোন মুখের কথা নয়, সত্যি সত্যি একত্ব বোধে এই রকমটিই হয়। আমাদের সব মুখের কথা হয়ে যায় বলেই এত দুঃখ কষ্ট আর যন্ত্রণা। আগে বুঝতে হবে কি বলছেন এখানে। প্রথমে তুমি আমার বন্ধু, তুমি আমার পিতা, আমার পিতৃদেরও তুমি পিতা। কাকে এভাবে সম্বোধন করা যাবে? যাঁর সাথে আমার একত্ব বোধ হয়ে গেছে। দ্বিতীয় বলছেন, আমার যা কিছু আছে সব তোমার জন্য। এটাকেই ভুল ধারণা করে ঠাকুরের কাছে বলতে থাকি – ঠাকুর পরীক্ষায় পাশ করিয়ে দাও, ঠাকুর আমার চাকরি করে দাও, আমার মেয়ের ভালো একটা পাত্র জুটিয়ে দাও, আমার রোগ ভালো করে দাও, চাওয়ার আর শেষ নেই। ভগবান কোথাও এক জায়গায় বসে আছেন সেই ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলে তিনি আমাদের সব কিছু মঞ্জুর করে দেবেন। এভাবেই ভগবানের সাথে আমরা দোকানদারির সম্পর্ক তৈরী করে রেখেছি। তোমাকে প্রণাম করলাম, চরণামৃত খেলাম, তোমাকে দু টাকার প্রণামী দিলাম তার বদলে তুমি আমার এই এই ঝামেলা মিটিয়ে দাও। ভগবান কী এতই মুর্খ যে তিনি এসে আমাদের সব ঝামেলা মেটাবার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়বেন! তিনি থোরাই কাউকে কেয়ার করতে যাবেন। তাঁর কাছে ভালো যা মন্দও তাই। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বলছেন, ঈশ্বর যদি থাকেন তাহলে চেঙ্গিস খাঁ এত লোককে নৃশংস ভাবে কেটে ফেলল কী করে? জীবন আমাদের কাছে মূল্যবান কিন্তু ঈশ্বরের কাছে জীবনও যা মৃত্যুও তাই। আপনার ফ্রীজ আপনার বেডরুমে না রেখে যদি ডাইনিং রুমে রাখেন তাহলে ফ্রীজট কি অন্যের হয়ে যাবে? ভগবানের দৃষ্টিতে সবটাই তিনি, তিনি নিজেকে কোথায় রাখবেন কিভাবে রাখবেন তাতে কি এসে যায়! যেখানে যেভাবেই থাকুক না কেন তিনিই তো আছেন। ভূমিকম্পে এত লোক কেন মারা গেল? ভগবান কিছু করতে পারলেন না কেন? তোমার দৃষ্টিতে মারা গেছে, ভগবানের দৃষ্টিতে এই ঘর আর সেই ঘর, কেউই মারা যায়নি। আমরা ভগবান, ঈশ্বর এই শব্দগুলি মুখে উচ্চারণ করছি বটে কিন্তু একবারও বোঝার চেষ্টা করি না শব্দগুলোর ঠিক ঠিক কি অর্থ। সবটাই ঈশ্বরের স্বর্গটাও তাঁর, নরকটাও তাঁর আর পৃথিবীটাও তাঁর। প্রেতযোনীটাও তাঁর, তির্যক যোনিও তাঁর আবার কুকুর, বেড়াল, মানুষ যোনিটাও তাঁর। ঈশ্বরের চোখে কোন তফাৎ নেই, আমার আপনার দৃষ্টিতে তফাৎ। আমরা আমাদের মত প্রার্থনা করে যাই। ঠাকুরও তো জগজ্জননীর কাছে কেশব সেনের জন্য প্রার্থনা করছেন। কেন প্রার্থনা করবেন না! কারণ সেখানে একত্ব বোধ আছে। কোথাও তো তাঁকে বলতে হবে। কোথায় বলবেন? মা তাঁর নিজের, মা ছাড়া তিনি কার কাছে যাবেন!

এই ভাবগুলি বোঝার জন্য একটা মানসিক প্রস্তুতির প্রয়োজন। সাধনার দ্বারা মানসিক প্রস্তুতি যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ এই ভাবগুলো কেউ আমাদের ভেতরে ঢোকাতে পারবে না। তবে শুনে যেতে হয়। শুনতে শুনতে কোন একদিন ঠাকুরের কৃপায় হঠাৎ করে বোধ হবে, তাই তো এতদিন যা শুনেছি সবটাই সত্য। যখন একত্ব বোধ হয়ে যাবে, যখন সব সময় দিব্য সত্তার ব্যাপারে সম্পূর্ণ সচেতন হয়ে যাবে তখন সে এই মন্ত্রের ঋষির মতই দেখবে, তুমি আমার বন্ধু, তুমি আমার পিতা, তুমি আমার পিতৃদেরও পিতা, আমার যা কিছু আছে সব তোমারই। সেইজন্য বেদের কথা, উপনিষদের কথা, কথামৃতের কথা একই কথা। ঠাকুর কতবার বলছেন, তিনি আমার আপনজন, নিজের লোক। আবার আরেকটি মন্ত্রে এই ভাবটাই অন্য ভাবে বলছেন –

যো নঃ পিতা জনিতা যো বিধাতা ধামানি বেদ ভুবনানি বিশ্বা।
যো দেবানাং নামধা এক এব তং সম্প্রশ্নং ভুবনা যন্ত্যন্যা।।ঋ-১০/৮২/৩।।

এই মন্ত্রের দেবতা বিশ্বকর্মা। বিশ্বকর্মা একজন দেবতা ছিলেন, তিনি দেবতাদের নানা রকম কাজ করে দেন। এই নামটাই পরে হয়ে গেল বিশেষণ। ভগবান যিনি তাঁকে বিশ্বকর্মা বলছেন। বিশ্বকর্মাও দুটো অর্থেই আসে, একজন দেবতা রূপে আসেন আবার যিনি বিশ্বের কর্তা সেই নামেও আসেন। আমরা আবার বিশ্বকর্মা বলতে বুঝি যাঁর পূজোর দিন ঘুড়ি ওড়ায়, এই বিশ্বকর্মাকে এখানে বলা হচ্ছে না। এই বিশ্বকর্মা হলেন একজন বৈদিক দেবতা। আগের মন্ত্রে ইন্দ্রকে পিতা বলা হয়েছে, বিশ্বকর্মাকেও পিতা বলা হচ্ছে। কিন্তু তার সাথে বলছেন *ধামানি বেদ ভুবনানি বিশ্ব* – কার কি স্থান, কে কোথায় আছে সবটাই তিনি জানেন। *যো দেবানাং নামধা এক এব* – মূল ভাবটা এই লাইনেই বলা হচ্ছে। তিনি এক, এক ছাড়া দুই নয়। এক হয়েও তিনি বহু নাম বহু রূপের মধ্যে নিজেকে প্রকাশিত করে আছেন। বেদে বিচিত্র ধরণের ভাব আছে, একটা ভাবকে তাঁরা ধরে নেন, তারপর সেই ভাবেরই একজন দেবতা বানিয়ে দেন। বেদে ঈশ্বর বলে কিছু নেই, পুরুষের কথা আছে, ঈশ্বর সম্বন্ধে ইদানিং আমাদের যে ভাব ধারণা এই ভাবটাই ছিল পুরুষের মধ্যে, এই পুরুষই আদি পুরুষ। সেই পুরুষের ভাবমুর্তি বিশ্বকর্মার মধ্যে আরোপিত করে দিচ্ছেন। যে বিশ্বকর্মা বিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন, সেখান থেকে বিশ্বকর্মাকে একজন দেবতা বানিয়ে দিলেন। সেইজন্য বেদ যদি ঠিকমত না বুঝে পড়া হয় তাহলে অনেক সংশয় তৈরী হবে। এই রকম অনেক কিছুতেই পাওয়া যাবে। যেমন দ্যাবা পৃথিবী, পৃথিবী নামে একটা জিনিস আছে, সেখান থেকে পৃথিবীকে একজন দেবী বানিয়ে দেওয়া হল। আবার সেই দেবী থেকে আবার অন্য একটা কিছু বানিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

বিশ্বকর্মা ভগবান, তিনি এই বিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন। প্রথমে দেখছেন দেবতাই সব কিছু সৃষ্টি করেছেন, তিনিই এই বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা, পরের ধাপে বলছেন সৃষ্টিকর্তা আর দেবতা এক। এই দেবতা ইংরাজী ছোট অক্ষরের 'জি' কিন্তু তাঁর মধ্যে ভগবানের সব গুণই আরোপিত করা হয়েছে। ভগবানের একটি কাজ যেমন সংহার করা, তাই ভগবানের একটি ক্ষমতা বিনাশকারী। এই বিনাশরই একজন দেবতা দাঁড় করিয়ে দিলেন, যমরাজ। ঠিক সেই রকম, ভগবানের আরেকটি ক্ষমতা তিনিই সৃষ্টি করেন, তিনি যখন সৃষ্টি করছেন তখন এটি তাঁর একটি কার্য হয়ে গেল যার নাম *বিশ্ব কর্মণ*, এখান থেকে বেদ একজন দেবতাকে সৃষ্টি করে নাম দিলেন বিশ্বকর্মা। ইদানিং বিশ্বকর্মা একজন মামুলি দেবতা, কিন্তু বেদের ঋষিরা এই বিশ্বকর্মাকেই অনন্তেরই একটি মুখ রূপে দেখছেন। অনন্তের মুখ কিভাবে দেখা হচ্ছে? বিশ্বের সৃষ্টিকারী রূপে। যিনি অনন্ত তাঁর অনেক মুখ, বলা হয় *বিশ্বতো মুখম্*, হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ অনন্ত মুখ, সব মুখের মধ্যে তাঁরই একটি মুখ আছে যেটা দিয়ে তিনি এই জগৎ সৃষ্টি করেন। এই একটি মুখও অনন্ত, সেই একটি মুখই বিশ্বকর্মা একজন দেবতা। একদিকে বিশ্বকর্মা একজন দেবতা আরেক দিকে তিনি সেই অনন্তেরই একটি মুখ, এটাই এখানে বলছে *যো নঃ পিতা জনিতা যো বিধাতা*। কিন্তু আমরা বিশ্বকর্মা বলতে বুঝে যন্ত্রপাতির দেবতা, কলে কারখানাতে তাঁর পূজা হয়, ঘুড়ি ওড়ান হয়। কিন্তু বেদের বিশ্বকর্মা বিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন আর তিনি ইন্দ্র, মিত্র, বরুণের মত একজন আলাদা দেবতা। ভগবানের থেকে দেবতা অনেক নীচে কিন্তু তা হোক, এই দেবতাদের আবার অনন্তের সাথে এক করে দেওয়া হচ্ছে। বেদের এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। এই সব কারণে বেদ বোঝা খুব কঠিন। ব্রাহ্মণ ছাড়া তাই কাউকে বেদ পড়তে দেওয়া হত না। তাও আবার বত্রিশ বছর গুরুর কাছে মুখ বুজে পড়ে থাকতে হত। মনুস্মৃতিতে বর্ণনা আছে ব্রাহ্মণকে বত্রিশ বছর ধরে কি কি করতে হবে, বিয়ে করবে না, গুরুর কাছে থেকে গুরুর সেবা করবে, রোজ গঙ্গা স্নান করবে, জপ করবে, হবিষ্যান্ন খাবে, জুতো পড়বে না, ছাতা ব্যবহার করবে না ইত্যাদি। তারপরে বলছেন - *যো দেবানাং নামধা এক এব* – তিনি এক, সেই অনন্ত ঈশ্বর অথচ তাঁর অনেক নাম, যেমন তাঁর নাম ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র, অগ্নি। এখানে বিশ্বকর্মাকে অনন্তের সাথে এক করে পূজা করা হচ্ছে। শুধু যে অনন্তের সাথে এক করে দিচ্ছেন তা নয়, অনন্তের যে আরও বিভিন্ন রূপ আছে তার সাথেও তাঁকে এক করে দেওয়া হচ্ছে। বেদকে যারা পৌত্তলিক পূজার প্রবর্তক বলে তারা যে কিছু না জেনে বুঝে বলে এখানেই সেটা পরিষ্কার ধরা পড়ে। বই পড়া বিদ্যা আর দর্শন সম্বন্ধে কোন ধারাণা না থাকলে এই ধরণের কথাই বলবে। বিশ্বকর্মার এই প্রার্থনা ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ ও অথর্ববেদেও আছে। তাই এই প্রার্থনা মন্ত্রটি বেদের অত্যন্ত দামী মন্ত্র। ঋগ্বেদের মন্ত্র স্তবনের জন্য আর যজুর্বেদের মন্ত্র যজনের জন্য, আহুতি দেওয়া হয়।

এই মন্ত্রে দুটোই করা যায়, আহুতিও দেওয়া যায় আবার স্তুতিও করা যায়। যিনি এক তাঁকেই বিভিন্ন নামে সম্বোধন করা হয় - *যো দেবানাং নামধা এক এব। তং সংপ্রশ্নং ভুবনা যন্ত্যন্য* – এই জিনিসটা বেদে অনেক জায়গায় আসে, যিনি সেই অনন্তের মুখ তাঁর দিকে যেন অবাক বিস্ময়ে, *সম্প্রশ্নং*, মানে প্রশ্নের দৃষ্টি নিয়ে তাকায়। ঋষি বলছেন – পুরোটাই অবাক হয়ে যাওয়ার মত, ভক্ত অবাক বিস্ময়ে দেখে তিনি সেই ভগবান, তিনিই এই বিশ্বকে সৃষ্টি করছেন, তিনি সেই এক, তাঁর বহু নাম। এখানে বেদের দেবতার অর্থেই আসছে। কিন্তু দেবতা হলেও তাঁকে বিশ্ব রূপে নেওয়া হয়। *যো নঃ পিতা*, যিনি আমাদের বাবা, *জনিতা*, যিনি আমাদের জন্ম দিয়েছেন, *যো বিধাতা*, যিনি বিধাতা। বিধাতা শব্দ বেদেই এসে গিয়েছিল কিন্তু পরের দিকে বিধাতা শব্দ খুব প্রচলিত হয়ে গেছে। বিধাতার অর্থ, যার যা প্রাপ্য সেই প্রাপ্য যিনি দিয়ে দেন তিনিই বিধাতা। সমাজে বা পরিবারে আমরা অনেক সময় মনে করি আমি কাজ করছি কিন্তু ফল অন্য কেউ পাচ্ছে। কম্যুনিস্টরাই পরে এই কথা বলতে শুরু করল, কাজ করে মজুররা আর তার লাভ নেয় মালিকরা। কিন্তু হিন্দুদের কাছে এই নিয়ে কোন সমস্যা নেই, হিন্দুদের মধ্যে তাই কখন বিপ্লবও হয় না। আমাদের দর্শনই বিপ্লবের অনুমতি দেবে না, সব বিধাতার জন্য হচ্ছে। ওর বুদ্ধি আছে, কর্মের জোর আছে তাই সে পাচ্ছে, তোমার বুদ্ধি নেই, কর্ম নেই তাই তুমি কিছু পাচ্ছ না। তুমি নিজেকে পাল্টাবার জন্য পরিশ্রম কর, কোন জন্মে তোমারও পরিস্থিতি পাল্টে যাবে। আর এই জন্মই তো শেষ জন্ম নয়, পরেও তোমার অনেক জন্ম আসবে। এই ভাব ভারতে যত দিন থাকবে তত দিন ভারতে কোন বিপ্লব হবে না। ভারতে একটা দলের সরকার চলে গিয়ে অন্য দলের সরকার আসছে। সেই দলকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য ভারতের লোকেরা রাস্তায় কোন দিনই নামতে যায়নি। আমরা জানি বিধাতা রূপে ভগবানই সব ফল দেন। কি রকম ফল দেন? যেটা আমি করেছি ঠিক সেই রকম ফল দেন, ফল কখনই এলোমেলো হবে না। যার কর্মে যা আছে সেই কর্ম অনুযায়ীই তার সব কিছু হবে। এই কথাগুলো আমরা এখনও ব্যবহার করছি এই ধরণের মন্ত্র থেকেই ব্যবহার হয়ে আসছে।

ধামানি বেদ ভুবনানি বিশ্বা, যা কিছু জগতে আছে সবটাই তিনি জানেন। কারণ তিনি শুদ্ধ চৈতন্য, চৈতন্যের কাছে অজানা কিছুই নেই। *যো দেবানাং নামধা এক এব*, তিনি এক কিন্তু দেবতাদের বিভিন্ন নামে তিনিই আছেন। এখানে ভগবানের নামে বলা হচ্ছে না, বিশ্বকর্মা দেবতার নামেই বলা হচ্ছে। বেদের মন্ত্রে যদিও দেবতাদের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করা হয়, কিন্তু দেবতারা যেন অনন্তেরই মুখ। বিশ্বকর্মাকেও দেখছেন, সাথে সাথে বিশ্বকর্মার পেছনে যিনি আছেন তাঁকেও দেখছেন। *তং সম্প্রশ্নং ভুবনা যন্ত্যন্যা*, যত জীব আছে সবাই সেই একের কাছেই যায়, সেই একের ব্যাপারেই সবাই প্রশ্ন করে, সেই এককেই সবাই জানতে চায়।

শাস্ত্রে বিশেষ করে পুরাণে স্বর্গলোক, পিতৃলোক, দেবতাদের যে এত বর্ণনা, আদৌ এই সব লোক আছে কি নেই, থাকলে কোথায় আছে? দেবতারা আদৌ আছেন কিনা? থাকলে কোথায় আছেন? আমরা কেউই বলতে পারবো না, কারণ শাস্ত্রে যত বর্ণনা আছে তার কোন অনুভবই আমাদের নেই, সেইজন্য এগুলোর সত্যতাকে নিয়ে আলোচনা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় উচিতও নয়। লীলাপ্রসঙ্গ হল আমাদের অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ, সেখানে এসবের উপর একটা প্রসঙ্গ আছে যেখানে এগুলোর সত্যতা নিয়ে খুব সুন্দর একটা আলোচনা আছে, যদিও ঠাকুরের জীবনের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। ঠাকুরের গর্ভধারিণী মা চন্দ্রামণি দেবীকে একাধিক দেবী দেবতারা দর্শন দিয়েছেন, লীলাপ্রসঙ্গে এর উপর খুব সুন্দর আলোকপাত করা হয়েছে। ঠাকুর যখন মায়ের গর্ভে তখন তাঁর প্রচুর দেব দেবীর দর্শন হচ্ছিল। তারমধ্যে একটি দৃশ্যের বর্ণনাতে বলছেন, একদিন দেখছেন ব্রহ্মা হাঁসের পিঠে চেপে উঠোনের উপর দিয়ে যাচ্ছেন। রোদে ব্রহ্মার মুখটা লাল হয়ে গেছে, চন্দ্রামণি দেবী তাঁকে বলছেন ও ঠাকুর! তুমি কোথা থেকে আসছ। বলছেন অনেক দূর থেকে। চন্দ্রামণি দেবী আবার বলছেন, ঘরে পান্তা ভাত আছে খেয়ে একটু ঠাণ্ডা হও। তিনি একটু হেসে চলে গেলেন। চন্দ্রমণি দেবীর এই দিব্য দর্শন সত্যি না মিথ্যে, নাকি কল্পনা? বলা খুব মুশকিল। কারণ ঠাকুরের মায়ের জীবনের শেষের দিকে দক্ষিণেশ্বর ঠিক এই ধরণের একটা ঘটনা আছে। লীলাপ্রসঙ্গে শরৎ মহারাজ ঠাকুরের মায়ের শেষের দিকের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে ইংরাজীতে senile এই শব্দটা ব্যবহার করছেন, senile শব্দের অর্থ বার্ধক্যজনিত ভীমরতি। দক্ষিণেশ্বরে পাশেই ছিল কারখানা, কারখানায় সাইরেন বাজত। সাইরেন বাজতেই চন্দ্রামণি দেবী

বলতেন ‘বিষ্ণুলোকে খাওয়ার জন্য শাঁখ বেজেছে এবার আমাকে খেতে দাও’। ঠাকুর জানতেন এটা senility আর হৃদয়ও জানতেন এটা senility। রবিবার দিন কারখানা বন্ধ, বিষ্ণুলোকের শাঁখ বাজত না, তিনিও খাবেন না। বুড়ো মানুষ, না খেয়ে থাকলে সমস্যা হবে। দূর থেকে তাই মুখ দিয়ে সাইরেনের মত আওয়াজ করা হত। ঠাকুরের মা সেটা আবার নিজে দেখছেন ‘ওরে হৃদু এটা তুই বাজালি’। বিষ্ণুলোকের শাঁখ না বাজলে উনি খাবেন না। ঠাকুর কিন্তু একবারও বলছেন না যে মা বিষ্ণুলোকের শঙ্খধ্বণি শুনতে পেতেন। ঠাকুর, যিনি অবতার, তাঁর গর্ভধারিণী মা বার্ধক্যজনি কারণে মাথার গোলমাল হয়ে যাচ্ছে, মস্তিষ্কের বিকৃতি বলা হচ্ছে না। বাজছে সাইরেন আর উনি শুনছেন বিষ্ণুলোকে শাঁখ বেজেছে এবার আমি খাব, মানে ভগবান বিষ্ণু এখন খেতে বসেছেন। মায়ের কথা শুনে ঠাকুরও হাসছেন, হৃদয়রামও হাসছে। যেদিন শাঁখ বাজছে না, সেদিন হৃদয়রাম মুখ দিয়ে সাইরেনের মত আওয়াজ করছে, সেটা আবার উনি ধরে ফেলেছেন, হৃদু মুখ দিয়ে বাজাচ্ছে। সাইরেন বাজলে সেটাকে আবার অন্য দিকে নিয়ে যাচ্ছেন।

ঠাকুরের মায়ের এটাকে যদি আমরা কল্পনা বলে মেনে নিই তাহলে আগে যে তিনি এত দেবী দেবতাদের দর্শন করছিলেন সেগুলোকে আমরা কীভাবে নেব? কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার দিন যজমানদের বাড়িতে পূজা করে রামকুমারের ফিরতে দেরী হচ্ছিল। রাত্রিবেলা তিনি বাইরে বেরিয়ে ছেলের জন্য অপেক্ষা করছেন, তখন দেখলেন লক্ষ্মীদেবী রূপে একজন আসছেন। তিনি এসে ঠাকুরের মাকে বললেন ‘আমি ওখান থেকেই আসছি, তোমার ছেলেও আসছে’। তারপর দেখেন লক্ষ্মীদেবী লাহাদের বাড়ির দিকে ঢুকে গেলেন। এই ঘটনা কি সত্যি নাকি তাঁর কল্পনা? আসলে কোনটা ঠিক জানার কোন উপায় নেই। এই আলোচনাটা এই জন্যই করা হল, দেবতারা আছেন কিনা, স্বর্গলোক, পিতৃলোক আদৌ আছে কি নেই, আমাদের জানার কোন উপায় নেই। ঠাকুরের মায়ের এই কাহিনীগুলোকে যদি মাথায় রাখা হয় তাহলে ব্যাপারটা আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে। ওনার যেসব দেবী দেবতার দর্শন হচ্ছে এগুলো মিথ্যা নাও হতে পারে, হওয়ার কথাও নয়, কারণ দেবী এসে বলছেন রামকুমার আসছে, তারপর লক্ষ্মী লাহাদের বাড়ির ধানের গোলার দিকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। এটাও ঠিক যে লাহাদের প্রাচুর্য ছিল। দেবতাদের দর্শন তাঁর হতেই পারে। অথচ পরের দিকে senility হয়ে যাচ্ছে, সেটাও ঘটনা। তাহলে এই যে দেবী, দেবতা ও বিভিন্ন লোকের বর্ণনা যাঁরা করে গেছেন এগুলো কি তাঁদের কোন মনের কল্পনা, নাকি এনারাও কিছু দেখেছিলেন, নাকি senilityর লক্ষণ? জানার কোন উপায় নেই। যিনি অনুভব করেছেন এগুলো তাঁর কাছে একশ ভাগ সত্য ঠিকই। ধর্মের ব্যাপারে যে কোন কথা, মুক্তি বলুন, বন্ধন বলুন, ঈশ্বর বলুন, বিভিন্ন লোকের কথা বলুন, দেবী দেবতার কথা বলুন, যা কিছু শাস্ত্রে আছে তাই সত্য। যদি আপনি শাস্ত্রের কথা না মানতে চান তাহলে এর কোন কিছুই আপনার জন্য নয়। এরপরেই প্রশ্ন আসবে আমি শাস্ত্রকে কেন মানব? কারণ আমরা সব কিছুকে জানছি আমাদের ইন্দ্রিয় দিয়ে আর যুক্তিতর্ক দিয়ে, কিন্তু ইন্দ্রিয় দিয়ে বা যুক্তিতর্ক দিয়ে এই জিনিসগুলিকে জানা যায় না। আবার কিছু কিছু জিনিস আছে যেগুলো অতিন্দ্রিয়। এই জিনিসগুলিকে যিনি দেখছেন সবই তাঁদের অতিন্দ্রিয়ের অভিজ্ঞতা। তখন প্রশ্ন আসবে, অতিন্দ্রিয়ের ব্যাপার আর পাগলামোর ব্যাপারকে আমরা কি করে বিচার করে বুঝবো? সেটাও বোঝা যায়, তাঁর বাকি যে কার্যগুলি আছে সেই কার্য দিয়ে বিচার করতে হবে। প্রথমে দেখছেন শুদ্ধ চৈতন্য, তাঁর স্মৃতিতে কোন গোলমাল নেই, একদিকে শুদ্ধ চরিত্র, স্বার্থশূন্য অন্য দিকে জপ-ধ্যান-তপস্যা পুরোদমে চলেছে, সাধারণ জীবনযাত্রায় তাঁর মধ্যে কোন ধরণের senilityনেই। এরপর তিনি যে কথা বলবেন সেই কথার ব্যাপারে কোন প্রশ্ন করা যায় না। তাঁকে যদি প্রশ্ন করেন তাহলে বাবা-মাকেও সন্দেহ করা হয়ে যাবে। মা বলছে আমি তোর মা। সে যে তাঁর দত্তক সন্তান নয় তার কি গ্যারান্টি আছে? আমাদের জীবনের অনেক কিছুই মুখের কথার উপর চলে। এই মুখের কথাগুলো আসছে ঋষিদের থেকে যাঁদের চরিত্র একেবারে শুদ্ধ চরিত্র আর পবিত্র মন, তার থেকে আরও বড় হল স্বার্থ বলে তাঁদের কিছু ছিল না। তাঁদের যখন এই দিব্য দর্শনগুলো হচ্ছে এগুলো তাঁদের জন্য সত্য বটেই, তাঁদের শিষ্যদের কাছেও সত্য। কিন্তু ঠাকুরের মা যখন বিষ্ণুলোকের শাঁখের আওয়াজ শুনছেন তখন ঠাকুর আর হৃদয় হাসছেন কেন? কারণ এখানে তাঁর বার্ধক্য জনিত বিকার দেখা যাচ্ছে। আধ্যাত্মিক পুরুষের কখনই এই ধরণের senility থাকবে না। স্বামী ভূতেশানন্দজী, স্বামী রঙ্গনাথানন্দজীর

জীবন এখনও আমাদের স্মৃতিতে জ্বলজ্বল করছে। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁদের মস্তিষ্ক সম্পূর্ণ সজাগ। শেষ দিনেও যে কোন শাস্ত্রের ব্যাপারে কথা যখন বলছেন কোথাও সেখানে কোন ধরণের senility নেই, মন পুরো সজাগ। ঠাকুর বলছেন, আমার একটি কথা যদি মিথ্যে হয় তাহলে আমার সব কথা মিথ্যে। ঠাকুরের মায়ের শেষ জীবনের শেষ ঘটনায় বার্ধক্য জনিত বিকার দেখা যাওয়া মানে তাঁর জীবনের সব কিছুই সন্দেহের মধ্যে চলে আসবে। তার মানে এই নয় যে তাঁর সব কিছুই উড়িয়ে দিতে হবে।

সমগ্র বেদ দাঁড়িয়ে আছে সেই ধরণের উচ্চমানের ঋষিদের মুখের কথার উপরে, যাঁদের চরিত্র সম্পূর্ণ নিষ্কলঙ্ক। ঋষিদের ব্যাপারে কোথাও কেউ কোন সন্দেহ করার সুযোগই পাবে না। এই ধরণের ঋষিরা তাঁদের দিব্য অনুভূতি দিয়ে বিভিন্ন জিনিস দেখেছেন। বিভিন্ন জিনিসের মধ্যে কোথাও হয়তো কোন ফাঁক থেকে গেছে। যেখানে যেখানে ফাঁক থেকে গেছে সেগুলো তাঁরা হয়ত চিন্তা করেই দিয়েছেন, হয়তো নাও দিয়ে থাকতে পারেন। চিন্তা করেও যদি দিয়ে থাকেন সেটাকে নিয়েও কোন প্রশ্ন করা যাবে না। কারণ ঋষিদের মনের জগতটাও অত্যন্ত উচ্চমানের ছিল, মনে কোন রকম স্বার্থপরতা, আত্মকেন্দ্রিকতা ছিল না। যদি কেউ নির্দিষ্ট করে জানতে চান, যেমন দিল্লীর রাজা কে? স্পষ্ট করে বলে দেওয়া যাবে নরেন্দ্র মোদী। এইভাবে নির্দিষ্ট করে বলা যাবে না যে স্বর্গের রাজা ইন্দ্র। পিতৃলোকের রাজা হলেন, প্রথম যিনি মারা গিয়েছিলেন, তিনি যমরাজ, এভাবে নির্দিষ্ট করে বলা যাবে না। এগুলো এভাবে শাস্ত্রে চলে এসেছে, এরপর মেনে নেওয়া ছাড়া আমাদের আর কোন উপায় নেই। মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধি সাধনে ইন্দ্রেরও কোন প্রয়োজন নেই আর যমরাজারও কোন প্রয়োজন নেই। আর আমাদের বর্তমান আধ্যাত্মিক চিন্তাভাবনা একটা পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে বিবর্ধিত হয়ে অনেক উন্নত হয়ে গেছে। ঋষিরা দেবতা দেবী যা কিছু দেখেছিলেন ভুল কিছু দেখেননি, ঠিকই দেখেছিলেন। তাঁরা কিছু দিব্য সত্তাকে দেখে ছিলেন যাঁদের এই এই স্বভাব, ঋষিরা সেই দিব্য সত্তার একটা নাম দিয়ে দিলেন। পরের দিকে মহাভারত, পুরাণে দেবতা, স্বর্গলোক, নরক ইত্যাদি নিয়ে যত কাহিনী এসেছে তার কোনটারই কোন নির্ভরযোগ্যতা নেই। কারণ বেদে যে কথাগুলো আছে, যে কথাগুলো উচ্চমানের ঋষিরা দিয়েছিলেন, সেখান থেকে সেই কথাগুলোকে নিয়ে নিজের কল্পনা, নিজের কবিত্ব প্রতিভা দিয়ে একটা কাহিনী দাঁড় করিয়েছেন। কাহিনীর মধ্যে আধ্যাত্মিক সত্য আছে এতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু তার মধ্যে কথা ও কাহিনীর জাল বোনা হয়েছে তার কোন মাথামুণ্ড নেই। সেইজন্য বলা হয় on any given point of time বেদ হচ্ছে শেষ কথা। কারণ বেদে কোন কল্পনা ঢোকান হয়নি, কোন কবিত্ব ঢোকান হয়নি, ঋষিরা যেমনটি দেখেছিলেন তেমনটি দিয়ে গেছেন। আপনি যদি তাঁকে প্রশ্ন করতে চান অবশ্যই প্রশ্ন করতে পারেন, কিন্তু আপনি আর তাহলে হিন্দু থাকবেন না। হিন্দু থাকতে হলে বেদকে কোন প্রশ্ন করতে পারবেন না। তা নাহলে আপনি নাস্তিক বা অন্য কোন ধর্মকে বেছে নিতে পারেন। ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যকে ঠিক ঠিক ভাবে জানতে হলে এই কটি মৌলিক জিনিসগুলো ভালো করে বুঝে নিতে হবে।

ঋষিরা যে আধ্যাত্মিক সত্যগুলোকে দেখেছিলেন, এগুলো যেমন অন্য জগতের, ঠিক তেমনি আমাদের মস্তিষ্ক কিছু জিনিসকে সংস্কারবশতই হোক বা অন্য কোন কারণেই হোক অনেক কিছু ধারণা করে আছে। মস্তিষ্কে কোন কিছু হলে এই ধারণাগুলো যখন তখন পাল্টে যেতে পারে। জিম্বার্ডো নামে একজন মনস্তাত্ত্বিকের অধ্যাপক এই জিনিসটার নাম দিয়েছেন Alter State of Consciousness। বিভিন্ন কারণে মানুষের চেতনার স্তর পাল্টে যায়। যেমন গাঁজা খেলে তার state of consciousness পাল্টে যাবে, ড্রাগস নিলে state of consciousness পাল্টে যাবে। যার জন্য যারা ড্রাগস নেয় তারা সেটা আর ছাড়তে পারে না, কারণ তারা অন্য জগতে চলে যায়। অন্যে জগতে চলে যাওয়ার মানে, মস্তিষ্কে যে পথ দিয়ে নিউরোনাল কানেকশন হচ্ছে, সেই পথটা পুরো পাল্টে যাচ্ছে। এই পাল্টে যাওয়াটা যে কোন স্বাভাবিক অবস্থাতেও হয়ে যেতে পারে, ধ্যান-ধারণা করেও পাল্টে যেতে পারে। কিন্তু আমাদের এখানে ব্যাখ্যা করে বলে দিচ্ছে যে আমরা Alter State of Consciousnessকে মানি না। কিন্তু যখন এটাই শুদ্ধ মন থেকে হয় যেখানে আমিত্বের নাশ হয়ে যাচ্ছে তখন সেটাকে আমরা মানছি। তাহলে যে ড্রাগস্ নিচ্ছে তারও তো আমিত্বের নাশ হয়ে যাচ্ছে। ড্রাগস যারা নেয় তারা কোন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে পারেছ না বলে ড্রাগস নিয়ে পালিয়ে

থাকতে চাইছে। যারা ড্রাগস নেয়, গাঁজা খায় এদের আমিত্বের নাশ হয় না, এদের আমিত্বটা অত্যন্ত ঘন। আমি বাঁচতে চাই, কিন্তু এই জগতে বাঁচতে চাই না, অন্য জগতে বাঁচতে চাই, সেইজন্য সে গাঁজা, ভাং খাচ্ছে, ড্রাগস নিচ্ছে, এরপর অন্য জগতে ঢুকে যাচ্ছে। ঋগ্বেদের একটা মন্ত্রে ঋষি বলছেন –

প্র ভ্রাতত্বং সুদানবোহধ দ্বিতা সমান্যা।
মাতুর্গর্ভে ভরামহে।।ঋ-৮/৮৩/৮।।

কোন শিশু যখন জন্ম নেয় সে তখন কিভাবে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের দেবত্বের সাথে এক হয়ে যায় সেটাই এই মন্ত্রে বলা হচ্ছে। পরের দিকে এই ভাবটাই উন্নীত হয়ে চলে আস *অহং ব্রহ্মাস্মি* তে, আমি সেই ব্রহ্মের সাথে এক। এই মন্ত্রের দেবতা বিশ্বেদেবা, বিশ্বেদেবা এক বিশেষ গোষ্টিভুক্ত দেবতা। ভগবান সর্বত্র বিরাজমান আবার সবার মধ্যেই তিনি আছেন, অর্থাৎ সারা বিশ্ব জুড়ে তিনিই আছেন – ভগবানের এই বৈশিষ্ট্যতাকে নিয়ে এক শ্রেনীর দেবতা বানিয়ে দিলেন আর তার নাম দিলেন বিশ্বেদেবা। সেই বিশ্বেদেবাকে সম্বোধন করে বলা হচ্ছে, যদিও সরাসরি বৈশ্বেদেবার নাম করা হচ্ছে না, যিনি আমাদের ভরণপোষণ করেন, আমাদের প্রাচুর্য দেন, সেই দেবতাদের উদ্দেশ্য করে বলছেন – হে বিশ্বেদেবা, হে প্রাচুর্যদাতা, আমি যে মুহুর্তে মাতৃগর্ভে এসেছি সেই মুহুর্ত থেকে আমি তোমার দিব্য স্বভাব আর তোমার সাথে এক হয়ে গেলাম। *ভ্রাতত্বং*, তোমার সাথে আমার ভ্রাতৃত্বের যে সম্পর্ক সেই সম্পর্ক স্থাপিত হল। কখন? যে মুহুর্তে আমি মাতৃগর্ভে এসেছি। মন্ত্রের মূল বক্তব্য হল, একদিকে দেবতারা আছেন, তাঁরা দিব্য সত্তা, অন্য দিকে যিনি প্রার্থনা করছেন তিনি বলছেন, মাতৃগর্ভে আসার আগে আমি কোথায় ছিলাম জানি না। কিন্তু যে মুহুর্তে আমি মায়ের গর্ভে এসেছি, তার মানে যেদিন আমার অস্তিত্ব ঘোষিত হয়ে গেল সেদিনই এই যে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব এই অস্তিত্বের সঙ্গে আমি এক হয়ে গেলাম। হে বিশ্বেদেবা! তুমি এই অস্তিত্বেরই অঙ্গ, সেইজন্য তোমার সঙ্গে আমার একটা ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক হয়ে গেল। তুমি আর আমাকে কোন ভাবেই উপেক্ষা করতে পারো না। প্রকৃতির সাথে সমস্ত প্রাণির একটা একত্ব ভাব আছে, কোন আত্মা বা জীবাত্মা কোন ভাবেই প্রকৃতির থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। একটা ক্ষুদ্র জীবাত্মার মধ্যেই এই সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একটা ক্ষুদ্র সংস্করণকে ধরে রাখা হয়েছে। কেউ নিজেকে সবার থেকে আলাদা, পৃথক, বিচ্ছিন্ন ভাবতে পারে না। যে মুহুর্তে মাতৃগর্ভে জীবাত্মা নিজের অস্তিত্বকে নিশ্চিত করছে সেই মুহুর্ত থেকে সে এই বিশ্বেদেবার সাথে এক হয়ে গেল। ইদানিং কালে আমাদের মধ্যে যে সব ধারণা এসেছে, যেমন জীবাত্মা, যে জন্মেছে সে মরবেই, যে মরে গেছে যতক্ষণ তার মুক্তি না হয় তাকে আবার জন্ম গ্রহণ করতে হবে ইত্যাদি, এই ধারণাগুলো বেদে এত বেশি পুষ্টি লাভ করেনি। তাই বেদের ধারণা মাতৃগর্ভের প্রথম যে অস্তিত্ব পাচ্ছে সেই পর্যন্তই গেছে। বিজ্ঞানের কাছে এখন সমস্যা যে মানুষের মধ্যে ব্যক্তিত্ব বোধের চৈতন্য প্রথম কখন আসছে? মাতৃগর্ভে আসছে, নাকি জন্মাবার পর আসছে? বিজ্ঞান এই ব্যাপারে এখনও এক মত হতে পারেনি, বিভিন্ন ধর্মও এক মত হতে পারছে না। তবে মাতৃগর্ভে ছয় থেকে সাত মাস হলে শিশুর ব্যক্তি সত্তার চৈতন্য হয়, এটাই মোটামুটি এখন সবাই মেনে নিয়েছে। মন্ত্রে এটাই প্রমাণ করছে যে জন্ম নেওয়ার পর শিশুর আলাদা সত্তা তৈরী হয় বেদ মানছে না। বলছেন আমি যখন মাতৃগর্ভে এলাম, বলছেন না যে মাতৃগর্ভে আসার কত দিন পরে হচ্ছে। আমরা পুরাণে যে ভাবে পাই, আজকে হিন্দুদের মধ্যে যে বিশ্বাস তাতে বলা হয় মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত জন্ম-মৃত্যু চক্র চলতেই থাকবে। এই ধারণাকে গ্রহণ করলে এই মন্ত্রের কোন মূল্য নেই। কারণ যখন কেউ স্বর্গে থাকে, কেউ পশু পাখি হয়ে থাকে তখনও কিন্তু তার বিশ্বেদেবার সঙ্গে সম্পর্ক হয়ে রয়েছে। জন্ম-মৃত্যুর মধ্য দিয়ে জীবাত্মা সূক্ষ্ম শরীরকে নিয়ে যে বিভিন্ন যোনি, বিভিন্ন লোকে ঘুরে বেড়াচ্ছে এই ধারণাটা বেদের সময়ে তখনও দৃঢ় হয়নি। কিন্তু এই মন্ত্রে এই ধারণারই একটা আভাস পাওয়া যাচ্ছে। তারপরে বলছেন –মা বাবা যেমন নিজের সন্তানকে আইনত ত্যাগ করতে পারেনা ঠিক তেমনি হে বিশ্বেদেবা, তুমি কিন্তু আমাকে কখনই ছেড়ে চলে যেতে পারবে না। আর আমি তোমার দেবত্বের একটি অঙ্গ হয়ে গেলাম।

এই মন্ত্রকে নিয়ে পরবর্তিকালে অনেক দর্শন তৈরী হয়েছে, অনেকেই অনেক কিছু লিখেছেন। যেমন বলা হয়েছে – যে মুহুর্তে আমি মাতৃগর্ভে এসেছি সেই মুহুর্তে আমি তোমার দিব্য স্বভাবের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে গেছি। এরই প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়, যেটা স্বামীজী উল্লেখ করেছিলেন – *শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্যা পুত্রা আ যে*

ধামানি দিব্যানি। মানুষের মধ্যে যে দিব্যত্বের কথা বলা হয়, এই দিব্যত্ব ঠিক কোন জায়গা থেকে শুরু হয়? বলা হচ্ছে যে মুহুর্তে সে মাতৃগর্ভে এলো, এই বিন্দু থেকেই সে দিব্যত্বের অধিকারী হয়ে গেল। সাধনা করে করে আমি যখন ঈশ্বরের সঙ্গে আমার একত্বকে উপলব্ধি করার পরেই যে আমি দিব্যত্বের অধিকারী হচ্ছি তা নয়। দিব্যত্ব আমার মধ্যে সুপ্ত হয়ে রয়েছে, এই সুপ্ত অবস্থার কথাই এই মন্ত্রে বলা হচ্ছে। সাধনার দ্বারা যখন আমার জ্ঞান হবে তখন এই সুপ্ত দিব্যত্বের প্রকাশ হবে। মাতৃ জঠরে যখন কোন প্রাণের সঞ্চার হয় তখন তার মধ্যে দিব্যত্ব সুপ্ত অবস্থায় চলে আসে। এই দিব্যত্বকেই এখন উপলব্ধি করতে হবে। অন্তর্নিহিত সুপ্ত দিব্যত্বকে জাগ্রত করার কথাই মন্ত্রে বলা হচ্ছে।

খ্রীশ্চান আর ইসলাম ধর্মের প্রভাবে ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের একটা বিচিত্র ধারণা তৈরী হয়ে আছে। আমরা মনে করি ঈশ্বর হলেন একজন কঠোর রাজা, আকাশের কোথাও তিনি বসে আমাদের শাসন করছেন, যিনি নিয়মকানুনকে একটুও এদিক সেদিক হতে দেন না। আধ্যাত্মিক রাজ্যে এই ধরণের ধারণাগুলি অনেক সমস্যা তৈরী করে। ছোটবেলা থেকে বড়দের কাছে শুনে, কয়েকটা পপুলার ধর্মীয় গ্রন্থ পড়ে, কিছু বাবাজীদের কাছ থেকে বিচিত্র ধরণের ধর্মীয় কথাবার্তা শুনে আমাদের মনে জীবন ও ঈশ্বর সম্বন্ধে অদ্ভূত অদ্ভূত সব ধারণা তৈরী হয়ে আছে। জীবনের প্রতি আমাদের যে ধারণা সেটা যেমন বিচিত্র, ঈশ্বরের প্রতিও আমাদের ধারণা বিচিত্র। আমি যদি কোন দোষ করি, ঈশ্বর আমাকে শাস্তি দেবেন, ভালো করলে এই ঈশ্বরই আমাকে ভালো ফল দেবেন। এটাই পপুলার ধর্মের ভাব। খ্রীষ্ট ও অন্যান্য ধর্ম এই ভাব ও ধারণার উপরই দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু আধ্যাত্মিকতা প্রথমেই এই পাপবোধ, অপরাধবোধের ধারণাকে ফুঁ মেরে উড়িয়ে দেবে। ছোটবেলা থেকে আমরা শুনে এসেছি – দোষ করবে না ভগবান তাহলে শাস্তি দেবেন। কিন্তু চোখের সামনে দেখছি দোষ করার পর কেউ শাস্তি পাচ্ছে না, সবাই বহাল তবিয়তে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর যত ঝামেল সব ভালো লোকদের উপরই এসে পড়ে। তখন বলবে, মরার পর বিচার হবে, ভালো কাজ করলে স্বর্গে পাঠাবে আর খারাপ কাজ করলে নরকে বা জাহান্নমে পাঠাবে। কে দেখেছে মরার পর স্বর্গে যাচ্ছে বা নরকে যাচ্ছে? মনুস্মৃতিতেও বলছে, সে যদি শাস্তি না পায় তার ছেলে পাবে, ছেলে যদি না পায় তার নাতি পাবেই পাবে। এগুলো সান্ত্বনা দেওয়া ছাড়া কিছুই না। আমরা তো একটি বদমাইশ লোকও দেখলাম না যে শাস্তি পাচ্ছে। আসলে আমরা এতই দুর্বল চিত্তের যে এসব পাপ, অনাচারের কথা শুনে শুনে নিজের চোখে দেখে দেখে আমাদের মনকে ভারাক্রান্ত করে নিজেকেই শেষ করে রেখেছি। ভগবান হয়ত শাস্তি দেন বা হয়ত দেন না। যারা ভীতু, দুর্বল তারা মেনে নেয়। যারা বদমাইশ তারা মানবে না, বলবে, যা হবার পরের জন্মে হবে এই জন্মে তো ভোগ করে নিই। আধ্যাত্মিকতায় এসবের কোন স্থান নেই।

আধ্যাত্মিকতার উপর আলোচনা করতে গিয়ে অনেকে অনেক কিছুই বলে। কিন্তু একটা কথা প্রায়ই আলোচনায় আসে তা হল দিব্য একত্ব। কোন খোলা মাঠে বা বাড়ির ছাদে খোলা আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে দু বাহু সামনের দিকে প্রসারিত করে যদি ভাবতে থাকি – এই যে উন্মুক্ত আকাশ, সামনে প্রকৃতির বিশাল রূপ এই পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন সমষ্টি রূপে একক কোন সত্তা, আর আমিও সেই একক সত্তার একটি অঙ্গ। এই অঙ্গ রূপে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সাথে কোথাও আমার কোন আলাদা বোধ নেই। যেমন আমার শরীরের হাত আলাদা, পা আলাদা, চোখ, কান, নাক এগুলো সবই আলাদা অথচ আমি জানি সব অঙ্গ মিলেই আমার এই সম্পূর্ণ ব্যক্তি সত্তা। যখন হাতের কথা ভাবছি তখন হাত আর হাতের আঙুল আলাদা বোধ থাকতে পারে, কিন্তু যখন নিজেকে আমি বলে ভাবছি তখন সবটাই একক সত্তা রূপে দেখছি। ওই একক সত্তার মধ্যে আমি দেখছি আমার হাত, পা সব আলাদা আলদা। দিব্য একত্বের বোধ যার হয় তখন সে সব কিছু এভাবেই দেখে। এই যে পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এর সাথে আমি এক, গাছপালা আলাদা, নদী, পাহাড়, বাড়ি সব আলাদা আলাদা, তথাপি সবটাই একটা একক সত্তা রূপে বিরাজ করে আছে। আমার শরীর সেই একক সত্তারই একটা অঙ্গ, কিন্তু আসল আমি বলতে যেটা বোঝায় সেই আমি বোধের চেতনা, এই সচেতনতা পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে এক। ঠিক এই ভাবটাই বিশ্বেদেবাকে উদ্দেশ্য করে ঋষি বলছেন – হে ভগবান! যেদিন আমি মায়ের গর্ভে এসেছি সেদিন থেকে এই দিব্য সত্তার সঙ্গে আমি এক, সেইজন্য তুমি আর আমাকে উপেক্ষা করতে পারো না। তার

মানে পাপ বোধ, শাসনের ভয়, শাস্তির ভয় এগুলোকে পুরোপুরি উড়িয়ে দেওয়া হয়ে গেল। আধ্যাত্মিকতা যখনই এসে যাবে তখনই একত্ব বোধ চলে আসবে। এই একত্ব বোধের উপর ঋষি জোর দিচ্ছেন এই বলে যে, যে মুহুর্তে আমি মায়ের গর্ভে এসেছি সেই মুহুর্তেই আমি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে এক হয়ে গেলাম। সাধনা করার পর বা অদ্বৈত জ্ঞান হওয়ার পর তাঁর এই একত্ব বোধ হচ্ছে তা নয়, তখন থেকেই আমি তোমার সাথে এক, সেইজন্য তুমি আমাকে অবহেলা করতে পারো না।

এই ভাব ঠাকুরও বলছেন, বাপ-মা যদি ছেলেকে না দেখে তাহলে কি বামুনপাড়ার লোক এসে দেখবে! ভগবানের সাথে প্রথম দিন থেকেই সবারই একটা দিব্য সম্পর্ক হয়ে আছে, আমি ভগবানের সাথে এক, সেইজন্য আমাকে অবহেলা করা যাবে না। আমাদের শাস্ত্রও তাই বলে, যে শিশু জন্ম নিতে যাচ্ছে তারও খাবারের ব্যবস্থা আগে থেকেই ভগবান করে রাখেন, মায়ের স্তনে তিনিই দুধের ব্যবস্থা করে দেন। এমনকি সাধারণ থেকে অতি সাধারণ জীব তাদেরও শিশু ডিম থেকে যখন বেরিয়ে আসবে তারও খাবারের ব্যবস্থা করে রেখেছেন। যেমনি কোন প্রাণী জীবজগতে এসে গেল, এবার যে তার প্রাণ সঞ্চারন হবে তারও ব্যবস্থা ঠাকুর করে রেখেছেন। কারণ একটা দিব্য একত্বের সম্পর্ক রয়েছে, অন্য সময় আমরা হয়ত বুঝতে পারি না। কিন্তু এই দিব্য একত্বকে যদি আমরা বুঝে নিতে পারি তাহলে আমাদের সব দুঃখ-কষ্ট চলে যাবে। আমি যেমন আমার আমিকে কখনই উপেক্ষা করতে পারি না, আমি আমার সঙ্গে এক, ঠিক তেমনি ঈশ্বর আমাদের কখন ছেড়ে রেখে দিতে পারেন না, ঈশ্বর আর আমাদের মধ্যে একটা দিব্য একত্বের সম্পর্ক রয়েছে। অগ্নির প্রতি একটা মন্ত্রে বলছেন –

অগ্নিং মন্দ্রং পুরুপ্রিয়ং শীরং পাবকশোচিষম্।
হৃদ্ভির্মন্দ্রেভিরীমহে।।

আমরা আনন্দপূর্ণ হৃদয়ে সেই দেবতারই আরাধনা করছি যিনি আনন্দপূর্ণ। যাঁকে আরাধনা করা হচ্ছে তিনি আনন্দে পরিপূর্ণ আর যিনি আরাধনা করছেন তিনিও আনন্দে পরিপূর্ণ। মূলতঃ এই মন্ত্রে একটি চরম সত্যকে বলে দেওয়া হল, একমাত্র আনন্দপূর্ণ হৃদয় দিয়েই আনন্দময় ঈশ্বরকে পূজা করা যায়। দুটোর মধ্যে একটা যদি না থাকে তাহলে আর পূজা হবে না। যদি ঈশ্বরকে সেমেটিক ধর্মের ঈশ্বর রূপে দেখে, অর্থাৎ ঈশ্বর হাতে একটা ডাণ্ডা নিয়ে সবাইকে শাসন করছেন, এই মন্ত্র তার জন্য নয়। ঈশ্বরের প্রতি যদি কোন ধরণের ভয়ের ভাব থাকে, এই মন্ত্র তার জন্য নয়। ভেতরে প্রচুর চাহিদা আছে আর এও বিশ্বাস যে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা হলে তিনি সব চাহিদা পূরণ করে দেবেন, এই মন্ত্র তার জন্য নয়, শুধু এই মন্ত্রই নয় বেদের কোন মন্ত্রই এদের জন্য নয়। বেলুড় মঠের গর্ভ মন্দিরে যিনি বসে আছেন, যিনি সর্বেশ্বর মহাদেব, যিনি ঈশ্বরেরও ঈশ্বর, যিনি শুদ্ধ জ্যোতির্জ্যোতিরময়, যিনি আনন্দঘন তাঁর কাছে আমরা যাচ্ছি, তাঁকে দর্শন করছি। আমাদের মনে কত রকমের দুর্বলতা, কত ধরণের কামনা-বাসনা জমে আছে, কত ধরণের ক্রোধ, বিদ্বেষ ভাবে মন বিষিয়ে আছে, ঠাকুরের কাছে যাবার আগে আমরা একবারও কি ভাববো না যে এই মন নিয়ে আমি কার কাছে যাচ্ছি! সন্ন্যাসীরা যখন গর্ভ মন্দিরে ঠাকুরকে প্রণাম করতে যান, যাওয়ার অনেক আগে থেকে তাঁরা মনে মনে একটা প্রস্তুতি নিতে শুরু করে দেন, পরনের বস্ত্র শুদ্ধ হতে হবে, মন থেকে সমস্ত রকম নেগেটিভ ভাব সরিয়ে দিতে হবে। নিজের ঘর থেকে বেরোবার আগে পা ধুয়ে নেবেন, মন্দিরে ওঠার আগে আবার পা ধোবেন, গর্ভ মন্দিরে প্রবেশ করার আগে সারা অঙ্গে গঙ্গাজল ছিটিয়ে নিজেকে পবিত্র করে নেবেন। এই প্রস্তুতি যদি না থাকে তাঁরা ঠাকুরের সামনে যাবেনই না। এত কিছু করার পেছনে যে কারণ সেটা এই মন্ত্রেই পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে – *শীরং পাবকশোচিষম্ হৃদ্ভির্মন্দ্রেভিরীমহে*। যাঁর কাছে আমি যাচ্ছি তিনি সবারই প্রিয়, জ্যোতির জ্যোতি, পবিত্র আবার অপরকেও পবিত্র করে দেন, তিনি আনন্দময়, আমিও তাঁর সম্মুখে দাঁড়াচ্ছি আনন্দপূর্ণ হৃদয় নিয়ে। আনন্দে পরিপূর্ণ না থাকলে কখনই মন্দিরে যেতে নেই। স্বামীজী তো আরও কড়া ভাষায় বলছেন, তোমার গোমড়া মুখকে জগতকে দেখিও না, গোমড়া মুখ থাকলে দরজা জানলা বন্ধ করে ঘরের ভিতর বসে থাক। আর ঈশ্বরের ব্যাপারে তো কোন প্রশ্নই নেই তিনি আনন্দময় পুরুষ, তিনি রসস্বরূপ। বিয়ে বাড়িতে

যাওয়ার সময় আমরা কত সাজগোজ করে কত আনন্দ নিয়ে যাই আর জগতের যিনি রাজাধিরাজ, তাঁর কাছে যখন যাচ্ছি তখন আমাদের মন, শরীর সবটাই কলুষিত।

বৈদিক ধর্মের সাথে অন্যান্য প্রাচীন ধর্মের এখানেই পার্থক্য দেখা যায়। ফ্রয়েডের থিয়োরিতে ধর্মের উৎস হল ভয়। তাদের মতে জগতে যা কিছু হয় লিভিডো আর মর্ডিডোর জন্য, লিভিডো হল ভালোবাসার আকাঙ্খা আর মর্ডিডো হচ্ছে ধ্বংস করার বাসনা। এদের কাছে desire to love and desire to destruction এই দুটো ছাড়া জগতে আর কিছু নেই। যদিও ফ্রয়েডের থিয়োরি সভ্য সমাজ বাতিল করে দিয়েছে কিন্তু এক সময় সারা বিশ্বের সমস্ত বুদ্ধিজীবিদের বিশেষ করে যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে ফ্রয়েডের থিয়োরি প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করেছিল। এখনও অনেকে অনেক ব্যাপারে ফ্রয়েডের কথা উল্লেখ করেন। ফ্রয়েড বললেন ধর্মের উৎস এই লিভিডো আর মর্ডিডো। কালীঘাটে বলি দেয় এর পেছনে আছে desire to destruction, নিজের ভেতরে যে হিংসা ভাব জমে আছে সেই হিংসা ভাবটা পাঁঠাকে বলি দিয়ে মিটিয়ে নিচ্ছে। আবার মানুষ যেমন নিজের বাবাকে ভালোবাসে, আবার ভয়ও পায়, এই ভয় থেকে বাবাকে শ্রদ্ধা করে, ঈশ্বরকেও মানুষ ভয়ে ভালোবাসে, পূজা করে। আজকে শ্রীরামকৃষ্ণের যে ধর্ম তার সাথে ওল্ড টেস্টামেন্টের তুলনা করা যাবে না, কারণ ওল্ড টেস্টামেন্টের ধর্ম খুবই প্রাচীন। তখনকার মানুষের যে চিন্তা ভাবনা ছিল তার সাথে আজকের মানুষের চিন্তা ভাবনাকে তুলনা করা যাবে না। তবে ওল্ড টেস্টামেন্টের সাথে বেদের তুলনা করা যেতে পারে। কিন্তু ওল্ড টেস্টামেন্টের থেকে বেদ আবার পাঁচ থেকে ছ হাজার বছরের পুরনো। তাতেও দেখা যাবে বেদের তুলনায় ওল্ড টেস্টামেন্টের ঈশ্বরের ধারণা অনেক অপরিণত। আর ওল্ড টেস্টামেন্টের বিভিন্ন অপরিণত ধারণাকে আধার করেই ফ্রয়েড নিজের সব আজগুবি থিয়োরি তৈরী করেছিলেন। এখানে এই মন্ত্রে বেদ কি বলছে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে - *অগ্নিং মন্দ্রং পুরুপ্রিয়ং* – আমরা হৃদয়ের আনন্দ দিয়ে আমাদের আনন্দের বিগ্রহকে, যিনি আনন্দের প্রতিমুর্তি তাঁর উপাসনা করছি। অথচ কার পূজা করছে? অগ্নির, সে তো সবাইকে তার দাহিকা শক্তি দিয়ে ভস্ম করে দেয়। কিন্তু তাঁকেই বলছেন আনন্দের প্রতিমুর্তি, আধ্যাত্মিকতার অনুভূতি যতক্ষণ ভেতরে না হবে ততক্ষণ এ জিনিস কখনই আসবে না। প্রত্যেক দেশে, প্রত্যেক সমাজে সে প্রাচীন কালেই হোক আর আজকেই হোক সব ক্ষেত্রে আগুনকে মানুষ স্বাভাবিক ভাবেই ভয় পায়। তা সত্ত্বেও বেদ বলছে অগ্নি হলেন আনন্দের বিগ্রহ, আমরা আমাদের হৃদয়ের আনন্দ দিয়ে তাঁর পূজা করছি। অগ্নির যেটা স্থুল রূপ, যেটাকে জাগতিক রূপে দেখছি, তার যদি পূজা করা হত তাহলে আর এই মন্ত্রটা আসত না। অগ্নি কে? তিনি আনন্দময়, তিনি পবিত্র, তিনি জ্যোতিরও জ্যোতি আর তিনি অপরকেও পবিত্র করেন। আমিও আমার আনন্দপূর্ণ হৃদয় নিয়ে তাঁর কাছে তাঁর উপাসনা করতে এসেছি।

যাঁর হৃদয় আনন্দে পূর্ণ, সেই আনন্দপূর্ণ হৃদয় দিয়েই আনন্দস্বরূপের পূজা করা যায়। শিবের পূজা কে করতে পারেন? যিনি শিব হয়েছেন। ঈশ্বরের পূজো কে ঠিক ঠিক করতে পারেন? যিনি সিদ্ধের সিদ্ধ তিনিই করতে পারেন। কোন সন্ন্যাসীকে যখন ভক্তরা বলেন আপনি ঠাকুরের ব্যাপারে কিছু বলুন। সন্ন্যাসী তখন ভক্তকে এই কথাই বলেন আমি যদি ঠাকুরের কথা আপনাকে বলি আপনি কি বুঝবেন! বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র যাঁরা ছিলেন তাঁরাই তাঁকে বুঝতে পারেন না, আমার আপনার কথা তো কোন ছাড়। বাচ্চা ছেলে যেমন বলে ঈশ্বরের দিব্যি, সেখানে ঈশ্বর বলতে বাচ্চা যেটুকু বোঝে আমরাও ঈশ্বর বলতে ততটুকুই বুঝি। কোথাও থেকে ভেতরে একটা সংস্কার হয়ে গেছে যার জন্য আমরা ঠাকুরের কাছে যাচ্ছি, জপ-ধ্যান করছি, কিন্তু হৃদয়ের এমন একটা পরিবর্তন হয়ে যাবে যেখান থেকে তীব্র একটা আকুতি আসবে যে আমাকে এটাই করতে হবে, এটাই আমার প্রাণ, এছাড়া আমি বাঁচতে পারবো না, এই জিনিস সহজে হয় না। এই তীব্র আকুতি যখন একটু আসতে শুরু করে এবং সেখান থেকে যখন আস্তে আস্তে এগোতে শুরু করে তখন দেখে তিনি নিজেও আনন্দময় আর যাঁর পূজো জপ-ধ্যান করছেন তিনিও আনন্দময়। তার আগে আমাদের যত পূজা, অর্চনা সবই নিরানন্দময়, কারণ আমরা সব সময় অপূর্ণতাতে পরিপূর্ণ। জান্তে অজান্তে কত রকমের যে অপূর্ণতা আমাদের নিরানন্দ করে রেখেছে ভাবতেও পারবো না। অপূর্ণতা ছাড়া আমরা থাকতেই পারি না। মন্ত্রে বলছেন আমরা স্বরূপতঃ পূর্ণ, আনন্দস্বরূপ, এই অপূর্ণতার ভাবকে সরিয়ে আমাদের হৃদয়ের আনন্দ দিয়ে সেই আনন্দস্বরূপেরই পূজা করি।

প্রথমের দিকে আমরা সিদ্ধের সিদ্ধ নিয়ে একটা বড় আলোচনা করেছিলাম, যার মূল ভাব হল ভগবানের ইতি করা যায় না। ভগবানকে ত্রাতা রূপে ভাবা এটাও একটি ভাব। আমরা বলছি বটে আমাদের অপূর্ণতা আছে, অপূর্ণতার জন্য কষ্ট আছে, কিন্তু যিনি সিদ্ধের সিদ্ধ তাঁর তো ঈশ্বর ছাড়া কেউ নেই, তাঁর কষ্ট হলে তিনি কার কাছে যাবেন? ঠাকুরের হাত ভেঙে যাওয়ার পর তাঁরও ব্যাথা লাগছে, ব্যাথার কথা তিনি কাকে বলবেন! মাকে বলছেন 'মা! বড় লাগছে'। গলার ক্যান্সারের জন্য কিছু খেতে পারছেন না, শরীরটা দিন দিন শীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। শরীরের জন্য কিছু বলতে চাইছেন না। শেষে মাকে বলছেন 'মা! খেতে পারছি না'। মা শিষ্যদের দেখিয়ে বললেন 'এতগুলো মুখে তুমিই তো খাচ্ছ'। আমি কার কাছে যাব, কার কাছে গিয়ে আমার কষ্টের কথা জানাব, ঈশ্বর ছাড়া তো তাঁর আর কেউ নেই। তিনি ত্রাতা, তাঁর কাছেই যাব। মন্ত্রে বলছেন –

ত্রাতারমিন্দ্রমবিতারমিন্দ্রং হবেহবে সুহবং শূরমিন্দ্রম্।।
হ্বিয়ামি শক্রং পুরুহিতমিন্দ্রং স্বস্তি নো মঘবা ধাত্বিন্দ্রঃ।।

কেউ যদি মনে করে আমি খুব কষ্টের মধ্যে আছি তখন এই মন্ত্রটি রোজ পাঠ করলে ধীরে ধীরে কষ্ট থেকে বেরিয়ে আসবে। মন্ত্রের দেবতা ইন্দ্র। এর আগেও আমরা বলেছি ইন্দ্র বলতে দুজনকেই বোঝায়, ইন্দ্র একজন দেবতা আবার ইন্দ্র যিনি ঈশ্বরের রূপ। স্বামীজীও বেদের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলছেন ব্যক্তি ঈশ্বরের ধারণা ঋষিদের মধ্যেও ছিল। কিন্তু বোঝা যায় তাঁরাও ব্যক্তি ঈশ্বর নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন না, যার জন্য থেকে থেকে ওনারা অনন্তের দিকে চলে যাচ্ছেন। ইন্দ্রকে একদিকে একজন দেবতা, যে দেবতা ঈশ্বরের অনেক নীচে সেই রূপে যেমন দেখছেন তেমনি সেই দেবতার মাধ্যমে তাঁরা ঈশ্বরকেও দেখছেন। সেই ঈশ্বরের যে গুণ সেই গুণগুলি ইন্দ্রের উপরেই আরোপ করে দিচ্ছেন। ঈশ্বরের একটি গুণ হল তিনি *ত্রাতারম্*, মন্ত্রে *ত্রাতারম্* শব্দটাই প্রধান। বলছেন, আমরা তাঁরই প্রার্থনা করব যিনি ত্রাতা রূপে আমাদের সব দুঃখ-কষ্ট থেকে ত্রাণ করেন। এই মন্ত্রটি এতই গুরুত্ব পেয়েছে যে প্রত্যেকটি বেদেই এসেছে।

ইন্দ্রের অনেকগুলো গুণের কথা বলছেন, ইন্দ্র *ত্রাতারম্* যিনি রক্ষা করেন, *অবিতারম্*, যিনি দুঃখ-কষ্ট থেকে বার করে আনেন, *শূরম্*, যিনি শক্তিমান, শক্তি আছে বলেই তিনি সব কিছু থেকে রক্ষা করতে সামর্থ, শক্তি আছে বলেই তিনি দুঃখ-কষ্ট থেকে বার করে নিয়ে আসতে পারেন। *পুরুহুতম্*, অনেকেই তাঁকে বন্দনা করেন, আমিও তাঁর প্রার্থনা করছি তিনি যেন আমাদের উপর কৃপা করেন। এই যে ধারণা ঈশ্বর আমাদের ত্রাতা, তিনি ত্রাণ করেন, এই ভাবটাই পরের দিকে ভক্তি সাহিত্যে একটা বিশেষ স্থান পেয়েছে। মহাভারতে দ্রৌপদীর যখন চীর হরণ হচ্ছে দ্রৌপদী তখন শ্রীকৃষ্ণকে ত্রাতা রূপে প্রার্থনা করছেন। নামকরা উপাখ্যান গজেন্দ্রমোক্ষ উদ্ধার ভাগবতে এসেছে। গজেন্দ্র নামে একটি হাতিকে কুমির ধরেছে। কুমিরের সাথে গজেন্দ্র অনেকক্ষণ লড়াই করেছে, কিন্তু কুমিরের গ্রাস থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারছিল না। কারণ জলে কুমিরের প্রচণ্ড শক্তি। তখন গজেন্দ্র বিষ্ণুর স্তুতি করতে শুরু করলেন, আর এই ধরণের মন্ত্র দিয়েই আরাধনা করছেন। আরাধনার পর বিষ্ণু এসে কুমিরের গলাটা কেটে দিলেন। ভক্তিমার্গের সাধকরা ব্যাপারটা ঠিক এভাবেই দেখেন, ভগবান স্বয়ং এসে আমাদের ত্রাণ করেন। এগুলো নিয়ে অনেক মজার মজার কাহিনীও আছে।

গীতায় ভগবান বলছেন *যোগক্ষেমং বহাম্যহম্*, আমার ভক্তের যোগক্ষেম আমিই বহন করে নিয়ে যাই। অনেক আগে একজন খুব নামকরা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি শ্রীধর স্বামীর গীতার টীকার উপর ভাষ্য লিখছিলেন। তখনকার দিনে ব্রাহ্মণরা সবাই গরীব ছিলেন, বাড়িতে রোজ হয়ত খাবারও জুটত না। ওই রকম এক ব্রাহ্মণ গীতার ভাষ্য লিখছেন। যেখানে ভগবান বলছেন *যোগক্ষেমং বহাম্যহম্*, ভগবান বলছেন আমি ভক্তের যোগক্ষেম নিজে বয়ে নিয়ে যাই। ব্রাহ্মণ অনেক চিন্তা ভাবনা করছেন, *বহাম্যহম্* শব্দতে এসে ভাবছেন *বহ্যম্যহম্* কি করে হবে, কিছু একটা ভুল আছে, ভগবান নিজে কি করে বয়ে নিয়ে যাবেন! *দদাম্যহম্*, আমি দিয়ে দিই! তখনকার দিনে ছাপার অক্ষর ছিল না, উনি তখন কালি দিয়ে *বহাম্যহম্* শব্দটা কেটে নীচে *দদাম্যহম্* লিখে দিলেন। তারপর উনি অন্য গ্রামে ভিক্ষা করতে বেরিয়ে গেছেন। এদিকে খুব সুন্দর দেবসুলভ গৌরবর্ণের চেহারার একটি কিশোর চাল-ডাল, অনেক আনাজপত্র চুপড়িতে চাপিয়ে মাথায় করে ব্রাহ্মণীর কাছে

এসেছে। ব্রাহ্মণী কিশোর ছেলেটি জিজ্ঞেস করছে ‘তুমি কে, আর এত কিছু কোথা থেকে নিয়ে এলে’? ছেলেটি বলছে ‘আপনার স্বামী আমাকে দিয়ে এগুলো পাঠালেন’। ব্রাহ্মণী দেখছেন বেত মারলে যেমন দাগ হয় ছেলেটির পিঠের ফর্সা চামড়ায় সেই রকম লাল লাল দাগ। ব্রাহ্মণী জিজ্ঞেস করছেন ‘তোমার পিঠে এগুলো কিসের দাগ’। বলছে ‘আপনার স্বামী আমাকে মেরেছেন। আমি মালপত্রগুলো আনতে চাইছিলাম না, উনি মনে করলেন আমি নিয়ে আসব না তাই আমাকে মেরেছেন’। ব্রাহ্মণী বলছেন ‘আমার স্বামী কখনই এই রকম নির্দয় কাজ করতে পারেন না’। ‘বিশ্বাস করুন! আপনার স্বামীই আমাকে মেরেছেন, এই আমি সব দিয়ে গেলাম’ বলে ছেলেটি চলে গেল। ভিক্ষা করে ব্রাহ্মণ সে রকম কিছুই পায়নি, প্রায় খালি হাতেই বাড়ি ফিরে এসেছেন। ব্রাহ্মণ এসে স্ত্রীকে বলছেন ‘আজ তেমন কিছু ভিক্ষা পাওয়া গেল না’। স্ত্রী বললেন ‘কেন! তুমি তো সবই পাঠিয়ে দিয়েছ’। ব্রাহ্মণ অবাক! আমি কী পাঠাব আর কাকে দিয়েই পাঠাতে যাব! কিন্তু দেখছেন বাড়িত সব জিনিসপত্র এসে হাজির। ব্রাহ্মণ জিজ্ঞেস করলেন ‘কে এনেছে এসব’? স্ত্রী বললেন ‘যাকে তুমি মেরেছ’। ‘আমি কাকে মেরেছি, আমি কাউকে তো মারিনি’। ‘তুমি কী বলছ! ওই সুন্দর ফুটফুটে ছেলেটি মাথায় অত বোঝা নিয়ে এসেছিল আর তার পিঠে বেত মারার দাগ’। তখন ব্রাহ্মণের চোখ খুলে গেল, ভগবান নিজেই আমার জন্য বয়ে নিয়ে এসেছেন। ব্রাহ্মণের দুচোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এসেছে। সেই লেখাটা কেটে আবার *বহাম্যহম্* করে দিলেন। পরের দিকে গীতার ভাষ্যকাররা *যোগক্ষেমং বহাম্যহম্* এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলছেন, যাঁরা ঈশ্বরের ঠিক ঠিক ভক্ত তাঁর জন্য তিনি নিজে বয়ে নিয়ে আসেন। বাকীদেরও তো তিনিই দেন। সবাইকে ভগবানই দেন ঠিকই, কিন্তু বাকীদের পুরুষকারের দ্বারা দেন, তাদের কাজ করিয়ে দেন। ঠিক ঠিক ভক্তদের তিনি নিজেই দিয়ে দেন। ঠাকুর বলছেন ঠিক ঠিক ভক্ত হল রাজার ব্যাটা, রাজার ব্যাটার মাসোয়ারা এমনিতেই এসে যায়। ত্রাতা রূপে তিনি ঠিক এভাবেই ত্রাণ করেন। অন্যান্যদের রক্ষা নিজের জোরে হয়।

আমরা সবাই দুর্বল, অপরের উপর আমাদের ভরসা করতে হয়, ঈশ্বরের উপর ভরসা করতে পারি না। ঈশ্বরের উপর ভরসা নেই বলে বাড়ির লোক, ব্যাঙ্ক ব্যালেন্সর উপর আমাদের ভরসা করে থাকতে হয়, তার উপর আবার রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে, নানার রকম ক্ষমতাবান লোকদের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চলতে হয়। কিন্তু শেষমেশ রক্ষা তিনিই করেন। অল্প বয়সী সন্ন্যাসী বা ভক্তদের ধারণা আছে কিন্তু ভাব দৃঢ় থাকে না। প্রবর্তক অবস্থায় ভাব দৃঢ় থাকে না বলে পুরোপুরি ঈশ্বরের উপর ভরসা করতে পারে না, কিন্তু পরে পাল্টে যায়। দেখা যায় যার বয়স যত কম, ধারণা যত কম সে তত বেশি ভক্তির কথা বলে। বয়স যত বাড়তে থাকে তখন আস্তে আস্তে এই দৃষ্টিভঙ্গীটা পাল্টে গিয়ে স্বাভাবিক হতে শুরু করে। সেইজন্য সাধু সন্ন্যাসীদের ঠিক ঠিক সাধনা অনেক পরে শুরু হয়। সাধনা করে এই ভাব দৃঢ় হয়ে গেলে ওখান থেকে তাঁকে আর নড়ানো যাবে না। যখন শুরু হয় তখন এই ভাবটাই পাকাপাকি ভাবে আসে, তিনি ছাড়া আমাকে আর কেউ রক্ষা করতে পারবে না। সাধারণ বিপদের ক্ষেত্র যেমন ভগবানকে ত্রাতা রূপে দেখেন তেমনি বড় বিপদেও দেখেন ভগবানই একমাত্র ত্রাতা। কোন পরিস্থিতিতেই তিনি আর কারুর সাহায্য নেন না। আরেকটি মন্ত্রে বলছেন –

মূষো ন শিশ্না ব্যদন্তি মাধ্য স্তোতারং তে শতক্রতো।
সকৃৎ সু নো মঘবন্নিন্দ্র মৃডয়াধা পিতেব নো ভব।।ঋ-১০/৩৩/৩।।

অনেকে বলেন যে অথর্ববেদে নানান রকমের টোটকা দেওয়া আছে, যেমন কারুর বিশেষ ধরণের জ্বর হয়েছে সেটা সারাতে গেলে কি করতে হবে, অমুক ঝামেলা হয়ে গেছে সেটা দূর করতে গেলে এই এই করতে হবে ইত্যাদি, কিন্তু এই জিনিস যে শুধু অথর্ববেদেই আছে তা নয়, ঋগ্বেদেও পাওয়া যাবে। এই মন্ত্র ঋগ্বেদ থেকে নেওয়া হয়েছে, মন্ত্রের শুধু শব্দার্থ করলে একটা টোটকা মনে হবে। মন্ত্রের দেবতাও ইন্দ্র। একজন মনের ব্যাথাতে রয়েছেন, এখন সে কোথায় যাবে? ভগবান ছাড়া আর কাউকে জানেই না। সে বেদনার সাথে প্রার্থনা করছে *মূষো ন শিশ্না ব্যদন্তি মাধ্যঃ স্তোতারং তে শতক্রতো। সকৃৎ সু নো মঘবন্নিন্দ্র মৃডয়াহধা পিতেব নো ভব।।* বেদনা কত তীব্র হতে পারে এই মন্ত্রে বলছেন। মন্ত্রটি খুব শক্তিশালী। বেদনার চিত্রণ যে কত গভীর ভাবে কাব্যের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা যেতে পারে, ভাবলেই অবাক হয়ে যেতে হয়। প্রার্থনায় যেমন তীব্র আকুতি আর তেমনি কবিত্ব। আগে আমরা একটা মন্ত্রে আলোচনা করেছিলাম, যেখানে বলছেন কেউ যদি প্রচুর

পাপ কাজ করে তাহলে সেই পাপ কাজ থেকে তার প্রচুর কষ্ট আসে, আর এই দুঃখ-কষ্টই মানুষকে আবার পাপ কাজ করায়। দুটো জিনিস – পাপ কাজ করলে দুঃখ-কষ্ট আসবে আর দুঃখ-কষ্ট হলে মানুষ আবার পাপ কাজে প্রবৃত্ত হয়। দুঃখ-কষ্ট সবারই জীবনে আসে, সন্তান মরে গেলে বাবা-মার কষ্ট তো হবেই, যুবতী স্ত্রীর স্বামী মারা গেলে তার কি কোন কষ্ট হবে না! কতটা দুঃখ হচ্ছে, কতক্ষণ দুঃখে কাতর হয়ে আছে আর কতটা সময় সে ভেঙে পড়ে আছে, এগুলো দিয়ে দুঃখের গভীরতা বোঝা যায়। কিন্তু যিনি স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত তাঁকে কোন কষ্টই স্পর্শ করতে পারবে না।

বেলুড় বিদ্যামন্দিরের তখন অধ্যক্ষ ছিলেন স্বামী তেজেসানন্দ। বিদ্যামন্দিরে কলকাতা থেকে একজন বৃদ্ধ অধ্যাপক ফিজিক্স পড়াতে আসতেন। উনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। ক্লাশের পর উনি মহারাজের ঘরে এসে চা খেতেন। একদিন যথারীতি চা খাচ্ছেন। তেজেসানন্দজী মহারাজ ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে বলছেন ‘আপনার মুখটা দেখে ভালো লাগছে না, আপনার কি কিছু হয়েছে’? ভদ্রলোক বলতে চাইছেন না ‘তেমন কিছু না’। ‘না, বলুন কি হয়েছে’। ‘এখান থেকে বাড়ি গিয়ে আমাকে শ্মশানে যেতে হবে’। ‘শ্মশানে কেন? আপনার কেউ মারা গেছে’? ‘আমার একমাত্র সন্তান গত হয়েছে, তাকে এখন দাহ করতে যেতে হবে’। ‘আপনার ছেলে মারা গেছে? এরপরেও আপনি কী করে এলেন’? ‘না, ভাবলাম ছেলে তো মারা গেছেই কিন্তু এতগুলো ছেলে আমার অপেক্ষায় থাকবে, সামনে পরীক্ষা’। স্বামী তেজেসানন্দজী হতবাক হয়ে গালে হাত দিয়ে বসে পড়লেন। বিদ্যামন্দিরের খুব নামকরা ঘটনা। আমরা মনে করি সাধু-সন্ন্যাসীরাই খুব উচ্চমানের হন, কিন্তু তা নয়। গৃহীদের মধ্যেও যে কত উচ্চমানের ঋষিতুল্য পুরুষ রয়েছেন আমরা টের পাই না।

অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন *অশোচ্যানন্বশোচ্যস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদংশ্চ ভাষসে*, যাকে নিয়ে শোক করার কথা নয় তাকে নিয়ে তুমি শোক করছ আবার অন্য দিকে প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের মত কথা বলছ। ভাষ্যকাররা প্রশ্ন করছেন, ভীষ্ম, দ্রোণ মারা গেলে কি শোক করা যাবে না? তাঁরা কি শোক করার যোগ্য নন? হ্যাঁ তাঁরাও শোক করা যোগ্য, তাঁরা যদি স্বধর্ম থেকে পতিত হয়ে যেতেন তাহলে তাঁদের জন্য শোক করা যেত। মরে যাওয়ার জন্য শোক করার কিছু নেই। স্বধর্মে থেকে পতন হয়ে যাওয়া, তাঁর মনের স্বাভাবিক স্থিতি থেকে বিচ্যুত হয়ে গেলে তখন শোক করার যোগ্য তিনি।

এই শোক যখন আসে তখন সেই শোক কেমন হয় তার বর্ণনা করতে গিয়ে বলছেন *মূষো ন শিশ্না ব্যদন্তি মাধ্যঃ স্তোতারং তে শতক্রতো। সকৃৎ সু নো মঘবন্নিন্দ্র মৃডয়াহধা পিতেব নো ভব।।* তাঁতিরা তাঁত বোনে, টানা-পোড়েনে সুতো দিয়ে তাঁত বোনা হচ্ছে। টানা-পোড়েনের সবচেয়ে বড় শত্রু হল ইঁদুর। তাঁতি বেচারি সব কিছু সাজিয়ে রেখেছে আর রাত্রিবেলা একটা ইঁদুর ঢুকে সব সুতোগুলো কেটে দিয়ে যায়। তাঁতির সারাদিনের সব পরিশ্রম, সব অর্থ নষ্ট হয়ে গেল। ইঁদুর যদি কাপড় বোনার আসল সুতোগুলোকে কেটে দেয় তখন আর গামছাই তৈরী হবে কি করে আর শাড়িই বা কি করে বানানো হবে। ঋষি বলছেন আমার মনে এমন বেদনা, এমন ব্যাথা যে সেই বেদনা ইঁদুরের মত আমার হৃদয়ের সমস্ত তন্ত্রিগুলোকে কুঁড়ে কুঁড়ে কেটে দিচ্ছে। একটা দুটো শোক নয়, কত রকমের যে শোক গুণে শেষ করা যায় না, সংসারীরা তো শোক সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে। একটা শোক থেকে বেরোতে না বেরোতে আরেকটা শোক এসে ঘিরে ফেলে। ওই শোক থেকে বেরিয়ে আসতেই আরেকটা শোক, শোকের শেষ নেই। যদি কোন শোকই না থাকে সংসারীরা কোন একটা শোক তৈরী করে নেবে। ঋষি এটাই বলছেন আমার হৃদয়ের যে তন্তু, শোকরূপী ইঁদুর সব তন্তুকে কেটে দিচ্ছে। কার হৃদয়ের তন্তু কেটে দিচ্ছে? কোন সাধারণ লোকের তন্তুকে কেটে দিচ্ছে না। বলছে *স্তোতারং তে শতক্রতো* – হে শতক্রতো, আমি যা তা লোক নই, আমি আপনার স্তুতিকারী, আমি আপনার একান্ত ভক্ত। যবে থেকে আমার উপনয়নাদি হয়েছে তবে থেকে আমি যজ্ঞাদি করে যাচ্ছি। ইন্দ্রের আরেকটি নাম শতক্রতো, হে ইন্দ্র আমি তোমার ভক্ত, তুমি তোমার ভক্তের উপর কৃপা কর। ইঁদুর এসে যেমন তাঁতির তাঁতবোনার সুতোগুলো কেটে দিয়ে যায়, ঠিক তেমনি ব্যাথা, বেদনা আমার হৃদয়কে বিদীর্ণ করে দিচ্ছে।

বেদে যেখানই কোন স্তুতির কথা আসে তখন ব্রাহ্মণ সেখানে নিজেকে নিয়ে আসেন। আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ হল বেদে কোথাও বৈষ্ণব বিনয় নিয়ে কোন স্তুতি বা প্রার্থনা করা হয় না। ঋষি নিজেকে কখনই

বলবেন না যে, আমি অধমের অধম, আমি দীন হীন, আমি কাঙাল। কিন্তু আমাদের ভক্তদের কার কত বেশি বিনয় এই নিয়ে পরস্পর রীতিমত কুস্তি লড়তে শুরু করে দেয়। বেদে এই জিনিস একেবারেই নেই, যখনই ঋষি প্রার্থনা করবেন তখনই বলবেন – আমি যা তা কোন লোক নই, আমি স্তোতা তোমার, আমি তোমার আরাধনা করেছি, আমি তোমার সাধনা করেছি। বেদে কোথাও কোন ধরণের মিনমিনে পিনপিনে ভাব পাওয়া যাবে না। স্বামীজী বলছেন উপনিষদ হল Message of Strength। আমরাও তো ঠাকুররের কাছে বলি – হে ঠাকুর! আমি পাপী তাপী, দীনহীন, আমি কাঙাল আমাকে রক্ষা কর। বেদের ঋষিদের কাছে এভাবে প্রার্থনা করা অসম্ভব, কোন প্রশ্নই নেই। ঈশাবাস্যোপনিষদের ঋষি বলছেন *সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে*, আমি সারাটা জীবন সত্যে প্রতিষ্ঠিত ছিলাম, ধর্মে প্রতিষ্ঠিত ছিলাম, হে সূর্য! তোমার বাস্তবিক রূপ আমাকে দেখাও। আমি কোন কাঙালী ভিখারী হয়ে তোমার কাছে প্রার্থনা করছি না। আমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে তোমার বাস্তবিক রূপ দেখার। এখানেও ঋষি ঠিক সেইভাবে বলছেন – হে শতক্রতো! আমার ভেতরে দুঃখ কুড়ে কুড়ে শেষ করে দিচ্ছি ঠিকই, কিন্তু তাই বলে আমি কোন কাঙালী নই, আমি *স্তোতারম্*, সারাটা জীবন আমি তোমার স্তুতি করে এসেছি। আর স্বাভাবিক ভাবে আমি সত্যে এবং ধর্মে প্রতিষ্ঠিত। আমার দুঃখ হচ্ছে তো আমি কী করব! একজন হয়ত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের একমাত্র সন্তান মারা গেছে, তাঁর তো কষ্ট হবেই, ভেতরে বেদনা তাঁর হৃদয়ের তন্তুকে কেটে দেবে, তখন সেই ব্রাহ্মণ বলছেন *মূষো ন শিশ্না ব্যদন্তি মাধ্যঃ স্তোতারং তে শতক্রতো*, ইঁদুর যেমন তাঁতির আসল সুতোগুলোকে কেটে তার সব পরিশ্রম ও অর্থকে নষ্ট করে দেয়, ঠিক সেই রকম আমার এই শোক আমার হৃদয়কে কুড়ে কুড়ে কেটে বিদীর্ণ করে দিচ্ছে।

সকৃৎ সু নো মঘবন ইন্দ্র, মঘবনও ইন্দ্রের আরেকটি নাম, হে ইন্দ্র আপনি আরেকবার আমার দিকে কৃপা দৃষ্টি দিন, যেমন *মৃডয়াহধা পিতেব নো ভব* – বেদে মায়ের থেকে পিতাকে বেশি স্থান দেওয়া হয়েছে, শক্তির উপাসনা বেদে খুব সামান্য। দেবীসূক্তম্, মেধাসূক্তম্ এগুলো বেদের খুব বিরল সূক্তম যাতে দেবীর উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু বেদে যেখানে সন্তান রূপে প্রার্থনা করছে সেখানে সে পিতার সন্তান রূপেই প্রার্থনা করছে, মায়ের সন্তান হিসাবে প্রার্থনা করছে না। বেদে মায়ের উল্লেখ প্রায় পাওয়াই যায় না, খুব বিরল কখন একটা দুটো মাতৃ বন্দনা দেখা যায়। বেদে যত দিব্য ব্যক্তিত্ব বেশির ভাগই পুরুষ। জাগতিক ক্ষেত্রেও বাবার থেকেই সন্তানের বেশি রক্ষা হয়, একটা বয়স পর্যন্ত মায়ের স্নেহ, মমতা ও মাতৃত্বের দ্বারাই সন্তানের জীবন সুরক্ষিত থাকে। যে কোন সন্তানই তার বাবাকে একজন বীরপুরুষ রূপে দেখতে ভালোবাসে। সেইজন্য বলা হয় সন্তানের সাথে থাকার সময় বাবাকে কখন অপমান করতে নেই। কারণ তাহলে দুজনের ব্যক্তিত্ব একই সঙ্গে বিনষ্ট হয়ে যাবে। ছেলে সব সহ্য করে নেবে কিন্তু তার বাবার অপমান কখনই সহ্য করবে না। এই কারণেই সে সহ্য করবে না, বাবা তার কাছে আদর্শ। সেই আদর্শ যদি কোন ভাবে ভেঙ্গে যায় ছেলের ব্যক্তিত্ব চিরদিনের মত নষ্ট হয়ে যাবে। বেদেও পিতাকে খুব উচ্চ স্থান দেওয়া হয়েছে। সেইজন্য মন্ত্রেও বলা হচ্ছে *মৃডয়াহধা পিতেব নো ভব* – সন্তানের কষ্ট হলে বাবা যেমন তাঁর সন্তানকে রক্ষা করেন, এখানে ঠিক রক্ষা করার কথা বলছেন না, *মৃডয়ার* অর্থ হয় Divine Grace। ঈশ্বরীয় কৃপা আমার উপর যেন হয়। এটা বলছেন না যে আমার দুঃখটা দূর করে দাও, বলছেন ঈশ্বরীয় কৃপা যেন আমার উপর বর্ষিত হয় আর এই শোক থেকে যেন আমি বেরিয়ে আসতে পারি। এই শোক থেকে বেরিয়ে আসার জন্য যা দরকার, যেটার অভাব সেটা এলে যদি যায় তাও ভাল, এমনিতেই যদি মনের গতি মোর ফিরে যায় তাও ভালো বা অন্য কিছুতেও যদি চলে তাতেও ভালো। আসলে আমি যেটা চাইছি, এই যে আমার হৃদয়ের বেদনা, এই বেদনার পুঞ্জিভূত মেঘ যেন আমার হৃদয়ের আকাশ থেকে সরে যায়। মাকড়সার মত আমরা নিজেদের ভেতর থেকে একটা বিরাট জাল বিস্তার করে রেখেছি। মাকড়সার জালে যখনই কোন পোকা-মাকড় এসে ফেঁসে যায় তখন জালের মধ্যে যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়ে গেল ওই চাঞ্চল্য দিয়েই মাকড়সা বুঝতে পারে কোন পোকা এসে ফেঁসেছে। আমরাও সেই উর্ণনাভি, আমরা নিজেরাই বিরাট মাকড়সার জাল তৈরী করে রেখছি। সেই জালে কী নেই! স্ত্রী আছে, পুত্র আছে, আত্মীয়-স্বজনরা আছে, বন্ধু-বান্ধব আছে। এই বিশাল জালের কোথাও যদি একটা টোকা পড়ে সাথে সাথে হৃদয়ের তন্তুতে ব্যাথা কম্পন হতে শুরু করে। এত বড় জাল যখন ছড়িয়ে রেখেছি তখন

আমাদের বেদনা তো হবেই। ঋষিরা আমাদের মত মাকড়সর জাল ছড়াতেন না, তাও তাঁদের দুঃখ, বেদনা হত। সেটাই ঋষি বলছেন, তাঁতির তাঁতকে ইঁদুর যেমন কেটে দিচ্ছে, ঠিক সেইভাবে শোক, বেদনা আমার হৃদয় তন্ত্রিকে কেটে দিচ্ছে। আমার যে এত বেদনা, এত কষ্ট আমি তোমাকে ছাড়া কাকেই বা জানাব আর কোথায় বা যাব। আর আমি তো তোমার ভক্ত, তোমার নিত্য পূজা করি, আমি যা তা কেউ নই, আমি তোমার দরবারে হঠাৎ উটকো লোক হিসেবে হাজির হইনি। ঋগ্বেদ হল বিশেষ করে স্তুতি গ্রন্থ। একজন ব্রাহ্মণ যিনি খুব উচ্চমানের ভক্ত, তিনি অভিমান করে এই স্তুতি করছেন। এই মন্ত্রকে একটা নিছক সুন্দর কবিতা বলে মনে করলে খুব ভুল হবে। যারই মনে ব্যাথা আছে বুকে একরাশ বেদনা আছে সে যদি এই মন্ত্রটিকে সাধনা মনে করে রোজ প্রার্থনা করে তাহলে তার অন্তরের সব ব্যাথা বেদনা চলে যাবে। বেদের প্রত্যেকটি মন্ত্রের একটা আধ্যাত্মিক মূল্য আছে, আধ্যাত্মিক মূল্য মানে, যে কোন মন্ত্রকে যদি সাধনা মনে করে কেউ প্রার্থনা করে তাহলে ঐ মন্ত্রের শক্তি তার মধ্যে কাজ করে তার অনেক কিছু বাধা বিপদ কাটিয়ে দেবে। যেমন মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র যদি কেউ জপ করে তাহলে যার কোন বিপদ হবার সম্ভবনা আছে সেটা কেটে যাবে।

এই মন্ত্রের দুটো দিক। একটা দিক হল ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছেন, পিতা যেমন তাঁর নিজের সন্তানের রক্ষা করেন আপনি আমাকে সেইভাবে রক্ষা করুন। দ্বিতীয় দিক হল হৃদয়ের বেদনার জন্য আর্তি জানানো হচ্ছে। শোক সবারই জীবনে আসে। কিন্তু পাপ বোধ না থাকলে দুঃখ হবে না। মানুষ যখন দুঃখে থাকে তখন ওই দুঃখ থেকে বেরোবার জন্য আবার পাপ কর্মে লিপ্ত হয়ে পড়ে। ছোটবেলা থেকে একটি প্রচলিত প্রার্থনা আমরা প্রায় সবাই করে আসছি, ত্বমেব মাতা পিতা ত্বমেব। ছোটবেলায় আমাদের অবাক লাগত একই লোক কি করে বাবা হতে পারে আবার মাও হতে পারে! আমাদের মাথায় রাখতে হবে এসব স্তুতি যাঁরা করছেন তাঁরা সবাই সিদ্ধের সিদ্ধ। যাঁকে আমরা পিতা বলে জানি তিনি পিতাই, যাঁকে মাতা বলছি তিনি মাতাই। কিন্তু অনন্তকে আমরা কীভাবে দেখব? পিতা বা মাতা এনারা সান্ত, স্থান আর কালের মধ্যে আবদ্ধ। কিন্তু যিনি অনন্ত, স্থান কালের পারে, তিনি একই সাথে দুটোই হতে পারেন, এটাও হতে পারেন ওটাও হতে পারেন। সেইজন্য দর্শনের কিছু কিছু ভাব বা ধারণা যদি পরিষ্কার না থাকে তাহলে বেদ বোঝা যাবে না। ঠিক তেমনি কথামৃতে ঠাকুর যে অনেক ধরণের কথা বলছেন, বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্র পড়া না থাকলে ঠাকুরের কথা বোঝা যাবে না। স্বামীজীর কথা তাও বোঝা যায়, কারণ তিনি কথাগুলিকে আমাদের বোঝার জন্য যুগোপযোগী করে সাজিয়ে দিয়েছেন। প্রথমের দিকে কথামৃত পড়ে মনে হবে সব পরিষ্কার, সহজ কিন্তু যত শাস্ত্র অধ্যয়ন করা হবে তত আমাদের ধারণাগুলো পাল্টাতে থাকবে, তখন যেটা প্রথমের দিকে সহজ মনে হচ্ছিল সেটাকে এবার মনে হবে ঠাকুরের এই কথা তো কোন সাধারণ কথা নয়। কথামৃতে আমরা প্রবর্তক, সাধক, সিদ্ধ ও সিদ্ধের সিদ্ধ এই কথাগুলো অনেকবার পড়েছি। কিন্তু তার কার্যকারিতা কত গভীর সেটা বোঝা যায় বেদের মন্ত্রে গিয়ে। ঠাকুর এমনি মন থেকে কিছু বলে দিচ্ছেন না, কত গভীর ভাবের বিষয়! সিদ্ধের সিদ্ধ বলতে গিয়ে বলছেন, তাঁর নানান রকমের ভাব, সন্তান ভাব, মধুর ভাব, সখ্য ভাব আরও কত কি। তারে বাড়া তারে বাড়ে, এই যে কথাগুলো বলছেন, যতক্ষণ আমরা বেদে না দেখছি ঋষিরা অনন্তকে কীভাবে দেখছেন, ততক্ষণ ঠাকুরের কথা বোঝা যাবে না। ঠিক তেমনি কথামৃত পড়া থাকলে এগুলো বুঝতে সুবিধা হয়। ভাষ্যকাররা মন্ত্রের ব্যাখ্যা করে দেবেন ঠিকই, কিন্তু ভাষ্যকারদের কথাতেও একটা সীমাবদ্ধতা এসে যায়। ঈশ্বরকে ঈশ্বরীয় কথা দিয়েই জানা যায়। ভাষ্যকাররা তো মানুষ, পণ্ডিত কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু মানুষের কথা আর ঈশ্বরীয় কথা এক হতে পারে না। বেদের আরেকটি মন্ত্রে আবার অন্য ভাব নিয়ে ঈশ্বরকে দেখা হচ্ছে –

ত্বং হি নঃ পিতা বসো ত্বং মাতা শতক্রতো বভূবিথ।
অধা তে সুম্নমীমহে।।ঋ-৮/৯৮/১১।।

বেদের এই মন্ত্রটির মূল ভাব হল God the most loving । এটা কোন সাধারণ কবির কাল্পনিক উদ্গার নয়, যিনি বলছেন তিনি একজন বেদের ঋষি। হে কৃপাময়! হে ইন্দ্র! হে শতক্রতো! তুমিই আমার পিতা, তুমিই আমার মাতা। ইন্দ্রকে যখনই মাতা বলে সম্বোধন করা হয় তখনই বুঝতে হবে এখানে ইন্দ্র হলেন সেই পরম আধ্যাত্মিক শক্তি, কোন সাধারণ দেবতা নন। সাধারণত ভগবানকে কোথাও পিতা রূপে আবার

কখন মাতা রূপেও চিন্তন করা হয়। যীশু ভগবানকে পিতা রূপেই সাধনা করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশ্বরকে মাতৃ রূপে সাধনা করছেন। কিন্তু একই সাধকের ক্ষেত্রে ভগবানকে পিতা ও মাতা উভয় রূপেই কল্পনা করা খুবই বিরল, যদিও অসম্ভবের কোন কিছু নেই, কিন্তু সাধারণতঃ দেখা যায় না। যেমন কালিদাস লিখছেন – আমি প্রণাম করছি জগতের মা পার্বতীকে আর পরমেশ্বর শিবকে। এখানে পার্বতী আর শিব দুজনকে আলাদা সত্তা রূপে দেখা হয়েছে। কিন্তু এই মন্ত্রে ঋষি ইন্দ্রকেই বলছেন পিতা আবার সেই ইন্দ্রকেই বলছেন মাতা। আমরা ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের ইতিহাস অধ্যয়ন করছি। ভারতে পরবর্তি কালে যে যে ভাবগুলোকে আধ্যাত্মিক পিপাসু সাধকরা অবলম্বন করে সাধনার পথে এগিয়ে গিয়েছেন, সেই ভাবগুলো বেদে আগে থাকতেই কিভাবে ছিল সেগুলোকে আমরা দেখতে পাই। *ঈমহে* সাধারণতঃ উপাসনার অর্থেই ব্যবহার করা হয়। ঋষি বলছেন হে ইন্দ্র! আমরা তোমার প্রার্থনা করছি যাতে তোমার কৃপা পাই। রামকৃষ্ণ ভাবধারার আধ্যাত্মিক সাহিত্যে মাতৃসাধনার উপর অনেক আলোচনা করা হয়েছে। খ্রীশ্চানদের একটি ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যেও মাতৃসাধনার কথা পাওয়া যায়। আবার অনেক বলেন মুসলমানদের যে কাবা ওখানে নাকি আগে মাতৃপূজার প্রচলন ছিল। মাতৃশক্তির আরাধনা ভারতে চিরদিনই ছিল। কিন্তু বেদকে কখনই মাতৃশক্তির আরাধনা রূপে দেখা হয় না। অথচ বেদের কোন কোন মন্ত্রে মাতৃ ভাবের উল্লেখ পাওয়া যাবে। আগের মন্ত্রেই আমরা আলোচনা করছিলাম বেদে দেবীর স্থান খুব বেশি পাওয়া যায় না।

ত্বং হি নঃ পিতা বসো, বসো মানে যিনি ধন সম্পত্তি দেন। ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়, একজন ঋষি যিনি এমন এক উচ্চাবস্থায় আছেন যেখান থেকে তিনি দেখছেন তিনিই পিতা তিনিই মাতা। পরের দিকে যে স্তব রচিত হয়েছে ত্বমেব মাতা পিতা ত্বমেব এইসব স্তুতি সাধকদের রচিত। কিন্তু বেদের মন্ত্র কল্পনা করে রচিত হয়নি, ধ্যানের ওই উচ্চ অবস্থায় ঋষি বলছেন তুমিই পিতা তুমিই মাতা। কাকে বলছেন? একেবারে নির্দিষ্ট করে ইন্দ্রকেই বলছেন। এই মন্ত্রটি আবার সামবেদেও এসেছে আবার অথর্ব বেদেও আছে। ঋষি ইন্দ্রকে মাতা রূপে দেখছেন, ভাবলেও কি রকম অস্বাভাবিক লাগে। স্বামী ভূতেশানন্দজীকে এক গৃহী শিষ্য প্রণাম করে বিদায় নেওয়ার সময় বলছেন 'আসি মা'। পাশে একজন মহারাজ দাঁড়িয়েছিলেন তিনি স্বামী ভূতেশানন্দকে ভক্তের এই মাতৃ সম্বোধন শুনে ফিক্ করে হেসে ফেলেছেন। ভূতেশানন্দজী কখনই রেগে যেতেন না, পরে তিনি খুব মিষ্টি করে সেই মহারাজকে বলছেন 'এইভাবে হাসতে নেই, কার কত রকম ভাব আছে আমরা কি করে জানব'। এখানেও বেদের এই ভাব, ভূতেশানন্দজীর শিষ্য গুরুকে মা রূপে সম্বোধন করছেন। ভাব খুব পাকা না হলে গুরুকে বা ইষ্টকে পিতা ও মাতা এই দুই রূপে ভাবা যায় না। অন্তর্জগতের কোথাও একটা দিব্য জ্ঞানের আলো প্রস্ফুটিত হওয়া দরকার। ঋষিরা কবিও ছিলেন না আর ভক্তও ছিলেন না, সবাই সিদ্ধের সিদ্ধ। সিদ্ধের সিদ্ধ ঈশ্বরকে এক সঙ্গে বাবা ও মা দুটোই দেখছেন। *বসো*, যিনি কৃপা করেন – তুমি পিতা তুমি মাতা, তুমি আমাদের কৃপা কর। কার উপর কৃপা করবেন? সন্তানের উপর। বেদের মন্ত্রে ঋষিরা কোথাও কোন অবস্থাতেই নিজেকে ছোট করবেন না – আমিও সাধনা করেছি, আমারও সিদ্ধি আছে, কোন কাঙালীর মত আমি তোমার কৃপা প্রার্থনা করছি না। ঠাকুর বলছেন, ছেলে যখন খুব জেদ করে তখন বাপ-মা আগেই তার হিস্যে দিয়ে দেয়। ঋষিদেরও তাই ভাব, আমার বাপের সম্পত্তির উপর আমার অধিকার আছে। হিন্দু আইনে পৈতৃক সম্পত্তিতে সন্তানের অধিকার আছে, এই অধিকার থেকে কেউ তাকে বঞ্চিত করতে পারবে না। আমি তোমার সন্তান, পাতানো সন্তান নই, আসল সন্তান, তোমার আনন্দের সম্পদে আমার পূর্ণ অধিকার আছে তাই – হে ইন্দ্র! তুমি আমার পিতা, তুমি আমার মাতা তুমি কৃপা কর যাতে তোমার আনন্দ আমি যেন পাই। রামপ্রসাদ, কমলাকান্তের কিছু কিছু মাতৃসঙ্গীতেও এই ভাবগুলো ফুটে ওঠে। যেমন এক জায়গায় বলছেন আমি কি তোর আঠাশে ছেলে। এখানে যেমন পিতা ও মাতার ভাব নিয়ে আসা হয়েছে, ঠিক তেমনি অন্যান্য ভাবও এসেছে। আরেকটি মন্ত্রে অগ্নিকে বলছেন –

অগ্নিং মন্যে পিতরমগ্নিমাপিমগ্নিং ভ্রাতরং সদমিৎসখায়ম্।
অগ্নেরনীকং বৃহতঃ সপর্যং দিবি শুক্রং যজতং সূর্যস্য।।ঋ-১০/৭/৩।।

অগ্নমীড়ে পুরোহিতং বেদের প্রথম মন্ত্রে অগ্নিকে সম্বোধন করার সময় অনেকগুলো বিশেষণ ব্যবহার করা হয়েছে। সেখানেও ঋষি অগ্নিকে বলছেন আমি তোমাকে আরাধনা করার জন্য নিত্য তোমার কাছে আসি। এই মন্ত্রে অগ্নি আর দেবতা রূপে নেই, ঈশ্বর রূপে এসেছেন। *অগ্নিং মন্যে পিতরম্ আপিম্ অগ্নিং*, হে অগ্নি! তোমাকে আমি পিতা রূপে দেখছি, আপিম্ মানে নিকট আত্মীয়, তোমাকে আমার নিকট আত্মীয় রূপে দেখছি। ঋষি অনেকদিন অগ্নির আরাধনা করে এসেছেন, অগ্নির সাথে তাঁর একটা নিবিড় ভাব গড়ে উঠেছে। বলছেন, হে অগ্নি! আমি তোমাকে আমার বাবা মনে করি, তোমাকে আমার খুব কাছের সম্বন্ধী মনে করি। তাই না, *অগ্নিং ভ্রাতরং*, তোমাকে আমার ভাই মনে করি। *সদমিৎসখায়ম্*, তুমি আমার চিরন্তন সখা। গীতার একাদশ অধ্যায়েও অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে সখা, মিত্র বলছেন। একই ভক্ত বা সাধক তিনি তাঁর ইষ্টকে একই সঙ্গে বিভিন্ন সম্পর্ক নিয়ে সম্বোধন করেন। পরের দিকে খুব নামকরা স্তোত্র *ত্বমেব মাতা পিতা ত্বমেব, ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব* বেদের এই মন্ত্রের ভাব থেকেই পুষ্টি পেয়েছে। সেইজন্য বলা হয় হিন্দু ধর্মে যা কিছু আছে সব বেদ থেকেই এসেছে, বেদের বাইরে কিছু নেই। আমরা এখন ভোগ সাম্রাজ্যের বাসিন্দা হয়ে দৌড়ে বেড়াচ্ছি, আমাদের সময় নেই তাই সস্তা বস্তাপচা সাহিত্য নিয়ে মাতামাতি করছি, ভুলেই গেছি কত অমূল্য রত্ন ভাণ্ডারের আমরা উত্তরাধিকারী। ঠাকুর বলছেন সাপের মাথায় মণি অথচ মরা ব্যাঙ খেয়ে বেড়ায়। বেদরূপী মণি আমাদের অথচ মরা ব্যাঙ খেয়ে বেড়াচ্ছি।

বলছেন তুমি শুধু এই জন্মেরই আমার সখা নও, চিরন্তন, জন্ম জন্মের সখা। যবে থেকে আমি সৃষ্টিতে এসেছি তবে থেকে আমি তোমার সাথে এই বন্ধুত্বের সম্পর্কে বাঁধা আছি। এর আগে বরুণ দেবতার নামে একটি মন্ত্রে ঠিক এই ভাবটাই এসেছিল, যেখানে বলছেন, হে বরুণ! যেদিন আমি মায়ের গর্ভে এসেছি সেদিনই তোমার সাথে আমার একটা চিরন্তন সম্পর্ক এসে গেছে। মরুৎ মানে বায়ু, বায়ু মানেই প্রাণ। শিশু যখন মায়ের গর্ভে আসে তখন থেকেই তার মধ্যে প্রাণ সঞ্চালন শুরু হয়ে যায়। প্রাণ সঞ্চালন শুরু হয়ে গেছে বলে বলছেন, আমরা দুজনে এখন চিরন্তন বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। মায়ের গর্ভে আসার আগে শিশু কোথায় ছিল আমাদের জানা নেই, জন্মে যখন মারা যাবে তখন সে কোথায় যাবে তাও আমাদের জানা নেই, কিন্তু যে মুহুর্তে সে মায়ের গর্ভে এসে গেছে, যে মুহুর্তে তার মধ্যে ব্যক্তি সত্তা এসে গেল তখন এই সম্পর্ক নিয়ে আর কোন প্রশ্ন করা যাবে না। যে মুহুর্তে আমার আমিত্ব এসে গেল সেই মুহুর্তে আমি এই জগতের সঙ্গে এক হয়ে গেলাম। জগৎ মানেই প্রাণন ক্রিয়া, প্রাণন ক্রিয়া মানেই মরুৎ। কিন্তু ভগবান আর আমি এই অস্তিত্বের মধ্যে একটা বড় পার্থক্য আছে। আজকের দিনে আমরা ঠাকুরকে বলতে পারবো না, হে ঠাকুর! যেদিন আমি মায়ের গর্ভে এলাম সেদিন থেকে তোমার সাথে আমার সম্পর্ক। অথচ বেদে বরুণ দেবতাকে এভাবেই বলা হচ্ছে। কারণ ঠাকুর যে ঈশ্বর এই ভাব আমরা এখনও বুঝিনি, আমাদের কাছে এখনও এটা মুখের কথা। যখন ঠিক ঠিক বুঝে নেব তখন আমি বলতে পারব, যুগে যুগে, জন্মে জন্মে তোমার সাথে আমার সম্পর্ক। বেদের ঋষি বলছেন যে মুহুর্তে আমি মায়ের গর্ভে এসেছি তখনই আমার প্রাণন ক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। প্রাণন ক্রিয়াকে কখন না করা যাবে না। বৈদিক যুগে তখনই তাঁরা জানতেন প্রাণন ক্রিয়া আর মরুৎ স্বাভাবিক ভাবেই এক সম্পর্ক যুক্ত। ইন্দ্রকে হয়ত নাও বলা যেতে পারে, অগ্নিকেও নাও বলতে পারে, কিন্তু ঊনপঞ্চাশ মরুৎ, তাঁরা প্রাণ শক্তির দেবতা বলে প্রাণের সব রকম ক্রিয়ার সঙ্গে মরুৎএর স্বাভাবিক ভাবেই সম্পর্ক থাকতে হবে।

অগ্নিকে বলছেন, হে অগ্নি আমি তোমার আরাধনা করছি বলে নয়, *সদমিৎসখায়ম্*, আমার তোমার মধ্যে চিরন্তন সম্পর্ক, তুমি আমার চিরন্তন সখা। মানব সভ্যতার আদিম যুগে যত ধর্ম ছিল তাঁরা সবাই অগ্নির উপাসক ছিলেন। বেদের দৃষ্টিভঙ্গীতেও অগ্নির স্থান খুব উচ্চ। এমনও বলা হয় যে, মা ও বাবার সম্পর্ক থেকে সন্তানের জন্ম হয়, সেটাকেও এনারা যজ্ঞের আহুতি রূপে দেখছেন। যজ্ঞের আহুতি মানেই সেখানেও অগ্নির ব্যাপার এসে গেছে। জন্মাবার পর সন্তান যে খাওয়া-দাওয়া করছে, বড় হচ্ছে সবই অগ্নির কার্য। সারাটা জীবনই সে অগ্নির যজ্ঞ করে চলে, জীবনের সমাপ্তিতে সেই দেহকেই অগ্নিতে সমর্পিত করে দিচ্ছেন। তাই অগ্নির সাথে মানুষের সম্পর্ক চিরন্তন। তবে মা-বাবার দৈহিক সম্পর্কে যে অগ্নিকে দেখা হচ্ছে সেখানে আমাদের মত লোকেদের জন্য কোথাও একটা কল্পনা জড়িয়ে থাকে। কারণ এখানে ঋষি দিনের পর দিন সকাল বিকাল

অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ করে যাচ্ছেন, যজ্ঞ করতে করতে অগ্নির সাথে তাঁর একটা একত্বের ভাব এসে গেছে। একত্বের ভাব আসার জন্য ঋষি দেখছেন *সদমিৎসখায়াম্*। অষ্টধাতুর রামলালার মুর্তির সাথে ঠাকুরের যে সম্পর্ক সেখানেও এই একত্বের ভাব।

এই অগ্নি কে? তিনি কি রকম? *অগ্নেরনীকং বৃহতঃ সপর্থং দিবি শুক্রং যজতং সূর্যস্য*, দিবি অর্থাৎ এই যে আকাশ, আকাশে যে সূর্য, সেই সূর্যের যে মুখ সেটাই অগ্নি। আকাশে সূর্যের স্থান রাজার মত, সূর্যই আকাশের রাজা। কিন্তু বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে আমাদের গ্যালাক্সি নাকি অতি সাধারণ গ্যালাক্সি, সেই অতি সাধারণ গ্যালাক্সির একটা কোণের মধ্যে এই সৌরজগৎ পড়ে আছে। বিজ্ঞানীদের কাছে সূর্য অত্যন্ত মাঝারি ধরণের নক্ষত্র। সেই সূর্যের ছোট্ট একটি গ্রহ এই পৃথিবী, সেই পৃথিবীর মধ্যে আমি। তার মানে এই ব্রহ্মাণ্ডে আমি হলাম absolutely insignificant creature। পদার্থ বিজ্ঞানের দিক দিয়ে সূর্যের কোন স্থানই নেই। পদার্থ বিজ্ঞানে যদি কোন কসমসের ছবি নেওয়া হয় সেখানে সূর্যকে খুঁজেই পাওয়া যাবে না, এতই নগণ্য একটি নক্ষত্র। অথচ আমরা জানি আমাদের কাছে সূর্যই সব, আকাশের রাজা সূর্য। আকাশে সূর্যই একমাত্র জ্বলজ্বল করে। এটাই ঠিক, ঠিক এই জন্যই এখানে পদার্থ বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা চলছে না। আমাদের যে general perception সেটাই ঠিক। কোন পণ্যের প্রচুর বিজ্ঞাপন দিলেই যে পণ্যের বাজার খুব ভালো হয়ে যাবে তা নয়, কারণ লোকেদেরও নিজস্ব একটা বুদ্ধি আছে, তারা দেখে এই দ্রব্য দিয়ে আমার কাজ হয় কি হয় না। ঊনিশ-বিশ যেখানে থাকে বা সমান সমান থাকে সেখানে বিজ্ঞাপন কাজ করবে। এক আর একশোর তফাৎ যদি থাকে তাহলে যতই বিজ্ঞাপন দেওয়া হোক না কেন, কয়েকজন বোকা লোক ছাড়া ওই মাল কেউ কিনতে যাবে না। আমার দৈনন্দীন জীবনে সূর্যের স্থান, অন্তরীক্ষে সূর্য জ্বলজ্বল করছে, রাত্রি অবসানের পর আকাশে সূর্য উদয় হল সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক আলোতে ঝলমলিয়ে উঠল, সব কিছু স্পষ্ট রূপে চোখের সামনে হাজির হয়ে গেল। সূর্যের উপস্থিতিতেই পৃথিবীর জীবন জেগে ওঠে। অন্তরীক্ষে সূর্যের যে স্থান, সবার জীবনে সূর্যের যে স্থান, হে অগ্নি! আমাদের জীবনে আপনার ঠিক সেই স্থান। এখানে অগ্নির উপর ঈশ্বরীয় সত্তাকে আরোপ করা হয়েছে। সূর্যোদয়ে পদ্ম ফুটে উঠছে, পাখির কলতানে আকাশ বাতাস গুঞ্জরিত হচ্ছে, জীবনের স্পন্দন শুরু হয়ে যায়। অগ্নিকে সূর্যের সাথে তুলনা করে বলছেন আপনিই সেই দিব্য ঈশ্বরীয় সত্তা। দিব্য সত্তাকে তো চোখে দেখা যাবে না, চোখে আপনাকেই দেখা যাবে। আমাদের মনে রাখতে হবে এই যে অগ্নির কথা বলা হচ্ছে এই অগ্নি সেই স্থূল অগ্নি নয়। এখানে অগ্নি দেবতা, যে অগ্নি দেবতাকে ঋষি ঈশ্বর রূপে দেখছেন, আবার পিতা রূপে, মাতা রূপে দেখছেন আর চিরন্তন সখা রূপে দেখছেন। আর অন্তরীক্ষে সেই সূর্যের মত দেখছেন, যে সূর্য সমগ্র জগতকে আলোকিত করছে।

রোমা র‍্যোঁলা ঠাকুরের জীবনী লিখতে গিয়ে ঠাকুরের সাধনার প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে লিখছেন, আগেকার দিনের খ্রীশ্চান সাধুদের যে কাহিনী শোনা যেতে ঠাকুরের সাধনার কাহিনীগুলো সেই একই রকম। রোমা র‍্যোঁলা ঠিকই বলছেন, লীলাপ্রসঙ্গে সাধক-ভাব পড়লে আমাদেরও বিশ্বাস হয় না। শ্রীমা, স্বামীজী, শরৎ মহারাজ, মাস্টার মশাই এতগুলো independent source থেকে ঠাকুরের কথা যদি না আসত তাহলে কারুর পক্ষে বিশ্বাস করা খুব কঠিন হয়ে যেত। পাঁচ ছ হাজার বছর আগে ঋষিরা কী গভীর তপস্যা করেছিলেন আমাদের কাছে তার কোন ইতিহাস নেই, কিন্তু ঠাকুরের জীবন আমাদের সামনে আছে, আর বেদের এক একটি মন্ত্র নিয়ে গভীর চিন্তা করলে বোঝা যায় ঋষিরা তপস্যার গভীরে কোন রাজ্যে হারিয়েছিলেন। এনারাই ছিলেন ঠিক ঠিক সিদ্ধের সিদ্ধ। ঋষিরা কেউ কবি ছিলেন না, কল্পনা করে, চিন্তা করে তাঁরা কিছু রচনা করে যাননি। এক অর্থে কবি ছিলেন ঠিকই, কারণ কবির অর্থ ক্রান্তদর্শি, যিনি তিন কালকে এক সঙ্গে দেখতে পান। ভগবানের এক নাম কবি। ঋষিরা সেই ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছিলেন তাই তাঁরাও কবি।

ঋষি প্রার্থনা করছেন, *অগ্নেরনীকং বৃহতঃ সপর্থ*, হে অগ্নি! আমি তোমাকে সেই অনন্তের মুখ রূপে উপাসনা করছি, *দিবি শুক্রং*, অন্তরীক্ষে সূর্যের যে পবিত্র রশ্মি আমি তোমাকে সেই রূপে দেখছি। এখানে সূর্যের আলো বলতে দিনের আলোর কথা বলছেন না, দিব্য জ্ঞানের আলোর কথাই বলছেন। ভোরের আলো প্রস্ফুটিত হওয়ার সাথে সাথে জগতে যেমন প্রাণের সঞ্চার শুরু হয়ে যায়, পদ্মফুল প্রস্ফুটিতে হয়, পাখির কলতান,

আকাশে বাতাসে সর্বত্র যে প্রাণের স্পন্দন জেগে ওঠে, সেই প্রাণদায়িনী যে দিব্য প্রকাশ, সেই প্রকাশের পেছনে রয়েছে অগ্নির দিব্য জ্ঞানের আলো। জ্ঞানের আলোর প্রকাশ রূপে আমি তোমার উপাসনা করছি। পরের একটি মন্ত্রে আমরা আলোচনা করব বেদে মাতৃশক্তিকে কীভাবে দেখা হত। সরস্বতী দেবীর উপর এই মন্ত্রটিও খুব বিখ্যাত একটি মন্ত্র।

যস্তে স্তনঃ শশয়ো যো ময়োভূর্যেন বিশ্বা পুষ্যসি বার্যাণি।
যো রত্নধা বসুবিদ্যঃ সুদত্রঃ সরস্বতি তমিহ ধাতবে কঃ।।ঋ-১/১৬৪/৪৯।।

আমরা সাধারণ ভাবে সরস্বতীকে বিদ্যার দেবী, জ্ঞানের দেবী বলে জানি, কিন্তু এখানে বলছেন হে সরস্বতী! তোমার স্তন সমস্ত বিশ্বকে পুষ্টি প্রদান করে পোষণ করছে। *যো রত্নধা বসুবিদ্যঃ সুদত্রঃ*, আমাদের ধন-রত্ন, সম্পদ, পুষ্টি সবটাই তোমার কাছ থেকে হয়। *সরস্বতি তমিহ ধাতবে কঃ*, হে মা সরস্বতী! তুমি আমাদের কৃপা কর যাতে আমরাও পুষ্টি লাভ করতে পারি আর আমাদের জীবনযাত্রা নির্বাহ করার জন্য যা কিছু দরকার সব পেতে পারি। *যস্তে স্তনঃ শশয়ো যো ময়োভূর্যেন*, ভাষ্যকার এর অনুবাদ করছেন exhaustless breast, তোমার স্তন কখনই শেষ হয়ে যাবে না। শিশু মায়ের স্তন পান করতে করতে একটা সময় স্তন থেকে শিশুর পানের জন্য দুধের সরবারহ থেমে যায়। মা সরস্বতীকে প্রার্থনা করে বলছেন, তোমার স্তন অফুরন্ত, কারণ তুমি জগদম্বে, জগজ্জননী, যাঁর স্তন থেকে জগতের পোষণ হয় সেই স্তনের পুষ্টি সরবরাহ কখনই শেষ হয়ে যাবে না।

বেদান্ত বা সাংখ্য মতে বলা হয় প্রকৃতি থেকেই সব কিছুর সৃষ্টি হয়, আবার প্রকৃতিকেই দেখছেন জড় রূপে। কিন্তু শক্তির উপাসকরা, তাঁরা যে মতরই হন না কেন প্রকৃতিকে তাঁরা সেই চৈতন্যময়ী শক্তি রূপেই দেখেন। বেদান্তের কথা বলতে গিয়ে ঠাকুর বলছেন 'মা! তুই আমাকে শুষ্ক জ্ঞানী করিস না'। ঠাকুর শুষ্ক জ্ঞানী বলতে কি বোঝাতে চাইছেন আমাদের বোঝা দরকার। ষড়দর্শনের বৈশাষিক, ন্যায় বলতে গেলে উঠেই গেছে, সাংখ্য ও যোগের মূল বিষয়গুলি বেদান্তে এসে গেছে। ষড়দর্শনের বেদান্তই শেষ পর্যন্ত থেকে গেছে, বেদান্ত ছাড়া বর্তমানে হিন্দু ধর্মে আর কোন সে রকম জোড়ালো দর্শন নেই। পরের দিকে বেদান্তের আবার তিনটে ভাগ হয়ে গেছে – অদ্বৈত, দ্বৈত আর বিশিষ্টাদ্বৈত। যদিও পণ্ডিতরা বলেন দ্বৈতকে ওনারা ভালো ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, কিন্তু সারা বিশ্বের পণ্ডিতদের মত নিলে দেখা যাবে শঙ্করাচার্যের অদ্বৈত বেদান্তই ঠিক ঠিক রাজার মত প্রতিষ্ঠিত। শঙ্কারাচার্যের অদ্বৈত পুরোপুরি যুক্তি দিয়ে চলে। বেদান্ত বলতে শঙ্কারাচার্যেরই বেদান্ত। কিন্তু শুধু শঙ্করাচার্যের শুদ্ধ যুক্তি নিয়ে চললে কিছু কিছু জিনিস যেগুলো অবশ্যম্ভাবি ভাবে সত্য, সেগুলোকে বাদ দিয়ে দিতে হয়। সবার আগে বাদ চলে যাবে শক্তির ব্যাপারটা। ইদানিং শক্তির যেভাবে আরাধনা করা হয় বা ঠাকুর যেভাবে আরাধনা করেছেন, সেই শক্তিকে বাদ দিয়ে দিতে হবে। এরপর ভক্তির ব্যাপারগুলো, ভক্তরা সব কিছুকে যেভাবে দেখেন সেটাও শঙ্করাচার্যের বেদান্ত মতে চললে উড়ে যাবে। কিরকম উড়ে যায় বোঝা যাবে আচার্যের গীতার ভাষ্যে। যেখানে ভক্তির ব্যাপার থাকবে সেখানে সেবা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আচার্য তাঁর গীতার ভাষ্যে বলছেন, সেব্য-সেবক ভাব ততক্ষণই হয় যতক্ষণ আমি-তুমি আলাদা বোধ থাকবে। যদি জেনে যায়, আমিও যা তুমিও তা, তখন সেব্য-সেবক ভাব কোথা থেকে আসবে! অদ্বৈত বেদান্তের শেষ কথা আমি সেই শুদ্ধ আত্মা, আমি সেই শুদ্ধ আত্মা বোধ যার হয়ে যাবে তখন কে কার সেবা করবে আর কাকেই বা ভক্তি করবে। এর আবার অন্য একটা দিক আছে। আচার্যের ভাষ্য যদি খুব ভালো করে অধ্যয়ন করা থাকে তাহলে দেখা যাবে আচার্যের ভাষ্যে ভাবের ব্যাপারটা একেবারে টগবগ করছে। এটা খুবই আশ্চর্যের, একদিকে আচার্যের বেদান্ত দর্শন একেবারে কাঠখোট্টা, প্রচণ্ড শুষ্ক। উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্রের উপর যখন তিনি ভাষ্য দিচ্ছেন তখন তিনি সব কিছুকে, এমনকি যেখানে সামান্যতম একটু দুর্বলতা দেখছেন ওটাকেও উনি কুচি কুচি করে কেটে বাদ দিয়ে দিচ্ছেন। অথচ গীতার ভাষ্যে এসে যদি ভক্তির উপাদান, দাস্যভাব গুলিকে সরিয়েও দেওয়া হয়, তাতেও প্রচণ্ড একটা গভীর ভালোবাসার ব্যাপার চলছে। এখানেই আচার্যের দুটো আপাত বিরোধী ভাব এসে যায়। বেদান্ত দর্শন রূপে যখন বলছেন তখন সব কিছু একেবারে শুষ্ক, সব কিছু

প্রখর যুক্তির উপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন, যুক্তিতে কোথাও কোন ফাঁক নেই। অথচ গীতার ভাষ্য যখন লিখছেন তখন পদে পদে মাধুর্য ছড়িয়ে আছে, একটা মিষ্টতার স্বাদ লাগিয়ে দিয়েছেন, রসে টগবগ করছে।

গীতার ভাষ্যে নেতি নেতি ভাব আর ইতি ইতি ভাব মিশে আছে। যখন তত্ত্বের দিকে যাচ্ছেন তখন নেতি নেতি করে সব কিছু কেটে দিচ্ছেন। কিন্তু নেতি নেতি করে শেষে সচ্চিদানন্দে যখন পোঁছে যাচ্ছেন তখন দেখছেন তিনি *রসো বৈ সঃ*, তিনি রসস্বরূপ, সব জায়গায় সেই রস যেন ছড়িয়ে আছে। সচ্চিদানন্দের বোধ হয়ে যাওয়ার পরেও তাঁর দাস ভাব থাকবে। কারণ তখন তিনি নিজেকেই নিজের পূজো করছেন। তখন আমি তোমার দাস এই বোধে দাস্য ভাব থাকছে না, মা যেমন সন্তানকে ভালোবাসে সন্তান যেমন মাকে ভালোবাসে। সমস্যা হল, বেদান্তের এই বিশাল কাঠামোর পুরোটাই নেতি নেতির উপর চলে, অথচ পরিণতি হয় গিয়ে *রসো বৈ সঃ*, তিনি রসস্বরূপ এই বোধে। যদি *রসো বৈ সঃ* এই পরিণতিতে না পোঁছায় তাহলে সব সময় শুষ্ক জ্ঞানই থেকে যাবে। শুষ্ক জ্ঞান থেকে বেরিয়ে আসার কোন পথই নেই। সেইজন্য বেদান্ত বিচার খুব কঠিন ও বিপজ্জনকও বটে। বেদান্ত বিচার পুরো শুষ্ক করে ছেড়ে দিতে পারে। অথচ বেদান্ত বিচারের শেষে সচ্চিদানন্দে পোঁছে গিয়ে দেখবেন তিনিই সব কিছু হয়েছেন, এরপর দাসভাব, সন্তানভাব, মধুরভাব সব রকম ভাবই এসে যাবে। ভক্তিমার্গের সাধকের ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস থাকে আর তার সাথে ঈশ্বরই সব কিছু করছেন এর উপরেও বিশ্বাস থাকবে। জ্ঞানমার্গের সাধকের কাছে ব্যাপারটা উল্টো। তিনি বলবেন ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়ের উপর কাজ করছে, গুণ গুণের উপর কাজ করছে ইত্যাদি, সব দিক দিয়ে শুষ্ক হয়ে যাচ্ছে। অথচ সচ্চিদানন্দের আস্বাদ এখনও পায়নি। ফলে ঈশ্বরের প্রতি একটা ভাব অবলম্বন করে যে মাধুর্য রসের আস্বাদ হয় সেই মাধুর্যের আস্বাদ কোন দিন করতে পারে না। কিন্তু যিনি সিদ্ধের সিদ্ধ হয়ে যান, জ্ঞানমার্গ দিয়েই সিদ্ধ হন আর ভক্তিমার্গ দিয়েই সিদ্ধ হন, জ্ঞানীর ঈশ্বর আর ভক্তের ঈশ্বর কখনও আলাদা নন। ভক্তের ঈশ্বর কথা বলেন। ঠাকুরও বলছেন তিনি কথা কন। বলেই আবার বলছেন, কাকেই বা বলি আর কেউ বা বিশ্বাস করে। ঠাকুর ব্রাহ্ম সমাজের লোকদের বলছেন, তিনি সাক্ষাৎ হন, তিনি কথা কন, কিন্তু কেই বা বিশ্বাস করে। ভক্তের ঈশ্বর কথা বলবেন আর জ্ঞানীর ঈশ্বর কথা বলবেন না, এতো হতে পারে না। সচ্চিদানন্দে যে মার্গ দিয়েই যান, সচ্চিদানন্দে পোঁছে গেলে আপনার সেই রসেরই বোধ হবে, তখন সচ্চিদানন্দের সাথে কথা হবে। ঈশ্বরের অনন্ত ভাব, ভাবের ইতি করা যায় না, তখন তাই আপনার ভেতর থেকেও সেই অনন্ত ভাব ফেটে ফেটে বেরোবে।

মন্ত্রে ঋষি সরস্বতীর কথা বলছেন, তিনি দেখছেন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন গাভীর বৎস। গাভী যেমন নিজের স্তন দিয়ে বৎসের পোষণ করে, ঠিক সেই ভাবে মা জগৎকে পোষণ করছেন। পীনপয়োধরা, তাঁর স্তন ভারী হয়ে আছে, কারণ পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে পোষণ করছেন। পোষণ মানে তিনি যে শুধু প্রাণ সঞ্চার করছেন তা নয়, তিনি ধাতা। সোনা, রূপা যা কিছু রত্ন আছে সব তিনিই দিচ্ছেন। এই ভাব ধারণ করে রাখা কঠিন বলে আমাদের পৌরাণিক কাহিনীতে এই ভাবটাই বিভিন্ন ভাবে ধারণা করান হয়েছে যার মধ্যে খুব প্রচলিত একটি নাম হল কামধেনু। গরু দুধ দেবে, দুধ দেওয়া ছাড়া তো আর কিছু দেবে না। কিন্তু কামধেনু সব কিছুই দেন। কামধেনু বাছুর নন্দিনীকে পালন করতেন বশিষ্ট মুনি। নন্দিনী তো একেবারে রান্না করা তৈরী খাবারই সরবরাহ করে দিত। গরু কি কখন রান্না করা খাবার তার ভেতর থেকে সরবরাহ করতে পারে? সম্ভবই নয়। সরস্বতীর যে ভাব ঋষি বর্ণনা করছেন, *যস্তে স্তনঃ শশয়ো যো ময়োভূর্যেন বিশ্বা পুষ্যসি বার্যাণি*, পুরাণে নন্দিনীর মাধ্যমে এই ভাবকেই দেখানো হয়েছে। কালীকির্তনে একটা খুব সুন্দর গান আছে তাতে বলছেন 'দ্যাখনা চেয়ে ন্যাংটা মেয়ে করছে কি কারখানা', যিনি এই দৃশ্য দর্শন করেছেন তিনি বলছেন দ্যাখনা চেয়ে ন্যাংটা মেয়ে করছে কি কারখানা, কি কারখানা করছেন? সৃষ্টিকার্য। প্রকৃতি যে সৃষ্টিকার্য করছেন, প্রকৃতির মধ্যে যে শুদ্ধ ভাব রয়েছে, সেই শুদ্ধ ভাব নিয়েই সৃষ্টি হচ্ছে। ন্যাংটা মেয়ে বলতে কোন খারাপ অর্থে বলছেন তা নয়, প্রকৃতির যে বিশুদ্ধ রূপ যেখানে কোন আবরণ নেই সেখান থেকে সৃষ্টি চলছে। সৃষ্টি তো হয়ে গেল। কিন্তু তারপর কী হবে? সৃষ্টিকে ভরণ-পোষণ করার কাজ শুরু হবে। তখন তাঁর মাতৃরূপ আসছে। চণ্ডীতেও মায়ের যেখানে স্তুতি করা হচ্ছে সেখানেও অনেকবার এই ভাব নিয়ে আসা হয়েছে। কী ভাব? উন্নত পীনপয়োধরা। মা যখনই শক্তি রূপে আসবেন তখনই এই শব্দের ব্যবহার করা হবে। গাভীর যখন বাছুর হয় তখন বাছুরকে পোষণ করার জন্য

full breast হয়ে যায়, বাছুরকে দুধ দিতে হবে। পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়ে গেছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যেখানে যেখানে যার যার যত রকমের চাহিদা আছে সব চাহিদা পূরণের জন্য এই মাতৃশক্তি থেকে যোগান দেওয়া হচ্ছে। ঋষি এখানে মাতৃশক্তিকে সরস্বতী রূপে বন্দনা করছেন। আমরা যেভাবে মা শব্দ লাগিয়ে দিয়ে থাকি, বা মায়ের ভাব যেভাবে কাব্যে প্রকাশ করে থাকি, বেদে সেভাবে করা হয় না। বেদের ছন্দ বেদের ভাব পুরো আলাদা, তাই *যস্তে স্তনঃ শশয়ো যো ময়োর্ভূঃ* বলার পর বলছেন *যো রত্নধা বসুবিদ্যঃ সুদত্রঃ*। বলছেন সবাইকে পোষণ করার জন্য মায়ের স্তন যেন সব রকমের রত্নকে ধারণ করে রেখেছেন। বসু মানে রত্ন। এরপরে বলছেন *সরস্বতি তমিহ ধাতবে কঃ*, হে মা সরস্বতী! তোমার যে ওই রত্নগুলো আছে ওগুলো আমাদের জন্য উন্মুক্ত করে দাও যাতে আমাদের পোষণ হয়। এটাকেই ভাষ্যকাররা বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করবেন, কারণ পরের দিকে সরস্বতী দেবীকে সব সময় বিদ্যার দেবী রূপে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু বেদের এই মন্ত্রে সরস্বতীকে শুধু বিদ্যার অর্থে নেওয়া হচ্ছে না। গায়ত্রী মন্ত্রের যেমন তিন ভাবে অর্থ হয়, সেই ভাবে এই মন্ত্রকেও কয়েক ভাবে অর্থ করা যায়। শক্তির আরাধনাতে স্তুতি করার সময় বলা হয় এই জগৎ মায়ের যোনি থেকে বেরিয়েছে, যোনি শব্দটা প্রায়ই আসে, যোনি মানে যেখান থেকে জন্ম হয়। জন্ম তো হয়ে গেছে কিন্তু পোষণ কোথা থেকে হবে? কেন? মা রয়েছেন না। এই একই ভাব গীতাতেও এসেছে যেখানে ভগবান বলছেন *মাতা ধাতা পিতামহঃ*, আমি ধাতা আমি ধারণ করে আছি। তিনি বিভিন্ন ভাবে পোষণ করছেন, বৃষ্টি হচ্ছে, বাতাস বইছে, রোদ হচ্ছে, দিন রাত হচ্ছে, নদীতে জল প্রবাহিত হচ্ছে, বৃক্ষে ফল ধরছে, মাঠে ফসল হচ্ছে, বিভিন্ন ভাবে তিনি সবাইকে পোষণ করে যাচ্ছেন।

এই মন্ত্রে যেমন ভগবানকে মা রূপে দেখছেন, অন্য একটা ধাপে গিয়ে সেই ভগবানকেই ঋষি শিশু রূপে দেখছেন। ভগবানকে শিশু রূপে দেখা আর সেইভাবে ভগবানের সাধনা করা অন্যান্য ধর্মেও পাওয়া যাবে। চাইল্ড খ্রাইস্ট, বেবী খ্রাইস্ট আর তাঁর পূজো করা খ্রীশ্চান ধর্মে প্রচলিত আছে। আমাদের ধর্মে নাড়ুগোপালের পূজো বলতে গেলে ঘরে ঘরেই হয়ে চলেছে। তাছাড়া শ্রীরামচন্দ্রের রামালালার পূজো ভারতে খুব প্রচলিত। আগেকার দিনে দেখা যেত না কিন্তু রামলালা, নাড়ুগোপাল খুব বেশি মাত্রায় ছড়িয়ে যাওয়ার পর ইদানিং শিশু শিবের ছবির পূজা হতে শুরু হয়েছে। বাচ্চা শিবের ধারণা কার মাথায় এসছে ভগবানই জানেন, কারণ বাচ্চা শিব হওয়ার কথা নয়, যুক্তিতেই দাঁড়াবে না। যেমন বাচ্চা নারায়ণ কখনই হতে পারে না, কারণ নারায়ণ, শিব হলেন স্বয়ম্ভূ। কিন্তু মানুষ কী করবে! ভেতরে যে ভাব আর আবেগ রয়েছে, আমি ভগবানকে শিশু রূপে ভালোবাসতে চাই। তার ইষ্ট শিব, এখন সে কী করবে? মনের ভাবকে সে এখন প্রকাশ করছে শিবকে শিশু রূপে পূজা করে। কিন্তু শিবকে শিশু রূপে ভাবাটাই অযৌক্তিক। কারণ শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম হয়েছে, শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়েছে, শিশু রূপে ভাবা যায়। ঠাকুরকেও অনেকে শিশু রূপে, গদাই রূপে ভালোবাসছে। ভক্তিগীতিতেও এই ভাব এসেছে ‘দুখিনী ব্রাহ্মণীর কোলে কে শুয়েছ আলো করে’। শ্রীরামকৃষ্ণের শিশু রূপের অবশ্যই পূজা করা যেতে পারে কিন্তু নারায়ণ, বিষ্ণু, শিব এনাদের শিশু রূপ হতে পারে না। ভগবানকে শিশু রূপে আরাধনা করার ভাব বেদের মন্ত্রেই এসে গিয়েছিল। বেদের ব্যাপারটা আরও মজার, বেদে ভগবানের শিশু রূপের কোন ধারণা নেই, কিন্তু ঋষিরা অন্য ভাবে নিয়ে এসেছেন। বেদে অনেক মন্ত্র আছে যেখানে ভগবানকে শিশু রূপে দেখা হচ্ছে। আমরা এখানে এই রকম একটি মন্ত্র নিয়ে আলোচনা করছি –

অথং বেনশ্চোদয়ৎ পৃশ্নিগর্ভা জ্যোতির্জরায়ু রজসো বিমানে।
ইমমপাং সঙ্গমে সূর্যস্য শিশুং ন বিপ্রা মতিভী রিহন্তি।।ঋ-১০/১২৩/১।।

বেদে বেণ একটা খুব প্রচলিত শব্দ, যার অর্থ আদরণীয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য হল, পরে পৌরাণিক কাহিনীতে বেণ নামে এক খুব অত্যাচারী রাজা ছিল। ব্রাহ্মণরা তাকে অভিশাপ দিয়ে মেরে ফেলেছিল। সেই থেকে বেণ নামটা কলঙ্কিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বেদের সময় বেণ শব্দের খুব প্রচল ছিল। মন্ত্রের শেষ লাইনে বলছেন, *শিশুং ন বিপ্রা মতিভী*, শিশুকে যেভাবে আদর করা হয়, তেমনি ব্রাহ্মণরা যে মন্ত্রোচ্চারণ করছেন তাতে মনে হচ্ছে তাঁরা যেন ভগবানকে শিশুর মত আদর করছেন। যে কোন ধর্মে প্রার্থনার গুণের উপর প্রচণ্ড গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এখানে আমাদের মনে রাখতে হবে, দাস্য ভাবের কথা আমরা যে বলে থাকি, আমি তোমার দাস,

ভগবান যেখানে থাকবেন এই ভাব অবশ্যই থাকবে, কিন্তু সেখানেও একটা স্নেহের ভাব থাকে, যে স্নেহের মাধ্যমে ভগবানের সাথে একটা নিবিড় সম্পর্ক তৈরী হয়। ব্রাহ্মণ যে প্রার্থনা করছেন, এই প্রার্থনাটা কী রকম? বলছেন, আমার এই প্রার্থনা যেন সেই দিব্য সত্তাকে আদর করে। কীভাবে আদর করবে? শিশুকে যেভাবে আদর করা হয়। ঠাকুরের কথায় সিদ্ধের সিদ্ধ যতক্ষণ না হবে ততক্ষণ এই ভাব আসা অসম্ভব। কী গভীর নিবিড় সম্পর্কের ভাব! ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ঋষি যিনি প্রার্থনা করছেন, আমি যে এই প্রার্থনা করছি এই প্রার্থনা তাঁকে যেন আদর করছে। এখানে সেই দিব্য সত্তার নিরাকার রূপ কিন্তু যেন সাকার রূপ দেওয়া হচ্ছে, তার সাথে প্রার্থনাও সাকার, এই সাকার রূপ যেন সেই সাকার রূপকে আদর করছে। ভাগবতেরও একটা জায়গায় বর্ণনা আছে, সৃষ্টির যখন সময় হয় তখন বেদের এই ঋচারা গিয়ে ভগবান নারায়ণকে নিদ্রা থেকে জাগ্রত করেন, যেভাবে আগেকার দিনে চারণরা রাজাদের ঘুম থেকে তুলতেন। সকালে ঘুম থেকে ওঠার জন্য আমরা যে এখন এ্যালার্ম দিয়ে রাখি, ভগবান তো আর এ্যালার্ম দিয়ে রাখেন না, কিন্তু বেদ অর্থাৎ জ্ঞান জানে যে এখন সময় হয়ে গেছে, বেদের ঋচারা তখন স্তুতি করতে শুরু করে দেয়। বেদের স্তুতি শুরু হওয়ার পর ভগবান ধীরে ধীরে নিদ্রা থেকে উত্থিত হন। সেখান থেকে সৃষ্টি কার্য শুরু হয়। বোঝানোর জন্য এই ধরণের উপমা নেওয়া হয়, যখন অন্য কোন কিছুই থাকে না তখন ঈশ্বরের সব থেকে কাছে যেটা যায় তা হল শব্দ। মন, বুদ্ধি এরা ঈশ্বরের কাছে যেতে পারে না, শুধু ভাবগুলি শব্দ রূপে যেতে পারে, যাকে আমরা শব্দব্রহ্ম বলি। বাইরের শব্দগুলি আমাদের কানে ধাক্কা মারে তারাও সেভাবে গিয়ে ভগবানের কানে ধাক্কা মেরে তুলছেন না। দূর থেকে তাঁরা স্তুতি করতে থাকেন। একটা গভীর ভাবকে বোঝাবার জন্য এই ধরণের উপমা নিয়ে আসা হয়। যাই হোক, এখানে পুরোহিত যিনি স্তবন করছেন, তিনি বলছেন আমার এই প্রার্থনা গুলো যেন দিব্য সত্তাকে গিয়ে আদর করুক, শিশুকে যেভাবে আদর করা হয়।

এই ভাব বেদের বেশ কয়েকটি মন্ত্রে নিয়ে আসা হয়েছে। আমার প্রার্থনাগুলো কি রকম? যেমন মা তার শিশুকে চুম্বন করে, প্রতিদানে শিশুও যেমন মাকে চুম্বন করে ঠিক সেই রকম আমার এই মন্ত্রগুলি, সেই দিব্য সত্তার প্রতি আমার যে ভালোবাসা, আমার যে ভক্তি, সেই ভালোবাসা ও ভক্তি রূপে তাঁকে চুম্বন করে। বেদে এই ভাবটা আগেই এসে গিয়েছিল। যার জন্য পরবর্তি কালে আমাদের পরম্পরাতে সব থেকে নামকরা মা ও সন্তানের বাৎসল্য ভাবের প্রকাশ যশোদা আর কৃষ্ণের ভালোবাসায় প্রকাশ পেয়েছে। যদিও আমরা রামলালা, নাড়ুগোপালের কথা বলি কিন্তু বাৎসল্য ভাবের সর্বোচ্চ প্রকাশ যশোদার মধ্যেই প্রস্ফুটিতে হতে দেখা গেছে। কিন্তু এই ভাব বেদের মধ্যেই ছিল। হিন্দু ধর্মে যা কিছু ভাব আছে সব বেদেই আছে। এই ভাবকেই আরেক ধাপ এগিয়ে নিয়ে সেই দিব্য সত্তাকে দেখছেন নিজের প্রিয়তম রূপে, সেখানে বলছেন –

পরি ত্বা গির্বণো গির ইমা ভবন্তু বিশ্বতঃ।
বৃদ্ধায়ুমনু বৃদ্ধয়ো জুষ্টা ভবন্তু জুষ্টয়ঃ।।ঋ-১/১০/১২

বলছেন, ভগবান কী ভালোবাসেন? জাগতিক অর্থে যদি বলা হয় মেয়েরা বিয়ের আগে ছেলের কাছে কী চায়? যে কেউ যখন কাউকে ভালোবাসে সে তার ভালোবাসার মানুষটির কাছ থেকে মিষ্টি কথা শুনতে চায়। মহাভারতে অতিথিকে আপ্যায়নের কথা বলতে গিয়ে বলছে, বাড়িতে অতিথি এলে তাকে পা ধোয়ার জল দেব, বসার জন্য আসন দেবে, ঠাণ্ডা জল দেবে, ফল মিষ্টি দেবে ইত্যাদি অনেক কিছু বলার পর কমিয়ে কমিয়ে বলছে বাড়িতে কিছুই যদি না থাকে বসার জন্য ঘাসের একটা টুকরো দেবে। শেষে বলছেন সেটাও যদি না থাকে তাহলে দুটো মিষ্টি কথা দিয়ে আপ্যায়ন করবে। কারণ মিষ্টি সম্ভাষণ সব কিছুর ঘাটতিকে পূরণ করে দেয়। জীবনে আমরা যে ভাব নিয়ে চলি, যা কিছু প্রত্যাশা করি সেটাই আবার ভগবানের কাছেও প্রত্যাশা করি। আমরা মনে কর প্রিয়জন থেকে আমরা যেমন মিষ্টি কথা শুনতে ভালোবাসি, ভগবানও তেমনি তাঁর ভক্তের কাছ থেকে মিষ্টি কথা শুনতে চাইবেন। আমাদের সব রকম মানবীয় ভাবগুলি ভগবানের উপর আরোপ করে দিই। ভগবান কি চান? মিষ্টি কথা। আমাদের মিষ্টি কথা বললে আমরা যেমন তার জন্য অনেক কিছু করে দিতে চাই, ভগবানের ব্যাপারেও আমরা মনে করি তিনি মিষ্টি কথা শুনতে চান। যিনি আপ্তকাম, সচ্চিদানন্দ,

যিনি সব কিছুর বাইরে তিনি কিসের দাস হবেন! ভক্তদের এগুলো এক একটা নিজস্ব ভাব, আমি যেমন ভালোবাসার দাস তিনিও ভালোবাসার দাস।

ঋষিরও এই ভাব, ভাবছেন আমি যেভাবে মিষ্টি কথা ভালোবাসি। সেটাই এই মন্ত্রে বলছেন *পরি ত্বা গির্বণো গির ইমা ভবন্তু বিশ্বতঃ*, ভগবানকে সম্বোধন করছেন হে স্তুতিপ্রিয়! ভগবান কে? যিনি স্তুতি ভালোবাসেন। *গির* মানে শব্দ, আমার এই শব্দগুলি, অর্থাৎ আমি যে ঋচা পাঠ করছি, আমার এই ঋচাগুলি যেন তোমাকে ভালোবেসে *ইমা ভবন্তু বিশ্বতঃ*, তোমাকে চারিদিক থেকে বেষ্টিত করে নেয়। *বিশ্বতঃ* মানে সব দিক থেকে। আমার এই প্রার্থনার শব্দগুলি যেন চারিদিক থেকে তোমাকে জড়িয়ে ধরে। বেদের প্রত্যেকটি মন্ত্রে সেই দিব্য সত্তার প্রতি ভালোবাসা লেগে আছে।

বৃদ্ধায়ুমনু বৃদ্ধয়ো, বৃদ্ধ বলতে আমরা মনে করি বয়সের ভারে বৃদ্ধ, কিন্তু বেদে বৃদ্ধ শব্দের অর্থ শ্রেষ্ঠ। *বৃদ্ধায়ুম্ অনু বৃদ্ধয়ো*, যিনি শ্রেষ্ঠ তাঁর শ্রেষ্ঠত্বকে আরও বড় করা হচ্ছে। যিনি আগে থেকেই শ্রেষ্ঠ আমার এই শব্দগুলি তাঁর শ্রেষ্ঠত্বকে আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে। শব্দ দিয়ে শ্রেষ্ঠত্বকে বাড়ানো হয়। শব্দের শক্তির ব্যাপারে আমাদের ঠিক ঠিক ধারণা নেই। এই মন্ত্রের দেবতা ইন্দ্র, ইন্দ্রকে স্তুতি করা হচ্ছে – আপনি বৃদ্ধ, অর্থাৎ আপনি শ্রেষ্ঠ। কিন্তু আপনার শ্রেষ্ঠত্বকে আমার এই স্তুতির শব্দগুলি আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে। *জুষ্টা ভবন্তু জুষ্টয়ঃ*, আমার এই শব্দগুলির মধ্যে প্রচণ্ড ভালোবাসা জড়িয়ে আছে। জুষ্ট মানে জুড়ে দেওয়া, আপনার প্রতি আমার এই ভালোবাসার শব্দ যেন আপনার ভালোবাসার সঙ্গে জুড়ে দিয়ে ভালোবাসাকে আরও বাড়িয়ে দেয়। এখানে ভগবানকে ঋষি তাঁর প্রেমিক রূপে দেখছেন। আমাদের সাদামাটা ভাষায় যদি এই মন্ত্রের ভাবকে প্রকাশ করি তাহলে জিনিসটা এভাবে দাঁড়াবে – ওগো! তুমি মিষ্টি কথা শুনতে ভালোবাস, আমার এই মিষ্টি কথা তোমার মাধুর্যকে আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে। আমার এই মিষ্টি কথা আমাদের ভালোবাসাকে যেন আরও বাড়িয়ে দেয়। এর মধ্যে কোন ঢংঢাং নেই, কোন আদিখ্যেতা নেই। আমার ইষ্টের প্রতি আমার এই যে ভালোবাসা, আমার শব্দের মাধ্যমে এই ভালোবাসা যেন বাড়ে। কারণ আমার শব্দগুলো যিনি শ্রেষ্ঠ তাঁর শ্রেষ্ঠত্বকে আরও মহিমামণ্ডিত করবে। শুধু তাই নয়, যাঁকে এই কথাগুলো বলা হচ্ছে তিনি হলেন Lover of Song, স্তবপ্রিয় বা স্তুতিপ্রিয়, যিনি স্তুতিগান শুনতে ভালোবাসেন। বেদের কয়েক জায়গায় এই ভাব আনা হয়েছে তিনি Lover of Song। পরের দিকে ভগবানের নামে আমরাও এই কথা বলি। যেখানে খুব সুন্দর ভক্তিগীতি হয় কিছুক্ষণের জন্য মনটা হারিয়ে যায়, তখনকার মত মন একটা উচ্চ অবস্থায় উঠে যায়, কিন্তু পরে আবার মনের পতন হয়ে যায়। ঋষি যখন স্তব করছেন তখন তিনি যেন কি রকম একটা একত্বের ভাবে চলে যাচ্ছেন, সেটাই এই মন্ত্রে ফুটে উঠেছে। কথামৃতে দেখা যায় যেখানেই ঠাকুরের গান বা নৃত্যের বর্ণনা আসছে মাস্টারমশাই বারবার দেবদুর্লভ সঙ্গীত, দেবদুর্লভ নৃত্য, দেবদুর্লভ কণ্ঠ এই শব্দগুলি ব্যবহার করছেন। পরম্পরাতে আমরা যতটুকু জানি তাতে বলা হয় যে ঠাকুরের গলা খুব মিষ্টি ছিল। ঠাকুর তিনটি দশার কথা বলছেন, অন্তর্দশা, অর্ধবাহ্যদশা আর বাহ্যদশা। অন্তর্দশাতে সমাধিস্থ, তখন বোধে বোধ করছেন। কিন্তু বাহ্যদশায় ইষ্টের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের একমাত্র মাধ্যম হল শব্দ। তাঁর যে স্তুতি করা হয় সেই স্তুতিতে এমন শব্দ নেওয়া হয় সেই শব্দের মাধ্যমে তাঁর যে শ্রেষ্ঠত্ব সেই শ্রেষ্ঠত্ব যেন আরও বৃদ্ধি পায়। এখানে *জুষ্টঃ* শব্দে যেন বেশি জোর দেওয়া হচ্ছে, তোমার সাথে আমার যে একত্ব বোধ, এই বোধ যেন আরও দৃঢ় হয়।

ঠাকুর বলছেন চোখ বুজলেই কী ধ্যান হয়, চোখ খুলেও ধ্যান হয়। চোখ খুলে যখন ধ্যান হয় তখন শব্দের মাধ্যমে ওই যোগটা হয়। তখন ভালোবাসার গান ভেতরে গুন্ গুন্ হতে থাকে। ওই যে ভালোবাসার গান, যিনি শ্রেষ্ঠ ওই শ্রেষ্ঠর যে শ্রেষ্ঠত্ব সেই শ্রেষ্ঠত্বকে এই ভালোবাসার গান বাড়িয়ে দিচ্ছে। ঠাকুরের উপর অনেক সুন্দর সুন্দর গান রচিত হয়েছে। কিছু কিছু গান আমরা বিশেষ বিশেষ সময় করি, যেমন খণ্ডন ভব বন্ধন সন্ধ্যেবেলায় আরতির সময় করা হয়, কিন্তু স্বামীজীর যে কিছু কিছু গান আছে যেমন আচণ্ডালপ্রতিহতরয়ো যস্য প্রেমপ্রবাহ, আবার বলছেন শক্তিসমুদ্রসমুত্থ তরঙ্গ, এই শব্দগুলি ঠাকুরের শ্রেষ্ঠত্বকে আরও উঁচুতে নিয়ে যাচ্ছে। যখন অদ্বৈততত্ত্ব সমাহিত চিত্ত...... ঠাকুরের ভেতরে যেন পুরো অদ্বৈত ভাব আর বাইরে ভক্তি, একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বকে যখন এই শব্দ দিয়ে পূজা করা হচ্ছে তখন তিনি যেন আরও বড় হয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু এই

প্রার্থনার বিনিময়ে তিনি কি চাইছেন? তোমার আমার মধ্যে যে ভালোবাসা এই ভালোবাসা যেন দিনে দিনে আরও বাড়ে। আমরা অনেক সময় বলি ভালোবাসাটা বিশেষ্য পদ নয়, ভালোবাসা হল ক্রিয়া। যখন বলছি আমি তোমাকে ভালোবাসি, তখন ভালোবাসাটা যেন বিশেষ্য হয়ে গেল, কিন্তু ভালোবাসাটা করে দেখাতে হয়। ঠাকুরের জীবনে এর একটা খুব ভালো দৃষ্টান্ত আছে। ঠাকুর ভক্তদের সামনে খুব সুন্দর কিছু কথা বলার পর একজন ভক্ত বলছেন 'বাঃ! খুব দারুণ কথা তো'। ঠাকুর সেই ভক্তকে বলছেন 'একটা থ্যাঙ্কু দাও'। ভক্তটি তখন বলছেন 'থ্যাঙ্কু বললেই কি সব হয়ে গেল'? তার উত্তরে ঠাকুর বলছেন 'মুর্খদের জন্য ওটাও বলতে হয়। রাবণ বধের পর শ্রীরামচন্দ্র যখন বিভীষণকে লঙ্কার রাজা করছেন বিভীষণ তখন বলছেন 'আমার রাজ্য লাগবে না, আপনার শ্রীপাদপদ্মে আমার ভক্তিটুকুই চাই'। শ্রীরামচন্দ্র বলছেন 'মুর্খদের জন্য তোমাকে রাজা হতে হবে, তা নাহলে মুর্খরা বলবে বিভীষণ শ্রীরামচন্দ্রের জন্য এত কিছু করল তার বদলে সে কী পেল'? কিছু কিছু জিনিস আছে যেগুলোকে কার্যে দেখাতে হবে। অনেকে আছে যাদের ভক্তি শ্রদ্ধা বলে কিছু নেই তারা প্রায়ই এই কথা বলবে 'ভক্তি ভেতরের ব্যাপারে, বাইরে দেখাবার কিছু নেই'। কিন্তু একেবারেই তা নয়, ভক্তি পুরোপুরি বাইরেরই ব্যাপার, বাইরে তোমাকে ভক্তি দেখাতে হবে। ঠাকুর তাই বলছেন ঈশ্বরের নামে লজ্জা, ঘৃণা, ভয় থাকতে নেই। বলার পর মাস্টারমশাইকে গান করতে বলছেন। মাস্টারমশাই ইতস্ততঃ করছেন দেখে ঠাকুর বলছেন 'স্কুলের ছেলেদের সামনে দাঁত বার করতে পার আর এখানে ঈশ্বরের গান করতে তোমার সঙ্কোচ'! এই ভাবটাই এখানে নিয়ে আসা হয়েছে, যতক্ষণ শব্দ দিয়ে স্তুতি না করা হবে ততক্ষণ ভালোবাসার বাঁধনটা কোথা থেকে আসবে! ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসার প্রকাশ বিভিন্ন ভাবে নিয়ে আসতে হয়। যখন ধ্যান করছে তখন ভালোবাসা এক ভাবে আসবে আর যখন ধ্যান করছে না তখন হাততালি দিয়ে হরিনাম করছে, তাতেও ভালোবাসা হয়, দুটোই করতে হবে।

অথং বেনশ্চয়োদয়ৎ পৃশ্নিগর্ভা জ্যোতির্জরায়ু রজসো বিমানে।
ইমম্ অপাং সংগমে সূর্যস্য শিশুং ন বিপ্রা মতিভী রিহ্ন্তি।। (ঋ-১০/১২৩-১)।

এতক্ষণ দেখান হল ভগবানকে কোথাও বাবার মত পূজা করা হচ্ছে, কোথাও বাবা ও মা একসাথে ভেবে, আবার কোথাও বন্ধুর মত, সখার মত, আবার দেখলাম শুধু মাতৃ রূপে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছেন। এই মন্ত্রে ভগবানকে শিশুর মত, বালকের মত পূজা করা হচ্ছে, যেটা পরের দিকে শ্রীকৃষ্ণকে নাড়ুগোপাল রূপে পূজায় পাওয়া যাচ্ছে। বেদের ঋষিদের অনেক নামে অভিহিত করা হয়, তার মধ্যে একটা নাম কবি, আরেকটি নাম বিপ্র যেটা এই মন্ত্রে বলছেন। আবার কখন মনীষীও বলা হয়। এই মন্ত্রেও ভগবানের স্তুতি করা হচ্ছে, কিন্তু এখানে স্তুতি করে ভগবানকে যেন আদর করা হচ্ছে, আদর করে তাঁর শরীরে যেন আলতো করে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। কিভাবে করা হচ্ছে? শিশুকে মা যেমন ভাবে আদর করে ঠিক সেই ভাবে আমি আমার কবিতা দিয়ে ভগবানকে আদর করছি। এই ধরণের অনেক মন্ত্র আছে যেখানে ভগবানকে নবজাত শিশুর প্রতি যেমনটি করা হয় ঠিক সেইভাবে ভগবানের সাথে ব্যবহার করা হয়। সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যে একটা একত্বের ভাব বিরাজ করছে, সেই একত্বকে নিয়ে একটা মন্ত্রে খুব সুন্দর বলছেন –

বেনস্তৎ পশ্যন্ নিহিতং গুহা সদ্ যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীডম্।
তস্মিন্নিদং সং চ বি চৈতি সর্বং সঃ ওতঃ প্রতোশ্চ বিভূঃ প্রজাসু।।য-৩২/৮।।

দর্শনের দিক থেকে এটি একটি খুব উচ্চমানের মন্ত্র, অন্য দিকে যজুর্বেদের এই মন্ত্রে আবার যজ্ঞে আহুতি দেওয়া হয়। একজন প্রেমিক ঋষি, যাঁর ভেতরটা ভালোবাসায় পরিপূর্ণ, তিনি আবার জ্ঞানী, এই ব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্বকে তিনি যেভাবে দেখছেন সেটাই বলছেন *বেনস্তৎ পশ্যন্ নিহিতং গুহা সদ্*। প্রথমে কয়েকটি ধাপে বলছেন। প্রথমে তৎ এই সম্বোধন করে বলছেন। তৎ একটি সর্বনাম, কোন বস্তুকে ইঙ্গিত করে বলা হয়। যেমন নাম না বলে বলা হয় তুমি যাও, তুমিটা সর্বনাম। তৎ হিন্দু শাস্ত্রের খুব নামকরা সর্বনাম, *সর্বম্*, সৃষ্টিতে যাবতীয় যা কিছু আছে সব কিছুকে তৎ একটি সর্বনাম দিয়ে ইঙ্গিত করা হয়। তৎ থেকেই তত্ত্ব শব্দ এসেছে, কিংবা যখন বলছেন *তত্ত্বমসি*, এই যে তৎ বলা হচ্ছে এই তৎ হল ভগবানের নাম। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় যা

কিছু আছে তার সর্বনাম এই তৎ। *বেনস্তৎ পশ্যন্*, ঋষি সেই দিব্য সত্তাকে তৎ রূপে দেখছেন। *নিহিতং গুহা সদ্*, সেই সত্তা গুহার মধ্যে নিহিত হয়ে আছেন, গুহার মধ্যে বা হৃদয়ের ভেতরে একটা রহস্যময় রূপে অবস্থান করে আছেন। রহস্যময় বলা হয় এই জন্য যে তাঁকে জানা যায় না। অথচ বলছেন *যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীডম্*, এই পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন একটি *নীডম্*, একটি single ঘর, নীড় মানে পাখির বাসা। আমরা মনে করছি আপনি আলাদা, আমি আলাদা, সে আলাদা, কিন্তু কেউ আলাদা নয়, পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এক। এই পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একটিই বাসা, সেই বাসাটাই ভগবান।

তস্মিন্নিদং সং চ বি চৈতি সর্বং, সেই যে নীড়, সেখানেই এই একত্ব রূপী ব্রহ্মাণ্ড গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। সেই নীড় থেকেই আবার বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বেরিয়ে আসে। নাসদীয় সূক্তেও এই একত্বের ভাবকে খুব সুন্দর ভাবে দেখানো হয়েছে, যেখানে বলছেন যখন সৃষ্টি প্রথম বেরিয়ে আসে তখন থেকেই এর একটা দিব্য একত্ব ভাব নিয়ে বেরিয়ে আসে। এই দিব্য একত্ব সৃষ্টির শেষে যেন একটা জায়গায় গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। দিনান্তে পাখি যেমন নিজের বাসায় ফিরে যায়, ফিরে গিয়ে সে যেমন তার বাসার সঙ্গে এক হয়ে যায়। ঠিক তেমনি সৃষ্টিতে যা কিছু আছে সৃষ্টির শেষে তারা যেন ঈশ্বরের সঙ্গে এক হয়ে যায়। ভোরের আলো ফোটার সাথে সাথে বাসা থেকে পাখিরা যেমন বেরিয়ে আসে, ঠিক তেমনি সৃষ্টি যখন আবার শুরু হয় তখন ভগবান থেকে যেন সৃষ্টিটা বেরিয়ে আসে। গীতাতেও ভগবান ঠিক এই কথাই বলছেন – *কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্*, কল্পের যখন শেষ হয় তখন সৃষ্টিতে যা কিছু আছে সব কিছু আমি নিজের মধ্যে টেনে নিই, কল্প যখন শুরু হয় তখন আমার ভেতর থেকেই সব কিছু বার করে নিয়ে আসি। মূল কথা ভগবান থেকেই সব কিছু সৃষ্টি হয় আবার ভগবানেই সব কিছু মিশে এক হয়ে যায়, এই দিব্য একত্বের ভাবের উপর এখানে জোর দেওয়া হচ্ছে।

মন্ত্রে ধাপে ধাপে একত্ব ভাবকে একটা জায়গাতে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করাচ্ছেন। প্রথমে ঈশ্বরের নাম বলছেন তৎ। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রূপকে তৎ নামে সম্বোধন করার পর আরেকটু কাছে নিয়ে এসে বলছেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির শেষে নীড়ে গিয়ে এক হয়ে যাচ্ছে আবার সেই নীড় থেকেই আবার সৃষ্টির শুরুতে বেরিয়ে আসে। শেষ লাইনে গিয়ে মারাত্মক কথা বলছেন *সঃ ওতঃ প্রোতশ্চ বিভূঃ প্রজাসু*, প্রজা মানে সৃষ্টি, যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে সেটাই প্রজা, যারই জন্ম হয়েছে সেই প্রজা, পাথরও প্রজা, আমিও প্রজা সবটাই প্রজা। সমস্ত প্রজার মধ্যে ভগবান বিভু রূপে ওতঃপ্রোত হয়ে রয়েছেন। আমি যে জামা পড়ে আছি, এই জামাটা কিছু দিন আগে কাপড় ছিল, সেই কাপড়কে কেটে সেলাই করার পর এই জামা হয়েছে। কিন্তু কাপড় আগে ছিল সুতো। সুতোগুলো আবার কাপড় হয়ে এক অপরের সাথে এমন জড়িয়ে আছে যে একটা সুতোকে আরেকটা সুতো থেকে আলাদা করে বোঝা যাচ্ছে না। আমরা সবাই এখানে বসে আছি, আমাদের নাম আলাদা হতে পারে, কিন্তু আমরা সবাই ঈশ্বর, সুতো যেমন ওতঃপ্রোত ভাবে এক অপরকে জড়িয়ে থাকে ঠিক তেমনি ঈশ্বর আমাদের সাথে ওতঃপ্রোত হয়ে জড়িয়ে আছেন।

খ্রীশ্চানদের মধ্যে আত্মার ধারণা হল, আমাদের শরীরের মধ্যে অনু পরিমাণ non-material একটা জিনিস আছে যেটাকে তারা আত্মা বলছে। আমাদের কাছে আত্মা তা নয়, আমাদের কাছে একমাত্র আত্মাই আছেন। আর তিনি বিভু রূপে সর্বব্যাপী। আত্মা সর্বব্যাপী বলে আত্মা সবার ভেতরেও আছেন। ঠাকুর বলছেন বিভু রূপে তিনি সর্বত্র বিদ্যমান। একটা পিঁপড়ের মধ্যে তিনি আছেন আবার হাতীর মধ্যেও তিনি আছেন। কিভাবে আছেন? বিভু রূপে *ওতঃ প্রোতশ্চ*। এগুলো বেশি বিচার বিশ্লেষণ করতে গেলে মাথা ঘুরে যায়। খুব বেশি বিচার করারও দরকার নেই, খুব সহজ ব্যাপার। ভগবানই আছেন, ভগবান আমার আপনার ভেতরে অন্তর্যামী রূপে আছেন, খুব ভালো। খ্রীশ্চানদের ধারণানুযায়ী আলোর মত একটা আত্মা আমার আপনার ভেতরে আছেন, কেউ মারা গেলে তার অন্তর্যামী বেরিয়ে চলে গেলেন, শরীরটা পড়ে রইল। তাহলে মৃত শরীর বা শরীরের অঙ্গগুলো ভগবানের ভেতরে না বাইরে? আমরা বলছি ভগবানের ভেতরেই থাকবে। আরও ভেতরে নিয়ে যেতে যেতে এ্যাটমের অবস্থায় যদি চলে যাওয়া হয় তখন ওই এ্যাটম কি ভগবানের বাইরে না ভেতরে থাকবে? ভগবানের ভেতরেই থাকবে। ভগবান এ্যাটমকেও ওতঃপ্রোত করে রেখেছেন। সেখান থেকে ইলেক্ট্রন প্রোটনের অবস্থায় চলে গেলেন, তখন ইলেক্ট্রন প্রোটন কি ভগবানের বাইরে না ভেতরে থাকবে? ভগবানের

ভেতরেই থাকবে। সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতম যেটা আমরা কল্পনা করতে পারি, ভগবান বিভু রূপে সেখানেও ছেয়ে আছেন। এই কথাই বলছেন, *সঃ ওতঃ প্রোতশ্চ বিভূঃ প্রজাসু*, যেমন শরবতে জল ওতঃপ্রোত ভাবে আছে, জলই আছে। মূল কথা তিনিই আছেন, সৃষ্টিতে তাঁকেই নানান রূপে দেখাচ্ছে। এই যে নানান ভাবে দেখাচ্ছে, এই জায়গাতে এসে সবার মধ্যে একটা পার্থক্য হয়ে যায়। বিদ্যাসাগর মহাশয় ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করছেন, তিনি কি কাউকে কম শক্তি কাউকে বেশি শক্তি দিয়েছেন? ঠাকুর তখন খুব সুন্দর বলছেন – তাহলে তোমাকেই কেন আমরা দেখতে আসব? তোমার মধ্যে বেশি শক্তি আছে বলেই তোমাকে দেখতে এসেছি। বিভু রূপে তিনিই আছেন কিন্তু শক্তি রূপে তফাৎ হয়ে যায়। মৃত দেহ আর সজীব দেহে কোথায় তফাৎ? শক্তিতে তফাৎ। প্রাণহীন আর প্রাণবান শরীরে শক্তির তফাৎ। মৃত্যুকে গভীর ভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে ঈশ্বরের দিক থেকে মৃত্যু বলে কিছুই নেই। তিনি তো সর্বত্র সর্বদা বিদ্যমান। চেঙ্গিস খাঁ একে মারল কি তাকে মারল তাতে ঈশ্বরের কিছু আসে যায় না। কারণ সবটাই তো তিনি, যে মারছে সেও তিনি যাকে মারছে সেও তিনি। তবে আমরা যাকে ভালোবাসি তার মধ্যে আমরা সেই দিব্য সত্তাকেই দেখি। ছেলে মেয়ে পরস্পরের মধ্যে যখন ভালোবাসা হয় তখন শুরুই হয় you so divine এই বাক্য দিয়ে। আমাদের ভালোবাসা, আমাদের মুগ্ধ হওয়া সব সময় শক্তিকে কেন্দ্র করেই হয়ে থাকে। ভগবান নিজেও শক্তিকে ভালোবাসেন, তাঁর নামই শক্তিমান। তিনি যাকে বিশেষ ভাবে ভালোবাসেন তাকে শক্তি ঢেলে দেন। আমরা মনে করি ভক্ত মানেই সে কিছু জানে না, হাবাগোবা, শান্ত শিষ্ট। কিন্তু তা নয় ভক্ত মানে তার ভেতর প্রচণ্ড শক্তির প্রকাশ থাকবে। ঠাকুর নিজেই বলছেন, যে ভালো গাইতে পারে, বাজাতে পারে, লেকচার দিতে পারে বুঝবে তার মধ্যে ভগবানের বিশেষ শক্তির প্রকাশ। যার মধ্যে এই বিশেষ শক্তির প্রকাশ হয় তার প্রতিই সবাই আকৃষ্ট হয়, কারণ শক্তিকেই মানুষ ভালোবাসে, শক্তির প্রতিই মানুষ বেশি আকৃষ্ট হয়। কিন্তু যিনি ঋষি, ঠাকুরের কথায় যিনি সিদ্ধের সিদ্ধ, তাঁকে শক্তি আর বিভুর এই পার্থক্য কোন প্রভাবিত করতে পারে না। একেবারেই যে প্রভাবিত করবে না তা নয়, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তিনিও একটু যেন ঈশ্বরীয় শক্তির প্রকাশকে কাছে রাখতে চান। কেশব সেনের শরীর খারাপ, ঠাকুর জগন্মাতার কাছে আকুল হয়ে বলছেন 'মা! কেশবের যদি কিছু হয়ে যায় তাহলে কলকাতায় গেলে কার সঙ্গে কথা বলব'! ছেলে যদি মরে যায় তখন দুঃখ তো হবেই, মা কার সঙ্গে কথা বলবে, এগুলো আলাদা জিনিস, কিন্তু তাই বলে আমার জীবনটাই শেষ হয়ে যাবে তা নয়। মারা গিয়ে কোথায় যাবে, যেখানেই যাক না কেন ভগবানের ঘরেই তো থাকছে, ভগবানের বাইরে তো কিছু নেই। কিন্তু কার সঙ্গে আমি কথা বলব, কার সঙ্গে খেলব, এগুলো অন্য ধরণের সমস্যা।

প্রথমে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে যেন আঙুল দিয়ে ইশারা করে বলছেন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তৎ। সেখান থেকে এক ধাপ এগিয়ে এসে বলছেন *গুহায়াম্*, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড রহস্যময়, একে বোঝা যায় না। পরের ধাপে গিয়ে বলছেন, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভগবানের মধ্যে গিয়ে এক হয়ে যায়। তাহলে আবার যখন সৃষ্টি হচ্ছে তখন কি ভগবানের থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছে? পরের ধাপে এসে বলছেন, কখনই আলাদা হচ্ছে না, ওতঃপ্রোত রূপে ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে আছে, আর শেষে বলছেন বিভু রূপে তিনিই আছেন, সবেতে তিনিই এক হয়ে রয়েছেন। এই যে পূর্ণ একত্বের ভাব, নিজেকে যখন সব কিছু থেকে একান্ত করে নিয়ে এই একত্বের ভাব নিয়ে গভীর ভাবে চিন্তা করা যায় তখন এই ভাবটা খুব ভালো করে বোঝা যায়। সমুদ্রের ধারে কোন নির্জন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি, কোথাও কোন প্রানী নেই, আমি একা আছি আর ভাবছি এই বিশাল বিশ্ব তার মধ্যে এই অগাধ জলরাশির তরঙ্গের উচ্ছাস, কোথায় যেন একটি দিব্য একত্বের ভাব সব কিছুকে এক সূত্রে বেঁধে রেখেছে, আমিও এই একত্বের একটি অঙ্গ, সেই অঙ্গেরই আরেকটি অঙ্গ আমার মন এক উচ্চ অবস্থায় এসে এই একত্বের ভাবকে গ্রহণ করতে সক্ষম হচ্ছে, যার মধ্যে আমি নিজেকেও দেখছি। যে কেউ যদি এই ভাব নিয়ে চিন্তা করে, ধীরে ধীরে এই চিন্তাই তাকে এক উচ্চমানের অনুভূতি করিয়ে দেবে। ঈশ্বরের সত্তা সব কিছুতে বিভু রূপে ওতঃপ্রোত ভাবে ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে, এটি একটি উচ্চতম অনুভূতি। ঠাকুর বলছেন শাস্ত্র পড়ে কী হবে! খুব বড়জোর ধারণা হবে যে তিনি আছেন, এর বেশি কিছু হয় না। যতক্ষণ না ডুব দিচ্ছ ততক্ষণ কিছু হবে না, ডুব দিলে জানতে পারবে শাস্ত্রের কথাগুলো সত্য। ডুব দিচ্ছি না, শাস্ত্রের কথা গভীর ভাবে চিন্তা ভাবনা করছি

না কিন্তু শাস্ত্রের কথা মন দিয়ে শুনে যাচ্ছি, এতে আর কিছু না হোক, কিছুক্ষণের জন্য একটু spiritual entertainment হয়ে যাচ্ছে, এর বেশি কিছু হয় না। যতক্ষণ নিজের সাধনা না শুরু হয়, শাস্ত্রের এই সব উচ্চ ভাবকে নিয়ে যতক্ষণ গভীরে ডুব না দেওয়া হয় ততক্ষণ জগতের প্রতি আকর্ষণটা কমতে শুরু করবে না, জগতের প্রতি আকর্ষণ না কমা পর্যন্ত জীবনে আঘাত যন্ত্রণা পাওয়াটাও শেষ হবে না। দিব্য সত্তা এক, সব কিছু সেই দিব্য সত্তার সাথে একত্বে ওতঃপ্রোত হয়ে আছে এই ভাবটা যত ভেতরে ঢুকে কাজ করতে শুরু করবে তত জগতের যা কিছুর প্রতি আমাদের অভিসঙ্গি হয়ে আছে সেটা আলগা হতে শুরু করে আর দ্বেষ ভাবটাও সরে যেতে থাকে। রাগ আর দ্বেষ দুটোরই বাঁধন আলগা হতে শুরু হয়ে যায়। দিব্য একত্বের অনুভূতি হয়ে যাওয়ার পরেও যতক্ষণ শরীর থাকবে ততক্ষণ রাগ আর দ্বেষের বাঁধন থাকবে কিন্তু পোড়া দড়ির মত হয়ে থাকবে, ওই দড়ি দিয়ে বাঁধনের কার্য আর হবে না। অথর্ব বেদের এমন একটি মন্ত্র পাই যেখানে ঋষি ঈশ্বরকে নিজের প্রেমিক রূপে বর্ণনা করছেন –

দোহেন গামুপ শিক্ষা সখায়ং প্র বোধয় জরিতর্জারমিন্দ্রম্।
কোশং ন পূর্ণং বসুনা ন্যৃষ্টমা চ্যাবয় মঘদেয়ায় শূরম্।।অ-২০/৮৯/২।।

এখানে *জারম্* একটি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। পরের দিকে সংস্কৃত সাহিত্যে বা ইদানিং আমাদের যে প্রচলিত ভাষা তাতে জার শব্দটা খারাপ অর্থেই ব্যবহৃত হয়। এমনকি নারদীয় ভক্তিসূত্রে ঈশ্বরের প্রতি পরা ভক্তিকে তুলনা করছেন *জারানাম্* শব্দ দিয়ে। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি কেমন? *যথা ব্রজগোপীকানাম্*, ব্রজের গোপীদের মত ভক্তি। সেই ভক্তি কেমন? *জারানামিব*, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপীদের ভক্তির ব্যাপারটা যদি না থাকত তাহলে পরা ভক্তিকে বোঝানই যেত না। জার শব্দের শাব্দিক অর্থ হয়, যে ভালোবাসায় শারীরিক কামনা থাকে। বেদে কিন্তু এর অর্থ অন্য রকম। বেদে জার মানে প্রেমিক, প্রেম বলতে যা বোঝায়।

এই মন্ত্রের দেবতা ইন্দ্র। ইন্দ্রের স্তুতি করে বলছেন *দোহেন গামুপ শিক্ষা সখায়ং*, গরুর দুগ্ধ দোহন করার জন্য যেমন গরুকে কাছে নিয়ে আসা হয়, তেমনি বলছেন ভগবানকে দোহন করার জন্য কাছে নিয়ে এসো। *প্র বোধয়, বোধয়* শব্দের অর্থ হয় জানিয়ে দেওয়া, আবার জাগানোর অর্থেও ব্যবহার করা হয়। *জরিতর্জারমিন্দ্রম্*, ইন্দ্রের প্রতি আমার এক প্রেমিকের ভালোবাসা। প্রেমিকা প্রেমিকে যেমন খুব ভালোবেসে জানায় বা জাগায় বা আমন্ত্রণ জানায়, ঠিক সেই রকম তুমি ইন্দ্রকে জাগাও যাতে *কোশং ন পূর্ণং ন্যৃষ্টমা চ্যাবয় মঘদেয়ান শূরম্*, তিনি যেন আমাদের ধন রত্ন দেন। কিন্তু তার আগে গরুকে দোহন করার জন্য কাছে নিয়ে আসা হয় ঠিক তেমনি ইন্দ্রকে কাছে নিয়ে এসো। বেদ মানেই যজ্ঞ, যজ্ঞ যখন হবে তখন ইন্দ্র যেন কাছে আসেন। গরুকে দোহনের জন্য নিয়ে এলে দুধ পাওয়া যাবে, প্রেমিক যখন প্রেমিকাকে ডেকে নিয়ে আসে তখন তাদের ভালোবাসা আরও কাছে আসে। ইন্দ্রকে সেইভাবে কাছে ডেকে নিয়ে আসতে বলা হচ্ছে আর এদের প্রার্থনা যেন পূরণ হয়। আমার ইচ্ছার পূর্তি কীভাবে হবে এটাকে দুভাবে বলছেন, এক গরুর দুধ যেমন ভাবে পাওয়া যায় বা দ্বিতীয় প্রেমিক যেমন তার প্রেমিকাকে পায়। এই মন্ত্রে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে মধুর ভাবের বীজ বেদেই নিহিত ছিল। ইন্দ্রকে জার বলে সম্বোধন করছে, জার মানে প্রেমিক। ভারতে ধর্মের যত রকম ভাব আছে তার সব বীজ বেদেই আছে। ভগবানকে নিজের প্রেমিকা রূপে ভালোবাসা, যিনি ভালোবাসছেন তিনি কোন মহিলা নন, তিনি একজন ঋষি। আবার একটা জায়গায় ভগবানকে স্ত্রীর সঙ্গে তুলনা করছেন। ভগবানের প্রতি কি রকম ভালোবাসা? স্বামীর সাথে স্ত্রীর মিলনের যে ভালোবাসা, ভগবানের প্রতি ওই রকম ভালোবাসা।

অচ্ছা ম ইন্দ্রং মতয়ঃ স্বর্বিদঃ সধ্রীচীর্বিশ্বা উশতিরনূষত।
পরি ষ্বজন্তে জনয়ো যথা পতিং মর্য ন শুন্ধ্যুং মঘবানমূতয়ে।।ঋ-১০/৪৩/১

পরি ষ্বজন্তে জনয়ো যথা পতিং, একজন রূপবতী স্ত্রী তার স্বামীকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে আলিঙ্গন করার জন্য স্বামী যেমন খুশী হয়ে যায়, খুশী হয়ে স্বামী স্ত্রীর কামনা-বাসনা পূরণের জন্য সব কিছুই করতে রাজী হয়ে যায়। ঠিক সেই রকম হে ইন্দ্র! আমার মন্ত্রগুলি যেন তোমাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে আর তোমার হৃদয়ের অর্গল যেন খুলে যায়। এই ধরণের প্রার্থনাগুলি ইন্দ্রের প্রতিই বেশি করা হয়েছে। যদিও এই মন্ত্রগুলিতে প্রার্থনা

করা হয়েছে কিন্তু এই প্রার্থনাগুলির পেছনে একটু চাহিদা আছে, আমাদের ইচ্ছা ও কামনার যেন পুর্তি হয় আর আমাদের যেন ধন সম্পদ হয়। ঋষি বলছেন, আমার এই মধুর গানগুলো যেন ভগবানকে চারিদিক থেকে জড়িয়ে ধরে যাতে তিনি আমার এই প্রার্থনাগুলো পূরণ করেন। এই প্রার্থনাগুলো পুরোপুরি ভক্তির নয়। এখানে পরিষ্কার বলছেন, আমার ধন-সম্পদ চাই। এই প্রার্থনাগুলি কীভাবে জড়িয়ে ধরবে? এখানে জার শব্দ দিয়ে বলা হচ্ছে না, পতি শব্দ দিয়ে বলছেন একজন সুন্দরী স্ত্রী যেমন তার স্বামীকে জড়িয়ে ধরে। মহাপুরুষ বা ঋষিদের মনে অনেক রকম ভাব আসে, এক একটা ভাব যখন আসছে তখন তাঁরা কখন জার বা প্রেমিকের উপমা, কখন স্ত্রীর উপমা নিচ্ছেন। আসলে এমন কোন উপমা নেই যা ঈশ্বরের জন্য ব্যবহার করা যায় না। ঠিক তেমনি আরেকটি মন্ত্রে বলছেন –

দেবো ন যঃ পৃথিবী বিশ্বধায়া উপক্ষেতি হিতোমিত্রো ন রাজা।
পুরঃ সদঃ শর্মসদো ন বীরা অনবদ্যা পতিজুষ্টেব নারী।।ঋ-১/৭৩/৩।।

এই মন্ত্রের দেবতা অগ্নি। অগ্নিকে অনেক ভাবে স্তুতি করা হচ্ছে। *দেবো ন যঃ পৃথিবীং বিশ্বধায়া*, অগ্নি, যিনি জ্বলজ্বল করছেন তাঁকে প্রার্থনা করা হচ্ছে। *বিশ্বধায়া*, তিনি সবারই জন্য, সবাইকে তিনি ধারণ করে আছেন। এই অগ্নি আমরা যে অগ্নির ব্যবহার করি সেই অগ্নি নয়, অগ্নি এখানে একজন দেবতা যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যাবতীয় যা কিছু আছে সব কিছুকে ধারণ করে আছেন। *উপক্ষেতি হিতোমিত্রো ন রাজা*, এই জগতে তিনি তাঁর সত্যিকারের মিত্রদের দ্বারা পরিবেষ্টিতে হয়ে রাজার মত বিরাজ করেন। আমরা যাকে আমাদের মিত্র মনে করি তাদের বেশির ভাগই হয় সুযোগসন্ধানী, আর রাজাদের তো সব সময় তার তোষামোদী মিত্ররা ঘিরে রাখে। এখানে তা নয়, অগ্নির আশেপাশে যারা মিত্র তারা সবাই অগ্নির হিতাকাঙ্খী, *হিতোমিত্র* অগ্নির হিতাকাঙ্খী মিত্ররা তাঁকে ঘিরে রেখেছে। যার যেমন কল্পনা শক্তি সেই অনুযায়ী এসব মন্ত্রের বিচার করতে পারে। অগ্নি যদি কারুর ইষ্ট হন তাহলে তিনি কীভাবে থাকবেন? যেভাবে তাঁর ইষ্ট থাকেন। যার ইষ্ট ঠাকুর, তার ভেতর ঠাকুরের ভাব আসবে। যাঁর আরাধনা করবে তাঁর ভাবই তার মধ্যে আসবে। ঠাকুরের কী ভাব? ঠাকুর ত্যাগের বাদশা। অগ্নির ক্ষেত্রে বলছেন, তিনি পৃথিবীতে রাজার মত থাকেন, যার ইষ্ট অগ্নি সেও এবার রাজার মত থাকুক। শুধুই যে রাজার মত বিচরণ করছেন তা নয়, চারিদিকে হিতমিত্ররা দাঁড়িয়ে আছেন, দেবতার মিত্র দেবতাই হবেন, বাকি যাঁরা দেবতা আছেন তাঁরা অগ্নিকে ঘিরে রেখেছেন।

পুরঃ সদঃ শর্মসদো ন বীরা, অন্তঃপুরে যখন থাকেন সেখানেও তিনি বীরপুরুষের মত বসে থাকেন। *অনবদ্যা পতিজুষ্টেব নারী*, যে স্ত্রীর কাছে অন্য কোন পুরুষ যেতে পারে না। যেমন সীতা, রাবণ এত চেষ্টা করেও সীতার কাছে ঘেঁষতে পারল না, এই রকম সতী, অথচ সেই নারী স্বামীকে প্রচণ্ড ভালোবাসে। এবার কল্পনা করা যাক, অগ্নি দেবতা আমার সামনে বসে আছেন, যিনি নিজের জ্যোতিতে জ্বলজ্বল করছেন। কি রকম বসে আছেন? সত্যিকারের বন্ধুদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে রাজার মত বসে আছেন। শেষে বলছেন, বীরপুরুষের কাছে তাঁর অনবদ্য স্ত্রী, অনবদ্য স্ত্রী মানে যে নারীর কাছে কোন পুরুষ ঘেঁষতে পারে না সেই স্ত্রীর কাছে তাঁর স্বামী যেভাবে বসে থাকেন। ঠাকুরের ভক্ত যদি হয় তাহলে ভক্ত কি রকম হবে? একজন পতিব্রতা স্ত্রীর মত, তার কাছে আর কেউ ঘেঁষতে পারবে না। আর ঠাকুর কি রকম? একজন বীরপুরুষের মত। বীরপুরুষ যেমন তাঁর পতিব্রতা স্ত্রীর কাছে বসে থাকেন ঠিক তেমনি ভক্তের কাছে ঠাকুর সেইভাবে বসে আছেন। বেদের এই মন্ত্রে ঠিক এই কথাই বলা হচ্ছে, অগ্নি রাজার মত বসে আছেন। বীরপুরুষ কি শত্রুর মধ্যে বসে আছে নাকি তার সতী স্ত্রীর কাছে, যে স্ত্রীর কাছে অন্য কোন পুরুষ আসতে পারে না, তার কাছে বসে আছে? সতী স্ত্রীর কাছে বসে থাকলে বীরপুরুষের যে রকম অনুভূতি হবে অগ্নিও সেই অনুভূতি নিয়ে শক্তিমানের মত বসে আছেন। অগ্নি এখন শত্রুর মধ্যে নেই, রাজদরবারেও নেই, নিজের অন্দরমহলে সতী স্ত্রীর কাছে বসে আছেন। এই ধরণের মন্ত্রগুলিকে আধার করেই পরবর্তিকালে ভক্তিশাস্ত্রে মধুর ভাব সমৃদ্ধ হয়েছে। ঠাকুর তিন টান এক হওয়ার কথা বলছেন, তার মধ্যে একটা টান হল সতীর পতির উপর টান। সতী হল, নিজের স্বামী ছাড়া অন্য কোন পুরুষের ছায়া পর্যন্ত তার মনের মধ্যে আসবে না। সতীর মন একটা জায়গাতেই স্থির হয়ে গেছে, ওর বাইরে সে আর যায় না। ঠাকুর বলছেন, সতী স্ত্রী বাড়িতে সবারই সেবা করে, শ্বশুড়ের সেবা করছে, ভাসুর,

দেওর সবারই সেবা করে যাচ্ছে, কিন্তু স্বামীর সঙ্গে তার একটা অন্য ব্যাপার। সতীত্ব মানেই একটা জায়গায় স্থির। আবার একটা মন্ত্রে ভগবানকে বন্ধু রূপে দেখা হচ্ছে, এটাই পরে ভক্তিশাস্ত্রে সখ্যভাবে চলে গেছে।

মাকির্ন এনা সখ্যা বি চৌষুস্তব চেন্দ্র বিমদস্য চ ঋষেঃ।
বিদ্ম হি তে প্রমতিং দেব জামিবদস্মে তে সন্তু সখ্যা শিবানি।।ঋ-১০/২৩/৭।।

মন্ত্রের দেবতা ইন্দ্র। এমনিতেই সখ্য শব্দের অন্তর্নিহিত অর্থ অন্য রকম হয়, তার উপর আবার বেদ থেকে এই সখ্য শব্দ নেওয়া হচ্ছে, বেদের সময়ে সখ্য শব্দের আরও অন্য অর্থ হয়ে যায়। আরও যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ তা হল আমাদের আধ্যাত্মিক শাস্ত্রের পরিভাষাগুলি গভীর অর্থবহ হয়। সখ্য ভাব হল যেখানে ঈশ্বরকে নিজের সখা রূপে দেখা হয়। সখ্য ভাবকে সব থেকে সুন্দর ভাবে প্রস্ফুটিত করা হয়েছে কৃষ্ণ-অর্জুন বা কৃষ্ণ-সুদামার কাহিনীতে। রাম আর সুগ্রীবের কাহিনীর মধ্যেও সখ্যভাবকে নিয়ে আসা হয়েছে, যদিও একবার শ্রীরামচন্দ্র সুগ্রীবের উপর একটু ক্ষুণ্ন হয়েছিলেন। সখ্য মানে সখা, সখার একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হল, দুজনকে সমান সমান হতে হবে। যখন দুজনের মধ্যে খুব গভীর প্রেমের সম্পর্ক তৈরী হয় তখনই সমান সমান ভাব আসে। যার জন্য অর্জুনের যদিও শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সখা ভাব ছিল, কিন্তু একাদশ অধ্যায়ে বিশ্বরূপ দেখে আঁৎকে উঠে বলছেন আমি না জেনে না বুঝে আপনার সাথে কত রকম ভুল ব্যবহার করেছি। যদিও অর্জুন শেষ দিন পর্যন্ত সখাভাবেই ছিলেন।

আমাদের পরম্পরাতে কিছু ঘটনা আছে যার কথা আমরা মুখে মুখে শুনে আসছি। সেই রকম একটি ঘটনার কথা বলতে গিয়ে একজন মহারাজ বলছেন, ঠাকুর যখন দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন সেই সময় বরাহনগরে ফাগুর কচুরির দোকান ছিল। ফাগুর দোকানের কচুরি ঠাকুর ভালোবাসতেন। বেলুড়ে মঠ স্থাপন হয়ে যাওয়ার পরের দিকের ঘটনা। একদিন স্বামীজী গঙ্গা পেরিয়ে কলকাতায় যাচ্ছেন। হঠাৎ স্বামীজী দেখেন ফাগুর দোকানে গরম গরম কচুরি ভাজা হচ্ছে। ওই দেখে তিনি এক চাংড়ি কচুরি কিনে কলকাতা না গিয়ে বেলুড়ে ফেরত চলে এলেন। মঠের সবাই দেখে অবাক। স্বামীজী হঠাৎ কেন ফেরত চলে এলেন! স্বামীজী কাউকে কিছু না বলে সোজা পুরনো মন্দিরে গিয়ে ঠাকুরের সামনে পুরো এক চাংড়ি কচুরি রেখে বলছেন 'খাও ইয়ার্'! এই যে স্বামীজী 'খাও ইয়ার্' বলছেন, এই 'ইয়ার্' শব্দটা সমত্ব বোধেরই উপযুক্ত ব্যঞ্জনা। সমান সমান বোধ না এলে সখ্য ভাব আসবে না। সেইজন্য ঈশ্বরের সঙ্গে সখ্যভাব হওয়া খুব কঠিন। ইন্দ্রকে ঋষি বলছেন, *মাকির্ন এনা সখ্যা বি চৌষুস্তব চেন্দ্র বিমদস্য চ ঋষেঃ*, যে ঋষি এই মন্ত্রের দ্রষ্টা ছিলেন তাঁর হয়তো বিমদ নাম ছিল, বলছেন, হে ইন্দ্র! বিমদ ঋষি আর আপনার (ইন্দ্র) *বিদ্ম হি তে প্রমতিং দেব জামিবদস্মে তে সন্তু সখ্যা শিবানি*, মধ্যে যে সম্পর্ক, আমি জানি আমার প্রতি আপনার যে ভাইয়ের মত ভালোবাসা, আপনার এই ভালোবাসা পবিত্র ভালোবাসা, এই শুভ সম্পর্ক যেন চিরদিন স্থায়ী হয়। এখানে সখ্য শব্দ আমরা অনেক ভাবে অনুবাদ করছি, কিন্তু বেদের সময়ে তাঁরা সখ্য শব্দের হয়ত অন্য রকম অর্থ করতেন।

মূল কথা হল, গীতায় ভগবান বলছেন, আমিও তাকে ভুলি না সেও আমাকে ভোলে না। কারণ *জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্*, জ্ঞানী ভগবানের আত্মা, তাঁকে ভগবান কখন ভুলতে পারেন না। ভগবান গীতায় যে ভাবটা বলছেন, এই ভাবটাই বেদে ঋষি বলছেন – আমি জানি আপনি আমাকে ভালোবাসেন, আমি জানি আপনার সাথে আমার একটা একত্বের সম্পর্ক, আপনার সাথে আমার এই সখ্য ভাব, বন্ধুত্বের সম্পর্ক যেন কোন দিন নাশ না হয়ে যায়। বন্ধু ভাবে ভগবানের সাথে যেমন সম্পর্ক দেখান হল, ঠিক তেমনি আরেকটি মজার সম্পর্ককে দেখান হয়েছে যেখানে ভগবানকে অতিথি রূপে দেখাচ্ছেন। যজ্ঞের সময় দেবতারা আহুতি গ্রহণ করার জন্য যজ্ঞে উপস্থিত হন। বাড়িতে যজ্ঞ হচ্ছে সেখানে দেবতারা এসেছেন, তাঁরা তখন সেই বাড়ির অতিথি। পরের দিকে আমরা বলছি *অতিথি দেবো ভবো*, এখানে ঠিক উল্টো, *দেবঃ অতিথি ভব*। যখন পূজা করা হয় তখন আমরা দেবতাদের আহ্বাণ করে বলি, আসুন বসুন, আসন গ্রহণ করুন ইত্যাদি, তার মানে তিনি আমাদের অতিথি হয়ে গেলেন। ইষ্টকে অবশ্য এভাবে আবাহন করে নিয়া আসা হয় না, কারণ তিনি তো

আমার ভেতরেই আছেন। তবে বহিঃপূজার সময় ইষ্টকেও ভেতর থেকে আবাহন করে বাইরে নিয়ে এসে পূজাদি করা হয়। এই মন্ত্রে বর্ণনা করা হচ্ছে দেবতারা কীভাবে অতিথি রূপে আসেন।

বিশোবিশো বো অতিথি বাজয়ন্তঃ পুরুপ্রিয়ম্।
অগ্নিং বো দুর্যং বচঃ স্তুষে শুষস্য মন্মভিঃ।।ঋ-৮/৭৪/২।।

বিশোবিশো বো অতিথি, প্রত্যেক গৃহে তিনি অতিথি। বেদের সময় এই সমস্যাটা দেখা দিয়েছিল যে, যখন ইন্দ্রকে বা অগ্নিকে বা কোন দেবতাকে আহুতি দেওয়া হচ্ছে তখন সেই দেবতা কীভাবে গ্রহণ করতেন? পরের দিকের দর্শনগুলিতে বিশেষ করে আমাদের ষড়দর্শনে এর উপর প্রচুর আলোকপাত করা শুরু হয়ে যায়। যখন ইন্দ্রকে যজ্ঞে আহুতি দেওয়া হয় তখন সেই যজ্ঞস্থলে আহুতি নেওয়ার জন্য সত্যিই কি ইন্দ্র আসেন? যদি না আসেন তাহলে আহুতি দিয়ে আমার কি লাভ? যদি আসেন, তাহলে আমি যখন যজ্ঞে আহুতি দিচ্ছি তখন অন্য কোথাও আরেকজনও তো আহুতি দিচ্ছে। যেমন আমি যখন ঠাকুরের ধ্যান করছি, তখন বলছি ঠাকুর তুমি এসো, আমাদের হৃদয়াসনে বিরাজ কর। সেই সময় আরও অনেকে তো ঠাকুরের ধ্যান করছে। ঠাকুরকে নিয়ে তো রীতিমত টানাটানি শুরু হয়ে যাবে, এখন ঠাকুর কোথায় যাবেন? এখান থেকেই দেবতা বা ঈশ্বরকে একজন পুরুষ রূপে ভাবা থেকে সরে এসে এই ধারণা এসে গেল তিনি এক সঙ্গে অনেক জায়গায় থাকতে পারেন। এর আগে বেদের একটা মন্ত্রে বলছেন *ইন্দ্র মায়াভিঃ পুরূরূপো ঈয়তে*, তিনি অনেক রূপ ধারণ করতে পারেন। এই মন্ত্রের সাথে আমাদের আলোচ্য মন্ত্রের একটা প্রধান পার্থক্য হল, যে দেবতারই পূজো বা স্তুতি করা হোক, বায়ু, অগ্নি, বৃহস্পতি, ইন্দ্র যাকেই স্তুতি করা হোক তিনি ইন্দ্রই, ইন্দ্রই এইসব নানান রূপ ধারণ করছেন, আর তাই নয়, ইন্দ্র নিজেই মানে এক ইন্দ্র একসাথে অনেক বাড়িতে যেখানে যজ্ঞে আহুতি দেওয়া হচ্ছে সেখানে উপস্থিত থাকেন। ঈশ্বরের এই সর্বব্যাপিত্ব, যাকে আমরা বিভু বলি, এই ধারণাটা বেদেই এসে গিয়েছিল। অনেকের একটা ভুল ধারণা যে বেদে শুধু দেবতাদেরই পূজো, যজ্ঞের কথা বলা হয়েছে, ঈশ্বরের ধারণা অনেক পরে এসেছে। কিন্তু তা নয়, বেদের ঋষিদের মধ্যে অনেক আগেই ঈশ্বরের এই সর্বব্যাপিত্বের বা বিভুর ধারণা এসে গিয়েছিল। পরের দিকে বেদেই অনেক মন্ত্র আছে সেখানে আত্মভাব, ঈশ্বর আমার নিজের আপনজন এই ভাব এসেছে। ঈশ্বরের ব্যাপারে ঠাকুর বার বার বলছেন, তিনি তো আপনজন, তিনি নিজের লোক। কিন্তু এই মন্ত্রে ভগবানকে অতিথি রূপে দেখছেন। পরে এটাই উল্টো হয়ে গিয়ে *অতিথি দেবো ভব* হয়ে গেছে, কিন্তু এখানে দেবতা অতিথি ভব, দেবতা অতিথির সমান। যার জন্য একমাত্র হিন্দুদের মধ্যেই দেখা যায় বাড়ির একটা ঘর গৃহদেবতার পূজোর জন্য আলাদা করে রাখা হয়, তাঁর জন্য আবার আলাদা শয়নকক্ষ। জাপানে এক সময় প্রথা ছিল, কোন কারণে রাজা যদি বাড়িতে এসে যান সেইজন্য প্রত্যেক বাড়িতে একটা বিশেষ ঘরকে আলাদা করে সব সময় সাজিয়ে রাখা হত। ভারতে ভক্তির প্রভাব বেড়ে যাওয়ার পর এখানেও একই ব্যাপার শুরু হয়ে গেল, দেবতা বা ভগবান তিনি যদি সাক্ষাৎ এসে যান সেইজন্য আগে থেকেই তাঁর ব্যবহারের সব কিছু আলাদা করে রেখে দেওয়া হয়। এমনকি পূজোর বাসন এবং অন্যান্য আনুষাঙ্গিক জিনিস সব সময় আলাদা করে রাখা হয়, অন্য কোন কাজে ব্যবহার করা হয় না। ভারতে অতিথিকে প্রচণ্ড সম্মান দেওয়া হয়, বাড়িতে অতিথি আসা মানে বিরাট আনন্দের ব্যাপার। পাশ্চাত্যের মানুষ এই ধরণের শব্দ কখন শোনেনি, তাদের ধারণাতেও ছিল না। তাই আমেরিকাতে স্বামীজীর বক্তৃতাগুলিকে যখন রিপোর্টিং করা হয়েছিল তখন নিউজপেপারে অতিথিকে 'অতিতি' বলে উল্লেখ করা হয়েছিল। স্বামীজীও এই কথাই বলছিলেন, ভারতের বাচ্চারা বাড়ির বাইরে অপেক্ষা করতে থাকে যদি কোন অতিথি আমাদের বাড়িতে আসে। যদি দেখে কোন অতিথি আসছে তখন বাইরে থেকেই 'অতিথি' 'অতিথি' বলে চেঁচাতে থাকে। বাড়িতে একজন অতিথি আসা মানে আনন্দের ব্যাপার।

বিশোবিশো, অতিথি শুধু আমার বাড়িতেই নয়, প্রত্যেক বাড়িতে তিনি অতিথি। এখানে সাধারণ ভক্তদের কথা বলা হচ্ছে না, যাঁরা খুব উচ্চমানের ভক্ত একমাত্র তাঁদেরই কথা বলা হচ্ছে। যেমন ঠাকুরের মত ভক্ত যখন পূজো করছেন তখন মা যেন সেখানে আবির্ভূতা হয়ে গেছেন। এখানেও ঠিক তাই হচ্ছে, যাঁরা অগ্নিহোত্রাদি কর্ম করছেন, তাঁরা এত উচ্চমানের ব্রাহ্মণ যে তাঁরা প্রত্যক্ষ দেখছেন যে সেখানে অগ্নিদেবতা স্বয়ং

উপস্থিত। এই মন্ত্রটিও অগ্নিদেবতার নামে। বাল্মীকি রামায়ণেও ঠিক এই রকম বর্ণনা আছে, দশরথ যখন পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করছেন তখন সেখানে সব দেবতারা সশরীরে উপস্থিত হয়ে গেছেন। দেবতাদের যখন যজ্ঞ ভাগ দেওয়া হত তখনও তাঁরা সশরীরে এসে সেই যজ্ঞ ভাগ গ্রহণ করতেন। সশরীরে উপস্থিত হওয়া মানে এই নয় যে আমরা দেবতাদের এই স্থূল চোখে দেখতে পারব, দেবতারা তাঁদের সূক্ষ্ম শরীরে থাকতেন। শ্রীমাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে, ঠাকুরকে যে ভোগাদি নিবেদন করা হয় ঠাকুর কি তা গ্রহণ করেন? শ্রীমা বলছেন, হ্যাঁ তিনি গ্রহণ করেন, জ্যোতি রূপে তিনি সব কিছু স্পর্শ করে তার সারটুকু নিয়ে নেন। এই ভাবটাই মন্ত্রে ঋষি অগ্নিদেবতার উদ্দেশ্যে বলছেন *বিশোবিশো বা অতিথিং*, প্রতি ঘরে ঘরে অগ্নি অতিথি রূপে উপস্থিত থাকেন।

বাজয়ন্তঃ পুরুপ্রিয়ম্, পুরুপ্রিয়ম্ মানে সবারই সহৃদয় বন্ধুর মত, হঠাৎ করে কোন অচেনা অতিথির মত এসে গেছেন তা নয়, তিনি সবারই অত্যন্ত প্রিয়। অত্যন্ত প্রিয়জন বাড়িতে আসার পর যে আনন্দ হয়, অগ্নির আবির্ভাবে সেই আনন্দ হচ্ছে। *অগ্নিং বো দুর্যং বচঃ স্তুষে শুষস্য মন্মাভিঃ*, আমরা সেই অগ্নির স্তুতি করছি। স্তুতি করছি তাঁর শক্তি ও ক্ষমতা আরও যেন বৃদ্ধি হয়, তাঁর সুনাম যশ যেন দিনে দিনে আরও বাড়ে। বেদের এটি একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য, ঈশ্বরের গুণ বলতে আমরা আজ যেভাবে জানি দেবতাদের তাঁরা যেমন সেই ভাবে দেখেন আবার দেবতাদের মানুষ রূপেও দেখেন। এই ধরণের জিনিস একমাত্র বেদেই দেখা যায়। মানুষকে আমরা যেভাবে দেখি, মানুষের বুদ্ধি আছে, শক্তি আছে আর আমরা শুভ কামনা করি তার যেন শক্তি বাড়ে, বুদ্ধি বাড়ে, ঠিক তেমনি দেবতাদের যখন স্তুতি করা হয় ঠিক এই ভাবেই স্তুতি করা হয়, ইন্দ্রের পরাক্রম যাতে আরও বৃদ্ধি পায়, শক্তি যেন আরও বাড়ে। এখানে বলছেন, হে অগ্নি! আপনার আরও জয়জয়কার হোক, আরও শক্তি বৃদ্ধি হোক। আপনি কে? পরমপ্রিয় অতিথি, শুধু আমারই নয়, প্রত্যেকটি বাড়ির আপনি পরমপ্রিয় মঙ্গলময় অতিথি। পরের দিকে অনেক কবিরাও এই ভাব গ্রহণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি বিখ্যাত কবিতায় কবি বলছেন – শরতে আজ কোন অতিথি এল প্রাণের দুয়ারে, কবিতার এই লাইন যেন এই মন্ত্রেরই ছায়া। অতিথি ভাব যেমন একটা ভাব, তেমনি অন্য ভাবে বলছেন – আমরা তোমার।

বয়ং ঘা তে ত্বে ইদ্বিন্দ্র বিপ্রা অপি ষ্মসি।
নহি ত্বদন্যঃ পুরুহুত কশ্চন মঘবন্নস্তি মর্ডিতা।।ঋ-৮/৬৬/১৩।।

এই মন্ত্রের দেবতা ইন্দ্র, ইন্দ্রকে বলছেন হে প্রভু! আমরা আপনার আর আমাদের যে অস্তিত্ব, এই অস্তিত্ব আপনার উপর নির্ভর। কারণ আপনি ছাড়া আমাদের কেউ নেই যিনি আমাদের পথ দেখাতে পারেন, যিনি আমাদের উপর কৃপা করতে পারেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা যখন বেদের অনুবাদ করতে শুরু করলেন তখন এসব মন্ত্রের অনুবাদ করতে গিয়ে অনেক গোলমাল পাকিয়ে দিয়েছিলেন। পুরো ছবিটা যদি পরিষ্কার না থাকে তাহলে মন্ত্রের পুরো ভাবটাই গোলমাল হয়ে যাওয়ার সম্ভবনা থাকবে। বেদে যখন ইন্দ্রের স্তুতি করছে তখন কখন কখন ইন্দ্রকে একজন দেবতা রূপে স্তুতি করা হচ্ছে কখন কখন আবার ইন্দ্রের উপর সেই অনন্তের একটি মুখ বসিয়ে স্তুতি করা হচ্ছে। আমরা কখনই শ্রীরামকৃষ্ণকে দেবতা রূপে দেখি না, শ্রীরামকৃষ্ণকে সব সময় ঈশ্বর রূপেই দেখা হয়। ঠাকুরের জীবনের উপর যখন আলোচনা করি, যেমন ঠাকুর জিলিপি খেতে ভালোবাসতেন, তখন মানবীয় ভাবগুলিকে যেমন নিয়ে আসা হয় ঠিক তেমনি দেবতাদের স্তুতিতে কিছু দেবত্বের ব্যাপারগুলো রাখা হয়, কিন্তু বাকি যা কিছু আছে সেটা তাঁর ঈশ্বরত্ব। অবতারদের যেসব কাহিনী, যেমন শ্রীকৃষ্ণ দুষ্টুমি করছেন, কত রকম লীলা করছেন, এগুলো শ্রীকৃষ্ণের মানবীয় দিক। শ্রীকৃষ্ণের মানবীয় গুণগুলিকে যেমন রাখা হয় সাথে সাথে ভাগবতাদি গ্রন্থ শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরীয় গুণগুলিকে কখনই দৃষ্টির অগোচরে রেখে দেবে না। ঠিক তেমনি বেদের মন্ত্রে ইন্দ্র যে দেবতাদের রাজা সেই ভাব যেমন আছে সাথে সাথে ইন্দ্রের ঈশ্বরীয় গুণগুলিকে সরিয়ে দেওয়া হয় না।

ঋষি ইন্দ্রকে বলছেন, আমরা আপনার, আপনি ছাড়া আমাদের কেউ নেই, আপনি ছাড়া আমাদের কৃপা করার আর কেউ নেই। ঈশ্বরের প্রতি এই ভাব নিজের খুব ঘনিষ্ঠ আত্মীয় না হলে হয় না। এই ভাবটাই গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ নিয়ে আসছেন যখন তিনি বলছেন *মৎপরঃ*। আমার ভক্ত মানছে যে আমার থেকে বড় আর

কেউ নেই। এখানেই সাধারণ মানুষ আর একজন ঋষি বা ঠিক ঠিক ভক্তের মধ্যে তফাৎ হয়ে যায়। সাধারণ মানুষ মনে করে বাড়িতে আমার স্বামী বা স্ত্রী আছে, আমার বন্ধু-বান্ধব আছে, আমার টাকা-পয়সা আছে, আমার সম্পত্তি আছে এগুলো দিয়েই আমার জীবনের সব কিছু চলে যাবে। কিন্তু যাঁরা ঋষি যাদের মন প্রাণ ঈশ্বরে সম্পূর্ণ সমর্পিত তাঁরা জানেন ঈশ্বর ছাড়া কেউ পথ দেখাতে পারে না। ঈশ্বর ছাড়া তার রক্ষা কেউ করতে পারে না। এর থেকেও আরও বড় ব্যাপার হল, যদি সাধনার জগতে ঢুকে যাওয়া যায়, যদিও খুব কঠিন, কিন্তু একবার ঢুকে যাওয়ার পর একটা জায়গায় গিয়ে দেখে আমি একা হয়ে গেছি। বিজনেস ম্যানেজমেন্টে বলে – it is lonely at the top, যে মানুষ উপরে চলে যায়, কোম্পানিতে যে সিইও হয়ে গেছে সে তখন নিজেকে খুব একা মনে করে। বিরাট ক্ষমতায় চলে গেছে, ভারতের রাষ্ট্রপতি হয়ে গেছেন, তিনি নিজেকে তখন খুব একা মনে করেন। কার সঙ্গে আর তিনি কথা বলবেন! বুদ্ধিবৃত্তির জগতে আইনস্টাইনের মত কেউ হয়ে গেলে তিনিও একা হয়ে যান। কার কাছে গিয়ে তিনি নিজেকে খুলবেন, কার কাছে গিয়ে তিনি দুটো কথা বলবেন, কারণ তাঁর সমকক্ষ আর কেউ নেই। তখন তিনি নিজেকে সত্যিই খুব একা একা মনে করেন, আমি কেমন একা হয়ে গেলাম। জাগতিক ক্ষেত্রে খুব পরিশ্রম, সাধনা করে খেটে খেটে, সবাইকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে সর্বোচ্চ কোন অবস্থায় চলে যাবার পর যে একা হয়ে যাচ্ছে, এখানে তার নিজস্ব একটা আনন্দ আছে আবার দুঃখও আছে, দেখছে তার পাশে কেউ নেই। আধ্যাত্মিক জগতের একাকীত্বে এই দুঃখটা আসে না। আধ্যাত্মিক সাধনা শুরু করার পর এগোতে এগোতে একটা অবস্থায় পৌঁছে গিয়ে দেখে তার আশেপাশে যারা আছে তারা আর তাকে পথ দেখাতে পারবে না, শাস্ত্রে যা আছে সেও তাকে পথ দেখাতে পারবে না। এই অবস্থায় এসে সে তখন নিজেকে খুব অসহায় মনে করে, সত্যিই খুব অসহায় হয়ে যায়। ঠাকুরের জীবনীকে খুব গভীর ভাবে পর্যবেক্ষণ করলে এই জিনিসটা ঠাকুরের জীবনে পদে পদে দেখা যাবে। যখনই কোন জায়গা থেকে বা কারুর কাছ থেকে কোন সংশয়াত্মক কথা শুনছেন, হলধারী কিছু একটা কথা বলে দিল, এমনকি পরের দিকে নরেন্দ্রনাথও যখন কিছু কথা ঠাকুরকে বলছেন ঠাকুর শুনে অস্থির হয়ে পড়ছেন। ঠাকুর দৌড়ে মা কালীর কাছে গিয়ে বলছেন – মা! নরেন এই কথা বলছে, তাহলে কি সব ভুল, এতদিন কি তুই আমাকে ঠকালি! ঠাকুরের এই ব্যাপারগুলো ধারণা করা খুব কঠিন, আধ্যাত্মিকতার ব্যাপারে একটু জ্ঞান না হলে এই জিনিসগুলো ধারণা করা যাবে না। তার আগে আমাদের অবাক হয়ে ভাবতে হবে, সব ব্যাপারে ঠাকুর মা কালীর কাছে কেন দৌড়ে যাচ্ছেন! আবার নরেন একদিন বলছেন – ইনি এখনও মা কালীর ঘরে যান। ভাবা যায় প্রধান শিষ্য গুরুকে ব্যঙ্গ করছেন! কত পরিহাসের ব্যাপার! নরেন্দ্র নাথ দত্ত যেন বলতে চাইছেন – আপনার এখনও গোলমাল আছে, এখনও সাধনা যেন পুরো হয়নি। আরও আশ্চর্যের! যে জিনিসকে নিয়ে নরেন গোলমালের কথা বলছেন ঠাকুর সেখানেই জিজ্ঞেস করতে ছুটে যাচ্ছেন – মা! নরেন এই কথা বলছে। আসলে সত্যি সত্যি এই রকমই হয়।

বেলুড় মঠে একজন খুব নামকরা মহারাজ ছিলেন। শেষ জীবনে তিনি শুধু জপ-ধ্যানই করতেন আর কথামৃত ছাড়া অন্য কোন বই পড়তেন না। কথামৃত পড়তে পড়তে হঠাৎ তাঁর মনে হয়ত কোন প্রশ্ন এল, তিনি এতই উচ্চমানের সাধু যে, তাঁর প্রশ্ন মানে কত গূঢ় প্রশ্ন হতে পারে চিন্তাই করা যায় না। এরপর উনি যে মহারাজকেই সামনে পেতেন তাঁকেই জিজ্ঞেস করতেন – আচ্ছা বলতো এই জিনিসটা কী হবে? যেমনি সেই মহারাজ কিছু বলতে শুরু করলেন উনি তাঁকে এক ধমক দিয়ে থামিয়ে দিতেন – জানো না, বোঝ না কিছু, চুপ করো। এরপর আরেকজনকে গিয়ে জিজ্ঞেস করবেন। সেখানেও এই একই ব্যাপার হত। প্রশ্ন করতে করতে তিনি শেষে প্রভু মহারাজের (স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী) কাছে গিয়ে পৌঁছাতেন। প্রভু মহারাজ ওনাকে দেখেই বুঝে যেতেন, খুব জটিল প্রশ্ন নিয়ে এসেছেন, এই প্রশ্নের মীমাংসা করা খুবই দুরূহ। ঘরে ঢুকতেই প্রভু মহারাজ খুশি হয়ে বলতেন 'মহারাজ! এসেছেন! খুব ভালো। বসুন বসুন। এক কাপ চা খাবেন'? চা খাওয়ার জন্য বসিয়েছেন, তারপর 'এই নিন, একটা ভালো ধুতি আছে', এইসব করে মহারাজের মনটা ওখান থেকে সরিয়ে দিয়ে কিছুক্ষণ গল্প করে নিজের ঘরে ফেরত পাঠিয়ে দিতেন। ওনার আধ্যাত্মিক ব্যাপারগুলো এতই অন্তঃকরণ হয়ে ভেতরে ঢুকে গেছে যে এখন তাঁর কোন সংশয়ের নিরসন একমাত্র তিনিই করতে পারবেন যিনি

তাঁর থেকেও শুদ্ধ মনের অধিকারী, তিনি ছাড়া আর কেউ তাঁকে গাইড করতে পারবেন না। তখন তাঁর নিজের শুদ্ধ মনই তাঁর গুরু হয়ে যান। এবার তিনি কার কাছে প্রার্থনা করবেন? মন্ত্রের ঋষি এই কথাই বলছেন। আমাদের খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে, বেদের একটি মন্ত্রও সাধারণ লোকের জন্য নয়। বেদের সব প্রার্থনাই হল, খুব উচ্চমানের ঋষিদের যেভাবে সেই উচ্চ দিব্যত্বের সাথে সংযোগ স্থাপিত হয় তারই বর্ণনা।

তবে আচার্য শঙ্কর বলছেন সিদ্ধ পুরুষদের যেটা স্বাভাবিক সেটাই সাধককে সাধনা করে অর্জন করতে হয়। তিনটে জিনিস – সাধক, সাধনা ও সিদ্ধি। সাধনা জিনিসটা কি? সাধক কি করবে? সিদ্ধ পুরুষের যেটা স্বাভাবিক আচরণ সেটাই যখন একজন কষ্ট করে চেষ্টা করে আয়ত্ত করেতে চাইছে, সেটাই সাধনা। সিদ্ধের সিদ্ধ যিনি, যিনি একজন খুব উচ্চমানের ঋষি, তিনি খুব স্বাভাবিক ভাব নিয়ে বলছেন – হে ইন্দ্র! তুমি আমার প্রিয়, তোমার উপরই আমি নির্ভর করে আছি, তুমি ছাড়া কেউ নেই যে আমাকে পথ দেখাবে। সব দিক থেকে ঋষি ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে আছেন, টাকা-পয়সার দরকার হলে তিনিই দেবেন, জ্ঞানও তিনিই দেবেন, যা যা তাঁর দরকার সব তিনিই দেবেন। এই নির্ভরতাটা ঋষির স্বাভাবিক। আমাদের মত সাধারণ লোক যদি বলে – হে ঠাকুর! তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই, তখন সেটাই আমাদের মুখের কথা হয়ে যাবে। তবে আধ্যাত্মিক যাত্রা এভাবেই শুরু হয়। মুখের কথা অনেক দিন করতে করতে এটাই একটা সময় আন্তঃকরণ হয়ে যাবে, সেখান থেকে উন্নতি হতে থাকে। আধ্যাত্মিক উন্নতি যখন শুরু হয়ে গেল তখন একটা জায়গায় তিনি কি দেখবেন? ঠিক যেভাবে ঋষি বলছেন – হে ঠাকুর! তুমি ছাড়া কে আমাকে পথ দেখাবে, তুমি ছাড়া তো আমার আর কেউ নেই। এটাই তাঁর তখন বাস্তবিক মনে হবে। এতদিন যেটা মুখের কথা ছিল সেটা তখন আর মুখের কথা না থেকে বাস্তবিক হয়ে যায়। আবার একটি মন্ত্রে গিয়ে এর ঠিক উল্টোটা করছেন, এটিও ঋগ্বেদের মন্ত্র।

ত্বয়েদিন্দ্র যুজা বয়ং প্রতি ব্রুবীমহি স্পৃধঃ
ত্বমস্মাকং তব স্মসি।।ঋ-৮/৯২/৩২।।

এই মন্ত্রের দেবতাও ইন্দ্র। প্রথমে বলছেন আমি তোমার, এখানে পূর্ণ শরণাগতির ভাব। এরপরেই বলছেন তুমি যে পুরো আমারই। সিনেমার নায়ক নায়িকারা যেমন গান করে আমি যে তোমার তুমি যে আমার, কিন্তু একটু স্বার্থের খোটাখুটি শুরু হলে তখন তুমি যে কোথায় আমি যে কোথায় গিয়ে শেষ হবে কেউ জানে না। উর্দুতে খুব সুন্দর একটা শায়ের আছে – যো কভি জান কে কসম খাতে থে, উহ অব জানাজেমে জানে কে কসম খাতে হ্যায়। যে কখন তোমার প্রাণের দিব্যি খেত সেই এখন বলছে তুমি মরলে আমি তোমার শবযাত্রায় সামিল হব। কিন্তু ভগবানের সঙ্গে যখন আমি যে তোমার তুমি যে আমার এই সম্পর্ক হয় তখন সেই সম্পর্কের সাথে এর কোন ধরণের মিল নেই, এখানে কোন রকমের ছাড়াছাড়ি প্রশ্ন আসে না। এখানে প্রথমটায় পূর্ণ শরণাগতির ভাব, দ্বিতীয়টায় আপনার ভাব। যেমন মা কালীর প্রতি ঠাকুরের শরণাগতির ভাব ছিল আর রামলালার প্রতি ছিল আপনত্বের ভাব, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যশোদার যেমন আপনজনের ভাব।

প্রথমে বলছেন হে ইন্দ্র! আমার উপর তোমার কৃপা যেন থাকে। আমার উপর তোমার কৃপা যদি থাকে তাহলে যারাই আমার সামনে কথা বলার জন্য, তর্ক করার জন্য এসে দাঁড়াবে তাদের সবাইকেই আমি দাবিয়ে দিতে পারব। কারণ *ত্বম্ অস্মাকং তব স্মসি*, তুমি আমার আমি তোমার। তোমার আর আমার মধ্যে একটা একত্ব ভাব আছে। তোমার শক্তিতে আমি শক্তিমান, এই বোধ যদি আমার মধ্যে থাকে তাহলে আমার সামনে কেউ দাঁড়াতে পারবে না। এ কথা একমাত্র তিনিই বলতে পারবেন যিনি নিজের মধ্যে ঈশ্বরীয় শক্তির প্রকাশকে অনুভব করেছেন। ঠাকুরের লীলাপ্রসঙ্গ পড়া থাকলে বেদ মন্ত্রের ভাবগুলি ঠিক ঠিক বোঝা যায়। কারণ বেদে যত রকম ভাব এসেছে সব ভাব ঠাকুরের মধ্যে পাওয়া যাবে। ঠাকুর কালনার ভগবান দাস বাবাজীর আশ্রমে গেছেন। হৃদুর পেছনে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছেন। দেখছেন ভগবান দাস বাবাজী একজনকে শাসাচ্ছেন তোমার মালা কেড়ে নেওয়া হবে বলে। তখন ঠাকুর আর নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারলেন না। হি হি করে হাসছেন। একবার এই দৃশ্যটা মনে মনে কল্পনা করুন, ভগবান দাস বাবাজী তখনকার দিনের বিরাট নামকরা পণ্ডিত আবার বৈষ্ণব সমাজের প্রধান, অন্য দিকে ঠাকুরকে তখন কেউ জানে না, চেনে না। আর সঙ্গে গেছে তাঁর

ভাগ্নে হৃদয়রাম, আরও গেঁয়ো মুর্খ। সেই হৃদয়রামকে আশ্রয় করে যিনি যাচ্ছেন তাঁর ব্যক্তিত্ব কেমন একবার কল্পনা করে নিন। অথচ ভগবান দাসের ওই কথা শুনে তাচ্ছিল্যের ভাবে একেবারে হি হি করে হাসতে শুরু করেছেন। বলছেন, আপনি মালা কেড়ে নেওয়ার কে! যা করবেন ভগবানই করবেন। ভগবান দাসেরও কত উচ্চ ভাব, সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিনয়শীল হয়ে গেলেন। আপনি ঠিক কথাই বলছেন। বেদ এই কথাই বলছে, তুমি আমার আমি তোমার এই ভাব যদি থাকে কোন জায়গাতে তার সামনে আর কেউ দাঁড়াতে পারবে না। ঠাকুর বলছেন তিনি রাশ ঠেলে দেন, জ্ঞানের ক্ষেত্রেও তাই হয়, কেউ দাঁড়াতে পারবে না। অন্তর্নিহিত যে শক্তি সেখানেও কেউ দাঁড়াতে পারবে না। সাধারণ কথাবার্তাতেই হোক আর রসিকতাতেই হোক আর তর্কাতর্কিই হোক কোন কিছুতেই ঠাকুরের সামনে কেউ দাঁড়াতে পারত না। আমরাও তো অনেকে রোজ ঠাকুরকে বলি – হে ঠাকুর! আমি তোমার তুমি আমার, কিন্তু আমাদের কিছু হয় না কেন? তার মানে আমাদের সেই সাধনা নেই, এখনও সেই উচ্চস্তরে আমরা যাইনি। কিন্তু যেদিন মর্মে মর্মে বুঝে যাবে ঈশ্বর ছাড়া আমার কেউ নেই, আর যখন সত্যিই এই বোধ আসবে আমি তোমার তুমি আমার, তখন কিন্তু আর কেউ তাকে দাবাতে পারবে না। ঠাকুর বলছেন, যে ঈশ্বরকে ঠিক ঠিক মানে সবাই তার বশে এসে যায়, সবাই তাকে মানে। এই কথা বলেই মাস্টারমশাইর দিকে তাকিয়ে বলছেন এমনকি তার স্ত্রী পর্যন্তে বশে এসে যায়। তুমি রাজাকে জয় করে নিতে পার, পুরো জগতকে তুমি জয় করে নিতে পার, স্ত্রীকে জয় করা যায় না। আরেকটি মন্ত্রে বলছেন –

যদগ্নে স্যামহং ত্বং ত্বং বা ঘা স্যা অহম্।
স্যুষ্টে সত্যা ইহাশিষঃ।।ঋ-৮/৪৪/২৩।।

এই মন্ত্রের দেবতা অগ্নি। হে প্রভু! আমি যদি তুমি হতাম আর তুমি যদি আমি হতে তাহলে আমার প্রতি তোমার যত প্রার্থনা সবটাই তা পূর্ণতা পেত। ঠাকুর উপমা দিচ্ছেন ছেলে যদি খুব জেদাজেদি করে বাপ তখন আগেই তার হিস্যেটা দিয়ে দেয়। আবার আরেক জায়গায় ঠাকুর বলছেন, ছেলে যখন মায়ের আঁচল ধরে খুব করে বলে – মা তোর পায়ে পড়ি দুটি পয়সা দে, মা শেষে বিরক্ত হয়ে দুটি পয়সা ফেলে দেয়। বেদের এই মন্ত্রে ঠিক এই ভাবটাই নিয়ে আসা হয়েছে। তবে আমাদের এখানে খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে যে, কোন পরিস্থিতিতেই আমাদের যেন এই ধারণা না হয়, যে কেউ এই ধরণের প্রার্থনা করতে পারে। আমার আপনার এই ধরণের প্রার্থনা করার কোন পাত্রতাই নেই। বেদের প্রত্যেকটি মন্ত্রই সিদ্ধ মন্ত্র, ঋষিরা তাঁদের ধ্যানের গভীরে এই মন্ত্রগুলিকে দেখেছেন, কিন্তু মন্ত্রের এই ভাব অবলম্বন করে যদি কেউ সাধনার পথে এগোতে পারে এর ফল কিন্তু সে এক্ষুণি বা দুদিন বাদে পেয়ে যাবে না। গায়ত্রী মন্ত্রও সিদ্ধ মন্ত্র, বিশ্বামিত্র ঋষি যখন বলছেন প্রচোদয়াৎ, তখনই তাঁর মন ঈশ্বরের দিকে চলে যাচ্ছে। আমি আপনি প্রচোদয়াৎ বলে দিলেই আমাদের মন সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরের দিকে যাচ্ছে না আর যাবেও না। কারণ গায়ত্রী মন্ত্র এখনও আমাদের কাছে সিদ্ধ হয়নি। বেদের প্রত্যেকটি মন্ত্র ঋষিদের কাছে শুদ্ধ মন্ত্র, সেইজন্য সবাইকে বেদ মন্ত্র শুনতে দেওয়া হত না। ব্রাহ্মণ শরীর হতে হবে, দীক্ষা নিয়ে গুরুর কাছে বছরের পর বছর পরে থেকে ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন করে যেতে হবে। এরপর গুরুর ইচ্ছা হলে তাকে কয়েকটি মন্ত্র শিখিয়ে দেবেন। শিখিয়ে দিলেও তার কিছু হবে না। তোমার যে মন্ত্র ভালো লাগে সেই মন্ত্রকে নিয়ে তুমি সাধনা কর, সাধনা করে সিদ্ধি লাভ কর। একটা মন্ত্রে যদি সিদ্ধ হয়ে যাও বাকি মন্ত্রে সিদ্ধি পাওয়া খুব সহজ হয়ে যাবে।

এখানে বলছেন, Had I been Thou 'হে অগ্নি! আমি যদি তুমি হতাম আর তুমি যদি আমি হতে তাহলে তুমি যা কিছু প্রার্থনা করতে আমি তোমার সব প্রার্থনা পূরণ করে দিতাম'। ভগবানের কাছে এটি অত্যন্ত স্নেহের আবদার। সন্তান যেমন মায়ের কাছে আবদার করে বা একজন প্রেমিক প্রেমিকার কাছে যেভাবে আবদার করে অর্থাৎ অধিকার বোধ থেকে একজন আরেকজনের কাছে যেভাবে কিছু আবদার করে ঋষি সেই অধিকার বোধ নিয়ে ভগবানের কাছে আবদার করে ঘুরিয়ে বলতে চাইছেন আমি যে তোমার কাছে প্রার্থনা করছি সেই প্রার্থনা গুলো পূরণ হোক। তোমার প্রতি আমার যে ভালোবাসা, তোমার প্রতি আমার যে প্রতিশ্রুতি, এটাই যদি উল্টোটা হত আমি তোমার সব পূরণ করে দিতাম। তার মানে, আমার যা কিছু প্রার্থনা তুমি পূরণ করে দাও। ভগবানের কাছে ঋষি এই আবদারটুকু করছেন। আরেকটি খুব সুন্দর মন্ত্র, বলছেন –

মহে চন ত্বামদ্রিবঃ পরা শুল্কায় দেয়াম্।
ন সহস্রায় নাযুতায় বজ্রিবো ন শতায় শতামঘ।।ঋ-৮/১/৫।।

হে প্রভু! *পর শুল্কায়*, কেউ যদি সর্বোচ্চ্য মূল্যও দেয় তাও তোমাকে আমি বিক্রী করবো না। সর্বোচ্চ মূল্যের থেকেও যদি হাজার গুণ, কিংবা হাজার হাজার গুণ দাম দেয়, অনন্ত মূল্যও যদি দেয় তাও কোন পরিস্থিতিতেই তোমাকে আমি বিক্রী করব না। বিক্রী করবো না, এর মানে আমি তোমাকে কোন অবস্থাতেই ছাড়ব না। এর আগে আমরা গীতার *মৎপরঃ* শব্দটি নিয়ে আলোচনা করেছি, *পরঃ* মানে শ্রেষ্ঠ, যিনি জেনে গেছেন ঈশ্বরই শ্রেষ্ঠ তিনি তখন কিসের বিনিময়ে ঈশ্বরকে ছেড়ে দেবেন! কথামৃতে ঠাকুর খুব সুন্দর উপমা দিয়ে বলছেন – একজনের কাছে একটা হীরে ছিল। সে তার চাকরকে হীরেটা দিয়ে বেগুনওয়ালার কাছে পাঠিয়েছে। বেগুনওয়ালা হীরেটা দেখে ভাবছে জিনিসটা দেখতে ভালোই, ওজনটোজন করার জন্য বাটখারার কাজে দেবে। চাকরকে বলল, এই পাথরটার জন্য আমি তোমাকে দশ সের বেগুন দিতে পারি। চাকর জানে এটা হীরে। সে বেগুনওয়ালাকে একটু বাড়াতে বলল। বেগুনওয়ালা বলছে – না! না! দশ সের অনেক বেশি বলে ফেলেছি, এতেই আমার পরতায় পোষাবে না। চাকর হীরে নিয়ে ফেরত চলে এসেছে। তখন মালিক তাকে একজন কাপড়ওয়ালার কাছে পাঠিয়েছে। কাপড়ওয়ালা তাকে একশ টাকা দিয়ে বলছে, এর থেকে বেশি দেওয়া যাবে না। আবার ফেরত এসেছে। এবার সে তাকে এক জহুরীর কাছে পাঠিয়েছে। জহুরী হীরেটা দেখেই বলছে 'আমার দোকানে যত মাল আছে আর যত নগদ টাকা আছে সব দিয়েও এর দাম কুলোবে না, আমি এই হীরে কিনতেই পারব না'। যে কোন লোকের কাছে ঈশ্বর হলেন একটি অমূল্য হীরে। আর সত্যিই আমাদের কী দুর্ভাগ্য! আমরা সবাই এই অমূল্য হীরেকে বেগুনওয়ালার কাছে বিক্রী করে বেড়াচ্ছি, বিক্রী না করলে বন্ধক রাখছি। আজ বেগুনওয়ালকে গিয়ে বলছি এটা রেখে আমাকে কিছু বেগুন দাও। বেগুনওয়ালা ভাবলো দুদিন আমার বাচ্চারা এটা নিয়ে খেলতে পারবে, আচ্ছা এই নাও দু সের বেগুন নিয়ে যাও। দুদিন পর এক পটলওয়ালার কাছে বন্ধক রেখে এক কিলো পটল নিয়ে এলাম। সারাটা জীবন আমরা এই অমূল্য হীরেকে আজ রিক্সাওয়ালা, কাল সব্জীওয়ালা, পরশু মুদিওয়ালা, তারপর এই নেতা, সেই নেতা এদের কাছে বন্ধক রেখে বেরাচ্ছি। সারা জীবন আর হিন্দু ধর্মে যদি বিশ্বাস থাকে তাহলে জন্ম জন্মান্তর ধরে ঈশ্বরকে শুধু বন্ধকই রেখে যাচ্ছি, নিজের কাছে কখনই রাখছি না। কবীর দাসের একটা ভজন আছে তাতে তিনি বলছেন, যে মানব-জীবন এত দুর্লভ অথচ মাটির দামে এই জীবনকে বিক্রী করে যাচ্ছি।

কিন্তু মন্ত্রের ঋষি বুঝে গেছেন জিনিসটা কি! জগতে এমন কোন জিনিস নেই যেটাকে পাওয়ার জন্য আমি তোমাকে বিক্রী করব। অনেক আগেকার কথা, তখনও ভারত স্বাধীন হয়নি। বেলুড় মঠে সাধু হওয়ার জন্য একজন যুবক এসেছেন। যুবকটিকে একজন খুব সিনিয়র মহারাজ বলছেন 'দেখ বাপু! ঈশ্বর যদি তোমাকে বলেন আমি তোমাকে বিলেতের রাজা কিং জর্জ বানিয়ে দেব, এরপর তুমি ভালো করে বিচার করে দেখ কোনটা তুমি মন থেকে ঠিক ঠিক চাইবে – এক দিকে তুমি ইংল্যাণ্ডের রাজা, ইংল্যাণ্ডের রাজা মানে সারা বিশ্বের রাজা হওয়ার হাতছানি আর অন্য দিকে একজন কাঙালী ভিখারী সন্ন্যাসী হওয়ার হাতছানি'। ঠাকুরের ভক্ত বলে যারা নিজেদের মনে করে তাদের কাউকে যদি কোন মহারাজ প্রশ্ন করেন 'বল! তুমি কি চাও! ইন্দ্রপদ না ঠাকুরে ভক্তি'। ভক্ত অবশ্যই বলবেন ঠাকুরে ভক্তি। কারণ তার ইন্দ্রপদের কোন ধারণাই নেই। আমরা জানি আলু চব্বিশ টাকায় কিনব নাকি তেইশ টাকায় কিনব, এক টাকার জন্য আধ ঘন্টা আলুওয়ালার সঙ্গে দরদাম করব। এরপর ইন্দ্রপদের কি ধারণা করব আমরা! এক টাকা ভাড়া নিয়ে রিক্সাওয়ালার সঙ্গে তুলকালাম করছি আবার আমরা কিনা বলছি ইন্দ্রপদ আমার কাছে তুচ্ছ। স্ত্রীর কথায় যে ওঠবোস করে সে কিনা বলে রম্ভা তিলোত্তমা আমার কাছে চিতাভস্ম। রম্ভা তিলোত্তমাকে কোন দিন তুমি দেখেছ? অপ্সরার রূপের কোন ধারণা আছে? জীবনে এখনও কোন প্রলোভনের সামনে পড়তে হয়নি তাই এত বড় বড় কথা বলতে পারছি। এই কারণেই সব সম্প্রদায়ের সব জায়গার সাধু সন্ন্যাসীদের কত সামলে রাখা হয়। কামিনী-কাঞ্চনের প্রলোভন বড় বড় সাধু মহাত্মাদেরই ছিটকে ফেলে দিচ্ছে আর আমরা কোন ছার। বেনারসে স্বামীজীর ভাস্করানন্দের সাথে দেখা হয়েছে, স্বামীজীকে ভাস্করানন্দজী বলছেন 'কামিনী থেকে কেউ বেরোতে পারে না'।

স্বামীজী বলছেন ‘তা নয়! কেউ কেউ আছেন যাঁরা কামিনী থেকে বেরিয়ে এসেছেন, আমি দেখেছি’। স্বামীজী ঠাকুরের কথাই বলতে চাইছিলেন। ভাস্করানন্দজী তখন বলছেন ‘তুমি জানতে পারবে না, ওদের ভেতরে ভেতরে অনেক কিছু থাকে’। ভাস্করানন্দজী খুব উচ্চমানের সাধু, শ্রীমাও তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। তিনি বলছেন! তুমি বুঝতে পারবে না, ভেতরে ভেতরে এদের থাকে। স্বামীজী শুনে ওখান থেকে উঠে বেরিয়ে গেলেন। তখন ভাস্করানন্দজী তাঁর লোকদের বলছেন ‘গুরুর প্রতি এই রকম শ্রদ্ধাই থাকতে হয়’। স্বামীজীর মত কয়েকজন সন্ন্যাসী ব্যাতিক্রম। কামিনী-কাঞ্চন থেকে বেরিয়ে আসা খুব কঠিন। বেদ মন্ত্রে এই যে বলছেন, *ন সহস্রায় নাযুতায় বজ্রিবো ন শতায় শতামঘ*, অনন্ত ধন সম্পদ দিয়েও আমি তোমাকে বিক্রী করবো না। আমাদের এই মন নিয়ে এভাবে বলা অসম্ভব। কিন্তু ঠিক ঠিক যখন এগোতে শুরু করে, যখন সে বিষয়ানন্দ থেকে সরে এসে ভজনানন্দে গিয়ে অবস্থিত হয়, তখন কোন প্রলোভন যদি আসে তখন তার মনে লড়াই শুরু হয়ে যায়। এর আগে পর্যন্ত কিছুই লড়াই হয় না, একটু ফুঁ মারলেই ছিটকে পড়ে যাবে।

এখানে ঋষি ভজনানন্দেও নেই তিনি এখন ব্রহ্মানন্দে অবস্থিত, যেখানে তাঁর ঈশ্বরের সঙ্গে এক বোধ হয়ে গেছে। মন্ত্রে যে বিক্রী করার কথা বলা হচ্ছে, এই বিক্রী করার অর্থ হল জগতে এমন কোন কিছু নেই যেটাকে পাওয়ার জন্য আমি তোমাকে ছেড়ে দেব। এই অবস্থায় তিনি প্রাণের ভয়েও ঈশ্বরকে ছাড়বেন না আর কোন লোভে পড়েও ঈশ্বরকে ছাড়বেন না। হে প্রভু! যে যাই আমাকে দিক, কোন পরিস্থিতিতেই তোমাকে আমি বিক্রী করছি না। বড় বড় সাধকরাও কোন পরিস্থিতিতে নিজের স্ত্রী পুত্রের জন্যও আপোষ করেন না। যাঁরা ধর্মে প্রতিষ্ঠিত তাঁরাও ধর্মের ব্যাপার যখন আসে তখন কোন অবস্থাতেই ধর্মকে উল্লঙ্ঘন করবেন না। বৌদ্ধ ধর্মে জাতকের একটি গল্পে বোধিসত্ত্ব শ্রেষ্ঠী হয়ে একজন বণিকের বাড়িতে জন্ম নিয়েছেন। তিনি অতিথিদের সেবা করতেন। ইন্দ্র একবার পরীক্ষা নেওয়ার জন্য ব্রাহ্মণ সেজে অতিথি হয়ে এসেছেন। বোধিসত্ত্ব থালায় খাবার সাজিয়ে অতিথিকে সেবা করার জন্য যাচ্ছে আর সেই সময় উঠোনের জমিতে ফাটল ধরে আগুন বেরিয়ে আসতে শুরু হয়েছে। আর ওদিকে আকাশবাণী হচ্ছে ‘হে বণিক! তুমি তোমার অতিথির সেবার জন্য এই খাবারের থালা নিয়ে এক পা এগিয়েছ তো তুমি আর তোমার স্ত্রী পুড়ে ভস্ম হয়ে যাবে’। বণিক বলছেন ‘আমি আমার ধর্মে প্রতিষ্ঠিত, নরকেও যদি পতিত হয়ে যাই আমি আমার ধর্মকে ছাড়ব না, অতিথি সেবা আমার ধর্ম, এই ধর্ম পালন আমি করবই’। বণিক এগিয়ে গেল, দেখছেন কোন আগুন নেই। যাঁরা ঈশ্বরের ভালোবাসা পেয়েছেন, সেতো অনেক উচ্চমানের অবস্থা, কিন্তু ধর্মেও যদি কেউ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যান, কোন কিছুই এমনকি মৃত্যু ভয়ও তাঁকে তাঁর ধর্ম থেকে চ্যুত করতে পারবে না। যার জন্য এটা মেনে নিতে কোন অসুবিধা নেই যে, যারা ধর্মান্তর করে আর যারা ধর্মান্তরিত হয় তাদের মধ্যে ধর্মের ভাব একটুও নেই। সন্ন্যাসী যদি কোন কারণে সন্ন্যাস ধর্ম ত্যাগ করে কোন নারীকে বিয়ে করে সংসার বসায়, এমন ঘটনা যে হবে না তা নয়, হতেই পারে, কিন্তু তারপরে তার কি হচ্ছে সেটা দেখতে হবে। নারীর প্রলোভনে পড়ে সে সন্ন্যাস ধর্ম ছেড়ে দিয়েছে সেটা গুরুত্ব নয়, গুরুত্ব হল এরপর তার ভেতরে কি প্রতিক্রিয়া হচ্ছে। যদি বলে বেশ আছি, তার মানে সন্ন্যাসের ভাব তার ভেতরে আদৌ ছিল না। কিন্তু কিছু দিন পর থেকে তার মনের ভেতর যদি খুব হাহুতাশ হতে থাকে, খুব আক্ষেপ করতে থাকে – এ আমি কোথা থেকে কোথায় এসে পড়লাম। এরপর সে আরও সজাগ হয়ে যাবে। কিন্তু যাঁর কিছু উপলব্ধি হয়েছে, সবচেয়ে উচ্চমূল্যও যদি কেউ দেয় তাও সে ভগবানকে বিক্রী করে দেবে না। তাই না, সেই উচ্চমূল্যের শত গুণও যদি কেউ দেয়, সহস্র গুণও যদি দেয় বা অনন্ত মূল্যও যদি কেউ দেয় তাও কিন্তু আমি তোমাকে বিক্রী করব না।

বেদের একটা মূল বিশেষত্ব হল, বেদ একজনের রচনা নয়। একজনের রচনা হলে তাঁর বক্তব্যের মধ্যে আগাগোড়া একটা বিশেষ ধরণের সঙ্গতি বজায় থাকত। গীতা যদিও ব্যাসদেবের একার রচনা কিন্তু সব ধরণের দর্শনকে গীতার মধ্যে নিয়ে আসা হয়েছে। সব ধরণের দর্শনকে নিয়ে আসা হলেও মূল বক্তব্যকে একটা জায়গায় নিয়ে গিয়ে উপসংহার করে দেওয়া হয়েছে। বেদে এই ব্যাপারটা নেই। ঋষিদের যেমন যেমন অনুভূতি এসেছে, যেমনটি তাঁরা ধ্যানের গভীরে উপলব্ধি করেছেন ঠিক তেমনটি রেখে দিয়েছেন। সেইজন্য বেদে আধ্যাত্মিকতার রাজ্যে যত রকমের ধারণা হতে পারে তার সবটাই এসে গেছে। এবার নিজে আমাকে

নিজে ঠিক করে নিতে হবে কোন ভাবটা আমার ভালো লাগছে, কোন ভাব আমার মানসিকতার সঙ্গে খাপ খাচ্ছে। ঠিক করে নিয়ে এবার সেই ভাবের উপর অনুশীলন চালিয়ে যেতে হবে। ঠাকুর বলছেন, পতিব্রতা স্ত্রী বাড়িতে ভাসুর, দেওর, শ্বশুড়, শাশুড়ী সবারই সেবা করে কিন্তু স্বামীর সঙ্গে তার আলাদা বিশেষ সম্পর্ক। সাধনাতেও একটা বিশেষ ভাবের উপর বিশেষ সম্পর্ক থাকে। যেমন কেউ ঠিক করে নিলেন *ওঁ স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্ম স্বরূপিণে। অবতার বরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ।।* এই মন্ত্রটাই আমার শেষ কথা। তার মানে এই মন্ত্রের সাথে আমর স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক হয়ে গেল। এরপর বাকি সময় অন্য মন্ত্র বা স্তুতি নিয়ে যখন চিন্তা করছি, আবৃত্তি করছি তখনও স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কই থাকে। যেমন একজন বউমা তার শ্বশুড়ের সেবা করছে, সে কোন পুরুষের সেবা করছে না, শ্বশুড়ের সেবার মাধ্যমে সে নিজের স্বামীরই সেবা করছে। আমরা মনে করছি বউমা তার শ্বশুড়-শাশুড়ি সেবা করছে। স্বামীর বাবা, মা, ভাই-বোন, খুড়ি, জ্যাঠি সবার সেবার মাধ্যমে সে স্বামীরই সেবা করে। কারণ সে জানে এদের সেবা করলে আমার স্বামী খুশি হবে। স্বামীকে খুশি রাখা স্বামীর প্রতি ভালোবাসারই অঙ্গ। যে স্ত্রী স্বামীকে ভালোবাসে সে স্বামীর বাড়ির সবাইকে ভালোবাসবে। বেদের মন্ত্রের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হয়। আমি আমার ইষ্ট ঠিক করে নিয়ে তাঁকে ভালোবাসছি, ভালোবেসে ইষ্টের সঙ্গে একাত্ম অনুভব করছি, তখন বেদের অন্যান্য মন্ত্রে যত ভাব আছে সব ভাবের প্রতিই আমার একটা ভালোবাসা আসবে। সেই ভালোবাসা দিয়ে আমার ইষ্টকেই খুশি করা হচ্ছে, পূজো করা মানেও তাই, ইষ্টকে খুশি করা। বেদের মন্ত্রগুলি আমাদের চারিপাশের পরিবেশকে অন্য রকম করে দেয়, ওই পরিবেশ ইষ্টের প্রতি আমাদের নিজস্ব ভাবকে বজায় রেখে এগিয়ে যেতে সহায়তা করে। ইষ্টের প্রতি যে ভাব সেটাই থাকবে কিন্তু সব রকম ভাবকে জেনে রাখা ভালো। ভাব বজায় রাখাটা সম্পূর্ণ নির্ভর করে যার যার নিজের সাধনার উপর।

ঠাকুর বলছেন, সময় না হলে কিছু হয় না, কিন্তু শুনে রাখা ভালো। ঠাকুরের এই কথাকেই অন্য উপমা দিয়ে বলা যেতে পারে। মুক্তা তৈরী হতে হলে ঝিনুককে সমুদ্রেই থাকতে হবে। একটা বালির কণা ঝিনুকের মধ্যে ঢুকবে তারপর সেখান থেকে একটা মুক্তা তৈরী হবে। সব ঝিনুকেই মুক্তা তৈরী হয় না। কিন্তু সব ঝিনুককে যদি সমুদ্র থেকে তুলে এনে পরিষ্কার জলে রেখে দেওয়া হয় তাহলে ওর মধ্যে মুক্তা তৈরী হওয়ার যে সম্ভবনা ছিল সেটা চিরদিনের মতে চলে যাবে। আধ্যাত্মিকতার সমুদ্রের মধ্যে যতক্ষণ থাকছে তখন একটা কর্মের সৃষ্টি হচ্ছে, এই কর্মের মধ্য থেকে কোন কর্ম যে মুক্তা তৈরী করে দেবে জানা নেই। কিন্তু সমুদ্রের বাইরে যদি থাকে তাহলে মুক্তা তৈরী হওয়ার সম্ভবনটাই থাকবে না। আমাদের এর মধ্যেই পড়ে থাকতে হবে আর শুধু সাধনা করে যেতে হবে, এছাড়া আর কোন পথ নেই। যেমন এই মন্ত্রে বলছেন – হে প্রভু! কোন মূল্যের বিনিময়ে আমি তোমাকে বিক্রী করবো না। এরমধ্যে একটাই ব্যাপার – ঈশ্বরের ব্যাপারে তোমার কী ধারণা। ঈশ্বরের ব্যাপারে তোমার এই যে ভাব, এই ভাবকে তুমি আর কিছুতেই কোথাও আপোষ করতে যেও না। বিক্রী করা মানে বাজারের কেনাবেচার ব্যাপার তো নয়, আমার এখন এই ভাব, আমি ঈশ্বরকে সর্বভূতে চিন্তা করছি, এই ভাবের সঙ্গে আর কোন মতেই আপোষ করব না। বিহারের এক ফকির বাবাকে সেখানকার মুখ্যমন্ত্রী কোন কারণে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। ফকির বাবা পরিষ্কার বলে পাঠালেন আমার পক্ষে সম্ভব নয়, এখন আমার প্রার্থনার সময়। যে পুলিশ অফিসার তাঁকে নিতে গিয়েছিল সে পরে তার লোকদের অবাক হয়ে বলছে, এমন লোকও তাহলে আছে যে মুখ্যমন্ত্রীকেও ফিরিয়ে দিতে পারে! আরেকটি খুব সুন্দর ঘটনার বর্ণনা আছে। একজন মৌলবী কোন নর্তকীর মোহে পড়ে গিয়েছিল। গোপনে সবার আড়ালে মৌলবী ওই নর্তকীর সেবা করে আসত। জুতো পালিশ করে দেওয়া থেকে ঘরের টুকিটাকি অনেক কাজ করে দিয়ে আসত। নর্তকী ভাবছে কে সেই ব্যক্তি যে আমার সব কাজ করে দিয়ে যায়! শেষ পর্যন্ত একদিন মৌলবী ধরা পড়ে গেল। নর্তকী মৌলবীকে ডেকে বলছে – আপনি কেন আমার এসব কাজ করেন? মৌলবী বলল – আমি তোমার মোহে পড়ে গেছি। নর্তকী তখন বলল – ঠিক আছে, আপনি কাল আমার কাছে আসুন, আগামীকাল আমি শুধু আপনারই সেবাতে থাকব, অন্য কেউ আর আসবে না। মৌলবী পরের দিন তাঁর সাধারণ বেশে পরিষ্কার হয়ে গেছেন। নর্তকীর বাড়িতে যেতেই ওখানকার চাকররা মৌলবীকে ধরে দামী দামী সুগন্ধী দিয়ে ভালো করে স্নান করিয়ে নর্তকীর ঘরের বিছানায় বসিয়ে দিয়েছে। রূপোর গড়াগড়া দেওয়া হয়েছে। নর্তকী যত ভালো সাজগোজ

করার আছে সব দিক থেকে ভালো করে সেজে এসেছে। এবার সে নাচ শুরু করতে যাবে। সেই সময় সন্ধ্যেও হয়ে গেছে। নাচ শুরু করতেই অন্য দিকে মসজিদ থেকে আজানের ধ্বণি উঠেছে – আল্লা হু আকবর। মৌলবীর মনটাও ছটফট করতে শুরু করে দিয়েছে। আজান দেওয়া মানে, মনে করিয়ে দেওয়া হচ্ছে এখন আল্লাকে প্রার্থনা করার সময়। একবার আজান দেওয়া হয়েছে, দ্বিতীয় আজান দেওয়া হল, তৃতীয় আজান শুরু হতে না হতেই লোকটি পাগলের মত হয়ে গেছে। ওখান থেকেই সোজা মসজিদের দিকে দৌড় লাগিয়েছে। নর্তকী বলছে – শেখজী! দাঁড়ান! দাঁড়ান! আপনার কি হল? মৌলবী বলছে – এখন নয়, আজানের সময় হয়ে গেছে আমি অন্য কিছু করতে পারব না। নর্তকীর নাচ, সাজগোজ সব পড়ে থেকে গেল আর মৌলবী ছুটে পালিয়ে গেল। মহাপুরুষ মহারাজ এই গল্পটা বলতেন, বলে বলতেন – যাঁরা ঈশ্বরের ঠিক ঠিক ভক্ত তাঁরা কখনই কোন কিছুর সঙ্গে আপোষ করবেন না। নিজেকে কখনই কোন কিছুর বিনিময়ে তাঁরা বিক্রী করে দেবেন না। কোন একটা কারণে মোহে পড়ে নর্তকীকে ভালোবেসে ফেলেছে। নর্তকী তাকে আহ্বাণও জানিয়েছে। সেও গেছে। কিন্তু যখন প্রার্থনার সময় হয়ে গেল তখন কিন্তু তাকে টেনে ওখান থেকে বার করে নিয়ে এল – আমি কিন্তু কোন কিছুর বিনিময়ে তোমাকে বিক্রী করব না। আমি আল্লাকে ভালোবেসেছি, আল্লাকে আমি কোন মূল্যেই বিক্রী করতে পারিনা। বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ে এই ধরণের প্রচুর কাহিনী আছ। মোহ হবে, আকর্ষণ, প্রলোভন সবই হবে, কোথাও এগুলোকে না করা হয় না। কিন্তু কোথাও এগুলোকে পাশ কাটিয়ে যাত্রা শুরু করতে হবে। যাত্রা একবার শুরু হয়ে গেলে ধীরে ধীরে মোহ, আকর্ষণগুলো কেটে যাবে।

বেদে যদিও অনেক জাগতিক প্রার্থনা আছে, আমার টাকা হোক, সম্পত্তি হোক, গোধন হোক ইত্যাদির জন্য যেমন প্রার্থনা আছে তার সাথে সাথে এমন এমন প্রার্থনা আছে যেখানে শুধু ঈশ্বরীয় জ্ঞানের জন্যই প্রার্থনা করা হচ্ছে। যেমন গায়ত্রী মন্ত্র, গায়ত্রী মন্ত্রে বুদ্ধিকে আধ্যাত্মিক জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করার জন্য প্রার্থনা করা হচ্ছে, যদিও গায়ত্রী মন্ত্রকে তিন ভাবেই ব্যাখ্যা করা যায়। বেদের অন্তর্নিহিত মূল ভাবই হল আধ্যাত্মিক জ্ঞান, প্রত্যেকটি মন্ত্রেই জ্ঞানের কথা ছড়িয়ে আছে, যেখানে জাগতিক প্রার্থনা আছে সেখানেও প্রচ্ছন্ন ভাবে আধ্যাত্মিক জ্ঞানও রাখা হয়েছে।

ইন্দ্র ক্রতুং ন আ ভর পিতা পুত্রেভ্যো যথা।
শিক্ষা ণো আস্মিন্ পুরুহূত যামনি জীবা জ্যোতিরশীমহি।।ঋ-৭/৩২/২৬।।

ঋষি প্রার্থনা করছেন *জীবা জ্যোতিরশীমহি*, আমরা যেন জ্যোতির পথেই পদচারণ করতে পারি। কিন্তু কি রকম সেই জ্যোতির পথ আর সেই পথ দিয়ে কি করে হাটব? *ইন্দ্র ক্রতুং ন আ ভর পিতা পুত্রেভ্যো যথা*, পিতা যেমন নিজের পুত্রকে সব কিছুর শিক্ষা দিয়ে জীবনে চলতে শেখায়। সন্তান পাঁচ বছর পর্যন্ত মায়ের কাছেই ঠিক ঠিক শিক্ষা পায়, পরে নিজেকে তৈরী করার শিক্ষাটা পিতার কাছ থেকেই পায়। সেইজন্য বাবা যদি ভালো না হয় সন্তানদের মানসিক ও চারিত্রিক বিকাশটাও এলোমেলো হয়ে যায়। তবে ভারতে আগেকার দিনে একটা বয়স থেকে শিক্ষকরাই সন্তানদের শিক্ষার ভারটা নিয়ে নিতেন। মন্ত্রের ঋষি তাঁর ইষ্টদেবতা ইন্দ্রকে বলছেন, পিতা যেমন পুত্রকে পরিচালিত করে ঠিক পথ নিয়ে যান; ঠিক পথ মানে light of wisdom, জ্যোতির্ময় যে পথ সেই পথে আপনি আমাকে নিয়ে চলুন। ভগবানের মত নিয়ে যেতে বলছেন না, পিতা-পুত্রের সম্পর্কের মত। অন্যান্য ধর্মে বিশেষ করে সেমেটিক ধর্মগুলিতে ভগবানের সাথে সরাসরি একটা সম্পর্ক আছে, যেখানে ভগবান যেন একজন কঠোর ন্যায়পরায়ণ রাজা বা কড়া বাবা। কিন্তু এখানে স্নেহপরায়ণ পিতা। বাবা ছেলের কাঁধে হাত দিয়ে খুব মিষ্টি করে শিক্ষা দিতে দিতে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। ছেলের মনে পাঁচটা প্রশ্ন উঠছে বাবা তার সংশয়, অনুসন্ধিৎসা মিটিয়ে দিচ্ছেন, ছেলে পিছলে পড়তে যাচ্ছে বাবা তাকে সামলে নিচ্ছে। ঠাকুরের উপমা – ছেলে যদি বাপের হাত ধরে ছেলের পড়ে যাবার ভয় থাকে, কিন্তু বাপ যদি ছেলের হাত ধরে সে আর পড়বে না। বাস্তবিক জীবনে আধ্যাত্মিক জ্ঞান কিভাবে আসে আরেকটি মন্ত্রে তারই কথা বলছেন –

পূর্বো জাতো ব্রহ্মণো ব্রহ্মচারী ধর্মং বসানস্তপসোদতিষ্ঠৎ।
তস্মাজ্জাতং ব্রাহ্মণং ব্রহ্ম জ্যেষ্ঠং দেবাশ্চ সর্বে অমৃতেন সাকম্।।অ-১১/৫/৫।।

এই মন্ত্রের মূল বিষয় জীবনের সর্বোচ্চ জ্ঞান। সমাজ যেভাবে পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অনেক এগিয়ে গেছে তাতে আমাদের মনে হয় বিজ্ঞান বা বিজ্ঞানের যে বিভিন্ন শাখা আছে এগুলোই সর্বোচ্চ জ্ঞান। কিন্তু বেদের ঋষিদের কাছে জাগতিক কোন বিষয় সর্বোচ্চ জ্ঞান হতে পারে না। মুণ্ডকোপনিষদে বলছেন সর্বোচ্চ জ্ঞান মানে যেটাকে জানলে সব জানা যায়। আমাকে সেই বিদ্যাটা বলুন *কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি*। কোনটাকে জানলে সব কিছুকে জানা যায়। সর্বোচ্চ জ্ঞান হল ঈশ্বরের জ্ঞান। পরম যে দিব্য সত্তা তাঁকে জানাই সর্বোচ্চ জ্ঞান। বেদের সময় এর থেকে নিকৃষ্ট আরেকটি বিদ্যাকে নিয়ে আসা হয়েছিল, সেটাকে বলছেন knowledge of gods। তাহলে ঈশ্বর জ্ঞান আর দেবতা জ্ঞানের মধ্যে তফাৎ কোথায়? ঈশ্বর জ্ঞানে একত্ব বোধ হয় আর দেবতা জ্ঞানে জাগতিক লাভ হয়। দেবতা জ্ঞানে কখনই আধ্যাত্মিক লাভ হবে না, ঈশ্বর জ্ঞানে আধ্যাত্মিক লাভ। বেদে ঈশ্বর জ্ঞান আর দেবতা জ্ঞান এই দুটোকে আলাদা করে রাখা হয়েছে। এই দুটো জ্ঞানের খুব ভালো বর্ণনা পাওয়া যায় ঈশাবাস্যোপনিষদে। যখন ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ দেবতার স্তুতি করা হচ্ছে তখন জাগতিক কিছু ফল পাওয়া যায়। কঠোপনিষদে যমরাজ নচিকেতাকে তিনটে বর দিলেন, প্রথম বরে নচিকেতা নিজের ঝামেলাটা মিটিয়ে নিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় আর তৃতীয় বর খুব মজার। দ্বিতীয় বরে নচিকেতা সেই যজ্ঞের ব্যাপারে জানতে চাইলেন যে যজ্ঞ করলে মানুষ স্বর্গে যেতে পারে। এটাই দেবতা বিষয়ক জ্ঞান। কিন্তু তৃতীয় বরেই নচিকেতা যমরাজের কাছে আত্মজ্ঞান চেয়ে বসলেন। আধ্যাত্মিক জগতে এই দুটো জ্ঞান একসাথে চলে ঈশ্বর জ্ঞান আর দেবতা বিষয়ক জ্ঞান। দেবতা বিষয়ক জ্ঞান ইহলোক ও পরলোকে সুখ সমৃদ্ধি দেবে, ঈশ্বর জ্ঞান ইহলোক আর পরলোকের পারে নিয়ে যায়। হিন্দু ধর্মে যেদিন ভাগবত ধর্মের অনুপ্রবেশ হল, যে ধর্মের কথা আমরা ভাগবত বা গীতাতে পাই, সেদিন থেকে হিন্দু ধর্মে সমস্যা হয়ে গেল। মানুষ একদিকে মুখে বলছে আমার ভক্তি চাই জ্ঞান চাই, অথচ প্রাণ তার আটুপাটু করছে যাতে দুটো টাকা হয়, মেয়েটার যেন একটা সৎপাত্র জোটে, ছেলেটার যেন একটা ভালো চাকরি হয়। এখন সে কোথায় যাবে? লোকে কী বলবে ভেবে সে দেবতার পূজো করতে পারে না। অনেকেরই বিশ্বাস ঠাকুর অবতার, বেলুড়ে ঠাকুরের মন্দির আছে। কিন্তু ভারতের অন্যান্য জায়গায় বড় বড় বাবাজীদের কত মন্দির, সেখানে কত লোক যাচ্ছে, সেই তুলনায় বেলুড়ে অতি নগণ্য সংখ্যায় দর্শনার্থি আসে। কারণ ওখানে চমৎকারী আছে। ওনারা কেউ ম্যাজিসিয়ান নন, ম্যাজিক দেখতে হলে পিসি সরকারের কাছে যাবে, ওখানে কেন ম্যাজিক দেখতে যাবে! যাচ্ছে কারণ আমার কামনা-বাসনা গুলো ওখানে গেলেই পূরণ হবে। ঠাকুরের ভক্ত, বেলুড় মঠ থেকে দীক্ষা নিয়েছে কিন্তু যাচ্ছে ব্যাঙ্গালোরে কোন বড় বাবাজীর মন্দিরে। কারণ সে জানে ঠাকুরের কাছে গেলে জ্ঞান ভক্তি হবে কিন্তু টাকা-পয়সা, মান-যশ, প্রতিপত্তির জন্য ওখানে যেতে হবে। বেদে এই নিয়ে বিরাট সমস্যা হয়ে গিয়েছিল। উপনিষাদির জ্ঞান নিয়ে যাঁরা চর্চা করতেন তাঁদের কাছেও সমস্যা হয়ে গিয়েছিল। কারণ উপনিষদের জ্ঞান নিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে গেলে সবাই ছিটকে তাঁর কাছ থেকে বেরিয়ে যাবে। তখন এনারা বলতে শুরু করলেন সব প্রার্থনা তাঁর কাছেই যায়। তার মানে, ঠাকুরের কাছে যদি কিছু প্রার্থনা করা হয় সেই প্রার্থনাও পূর্ণ হবে। ঠাকুর কিন্তু নিজেই বলছেন, কল্পতরুর কাছে গিয়ে কি কেউ লাউ-কুমড়ো চাইবে। তাহলে বেচারী কোথায় যাবে? সত্যিই মারাত্মক সমস্যা।

বেদ তাই বলছে, পরম জ্ঞান দুই রকম – ঈশ্বর জ্ঞান আর দেবতা জ্ঞান। ঈশ্বর জ্ঞানে জ্ঞান ভক্তি হয়, অর্থাৎ সংসার থেকে মুক্তি হয় আর দেবতা বিষয়ক জ্ঞানে সংসারে ঐশ্বর্য প্রাপ্তি হয়। কিন্তু সংসার থেকে মুক্তিও চাই আর সংসারে ঐশ্বর্যও চাই এই দুটোই আমি চাই, দুটোই কি করে পাব আমায় বলুন। তখন এই মন্ত্রে সেই সমাধান দিচ্ছেন। *পূর্বো জাতো ব্রহ্মণো ব্রহ্মচারী*, প্রথমে তোমাকে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী হতে হবে বা ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মচারী হতে হবে। পরের দিকে যখন বর্ণপ্রথা আরও স্পষ্ট আকার নিতে শুরু হল তখন এনারা শূদ্রদের বলতে শুরু করলেন, যদি জীবনে উন্নতি করতে চাও তাহলে এখন থেকে তুমি চেষ্টা করতে থাক, তারপর কোন জন্মে গিয়ে যদি ব্রাহ্মণ ঘরে জন্ম নাও, ব্রাহ্মণ ঘরে জন্ম নেওয়ার পর যদি তোমার কোন শুভ কর্ম করা থাকে তাহলে তুমি গুরুর কাছে পৌঁছাতে পারবে, তখন তুমি বেদ অধ্যয়নের সুযোগ পাবে। বেদ অধ্যয়নের জন্য মানে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের জন্য যাওয়া। ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী মানেই শারীরিক, মানসিক ও বৌদ্ধিক শক্তি ভেতরে মজুত

আছে। তখনই তুমি বেদের জ্ঞানের জন্য নিজেকে সম্পূর্ণ উজাড় করে দিতে পারবে। এই প্রথা আজ ভারত থেকে উঠেই গেছে। কম বয়সে এখন কাউকে এই পথে যেতেই দেওয়া হয় না।

দ্বিতীয় বলছেন, *ধর্মং বসানস্তপসোদতিষ্ঠৎ*, সেখানে তুমি ধর্মের বস্ত্র গ্রহণ কর। ধর্মের বস্ত্র গ্রহণ করা মানে ধর্মের আচরণ করা। বেদজ্ঞ গুরুর আশ্রমে ব্রহ্মচারী হয়ে যিনি গেছেন তিনি আশ্রমের সব রকম অনুশাসন মানছেন, তাই বলে যে তিনি ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হবেন তা নয়। ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হওয়া আলাদা জিনিস। পরে এক জায়গায় বলবেন, পুরো বেদ যদি কারুর মুখস্তও হয়ে যায় তখনও সে কিন্তু ধর্মে প্রতিষ্ঠিত নাও হতে পারে, বেদকে আত্মীকরণ করতে হবে, আত্মীকরণ করাটাই ধর্ম। গায়ত্রী মন্ত্র জপ করা মানে কিছু শব্দকে আওড়ে যাচ্ছে। কিন্তু গায়ত্রী মন্ত্র বা যে কোন মন্ত্রই যখন অন্তরীকরণ হয় তখনই ধর্ম শুরু হয়ে গেল। ধর্ম তখনই হয় যখন কোন একটা মূল্যবোধকে ভেতরে আত্মীকরণ করা হয়। যদি কোন কিছুকে আত্মীকরণ করা হয়ে যায় তখন এর অবশ্যই একটা পরিণতি হবে, সেটা হল তখনই মানুষ তপস্যা শুরু করে। ঠাকুর খুব সুন্দর উপমা দিচ্ছেন, একজন চোর যদি একবার জানতে পারে পাশের ঘরে সোনা রাখা আছে তার কি আর রাত্রে ঘুম হবে! কেউ শুনেছে সোনা আছে, এর কোন অর্থই নেই। কিন্তু পাশের ঘরে সোনা আছে, এই তথ্যটাই ভেতরে ঢুকে গিয়ে যদি বসে গেল; এবার এই চোরের কি অবস্থা হবে ভাবুন! চোরের ছটফটানি শুরু হয়ে যাবে, তার মানে তার তপস্যা শুরু হয়ে গেল। তথ্য এখন জ্ঞানে রূপান্তরিত হয়ে internalized হয়ে গেছে। যেটা এতক্ষণ একটা মামুলি তথ্য ছিল সেটাই এখন ধর্ম রূপে এসে গেল। যখনই একটা শব্দ ধর্মে রূপান্তরিত হয়ে গেল তখনই তার নিশ্চিত পরিণাম হবে তপস্যা। ধর্ম সব সময় তপস্যার দিকে অবশ্যই ঠেলে দেবে, এর কোন ব্যতিক্রম হবে না। একটা বিশ্বাস যখন internalized হয়ে যায়, সন্তান অনেক দিন ধরে রোগে ভুগছে তার মাকে যদি বলা হয় তুমি সাত দিন উপোস কর, শুধু জল খেয়ে থাক, মায়ের যদি বিশ্বাস হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে সাত দিন শুধু জল খেয়ে থাকতে শুরু করে দেবে। কারণ মা ছেলের মঙ্গলের জন্য একটা ধর্মে প্রতিষ্ঠিত।

এই কথাই এখানে বলছেন, তপস্যা কখন শুরু হয়? যখন ধর্ম হয়। ধর্ম কখন হয়? যখন ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী হয়ে গুরুর উপদেশ গ্রহণ করেছে। *তস্মাজ্জাতং ব্রাহ্মণং ব্রহ্ম জ্যেষ্ঠং*, জ্যেষ্ঠ শব্দ এখানে শ্রেষ্ঠের অর্থে। সেখান থেকে জন্ম হয় শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের। বৈদিক সময়ে অনেক ধরণের ব্রাহ্মণ ছিলেন। কিছু ব্রাহ্মণ বেদের সব কিছু ঝাড়া মুখস্ত করে রাখছেন, একেবারে সাধারণ ব্রাহ্মণদের থেকে তাও ভালো বলতে হবে। বেদ মুখস্ত করা ব্রাহ্মণদের থেকে শ্রেষ্ঠ হলেন যাঁদের বেদের বক্তব্যে প্রত্যয় এসে গেছে। তাঁর থেকেও শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হলেন যিনি ঘোর তপস্যা করতে শুরু করে দিয়েছেন। ব্রহ্মচারীদের যে প্রথমে বেড়া দিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তুমি বেশি খাওয়া-দাওয়া করবে না, মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করবে না, উপহার গ্রহণ করবে না, এগুলো তাঁর হয়ে গেছে। এরপর সব কিছু থেকে সরে এসে শুধু একটি বিষয়ের উপর মনকে একাগ্র করে তপস্যা শুরু করেছেন। সাপ যেমন খোলস ছেড়ে নতুন হয়ে বেরিয়ে আসে, সেই রকম তপস্যা করে সে একটা সাংঘাতিক তেজসম্পন্ন হয়ে বেরিয়ে আসে। এবার এই ব্রাহ্মণ খোলস ছেড়ে নতুন শরীর নিয়ে বেরিয়ে এসেছে। *ব্রহ্ম জ্যেষ্ঠং*, তিনি এখন একজন নতুন মানুষ। ব্রাহ্মণদের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ হয়ে গেলেন।

শ্রেষ্ঠ হয়ে গেলেন ঠিক আছে কিন্তু তাতে তাঁর কি হল? তখন বলছেন *দেবাশ্চ সর্বে অমৃতেন সাকম্*, এরপর দেবতার জ্ঞান যেটা দিয়ে জাগতিক ঐশ্বর্য হয় আর ঈশ্বরের জ্ঞান যে জ্ঞানে অমৃতত্ব লাভ হয়, দুটোরই জ্ঞান তাঁর হয়ে যায়। তিনি এখন জগতের যে কোন জ্ঞানকে গ্রহণ করে সেই জ্ঞানকে ভেতরে ধারণ করে রাখার ক্ষমতা পেয়ে যান। এর শুরু কোথা থেকে হচ্ছে? ব্রাহ্মণ যুবক গুরুর আশ্রমে গিয়ে ব্রহ্মচারী হয়ে গুরুর উপদেশ মত জীবন-যাপন করে, সেখান থেকে সে ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয়, ধর্ম থেকে তার তপস্যা শুরু হয়, তপস্যার দ্বারা সে দেবতা বিষয়ক জ্ঞান আর ঈশ্বরের জ্ঞান এই দুটো জ্ঞানেরই মালিক হয়ে যায়, এই চারটে ধাপ। ব্রাহ্মণ বলা হচ্ছে কারণ তখনকার দিনে ব্রাহ্মণদেরই বেদ অধ্যয়নের অধিকার ছিল, ব্রহ্মচারী বলছেন কারণ ব্রাহ্মণ হলেই যে হবে তা নয় তাকে গুরুর আশ্রমে গিয়ে শিক্ষা নিতে হবে। কিন্তু ব্রহ্মচারী হয়ে সে বেদের শিক্ষা পেতে পারে, যজ্ঞাদি করার অনেক উপাচার জেনে নিতে পারে কিন্তু এটা নিশ্চিত করে বলা যাবে না যে এগুলো তার ধর্মে রূপান্তরিত হবে। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে এসে এক ভক্ত ঠাকুরের কথা শুনতেন।

একদিন ঠাকুরকে বলছেন ‘আপনি যে কথাগুলো বলছেন এগুলো কি সব সত্য’? ঠাকুর বলছেন ‘হ্যাঁ, সব সত্য’। তারপর থেকে সেই ভক্ত আর ঠাকুরের কাছে আসতেন না। পরে খোঁজ নিয়ে জানা গেলে সে ঘরবাড়ি ছেড়ে কোথায় চলে গেছে। লীলাপ্রসঙ্গেই এই ঘটনার বর্ণনা আছে। যদি এটাই সত্য হয় তাহলে আমি এখানে থেকে কী করব! এটাই এই মন্ত্রের মূল ভাব।

ব্রহ্মচর্য যে কেউই পালন করতে পারে। আইনস্টাইনের মত বড় বড় বিজ্ঞানীরাও ব্রহ্মচর্যে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বিজ্ঞানের একটা কিছুকে নিয়ে এনারা এত বেশি একাগ্র হয়ে যেতেন যে ভোগবৃত্তি জাগতই না। জর্জ হুভার বিশ্ব বিখ্যাত উদ্ভিদ বিজ্ঞানী ছিলেন। বিয়ে থা করলেন না, চিরকাল টাকা-পয়সার ব্যাপারে প্রচণ্ড উদাসীন ছিলেন। অফিস থেকে যে চেক পাঠান হত, সেটা ভাঙ্গাতে উনি প্রায়ই ভুলে যেতেন। পরে অফিস থেকে বলা হত, স্যার আপনি চেকটা না ভাঙ্গানোর জন্য ব্যাঙ্কের হিসেব মিলছে না। একবার ওনাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল আপনি বিয়ে থা করলেন না কেন। তাতে উনি খুব সুন্দর কটি কথা বলেছিলেন – আমারও ইচ্ছে ছিল বিয়ে করি, কিন্তু যখন ভোর চারটের সময় উঠে গাছগুলোকে গিয়ে জিজ্ঞেস করি বাবা কেমন আছ, আমি তখন ভাবতাম আমার স্ত্রী এলে এই নিয়ে আমাকে সে কি ভাববে, তাই আর বিয়ে করলুম না। তার বিশাল বাগান ছিল আর সেখানে নানান রকমের গাছ, প্রত্যেকটির গাছের যত্ন নিজের হাতে করতেন। বোটানির সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে বিশ্বে তাঁর কথাই ছিল শেষ কথা। ভোর চারটের সময় উঠেই প্রত্যেকটি গাছকে তিনি জিজ্ঞেস করতেন বাবা কেমন আছ। তিনি তখন বলছে, আমি ভেবে দেখলাম আমার জীবনের সময়গুলো ভোগের দিকে দেব, নাকি আমার প্রাণের শিশুদের দিকে দেব, ভেবে ঠিক করলাম, না থাক আর কাউকে জীবনের সাথে জড়িয়ে লাভ নেই, তাহলে এদের প্রতি আমি সময়ই দিতে পারব না। উদ্ভিদের ব্যাপারে তাঁর এত আবিষ্কার আছে যে যার জন্য আমেরিকার অর্থনীতি পুরো পাল্টে গিয়েছিল। জর্জ হুভারকে বলা যেতে পারে তিনি পুরোপুরি ব্রহ্মচর্যে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, কিন্তু ধার্মিক লোক ছিলেন না। ব্রহ্মচর্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলেই যে সে ধার্মিক হয়ে যাবে তা নয়। যে ধার্মিক নয় সে কখন তপস্যা করতে পারবে না। যে তপস্যা করছে না সে কোন দিন আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করতে পারবে না। আধ্যাত্মিক উপলব্ধির ক্ষেত্রে এই চারটি স্তর – ১) ব্রহ্মচর্য, ২) ধর্ম, ৩) তপস্যা এবং চতুর্থ ৪) আধ্যাত্মিক জ্ঞান।

আমাদের একটা ধারণা যে নির্গুণ নিরাকার একটা আলাদা কিছু আর সগুণ সাকার অন্য একটা কিছু। কখনই তা নয়, নির্গুণ নিরাকারও যা সগুণ সাকারও তাই। আরও একটা বিচিত্র ধারণা যে নির্গুণ নিরাকার সগুণ সাকার থেকে শ্রেষ্ঠ। নির্গুণ সগুণ, নিরকার সাকারের মধ্যে কোন তফাৎ নেই, তফাৎ হল আমাদের মাথায়। অনন্তকে আমরা কীভাবে দেখছি, আমাদের মনের গঠন যেমন হবে সেই অনুসারে আমি অনন্তকে দেখব। সগুণ সাকার বলা মানেই এই নয় যে অনন্তকে সীমিত করে দেওয়া হচ্ছে। সগুণ সাকার মানে, মন দিয়ে ঈশ্বরকে দেখা। নির্গুণ নিরাকারকে শুদ্ধ মন, শুদ্ধ বুদ্ধি, শুদ্ধ আত্মা দিয়ে বোধে বোধ করা হয়। নির্গুণ নিরাকার আর সগুণ সাকারে কোন তফাৎ নেই, তফাৎ শুধু মন দিয়ে দেখার সময়। শুদ্ধ ভক্ত দেখে তিনি সগুণ সাকার, সেই ভক্তই যোগ সাধনা করে করে যখন মনকে বুদ্ধিতে লয় করে দেয়, বুদ্ধিকে আত্মাতে লয় করে দেয়, জগতের অনুভূতি পুরোপুরি তাঁর মন থেকে যখন সরে যায় তখন ভক্ত তাঁকে দেখেন না, তাঁকে বোধ করেন। কী বোধ করেন? সেই এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দই আছেন। আধ্যাত্মিকতা কখনই সবার জন্য নয়। হাজার হাজার ভক্তের মধ্যে দু-একজনকে এই আধ্যাত্মিকতা স্পর্শ করে, যখন স্পর্শ করে তখনই তার জীবন পাল্টাতে শুরু হয়। তার আগে পর্যন্ত সবাই ধার্মিক। ধার্মিক আর অধার্মিকের মধ্যে খুব বেশি তফাৎ নেই। অধার্মিকরা পুরোপুরি নির্ভর করে থাকে তার মনের উপর, নিজের বাহুবলের উপর। ভক্ত সেও নিজের মন আর বাহুবলের উপর নির্ভর করে আছে কিন্তু প্রার্থনা করতে গেলে মাঝে মাঝে ঈশ্বরকেও ভেতরে নিয়ে আসে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে ধার্মিক পুরুষ অধার্মিক পুরুষের থেকে একটু যেন ভালো কিন্তু ধার্মিক হয়ে যাওয়ার পর তার মধ্যে গুণগত পরিবর্তন সেভাবে হয় না। গুণগত পরিবর্তন আসে একমাত্র আধ্যাত্মিকতায়।

আমরা আধ্যাত্মিক পুরুষ কীভাবে হব? সেটাই এই মন্ত্রে আলোচনা করা হচ্ছে। ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার ব্যাপারে বাচ্চা বয়স থেকে আমরা কতকগুলি ধারণা মাথায় নিয়ে ঘুরছি, যেমন ঠাকুর আছেন, ঠাকুর আমাদের

দেখছেন, দুঃখ-কষ্ট ঠাকুরই দিচ্ছেন, ভালো-মন্দ ঠাকুরই দিচ্ছেন। এই ধারণা মাথায় নিয়ে যখন আমরা শাস্ত্র কথা শুনতে যাচ্ছি তখন শাস্ত্র পড়ে কী শিখব! কারণ আমরা একটা ধারণাকে মাথায় নিয়ে বসে আছি, ওই ধারণার বাইরে আমাদের যাওয়া খুব কঠিন। কিন্তু যখন বলছেন *শিষ্যস্তেহং সাধি মাং তাং প্রপন্নাম্*, আমি আপনার পায়ে আশ্রয় নিলাম আপনি আমায় রক্ষা করুন। তখন বলবেন, খুব ভালো কথা! তাহলে তুমি বুঝে গেছ তো এই সংসারে কিছু নেই? হ্যাঁ! বুঝে গেছি। খুব ভালো! এবার আমি যেভাবে বলব সেভাবে চল। এবার তাকে আধ্যাত্মিক সত্য দেওয়া শুরু হবে। তাই বলছেন যখন কেউ ব্রহ্মচারী হয়ে যায় আসলে সে ব্রতী হয়ে যায়। আমি আজ থেকে এই ব্রত নিলাম। আমি আজ থেকে এই রকমটি করব। এখান থেকেই শুরু হয় ধর্ম। আধ্যাত্মিকতার প্রথম ধাপ ধর্ম। এই ধর্ম মানে হিন্দু ধর্ম, খ্রীশ্চান ধর্ম নয়, ধর্ম মানে কতকগুলি আদর্শের উপর জীবনকে নির্মাণ করা। যদি জিজ্ঞেস করা হয় আপনার জীবনের আদর্শ কি কি? দেখা যাবে আমাদের জীবনের কোন আদর্শই নেই। টাকা উপার্জন করা, টাকা দিয়ে ভোগ করা আর মাঝে মাঝে একটু দান করা, এটাই আমাদের সবার জীবনের আদর্শ। এটা কোন আদর্শই নয়, আদর্শ মানে আমি এটার জন্য নিজের জীবন দিতে প্রস্তুত। লোকে টাকা-পয়সার জন্যও জীবন দিয়ে দেয়, কিন্তু টাকা কখন আদর্শ হতে পারে না, টাকা তো জড় বস্তু, বস্তু মানে বিষয় হয়ে গেল। কিন্তু যেদিন কেউ ঠিক করে নিল, এই আমার আদর্শ আর এই এই আমার জীবনের নীতি, এর জন্য আমি আমার প্রাণ দিয়ে দেব। এবার সে ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। তার মন আস্তে আস্তে আধ্যাত্মিকতার রাজ্যে প্রবেশ করবার জন্য প্রস্তুত হতে থাকবে। অবাক লাগে, এত লোক মন্দিরে যাচ্ছে, এত ধর্ম কথা শাস্ত্র কথা শুনছে কিন্তু সমাজে কোথাও কোন পরিবর্তনের লক্ষণ নেই। পরিবর্তন আসবে কোথা দিয়ে! কারণ যে ধর্মের কথা, শাস্ত্রের কথা মানুষের কান দিয়ে ভেতরে যাচ্ছে, সেই কথাগুলো জীবনের কোন ব্রতে রূপান্তরিত হচ্ছে না। ব্রততেই যদি রূপান্তরিত না হয়, সেটাই পরে ধর্মে কী করে রূপান্তরিত হবে! ধর্মে রূপান্তরিত হওয়ার পরেই মন শক্তি পায়। শক্তিশালী মনেই জ্ঞান নিজেকে উন্মোচিত করতে পারে। কিন্তু সব কিছুর শুরু হয় ব্রহ্মচারী থেকে। ব্রহ্মচারী শুধু যে বিয়েথা না করে থাকা তা নয়, জাগতিক ভোগ থেকে নিজেকে সরিয়ে এনে একটা বেড়া দেওয়া। জগতে কত রকমের আমোদ আহ্লাদ আছে এগুলোতে ব্রহ্মচারী কখনই আর জড়াবে না। এসব আমরা আগে আলোচনা করেছি। যদি কেউ ঠিক ঠিক ব্রহ্মচারী হয়ে যায় তখন কি হতে পারে, সেটাই আরেকটি মন্ত্রে খুব সুন্দর বলছেন –

ব্রহ্মচারী সিঞ্চতি সানৌ রেতঃ পৃথিব্যাং তেন জীবন্তি প্রদিশশ্চতস্রঃ।।অ-১১/৫/১২।।

বেদে যখনই ব্রহ্মচারীর কথা বলা হবে তখন ব্রহ্মচারীর অনেক শর্ত ও গুণ একসাথে নিয়ে নেওয়া হয়। নারী-পুরুষের ব্যাপার থেকে ব্রহ্মচারীকে তো দূরে থাকতেই হবে, কিন্তু তার সাথে আরও অনেক কিছু থাকে, যেমন গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা, জাগতিক কোন ভোগে লিপ্ত না হওয়া, নিত্য শাস্ত্র অধ্যয়ন, নিত্য জপ-ধ্যান করা ইত্যাদি জিনিসগুলোও ধরা আছে।

ব্রহ্মাচারী কি করে? অথর্ব বেদের ঋষি বলছেন *ব্রহ্মচারী সিঞ্চতি সানৌ রেতঃ পৃথিব্যাং*, ব্রহ্মচারী তার রেতঃকে ছড়িয়ে দেয়। কোথায় তার রেতঃ ছড়িয়ে দেয়? সমস্ত পৃথিবীতে। বেদের ধর্ম মূলতঃ গৃহস্থদের ধর্ম। গৃহস্থ ধর্ম মানেই পুরুষের স্ত্রী থাকতে হবে। স্ত্রীর একটাই কাজ, পুত্র সন্তানের জন্ম দেওয়া। পুত্র সন্তান কেন? পুত্র তার বাবা মাকে পূর্ব পুরুষদের সাথে স্বর্গে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করে দেবে। মহাভারতে এসে এটাই বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। কারুর যদি পুত্র সন্তান না থাকে তার কী হবে? মহাভারত তাই বলে দিল মেয়ের পুত্র সন্তান অর্থাৎ দৌহিত্র্যও যদি পিতৃযজ্ঞ করে তাতেও মাতামহ বা মাতামহীর স্বর্গপ্রাপ্তি হবে। আরও পরের দিকে নিয়ম করে দেওয়া হল কন্যা সন্তানও পিতৃশ্রাদ্ধাদির কর্ম করতে পারবে। এগুলো ধর্মীয় রীতিনীতি, ধর্মীয় রীতিনীতি সময়ের সাথে সাথে পাল্টাতে থাকে। কিন্তু আধ্যাত্মিকতার কোন কিছু পাল্টাবে না, আধ্যাত্মিকতার সব কিছুই সনাতন। বেদের সময় একজন পুরুষ বাধ্য ছিল কোন নারীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখা। এখনও কেউ যদি সন্ন্যাসী হওয়ার জন্য ঘরবাড়ি ছেড়ে এসে বলে আমি বিয়ে করব না, বাড়ির লোকেরা তাকে বোঝাতে থাকে কেন তুমি বিয়ে করবে না। এই দেখ সবাই যুগলে আছেন, বিষ্ণুর সঙ্গে লক্ষ্মী, শিবের সঙ্গে পার্বতী, আমাদের কোন দেবী দেবতা নেই যে যার বিয়ে হয়নি। বেদের সময় বিবাহ করাটা বাধ্যতামূলক ছিল। বেদের সময় তাই

এই সমস্যাও এসে গিয়েছিল – একজন পুরুষ তার ওজসকে, তার ভেতরে যে তেজ সেটাকে কাজে লাগাবে, কিন্তু যে ব্রহ্মচারী সে তো কাজে লাগাবে না, তাহলে সেই ক্ষেত্রে সে কী করবে? ভগবান ব্রহ্মচারীকে যে শক্তি দিয়ে পাঠিয়েছেন সেটা তো কোন কাজে লাগলো না। কোথাও তো সে ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাচ্ছে। যেটা বীজাকারে তেজ বা ওজস রূপে একজন পুরুষের মধ্যে থাকে, যে বীজকে ছড়ানো হবে সংসারের বিস্তারের জন্য, ব্রহ্মচারী সেই বীজকে ছড়াতে চাইছে না, সেতো সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করছে। এই মন্ত্রে তার উত্তর দেওয়া হচ্ছে। যদিও বেদে পরিষ্কার ভাবে সন্ন্যাসের ধারণা আসেনি, কিন্তু কোথাও কোথাও বেদেও হাল্কা ভাবে সন্ন্যাসের কথা এলেও উপনিষদে সন্ন্যাসের ধারণা পুরোদমে এসে গিয়েছিল।

বলছেন, *ব্রহ্মচারী সিঞ্চতি সানৌ রেতঃ পৃথিব্যাং*, ব্রহ্মচারী নিজের ওজস বা বীর্যকে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেয়। বেদে রেতঃ শব্দের মানে বীজ। এই বীজ সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেওয়ার ফলে কি হচ্ছে? *তেন জীবন্তি প্রদিশশ্চতস্রঃ*, এই যে ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মাণ্ডের যা কিছু শুভ, ব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব পুরোপুরি দাঁড়িয়ে আছে একমাত্র একটি কারণে, ব্রহ্মচারীর এই রেতঃ। আমাদের ধারণা যে, মানুষের মধ্যে যে জৈবশক্তি (sexual energy) আছে, এই জৈবশক্তিকে যদি কোন জৈবিক প্রক্রিয়ায় অপচয় না করা হয়, তখন এটাই মনের মধ্যে ওজ সৃষ্টি হয়। ওজ হল শাস্ত্রের একটি পরিভাষা, যিনি ব্রহ্মচর্যকে ধারণ করে আছেন। ওই ওজকে যখন ভেতরে ধারণ করে নেওয়া হয় তখন ব্রহ্মচারীর এই ওজঃ শক্তির দ্বারা পৃথিবীর সবাই উপকৃত হয়, এর দ্বারা সমস্ত পৃথিবীর মঙ্গল হয়। সেইজন্য সন্ন্যাসী বা ব্রহ্মচারীকে অবশ্যই যুবক হতে হবে। কারণ একটা বয়সের পর থেকে রেতঃ ধারণ করে এই ওজঃ শক্তি তৈরী হওয়া কমে যায়। কম বয়সে যদি সন্ন্যাসী না হয়ে থাকে তাহলে সে জগতের মঙ্গল করতে পারবে না, তাঁর নিজের মঙ্গল অবশ্যই হবে। কেউ যদি বৃদ্ধ বয়সেও সন্ন্যাসী হয় সেটাও খুব ভালো, সন্ন্যাসী হয়ে তিনি তো ঈশ্বর চিন্তনই করবেন, ঈশ্বর চিন্তন করার থেকে আর ভালো কী হতে পারে! কিন্তু অল্প বয়সে সন্ন্যাস নেওয়ার পর যখন সে ব্রহ্মচর্যের দ্বারা নিজের ওজ শক্তিকে তৈরী করছে, তখন এই ওজঃ শক্তি সমগ্র জগদ্বাসীর মঙ্গল করবে।

জগতের যেখানে যা কিছু শুভ সব এই ওজঃ শক্তির জন্যই এসেছে। স্বামীজীও এর উপর জোর দিতে গিয়ে অনেক কথা বলেছেন। অনেক আচার্যরা আবার ব্রহ্মচর্যের উপর আলোচনা করতে গিয়ে অনেক রকম ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করে দেন – ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন করে গৃহস্থরা কি করে থাকবে? গৃহস্থদের ব্রহ্মচর্যের শিক্ষা দেওয়াটা কখনই ঠিক কাজ নয় ইত্যাদি। অথচ ঠাকুর বলছেন, স্বদারায় গমনে দোষ নেই। বলেই ঠাকুর আবার একটা দুটো সন্তানের পরে ভাই-বোনের মত থাকতে বলছেন। অর্থাৎ একটা লাইন টেনে দিয়ে সবাইকে ওজঃ শক্তিকে preserve করতে হবে। কিন্তু এখানে সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারীদের কথা বলা হচ্ছে, যাঁরা ওই তেজ, ওজঃ শক্তিকে preserve করছেন। স্বামীজী বলছেন, যে যে ধর্মে ব্রহ্মচর্যের উপর জোর দেওয়া হয়েছে, সেই সেই ধর্মই বড় বড় সাধু মহাত্মার জন্ম দিয়েছে। স্বামীজী এর তুলনা করে দেখাচ্ছেন ক্যাথলিক আর প্রোটেস্ট্যান্টদের সাথে, দুজনের একই ইষ্ট কিন্তু ক্যাথলিকরা বিয়ে করতে দেয় না, প্রোটেস্ট্যান্টরা বিয়ে করার অনুমতি দেয়, যার জন্য ক্যাথলিক সম্প্রদায়ে প্রচুর সন্ন্যাসী আছেন, প্রোটেস্ট্যান্টে সন্ন্যাস হয় না।

অনেকে বলতে পারে ক্যাথলিকদের মধ্যে কত স্ক্যাণ্ডাল, সন্ন্যাসীদের নামে এত এত নোংরা খবর সামনে আসছে। এখানে স্ক্যাণ্ডালকে নিয়ে আলোচনা করতে আসা হয়নি, আমরা এসেছি সন্ন্যাস ধর্মের যদি একটি মাত্র সাফল্য হয়ে থাকে সেটাকে আলোচনা করতে। স্বামীজী এক জায়গায় বলছেন, শ্রেয়োর পথ অত্যন্ত কঠিন আর অত্যন্ত দুর্গম, শ্রেয়োর পথে যে এত লোক নামছে আর চলতে গিয়ে এত লোক যে পিছলে ছিটকে যাচ্ছে এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই, এদের মধ্যেও দু-একজন যে সাফল্যের চূড়ায় গিয়ে পদচিহ্ন রাখতে পারছেন এটাই আশ্চর্যের। স্বামীজী বলছেন Character has to be established through thousand stumbles। এর মধ্যে একজনও যদি সফল হন তাহলে তিনি একাই সমস্ত জগতের মঙ্গল করতে পারবেন। ঠাকুর বলছেন, বংশে একজন যদি কেউ ভালো হয় সেই বাকীদের সবাইকে উপরে টেনে নিয়ে যাবে।

চিকাগো বিশ্বধর্ম সম্মেলনে স্বামীজী বক্তৃতায় প্রথম বাক্যটা বলতেই কানে তালা ধরে যাওয়ার মত সারা হল করতালিতে ফেটে পড়ল। এই ঘটনা আমরা বহু জায়গায় শুনেছি, পড়েছি। কিন্তু একবারও কি চিন্তা করে দেখেছি কেন সমস্ত শ্রোতারা দাঁড়িয়ে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে তালি দিয়েছিল! সভায় পেছনের দিকে একজন মহিলা বসেছিলেন তাঁর নাম ছিল মিসেস ব্লজেট। বক্তৃতা শেষ হওয়ার পর যুবতী মেয়েগুলো যখন স্বামীজীকে একটু স্পর্শ করার জন্য স্বামীজীর দিকে দৌড়ে যাচ্ছে তখন তিনি বলছেন Youngman! If you can resist this temptation then you are God। স্বামীজীর এই Sisters & brothers of America এর মধ্যে কী এমন জাদু ছিল যে সমস্থ শ্রোতৃমণ্ডলী একসাথে দাঁড়িয়ে হাততালি দিতে শুরু করে দিল? নিউ ডিসকভারিতে স্বামীজী নিজেই এর উত্তর দিচ্ছেন, কয়েকজন শিষ্যাকে স্বামীজী বলছেন, যখন আমি বললাম Sisters & brothers of America তখন পুরো audience উঠে দাঁড়িয়ে clapping করল, তোমরা জানো কেন করল? কারণ ওই শব্দের পেছনে আমার সারা জীবনের অখণ্ড ব্রহ্মচর্যের শক্তি ছিল। স্বামীজীর এই কথাকে যিনি স্মৃতিচারণ করছেন, তিনি বলছেন – আমেরিকান সোসাইটিতে তখনকার দিনে মেয়েদের সামনে ব্রহ্মচর্য, সেক্স, বীর্য এই ধরণের শব্দের ব্যবহার করাটা কেমন একটা অশালীনতার ব্যাপার হয়ে যেত আর এই ধরণের শব্দও কেউই ব্যবহার করতেন না। স্বামীজী এরপর বলছেন – ওই শক্তির সামনে জগতে এমন কোন শক্তি তখন ছিল না যে ওই শক্তিকে দাবিয়ে দেবে। কী এমন সেই জিনিস যা কিনা স্বামীজীকে জগতে এত Great করেছে? এই প্রশ্নের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এরপর আপনি যদি socio analysis করেন বা psycho analysis করেন, অনেক রকমের বিশ্লেষণেই আপনি যেতে পারেন, কিন্তু কখনই এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে না। প্রশ্নের উত্তর বেদের এই মন্ত্রেই পাওয়া যাবে, *ব্রহ্মচারী সিঞ্চতি সানৌ রেতঃ পৃথিব্যাং*, সারা পৃথিবীতে তিনি তাঁর বীর্যকে সিঞ্চন করে যাচ্ছেন। ফলে কী হয়? *তেন জীবন্তি প্রদিশশ্চতস্রঃ*, জগতে যে জীবনী শক্তি চলছে, এই শক্তি আসে একমাত্র ব্রহ্মচারীর ওই সিঞ্চিত বীর্য থেকে।

এখানে দুটো জিনিস, ব্রহ্মচারী যদি সারা জীবন ব্রহ্মচর্য পালন করে চলেন, তাতে কি তাঁর জীবনটা বৃথা চলে গেল? সন্ন্যাসীর জীবন কী বৃথাই চলে যাচ্ছে? বেদের দৃষ্টিতে বৃথা যাচ্ছে না। গৃহস্থের ক্ষেত্র হল নারী যার মধ্যে সে তার বীজ বপন করছে আর ব্রহ্মচারী বা সন্ন্যাসীর জন্য যে ক্ষেত্র সেটা নারী না হয়ে পুরো জগতকেই সে ক্ষেত্র করে নিচ্ছে। গৃহস্থের সন্তান হওয়াতে তার যে ভাল হচ্ছে, তার পূর্বজদের যে ভালো হচ্ছে, ঠিক তেমনি ব্রহ্মচারী বা সন্ন্যাসীর একজন সন্তান হওয়ার জন্য তাঁর যে ভালো হত বা তার পূর্বজদের যে ভালো হত, সেই ক্ষুদ্র ভালো হওয়াকে অতিক্রম করে তিনি সমগ্র জগতের মঙ্গলের কারণ হয়ে যান। আজ ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর নামে কত লোক ছুটে আসছে, কত লোকের মঙ্গল হচ্ছে, আমরা ঘরবাড়ি ছেড়ে শাস্ত্রের কথা শুনতে আসছি, ভালো লাগছে বলেই আসছি। একজন দুজন লোক, ঠাকুর স্বামীজীর মত দু-একজন পুরুষ এটাতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন, যার ফলস্বরূপ আজ এত লোকের মঙ্গল হচ্ছে।

বেদের পরে পরে ব্রহ্মচর্যকে নিয়ে অনেক চিন্তাভাবনা করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, যেখানে গিয়ে বলা হচ্ছে ঈশ্বরীয় জ্ঞান ও শক্তি যখন ভেতরে আসে সেই জ্ঞান ও শক্তিকে সাধারণ মানুষ ধারণ করতে পারে না। ব্রহ্মচর্যের শক্তি না থাকলে ঈশ্বরীয় জ্ঞান বা শক্তি তাকে উল্টে ফেলে দেবে। রাজযোগের সাধকদের প্রথমেই সাবধান করে বলে দেওয়া হয়, যদি ব্রহ্মচর্য পালন না কর তাহলে তোমার মাথাটি খারাপ হয়ে যাবে। ব্রহ্মচর্য পালনে বিশেষ মেধা নাড়ী খুলে যায়, মেধা নাড়ী খুলে গেলে যে কোন জিনিস গ্রহণ ও ধারণ করার সামর্থ এসে যায়। যারা নপুংসক, যারা অবিবাহিত জীবন যাপন করছে তারাও তো ব্রহ্মচারী। কিন্তু না, ব্রহ্মচারী মানে তার ভেতরে পূর্ণ শক্তি এসে গেছে, সেই শক্তি দিয়ে ইচ্ছে করলে যা কিছু করে দিতে পারবে। যাদের মধ্যে কোন ক্ষমতাই নেই এখানে তাদের কথা বলা হচ্ছে না। ব্রহ্মচারীর এমন শক্তি যে সে বলবে – আমি যদি চাই দশটা স্ত্রী জুটিয়ে নিতে পারি, আমি যদি চাই একশটা সন্তানের জন্ম দিতে পারি, কিন্তু এসব আমি কিছুই করব না। তাহলে কি ব্রহ্মচারী হতাশার জীবন যাপন করবে? কখনই না, আমার এই জীবন ঈশ্বরের সেবায় সমর্পিত, এই জীবন মানবজাতির কল্যাণে নিবেদিত। ঠিক এই ভাবের উপরেই একটি মন্ত্রে বলছেন –

আচার্য উপনয়মানো ব্রহ্মচারিণং কৃণুতে গর্ভমন্তঃ।
তং রাত্রীস্তিস্র উদরে বিভর্তি তং জাতং দ্রষ্টুমভিসংযন্তি দেবাঃ।।অ.১১/৫/৩৩

আচার্যের কাছে যখন ব্রাহ্মণ সন্তান শিক্ষার জন্য প্রথম যায় তখন সে তিন রাত্রি আচার্যের কাছে থাকে। দীক্ষা হওয়ার পর ওই তিন রাত অতিবাহিত করে আচার্যের কাছ থেকে যখন সে বেরিয়ে আসে তখন সে এক নতুন জীবন প্রাপ্ত করে। নতুন জীবন পেয়ে সে যখন বেরিয়ে আসে তখন *তং জাতং দ্রষ্টুমভিসংযন্তি দেবাঃ*, তার চেহারাটা একটা দিব্যজ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। বাইবেলে যীশু বলছেন, The old man has to die। ইদানিং যে নানা রকমের দীক্ষা হয়ে থাকে, মন্ত্রদীক্ষা, ব্রহ্মচর্যের দীক্ষা, সন্ন্যাস দীক্ষা এগুলো একটা উপাচার ঠিকই, কিন্তু এই উপাচারের ভেতর দিয়েই একটি নতুন মানুষ জন্ম নিয়ে বেরিয়ে আসে। ঠাকুরের তিথিপূজার রাত্রে যাদের সন্ন্যাস দীক্ষা হয় ভোরবেলা তাঁদের সবার চেহারার ভেতর থেকে একটা দিব্যজ্যোতি বেরিয়ে আসে। সবাইকে মনে হয় যেন সদ্যোজাত দেবশিশু। একটা নতুন জীবন লাভ করতে যাচ্ছে তার আগে তাকে দিয়ে অনেক রকম উপাচার পালন করানোটা বাধ্যতামূলক থাকে। ওই উপাচারের ভেতর থেকেই নতুন জন্ম হয়। সাধারণ একটা বিবাহের ক্ষেত্রে যখন ঠিক হয়ে গেল এই পাত্রের সাথে এই পাত্রীর বিবাহ হবে সেদিন থেকে পাত্র-পাত্রীকে কত রকম উপাচার পালন করতে হয়। এই উপাচারের খুব দরকার, কারণ এগুলোই তার মনকে একটা নতুন জীবনকে বরণ করে নেওয়ার জন্য প্রস্তুতি করিয়ে দিচ্ছে। কেউ যখন ব্রহ্মচারী হতে যাচ্ছে তখন সে নিজেকে সমস্ত প্রাণীর জন্য উৎসর্গ করতে যাচ্ছে, সমাজের জন্য সে এখন উৎসর্গিকৃত।

অথর্ব বেদের এই মন্ত্রে বলছেন, ব্রহ্মচারী ব্রতে দীক্ষিত হওয়ার জন্য তাকে গুরুগৃহে তিন রাত্রি থাকতে হত। কি কি উপাচার করা হত সেটা বলা নেই। ওই তিন রাত্রির পর যখন সে গুরুগৃহ থেকে বেরিয়ে আসে সে যেন তখন একটা খোলস ছাড়া সাপের মত বেরিয়ে আসে। এবার সে নিজেকে আট বছর বা চব্বিশ বছরের জন্য বেদশিক্ষায় উৎসর্গ করে দিল। যে কোন শুভ কাজ শুরু করার আগে একটু উপাচার রাখতে হয়। যত উপাচারের মধ্যে দিয়ে যাবে তত তার অন্তর্জগতের রূপান্তরটাও বৃহৎ হবে। সেইজন্য হিন্দু ধর্মের যে কোন শুভ কর্মের অনুষ্ঠানের পূর্বে অনেক ধরণের উপাচার রাখা হয়েছে। মানুষ মরে গেলেও কত রকমের উপাচার পালন করতে হয়, তখন এই উপাচারগুলিই আমাদের মনকে মেনে নিতে তৈরী করে দিচ্ছে যে লোকটিকে আর এই দেহে এই রূপে দেখা যাবে না। কিন্তু মরে গেলে আর সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হল, তখন আমাদের মাথা থেকে কোন দিন যাবে না যে লোকটি মারা গেছে। দেখা যায়, কারুর কেউ প্রিয়জন মারা গেছে, সে তার দাহ ক্রিয়াদি থেকে শুরু করে শ্রাদ্ধাদি কর্মে যদি উপস্থিত থাকে তাহলে স্বপ্নে সে কখনই তাকে দেখবে না। কারণ এই উপাচারগুলির মাধ্যমে মনকে প্রত্যেক ধাপে মনে করিয়ে দেওয়া হচ্ছে তোমার এই প্রিয়জন মারা গেছে। শরীরটা নতুন কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া হল, লম্বা প্রসেসান করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, শ্মশানে প্রত্যেকটি অঙ্গে ঘি ও অন্যান্য সুগন্ধ লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে, ওখানেই কত রকম পিণ্ড দেওয়ার পর অগ্নিতে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সেদিন থেকে দশ দিন ধরে হবিষ্যান্ন খাচ্ছে, তার ভেতরে যে মানুষটা এতদিন জীবিত রূপে ছিল সেটাকে এভাবে ধীরে ধীরে তার মন থেকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। উপাচার হয়ে গেছে, এবার তুমি ওই মানুষটিকে মন থেকে সরিয়ে দিয়ে নতুন জীবনের দিকে এগিয়ে যাও। ব্রহ্মচারী ব্রতের দীক্ষাও ঠিক তাই করছে। আগেকার দিনে আর এখনও গায়ত্রী মন্ত্র দেওয়ার সময় কত রকম উপাচার করান হয় তারও উদ্দেশ্য একই। ব্রহ্মচর্য যে কত গুরুত্ব সেটাই আরও কয়েকটি মন্ত্রে বলা হচ্ছে –

ব্রহ্মচর্যেণ তপসা রাজা রাষ্ট্রং বি রক্ষতি।
আচার্যো ব্রহ্মচর্যেণ ব্রহ্মচারিণমিচ্ছতে।।১৭
ব্রহ্মচর্যেণ কন্যা যুবানং বিন্দতে পতিম্।১৮
ব্রহ্মচর্যেণ তপসা দেবা মৃত্যুমাপাঘ্নত।
ইন্দ্রো হ ব্রহ্মচর্যেণ দেবেভ্যঃ স্বরাভরত্।।১৯

শুধু নারী-পুরুষের কাম ভাবকে নিয়ে নয়, এখানে সব কিছুকে মিলিয়ে ব্রহ্মচারীর সম্বন্ধে বলা হচ্ছে। ব্রহ্মচারী মানেই সে এখন ব্রত নিয়েছে, ব্রত মানে তপস্যাই তার প্রধান জীবনসঙ্গী। ব্রহ্মচারী মানে, এই আমার ব্রত, এই ব্রতই আমার স্বধর্ম, আমি এই স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত। একজন শিক্ষকের যেমন কিছু স্বধর্ম আছে, তেমনি স্বামী রূপেও তার কিছু স্বধর্ম আছে, স্ত্রীরও স্বধর্ম আছে, আবার অবিবাহিতা মেয়েরও একটা স্বধর্ম আছে, প্রত্যেকরই কিছু স্বধর্ম আছে। যখন ব্রহ্মচর্যের কথা বলা হয় তখন এই ব্রহ্মচর্যও স্বধর্ম, যার মধ্যে তপস্যা জুড়ে আছে। কোন ধরণের প্রলোভনের কারণে ব্রহ্মচারী কখন তার স্বধর্মকে উল্লঙ্ঘন করবে না।

ব্রহ্মচর্যেণ তপসা রাজা রাষ্ট্রং বি রক্ষতি, ব্রহ্মচর্যের তপস্যা দিয়ে রাজা রাষ্ট্রের রক্ষা করে। রাজা যখন স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকে তখন রাষ্ট্রের রক্ষা হয়। দেশের রাষ্ট্রপ্রধান যদি ব্রহ্মচর্যে প্রতিষ্ঠিত থাকে তাহলে সেই দেশের উন্নতি হতে বাধ্য, কোন বিদেশী শক্তি সেই দেশকে কখনই দাবিয়ে রাখতে পারবে না। এখানে ব্রহ্মচর্য মানে মেয়ে থেকে দূরে থাকছে তা নয়, ব্রহ্মচারী মানে সে স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত। রাজা যখন রাজধর্মকে তপস্যা রূপে নিয়ে নিয়েছে সেই দেশ যে কোথায় পৌঁছে যাবে কেউ চিন্তাই করতে পারবে না।

আচার্যো ব্রহ্মচর্যেণ ব্রহ্মচারিণম্ ইচ্ছতে, আচার্যগণ নিজের ব্রহ্মচর্যের দ্বারা ব্রহ্মচারীর প্রত্যাশা করেন। এটা খুব মজার ব্যাপার, আগেকার দিনে প্রত্যেক বেদের আচার্য প্রত্যাশা করতেন আমার আশ্রমে যেন অনেক ব্রহ্মচারী শিষ্য আসে। ঠাকুর বলছেন, যে বাবুর বাড়ি নেই, বাগান নেই সেই বাবু কিসের বাবু, যে ভগবানের ঐশ্বর্য নেই সেই ভগবান কিসের ভগবান। আচার্যের কাছেও যদি ভালো ব্রহ্মচারী শিষ্য না আসে তাহলে তিনি কিসের আচার্য। এটা একটা সমস্যা, গুহায় তপস্যা করে করে সত্যি সত্যি বিরাট মুনি হয়ে গেছেন, কিন্তু তাঁর ভেতরে যে ঐশ্বর্য এসেছে সেটা যেন দেখতে পাওয়া যায়। এখানে এটাই বলছেন, যিনি আচার্য তিনি তাঁর ব্রহ্মচর্যের শক্তি, তাঁর তপস্যার শক্তি দিয়ে ব্রহ্মচারী শিষ্য পাওয়ার কামনা করেন। পরিষ্কার বক্তব্য হল, যে আচার্যের তপস্যা আর ব্রহ্মচর্যের শক্তি বেশি তাঁর কাছেই সবাই শিষ্য হওয়ার জন্য আসবে। ভেতরে আধ্যাত্মিক শক্তি যদি না থাকে তাঁর কাছে শিষ্য আসবে না।

ব্রহ্মচর্যেণ কন্যা যুবানং বিন্দতে পতিম্, একজন কুমারী কন্যার যে ব্রহ্মচর্যের শক্তি সেই শক্তি দিয়ে সে পতির কামনা করে। আগেকার দিনে বিয়ে দেওয়ার আগে পাত্র পক্ষ থেকে খোঁজ নেওয়া হত মেয়েটির স্বভাব কেমন, দেখতে কেমন। এখন এসব উঠে গেছে, সমাজও তাই অন্য রকম হয়ে গেছে। তবে এটা অবধারিত যে, কোন মেয়ের যদি ব্রহ্মচর্যকে আধার করে তপস্যা না থাকে তাহলে ওই মেয়েকে দিয়ে কখনই সংসার কার্য চলতে পারবে না। ব্রহ্মচর্যের তপস্যা থাকতেই হবে, শুধু মেয়ের তরফেই নয়, ছেলের তরফ থেকেও তপস্যা থাকতে হবে, তবেই বিবাহিত জীবন সার্থক হবে। এখানে বলছেন মেয়ে যদি ব্রহ্মচর্য তপস্যায় প্রতিষ্ঠিত না থাকে তাহলে তার ভালো স্বামী জুটবে না। শুধু মেয়ের দিক থেকেই নয়, ছেলেও যদি ব্রহ্মচর্যের তপস্যায় প্রতিষ্ঠিত না থাকে তাহলে তারও কপালে কোন দিন ভালো স্ত্রী জুটবে না। যদি পেয়ে যায় তাহলে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে চিড় ধরতে বেশি দিন লাগবে না।

সন্ন্যাসীকে যখন যে আশ্রমে থাকতে হয় সেই আশ্রম থেকে তাঁকে কিছু কাজের দায়ীত্ব দেওয়া হয়। আশ্রম থেকে যদি কোন কাজের দায়ীত্ব না দেওয়া হয় তাহলে সন্ন্যাসী কি মন খারাপ করে বসে থাকবে! কোন কাজ যদি না থাকে সন্ন্যাসীর তো এক মহান সুযোগ এসে গেল, এবার শুধু সে জপ-ধ্যান তপস্যা করে চুপচাপ নিজের ভেতরে শক্তি সঞ্চয় করতে থাকুক। কাউকে কিছু জানতেও দেবেন না, ভেতরে ভেতরে জপ-ধ্যান পড়াশোনা করে করে শুধু শক্তি সঞ্চয় করতে থাকবেন। একদিন তিনি নিজেই বোমা হয়ে ফাটবেন।

একটা খুব নামকরা ঘটনা আছে। অনেক দিন আগে ভারতের এক বিখ্যাত সেতার-বাদক যিনি তাঁর ষাট বয়সেও কোন public performance করেননি। ষাট বছর পার হয়ে যাওয়ার পর উনি প্রথম কোন public performanceএ বাজাতে এসেছেন। উনি সেতার বাজাচ্ছেন আর ওনার সাথে যিনি তবলায় সঙ্গত করতে এসেছেন উনি ইতিমধ্যে তবলায় বিশ্ব বিখ্যাত হয়ে গেছেন। সেতার বাদক প্রথমে আট মাত্রায় বাজাতে শুরু করেছেন। তবলা একটু এগিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল। উনি আস্তে করে তাঁর তবলচিকে বললেন ‘একটু সঙ্গে

সঙ্গে চলুন’! তবলা যিনি বাজাচ্ছিলেন তিনিই পরে এই ঘটনার স্মৃতিচারণ করেছিলেন। তিনি লিখছেন ‘ওই কথা বলার পর আমি বললাম, বাচ্চা ঘাবড়া গিয়া’। উনি সত্তর বছরের ছিলেন আর যিনি সেতার বাজাচ্ছেন তাঁর বয়স ষাট, তাঁকে বলছেন বাচ্চা ঘাবড়া গিয়া। উনি কিন্তু থামলেন না, তবলা এগিয়ে এগিয়েই বাজাচ্ছেন। তখন সেতার-বাদক আটের মাত্রটা ষোল মাত্রায় নিয়ে গেলেন। তখনও তবলা এগিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন তবলা সেতারকে লীড করছে। সেতার-বাদকদের কাছে এ ধরণের সঙ্গত খুব অপমানজনক মনে হয়। আবার তিনি তবলা বাদককে বললেন ‘সঙ্গে সঙ্গে চলুন!’ তবলা-বাদক কিছুই বলছেন না, উনি এগিয়ে এগিয়েই বাজিয়ে যাচ্ছেন। সেতার বাদক তখন যে রাগে বাজাচ্ছিলেন, সেটাকে বত্রিশ মাত্রাতে নিয়ে গেলেন, যদিও বাস্তবে ওই রাগকে বত্রিশ মাত্রায় বাজানো খুবই অসম্ভব মনে হয়, কিন্তু আশ্চর্যের যে তিনি সেটাকে বত্রিশ মাত্রাতেই নিয়ে চলে গেছেন। তবলার পণ্ডিতজীকে তবলা বন্ধ করে দিতে বাধ্য করলেন, সেতারের ওই দ্রুত লয়ের সাথে তবলার মাত্রাকে বাড়িয়ে আর মেলাতেই পারলেন না। রাতারাতি সেই সেতার বাদকের নাম সারা ভারতে ছড়িয়ে গেল। সন্ন্যাসীকেও এই বত্রিশ মাত্রাকে মাথায় রাখতে হবে, চুপচাপ শুধু শক্তি সঞ্চয় করতে যেতে হবে, যেদিন ফাটবে তাঁর ধারে কাছে তখন কেউ দাঁড়াতে পারবে না।

এখানেও ঠিক এই কথাটাই বলছেন *ব্রহ্মচর্যেণ কন্যা যুবানং বিন্দতে পতিম্*, সাধনা করে করে কন্যা এমন শক্তি তৈরী করছে যে সেই শক্তি দিয়ে সে তার উপযুক্ত স্বামী পাওয়ার ইচ্ছা করতে পারে। বিপরীত ভাবে ছেলেও যদি এই রকম তপস্যা করে সেও উপযুক্ত কন্যাকে স্ত্রী রূপে পাওয়ার ইচ্ছা করতে পারে। কিন্তু এতক্ষণ সব জাগতিক ব্যাপারে বলা হল। আসলটা পরেই বলছেন।

ব্রহ্মচর্যেণ তপসা দেবা মৃত্যুম্ অপাঘ্নত, দেবতারা ব্রহ্মচর্যের দ্বারা মৃত্যুকে জয় করেছেন। আমরা যদি আচার্য শঙ্করের কথানুসারে বলি তাহলে এটা আপেক্ষিক ভাবে অমৃতত্ত্ব নয়, এই মৃত্যুকে জয় করা মানে দীর্ঘকালীন একটা স্থায়ীত্ব। *ইন্দ্রো হ ব্রহ্মচর্যেণ দেবেভ্য স্বরাভরৎ*, স্বর মানে এখানে ঐশ্বর্য। ইন্দ্র, যিনি দেবতাদের রাজা, তিনি নিজের ব্রহ্মচর্যের তপস্যার শক্তি দিয়ে দেবতাদের জন্য ঐশ্বর্য নিয়ে এসেছেন। এখানে যে ব্রহ্মচর্য শব্দ বলা হচ্ছে, এই ব্রহ্মচর্য মানে নারী-পুরুষের কাম বর্জিত ব্যাপারে নিয়ে বলা হচ্ছে না। এখানে ব্রহ্মচর্য হল, আপনি নিজের জন্য জীবনের কিছু মূল্যবোধকে বেছে নিয়ে একটা পথ ঠিক করে নিলেন, বেছে নেওয়ার পর ঠিক করে নিলেন আমি সর্বদা এই মূল্যবোধের উপরই প্রতিষ্ঠিত থেকে এই পথ অনুসরণ করে চলব, এই পথে চলার জন্য আমি সব কিছু বিসর্জন দেব। তখনই তপস্যা শুরু হয়। যেমন মুসলমানরা দিনে পাঁচবার করে নমাজ পড়ছে, জীবনে একবার হজ করতে যাচ্ছে আর বছরে একমাস রোজা রাখছে, এটাই ব্রহ্মচর্যের তপস্যা। ইসলাম ধর্মে যত দিন নমাজ আর রোজা থাকবে তত দিন মুসলমান সমাজকে কেউ দাবাতে পারবে না। দেবতাদের যে এত ঐশ্বর্য, অসুররা যে ঐশ্বর্যকে হিংসা করে, মানুষ যে ঐশ্বর্যের কল্পনা করতে পারে না, এই ঐশ্বর্য দাঁড়িয়ে আছে শুধু ইন্দ্রের একার তপস্যার জন্য। এখানে শুরু করেছেন রাষ্ট্র থেকে, একটা দেশ কীভাবে সমৃদ্ধ হয়, সেখান থেকে শুরু করে একটার পর একটা বলে বলে এগিয়ে গিয়ে শেষ করছেন দেবতাদের ঐশ্বর্যে গিয়ে। মাঝখানে বললেন দেবতারা যে মৃত্যুকে জয় করেছে, অর্থাৎ দেবতারা যে অমরত্ব পেয়েছেন সেটাও এই ব্রহ্মচর্য তপস্যার দ্বারা। পরের দিকে হিন্দু চিন্তাধারা বিবর্তিত হয়ে হয়ে একটা জায়গায় এসে তপস্যাকে খুব উচ্চমানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তপস্যা মানে তাপ সৃষ্টি করা, যা কিছু তাপ সৃষ্টি করে সেটাই তপস্যা। আমাদের সবারই জীবনে কিছু না কিছু সমস্যা আছে। আপনি ঠিক করে নিন, সপ্তাহে একটা দিন আমি উপোস করব। মুসলমানরা যে এক মাস রোজা রাখে, আপনাকে এক মাস উপোস করতে হবে না, সপ্তাহের যে কোন একটা দিন দিনের বেলা আমি কিছু খাবো না, এটাই আমার ব্রত। এবার আপনি এক বছর দু বছর এই ব্রত পালন করে যান, একটা সময় এই তপস্যাই ফল দিতে শুরু করবে। প্রথম প্রথম কিছু না কিছু বিঘ্ন আসবে, শরীর খারাপ হবে, ডাক্তার ফতোয়া দিয়ে দেবে খালি পেটে থাকা যাবে না, বাড়ির লোক বলবে, সব কিছুতেই তোমার বাড়াবাড়ি। আপনারও মনে হবে এটুকু খেয়ে নেওয়া যেতে পারে।

উত্তরকাশীতে এক বৃদ্ধ সন্ন্যাসী ছিলেন তিনি রোজ গঙ্গা দর্শন করতে আসতেন। শেষের দিকে তিনি এতই অথর্ব হয়ে গিয়েছিলেন যে বিছানা থেকেও উঠতে পারতেন না। কিন্তু তাঁর দুজন শিষ্যের কাঁধে ভর দিয়ে

কোন রকমে গঙ্গা দর্শনে আসতেন। একজন সন্ন্যাসী একদিন তাঁকে বললেন ‘স্বামীজী! আপনি এখন বৃদ্ধ হয়ে গেছেন, এখন আর এসবের কী দরকার!’ শুনে তিনি প্রচণ্ড রেগে গেলেন ‘কী বলছেন আপনি! দুদিন পরে যে শরীর চলে যাবে তাকে তোয়াজ করার জন্য আমি আমার মায়ের দর্শন করা বন্ধ করে দেব!’ এটাই তপস্যার তেজ, আমি এই ব্রত নিয়েছি, এর সাথে আমি কোন পরিস্থিতিতেই আপোষ করতে পারি না। তপস্যা মানেই তাপ সৃষ্টি হবে। উপোসে সব থেকে বেশী তাপ সৃষ্টি হয়। কিন্তু হঠাৎ একদিন দেখলেন আপনার পাড়ার এক বন্ধু দাড়ি রাখতে শুরু করেছে। আপনি জিজ্ঞেস করলেন ‘কী ভাই! দাড়ি কামাচ্ছ না কেন?’ ‘আমার স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা, সন্তান যেন ঠিক ভাবে আসে তাই দাড়ি রেখেছি’। এটা কী কোন তপস্যা! ফাঁকিবাজি, ব্লেডের খরচ বাঁচাচ্ছে। তার থেকে যদি বলত আমার স্ত্রীর ভালোর জন্য, আমার ভাবী সন্তানের মঙ্গলের জন্য প্রত্যেক সোমবার সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত উপোস করছি, তখন বলা যেত যে হ্যাঁ এবার ঠিক ঠিক তপস্যা করছে। কিন্তু তা করবে না। গ্রামের মেয়েরাই যা এখনও একটু আধটু উপোস করে। প্রথমে যে কোন একটা ব্রত নিন, সেই ব্রতকে এবার পালন করতে থাকুন, তারপর দেখুন কী হয়। এগুলো কোন ভক্তিগ্রন্থের কথা নয়, এগুলোই বেদবাক্য, আর যে কোন হিন্দুর জন্য বেদবাক্য হল শেষ কথা। এই কথাই যদি কোন পুরাণে থাকত, অধ্যাত্ম রামায়ণ কিংবা গীতাতেও যদি থাকত তাহলে সেখানে প্রশ্ন করা যেত, কিন্তু বেদে যেটা বলা হয়েছে তার উপর কোন প্রশ্ন করা যাবে না, কোন অবস্থাতেই আপোষ করা যাবে না। আমরা যে কোন সংস্কারবশতঃ করছি তা নয়, যৌক্তিকতার দিক দিয়েও বেদবাক্যের সঙ্গে কোন আপোষ করা যাবে না।

আমরা প্রায়ই বলি শাস্ত্র প্রমাণ, গুরুর কথা মানতে হয়। কেন শাস্ত্র প্রমাণ বলা হয়, গুরুর কথা কেন মানতে হয়? এই ব্যাপারে বেদ কী বলছে আমরা দেখব। বেদ বাক্যকে কোন প্রশ্ন করা যাবে না, কারণ বেদের কথা ঋষিদের কথা। ঠিক এই ব্যাপারটাই বেদের একটি মন্ত্রে বলা হচ্ছে, ঋষির কথা কেন শুনতে হবে।

অক্ষেত্রবিৎ ক্ষেত্রবিদং হ্যপ্রাট্ স প্রৈতি ক্ষেত্রবিদানুশিষ্টঃ।
এতদ্বৈ ভদ্রম্ অনুশাসনস্যোত স্তুতিং বিন্দত্যঞ্জসীনাম্।।ঋ-১০/৩২/৭।।

সাধারণ অর্থে ক্ষেত্র মানে জমি বা ক্ষেত। গীতাতে যে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞর কথা বলা হচ্ছে সেখানে ক্ষেত্রের অর্থ যদিও ক্ষেত কিন্তু গীতাতে ক্ষেত্র মানে শরীর। আর যিনি ক্ষেত বা শরীরকে জানেন তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ। এই শরীর দিয়ে যত কর্ম করা হয় তার ফল এখানেই উৎপন্ন হয়। এই ক্ষেত্রকে যিনি জানেন তিনি অন্তর্যামী। গীতাতে ক্ষেত্র মানে শরীর, এই শরীরটা একটা ক্ষেতের মত যেখান চাষবাশ হচ্ছে, ফসল উৎপন্ন হচ্ছে, যেহেতু এই শরীর দিয়েই সব কর্ম হয় এবং কর্মফল উৎপাদন হয়, সেইজন্য শরীরকে বলছেন ক্ষেত্র। কিন্তু বেদে যখন ক্ষেত্র বলছেন তখন সেই ক্ষেত্র মানে সমগ্র ভূমি। *অক্ষেত্রবিৎ ক্ষেত্রবিদং হ্যপ্রাট্*, একজন লোক অজানা অচেনা বিদেশ ভূমিতে যাবে, তখন যে বিদেশে গেছে সে তার সঙ্গে কথা বলে। এটা খুবই সাধারণ ব্যাপার, যে কোন দিন দিল্লী যায়নি সে দিল্লী যাওয়ার আগে যে দিল্লী গেছে তার কাছে দিল্লীর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে। এবার বলছেন, *স প্রৈতি ক্ষেত্রবিদানুশিষ্টঃ*, যিনি ওই দেশে গেছেন তাঁর নির্দেশ ও কথাবার্তার উপর আধার করে সে সেই দেশে যাওয়ার প্রস্তুতি নেয়। *অনুশিষ্টঃ*, মানে যেমনটি তিনি নির্দেশ করেন।

এতদ্বৈ ভদ্রম্ অনুশাসনস্যোত স্তুতিং বিন্দত্যঞ্জসীনাম্, শাস্ত্রের নির্দেশ কোথায়? শাস্ত্রের নির্দেশ এখানেই। যে অচেনা অজানা জায়গার কথা কেউ জানে না, শাস্ত্র সেই জায়গার বর্ণনা দেয়। আমরা তিন ভাবে জীবন-যাপন করি। প্রথম, আমাদের মন, বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়র মাধ্যমে যত রকম তথ্য ভেতরে আসছে, আমরা সেই তথ্যানুসারে কাজ করে যাচ্ছি। কিন্তু আমরা জানি ইন্দ্রিয়গুলি সব সময় রাগ-দ্বেষ প্রেরিত হয়। রাগ মানে যে জিনিসকে ভালোবাসে আর দ্বেষ মানে যে জিনিসকে সে অপছন্দ করে। যেখানেই রাগ সেখানেই সে এগিয়ে যায়, যেখানে দ্বেষ সেখান থেকে সে সরে আসে। এভাবেই আমাদের জীবন এগিয়ে চলে। বুদ্ধিতে গিয়ে জিনিসটা অন্য রকম হয়ে যায়। যে শাস্ত্র বা বই আমি পড়েছি, যে ধরণের কথাবার্তা শুনে এসেছি সেখান থেকে আমার নিজস্ব একটা চিন্তাধারা তৈরী হয়, সেই অনুসারে আমি সব কিছুকে একটু বিচার করতে চাই, যদিও খুব বেশি বিচারে প্রবৃত্ত হই না। এর বাইরে আমরা যাকে শ্রদ্ধা করি, যার আদর্শ আমাদের ভালো লাগে তার কথা

মত আমরা চলি। যেমন কম্যুনিস্টরা কার্ল মার্ক্স লেনিনকে শ্রদ্ধা করে, তারা তাই তাঁদের কথা মত চলে। ইদানিং মাওবাদীরা বলছে শক্তির উৎস হবে বন্দুকের নল। পরে তারাই যখন শক্তিমান হয়ে গেল তখন তাদের নীচে যারা আছে তারা এখন ওই কথাগুলোই বলে। এভাবেই জীবন চলছে। কিন্তু জীবনের সিদ্ধান্ত সব থেকে ভালো কে দিতে পারেন? একজন হল আমাদের মন-বুদ্ধি, আরেকজন আমাদের মা-বাবা ও শিক্ষকরা আর সমাজের জ্ঞানীগুণীরা। কিন্তু এনারা জীবনের শুধু একটা দিককেই জানেন। মন-বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় অর্থাৎ আমাদের যে নিজস্ব বিচারধারা নিয়ে যখন চলছি তখন আমরা জীবনের একটা দিককেই দেখছি। যখন মা-বাবার কথামত চলছি তখন আবার জীবনের ব্যাপারে যে দিকটা আমার কাছে অজানা ছিল সেটা খুলে গেল, যখন শিক্ষকদের কাছ থেকে নির্দেশ আসতে শুরু করল তখন আরেকটা দিক খুলে গেল, এরপর একটা স্তরে এসে আমি জীবনের ব্যাপারে এগিয়ে গেলাম আমার মা-বাবা পেছনে পড়ে গেল, আমি এখন বেশি জানি তারা আমার থেকে কম জানে। তৃতীয় বড় বড় দার্শনিকরা জীবনের ব্যাপারে আরও বেশি জানেন। যেমন এ্যরিস্টটল, প্লেটো, সক্রেটিস এনারা বড় বড় দার্শনিক ছিলেন এনাদের কথা মত অনেকের জীবন চলেছে। কিন্তু জীবনের ব্যাপারে কে আমাদের ঠিক ঠিক শিক্ষা দিতে পারেন? যদি সঠিক ভাবে বিশ্লেষণ করা হয় তাহলে আমাদের মানবজীবনের আসল শিক্ষক কে হবেন? যিনি সবটাই জানেন তিনিই আমাদের জীবনের আসল শিক্ষক হবেন। ঠাকুর উপমা দিচ্ছেন, একজন বাহ্যে গিয়েছিল সেখান থেকে এসে বলছে গাছে একটা লাল রঙের গিরিগিটি দেখেছি। আরেকজন বলল লাল কেন হবে আমি দেখলাম নীল রঙের। আরেকজন বলছে সবুজ রঙ। সবাই মিলে সেই গাছের কাছে গেছে। গাছের তলায় একজন লোক সব সময় থাকে। সে এদের বিবাদ শুনে বলছে – আমি এই গাছের তলায় থাকি আমি এই গিরগিটিকে জানি, এটি আসলে বহুরূপী, কখন লাল রঙ, কখন নীল কখন সবুজ রঙ ধারণ করে। ঠাকুর আবার আরেকটি উপমা দিচ্ছেন, কয়েকজন অন্ধ মিলে হাতীর কেউ কান ধরেছে, কেউ শূর ধরেছে কেউ হাতির পা ধরেছে। যে কান ধরেছে সে বলছে হাতি কুলোর মত, যে হাতির পা ধরেছে সে বলছে কুলোর মত হতে যাবে কেন হাতি থামের মত, যে শূর ধরেছে সে হাতিকে অন্য ভাবে বর্ণনা করছে। এখানে কে ঠিক? যে সবটাকে দেখেছে সেই ঠিক। শ্রেষ্ঠ আচার্য কে হবেন? যিনি সবটাই জানেন।

এখানে এসে এবার কিন্তু লড়াই লেগে যাবে। প্লেটো, সক্রেটিস আছেন আবার অন্য দিকে যীশুও আছেন, এনাদের মধ্যে কার কথা ঠিক? এই জায়গাতেই শুরু হয় কঠিন লড়াই। এটা সত্য যে, আমাদের মন বুদ্ধি দিয়ে জীবন চলবে না। ছোট্ট বাচ্চা মেয়েকে তার শিক্ষক হয়ত কিছু ভুল বলেছে, সেই ভুলটা যদি মা ঠিক করে দেয় মেয়েটি মাকে মুখের উপর বলে দেবে 'তুমি আমার টীচারের থেকে বেশি জান নাকি!' পাকিস্তানের আবদুল সালাম খুব নামকরা পদার্থ বিজ্ঞানী। নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পর একটা সাক্ষাৎকারে ওনাকে জিজ্ঞেস করা হল নোবেল প্রাইজ পেয়ে কেমন লাগছে। উনি বলছেন 'আমার পাঁচ বছরের মেয়ে আমাকে ধমকায় 'তুমি কিছু জানো না বলে'। ওর বিজ্ঞানের টীচার একটা ভুল বলেছিল সেটাকে ঠিক করতে গিয়ে আমাকে মেয়ের কাছে ধমক খেতে হয়েছে 'তুমি আমার টীচার থেকে বেশী জান!' উনি তাই বলছেন 'আমার মেয়েই আমাকে মানে না, এই সম্মান পেয়ে আমার কী হবে!' ছোট বাচ্চার কাছে তার টীচার সব জানে, আরও যখন ছোট থাকে তখন তার মা সব কিছু জানে। যত সে বড় হতে থাকে তত সে বুঝতে পারে এর বাইরেও কিছু আছে। আমি সব কিছু জানি, আমার বাড়ি লোকেরা সব কিছু জানে এই ব্যাপারটা কিছু দিনের মধ্যে কেটে যায়। তখন সে ধীরে ধীরে একজন শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের দিকে এগোতে শুরু করে। শিক্ষকদের কাছে গিয়েও গোলমাল হয়ে যায়, কে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক বার করতে গিয়ে অনেক সমস্যা হয়ে যায়। যারা বিজ্ঞানের লোক তাদের কাছে বিজ্ঞানীরাই শ্রেষ্ঠ শিক্ষক, যারা দর্শনের লোক তারা দর্শনের একটা বিশেষ মতবাদে আকৃষ্ট হয়ে যায়, তারপর তারা সেই দর্শনের মতবাদের শ্রেষ্ঠ আচার্যদের কথাকে অনুসরণ করতে থাকে। ঠিক তেমনি যাঁরা ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার দর্শনকে গ্রহণ করেন তাঁরা তখন একজন আচার্যকে বেছে নিয়ে বলে দেন ইনি শ্রেষ্ঠ আচার্য। কিছু লোকের কাছে যীশু শ্রেষ্ঠ শিক্ষক আবার কিছু লোকের কাছে প্লেটো শ্রেষ্ঠ। কিন্তু কে শ্রেষ্ঠ, এই শ্রেষ্ঠত্বকে কীভাবে নিরুপণ করা হবে? এখানে বলছেন, বেদ এই মন্ত্রে বলে দিচ্ছে যিনি জীবনকে পুরোটা দেখেছেন।

আমার আপনার সাথে একজন বড় চিন্তাবিদের পার্থক্য হল – we read one word or one line at a time। জীবনের যে পুস্তক আমরা একবারে তার একটা শব্দ বা একটা লাইনে পড়তে পারি, কিন্তু একজন বড় চিন্তাবিদ সেই পুস্তকের একটা পাতা একবারে পড়ে নেন আর আধ্যাত্মিক জগতের যিনি শ্রেষ্ঠ আচার্য তিনি একসাথে পুরো বইটাকেই পড়ে নেন। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন হতে পারে, সত্যিই কি তারা একবারে পুরোটাই জানতে পারেন? এখানে এসে অনেক রকম বিচার্য বিষয় এসে যায়। প্লেটো শ্রেষ্ঠ নাকি যীশু শ্রেষ্ঠ? এই জায়গাতে এসে ওনারা অনেক রকম বিচার নিয়ে আসেন। প্লেটো শেষ পর্যন্ত নিজের চিন্তাশক্তির উপর নির্ভর করে এসেছেন। যিনি বড় চিন্তাবিদ তিনি কিছু জিনিসকে যুক্তি দিয়ে হয় সঠিক বলে প্রমাণ করে দেবেন নয়তো ভুল প্রমাণ করে দেবেন। সুতরাং intellect cannot be the ultimate guide of truth। এবার আমরা যদি বলি যীশুর যে দিব্যদর্শন গুলো হয়েছিল সেগুলোর উপর নির্ভর করে কি আমরা যীশুকে শ্রেষ্ঠ বলে মেনে নিতে পারি? ওগুলো তাঁর মনের ভুলও হতে পারে, তাঁর পাগলামো হয়ে থাকতে পারে। এই জায়গাতে এসে এনারা প্রথম যে বিচার্য বিষয়টি নিয়ে আসেন তা হল self interest, দেখা যায় দার্শনিক, কবি, সাহিত্যিক বা ঋষিদের কোন ধরণের ব্যক্তিগত স্বার্থ থাকে না। আমার প্রচুর টাকা-পয়সা হবে, আমার খুব নাম হবে, আমার অনুগামীর সংখ্যা বিরাট হবে, এই ধরণের বাসনা তাঁদের কারুরই থাকে না, সেটা যেমন প্লেটো, সক্রেটিসের ক্ষেত্রে সত্য তেমন যীশুর ক্ষেত্রেও সত্য। জগতে নাম-যশ, টাকা-পয়সার জন্য কোন দার্শনিক, সাধু, কবির কোন অবস্থাতেই দৌড়ান না। কিন্তু যেটা সাধু মহাত্মাদের ক্ষেত্রে দেখা যায়, তাহল এনারা সম্পূর্ণ ভাবে নিঃস্বার্থপর হন, এমনকি প্রয়োজনে অপরের কল্যাণে নিজের শরীরকেও বিসর্জন দিয়ে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকেন। সক্রেটিসকে তাঁর শিষ্যরা যখন জেল থেকে লুকিয়ে নিয়ে যেতে চাইছেন তখন তিনি তাঁর শিষ্যদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে দিচ্ছেন, বলছেন I will not compromise with my principles, I am established in truth। দ্বিতীয় আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হল চরিত্রের দৃঢ়তা। এনাদের চরিত্র পুরোপুরি স্বচ্ছ। ঠাকুর বলছেন সাধুকে দিনে দেখবি রাতে দেখবি তবে গিয়ে সাধুকে বিশ্বাস করবি। সক্রেটিস, যীশুর মত মহাত্মাদের মধ্যে এই ধরণের চরিত্র দেখা যায়।

বড় চিন্তাবিদ আর আধ্যাত্মিক পুরুষ যে কথাগুলো বলেন, সেই কথা দিয়ে দুজনের মধ্যে পার্থক্যটা ধরা পড়ে। তিনি কি শুধু এই দৃশ্যমান জগতকে নিয়ে কথা বলছেন, নাকি এই দৃশ্যমান জগতের বাইরে যে অন্য জগৎ আছে তার ব্যাপারেও বলছেন? যীশু বা শ্রীরামকৃষ্ণ বা বেদ উপনিষদ এই জগতের কথাও বলছেন তার সাথে তাঁরা সেই জগতের কথাও বলছেন যে জগতকে ইন্দ্রিয় দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে জানা যায় না। এই জায়গাতে এসে সক্রেটিস আর যীশুর মধ্যে পার্থক্য হয়ে যায়। আর এই পয়েন্টে এসে মানুষের মধ্যে দুটো বিভাজন হয়ে যায়। একটা অংশ নিজেদের যুক্তিবাদী বলে পরিচয় দেন। যুক্তিবাদীরা বলে আমরা তোমার ইন্দ্রিয়াতীত জগতকে বিশ্বাসও করি না আর জানতেও চাই না। আধ্যাত্মিক পুরুষের এখানে কিছু করার থাকে না, ঠিক আছে বাপু তুমি তোমার বিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে যাও, তুমি যদি বিশ্বাস না কর, না জানতে চাও তাতে আমার তো কিছু করার নেই। এই কারণে ধর্মের ব্যাপারে কখন ধর্মান্তর হতে পারে না, তাঁরাও কাউকে জোর করে নিজের মত চাপিয়ে দেন না। এই ব্যাপারে সক্রেটিস আর যীশুকে নিয়ে খুব ভালো তুলনা করা যেতে পারে। সক্রেটিসের মধ্যে যে মহৎ গুণ ছিল তার সমস্ত গুণ যীশুর মধ্যেও ছিল। কিন্তু সক্রেটিস কখনই ইন্দ্রিয়াতীত জগতের কথা বলছেন না, যীশু বলছেন। তার মানে যীশুর কাছে দুটো জগতের খবরই পাওয়া যাব। যারা বলবে ওই জগতের ব্যাপারে আমার কোন আগ্রহ নেই, তাহলে ভাই তোমার জন্য যীশু নয়। এই জায়গাতে এসে কেউ কাউকে ধর্মান্তরিত করতে পারে না। তাহলে তো গোটা পৃথিবীটাই ধর্মীয় পতাকার নীচে চলে যেত। এখানে আবার আরেকটি ব্যাপার আছে, যদিও ব্যাপারটা একটু বিতর্কিত কিন্তু সত্য। একজন দার্শনিকের যে জনপ্রিয়তা, তাঁর যে খ্যাতি এখন তিনি পাচ্ছেন, এই খ্যাতি সময়ের সাথে সাথে কমতে থাকে। কোন কারণে যদি খ্যাতি অনেক উপরে উঠে যায় কিন্তু আবার নীচে পড়ে যাবে। কিন্তু একজন ঋষি বা অবতার পুরুষের জনপ্রিয়তা, খ্যাতি সময়ের সাথে সাথে উপরের দিকে উঠতেই থাকে। নিজের সময়ে যীশুর যে পরিচিতি ছিল সেই তুলনায় সক্রেটিস তাঁর নিজের সময়ে অনেক বেশি পরিচিত ছিলেন। দু হাজার বছর পরে

সক্রেটিসের নাম শুধু টেক্সট বুকে থেকে গেছে আর যীশুর নাম সবার ঘরে ঘরে ঢুকে গেছে। সক্রেটিসের নামে লোকেরা ধর্মীয় নির্যাতন সহ্য করবে না, কিন্তু যীশুর নামে সহ্য করবে। সক্রেটিসের নামে নিজের জীবনকে কেউ উৎসর্গ করবে না, কিন্তু যীশুর নামে উৎসর্গ করে দেবে। আপনি তখন বলতে পারেন, কম্যুনিস্টরাও তো মার্ক্সের নামে, লেনিনের নামে করছে। ঠিকই, কিন্তু মার্ক্সের নামে কেউ জীবন উৎসর্গ করে না, সবাই পেটের দায়ে করে। কিছু কিছু কম্যুনিস্ট নেতা আছেন যাঁরা নিজের সব কিছু পার্টির কাজে ঢেলে দিয়েছেন, কিন্তু সেখানে একটা ইমোশান জড়িয়ে আছে। মার্ক্সের জনপ্রিয়তা বাড়ছে না কমছে এর বিচারের জন্য আমাদের কম করে পাঁচশ বছর দিতে হবে। মানব ইতিহাসে একশ বছর বিচারের জন্য কিছুই নয়। মানব জীবনের ইতিহাসে একটা জিনিসকে বিচারের জন্য কম পক্ষে পাঁচশ বছর দিতে হবে। ঐ পাঁচশ বছরের ইতিহাসে জনপ্রিয়তা বাড়ছে না কমছে। ওখানে গিয়ে ধরা পড়ে যায় এটা আধ্যাত্মিক দর্শন নাকি শুধু কোন দার্শনিক মতবাদ। এখানে এসে একজন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক আর একজন সামান্য ঋষির মধ্যে পার্থক্য ধরা পড়ে যায়।

এতক্ষণ আমরা যে আলোচনাটা করলাম ঠিক এই কথাই এই মন্ত্রে বলা হচ্ছে *অক্ষেত্রবিৎ ক্ষেত্রবিদং*। আপনি কি ইন্দ্রিয়াতী জগতের কথা জানতে চাইছেন, আপনি কি জানতে চাইছেন মন-বুদ্ধির পারে কি আছে? তাহলে আপনাকে এমন লোকের কাছে যেতে হবে যিনি ওই জগতকে দেখেছেন বা ওই জগতের ব্যাপারে ভালো জানেন। তাই না, শুধু জীবনের ব্যাপারেও যদি আপনাকে জানতে হয় তাহলেও আপনাকে তাঁর কাছেই যেতে হবে যিনি সবটাকেই জানেন। কে তিনি, যিনি সবটাকে জানেন? একমাত্র একজন ঋষিই সবটা জানেন। এর আগে আমরা যে কয়েকটি পয়েন্ট নিয়ে আলোচনা করলাম, ধীরে ধীরে বুদ্ধির যত বিকাশ হচ্ছে তত তার বিচার বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা বাড়ছে তখন সে দেখছে there are some world masters who are really capable of talking about world। তাঁরা কারা? তাঁরাই দার্শনিক। দার্শনিকদের যখন বিচার করতে যাবেন তখন কিছু শর্ত আরোপ করে দেখতে হবে। প্রথমে আসবে নিঃস্বার্থপরতা, দ্বিতীয় আসবে চরিত্র আর আদর্শে দৃঢ়তা। এইভাবে বিচার করতে করতে দেখা যাবে সক্রেটিস হলেন সব থেকে শ্রেষ্ঠ দার্শনিক, সক্রেটিস সত্যিই just like a prophet ছিলেন। কিন্তু যীশুর সাথে সক্রেটিসের পার্থক্য হয়ে যায় knowledge of the other worldএর জায়গায় এসে, যেটা সক্রেটিসের কাছে ছিল না, আর এই ব্যাপারে তাঁরও কোন আগ্রহ ছিল না। সক্রেটিসের তাই একটা দিক আসছে, দ্বিতীয় দিকটা আসছে না। প্রশ্ন উঠতে পারে দ্বিতীয় দিকটার খবর জানার কি খুব প্রয়োজন আছে? জগতের বেশির ভাগ লোকের পক্ষে জানার প্রয়োজন না থাকতে পারে, কিন্তু কিছু মানুষের কাছে এই দ্বিতীয় দিকটাকে জানাটা খুব জরুরী। যার জীবনে সব কিছু করা হয়ে গেছে, নিজের ইচ্ছা মত যা করার ছিল সব করা হয়ে গেছে। তারপর ভেতর থেকে এমন একটা ইচ্ছা জেগে ওঠে, অন্তরাত্মা এমন একটা উচ্চ দিব্য জিনিস পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে যেটা এই জগৎ থেকে সে কখনই পেতে পারবে না।

কার্ল জুঙ খুব বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী ছিলেন। যদিও উনি ফ্রয়েডের অনুগামী ছিলেন কিন্তু পরে ফ্রয়েডের মতের সঙ্গে বিরোধ হওয়াতে তিনি সেখান থেকে সরে আসেন। ফ্রয়েড আর কার্ল জুঙের একটা কাহিনী আছে। একবার একটি মেয়ে ওনাদের কাছে এসেছেন। মেয়েটির মানসিক সমস্যা ছিল। ফ্রয়েড সব শুনে মেয়েটির সমস্যাকে যৌন সমস্যাতে নিয়ে চলে গেলেন। এমনিতেও ফ্রয়েড সব কিছুকে টেনে সেক্সে নিয়ে যেতেন, এখানেও তাই করেছেন। কার্ল জুঙ দেখলেন ব্যাপারটা ঠিক তা নয়, মেয়েটির অন্য কোথাও কিছু সমস্যা আছে, যেটা কেউ ধরতে পারছে না। উনি একটা একটা ঘটনাকে বিচার করতে করতে দেখলেন, মেয়েটি যখন তিন চার বছরের ছিল সেই সময় ওদের বাড়ির কাছে একটা চার্চ ছিল। মেয়েটির মা চার্চে গিয়ে প্রার্থনা সঙ্গীতাদি শুনত, মেয়েটিও মায়ের সাথে চার্চে গিয়ে সঙ্গীতকে উপভোগ করত। মেয়েটি এখন যেখানে থাকে সেখানে ধারে কাছে কোন চার্চ নেই। কার্ল জঙের মাথায় হঠাৎ মনে হল, মেয়েটিকে যদি আবার চার্চে পাঠানো যায় তাহলে সে হয়তো ঠিক হয়ে যেতে পারে। উনি সঙ্গে সঙ্গে বললেন, তুমি রোজ চার্চে যাওয়া শুরু কর আর প্রত্যেক দিন চার্চের সঙ্গীতে অংশ নাও। যেতে শুরু করে দেওয়ার কিছু দিনের মধ্যে মেয়েটি স্বাভাবিক হয়ে গেছে। এরপর থেকে ধীরে ধীরে কার্ল জঙ ফ্রয়েডের কাছ থেকে সরে এলেন। এরপর উনি লিখলেন

Modern Man in Search of Soul, কার্ল জুঙের খুব বিখ্যাত বই। তিনি উপলব্ধি করলেন ফ্রয়েডিয় দর্শনে কিছু গোলমাল আছে, ফ্রয়েডিয় দর্শন কখনই পূর্ণাঙ্গ দর্শন হতে পারে না। কারণ এমন এমন অনেক মানুষ সত্যিই আছেন যাঁরা বাস্তবিক আত্মানুসন্ধানেই শুধু নিজেকে ব্যপ্ত রাখতে চান। কিছু মানুষ আছেন যাঁরা সত্যি সত্যি এই জগৎ থেকে কোন কিছুই প্রত্যাশা করেন না, তাঁদের কাছে একটাই প্রত্যাশা আমার কী করে আত্মজ্ঞান হবে, আত্মাকে আমি কীভাবে জানতে পারবো। এখন এই মানুষটি কার কাছে যাবেন? এই লোকটির কথা না হয় আমরা ছেড়ে দিচ্ছি। পৃথিবীর সাতশ কোটি লোকের মধ্যে একজন লোকও যদি বলে আমার টাকা লাগবে না, আমি স্ত্রী চাই না, সাম্রাজ্য চাই না, আমি এর থেকে আরও উচ্চ জিনিস চাইছি। এই লোকটিকে নিয়ে আমরা দুটো জিনিস করতে পারি, হয় তাকে পাগলা গারদে পুরে দেব, নয়তো ঠাকুরের মত লোকের কাছে পাঠিয়ে দিতে পারি। ঠাকুরের মত লোকের কাছে গিয়ে সে বলবে, আমি তো এনার মত লোককেই খুঁজে বেড়াচ্ছি। ঠাকুরকে বলবে, আপনি আমাকে ওপারের কথা বলুন। তখন কি হবে - *অক্ষেত্রবিৎ ক্ষেত্রবিদং*। এই কটি জিনিস, মুক্তি, বন্ধন, পুনর্জন্ম, স্বর্গ, নরক, কর্ম, কর্মফল এই জিনিসগুলো শাস্ত্র ছাড়া জানা যায় না। এগুলোই ওপারের জিনিস। ওপারের জিনিস যদি হয়, তাহলে যাঁর ওপারের জ্ঞান আছে তাঁর কাছে থেকে এই জিনিসগুলো জানা যাবে। কোনটা শাস্ত্রের কথা আর কোনটা শাস্ত্রের কথা নয় আমরা জানি না। লোককে কিছু দিনের জন্য বোকা বানাতে পারবে, কিন্তু সময় এমন একটা জিনিস যে সময়েই নকল যেটা সেটা হারিয়ে যাবে আর আসলটাই পড়ে থাকবে। এই পৃথিবীর মাটিতে খোসা সমেত ফল দিন, কিছু দিন পরে দেখুন খোসা মাটি হয়ে গেছে আর বীজটা আস্তে আস্তে বৃক্ষ হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। প্রকৃতি কখনই ফাঁকিবাজিকে বেশি দিন চলতে দেবে না। শুধু খোসা যদি মাটির সংস্পর্শে আসে খোসাকে প্রকৃতি মাটি বানিয়ে দেয়। যদি সার থাকে তাহলে তাকে সেই মাটি বৃক্ষ বানিয়ে দেয়। মা প্রকৃতির এটাই স্বভাব। ধাপ্পাবাজিকেও প্রকৃতি গিলে নেয়। আমরা আম, জাম, কাঠাল, লিচুর ভেতরের বস্তুটা নিয়ে নিই আর বীজটা ফেলে দিই। পৃথিবী ঠিক উল্টো করে, আমরা যেটাকে ফলের সার মনে করি সেটাকে মাটি বানিয়ে দেয় আর বীজকে গাছ বানিয়ে দেয়। যদি একজন ঋষি সত্যকে বলে থাকেন সেই ঋষির কথাকে প্রকৃতি দাবাতে পারবে না। আজ কিংবা কাল ঋষির কথাই বেদবাক্য হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। শুধু আধ্যাত্মিক সত্যেই নয়, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, রাজনীতি যে কোন বিষয়ের উপর যেটা সত্য সেটাকে কখনই দাবিয়ে রাখা যায় না। চীন দেশে এত বছর ধরে ধর্ম অনুশীলনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা ছিল, কিন্তু যেদিন থেকে এই নিষেধাজ্ঞা সরিয়ে দেওয়া হয়েছে দেখা গেল মানুষ আগে যেমন ধার্মিক ছিল এখনও সেভাবেই ধার্মিক আছে। রাশিয়াতেও একই জিনিস হল। গত পঞ্চাশ বছর মানুষকে দাবিয়ে রাখা হল, তারপর আবার সবাই চার্চে যাওয়া শুরু করে দিল। কেন? ওপারের কথা জানার ব্যাপারে মানুষের ভেতরে একটা চিরন্তন ক্ষুধা আছে। এই ক্ষুধাকে নিবৃত্ত করার জন্য মানুষ কার কাছে যাবে? *অক্ষেত্রবিৎ ক্ষেত্রবিদং*।

এতদ্বৈ ভদ্রম্ অনুশাসনস্যোত স্রুতিং বিন্দত্যঞ্জসীনাম্, শাস্ত্রের কথা, ঋষিদের কথার এটাই আশীর্বাদ স্বরূপ যে, এই কথাগুলো আমাকে লক্ষ্যের দিকে সরল পথে তুলে দেয়। ঠাকুর বলছেন, একজন পুরী যাবে বলে বেরিয়েছে, যেতে যেতে যদি কখনও সে ভুল পথে চলে যায় তখন ঠিক কেউ না কেউ এসে তাকে বলে দেবে পুরীর পথ উত্তর দিকে নয়, দক্ষিণ দিকে। গুরু আমাদের ঠিক তাই করে দেন, উনি আমাদের ঠিক পথটা দেখিয়ে দেন। তার আগে আমরা কি করছিলাম? আমরা আধ্যাত্মিক অভিযানে এগিয়ে চলছিলাম ঠিকই এতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু ঠিক ঠিক পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম না। যদি ঠিক পথে থাকিও তাও মাঝে সাঝে আমাদের গোলমাল লেগে যাবে। গুরু কে? যিনি ওপারের খবর জানেন, শুধু জানেনই না, ঠিক ঠিক জানেন, কীভাবে ওপারের খবর জানা যেতে পারে সেটাও তিনি জানেন। তিনি আমাদের ঠিক পথে তুলে দেন। শাস্ত্রের এটাই কাজ, শাস্ত্র আমাদের সঠিক পথের খবরটা বলে দেয়। কোন পথের খবর? আধ্যাত্মিক পথের খবর।

বেদ আমাদের প্রধান শাস্ত্র। বেদের কথাকে বিশ্বাস কেন করবে? কারণ নিজের মনকে বিশ্বাস করা যায় না, আশেপাশে যাঁরা আছেন তাঁদের পুরো ভরসা করা যায় না। এরপরেই আসে Philosophers or The Masters, শেষ পর্যন্ত আমাদের কোন একজন দার্শনিক বা কোন একজনকে নিতে হবে যাঁকে সামনে রেখে

আমাকে চলতে হবে। আমাকেই ঠিক করতে হবে আমার গুরু কে হবেন। শোক, দুঃখ, বেদনা আর চোখের জল আমাদের জীবনের চিরসঙ্গী। জীবনে আমাদের অনেক আশা আকাঙ্খা থাকে, বেশির ভাগ আশা আকাঙ্খা মৃত্যুর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত অপূর্ণই থেকে যায়, সেই অপূর্ণতার জন্য কত চোখের জল ফেলতে হয়। অনেক কষ্ট করে যে জিনিসটা সংগ্রহ করেছি, যাকে ভালোবেসেছি, সেই বস্তু ও মানুষটিও এক সময় জীবন থেকে হারিয়ে যাচ্ছে, তার জন্যও কত চোখের জল ফেলতে হয়। আমি আর চোখের জল ফেলতে চাই না, এই শোক, দুঃখ, বেদনা থেকে বেরিয়ে এসে আমি একটা শান্তির জীবন পেতে চাইছি। বিজ্ঞানীর কাছে গিয়ে যদি বলি, আমার জীবনে অনেক কষ্ট আপনি কি আমার কষ্টটা লাঘব করতে পারবেন? বিজ্ঞানী বলবেন, আমার তো সে রকম উপায় জানা নেই, তবে হ্যাঁ চিকিৎসা বিজ্ঞানে কিছু কিছু ড্রাগস আছে যেগুলো নিয়মিত সেবন করলে তোমার মস্তিষ্কটা একটু ঠাণ্ডা হবে। এবার আমি যদি আধ্যাত্মিক জ্ঞানসম্পন্ন পুরুষের কাছে গিয়ে আমার কষ্ট লাঘবের উপায়ের কথা জানতে চাই, তখন তিনি বলবেন, আমার কাছে উপায় আছে। বেদেই একটি মন্ত্রে বলছে *বেদাহমেতং পুরুষং*, আমি সেই পুরুষকে জেনেছি, যাঁকে জানলে মানুষ অমৃতত্ব লাভ করে। অমৃতত্ব লাভ করা মানেই, শোক আর মোহের পারে চলে যাওয়া। যিনি শোক মোহের পারে না গিয়ে থাকেন তাহলে তিনি কি করে জানবেন কিভাবে শোক মোহের পারে যাওয়া যায়! তাহলে যাঁরা এখানে সেখানে শাস্ত্রের কথা বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছেন তাঁরা কি সবাই শোক মোহের পারে চলে গেছেন, যদি না গিয়ে থাকেন তাহলে তাঁরা কি নিয়ে লেকচার দিচ্ছেন। আগেকার দিনে কেউ যখন কেদারবদ্রী যেত তখন সে আশেপাশের গ্রামে খোঁজ করত এর আগে কেউ কেদারবদ্রী গেছে কিনা। খোঁজ নিয়ে দেখা গেল তিরিশ চল্লিশ বছর আগে কেউ একজন গিয়েছিল এখন সে মারা গেছে। কিন্তু তার ছেলেরা আছে, তারা তাদের বাবার থেকে কেদারবদ্রীর গল্প শুনেছে, তাদের কাছ থেকেই সে সব শুনে নিয়ে যাত্রা করত। যারা শাস্ত্রের কথা বলছেন তাঁরাও এই ছেলেদের মত।

বেদের মাহাত্ম্য ঠিক এই মন্ত্রেই বলে দিচ্ছেন, বেদ ওপারের সব খবর বলে দেয়। ওই জগতের প্রভাব এই জগতে কিভাবে বোঝা যায়? প্রথম যেটা বোঝা যায় তাহল শোক আর মোহ থেকে বার করে নিয়ে আসে। দ্বিতীয়, আনন্দে পরিপূর্ণ করে দেবে। অনেকে বলেন, দুঃখ তো হতেই থাকে, দুঃখ তো যাচ্ছে না। দুঃখ সবারই হয়, মহাভারত, ভাগবত শুনে আমাদের মনে হবে শ্রীকৃষ্ণের কোন দুঃখ ছিল না, কিন্তু না, শ্রীকৃষ্ণেরও দুঃখ ছিল। বাল্মীকি রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্র সীতার জন্য কীভাবে চোখের জল ফেলতেই থেকে গেছেন। ছোটভাই লক্ষ্মণ বোঝাচ্ছেন 'দাদা! আপনি কেন এত কাতর হচ্ছেন। কিছু মনে করবেন না, আপনার কাছ থেকে যে কথা শিখেছি সেই কথাই আপনাকে বলছি'। একবার দুবার নয়, শ্রীরামচন্দ্রকে অনেকবার লক্ষ্মণকে সামলাতে হয়েছে। হা হুতাশ করে বলছেন 'দেখো ভাই! জগতের যত সুখভোগ ভরতেই ভোগ করতে পারছে, আর আমার কি দুর্ভাগ্য! আমাকে কিনা জঙ্গলে পড়ে থাকতে হচ্ছে'। এই ধরণের বিলাপ তিনি বহুবার করছেন আর লক্ষ্মণকে এসে দাদাকে বোঝাতে হচ্ছে। সীতার অপহরণ হতেই শ্রীরামচন্দ্র হাউ হাউ করে কাঁদছেন। লক্ষ্মণ আবার এসে সামলাচ্ছেন 'দাদা আপনি একজন বীরপুরুষ! সারা জীবন আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করে এসেছি। আপনি এভাবে বিহ্বল হয়ে হা হুতাশ করবেন না'। বাল্মীকি ছিলেন সত্যিকারের কবি, তিনি সঠিক চিত্রটা এঁকে দিয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণের ক্ষেত্রে এসে এই সঠিক চিত্র অঙ্কন করার জন্য বাল্মীকির মত কবি ছিলেন না। সংসারে যিনি থাকবেন, সাধারণ মানুষই হোক আর অবতার পুরুষই হোন, অনবরত তাঁর জীবনে সমস্যা লেগেই থাকবে। তাহলে ধর্ম তাঁকে কি শিক্ষা দিচ্ছে? ধর্ম বলে দেয় সমস্যা আসবে, ধাক্কা আসবে, চোখে জল আসবে তার সাথে এটাও শিক্ষা দিয়ে দেয় কত তাড়াতাড়ি তুমি এগুলো থেকে নিজেকে ফেরত নিয়ে আসতে পারবে। একটা স্প্রিংকে টেনে ছেড়ে দেওয়ার পর কত তাড়াতাড়ি নিজের অবস্থায় স্থিত হওয়া দেখে বোঝা যায় স্প্রিংএর সম্প্রাসারন ও সঙ্কোচন ক্ষমতার জোরটা কেমন। শাস্ত্রের কথাকে যাঁরা অবলম্বন করে চলছেন তাঁদের সাথে সাধারণ লোকের এটাই পার্থক্য। সাধারণ লোকেরা হল স্প্রিং, স্প্রিংএর মধ্যে বেশি ওজন দিয়ে দিলে স্প্রিংটা তার হয়ে ঝুলে থাকবে। যাঁরা শাস্ত্রের কথা শুনে ধর্মের পথে আছেন তাঁরা শোক দুঃখ এলে কিছুক্ষণ ঝুলে আবার সোজা হয়ে যাবেন। পাওয়ারফুল স্প্রিং একটু নাড়ানো যাবে না। ধর্মের এটাই কাজ it pulls you back towards centre of gravity। আমার আসল যে অস্তিত্ব, যেখানে আমার আমিত্বটা রয়েছে ধর্ম

আমাদের সেখানে টেনে নিয়ে বসিয়ে দেয়। যাদের মধ্যে এই ভাব নেই, তারা ওর মধ্যেই পড়ে থাকে, ওর মধ্যেই চোখের জল ফেলতে থাকে। *অক্ষেত্রবিৎ ক্ষেত্রবিদং*, মন্ত্রের এটাই বক্তব্য, যদি জীবনে শান্তি চাও তাহলে যাঁরা ক্ষেত্রবিৎ, যাঁরা ঋষি তাঁদের কথা শুনে চলতে হবে। যদি ওপারের কথা জানতে চাও, আধ্যাত্মিক সত্যকে জানতে চাও তাহলে ক্ষেত্রবিৎ যাঁরা তাঁদেরই কথা শুনতে হবে। আপনি বলবেন শাস্ত্রের কথা মত চললে আমার কি টাকা-পয়সা হবে? পুরো শাস্ত্র তো এই কথাই বলছে, তুমি যদি নিজের মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পেরে যাও তাহলে তো তোমার এমনিতেই টাকা-পয়সা হবে। দ্বিতীয়তঃ, শাস্ত্র তোমাকে টাকা-পয়সা দিয়ে বিল গেটস্ নাও বানিয়ে দিতে পারে অন্তত এটা তোমাকে শিখিয়ে দেবে যতটুকু তোমার আছে সেটুকু নিয়ে কিভাবে সন্তোষে থেকে আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে যেতে পার।

এই মন্ত্রের অন্তর্নিহিত ভাব হল আচার্যের ভূমিকা কি হবে। আচার্য মানে বৈদিক ঋষি। বৈদিক ঋষি আর আর সাধারণ পণ্ডিত বা পাশ্চাত্যের দার্শনিকদের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? বৈদিক ঋষি তপস্যা করে করে নিজের মনকে এমন শুদ্ধ পবিত্র করে নিয়েছেন যার ফলে they are capable of any right knowledge। দ্বিতীয় তাঁদের মধ্যে কোন রকম ব্যক্তিস্বার্থ নেই। তৃতীয় তাঁদের কথার মধ্যে কোন ধরণের অসঙ্গতি নেই, চরিত্র, আদর্শ, আচরণ, কথাবার্তা সবটাই সঙ্গতিপূর্ণ। এই গুণগুলি সক্রেটিসের মধ্যেও ছিল কিন্তু যীশুকে কেন বেশি লোক মনে রেখেছে? কারণ যীশু ওপারের খবর জানতেন, সক্রেটিস জানতেন না।

ঋকবেদে একটি খুব বিখ্যাত মন্ত্র আছে যা এখন গণেশের উদ্দেশ্য ব্যবহৃত হয়। এছাড়া জপ-ধ্যান শুরু করার আগে এই মন্ত্রটি পাঠ করে নেওয়া যেতে পারে। বেদের এই মন্ত্র গণেশের নামে করা হয়নি, এই মন্ত্রের দেবতা হলেন ব্রহ্মণস্পতি।

গণানাং ত্বা গণপতিং হবামহে কবিং কবীনামুপমশ্রবস্তমম্।
জ্যেষ্ঠরাজং ব্রহ্মণাং ব্রহ্মণস্পত আ নঃ শৃণ্বন্নূতিভিঃ সীদ সাদনম্।।ঋ-২/২৩/১।।

বেদে মন্ত্রের প্রার্থনা যাঁর নামেই করা হোক না কেন, প্রথমেই দেখতে হব সব মন্ত্র ঈশ্বরের নামেই করা হচ্ছে। কিন্তু এক একটা রূপে, এক একটা দিক দিয়ে যখন দেখতে চাওয়া হয় তখন দেবতার নাম পাল্টে দেওয়া হয়। মনে করুন চারটে দুষ্ট লোক আপনাকে লাঠি-সোটা নিয়ে ঘিরে ফেলেছে। আপনি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছেন, হে ভগবান! আপনি এদের আচ্ছা করে পিটিয় দিন। ঠাকুরের কাছে কি এই প্রার্থনা করা যাবে, হে ঠাকুর! এই চারটেকে আপনি একটু পিটিয়ে দিন? যাঁর বালগোপাল ইষ্টদেবতা, সেই বালদেবতাকে কী বলা যাবে এই চারটে দুষ্টকে তুমি পিটিয়ে দাও? কখনই বলা যাবে না। তখন আপনারা হনুমান জীকে লাগবে। সাধু-সন্ন্যাসীদেরও এমন অনেক সমস্যা আছে যার সমাধানের জন্য তাঁরাও ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করতে চান না, তখন তাঁরা খুব করে চণ্ডীপাঠ করতে শুরু করে দেন। এই সমস্যা বেদের ঋষিদেরও ছিল। হৃদয়ে আত্মাকে দেখছেন *অঙ্গুষ্ঠমাত্র জ্যোতিরিবাধূম্রকঃ*, আংঠার মত জ্যোতি রূপে আত্মাকে হৃদয়ের মধ্যে দেখছেন যাঁর মধ্যে কোন মলিনতা নেই, *অধূম্রকঃ*। এই অঙ্গুষ্ঠমাত্র আত্মাকে কী করে বলবেন যে, তুমি আমাকে দুশমন্ থেকে রক্ষা কর। তখন ঋষিরা তাঁর একটা অন্য রূপের কথা চিন্তা করলেন। দুশমন্ থেকে রক্ষা করার জন্য তাঁর অন্য রূপ দরকার। বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণকে আমরা মিষ্টি মিষ্টি রূপে দেখছি, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে তাঁকে অর্জুনের সখা রূপে সারথির দায়ীত্ব পালন করতে দেখছি। এই রূপ দিয়ে সংহার কার্য হবে না, তাই তাঁকে বিশ্বরূপ ধারণ করতে হল। বেদের এখানেই বিশেষত্ব, ঋষি এক একজন দেবতাকে সেই রূপেই নিয়ে আসছেন যে রূপে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত প্রয়োজন পূরণ করতে পারবেন, হে ঈশ্বর! আপনি এই রূপ নিয়ে আমার এই কার্যটা করে দিন।

এই মন্ত্রেও ঠিক এটাই করা হয়েছে। ব্রহ্মণস্পতি একজন দেবতার নাম। সায়ানাচার্য ব্রহ্মণস্পতির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলছেন, যিনি অন্নের স্বামী। মন্ত্রে একটা শব্দ আছে 'শ্রব', যার অর্থ অন্ন। তার মানে, জাগতিক সম্পদের যিনি মালিক তিনি হলেন ব্রহ্মণস্পতি। এই অর্থ করার সাথে সাথে সায়নাচার্য বলছেন ব্রহ্মণ শব্দ কর্মের অর্থেও হয়, অর্থাৎ যিনি কর্মের অধিপতি তিনি ব্রহ্মণস্পতি, এই ব্রহ্মণস্পতিই পরে গিয়ে বিধাতা নামে বেশি পরিচিত হয়েছেন। সায়নাচার্য দুটো অর্থে ব্রহ্মণস্পতির ব্যাখ্যা করছেন, যিনি অন্নের স্বামী আর

দ্বিতীয় অর্থ যিনি কর্মের অধিপতি। অন্নের স্বামী ভগবান নিজেই, কর্মের স্বামীও ভগবান নিজেই। কিন্তু এই মন্ত্রটি বেদে ব্রহ্মণস্পতি দেবতার নামে। ইদানিং গণেশের নামে এই প্রার্থনা করা হয়। যখনই গণেশের কোন স্তুতি করা হয় তখন সব সময় এই মন্ত্রটি দিয়ে গণেশের স্তুতি করা হয়। যাঁরা জাপক, প্রচুর জপ করেন, জপের বিঘ্ননাশ করার জন্য বেদের এই মন্ত্রটা তাঁরা জপের আগে পাঠ করে নেন। জপের বিঘ্ননাশ না করলে আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবীক বিঘ্নগুলি জপে অনেক বিঘ্ন উৎপাদন করে, কিন্তু এই মন্ত্রটি জপ করলে সব বিঘ্নগুলি সরে যায়। তাছাড়া বাড়িতে উপনয়ন, বিবাহ, অন্নপ্রাশনাদির মত কোন শুভ অনুষ্ঠান করতে হচ্ছে, একটা শুভ কাজ করতে যাচ্ছি যেটা মাঝ পথে খারাপ হয়ে যাওয়ার সম্ভবনা আছে, তখন এই মন্ত্রই স্বস্তিবাচক মন্ত্র রূপে কাজ করে শুভকাজকে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে সাহায্য করে।

গণানাং ত্বা গণপতিং হবামহে, গণা মানে সমূহ, যেখানে সমূহ রয়েছে আপনি তারও গণপতি। যদিও গণপতি মানে গণেশ, কিন্তু পৌরাণিক মতে বলা হয়। বেদে তা নয়, বেদে গণপতি মানে শ্রেষ্ঠতম। যেখানেই গণ বা সমূহ আছে সেখানে আপনিই শ্রেষ্ঠ। তাহলে গণ কে? বলছেন গণ মানে দেবতা। কিন্তু দেবতারা সমূহে চলেন, দেবতার সংখ্যাও অনেক। গণপতি কে? যিনি দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আবার আমাদের শরীর আদিকেও গণ বলা হয়। অনেক কিছুর সম্মিলনে আমাদের শরীর, শরীরে ইন্দ্রিয় আছে, অনেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আছে, এর যিনি পতি তাঁকে বলছেন স্বয়ংপতি, স্বয়ংপতি মানে যিনি আত্মজ্ঞান নিয়ে রেখেছেন। সুতরাং এই মন্ত্রকে যে কেউ ঠাকুরের নামেও করতে পারেন। কারণ স্বয়ংপতি ঈশ্বর ছাড়া আর কেউ হন না, দেবতার তো কখনই স্বয়ংপতি হবেন না। বলছেন যিনি গণপতি তাঁকে আমরা হবামহে, আবাহন করছি।

আমাদের কখনই যেন সংশয় না আসে, তা হল – এই মন্ত্রটি ইদানিং গণেশের নামে ব্যবহার করা হলেও বেদে এই মন্ত্রটি ব্রহ্মণস্পতির নামে করা হয়েছে, ব্রহ্মণস্পতি একজন দেবতা। কিন্তু সায়নাচার্য তাঁর ব্যাখ্যাতে বলছেন গণ মানে সমূহ, যেখানেই সমূহ আছে সেখানেই যিনি সেই সমূহের অধিপতি তিনিই গণপতি। গণপতির অন্য কি কি গুণ? *কবিং কবীনাম্ উপমশ্রবস্তমম্*, কবি মানে ক্রান্তদর্শি, যিনি ভূত, ভবিষ্যত ও বর্তমান তিনটে কালকেই জানেন। অন্যান্য জায়গায় ভগবানকে বলা হয় কবি, কিন্তু এখানে বলছেন তিনি *কবিং কবীনাম্*। কবি মানে জ্ঞানী, যিনি জ্ঞানীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, কবি মানে যিনি তিনটে কালকে জানেন। কিন্তু এরকম কবি অনেকেই হতে পারেন, যাঁরাই জীবনমুক্ত, যাঁরাই আত্মজ্ঞানী তাঁরাই কবি। মন্ত্রে বলছেন, আপনি তাঁদের একজন নয়, আপনি সব কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম, *কবিং কবীনাম্*। ইদানিং গণেশকে যেভাবে পরিভাষিত করা হয় সেখানেও বিনায়ককে জ্ঞানী রূপেই দেখা হয়। *উপশ্রবস্তমম্*, যেখানে উপমার ব্যাপার আসে, যেমন কাউকে অন্য কিছুর উপমা দিয়ে স্তুতি করা হয়, কারণ সব মানুষই স্তুতি করার যোগ্য হয় না। স্তুতি করার যোগ্য যাঁরা তাঁদের সবার মধ্যে আপনি শ্রেষ্ঠতম। *শ্রব* শব্দের অর্থ অন্ন, আবার *শ্রবস্তম* বলতে বোঝায় শ্রেষ্ঠতম। গ্রাম দেশে যাদের কাছে প্রচুর অন্ন থাকে তাদের গ্রামের শ্রেষ্ঠ বলা হয়, সেখান থেকে *শ্রবস্তম* এসেছে।

জ্যেষ্ঠরাজং ব্রহ্মণাং ব্রহ্মণস্পত, *রাজং* মানে যিনি রাজ্য শাসন করেন, ঈশ্বর শব্দ এসেছে ঈশ থেকে। ঈশ মানে যিনি ঈশন্ অর্থাৎ জগতকে শাসন করেন। রাজাও একই অর্থে হয়, যিনি প্রজাদের শাসন করেন। ঈশ্বর মানেও তাই যিনি জগতকে শাসন করে আর যিনি সবারই ভেতরে থেকে সবাইকে শাসন করেন। *জ্যেষ্ঠরাজং*, যত রকমের রাজা হতে পারে তাদের মধ্যে আপনি জ্যেষ্ঠ, সব রাজাদের উপরে আপনি বসে আছেন, তিনি ভগবান ছাড়া আর কেউ হতে পারবেন না। *ব্রহ্মণাং ব্রহ্মণস্পতে*, এখানে ব্রহ্মণ্ শব্দের অর্থ সুনাম বা যিনি জানেন তাঁর ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান আছে সেই অর্থে ব্রহ্মণা। কিন্তু ব্রহ্মণ্ এখানে সুনাম, যশ এই অর্থেই নেওয়া হয়েছে। যাঁদের সুনাম বা যশ আছে তাঁদের মধ্যে আপনি ব্রহ্মণস্পতি, পরে 'আ' আছে বলে ব্রহ্মণস্পত বলা হচ্ছে। সেখান থেকেই বলা হচ্ছে যে এই মন্ত্রের দেবতা ব্রহ্মণস্পতি। কিন্তু ভগবানের একটি নাম ব্রহ্মণস্পতি, ব্রহ্মণদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ। স্তুতির ধর্মই হল যখন কারুর স্তুতি করতে হয় তখন একটু বেশি করেই বড় বানিয়ে স্তুতি করতে হয়। যাঁর প্রতি ভালোবাসা শ্রদ্ধা খুব উচ্ছাসের পর্যায়ে চলে যায় তখন স্তুতি একটু বেশি করেই বেরিয়ে আসে।

আ নঃ শৃণ্বন্নুতিভিঃ সীদ সাদনম্, হে ব্রহ্মণস্পতি! প্রার্থনা করছি, আপনি আমাদের উপর কৃপা দৃষ্টি দান করুন, এই যে যজ্ঞ করছি, এই যজ্ঞে আপনি আসুন, এসে বসুন এবং যজ্ঞে আপনি যোগ দিন। বেদ মন্ত্র মানে যজ্ঞের মন্ত্র, এসব মন্ত্রকে যেমন যজ্ঞে আহুতি রূপে নেওয়া যেতে পারে আবার যেহেতু এটি ঋগ্বেদের মন্ত্র তাই স্তুতির অর্থেও নেওয়া যায়। আবার প্রার্থনা মন্ত্র হয়ে যায় যদি কেউ শুধু প্রার্থনা করতে চায়। মন্ত্রের আগে একটা ওঁ লাগিয়ে দিলেই এই মন্ত্রই সিদ্ধ মন্ত্র রূপে জপ করে সিদ্ধি পাওয়া যাবে। বেদের সব মন্ত্রই সিদ্ধ মন্ত্র হওয়াতে একসাথে তিন ভাবে ব্যবহার করা যায় – যজ্ঞে ব্যবহার করা যায়, প্রার্থনা রূপে ব্যবহার করা যায় আবার জপের মন্ত্র রূপেও ব্যবহার করা যায়। আবার মনে করিয়ে দেওয়া হচ্ছে, এই মন্ত্রের দেবতা ব্রহ্মণস্পতি, ভাষ্যেও ব্রহ্মণস্পতি শব্দের ব্যবহার করছেন কিন্তু সেখানে ব্রহ্মণস্পতির অর্থ ঈশ্বর। কিন্তু ঈশ্বরকে যজ্ঞে এভাবে আহ্বাণ করে বসতে বলা হয় না, যজ্ঞে যোগদান করতেও বলা যাবে না, সেইজন্য ব্রহ্মণস্পতি একজন দেবতা। তবে ব্রহ্মণস্পতি দেবতার যেসব গুণের এখানে বর্ণনা করা হয়েছে এই গুণগুলো পুরোপুরি ঈশ্বরের।

শাস্ত্র পড়লে কী হয়? ঠাকুর বলছেন, অস্তি মাত্রম্, তিনি আছেন এই বোধটা দৃঢ় হয়। শাস্ত্রের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনলে কোথা দিয়ে একটা বিশ্বাস হতে থাকে যে শাস্ত্র যা বলছে সব সত্য, ঈশ্বরের প্রতি একটা দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায়। এই বিশ্বাসকে অবলম্বন করে জ্ঞান-ভক্তি উপলব্ধির জন্য এবার সে এগোতে থাকে, পরের ধাপে এসে সে গভীরে ডুব দেয়। ডুব দেওয়ার পর জ্ঞান প্রকাশ হয়ে যায়। এটাকেই রাজযোগে বলছে শব্দ, অর্থ ও জ্ঞান। শব্দ শব্দতেই থেকে যায়, যখন সেই শব্দ থেকে অর্থটা প্রকাশ হতে শুরু করে তখন তাঁর উপর বিশ্বাস আসতে শুরু হয়। এরপর একটাই ধাপ, অর্থ যখন জ্ঞানরূপে চলে যায় তখন তাঁর জীবনটাই সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। এই ভাবের উপর বেদে একটা খুব সুন্দর মন্ত্র আছে –

ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্যস্মিন্দেবা অধি বিশ্বে নিষেদুঃ।
যস্তন্ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি য ইত্তদ্বিদুস্ত ইমে সমাসতে।।ঋ-১/১৬৪-৩৯।।

ঋচো, ঋগ্বেদের ঋচা বা বেদে যে স্তুতির মন্ত্রগুলো অর্থাৎ বেদে যে প্রার্থনাগুলো রয়েছে। আসলে ঋগ্বেদ নাম ব্যাসদেবের সময়ই এসেছে। তার আগে বেদের সব মন্ত্রকেই ঋচা বলা হত। বেদের মন্ত্রগুলিতে যাঁর কথা বলা হয়েছে তিনি হলেন *অক্ষরে*। অক্ষর শব্দের অর্থ যাঁর কখন ক্ষর বা ক্ষয় হয় না। শব্দেরও কখন নাশ হয় না, শব্দ সনাতন। শব্দ যাঁকে ইঙ্গিত করছে তিনিও সনাতন। সেইজন্য দুটোকেই অক্ষর বলা হয়। কথা বলতে গিয়ে যে শব্দ হয়, শব্দ যা দিয়ে তৈরী হয় সেটাকেও অক্ষর বলা হয় আর ঈশ্বরকেও অক্ষর বলা হয়। সেইজন্য অক্ষর বলতে কী বোঝাচ্ছে আমাদের সংশয় এসে যায়। সৃষ্টি যেখানে সেখানেই ঈশ্বর, আর যেখানেই সৃষ্টি সেখানেই শব্দ, তাই শব্দ আর ঈশ্বর এক সঙ্গে চলে, এর নামই শব্দব্রহ্ম। অক্ষর তাই দুটোকেই বোঝায়। স্বরবর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণ এগুলোও অক্ষর আবার ঈশ্বরকেও অক্ষর বলা হয়। অক্ষর থেকেই ঋচা এসেছে, ঋচার মন্ত্রগুলিতে যে অক্ষরগুলো আছে সেগুলো কোন দিন নাশ হবে না, ঋচার ওই অক্ষর দিয়ে নির্দেশ করা হচ্ছে সেই অক্ষরকে। যদি বলেন ঈশ্বরের ব্যাপারে আমরা তো মন্ত্রেরই ব্যবহার করেছি, অক্ষরের তো ব্যবহার হয়নি। তা নয়, অক্ষরের ব্যবহারও আমরা করেছি। এর আগে আমরা একটা জায়গায় আলোচনা করেছিলাম যেখানে বলা হয়েছিল কং ব্রহ্ম, খং ব্রহ্ম, ক হল অক্ষর, খও অক্ষর। ক একটা অক্ষর ক যাঁকে নির্দেশ করছে সেটাও অক্ষর। ঠিক তেমনি দ, দ অক্ষর ইন্দ্রের অর্থে ব্যবহার হয়, যিনি দেন।

তাই বলছেন ঋচাতে যে অক্ষর সেই অক্ষর *পরমেব্যোমন্,* যিনি আকাশেরও পারে। মন্ত্র শুধু নির্দেশ দেয়। অস্তি মাত্রম্, তিনি আছেন, বেদমন্ত্র এই বোধটুকু শুধু দিয়ে দেয়। কিন্তু আসল তিনি রয়েছেন ব্যোমের পারে। তার মানে, আপাতদৃষ্টিতে যা কিছুর অস্তিত্ব অনুভব হচ্ছে তিনি সেই অস্তিত্বের পারে। *যস্মিন্ দেবা অধি বিশ্বে নিষেদুঃ,* সেই যে ঈশ্বর তাঁকে নির্গুণ নিরাকার বলুন আর সগুণ সাকারই বলুন, যাঁর কথা ঋচারা বলে, বেদ যাঁর কথা বলছে, সেই যে অক্ষর তাঁর মধ্যেই দেবতারা, দেবতা বলতে যাঁরা দেদীপ্যমান, যাঁর অস্তিত্বে দেবতারা দেদীপ্যমান, জ্বলজ্বল করছেন। তার মানে, দেবতারা কিছুই নন, দেবতাদের অস্তিত্ব সেইখানে। আমরা

যেমন অনেক সময় বলি, তুমি কার জোরে লাফাচ্ছ? দেবতারা কার শক্তিতে লাফাচ্ছে, কার আলোতে দেবতারা দীপ্যমান? সেই ব্রহ্মের শক্তিতে, ব্রহ্ম মানে অক্ষর। সেই অক্ষরের কথা ঋগ্বেদ বলছে।

বলছেন, *যস্তন্ন বেদ কিম্ ঋচা অরিষ্যতি*, যে এই অক্ষরকে জানে না, বোঝে না বেদ অধ্যয়ন করে তার কী হবে! বলতে চাইছেন, ঋগ্বেদের প্রাথমিক অর্থ যে বোঝে না সে ঋগ্বেদ পড়ে কী করবে! *য ইত্তদ্বিদুস্ত ইমে সমাসতে*, সেই ব্যক্তিই ঠিক ঠিক উচ্চমানের যিনি ঋগ্বেদ যাঁকে নির্দেশ করছে তাঁকে জানেন, বোঝেন এবং উপলব্ধি করেছেন। মন্ত্রের বক্তব্য হল, বেদের দুটো দিক, যা প্রথমের দিকে আমরা আলোচনা করেছিলাম আর পতঞ্জলিও যোগে এর উল্লেখ করেছেন, আর এটা বেদের মধ্যেই আছে। বেদের দুটো দিকের একটা হল শব্দসমূহ। চারটে বেদে যা কিছু পাই সবই শব্দের সমাহার। কিন্তু বেদ এই শব্দ দ্বারা কী বলতে চাইছে? বেদের একটাই বক্তব্য পরমাত্মাই একমাত্র সত্য। সেই পরমাত্মার বৈশিষ্ট্য কী? *পরমে ব্যোমন্*, ইন্দ্রিয়ের যে দৃশ্যমান জগৎ তার পারে তিনি। দৃশ্যমান জগতের মধ্যেও তিনি আছেন, কিন্তু তাঁর ঠিক ঠিক অস্তিত্ব শুদ্ধ চৈতন্য রূপে। এই জিনিসটাকে যিনি জানেন, বোঝেন, যিনি উপলব্ধি করেছেন তিনিই সত্যিকারের ধন্য, তিনিই বেদকে ঠিক ঠিক বুঝেছেন। যিনি এই জিনিসটা বোঝেননি অথচ পুরো বেদ মুখস্ত করে রেখেছেন, তাঁর বেদ পাঠ করা বৃথা। তার মানে দাঁড়ায়, বেদের একমাত্র উদ্দেশ্য পরমাত্মার সাক্ষাৎকার, আচার্য শঙ্করও ঠিক এ কথাই বলছেন, বেদ মানে যা অধ্যয়ন করে ঈশ্বরের জ্ঞান লাভ হয়, ঈশ্বরের দর্শন হয়। বেদ নিজেই এই কথা বলছে। সারা জীবন বেদ আবৃত্তি করে যেতে পারে, কিন্তু কোন কাজে লাগবে না। বেদ যাঁর দিকে ইঙ্গিত করছে, সেই অক্ষরের কী বৈশিষ্ট্য? দেবতারাও তাঁর মধ্যে অবস্থিত।

ঠাকুরের কথাতেও এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় – শাস্ত্র পড়লে কী হয়? অস্তিমাত্র জ্ঞান হয়। অস্তিমাত্র বিশ্বাস হয়ে গেলে সে ডুব দেয়। সাধনা করলে তিনি দেখা দেন, তিনি কথা কন, তিনিই তখন সব কিছু জানিয়ে দেন। যতক্ষণ তিনি নিজের অস্তিত্বের কথা না জানিয়ে দেন ততক্ষণ তাঁকে জানার কোন উপায় নেই। বেদের প্রত্যেকটি কথা, গীতা উপনিষদের প্রত্যেকটি কথা তিনি যদি কৃপা করে না জানিয়ে দেন ততক্ষণ এগুলোকে জানা বা ধারণা করার কোন সাধ্যি নেই, জানার কোন পথ নেই। তিনি না জানালে যখন কিছুই জানা যাবে না, তাহলে বেদ উপনিষদ পড়ে কী হবে? শাস্ত্র পড়লে একটাই লাভ, ঈশ্বর আছেন, তিনি দেখা দেন এই বিশ্বাসটা দৃঢ় হয়। এই বিশ্বাস যখন দৃঢ় হয় তখন সাধনার দিকে মন যায়। সাধনার পরে আসে সিদ্ধি, সিদ্ধি অবস্থায় তিনি সব কিছু জানিয়ে দেন। এবার মনে করুন, যে কোন দিন শাস্ত্র পড়েনি কিন্তু ঈশ্বরে পুরো বিশ্বাস আছে, তিনি আছেন, তিনিই সব কিছু করছেন, তিনি আমাকে দিয়ে সব কিছু করাচ্ছেন, তাঁকে জানাই আমার জীবনের উদ্দেশ্য। তাহলে তার কি আর শাস্ত্র অধ্যয়ন করার দরকার আছে? না, আর দরকার নেই। তবে আমাদের ক্ষেত্রে কি হয়, আমরা মুখে বলতে পারি যে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে তিনিই সব কিছু করাচ্ছেন। কিন্তু জীবনে চলার ক্ষেত্রে গিয়ে আমরা অন্য রকম করে বসি, আসলে এগুলো আমাদের মুখের কথা মাত্র। ঠাকুরও অনেকবার বলছেন, সংসারীদের সব মুখের কথা, বাচ্চারা যেমন বড়দের থেকে শুনে কোঁদল করার সময় বলে ঈশ্বরের দিব্যি, এদেরও ঠিক তাই। কিন্তু যাঁর এই বিশ্বাস দৃঢ় হয়ে গেছে, তিনি আছেন, তিনিই সব করছেন, তিনিই কৃপা করে দেখা দেবেন তাঁর জন্য আর শাস্ত্র নয়। তখন কিছু একটা করতে হবে তাই শাস্ত্রও একটু কোথাও শুনলেন, কোন ব্যাপারে শাস্ত্র কি বলছে জানার আগ্রহ নিয়ে একটু দেখলেন, এমনিতে আর কোন দরকার নেই। এর বাইরে বাকী যত লোক আছে প্রত্যেককে শাস্ত্র পড়তে হবে। শাস্ত্র না পড়লে কোন দিন তার শ্রদ্ধা আসবে না। শ্রদ্ধা যত দিন না হবে চেষ্টাটাও শুরু হবে না। চেষ্টা মানেই সাধনা। যারা শাস্ত্র পড়ে না তাদের ধর্মে মতিগতি হওয়ার সম্ভবনা অনেক কম। এখানে যাঁরা শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে আসছে, সবারই একটা শ্রদ্ধা আছে বলেই আসছে। কিন্তু এর আগে ছোটবেলা থেকে বড়দের কথা শুনে, বাড়ির ধর্মীয় পরিবেশে বড় হতে হতে যে শ্রদ্ধা হয়েছিল আর এতদিন শাস্ত্র কথা শুনে শুনে যে শ্রদ্ধা এসেছে, এই দুটো শ্রদ্ধার মধ্যে গুণগত মানে অনেক তফাৎ। এই শ্রদ্ধাই দৃঢ় হয়ে যাচ্ছে, দৃঢ় হতে হতে একদিন হঠাৎ কারুর মনে হবে সাধনার মধ্যে ডুবে যাই। যেদিন তিনি সাধনাতে ডুবে যাবেন সেদিন থেকেই তার সিদ্ধির দ্বার

উন্মোচন হয়ে গেল। তখন তিনি সব জানিয়ে দেবেন। কিন্তু বাকি সময় জপ-ধ্যান সবই করা হচ্ছে কিন্তু মাঝে মাঝে মন এদিক ওদিকেও যাচ্ছে, যত দৃঢ় হতে থাকবে মনেরও তত এদিকে ওদিক যাওয়া কমে যাবে।

ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্, খুব সুন্দর একটি মন্ত্র। ঋগ্বেদে বা বেদে যা কিছু আছে বা যে কোন শাস্ত্রে যা কিছু আছে, সব কিছুর উদ্দেশ্য একটাই ঈশ্বরের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। ঈশ্বর কে? যিনি *পরমে ব্যোমন্*, এই পঞ্চভূতের জগতের বাইরে তিনি। পঞ্চভূতের বাইরে তাই বলে এই নয় যে তিনি পঞ্চভূতের মধ্যে নেই। তার মানে এই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাঁকে জানা যায় না। তাঁকে জানাটাই জীবনের উদ্দেশ্য। বেদের একমাত্র উদ্দেশ্য তাঁর দিকে সবাইকে নিয়ে যাওয়া। বাকি যারা শুধু বেদের শব্দ নিয়ে আছেন, সেটা কিছুই নয়।

ব্রতেন দীক্ষাম্ আপ্নোতি দীক্ষয়াপ্নোতি দক্ষিণাম্।
দক্ষিণা শ্রদ্ধাম্ আপ্নোতি শ্রদ্ধয়া সত্যম্ আপ্নোতে।।যজু – ১৯-৩০।।

ব্রতেন দীক্ষাম্ আপ্নোতি, ব্রত থেকে দীক্ষা লাভ হয়। *দীক্ষয়াপ্নোতি দক্ষিণাম্*, দীক্ষা থেকে দক্ষিণা পাওয়া যায়। *দক্ষিণা শ্রদ্ধাম্ আপ্নোতি*, দক্ষিণা থেকে শ্রদ্ধা আসে। *শ্রদ্ধয়া সত্যম্ আপ্নোতে*, শ্রদ্ধা থেকে সত্যের উপলব্ধি হয়। আধ্যাত্মিক জীবনে প্রবেশ করার জন্য প্রথমে একটা ব্রত নিতে হয়। আমরা যেমন বলি তিনি দেশ সেবার ব্রত নিয়েছেন। ঠিক তেমনি আধ্যাত্মিক জীবনের খুব প্রচলিত ব্রত হল ব্রহ্মচর্য ব্রত বা সন্ন্যাস ব্রত। আধ্যাত্মিক সাধনার জন্য এই ব্রত সবাইকে নিতে হয়। অনেকেই নানা রকম ব্রত পালন করেন। একদশী ব্রত, নিশিপালন ব্রত, ব্রতোপবাস এগুলোও ব্রত। সব রকম ব্রত হল দীক্ষার জন্য। এই দীক্ষা মন্ত্রদীক্ষা নয়। দীক্ষা মানে আধ্যাত্মিক অনুশীলনে নামা। *দীক্ষয়াপ্নোতি দক্ষিণাম্*, দীক্ষা যখন হয়ে গেল, অর্থাৎ আধ্যাত্মিক অনুশীলন শুরু হয়ে গেলে আসে দক্ষিণা। এই দক্ষিণা মানে কৃপা। ব্রাহ্মণকে যে দক্ষিণা দেওয়া হয় সেই দক্ষিণার কথা বলা হচ্ছে না। এখানে আমাদের ছোট্ট করে একটা জিনিস খুব ভালো করে বোঝার দরকার।

মানবজীবন চালানোর দুটি বিধি নির্ধারিত হয়ে আছে – একটা হল ভিক্ষা, আরেকটি হল দীক্ষা। ভিক্ষার দ্বারা মানুষ জীবন নির্বাহ করে আর দীক্ষার দ্বারা সে দক্ষিণা লাভ করে, দক্ষিণা লাভ করা মানে জীবনে উপলব্ধি হওয়া। ভিক্ষা দিয়ে জীবনের উপলব্ধি কখনই হয় না। জীবনের উপলব্ধি হয় দীক্ষা ও দক্ষিণা দিয়ে। দক্ষিণা মানে কৃপা, কৃপা পাওয়ার জন্য দীক্ষা নিতে হবে, দীক্ষা নেওয়ার আগে ব্রত নিতে হবে। ভিক্ষা দিয়ে হয় জীবন নির্বাহ, সন্ন্যাসী যদি কোন গৃহস্থের কাছে ভিক্ষা নিতে যান তখন তাঁকে কিছু রুটি ডাল বা হয়ত দুটো টাকা দিয়ে দেবে। বলা হয় যে, কেউ যদি কারুর বাড়িতে ভিক্ষা চায় তখন তাঁকে ওই দুটো টাকাই হয়ত দেবে, কিন্তু কেউ যদি একবারে কাশী যাওয়ার ভাড়া চেয়ে বসে তখন তাঁকে সেটা দেওয়া হবে না। কিন্তু কেউ কি কাশীর ভাড়া পাবে? পাবে। কে পাবে? যিনি দীক্ষা নিয়েছেন। দীক্ষা নিয়েছেন মানে, যিনি ব্রতী। ব্রতী মানে যিনি ভিক্ষা পাওয়ার যোগ্য। আমি কোন বড় কোম্পানিতে ম্যানেজার পদে চাকরি করছি। কোম্পানীতেও আমার দুটো পথ – ভিক্ষা আর দীক্ষা। ভিক্ষা মানে, আমি কোম্পানির মালিককে গিয়ে বলছি – আমি এতদিন ধরে আপনার কোম্পানিতে চাকরি করছি কিন্তু আমাকে প্রমোশন দিচ্ছেন না, আমার মাইনে বাড়াচ্ছেন না কেন। আমি ভিক্ষা চাইছি। কোম্পানি আমাকে কিছুই দেবে না। খুব জোর হলে দুশ টাকা মাইনে বাড়িয়ে দেবে। আমি বললাম – আমি কি এই দুশো টাকা মাইনে বাড়ানোর কথা আপনার কাছে বলতে এসেছি? এবার আমাকে মালিক দুটো অপমানজনক কথা বলে দিল, হয়ত চাকরি ছেড়ে দিতে বলল। এরপর আমি কী আর করব! কিন্তু আমি যদি দীক্ষাব্রতী হয়ে যাই? দীক্ষাব্রতী মানে, আমি তপস্যা করছি। কী তপস্যা? কোম্পানিতে এমন এমন কাজ করছি যে কোম্পানী আমাকে ছাড়া চলবেই না, আমি কোম্পানীর অপরিহার্য ব্যক্তিত্ব, আমাকে ছাড়া কোম্পানী লাটে উঠে যাবে। তখন খুশী হয়ে মালিক বলবে, ভাই আপনি আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন না, আপনি বলুন আপনার কি কি লাগবে। বাড়ি থেকে অফিসে আসা-যাওয়ার জন্য আপনার গাড়ি লাগবে? সপ্তাহে দুদিন ছুটি চাই? উইক এণ্ডে কোথাও ঘুরতে যাবেন? যা লাগবে আপনি বলুন আমরা সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

অনেক আগেকার একটি ঘটনা। একজন আইএএস অফিসার ছিলেন, খুব সৎ ও নিষ্ঠাবান অফিসার ছিলেন। এক কোম্পানি প্রচুর টাকা ঘুষ দিয়ে তাঁকে দিয়ে কিছু কাজ করিয়ে নেওয়ার জন্য অনেক চেষ্টা

করেছিল। কিন্তু তাঁকে দিয়ে কোম্পানি কিছুতেই কাজ আদায় করতে পারেনি। পরে সেই কোম্পানির সাথে ভদ্রলোকের অনেক ঝগড়া-বিবাদ হয়ে গিয়েছিল। আইএএস অফিসার চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর সেই কোম্পানির লোক এসে ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করে বলছেন – আপনার মত দক্ষ, সৎ, নিষ্ঠাবান কর্মি আজকাল আর পাওয়া যায় না, আপনার কাছে আমাদের বিনীত অনুরোধ আপনি যদি দয়া করে সপ্তাহে একদিন এসে আমাদের কোম্পানিতে কাজ করেন। ভদ্রলোক কিছুতেই রাজী হলেন না। শেষে কোম্পানির মালিক এসে বলছেন – আপনার উপর কোন বাধ্যতা নেই, প্রত্যেক সোমবার কোম্পানির গাড়ি এসে ঠিক নটার সময় আপনার বাড়ির সামনে দাঁড়াবে, দশটা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে, যদি আপনি আসেন গাড়ি আপনাকে নিয়ে আসবে আর আপনি যদি না আসেন গাড়ি দশটার পর অফিসে ফেরত চলে আসবে। কিন্তু আমরা মনে প্রাণে চাইছি আপনি আসুন, আপনার সাহায্য পেলে আমাদের মঙ্গল হবে। ভদ্রলোক শেষ পর্যন্ত কাজ করতে রাজী হলেন কিন্তু শর্ত রেখে দিলেন, আমি আমার নিজের খুশি মত যাব আসব। কোন দিন যেতেন কোন দিন যেতেন না। ভদ্রলোক এত সৎ আর কাজেকর্মে এত দক্ষ যে তাঁর কী প্রচণ্ড চাহিদা। ঠাকুর বলছেন, গ্রামে যখন বিবাদ হয় তখন গ্রামে বড় বড় মোঁচওয়ালা পালোয়ান থাকতে বিশ ক্রোশ দূর থেকে পাল্কি করে একটা রোগা-প্যাটকা বামুনকে নিয়ে আসে বিবাদের মীমাংসা করাবার জন্য। কেন আনা হয়? কারণ ওই ব্রাহ্মণ ব্রতী, দীক্ষা নিয়েছেন, সত্যে প্রতিষ্ঠিত।

দীক্ষা নিয়েছেন মানে এবার দক্ষিণা আসবে। দক্ষিণা বা কৃপা সব জায়গা থেকে আসে। রাজনীতিতেও ঠিক তাই হয়, সব নেতারা ভোটের সময় হাতজোড় করে ভোটারদের কাছে গিয়ে বলে আমাদের ভোট দেবেন। নেতারাও ভিক্ষা চাইছে। কেন তাকে ভিক্ষা চাইতে হবে! ভিক্ষা চাওয়ার তো কোন দরকারই হয় না। এমন এমন ভালো কাজ, শুভ কাজ করলে সবাই বলতে বাধ্য হবে আমরা আপনাকেই চাই, আপনাকে ছাড়া আমাদের চলবে না। এটাই দীক্ষা। বাকিরা হাতজোড় করে ঘুরে বেড়াতে থাকুক, এদের দীক্ষা নেই তাই ভিক্ষাতে নেমে পড়েছে। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কেও ঠিক তাই। স্বামী স্ত্রীকে বলছে 'তুমি কি আমাকে একটুও ভালোবাসতে পারো না'! তার মানে স্বামী স্ত্রীর কাছে ভিক্ষা চাইছে। স্ত্রী যদি স্বামীকে বলে 'তুমি আজকাল আমার দিকে একটু ফিরেও তাকাও না'। যদি নাও তাকায়, তার মানে স্ত্রী স্বামীর কাছে ভিক্ষা চাইছে, তোমার দীক্ষা নেই। স্ত্রীর যদি দীক্ষা থাকে তাহলে স্বামী মন্ত্রবিদ্ধ সাপের মত স্ত্রীর কাছে এসে পড়ে থাকবে 'তুমি ছাড়া আমার জীবন অন্ধকার'। উর্দুতে খুব নামকরা একটা সায়েরে বলছে – নিজেকে তুমি এমন পর্যায়ে নিয়ে যাও যে, কোন জিনিস চাওয়ার আগে খোদা এসে তোমাকে বলবেন বতা তেরি রজা ক্যায়া, তুমি কি চাইছ বল, এক্ষুণি তোমাকে দিচ্ছি। এটাকে বলে দীক্ষা, এই দীক্ষাকে জীবনে কখনই ভুলে যাওয়া ঠিক হবে না। তাই প্রথমে বলা হয়েছিল জীবনের দুটি বিধি – ভিক্ষা আর দীক্ষা। আমাদের সারাটা জীবন চলে যায় শুধু ভিক্ষা চাইতে, সব জায়গাতে আমরা ভিক্ষাই চাইছি। বাচ্চা বয়সে ক্লাশ টীচারের পেছনে দৌড়েছি, যদি পরীক্ষার খাতায় একটা নম্বর বেশি দিয়ে দেন, বড় হয়ে চাকরির জন্য দৌড়াচ্ছি, বিয়ের পর স্ত্রীর ভালোবাসা পাওয়ার জন্য দৌড়াচ্ছি, সন্তানের ভালোবাসা পাওয়ার জন্য দৌড়াচ্ছি। সারা জীবন ভিক্ষা ভিক্ষা আর ভিক্ষা, এই ভিক্ষার জন্য সবার পেছনে পেছনে লেগে থাকছি, যদি আমাকে কেউ একটু কৃপা করে। কিসের ভিক্ষা! কার কাছে ভিক্ষা নিতে যাবো! ভেতর থেকে এমন জোর নিয়ে আসুন যাতে জগতের সবাই এসে বলবে আমরা আপনাকেই চাই, আপনাকে ছাড়া আমাদের চলবে না। এটাই আশ্চর্যের যে, এই ক্ষমতা সবারই ভেতর আছে। তোমার ভেতরেই যে অনন্ত শক্তি, যে শক্তিতে গ্রহ নক্ষত্র ঘুরছে সেই অনন্ত শক্তি সবারই মধ্যে আছে। কিন্তু আমাদের সবারই বিশ্বাসের অভাব, তার থেকেও আরও মারাত্মক যেটা তা হল দীক্ষার অভাব। দীক্ষার জন্য দরকার ব্রত নেওয়া, আমি এই ব্রতে নিজেকে উৎসর্গ করে দিলাম। পতিব্রতা স্ত্রী কিসের ব্রত নিয়েছে? আমি আমার স্বামীর জন্য জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছি। ঠাকুর বলছেন, যে মেয়ে উপপতি করেছে সেই মেয়ের এমন জোর যে রাস্তায় নেমে সেই উপপতির কাপড় টেনে বলে 'তোর জন্য আমি সব কিছু ছেড়ে এলুম তুই আমাকে নিবি না মানে'! এখানেও সেই দীক্ষা, I committed myself for this। এই commitment জীবনের

যে কোন ক্ষেত্রেই হতে হবে, কাজের ক্ষেত্রে হতে হবে, অন্তর্জগতের ব্যাপারে হতে হবে। সব ক্ষেত্রে দীক্ষা যখন হয় তখন আসে দক্ষিণা। এই দক্ষিণা যখন আসে তখন কি হয়?

দক্ষিণা শ্রদ্ধাম্ আপ্নোতি, ভগবানের প্রতি নিজেকে যে ব্রতী করে দিচ্ছে তখন ভগবানের থেকে দক্ষিণা বা কৃপা আসে। ভগবান কি দক্ষিণা দেন? শ্রদ্ধা দেন। শ্রদ্ধা আসা মানে, ঈশ্বরের প্রতি তার বিশ্বাস পাকা হয়ে গেল। ওই শ্রদ্ধা দিয়ে তখন সত্য উপলব্ধি হয়। ঠাকুরের কাছে যখন একটা লম্বা লিস্ট নিয়ে বলছি, হে ঠাকুর আমাকে এই দাও, সেই দাও, তখন তো আমি ভিক্ষা চাইছি। ঠাকুর আমাদের কী দেবেন? খুব জোর দুটো রুটি ডালের ব্যবস্থা করে দেবেন, তার বেশি কিছু করবেন না। সব কিছু নিতে হলে কী করতে হবে? দীক্ষা, তার মানে এবার আমি ব্রত নিলাম, ব্রত নেওয়া মানে তপস্যা। এমন তপস্যা যে তুমি আমার আবদার শুনবে না! তোমাকে আমি বাধ্য করব শুনতে। কীভাবে? এই দেখো আমি তপস্যায় বসে গেলাম, এরপর তুমি আর আমাকে হেলাফেলা করতে পারবে না। রাবণের মত লোক তপস্যায় বসে গেল, সে এমন তপস্যা করতে শুরু করল যে কৈলাস নড়তে শুরু করে দিয়েছে। শিবকে দৌড়ে এসে বলতে হচ্ছে 'বল! তুমি কী চাও'। ঋষি মুনিরা তপস্যায় বসে যাচ্ছেন, ভগবানকে ছুটে আসতে হচ্ছে। কী চাও তুমি বল! ঋষি মুনিরা বলছেন, আমরা কিছু চাই না, আপনার ভালোবাসাটুকু চাই। উপলব্ধির স্তরগুলি এভাবেই চলে – প্রথমে ব্রত, আমি এটাই করব, দ্বিতীয় দীক্ষা এই আমার তপস্যা শুরু করলাম, তৃতীয় দক্ষিণা, তপস্যা করার পর আসে তাঁর কৃপা, চতুর্থ ধাপে আসে শ্রদ্ধা, পঞ্চম ও শেষ ধাপে আসে সত্যের উপলব্ধি। এর বাইরে জাগতিক জীবনে যখন আমরা ভিক্ষার উপরে চলি, বুঝে নিন জগতে একটা কেঁচো থেকেও আমাদের অবস্থা খুব একটা ভালো নয়। আসলে জগতে সবাই কেঁচো, সব কিছুতে আমরা ভিক্ষা চেয়ে বেড়াচ্ছি। ভিক্ষা ছাড়া জীবনে আর কী আছে আমাদের? কর্মক্ষেত্রে ভিক্ষা, ভালোবাসায় ভিক্ষা, নাম-যশে ভিক্ষা, সব কিছুতে শুধু ভিক্ষা আর ভিক্ষা। আপনার ভেতরে এমন শক্তির তোড় আসবে যে আপনি দাঁড়াবেন আর আশপাশ থেকে সবাই দৌড়ে এসে বলবে – বলুন আপনার কী চাই। তিনি সন্ন্যাসীই হন আর সামান্য গৃহস্থই হন আর যাই হয়ে থাকুন, তপস্যা যদি থাকে তাহলে তাঁর ব্যক্তিত্ব এমন হয়ে যাবে যে তিনি দাঁড়ালেই লোকেরা বুঝে যাবে ইনি সবার থেকে আলাদা। ব্যক্তিত্ব দিয়ে যে মানুষ প্রভাবিত হয় তার জন্য গেরুয়া পড়ার দরকার হয় না, যদি কেউ ব্রতী হন, দীক্ষা পেয়ে থাকেন তাহলে একটা unknown force তাঁর ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে বেরিয়ে আসে, যার জন্য সমাজ তাঁকে মাথায় তুলে রাখবে। তাঁকে হয়তো কেউ চেনে না, জানে না, হয়ত কেউকেটা কিছু নন, কিন্তু তাঁর সামনে সবাই কেঁচো হয়ে যাবে, সেও বুঝতে পারবে না কেন এর সামনে আমার নিজেকে অসহায় বোধ হয়।

কিন্তু এখানে এই মন্ত্র আধ্যাত্মিকতার জন্য। তুমি জ্ঞান লাভ করতে চাইছ, ভক্তি লাভ করতে চাইছ? তুমি কি জ্ঞান বা ভক্তি লাভের জন্য প্রস্তুত? হ্যাঁ প্রস্তুত। তাহলে তুমি ব্রত নিয়ে নাও, ব্রত মানে আমি এটাই করব। মুসলমানরা বলছে আমি দিনে পাঁচবার নমাজ পড়ব, রোজা রাখব, সেখান থেকে তারা পেয়ে যাচ্ছে দীক্ষা, আল্লার কৃপা পেয়ে যাচ্ছে। এই দীক্ষা থেকে আসে দক্ষিণা। ভগবানের যে কৃপা সেটা শ্রদ্ধা থেকেই আসে। শ্রদ্ধা এসে গেলে সত্য উপলব্ধি হয়, তাঁকে তখন জানা যায়। সাফল্য মানেই তপস্যা থাকতে হবে। তপস্যা মানেই ব্রত। ব্রত করার প্রেরণা শক্তি আসে শ্রদ্ধা থেকে আর তার যে বিধিবাক্য অর্থাৎ কোনটা করবে আর কোনটা করবে না, সেটা আসে ধর্ম থেকে।

এই যে বললেন শ্রদ্ধা দিয়ে সত্যকে জানা যায়, এই সত্যটা কী? সত্যের কী রূপ? এখানে কোন চিন্তা ভাবনা করা, কিছু দর্শন করা, কল্পনা করার কথা বলছেন না। চিন্তা ভাবনা বা কল্পনার কিছু নেই এখানে। এখানে যা কিছু বলা হচ্ছে সব প্রত্যক্ষ করার কথাই বলা হচ্ছে। ঠাকুর বারবার বলছেন 'তিনি কথা কন'। যজুর্বেদের একটি মন্ত্রে ঠিক এই জিনিসটাকেই বলছেন –

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাহতি মৃত্যুমেতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেহয়নায়।।যজু-৩১/১৮।।

মজার ব্যাপার হল এই মন্ত্রটি যজুর্বেদের খুব নামকরা মন্ত্র, যজুর্বেদের মন্ত্র মানে যজ্ঞে আহুতি দেওয়ার জন্য। কিন্তু মন্ত্রের মূল ভাব মৃত্যুর পারের ভাব। যজুর্বেদের মূল ভাব কিন্তু মুক্তি নয়, মুক্তির কোন ধারণাও নেই। এখানে *অতি মৃত্যুমেতি* মানে স্বর্গপ্রাপ্তি। আশা করি এখানে আমরা যে কজন আছি মোটামুটি সবাই ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর ভাবধারা দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং ঠাকুর, স্বামীজীর উপর অনেক বই পড়ে পড়ে, আত্মা, মুক্তির ব্যাপারে একটা ধারণা করে মনে করছি সবাই একই কথা বলছেন। কিন্তু সবাই একই কথা বলছেন না, যজুর্বেদে যখন *অতি মৃত্যুমেতি* বলছে তখন এর অর্থ হয় স্বর্গপ্রাপ্তি। কি রকম স্বর্গপ্রাপ্তি? বিরাট লম্বা সময়। যার জন্য যেখানে যেখানে এই ধরণের মন্ত্র আসে সেখানে সেখানে আচার্য ভাষ্য দিতে গিয়ে বলছেন কর্মকাণ্ড দিয়ে যে মুক্তি হয়, যাকে ওনারা মৃত্যুকে অতিক্রম করা বলছেন, আসলে সেটা হল স্বর্গ, যেখানে স্থায়ীত্বের ব্যাপারটা বিরাট লম্বা। যদিও অমৃত বলা হচ্ছে কিন্তু আপেক্ষিক অমৃত, অনন্ত কালের জন্য অমৃত নয়। স্বামীজী যখন এই মন্ত্রের কথা বলছেন বা বেদান্তে যখন এই মন্ত্রকে নিয়ে বলবে তখন অমৃত মানে হয়ে যায় মুক্তি।

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্, এখানে আর কোন তাত্ত্বিক কিছু নেই, সব প্রত্যক্ষ। বলছেন *বেদাহম্* আমি তাঁকে জেনেছি। নরেন যখন ঠাকুরকে বলছেন আপনি কি ঈশ্বর দেখেছেন, ঠাকুর বলছেন হ্যাঁ দেখেছি। ঠিক সেই রকম ঋষি বলছেন *বেদাহমেতং* আমি তাঁকে জেনেছি। *পুরুষং মহান্তম্*, সেই শ্রেষ্ঠতম পুরুষকে আমি জেনেছি। বেদের পুরুষ মানে ঈশ্বর, তিনি *মহান্তম্* যাঁর থেকে আর কেউ উপরে হয় না। তাঁকে দেখতে কী রকম? *আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ*, যে কোন ধরণের তমস, যে কোন ধরণের কালিমা, কালিমা বলতে সত্ত্ব, রজো আর তমো তিনটে গুণও কালিমা রূপে আসছে, এই তিনটে গুণের পারে যিনি তিনি *আদিত্যবর্ণম্*। এই ধরণের মন্ত্রের ব্যাখ্যা পড়ার পর আমাদের মনে ধারণা হয় যে আমারও যখন ঈশ্বর দর্শন হবে তাঁকে মানুষের মত একজন জ্যোতির্ময় পুরুষ রূপে সামনে দেখব। ব্যাপারটা তা নয়। জ্যোতির্ময় হল জ্ঞানের একটা অবস্থা, ওই জ্ঞানের অবস্থায় দেখেন সব কিছু যেন পরিষ্কার, কোন অন্ধকার নেই, সত্ত্ব, রজো ও তমো বলে কিছু নেই, অজ্ঞানের লেশ মাত্র নেই। আত্মাকে পুরুষ নামেও বলা হয়, *পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণম্*, পুরুষকে আলোময় রূপে দেখছেন না, দেখছেন সবটাই দিব্যজ্যোতির্ময় আলোতে স্পষ্ট। ঈশ্বর দর্শনের ক্ষেত্রে প্রত্যেক ধর্মেই দিব্যজ্যোতি শব্দটা ব্যবহার করা হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও তাঁর কবিতা দিব্য আলোর প্রচুর ব্যবহার করেছেন। এই দিব্য আলোকেই বলছেন *আদিত্যবর্ণম্ তমসঃ পরস্তাৎ*, এই দিব্য আলো যে কোন অন্ধকারের পারে। শুধু যে যে কোন ধরণের অন্ধকারের পারের কথা বলছেন তা নয়। যে কোন ধরণের যে thought process হতে পারে, সত্ত্ব, রজো ও তমের যে কোন ধরণের গুণ হতে পারে, সবারই পারে তিনি। তিনিই সব কিছু হয়েছেন, সব কিছুর মধ্যে তিনিই আছেন এই সত্যকে যখন সাক্ষাৎ করা হয় তখনই সে মৃত্যুকে অতিক্রম করে চলে যায়। তিনিই সত্য, আদিত্যবর্ণম্, সূর্য যেমন জ্বলজ্বল করে ঠিক তেমনি তিনি জ্ঞান রূপে, চৈতন্যময় জ্যোতি রূপে জ্বলজ্বল করছেন। জ্ঞানরূপে, চৈতন্যময় জ্যোতি রূপে যখন তাঁকে সাক্ষাৎ করা হয় তখনই সে মৃত্যুকে অতিক্রম করে। মৃত্যুকে অতিক্রম করা মানে জীবন-মৃত্যু রূপী যে সংসার, এই সংসারের পারে চলে যায়।

নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেহয়নায়, এ ছাড়া মুক্তির অন্য কোন পথ নেই। আপনি যা কিছুই চেষ্টা করে থাকুন, অপরের মঙ্গল করতে থাকুন, ঈশ্বরের ধ্যান করতে থাকুন, যা কিছুই করতে থাকুন না কেন, জীবন-মৃত্যুর এই সংসারের পারে যাওয়ার একটাই পথ তাঁকে সাক্ষাৎ করা। মাথা খারাপ থাকলে, দুর্বল চিত্ত যাদের তারাও অনেক কিছু দর্শন করে, তাহলে এরাও কি জীবন-মৃত্যুর পারে চলে যাবে? কখনই নয়। তিনিই সব কিছু হয়েছেন, তিনি চৈতন্যময় জ্যোতি, তাঁর উপরে আর কিছু নেই এইভাবে যিনি সাক্ষাৎ করেন সেটা তাঁর বাস্তবিক জীবনেও প্রতিফলিত হবে, জগতের কোন কিছুই তাঁকে আর আকৃষ্ট করতে পারবে না, কোন কিছু থেকে তাঁর আর কোন ধরণের শোক আর মোহ আসবে না।

জগতে ধার্মিক পুরুষ আর আধ্যাত্মিক পুরুষ এই দুই ধরণের মানুষ হয়। ধার্মিক পুরুষ সত্ত্ব, রজো ও তমের এই তিনটে গুণের এলাকায় বাঁধা থাকে। যে কোন সময় সে ধর্ম থেকে চ্যুত হয়ে ধর্মভ্রষ্ট হয়ে যেতে পারে। আধ্যাত্মিক পুরুষ কখনই পথভ্রষ্ট হন না। যিনি ঈশ্বরকেই সত্য বলে জেনে গেছেন আর ঈশ্বরকেই একমাত্র আকাঙ্খা করছেন তিনি আর কখন পথভ্রষ্ট হবেন না। যতক্ষণ সত্ত্বগুণে আছে, যতক্ষণ একজন ভালো

মানুষ হয়ে থাকতে চাইছে, ততক্ষণ ভালো থেকে খারাপ মানুষে নেমে আসার সম্ভবনা সব সময়ই থাকবে। কিন্তু মাঝে মাঝে আধ্যাত্মিক পুরুষ হয়ে যাচ্ছে আবার মাঝে মাঝে অনাধ্যাত্মিক পুরুষ হয়ে যাচ্ছে, এ জিনিস কখনই হয় না। আধ্যাত্মিক জীবনে উপলব্ধির তারতম্য থাকতে পারে, কিন্তু আধ্যাত্মিক পুরুষ কখনই জাগতিক কোন কিছুতে জড়াবেন না। কারণ তিনি জেনে গেছেন ঈশ্বর হলেন *মহন্তম্*, মহন্তমকে ছেড়ে সাধারণকে তিনি কখনই বরণ করবেন না। যিনি জেনে গেছেন ঠাকুরই শ্রেষ্ঠতম, ঠাকুরের কথাই শেষ কথা, তিনি কখন ঠাকুরকে ছেড়ে কামিনী-কাঞ্চন, নাম-যশের পেছনে মনকে যেতে দেবেন না। তিনি হলেন *মহন্তম্ আদিত্যবর্ণম*, তাঁর জন্য সব কিছু ছেড়ে দেওয়া যায়, কোন কিছুর জন্যই তাঁকে ছাড়া যাবে না, এই দৃঢ় বিশ্বাস যদি একবার এসে যায় তার কোন দিন পতন হবে না। কিন্তু এর বাইরে যতক্ষণ ধর্মের রাজ্যে থাকবে ততক্ষণ তার পতনের একশ ভাগ সম্ভবনা থাকবে। বিশ্বামিত্রাদি মুনিদের পতনের কথা আমরা জানি, তাঁরা সবাই ধর্মের পথে ছিলেন। ঠাকুর বলছেন জ্ঞানী ভয়তরাসে, কারণ জ্ঞানী এখনও ধর্মের পথে আছে। যাঁর ঈশ্বরের পুরো ব্যাপারটাই বিশ্বাসে এসে গেছে তাঁর আর কখনই কিছু পাল্টাবে না। বেদের এই ভাবই পরে গীতা এবং অন্যান্য শাস্ত্রে এসেছে। আরেকটি মন্ত্রে বলছেন, যদিও আগের মন্ত্রের মত খুব একটা প্রচলিত নয়, কিন্তু এর ভাবও খুব সুন্দর –

ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমাগ্নিমাহুরথো দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুত্মান্।
একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ।।ঋ-১/১৬৪-৪৬।।

এই মন্ত্রটি একাধারে ঋগ্বেদ ও অথর্ব বেদে এসেছে। তিনি এক কিন্তু ঋষিরা তাঁকে অনেক নামে বলেন। ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অগ্নি কয়েকজন দেবতার নাম করে বলছেন *দিব্য স সুপর্ণো গরুত্মান্*, *গরুত্মান্* একজন দিব্য পাখি, ইনিও দেবতাদের মত, পরে এনাকেই গরুড় পাখি রূপে পুরাণাদিতে দেখানো হয়েছে। সেই একটি নামকেই দেবতাদের এত রকম নাম দিয়ে সম্বোধন করা হয়। *একং সদ্বিপ্রা*, ঈশ্বর বা সত্য সেই এক, বিপ্রা মানে জ্ঞানী, জ্ঞানীরা দেখেন সব দেবতারা সেই এক, কিন্তু যখন বলে তখন অনেক নামে বলা হয়। যেমন কেউ অগ্নি বলছেন, কেউ যম বলছেন, কেউ মাতরিশ্ব নামে অভিহিত করছেন। প্রথমের দিকে কয়েকজন দেবতার নাম বলে শেষ আরও কয়েকজন দেবতার নামে বলে শেষ করছেন। কিন্তু এনারা সবাই *একং সৎ*, সৎ মানে যিনি আছেন, অস্তিত্ব যাঁর আছে সেই সৎ। আচার্য দেখাচ্ছেন যিনি সৎ তিনি কিভাবে চিৎ, যিনি চিৎ তিনিই কিভাবে আনন্দ, যিনি আনন্দ তিনিই কিভাবে সৎ, তাই সচ্চিদানন্দ বলাও যা, শুধুমাত্র সৎ বলাও তাই, আবার সৎ বলাও যা ঈশ্বর বলাও তাই। ঈশ্বর, তিনি সেই এক। অথচ বিপ্রগণ অর্থাৎ ঋষিরা তাঁকে পৃথক পৃথক ভাবে নানান নামে সম্বোধন করেন। কেন আলাদা আলাদা ভাবে সম্বোধন করেন? কারণ, আমাদের মনের বিশেষ বিশেষ চাহিদা আছে, সব রকম চাহিদা একজনকে দিয়ে মেটানো যায় না। যেমন বালগোপাল অনেকের ইষ্ট, কিন্তু বালগোপালকে দিয়ে বজ্র চালানো বা খড়্গ চালানোর কথা বলা যায় না। বজ্র চালানোর জন্য ইন্দ্রের স্তুতি করা হল। ইন্দ্র যখন আসছেন তখন বালগোপালের ভক্ত বলবে, আমার বালগোপালই ইন্দ্র হয়েছেন। আবার গরুড় পাখি রূপে তিনি সাপের উপদ্রব থেকে আমাদের রক্ষা করছেন। বালগোপাল নিজে সাপ ভক্ষণ করবেন ভক্ত কল্পনাই করতে পারবে না, ভক্ত তাই দেখে বালগোপালই গরুড় পাখি হয়ে রক্ষা করছেন।

ঋষিরা জানতেন আমরা যে পরম সত্তার কথা বলছি, যে পুরুষের কথা বলছি তিনিই ইন্দ্র, তিনিই মিত্র বরুণাদি। স্বামীজীর সময় তখনও বেদ নিয়ে গভীর ভাবে কাজ শুরু হয়নি, সবে বেদের অনুবাদ শুরু হয়েছিল। তখনকার দিনেও বেদ নিয়ে অনেক সমস্যা ছিল। বেদে বিভিন্ন দেবতার ধারণাকে তিনি evolutionary thoughts হিসাবে নিচ্ছেন। ইন্দ্র একজন দেবতা, মিত্র, বরুণ, অগ্নি সব যেন আলাদা আলাদা দেবতা, পরের দিকে যেন সব দেবতাকে মিলিয়ে বলছেন সব এক। আমরা যেমন বলি সচ্চিদানন্দই আছেন, মুসলমানরাও বলছেন আল্লাই আছেন। কিন্তু ওদের যখন বিভিন্ন ধরণের কাজ করতে হয় তখন আল্লার বদলে ফরিস্তা, জিন্ ইত্যাদি অনেক কিছু নিয়ে আসে, এরা কিন্তু আল্লা থেকে আলাদা। হিন্দুরা তা করছে না, এরাও অনেক দেবতা নিয়ে আসছে কিন্তু ভগবানের রূপেই থাকছে। সেদিক থেকে এই মন্ত্রটি খুব বিখ্যাত একটি মন্ত্র। ধর্মের সমন্বয় হিন্দু ধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য, সেই বৈশিষ্ট্যই এই মন্ত্রে দেখিয়ে ঋষি বলছেন এই যে ঋষিরা ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অগ্নি বিভিন্ন দেবতার নাম করছেন আসলে সেই এক ঈশ্বরের কথাই তাঁরা বলছেন। বর্তমান যুগে এসে এই

মন্ত্রের পরিধিকে আরও বিস্তার করে যীশু, মহম্মদ, আল্লা, গড সবাইকেই এক জায়গায় নিয়ে আসা হয়েছে। হিন্দুদের কাছে সবটাই এক *একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ*, এটাই হিন্দু ধর্মের একটি মৌলিক ভাবনা। বেদের অনেক মন্ত্রেই এই ভাব পাওয়া যাবে এবং পরের দিকে হিন্দুদের বিভিন্ন শাস্ত্রেও এই চিন্তাধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

বেদে প্রথমের দিকে তাঁরা প্রকৃতিকে নিয়ে তার উপরেই অনন্তের সব গুণ আরোপ করলেন, কিন্তু পরে দেখছেন অনন্তের যে বৈশিষ্ট্য তার সাথে অনেক কিছু খাপ খাচ্ছে না। তখন ওটাকে ছেড়ে দিয়ে আরেকটাকে ধরলেন। এইভাবে করে করে যখন শেষে বুঝলেন যে এক ছাড়া আর কিছু নেই, একই বহু রূপে প্রকাশিত, এই ধারণাই নিয়ে গেল নৈর্ব্যক্তিক ব্রহ্মের ধারণাতে। এই ভাবকেই এই মন্ত্রে খুব সুন্দর ভাবে অভিব্যক্ত করছেন – *একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি*। সব দেবতাই এক, ঐ যে অনন্ত, সেই অনন্তের উপরে একটা একটা করে মুখোশ লাগিয়ে গেছেন। একটা মুখোশ ইন্দ্র, একটা মুখোশ বরুণ। তাঁরা কিন্তু আগে জানতেন না যে এটাই অনন্ত। তার আগে কি করেছিলেন? ইন্দ্র একটা মুখোশ ধরে সেটাকে নিয়ে অনন্তের দিকে এগিয়ে গেছেন। যখন দেখলেন ইন্দ্র একটা সাকার রূপ, একে চলবে না, অনন্তে যাওয়ার আগেই হারিয়ে যাচ্ছে তখন আরেকটা মুখোশ নিলেন, তারপর দেখলেন এটাও সাকার অনন্তের সঙ্গে মেলান যাচ্ছে না। এইভাবে এক সময় তারা বুঝতে পারলেন অনন্ত সেই এক, আর এই মুখোশ গুলো সব আলাদা, সেই অবস্থাতে তাঁরা উপলব্ধি করলেন *একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি*। সৎ সেই এক, এখানে এই সৎ বোঝাচ্ছে সেই অনন্তকে, আর *বহুধা* হল ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ ইত্যাদি দেবতারা।

ঠাকুর বলছেন মত আর পথ, বেদের বাইরে ঠাকুর নতুন কিছু বলছেন না। সব ধরণের মত যতক্ষণ হয়ে আছে, মতের অমিল থাকবেই, কিন্তু সব মতই সেই এক সত্যের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আমি আর আপনি কখনই এক হব না কিন্তু আমি আপনি সেই এক সচ্চিদানন্দরই প্রকাশ। মানুষ, জীব, পুরুষ হিসেবে আমি আপনি যেমন এক ঠিক তেমনি চৈতন্যস্বরূপের দিক থেকেও আমরা এক। কিন্তু ব্যক্তি সত্তা হিসেবে আমরা সবাই আলাদা। ঠাকুর বলছেন পথ যেখানে নিয়ে যাচ্ছে সেখানে গিয়ে সবাই এক, কিন্তু পথ আলাদা হতেই পারে, বিভিন্ন পথ সেই একের দিকেই নিয়ে যায়। একজন সিঁড়ি দিয়ে ছাদে উঠছে, আরেকজন মই বেয়ে ছাদে উঠছে, সিঁড়ি আর মই কখনই এক হবে না। আমরা মুর্খের মত বলে বেড়াই হিন্দুও যা খ্রীশ্চানও তাই, হিন্দুও যা মুসলমানও তাই, তা কখনই নয়। সব ধর্মই আলাদা আলাদা পথ, কোন ধর্মই অন্য ধর্মের সাথে এক নয়, কিন্তু যেটা সাধারণ তা হল সব ধর্মের লক্ষ্য এক, যে লক্ষ্যের দিকে ধর্ম এগিয়ে দিচ্ছে। যে কোন একটা ধর্মের পথ ঠিক ঠিক ধরে থাকলে সেই সচ্চিদানন্দে গিয়ে পৌঁছাবেই পৌঁছাবে। বেদে যে এত দেবতার কথা বলা হয়েছে তাই বলে ওনারা যে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে এত দেবতার জন্ম দিলেন তা নয়, তাঁরা সেই অনন্তের সন্ধানে একটা সান্ত সাকার রূপকে ধরে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে গেছেন। পরে দেখলেন যে সান্ত দিয়ে অনন্তকে ধরা ছোঁয়া যায় না, তখন তারা অনন্তকে দিয়েই অনন্তের সন্ধানে ডুব দিলেন। অনন্তের সন্ধানে ডুব দেওয়ার পর তাঁদের উপলব্ধি হল যে আত্মাই ব্রহ্ম।

তদেবাগ্নিস্তদাদিত্যস্তদ্ বায়ুস্তদ্ উ চন্দ্রমাঃ।
তদেব শুক্র তদ্ ব্রহ্ম তাহআপঃ স প্রজাপতিঃ।।য-৩২/১।।

এই মন্ত্রেও একই ভাব নিয়ে বলছেন। মন্ত্রে তৎ শব্দ ব্যবহার করছেন, তৎ হল সর্বনাম। বিশেষ্যকে বোঝাবার জন্য যে শব্দ ব্যবহার করা হয় তাকে বলে সর্বনাম। নাম না বলে ‘তুমি’ বলে সম্বোধন করা হল, ‘তুমি’টা সর্বনাম। সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যত সৃষ্টি আছে, যা কিছু এখনও সৃষ্টি হয়নি, সৃষ্টির আগে যা কিছু ছিল এখন নেই, সৃষ্টির বাইরে যা কিছু আছে, সব কিছুকে যদি একসাথে নেওয়া হয় তখন এর সর্বনাম হবে তৎ। সেইজন্য তৎ মানে ভগবান। ইংরাজীতে তৎ মানে That। কিন্তু সমষ্টিতে যা কিছু আছে সবটাকে একসাথে ইঙ্গিত করার জন্য তৎ বলে দেওয়া হয়, সেইজন্য ভগবানের একটা নাম তৎ। *ওঁ তৎ সৎ*, মানে সৎ রূপে যিনি আছেন। এই যে বলছেন *তদেবাগ্নিস্তদাদিত্যস্তদ্ বায়ুস্তদ্ উ চন্দ্রমাঃ। তদেব শুক্র তদ্ ব্রহ্ম তাহআপঃ*

স প্রজাপতিঃ, বিভিন্ন দেবতাদের নাম নিয়ে বলছেন আর এখানে তৎ মানে জগতের অর্থে বলছেন না, তৎ মানে ভগবানের নাম। কারণ সৃষ্ট ও অসৃষ্ট মিলিয়ে যা আছে সেটা ভগবান নিজে। দেবতাদের নাম নিয়ে শুরু করে সব কিছুতে নিয়ে গিয়ে বলছেন তিনিই এই সব কিছু হয়েছেন।

ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্ যশঃ।।(য-৩২/৩)

প্রতিমা মানে প্রতিরূপ, ইংরাজীতে যেমন বলা হয় God created man in his own image, যেমনটি ভগবান তেমনটি মানুষ। কিন্তু বেদ বলছে *ন তস্য প্রতিমা অস্তি*, ভগবানের কোন প্রতিমা নেই, প্রতিমা নেই অর্থাৎ ভগবানের কোন প্রতিরূপ নেই অর্থাৎ ভগবানের সমতুল্য কিছু নেই যা দিয়ে ভগবানের প্রতিরূপ দেওয়া যাবে, তার মানে তিনি অরূপ। তুমি যা প্রতিমাই নাও, যে রূপই নিয়ে আস, যেভাবেই নিয়ে আসা হোক না কেন, ভগবানের প্রতিরূপ কোথাও আসবে না। হিন্দীতে খুব নামকরা একটা গান আছে যো বাত্ তুঝমে হ্যায় তেরে তসবীর মে নহী, এতে যেমন সিমিলারিটির কথা বলা হচ্ছে, কিন্তু এখানে বলছেন, *ন তস্য প্রতিমা*, কোন সিমিলারিটিই নেই। *যস্য নাম মহদ্ যশঃ*, যাঁর যশ মহৎ, তাঁকে আমরা কার সাথে তুলনা করতে পারি! কোন আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রামের কথা ভাবুন, সেই গ্রামের সব থেকে যিনি বিদ্বান তিনি ওই গ্রামে পোস্টমাস্টারের কাজ করেন। এবার কানপুর আইআইটি কলেজের স্কলারশিপ পাওয়া এক ছাত্র পিএইচডি করছে, সেই ছাত্রটি সেই আদিবাসীদের গ্রামে বেড়াতে গেছে। গ্রামের লোকেরা ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করছে – কাঁহা তক্ পড়ে হো। ছেলেটি বলছে পিএইচডি কর রহা হুঁ। গ্রামের লোকেরা খুব দুঃখ করে বলছে, ক্লাশ ফাইভ পর্যন্ত যদি পাশ করতে পারতে তাহলে কোন রকমে এখানে একটা পোস্টমাস্টারের কাজ পেয়ে যেতে, সেই ক্লাশ ফাইভটাও পাশ করতে পারলে না! ছেলেটি এখন কি করে তাদের বোঝাবে যে কম্প্যুটারে পিএইচডি করাটা কি জিনিস! স্কলারশিপ পাওয়া ছেলেটির একটা প্রতিমা যদি গ্রামে খুঁজতে যাওয়া হয় তাহলে সেই প্রতিমা কোথায় পাবে! এই জগৎ হল একটা আদিবাসী গ্রামের মত, এখানে ঈশ্বরের সমতুল্য কিছু জিনিসকে দিয়ে ঈশ্বরকে যদি বোঝাতে হয় তাহলে আমরা কি দিয়ে ঈশ্বরকে বোঝাতে পারব! এটাই এখানে বলছেন, *ন তস্য প্রতিমা অস্তি*।

তাবাংস্তে মঘবন্ মহিমোপো তে তন্বঃ শতম্।
উপো তে বধ্বে বদ্ধানি যদি বাসি ন্যর্বুদম্।।অ-১৩/৪/৪৪।।

Many in one, ইন্দ্রের নামে এই মন্ত্রে ভগবানের মহত্ত্ব কেমন বলা হচ্ছে। *উপো তে বধ্বে বদ্ধানি যদি বাসি ন্যর্বুদম্*, কোটি কোটি রূপে আপনিই আছেন কিন্তু এই যে কোটি কোটি রূপ, সব রূপ আপনার মধ্যেই অবস্থিত হয়ে আছে। আমরা এই ঘরে যারা আছি, ঘরের বাইরে সব জায়গায় যত প্রাণী আছে সব ভগবানেরই এক একটি রূপ। আর এরা সবাই কোথায় আছে? ভগবানের মধ্যেই আছে। এই যে দুটো ধারণার কথা বলা হচ্ছে – সব ভগবানরই রূপ আর দ্বিতীয় সব কিছু ভগবানের মধ্যেই অবস্থিত, এটাকে কল্পনা করতে হলে সমুদ্রের উপমাই সব থেকে ভালো উপমা হবে। সমুদ্র আর সমুদ্রের উপর বরফের অনেক টুকরো ভাসছে। কোটি কোটি বরফের যে টুকরো সমুদ্রের চারিদিকে ভাসছে সেগুলোও সব জল। টুকরোগুলো কোথায় আছে? জলের মধ্যেই আছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যাবতীয় যা কিছু আছে সব আপনারই মধ্যে আছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যত রূপ দেখা যাচ্ছে সব আপনারই রূপ, আপনার মধ্যেই সব রূপ বাস করছে। শাস্ত্রে এর আরেকটি উপমা দেওয়া হয় তা হল প্রতিবিম্বের উপমা। সকালবেলা ঘাসের প্রত্যেকটি ডগায় শিশির কণা পড়েছে, প্রত্যেকটি শিশির বিন্দুর মধ্যে সূর্য প্রতিবিম্বিত হচ্ছে। সেই একই সূর্য কিন্তু তার কোটি কোটি রূপ দেখা যাচ্ছে। প্রত্যেকটি শিশিরের বিন্দুর মধ্যে পুরো আকাশটাও প্রতিবিম্বিত হচ্ছে। এরপরে খুব নামকরা একটি মন্ত্রে বলছেন –

স পর্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।
কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতোহর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ।।

ঈশ্বর বা আত্মার গুণ বা লক্ষণ কি কি হতে পারে এই মন্ত্রে তারই বর্ণনা করা হচ্ছে। যজুর্বেদের মন্ত্র আবার ঈশাবাস্যোপনিষদের আট নম্বর মন্ত্রেও এটিকে রাখা হয়েছে। তিনি সর্বব্যাপী, জ্যোতির্ময়, অশরীর,

অক্ষত, শিরাহীন, নির্মল, অপাপবিদ্ধ, সর্বদর্শী, মনের নিয়ন্তা, সর্বোত্তম ও স্বয়ম্ভূ। তিনি নিত্যকাল স্থায়ী, এবং প্রজাপতিদের জন্য তিনি কর্তব্য বিধান করে দেন।

উতেয়ং ভূমির্বরুণস্য রাজ্ঞ উতাসৌ দ্যৌর্বৃহতী দূরেঅন্তা।
উতৌ সমুদ্রৌ বরুণস্য কুক্ষী উতাস্মিন্ন্ অল্প উদকে নিলীনঃ।।অ/৪/১৬/৩।।

উতেয়ং ভূমির্বরুণস্য রাজ্ঞ, যে বিরাট পৃথিবী আমরা দেখছি এর রাজা হলেন বরুণ। *উতাসৌ দ্যৌর্বৃহতী দূরেঅন্তা,* যে বিরাট অন্তরীক্ষ আর *উতৌ সমুদ্রৌ বরুণস্য কুক্ষী,* যে বিশাল সমুদ্র, এটা যেন তাঁর জঙ্ঘা। অথচ *উতাস্মিন্ন, অল্প উদকে নিলীনঃ,* ছোট্ট যে জলের ফোঁটা সেটাও তিনি। গীতা ও উপনিষদে বলছেন *অণোরণীয়াম মহতো মহীয়ান্,* অনু অর্থাৎ সব থেকে যেটা ক্ষুদ্র হতে পারে তিনি তার থেকেও ক্ষুদ্র আবার যেটা সব থেকে বৃহৎ হতে পারে তিনি তার থেকেও বৃহৎ। এখানে অন্য ভাবে বলছেন, সমস্ত পৃথিবীর তিনি রাজা, আকাশ আর সমুদ্রকে যদি জুড়ে দেওয়া হয় তখন সেটা হয়ে যাবে তাঁর জঙ্ঘা। বলতে চাইছেন ভগবান কত বৃহৎ হতে পারেন, অথচ তিনি জলের একটা ছোট্ট বিন্দুর মধ্যেও রয়েছেন। বলার উদ্দেশ্য, আমরা যে কোন সত্তার কথাই ভাবি না কেন, সব সত্তার পেছনে একমাত্র তিনিই আছেন। এ্যটমের কথা ভাবলে সেই এ্যটমের সত্তার পেছনেও তিনি আছেন আবার পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কথা ভাবলে, সেই সত্তার পেছনেও তিনিই আছেন। শুধু নামগুলো পাল্টে যায়, যেমন আমাদের ভেতরে যিনি আছেন তাঁকে প্রভু বলছি আর সব কিছুর মধ্যে যিনি আছেন তাঁকে বিভু বলছি। ভগবান চৈতন্যস্বরূপ, চৈতন্যের কোন বিভাজন করা যায় না। যেটা খণ্ডে আছে সেটাই ব্রহ্মাণ্ডে আছে। ভগবান বলতে বুঝি, বৈকুন্ঠে বিষ্ণু লক্ষ্মী দেবীকে নিয়ে বসে আছেন, সেখান থেকে তিনি রাজত্ব করছেন। এখানে ভগবান সম্বন্ধে তা বলা হচ্ছে ন। বেদের সময়েই ঈশ্বরের প্রভু ও বিভুর তত্ত্ব এসে গিয়েছিল। তিনি সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে আছেন, তিনি শুধু রাজা নন, তিনিই সেটা, অথচ তিনি একটি ছোট্ট জলকণাতেও আছেন। পরের একটি মন্ত্রেও এই ভাবটাই একটু অন্য ভাবে বলছেন।

সবিতা পশ্চাতাৎসবিতা পুরস্তাৎসবিতোত্তরাত্তাৎসবিতাধরাত্তাৎ।
সবিতা নঃ সুবতু সর্বতাতিং সবিতা নো রসতাং দীর্ঘমায়ুঃ।।ঋ-১০/৩৬/১৪

তিনি সামনে, তিনি পেছনে, তিনিই উত্তরে আবার তিনিই দক্ষিণে, কোন দিক নেই যে যেদিকে তিনি নেই, তিনি যেন আমাদের আনন্দ দেন। *সবিতা নঃ সুবতু সর্বতাতিং,* জীবনে যে দুঃখ-কষ্ট সেটা যেন তিনি দূর করেন আর আমাদের যেন তিনি দীর্ঘায়ু করেন। পরের দিকে আধ্যাত্মিক সাহিত্যেও এই ভাব এসেছে। গীতাতেও অর্জুন বলছেন হে ভগবান! আপনাকে সামনে থেকে প্রণাম, আপনাকে পেছন থেকে প্রণাম, পাশ থেকে প্রণাম। এই ভাব চণ্ডীতেও এসেছে, সামনেও তিনি, পেছনেও তিনি, এমন কোন জায়গা নেই যেখানে ঈশ্বর নেই। তিনি যেন আমাদের রক্ষা করেন, আমাদের যেন শান্তি দেন আর আমাদের যেন দীর্ঘায়ু করেন।

ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্ধনম্।
উর্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোরমুক্ষীয় মামৃতাৎ।।ঋ-৭/৫৯/১২।।

এটাই বিখ্যাত মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র। প্রধানতঃ শিবের প্রণাম মন্ত্র রূপে এই মন্ত্রের ব্যবহার করা হয়। ত্র্যম্বক রুদ্রের এক নাম, শিবকেও ত্র্যম্বক বলা হয়। শুধু শিবের মন্ত্র রূপে ব্যবহার না করে যে কোন জায়গায় এই মন্ত্র ব্যবহার করা যায়। *ত্র্যম্বকং যজামহে,* শিবকে আমার প্রণাম নিবেদন করছি। যিনি *সুগন্ধিং পুষ্টিবর্ধনম্,* সুগন্ধ মানে সুবাস, কিন্তু এখানে সুগন্ধের অর্থ যশ, গন্ধ যেমন চারিদিকে ছড়িয়ে যায় তেমনি শিবের কৃপায় আমার যশ বা সুনাম যেন চারিদিকে ছড়িয়ে যায়। *পুষ্টিবর্ধনম্,* সংসারে সুস্থ ভাবে জীবন-যাপন করার জন্য দরকার – সুস্বাস্থ্য, ধন-সম্পদ, খাদ্য, পানীয়, বস্ত্র ইত্যাদি – সবটাকে মিলিয়ে পুষ্টি বলা হচ্ছে, ভগবান শিবের কৃপায় আমার এই জিনিসগুলো যেন অর্থাৎ পুষ্টি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। লতায় কিছু ফল দড়কচা হয়ে থেকে যায়, এই ফলগুলির কোন পুষ্টিও হয় না, আর মানুষের কোন কাজেও আসে না, লতাতেই নষ্ট হয়ে যায়। হে শিব! আমি যেন তোমার সংসার বৃক্ষলতায় এই রকম দড়কচা ফল হয়ে শেষ না হয়ে যাই। আমার যেন পুষ্টি হয় এবং পুষ্ট

ফলের মত আমিও যেন জগতের কাজে আসতে পারি। এখানে জাগতিক অর্থে প্রার্থনা করে বলছেন – আমি ভগবান শিবের আরাধনা করছি, তিনি যেন আমার যশ, স্বাস্থ্য, ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করে আমার জীবনের পুষ্টি বর্ধন করেন। এই মন্ত্রের বৈশিষ্ট্য হল, একদিকে যেমন জাগতিক প্রার্থনা করা হচ্ছে অন্য দিকে আবার পারমার্থিক প্রার্থনাও করা হচ্ছে। দ্বিতীয় লাইনেই পারমার্থিক প্রার্থনা জানাচ্ছেন।

উর্বারুকম্, শশা, তরমুজ জাতীয় ফল যখন পেকে পুষ্ট হয়ে যায় তখন গাছ থেকে পেড়ে নেওয়া হয়। তার আগে লতার সাথে ফল লেগে থাকে, এটাই বন্ধন। গীতায় অশ্বত্থ বৃক্ষকে সংসারের সাথে তুলনা করা হয়েছে। এই মন্ত্রেও ঠিক ওই ভাবে তুলনা করে বলা হচ্ছে, সংসার রূপ লতাতে ফল ঝুলে আছে। লতা থেকে ফল যেভাবে পেড়ে নেওয়া হয়, হে ভগবান শিব! ঠিক সেইভাবে আপনি আমাকে এই সংসার রূপ লতার বন্ধন থেকে পেড়ে নিন। পেড়ে নিয়ে কি করতে বলছেন? *মৃত্যোরমুক্ষীয় মামৃতাৎ*, জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে বার করে অমৃতত্ত্বের দিকে নিয়ে যান। যখনই বেদে মৃত্যুর কথা আসবে তখন সেখানে সব সময় জন্ম-মৃত্যুর চক্রের অর্থেই নিতে হবে। এই যে বলছেন মৃত্যু থেকে আমাকে পেড়ে নিন, অমৃতত্ত্ব থেকে পেড়ে নেবেন না, এর তাৎপর্য হল – জন্মের মধ্যে আমার অস্তিত্ব আছে, কিন্তু মৃত্যু থেকেও যদি আমাকে পেড়ে নেওয়া হয় তাহলে আমার যে অস্তিত্ব সেটাই শূন্যবাদে চলে যাবে। এখানে কিন্তু তা প্রার্থনা করা হচ্ছে না। আমাকে শূন্য করে দেবেন না। তাহলে কি করতে বলছেন? অমৃতত্ত্ব, eternal existence থেকে যেন আমাকে সরিয়ে না নেওয়া হয়। এর অর্থ দাঁড়াল, সংসার লতাতে আমি একটা ফলের মত বন্ধনে পড়ে আছি, এই সংসার লতা থেকে আপনি আমাকে পেড়ে নিন, পেড়ে নিয়ে আমাকে অমৃতত্ত্ব প্রদান করুন। সমস্যা হল, আমাদের কাছে সংসার একটা জিনিস আর মুক্তি আরেকটা জিনিস। সংসার একটা জায়গায় আছে আর মুক্ত সংসার যেন আরেকটা জায়গায় আছে। ব্যাপারটা আসলে তা নয়, সংসারটাও সচ্চিদানন্দরই একটি অংশ, কিন্তু আমাদের চোখের সামনে সচ্চিদানন্দ সংসারে যেভাবে প্রতিভাসিত হচ্ছেন সেটা অন্য রকম। মূল ভাব হল এই দেহবোধ, সংসারবোধ যেন না আসে, আমার মধ্যে যেন আনন্দের ভাব থাকে। এই ধরণের অনেক বৈদিক মন্ত্র আমাদের দৈনন্দিন প্রার্থনার মধ্যে ঢুকে গেছে।

ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমান্ অসি ত্বং উত বা কুমারী।
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ।।অ-১০/৮/২৭

অথর্ব বেদের এই বিখ্যাত মন্ত্রটি সবারই মুখস্ত রাখা উচিৎ, আর সুযোগ পেলে, রাস্থা-ঘাটে, বাসে-ট্রেনে যেতে যেতে মন্ত্রটা মনে মনে আবৃত্তি করতে করতে এর অর্থ ও ভাব চিন্তা করে যেতে হবে। সামনে কোন খারাপ দৃশ্য চোখে পড়ে গেল, রাস্থায় কোন কাঙালী, ভিখারীকে দেখলে এক মুহুর্তের জন্য দাঁড়িয়ে তার সামনে এই মন্ত্রটি আবৃত্তি করুন।

ত্বং ভগবানকে উদ্দেশ্য করে বলছেন। *ত্বং স্ত্রী*, তুমি নারী, *ত্বং পুমান্*, তুমিই পুরুষ, *ত্বং কুমার উত বা কুমারী*, যৌবন প্রাপ্ত কিশোর সেও তুমি আর যুবতী মেয়ে সেও তুমি। কিন্তু তারপরেই বলছেন, *ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি*, ওই যে বৃদ্ধ চলচ্ছক্তিরহিত হয়ে লাঠি হাতে স্খলিত পদে কোন রকমে হেঁটে যাচ্ছে, সেও তুমি। বৃদ্ধ বলতে সবাইকেই বোঝাচ্ছে, যার সব শক্তি নিঃশেষিত হয়ে গেছে, যার কিছুই নেই সব দিক দিয়েই যে শেষ, যারা কাঙালী, ভিখারী, সেটাও তুমি নিজেই হয়েছ। *ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমখঃ*, বিশ্বে যত রূপ আছে সব তোমারই রূপ। গীতার বিশ্বরূপদর্শনেও ঠিক এরই বর্ণনা করা হয়েছে, সমষ্টি রূপটাও ভগবানের।

বেদের এই মন্ত্রে ভগবানকে যেমন সব রকম সুরূপের মধ্যে দেখানো হচ্ছে, যত স্ত্রী আছে সব তাঁরই রূপ, যত পুরুষ সেটাও তাঁরই রূপ, কুমার ও কুমারীর যত রূপ সেটাও তাঁরই রূপ ঠিক তেমনি আবার যেটা কুরূপ, যে রূপ বা দৃশ্য আমরা দেখতে চাই না, সেটাও ভগবানরই রূপ। খ্রীশ্চানরা এই ভাব খুব নিষ্টার সঙ্গে অনুশীলন করে। দরিদ্র, কাঙালী, রোগীদের সেবার মাধ্যমে তারা যীশুকেই সেবা করে। সবাই সেই child of God, এই ভাব নিয়ে তারা সবাইকে সেবা করে। কিন্তু এখানে child of God রূপে দেখে সেবার কথা বলা হচ্ছে না, সাক্ষাৎ তিনিই সব কিছু হয়েছেন। এই মন্ত্রকেই আধার করে পরবর্তি কালে স্বামীজী সবাইকে আহ্বাণ

জানিয়ে বলছেন – মুর্খ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী সবাই তোমার ভাই। এই মন্ত্র যদি আমাদের জীবনের কেন্দ্রবিন্দুতে একবার চিরস্থায়ী ভাবে বসিয়ে নেওয়া যায়, তারপরেও হয়ত আমাদের ভুল হবে, মনের মধ্যে যখন প্রচণ্ড দুঃখ, রাগ, অভিমান হবে তখন আবার ভুল হবে কোন সন্দেহ নেই, ভুল করে সামনের লোককে মানুষ জ্ঞান করে বসব, কিন্তু অনেক দিন ধরে মন্ত্রের এই ভাবকে অনুশীলন করে গেলে আস্তে আস্তে ষড় রিপুর প্রভাব, কাম, ক্রোধাদির প্রভাব থেকে বেরিয়ে আসতে পারব। দুষ্ট লোক আমার ক্ষতি করে দিয়েছে, আমি রেগে যাচ্ছি ঠিকই কিন্তু মনে মনে *ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমান্ অসি ত্বং কুমার বা উত কুমারী*, যাকে দেখে আমি রেগে যাচ্ছি, যার উপস্থিতি আমাকে পীড়া দিচ্ছি, তাকে দেখেও আমি বলছি – হে নারায়ণ! এই রূপেও তুমি। এটাই ব্যবহারিক বেদান্ত। বেদান্তের সিদ্ধান্ত বাক্য হল *সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম*, এই সিদ্ধান্ত বাক্যের ব্যাবহারিক দিক হল – *ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমান্ অসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী। ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ।।* বেদের এটি একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্র। সারাটা দিন এই মন্ত্রকে যদি কেউ ঘোরাতে থাকে তার inter personal relationship পুরো পাল্টে যাবে। বাসে, ট্রেনে যেতে যেতে কত রকম লোকের সংস্পর্শে আসতে হচ্ছে, কারুর সাথে ঝগড়া হচ্ছে, কারুর সাথে বন্ধুত্ব হচ্ছে, রিক্সাওয়ালার সাথে কথা কাটাকাটি হচ্ছে, কিন্তু চট করে মাথায় যদি এই মন্ত্রটা ঘুরতে থাকে, এই রূপটাও ভগবানেরই, তখন পারস্পরিক সম্পর্কটা অন্য রকম হয়ে যাবে। ঠাকুর বলছেন, তবলার বোল মুখে বলা সহজ কিন্তু তবলায় হাত দিয়ে বোল বাজান খুব কঠিন। এই মন্ত্রের ভাব আমরা মুখে বলছি বটে কিন্তু ব্যবহারিক জীবনে অনুশীলন করা সত্যিই খুব কঠিন। আবার এটাও আছে, আমার হয়ত একটা মন্ত্রের ভাব ভালো লাগে, আপনার হয়ত আরেকটা মন্ত্রের ভাব ভালো লাগছে, তাতে কোন অসুবিধা নেই। এভাবেই আমাদের জীবন পরিপুষ্টতার দিকে এগিয়ে চলে। বেদে অনেক রকম মন্ত্র আছে, কিছু মন্ত্রকে মনে হতে পারে এই মন্ত্রের ভাবই আমার জীবন-দর্শন। যে কোন মন্ত্রের ভাবকেই গ্রহণ করে থাকুন না কেন, সেই মন্ত্রের ভাবই তার জীবনের বাঁধনকে, দেহ-ইন্দ্রিয় কেন্দ্রিক মনকে ধীরে ধীরে পাল্টাতে শুরু করে দেবে। নেগেটিভ ইমোশানগুলি, কাম, ক্রোধ, লোভ এগুলো কখন যে নিস্তেজ হয়ে দমে যাবে টেরই পাওয়া যাবে না। আত্মার ব্যাপারে একটি মন্ত্রে বলছেন –

অকামো ধীরো অমৃতঃ স্বয়ম্ভূ রসেন তৃপ্তো ন কুতশ্চনোনঃ।
তমেব বিদ্বান্ ন বিভায় মৃত্যোরাত্মানং ধীরমজরং যুবানাম্।।অ-১/৮/৪৪।।

উপনিষদে আত্মার উপর অনেক মন্ত্র আছে, বিশেষ করে ঈশোপনিষদ ও কঠোপনিষদে আত্মার বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা করে প্রচুর মন্ত্র আছে। সচ্চিদানন্দ, ঈশ্বর, আত্মা এই শব্দগুলো আমরা প্রায়ই শুনে থাকি, শব্দগুলির প্রচুর ব্যবহারও করে থাকি। আত্মার স্বরূপ কি কেউ প্রশ্ন করলে আমরা সঠিক উত্তর দিতে পারি না। উপনিষদ ও অদ্বৈত দর্শনে আত্মাকে নেতি নেতি করেই বলা হয়, অর্থাৎ আমরা যে যে জিনিসগুলি জানি আত্মা সেই জিনিস নয়। কিন্তু আত্মার কিছু কিছু লক্ষণ, চারিত্রিক গুণ নেতি নেতি থেকে বেরিয়ে আসে। মাঝে মাঝে সেই গুণ ও লক্ষণকেও আলোচনা করা হয়। এই মন্ত্রে যেমন প্রথমে বলছেন *অকামো*, আত্মার মধ্যে কোন কামনা নেই। আত্মার ক্ষেত্রে পূর্ণকাম শব্দ ব্যবহার করা যাবে না। পূর্ণকাম বলতে বোঝায়, আগে তাঁর মনে কোথাও কামনা ছিল, সেই কামনা থেকে এখন তিনি পূর্ণকাম হয়ে গেছেন। কিন্তু আত্মার মধ্যে কোন দিনই কোন কামনা ছিল না, সেইজন্য এখানে *অকামো* শব্দ নেওয়া হয়েছে। অকামের বদলে আরেকটি শব্দ ব্যবহার করা হয় – আপ্তকাম। আপ্তকামের অর্থও তাই, কোন কিছুর কামনাই তাঁর মধ্যে নেই, সব সময় তিনি পূর্ণ হয়ে আছেন, তাই তাঁর মধ্যে কোন ধরণের ইচ্ছা জাগে না। যাঁরা সাধু জীবনে প্রবেশ করেন তাঁদের এই ব্যাপারটা মাথায় রাখার চেষ্টা করতে হয় – আমি পূর্ণকাম, আমি যা কিছু করছি তার একটাই উদ্দেশ্য অপরের মধ্যে যে অপূর্ণতা আছে, সেই অপূর্ণতাকে পূর্ণ করার জন্য কাজ করছি, আমার নিজের জন্য কিছুই লাগবে না, কারণ আমি সেই পূর্ণ আত্মা। এই ভাব সব সন্ন্যাসী রাখতে পারেন না, কিন্তু তাই বলে তাঁরা আদর্শ থেকে সরে যাবেন তা নয়। দেহ ও ইন্দ্রিয় থেকে নিজের অস্তিত্বকে যদি সরিয়ে নেওয়া হয় তখন তিনি আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবেন। তখন আত্মার যে গুণগুলো আছে সেই গুণগুলিও তাঁর মধ্যে থাকতে হবে। কিন্তু আমরা দেহ ও ইন্দ্রিয়ের বোধ থেকে বেরিয়ে আসতে পারি না। যতই আমরা শাস্ত্র পাঠ করি না কেন, আমি কে ভাবলেই ঘুরে

ফিরে চলে যাব শরীর আর ইন্দ্রিয়ে। আদর্শ রূপে যদি বুঝতে হয় তাহলে গুরু আমাকে বলে দেবেন তুমি সেই আত্মা। আমি যদি সেই আত্মা হই তাহলে আত্মার যা যা গুণ সব গুণ আমারও হবে। দরিদ্রের ব্যাটার গুণ এক রকম আবার রাজার ব্যাটার গুণ অন্য রকম হয়।

প্রথমেই আত্মার গুণ বলছেন আত্মা *অকামো*। আমার মধ্যে যদি কামনা-বাসনা থাকে তাহলে বুঝতে হবে আমার মধ্যে গোলমাল আছে, আমি আত্মা নই। দ্বিতীয় বলছেন *ধীরো*, ধীর শব্দের অর্থ বোঝার আগে ধীরের বিপরীত কি হবে বোঝা দরকার। ধীরের উল্টো চঞ্চল, যার চিত্ত বা মন অস্থির সে চঞ্চল হবে। বাচ্চা ছেলের মন সব সময় অস্থির, বাচ্চা বাদে অস্থির মন হয় পাগলের আর দ্বিতীয় যার কামনা-বাসনা আছে। আমরা কেউ বাচ্চা নই, পাগলও নই, তাহলে আমাদের মন কেন স্থির হয় না? কারণ আমাদের মনে কামনা-বাসনা আছে। কখন এটা করছি, একটা কাজ করতে করতে আরেকটা কাজের চিন্তা করছি, সেই কাজ ছেড়ে অন্য কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ছি, এটাই চাঞ্চল্যের লক্ষণ। চাঞ্চল্যের বিপরীত হল ধীর। যেখানেই অপূর্ণতা সেখানেই কামনা আছে। তাই অপূর্ণতা থাকলে চাঞ্চল্য থাকবে। অপূর্ণতা না থাকলে ধীর হয়ে যাবে। আত্মা *অকামো*, সেইজন্য সে *ধীরো*। যিনি আত্মবান, নিজেকে আত্মা রূপে মনে করেন তিনি অবশ্যই ধীর পুরুষ হবেন, তাঁর মধ্যে কোন ধরণের চাঞ্চল্য থাকবে না।

আত্মার তৃতীয় গুণ *অমৃতঃ*, আমি নাশ হয়ে যাব এই ভাব তাঁর মনে কখনই আসবে না। স্বামীজী আলেকজাণ্ডার আর ব্রাহ্মণের কথা বলছেন, সেখানে ব্রাহ্মণ আলেকজাণ্ডারকে বলছেন – তুমি আমাকে কী করে মারবে! আত্মার নাশ কেউ করতে পারে না। জীবন থেকে কোন কিছু চলে গেলে আমাদের সবারই কষ্ট অনুভব হয়। তবে যত এই ভাব নিয়ে জীবনে অনুশীলন করা যাবে ততই কিছু চলে যাওয়ার কষ্টগুলো নিয়ন্ত্রণ করাটা মুঠোর মধ্যে চলে আসবে। কী ভাব? অমৃতের ভাব। অমৃতের ভাব যদি কারুর ভেতরে এসে যায়, তার জীবন পুরোপুরি পাল্টে যাবে। গ্যালিলিও টেলিস্কোপ দিয়ে আবিষ্কার করলেন সূর্য পৃথিবী প্রদক্ষিণ করছে। গ্যালিলিওর উপর তখনকার চার্চ কর্তৃপক্ষরা প্রচণ্ড খেপে গেল। অন্য দিকে দেশে গ্যালিলিওর খুব সম্মান ছিল। কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দেওয়ার পর তাঁকে বলা হল – তুমি যদি ক্ষমা ভিক্ষা করে নাও তাহলে তোমাকে আমরা মৃত্যুদণ্ড দেব না। গ্যালিলিও কী আর করবেন, নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্য ক্ষমা চাইতে বাধ্য হলেন। গ্যালিলিও যখন কোর্ট থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন, তখন তিনি হাল্কা করে বন্ধুদের বলছেন – তবে আমি যা বলেছি সেটাই সত্য। আপনার হাতে ক্ষমতা আছে তাকে আপনি ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়ে দিতে পারেন, কিন্তু সত্যকে যিনি জেনে গেছেন তিনি ওই সত্য থেকে কখনই নড়বেন না। যদি নিজেকে বিশিষ্ট ব্যক্তি বলে মনে করেন, আমি অনন্ত, আমার মধ্যে অনন্ত শক্তি আছে, আমি সাধারণ কেউ নই, এই ব্যাপারে আপনার কোন উপলব্ধি নাও থাকতে পারে, আপনি এমনিতে একজন অতি সাধারণ লোক, আপনাকে কেউ মানে না, আর তাই নয়, বিপরীত বিষম পরিস্থিতিতে আপনাকে সবাই পিষতে থাকে তখনও আপনি ভাবছেন – একবার যদি সুযোগ আসে আমি দাঁড়িয়ে দেখাব। কিন্তু ঐ অবস্থায় আপনি যদি মারা যান, জহুদিদের হিটলার যেভাবে মারছিল, যাঁর দৃঢ় বিশ্বাস যে আমি সর্বশক্তিমান, যখন মারা যান তখনও তিনি মাথা উঁচু করে মরবেন। যদি মরতেই হয় তাহলে মাথা উঁচু করে মরাই ভাল, আর যদি বেঁচে থাকতে হয় তখনও মাথা উঁচু করেই বেঁচে থাকা ভালো। এখন বদমাইশ ক্ষমতাবান লোক যদি সাধারণ কথায় সবার সামনে মুণ্ডু কেটে দিতে আসে তখন বাঁচার জন্য তার সামনেই তার কথাকে ঠিক বলে মেনে নিতে হয়। কিন্তু মনে মনে জানে এরা সব অপদার্থ, কারণ সত্য কথা শোনার মত দম এদের মধ্যে নেই। দুর্বল লোকেদের সত্য কথা শোনার দম থাকে না। যদি আপনার মধ্যে এই ভাব থাকে – আমি শুদ্ধ আত্মা, আমার মৃত্যু নেই, শুধু মৃত্যুই নয় শরীরের কিছু হয়ে গেল কোই পরোয়া নেই, আমি সর্বশক্তিমান, দেখবেন আস্তে আস্তে আপনার ব্যক্তিত্ব কোন পর্যায়ে চলে গেছে। কোন বিষম পরিস্থিতির প্রভাবে আপনাকে মাটিতে পড়ে যেতে হয়েছে তখনও এই ভাব আপনাকে রক্ষা করবে। কথায় আছে, হাতি যখন পাঁকে পড়ে চামচিকেও তাকে লাথি মারে। লাথি খাচ্ছে, তখনও বলছে – আমি হাতি, নেহাৎ পাঁকে পড়ে গেছি, দাঁড়াও একবার বেরিয়ে আসতে দাও, তারপর আমার ক্ষমতা বুঝবে। এই ভাব যদি না রাখতে পারে তাহলে নচিকেতা যেমন তাঁর বাবাকে বলছেন – শস্যের দানার মত মানুষ জন্মাচ্ছে আর মরছে। আপনিও পিঁপড়ে

মশার মত জন্মেছেন ওই পিঁপড়ে মশার মতই মরতে থাকবেন। একটা মহৎ আদর্শকে যদি গ্রহণ করে এগিয়ে যান তাহলে মাথা উঁচু করে বাঁচবেন আর মাথা উঁচু করেই মরবেন। বেদের এই মন্ত্রগুলো কোন তাত্ত্বিক বা কাব্যিক রূপে কিছুই বলা হচ্ছে না, এটাই বাস্তব সত্য।

আত্মার চতুর্থ গুণ *স্বয়ম্ভূ*, আত্মাকে কেউ জন্ম দেয়নি। যাঁর কেউ জন্ম দিতে পারে না, তাই তাঁকে কেউ নাশও করতে পারে না। স্বয়ম্ভূ শব্দ উপনিষদ এবং অন্যান্য শাস্ত্রেও অনেকবার আসে। আত্মার ব্যাপারে বলতে গিয়ে আবার বলছেন *রসেন তৃপ্তো ন কুতশ্চনোনঃ*। বেদে রস শব্দ অনেকবার এসেছে। রস মানে আনন্দ, রস মানে সার। যেমন জলকে বলছি এর মধ্যে দ্রবের ভাব আছে, জলের মধ্য রস আছে। এই রস থেকেই হয়েছে রাসলীলা। ভগবানকে বলা হয় *রসো বৈ সঃ*, সেইজন্য ভগবানের আরেকটি নাম রস। আত্মা কি রকম? আত্মা রসে পরিপূর্ণ, তাঁর কোন কিছুর অভাব নেই। যদি কেউ খুব দুঃখ কষ্টে পড়ে থাকে তখন একবার ভাবতে হয় – আমি তো শুদ্ধ আত্মা, আমি তো রসে পরিপূর্ণ, আমার স্বরূপই তো আনন্দস্বরূপ। কিছু দিন বাদে দেখা যাবে তার মন থেকে অবসাদ ধীরে ধীরে চলে গেছে। এরপর আবারও তার মধ্যে অবসাদ আসবে, কারণ সে তো আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত নয়, কিন্তু তখনকার মত অবসাদটা নেমে যাবে। জগতে যত রকম সমস্যা আছে, দৈনন্দিন জীবনে আমাদের মধ্যে যত রকমের দুর্বলতা দেখা যায়, সব ক্ষেত্রে বাহ্যিক কারণ অত্যন্ত নগণ্য, সবটাই আমাদের মাথা থেকে আসছে। আমি যদি নিজেকে দুর্বল মনে করি, সেখানে আমার মনই কাজ করছে। মন থেকেই যদি দুর্বলতা আসে, মনের মধ্যেই যদি দুর্বলতা বাসা বেঁধে থাকে তাহলে মনের সঙ্গে লড়াই করে নিলেই হল। বাইরে থেকে একটা অসুর যদি আমার সাথে লড়াই করতে আসে তখন আমাকেও অসুরের সঙ্গে লড়াই করতে বন্দুক তরোয়াল বার করতে হবে। কিন্তু অসুর যদি আমার ভেতরেই থাকে তখন লড়াইটা ভেতরেই করতে হবে। আমার মধ্যে যে দুর্বলতা আসছে, মনের মধ্যে থেকে থেকে যে অবসাদ আসছে, দুঃখের অনুভূতি আসছে, এগুলো কোথা থেকে আসছে? ভেতর থেকেই আসছে, তাই লড়াইটা এখানেই হবে। এক সেকেণ্ডের জন্য যদি ভাবি আমি সেই শুদ্ধ আত্মা, আমি সেই রসস্বরূপ, যতটুকু সময়ের জন্য ভাবছি ততটুকু সময়ের মধ্যে দেখা যাবে আস্তে আস্তে নেগেটিভ ভাবটা পরিষ্কার হয়ে মন শান্ত হয়ে গেছে। যে যে চিন্তা মনকে দুর্বল করে দিচ্ছে, ওই চিন্তাগুলিকে আমাকে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। আপনি একটা গাড়ি কিনতে চাইছেন কিন্তু আর্থিক ক্ষমতা সায় দিচ্ছে না। শুধু ভেবেই যাচ্ছেন – একটা গাড়ি কিনলে হত। এবার গাড়ি কেনার ভাব আর নিজেকে আলাদা করে দিন, এরপর দেখুন মন কীভবে উপরের দিকে উঠে এসেছে। তারপর ভাবুন, আমি সেই পূর্ণকাম, আমি তো সেই রসস্বরূপ, আমার একটা গাড়ি নেই বলে কেন আমি অস্থির হব! ওই মুহুর্তটুকু সময়ের মধ্যে দেখবেন আপনার ভেতরে যে অসুরটা দাঁড়িয়েছিল, ওর নাশ হয়ে গেছে। অসুর আবার আসবে, এরা রক্তবীজের বংশধর। অসুররা যদি রক্তবীজের সন্তান হয় তাহলে আপনিও তো রসস্বরূপ, সে যতবার আসবে আপনিও ততবার তাড়াবেন। কিছু দিন বাদে দেখবেন আস্তে আস্তে এই লড়াইটা আপনি জিততে শুরু করেছেন। কিন্তু আপনার টাকা-পয়সা নেই, খাওয়া-পড়ার অভাব চলছে, এগুলো আলাদা ব্যাপার, জাগতিক সমস্যাকে জাগতিক ভাবেই মোকাবিলা করতে হবে। আমার টাকা-পয়সা নেই একটা সমস্যা ঠিকই, কিন্তু তার জন্য অবসাদ কেন আসবে! আপনার হাত কেটে গেছে, এটাও সমস্যা কিন্তু ঠিক মত ওষুধ লাগালে ভালো হয়ে যাবে, এরজন্য অবসাদগ্রস্ত কেন হতে হবে! বাড়ির ছাদ দিয়ে যদি জল পড়ে সত্যিই সমস্যা। এগুলোকে নিয়ে এখানে কিছু বলা হচ্ছে না। তখন বলবে, তুমি ছাদ সারিয়ে নাও, সারাতে না পারলে ওখানে একটা বালতি রেখে দাও। তার জন্য অবসাদ কেন হতে যাবে! তারপরেও যদি অবসাদ হয়, তাহলে চিন্তা করুন আমি তো সেই রসে পরিপূর্ণ। দেখবেন আস্তে আস্তে অবসাদ ভাবটা কেটে গেছে। কেটে যাওয়ার পর আমি সেই রসে পরিপূর্ণ ভাবটাও চলে যাবে, আবার অবসাদ আসবে। আসবে, কিছু করার নেই, লড়াই এভাবেই হয়, এভাবেই চলতে থাকবে। আত্মার সাক্ষাৎকার না হওয়া পর্যন্ত লড়াই চলবে। আত্মার সাক্ষাৎকার হয়ে গেলে আমি সেই রসে পরিপূর্ণ এই ভাবটা চিরস্থায়ী ভাবে থেকে যাবে। তার আগে পর্যন্ত লড়াই চলতে থাকবে। তবে যতটুকু বিচার করবেন ততটুকুই লাভ। কিন্তু এখানে যা কিছু বলা হচ্ছে, এগুলোই একমাত্র চিরন্তন সত্য।

তমেব বিদ্বান্ ন বিভায় মৃত্যুঃ। আত্মতত্ত্ব সাধারণ লোক জানতে পারে না, বুঝতে পারে না, মানতেও পারে না। কিন্তু যিনি বিদ্বান, যিনি আত্মতত্ত্বকে জেনে গেছেন তাঁর মধ্যে আর মৃত্যুর ভয় থাকে না। সন্ন্যাসীদের তাই কোন মৃত্যু ভয় থাকে না, কারণ তাঁরা আত্মতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যান। শেষে বলছেন, *আত্মানং ধীরমজরং যুবানাম্*। আত্মা ধীর, অজর, তাঁর জন্ম নেই আর *যুবানাম্*, চিরন্তন, সব সময় নতুন। আত্মা চিরকাল যুবক, কোন দিনই আত্মা বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হয় না। আত্মা তাই সব সময় তরতাজা। আত্মার এই সতেজ ভাবকে অগ্নির মন্ত্রেও নিয়ে আসা হয়েছে। এই ভাবগুলিই আমাদের মনের অবসাদ দূর করতে প্রভূত সাহায্য করে।

চত্বারি বাক্‌পরিমিতা পদানি তানি বিদুর্ব্রাহ্মণা যে মনীষিণঃ।
গুহা ত্রিণি নিহিতা নেঙ্গয়ন্তি তুরীয়ং বাচো মনুষ্যা বদন্তি।।ঋ-১/১৬৪/৪৫।।

চত্বারি বাক্‌পরিমিতা পদানি, যত রকমের কথা আছে সব কথা চারটে পায়ে দাঁড়িয়ে থাকে, অর্থাৎ বলতে চাইছেন মানুষ যে কথা বা বাক্যালাপ করে সেই কথা চার রকমের। *তানি বিদুর্ব্রাহ্মণা যে মনীষিণঃ*, ব্রাহ্মণদের মধ্যে যাঁরা মনীষী তাঁরা এই চার ধরণের কথাকে জানেন। *গুহা ত্রিণি নিহিতা নেঙ্গয়ন্তি*, চারটির মধ্যে তিন ধরনের কথা গুহার মধ্যে লুকিয়ে আছে। *তুরীয়ং বাচো মনুষ্যা বদন্তি*, তুরীয় শব্দটা এসেছে চত্বারিয় থেকে, তুরীয় অবস্থা যে অবস্থাকে সমাধির অবস্থা বলে। কিন্তু বাণীর ক্ষেত্রে চতুর্থ হয়ে যায় *তুরীয়ং বাচো*, মুখ দিয়ে যে বাণীর শব্দ উচ্চারিত হয়।

চার ধরণের বাণীর মধ্যে প্রথমটিকে বলে পরা, দ্বিতীয় পশ্যন্তি, তৃতীয় মধ্যমা আর চতুর্থ বৈখরী। কথা বলার সময় আমরা প্রথমে মুখ দিয়ে বলি, কিন্তু এই কথার শব্দ ধীরে ধীরে নীচের দিকে যেতে থাকে। প্রথম কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে, জিহ্বা, ঠোঁট নড়তে থাকে। জিহ্বা, ঠোঁট নড়া যদি বন্ধ করে দেওয়া হয় তখন যে বাণী বের হয় সেটা কণ্ঠদেশ থেকে বের হয়। দীক্ষার সময় গুরু বলে দেন মন্ত্র জপ করার সময় ঠোঁড় আর জিহ্বা যেন না নড়ে। কিন্তু বেশির ভাগ ভক্তদের জপের সময় ঠোঁট আর জিহ্বার নড়া বন্ধ করতে হিমশিম খেতে হয়। জিহ্বা নড়া বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর মন খুব শান্ত হয়ে গেলে খুব ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে কণ্ঠের একটা জায়গা হাল্কা ভাবে কিছু একটা যেন নড়ছে। এটাই মধ্যমা বাণী, মধ্যমায় vocal chordটা খুব হাল্কা ভাবে নড়তে থাকে। জপ খুব আস্তে হওয়ার কারণ এটাই, বৈখরী আর মধ্যমাতে ঠোঁট, জিহ্বা, কণ্ঠে physical movement হয় বলে জপ বেশি স্পীডে হতে পারে না। এটার উপর যদি কারুর নিয়ন্ত্রণ এসে যায় তার জপের স্পীড অনেক বেড়ে যাবে। তখন সে মোটামুটি চিন্তার স্তরে চলে যাবে। বাণী যখন এই স্তরে চলে যাচ্ছে তখন তাকে বলা হয় মধ্যমা। মধ্যমার নীচে যখন বাণী চলে যায় তখন তাকে বলছে পশ্যন্তি। পশ্যন্তি আসলে ওঁম্। ওঁম্ মানে, সমস্ত শব্দের উৎপত্তি এই পশ্যন্তি থেকেই হয়। এরও নীচের বাণীর অবস্থাকে বলছেন পরা, পরা মানে অনাহত। শব্দ বা বাণীর এই চারটি ধাপ হল, স্থূল থেকে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতর থেকে যেন আরও সূক্ষ্মতমের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

তানি বিদুর্ব্রাহ্মণা যে মনীষিণঃ, ব্রাহ্মণদের মধ্যে যাঁরা মনীষী তাঁরা জানেন স্থূল শব্দের পেছনে একটা সূক্ষ্ম শক্তি রয়েছে, সেই সূক্ষ্ম শক্তির পেছনেও আরও একটা সূক্ষ্ম শক্তি রয়েছে, এইভাবে পরা হল শেষ ধাপ। বাণীর এই চারট ধাপকে কোন কোন শাস্ত্রে একটু অন্য ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে বড় বড় কণ্ঠশিল্পীরাও বলেন, আওয়াজ প্রথমে মুখ দিয়ে বের হয়, সাধনা করার পর কণ্ঠ থেকে আওয়াজ বের হতে থাকে, আরও সাধনা করতে করতে ক্রমে ক্রমে হৃদয় দেশ থেকে, পরে নাভি দেশ থেকে আওয়াজ বের হয়। ভীমসেন যোশীও তাঁর শিষ্যদের বলতেন যখন সা বলবে তখন নাভি দেশ থেকে যেন আওয়াজটা বেরোয়। ওনারা একেবারে পরা স্তর থেকে আওয়াজটা বার করতেন, ওই আওয়াজ যখন গলা দিয়ে বেরিয়ে আসবে তখন গম্ভীর ধ্বণি হবে। অনেকক্ষণ ধ্যান করার পর বা খুব আবেগপ্রবণ হয়ে যাওয়ার পর কোন কথা বললে মনে হবে যেন গলা থেকে শব্দ বেরিয়ে আসছে। গলা থেকে যে শব্দ বেরোয় তখন আওয়াজটা গম্ভীর হয়ে যায়। যখন আরও নীচ থেকে আওয়াজ বেরোয় তখন সেই আওয়াজ আরও গম্ভীর হয়ে যায়। হিন্দীতে নামকরা কবি ছিলেন সুর্যকান্তি ত্রিপাঠি নিরালা, তিনি ধ্বণিকে নিয়ে বলছেন জলদমন্দ্র রব, কণ্ঠস্বর হবে গম্ভীর মেঘের

মৃদু মৃদু গর্জনের মত। বড় উচ্চাঙ্গ কণ্ঠশিল্পী যখন সা আওয়াজ করেন তখন সেই সা অনেক গভীর থেকে বেরিয়ে আসে। যদিও সঙ্গীত শিল্পীরা স্বরধ্বণি অন্য ভাবে ব্যাখ্যা করেন এখানে সেভাবে বলা হচ্ছে না।

মনীষীরা ধ্বণিকে বৈখরী, মধ্যমা, পশ্যন্তি ও পরা এই চারভাবে ব্যাখ্যা করেন। আমরা সবাই বৈখরী স্তরেই কথা বলি। বলছেন, তোমরা বৈখরী থেকে মধ্যমাতে যাও, মধ্যমা মানে চিন্তার জগৎ। মধ্যমাতে শব্দ পুরোপুরি চিন্তার স্তরে থাকে। চিন্তার জগতের পেছনে, যেখানে চিন্তার জন্ম হয়, যাকে অনাহত বলা হয়, ওখানে শুধু ওঁম্, এই জায়গাকে বলছেন পরা। এর পারেই নাদ ভেদ। এই পরাকে অতিক্রম করে যখন নাদ ভেদে চলে যায় তখনই ঈশ্বর দর্শন হয়। ঠাকুরও নাদ ভেদের কথা বলছেন। এখানে আমরা বেদের মন্ত্র নিয়ে আলোচনা করছি, কথাবার্তা, বাক্যালাপ এতে বেদের কোন আগ্রহ নেই। মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি বলতে চাইছেন, তুমি যদি আত্মানুভূতি লাভ করতে চাও, ঈশ্বর বা আত্মাকে যদি জানতে চাও তাহলে সব কথা বন্ধ কর। কথার পেছনে যে স্নায়ুশক্তি আছে সেটাকেও বন্ধ কর, শব্দ যেখানে চিন্তা রূপে আসছে সেটাকেও বন্ধ কর। এরপর অনাহতের যে শেষ ধাপ, যেখানে সমস্ত শব্দের জন্ম সেটারও পারে চলে যাও। ওইটাই অনাহত বা নাদ। তাই বলছেন, সাধারণ মানুষ *ঠোঁট* আর জিহ্বার মধ্যে থাকে আর মনীষীরা *গুহা ত্রিণি নিহিতা নেঙ্গয়ন্তি*, অর্থাৎ *ঠোঁট* আর জিহ্বার পেছনে বাকি যে তিনটে আছে সেটাকেও জানেন। এই তিনটেকে ভেদ না করলে আত্মানুভূতি হয় না। এরপর ঋগ্বেদরই আরেকটি মন্ত্রে বলছেন জীবনের অশুভ জিনিসগুলিকে কীভাবে নাশ করতে হয়।

আ বিবাধ্যা পরিরারস্তমাংসি চ জ্যোতিষ্মন্তং রথমৃতস্য তিষ্ঠসি।
বৃহস্পতে ভীমমমিত্রদম্ভনং রক্ষোহণং গোত্রভিদং স্বর্বিদম্।।ঋ-২/২৩/৩।।

যিনি ভগবান তিনি Destroyer of Darkness and Evil, এখানেও ব্রহ্মণস্পতকে উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে, *আ বিবাধ্যা পরিরারস্তমাংসি চ*, যারা দুষ্ট আর যেখানে তমস বা অন্ধকার সেই দুষ্ট আর অন্ধকারকে তিনি বিদূরিত করে দিয়েছেন। অর্থাৎ বলতে চাইছেন, ঈশ্বরের কৃপায় দুষ্ট শক্তি আর তমসের নাশ হয়ে গেছে। তারপরেই বলছেন, *জ্যোতিষ্মন্তং রথমৃতস্য তিষ্ঠসি*, আমাদের জীবনে অন্ধকার যা কিছু আছে আর দুষ্ট শক্তি যা আছে সব কিছুকে সরিয়ে দিয়ে তিনি এবার রথের উপর আরূঢ় হয়েছেন। কিসের রথ? *ঋতস্য*, ঋতম্ নিয়ে আমরা এর আগে কয়েকবার আলোচনা করেছি, সেই ঋতের রথে তিনি আরূঢ় হয়েছেন। তার মানে, অনৃত যা কিছু আছে, যেখানে মিথ্যা, অধর্ম, দুষ্ট শক্তির প্রভাব রয়েছে সেখান থেকে এই সব অনৃতকে সরিয়ে দিয়ে *জ্যোতিষ্মন্তং রূপে তিষ্ঠসি*, অবস্থান করছেন। জীবনে যেখানেই ঈশ্বরের কৃপা হয়, যেখানেই ঈশ্বরের উপস্থিতি হয় সেখান থেকে সমস্ত তমস ভাব, নিকৃষ্ট ভাব দূরীভূত হয়ে যায়। ঈশ্বরের জ্ঞানের আলোতে, তাঁর পবিত্রতার আলোর প্রভাবে এই ধরণের সব অশুভের নাশ হয়ে যায়।

বৃহস্পতে ভীমমমিত্রদম্ভনং, বৃহস্পতি হলেন বুদ্ধি বা জ্ঞানের দেবতা। তিনি কী করেন? *অমিত্রদম্ভনং*, অমিত্র অর্থাৎ যে আমার শত্রু, যার মধ্যে মিত্রতার ভাব নেই, তার দম্ভকে তিনি নাশ করে দেন। *রক্ষোহণং গোত্রভিদং স্বর্বিদম্*, তার সাথে তিনি আলোকে আমার কাছে আসা থেকে যে আটকে রেখেছে সে বাধাটা তিনি ভেঙে দেন। যেমন আমি ঘরের ভেতরে বন্দী হয়ে আছি, বাইরে থেকে সব দরজা বন্ধ, বাইরের আলো ভেতরে আসতে পারছে না, দরজাকে ভেঙে দিয়ে তিনি আলোকে ঘরের ভেতরে নিয়ে এলেন। *স্বর্বিদম্* শব্দের অর্থ হল যিনি আলো নিয়ে আসেন, এই শব্দই পরে গোবিন্দম্ হয়ে গেছে। গোবিন্দ শব্দের অর্থ হল যিনি গো অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণে রাখেন। *স্বর্বিদম্* মানে যিনি আলো দেন। মূল কথা ঈশ্বরের কাছে এই ভাব নিয়ে প্রার্থনা করা হচ্ছে, সমস্ত অশুভ শক্তি, সব রকমের তমসতাকে অপসারিত করে তিনি জীবনের আলো নিয়ে আসছেন। ঋগ্বেদেরই একটি খুব বিখ্যাত মন্ত্র নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে।

বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরা সুব।
যদ্ভদ্রং তন্ন আ সুব।।ঋ-৫/৮২/৫।।

এই মন্ত্রটিকে কল্যাণকারি মন্ত্র রূপে গণ্য করা হয়, সবারই এই মন্ত্র রোজ পাঠ বা কিছুক্ষণ অন্তত জপ করা উচিত। *বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরা সুব*, হে সবিতা! আপনি সমস্ত বিশ্বের দেবতা বা ঈশ্বর, আমার

জীবনে যা কিছু অশুভ, যা কিছু দুষ্কর্ম, যে দুর্বুদ্ধি আমাকে দিয়ে সব কিছু বাজে কাজ করাচ্ছে, তাকে আপনি দূরে সরিয়ে দিন। *যদ্ভদ্রং তন্ন আ সুব*, তার সাথে আমার জীবনের জন্য যা কিছু শুভ সেটাকে প্রেরণ করুন। এই মন্ত্রকে শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে প্রাণায়ামও করা যেতে পারে। নিঃশ্বাস ছাড়ার সময় বলছি *বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরা সুব*, সাথে সাথে চিন্তা করছি নিঃশ্বাসের সাথে আমার অন্তর্জগতে যা কিছু অশুভ আছে, শরীরের ভেতর যত রকম আবর্জনা আছে সব বেরিয়ে যাক। এরপর নিঃশ্বাস নেওয়ার সময় বলছি *যদ্ভদ্রং তন্ন আ সুব*, জগতে যেখানে যা কিছু শুভ আছে সব এই নিঃশ্বাসের সাথে আমার ভেতরে এসে শরীরের সমস্ত স্নায়ু, পেশী, রক্তে ছড়িয়ে গিয়ে আমাকে পবিত্র করে দিক। জপ-ধ্যান করার আগে এভাবে দশ বারো বার প্রাণায়াম করে নিলে বা স্নানের পর বা ট্রেনে বাসে, রাস্থাঘাটে চলার সময় কয়েকবার জপ করলে মন বুদ্ধি সব পরিষ্কার হয়ে যাবে, ভেতরের সমস্ত গ্লানিভাব দূর হয়ে শরীরে সব সময় তরতাজা ভাব বজায় থাকবে। এরপর আমরা একটা খুব ব্যতিক্রমী মন্ত্রের আলোচনা করতে যাচ্ছি। এখন যে আমরা দেবীকে দশভূজা রূপে পূজা করছি এই ভাব বেদেই প্রথম এই মন্ত্রে এসেছে।

ইয়ং যা নীচ্যর্কিণী রূপা রোহিণ্যা কৃতা।
চিত্রেব প্রত্যদর্শ্যয়াত্যন্তর্দশসু বাহুষু।।ঋ-৮/১০১/১৩।।

মন্ত্রে দেবীকে দশভূজা রূপে দেখান হচ্ছে, দেবীর এই ধারণাই পরের দিকে পুরাণে দেবী দুর্গা রূপে নিয়ে আসা হয়েছে। বলছেন, দেবীর ওই সুমনোহরা রূপ যেন তাঁর দশভূজার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছে। তিনি তাঁর সুন্দর রূপময়ী রূপে দশভূজা হয়ে এগিয়ে আসছেন। বেদে দশভূজাকে দশটি দিক রূপে দেখাচ্ছেন। মন্ত্রের দেবী যদি ঊষা হন, তাঁকে বর্ণনা করছেন, ঊষাদেবী যখন এগিয়ে আসছেন তখন তাঁর আলোর কিরণ দশটি দিকেই ছড়িয়ে তিনি এগিয়ে আসছেন, সেইজন্য তাঁকে দশভূজা রূপে বর্ণনা করছেন। এই ভাবকেই আধার করে পরের দিকে দশভূজা মা দুর্গার আরাধনা এসেছে। মাতৃপূজার যে ভাব পরে পুরাণাদিতে গিয়ে খুব প্রচলিত হয়েছে, সেই মাতৃপূজারই ভাব কীভাবে বেদে এসেছে সেটাই পরের একটি মন্ত্রে দেখানো হচ্ছে।

উচ্ছন্তি যা কৃণোষি মংহনা মহি প্রখ্যৈ দেবি স্বর্দৃশে।
তস্যাস্তে রত্নভাজ ঈমহে বয়ং স্যাম মাতুর্ন সুনবঃ।।ঋ-৭/৮১/৪।।

বেদে এই দেবীর বর্ণনায় কন্যাকুমারী দেবীর ভাবকে নিয়ে আসছেন, কন্যাকুমারীর মত কুমারী রূপেই বর্ণনা করা হচ্ছে। হে ঊষাদেবী! আপনি যখন সকালবেলা বেরিয়ে আসছেন, তখন আপনার রূপ আর যশ চারিদিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে। *তস্যাস্তে রত্নভাজ ঈমহে বয়ং*, আপনিই সবাইকে ধন, সম্পদ দিয়ে রক্ষা করছেন। *স্যাম মাতুর্ন সুনবঃ*, মা যেমন সন্তানের দেখাশোনা করে সব দিক দিয়ে রক্ষা করেন, ঠিক সেই ভাবে হে দেবী আপনি আমাদের দেখাশোনা করুন। এর আগে এসেছিল বাবা যেভাবে নিজের সন্তানকে দেখেন সেইভাবে দেখুন, কিন্তু এই মন্ত্রে বলছেন, মা যেভাবে তাঁর সন্তানদের দেখাশোনা করেন, ঠিক সেই ভাবে আপনি আমাদের দেখাশোনা করুন। এই মন্ত্রে এই জিনিসটা দেখানোর জন্যই আলোচনা করলাম, পরবর্তি কালে হিন্দু ধর্মে যত রকমের ভাব এসেছে সব আগে থেকেই বেদে এসে গিয়েছিল। বেদে আছে বলেই পরে পরে এই ভাবগুলিকে নেওয়া হয়েছে। বেদের আরেকটি মন্ত্রে ঈশ্বরকে আলোর স্বরূপে দেখা নিয়ে বলছেন –

অগ্নির্জ্যোতির্জ্যোতিরগ্নিরিন্দ্রো জ্যোতির্জ্যোতিরিন্দ্রঃ।
সূর্যো জ্যোতির্জ্যোতিঃ সূর্যঃ।।সা-১৮৩১।।

জ্যোতিঃ মানে চৈতন্যের জ্যোতি নিয়ে বলা হচ্ছে। স্বামীজী আরাত্রিক ভজনে যে *জ্যোতির্জ্যোতিঃ* বলছেন সেখানেও তিনি চৈতন্যের জ্যোতিকে নিয়েই বলছেন, আমরা যে জ্যোতি দেখি সেই জ্যোতির পেছনে যে চৈতন্যের জ্যোতি রয়েছেন তিনিই শ্রীরামকৃষ্ণ। ঈশ্বরকে জ্যোতি নামে সম্বোধিত করা হচ্ছে। মন্ত্রে বলছেন *অগ্নির্জ্যোতির্জ্যোতিরগ্নিঃ*, অগ্নির জ্যোতি, অর্থাৎ অগ্নির যে আলো আর সেই চৈতন্যের জ্যোতি বা আলো দুটোই এক, এক অপরের গুণ নয়। *ইন্দ্রঃ জ্যোতির্জ্যোতিরিন্দ্রঃ*, ইন্দ্র হলেন সেই জ্যোতি, আর সেই জ্যোতিই ইন্দ্র।

ঠিক তেমনি *সূর্যো জ্যোতির্জ্যোতিঃ সূর্যঃ*, সূর্যের যখন পূজা করা হয়, সূর্যের উদ্দেশ্যে যখন তর্পণ করা হয় বা যখন সূর্যের নামে গায়ত্রী মন্ত্র বলা হয় তখন এই স্থূল সূর্য রূপে করা হয় না, পূজা, তর্পণ যা কিছু করা হয় সূর্যকে জ্যোতি রূপেই করা হয়। জ্যোতিকে যখনই আমরা বাংলায় ব্যবহার করি তখন সব সময় তাকে আলো রূপেই দেখে থাকি। এখানে কিন্তু জ্যোতিকে আলো রূপে নেওয়া হচ্ছে না, জ্যোতি মানে সব সময়ই হয় চৈতন্যের আলো। জ্যোতি মানেই চৈতন্যময় আলো। সেইজন্য উপনিষাদিতে শুদ্ধ আত্মাকে প্রায়ই জ্যোতি রূপে বলা হয়। কঠোপনিষদেই আছে *অঙ্গুষ্ঠমাত্র জ্যোতিরিবাধূমকঃ*। যোগীরা ধ্যানের গভীরে আত্মাকে জ্যোতি রূপেই প্রত্যক্ষ করেন, *অঙ্গুষ্ঠমাত্র*, আংঠার মত জ্যোতি রূপে দেখেন, সেই জ্যোতি *অধূম্রকঃ*, কোথাও তার মধ্যে কোন ধরণের কালিমা নেই। জ্যোতি ঈশ্বরে নাম এবং ঈশ্বরের স্বরূপ। *সূর্যো জ্যোতির্জ্যোতিঃ সূর্যঃ*, সূর্য দেবতা যিনি তিনিই সেই জ্যোতি, যিনি জ্যোতি তিনিই সূর্য। আকাশে স্থূল সূর্যের সাথে এই সূর্যের কোন সম্পর্ক নেই। গীতাতেও যেখানে আদিত্য শব্দকে সূর্যের অর্থে নিয়ে আসা হয়েছে সেখানেও আমরা যে স্থূল সূর্যকে দেখছি সেই সূর্য নয়। ঈশ্বরের যে জ্যোতি, সেই জ্যোতিস্বরূপ হলেন সূর্য দেবতা। সাধারণ মানুষ এই ব্যাপারটা বুঝতে পারবে না, তাই বলে দেওয়া হয় আকাশে যে সূর্য দেখা যাচ্ছে এই সূর্যই সূর্য দেবতা। কিন্তু আসলে তা নয়, যিনি চৈতন্যময় জ্যোতি, যিনি ঈশ্বর তিনিই সূর্য, যিনিই সূর্য তিনিই ঈশ্বর। এই যে দেবতা আর ঈশ্বর এক অপরের সাথে এক, এই ভাবটাই এই মন্ত্রে নিয়ে আসা হয়েছে।

ব্রহ্মা দেবানাং পদবীঃ কবিনামৃষির্বিপ্রাণাং মহিষো মৃগাণাম্।
শ্যেনো গৃধানাং স্বধিতির্বনানাং সোমঃ পবিত্রমত্যেতি রেভন্।।ঋ-৯/৯৬/৬।।

মন্ত্রের দেবতা সোম দেবতা, আত্মার উদ্দেশ্যেও বলা যেতে পারে। *ব্রহ্মা দেবানাং*, দেবতাদের মধ্যে তিনি ব্রহ্মা অর্থাৎ তিনি শ্রেষ্ঠতম। *পদবীঃ কবিনাম্*, কবিদের মধ্যে তিনি পদবী, পদবী মানে শ্রেষ্ঠ। *ঋষির্বিপ্রাণাং*, বিপ্রদের মধ্যে তিনি ঋষি। যদিও বিপ্র বলতে আমরা ব্রাহ্মণদের মনে করি, আসলে বিপ্র মানে বিদ্বজ্জন, বিদ্বজ্জনদের মধ্যে ঋষি শ্রেষ্ঠতম। ব্রাহ্মণদের মধ্যে অনেক রকম ব্রাহ্মণ হয়, যেমন ক্ষত্রিয়দের মধ্যে কেউ সৈনিক, কেউ কমাণ্ডার হয়, কেউ রাজা হয়। ঠিক তেমনি ব্রাহ্মণদের মধ্যে অনেক সাধারণ ব্রাহ্মণ আছেন, কিন্তু বিপ্র যখন বলা হয় তখন বুঝতে হবে ব্রাহ্মণের মধ্যে বিশেষ জ্ঞান আছে। সেই বিপ্রদের মধ্যে ঋষি শ্রেষ্ঠ, ঋষি মানে যাঁর মন পুরোপুরি ঈশ্বরে। *মহিষো মৃগাণাম*, মৃগ মানে পশু, পশুদের মধ্যে তিনি মহিষ। যেখানেই একটা দল আছে, যেমন গরুর দল, মোষের দল, গরুর দলের মধ্যে বৃষভ যেমন দলপতির মত তেমনি মোষদের দলে মহিষ অর্থাৎ ব্যাটাছেলে মোষ হল সেই দলের দলপতি। এই মহিষ হল পশু জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বিভিন্ন জিনিসের মধ্যে যেটা শ্রেষ্ঠ সেটা তিনি। গীতার দশম অধ্যায়ে ঠিক এভাবকেই ব্যক্ত করা হয়েছে।

ঠিক সেই রকম আবার বলছেন *শ্যেনো গৃধানাং*, গৃধ মানে পাখি, আকাশে যারা বিচরণ করে তাদের মধ্যে শ্যেন অর্থাৎ বাজ পাখি শ্রেষ্ঠ। *স্বধিতির্বনানাং*, যেখানে গাছপালাতে ছেয়ে আছে সেখানকার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হল *স্বধিতি*। স্বধিতি মানে কুড়াল, যে সব কিছুকে কেটে সমান করে দিচ্ছে। *সোমঃ পবিত্রমত্যেতি রেভন্*, সোম যাকে যজ্ঞে অর্পণ করা হচ্ছে সেটাই সব কিছু থেকে শ্রেষ্ঠ। বিভিন্ন জিনিসের মধ্যে যেটা শ্রেষ্ঠ তার কথা বলার পর বলছেন সোমই সব কিছুর থেকে শ্রেষ্ঠ। সবাই মনে করে সোম হল রস, কিন্তু সোম হল আত্মবিদ্যা। আত্মবিদ্যাই সব কিছু থেকে শ্রেষ্ঠ ও পবিত্র। আত্মবিদ্যা কি রকম শ্রেষ্ঠ? যেমন দেবতাদের মধ্যে ব্রহ্মা শ্রেষ্ঠ, কবিদের মধ্যে পদবী শ্রেষ্ঠ, বিপ্রদের মধ্যে ঋষি শ্রেষ্ঠ সেই ভাবে আত্মবিদ্যা সব কিছু থেকে শ্রেষ্ঠ।

আমরা জানি বেদে শূদ্রের কোন অধিকার ছিল না, এমনকি বৈশ্য আর ক্ষত্রিয়দেরও বেদ অধ্যয়ণের অধিকার ছিল না। ব্রাহ্মণরাই শুধু বেদ অধ্যয়ন করতে পারতেন, কিন্তু তাও কয়েকজন মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মণরাই বেদ পড়তেন। কিন্তু এই যে ভাব, যা কিছু শ্রেষ্ঠতম সেটা ভগবান, এই ভাব সাধারণ মানুষ কিভাবে পাবে? তাই ব্যাসদেব তাঁর সৃজনী শক্তি আর লেখনী শক্তির সমণ্বয়ে তৈরী করলেন গীতা শাস্ত্র, গীতার দশম অধ্যায় শুধু এই ভাবকেই বর্ণনা করে গেছেন।

মন্যে ত্বা যজ্ঞিয়ং যজ্ঞিয়ানাং মন্যে চ্যবনমচ্যুতানাম্।

মন্যে ত্বা সত্বনামিন্দ্র কেতুং মন্যে ত্বা বৃষভং চর্ষণীনাম্।।ঋ-৮/৯৬/৪।।

ঈশ্বরের অনেক রূপের কথা বলতে গিয়ে বলছেন, *মন্যে ত্বা যজ্ঞিয়ং যজ্ঞিয়ানাং*, আপনি পবিত্রের মধ্যে পবিত্রতম। *চ্যবনমচ্যুতানাম্*, অচ্যুত, যাকে কখন তার স্থান থেকে চ্যুত বা নাড়ানো যায় না তাকেও আপনি চ্যুত করে দিতে পারেন, এটাই আপনার চরম শক্তি। *মন্যে ত্বা সত্বানামিন্দ্র কেতুং*, হে ইন্দ্র! আপনি হলেন কেতু, যেখানে যা কিছু শক্তি আছে সব শক্তির আপনি হলেন ব্যানার অর্থাৎ আপনি জয়ীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। *মন্যে ত্বা বৃষভং চর্ষণীনাম্*, যেখানেই মানব সেখানেই আপনি শ্রেষ্ঠতম। ঈশ্বর, আত্মার এই ভাবগুলো গীতাতে যেভাবে নিয়ে আসা হয়েছে আর এই ভাবকেই যখন বেদের মন্ত্রে বলা হয় তখন দুটোর মধ্যে একটা বড় পার্থক্য হয়ে যায়। গীতা যদিও মোক্ষশাস্ত্র কিন্তু গীতাতে কাব্যরস আছে কিন্তু বেদে কোন ধরণের কাব্য নেই, আধ্যাত্মিক সত্যগুলোকে সরাসরি সামনে রাখা হয়েছে। ঋষি যেমনটি অনুভব করেছেন ঠিক তেমনটি রেখে দিয়েছেন।

আশ্চর্যের হল, ঋক বেদের ষষ্ঠ মণ্ডলের একটি মন্ত্রে ঋষি যেন ঈশ্বরকে নর্তক রূপে দেখছেন। পরের দিকে শিবকে যে নটরাজ রূপে নিয়ে আসা হয়েছে সেই ভাবই বেদের এই মন্ত্রে অনেক আগেই এসে গেছে। সৃষ্টির খেলা চলা মানেই জগত যেন চলতে থাকে, জগৎ যে চলছে এটাই যেন ঈশ্বরের নৃত্য।

শ্রিয়ে তে পাদা দুব আ মিমিক্ষুর্ধৃষ্ণুর্বজ্রী শবসা দক্ষিণাবান্।
বসানো অৎকং সুরভিং দৃশে কং স্বর্ণ নৃতবিষিরো বভূব।।ঋ-৬/২৯/৩।।

হে প্রভু! আপনি হলেন সচল নর্তক। এই যে জগৎ চলছে, সৃষ্টি চলছে, জগৎ যেন আপনারই নৃত্য। এই ভাবটাই নটরাজে নিয়ে আসা হয়েছে। *বসানো অৎকং সুরভিং দৃশে কং*, যাঁরা নৃত্য করেন তাঁরা বিভিন্ন ধরণের সাজপোশাক পরিধান করে নৃত্য করেন। কিন্তু আপনার নৃত্যের সাজ কি রকম? নক্ষত্র, চন্দ্রমা খচিত আকাশ যে রকম সুন্দর সেই রকম আপনার নৃত্যের পোশাকও সুন্দর। সৃষ্টিতে যাবতীয় যা কিছু আছে সেটাই আপনার নৃত্যের বসন। দিগম্বর মানে, দিক্ যাঁর বসন, এই ভাব এই মন্ত্র থেকেই এসেছে। আকাশ যদি কারও অম্বর হয় তাহলে তাঁকে দেখতে কেমন লাগবে? নির্ভর করবে আপনি দিনে দেখছেন, না রাতে দেখছেন। দিনে দেখলে তাঁর কোন অম্বর নেই, আর রাতে দেখলে নক্ষত্র খচিত অম্বর। *শ্রিয়ে তে পাদা দুব আ মিমিক্ষুঃ*, হে নটরাজ! আপনার কৃপা পাওয়ার জন্য আপনার ভক্তরা, যাঁরা আপনার উপাসক তাঁরা আপনার চরণ স্পর্শ করছেন। যিনি ঈশ্বর তিনি নটরাজ, তাঁর নৃত্যের সাজ এই রকম, তাঁর ভাব এই রকম, সৃষ্টি তাঁরই যেন নৃত্য, এই ভাবকেই এই মন্ত্রে বর্ণনা করছেন। পুরাণে যদিও আমরা নটরাজের বর্ণনা পাই কিন্তু বেদের এই মন্ত্রে সেই নটরাজরই যেন একটা ঝলক পাওয়া যাচ্ছে। হিন্দু ধর্মের ঈশ্বরকে কেন্দ্র করে যত রকম ভাব এসেছে সব ভাবই আগে থেকে বেদে এসে গিয়েছিল।

গীতার একাদশ অধ্যায়ে বিশ্বরূপদর্শনে দেখানো হয়েছে ভগবান যখন সৃষ্টিকে সংহার করেন তখন তিনি সব কিছুকে নিজের মধ্যে গ্রাস করে নেন, অর্জুন দেখছেন নদীর জল যেমন সমুদ্রের মধ্যে মিশে হারিয়ে যায় ঠিক সেই ভাবে সব কিছু শ্রীকৃষ্ণের মুখের মধ্যে ঢুকে হারিয়ে যাচ্ছে। এই ভাবটাই একটি মন্ত্রে কীভাবে নিয়ে আসা হয়েছে দেখানো হয়েছে –

দ্যাবা চিদস্মৈ পৃথিবী নমেতে শুষ্মাচ্চিদস্য পর্বতা ভয়ন্তে।
যঃ সোমপা নিচিতো বজ্রবাহুর্যো বজ্রহস্তঃ স জনাস ইন্দ্রঃ।।ঋ-২/১২/১৩

ইন্দ্রের কী রকম শক্তি! আকাশ, পৃথিবী যাঁর সামনে ভয়ে মাথা নত করছে, যাঁর ভয়ে বড় বড় পাহাড়গুলো কাঁপছে, যাঁর হস্তে বজ্র, যিনি সোমরস পান করেন তিনিই সেই ইন্দ্র। আকাশ, পৃথিবী, পাহাড় যাদের এরা কেউই নড়াচড়া করতে পারে না, সব সময়ই স্থির হয়ে থাকে। কিন্তু এরাও ইন্দ্রের বজ্রের ভয়ে কেঁপে ওঠে। বেদের মন্ত্রেই এক জায়গায় বলছেন বাবা যেমন সন্তানকে রক্ষা করে, মা যেমন সন্তানকে রক্ষা করেন তিনি যেন সেইভাবে আমাদের রক্ষা করেন। এই মন্ত্রে ঈশ্বরের শক্তিকে নিয়ে বলছেন, ইন্দ্রের কী রকম শক্তি! জগতে যাবতীয় যা কিছুকে আমি শ্রেষ্ঠ মনে করছি সেটাই ইন্দ্রের সামনে ভয়ে কাঁপে। ঈশ্বরের শক্তিরই

বর্ণনা করতে গিয়ে একটু আগে বলা হল, যেটা অচ্যুত, যাকে নাড়ানো যায় না, সেটাকেও তিনি নাড়িয়ে দেন। অথচ ভগবান সবাইকে রক্ষা করেন, সেটাই আবার আরেকটি মন্ত্রে খুব সুন্দর বলছেন –

অপশ্যং গোপামনিপদ্যমানমা চ পরা চ পথিভিশ্চরন্তম্।
স সধ্রীচীঃ স বিষূচীর্বসান্ আ বরীবর্তি ভুবনেষ্বন্তঃ।।ঋ-১/১৬৪/৩১।।

এই মন্ত্রটি প্রত্যেকটি বেদেই এসেছে। আরও আশ্চর্যের যে ঋকবেদেই দুবার এই মন্ত্র এসেছে, প্রথম মণ্ডলেও এসেছে আবার দশম মণ্ডলেও এসেছে। এতেই বোঝা যায় কত গুরুত্বপূর্ণ এই মন্ত্র। বলছেন, *অপশ্যং গোপাম্ অনিপদ্যমানম্*, আমি সেই ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ দেখেছি যিনি কখনই বিশ্রাম নেন না। আর *আ চ পরা চ পথিভিশ্চরন্তম্*, এই পৃথিবীর তিনি সামনের দিকে যাচ্ছেন, পৃথিবীর পেছনের দিকে যাচ্ছেন। *স সধ্রীচীঃ স বিষূচীর্বসান*, তাঁর পরিধেয় বসন হল যশ, *আ বরিবর্তী ভুবনেষ্বন্তঃ*, এই জগতে তিনি সব সময়ই চলমান হয়ে আছেন। তাই বলছেন, যে ঈশ্বর যিনি কখন বিশ্রাম নেন না, চলার পথে কখনই যিনি থামেন না, সেই ঈশ্বরকে আমি প্রত্যক্ষ দেখেছি। এই মন্ত্রের ভাবের উপর মা কালীকে নিয়ে ঠাকুরের একটি খুব সুন্দর দিব্য দর্শন আছে, ঠাকুর একদিন দেখছেন দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের আলসেতে মা দাঁড়িয়ে আছেন, তিনি দিগম্বরী। ঠাকুর বর্ণনা করছেন, দেখলাম বাচ্চা মেয়ে ছাদের আলসেতে দাঁড়িয়ে আছে, দিগম্বরী আর তাঁর চাহনীতে জগৎ নড়ছে। মা তাকাচ্ছেন বলে জগৎ চলছে। যদিও এই মন্ত্রের ভাবের সাথে ঠাকুরের দিব্য দর্শনকে মেলানো যাবে না, কিন্তু কয়েকটা জায়গায় মিল পাওয়া যাবে। যেমন মন্ত্রে বলছেন, তিনি চলছেন বলে জগৎ আছে, তাঁকে আমি দেখেছি। ঠাকুরও বলছেন আমি মাকে দেখেছি যাঁর চাহনিতে জগৎ নড়ছে। *জগতিজগম্য*, জগৎ মানেই চলা, কী করে চলে? ঈশ্বর চলছেন। আর ঠাকুর বলছেন তাঁর চোখের চাহনিতে জগৎ নড়ছে, নড়ছে আর চলা একই। সেটাই এই মন্ত্রে ঋষি বলছেন – *অপশ্যং গোপাম্*, আমি দেখলাম তিনি সামনে যাচ্ছেন, পেছনে যাচ্ছেন, আর সমস্ত বিশ্ব জুড়ে তিনি চলছেন, তাঁর চলাতেই এই জগৎ চলছে। কী অপূর্ব ভাব!

মা ন একস্মিন্নাগসি মা দ্বয়োরুতো ত্রিষু।
বধীর্মা শূর ভূরিষু।।ঋ-৮/৪৫/৩৪।।

মা ন একস্মিন্নাগসি, হে ঈশ্বর! আমি যদি একবার কোন দোষ করে ফেলি সেই দোষের জন্য আমাকে নাশ করে দিও না। *মা দ্বয়োরুতো ত্রিষু*, হে ঈশ্বর! আমি যদি দুবার কোন ভুল করে ফেলি সেই ভুলের জন্য আমাকে নাশ করে দিও না, তিনবারও যদি ভুল করে ফেলি তাও আমাকে নাশ করে দিও না। *বধীর্মা শূর ভূরিষু*, যদি অনেক অনেক দোষ করি, ভুলের পর ভুল করে ফেলি তাও আমাকে নাশ করে দিও না। হে ঈশ্বর! তুমিই তো আমার একমাত্র আশ্রয়, তোমাকে ছেড়ে আমি কোথায় যাব! আমরা কথায় কথায় বলি আমরা যদি একবার দোষ করে ফেলি তিনি একবারের মতই ক্ষমা করে দেবেন। কিন্তু তা না, ভগবানকে প্রত্যেক বারই ক্ষমা করতে হয়। এটাই এই মন্ত্রের ঋষি বলছে, হে ভগবান! আমি একটা দোষ করলে তুমি আমাকে ক্ষমা করবে, দুটো দোষ করলেও ক্ষমা করবে, তিনটে দোষ করলেও যে তুমি ক্ষমা করে দেবে তা নয়, আমি যদি অনন্ত দোষও করি তাও তুমি আমাকে ক্ষমা করে দিও, তাও যেন আমাকে তুমি নাশ না কর, কারণ তুমি হলে আমার শেষ আশ্রয়। দোষ করলে ভগবান সাজা দেন, নরক ভোগ করান এগুলো সেমেটিক ধর্মের ধারণা থেকে এসেছে। আমাদের ধর্মে এই ধরণের কোন ধারণা নেই, আমাদের কাছে ভগবান শেষ আশ্রয়, আমি যত দোষই করি আর যাই করি না কেন হে ঠাকুর! তুমি ক্ষমা কর। আমি যে তোমার তুমি যে আমার, এই ভাবটাই আমাদের বারবার ঘুরে ঘুরে আসে। দোষ করে ফেলেছি তো হয়েছে কী! ভগবান ক্ষমা করে দেবেন। কতবার ক্ষমা করবেন? *বধীর্মা শূর ভূরিষু*, যত বার দোষ করব ততবারই তাঁকে ক্ষমা করতে হবে। এটাই ভগবান বা ঈশ্বরের প্রতি বেদের ভাব। ঠিক তেমনি সরস্বতীকে নিয়ে বেদে কিছু মন্ত্র আছে, যেসব মন্ত্রে বলছেন সরস্বতী আমাদের প্রাণে শক্তি দেন, সবাইকে পবিত্র করেন। একটি মন্ত্রে জ্ঞানের প্রার্থনা করে বলছেন –

চক্ষুর্নো ধেহি চক্ষুষে চক্ষুর্বিখ্যৈ তনুভ্যঃ।
স চেদং বি চ পশ্যেম।।ঋ-১০/১৫৮/৪।।

হে প্রভু! আমাদের চোখে আলো দাও, আমাদের শরীরের অঙ্গে, ইন্দ্রিয়গুলিতেও দৃষ্টি দাও যাতে *স চেদং বি চ পশ্যেম*, আমরা এই জগতকে সমষ্টি রূপে একত্বে দেখতে পারি। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হল পূর্ণ, এই পূর্ণতার মধ্যে একটা একত্ব বিদ্যমান। ঋষি প্রার্থনা করছেন এই একত্বের ভাবকে যেন আমরা দেখতে পাই। বেদে যেমন জাগতিক প্রার্থনা করে অনেক মন্ত্র আছে, তেমনি এই ধরণের পারমার্থিক জ্ঞানের প্রার্থনা মন্ত্রও প্রচুর পাওয়া যাবে। এর আগের একটি মন্ত্রে যেখানে বলা হচ্ছে *ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমান্ অসি*, সেখানেও এই একত্বের ভাবের কথাই বলা হয়েছে। বেদ ধর্মকে কীভাবে ব্যাখ্যা করছে সেটাই পরের মন্ত্রে বলা হচ্ছে –

সত্যং বৃহদ্ঋতমুগ্রং দীক্ষা তপো ব্রহ্ম যজ্ঞঃ পৃথিবীং ধারয়ন্তি।
সা নো ভূতস্য ভব্যস্য পত্ন্যুরং লোকং পৃথিবী নঃ কৃণোতু।।অ-১২/১/১।।

গীতায় ভগবান বলছেন *গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা*, আমি আমার ওজস দিয়ে এই পৃথিবীকে ধারণ করে আছি। ভগবানের ওজসটা কী? এখানে সেটাই বলছেন। *সত্যং বৃহদ্ঋতমুগ্রং*, সত্য এই পৃথিবীকে ধারণ করে রয়েছে। *বৃহৎ ঋতম্* মহাজাগতিক নিয়ম, *উগ্রম্* মানে একেবারে অবক্র, কেউ এই ঋতমকে অতিক্রম করতে পারবে না। আর *দীক্ষা তপঃ ব্রহ্ম যজ্ঞঃ*, তিনি দীক্ষা, তপস্যা, ব্রহ্ম ও যজ্ঞ দিয়ে এই পৃথিবীকে ধারণ করে আছেন। এখানে ব্রহ্মের অর্থ প্রার্থনা। দীক্ষা, তপস্যা, প্রার্থনা, ত্যাগ এগুলোই মানুষের শুভকর্ম, এই শুভকর্মই পৃথিবীকে ধারণ করে আছে।

সা নো ভূতস্য ভব্যস্য পত্ন্যুরং, পৃথিবী আমার পত্নীর মত, যে আমাকে আগেও ধারণ করে ছিল ভবিষ্যতেও ধারণ করে থাকবে, সে যেন আমার জন্য আরও বিশাল হয়ে যায়। স্ত্রীর কাছে স্বামী যেমন প্রত্যাশা করে তার প্রতি স্ত্রীর ভালোবাসা আরও বিশাল হয়ে যাবে, ঠিক তেমনি বলছেন এই পৃথিবী যেন আমার জন্য বিশাল হয়ে যায়। অর্থাৎ আমার মধ্যে যেন কোন ধরণের সীমাবদ্ধতা, সঙ্কীর্ণতা কখন না আসে। আমার উন্নতি, নাম-যশ সব কিছুই যেন বৃহৎ হয়। পৃথ্বির কাছে প্রার্থনা করা হচ্ছে, সত্য, বৃহৎ, ঋতম, দীক্ষা, তপস্যা, প্রার্থনা, ত্যাগ পৃথ্বিকে ধারণ করে আছে, পৃথ্বি যেন আমাকে ধারণ করেন, ধারণ করে আমার সব কিছুকে যেন বৃহৎ করে দেন। প্রথম ব্রতী হয়ে গেলেন, ব্রতী মানে জীবনকে এভাবে চালাব, ব্রতী থেকে দীক্ষিত হয়ে গেলেন, দীক্ষিত হয়ে যাওয়া মানে আমি এই শুভ কাজই করব। মানুষের এই তপস্যা বা ঈশ্বরের যে তপস্যা তার সাথে প্রার্থনা, এই শুভ কর্মের দ্বারা যে শুভ শক্তির জাগরণ হয়, এই শুভ শক্তিই পৃথিবীকে ধরে রাখে। শুভ শক্তির যখন হ্রাস হয়ে যায় তখনই পৃথিবীতে নানা রকমের অশান্তি অরাজকতা নেমে আসে। ঋষি, যিনি এই মন্ত্রের দ্রষ্টা, তিনিও সত্যে প্রতিষ্ঠিত, দীক্ষায় প্রতিষ্ঠিত, তিনিও যেন এই পৃথিবীকে ধারণ করে আছেন, যেমন স্বামী স্ত্রীকে ধারণ করে থাকে। স্ত্রী যেমন স্বামীর কাছে নিজের হৃদয়কে উন্মুক্ত করে দেয় ঠিক সেই রকম ঋষি বলছেন পৃথিবী যেন আমার কাছে তার হৃদয়কে খুলে দেয়। বেদে বিবাহের সময় যে ধরণের প্রার্থনা মন্ত্র ব্যবহার করা হয়, তারই একটি মন্ত্রে বলছেন –

গৃণামি তে সৌভাগত্বায় হস্তং, ময়া পত্যা জরদষ্ঠির্ যথাসঃ।
ভগো অর্যমা সবিতা পুরংধির্, মহ্যং ত্বাদুর্ গার্হপত্যায় দেবাঃ।। ঋ-১০/৮৫-৩৬।।

বিবাহের সময় স্বামী নববধুর হাত ধরে বলছে – আমি তোমার হাত ধরলাম যাতে আমাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যত আর সমৃদ্ধ আসে, আর আমার শেষ দিন পর্যন্ত যেন তুমি আমার সাথে থাক। *ভগো অর্যমা সবিতা পুরংধির্, মহ্যং ত্বাদুর্ গার্হপত্যায় দেবাঃ* – ভগো দেবতার নাম আবার আলোর অর্থেও হয়, ভগো, অর্যমা, সবিতা ইত্যাদি দেবতারা তোমাকে কন্যারূপে আমাকে দিয়েছেন যাতে আমি তোমাকে আমার গৃহের অধিশ্বরী করে রাখতে পারি। বেদের আরেকটি ভাব এখানে পাচ্ছি – যে কন্যাকে বিবাহ করা হচ্ছে সেই কন্যা দেবতা প্রদত্ত। কন্যা শুধু বাবা-মারই নয়, কন্যা দেবতার জিনিস সেই কন্যাকে দেওয়া হচ্ছে, সেইজন্য বলাই হয় পুরুষকে কন্যাদান করা হয়, পুরুষ তাই হাত ধরে বলছে – আমৃত্যু তুমি আমার কাছে থেকে আমাকে সৌভাগ্য প্রদান করতে থাক, সেইজন্য মেয়েকে বিয়ের আগে বলে কুমারী, বিয়ে হয়ে গেলে বলে সৌভাগ্যবতী। বয়ঃজেষ্ঠরা আশীর্বাদ করে বলে সৌভাগ্যবতী হও। হিন্দুধর্মের পরম্পরাতে কন্যাকে মা লক্ষ্মীর সঙ্গে তুলনা করা

হয়। নারী যদি সৌভাগ্যবতী হয়ে যায় সেই নারী যার সঙ্গে থাকবে তার ভাগ্য স্বাভাবিক ভাবে খুলে যায়। বিয়ের সময় তাই কন্যাকে আশীর্বাদ করে ঋগ্বেদের একটি মন্ত্রে বলছেন –

সম্রাজ্ঞী শ্বশুড়ে ভব, সম্রাজ্ঞী শ্বশ্রাং ভব।
ননান্দরি সম্রাজ্ঞী ভব, সম্রাজ্ঞী অধি দেবৃষূ।। ঋ-১০/৮৫-৪৬।।

তুমি তোমার শ্বশুড়ের কাছে সম্রাজ্ঞী হয়ে থাক, তুমি তোমার শাশুড়ীর কাছে সম্রাজ্ঞী হয়ে থাক, তোমার ননদদের কাছে সম্রাজ্ঞী হয়ে থাক আর তোমার দেবরদের কাছে সম্রাজ্ঞী হয়ে থাক। বিবাহের পর কন্যাকে যে আশীর্বাদ করে প্রার্থনা করছেন, এর একটা সুদূর প্রসারী দিব্য প্রভাব আছে। মামুলি কেউ যদি বলে দেয় – যাও, তুমি রানী হয়ে থাক, সে কিন্তু রানী হয়ে থাকবে না, কিন্তু এই বেদ মন্ত্র দিয়ে যখন কন্যাকে আশীর্বাদ করা হবে তখন তার একটা দিব্য প্রভাব পড়বেই পড়বে। হিন্দু ধর্মের পরের দিকে একটা সময়ে বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু বেদেই আমরা বিধবা বিবাহের উল্লেখ পাই।

উদীর্ষ্ব নার্যমি জীবলোকং, গতাসুম্ এতম্ উপ শোষ এহি।
হস্তগ্রামস্য দিবিষো স তবেদং, পত্যুর্ জনিত্বম্ অভি সং বভূথ।।
ধনুর্ হস্তাদ্ আদদানো মৃতস্য- হস্মে ছত্রায় বর্চসে বলায়।
অত্রৈব ত্বম্ ইহ বয়ং সুবীরা, বিশ্বাঃ স্পৃধো অভিমাতীর্ জয়েম্।।ঋ-১০/১৮/৮-৯।।

ঋগ্বেদের এই মন্ত্রে বিধবা বিবাহকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। এক সদ্য বিধবা নারী, কিভাবে হয়েছে বোঝা যায় না। মৃত স্বামীর ধনুক তার পাশেই রাখা আছে। তখন একজন এসে মেয়েটিকে সান্ত্বনা দিচ্ছে – তুমি ওঠো, উঠে দাঁড়াও, তোমার অনাগত জীবনের দিকে তাকাও, তুমি এমন একজনের পাশে পড়ে আছ যার জীবনদীপ নিভে গেছে। তোমার স্বামীর ধনুকটা আমি তুলে নিলাম, যাতে ওর যত শক্তি, বীর্য আমার মধ্যে চলে আসে, সেই শক্তি বীর্য দিয়ে আমি যেন তোমাকে খুশি রাখতে পারি। তুমি এসে আমার পাশে দাঁড়াও আর আমি যেন সবাইকে জয় করে নিতে পারি। মূল কথা, একটি মেয়ে স্বামীর মৃত্যুতে শোকাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে আছে, সেই শোক তাপ থেকে তার মনকে উজ্জীবিত করে নতুন জীবনের দিকে হাতছানি দিয় উৎসাহিত করা হচ্ছে।

এই ধরণের বহু মন্ত্র সমগ্র বেদ জুড়ে আছে, যা এক জীবনে অধ্যয়ন করলেও শেষ হবে না। আমরা সামান্য কয়েকটি বিখ্যাত ও প্রচলিত মন্ত্রকে বেছে নিয়ে আলোচনা করে বেদের কি ভাব, বেদ কি বলতে চাইছে তার একটা ঝলক পেলাম। এরপর আমরা বেদের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সূক্তকে নিয়ে আলোচনা করব।

।। নাসদীয়সূক্তম্ ।।

নাসদীয়সূক্তম্ আর পুরুষসূক্তম্ সৃষ্টির ব্যাপারে ঠিক কি বলতে চাইছে যদি কেউ পুরোপুরি বুঝে নিতে পারেন তাহলে ভারতের প্রাচীন দার্শনিকরা সৃষ্টির রহস্যকে কিভাব দেখতেন, সৃষ্টি তত্ত্বের আড়ালে কোন্ কোন্ দর্শনের কি কি ভূমিকা কাজ করছে, আর সেই দর্শনকে ভিত্তি করে পরবর্তি কালে ভারতে কিভাবে অন্যান্য দর্শন জন্ম নিয়েছে, এই জিনিসগুলি তাঁর পরিষ্কার হয়ে যাবে। নাসদীয়সূক্তম্ পড়লে বোঝা যায় আমাদের ঋষিরা চিন্তার রাজ্যে কত উচ্চস্তরে বিচরণ করতেন। নাসদীয়সূক্তম্ পুরোপুরি বুঝে নেওয়া সত্যিই খুব কঠিণ, তবে যতটুকু ধারণা করা যাবে ততটুকুই লাভ, এটুকু ধারণাই হিন্দু ধর্মের মূল ব্যাপারগুলি পরে বুঝতে আমাদের সাহায্য করবে। নাসদীয়সূক্তম্ স্বামীজীর খুব প্রিয় ছিল। কেন স্বামীজীর প্রিয় ছিল সেটা আমরা আলোচনা করতে করতে বুঝতে পারব।

আদিম যুগ থেকে সৃষ্টির রহস্য সমস্ত চিন্তাবিদ মানুষকে আকৃষ্ট করে আসছে। আমি কোথা থেকে এলাম, আমার জন্ম কেন ও কিভাবে হল, জগৎ কোত্থেকে এসেছে, যেদিন থেকে মানুষের মধ্যে চিন্তা শক্তির উন্মেষ হয়েছে সেদিন থেকেই এই ব্যাপারগুলো মানুষকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে। কেউ যদি জ্ঞানের অনেক উচ্চস্তরে চলে যান তা দর্শনের ক্ষেত্রেই হোক বা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই হোক সৃষ্টির ব্যাপারে তাঁকে ব্যাখ্যা করতেই

হবে। কিছু দিন আগে আমেরিকার এক বিজ্ঞানী অনেক গবেষণা করে বললেন আমরা সবাই অন্য গ্রহ থেকে এসেছি। তাঁর মতে পৃথিবীতে যেসব জড় পদার্থ রয়েছে তার থেকে কখনই প্রাণের উদ্ভব হতে পারে না, তাই পৃথিবীতে প্রাণীরা এসেছে অন্য কোন গ্রহ বা নক্ষত্র থেকে। মূল কথা তুমি কে, আমি কে, আমরা কোথা থেকে এলাম, তুমি বিজ্ঞানী হও, তুমি দার্শনিক হও আর তুমি ধর্মের নেতা হও, এই প্রশ্নের উত্তর তোমাকে বলতে হবে। ঠাকুর অবশ্য সৃষ্টির প্রসঙ্গ কখনই তোলেননি। লণ্ডনে থাকার সময় স্বামীজীর খুব ইচ্ছে হয়েছিল, বেদ থেকে শুরু করে পুরাণাদিতে সৃষ্টি নিয়ে যত ধরণের আলোচনা আছে, সৃষ্টির ব্যাপারে যত রহস্য আছে সবটাকে মিলিয়ে একটা সাধারণ মতের উপরে দাঁড় করাবেন।

সৃষ্টির ব্যাপারে পরিষ্কার দুটো মত। শ্রীমা বলছেন – ঈশ্বর চিত্রকরের মত সৃষ্টি রচনা করেন না। শ্রীমার কথাতে বোঝা যাচ্ছে যে ঈশ্বরের সৃষ্টি রচনা আর চিত্রকরের সৃষ্টি রচনার মধ্যে পার্থক্য আছে। মাটিতে ছোট্ট বটবৃক্ষের বীজ রোপণ করা হলে আমরা জানি ঐ বীজ থেকে একটা বট গাছ বের হবে, কিন্তু বীজ থেকে বেরিয়েই বট গাছ বিশাল বৃক্ষে পরিণত হয়ে যাবে না। প্রথমে দুটো পাতা, তারপর ধীরে ধীরে ডালপালা ছড়িয়ে বট গাছ বড় হতে থাকবে, দীর্ঘ সময় ধরে এই বেড়ে ওঠা চলতে থাকে। আমরাও নিশ্চিত ভাবে বলতে পারি সব বীজ থেকে এভাবেই উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়, আবার বীজের মধ্যেই সমগ্র বৃক্ষ সুপ্ত হয়ে আছে। বীজ মাটি থেকে রস পেয়ে অঙ্কুরিত হবে, আলো বাতাস জল পেয়ে আস্তে আস্তে সে বড় হতে থাকবে, বৃক্ষে ফল কবে হবে আদৌ হবে কিনা আমরা বলতে পারি না, কিন্তু গাছ এভাবেই বড় হতে থাকবে। শ্রীমা বলতে চাইছেন ভগবান যখন সৃষ্টি করেন তখন তিনি এভাবেই করেন। কিন্তু চিত্রকর কোন মানুষের ছবি আঁকার সময় ইচ্ছে করলে আগে মাথাটা আঁকতে পারেন তারপর শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আঁকলেন, ইচ্ছে করলে আগে হাত পা এঁকে নিয়ে পরে মুণ্ডুটা আঁকলেন। কিন্তু বীজ অঙ্কুরিত হল, গাছের ডালপালা বেরোবার আগেই ফুল বা ফল হবে না। চিত্রকর ইচ্ছে করলে গাছের ফুল আগেই এঁকে নিতে পারেন। অঙ্কন দেখে কেউ ধরতে পারবে না যে তিনি কোনটা আগে কোনটা পরে এঁকেছেন।

এই দু ধরণের সৃষ্টির দুটো নাম দেওয়া হয়েছে – ডারউইনের বিবর্তনবাদ তত্ত্ব থেকে এর একটা নাম এসেছে, একটা থেকে আরেকটা পর পর এগিয়ে চলে। একটা নির্দিষ্ট নিয়মে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সৃষ্টি এগোবেই, কেউ এর এগোনকে আটকাতে পারবে না। দ্বিতীয় প্রকারের সৃষ্টির নাম স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টি। ভগবান ইচ্ছে করলেন মানুষ হোক, সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সৃষ্টি হয়ে গেল, এইভাবে ঘোড়া হোক, ঘোড়া হয়ে গেল, হাতি হোক, হাতি হয়ে গেল। এই দুই ধরণের সৃষ্টির মধ্যে কোন মিল পাওয়া যাবে না। স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টি চিত্রকরের মত রচনা আর বিবর্তনের মধ্য দিয়ে যে সৃষ্টি একটা নির্দিষ্ট নিয়মের মধ্যে দিয়ে সৃষ্টি এগিয়ে চলে। শ্রীমা এটাই বলছেন ভগবানের সৃষ্টি বিবর্তনের মধ্যে দিয়েই হয়, পুরো জিনিসটাই অন্তর্নিহিত আছে সেটা আস্তে আস্তে খুলতে থাকে। খুলে কোথায় যাচ্ছে আমরা বলতে পারবো না, আর এ ব্যাপারে আমাদের কোন মাথা ব্যাথা নেই। কিন্তু খ্রীশ্চান বা ইসলাম ধর্মে সৃষ্টি স্বতঃস্ফূর্ত। ভগবান প্রথমে আদমকে মানুষ রূপে সৃষ্টি করলেন, সৃষ্টি করে আদমকে বললেন এবার আমাকে ইভের সৃষ্টি করতে হবে, তোমার বুকের পাঁজরের হাড় থেকে ইভের সৃষ্টি হবে। নারীর সৃষ্টি কোথা থেকে এলো? খ্রীস্টানদের মতে পুরুষের বুকের পাঁজরের হাড় থেকে। তার মানে ভগবান যদি চাইতেন আমি আগে নারীর সৃষ্টি করব, স্বাভাবিক ভাবেই তিনি তা করতে পারতেন। কিন্তু বিবর্তনবাদে কখনই এভাবে সৃষ্টি হয় না।

কোন পদ্ধতি ঠিক আর কোনটা ঠিক নয় এর বিচার করা আমাদের এই বুদ্ধি দিয়ে সম্ভব নয়। কিন্তু ভারতীয় পরম্পরাতে বিবর্তনবাদকে সৃষ্টির প্রক্রিয়া বলে মনে করে আসছে। শুধু তাই নয়, এর সাথে হিন্দুরা আরও বলেন, ভগবান কি রকম সৃষ্টি করেন – *পূর্বমকল্পন্ অয়ম্*, আগের আগের কল্পে সৃষ্টি যে রকমটি ছিল এই কল্পেও ঠিক আগের মতই সৃষ্টি হবে। আগের আগে কল্পে গাঁদা গাছ যেভাবে বড় হয়েছিল, এই কল্পেও ঠিক সেইভাবেই গাঁদা গাছ বড় হবে। হিন্দুদের বেশির ভাগ শাস্ত্র ও ধর্মগ্রন্থ স্বাভাবিক ভাবে বিবর্তনবাদকেই মেনে এসেছে, কিন্তু মজার ব্যাপার হল ভারতে বিবর্তনবাদ বেশি জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি। অন্য দিকে পাশ্চাত্য দর্শন বিবর্তনবাদকে জানতই না, কারণ ধর্মীয় কারণে তাদের স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টিতেই বিশ্বাস ছিল,

বিবর্তনবাদকে তার নিতেই পারল না। দ্বিতীয় কথা, ভগবান একটা সময় যে সৃষ্টি করলেন তখন তাঁর নিশ্চয়ই কোন উদ্দেশ্য ছিল। আমরা এখন বুঝতে পারছি যে ভগবানের কি উদ্দেশ্য জানা যায় না। কিন্তু ঐ উদ্দেশ্য পর্যন্ত পৌঁছানর জন্য বিবর্তনের তত্ত্ব স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের মানতে হবে। অথচ হিন্দুদের একটা সময় বলতে হয় ভগবান বিশেষ কোন একটা সময়ে সৃষ্টি করেন না, সৃষ্টির ব্যাপারে তাঁর কোন উদ্দেশ্যই নেই।

বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, স্মৃতি আদি শাস্ত্রের যাঁরা ঠিক ঠিক পণ্ডিত তাঁদের যদি জিজ্ঞেস করা হয় সৃষ্টি কিভাবে হল, তাঁরা যদি সত্যিই নিজের মন থেকে উত্তর দিতে চান তাহলে তাঁরাও সৃষ্টির ব্যাপারে হাত তুলে দেবেন। আমি জানিনা, এটাই তাঁর সঠিক উত্তর। এটা তাঁর কিংবা আমাদের মনের কথা নয়, শাস্ত্রও বলতে চাইছে আমরা বলতে পারবো না সৃষ্টি কিভাবে হচ্ছে। যিনি অনন্ত তিনি সান্ত কি করে হচ্ছেন, যিনি অখণ্ড তিনিই আবার খণ্ড হয়ে যান, কি করে হয় আমরা কেউই জানিনা। যার জন্ম সবার প্রথমে হয়েছে তিনিই জেষ্ঠ্য, তিনি যাকে জন্ম দেন সে হয়ে যায় কনিষ্ঠ, তার থেকে যে জন্ম নিচ্ছে সে আরও কনিষ্ঠ। ছেলে কখন বাবার জন্মের কথা বলতে পারবে না। বাবা ছেলের জন্ম দেখেছে তাই বাবা ছেলের জন্মের কথা বলতে পারে। তাই ঋষিরা কি করে বলবেন সৃষ্টিটা কি করে হয়েছে। কিন্তু সৃষ্টির রহস্য জানার ব্যাপারে মানুষের প্রচণ্ড স্পৃহা আর চিরন্তন, আদিম কাল থেকে মানুষ সৃষ্টির ব্যাপারে প্রশ্ন করে আসছে। সৃষ্টির এই অনুসন্ধিৎসুতার ক্ষুধাকে মেটাবার জন্য ঋষিরা সৃষ্টির ব্যপারে কিছু উত্তর দেন। যখন তাঁরা উত্তর দেন তখন ওনারা দুটো দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে উত্তর দেন। একটা যুক্তি বিচার দিয়ে উত্তর দেন আরেকটা উত্তর দেন পৌরাণিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে।

পৌরাণিক দৃষ্টিভঙ্গিতে স্রষ্টা আর সৃষ্টির মাঝখানে বেশ কিছু উপাধি আরোপিত করা হয়। যেমন বলা হয় – ভগবান নারায়ণ ক্ষীরসাগরে শেষনাগের উপরে অনন্ত শয্যায় শুয়ে আছেন। শায়িত অবস্থায় তিনি চিন্তা করছেন, এক সময় তাঁর নাভি থেকে একটা পদ্ম প্রস্ফুটিত হল। সেই নাভি পদ্মে প্রথম জাত হলেন ব্রহ্মা। এই কাহিনীর মধ্যে যে শব্দগুলি ব্যবহার করা হয়েছে তার প্রত্যেকটি শব্দের ভেতর একটা বিশেষ তাৎপর্য লুকিয়ে আছে। নারায়ণ মানে নরে যাঁর অয়ন, মানে যিনি জলে বাস করেন, এখানে জল ক্ষীরসাগর। আবার নর মানে মানুষ, অর্থাৎ মানুষের মধ্যে যাঁর বাস তিনিই নারায়ণ, দুটো অর্থই হয়। আবার তিনি সাপের উপরে শুয়ে আছেন, সাপের নাম অশেষ নাগ। অশেষের অর্থ অনন্ত, তিনি অনন্তের প্রভু। এগুলো সবই উপাধি। শব্দ দিয়ে তাঁর একটা রূপ দেওয়া হল, সেই রূপের মাধ্যমে একটা আখ্যায়িকা তৈরী হয়ে গেল। সৃষ্টিকে ব্যাখ্যা করার এটাও একটা পদ্ধতি। গীতায় ভগবান বলছেন *'সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোক্ষিশিরোমুখম্'* সব জায়গায় তাঁর মস্তক, সর্বত্র তাঁর চোখ, সব জায়গায় তাঁর হাত, পা ইত্যাদি, এটাও ব্যাখ্যা করার একটা পথ। সব জায়গাতেই তিনি আছেন, বলতে চাইছেন তিনি একটা জায়গাতে আবদ্ধ নন। আমি ঘরে নিজের চেয়ারে বসে আছি, আমার সত্তা ঐটুকু ঘরের মধ্যেই শেষ। ভগবানও কি এই রকম শুধু বৈকুণ্ঠে বসে আছেন? সাধারণ মনের অধিকারী মানুষ এই জিনিসটা বুঝতে চায়না যে ভগবান সর্বত্র বিরাজমান, তখন এই ধরণের মনকে কিছু একটা ধারণা করাবার জন্য বলা হল ভগবান তাঁর অনন্ত ঐশ্বর্য নিয়ে বৈকুণ্ঠে বসে আছেন, আর তাঁর ইচ্ছাতেই সমস্ত জগত চলেছে। যাদের মন এর থেকে আরেকটু উন্নত তাদের জন্য বলা হবে ভগবানের হাত সর্বত্র, সর্বত্র তাঁর পা, সর্বব্যাপী তাঁর চোখ। এদের থেকেও যাদের মন আরো উন্নত তাদেরকে বলা হবে তিনি নির্গুণ নিরাকার। ঠাকুর উপমা দিয়ে বলছেন – প্রথমে দেখে মাকালীর সহস্র হাত, তারপর দেখে দশটি হাত, তারপর চারটে, পরে চারটে থেকে দুটো শেষে দেখে কিছুই নেই। সমুদ্রের জল দূর থেকে নীল দেখায়, কাছে গিয়ে হাতে জল নিয়ে দেখে জলের কোন রঙ নাই। যে মানুষের মন ঈশ্বর থেকে যত দূরে সেই মানুষের জন্য তত বেশি পৌরাণিক কাহিনী প্রয়োজন হয়। ঈশ্বরের যত কাছে যাওয়া যাবে ততই নির্গুণ নিরাকারের দিকে মন চলে যাবে। এভাবেই বিভিন্ন মানসিক প্রকৃতি অনুযায়ী ধর্মের তত্ত্বগুলিকে বিভিন্ন ভাবে শাস্ত্রে উপস্থাপিত করা হয়েছে।

ভারত তথা বিশ্বের প্রথম দর্শন সাংখ্য দর্শন, সাংখ্য দর্শনকে সব দর্শনের জনক বলা হয়। সাংখ্য থেকেই জন্ম যোগদর্শন, তারপর এল ন্যায়, বৈশাষিক, কর্মকাণ্ড বা পূর্বমীমাংসা আর উত্তরমীমাংসা বা বেদান্ত। এই ছটি দর্শনের সব বীজ বেদে আগে থেকেই আছে, বেদের বাইরে নতুন কোন কিছু আবিষ্কার করেননি। সেই কোন মান্ধাতা আমল থেকে চলছে, তাই নতুন কেউ কিছু বলছে না। সাংখ্যের সৃষ্টির তত্ত্বকেই সব থেকে

বেশি যুক্তিযুক্ত মনে করা হয়। পুরাণ যে সৃষ্টি তত্ত্বকে গ্রহণ করেছে সেটা পুরোটাই পৌরাণিক। পরের দিকে বেদান্ত দুটো দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করল। বেদান্তের জ্ঞানমার্গী, বিশেষ করে শঙ্করাচার্য, স্বামীজী এনারা সাংখ্যের তত্ত্বটাকে গ্রহণ করেছেন। বেদান্তের আরেকটা মার্গ ভক্তিমার্গীরা পৌরাণিক দৃষ্টিভঙ্গীকেই বেশি প্রাধাণ্য দিয়ে সেটাই আঁকড়ে থাকলেন। সাংখ্য তত্ত্বকে যে যুক্তিযুক্ত বলে মানা হয় তাতে মনে করা উচিৎ নয় যে এর সবটাই যুক্তিযুক্ত, কেননা একটা জায়গাতে এসে বেশি চাপ দিলে সাংখ্য দর্শনের তত্ত্বেও ফাটল ধরে যাবে।

অন্য দিকে পদার্থ বিজ্ঞানীরা সৃষ্টির কথা বলতে গিয়ে অনেক কথাই বলেন, কখন বলছেন বিগব্যাঙ, কখন বলছেন ব্ল্যাকহোল, কিন্তু তাঁরাও বলেন একটা জায়গায় গিয়ে তাঁদের এসব থিয়োরিও কোন কাজ করে না। সাংখ্য দর্শনেও একই জিনিস হয়, একটা জায়গার পর আর প্রশ্ন করা যায় না। বৃহদারণ্যক উপনিষদে গার্গি এটাই করতে গিয়েছিলেন। সৃষ্টির ব্যাপারে যাজ্ঞবল্ক্যকে গার্গি একের পর এক প্রশ্ন করে চলেছেন। একটা জায়গায় গিয়ে গার্গি যুক্তি দিয়ে প্রশ্ন করে তত্ত্বটাকে আরো টেনে নিয়ে যেতে চাইলেন, তখন যাজ্ঞবল্ক্য বললেন – গার্গি খুব সাবধাণ, না বুঝে যদি প্রশ্ন কর তাহলে তোমার মাথা ধর থেকে খসে যাবে। গার্গি সঙ্গে সঙ্গে থেমে গিয়েছিলেন। একটা জায়গার পর আর প্রশ্ন করতে নেই। অবশ্য তারও আগে প্রশ্ন করার পাত্রতা থাকা চাই, আমি এই প্রশ্ন করার যোগ্য কিনা জেনে নেওয়া দরকার। কথামৃতে ঠাকুরকে এসে অনেকেই প্রশ্ন করত ঠাকুর কাউকে উত্তর দিতেন আবার কাউকে পাশ কাটিয়ে যেতেন। একজন এসে বলছে ‘ঈশ্বর যদি থাকেন তাহলে কেউ এসে দেখিয়ে দিক’, ঠাকুর বলছেন ‘তার ভারি বয়ে গেছে তোমাকে দেখাতে’। এদের প্রশ্ন করার পাত্রতাই হয়নি, প্রশ্নের উত্তর দিলেও কিছু বুঝবে না, উল্টো বুঝে আরেক বিপত্তি হবে। সাধনা করে মনের শুদ্ধতা অর্জিত না হলে তাদের এসব কথা বলা হলেও কিছুই বুঝবে না।

যুক্তি বিচারের দ্বারা সৃষ্টির কথা আর পৌরাণিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে সৃষ্টির কথা এই দুটো দৃষ্টিভঙ্গীই প্রথম থেকেই বেদে বলা হয়ে গেছে। বেদে পুরুষসূক্তম্ সৃষ্টির ব্যাপারে পৌরাণিক দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ণনা দিচ্ছে। পুরুষসূক্তম্ পুরোটাই পৌরাণিক ভাবে বর্ণিত, যিনি পুরুষ, পুরুষ মানে সেই ভগবান, সেই পুরুষকে দেবতারা বললেন আপনাকে সৃষ্টি করতে হবে। সেই পুরুষকেই দেবতারা যজ্ঞের পশু বানাল। সেই পশুকে যখন যজ্ঞে বলি দিচ্ছে তখন সেই যজ্ঞ থেকে পুরুষের এক একটি অঙ্গ থেকে বিভিন্ন সৃষ্টি হতে থাকল। এটাই পৌরাণিক দৃষ্টিভঙ্গী। আবার নাসদীয়সূক্তে যুক্তি বিচারের উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। তাই নাসদীয়সূক্ত আর পুরুষসূক্তের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পূর্ণ আলাদা। নাসদীয়সূক্তম্ দার্শনিক তত্ত্বের আধারে আর পুরুষসূক্তম্ পৌরাণিক আধারে। পুরুষসূক্তমের সবটাই কবিতার আকারে বর্ণনা, যার মধ্যে সত্যের উপাদান অনেক কম। একটা দুটো বাস্তব সত্যের উপাদান নিয়ে বাকিটা কাব্যিক ঢঙে সাজান হয়েছে। যদি আমরা সত্যিই ধরে নিই ভগবানকে ধরে এনে বলি দিয়ে যজ্ঞে তাঁকে আহুতি দিচ্ছে তাহলে কিন্তু এর তাৎপর্য আমাদের কাছ থেকে হারিয়ে যাবে। পুরুষসূক্তমের তাৎপর্য হল যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে সব ঈশ্বর থেকেই বেরিয়েছে, ঈশ্বরেরই বিস্তার, ঈশ্বরের বাইরে কিছু নেই। এই তত্ত্বকে বলার জন্য এত বড় একটা রূপকাকারে ছবি আঁকা হয়েছে। কেন করেছেন? আমাদের মত মুর্খদের জন্য। হাজার খানেক স্বর্গ আর লাখ খানেক নরক যদি না থাকে, ভয় যদি আমার নাইই থাকে তাহলে আমরা কিসের জন্য ধর্ম পালন করব! ঋষিরা দেখলেন সরাসরি এদের আধ্যাত্মিক তত্ত্ব দিলে নিতে পারবে না, পাপের ভয় যদি না থাকে এরা কেউ ভালো কাজের দিকে এগোবেই না। আমাদের মত মূর্খদের জন্য ঋষিরা বিভিন্ন কাহিনীর মাধ্যমে আধ্যাত্মিক সত্যগুলিকে সামনে নিয়ে এলেন। কিন্তু তাই বলে কি ধর্মটা মুর্খদের জন্যই করা হয়েছে? কখনই তা নয়, প্রবৃত্তি আর নিবৃত্তিমূলক ধর্মের ব্যবস্থা এই জন্যই করা হয়েছে। ধর্ম যারা গৃহস্থ তাদের জন্যও আবার যিনি সন্ন্যাসী তাদের জন্যও, যারা স্থুল বুদ্ধি সম্পন্ন আবার যারা সূক্ষ্ম বুদ্ধি সম্পন্ন উভয়ের জন্যই ধর্ম।

সূক্ষ্ম বুদ্ধি সম্পন্নদের জন্য নাসদীয়সূক্তম্ এবং যাদের বুদ্ধি সূক্ষ্ম হয়নি তাদের জন্য পুরুষসূক্তম্। সারা দেশে তাই কেউ নাসদীয়সূক্তম্ আবৃত্তি করে না, সবাই পুরুষসূক্তম্ই পাঠ করছে। বেলুড় মঠে সন্ন্যাসীর শরীর চলে গেলে তাঁর দেহকে স্নান করার সময় পুরুষসূক্তম্ থেকে পাঠ করা হয়। নাসদীয়সূক্তম্ বেশির ভাগ মানুষই বুঝতে পারবে না, কারণ এর মন্ত্রগুলি অত্যন্ত উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ত্বে সমৃদ্ধ। এর অর্থগুলি এত জটিল আর এত

ভাবে অর্থ করা যেতে পারে যে, যত পণ্ডিত এর অনুবাদ করেছেন কারুর সঙ্গে কারুরটা মেলে না। স্বামীজীও নাসদীয়সূক্তমের অনুবাদ করেছেন। নাসদীয়সূক্তমের মধ্যে এত গভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্ব রয়েছে যে, যে কোন পণ্ডিত ইচ্ছে করলে শব্দের অর্থ একটু এদিক ওদিক করে যে কোন একটা অন্য দর্শন দাঁড় করিয়ে দিতে পারেন। শব্দের অর্থ নিজের ইচ্ছে মত পাল্টানোর কথা বলা হচ্ছে না, সংস্কৃতের একটা অর্থের পাঁচ রকম অর্থ হতে পারে, পাঁচটা অর্থকে পাঁচ ভাবে নিলে পাঁচটা আলাদা আলাদা দর্শন দাঁড়িয়ে যাবে।

স্বামীজীও সায়ানাচার্য শব্দগুলির যে অর্থ করেছেন তার থেকে সরে এসে অন্য অর্থ করেছেন। স্বামীজী মনে করেছেন নাসদীয়সূক্তমের ঠিক ঠিক ব্যাখ্যা দিতে গেলে এই শব্দের এই অর্থই নিতে হবে, সৃষ্টির ব্যাখ্যা করতে হলে এই অর্থ গ্রহণ করতে হবে। স্বামীজী তাই ইংরাজী অনুবাদ করার সময় নিজের মত অর্থ করেছেন। নিজস্ব যে ভাব নিয়ে স্বামীজী ইংরাজী অনুবাদ করেছেন, বাংলায় তার অনুবাদ করার সময় সেই ভাব বজায় রাখতে না পারার জন্য পুরো অনুবাদটাই পণ্ড হয়ে গেছে। গীতার দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ অনাসক্ত কর্মের কথা বলেছেন, অনাসক্তের ইংরাজী অনুবাদ detached or unattached কিন্তু স্বামীজী এর অনুবাদ করলেন unselfish, unselfishness work, অনাসক্তের সাথে এর কোন সম্পর্কই নেই। অথচ গভীর ভাবে এর গূঢ়ার্থ ভাবলে স্বামীজীর অনুবাদই সব দিক থেকে উপযুক্ত মনে হবে। আবার এই unselfishness workকে বাংলায় অনুবাদ করে দিল নিঃস্বার্থ কর্ম। এরপর যখন গীতা অধ্যয়ন করব তখন এটাই পড়ব অনাসক্ত হও আর স্বামীজীর অনুবাদ যখন পড়ব তখন পড়ব নিঃস্বার্থ হও। কিন্তু অনাসক্ত আর নিঃস্বার্থের মধ্যে কোন মিল নেই। কারণ স্বামীজী শুধু অনুবাদই করেননি সাথে সাথে তিনি এর ব্যাখ্যাটাও দিয়ে দিচ্ছেন। মানুষ অনাসক্তের কি বুঝবে, আমি অনাসক্ত হয়ে কিভাবে রান্না করব? তাই বলছেন তুমি নিঃস্বার্থ হয়ে রান্না কর। রান্না যখন করছ তখন তোমার জন্যই করছ তখন আরও দুজনের জন্য কর। মা যখন রান্না করে তখন তার নিজের জন্যই শুধু করে না, সবার জন্যই করে – এটাই প্রকৃত অনাসক্ত। প্রত্যেক মায়েরাই এভাবে রান্না করে, অনাসক্ত হয়ে করছে, যে কোন সমাজে মায়েদের স্থান তাই এত উর্ধ্বে দেওয়া হয়। অনাসক্ত হওয়া এই নয় যে কোন দিকে নজর দেব না, কারুর খোঁজ খবর নেব না, সেইজন্য মানুষকে বলা হচ্ছে তুমি নিঃস্বার্থপর হও। কিন্তু এই নিঃস্বার্থপরতার ভাব থেকে মানুষ অনেক দূরে সরে এসে আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়ার জন্য পরিবারগুলি ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রে পরিণত হয়ে একটা অন্ধকারময় আত্মসর্বস্ব জীবনকে বেছে নিচ্ছে। আজকের দিনে গীতা তাই এত প্রাসঙ্গিক, এই স্বার্থপরতার অন্ধকারময় জীবন থেকে বাঁচার জন্য প্রথমেই তোমাকে নিঃস্বার্থ হতে হবে। এটাই স্বামীজী তাঁর অনুবাদে বলতে চেয়েছেন। অনাসক্ত কর্মের কথা গীতাতে যেভাবে বলা হয়েছে আজকের দিনের পরিপ্রেক্ষিতে সেটাই বলা হচ্ছে যে তোমাকে কর্ম করতেই হবে, কর্ম ছাড়া দুনিয়াতে কেউ বাঁচতে পারবে না, তাই আগে তুমি নিজের স্বার্থবুদ্ধি ত্যাগ কর, তারপর যে কাজই করবে সেটা অপরের জন্য কর, তাতে তুমিও বাঁচবে অপরকেও বাঁচার সুযোগ করে দিতে পারবে। অনাসক্তের অনুবাদ স্বামীজী যে নিঃস্বার্থ করেছেন এটাই উপযুক্ত অনুবাদ কিন্তু যে মুহুর্তে অনাসক্তের অর্থ নিঃস্বার্থ করে দেবে তখনই মনে হবে অনুবাদটা ঠিক হচ্ছে না। যেখানেই শাস্ত্রের কিছু শব্দকে স্বামীজী ইংরাজীতে অনুবাদ করেছেন পরে সেটাকেই বাংলাতে অনুবাদ করার সময় তার অর্থ পুরো পাল্টে গেছে। নাসদীয়সূক্তমের প্রথম মন্ত্রে বলছেন –

নাসদাসীন্ নো সদাসীৎ তদানীং নাসীদ্রজো নো ব্যোমা পরো যৎ।
কিমাবরীবঃ কুহকস্য শর্মন্নম্ভঃ কিমাসীদ্ গহনং গভীরম্।।১।।

প্রথম মন্ত্রের প্রথম শব্দ *‘নাসদ্’*, বেদের সূক্তে যেটা প্রথম শব্দ থাকে সেই শব্দ দিয়েই সূক্তের নামকরণ করা হয়, *ন অসদ্* দিয়ে শুরু, সূক্তের নাম তাই নাসাদীয়সূক্তম্। এখানে দুটি শব্দ অসৎ আর সৎ, তখন অসৎও ছিল না সৎও ছিল না। কখনকার কথা বলছেন? *‘তদানীং’* মানে তখন, সেই সময়।

অসৎ আর সৎ এই দুটো শব্দ হিন্দু ধর্মের যত শাস্ত্র আছে বিশেষ করে বেদ, উপনিষদ, গীতা, পুরাণে বার বার আসবে। গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ের একটা শ্লোকে(১৩) সৎ ও অসৎ শব্দের উল্লেখ করা হয়েছে – *অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে*। দুটো শব্দ অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, এমনকি দ্ব্যর্থবোধাত্মক

অর্থেও ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থের বিভিন্নতার কারণেই বিভিন্ন দর্শনের জন্ম হয়েছে। সাধারণ ভাবে আমরা সৎ এর অর্থ করি যেটা আছে। কিন্তু একটা জিনিস আছে কিসের ভিত্তিতে বলছি যে এটা আছে। আমি আছি, আপনি আছেন, সে আছে, বাড়ি আছে, গাছ আছে। এই যে আছে, তার প্রমাণ কি? একটা জিনিস আছে কি নেই বিশ্বের যে কোন দর্শন, আজকের দর্শন, আগেকার দর্শন, সবার কাছেই এক বিরাট সমস্যা। একে বলে epistemology বা Theory of knowledge। আগে তোমাকে বলতে হবে যে জিনিসটা তুমি জানো বলছ, সেটাকে জানার উপায় কি। শুনলে মনে হবে কি সব অদ্ভুত কথা বলছে। কিন্তু এই ব্যাপারগুলো যতক্ষণ না পরিষ্কার হবে ততক্ষণ শাস্ত্রের অর্থ বোঝাই যাবে না। এগুলিকে অবহেলা করে করে আজ হিন্দুরা নিজেদের ধর্মকেই ভুলে গেছে। মুসলমানরা তাদের ধর্মকে খুব ভালো করে জানে, কারণ ইসলাম ধর্ম খুব পরিষ্কার আর সহজ – আল্লা আছেন, তিনি জগৎ সৃষ্টি করেছেন, আমাদের কাজের সুযোগ দিয়েছেন, ভালো কাজ করলে স্বর্গে, খারাপ কাজ করলে নরকে যেতে হবে। কিন্তু হিন্দুদের কাছে তাদের হিন্দু ধর্মের কিছুই পরিষ্কার নয়।

আজকের দিনে যে কোন ধর্মকে ঠিক ঠিক বুঝতে হলে Theory of knowledgeকে জানতেই হবে, আমার হাতে এই চক আছে, আমি জানব কি করে যে এটা চক। আমি যে চক দেখছি অন্যেরাও যে এই একই চক দেখছে এর প্রমাণ কি? এটাকে না বুঝলে একটা অবস্থায় গিয়ে শাস্ত্র ঠিক কি বলতে চাইছে সঠিক ভাবে অনুধাবন করার ক্ষেত্রে বিরাট সমস্যা তৈরী হবে। শাস্ত্রের অর্থ বিচার করার ক্ষেত্রে একটা অবস্থায় আবার নৈয়ায়িকরা চলে আসেন, তখন আবার এর চুলচেরা তর্ক আর বিচার চলতে থাকে। এরা আবার তখন ধর্মের পথ থেকে সরে আসে। বেদান্ত, উপনিষদ বুঝতে হলে সবাইকে Theory of knowledge ভালো করে যুক্তি সহকারে বুঝতে হবে, যদি না বোঝে তাহলে শঙ্করাচার্যকে বুঝতেই পারবে না, শঙ্করাচার্যকে যদি না বোঝে গীতা উপনিষদও কোন দিন বুঝতে পারবে না।

প্রথম প্রমাণ হল প্রত্যক্ষ প্রমাণ। প্রত্যক্ষ প্রমাণের প্রথম শর্ত আমি যা দেখছি অপরেও যেন তাই দেখে। আমি এক রকম দেখছি আরেকজন অন্য রকম দেখছে তা কখনই হবে না। আবার কিছু জিনিস আছে আমরা চোখে দেখছি না, যেমন ইলেক্ট্রনকে আজ পর্যন্ত কেউ দেখতে পায়নি, কিন্তু গবেষণার সাহায্যে পরীক্ষা করে তার অস্তিত্ব জানা গেছে এটাও প্রত্যক্ষ প্রমাণের মধ্যে পড়ে। প্রত্যক্ষ প্রমাণের পর আসছে অনুমান প্রমাণ। খুব ঠাণ্ডা পড়েছে, আমি বাড়ি ফিরলাম কিন্তু ঘেমে গেছি, বাড়ির লোকদের কি মনে হবে? হয় আমি খুব দৌড়ে দৌড়ে এসেছি আর তা নাহলে আমার শরীর খারাপ হয়েছে। বাড়ি ফিরে আমি খুব হাসি মুখে কথা বলছি, তখন বাড়ির লোক ধরে নিল আমি দৌড়ে দৌড়ে এসে ঘেমে গেছি। বাড়ির লোক বলল – তুমি দৌড়ে দৌড়ে কেন এলে? বাড়ির লোক কি করে জানল যে আমি দৌড়ে এসেছি। এটাই অনুমান প্রমাণ। অনুমান মানে বাংলার অনুমান নয়, আমি অনুমান করলাম বা আমার অনুমানে মনে হচ্ছে এই রকম হতে পারে, এই অনুমানের কথা অনুমান প্রমাণে বলছে না। অনুমান একটা পরিভাষা যার অর্থ দৃঢ় ও সন্দেহাতীত জ্ঞান। আমি দুপুরে ঘুমিয়েছিলাম। ঘুম থেকে উঠে দেখলাম বাইরে রাস্তাঘাট ভেজা। বুঝে গেলাম বৃষ্টি হয়েছে, যেটা জানছি একেবারের দৃঢ় ভাবে জানছি যে বৃষ্টিই হয়েছে। এখানে এসে নৈয়ায়িকরা দুটো ভাগে ভাগ হয়ে যায়। ন্যায় দু রকমের একটা Deductive Logic কারণ দেখে কার্যকে জানা আরেকটি Inductive Logic কার্যকে দেখে কারণকে বিশ্লেষণ করা। যখনই আমরা এটাকে Inductive Logicএ নিয়ে যাব তখন এটাই পুরো একটা আলাদা ফিলজফির কোর্স হয়ে যাবে, যার উপরে প্লেটো, এ্যরিস্টটলরা অনেক কাজ করেছেন। বেশির ভাব দার্শনিকরা তর্ক করার জন্য প্রশ্ন তোলেন যে – তুমি যে একে অনুমান প্রমাণের জন্য ভিত্তি করেছ এর কোন দামই নেই। এই নিয়েই তখন অনেক তর্কাবিতর্ক হবে। আমাদের এর মধ্যে ঢুকে কোন কাজ নেই।

তারপরে আসছে শব্দ প্রমাণ। শব্দ প্রমাণ মানে শ্রুতি প্রমাণ, বেদে আছে সেইজন্য আমি এটা সত্য বলে জানছি। খ্রীশ্চান বা মুসলমানরা কি মানবে শব্দ প্রমাণকে? তারা বলবে তোমার বেদে আছে তাতে আমার কি যায় আসে। যারা ঘোর ভৌতিকবাদী তারা শব্দ প্রমাণকে তো মানবেই না, অনুমান প্রমাণকেও উড়িয়ে দেয়। তুমি বড়লোক আমি সাধারণ লোক হয়ে জন্মেছি, তুমি সব সময় সুস্থ আমি রোগগ্রস্থ হয়ে জন্মেছি, এর আবার অনুমান কি, এর কারণ অন্য কোথাও হবে। যদি বলা হয় জেনেটিক কারণে, তারা বলবে জেনেটিক্সেরও আবার

কারণ থাকে নাকি! অনুমান-টনুমান আমরা বিশ্বাস করিনা, চোখের সামনে যা দেখব সেটাই মানব। এটাই চার্বাক দর্শনের মত। এইভাবে বিভিন্ন দর্শনে জ্ঞানার্জনের বিভিন্ন পন্থার কথা বলা হয়েছে।

এরপর অভাব প্রমাণ। একটা জিনিস নেই, মানে যেটার অভাব, বস্তুর অভাবই সেই বস্তুকে জানার একটা পদ্ধতি। এখানে যদি বোতল থাকে আমরা প্রত্যক্ষ দেখতে পাবো একটা বোতল আছে। যদি বলি দেখুন তো এখানে গাধা আছে কিনা। দেখলাম গাধা নেই, এটা হয়ে গেল অভাব প্রমাণ। একটা জিনিস নেই সেটাও জানার একটা পদ্ধতি। অভাব প্রমাণ আমাদের খুব সংশয় তৈরী করে, এখানে একটি বোতল নেই আরেকটি বোতল আছে তাহলে দুটোই তো প্রত্যক্ষ হয়ে গেল। তাহলে হঠাৎ অভাব কেন বলতে যাচ্ছেন। যারা অভাব প্রমাণ তৈরী করেছেন তাদের একটা যুক্তি আছে কেন অভাব প্রমাণকে একটা আলাদা জানার পদ্ধতি করা হচ্ছে। আর অভাব প্রমাণকে যদি সঠিক বলে না মানা হয় তাহলে বেদান্ত দর্শন ভেঙ্গে চৌচিড় হয়ে যাবে, বেদান্তের কোন অস্তিত্বই থাকবে না। অন্যান্য দর্শনের সাথে যখন বেদান্তের লড়াই হয় তখন প্রথমে অভাব প্রমাণ নিয়ে সবাই বেদান্তকে আক্রমণ করে। আর যদি বলে দেওয়া হয় অভাবতো প্রত্যক্ষই, দেখতে পাচ্ছি যে একটা জিনিস নেই এটাই তো প্রত্যক্ষ প্রমাণ হয়ে গেল, তাহলে প্রত্যক্ষ প্রমাণ আর অভাব প্রমাণের মধ্যে পার্থক্য কোথায় রইল। কিন্তু দুটোর মধ্যে একটা মৌলিক পার্থক্য আছে। একটা জিনিসকে ওখানে দেখার কথা আমি ভাবছিলাম সেটা দেখতে পাচ্ছি এটা আমার মনের মধ্যে একটা ছাপ ফেলছে, আবার যদি না দেখতে পাই সেটাও আমার মনের মধ্যে সক্রিয় ছাপ ফেলছে যে, জিনিসটা নেই। অভাব প্রমাণ কখনই নেতিমূলক কিছু হচ্ছে না, প্রত্যক্ষ প্রমাণে ফেলে দিলে নেতিবাচকে হয়ে যাবে, কিন্তু অভাব প্রমাণে স্পষ্ট রূপে জ্ঞান হচ্ছে।

যদি বলে অন্ধকার মানেই তো আলোর অভাব, অন্ধকারকে কি কখন দেখা যায়? তখন এনারা বলবেন – তোমার কথা ঠিক, অন্ধকার আলোর অভাব, কিন্তু এখানে এটা মিলবে না, এই মিলটা এক নয়। আমি অন্ধকারকে অন্ধকার বলতে পারি, কিন্তু ‘তুমি অন্ধকার ছড়াচ্ছ’ এই কথা কোথাও শোনা যাবে না, আমরা বলি আলোটা নিবিয়ে দেওয়া হয়েছে। আলো নিবিয়ে দেওয়া আর অন্ধকার করা একই জিনিস। তাই এখানে এই যুক্তি কোন দিক দিয়েই খাটবে না।

বেদান্ত অধ্যয়ন করার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ প্রমাণ, শব্দ প্রমাণ আর অভাব প্রমাণ অত্যন্ত জরুরি, অনুমান প্রমাণের অতটা গুরত্ব নেই। পূর্বমীমাংসা অভাব প্রমাণকে মানে না, আর বৌদ্ধ, জৈন, যোগ, সাংখ্য এরাতো মানবেই না, এরা বলবে অভাব আবার কি, সব প্রত্যক্ষ। এখানেই বেদান্ত নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে না যদি অভাব প্রমাণকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়। বেদান্তের অনেক কিছু দাঁড়িয়ে আছে শুধু এই অভাব প্রমাণ কোন কিছুকে জানার একটা অকাট্য প্রমাণের জন্য। ইংরাজীতে একটা কথাকে খুব সুন্দর করে বলা হয় - He was conspicuous by his absence। Conspicuous কথার অর্থ দৃষ্টিগোচর হওয়া। একটা ক্লাশে একজন ছাত্র ইউনিফর্ম না পড়ে একটা চক্‌রাবক্‌রা জামা প্যান্ট পড়ে মাথায় টুপি লাগিয়ে ক্লাশে বসে আছে তখন ইংরাজীতে বলবে – The student become conspicuous by his dress ছাত্রের সাজপোশাক ক্লাশের সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। উদ্ভট পোষাকের জন্য ছাত্রকে শিক্ষক প্রচণ্ড তিরস্কার করেছেন, এমন ভাবে সবার সামনে বকলেন যে ছাত্রটি নিজেকে প্রচণ্ড অপমানিত বোধ করে পরের দিন ক্লাশে অনুপস্থিত হয়ে গেল, তখন বলা হবে He was conspicuous by his absence. তাকে সবাই ক্লাশে আশা করেছিল কিন্তু সে ক্লাশে ছিল না, এটাই positive absence। এর ঠিক উল্টোটা হল ভাব, মানে জিনিসটা আছে। প্রত্যক্ষ হল ভাব, অভাব এর ঠিক বিপরীত। আবার প্রত্যক্ষ না হলেই সেটা কিন্তু অভাব প্রমাণ হয়ে যাবে না। এ ঘরে অনেক কিছু নেই হাতি নেই, ঘোড়া নেই, বাঘ নেই, ‘নেই’ এর একটা তালিকা বানালে বিশাল হয়ে যাবে, কিন্তু আমরা তা করছি না, একজনের আসার কথা ছিল সে এখানে নেই, তার অনুপস্থিতি আমাকে তার জ্ঞান লাভ করিয়ে দিচ্ছে, এটাই অভাব প্রমাণ। সাধারণ অবস্থাতে সৎ বলা মানে একটা জিনিস আছে, তাকে ছটি প্রমাণের, মানে কোন কিছুকে জানার যে ছয়টি প্রক্রিয়া আছে তার যে কোন একটার দ্বারা সিদ্ধ হতে হবে। ছয়টি প্রমাণই যে কোন কিছুর জ্ঞান লাভের অকাট্য প্রমাণ। ছয়টি প্রমাণকে বলে ষট্‌প্রমাণ। এই ষট্ প্রমাণ দিয়ে যে জিনিসটাকে জানা যায় সেটাই সৎ, অর্থাৎ তার অস্তিত্ব আছে।

সৎকে আমরা দেখলাম, অসৎ ঠিক এর বিপরীত। আমরা যখন চিন্তা করি, ঘুমোই, গল্প করি, খাওয়া দাওয়া করছি সব সময় আমাদের মনে নানা ধরণের ঢেউ উঠছে, স্বামীজী রাজযোগে বলছেন জলাশয়ে পাথর পড়ছে। মনের মধ্যে যে ঢেউ সৃষ্টি হচ্ছে এটাকেই বলছে জানা। আমরা যা কিছু জানছি এই জানাটা কিভাবে হচ্ছে? বাইরে থেকে কোন উত্তেজনা মনের মধ্যে গিয়ে ঢেউ তুলল, তখনই আমাদের কোন জিনিসের জ্ঞান হয়ে গেল, জানার ব্যাপারটা ভেতরে হয় আর আমাদের ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে উত্তেজনা বাইরে থেকে এসে চৈতন্যের সাথে জুড়ে গিয়ে আমাদের জ্ঞান হয় যে এটা আমরা জানলাম। যেমন কাঁচের বোতলের বাইরে চুম্বক নড়ছে আর বোতলের ভেতরে লোহা নড়ছে, ঠিক তেমনি সবার ভেতরে বুদ্ধিতে যে চৈতন্য রয়েছে সেটা নড়ছে, বুদ্ধিতে যে কম্পন হচ্ছে চৈতন্য সেই কম্পনের সাথে একাত্ম হয়ে পড়ছে। সেইজন্য আমরা কখনই বাইরের জগতকে জানতে পারিনা, আমার মনের ভেতরে যে বৃত্তিগুলি হচ্ছে সেটাকেই আমরা জানছি। এই তত্ত্বটাই আবার দুটো দর্শনের জন্ম দিচ্ছে – Subjectivism, অধ্যাত্মবাদ and Objectivism, বস্তুবাদ বা বিষয়বাদ। জিনিসটা কি বাইরে আছে না নেই, Subjectivism বলবে বাইরে কোথায় আছে, ওটা একটা উত্তেজনা, যা হবার তোমার ভেতরেই হচ্ছে, Objectivism আবার বলবে যা আছে বাইরেই আছে, বাইরে আছে বলেই তো তুমি জানতে পারছ, বাইরে যদি নাইই থাকত তাহলে তোমার জানার কোন প্রশ্নই আসত না। এই নিয়ে তুমুল বিতর্ক হয়। প্লেটো ছিলেন Subjectivist কিন্তু তাঁর শিষ্য অ্যারিস্টটল ছিলেন Objectivist। এগুলো যদিও খুব জটিল মনে হবে, কিন্তু এই জিনিসগুলি যদি পরিষ্কার না হয় আর এর পার্থক্য যদি না ধরা যায় তাহলে শাস্ত্রের তত্ত্বগুলি আমরা ধারণাই করতে পারব না।

মূল কথা আমাদের মনের ভেতরেই খেলা চলছে। বাইরে টেবিল, গ্লাশ, মাইক সব আমার মনের মধ্যে বৃত্তি রূপে খেলা করছে। বৃত্তি মানে চিত্তের মধ্যে চৈতন্যের কম্পন হওয়া। যখন ভাব বৃত্তি তৈরী হয়, অর্থাৎ যে জিনিসটা আছে সেটা চিত্তের মধ্যে এমন একটা বৃত্তি তৈরী করে যার ফলে মনে হবে এটা আছে, এটাই সৎবৃত্তি বা ভাববৃত্তি। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান বলছেন – *নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ। উভয়োরপি দৃষ্টোন্তস্তনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ*।। সৎ থেকে কখন অভাবের সৃষ্টি হয় না, অভাব থেকে কখন সৎ এর সৃষ্টি হয় না। এই শ্লোককেই বিভিন্ন আচার্যরা বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করেন। সৎ বৃত্তি আমাকে একটা বৃত্তি দিচ্ছে সেটা হল এই জিনিসটার অস্তিত্ব আছে। অসৎ বৃত্তি হল যেটা থেকে সেই বস্তুর অস্তিত্বহীনতার বৃত্তি তৈরী করছে।

নামকরা জার্মান থিয়োলজিয়ান টমাস এ্যাকোইনিয়ার খুব বড় খ্রীশ্চান সাধু ছিলেন। সেমিনারিতে তিনি যখন ছিলেন, অর্থাৎ যেখানে খ্রীশ্চান পাদরিদের ট্রেনিং দেওয়া হয়, সেই সময় তাঁর শরীরটা খুব স্থূলকায় ছিল। আড়ালে সবাই তাঁকে ষাঁড় বলে ডাকত। যাঁরা ধর্মের পথে থাকেন তাঁরা এসব জিনিস নিয়ে বেশি মাথা ঘামান না। কিন্তু টমাস এসব ব্যাপারে খুব সিরিয়াস ছিলেন। একদিন দুজন সহপাঠি মজা করে তাঁকে বললেন – দেখো দেখো একটা ষাঁড় আকাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। আমাদের কাউকে যদি বলা হয় আকাশ দিয়ে একটা ষাঁড় উড়ে যাচ্ছে, আমরা নিশ্চয়ই কেউ জানলার কাছে দৌড়ে দেখতে যাবো না। কিন্তু টমাস সোজা দৌড়ে জানালা দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখছে। কাণ্ড দেখে ক্লাশের সবাই হো হো করে হাসতে শুরু করে দিয়েছে। উনি কিছু না বলে জানলার কাছ থেকে সরে এসে নিজের চেয়ারে ফিরে এলেন। তখন একজন তাঁকে বলছে ‘তোমার মাথাটা কি মোটা? এতটুকু বুদ্ধিও কি তোমার নেই যে আকাশ দিয়ে ষাঁড় উড়ে যেতে পারে!’ টমাস তখন উত্তর দিচ্ছে ‘আকাশ দিয়ে একটা ষাঁড় উড়ে যাচ্ছে আমি বিশ্বাস করব কিন্তু একজন ভাবী খ্রীশ্চান সন্ন্যাসী কখন মিথ্যা কথা বলবে, এ আমি কোন দিনই বিশ্বাস করতে পারব না’। এই কথাতে সবার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। যখনই কেউ বলবে আকাশে ফুল ফুটেছে, ডানাওয়ালা গাধা বা ঘোড়া উড়ে যাচ্ছে তখন আমাদের মনের মধ্যে ভাব বৃত্তি আসবে না, তার বদলে আসবে অভাব বৃত্তি। চৈতন্য ভাবটা আসছে কিন্তু সেই ভাবটা একটা নেতিমূলক ভাবের উদয় হয়ে বলে দিচ্ছে যে এই জিনিসের কোন অস্তিত্বই নেই। যখন অভাব বৃত্তির চৈতন্য হচ্ছে তখন তাকে বলছে অসৎ। অসৎ হল অভাব বৃত্তিযুক্ত চৈতন্য।

আমরা সৎ আর অসৎ এর পার্থক্যটা দেখলাম। কিন্তু এর যদি অর্থ করে দিই সৎ মানে যেটা আছে আর অসৎ মানে যেটা নেই, তাহলে নাসদীয়সূক্তমের দর্শন পুরো মিথ্যা হয়ে একটা মামুলি কবিতা হয়ে যাবে। নাসাদীয়সূক্তম্ বলছে সৃষ্টির আগে সৎ ছিল না আর অসৎও ছিল না, মানে দৃশ্য জগৎ বলে কিছু ছিল না, যাকে আমি ইন্দ্রিয় দিয়ে, শব্দ দিয়ে, অনুমান দিয়ে জানতে পারি সেটা তখন ছিল না। তাহলে কি ছিল তখন? শূন্য ছিল কি? না, তখন শূন্যও ছিল না। কেন বলছেন তখন শূন্যও ছিল না? কারণ বলা হচ্ছে *নো অসদ্ আসীদ্*, অসৎও ছিল না, তার অর্থ অবৃত্তি, কিছু নেই সেটাই নেই, নেই জিনিসটাই নেই। আকাশ কুসুম অসৎ, আকাশ কুসুম কখনই নেই, বন্ধ্যা পুত্র অসৎ। তাহলে কি ভগবান অসৎ? না, ভগবান কখনই আকাশ কুসুমের মত, বন্ধ্যা পুত্রের মত অসৎ হন না। তাহলে কি করে জানা যাবে ভগবানকে? শব্দ প্রমাণের দ্বারা ভগবানকে জানা যাবে। কেননা ভগবান প্রত্যক্ষ প্রমাণ হবে না, সাদা চোখ দিয়ে ভগবানকে দেখা যাবে না। ভগবানকে অনুমান প্রমাণ দিয়েও জানা যাবে না। যেহেতু ভগবানকে শব্দ প্রমাণ দিয়ে জানা যায় সেইজন্য তিনি অসৎ নন। প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিয়ে জানা যায় না, তাই তিনি সৎ নন। সেইজন্য বলছেন সৎ ছিল না, কিন্তু শব্দ প্রমাণে ভগবান আছেন, যেহেতু প্রত্যক্ষ প্রমাণ যতটা স্পষ্ট শব্দ প্রমাণ ঠিক একই ভাবে স্পষ্ট, তাই ভগবানকে অসৎ বলা যাবে না। অভাব প্রমাণের মূল্যও এক রকম, কোন পার্থক্য নেই, কোন প্রমাণই দু-রকমের কথা বলবে না। প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিয়ে ভগবানকে ধরা যাচ্ছে না তাই তিনি অসৎ আবার শব্দ প্রমাণ দিয়ে তাঁকে ধরা যাচ্ছে তাই তিনি অসৎ নন, সেইজন্য তখন সৎ ছিল না, অসতও ছিল না। সৎ কেন ছিল না? কেননা তখন দৃষ্টি প্রমাণ অর্থাৎ দেখার মত কিছুই নেই, শুধু যে ভগবানই নেই তা নয়, কিছুই নেই, সৃষ্টিই নেই, সৃষ্টি হলে তবেই তো কিছু দেখবে, দেখারও কিছু নেই, যে দেখবে সেও নেই, বিষয়ও নেই বিষয়ীও নেই। তাহলে কি কিছুই নেই, তাহলে তো বলতে হবে যে শূন্য থেকে সৃষ্টি বেরিয়ে এলো। যদি বলা হয় *ন সৎ আসীদ্*, সৃষ্টির পূর্বে কিছুই ছিল না বললেই বলতে হবে সৃষ্টিটা শূন্য থেকে বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু শূন্য থেকে কি করে সৃষ্টি হবে, তখন পুরোটাই অভাব হয়ে গেল, অভাব থেকে কি করে সৃষ্টি হবে! ফিজিক্সেও এই নিয়ে সমস্যা আসে, বিগ ব্যঙের আগে পদার্থ কোথায় ছিল? তারা বলবে matter was in energy form, এনার্জী ফর্ম কোথায় ছিল? একটা পয়েন্ট ফর্মে ছিল। তার আগে কি ছিল? ফিজিক্স বলছে আমরা জানিনা।

অসৎও ছিল না, নাসদীয়সূক্তমের এই ভাব থেকেই বেদান্তের নির্দ্বন্দ্ব অদ্বৈত তত্ত্ব বেরিয়ে আসছে। এই অসৎকে যদি আমরা অন্য ভাবে ব্যাখ্যা করি তাহলে সেটা অন্য দর্শন হয়ে যাবে। কেন অসৎও ছিল না? আমরা আগেই বলেছি যে প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিয়ে জানা যাবে না, যেহেতু প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিয়ে জানা যাবে না তাই বলা হচ্ছে *নো সদ্ আসীদ্*। সৃষ্টি ছিল না তার মানে কি কিছু ছিল না? বৌদ্ধরা যেমন নির্বাণকে বলছে প্রদীপ জ্বলছে ফুঁ মেরে নিবিয়ে দেওয়া হল, তাহলে আলো কোথায় গেল? কোথায় যাবে, কোথাও যায়নি আলোর অভাব হয়ে গেছে। এখানে বৌদ্ধদের মতানুযায়ী অভাবও হবে না, বলা হচ্ছে কিছু ছিল না অথচ কিছু ছিল। তাহলে সৎ বলা হচ্ছে না কেন? যেহেতু প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিয়ে জানা যাবে না, তাই বলা হল *নাসদাসীন্ নো সদাসীত্*। পরের দিকে এই গভীর তত্ত্ব থেকেই বেদান্তের মূল তত্ত্ব দ্বৈতাদ্বৈতের পারের তত্ত্ব জন্ম নিয়েছে। আমাদের মন সব সময় দ্বৈত জগতের মধ্যেই থাকে, তাই দ্বৈতাদ্বৈতের পারে বলতে গেলে ঠিক কি বোঝায় আমরা ধারণা করতে পারিনা। সব থেকে সুন্দর উপমা সূর্য। সূর্যে দিন আছে, না রাত আছে? সূর্যে দিনও নেই রাতও নেই, দিন হলে রাতও হবে। সূর্য দিন ও রাতের অবস্থার পারে। যদি ধরে নেওয়া হয় সূর্যের তাপেও মানুষের মত বাসিন্দা আছে। সূর্যের মানুষকে পৃথিবীর মানুষ গিয়ে যদি বলে – বাঃ কি মজা এখানে সব সময় দিন। সূর্যের মানুষ অবাক হয়ে বলবে – দিনটা আবার কি জিনিস? পৃথিবীর মানুষ বলছে – কেন এই যে সব সময় আলো থাকছে। সূর্যের মানুষ আরও অবাক হয়ে বলবে – আলো থাকাটা দিন কেন হবে, আলোর আবার বিপরীত কিছু আছে নাকি!

আরও সহজ ভাবে বোঝা যাবে – যদি আমাকে কেউ জিজ্ঞেস করে তুমি পরীক্ষায় পাশ করেছ? আমি বললাম আমার এখনও পরীক্ষা হয়নি। সে আবার বলছে – আরে ছাড়ো না, পরীক্ষা হয়েছে কি হয়নি ছাড়ো, তুমি পাশ করেছ কিনা বল? আমি বলব – আপনি কি বোকার মত কথা বলছেন, পরীক্ষাই হয়নি তো পাশ

ফেলের প্রশ্ন কোত্থেকে আসবে। সে বলছে – আরে ধুৎ, যারা পড়াশোনা করে তারা হয় পাশ করে না হয় ফেল করে, তোমার কোনটা হয়েছে, পাশ না ফেল? আমাদের মস্তিষ্কের একটা সীমাবদ্ধতা আছে, তার ফলে আমরা সব সময় দ্বৈত ভাবের বাইরে কিছু ভাবতেই পারিনা, জীবন-মৃত্যু, দিন-রাত্রি, সকাল-বিকেল, শীত-গ্রীষ্ম, ধর্ম-অধর্ম, পাপ-পূণ্য। কিন্তু এগুলির পারেও একটা অবস্থা আছে। মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গলের খেলা হয়নি, আমি জিজ্ঞেস করলাম – কটি গোল হয়েছে? আরে খেলাই শুরু হয়নি। খেলা শুরু হয়ে গেছে এখনও গোল হয়নি, তখন যদি জিজ্ঞেস করে কটা গোল হয়েছে, তাহলে বলবে শূন্য শূন্য। কিন্তু খেলা শুরুই হয়নি, তখন কি বলা যাবে যে স্কোর শূন্য শূন্য? কখনই বলা যাবে না, অঙ্কে এটাকে বলে পাই সেট। পাই সেট হচ্ছে খালি কিন্তু শূন্য বলা যাবে না, পাই আর জিরো তে তফাৎ আছে। পাইয়ের নিয়মে বলে – শূন্যও নয় একও নয় এটা হল পাই। এটাই বলছে - *নাসদাসীন্ নো সদাসীত্*, তখন এই জিরো আর ওয়ানের খেলা ছিল না, তখন পাই ছিল। একটা কিছু ছিল। কি ছিল? শূন্যও ছিল না, একও ছিল না। আমি বলব – আরে জিরো নেই এক নেই তাহলে কি আছে বলুন? নাসদীয় সূক্তে এটাই আমাদের বুঝতে হবে।

অসদ্ আবার দু-রকমের হয়, একটা যেটা এতক্ষণ আমরা আলোচনা করেছি, প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিয়ে দেখা যায় না কিন্তু অনুভূতি দিয়ে দেখা যায়, বেদান্ত যাকে অপরোক্ষানুভূতি বলছে। দ্বিতীয় যত কিছুই হোক না কেন ত্রিকালে যেটা কেউ কোন দিনই দেখতে পারবে না তাকে অসদ্ বলছে। দ্বিতীয় অসদ্‌কে পৃথক ভাবে বোঝার জন্য পরে এর নতুন একটা নাম দিয়ে বললেন অলীক। অলীক শব্দের যথার্থ অর্থ যা কোন কালে ছিল না আর কোন কালে হবেও না। যেমন বন্ধ্যা পুত্র, বন্ধ্যার কোন দিন পুত্র ছিল না আর কোন দিন হবেও না, যদি পুত্র হয়ে যায় তাহলে সে আর বন্ধ্যাই থাকবে না। এগুলো হল contradictory in terms, যদি বলেন গরম গরম বরফ নিয়ে এসো, কিংবা ঠাণ্ডা গরম জল নিয়ে এস, বরফ মানেই ঠাণ্ডা আর গরম জল মানেই গরম হতে হবে। এগুলোকে বলা হয় অলীক।

দর্শনে অসৎ আর অলীক দুটো শব্দ একই রকম মনে হয়। এই কারণে শাস্ত্র বিশেষ করে বেদ ভাষ্য সহকারে না পড়লে শব্দের অর্থ অনেক রকম মনে হবে, আর শব্দের যদি ঠিক অর্থ না করা হয় তাহলে পুরো দর্শনটাই পাল্টে যাবে। যেমন মায়াকে কখন বলবে অলীক, কখন বলবে অসৎ আবার কখন বলছে সৎ। যখন কেউ বলে জগতে একমাত্র মায়াই আছে, যা কিছু দেখছ সব মায়া। তাহলে মায়া শব্দের অর্থ সৎ হয়ে গেল, কেননা প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা মায়া দেখা যাচ্ছে, তাহলে মায়া সৎ। আবার যেহেতু মায়ার প্রকৃত অস্তিত্বই নেই সেই হেতু মায়া অসৎ। এই অসৎকে যখন এরা অলীক অর্থে নেয় তখন মায়া কখন ছিল না আর মায়া কখনই নেই, তার ফলে তারা বলছে জগৎ বলে কিছু নেই, বেদান্ত যেমন বলছে ত্রিকালমে জগৎ নহি হ্যায়। সেইজন্য শাস্ত্রে যখন এই ধরণের শব্দগুলিকে ব্যবহার করা হয় তখন এর অর্থ খুব জটিল হয়ে যায়, আর এই নিয়েই পণ্ডিতদের মধ্যে তর্ক চলতে থাকে। আবার ঈশ্বরকেও কখন কখন বলে দেবে সৎ আবার কখন বলে দেবে সৎ অসৎএর পার, অবশ্য কোন অবস্থাতেই ঈশ্বরকে অলীক বলবে না। মায়াকে যেমন কখন বলছে সৎ আবার কখন বলছে অসৎ তেমনি মায়াকেও বলে দেয় সৎও নয় অসৎও নয়। যখন মায়াকে সৎ নয় অসৎও নয় বলছে তখন এই অসৎ বলতে বোঝাচ্ছে অলীককে। অর্থাৎ মায়া বলে যে কিছুই নেই তা নয় আবার তার চিরন্তন অস্তিত্ব নেই। কোন কোন ক্ষেত্রে ভগবানকে সৎ দিয়ে বোঝাবে, যখন বলছে একমাত্র তিনিই আছেন তখন ভগবানকে সৎ দিয়ে বোঝান হয়। তার মানে ঈশ্বরই একমাত্র সৎ আর বাকি সব অসৎ। এখানে সৎ মানে যার একমাত্র সত্তা আছে বাকী কারুর সত্তা নেই। সৎ আর অসৎ দুটো শব্দ তাই প্রচণ্ড জটিল। গীতাতেও কোথাও কোথাও মায়াকে বলছেন সৎ কখন অসৎ বলছেন আবার কখন বলছেন মায়া সৎ অসতের পার। যদি আমরা প্রথম থেকে একটা বাঁধা অর্থ না ধরে রাখি তাহলে গীতার অর্থ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম হয়ে যাবে। এখান থেকেই শাস্ত্র যে তত্ত্বকে দিতে চাইছে সেটা না ধরতে পারার জন্য অনেক সমস্যার উদ্ভব হয়ে যায়। আমাদের মোটামুটি মনে রাখতে হবে সৎ মানে আছে অসৎ মানে নেই, এটাকে মাথায় রেখে নাসদীয়সূক্তম্ ঠিক কি বলতে চাইছে বোঝার চেষ্টা করব।

প্রথম মন্ত্রে প্রথমেই বলছেন সৎ ছিল না, এর অর্থ জগৎ ছিল না। অসৎ ছিল না, এর মানে একেবারেই যে কিছু ছিল না তা নয়, কিছু একটা ছিল। সৃষ্টি ছিল না মানে দ্রষ্টা কেউ নেই তাহলে দৃশ্য কি করে থাকবে, কিন্তু কিছু যে একটা ছিল সেটা আমরা কিভাবে জানছি? শব্দ প্রমাণের মাধ্যমে জানছি, অর্থাৎ বেদ এই কথা বলছে। ঈশ্বর সর্ব কালেই আছেন। কিন্তু আমরা কি করে জানব যে তিনি হাজার বছর আগে ছিলেন কি ছিলেন না? তিনি যে ছিলেন এটা আমরা জানছি বেদের মাধ্যমে, মানে শব্দ প্রমাণের দ্বারা। যেমন ইতিহাসের ঘটনা ঐতিহাসিকদের গবেষণা আর অনুসন্ধানের পর যে সমস্ত ঘটনা লিপিবদ্ধ হয়েছে তার মাধ্যমে জানছি, ঠিক তেমনি ঈশ্বরের সর্বকালের অস্তিত্বের কথা আমরা জানছি যেখানে সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের আধ্যাত্মিক গবেষণা ও অনুসন্ধানের খবরাখবর সংগ্রহিত করা হয়েছে তার মাধ্যমে অর্থাৎ বেদের মাধ্যমে। ঈশ্বর যদি সর্বকালেই না থাকেন তাহলে এই জগতের অভাব হয়ে যাবে, শূন্য থেকে সৃষ্টি, যার কোন অর্থই হয় না। অসৎএর আগে 'ন' লাগানো আছে, তার মানে এরও দুটো অর্থ – ১) ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং ২) চিরন্তন বা নিত্য। *ন অসৎ* বলা হচ্ছে, তাই প্রথমে যদি সৎ বুঝে নেওয়া যায় তাহলে ন অসৎ বুঝতে সুবিধে হবে। সৎ হয় নিত্য অর্থে আসবে আর তা নাহলে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অর্থে আসবে। যদি নিত্য অর্থে সৎ নেওয়া হয় তখন এর উল্টোটা হয়ে যাবে ন অসৎ, আর ন সৎ হয়ে যাবে নিত্য নয়। নিত্য যদি হয়ে যায় তাহলে একটা সমস্যা হয়ে যাবে, সাংখ্যবাদীদের সিদ্ধান্তে যে প্রকৃতির একটা সত্তা আছে সেই সত্তাটা সত্য হয়ে যাবে। এই জায়গাটা বুঝতে গেলে আবার খুব কঠিন মনে হবে।

সৃষ্টির ব্যাপারে কয়েকটি সিদ্ধান্ত আছে। একটা সিদ্ধান্ত হল পরিণামবাদ, আরেকটি সৎকার্যবাদ। সৎকার্যবাদের মধ্যে আরেকটি সিদ্ধান্ত হয়ে যায় বিবর্ত। পরিণামবাদে বলা হয় একটা জিনিস থেকে আরেকটি জিনিস হয়েছে। যেমন হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন আছে সেখান থেকে জলের সৃষ্টি। সৎকার্যবাদের খুব নামকরা সিদ্ধান্ত হল বিবর্তবাদ, বিবর্তবাদের মতে সৃষ্টি মায়া থেকে হয়েছে। মায়া থেকে হয়েছে বলতে গিয়ে এনারা বলছেন, যিনি ঈশ্বর, যিনি ব্রহ্ম তিনিই আছেন, তাঁর মায়ার শক্তির দরুন এত কিছু দেখাচ্ছে। সৃষ্টির উপর বিভিন্ন সিদ্ধান্ত থাকার জন্য কয়েক রকমের সত্তা এসে যায়। কয়েক রকমের সত্তা আসার জন্য সৃষ্টির উৎসও অনেক রকম হয়ে যায়। তার মধ্যে একটা মতবাদে বলা হয় শূন্য থেকে সৃষ্টি হয়েছে। দ্বিতীয় মতে বলে প্রকৃতি থেকে সৃষ্টি হচ্ছে। তৃতীয় মত হল মায়া, মায়ার দরুণ সৃষ্টিকে দেখাচ্ছে। বৌদ্ধ দর্শনে শূন্যবাদকে খুব বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যদি খুব চুলচেরা বিশ্লেষণ করা হয় তাহলে দেখা যাবে খ্রীশ্চান আর ইসলাম দর্শনও শূন্যবাদে দাঁড়িয়ে যায়। খ্রীশ্চান ধর্মে বলে, কিছুই ছিল না কিন্তু দুম্ করে সব কিছু হয়ে গেল। সাংখ্যবাদীরা বলছে প্রকৃতি থেকে সৃষ্টি হয়েছে। সাংখ্যবাদীদের দর্শনকেও বিশ্লেষণ করতে করতে একটা জায়গায় এসে বর্তমান বিজ্ঞানের মতবাদে ঢুকে যাবে। সাংখ্যবাদীদের মতে প্রকৃতি ঈশ্বর নয়, প্রকৃতি জড়। প্রকৃতির মধ্যে একটার পর একটা বিবর্তন হতে হতে সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে। বিজ্ঞানও বলছে পদার্থ আছে, পদার্থই বিবর্তিত হতে হতে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী জগতের সৃষ্টি হয়েছে। নাসদীয়সূক্তে যে প্রথমে *ন অসৎ* বলা হয়েছে, এই *ন অসৎ* বলাতে শূন্যবাদ নাকচ হয়ে যাচ্ছে। তারপরে বলছেন *ন সৎ আসীৎ*, তাহলে সৃষ্টির আগে কিছু ছিল। কিছুই ছিল না যদি না বলা যায়, তাহলে তখন কিছু ছিল নিশ্চয়ই। বলছেন, না তাও বলা যাবে না। তাহলে প্রকৃতিকে সাংখ্যবাদীরা যে সত্য বলছেন, সেটাও নাকচ করে দেওয়া হল। তার মানে নাসদীয়সূক্ত শূন্যবাদকেও কেটে দিচ্ছে, সাংখ্যবাদকেও কেটে দিচ্ছে। শূন্যবাদ আর সাংখ্য দর্শনে যেখানে প্রকৃতির একটা আলাদা সত্তা আছে, এই দুটোকে যদি কেটে দেওয়া হয় তাহলে একটা মজার ব্যাপার দাঁড়িয়ে যাবে। শূন্যবাদ আর সাংখ্য দর্শনকে মেলাবার পর সৃষ্টির ব্যাপারে যত রকমের সিদ্ধান্ত আছে সব সিদ্ধান্তই কেটে বাদ চলে যাবে। থেকে যাবে একমাত্র বেদান্তের সিদ্ধান্ত, মায়ার দরুন সৃষ্টি দেখাচ্ছে। মায়ার সিদ্ধান্তে বলা হয়, সবটাই আছে কিন্তু ভগবান ছাড়া কিছু নেই। কিন্তু তাঁর মধ্যে এমন একটা পরিবর্তন হয়ে যায়, সেটাকেই যেন সৃষ্টির মত দেখায়, কিন্তু বাস্তবে এটা সৃষ্টি নয়। একটা বস্তু যখন একটা থেকে পাল্টে পুরো অন্য রকম হয়ে যায় তখন সেটাকে বলে সৃষ্টি। কিন্তু এমন ভাবে পাল্টায় যেন মনে হবে শুধু নাম আর রূপের খেলা চলছে, তখন সেটাকে সৃষ্টি বলা যায় না। যেমন প্লাস্টিক থেকে আমরা বোতলও তৈরী করছি আবার প্লাস্টিকের গ্লাশও তৈরী করছি। এখানে প্লাস্টিক

থেকে কিছু সৃষ্টি হচ্ছে না, প্লাস্টিকের নাম আর রূপটাই শুধু পাল্টাচ্ছে। কিন্তু ঈশ্বর থেকে যে সৃষ্টি হয় সেখানে এতটাও পরিবর্তন হয় না। মায়াতে এমন একটা করে দিচ্ছে যার ফলে পুরো জিনিসটাকে দেখাচ্ছে অন্য রকম। বাস্তবিক যে কোন পরিবর্তন হয়েছে তা কিন্তু হচ্ছে না। এই সূক্ষ্ম জটিল ব্যাপারটা আমাদের মত সাধারণ মানুষের পক্ষে ধারণা করা খুব কঠিন। কিন্তু আমাদের মনে অনেক রকম অনুসন্ধিৎসা জাগে, আমি কোথা থেকে এলাম, কিভাবে এলাম, ইত্যাদি। আমি কোথা থেকে এলাম যদি কেউ জিজ্ঞেস করে তখন খুব সহজ ভাবে বলে দেওয়া যায়, ঈশ্বর তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। খুব সহজ ব্যাপার, আমরাও সরল মনে মেনে নিচ্ছি। কিন্তু দার্শনিকরা এই কথা মানবেন না। ঈশ্বর যদি তোমাকে সৃষ্টি করেন তাহলে তিনি কি দিয়ে তোমাকে সৃষ্টি করেছেন? তিনি মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। খুব ভালো কথা, তাহলে বলো এই মাটি ঈশ্বরের মধ্যে ছিল, নাকি ঈশ্বরের বাইরে ছিল? ঈশ্বরের বাইরে যদি থাকে তাহলে ঈশ্বর সীমিত হয়ে গেলেন। আর ঈশ্বরের মধ্যে যদি থাকে, তাহলে ঈশ্বরের পরিবর্তন হওয়াতে ঈশ্বর ছোট হয়ে গেলেন। এরপর এই দর্শন আর দাঁড়াতে পারবে না। যদি বলেন ঈশ্বর নিজের ইচ্ছায় সৃষ্টি করে দিলেন। তখনও আবার সমস্যা হয়ে যাবে, তাহলে তিনি শূন্য থেকে সৃষ্টি করছেন। সেইজন্য সৃষ্টির উপর যত সিদ্ধান্ত আছে সবাইকেই এই সমস্যায় পড়তে হয়। কিন্তু বেদান্ত একেবারে পরিষ্কার, ঋষিরা যেমনটি দেখেছিলেন তুমিও তেমনটি দেখ। ঋষিরা বলছেন কি ছিল বলা যাচ্ছে না। ছিল কিনা তাও জানা নেই, কারণ যে মন দিয়ে জানবে সেই মনই তখন নেই। আমরা কেউ নির্দিষ্ট করে বলতে পারবো না যে কোন একটা পদার্থ ছিল। পদার্থ ছিল না যদি বলা হয়? না সেটাও বলা যাবে না। কেন বলা যাবে না, পরে পরে আরও ব্যাখ্যা আসতে থাকবে।

পদার্থ ছিল না বলা যাবে না, পদার্থ ছিল তাও বলা যাবে না। তাহলে কি ছিল? তখনই বেদান্তের এই সিদ্ধান্ত আসে, যিনি ঈশ্বর তিনি তাঁর মায়া দিয়ে একটা কিছু সৃষ্টি করেছেন। তাই পদার্থ ছিল এটাও বলা যাবে না, পদার্থ ছিল না সেটাও বলা যাবে না। একটাই তো হবে, হয় পদার্থ ছিল নয়তো পদার্থ ছিল না। এই জিনিসটাকে কোয়ান্টাম ফিজিক্স দিয়ে সহজে বোঝান যায়। যদি বলা হয় ইলেক্ট্রন কি পার্টিকেল? বলবে, না পার্টিকেল নয়। ও! তাহলে ইলেক্ট্রন এনার্জি। না, তাও বলা যাবে না। তাহলে কি? ইলেক্ট্রন এটাও আবার ওটাও, আবার এটাও না ওটাও না। কোয়ান্টাম ফিজিক্সে বাস্তবিক এভাবেই বলা হয়। ঋষিরা একটা জিনিসকে ধারণা করে নেওয়ার পর সেটাকে নিয়ে চিন্তন করে ধ্যানের গভীরে গিয়ে এর রহস্যের সমাধান পেলেন, বিজ্ঞানও আজ বলছে জিনিসটা বাস্তবিক এভাবেই হয়। এ্যাটমিক স্তরেরও অনেক সূক্ষ্মে চলে গেলে তাঁরাও গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারেন না যে জিনিসটা ঠিক এই রকম। এটাই এখানে বলছেন *নাসদাসীন্নো সদাসীৎ*।

এখানে শুরুই করছেন অসৎ নেই বলে। কিন্তু উপনিষদে গিয়ে আবার পাল্টে দিচ্ছেন। ছান্দোগ্য উপনিষদে বলছেন – *সদীদমগ্রে আসীদ্ সৌম্য,* হে সৌম্য, আগে শুধু মাত্র সৎ ছিল। এখানে নাসদীয়সূক্তে বলছে সৎও ছিল না অসৎও ছিল না, তাহলে তো দুটোর মধ্যে বিরোধ লেগে যাবে। উপনিষদের আরেক জায়গায় বলছে – *অসদ্বা ইদমগ্রে আসীদ্* - আগে অসৎ ছিল। এক জায়গায় বলছে আগে অসৎ ছিল, আরেক জায়গায় বলবে আগে শুধু সৎ ছিল, কিন্তু বেদে বলছে আগে সৎ ছিল না অসৎও ছিল না, আবার এক জায়গায় গিয়ে বলছে সব কিছু সৎ থেকে সৃষ্টি হয়েছে, আবার এক জায়গায় বলছে সব কিছু অসৎ থেকে সৃষ্টি হয়েছে। তাহলে আমরা কোনটা নেব। কিন্তু বেদ উপনিষদের একই তত্ত্ব, কিন্তু বলছে অন্য ভাবে, সেখানেই তখন ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন হয়। সৃষ্টির প্রথমে কি ছিল বলতে গিয়ে বলবে মায়া ছিল কিংবা ব্রহ্মণ্ ছিল কিংবা আত্মাই ছিল, এই ভাবে বলে বলে নিয়ে তারপরে একটা সুসংবদ্ধ তত্ত্বকে দাঁড় করাবে। আসলে কি হয়, পুরো জিনিসটা অন্ধকারে আবৃত ছিল, ওই অন্ধকারে কী ছিল আমরা কি করে জানব! আদৌ কিছু আছে কিনা সেটাই বা কি করে জানব! সেইজন্য সৃষ্টির অগ্রে কি ছিল ওনারা কখনই নিশ্চিত করে বলতে পারবেন না।

নাসদীয়সূক্তের সৎ আর অসৎ এই ব্যাপারটাকে পরিষ্কার করার জন্য প্রথমে তাই সৎ ও অসৎ এর এত বিস্তৃত আলোচনা করা হল। এটা পরিষ্কার না হলে নাসাদীয়সূক্তম্ পড়তে গিয়ে আমরা এর তত্ত্বকে হারিয়ে ফেলব। যেমন আত্মা শব্দ অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়, আত্মা মানে জীবাত্মা, আত্মা মানে দেহাত্মা, আত্মা মানে ভেতরে যিনি চৈতন্য রয়েছেন, আবার আত্মা মানে ব্রহ্ম, আত্মার অর্থ বুদ্ধি, আত্মার অর্থ প্রাণ। কোন্ জায়গায়

আত্মার কোন্ অর্থ হবে আচার্যের কাছে অধ্যয়ন না করলে আত্মার অর্থ ভুলভাল করে পুরো দর্শনটাই তালগোল পাকিয়ে যাবে। এসব কারণেই অনেকে বিরক্ত হয়ে বলে একই শব্দের এতগুলো অর্থ কেন করা হয়েছে? তার কারণ তখনকার সময় শব্দের এত বৈচিত্র্যতা ছিল না, গুরু শিষ্যকে বলে দিচ্ছেন, শিষ্য বুঝে নিচ্ছে এইভাবে পরম্পরা চলে এসেছে, কিন্তু ইতিমধ্যে নতুন নতুন শব্দ সৃষ্টি হয়ে গেছে, কিন্তু নতুন শব্দকে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে সেই ধরণের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ না থাকাতে কেউ সাহস করে পুরনো শব্দের বদলে নতুন শব্দ প্রয়োগ করতে পারেনি। এই কারণেই যে কোন শাস্ত্র পড়তে গেলে ঠিক ঠিক আচার্যের কাছে খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে আর ধরে ধরে পড়তে হয়। এত কঠিণ আর সাধন সাপেক্ষ বলে দেশের লোকেরা বেদ পড়া ছেড়ে দিল।

এই ধরণের মন্ত্রে এসে বোঝা যায় ধর্ম তত্ত্ব জানতে হলে কি প্রখর মেধা ও সূক্ষ্ম বুদ্ধির দরকার। গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে শঙ্করাচার্যের ভাষ্যের এক জায়গায় আছে, শঙ্করাচার্য নিজেই বর্ণনা করছেন – বিরাট তর্ক চলছে, হঠাৎ পূর্বপক্ষ হাত তুলে বলবে 'ভাই, তোমরা বেদান্তীরা নিজেরাই দ্বিধাগ্রস্ত তার ওপর আবার একটা শব্দের অনেক রকম অর্থ বার করে অপর পক্ষের মনে সংশয় তৈরী করে দিচ্ছ, সত্যি ভাই সেইজন্য তোমাদের বেদান্ত আর কেউ পড়ে না'। বিরোধী পক্ষের অভিযোগ নিজেই উত্থাপন করে শঙ্করাচার্য তারপর তার পরিসমাপ্তি করছেন 'তুমি যা বলছ ঠিকই বলছ, বেদান্ত পড়তে গেলে তাই মনে হবে, কিন্তু বেদান্ত আসলে তা নয়, ঠিক ঠিক নিষ্ঠার সাথে গুরুর কাছে যখন শোনা হয় তখন গুরু এক কথায় সব পরিষ্কার করে দেন'। শাস্ত্রে আধ্যাত্মিক তত্ত্বকে বোঝা অত্যন্ত কঠিণ, সূক্ষ্ম বুদ্ধি আর পবিত্রতা না হলে আধ্যাত্মিক তত্ত্বের কিছুই ধারণা হবে না। লাটু মহারাজ লেখাপড়া করেননি, জাগতিক বিচারে মুর্খ ছিলেন। ঠাকুরের শরীর যাবার পর লাটু মহারাজের জীবনী পড়লে দেখা যাবে এই অশিক্ষিত সহজ সরল গ্রাম্য মানুষটির কি প্রচণ্ড সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ছিল। স্বামীজী বিদেশ থেকে ফিরে এসেছেন, সবাই বিদেশে স্বামীজীর সব কীর্তি কাহিনী শুনছেন, লাটু মহারাজও শুনছেন। হঠাৎ সবাইকে অবাক করে দিয়ে লাটু মহারাজ স্বামীজীকে বলছেন 'লোরেন ভাই, তুমি নতুন কি আর করেছ, তুমি তো গীতা উপনিষদের কথাতে দাগা বুলিয়েছ'। স্বামীজী সবাইকে বলছেন 'দ্যাখ্, লাটু ঠিক ঠিক জিনিসটাকে ধরেছে'। ঠিকই স্বামীজী তাঁর রচনাবলীতে যত কথা বলেছেন গীতা উপনিষদের বাইরে একটি কথাও বলেননি। আমরাও স্বামীজী রচনাবলী পড়ছি কিন্তু ধরতে পারছি না, কিন্তু লাটু মহারাজ খচ্ করে ধরে নিচ্ছেন, অথচ সেভাবে গীতা উপনিষদ তিনি কখন পড়েননি। এটাই সূক্ষ্ম বুদ্ধি।

লাটু মহারাজ ঠাকুরের কাছে বর চেয়েছিলেন যে আমি যা খাই সব যেন হজম হয়ে যায়। শ্রীরামকৃষ্ণের শরীর চলে যাবার পর বরাহনগর মঠে তখন পয়সা কড়ির খুব অভাব, কোন রকমে সব গুরুভাইদের দিন গুজরান হচ্ছে। এক গুরুভাই ঠাকুরের জন্য রোজ সকালে একটা ছোট বাটিতে নৈবেদ্য ভোগ দিতেন। রাতে সবার খাওয়ার পর ঐ পাত্রকে খুব সুন্দর করে ঘষে মেজে পরিষ্কার করে রাখা হত যাতে সকালে উঠেই ঠাকুরকে ঠিক সময়ে ভোগ নিবেদন করা যায়। লাটু মহারাজ রাতে উপোস করে সারা রাত ধরে মশগুল হয়ে জপ করে যাচ্ছেন। গভীর রাত্রে কোন এক সময়ে তাঁর জপ ভেঙ্গেছে, আর এমনই কপাল যে সেই সময় তাঁর প্রচণ্ড খিদে পেয়ে গেছে। কিন্তু অত রাতে কিছুই খাবার নেই। কি খাবেন? ওনার কাছে সব সময় ছোলা থাকত, সেখান থেকে একটু ছোলা নিলেন, একটু পেঁয়াজ কুচোলেন। তারপর ঠাকুরের ধোয়া মাজা পরিষ্কার বাটিতে করে সেদ্ধ করে খেলেন। খেয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়েছেন। বাটিটা নোংরাই থেকে গেছে। সকালবেলা বাবুরাম মহারাজ ঠাকুরকে নৈবেদ্য দিতে গিয়ে দেখেন বাটিতে ছোলা পেঁয়াজ লেগে আছে। বাবুরাম মহারাজ লাটু মহারাজকে ঘুম থেকে তুলে প্রচণ্ড গালাগাল দিতে শুরু করলেন, শেষে বাপ-মা তুলেও গালাগাল দিতে শুরু করলেন। লাটু মহারাজ কিছুক্ষণ শোনার পর বলছেন 'বাবুরামদাদা, তোমার বাপ-মা আর আমার বাপ-মা কি আলাদা'? এই একটা কথায় বাবুরাম মহারাজ একেবারে চুপ্সে গেলেন। তোমারও বাপ-মা সেই ঠাকুর আর আমারও বাপ-মা সেই ঠাকুর। লাটু মহারাজের কি সূক্ষ্ম বুদ্ধি। তাই বলে কি বাবুরাম মহারাজের বুদ্ধি ছিল না? নিশ্চয়ই ছিল, সূক্ষ্ম বুদ্ধি না থাকলে বাবুরাম মহারাজ সঙ্গে সঙ্গে চুপ্সে যেতেন না, তিনিও বুঝে গেছেন লাটু মহারাজ কি বলতে চাইছেন। আচার্য শাস্ত্র বলতে শুরু করেছেন আর শিষ্য ঝরঝর করে সব বুঝে নিচ্ছে এই ধরণের সূক্ষ্ম বুদ্ধি না থাকলে আধ্যাত্মিক উত্থান হয় না।

মাণ্ডুক্য উপনিষদের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য উত্তম শিষ্য, মধ্যম শিষ্য ও অধম শিষ্যের বর্ণনা দিচ্ছেন – উত্তম শিষ্য একবার শুনলেই বুঝে নেয় আচার্য কি বলতে চাইছেন, মধ্যম শিষ্যকে বারবার বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ দিয়ে নানা উপমা দিয়ে বোঝান হয় আর অধম শিষ্যকে যেটা বোঝান হয় সে তার উল্টোটাই বোঝে। উত্তম শিষ্যকে একবার বলে দিলেন 'তত্ত্বমসি' তুমিই সেই, সঙ্গে সঙ্গে সে বুঝে নেবে এর অন্তর্নিহিত ভাব। স্বামীজীকে ঠাকুর কিছুই বলেননি, শুধু একটু ছুঁয়ে দিয়েছেন তাতেই স্বামীজীর আধ্যাত্মিক উপলব্ধি হয়ে গেল, স্পর্শেই তাঁর অদ্বৈত জ্ঞান হয়ে গেল। ঠাকুর আরও অনেককেই তো স্পর্শ করেছিলেন, কিন্তু আর কারুর আধ্যাত্মিক উপলব্ধি হল না কেন? আমাদেরও তাই হয় না।

তপস্যা সবাইকে করতে হবে, তপস্যা সাধন ভজন না হলে মন পবিত্র হবে না। জপ ধ্যানে বুদ্ধি সূক্ষ্ম হয়। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য এগুলোর সাথে সচেতন ভাবে লড়াই করতে হবে। আমাকে এটা ধারণা করতেই হবে, ধারণা করতে গেলে সমস্ত রিপুর সাথে লড়াই করতে হবে, সাথে সাথে মাটি কামড়ে সাধনা করতে হবে, এই দৃঢ়তা না থাকলে শাস্ত্র কোন দিন বোঝা যাবে না। শাস্ত্র যদি না ধারণা করা যায় কোন কালেই আধ্যাত্মিক পুরুষ তো দূরের ধার্মিক পুরুষই হতে পারবে না। জীবনে আমাদের প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু একটা চাই, তা নাহলে কি অবলম্বন করে আমরা বেঁচে থাকব! লোকেরা যে টাকা-পয়সা উপার্জন করে ভোগের জন্যই করে, কিন্তু টাকা-পয়সাকে কেউ ভোগ করে না, এগুলো কোন একটা দিকে আমাদের এগিয়ে দেয়। এগোতে গিয়ে বুঝতে পারে সব কিছু সেই একটা দিকেই এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সেইজন্য এই চারটে পুরুষার্থের কথা বলা হয় – ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। কিন্তু সূক্ষ্ম বুদ্ধি না হলে চারটের কোনটাই হবে না। শাস্ত্র যদি না জানা থাকে, শাস্ত্র ধারণা করার ক্ষমতা যদি না থাকে তাহলে চারটের কোনটাই হবে না।

তদানীং, মানে সেই সৃষ্টি কালে সৎ ছিল না অসৎ ছিল না। *নাসীদ্রজো নো ব্যোমা পরো যৎ* - এই *রজঃ* শব্দের অনুবাদ আবার খুব কঠিণ হয়ে যায়। কারণ বেদের ভাষা অনেক পুরনো। যার জন্য পরে যাস্কের নিরুক্তাদির রচনা হয়েছে, তাও বেদের অনেক পরে, তারও পরে সায়নাচার্য এর ব্যাখ্যা করছেন। *রজঃ* শব্দকেও অনেক ভাবে অনুবাদ করা যেতে পারে। যে ভাবেই আমরা অনুবাদ করব এর অর্থ পুরো অন্য রকম হয়ে যাবে। স্বামীজী রজঃ শব্দের অনুবাদ করছেন there was no air, কিন্তু রজঃ কোন অবস্থাতে বাতাস বলে অনুবাদ করা যায় না। ভাষ্যকাররা রজঃ বলতে বোঝাচ্ছেন নানান রকম লোক, যেমন স্বর্গলোক, পৃথিবীলোক, পাতাললোক ইত্যাদি। আবার স্বামীজী বলছেন firmament, যার অর্থ, যে জিনিসটা ধরে রাখে। স্বামীজী রজঃ শব্দের বাতাস অনুবাদ করে শুধু যে অনুবাদ করে দিলেন তা নয়, শব্দের ব্যাখ্যাটাও কি হবে সেটাও অনুবাদ করে দিলেন। সেই সময় কোন বাতাস ছিল না, বাতাস নেই মানে কোন গতি ছিল না, গতি রজগুণের ধর্ম। সৎ ছিল না, অসৎ ছিল না বলার পর কি কি হতে পারে তার ব্যাখ্যা করার জন্য এই শব্দগুলিকে ব্যবহার করা হচ্ছে, রজঃ তাই ব্যাখ্যামূলক শব্দ। সৃষ্টির আগের অবস্থাটা বোঝানোর জন্য বলছেন বাতাস ছিল না। বাতাস কোথায় চলে? বাতাসকে চলার জন্য আকাশ দরকার, তাই বলছে *নো ব্যোমা পরো যৎ*, পৃথিবীর উপরে আকাশ, আকাশের উপরে বাতাস। সৎ অসৎ ছিল না, মানে পৃথিবী ছিল না। পৃথিবী ছিল না ঠিক আছে, কিন্তু বাতাস তো ছিল? বিজ্ঞানের মতে প্রথমে বাতাস আসবে তারপর প্রাণী জগত আসবে। কিন্তু বলছে বাতাসও ছিল না। ঠিক আছে বাতাস নেই, তাহলে অন্তরীক্ষ তো আছে। না, আকাশও ছিল না। তাই স্বামীজী যে রজঃ কে বাতাস অনুবাদ করেছেন এখানে এসে পরিষ্কার বোঝা যায় স্বামীজীর অনুবাদটাই সঠিক, স্বামীজী ঋষি কিনা, তাই তাঁর অনুবাদও হবে ঋষির মতই, ঋষিরা যা বোঝাতে চেয়েছেন স্বামীজী সেটাকে ধরতে পেরেছেন বলেই এত সুন্দর ও যুক্তিযুক্ত অনুবাদ করেছেন। রজঃ মানে অনেক কিছুই হয়, যেমন বিরজা কথাটা রজঃ থেকে এসেছে। সন্ন্যাসীরা বিরজা হোম করেন। বিরজার অর্থ যা কলুষ মুক্ত, কিন্তু এখানে রজর কলুষ অর্থ করা যাবে না, করলেই পরের শব্দে *নো ব্যোমা পরো যৎ* এসে গোলমাল হয়ে যাবে। সব কিছুর পারে যে আকাশ, সেই আকাশও তখন ছিল না। কলুষের সাথে আকাশের কোন সম্পর্ক নেই, কিন্তু বাতাসের একটা সম্পর্ক আছে, বাতাসের বাবা হল আকাশ। আবার রজঃ মানে সক্রিয়, মানে শক্তি। শক্তিকেই এখানে ব্যাখ্যা করে বলা হচ্ছে বাতাস রূপে। ব্যোম শব্দকে যদি অন্তরীক্ষ বা space অর্থে নেওয়া হয় তাহলে space

কখন ফাঁকা থাকবে না, space এর মধ্যে সব সময় কিছু না কিছু থাকবে। অন্তরীক্ষে যেটা সব সময় থাকবে সেটা হল বাতাস বা শক্তি। তাই বলছেন বাতাসও ছিল না। কেন ছিল না? যেখানে সৃষ্টি হয়েছে ওই জায়গাতে তখন কিছু ছিলই না। কিছু ছিল না এটাও নিশ্চিত করে বলা যাবে না। কিছু ছিল তাও বলা যাবে না। এই যে নেতি নেতি করে বলা, এটাই বেদান্তের একটা খুব প্রচলিত নীতি। তাই বলছেন সৎ ছিল না, অসতও ছিল না। শুরু করছেন অসৎ দিয়ে। ভাত রান্না করতে চাল দরকার। যে কোন সৃষ্টির জন্য উপাদান দরকার। যেটা দিয়ে সৃষ্টি হয় তখন সেই উপাদানই ছিল না। তাহলে কিছুই ছিল না! না, তাও বলা যাবে না। তাহলে কি? এবার আপনারা বুঝতে থাকুন। আবার অনেকে ভাবেন এটা subjective। না, subjectiveও নয়, subjective objective এর পারে। শুধু বলে দিলেন এটাও না ওটাও না।

সায়নাচার্য তাঁর ভাষ্যে তখন বলছেন, সৃষ্টিটা কি তাহলে বীজ রূপে কোন ভাবে ছিল? একটা ছোট্ট বটবৃক্ষের বীজের মধ্যে পুরো বটবৃক্ষটাই আছে। কিন্তু যত ছোটই হোক ওই বীজকে দেখা যাচ্ছে। তাহলে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির আগে একটা ছোট্ট বীজের মধ্যে ছিল, খুবই সাধারণ ব্যাপার। বলছেন, না, সেটাও ছিল না। কিছু তো ছিল! যেমন যেমন আমরা আলোচনা এগিয়ে নিয়ে যাব তেমন তেমন এই জটিল ব্যাপারটা খুলতে থাকবে। বেদের কথাকেই শেষ কথা বলে সবাইকেই মানতে হয়, বেদের বাইরে কখনই যাওয়া যায় না, সেইজন্য বেদের এই বর্ণনাকেই আমাদের মানতে হয়, এর বাইরে যাওয়া যাবে না। আসলে এখানে বলার উদ্দেশ্য হল, যেটা আছে সেটাকে মন বুদ্ধি দিয়ে ধরা যায় না, যেটাকে মন বুদ্ধি দিয়ে ধরা যায় না, সেটার ব্যাপারে আমরা কী বলব!

বিজ্ঞান যে আজ বিগ ব্যাঙের কথা বলছে এবং বিগব্যাঙের যে থিয়োরী তাতে বিজ্ঞান যা বলছে নাসদীয়সূক্তে ঠিক একই জিনিস বলা হচ্ছে। বিগব্যঙের থিয়োরী তে বলছে, একটা পয়েন্টে এসে সব কিছু বুম্ করে ফেটে পড়ে। পদার্থ বিজ্ঞানীরা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে পিছিয়ে পিছিয়ে একটা ছোট্ট পয়েন্টে পৌঁছে যান যেখানে পুরো বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ওই ছোট্ট পয়েন্টে জমাট বেঁধে আছে। মাপের দিক থেকে ওই পয়েন্টের হিসাব জিরোতে এসে দাঁড়ায়। গণিতের যে জিরোর নানা রকমের ডিভিশন হয় সব ওই জিরোতে গিয়ে গণিতের সব হিসাব হারিয়ে যায়। এই জায়গাটাকে বলে Point of Singularity। গণিতের যেমন Point of Singularity আছে তেমন ফিজিক্সেরও Point of Singularity হয়। ফিজিক্সের যে জায়গাতে গিয়ে Point of Singularity হয়, পদার্থ বিজ্ঞানীরা বলেন ওর ভেতরে আগে কি হয়েছে আমরা জানি না। জানার কোন উপায় নেই, কারণ ওখানে গণিতের কোন হিসাব কাজ করে না। আর Mathamatical Point of Singularity আরেকটা অন্য ব্যাপার, যে জায়গাতে গিয়ে জিরো দিয়ে ডিভিশান হয়ে জিনিসটা collapse করে যায়। কারণ কোন জিনিসকে জিরো দিয়ে ভাগ করলে সেটার কোন অর্থ হয় না। গণিতের বিশেষজ্ঞরা বলে দেন জিরো দিয়ে ডিভাইড করা চলবে না। এই কথা তো আমাদের ঋষিরাও বলছেন সৃষ্টির আগে কি ছিল প্রশ্ন করবে না। গার্গী যাজ্ঞবল্ক্যকে পর পর প্রশ্ন করে যাচ্ছিলেন, এটা কোথায় অবস্থিত, সেটা কোথায় অবস্থিত ছিল। এইভাবে শেষে এসে সৃষ্টি কোথায় অবস্থিত এই অর্থে যখন প্রশ্ন করছেন তখন যাজ্ঞবল্ক্য বলছেন – গার্গী! না বুঝে প্রশ্ন করবে না, এরপর প্রশ্ন করলে তোমার মাথা হাজার টুকরো হয়ে পড়ে যাবে। কেউ যদি সৃষ্টির আগে কি ছিল ব্যাখ্যা করে দেন, তখন সুপ্ত ছিল, নাকি ব্যক্ত ছিল, নাকি বীজাকারে ছিল, নাকি সৎ ছিল, তাহলে পুরো ধর্ম ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। জিরো দিয়ে ডিভাইড হয় না গণিতের বিশেষজ্ঞরা মানতে রাজী আছেন, Point of Singularityতে গিয়ে বিগ ব্যাঙ collapse করে যায়, মানে ওখানে আর প্রশ্ন করা যায় না বলতে বিজ্ঞানীরা রাজী আছেন আর যদি বলে দেওয়া হয় সৎও ছিল না অসৎও ছিল না তখন সবাই ধর্মের উপর একটা জিজ্ঞাসা চিহ্ন লাগিয়ে দেন। কিছু প্রশ্ন আছে যেটা জিজ্ঞাসা করা যায় না। যেমন জিরো দিয়ে ডিভাইড করা যায় না, Point of Singularityর পেছনে কি আছে যেমন জিজ্ঞেসে করা যায় না, ঠিক তেমনি মায়ার আবরণ যেখানে আছে সেখানে সৃষ্টির আগে কি ছিল জিজ্ঞেস করা যায় না। সেইজন্য বলছেন তখন সৎ ছিল না অসৎ ছিল না। কেন এই কথা বলছেন? কারণ সেখানে মন বুদ্ধি ছিল না। মন বুদ্ধি যদি না থাকে তাহলে বাণী কোথা থেকে আসবে, তাহলে কে বলবে তখন কি ছিল! সৃষ্টি যখন হয় তখন অনন্তের উপর

যেন একটা লাইন টেনে দেওয়া হল। সৃষ্টির ওই দিকটা অনন্ত আর সৃষ্টির এই দিকে বিভাজিত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সংসার। প্রথমেই মনের সৃষ্টি হল, মন যখন সৃষ্টি হল তারপরই মন সবটা জানবে। কিন্তু মনের ওই দিকটায় কি আছে মন কোন দিন জানতে পারবে না। ঠাকুর যেমন বলছেন সন্দেশ গলার নীচে চলে গেলে আর জানা যাবে না, ঠিক তেমনি মনের ওপারে চলে গেলে মন বলবে, আমার এলাকার বাইরে চলে এসেছি আমি আর কিছু বলতে পারবো না। এখানে এখনও মনের সৃষ্টি হয়নি, তাহলে কোথা থেকে পৃথিবী আসবে! কোথা থেকে অন্তরীক্ষ আসবে যেখানে স্বর্গ, পাতালাদি অবস্থিত! এতটা যে বলে দিল তাহলে তো বোঝাই যাচ্ছে কিছু ছিল না। না, তাও বলা যাবে না। কারণ কিছু ছিল না যদি বলে দেওয়া হয় তাহলে ঈশ্বরই অনীশ্বর হয়ে ঈশ্বর উড়ে যাবেন। এর থেকেও আরও যেটা বাজে ব্যাপার হবে তা হল, আপনি নিশ্চিত ভাবে বলে দিলেন কিছু নেই, একটা জিনিস আছে এটা যেমন একটা নিশ্চিত জ্ঞান ঠিক তেমন কিছু নেই এটাও একটা নিশ্চিত জ্ঞান। কিছু ছিল না এই নিশ্চিত জ্ঞান যদি হয় তাহলে তো আবার বুদ্ধিকে লাগিয়ে দেওয়া হয়ে গেল, কারণ ওই জায়গাতে তো বুদ্ধিও থাকবে না। সেইজন্য বেদান্ত অভাব প্রমাণ একটা বড় প্রমাণ। না জানাটাও একটা জানার বিধি, এটাও একটা প্রমাণ, যাকে বেদান্ত বলছে অভাব প্রমাণ। বুদ্ধির দৌড় বলে দেয় এটা আছে, বুদ্ধির দৌড় বলে দেয় এটা নেই। কিন্তু তখন যেহেতু বুদ্ধির দৌড় ছিল না তাই বলছে এটা যে ছিল বলা যাবে না, কিছু ছিল না এটাও বলা যাবে না। আমরা তো সব কিছুই বুদ্ধির দৌড়ে জানি, তাই আমরা বলব, হয় জিনিসটা আছে, নয়তো জিনিসটা নেই। তাই বলবেন, বুদ্ধি দৌড় নেই সেইজন্য বলতে পারবো না যে জিনিসটা ছিল। তাহলে ছিল না। না, তাও বলা যাবে না কারণ বুদ্ধির দৌড় নেই। তাই তুমি শান্ত হয়ে বসে ধ্যান করতে থাক। কিছুই যখন ছিল না, তখন স্বাভাবিক ভাবেই অন্তরীক্ষও ছিল না, আর অন্তরীক্ষে যে জিনিসগুলি থাকে, বিভিন্ন রকমের লোক সেই সব লোকও ছিল না।

সায়নাচার্য সৎ অসতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তাঁর ভাষ্যে খুব সুন্দর বলছেন – সৎ আর অসৎ এই দুটি বিলক্ষণ, অর্থাৎ এক অপরের থেকে আলাদা। তাই এরা কখনই এক সঙ্গে থাকতে পারে না, দুটোর সহবস্থান কখনই হবে না। যেমন জল আর অগ্নির সহবস্থান হয় না। কিন্তু সৃষ্টির আগে ওই জায়গাতে সৎ আর অসৎ দুটোর সহবস্থান হয়। এক সঙ্গে থাকা তখনই সম্ভব যদি আবরণটা মায়ার থাকে। ঈশ্বরীর কাছে গিয়েও বিপরীত ধর্মী কোন কিছুই থাকতে পারবে না।

বেদে যখন কোন জটিল শব্দ আসে তখন তার আগের শব্দের অর্থের সাথে ধারাবাহিকতা বজায় রেখে অর্থ করা হয়। এমনকি যদি কোন বিশেষ শব্দের অর্থ যদি নির্দিষ্ট করা থাকে যে এর বাইরে এর অন্য অর্থ করা যাবে না, তখন আগের শব্দের অর্থের সাথে যদি এই অর্থের সামঞ্জস্য না থাকে তাহলে সেই শব্দের অর্থকে পাল্টে এমন ভাবে ব্যবহার করা হবে যাতে তার আগের শব্দের অর্থের সাথে ধারাবাহিকতা ও সামঞ্জস্য বজায় থাকে, আচার্য তখন বলে দেন – এই শব্দের এই অর্থ। গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে একটা শ্লোক আছে *মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ*। মহাভূতের অর্থ স্থূলভূত, যা দিয়ে সৃষ্টি হচ্ছে। আচার্য শঙ্কর মহাভূতের অর্থ করছেন তন্মাত্রা, কিন্তু কোন বইতেই মহাভূত মানে তন্মাত্রা বলা নেই, একমাত্র শঙ্করাচার্য তাঁর ভাষ্যে বলছেন ‘এখানে মহাভূতের অর্থ হবে তন্মাত্রা’। মহাভূতের অর্থ তন্মাত্রা যদি না করা হয় তাহলে এই শ্লোকের পুরো বক্তব্যটাই গোলমাল হয়ে যাবে। শুধু তাই নয়, গীতার মূল দর্শনটাই পাল্টে অন্য দর্শনের জন্ম নিয়ে নেবে। সাংখ্য দর্শনও পুরো পাল্টে যাবে। কিন্তু সমস্ত শাস্ত্রে মহাভূত মানে স্থূলভূত। কিন্তু আচার্য এর অর্থ করে দিলেন সূক্ষ্মভূত। এখন যদি কেউ প্রশ্ন করে ব্যাসদেব কেন সূক্ষ্মভূত না বলে মহাভূত বললেন? এর উত্তরও কেউ দিতে পারবে না। ব্যাসদেব কেন করলেন আমরা কেউ জানিনা, হতে পারে সেই সময় তখনও শব্দের অত বৈচিত্র্যতা আসেনি, অনেক কারণ থাকতে পারে। তাই সব সময় বলা হয় আচার্যের কাছে শাস্ত্র না পড়লে কিছুতেই শাস্ত্রের অর্থ বুঝতে পারবে না, আচার্যকেও সব দিক দিয়ে দক্ষতা ও জ্ঞান অর্জন করে নিতে হয়।

তাই এখানে স্বামীজী যে অর্থ করেছেন সেটাই আমরা নেব, স্বামীজী বলছেন – সেখানে কোন বাতাস ছিল না, আর বাতাসকে ধরে রাখবে সেই আকাশও ছিল না। ব্যোম মানে আকাশ, কিন্তু ব্যোম অনেক কিছুকেই বোঝায়। ব্যোম বলতে আকাশও বোঝায় আবার অন্তরীক্ষকেও বোঝায়। ফিজিক্সের ভাষায় বলতে গেলে বলা

হবে – there was neither space। পরের দিকে বলবে সময়ও ছিল না। এখন আকাশই নেই তাহলে শক্তি কোথা থেকে আসবে, শক্তি যে খেলা করবে, খেলার জন্য যে আকাশ দরকার সেই আকাশই নেই।

পরের লাইনে বলা হচ্ছে – *কিমাবরীবঃ কুহ কস্য শর্মন্নম্ভঃ কিমাসীদ্ গহনং গভীরম্*। আজকে যে সৃষ্টিকে দেখছি সেটা *কিমাবরীবঃ, কিম্* মানে কি দিয়ে আবৃত ছিল, *কুহ* কোথায় ছিল, *কস্য শর্মন্ অম্ভঃ* কার অধীনে ছিল। *অম্ভঃ* শব্দের অর্থ জল, হিন্দু পুরাণের একটা অদ্ভুত বিশ্বাস যে সৃষ্টি জল থেকে বেরিয়েছে। পৌরাণিক কাহিনীতে সৃষ্টির বর্ণনাতেও দেখাচ্ছে নারায়ণ ক্ষীরসাগরে শুয়ে আছেন, এই দৃশ্যই আমাদের জানিয়ে দিচ্ছে যে যা কিছু সৃষ্টি সব জল থেকে এসেছে। এই জল কিন্তু নদী বা পুকুরের জলের কথা বলা হচ্ছে না, অম্ভঃ হল primordial water, অম্ভঃ শব্দ আমাদের সৃষ্টির আদি তত্ত্বকে ইঙ্গিত করছে। প্রথম থেকে সমস্ত প্রাণীই জলের উপরে নির্ভরশীল, গাছ জল না পেলে শুকিয়ে যায়, মানুষ জল খেয়ে বেঁচে থাকে, আদিম কাল থেকে জলের বিরাট গুরুত্ব। সেইজন্য বেদে বলে *অপো নারায়াণঃ,* জলই নারায়ণ। এখানে তাই বলছে বাতাস নেই, আকাশ নেই, তাহলে কোন্ জিনিস থেকে সৃষ্টিটা বেরিয়ে এল, তাই বলছে তাহলে কি সৃষ্টিটা primordial water থেকে বেরিয়ে এসেছে? তাহলে সেই দিব্য জল কোথায় ছিল? *কিমাসীদ্ গহনং গভীরম্,* ওটা কি গভীরে লুকিয়ে ছিল? যে ঋষি এই নাসাদীয়সূক্তম্ আবিষ্কার করেছেন, তিনিই এই প্রশ্ন করছেন।

শর্মন্ মানে ভোক্তা বা অভিভাবক। যিনি অভিভাবক তিনিই ভোক্তা হন। যদি কোন ভোগ্য বস্তু থাকে তাহলে তার ভোক্তা থাকতে হবে। ভোক্তা না থাকলে ভোগ্য বস্তুর কোন অর্থই হয় না। সৃষ্টি জিনিসটা হল জীবের ভোগের জন্য। এর আগে যেমন বললেন তখন সৎও ছিল না, অসৎও ছিল না। এবার অন্য দিক থেকে বলা হচ্ছে। অসৎ আর সৎ ছিল কি ছিল না ছেড়ে দাও, আমি তো আছি। আমি হলাম ভোক্তা, আমি যদি ভোক্তা হই তাহলে এই পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আমার ভোগ্য। তাহলে আপনি আমার ভোগ্য। আবার আমিই আপনার ভোগ্য। জীবই একমাত্র সব কিছুর ভোক্তা। কি করে ভোক্তা হল? আমরা পেছন থেকে যুক্তিকে নিয়ে যাচ্ছি। বলছেন ঈশ্বরের কাছে যে জীবগুলো পড়ে আছে এদের এত কর্ম জমে আছে যে এদের খুব বিরাট ভোগ না হলে কিছুই হবে না। তখন সৃষ্টি বেরিয়ে আসে। সৃষ্টি যখন বেরিয়ে এল তখন ভোগ্য বস্তুও বেরিয়ে এল। এবার ভোক্তাও আসবে। কারা ভোক্তা? যারা কর্মফল ভোগ করছে, এই ভোগ দুটো অর্থেই হবে, খারাপ অর্থেও আবার ভালোর অর্থেও। যারা খারাপ কাজ করেছে তারা নরকে কষ্ট পাবে, যারা ভালো কাজ করেছে তারা স্বর্গে সুখ ভোগ করবে। এই সুখ আর দুঃখের যে ভোগ হবে তার জন্য দরকার লোক। ভোক্তা থাকা মানেই ভোগ্য থাকবে, ভোগ্য থাকা মানেই ভোক্তা থাকবে। *শর্মন্* শব্দ হয় ভোক্তা অর্থে। তার আগে পর্যন্ত ভোগ্য শব্দ নিয়ে আসা হয়েছে যেখানে অন্তরীক্ষ, পাতাল, আবরণ ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে। এবার নিয়ে এসেছেন ভোক্তা নেই বলে। ভোক্তা নেই কেন? সৃষ্টিই নেই ভোগ্য আসবে কোথা থেকে, ভোগ্যও নেই তাই ভোক্তাও থাকবে না। ভোগ্য ও ভোক্তাকে যে জিনিস আবরণ করে থাকে সেই জিনিসও নেই। সেইজন্য বলছেন *কিমাবরীবঃ কুহ কস্য শর্মন্*।

এই যে এতক্ষণ যত কিছুর কথা বলা হল, অন্তরীক্ষ, ব্যোম্, রজঃ, লোক বা জীব এগুলো সৃষ্টির আগে কোথায় ছিল? তখন বলছেন *অম্ভঃ কিমাসীদ্ গহনং গভীরম্,* অম্ভ শব্দের অর্থ জল, আর অম্ভকে যার মধ্যে রাখা হয় তাকে বলে কুম্ভ। হিন্দুদের একটা বিচিত্র মত হল, সৃষ্টি যখন থাকে না তখন শুধু কারণ সলিল থাকে। সব কিছুই তখন কারণ সলিল রূপে ছিল। কারণ আর কার্য, কার্য মানেই তার পেছনে কারণ থাকবে। কারণ যা কিছুই থাকুক না কেন, সেই কারণের কার্য হল এই জগৎ। কিন্তু এনারা বলেন যে, যখন সৃষ্টি আদি থাকে না তখন শুধু কারণ সলিল থাকে। বড় বড় দার্শনিকরা চেষ্টা করে বার করতে চেয়েছিলেন, ঋষিরা কি অর্থে সলিল বা অম্ভ বলছেন। এই ধারণাটাই আবার পুরাণে কাহিনী রূপে দাঁড় করান হয়েছে, যেখানে বর্ণনা করছেন ক্ষীর সাগরে ভগবান বিষ্ণু অনন্ত নাগের উপর শয়ন করে আছেন। কারণ না হয় বোঝা যায়, এই জগৎ যদি কার্য হয় তাহলে তার কারণ কিছু একটা থাকবেই। কিন্তু কারণকে তাঁরা সব সময় সলিল রূপে নেবেই নেবেন। এর পেছনে দুটো ব্যাপার থাকতে পারে। প্রথম হল, পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব জল থেকে এসেছে। সেইজন্য ঋষিরা এই ব্যাপারটাই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির পেছনে নিয়ে গেলেন। দ্বিতীয় হল, শুদ্ধ আত্মার যে অনন্ত

ভাব, এই অনন্ত ভাবকে দেখানোর জন্য সলিল শব্দের প্রয়োগ করছেন। অনন্ত সাগর যেমন ঠিক তেমন এই শুদ্ধ আত্মা অনন্ত সাগরের মত ব্যাপ্ত।

কিন্তু এখানে আবার বলছেন *গহনং গভীরম্*, সৃষ্টির জন্য যে কারণ সলিলের দরকার অর্থাৎ যে কারণ সলিল থেকে সৃষ্টি বেরিয়ে আসে, সেখানে প্রবেশ করা অত্যন্ত দুষ্কর, তাকে মাপা যাবে না, গভীর থেকে গভীরতম। তারপরেই বলছেন *কিমাসীদ্*, সৃষ্টির আগে কোথায় ছিল এই সলিল? তার মানে জিনিসটা ওই রকম নেই। এখানে প্রত্যেকটি লাইনে যদি একটা জিনিসকে ব্যাখ্যা করা হয়, যদিও ভাষ্যকাররা কিছু বলছেন না, তাহলে পুরো ব্যাপারটা বোঝা সহজ হয়ে যায়। সেই ব্যাখ্যাটা হল, যখন সৃষ্টি হয়নি তখন মনেরও সৃষ্টি হয়নি, তাই তখন কি ছিল বলা যাবে না। কিন্তু একটা জিনিসকে তো বলা যেতে পারে – তখন সচ্চিদানন্দই ছিলেন, তিনি তো অনন্ত তাঁকে তো থাকতেই হবে। কিন্তু নাসদীয়সূক্তে একবারও তা বলছেন না। বলছেন কারণ সলিলও ছিল না। যদি বলে দেন তখন সচ্চিদানন্দই ছিলেন তাহলে এটা আর বেদান্ত থাকবে না, হিন্দু ধর্মও থাকবে না। এটাই তখন মুসলমান আর খ্রীশ্চান ধর্ম হয়ে যাবে। আল্লাই আছেন বা গডই আছেন, এটাই তখন একেশ্বরবাদ হয়ে যাবে। হিন্দু ধর্ম হল অদ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ মানে দুই নয়। দুই থাকা মানে সচ্চিদানন্দ পুরুষ আছেন আর প্রকৃতি আছে বা সচ্চিদানন্দ আর মন। মন থাকলে বলবে তিনি আছেন। মন যদি না থাকে তাহলে কি আছে? কি করে জানবে কি আছে! সচ্চিদানন্দ কি দুই? দুই হওয়ার কোন প্রশ্নই নেই। তাহলে তিনি কি এক? ঠাকুর বোঝাবার জন্য এই উপমাটা ব্যবহার করতেন, দশটি জলপূর্ণ ঘট আর আকাশের সূর্য। আকাশের সূর্য দশটি জলপূর্ণ ঘটে প্রতিবিম্বিত হচ্ছে। তাহলে কটি সূর্য হল? একটি আসল সূর্য আর দশটি প্রতিবিম্বিত সূর্য, মোট এগারটি সূর্য। এবার একটি একটি করে ঘট ভাঙতে ভাঙতে একটি ঘটে এসে দাঁড়াল। এবার কটি সূর্য থাকল? উপরে আসল সূর্য আর নীচে একটি প্রতিবিম্বিত সূর্য মোট দুটি সূর্য। শেষ ঘটটিও ভেঙে দেওয়া হল। এবার কটি সূর্য রইল? সঙ্গে সঙ্গে একজন ভক্ত বলছেন, একটি সূর্য রইল। ঠাকুর বলছেন, না, কি আছে মুখে বলা যাবে না। ঠাকুরের এই উপমাই নাসদীয়সূক্তের মূল বক্তব্যের বর্ণনা করছে। ঠাকুর বলছেন, তিনি এক, তিনিই দুই আবার তিনি এক দুইয়ের পারে। তাহলে তো খুব সহজ ভাবে বলে দিলেই হল শূন্যই আছে। কিন্তু শূন্যও নয়। এখানেই সমস্যা এসে যায়। সাংখ্যাবাদীরা বলে পুরুষ আর প্রকৃতি আছে, মুসলমানরা একেশ্বরবাদের কথা বলে, আল্লাই আছেন, বৌদ্ধরা বলেন তিনি শূন্য, বেদান্ত বলে অদ্বৈত। অদ্বৈতকেও এটাও বলা যায় যে দুটো নয়, কিন্তু তারপরে কি আছে আমরা বলতে পারবো না। তাহলে অদ্বৈতবাদের গণনা কোথা থেকে শুরু হয়? অদ্বৈত বেদান্তে সব সময় দুই থেকে গোণা শুরু হয়। দুই মানে ঈশ্বরও এসে গেলেন আর প্রকৃতিও এসে গেল। প্রকৃতি এসে যাওয়া মানে মনও এসে গেল। মন বলতে পারছে আমিও আছি তুমিও আছো। যখন আমি নেই তখন কে আছে? কে আছে কেউ বলার নেই। তাহলে ওটাকে কি আমরা এক বলতে পারি? বলা যাবে না। তাহলে কি শূন্য বলা যাবে? তাও বলা যাবে না। তাই গণনা শুরু হয় দুই থেকে। অদ্বৈত বেদান্তের এটাই একেবারে মূল সিদ্ধান্ত। এই জিনিসটাই নাসদীয়সূক্তে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এত দীর্ঘ করে বলছেন। ওটা কি এক? বলা যাবে না। ওটা কি শূন্য? বলা যাবে না। সেইজন্য এর নাম অদ্বৈত। কিন্তু লোকেরা অদ্বৈত বলতে মনে করেন দুই নয়, তাই এক। অনেক বড় বড় তাত্ত্বিকরাও এই জিনিসটাকে ধারণা করতে পারেন না। অদ্বৈতে একও হয় না শূন্যও হয় না। সেইজন্য অদ্বৈতের গণনা শুরুই হয় দুই থেকে। এই ভাবটাই এখানে বলতে চাইছেন। তাই নাসদীসূক্তকে বোঝা অত্যন্ত কঠিন মনে হয়, কিন্তু সৃষ্টি তত্ত্বকে ধারণা করার জন্য, ঈশ্বর তত্ত্বকে বোঝার জন্য এর থেকে ভালো যুক্তিযুক্ত বর্ণনা বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ কোথাও পাওয়া যাবে না।

ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ।
আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিং চনাস।।২।।

প্রথম মন্ত্রে আমাদের একটা আইডিয়া দিয়ে দেওয়া হল। সৃষ্টির আগে যা ছিল, সৃষ্টি কিভাবে হয়েছে, সৃষ্টির আগে কি ছিল, এই প্রশ্নগুলিই আমাদের মনে বার বার উদয় হয়, এবার এক এক করে সেগুলোকে বিস্তারিত করে বলছেন। দ্বিতীয় মন্ত্রে বলছেন – তখন মৃত্যুও ছিল না অমৃতও ছিল না। কেন ছিল না? এই প্রশ্ন হয়ই না। বন্ধ্যা নারীকে যেমন প্রশ্ন করা যায় না, তোমার কি সন্তান হয়েছে? সন্তান হলে ছেলে না মেয়ে

হয়েছে? এই প্রশ্নের কোন অর্থই হয় না। খ্রীষ্ট ধর্মে ভগবানের একটা গুণের কথা বলা হয়, তারা বলে ভগবান সর্বশক্তিমান, আর তিনিই সব কিছু সৃষ্টি করছেন, তিনিই সৃষ্টি কর্তা। এখন কেউ যদি প্রশ্ন করে – ভগবান কি এমন একটা পাথর সৃষ্টি করতে পারবেন যেটা তিনি তুলতে পারবেন না। যদি এর উত্তরে বলে এই রকম পাথর তৈরী হয় না, তাহলে ভগবানের সৃষ্টির ক্ষমতা নেই বলতে হয়। যদি বলা হয়, না তিনি তুলতে পারবেন না, তাহলে ভগবান সর্বশক্তিমান নয়। এগুলোই অমূলক প্রশ্ন। মৃত্যু জিনিসটা ব্যবহারিক জগতেই হয়। এনারা একটা খুব প্রচলিত উপমা দিয়ে জিনিসটা খুব সুন্দর ব্যাখ্যা করে দেন। সূর্যে রাত হয় না জানা কথা। তাহলে কি সূর্যে সব সময় দিন থাকে? এই প্রশ্নের কোন অর্থই হয় না। যেখানে রাত নেই সেখানে দিন শব্দের কোন অর্থই হয় না। সূর্যে বলা যাবে না এখন দিন না রাত। পৃথিবীতে বসে আমরা সবাই বলছি সূর্যে সব সময় দিন, কারণ পৃথিবীতে দিন ও রাতের ব্যাপারটা আমাদের জানা। সৃষ্টিতে কিছুই নেই, আমরা জানি কিছু না থাকা মানে সব মৃত্যুর গহ্বরে ঢুকে গেছে। তাহলে মৃত্যু কি সব গ্রাস করে নিয়েছে? কিন্তু না, *ন মৃত্যুরাসীদ্*, তখন মৃত্যুও ছিল না। এই যে এখানে একটা কি দুটো শব্দ দিয়ে একটা গভীর তত্ত্বকে নিয়ে আসা হচ্ছে, এই একটা কি দুটো শব্দ আমাদের চিন্তা-ভাবনাকে তত প্রভাবিত করতে পারে না। একটা বাক্যে এর অর্থ করে দিলে বড় জোর আমরা বলব, শুনতে ভালোই লাগছে, বেশ সুন্দর কবিতা। এতটুকু অভিব্যক্তি দিয়ে এসব মন্ত্রের ভাবের গভীরতাকে প্রকাশ করা যায় না। নাসদীয়সূক্তের অন্তর্নিহিত ভাব যে কত গভীর, এটা শুধু বোঝা যায় স্বামীজীর মত মহাপুরুষ এই নাসদীয়সূক্তকে ইংরাজী কবিতায় অনুবাদ করেছেন। এর গভীর ভাব ধারণা করার জন্য যে মানসিক প্রস্তুতির দরকার সেই মানসিক প্রস্তুতি আমাদের নেই। পরের দিকে সাধকরা এসে এর ভাবকে আরও বিস্তার করে ভাবীকালের সাধকদের চিন্তা-ভাবনা করার জন্য রেখে দিলেন। যেমন বলছেন শিব হলেন মহাকাল, মহাকালের সাথে যিনি রমণ করেন তিনি কালী। মহাকাল, কালী এই ধরণের কথা যখন বলছেন তখনও কিন্তু এই কথা বলে দেওয়া হল যিনি কালের সঙ্গে রমণ করছেন। তার মানে রমণ, কাল, কালী এই শব্দগুলি সবই সৃষ্টির পরের কথা। সেখান থেকে আবার এসে যাচ্ছে মহাকাল, যিনি কালকেও গ্রাস করেন বা কালী হলেন যিনি মহাকালকেও গ্রাস করে নেন, তন্ত্র তাই বলছে। যিনি কালকেও গ্রাস করেন মানে সহজ ভাষায় যিনি মৃত্যুকে গ্রাস করেন। অন্য দিকে কাল মানে হয় সময়, যিনি সময়কেও গ্রাস করে নেন তিনিই কালী। সময়কে কী করে গ্রাস করবে! অর্থ হল তখন সময়েরও জন্ম হয়নি। কিছু দিন আগে থেকে বিজ্ঞানীরাও বলতে শুরু করেছেন Time has a beginning। বিজ্ঞানীরা আগে জানতই না, তারা জানত সময় হল একটা absolute জিনিস, কাল সব সময়ই আছে সব সময় থাকবে। কিন্তু আমাদের ঋষিরা হাজার হাজার বছর আগেই জানেন Time has a beginning। তাহলে সময়ের যখন জন্ম হয়নি তখন কি ছিল? এই প্রশ্নটাই হয় না। কিন্তু সাধারণ মানুষ তো মানতে চাইবে না, তাই বলে দিলেন সময় তখন কালীর গর্ভে ছিল। এভাবেই কাহিনীর জন্ম হয়। তখন মৃত্যু ছিল না তাহলে মৃত্যু না থাকলে অমৃত ছিল। না, অমৃতও ছিল না। তাহলে কী আছে? যা আছে মুখে বলা যাবে না। যদি বেশি সংশয় হয় তাহলে আমাদের ঠাকুরের দশটি জলপূর্ণ ঘটের উপমাটা ভাবতে হবে। দশটি ঘটের শেষ ঘটটাও ভেঙে দেওয়া হয়েছে। এবার কটি সূর্য থাকল? কি আছে জানা বা বলার উপায় নেই। যা আছে তাই আছে, মুখে বলা যাবে না। এক একটা ঘট হল এক একটা মন। প্রত্যেকটি মনকে নাশ করে দেওয়া হল, এখন কি করে জানবে কী আছে!

মৃত্যু ও অমৃতকে নিয়ে বলার পর এবার দিন ও রাত্রিকে নিয়ে বলছেন – *ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ*। *প্রকেতঃ* শব্দের অর্থ ইঙ্গিত বা চিহ্নিত করা। এমন কোন চিহ্ন ছিল না যা দিয়ে বোঝা যাবে এটা দিন না রাত। আকার ইঙ্গিতেও কিছু বোঝা যাবে না। বলছেন, এগুলোর অস্তিত্বের কথা ছেড়ে দাও, অস্তিত্বের গন্ধ মাত্র ছিল না। আমরা ভাবব এটা কি ধরণের কথা হল, হয় আলো থাকবে না হয় অন্ধকার থাকবে। মৃত্যু কোথায় আছে? যখন সৃষ্টি হয়ে গেছে সেখানে জন্ম-মৃত্যু হবে। সৃষ্টি মানেই দ্বৈত স্বরূপে চলে এসেছে। দ্বৈত মানে দিন থাকবে রাত থাকবে, সুখ থাকবে দুঃখ থাকবে, ধর্ম থাকবে অধর্ম থাকবে, পাপ থাকবে পূণ্য থাকবে, মৃত্যু থাকবে অমরত্ব থাকবে। যেই সৃষ্টির ওপারে চলে যাবে তখন নির্দ্বন্দ্ব, কোন দ্বৈত ভাব থাকবে না। দ্বৈতের পারে চলে গেলে কি থাকবে, দুই থাকবে না, একও থাকবে না আবার শূন্যও থাকবে না, কি থাকবে

মুখে বলা যাবে না। অদ্বৈত মানে কখনই এক নয় দুইও নয়, অদ্বৈত মানে এক দুইয়ের পার। ঠাকুর বলছেন ঈশ্বর বই আর কিছু নেই। কিন্তু কোথাও তিনি বলেননি যে ঈশ্বর এক। আবার বলছেন তিনি এক দুইয়ের পার, কার্যও নেই কারণও নেই। সৃষ্টি এলেই তবে কার্য কারণ হবে, তখন দিন হবে রাত হবে। এখানে ঠিক সৃষ্টির পূর্বের অবস্থা বর্ণনা করছেন। উপনিষদে একটি খুব প্রচলিত প্রার্থনা মন্ত্র আছে যা আমরা নিত্য আবৃত্তি করি – *ওঁ অসতো মা সদ্গময়। তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়*।। আমাকে সৎ অসৎ এর পারে নিয়ে চলো, আমাকে অন্ধকার থেকে আলোর পারে নিয়ে চলো, আমাকে মৃত্যু থেকে অমৃতের পারে নিয়ে চলো। উপনিষদেরই মন্ত্র, কিন্তু দ্বৈতের কথা বলা হচ্ছে। যারা কিছুই বুঝবে না তাদের জন্য বলা হয়েছে। সাধারণ মানুষকে সৎ অসতের পার বললে কিছুই বুঝবে না, আলো ও অন্ধকারের পার বললে কিছু ধারণাই করতে পারবে না। তাই প্রাথমিক স্তরে কিভাবে প্রার্থনা করতে হবে? তখন এখান থেকে শুরু করা হয় – হে ভগবান আমার মন্দ বুদ্ধি দূর করে শুভ বুদ্ধি দাও, হে ভগবান আমার পাপ বুদ্ধি দূর করে ধর্ম বুদ্ধি দাও। এরপর সাধনা করে যখন এগিয়ে যায় তখন বলে – হে প্রভু, আমি যেন পাপ-পূণ্যের পারে যেতে পারে, আমাকে ধর্ম-অধর্মের পারে নিয়ে চল। আগে তম ও রজ গুণকে অতিক্রম করে সত্ত্বগুণকে ধরতে হবে, সত্ত্বগুণকে না ধরতে পারলে সাধুপুরুষ হওয়া যায় না। সাধুপুরুষ হয়ে গেলেই সব হবে না, এরপরে লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে সত্ত্ব, রজ ও তম তিনটে গুণকেই অতিক্রম করে যেতে হবে।

বলছেন দিন রাতের কথা ছেড়ে দাও সামান্যতম কিছুর আভাসও ছিল না, যাতে বোধ হবে কিছু আছে। স্বামীজী এর অনুবাদ করেছেন torch কিন্তু সঠিক শব্দ হবে indication, দিন ও রাতের যে ধারণা করবে তারও কোন রকম আভাস ছিল না। একেই বলে কাব্য। প্রথমে বলছেন কোন কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না, এবার বলছেন তার কোন রকম আভাসও ছিল না। যিনি নাসাদীয়সূক্তকে ছন্দোবদ্ধ করেছেন তিনি সত্যিকারের একজন শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। যদি পরমেশ্বরের দিক থেকে ভাবি, তাহলে যা কিছু ছিল সব পরমেশ্বরের মনেই ছিল। আর নিরাকার রূপে যদি দেখি তাহলে সেই সচ্চিদানন্দের ভেতরে সব লয় হয়ে আছে।

এই অবস্থাকে অব্যক্তও বলা যাবে না। অব্যক্ত বললেই ব্যক্ত ভাবটাও এসে যাবে, কিন্তু এখানে যে অবস্থার কথা বলা হচ্ছে তা হল ব্যক্ত অব্যক্তের পারের অবস্থা। অব্যক্ত বলতে সব সময় প্রকৃতি বা মায়াকে বোঝায়, ভগবানকে কখনই অব্যক্ত বলা যায় না। মায়া সব কিছুকে ব্যক্ত করে কিন্তু নিজে অব্যক্ত। ভগবান এই ব্যক্ত ও অব্যক্তের পার। এগুলো সাধনা সাপেক্ষ, শুধু শুনলে বা শাস্ত্র পড়লে এই জিনিসগুলি কখনই ধরা যাবে না। যখন Theory of Probability, আইজেনবার্গের Uncertainty Principle প্রথম বেরোল, আইনস্টাইনের মত বিজ্ঞানীও ফালতু তত্ত্ব বলে Theory of Probabilityকে উড়িয়ে দিয়েছিলেন, কারণ তিনিও মেনে নিতে পারলেন না যে এটাও হতে পারে আবার ওটাও হতে পারে। আইজেনবার্গ নিজে যখন এই থিয়োরিকে ফরমুলেট করলেন, তাঁরই মাথা ঘুরে গিয়েছিল। তিনি নিজেই থিয়োরিটাকে দশ বছর চেপে রেখে দিয়েছিলেন। Uncertainty Principle বলছে A x B is not = B x A. এটাকে কেউ মানতে পারে? তাই তিনি দশ বছর চেপে রেখেছিলেন। সেই সময় খবর এল অঙ্কে Matrix Theory আছে যেখানে A x B is not = B x A হয়, সঙ্গে সঙ্গে তিনি এইটা ছেপে দিলেন। এখন তো এই থিয়োরি ক্লাশ নাইন টেনে পড়ান হয়। ছাপা হয়ে যাওয়ার পর আইনস্টাইনের মত শ্রেষ্ট পদার্থ বিজ্ঞানী পর্যন্ত মানতে পারলেন না, তিনি বললেন যে আমরা কি বিজ্ঞানের কথা বলছি না আগডুম বাগডুম কিছু কথা বলছি। কারণ তখন পর্যন্ত ফিজিক্স জানত যে A leads to B, B leads to C, so A leads to C, কিন্তু এখন বেরিয়ে গেল A leads to B, B leads to C but A does not lead to C, অথচ আজকে মেট্রিক্স থিয়োরি, uncertainty principle ক্লাশ নাইন টেনে পড়ান হচ্ছে। যে জিনিসটা আইনস্টাইন মানতে চাইলেন না, সেই জিনিস এখন ক্লাশ এইটের ছাত্ররা পড়ছে, কারণ ব্রেণ এখন তৈরী হয়ে গেছে।

এগুলো ধারণা করার জন্য দরকার প্রচণ্ড রকমের একাগ্রতা, গভীর চিন্তন, সূক্ষ্ম বুদ্ধি আর পবিত্রতা। আমাদের কোনটাই হয়নি সেইজন্য শুনে বা পড়ে আমরা ধারণা করতে পারিনা। মূল ব্যাপার হল যে কোন জিনিস যার উল্টোটাও হতে পারে তিনি সেটা নন। যখন অস্তিত্বের কথা আসবে তখন অনস্তিত্বের কথাও

আসবে, তাই এখানে বলছে তিনি সৎও নন অসৎও নন, তিনি সৎ অসৎএর পারে। আছে আবার নেই এটাকে ধারণা করার জন্য বলেছেন একদিকে দিয়ে বলতে গেলে তিনি অব্যক্ত আরেক দিক দিয়ে গেলে বলতে হয় তিনি ব্যক্ত। অব্যক্তের 'অ'কে সরিয়ে দিলে এটা অব্যক্তও নয় আবার ব্যক্তও নয়। এগুলো শব্দের কোন খেলা নয়। এটাই সত্য, এটা এই রকমই হয় আর এই সত্যটাই বলা হচ্ছে। ধ্যানের গভীরে আত্মানুভূতি হয়ে গেলে পরিষ্কার এই সত্যটাই উন্মোচিত হয়ে যাবে। নাসাদীয়সূক্তম্ কোন সাদামাটা কবিতা নয়, আধ্যাত্মিক সত্যের চরম তত্ত্বগুলিকে শব্দ ও বাক্য দ্বারা বিন্যাস করে কবিতার রূপ দেওয়া হয়েছে। ঠাকুরের কথায় আছে কাঁটায় হাত কেটে গেছে, দর্‌দর্ করে রক্ত ঝড়ছে আর বলছে আমার তো কিছু হয়নি। স্বামীজী যে কাহিনী বলছেন যেখানে আলেকজাণ্ডার একজন ঋষিকে বলছেন – তোমাকে আমার দেশে নিয়ে যাব, যদি আমার সাথে না যাও তাহলে তোমাকে হত্যা করে রেখে যাব। ঋষি বলছেন – জীবনে তুমি এর থেকে বড় মিথ্যা কথা কখন বলোনি। আমি আত্মা তুমি আমাকে মারবে কি করে? ঋষি ঐ অবস্থায় পৌঁছে গেছেন যেখানে তাঁর দেহটা আছে এই মাত্র। আলেকজাণ্ডার যদি বলত আমি তোমার দেহকে নাশ করে দেব, তাহলে ঋষি বলতেন হ্যাঁ বাপু তা তুমি পারবে, কিন্তু আমাকে কিভাবে মারবে, আমিতো আত্মা, আত্মাকে কেউ কখন কোন ভাবেই নাশ করতে পারে না। যাঁর এই আত্মানুভূতি হয়ে গেছে তাঁর শরীরের প্রতি সেই ভাবটাই হবে যে ভাব আমাদের জামা কাপড়ের প্রতি। কেউ জামা ছিড়ে দিলে আমার খারাপ লাগবে কিন্তু আমার দেহের তো কিছু হবে না, কেননা জামাটা আলাদা আর আমার দেহটা আলাদা। ঠিক তেমনি যিনি আত্মজ্ঞানী তাঁর যদি দেহটা চলে যায় তাঁর কিছুই হবে না, দেহের সঙ্গে তাঁর একাত্ম বোধ যেদিন তাঁর আত্মানুভূতি হয়েছে সেদিনই নষ্ট হয়ে গেছে।

বেলুড় মঠে একজন মহারাজের ক্যান্সার হয়েছিল। যেদিন তাঁর শরীর গেছে তার আগের দিন সবাই ওনাকে বলছেন আপনার প্রচণ্ড কষ্ট হচ্ছে, চলুন আপনাকে সেবা প্রতিষ্ঠানে নিয়ে যাই। উনি অবাক হয়ে বলছেন – কষ্ট! কিসের কষ্ট! আমি সেই ব্রহ্ম, আমি সেই শুদ্ধ আত্মা আমার কিসের কষ্ট। সবাই হাঁ করে তাকিয়ে আছেন। ক্যান্সারের ঐ মারাত্মক যন্ত্রণা কিন্তু কোন অনুভূতিই নেই। চিন্তা করা যায়! শরীর যাবার একদিন আগে এই কথা বলছেন – আমি সেই শুদ্ধাত্মা, আমি সেই ব্রহ্ম আমার কোথায় কষ্ট! শাস্ত্রের বাক্য মুর্ত কিভাবে হয় মহারাজকে ওই সময় যাঁরা দেখেছেন তাঁরাই দেখেছিলেন।

ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি, যাঁদের আত্মানুভূতি হয় তাঁরা ঠিক এই জিনিসটাই স্পষ্ট দেখেন। কিন্তু আমরা তো বুঝতে পারব না, তাই হাজারটা উদাহরণ দিয়ে দিয়ে একটু ধারণা করার চেষ্টা করা হচ্ছে। আচার্যের কাছে যা কিছুই শুনছি এগুলো হল আচার্যের বাহ্যিক উত্তেজনার তরঙ্গগুলি তথ্য হয়ে আমাদের ভেতরে যাচ্ছে মাত্র, এতে আমাদের কোন অনুভূতিই হবে না, জ্ঞান যেটা হবে সেটা আমার ভেতর থেকেই হবে, বাইরে থেকে আসবে না। একটা জোক্‌কে যদি ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হয় তাহলে সেটাকে আর জোক্ বলে গণ্য করা হয় না। শাস্ত্র হচ্ছে ঠিক তাই। বলাটা আচার্যের কর্তব্য কিন্তু বোঝার ব্যাপারটা শিষ্যের।

প্রকেতঃ শব্দের অর্থ কোন কিছুর ইঙ্গিত দিচ্ছে, বা সূচনা করছে, ইংরাজীতে indication। Indicationকে দেখানোর জন্য সংস্কৃতে একটা শব্দের খুব ব্যবহার করা হয়, তা হল 'ইব', 'ইব' মানে যেন, মত। শঙ্করাচার্য গীতা ভাষ্যেও ঠিক এই কথাই বলছেন – যিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ তিনি মানুষ রূপ ধারণ করে যেন জন্ম গ্রহণ করেন। পরিষ্কার করে তাঁরা জিনিসগুলিকে বলতেন না। কারণ ভগবানের জন্মকে পরিষ্কার ভাবে বলতে গেলে তিনি জাগতের বস্তু হয়ে যাবেন। মন দিয়ে বোঝার চেষ্টা বললে কি হয় আমরা যেমন কানে শুনছি চোখে দেখছি, ঠিক এভাবে জিনিসটা হচ্ছে না, ঠাকুর বলছেন তখন বোধে বোধ হয়। বেদের কিছু ভাবকে যখন আলোচনা করা হয়েছিল তখন বলা হয়েছিল কেন বেদ বোঝা খুব কঠিণ। তার মধ্যে একটা বলা হয়েছিল, যে ভাষা বেদে ব্যবহার করা হয়েছে তা অনেক পুরনো ভাষা, সেই ভাষা আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগেই অপ্রচলিত হয়ে গেছে, তার মানে আরও কত পুরনো এর ভাষা। পাঁচশ বছর আগে ব্যবহৃত ভাষার অনেক অর্থই আমরা ধরতে পারিনা, আর বেদের ভাষা আড়াই হাজার আগেই ব্যবহার বন্ধ হয়ে গেছে। সেইজন্য অনেক জায়গাতেই বোঝা যায়না ওনারা ঠিক কি বলতে চাইছেন। এর থেকেও বড় সমস্যা, যে জিনিসটা বলতে চাইছেন তকে মুখে কখন বলাই যায় না। সৃষ্টি তত্ত্ব, আত্মতত্ব, ঈশ্বরের স্বরূপ, মায়া

এগুলো মুখে বলাই যায় না। যেটুকু তাঁরা যে ভাষাতে প্রকাশ করতে চাইছেন সেই ভাষাও আড়াই হাজার বছর আগে লুপ্ত হয়ে গেছে। আমাদের মত সাধারণ মানুষ ঋষিদের এসব কথা কি করে বুঝবে! সায়নাচার্যের মত কিছু পণ্ডিতদের ভাষ্যের উপরেই আমাদের নির্ভর করতে হয়। সায়নাচার্যকে আবার অনেকে মানেন না।

এখানে বলছেন যে সৃষ্টির আগের মুহূর্তে দিন আর রাতের কিছুরই বোধ নেই, ঘুণমাত্র যে বোধ হবে সেটাও ছিল না। যা কিছু দ্বন্দ্বমূলক সবটাকেই না করা হচ্ছে। যদি বলা হয় মৃত্যু ছিল না, তাহলে বলবে অমৃত ছিল, দিন ছিল না, তাহলে রাত ছিল। না, কোনটাই ছিল না, মৃত্যুও ছিল না, অমৃতও ছিল না, আবার দিনও ছিল না রাতও ছিল না। পরিষ্কার করে বলছেন না যে দিন ছিল না রাতও ছিল না, বলছেন দিন ও রাতের কোন বোধ ছিল না। আমরা দিন ও রাত বুঝি কি করে? কতকগুলি লক্ষণ দেখে বুঝি যে এখন রাত বা দিন, কিন্তু এখানে বলছেন এরকম কোন ধরণের লক্ষণই ছিল না যে বোঝা যাবে রাত কিংবা দিন। এখানে দিন-রাতটা বড় কথা নয়, আসলে সময় মানে কালের কথাই বলছেন। কাল যখন আসে তখন সে সব কিছুকে বিভাজন করে। কাল ও কার্য এই দুটো সব সময় একসাথে থাকে। যখন দুটি কার্য হয় তখন ওই দুটোর পরিমাপ হল কাল। যেমন জলঘড়ি, জলঘড়িতে একটা একটা করে জলের ফোটা পড়ছে। একটা ফোটা পড়া মানে একটা কার্য, আরেকটি ফোটা পড়ল আরেকটি কার্য হল, এই দুটো কার্যের মধ্যে যে তফাৎ সেটাই কাল। যত ফোটা পড়ছে তত সময়ের দ্বারা কার্যের বিভাজন হয়ে যাচ্ছে। সৃষ্টির ওই জায়গাতে কোন কার্যই নেই, সেখানে কাল কি করে আসবে! সময় হল measure of events। Event মানেই হয় কোন বস্তুর movement। কিন্তু আগেই বলেই দেওয়া হয়েছে অন্তরীক্ষই নেই, কোন পাতাল, পৃথিবী আদি লোক নেই তাই কোন movement নেই। কোন movement যদি না থাকে তাহলে event হবে কোথা থেকে, event না থাকলে time কোথা থেকে হবে! Time আর energy সব সময় পরস্পর যুক্ত হয়ে থাকে। যেমনি শক্তির গতি শুরু হবে তখন সময়ের প্রবাহও হতে শুরু হয়ে যাবে, দুটোর তফাৎ বোঝা যাবে না কিন্তু প্রবাহ শুরু হয়ে যাবে। Space যেখানে আছে সেখানেই সময় থাকতে বাধ্য, space না থাকলে সময়ও থাকবে না। এখানে বলছেন পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেটা সেটাই নেই। Absolute time আর relative timeএর কোন প্রশ্নই উঠবে না। বেদের কালে সময় মাপার সব থেকে নিকটতম উপায় ছিল দিন আর রাত এবং সূর্য, চন্দ্র আর তারকার গতিবিধি। বোঝানোর জন্য তাই বলছেন দিনও ছিল না, রাতও ছিল না, আসলে বলতে চাইছেন তখন সময় বলে কিছু ছিল না। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন ধরণের ইঙ্গিতও ছিল না। এইটাই *প্রকেতঃ* শব্দের সঠিক ব্যাখ্যা।

সবটাই না না করে বলে গেলে আমাদের পুরোটাই সংশয় হয়ে যাবে, তাই এবার ইতিবাচক দিক দিয়ে দ্বিতীয় মন্ত্রের পরের লাইনে বলছেন – *আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিং চনাস। আনীৎ অবাতং তৎ একম্ স্বধয়া* – এই লাইনটাতে পুরো নাসদীয়সূক্তের মূল বক্তব্যের কেন্দ্রীয় ভাবটা বলা হচ্ছে। যেন এই একটা বাক্য বলার জন্যই পুরো নাসাদীয়সূক্তম্ রচনা করা হয়েছে। এই লাইন আর শেষে একটা লাইন আসবে যাতে নাসদীয়সূক্তমের মূল তত্ত্বকে তুলে আনা হয়েছে। *তস্মাৎ হ অন্যৎ পরঃ*, তাঁর থেকে আলাদা কোন কিছু ছিল না। তাহলে একটা কিছু ছিল। আসলে এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে তখন কি ছিল আর কেমন ছিল। পরের দিকে স্বামীজী সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করতে চেয়েছিলেন। নিকোলা টেক্সলা একজন বড় আমেরিকান বিজ্ঞানী, মূলতঃ তিনি ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন, তার সাথে স্বামীজী এই সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। টেক্সলা স্বামীজীর আলোচনাতে প্রচণ্ড প্রভাবিত হয়েছিলেন। স্বামীজী যেখানে বক্তৃতা দিতেন জায়গাটা খুব ছোট ছিল, টেক্সলা কখনই ভেতরে গিয়ে বসতেন না, বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই পুরো বক্তৃতা শুনে বেরিয়ে যেতেন। পরে যখন স্বামীজীর সাথে আলাপ হয় তখন স্বামীজী তাঁকে বেদান্তে যে সৃষ্টিতত্ত্বের কথা বলা হয়েছে তা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। টেক্সলা সেই আলোচনা শুনে খুব উৎসাহিত হয় বললেন ‘পৃথিবীর যত ধর্মে যত সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে বলা হয়েছে সবই গালগপ্প মনে হয় কিন্তু আপনি যে তত্ত্ব সৃষ্টি সম্বন্ধে বললেন সেটাকে বিজ্ঞানের দ্বারা প্রমাণিত করা যায়। আপনি যেটা বলছেন সেটাকে আমি অঙ্কের মাধ্যমে প্রমাণিত করে দেব’।

পরবর্তি কালে টেক্সলা এই নিয়ে অনেক লেখালেখি করেছিলেন, আর স্বামীজীও বেশি দিন দেহে ছিলেন না, তাই টেক্সলা কতটা কি করতে পেরেছিলেন আমাদের কাছে সঠিক ভাবে জানা নেই। কিন্তু

আইনস্টাইন যখন $E = MC^2$ আনলেন, সেই সময় তাঁর টেক্সলা বা স্বামীজীর সঙ্গে আইনস্টাইনের কোন রকমের সম্পর্ক ছিল না, কিন্তু দেখা যায় সবারই একই ধরণের চিন্তা এখানে এসে মিলিত হচ্ছে। স্বামীজী যেটা বলতে চাইছিলেন, টেক্সলা যাকে গণিতের মাধ্যমে প্রমাণ দিতে চেয়েছিলেন, আইনস্টাইন যেটা দাঁড় করালেন, সবটাই একই ভাবের আবর্তের মধ্যে ঘুরছিল। আইনস্টাইনের থিয়োরি যখন এসেছিল সেই সময় স্বামীজী যদি বেঁচে থাকতেন তাহলে তিনি নিশ্চয়ই বলতেন বেদান্তের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে।

এখানে যে তিনটে শব্দ এসেছে *আনীৎ, অবাতং* ও *স্বধয়া*, এই তিনটে শব্দকে দর্শনের বিভিন্ন শাখার পণ্ডিতরা নিজেদের মত ব্যাখ্যা করেন। *আনীৎ* আসছে আন্ ধাতু থেকে, মানে নিঃশ্বাস নেওয়া, *অবাতং* শব্দের অর্থ যার নিঃশ্বাস নেই, তাহলে *আনীদবাতং* এর অর্থ যার নিঃশ্বাস নেই সে নিঃশ্বাস নিল, মানে যে নিঃশ্বাসই নিতে পারেনা, সে নিল নিঃশ্বাস। *স্বধা* শব্দও অনেক জটিলতার সৃষ্টি করে। *স্বধা* শব্দের অনেক রকম অর্থ করা যেতে পারে, *স্বধার* একটা অর্থ প্রকৃতি, *স্বধয়া* মানে নিজের যে প্রকৃতি সেই প্রকৃতি অনুসারে। *স্বধা* শব্দের অর্থ মায়াও হতে পারে, *স্বধয়া* মানে নিজের মায়ার দরুণ। *স্বধা* আবার শক্তিকেও বোঝায়। *স্বধয়া* শব্দের তিন রকমের অর্থ পাচ্ছি – প্রকৃতি, মায়া ও শক্তি। প্রথমে বলেছিলেন তখন সৎও ছিল না অসৎও ছিল না, মৃত্যু ছিল না অমৃতও ছিল না, সেখান থেকে এসে বলছেন তিনি একা ছিলেন *তৎ একম্*। এখানে যে এক বলা হচ্ছে এই এক আর একেশ্বরবাদের একের সঙ্গে এক নয়। তিনিই আছেন এটাই শুধু বলা যায়। সৃষ্টি শূন্য থেকে হয়েছে এই ভুল যাতে না হয় সেইজন্য বলছেন *তৎ একম্*। এই এক আর একেশ্বরবাদের একের তফাৎ একটু পরেই পরিষ্কার হয়ে যাবে। আসলে ঋষিরা ধ্যানের গভীরে নিজের শরীর, ইন্দ্রিয়, মন-বুদ্ধির পারে বোধে বোধ করেন যে সত্তা আছে। বার বার তাই আসে সত্তা মাত্রম্। তিনি আছেন, এই তিনিই এক, না দুই, নাকি অনন্ত কিছুই বলা যায় না। সেইজন্য বলছেন বোধে বোধ করেন। কে বোধ করেন? শরীর শরীরের পেছনে যায়, মন মনের পেছনে যায় আর আত্মা আত্মার পেছনে যায়, তাই ওই আত্মাই একমাত্র নিজেকে জানতে পারেন, বোধ করার ক্ষমতা একমাত্র আত্মারই থাকে। তাই তিনিই তখন বোধ করেন আমিই আছি। কিন্তু আমরা যা কিছু বোধ করি বা বোঝার চেষ্টা করি তার জন্য মন দরকার। মন সেখানে নেই, কারণ তার আগেই তো তিনি দেহকে ছেড়ে দিয়ে মন-বুদ্ধিকে ছেড়ে দিয়ে এগিয়ে গেছেন। কে ছেড়ে দিয়েছে? তিনিই ছেড়েছেন। আমার হাত দিয়ে আমি জগতের সব কিছুকে ধরছি। হঠাৎ আমার ইচ্ছে হল আমার হাত দিয়ে আমার মুখটা একটু ছুঁয়ে দেখি। হাত দিয়ে আমার মুখটা স্পর্শ করলাম। এখানে কে কাকে স্পর্শ করল? আমিই আমাকে স্পর্শ করছি, আমরা এটা বলি না যে, আমার হাত আমার গালকে স্পর্শ করেছে। আত্মা এই হাতের সঙ্গে একাত্ম করে নিয়ে সমস্ত জগৎকে জেনে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ তাঁর মনে হল, এবার আমি নিজেকে নিজে জানব। হাত কি মুখকে স্পর্শ করতে পারে? না তা পারে না, চামড়া চামড়াকে স্পর্শ করে বোধ করতে পারে। ঠিক তেমনি আত্মা আত্মাকে বোধ করে, নিজেকে নিজে বোধ করে। যখন নিজেকে নিজে বোধ করেন তখন দেখেন আমার তো জন্ম নেই মৃত্যু নেই, আমিই তো আছি, আমি তো সব সময় আনন্দস্বরূপ। তখন আর সে নিজেকে শরীরের সঙ্গে একাত্ম বোধ করবে না। ওখানেই তাঁর সমস্ত রকম শরীরের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেল। এটাই সমাধির অবস্থা। ঠাকুর বলছেন সমাধির পর একুশ দিন সমাধিতে থেকে দেহটা পড়ে যায়। তাহলে ঠাকুর কি করে শরীরকে ধরে রাখলেন? ঠাকুর বলছে, তিনি অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ তখন ইচ্ছা করলেন এই দেহকে আশ্রয় করে অনেক কাজ হবে। এগুলো কিভাবে হয় আমরা কোন দিন জানতে পারবো না, যিনি ওই সমাধি অবস্থায় যান তিনিই একমাত্র বলতে পারেন কি হয়। তাঁরা আবার বিভিন্ন ভাবে আমাদের বলার চেষ্টা করেন, কিন্তু ওই অবস্থার বর্ণনা করার মত উপযুক্ত শব্দ নেই। সচ্চিদানন্দ হলেন বিলক্ষণ, এই জগতের কোন কিছুর সাথে তাঁর মিল নেই, জগতের কোন কিছু দিয়েই তাঁকে বর্ণনা করা যায় না। তাই এই প্রশ্ন গুলি হয় না, তাও প্রশ্ন করা হচ্ছে আর তাঁরাও উত্তর দিচ্ছেন। তাই বলছেন *অবাতম্*, অর্থাৎ কোন ধরণের নড়চড়া নেই। নড়াচড়া করার জন্য দরকার আকাশ। সচ্চিদানন্দ অনন্ত, সচ্চিদানন্দের বাইরে কিছু নেই, কিছু না থাকা মানে আকাশও নেই, আকাশ না থাকলে কোন ধরণের নড়চড়াও হবে না। ভগবান সর্বব্যাপী বলতে আমরা বুঝি ভগবান সব জায়গায় যেতে পারেন, কিন্তু তা নয়, তার মানে এমন কোন স্থান নেই যেখানে তিনি নেই। যখন কোন জায়গা

নেই যে তিনি নেই, তখন তিনি যাবেনটা কোথায়। বায়ুকে বলছেন *সর্বত্রগোঃ*, বায়ু সব জায়গায় যেতে পারে, কিন্তু যিনি সব জায়গাতে আছেন তিনি যাবেন কোথায়। তাই বলছেন *অবাতম্*।

তিনি একা কি ভাবে রয়েছেন? তিনি কি কোন জড় পদার্থের মত পড়ে আছেন? সাংখ্যে যেমন প্রকৃতিকে জড় বলা হয়। এখানেও কি তিনি সেই রকম জড়? কারণ বলছেন তিনি নিঃশ্বাস নিচ্ছেন না। কিন্তু তারপরেই বলছেন আনীত, তিনি নিঃশ্বাস নিলেন। তিনি ছাড়া তো কিছু নেই, তিনি কিসের নিঃশ্বাস নেবেন? বলছেন এটা উপমা, তাই ভাষ্যকার *প্রাণীবৎ* বলছেন। প্রথম বললেন সৎ, অর্থাৎ তিনি আছেন, তারপর এখানে বলা হচ্ছে চিৎ, প্রাণবৎ। প্রাণকে এনারা অনেক সময় চৈতন্যের সঙ্গে এক করে দেখতেন, কারণ প্রাণই হল জীবনের লক্ষণ। তিনি হলেন চৈতন্যময় পুরুষ। চৈতন্যময় পুরুষকে আমরা কি করে বোঝাব? তাই বলছেন প্রাণীবৎ। সেইজন্য বলছেন *আনীত*, তিনি নিঃশ্বাস নিলেন। কিভাবে নিঃশ্বাস নিলেন? নিঃশ্বাস নিতে হলে নিজেকে যেমন দরকার তেমনি আরেকটা কিছু দরকার। তাই বলছেন *স্বধয়া*। স্বধা শব্দটা হয় ধারণ করার অর্থে। নিজের শক্তিতেই নিজেকেই নিঃশ্বাস নিচ্ছেন। *স্বধয়া* শব্দটি অত্যন্ত জটিল শব্দ। যিনি আছেন তিনি *আনীত*, তিনি নিঃশ্বাস নিলেন, আবার বললেন *অবাতম্*, কোন নড়চড়া নেই। আপনি নিঃশ্বাস নিচ্ছেন আবার কোন নড়চড়া নেই, এটা কি করে সম্ভব! *আনীত* বলতে বোঝান হচ্ছে তিনি চৈতন্যময় পুরুষ। *অবাতম্* তিনি ছাড়া কোন কিছু নেই, সেইজন্য সেখানে কোন নড়াচড়াও নেই। স্বধয়া, নিজের শক্তিতে তিনি নিঃশ্বাস নিলেন।

যেহেতু এই স্বধয়ার তিন রকম অর্থ হতে পারে তাই বলা যায় তিনি নিজের প্রকৃতির দ্বারাই শ্বাস নিচ্ছেলেন, আবার মায়াতে মনে হচ্ছে তিনি যেন শ্বাস নিচ্ছেন, অথবা তিনি নিজের শক্তির দ্বারা নিঃশ্বাস নিচ্ছিলেন। ভারতে যে কটি আধ্যাত্মিক দর্শন বেরিয়েছে সব এই একটি শব্দকে কেন্দ্র করেই সৃষ্টি হয়েছে। যখন স্বধয়াকে প্রকৃতি বলছে তখন সাংখ্য দর্শন এসে যাবে, সাংখ্য দর্শনের সাথে যোগদর্শনও এসে যাবে। যখন স্বধয়াকে মায়া অর্থে বলবে তখন বেদান্ত এবং বেদান্তের সঙ্গে জড়িত যত দর্শন হতে পারে সব দর্শনকে বোঝাবে। আবার যখন স্বধয়ার অর্থ করবে শক্তি তখন তন্ত্রদর্শন এসে যাবে আর যে কোন ভক্তিমার্গ বিশেষ করে যে ভক্তিতে শক্তিকে মানা হয়, সব দর্শন এসে যাবে। অধ্যাত্ম রামায়ণে বলছে সীতা শ্রীরামচন্দ্রের শক্তি, এই ধরণের যাবতীয় শাস্ত্র যেখানে এইভাবে শক্তির স্থান করে দিচ্ছে সব শাস্ত্র মান্যতা পেয়ে যাচ্ছে এই একটি কথার জন্য। ঠাকুর যেমন বলছেন তিনি আর তাঁর শক্তি অভেদ, শক্তিকে ব্রহ্ম থেকে আলাদা করা যাবে না। কিন্তু মায়াও যা শক্তিও তাই, শক্তিও যা প্রকৃতিও তাই। সব দর্শনকে একটা শব্দ *স্বধয়া* দিয়ে ব্যাখ্যা করে দেওয়া যায়। স্বধয়ার অর্থ হল নিজের ক্ষমতাতে, নিজের ক্ষমতাতেই যেন তিনি নিঃশ্বাস নিলেন। তার মানে, তিনি আছেন আর তাঁর শক্তি আছে। সৃষ্টির আগে কি ছিল জানতে চাইলে খুব সহজ ভাবে একটি কথাই বলা যায়, ব্রহ্ম আর শক্তি। তাহলে প্রথমে যে বলা হয়েছিল *ন অসৎ ন সৎ*, এই কথার সাথে এখন যা বলছে তার মধ্যে তো বিরোধ হয়ে যাচ্ছে। না কোথাও কোন বিরোধ হচ্ছে না। প্রথমে যেটা বলা হয়েছিল বোঝাবার জন্য যে, তখন যা কিছু ছিল সেটাকে জানার কোন পথ নেই। জানার পথ নেই বলে এখানে বলছেন, তখন মৃত্যুও ছিল না, অমরত্বও ছিল না, দিনও ছিল না, রাতও ছিল না, তাই জানার কোন পথ নেই। তাহলে তিনি নিজের শক্তিতে নিঃশ্বাস নিলেন এটাকে আপনি কি করে জানলেন? পরে তাও বলবেন, ঋষিরা ধ্যানের গভীরে জানতে পেরেছেন। বলার পরে আবার বলবেন, এটাকে কেউ জানেও কিনা কে জানে! কারণ এটা বুদ্ধির গম্য নয়, তাই জানা যায় না। ঈশ্বরের উপাধির কথা প্রথম এখানেই বলতে শুরু করেছেন, *আনীদাবতং স্বধয়া*।

আমরা অনেক সময় ভাবি হিন্দুদের এত দর্শন কি করে সৃষ্টি হয়েছে। এর উত্তর এই জায়গাতে এসে পাওয়া যাবে। একটি মাত্র শব্দ তার অর্থ যেভাবে করা হয়ে সেই ভাবে দর্শনের আলাদা একটা শাখা তৈরী হয়ে যাবে। যদি দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত আর অদ্বৈত থেকে তিন জন পণ্ডিতকে দাঁড় করিয়ে গীতা বা উপনিষদের শ্লোক বা মন্ত্রকে বিশ্লেষণ করতে বলা হয় তখন দেখা যাবে প্রত্যেকেই যুক্তি দিয়ে অর্থ দিয়ে দেখিয়ে দেবেন যে এই শ্লোক তাঁর মতকেই প্রতিষ্ঠিত করছে।

স্বামীজী নাসদীয়সূক্তমের এই লাইনের ব্যাখ্যা যেভাবে করেছেন তাতে চতুর্থ একটা তত্ত্ব দাঁড়িয়ে যায়। যদিও মায়া তত্ত্বের খুব কাছাকাছি, বলছেন - তিনি ছাড়া দ্বিতীয় কেউ নেই, তিনি আছেন আর তাঁর স্বভাব আছে, দ্বিতীয় আর কোন সত্তা এখানে নেই। পরের দিকে স্বামীজী একটা তত্ত্ব দাঁড় করালেন তাতে তিনি আকাশ আর প্রাণকে নিয়ে এলেন। তিনি এর অনুবাদ করে বলছেন The one breathed windlessly। পরবর্তি কালে স্বামীজী যখন বক্তৃতায় তাঁর অভিমত ব্যক্ত করছিলেন সেখানেও তিনি প্রায়ই নাসদীয়সূক্তের এই লাইন উল্লেখ করতেন। সচ্চিদানন্দ শুদ্ধ আত্মা, শুদ্ধ আত্মা ছাড়া আর কিছু নেই। এই যে শুদ্ধ চৈতন্য, কোন এক রহস্যময় কারণে তাঁর মাঝখানে যেন একটা বিভাজন রেখা এসে যায়, রেখার এই পারে যেন পদার্থ ও শক্তির জন্ম হয়ে যায়। মজার ব্যাপার হল তখনও আইনস্টাইনের জড় আর শক্তি অভেদ এই তত্ত্ব আবিষ্কার হয়নি, অথচ স্বামীজী বার বার বলছেন জড় আর শক্তি এক, দুটোর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। আসলে এটাই আমাদের প্রাচীন বৈদিক যুগের তত্ত্ব। এই জড়কেই আমাদের চিরাচরিত ভাষায় বলা হয় আকাশ, আমাদের মাথার উপরে যে আকাশ দেখি সেই আকাশের কথা কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে না। আকাশ হল যা কিছু জড় পদার্থ আছে তার অত্যন্ত সূক্ষ্ম অবস্থা। এই সূক্ষ্ম কণা সর্বত্রই আছে। যেখানেই আকাশ সেখানেই এই সূক্ষ্ম জড়কণা রয়েছে। যেখানেই space সেখানেই আকাশ থাকবে, তাই আকাশ বলতে আমরা যে space বুঝি, এতে কোন ভুল নেই। Particlesএর কখন অনুবাদ করা হয় Space Particles কখন Ether Particles আবার এগুলোর সংশয় থেকে বাঁচার জন্য সোজা আকাশও বলে দেন। আকাশ শব্দের এই ধরণের তত্ত্ব বা ধারণা যে হতে পারে এটা আর কোন দর্শনে নেই। বৈদিক ধারণায় আকাশকে যে অর্থে ব্যবহার করা হয় তাতে আকাশ না space না ঈথার। আকাশকে তাই আমরা আকাশ বলেই উল্লেখ করব যার অর্থ জড়ের অত্যন্ত সূক্ষ্ম অনু আর যাবতীয় যা কিছু আছে সবই এই আকাশ অনু থেকেই সৃষ্টি হয়। এই আকাশ থেকে একটা অন্য আকার নিচ্ছে যেটা আগেরটা থেকে একটা স্থুল, তার থেকে আরেকটা হতে হতে সব শেষে এই জগতের যা কিছু সব সৃষ্টি হয়েছে। যেখানেই space সেখানেই আকাশ আবার যেখানেই আকাশ সেখানেই space।

একটা বেলুনকে ফু দিয়ে বড় করলে বেলুনটা আয়তনে বাড়তে থাকে। যদি জিজ্ঞেস করা হয় বেলুনের ভেতরের আকাশটা কোথায় বাড়তে থাকে? তার উত্তর হবে আকাশে। আকাশ এখানে কিভাবে তৈরী হচ্ছে? বাতাস দিয়ে, বাতাস air particles। কিন্তু ফোলান বেলুনটি আকাশের ফাঁকা জায়গার মধ্যেই ফুলছে, এই আকাশের ক্ষেত্রে তা হয় না। একটা super space ছিল তার মধ্যে আরেকটা নতুন space তৈরী হয়েছে তা নয়। কিছুই ছিল না, যাই থাকুক এই মন দিয়ে সেটাকে ধরা যাবে না, কারণ ওটা মনের ধরা ছোঁয়ার বাইরে। এর কথাই আধুনিক ফিজিক্স বলছে। এখন ফিজিক্স বলছে একটা সময়ে এই আকাশের সৃষ্টি হয়েছিল, একই সময় আকাশ, সময় ও পদার্থ সৃষ্টি হয়েছে। আর এই তত্ত্বকেই নাসাদীয়সূক্তম্ বলতে চাইছে। কত সময়ের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে এই আকাশ, কাল আর পদার্থের? ফিজিক্স বলছে সেকেণ্ডকে যদি একের পিঠে কোটি কোটি শূন্য লাগিয়ে দেওয়ার পর যে সংখ্যা হবে সেই সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে যত সেকেণ্ড হবে সেই সময়টুকুর মধ্যে এই সৃষ্টি হয়েছে। এত দ্রুত পদ্ধতিতে হয়েছে যে তাকে ধারণা করা দূরে থাক, আমরা কল্পনাতেও আনতে পারব না।

যাই হোক, সৃষ্টির পর গোটা ব্রহ্মাণ্ড নিজেকে বিস্তার করতে থাকে। ব্রহ্মাণ্ড যে বিস্তার হচ্ছে, কোথায় বিস্তার হচ্ছে, কিসে বিস্তার করছে? বিজ্ঞানীদের কাছে এর উত্তর নেই। বিজ্ঞানীরা এখন অনেক হিসেব করে বলছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বাইরে কি আছে আমরা কি করে বলব। আর বেদে অনেক কাল আগেই বলে দিয়েছে এর আলোচনাই হবে না, কেউই বলতে পারবে না। এই প্রশ্ন তোলাই যাবে না। এই প্রশ্ন নিয়ে যদি তোমাকে চলতে হয় তাহলে তোমার জন্য এগুলো নয়, আর এর উত্তরও তুমি কোন দিন পাবে না।

স্বামীজী জড়কে আকাশ আর শক্তিকে প্রাণ বলে সম্বোধন করে বললেন এই প্রাণ বিভিন্ন ভাবে পরিবর্তিত হতে থাকল। আকাশ ও প্রাণ একই, এই দুটো পৃথক কোন কিছু নয়, যমজ ভাইয়ের মত। আকাশ ও প্রাণের একই সাথে উৎপত্তি হয়েছিল। উৎপত্তি হওয়ার পরে প্রাণ আকাশের উপরে আঘাত করতে থাকল, এটাই শক্তির ধর্ম। এটাই বলছে *আনীত অবাতং*, নিঃশ্বাস ছাড়তে শুরু করল। কিসের উপরে? আকাশের

উপরে। এটাকেই স্বামীজী বলছেন প্রাণ আকাশের উপরে আঘাত করতে শুরু করল। কোথা থেকে এল এই আকাশ ও প্রাণ? সেই চৈতন্য কোন এক প্রক্রিয়াতে এই আকাশ ও প্রাণে রূপান্তরিত হয়েছে। কি সেই প্রক্রিয়া? সেটাই আমরা কেউ জানিনা। বেদের ঋষিরা একে বলছেন *স্বধয়া*। এটাকেই কেউ মায়া বলছে, কেউ প্রকৃতি আবার কেউ শক্তি বলছে। শক্তি, প্রকৃতি বা মায়া কার? সেই চৈতন্যেরই। সেই চৈতন্য তাঁর শক্তিতে এই আকাশ ও প্রাণের সৃষ্টি করে দিলেন। সৃষ্টি হতেই প্রাণ আকাশের উপরে আঘাত হানতে শুরু করল আর তারপরেই এই জগতের সৃষ্টি হতে শুরু করে দিল। পদার্থ থাকলে সৃষ্টি হতে কত আর সময় লাগবে। এটাই সৃষ্টির ব্যাপারে ঋগ্বেদের বক্তব্য। *তদেকং*, তিনি একাই আছেন, এক ছাড়া দ্বিতীয় কেউ নেই। আর *স্বধয়াকে* যদি মায়া বলা হয় তাহলে যা কিছু দেখছি এগুলোকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় কারণ এটা মায়া। আর যদি স্বধয়াকে প্রকৃতি বলে, তাহলে এটাই তাঁর স্বভাব।

গীতার সপ্তম অধ্যায়ে ভগবান বলছেন – আমার দুটো প্রকৃতি – পরা প্রকৃতি আর অপরা প্রকৃতি। গীতাও নতুন কিছু বলছে না, বেদের এই তত্ত্বগুলিকেই বলা হচ্ছে। আকাশ ও প্রাণ স্বামীজীর খুব প্রিয় বিষয় ছিল। এই একটি লাইনের মাধ্যমে বেদ সমস্ত সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে বলে দিল। কেউ যদি বলে হিন্দু ধর্মে সৃষ্টির সম্বন্ধে কি কোন বিশ্লেষণ আছে? তখন এই লাইনটা বলে দিলেই হবে – *আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং*, বায়ু ব্যতিরেকেও তিনি প্রাণনক্রিয়া করছিলেন, আর তিনি নিজের মায়া বা প্রকৃতি বা শক্তির সাথে অভিন্ন হয়ে এই কার্য করছিলেন। এর বাইরে আর কোন প্রশ্ন করা যায় না। আপেক্ষিক জগতের মধ্যে থেকে অনন্তের চিন্তা করাই যায় না। ঠাকুর যেমন বলছেন – এক সের ঘটিতে কি পাঁচ সের দুধ ধরে। আমাদের এই এতটুকু বুদ্ধি, সেই বুদ্ধি দিয়ে আজকে ডালের সঙ্গে কি ভাজা খাব এই চিন্তাতেই আমাদের বুদ্ধি খরচ হয়ে যায় এরপর আবার সর্বব্যাপী অনন্ত চৈতন্যকে নিয়ে আলোচনা করতে চাইছি। আমাদের যতটুকু বুদ্ধি তাই দিয়েই এই স্বধয়াকে বিচার করব, যদি বলি সবই ঠাকুরের লীলা তখন স্বধয়ার মানে হয়ে যাবে শক্তি, আবার যদি তাঁর লীলাকে উড়িয়ে দিয়ে বলি, সব ফালতু, মিথ্যা, তখন হয়ে যাবে মায়া। আবার যদি বিজ্ঞান সম্মত ভাবে বিচার করে মীমাংসা করতে যাই তখন সাংখ্যের প্রকৃতি তত্ত্বের আশ্রয় নিতে হবে। তখন আবার প্রকৃতিকে বলবে ত্রিগুণাত্মিকা সত্ত্ব, রজ ও তম। সেই আকাশের উপরে প্রাণ আঘাত করতে সেখান থেকে বেরোল মহৎ, মহৎ থেকে এল অহঙ্কার, সেই অহঙ্কার থেকে বেরোবে সূক্ষ্ম তন্মাত্রা, সূক্ষ্ম তন্মাত্রা থেকে বেরোবে স্থূলভূত, স্থূলভূতের আবার পরস্পরে মিশ্রণ হতে থাকবে, মিশ্রণ হতে হতে ইলেক্ট্রন প্রোটনাদির সৃষ্টি হবে। সেইজন্য সাংখ্যবাদীদের কাছে সৃষ্টিটা মিথ্যা নয়, বাস্তব। ফিজিক্সের থিয়োরিগুলিও সাংখ্যযোগে খাপ খেয়ে যাবে কিন্তু একটা অবস্থার পর ফিজিক্স থেমে যাবে কিন্তু সাংখ্য ও যোগ থেমে থাকবে না, সে আরো এগিয়ে এগিয়ে যাবে।

তৎ ভগবানের একটি নাম, তাঁকে আকার ইঙ্গিতে বোঝানর জন্য বলছেন তৎ। *একম্* বলা মানে তিনি একাই ছিলেন। কাকে নির্দেশ করা বলা হচ্ছে তিনি একাই ছিলেন? তৎ, তাঁকে নির্দেশ করে বলা হচ্ছে। তার আগে বলা হয়েছিল *আনীদবাতং*, নিঃশ্বাস নিচ্ছিলেন না। এই একটা লাইনে এসে পুরো ব্যাপারটাতে যেন সাংখ্যের প্রকৃতিকে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন আমরা *একম্*কে পুরো ব্রহ্ম, মায়া ও জীবজগৎ বলছি বা শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর শক্তি ও জগতের ব্যাখ্যা করলাম, ঠিক তেমনি *একম্*কে চৈতন্য না বলে সবটাকে প্রকৃতি বলে দিলাম। *তদেকং*, সে একা, কে একা? প্রকৃতি। *অবাতং* নিঃশ্বাস নিচ্ছে না, *আনীদ* নিঃশ্বাস নিল, নড়ে চড়ে উঠল। এখন কেন প্রকৃতি নড়ে চড়ে উঠল সেটা অন্য জায়গার কথা। আমাদের যে ছটি দর্শন আছে তার মধ্যে সাংখ্য অন্যতম, সাংখ্যকে সমস্ত দর্শনের জননী বলা যেতে পারে। এখানে শুধু *একম্* বলছেন, কিন্তু বেদান্তে একম্এর সাথেই পরে বলা হবে একমেদ্বিতীয়ম্, তিনি এক আবার অদ্বিতীয়। এখন শুধু অদ্বিতীয় বললে মনে হবে তাঁর মধ্যে কিছু নেই, যাতে শূন্যের বোধ না হয় তাই একম্ বলা। আবার একম্ বলে দিলে একেশ্বরবাদের মত মনে হবে, তাই একেশ্বরবাদের বোধ না হওয়ার জন্য অদ্বিতীয় শব্দ নিয়ে আসা হয়। একম্ বা অদ্বিতীয় একটাতো হবে, তাহলে তো uncertainity এসে গেল। কিন্তু কখনই uncertain হবে না, কারণ একমাত্র ধ্যানের গভীরেই এটা জানা যায়। ধ্যানের গভীরে বোধে বোধ হয় বলে যুক্তিতর্ক দিয়ে, শাস্ত্র পড়ে এটাকে বোঝা যায় না। বোঝাবার জন্য এনারা একদিকে নেতি নেতি পদ্ধতি নিচ্ছেন আবার কখন ইতিবাচক পদ্ধতিতে

বলছেন, ইতিবাচক যা বলছেন সেটাও ঠিক ঠিক ইতিবাচক নয়, কারণ সেটাকেও এনারা আকার-ইঙ্গিতে বলছেন। আকার-ইঙ্গিতে বলতে গিয়েও বিপরীত ভাব নিচ্ছেন, *আনীদবাতম্*। এখানে তাই মনে করার কোন অবকাশ নেই যে তিনি আলাদা। আর তাঁকে আকার ইঙ্গিতে জানা যায় তাই তৎ শব্দটা ব্যবহার করলেন। আসলে বলতে চাইছেন তুমি যদি সমাধির গভীরে চলে যাও তুমিও সব জানতে পারবে। তোমাকে আমরা একটা ছোট্ট আইডিয়া দিয়ে দিলাম, এর বেশি কিছু বলা যাবে না। এর বেশি কিছু বলতে গেলে ঈশ্বরকে পরিভাষিত করা হয়ে যাবে। ঈশ্বরকে পরিভাষিত করে দিলেই ঈশ্বরের নাম রূপে এসে যাবে, যে ঈশ্বরের নাম রূপ এসে গেল সেই ঈশ্বর আর কিসের ঈশ্বর।

সাংখ্য মতে প্রকৃতিতে একটার পর একটা বিবর্তন হতে থাকে। পুরুষ সব সময় নির্বিকার কিন্তু প্রকৃতির খেলা দেখতে দেখতে সে মুগ্ধ হয়ে যায়। পুরুষ প্রকৃতির খেলা দেখতে থাকে আর প্রকৃতিও পুরুষকে যত রকমের খেলা দেখানোর আছে সেও নানা খেলা দেখাতে থাকে। তারপর পুরুষ একটা সময় বলে আমার আর খেলা দেখতে ইচ্ছে করছে না, আমার কিছুতেই কোন প্রয়োজন নেই, তখন প্রকৃতি পুরুষকে ছেড়ে দেয়, প্রকৃতি আবার জড় হয়ে শুয়ে পড়ে। সাংখ্য মতে সংক্ষেপে এটাই সৃষ্টির ব্যাখ্যা। এখানে যে বলছে *আনীদবাতং স্বধয়া*, মানে সে এখন নিজের প্রকৃতিতে পড়ে আছে, *অবাতং* নিঃশ্বাস নিচ্ছে না, জড় হয়ে পড়ে আছে, *আনীদ*, হঠাৎ চাঙ্গা হয়ে নড়ে চড়ে উঠল, যে নিঃশ্বাস নিচ্ছিল না সে নিঃশ্বাস নিয়ে নিল। মানে সৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। এই একটা লাইনের অর্দ্ধাংশ ভারতের সমস্ত দর্শনের চাবিকাঠি, শুধু সে কিভাবে ব্যাখ্যা করবে আর সেই ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করে বলে দেওয়া যাবে সে কোন্ দর্শনের কথা বলতে চাইছে। যে কোন দর্শনকে সৃষ্টির তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতেই হবে। আর সৃষ্টির কথা বলতে গেলে '*আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং*' এই বাক্যের ব্যাখ্যা করতে হবে। প্রথম কথা মনে রাখতে হবে দুটো আলাদা সত্তা নেই, প্রথমে দুই আছে বলা যাবে না। *স্বধয়া তদেকং*, নিজে থেকেই হবে ওর বাইরে থেকে কিছু হবে না, বাইরে থেকে কেউ এসে মনে করিয়ে দিল আর নিঃশ্বাস নিতে আরম্ভ করবে, তা কখন হবে না। আকাশ ও প্রাণকে থাকতে হবে অথচ সমগ্র ব্যাপারটাই একের খেলা। ভগবান এসে মাটির ঢেলা দিয়ে মানুষ তৈরী করলেন মানে ভগবান ও মাটি দুটো আলাদা জিনিস, এগুলো বাচ্চাদের কল্পনা, অবশ্য কোন কোন ধর্মে সৃষ্টি এভাবেই হয় বলে মনে করা হয়। কিন্তু ভারতীয় দর্শনে এই ধরণের তত্ত্ব কখনই গ্রাহ্য হবে না। তাহলে দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত এরা কি করে ব্যাখ্যা করছে? বুদ্ধি দিয়ে এরা নিজেদের মত করে ব্যাখ্যা করে দেবে। কিন্তু নাসদীয়সূক্তমে সৃষ্টির ব্যাপারে এটাই জটিল তত্ত্বের সংজ্ঞা, বিশেষ করে আমরা যে সৃষ্টি তত্ত্বের কথা আলোচনা করছি তার মূল বক্তব্যই এটা – *আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং*। এই একটি লাইন একাধারে বলে দিচ্ছে প্রকৃতি একটা একটা করে কিভাবে নিজেকে বিস্তার করছে, আবার বলে দিচ্ছে ব্রহ্ম তাঁর মায়াকে আশ্রয় করে কিভাবে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করছে, সৃষ্টিকে আমরা সত্য বলেও মনে করতে পারি আবার মিথ্যা বলেও উড়িয়ে দিতে পারি তাতে কিছু যায় আসে না। আবার এই লাইনকেই শিব আর শক্তির খেলা বলে গ্রহণ করতে পারি। যেভাবেই সৃষ্টিকে নিই না কেন *আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং* এই তিনটে শব্দ দিয়ে ব্যাখ্যা করে দেওয়া যেতে পারে।

তারপরেই বলছেন *তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিং চনাস*, তিনি ছাড়া আর কিছু ছিল না। একের পারে আর কোন যে সত্তা থাকতে পারে এই তত্ত্বকে এখানে সম্পূর্ণ ভাবে নস্যাৎ করা হল। যদি শুধু শক্তিকেও নিই তাহলেও কিন্তু শিব এসে যাবেন আর ভগবান শিব আর তাঁর শক্তি আলাদা কিছু নয়। ঠাকুর বলছেন – অগ্নি আর তার দাহিকা শক্তি, দুধ আর তার ধবলত্ব এরা কেউ আলাদা নয়। আমাদের মত সাধারণ মানুষ, যাদের কাছে দর্শনের তত্ত্ব দুর্বোধ্য মনে হয়, তারা বলেন শিব আছেন আর তাঁর শক্তি আছে, এঁরা দুজনে মিলে সৃষ্টির খেলা শুরু করে দেন। কিন্তু শিব আর শক্তি অভেদ, তন্ত্রেও বলছে সচ্চিদানন্দেকম্, সেই সচ্চিদানন্দই আছেন।

সায়নাচার্য ছিলেন ঘোর অদ্বৈতবাদী, এখানে এসে তিনি সাংখ্য মতকে তীব্র আক্রমণ করে বলছেন – সাংখ্য বলে কোন দর্শন হতেই পারে না। তিনি বলছেন – সৃষ্টির আগে নিজেকে যে আশ্রয় করে আছে, এখানে প্রকৃতি কাকে আশ্রয় করে আছে? কাউকেই প্রকৃতি আশ্রয় করে নেই, তাই সাংখ্য দর্শন বলে দর্শন হতেই পারে

না। কিন্তু সাংখ্যবাদীরা এর উত্তরে বলে – সে নিজেকে আশ্রয় করে আছে আকাশ ও প্রাণ পরস্পর আশ্রয় করে আছে, সমস্ত কিছু প্রকৃতিকেই আশ্রয় করে আছে।

বিজ্ঞান সৃষ্টির কথা বলতে গিয়ে বিগব্যাঙ আর ব্ল্যাকহোলের কথা বলে। বিগব্যাঙ মহাজাগতিক বিস্ফোরণের পর সৃষ্টির বিস্তার, আর ব্ল্যাকহোল হল প্রলয়ের পর সৃষ্টি সঙ্কুচিত হতে হতে একটা পয়েন্টে গিয়ে দাঁড়িয়ে যায়। বিগব্যাঙ এর প্রবক্তারা এই তত্ত্বকে গাণিতিক নিয়মে হিসেব করেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যখন সঙ্কুচিত হতে থাকে তখন এনার্জি তাকে ধরে থাকে, আর প্রত্যেক পদার্থ একে অপরকে টানে, টানতে টানতে ছোট হতে থাকে। ছোট হতে হতে একটা বিন্দুর মত আকৃতিতে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড সঙ্কুচিত হয়ে যায়, কারণ পদার্থ এত চাপতে থাকে যার ফলে এত ঘনত্ব বেড়ে যায় যে কল্পনাই করা যায় না, আলোও সেখান থেকে বেরোতে পারে না। এরই বিভিন্ন অবস্থায় অনেক রকম নাম হয়ে থাকে, কখন হোয়াইট স্টার, কখন রেড স্টার, কখন ব্ল্যাকহোল ইত্যাদি। একটা জিনিসের উপর যত চাপ পড়বে তত তার তাপ মাত্রা বাড়তে থাকবে। তাপমান একটা অবস্থা পর্যন্ত সহ্য করবে তারপরে সে বুম্ করে ফেটে পড়বে। যখন ফাটছে তখন এটাকে বলছে বিগব্যাঙ। তারপর বিস্তার হতে হতে যখন এনার্জি শেষ হয়ে যাবে তখন আবার সঙ্কুচিত হতে থাকে। সঙ্কুচিত হতে হতে ব্রহ্মাণ্ড যখন একটা বিন্দুর আকার ধারণ করছে তখন দূরত্বের পরিমাপ শূন্য হয়ে যায়। দূরত্ব যখন শূন্য হয়ে যায় তখন তার রেজাল্ট হয়ে যায় অনন্ত। সেইজন্য বিজ্ঞানীরা বলে একটা সীমার পর কি হয় আমরা বলতে পারব না। ফিজিক্সে এর নাম পয়েন্ট অফ সিঙ্গুলারিটি। এই পয়েন্টের আগে কি হয় বিজ্ঞান বলতে পারেনা। ঠিক এই কথাই নাসদীয়সূক্তমের শেষের দিকে বলছে – *যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্ সো অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ*। যিনি অধ্যক্ষ, অর্থাৎ ভগবান তিনিও এই সৃষ্টির কার্য জানেন কি জানেন না আমাদের জানা নেই। ঋষিরাও এই কথা বলছেন, কারণ যা আছে সেটা মুখে বলা যাবে না। বিজ্ঞানীরা কেন বলতে পারছে না? কারণ সমস্ত গাণিতিক নিয়ম, ফিজিক্সের নিয়ম, নিউটনের থিয়োরি, আইনস্টাইনের থিয়োরি, কোয়ন্টাম থিয়োরি সব এখানে এসে হারিয়ে যাচ্ছে, ভেঙ্গে পড়ছে। তাই বলে কি আমরা বলতে পারি যে বিজ্ঞানের সমস্ত নিয়ম অযৌক্তিক যেহেতু এদের কোন নিয়মই এখানে এসে দাঁড়াতে পারছে না। কখনই তা বলা যাবে না। কারণ সবারই একটা সীমা আছে, সবারই সীমিত ক্ষমতা। ঐ ক্ষমতার বাইরে এরা কখনই যেতে পারেনা।

সৃষ্টির সময় কি ছিল সেটা কে বলবে? কারণ দেখার জন্য তখন সেখানে কেউ ছিল না। একটা অবস্থার পর মন বুদ্ধি কোন কাজ করবে না, যেখানে এসে বিজ্ঞানের সব থিয়োরি, নিয়ম ভেঙ্গে যায়। এই জায়গার কথাই বলছেন তখন মৃত্যু ছিল না, অমৃত ছিল না, তখন দিনও ছিল না রাতও ছিল না। কিন্তু একটা কিছু ছিল, তাই *তদেকম্* বলছেন, একটা কিছু ছিল না বললে বলতে হবে শূন্য থেকে সব সৃষ্টি হয়েছে। সেই এক কিন্তু একজন সত্তা রূপে বলা হচ্ছে না, এই এক সৎ ও অসতের পারে অবস্থান করেছিলেন। যে মুহূর্তে তাকে সৎ বলব তখন আর জগতের আধ্যাত্মিক সত্তা থাকবে না, জগৎ হয়ে যাবে পদার্থ সর্বস্ব ব্রহ্মাণ্ড, যে কথা বিজ্ঞান সব সময় বলছে। যদি বলি তিনি অসৎ অবস্থাতে অবস্থান করেছিলেন তাহলে তখন বৌদ্ধদের শূন্যবাদ এসে যাবে। তখন বলতে হবে শূন্য থেকে এই জগতের সৃষ্টি হয়েছে, যেটাকে হিন্দু দর্শন কখনই সমর্থন করবে না, কারণ শূন্য থেকে কিছুই হতে পারেনা, সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। এটাই হিন্দুধর্মের স্বীকৃত সৃষ্টিতত্ত্ব। যদিও খ্রীশ্চান ও ইসলাম ধর্মে ভগবান সৃষ্টি করলেন কিন্তু এদের যাঁরা অতিন্দ্রীয়বাদী সাধক তাঁরাও সৃষ্টি তত্ত্বের কথা বলার সময় এই ভাষাতেই কথা বলেন। আবার রাজযোগের সাধকও একটা অবস্থায় দেখেন মন কিভাবে নিজেকে পরিষ্কার আলাদা করে নিতে পারে। স্থুল ভূত থেকে সূক্ষ্ম ভূত সেখান থেকে ক্ষুদ্র মন আর বিশ্ব মনের পার্থক্য স্পষ্ট দেখতে পান। পরিষ্কার দেখতে পান এক বিরাট পুরুষই একমাত্র আছেন। কোন মনের কল্পনাতে দেখেন তা নয়, পরিষ্কার ও স্পষ্টত দেখতে পান। কিন্তু ভাষায় বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁরা আর বর্ণনা করতে পারেন না। যার ফলে মহম্মদ এক রকম বলছেন, যীশু আরেক রকম বলছেন আবার শ্রীরামকৃষ্ণ আরেক রকম ভাবে বলছেন। কিন্তু খুব গভীরে গিয়ে বোঝার চেষ্টা করলে বোঝা যায় সবাই সেই একই জিনিসকে বোঝাতে চাইছেন। *তদেকম্*কে যদি বলে দেন এটাই ছিল তখন আর সেটা হিন্দুধর্ম থাকবে না, গোঁড়া বৈষ্ণব হয়ে যাবে অথবা গোঁড়া ইসলাম ধর্ম হয়ে যাবে। কিন্তু এই এককে আমরা নির্গুণ ব্রহ্ম বা সগুণ ব্রহ্ম বলতে পারি আবার

জড় প্রকৃতিও বলতে পারি। সব থেকে বড় কথা কি ছিল মুখে বলা যায় না। বোবাকে মিষ্টি খাইয়ে জিজ্ঞেস করছে, কিহে মিষ্টি কেমন লাগছে? বোবাও আকার ইঙ্গিতে বোঝাতে চাইবে, কেননা মুখ দিয়ে তার কথা বেরোবে না। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনেই আমরা এই ধরণের ঘটনা পাই। তিনি ভক্তদের বলছেন – আজ তোদের আমি সব ফাঁস করে দেব। কিন্তু তারপরেই বলছেন – আমার মুখ যেন কে চেপে ধরছে, বলতে দিচ্ছে না।

পোল ভোল্টে একটা লম্বা লাঠি নিয়ে দৌড়ে এসে একটা উঁচু বাধাকে অতিক্রম করতে হয়। লাঠিটা না থাকলে অত উঁচু বাধাকে সে অতিক্রম করতে পারবে না। আবার শেষ মুহুর্তে লাঠিকে না ছেড়ে দিলে বাধাটা ডিঙোতে পারবে না। মন আর ঈশ্বরের মধ্যেও ঠিক এই সম্পর্ক। মন লাঠির মত আর ভগবান এই মায়া রেখার পারে। মনের সাহায্যে আমরা দৌড় মারছি ঐ মায়ার দড়িকে অতিক্রম করতে। মন যার সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, তার এখন সময় হয়ে গেছে লাফ মারার, কিন্তু তখনও যদি মনকে ধরে রাখে তাহলে মায়ার জগতেই সে থেকে যাব। লাঠি যদি ছেড়ে না দেয় ঐ দড়িকে কোন দিন অতিক্রম করতে পারবে না।

আকাশের দিকে তাক করে গুলি ছুড়লে কিছু দূর গিয়ে আবার পৃথিবীর বুকে গুলিটা ফিরে আসবে। কিন্তু যদি এসকেপ ভেলোসিটি, মানে প্রতি সেকেণ্ডে সাত কিলোমিটার গতিতে রকেট ছাড়া হয় তাহলেই সে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে অতিক্রম করতে পারবে। যে রকেটকে চাঁদে পাঠানো হয় তাতে মোটামুটি প্রতি সেকেণ্ডে এগারো কিলো মিটার গতিতে ছাড়া হয়। যদি সাত কিলো মিটারের সামান্য একটু কম থাকে তাহলে রকেট ঘুরে আবার পৃথিবীতে চলে আসবে। মনকে ধরে রেখে আমরা যতই সাধনা করি না কেন, আমরা সেই মায়ার রাজ্যেই ফেরত চলে আসব। এর সব থেকে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হল শ্রীরামকৃষ্ণ যখন অদ্বৈত সাধনা করছিলেন তখন ঘুরে ঘুরে তাঁর সামনে মাকালী এসে যাচ্ছেন। কারণ মাকালী মায়ার রাজ্যে মনের মধ্যে গেঁথে আছে, শুধু মাকালীই নন, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাম যাই বলুন সবই মনের জগতের রাজা। যদি এই মনকেও অতিক্রম করতে হয় তাহলে মাকালীকেও জ্ঞান অসি দিয়ে খণ্ডিত করে দিতে হবে। অত্যন্ত সূক্ষ্ম বুদ্ধি না হলে এসব জিনিস ধারণা করা খুব কঠিন।

তম আসীত্তমসা গূঢ়মগ্রেঽপ্রকেতং সলিলং সর্বমা ইদং।
তুচ্ছ্যেনাভ্বপিহিতং যদাসীত্তপসস্তন্মহিনাজায়তৈকম্।।৩।।

আরও এক জটিল তত্ত্বে ঢুকে যাচ্ছেন। তৃতীয় মন্ত্রে সৃষ্টির ব্যাপারে যা কিছু হতে পারে সব বলছেন। সৃষ্টির সময় ঠিক কি হয়েছিল আমাদের জানার কোন উপায় নেই, পরে এটাই আবার বলবেন। কিন্তু ঋষিরা এই জিনিসটাকে নিয়ে এক গভীর চিন্তনে ঢুকে গেলেন। গভীর চিন্তনে কি হয়, চিন্তনের পদ্ধতিটা কি, চিন্তন জিনিসটা কি আমাদের একটু জানা দরকার। আমাদের কাছে চিন্তন মানে এটা থেকে সেটা, সেটা থেকে এটা, অনেকটা programming type। কিন্তু যে কোন সমস্যার সমাধান চিন্তনের মাধ্যমে একমাত্র নেতি নেতি পদ্ধতিতে আসে। নেতি নেতি মানে এটা নয়, সেটা নয়। বাচ্চাদের যে শেখানো হয় দুই যোগ দুই সমান চার, এটা হল programmingএর ভাষা। কিন্তু সমস্যাকে নিয়ে যখন অনেক গভীরে যাবে তখন যে জিনিসগুলো সম্ভব নয় সেগুলোকে বাদ দেওয়া হয়। নিউক্লিয়ার ফিজিক্সে ফাইনম্যান ডায়াগ্রাম বলে একটা থিয়োরী আছে। ফাইনম্যান ডায়াগ্রামে বলে একটা ইলেক্ট্রন পার্টিকেল একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গায় যখন যাবে তখন সে কিভাবে যাবে। বলছেন, তখন সে সম্ভবনার পথ (probabilistic theory) নেয়। এভাবে বেঁকে যাবে তারও সম্ভবনা আছে আবার সেভাবে বেঁকে যাওয়ারও সম্ভবনা আছে। এরপর সব সম্ভবনাকে যোগ করার পর canceling করা শুরু হয়। Canceling হতে হতে শেষ পর্যন্ত সব probabilityকে যোগ করে দেওয়ার পর সোজা পথ এটাই থাকবে। আমরা বলছি একটা জিনিস সব সময় সোজা পথে যায়, আসলে straight পথে যায় না, সব পথই নেয়। Probabilistic theoryতে যখন যায় তখন সব probabilityকে যোগ করার পর দেখা যায় জিনিসটা এই পথটাই নেয়। সমস্যা হল বাচ্চা বয়স থেকে programming যেভাবে চলে সেই ভাবে ট্রেনিং দেওয়া হয়। আর্যভট্ট, ভাস্করাদির মত ঋষিতুল্য গণিতজ্ঞরা অনেক কাল আগে দুই যোগ দুই চার হবে তৈরী করে দিয়ে গেছেন। আমরা এটা মুখস্ত করছি বলে মনে হবে programming হচ্ছে। কিন্তু

প্রথম যখন এটা নিয়ে চিন্তন হয় তখন নেতি নেতি পদ্ধতিতেই চিন্তন হয়। সত্যিকারের লেখক যখন কিছু লেখেন তখন তাঁর কাছে শত শত শব্দ শত শত চিন্তা আসতে থাকে। আসবেই, কারণ মস্তিষ্কের এটাই কাজ। তখন তাঁকে শব্দ আর চিন্তাকে এক এক করে বাদ দিয়ে দিয়ে এগিয়ে যেতে হয়। বাদ দিতে দিতে যেটা থেকে যায় সেটাই তাঁর আসল লেখা হয়ে বেরিয়ে আসে। নতুন চিন্তনের ক্ষেত্রে এই কথা বলা হচ্ছে, নতুন কোন চিন্তন সব সময় নেতি নেতি পদ্ধতিতে হয়ে থাকে। বেদান্তের যে নেতি নেতি সাধনা পদ্ধতি, সেটাও এই কারণে। অন্বেষণ কার্য সব সময় নেতি নেতিতে চলে। রিসার্চ মানেই নেগেটিভ জিনিসকে ফেলে দেওয়া। ফেলতে ফেলতে যদি কোনটাই না থাকে, তখন হাত তুলে বলে দেয় এখানে কোন সমাধানের উপায় নেই।

নাসদীয়সূক্তও নেতি নেতি পদ্ধতিতে বলছেন। এখন আমরা বলতে পারি, কে না জানে সৃষ্টি কিভাবে হয়! একটা পুরুষের শরীর আছে আর একটা নারীর শরীর আছে, দুটো শরীরের মিলন হয়ে গেল, সেখান থেকে একটা সৃষ্টি হয়ে গেল। এটা না বোঝার তো কিছু নেই, এর জন্য এত কিছু থিয়োরীর কি দরকার! শিব আছেন আর পার্বতী আছেন, শিব আর শক্তির মিলন হয়ে গেল সৃষ্টিও শুরু হয়ে গেল। এগুলোই হল সাধারণ মানুষের ধর্ম। কিন্তু মূল আধ্যাত্মিক দর্শন কখনই দুটো সত্তাকে মানবে না। ঋষিরা আধ্যাত্মিক অনুভূতির শেষ অবস্থায় সব সময় এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দের সত্তাকে প্রত্যক্ষ করেছেন। দুটো সত্তা মেনে নিলে ঋষিদের আধ্যাত্মিক অনুভূতির বিরোধী হয়ে যাবে। ঠাকুরও বলছেন এক বই দুই নাই, অদ্বৈতম্। তাহলে সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ থেকে বহু এলো কোথা থেকে? এবার আমরা নেতি নেতি শুরু করে দিলাম। নেতি নেতি শুরু করার পর একটা একটা করে সব তত্ত্ব কেটে বেরিয়ে যাবে, শিব আর শক্তির তত্ত্ব কেটে যাবে, নারী পুরুষ মিলনের থিয়োরী কেটে যাবে, চৈতন্য আর জড়ের চিজ্জড়গ্রন্থির তত্ত্বও টিকছে না। তাহলে কি থাকবে? এটাই খুবই সহজ ব্যাপার, কোথাও কোন জটিলতা নেই। সমস্যা হল আমরা মরে যাব তবুও আমরা একটু চিন্তা করতে চাই না। ফাঁকা থাকলে আমরা কাজ খুঁজে বেড়াই, চুপচাপ যাতে বসে থাকতে না হয়। ফাঁকা থাকার জন্যই তো ব্রাহ্মণরা সব কিছু ত্যাগ করে দিলেন, যাতে গভীরে গিয়ে মনন চিন্তন করতে পারেন। আসল কথা চিন্তন করার ক্ষমতাই মানুষের নেই। যেমনি চিন্তন করতে যান তখন দেখেন – তাই তো! এগুলো তো কখনই সম্ভব নয়। জীবনের ব্যাপারে যা কিছু জেনেছি সবটাই তো এত দিন ভুল জেনে এসেছি।

চিন্তন করতে করতে এক গভীর অবস্থায় গিয়ে দেখলেন *তম আসীত্তমসা* – তখন অন্ধকার ছিল। অন্ধকার কোথায় ছিল? ঐ অন্ধকারের মধ্যেই ছিল। স্বামীজী বলছেন এটাই সত্যিকারের কাব্য। তিনি অনুবাদ করছেন – At first there was only darkness wrapped in darkness, মানে অন্ধকার অন্ধকারে ঢাকা, এমন অন্ধকার যে মনে হয় অন্ধকার অন্ধকারকে ঢেকে দিয়েছে। অন্ধকারের আমরা অনেক রকম বিশেষণ প্রয়োগ করি, ঘুঁটঘুঁটে অন্ধকার, কালো অন্ধকার, আলকাতরার মত অন্ধকার, কালিদাস বলছেন সূচীভেদ্য অন্ধকার, এমন ঘন অন্ধকার যে ছুঁচ দিয়ে তাকে ছিদ্র করা যায় না। ঋগ্বেদ বলছে – এমন অন্ধকার যে অন্ধকার অন্ধকারে ঢাকা। যদি কোন ভাবে অন্ধকারের একটা আস্তরণ তুলে নেওয়া যায় তাহলে সেই অন্ধকারই আবার চলে আসবে। ঐ আস্তরণকেও যদি তুলে দেওয়া যায় আবার অন্ধকার এসে যাবে। এই ভাবে কত দূর পর্যন্ত অন্ধকার বিস্তৃত হয়ে আছে? শেষ পর্যন্ত। *তমঃ আসীত্তমসা অগ্রে*, প্রথমে কি ছিল? তমসা, অন্ধকারই ছিল। অন্ধকার ছিল মানে, তখন ওখানে কি ছিল জানার কোন পথ নেই। তার থেকে আরও গুরুত্বপূর্ণ হল, ওখানে কোন কিছু নেই যেটাকে চিন্তা ভাবনা করে বার করবে। পুরোটাকে যদি গভীর ভাবে চিন্তা করে বলা হয় তখন হয়ত বলবে, যা কিছু আছে সবটাই একেবারে পুরো ঘনীভূত রূপে জমাট হয়ে আছে। কিন্তু ওই ঘনীভূত হয়ে যা আছে তা হল আলোর অভাব। আলোর অভাব না বলে আমরা এর উল্টোটাও বলতে পারি, একটা আলোর পুঞ্জ বিস্তার হতে হতে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আলোকিত হয়েছে, এটাই তমস। কিন্তু সৃষ্টি সচ্চিদানন্দ থেকে হয়েছে তাই আমরা বলতে পারি না যে একটা আলোর কণা বাড়তে লাগল, বাড়তে বাড়তে আজকে যে আলো দেখছি সেই আলোতে এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এখানে বলছেন *তম আসীত্তমসা গূঢ়মগ্রে*, সৃষ্টির অগ্রে ঘনীভূত অন্ধকার ছিল, অন্ধকার অন্ধকারে আবৃত ছিল। সচ্চিদানন্দ জ্ঞানের সমুদ্র, জ্ঞানের সমুদ্র মানে আলোর সমুদ্র। অন্ধকার কেন বলা হচ্ছে? কারণ যদি আমরা বলি সচ্চিদানন্দ জ্ঞানস্বরূপ, আলোস্বরূপ,

সচ্চিদানন্দের আলো থেকে আলো বড় হয়ে গেল, তাহলে তো আমাদের কাছে সব কিছু পরিষ্কার হয়ে গেল সৃষ্টি কিভাবে এলো। এটাই মায়া, যিনি সচ্চিদানন্দ, যিনি জ্ঞানস্বরূপ তাঁকে এবার মায়া ঘিরে নিয়েছে। মায়া বলে কিছু আছে নাকি? কিন্তু না, মায়া তাঁরই স্বরূপ। তাই না, অজ্ঞানের এই আবরণ কোন ক্ষীণ আবরণ নয়, একেবারে স্তরের পর স্তর অজ্ঞান অন্ধকারে আবৃত্ত, *তম আসীত্তমসা গূঢ়মগ্রে*।

এই জায়গাতে ভাষ্যকার এর একটা ব্যাখ্যা দিয়ে বলছেন, আত্মতত্ত্ব, আত্মার স্বরূপকে পঞ্চকোষের আবরণ দিয়ে ঢেকে রেখেছে। এই আবরণগুলি কি? শুদ্ধ আত্মার উপর এই পাঁচটি আবরণ পড়ে আছে, প্রথম আবরণ অন্নময় কোষ। এইভাবে পর পর আসে প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ আর আনন্দময় কোষ। এরা এমন ভাবে একটার উপর একটা চেপে আত্মার আলোকে ঢেকে রেখেছে যে ভেতরে আলো থাকলেও জানার কোন উপায় নেই। তাই ঋষি বলছেন – *তম আসীত্তমসা গূঢ়মগ্রে*। আত্মার উপর আচ্ছাদন, আচ্ছাদন মানে অজ্ঞান। অজ্ঞান মানে নাম আর রূপ। নাম আর রূপই ঘোরতম অজ্ঞান। সবারই নাম আর রূপ যদি সরিয়ে দেওয়া হয় তাহলে আমরা সবাই মানুষ রূপে পরিচিত হব।

কিন্তু ঋষি বলতে চাইছেন আমরা জানি না সৃষ্টি কিভাবে হল। সেইজন্য এখানে অন্ধকারের উপমা নিয়ে বলছেন। স্বামীজী তমসকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এক জায়গায় বলছেন – আমাদের দেশে কালবৈশাখীর ঝড় হয়। পরিষ্কার আকাশ, কোথাও কোন মেঘ নেই। হঠাৎ আকাশের এক কোণে এক টুকরো কালো মেঘ দেখা গেল। কিছুক্ষণের মধ্যে পুরো আকাশ কালো মেঘে ঢেকে গেল, বিদ্যুতের কড়কড়ানি শুরু হয়ে গেল, তারপর প্রচণ্ড বেগে ঝড় ধেয়ে এল। কিছুক্ষণ পর আকাশ আবার পরিষ্কার হয়ে গেল। সচ্চিদানন্দ আকাশের মত পরিষ্কার, কোথাও কিছু নেই। হঠাৎ সচ্চিদানন্দের শক্তিতে তাঁর উপর একটা কালো মেঘ দেখা দিল, সেই মেঘ থেকে সৃষ্টির মত অনেক কিছু হয়ে গেল। এরপর সৃষ্টি লয় হয়ে আবার সচ্চিদানন্দ পরিষ্কার হয়ে গেল। দুদিন পর আবার কোথা থেকে একটা কালো মেঘ এসে ঝড়-বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। স্বামীজী বলছেন যে দেশের প্রকৃতিতে এই রকম কালবৈশাখী হয় তারা এই উপমাই ব্যবহার করবে। স্বামীজী যেটা বলছেন এটা উপমা আর *তম আসীত্তমসা গূঢ়মগ্রে* এটাও উপমা কিন্তু আক্ষরিক উপমা। এখানে অজ্ঞানতমকে দেখাতে চাইছেন। কালবৈশাখীর মত প্রাকৃতিক লীলা যারা দেখেছে তারা ওটাকে অজ্ঞানতমের উপমার জন্য দেখাবেন, আলোর ব্যাপারটা তারা কখনই নেবে না। কারণ সৃষ্টির আগে কি ছিল আর কিভাবে সৃষ্টি হচ্ছে জানা নেই।

এই অজ্ঞান তাহলে কোথা থেকে এলো? ভাষ্যকার বলছেন অগ্রে কাম ছিল, সেই কাম থেকে এসেছে। কোন বাসনা আর প্রচেষ্টা যদি না থাকে কাজ হবে না। ভগবান যখন কাজ করেন, জীবনমুক্ত পুরুষ যখন কাজ করেন তখন তাঁদেরও ইচ্ছা থাকে। গীতায় আচার্য শঙ্কর বলছেন *ভূতানুজিঘৃক্ষয়া*, সমস্ত প্রাণীকুলের মঙ্গল হোক। ইচ্ছা আর প্রয়োজন দুটো আলাদা। আমি তোমার মঙ্গল চাইছি, এটা হল ইচ্ছা, প্রয়োজন মানে আমার নিজের কোন দরকার আছে, সেইজন্য আগে আচার্য বলছেন *স্বপ্রয়োজনাভাবেহপি*, ভগবান যখন কাজ করেন তখন সেখানে নিজের প্রয়োজনের অভাব থাকে। আমি অপূর্ণ, আমার অভাব আছে সেইজন্য আমি কাজ করছি, আর যিনি পূর্ণকাম তাঁর কোন কিছুই লাগবে না, কিন্তু অপরের অপূর্ণতা পূর্ণ করার জন্য আমি কাজ করছি। এর বাইরে যারাই বলে আমার কোন প্রয়োজন নেই কিন্তু তাও কাজ করে যাচ্ছি এরা সবাই হয় পাগল নয়তো ভণ্ড। একমাত্র পাগলই বিনা প্রয়োজনে কাজ করে। এক পাগল সকাল থেকে সে রাস্তায় পড়ে থাকা মাটির ভাড়গুলি একটা ডাণ্ডা দিয়ে ভেঙে বেড়াত, সারাটা দিন খুড়িই ভেঙে যাচ্ছে। বিকেল হয়ে গেলে সে পরিশ্রান্ত হয়ে বলত – মা! এত কাজ আর তো পারি না! আমরা যদি বিচার করি সারাদিন আমরা তাই করে যাচ্ছি আর বলছি – আর পারি না, কত কাজ! সংসারে আমরা সবাই মাটির খুড়ি ভেঙে যাচ্ছি। পুত্র, মিত্র, স্বামী, পরিজনদের সেবা করা এগুলো খুড়ি ভাঙা ছাড়া কিছু নয়। ভগবান তো আমাদের মত পাগল নন যে অকারণে শুধু সৃষ্টির কার্য করে বেড়াচ্ছেন! এটাকে আটকে দিয়ে ভাষ্যকার বলছেন, অগ্রে কাম আছে। ভগবানের আবার কিসের কাম? *আপ্তকামস্য কা স্পৃহা?* যিনি আপ্তকাম, যিনি পূর্ণকাম তাঁর আবার কিসের স্পৃহা? তখন উপনিষদে বলছেন *একোহহম্ বহুস্যাম্ প্রজায়ামি*, আমি এক আমি বহু হব। গভীর ভাবে চিন্তা করলে এ ছাড়া আর কোন উত্তর আসে না। সচ্চিদানন্দের অবস্থায় যে আনন্দের অনুভূতি আমাদের পক্ষে কল্পনাই করা সম্ভব নয়। আর ঠাকুর

যদি অবতার হয়ে না আসতেন তাহলে আমরা কোন দিন জানতে পারতাম না, জ্ঞান মানে কি। ধর্ম বলতে আমরা ভগবান বুদ্ধের যে ধারণা সেটাই জানতাম, জগতে শুধুই দুঃখ, এই দুঃখ নিবারণের জন্যই ধর্ম। মনে হাজার রকম ইচ্ছা আছে, ইচ্ছা পূরণের জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি। এর বাইরে অন্য একটা যে দিক আছে সেদিকে আমাদের কেউ দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেননি, সেটা হল অসীম আনন্দ। ঈশ্বরকে কেন ভালোবাসব? কারণ তাঁর দর্শনে যে অসীম আনন্দ এটাকে আমাদের কোথাও সেভাবে জোর দিয়ে সামনে নিয়ে আসা হয়নি। নেই যে তা নয়, উপনিষদাদিতে আনন্দের বর্ণনা করছেন, বিবেকচূড়ামণিতেও বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু সেভাবে জনসাধারণের মধ্যে তুলে ধরা হয়নি। কিন্তু ঠাকুর সবার সামনে আনন্দের বিশ্লেষণ করে বলছেন – বিষয়ানন্দ, ভজনানন্দ আর ব্রহ্মানন্দ। বিষয়ের আনন্দ যাই হোক তার শতগুণ আনন্দ ভজনানন্দে। ভজনানন্দ মানে শুধু ঈশ্বরের নামগুণ গান করা। রোজ কয়েক ঘন্টা নিয়মিত খঞ্জনি নিয়ে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ গান করলে সাতদিনে হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। কিন্তু যেদিন বন্ধ করে দেবে তখন এর পরিণতি আরও ভয়ঙ্কর হয়ে যাবে, তার চরিত্রের যে পতন হতে শুরু করবে তাকে আর সামলানো যাবে না। কারণ কৃত্রিম ভাবে মনটা উপরে উঠে গিয়েছিল, এবার সেখান থেকে যখন নামবে তখন কোথায় গিয়ে যে পড়বে কেউ বলতে পারবে না। কারণ একটা জিনিসকে যত উপরে তুলে দেওয়া হবে সেটা যখন পড়বে তখন তত জোরে পড়বে। ভজনানন্দের সাথে যে আনুষাঙ্গিক সাধনার দরকার সেই সাধনা থাকে না বলে এই বিপত্তিটা হয়। কিন্তু ভজনানন্দ থেকে যখন ব্রহ্মানন্দে যায় তখন সেই আনন্দ কোটি গুণ আনন্দের অনুভূতি হয়। ঠাকুর ব্রহ্মানন্দের উপমা দিচ্ছেন – কোটি কোটি রোমকূপে রমণসুখ অনুভব হয়।

এই আনন্দের অনুভূতি হয় যখন সচ্চিদানন্দের সঙ্গে এক হয়ে যায়। সেই সচ্চিদানন্দ এখন নিজের আনন্দে মশগুল। তাহলে সচ্চিদানন্দের কিসের প্রয়োজন, কিসের অভাব? আমরা এই জিনিস কল্পনাই করতে পারবো না। তিনি আবার চিৎ, সর্বদা চৈতন্য, অজ্ঞানের কোন কিছু নেই। তিনি আবার বলছেন – দেখা যাক বহু রূপে কেমন লাগে। এবার তাঁর মধ্যে কাম এসে গেল। এই কাম খারাপ কিছু নয়। স্ত্রী স্বামীর ফটো তুলছে – চশমাটা খুলে ছবি তুলছে, চশমা ছাড়া তোমাকে কেমন লাগছে দেখি। চশমা খুললেও স্বামী, না খুললেও স্বামী। কিন্তু বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ দিয়ে দেখতে চাইছে। সচ্চিদানন্দের মধ্যে যে কাম, এটাও তাঁর বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ দিয়ে নিজেকে দেখা, *একোহহম্ বহুস্যাম্ প্রজায়ামি*, আমি এক আমি বহু হব। তিনি কত জায়গায় বহু হবেন? আমরা কি করে বলব তিনি কত জায়গায় বহু হবেন! তাঁর এলাকার তো কোন সীমা নেই, তিনি অনন্ত। বীজ ছাড়া কোন সৃষ্টি হয় না। যখন কোন গান রচনা হয় সেখানেও একটা বীজ থাকে, বই রচনাতেও বীজ থাকে, ছবি আঁকা হচ্ছে সেখানেও একটা বীজ থাকে, সন্তানোৎপত্তি হচ্ছে সেখানেও বীজ থাকবে, ঠিক তেমনি সৃষ্টি যখন হয় তখনও এরও বীজ থাকবে। সৃষ্টির এই বীজ কোথায়? মনের মধ্যে। মনের মধ্যে কিভাবে বীজ থাকে? কাম রূপে, আমি এক আমি বহু হব এই কাম রূপে। নাসদীয় সূক্তে অবশ্য এই নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে না, প্রসঙ্গক্রমে আমরা এই আলোচনা করলাম। কিন্তু কামের কথা যে একেবারেই এখানে বলছেন না তা নয়, ভাষ্যকার বলছেন সৃষ্টির ইচ্ছা জাগা। খ্রীশ্চান ধর্মের যে Let there be light বলছে, তারাও একই জিনিস বলছে। ভগবানের মধ্যে কেন সৃষ্টির ইচ্ছা এল, এর উত্তর আমরা কোন দিন পাবো না, দিতে পারব না আর কোন দিন বুঝতেও পারব না। মাণ্ডুক্যকারিকায় তাই অজাতবাদে বলছেন সৃষ্টি আদৌ হয়নি।

প্রথম বীজ হল সৃষ্টি হোক। গীতায় ভগবান বলছেন *মম যোনির্মহদ্ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্*, ভগবানই যোনি, বীজটাও আমি, বীজ প্রদান করছি আমিই। সচ্চিদানন্দই প্রকৃতি রূপে দাঁড়িয়ে গিয়ে তার মধ্যে বীজ প্রদান করলেন। কি বীজ প্রদান করলেন? আমি এক আমি বহু হব। এই যে বীজ, বলছেন সৎ অসতের বন্ধু হয়ে যায়। বন্ধু মানে যেখানে বন্ধন, যেখানে বেঁধেছে বাসা সেখানেই ভালোবাসা। কিন্তু এখানে বন্ধু মানে বন্ধুত্ব বলছেন না, সৎ অসতের বন্ধন হয়ে যায়। অসৎ কেন? কারণ চৈতন্যের অভাব, চিরন্তন সত্তার অভাব আর আনন্দের অভাব। সৃষ্টি মানে তাই, যার সৃষ্টি হবে তার নাশ হবে। গতকাল ছিল না, আজ আছে, আবার আগামীকাল থাকবে না, এটাই অসৎ। কিন্তু ভগবান সৎ, তিনি চিরদিন আছেন। অথচ সৎ আর অসতের মধ্যে বন্ধন হয়ে চিজ্জড়গ্রন্থি হয়ে যায়। আমার এই স্থূল শরীর আছে আবার এর মধ্যে যেন একটি চৈতন্য জীব

আছে। এক রাজা, দেখতে খুব সুপুরুষ, তার মধ্যে সব গুণ আছে। সেই রাজা এক কুৎসিৎ মেছোনিকে বলছে – তোমাকে না পেলে আমি বিবাগী হয়ে যাব, আমি সন্ন্যাসী হয়ে যাব। চৈতন্যের সাথে জড়ের বন্ধুত্ব, সৎ আর অসতের বন্ধুত্ব এও এই রকম। এখন বিচার্য বিষয় হল, সৎ আর অসতের এই বন্ধুত্ব কি সত্যি না মিথ্যে! সৎ আর অসতের মধ্যে যে বন্ধন হল এদের কে ফাঁসালো? এখানে এসে আমরা যত খুশী দর্শন দাঁড় করিয়ে দিতে পারি। ছেলে আর মেয়ের মধ্যে যখন ভালোবাসা হয় তখন মেয়ের বাবা ছেলের বাবাকে গিয়ে বলে তোমার ছেলে আমার মেয়েকে ফাঁসিয়েছে, আবার ছেলের বাবা উল্টে বলে আমার ছেলে সরল, হাবাগোবা তোমার মেয়েই আমার ছেলেকে ফাঁসিয়েছে। কে কাকে ফাঁসালো, এবার আপনি ব্যাখ্যা দিতেই থাকুন। বন্ধন যদি সত্য হয় তাহলে তার দর্শন এক রকম হয়ে যাবে, বন্ধন যদি কাল্পনিক হয় তখন তার দর্শন অন্য রকম হয়ে যাবে, আর যদি বলা হয় বন্ধন আদপে কখন ছিলই না, তখন তার একটা আলাদা দর্শন দাঁড়িয়ে যাবে। আমাদের হিন্দু ধর্মে যে এত রকম দর্শন জন্ম নিয়েছে, এটাই তার একমাত্র কারণ। কিন্তু এত সব কথা জানলেন কী করে? বলছেন যাঁরা কবি, যাঁরা মনীষী তাঁর শুদ্ধ মনের হৃদয়ে ধ্যানের গভীরে এই তত্ত্বকে জানতে পারলেন।

যোগশাস্ত্র বলছে পাঁচ প্রকারে আমাদের বিষয় জ্ঞান হয়, প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি। এই পাঁচটি দিয়ে জগতের জ্ঞান হয়। কিন্তু ঈশ্বরীয় জ্ঞান বা আত্মজ্ঞান পাওয়ার জন্য এই পাঁচটিকেই বন্ধ করে দিতে হবে। তার মানে, কল্পনা বন্ধ করতে হবে, মিথ্যা জ্ঞান আটকে দিতে হবে, স্মৃতি আর স্বপ্নকে সমূলে উৎপাটিত করে দিতে হবে আর জাগ্রত অবস্থার যে অনুভূতি সেটাও বন্ধ করে দিতে হবে। হিমালয়ের কোন গুহায় গিয়ে আমরা জাগ্রত অবস্থার অনুভূতি গুলিকে বন্ধ করে দিতে পারি। সেখানে কোন শব্দ নেই, কানে কোন শব্দ আসছে না, চোখ বন্ধ করে দিলে কোন দৃশ্য নেই, দরজা বন্ধ থাকলে বাইরে থেকে কেউ আসতে পারবে না। এমন একটা অবস্থা করে দেওয়া হল যার ফলে শীত-গ্রীষ্মের কোন অনুভূতিও নেই। পাঁচটা ইন্দ্রিয়ই বন্ধ, প্রত্যক্ষ কোন অনুভূতি হচ্ছে না। মনকে এমন অভ্যস্ত করে দেওয়া হয়েছে যে সে ঈশ্বর চিন্তন ছাড়া আর কিছুই করছে না, যার ফলে মিথ্যা কল্পনা চলে গেল। আর অকারণে মনের মধ্যে যেসব কল্পনার উদয় হয় সেগুলোও চলে গেল, শুধু নিজের ইষ্টের চিন্তনই করে যাচ্ছে। রাত হয়ে এল, এবার সে নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে যাবে, নিদ্রায় চলে যেতেই ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন এসে গেল। যোগশাস্ত্রে এই নিয়ে খুব সুন্দর বর্ণনা আছে। যোগীর আগে স্ত্রী ছিল। স্ত্রী মারা গেছে, যখন বেঁচে ছিল তখন স্ত্রী আমার কত সেবা-যত্ন করত। এই জিনিসটাই স্বপ্নে একটা রূপ নিয়ে হাজির হয়ে গেল। সমাধি অবস্থায় মন নিরুদ্ধ হয়ে যায়। নিরুদ্ধ অবস্থায় মন সব ধরণের আকার নেওয়া বন্ধ করে দেয়। নিরুদ্ধ অবস্থায় কি হয়? এতক্ষণ বিচার করছিল, সৎ কি, অসৎ কি, সৎএর সাথে অসতের কি সম্পর্ক, সচ্চিদানন্দের সঙ্গে সৃষ্টির কি সম্পর্ক, এই ধরণের আধ্যাত্মিক বিচার করতে করতে মনটা নিরুদ্ধ হয়ে যায়। যোগশাস্ত্র এই অবস্থাকে বলছেন *তদাদ্রষ্টুঃস্বরূপে অবস্থানম্*, তখন দ্রষ্টা নিজের স্বরূপে অবস্থান করেন, অর্থাৎ সত্য কি সেটা পরিষ্কার জানতে পারে। আমাদের কাছে জানা মানে, মনের মধ্যে নিজে থেকেই অনেক কিছু চলতে থাকে। এগুলো যখন বন্ধ হয়ে যায় তখন যে জিনিসকে নিয়ে চিন্তা করা হচ্ছিল সে জিনিসটার যথার্থ জ্ঞান স্পষ্ট হয়ে যায়, জিনিসটা যেমনটি ঠিক তেমনটি স্পষ্ট দেখতে পায়। একটা সমস্যা নিয়ে গভীর ভাবে চিন্তা করতে করতে মনের অন্যান্য বৃত্তিগুলি যখন বন্ধ হয়ে গেল তখন সমস্যার উপর যে আবরণ গুলো ছিল সেগুলো সরে গিয়ে সমস্যার রহস্য উদ্ঘাটন হয়ে যায়।

এখানে সমস্যা ছিল সৎ আর অসতের কিভাবে সম্পর্ক হল। তখন বলছেন সচ্চিদানন্দের মনে কামের জন্ম হল, সেখান থেকে সৃষ্টি হয়েছে। কি করে জানা গেল? কল্পনার দ্বারা জানা যায়নি, অঙ্কের জটিল সমস্যা ভেদ করে নয়, কোন যুক্তিতর্ক দিয়ে নয়, যাঁরা ক্রান্তদর্শি ঋষি, ক্রান্তদর্শি মানে যিনি ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যত তিনটে কালই একসাথে স্পষ্ট দেখতে পান, সেই ত্রিকালজ্ঞ ঋষিরা ধ্যানের গভীরে এই সত্যকে সাক্ষাৎ দর্শন করেছেন। তাঁরা সেটাকে যখন লিপিবদ্ধ করে দিলেন সেটাই হয়ে গেল মন্ত্র, কালজয়ী রচনা। ক্রান্তদর্শি না হলে কালজয়ী রচনা হবে না। কবি ভগবানেরই নাম, যিনি ত্রিকালজ্ঞ ঋষি তাঁকেও কবি বলা হয়। কবি মানে ক্রান্তদর্শি, ক্রান্তদর্শি মানে তিনি ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যত জানেন, তিনি একটা পরিস্থিতি দেখেই বুঝতে পারেন কি হতে যাচ্ছে, কাউকে দেখলেই বুঝতে পারেন লোকটি ভালো না খারাপ। কবি মানে একেবারে নির্মল চরিত্র,

সাধনা করে করে নিজেকে এমন এক উচ্চাবস্থায় নিয়ে গেছেন, যেখানে তাঁর কোথাও কোন কিছুর সাথে identification নেই। যার ফলে তিনি সৎ আর অসতের বন্ধনকে জানেন। সৎ মানে সৃষ্টির পূর্বে যেটা ছিল আর অসৎ মানে সৃষ্টির পরে যেটা ছিল, আর এই দুটোর সম্পর্ক কি, কিভাবে এল, এগুলো তিনি স্পষ্ট রূপে দেখতে পান। তখন বলছেন *নাসদাসীন্নো সদাসীৎ*, এগুলো সেই কবিদের কথা, এখানে কোথাও কোন কল্পনা নেই, কোন যুক্তিতর্কের পর সিদ্ধান্ত নেই, কবিরা যেমনটি দেখেছেন তেমনটি লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

কামস্তদগ্রে আসীদ্, এই কথা ঘুরে ঘুরে আসবে, কারণ কাম ছাড়া কিছু হয় না। ভগবান যিনি তাঁরও কিছু কামনা ছিল। কিন্তু ভগবানের কামনাকে যখন বিচার করতে যাওয়া হয় তখন দেখা যায় অন্য কোন কিছু আসে না, তখন এটাই শুধু আসে – আমি নিজেকে বহু রূপে দেখব। সেখান থেকে এই খেলা। সেইজন্য এই খেলার দিকে বেশি নজর দিলে অনেক সমস্যা হয়ে যায়। আধ্যাত্মিকতা মানেই জগৎকে বেশি মূল্য না দেওয়া।

অপ্রকেতং সলিলং সর্বমা ইদং – *অপ্রকেতং* শব্দের অর্থ যাকে আলাদা করা যায় না। যেমন এই ঘরে অনেক কিছু আছে, টেবিল আছে চেয়ার আছে, টেবিল আর চেয়ারকে আমরা আলাদা করে জানছি, এটাকে বলে প্রকেত, ইঙ্গিত করে দেখানো যায়। অপ্রকেত মানে কোন কিছু আলাদা ইঙ্গিত করে দেখানো যায় না। এই যে নাম আর রূপের আবরণ এসে গেল, এটাকে কোন ভাবেই আলাদা করা যাবে না। বীজ এসে গেছে, কিন্তু আলাদা করে বীজ থেকে কি হবে কিছু বোঝা যাচ্ছে না, এটা মানুষ হয়ে যাচ্ছে, এটা ঘোড়া হয়ে যাচ্ছে, এটা হাতি হয়ে যাচ্ছে এভাবে আলাদা করা যাবে না। অজ্ঞান এসে গেছে মানে নাম আর রূপ এসে গেছে কিন্তু *অপ্রকেতং*। বলছেন ব্যবহার দশায় সব কিছুকে আলাদা করা যায়, যেমন এখানে আমি আলাদা, আপনি আলাদা সব কিছুকে আলাদা করে বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু এখানে যে জায়গার বর্ণনা করা হচ্ছে তখন পুরোটাই *অপ্রকেতং*, কোন কিছুকেই আলাদা করে বোঝার উপায় নেই। এবার চিন্তা করতে করতে পেছনের দিকে যেতে শুরু করলেন। পেছনের দিকে যেতে যেতে চিন্তা করছেন প্রথমে কি ছিল? তখন বলবেন, দেখো ভাই প্রথমে যাই থাকুক, এখন যা কিছু দেখছ এগুলো সবই বিবর্তিত হয়ে হয়ে আজ এই অবস্থার রূপ নিয়েছে। ডারউইনের থিয়োরী দিয়ে গেলে বলা হবে বিবর্তনবাদ। বিবর্তন তো হয়েছে বুঝলাম, প্রথমে এক ছিল, এক থেকে দুই, দুই থেকে চার হয়েছে কিন্তু এদের জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল কোথায় ছিল? তখন এনারা বলছেন *অপ্রকেতং*, এটাকে আলাদা করে দেখানো যাবে না। এই ঘরটা যদি পুরো অন্ধকার করে দেওয়া হয়, বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যাবে না ঘরে কি আছে। ঘর থেকে বাইরে আওয়াজ যাচ্ছে কিন্তু আলাদা করে বলা যাবে না কি আছে, আলো এলে সব বোঝা যাবে। এখানে কোন সময়কার কথার বর্ণনা করা হচ্ছে? ঠিক যে মুহূর্তে সৃষ্টি হতে যাচ্ছে সেই সময়কার বর্ণনা করছেন। নাম রূপে বীজ এসে গেছে, কিন্তু নাম আর রূপকে আলাদা করে বলা যাচ্ছে না, সেইজন্য বলছেন *অপ্রকেতং*।

সলিলং সর্বমা ইদং – সৃষ্টি যেন জল থেকে এসেছে। আমাদের শাস্ত্রে যখনই সৃষ্টির প্রকরণ নিয়ে আলোচনা করা হয় তখনই এনারা সলিল শব্দটা নিয়ে আসেন। সলিল শব্দ দ্বারা ঠিক কি বোঝাতে চাইছেন বলা মুশকিল। তবে আমরা সচরাচর জল বলতে যা বুঝি এখানে সেই জলের কথা বলা হচ্ছে না, এনারা সব সময় ব্যবহার করেন কারণ সলিল, ocean or cause, যেখান থেকে কার্যটা বেরোবে। কিন্তু আমরা যাই বলি না কেন ocean of space বলি বা ocean of energy বলি, কি ছিল আমাদের জানা নেই। কিন্তু নাম আর রূপ যেখানে এসে গেছে, অজ্ঞান যেখানে এসে গেছে, যেখান থেকে সৃষ্টি হবে, তার মানে স্পেস এসে গেছে। স্পেসের মধ্যে কিছু একটা আছে যেটার মধ্যে সৃষ্টির বীজকে ধরে রাখা হয়েছে, এর নাম এনারা সব সময় দেন কারণ সলিল। স্বামীজী এর অনুবাদ করছেন All these was only un-illumined water, এখানেও বলতে চাইছেন সৃষ্টি যেন জল থেকে এসেছে। গ্রীক ফিলজফিতেও এই ধরণের বিশ্বাস দেখা যাবে। তারাও বিশ্বাস করে যে সমস্ত সৃষ্টি জল থেকে এসেছে। ভারতেও এই মতটা চলে এসেছে যে সব কিছু জল থেকেই এসেছে, আমরাও সমুদ্রের প্রাণী ছিলাম। সেইজন্য আমাদের lungs এ জল দরকার, lungsএ যত পরিমাণ জলের প্রয়োজন তার থেকে একটু জল কম থাকলেই গলা খুশ খুশ করবে আর কাশি হতে থাকবে। এটাই মনে করিয়ে দিচ্ছে আমরা সবাই হলাম জলের প্রাণী। সমস্ত প্রাণীরা কোন এক সময়ে জল থেকে ডাঙায় চলে

এসেছে। এইজন্য যে কোন প্রাণীর মধ্যে জলীয় পদার্থ বেশি থাকে। আমাদের সবারই উৎপত্তি সমুদ্রে। এগুলো আমরা ইদানিং কালে বিজ্ঞানের গবেষণার ফলে জানতে পারছি, আগেকার দিনের লোকেরা এত খবর জানতেন না। কিন্তু বৈদিক ঋষিরা প্রথম থেকেই বলছেন primordial water থেকেই সৃষ্টির উদ্ভব হয়েছে, এই primordial water ঠিক কি বলতে চাইছেন আমাদের পক্ষে এখন বলা খুব মুশকিল। পরের দিকে পৌরাণিক আখ্যায়িকায় এই প্রথম জলকেই বলছেন ক্ষীর সাগরে বিষ্ণু শেষ নাগের উপরে শুয়ে আছেন, সেখান থেকে সৃষ্টি এসেছে। Cosmic water এর ধারণা সমস্ত হিন্দু পৌরাণিক কাহিনীতেই উল্লেখ করা হয়েছে। সৃষ্টির কথা এলেই cosmic water এর কথা বলবেন। এখানে বলছেন – cosmic water ছাড়া আর কিছু ছিল না। ভাষ্যকাররা খুব সুন্দর ব্যাখ্যা দিচ্ছেন, পুরো সৃষ্টিটা কারণ সলিলে ঢাকা ছিল, যেমন গর্ভের মধ্যে জল থাকে। কিন্তু এতো কোন মুরগীর ডিমের মত নয় যে শুধু মুরগীই বেরোবে, এর মধ্যে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জিনিস রয়েছে। কেন *অপ্রকেতং* বলা হচ্ছে বলতে গিয়ে এনারা দুধ আর জলের উপমা দিয়ে বলছেন, দুধ আর জল যদি মিশিয়ে দেওয়া হয় তাহলে আলাদা করে দুধ আর জলকে বোঝা যাবে না। আপনি জানেন এর মধ্যে জল আছে কিন্তু ওই জলকে আপনি আলাদা করতে পারবেন না। এখানে আমরা দুটো তত্ত্ব পাচ্ছি – সৃষ্টি এসেছে cosmic water থেকে আর সৃষ্টি এসেছে অন্ধকার থেকে।

গভীর রাতে এক অজানা অচেনা জায়গায় আমরা পৌঁছেছি। সেখানে কি আছে আমরা বুঝতে পারছি না, কারণ পুরো জায়গাটা অন্ধকারে ঢাকা। যখন ভোরের আলো আস্তে আস্তে চোখ মেলতে থাকল তখন যেন সব কিছু জেগে উঠল। তখন মনে হয় সব কিছু যেন অন্ধকারের গর্ভ থেকে জন্ম নিল। এর মানে সব জিনিস আগেই ছিল, নতুন কিছু আসেনি। রাতের অন্ধকারে সব কিছু যেন এক হয়ে ছিল, যেমনি আলো ফুটতে থাকল, যেগুলো *অপ্রকেত* ছিল সব জিনিস *প্রকেত* হয়ে গেল। *অপ্রকেতঃ* মানে তখন কোন বহুত্বের চিহ্ন ছিল না, অন্ধকারে সব এক হয়ে ছিল। ঠাকুর বলছেন – পায়রাকে দেখলে মনে হবে কিছু নেই, কিন্তু পায়রার গলায় হাত দিলে বোঝা যায় গমের দানা গিজ্‌গিজ্‌ করছে। অন্ধকারের মধ্যে সব যেন একত্বের ভাব নিয়ে অবস্থান করছে, যেমনি এটাকে নাড়াচড়া করতে যাব তখনই দেখা যাবে যে আরে এর মধ্যে তো অনেক কিছু রয়েছে। কোথায় ছিল এই সব কিছু? কাব্যের ভাষায় তখন আমরা বলি – অন্ধকার জন্ম দিল নানা জীবের। *তমসা গূঢ়মগ্রে*, এই ভাবকেই ব্যক্ত করছে, আর এটা কোন রাতের অন্ধকারের কথা বলছেন না, এখানে মহাজাগতিক অন্ধকারের কথা বলছে। সেই মহাজাগতিক অন্ধকারই যেন সব কিছুর জন্ম দিচ্ছে।

পরের লাইনে বলছেন – *তুচ্ছ্যেনাভ্বপিহিতং যদাসীত্তপসস্তন্মহিনাজায়তৈকম্*। *আভু* শব্দের অর্থ ব্যাপক বা সম্পূর্ণ রূপে, *অপিহিতং* মানে আচ্ছাদিত, সম্পূর্ণ রূপে আচ্ছাদিত। *তুচ্ছ্যেন* শব্দের অর্থ করছেন ভাবরূপ অজ্ঞান, প্রথমে যেটাকে তমস বলছেন, সেটাকেই এখানে বলছেন ভাবরূপ অজ্ঞান। বেদান্তও যখনই মায়াকে ব্যাখ্যা করেন তখনও সব সময় বলবেন ভাবরূপম্। ভাবরূপম্, জিনিসটা আছে কিন্তু তার অস্তিত্বটা ঠিক পরিষ্কার নয়। ভাবরূপম্ মানে, যে কোন জিনিস যখন চিন্তার জগতে চলে আসে, তখন বলে সেটা ভাবরূপ গ্রহণ করেছে। সেই চিন্তাই যখন স্থূল রূপ ধারণ করে নেয় তখন বলা হয় বাস্তব রূপ পেয়ে গেল। বাস্তব রূপ আর ভাবরূপের তফাৎ আছে। ভাবরূপ যে ভুল তা নয়, ভাবরূপ পুরোপুরি সত্য, তার অস্তিত্ব আছে, কিন্তু ওর অস্তিত্বকে ধরা যাবে না। অজ্ঞানকে জানা যায় না, কারণ যে কোন জিনিসকে জানার জন্য জ্ঞান লাগবে, অজ্ঞানকে জানার জন্য যখনই জ্ঞান লাগাতে যাবে তখনই অজ্ঞান চলে যাবে, সেইজন্য অজ্ঞানকে কোন দিন জানা যায় না। এনারা অন্ধকার আর আলোর খুব নামকরা উপমা নেন। যদি কেউ অন্ধকারকে দেখতে চায় সে কিসের সাহায্যে অন্ধকার দেখবে। আলো দিয়ে তো অন্ধকারকে দেখা যাবে না। কোন জিনিসকে দেখতে গেলে আলোর দরকার হয়, আলো যেমনি নিয়ে আসা হবে তখন আর অন্ধকারও থাকবে না। আমরা বলি বটে অন্ধকার দেখছি, কিন্তু সেখানে অন্ধকারকে দেখছে না আলোর অভাব দেখছে। সেইজন্য বলছেন মায়াকে জানার কোন পথ নেই। যেহেতু জানার কোন পথ নেই তাই বলছেন ভাবরূপম্। যখন আমি বুঝতে পারলাম যে আমি জানতেই পারবো না জিনিসটা আছে কি নেই তাহলে আমার জিনিসটার জ্ঞান কোথা থেকে হবে? তখন বলছেন শাস্ত্র দিয়ে তোমার জ্ঞান হবে। শাস্ত্র ছাড়া অবিদ্যাকে জানার কোন পথ থাকে না। কিন্তু যিনি

ভাবরাজ্যের শ্রীরামকৃষ্ণ, তিনি সৎস্বরূপ, তাঁকে জানা যায়। ধ্যানের গভীরে যেতে যেতে ভাবরাজ্যের যিনি তিনি ধীরে ধীরে মুর্ত রূপ ধারণ করতে থাকেন। কল্পনার জগতেও শ্রীরামকৃষ্ণ আসবেন। কিন্তু কোনটা কল্পনা জগতের শ্রীরামকৃষ্ণ আর কোনটা ভাবরাজ্যের শ্রীরামকৃষ্ণ ধরা খুব মুশকিল। এর জন্য শাস্ত্র পড়তে হবে, তারপর দেখতে হবে তার জীবনধারায় কতটা পরিবর্তন এসেছে। এটা অবশ্য অন্য বিষয়। এখানে নাসদীয় সূক্তম্ নিয়ে আলোচনা চলছে, বলছেন *তুচ্ছ্যেনাভ্বপিহিতং যদাসীত্*, এই ভাবরূপী অজ্ঞান একেবারে সব কিছুকে আচ্ছাদিত করে রেখেছে। গীতায় যেমন বলছেন *ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ। যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্।।* আগুনকে যেমন ধুয়া ঢেকে রাখে, ময়লা যেমন আয়নাকে ঢেকে ফেলে আর গর্ভকে যেমন জল আচ্ছাদিত করে রাখে, ঠিক সেই রকম অজ্ঞান রূপী কারণ সলিল সৃষ্টির বীজকে ঢেকে রেখেছে।

আর তখন কি হয়? *তপসাস্তন্মহিনাজায়তৈকম্*, সেখান থেকে এসে গেছে এক। তিনি যে অসৎ নন সেইজন্য শব্দটা নিচ্ছেন *একম্*। ওই গর্ভের মধ্যে যিনি আচ্ছাদিত হয়ে আছেন, যেখান থেকে অন্তরীক্ষ হবে, সময়ের উৎপত্তি হবে সবটাতেই তিনি ঢাকা আছেন। কিছুই ছিল না, কিন্তু এখন সেখানে এক এসে গেল। এই এক ছাড়া জগতে আর কিছু নেই। বৈদিক ঋষিরা লক্ষ্য করেছিলেন পাখিরা ডিমে তা দিলে ডিম থেকে বাচ্চা বেরিয়ে আসে, আসলে ডিমে তা দেওয়া মানে ডিমের উপরে পাখি তার শরীরের উত্তাপ দিতে থাকে। ঋষিরা এই প্রক্রিয়াকে গ্রহণ করে বললেন সেই হিরণ্যগর্ভ থেকে এক বেরিয়ে এলেন। কিভাবে হিরণ্যগর্ভ থেকে সৃষ্টি বেরিয়ে এলো? তাপের শক্তিতে, কোথা থেকে তাপ এল? বলছেন *তপসা*, তপস্যার মাধ্যমে তাপ প্রবাহ তৈরী হল। তপসার অর্থ এখানে আবার দু ভাবে ব্যবহার করা যায়। তপসা হল তাপ, মহাজাগতিক তাপ। আমরা এখন বিগব্যাঙের কথা বলছি, ঋষিরা এসব থিয়োরি জানতেন না। ফিজিক্সও বলছে তাপের মাধ্যমে বিগব্যাঙ প্রক্রিয়ায় এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়েছে। তপসার অর্থ তপস্যাকেও বোঝায়। তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলছেন ‘*স তপোহতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা*’। তপস্যা হল, যখন কেউ একটা ব্রত ধারণ করে নিয়ে সেটাতেই সমস্ত মন ইন্দ্রিয় শরীরকে উৎসর্গ করে দিচ্ছে তখন শরীরে একটা তাপ সৃষ্টি হয়। একাদশী ব্রত করছে, খাচ্ছে না, সেদিন একটা কিছুতে মনটা একাগ্র করে রাখছে, তখন শরীর থেকে তাপ বেরোতে থাকবে। ব্রহ্মচর্য ব্রত নিয়েছে, কিছু দিন ধরে করতে করতে শরীর থেকে তাপ বেরোবে। দিনে তিন চার ঘন্টা আসনে বসে জপ ধ্যান করছে অনেক দিন ধরে, তাপ জন্মাবে। তপস্যার মাধ্যমে এই তাপ যখন সৃষ্টি হয় তখন এই তাপ থেকে অনেক কিছুর জন্ম হতে পারে। তপস্যা হয় একটা জিনিসকে নিয়ে, একটা ভাবকে নিয়ে তার মধ্যে নিজেকে ছেড়ে দেওয়া। তপস্যার এতো শক্তি যে কেউ যদি ঠিক করে নেয় আমি প্রত্যেক দিন মন্দিরে দু ঘন্টা করে আসনে বসে জপ করব আর আমি এই এই ফল চাই, এখন সে যদি দশ বছর এগার বছর ধরে করতে থাকে তাহলে সে ঐ ফল পেতে বাধ্য, হবেই হবে। কেন? মুরগী ডিমের উপরে তা দিচ্ছে মানে তাপ দিচ্ছে, সেই ডিম থেকে একটা বাচ্চা বেরোবে। ঠিক সেই রকম একটা আইডিয়াকে নিয়ে, একটা ভাবকে নিয়ে কেউ যদি বসে পড়েন, তখন ঐ আইডিয়াকে তাপ দেওয়া হচ্ছে, ঠিক মুহুর্তে ঐ ভাবটা তার কাছে উন্মোচিত হয়ে যাবে। মুসলমানরা রোজার সময় সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত যা তপস্যা করে ওতেই সারা মুসলমান জাতি শক্তি পেয়ে যাচ্ছে। আর শত শত কোটি কোটি মুসলমান এই তপস্যা করে যাচ্ছে বছরের পর বছর। যতই অসুবিধা আসুক মুসলমানরা দিনে পাঁচবার নমাজ পড়বেই। যাই হয়ে যাক মুসলমানরা তিরিশ দিন রোজা রাখবে।

সৃষ্টিও ঠিক এভাবেই হয়। ভেতরে যিনি সচ্চিদানন্দ আছেন তিনি তপস্যা করেন। কি তপস্যা করেন? একটি মাত্র আইডিয়া বা চিন্তার উপরে তপস্যা করেন। সৃষ্টি হোক। আমাদের যেমন কোন কিছু সৃষ্টি করতে গেলে অনেক দিন ধরে ভাবতে হবে, চিন্তা করতে হবে, ভগবানকে এসব করতে হবে না। আমরা চিন্তা করে আর কতটুকু সৃষ্টি করতে পারব? কিন্তু ভগবানকে পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে জন্ম দিতে হচ্ছে, সেইজন্য তাঁর তপস্যাও সেই রকম হবে। যে মুহুর্তে তিনি চিন্তা করলেন সৃষ্টি হোক তখন ব্রহ্মার জন্ম হয়ে গেল। ব্রহ্মা জন্ম নিয়ে তিনিও সৃষ্টির জন্য তপস্যা করতে থাকেন। মহারাজদের কাছে ভক্তরা কোন সমস্যা নিয়ে গেলে তাঁরা ভক্তদের একটা কথাই বলেন ‘খুব করে ঠাকুরকে ডাক আর জপ কর’। ঠাকুরকে ডাকা আর জপ করা মানেই তপস্যা করা, তপস্যা করলেই তাপ সৃষ্টি হবে, ফল হতে বাধ্য। নাসদীয়সূক্তমে প্রথমে কোন ঈশ্বরের উল্লেখ নেই,

ঈশ্বরের কথা অনেক পড়ে আসছে। সৃষ্টি একটার পর একটা হতে থাকে, একটা আইডিয়া আরেকটি আইডিয়ার জন্ম দিচ্ছে। যে কোন একটা আইডিয়াকে নিয়ে যেই তপস্যা করতে বসে যাবে একটা সময় বুম্ করে বেরিয়ে আসবে। যদি কোন আইডিয়াকে নাও নেয় তাহলেও তপস্যা করলে সে তার অন্য ভাবে নিজের মত একটা ফল দিয়ে দেবে। বেদ, পুরাণে যত যজ্ঞ বা কাহিনী আছে সব তপস্যারই এক একটা রূপ। বেদের যজ্ঞ, ইদানিং কালে সত্যনারায়ণ পূজা, দুর্গাপূজা, চণ্ডীপাঠ ইত্যাদি যে করা হয় সবই একটা সঙ্কল্প নিয়ে যখন করা হচ্ছে তখন তার ফল হবেই। যেমনটি তপস্যা হবে তেমনটি ফল পাবে। কিন্তু তপস্যা করলে ফল পাবেই, কোন ধর্মই বলবে না যে তপস্যা করলে ফল পাবে না। ঠাকুর বলছেন – কাতর হয়ে প্রার্থনা করলে তিনি শুনবেনই শুনবেন। তিনি কি শুনে ফল দিচ্ছেন? আমি যে প্রার্থনা করছি আসলে আমি তপস্যা করছি।

আমাদের মনে হাজারটা আইডিয়া ঘুরপাক খাচ্ছে, এই চাই সেই চাই। কিন্তু তপস্যা করছি কি? তপস্যা না হলে ফল হবে না। এখানে এই কথাই বলা হচ্ছে। ভগবান ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করলেন, প্রথম যিনি এলেন তিনিও তপস্যা করছেন। এই আইডিয়াই পরবর্তি কালে উপনিষদে বার বার এসেছে। প্রশ্নোপনিষদে দুজন ঋষি এক ঋষির কাছে গিয়ে বলছেন আমাদের কিছু প্রশ্ন আছে, আপনার কাছে জানতে চাই। ঋষি তাঁদের বলছেন – নিশ্চয়ই উত্তর পাবে, কিন্তু তার আগে তোমরা এক বছর এখানে থেকে তপস্যা কর, এক বছর তপস্যার পর প্রশ্ন করবে, সেই প্রশ্নের উত্তর যদি আমার জানা থাকে তবেই আমি বলব। দেবতাদের রাজা ইন্দ্র আর অসুরদের রাজা বৃত্র, দুজনে প্রজাপতির কাছে প্রশ্ন নিয়ে হাজির হয়েছে। প্রজাপতিও তাদের এক বছর তপস্যা করতে বললেন। দুজন মিলে তপস্যা করতে শুরু করলেন। তপস্যা করা মানে, স্বল্পাহারে থেকে, শরীরের সব রকমের সুখভোগ ত্যাগ করে শুধু ঈশ্বর চিন্তন করা। এক বছর তপস্যা করার পর দুজনে প্রশ্ন করলেন অমৃতত্ব কিভাবে লাভ হয়। প্রজাপতি শুধু দুটি কথা বলে দিলেন – তুমিই সেই। দুজনে ফেরত চলে এল। কিছু দিন পর ইন্দ্রের মনে সংশয় এসেছে। আবার প্রজাপতির কাছে গেলেন। প্রজাপতি ইন্দ্রকে আবার এক বছর তপস্যা করতে পাঠিয়ে দিলেন। তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলছেন– *স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা। ইদগং সর্বমসৃজত। যদিদং কিঞ্চ।* যা কিছু আছে আমি তার সৃজন করব, তিনি এই ভেবে তপস্যা করলেন। বেদে কিছু ভাব বীজাকারে আছে, পরে এই ভাবগুলি নিয়েই উপনিষদে আরো বিস্তার করে বলা হয়েছে। তেমনি নাসদীয়সূক্তমে যে তপস্যার কথা পাই ঠিক এই ভাবটাই আবার উপনিষদে এসেছে। *তপসস্তন্মহিনাজায়তৈকম্* - এখানে এটাই বলছেন তপস্যার জোরে *জায়তম একম্*, এই একের সৃষ্টি হল।

কামস্তদগ্রে সমবর্তুতাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ।
সতো বন্ধুমসতি নিরবিন্দন্ হৃদি প্রতীষ্যা কবয়ো মনীষা।।৪।।

এরপর প্রশ্ন আসে সৃষ্টি কেন হল। সেই কথা বলতে গিয়ে চতুর্থ মন্ত্রে বলছেন – *কামস্তদগ্রে* – যিনি তপস্যা করছেন তাঁর মনে প্রথমে একটা বাসনা জন্ম নিল। কি বাসনা এল – তৈত্তিরীয় উপনিষদে যেমন বলছে *ইদগং সর্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ*, যা কিছু আছে আমি তার সৃষ্টি করব। বাসনাকে কাম অর্থেও বলা যেতে পারে, তার ফলে অনেক পণ্ডিত এই কামকে পুরুষ-নারীর মধ্যে যে কামের কথা বলা হয়, সেটাকে এখানে ধরেছেন। কিন্তু ভাষ্যকাররা এই অর্থকে প্রত্যাখ্যান করে বলছেন এখানে সৃষ্টির কথাই বলা হয়েছে। এখন সমস্যা – *আপ্তকামস্য কা স্পৃহা*, যিনি ভগবান তিনি আপ্তকাম সুতরাং তাঁর মধ্যে স্পৃহা আসবে কেন? যার অভাব আছে তারই স্পৃহা হবে। ভগবানের তো কোন অভাব নেই তাহলে তিনি সৃষ্টি কেন করলেন? এর কি উত্তর আছে? আসলে এই প্রশ্নের কোন উত্তর নেই। যে কোন দ্বৈত দর্শনের বিরুদ্ধে, সে ইসলামই হোক বা খ্রীশ্চান ধর্মই হোক এটাই প্রধান অভিযোগ। এর কোন উত্তর তাদের কাছে নেই। মাণ্ডুক্যকারিকাতে এই প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে। যিনি আপ্তকাম, যিনি পূর্ণকাম তাঁর আবার কিসের স্পৃহা হবে, তিনি কেন সৃজন করতে যাবেন? সমস্ত দ্বৈত ধর্মের সামনে এটা একটা বিরাট সমস্যা। তখন তারা বলবেন যে আমরা যাতে ভালো হই সেইজন্য ভগবান সৃষ্টি করলেন এই কথা বলা হয়েছে। এখানে তুমিটা কোথায়, তুমি কে? তাঁকে যখনই আপ্তকামী বলে দেওয়া হচ্ছে তখন তো আর কিছুই দাঁড়াবে না। ঠাকুর তাই পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন – আম খেতে এসেছ আম খাও, ডাল পাতার হিসাব করতে যেওনা। এই প্রশ্নের কোন উত্তর হয় না। একটা লাইনের পর

আর প্রশ্ন করা যায় না। আমি কে, আমি কোথা থেকে এসেছি, কোথায় আমাকে যেতে হবে – এইসব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে না। কিন্তু এখান থেকে পালাতে কিভাবে হবে তার উত্তর পেয়ে যাবে।

গৌতম বুদ্ধকেও এই প্রশ্ন করা হয়েছিল। তিনিও কোন উত্তর না দিয়ে বললেন – তোমাকে যদি কেউ বিষযুক্ত তীর মারে তখন তুমি কি জানতে চাইবে কে তীরটা ছুড়েছে? তুমি কি জানতে চাইবে তীরটা কে বানিয়েছিল? তুমি কি জানতে চাইবে যে তীর মেরেছে সে কি সত্যিকারের কোন তীরন্দাজ কিনা? তুমি কি তার বংশের পরিচয়, তার জাতের পরিচয় জানতে চাইবে? এসব খবর না জেনে তুমি আগে তোমার শরীর থেকে তীরটা বের করে নেবে, ক্ষত স্থানে শুশ্রুষার জন্য কোন বৈদ্যের কাছে ছুটে যাবে। এগুলোর উত্তর থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে কিন্তু আগে তোমার প্রাণটি বাঁচাও। ঠাকুর বলছেন – আম খেতে এসেছ আম খাও। ঠাকুর একা বলেছেন না, ভগবান বুদ্ধও একই কথা বলছেন, যীশুও এক কথা বলছেন – এই তো তোমার সামান্য জীবন আগে কোন রকমে প্রাণ বাঁচাও। কিন্তু কোন কোন সময় ফাঁক পেলে মাথায় কিছু কিছু প্রশ্ন উঁকি মারে, তাই বলে দিলেন – *কামস্তদগ্রে*, প্রথমে তাঁর মনে ইচ্ছে জাগল। একেবারেই যদি কিছু উত্তর তাঁরা না দেন তাহলে লোকেদের মনে প্রচুর জিজ্ঞাসা থেকে যায়, সেইজন্য ওনারা দু-চারটে টুকটাক কথা বলে দেন। কিন্তু সেটাকেই বেশি কাটাছেঁড়া করতে গেলে মুখ থুবড়ে পড়বে।

গুজরাট ভূমিকম্পে প্রচুর লোক মারা গিয়েছিল। একজন সিনিয়র মহারাজ স্বামী ভূতেশানন্দজীকে প্রশ্ন করেছিলেন – মহারাজ এই যে সবাই বলে কর্মের জন্যই এই রকম হয়, কিন্তু এত এত লোকের কর্মে কি এটাই ছিল যে সবাই এক সঙ্গে এই ভাবে মারা যাবে? স্বামী ভূতেশানন্দজী একটু গম্ভীর হয়ে বলছেন – লঙ্কা খেলে ঝাল লাগে এটা মানছো তো? বলছেন – হ্যাঁ মানছি। তাহলে কার্য-কারণ সম্পর্ক আছে, একটা কর্ম করলে তার একটা ফল আছে, এটা মানছো তো? হ্যাঁ মানছি মহারাজ। তখন ভূতেশানন্দজী মহারাজ বলছেন – যেটা তোমার ব্যষ্টিতে লাগাচ্ছ ওটাকে তুমি বৃহতেও লাগিয়ে দাও। কেননা, ঠিক ঠিক এর কারণ যদি তুমি খুঁজতে যাও কোন দিন এর কারণ খুঁজে পাবে না। গুজরাট ভূমিকম্পে এত লোক কেন এক সঙ্গে মারা গেল এর উত্তর সারা জীবন খুঁজে গেলেও কোন দিন এর উত্তর তুমি পাবে না। তখন কি হবে? তোমার মনটা ওর মধ্যেই ঘুরতে থেকে যাবে, জগতে তোমার আসল কাজ কিছু করা হবে না। কিন্তু মনকে সান্ত্বনা দিতে হবে, এত লোক মারা গেলে কেন? লঙ্কা খেলে যেমন ঝাল লাগে, কর্মের ফলের সঙ্গে যেমন কর্মের সম্পর্ক থাকে, ঠিক তেমনি এত লোক যে মারা গেল এদের প্রত্যেকরই কোন কর্ম ছিল। তাহলে এটাই কি একমাত্র সঠিক বিশ্লেষণ? হতেও পারে আবার নাও হতে পারে। কর্মফল কাদের জন্য? যারা আধ্যাত্মিক পিপাসু তাদের জন্যই কর্মফল। আধ্যাত্মিক পিপাসুদের মনে কখন একটা প্রশ্ন খোঁচা দিল, মনকে শান্ত করার জন্য একটা উত্তর দিয়ে নিজের লক্ষ্যে এগিয়ে চল।

বেদ ঠিক এই জিনিসটাই করছে। মানুষের মধ্যে সৃষ্টি সংক্রান্ত, জগতের নানা প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক, বেদ তখন একটা উত্তর দিয়ে বলে দিচ্ছে – তুমি এর বেশি আর কিছু জানার চেষ্টা করো না, তোমার জীবন অতি ক্ষুদ্র, হাতে তোমার খুব অল্প সময়, এই সময়টুকু কাজে লাগিয়ে তোমার চরম লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চল। উপনিষদেও প্রশ্ন করা হয়েছে – *আপ্তকামস্য কা স্পৃহা*, ভগবান পূর্ণকাম হয়েও কেন তিনি সৃষ্টি করতে গেলেন। এই প্রশ্নের উপসংহার কি? এর উপসংহার সৃষ্টি বলে আদপেই কিছু নেই। তাহলে এগুলো কি দেখছি? যা কিছু দেখছ এগুলো তোমার মনের ভ্রম। এই তত্ত্ব কাদের জন্য? যারা খুব উচ্চ আধারের পুরুষ, তাদের জন্য জগৎ বলে কিছু নেই। কিন্তু আমাদের জন্য বলা হচ্ছে – প্রথমে এসেছিল বাসনা, *কামস্তদগ্রে*। পরে ফ্রয়েডাদি পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা এরই উপর অনেক থিয়োরি নিয়ে এলেন। প্রত্যেক মানুষের মনে প্রথম যে বাসনা আসে তা হল আমি কিছু সৃজন করব। সৃষ্টিতে প্রথম যাঁর আবির্ভাব, তাঁরও মনে সৃষ্টির বাসনা জেগেছিল।

চতুর্থ মন্ত্রের পরের লাইনে বলছেন *সতো বন্ধুমসতি নিরবিন্দন্ হৃদি প্রতীষ্যা কবয়ো মনীষা*, যাঁরা কবি, কবি মানে ঋষি, ত্রিকালদর্শি, শুধু ত্রিকালদর্শি নন, যে জিনিস সাধারণ দৃষ্টিতে অবোধগম্য সেটাও তাঁদের কাছে বোধগম্য। আর যাঁরা মনীষী, অর্থাৎ যাঁদের বুদ্ধি আছে প্রজ্ঞা আছে, যাঁরা যে কোন সমস্যার সমাধান করে দিতে পারেন। এই কবি, মনীষীরা অন্ধকারের আবরণকে ভেদ করে দিতে পারেন। বেদে অবতারের কথা নেই,

উপনিষদেও অবতার তত্ত্ব পাওয়া যাবে না, বেদ ও উপনিষদে যাঁরা উচ্চ আধ্যাত্মিক পুরুষ তাঁদের ঋষি বা কবি বলা হয়। মানুষের মধ্যে কবি সব থেকে উচ্চ পদ, কবির উপরে আর কেউ নেই। সেই অর্থে শ্রীরামকৃষ্ণ বেদের ভাষায় একজন কবি। বেদের সময়ে শ্রীকৃষ্ণ, যীশু এরা কেউ ভগবান বা দেবতা হতেন না, সবাইর উপাধি হত কবি। শ্রীরামকৃষ্ণের মত কবি ও মনীষীরা *সতো বন্ধুমসতি নিরবিন্দন্ হৃদি*, যখন ধ্যান করতে শুরু করলেন, ধ্যান করে যখন ধ্যানের গভীরে চলে গেলেন, গভীর থেকে আরো গভীরে চলে গেলেন তখন তিনি সৎ আর অসৎএর, শূন্য আর পূর্ণের মধ্যে কি সম্পর্ক, সেটাকে উপলব্ধি করলেন। কবিরা ধ্যানের গভীরে গিয়ে হৃদয়ে এই সত্য দেখতে পেলেন। এখানে জ্ঞানের উন্মোচন কিভাবে হয় তার বিবরণ দেওয়া হল। বাইরে থেকে কিছু জ্ঞান লাভ হয় না, যা কিছু জ্ঞান উপলব্ধি হবে সব হৃদয়েই হবে। ঠাকুর যখন নির্বিকল্প সাধনার চেষ্টা করে যাচ্ছেন তখন তিনি জ্ঞান অসি দিয়ে মাকালীকে দ্বিখণ্ডিত করে দিলেন, তারপর তাঁর মন মায়ার রাজ্য ছেড়ে শূন্যে বিলীন হয়ে গেল। জ্ঞান ও প্রজ্ঞার আলোকে যে উপলব্ধি হয়, এই বুদ্ধি ফিজিক্স, কেমেস্ট্রি, বায়োলজির থিয়োরি জানার বুদ্ধি নয়। এটাই আধ্যাত্মিক প্রজ্ঞা। এই প্রজ্ঞালোকে তাঁরা বুঝতে পারেন অস্তিত্ব আর অনস্তিত্বের মধ্যেকার যোগসূত্র, সৎ আর অসৎএর সম্পর্ক।

স্বামীজী মায়াকে ব্যাখ্যা করছেন দেশ, কাল ও কারণ দিয়ে। ব্রহ্ম এই দেশ, কাল ও কার্য-কারণের পারে, তিনিই এই মায়ার ভেতর দিয়ে জগৎ আকারে বহু রূপে প্রতিভাসিত হচ্ছেন। এই এক কি করে বহু হয়ে যায়? দেশ, কাল আর কারণ হল পর্দা। আমি, আপনি, গাছ-পালা, ঘরবাড়ি সব আছে, কিন্তু তথাপি বলছে সব কিছুর জন্ম হবার আগে তখন সৎও ছিল না অসৎও ছিল না। তাহলে কে জানল যে *নাসদাসীন্ নো সদাসীৎ?* ঋষিরাই জানলেন। কিভাবে জানলেন? ধ্যানের গভীরে। কোথায় দেখলেন? তাঁদের হৃদয়ে। সেইজন্য বারবার বলা হয়, আচার্যের কাছে যতই শোনা হোক, সারা জীবন ধরে শাস্ত্র অধ্যয়ন করে যেতে পারে, কিন্তু কিছুই হবে না। এখানে যা কিছু বলা হচ্ছে সবটাই সাধন সাপেক্ষ। ধ্যানের গভীরে যতক্ষণ না যাবে ততক্ষণ ধারণা হবে না। জপের গভীরেও নয়, এখানে জপও অত্যন্ত নিম্ন শ্রেণীর সাধনা। ধ্যানের গভীরে মানে, দিনে সাত ঘন্টা, আট ঘন্টা এক আসনে একটা ভাবকে নিয়ে বসে আছে। এক দিন দু দিন নয়, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর করলে একটু একটু করে বোঝা যাবে যে মায়ার আবরণ সরছে। তখন বোঝা যাবে সৎ ও অসতের, ব্রহ্ম ও জগৎ, নিত্য ও অনিত্য, অস্তিত্ব ও অনস্তিত্বের মধ্যে কি সম্পর্ক। তখন বোঝা যাবে সৎও নেই অসৎও নেই তথাপি কি করে হঠাৎ সৃষ্টি এসে যাচ্ছে। আবার সেই সৃষ্টির সময় যখন কিছুই ছিল না তার বর্ণনাও দিচ্ছেন। পরীক্ষাগারে গবেষণা করে এটা জানা যাবে না, ধ্যানের গভীরে গিয়ে ঋষিরা, কবিরা অনুভূব করেন – ও, এই ব্যাপার।

ঠাকুর বলছেন – নুনের পুতুল সমুদ্র মাপতে গিয়ে সমুদ্রে গলে মিশে গেল, তার আর খপর দেওয়া হল না। নুনের পুতুলের সত্তা সমুদ্রের সত্তার সাথে এক হয়ে গেল, তাহলে খবরটা আসছে কোথা থেকে যে নুনের পুতুল সমুদ্রে মিশে গেছে? ঠাকুর বলছেন – আমারও তাই হচ্ছিল, কিন্তু কে যেন আমাকে বাঁচিয়ে দিল, আমাকে পাথর করে দিল, আমার আর গলা হলো না। এর তাৎপর্য হচ্ছে – অনন্ত + এক = অনন্ত। অনন্ত হোটেলে ঢুকে পড়লে আর কেউ বেরোতে পারেনা। কিন্তু কোন কোন নির্দিষ্ট ব্যাক্তি পারেন। কারণ তাঁরা তাঁদের ব্যক্তি সত্তাকে সেই অনন্তের মধ্যেও ধরে রাখেন। নুনের পুতুল সমুদ্রে যাচ্ছিল, যেতে যেতে হঠাৎ এক দৈবশক্তিতে ম্যাজিকের মত নুনের পুতুল হয়ে গেল পাথরের। সে এখন সমুদ্রে ডুবে সব খবর নিয়ে আবার সমুদ্র থেকে বেরিয়ে এল। যদি সে বেরিয়েই চলে এল, তাহলে তো আরেকটা সমস্যা এসে গেল। সমস্যাটা হল, সেতো সমুদ্রে একাকার হয়ে যেত পারলো না, তাহলে কি খবর দেবে। কিন্তু আস্বাদন হয় বলে তার একটা অনুভূতি থেকে যায়। মন হল সান্ত আর ঈশ্বর অনন্ত, সান্ত মন যখন অনন্তের সাথে মিশে যায়, মনের ওখানেই নাশ হয়ে যায়। একটা ছোট পাত্রে গঙ্গার জল আছে, পাত্রের গঙ্গা জল গঙ্গায় ঢেলে দেওয়ার পর পাত্রের জলকে আর আলাদা করে দেখা যাবে না, কেননা সেই জল অনন্ত জলের সাথে মিশে একাকার হয়ে গেছে। এখন কেউ যদি মনে করে আমি ঐ পাত্রে যে জলটুকু ছিল সেই জলটুকুকেই ফেরত নিয়ে যাব। ধরা যাক পাত্রের গঙ্গাজলের চৈতন্য আছে। এখন এই ক্ষুদ্র চৈতন্য সেই বৃহৎ চৈতন্যে মিশে যাওয়ার পর তার কি

হবে আমরা চিন্তাই করতে পারব না। গঙ্গা বলবে আমি যা তুইও তাই। পাত্রে আবার গঙ্গাজল ভরে বাড়িতে ফিরে এল। বাড়ি ফিরে অন্যান্য আরও যে পাত্র আছে সে তাদের বলছে গঙ্গা যা আমিও তাই, কিন্তু এখন যে আমি বলছে এই আমিটা সেই গঙ্গার সঙ্গে নিজেকে অভেদ জ্ঞানে বলছে গঙ্গা যা আমিও তাই। কারণ পাত্র হিসেবে আলাদা কিন্তু গঙ্গা জল হিসেবে গঙ্গা যা আমিও তাই। পাত্র হিসেবে আলাদা আলাদা। তখন অন্য পাত্র বলছে গঙ্গা কতটা বড়? আরে ভাই কতটা বড় তা কি কখন বলা যাবে! কেন বলা যাবে না? স্বামীজী সেই কুয়োর ব্যাঙ আর সমুদ্রের ব্যাঙের গল্পে যেমন কুয়োর ব্যাঙ বলছে – তোমার সমুদ্র কি এই কুয়োর থেকেও বড়? না। কুয়োর এক দিক থেকে আরেক দিকে লাফ দিয়ে দেখিয়ে বলছে 'তোমার সমুদ্র কি এতটা বড়? সমুদ্রের ব্যাঙ ততই বলে যাচ্ছে – না। কুয়োর ব্যঙ বলছে – তুমি ধাপ্পা মারার জায়গা পেলে না! তাই হয়, এই পাত্র গঙ্গা থেকে ফিরে আসার পর বাড়ির বাকী পাত্রগুলি তাকে বলবে যত সব অযৌক্তিক আর গালগপ্পো।

ঠাকুরও বলছেন, কাকেই বা বলি আর কেই বা বুঝবে। কিন্তু ঋষিরা ধ্যানের গভীরে তাঁদের উপলব্ধ সত্যগুলিকে সমস্ত মানবজাতিকে শোনাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে বলেন, *শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্যপুত্রা আয়েধামানি দিব্যানি। নান্যপন্থা হয়নায়*। সবাই শোন আমরা সবাই সেই অমৃতের পুত্র, এটা না জানা ছাড়া কোন পথ নেই।

ঠাকুরকে নরেন জিজ্ঞেস করছেন – আপনি ঈশ্বর দর্শন করেছেন? ঠাকুর – হ্যাঁ করেছি। নরেন – আমাকে দেখাতে পারেন? ঠাকুর – হ্যাঁ দেখাতে পারি। ঠাকুর কিন্তু কখনই ঈশ্বর কি রকম বর্ণনা দিচ্ছেন না। কিন্তু বলছেন আমি দেখেছি তুইও দেখতে পারবি। একটি মেয়ে বিয়ের পর বাড়ি এসেছে, তার বন্ধু জিজ্ঞেস করছে – হ্যাঁরে স্বামী সুখ কি রকম? মেয়েটি বলছে – তোর যখন বিয়ে হবে তখন তুই বুঝতে পারবি। ঠাকুরও নরেনকে কোথাও বলছেন না যে ঈশ্বর এই রকম সেই রকম, বলছেন তুইও দেখতে চাইলে দেখতে পারবি। বেদ উপনিষদেও বলছে আত্মানুভূতি লাভ করতে হলে তোমাকে সব অতিক্রম করতে হবে, সংসারে বাঁধা থাকলে হবে না। বাইবেল আর কোরানে সাথে আমাদের এখানেই পার্থক্য। ওদের কাছে জগতটাই চরম সত্য, কিন্তু আমাদের কাছে এটাও মিথ্যা, একেও অতিক্রম করতে হবে। কারণ এগুলো অনন্তের বর্ণনা করতে চাইছে কিন্তু অনন্তের কখনই বর্ণনা হয় না। সৎ ও বলা যায় না, অসৎ বলা যায় না, কিছু ছিল না তাও বলা যায় না, ছিল তাও বলা যায় না, beyond nothingness and also beyond isness, এই উদ্ভট্ এক জিনিসের সাথে জগতের কি সম্পর্ক আমরা কি করে জানব! কারণ আমরা তো এর অনেক নীচে পড়ে রয়েছি। বাবার জন্মের খবর ছেলে কি করে জানবে। বাবার জন্মের কেউ যদি ভিডিও করে রাখে তাহলে অবশ্য দেখতে পারবে। ঋষিরা যে ধ্যান করে জানছেন এটাই ঠিক ভিডিও দেখার মত।

চতুর্থ মন্ত্রের শব্দগুলির অর্থও যে যেরকম করবে এর অনুবাদও সেইভাবে পাল্টে যাবে। *কামস্তদগ্রে সমবর্তুতাধি* – সৃষ্টির প্রথমে বলছেন সৎ ছিল না, অসৎও ছিল না। ঠিক আছে এটা না হয় বোঝা গেল, কিন্তু তারপরে কি হল? সেটাই বলতে গিয়ে বলা হচ্ছে – যিনি ছিলেন তাঁর মনে হঠাৎ কাম জাগল। এই কাম শব্দকে অনেকে, বিশেষ করে পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা নারী-পুরুষের যৌন ইচ্ছাকেই মনে করে। কিন্তু যাঁরা হিন্দু ধর্মের পরম্পরা ঐতিহ্যকে বিশ্বাস করেন তাঁরা কামের এই ধরণের ব্যাখ্যা কখনই মানবেন না। নাসদীয়সূক্তমের এই কামের অর্থ ইচ্ছা। এরপত্রই প্রশ্ন আসবে কিসের ইচ্ছা? সৃষ্টির ইচ্ছা। কিন্তু এটাই এক রহস্য, ভগবানের একটা নাম আপ্তকাম বা পূর্ণকাম তাঁর মনে কোন ইচ্ছার উদয় হবে কেন? উপনিষদের এক জায়গায় বলা হচ্ছে – *আপ্তকামস্য কা স্পৃহা*, মানে যিনি আপ্তকাম তাঁর আবার স্পৃহা কিসের। এই কারণেই বলা হয়, সৃষ্টি বিষয়ক কোন প্রশ্নেরই উত্তর কোন ভাবেই দেওয়া যায় না, যে ভাবেই ব্যাখ্যা করা হোক না কেন, সব ব্যখ্যাতেই একটা ফাঁক থেকে যাবে। প্রথমে বলা হয়েছিল এক ছিলেন, সে এক দুইএর পারই বলি আর যাই বলি যা ছিল সেটাকেই বলা হচ্ছে এক ছিল। কিন্তু সেই এক অখণ্ড থেকে বহু হল কি ভাবে? এক থেকে দুই আর মধ্যে যে যোগসূত্র বা বলা হচ্ছে *আনীদবাতং*, মানে শক্তির খেলা শুরু হল, সবই তো বোঝা গেলে, কিন্তু কেন শুরু হল?

বিজ্ঞানও এই কেনর কোন হদিস খুঁজে পাচ্ছে না। কিছু দিন আগে ফিজিক্সের একটা থিয়োরি এসেছে তাতে বলছে এই দৃশ্য জগতের যা কিছু আমরা দেখছি, গ্রহ, নক্ষত্র, নক্ষত্রপুঞ্জ সব কিছুর ওজন সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সমগ্র ওজনের মাত্র একশ ভাগের পাঁচ ভাগ। তাহলে বাকী ৯৫ ভাগ কি জিনিস? বিজ্ঞান বলছে এটা

জানার কোন উপায়ই নেই, অথচ আছে। এর মধ্যে যত বস্তু আছে তারা কোন আলোকে শোষণও করে না আবার কোন আলো বিকিরণও করে না। যখন কথা বলছি সেই সময় এই particles ক্রমাগত আমাদের শরীররে মাঝখান দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। আর আমাদের একজনের যা ওজন তার উনিশ গুণ বেশি ওজনের ঐ বস্তুগুলো এখানে রয়েছে। এটাই সবার কাছে এক রহস্য, ঋষিদের কাছেও এগুলো রহস্যময় ছিল। একটা পয়েন্টের পরে সৃষ্টির রহস্যের উত্তর দেওয়া যায় না। কিন্তু সাধারণ মনে প্রশ্ন উঠবে কেন সৃষ্টি হল? তখন বলবে – ইচ্ছা জাগল, *কামস্তদ্গ্রে*, প্রথমে কাম এল। উপনিষদেও পাই – আমি এক, আমি বহু হব। এই উপনিষদেই এক জায়গায় বলা হচ্ছে – *কামময় এবায়ং পুরুষঃ* – প্রথম যিনি পুরুষ তিনি কামময়। সচ্চিদানন্দ সচ্চিদানন্দই, কিন্তু যখন তাঁর মধ্যে ইচ্ছা এসে যায় তখন সচ্চিদানন্দের মধ্যেই যেন একটা বিভেদ এসে গেল। ইচ্ছে যার হবে তার মধ্যে তো চৈতন্য থাকতেই হবে। এই বোতলের কোন ইচ্ছে বোধ নেই, কেন নেই? এর কোন চৈতন্য নেই। যদি বোতলটা ভেঙ্গে একশ টুকরো হয়ে যায় তখন এর পেছনে দুটো সম্ভবনা থাকতে পারে। এক, হয় বাইরে থেকে কোন শক্তি এসে একে ধাক্কা মেরে ফেলে ভেঙ্গে দিয়েছে আর দুই, বোতলের ভেতরেই কিছু বিষ্ফোড়ণ হয়েছে। এই দুটোর বাইরে তৃতীয় কোন সম্ভবনা নেই।

আমি এই বোতলের মত নই, আমার মধ্যে চৈতন্য রয়েছে, কিছু করার আগে আমার মধ্যে ইচ্ছাকে জাগাতে হবে – এইটি আমি করব। সৎ আর অসৎ এই দুটোর পারে যখন বলছে তখন কিন্তু চৈতন্যকে বাদ দিচ্ছে না এই ইচ্ছাকে জাগ্রত করাটাই পার্থক্য করে দিচ্ছে। চৈতন্য যখন নিজেকে বহু করছেন তখন বলতে হবে এই বহু হওয়ার আগে তাঁর মনে ইচ্ছা এল। যারা পাগল তাদেরও মনে আগে ইচ্ছা জাগে তারপরই কোন কিছু করে। এটাকেই এখানে বলছেন *কামস্তদগ্রে সমবর্তুতাধি* – তার মনে আগে কাম জাগল। মনে হতে পারে এটা এমন কি আর নতুন কথা। আমাদের মনের যত রকমের আবেগ রয়েছে, এই কাম বা ইচ্ছাটাই হল প্রথম আবেগ। সেইজন্য বলা হয় জগতে যত রকমের সৃষ্ট পদার্থ রয়েছে তাদের সৃষ্টির প্রথমে রয়েছে কাম। কেন থাকে? কারণ, *কামময় এবায়ং পুরুষঃ*, যিনি প্রথম পুরুষ ছিলেন তিনি হলেন কামময়। তাঁর পুরো শরীরটাই কাম দ্বারা গঠিত। এই কাম বা ইচ্ছা কোন খারাপ বা নোংরা কিছু নয়।

মনসো রেতঃ – রেতঃ শব্দের আবার অনেক রকম অর্থ হয়। হিন্দীতে রেত কথার অর্থ বালি। রেত বলতে আবার নারীর শরীর থেকে এক ধরণের fluid নির্গত হয়, সেই fluid কেও রেত বলছে। আবার রেত বলতে যে কোন জিনিসের বীজকেও বোঝায়। এখানে বীজ অর্থেই ব্যবহার করা হচ্ছে – এটাই মনের প্রথম বীজ। মনের মধ্যে যাবতীয় যা কিছু হয়, শুধু যে আমার আপনার মনের মধ্যে হচ্ছে তা নয়, ভগবানের মনের মধ্যেও যা কিছু হচ্ছে তার মধ্যে প্রথম যে বীজ সেটা হল কাম। ফ্রয়েড আবার এই কামকে নিয়ে গেলেন প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে desire to mate আছে সেই পুরুষ-নারীর মিলনে, আর সেখান থেকে চলে গেলেন desire to destroy, শেষ করে দেওয়ার ইচ্ছা। এখানে একেবারেই তা নয়। প্রথম আসে অবিদ্যা, অবিদ্যার পরই আসে কাম, কামের পরেই আসে কর্ম। কাম এসে গেলে একটার পর একটা আসতেই থাকবে – কাম ক্রোধকে জন্ম দেবে, লোভকে জন্ম দেবে, একে একে মোহ, মদ, মাৎসর্য্য সব এসে যাবে। এগুলি থেকে নানা রকমে বন্ধন সৃষ্টি হবে, সেই বন্ধনকে জড়িয়ে তার আবার নানা রকমের জটিলতার জন্ম হবে। কিন্তু যিনি ভগবান, যিনি আদি পুরুষ, তাঁর এসব সমস্যা হয় না, কারণ তিনি বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ দিয়ে তৈরী। তাঁর মধ্যে শুধু সৃষ্টি করার কামটুকুই আছে, সৃষ্টি হয়ে গেলে সেই কাম সেখানেই শেষ। কিন্তু যারা সাধারণ তাদের মধ্যে যখন কামের জন্ম হয় তখন আর সেটা থামে না, কামের প্রক্রিয়া চলতেই থাকে।

উপনিষদ একেবারে পবিত্র ইচ্ছা বলতে বলছেন, ভগবানের মনে যেটা এসেছিল, *একোহম্ বহুস্যাম্ প্রজায়িনী* – আমি এক, আমি বহু হব। এই ভাবটাই সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে গিয়ে হয়ে যায় – আমি আমার সন্তানের মাধ্যমে অনেক হব। নিজের সন্তানের মাধ্যমে আমি বহু হব, এ্যামিবা থেকে শুরু করে ভগবান পর্যন্ত এটাই সাধারণ ইচ্ছা। ঠাকুর কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগের কথা বলছেন, কিন্তু উপনিষদে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ শব্দ নেই। সেখানে আছে পুত্রৈষণা ত্যাগ, এই ত্যাগের অর্থ – *একোহম্ বহুস্যাম্ প্রজায়িনী* – আমি এক, আমি বহু হব এই ইচ্ছা, সন্তান লাভের ইচ্ছাকে ত্যাগ করে দেওয়া। কিন্তু সন্তান লাভের ইচ্ছা ত্যাগ করে দিলে কি হবে,

ইচ্ছা ব্যাপারটা কি ত্যাগ হয়ে যাবে? হয় না, এই ইচ্ছাই তখন আবার নানান রূপ ধারণ করে নেয় – আমি একটা বই লিখেছি, আরও দশটি বই লিখব, আমি একটি বাড়ি করেছি এর পর আরও দশটি বাড়ি করব, একটি গাড়ি করেছি আরও চারটে গাড়ি করব। কোন না কোন ভাবে ইচ্ছা বর্দ্ধিত হতে থাকবে। সেইজন্য বলা হয় – পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা, লোকৈষণা ত্যাগ করতে। যা কিছু মনের মধ্যে হচ্ছে তার মূলে এই কাম।

পরের লাইনে বলছেন *সতো বন্ধুমসতি নিরবিন্দন্ হৃদি প্রতীষ্যা কবয়ো মনীষা* - এই লাইনে আবার একটা গভীর তত্ত্বকে তুলে ধরছেন। চিন্তা করলেই অবাক হয়ে যেতে হয়, আজ থেকে প্রায় সাত-আট হাজার বছর আগে ঋষিরা এ রকম একটা উচ্চ তত্ত্বের চিন্তা করে তাকে বাক্যে প্রস্ফুটিত করেছিলেন। নাসদীয়সূক্তের প্রথম লাইন ছিল – *নাসদাসীন্ নো সদাসীৎ তদানীং নাসীদ্রজো নো ব্যোমা পরো যৎ* - তখন সৎও ছিল না, অসৎও ছিল না, সৎ মানে যা কিছু দেখা যাচ্ছে, সৎ হল কার্য আর অসৎ তার কারণ। এখন বলছেন যিনি স্রষ্টা মানে ভগবান যিনি, তিনি কার্যও নন আবার কারণও নন, এই দুটো থেকে তিনি বিলক্ষণ আলাদা। কিন্তু মাঝখান থেকে দুটো উদ্ভট শব্দ এসেছে – অসৎ আর সৎ। হিন্দু ধর্মের এটাই বিরাট সমস্যা – অসৎ থেকে সৎ এর কি করে উৎপত্তি হল, আবার সৎ থেকে অসৎএর উৎপত্তি কি ভাবে হল? সৎ বলতে অনেক সময় ভগবানকে বোঝায়, কিন্তু সাধারণতঃ বলা হয় ভগবান সৎ অসতের পার। কিন্তু যিনি সৎ, সচ্চিদানন্দ, তিনি মায়াকে জন্ম দিলেন কি করে? যিনি চিৎ তিনি অজ্ঞানকে কি করে জন্ম দিলেন? সৎ ও অসতের উপর আমরা অনেক লম্বা আলোচনা করে যাচ্ছি, কিন্তু এখনও আমাদের কাছে ব্যাপারটা পরিষ্কার হচ্ছে না। বেদান্তে একটা কথা আছে রজ্জুতে সর্প ভ্রম। হৃষিকেষের দিকে এক আশ্রমে এক সন্ত মহাত্মা সব সময় তাঁর শিষ্যদের বোঝাতেন রজ্জু মে সাপ হ্যায়। আশ্রমের বাইরে দুই কাঙালী বসে থাকত কিছু খাবারের আশায়। অনেক দিন একই কথা শোনার পর এক কাঙালী আরেক কাঙালীকে বলছে – ইয়ে এক আজব কা সাপ হ্যায়, সাধুবাবা রোজ তাড়িয়ে দেয় আবার কোথা থেকে চলে আসে। সমস্ত বেদান্ত জুড়ে খালি এই রজ্জু আর সাপ, আমাদেরও এখন নাসাদীয়সূক্তম্ বুঝতে গিয়ে সৎ ও অসৎ নিয়ে পড়েছি।

এখানে বলতে চাইছেন, প্রথম সত্তা ভগবানের, তিনি সৎ অসৎ এর পার, তিনি সচ্চিদানন্দ। সেখান থেকে এসে গেল অবিদ্যা আর তার কার্য। যিনি সচ্চিদানন্দ, চিৎস্বরূপ, তাঁর অবিদ্যা আসে কি করে? এটাই রহস্য, দুধ থেকে যেন কালোর জন্ম হচ্ছে। কিন্তু দুধ থেকে কালোর জন্ম কখনই হতে পারে না। ঠিক সেই রকম সচ্চিদানন্দ থেকে কি করে অসৎ এর জন্ম হবে, অথচ তাঁকে অসৎ বলেও আখ্যা দেওয়া হয় না। আবার সেই অসৎ থেকে সৎ এর জন্ম হচ্ছে। ঈশ্বর, জীব, জগৎ ও মায়া, এই চারটে জিনিসের পারস্পরিক সম্পর্ক কিছুতেই মেলানো যায় না। ঈশ্বর বলতে সচ্চিদানন্দকেই বোঝায়। সচ্চিদানন্দে যখন মায়া এসে যাচ্ছে তখন আরও দুটো সত্তা এসে যুক্ত হচ্ছে – একটা জীব আরেকটি জগৎ। এখন ঈশ্বরের সাথে মায়াকে কিছুতেই মেলানো যাবে না। অন্য দিকে মায়ার সঙ্গে জীব আর জগৎকেও কিছুতেই মেলানো যায় না। তাই ঈশ্বরের সঙ্গে জীব ও জগৎকেও কখনই মেলানো যাবে না। অথচ সমস্ত শাস্ত্র, ইতিহাস, তন্ত্র, উপনিষদ, পুরাণ সবাই এই চারটের সম্পর্ককে নিয়েই নানান ভাবে আলোচনা করে যাচ্ছে। শুধু মাত্র হিন্দু ধর্মের শাস্ত্রেই নয়, কোরান, বাইবেল, গুরুগ্রন্থ সবাই এই চারটেকে নিয়েই আলোচনা করছে। কিন্তু ঈশ্বর, সে যারই ঈশ্বর হোক, খ্রীশ্চানের হোক, মুসলমানের হোক, তিনি আছেন আর তিনি সচ্চিদানন্দ। যিনি চৈতন্যস্বরূপ, যিনি আনন্দস্বরূপ, তাঁর মধ্যে নিরানন্দটা কোথা থেকে এলো, যিনি জ্ঞানস্বরূপ মাঝখান থেকে তাঁর মধ্যে এই অজ্ঞানটা কোথা থেকে চলে এল। সবই যদি সেই সচ্চিদানন্দ হয় তাহলে মানুষের মধ্যে হতাশা আসছে কেন, কেন তারা আত্মহত্যা করতে যাচ্ছে? যিনি সৎ স্বরূপ মানে তিনি সব সময়ই আছেন তাহলে মৃত্যু কেন দেখছি, কত কিছুর নাশ কেন হয়ে যাচ্ছে? এগুলোকে কিছুতেই মেলানো যাবে না। অথচ বলছে *সতো বন্ধুমসতি* – সৎ আর অসৎ হচ্ছে এক অপরের বন্ধু, এক অপরকে ছাড়া চলতে পারেনা। সৎ থাকলেই অসৎ থাকবে, অসৎ থাকলেই সৎ থাকবে।

সৎ আর এই অসৎএর মধ্যেকার এই সম্পর্ককে যদি উপমা দিয়ে আলোচনা করা যায় তাহলে ব্যাপারটা আরো ভালো পরিষ্কার হতে পারে। মনে করা যাক আমরা একটা ঘরে বসে আছি, ঘরটা পুরো অন্ধকারে ঢাকা। বাইরে থেকে কেউ যাচ্ছে, সে উচ্চ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করছে 'ঘরের ভেতরে কেউ আছে'? সবাই

যদি চুপ করে থাকে তাহলে সে ভাববে ঘরে কেউ নেই। তার কাছে ঘরটা পুরো অন্ধকারে ঢাকা, পুরো জিনিসটা অসৎ হয়ে গেছে। ঘরটা অসৎ হয়ে গেছে মানে, ঘরে কেউ আছে কি নেই এটা জানার কোন উপায় নেই। এখন হঠাৎ আলো জ্বলে উঠল, তারপর ঘর থেকে এক এক করে লোক বের হতে শুরু করল। তখন যে মনে করেছিল ঘরে কিছুই নেই সেই অবাক হয়ে ভাববে – বাবা, ঘরে এত কিছু ছিল! সব কিছুই আছে কিন্তু অসৎ, মানে কিছু যে আছে সেটাকে বোঝবার মত কোন চিহ্ন নেই, সৎ হচ্ছে এর ঠিক উল্টো যখন আমরা কোন লক্ষণ দেখে বুঝতে পারি যে এখানে অনেক কিছু আছে। আলো এসে গেলে বুঝতে পারলাম ঘরে অনেক কিছু আছে। এখানে সৎ অসতের মধ্যে এক হয়েছিল। সৎ এর জন্ম সব সময় অসৎ থেকেই হয়। ভোরের অন্ধকারে যেমন যেমন সূর্য উদয় হতে থাকবে তেমন তেমন আস্তে আস্তে পাখিরা ডাকতে থাকে, আলো যত একটু একটু করে ফুটতে থাকবে একটা একটা করে গাছ-পালা গুলি চোখের সামনে ভেসে উঠতে থাকে, মানুষ, গরু পশু চলাচল করতে শুরু করবে, তারপর সমস্ত কিছুই পরিষ্কার হয়ে সামনে চলে আসে। মনে হবে যে সমস্ত জগৎটা অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এল। সৃষ্টি যখন হয় তখন ঠিক এই রকমই হয়। অন্ধকার কোথাও কিছু নেই, মনে হয় যেন এখানে কিছুই নেই, তারপর আলো যেই ফুটে গেল তখন একটার একটা পর পর যেন বেরিয়ে আসতে থাকে। এই ভাবেই বলা যায় যে সৎ অসতের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে। তথাপি এর কোন অর্থই হয় না। অসৎ বা অবিদ্যা সচ্চিদানন্দ থেকে জন্ম নিচ্ছে এই ব্যাপারটাও আমাদের যেন চিন্তার বাইরে। অথচ বেদ নাসদীয়সূক্তমের মধ্য দিয়, যে নাসাদীয়সূক্তম্‌কে সমস্ত বিদ্বজ্জনরা গভীর দার্শনিক তত্ত্বের উদ্‌গাতা বলে মনে করেন, এই কথাই বলছে।

ম্যাক্সমূলারও নাসদীয়সূক্তমের অনুবাদ করতে গিয়ে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। ম্যাক্সমূলার এক জায়গায় বলছেন – বেদের ঋষিরা যেন হিমালয় পাহাড়ের চূড়ায় উঠছেন, একটার পর একটা চটিতে উঠেই চলেছেন, যেখানে সাধারণ মানুষের বাতাস নেই বলে বুক ফেটে যাবে, সেখানেও তাঁরা চলে গেছেন। তাঁদের বিবেক বুদ্ধিতে তীব্র সাধনার জোরে যেখানে চলে গেছেন সেখানে তাদের সমস্ত ভয় দূরীভূত হয়ে গেছে, কোন কিছু থেকেই তাঁর আর ভয় পাওয়ার নেই। মানে, যদি মনে করেন যে ব্যাপারটা অযৌক্তিক হয়ে যাচ্ছে, তখনও বলছেন – তাই হোক। কিন্তু তাঁর যে পরিষ্কৃত পবিত্র বুদ্ধি, সাধনা করে করে যে বুদ্ধিটা একেবারে স্বচ্ছ হয়ে গেছে, সেই সাধনাকৃত বুদ্ধি তাঁকে ঐখানে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা বলছি ভগবান থেকে অবিদ্যা কি করে জন্ম নিল, আমরা বলছি অসৎ থেকে সৎ কি করে আসছে? তাঁরা দেখছেন যে এটাই হতে হবে, এ ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন পছন্দ নেই। ফিজিক্সে অনেক নিয়ম আছে যেখানে অনেক কিছুকে মনে হবে যে এ রকম হতেই পারে না, অথচ ওটাই হয়।

তারপর বলছেন - *প্রতীষ্যা কবয়ো মনীষা।* ভগবানের সাথে অবিদ্যার কোন সংযোগ নেই অথচ বলছেন সংযোগ আছে, এটাকে কি করে জানছেন? স্বামীজী বলছেন – Sages who have searched their hearts with wisdom, যখন ধ্যান করবে আট ঘন্টা, দশ ঘন্টা দশ বছর, কুড়ি বছর ধরে, ধ্যান করে করে মরে গেল, তারপরে আবার জন্ম নিল, জন্ম নিয়ে আবার চলতে লাগল সেই এক সাধনা, এই ভাবে করে করে – *বহুনাং জন্মনামান্তে,* অনেক জন্ম সাধনা করে করে মন যখন পবিত্র হয়ে যাবে, হৃদয় একেবারে পরিষ্কার হয়ে গেছে, তখন যখন প্রজ্ঞার আলোক হৃদয়ে উদ্ভাসিত হয় তখন এই জিনিসটাই পরিষ্কার হয়ে স্পষ্ট হয়ে দেখা যায়। আধ্যাত্মিক সত্য এই পরিষ্কৃত শুদ্ধ হৃদয়েই উপলব্ধি হয়। এক জন্মে কিছুই হয় না, জঙ্গল পরিষ্কার করতে, হৃদয়ের আগাছা পরিষ্কার করতে করতেই অনেক জন্ম কেটে যায়। বেদের ঋষিরাও জানতেন আমি যে আধ্যাত্মিক সত্যকে দেখতে পারছি, এই সত্যকে সাধারণ মানুষকে কোন মতেই বোঝান যাবে না। গীতা, উপনিষদ, রামায়ণে বার বার একটা কথা আমাদের জন্য বলা হয়েছে – বাপু, তুমি এটা বুঝতে পারবে না। কেনোপনিষদে আছে গুরু শিষ্যকে উপদেশ দিয়ে যাচ্ছেন, একটার পর একটা কথা বলে যাচ্ছেন, শিষ্য বিরক্ত হয়ে বলছেন – হে গুরুদেব, আপনি আমাকে উপনিষদের শিক্ষা দিন। গুরুও শিষ্যের প্রতি স্নেহ পরবশ হয়ে বলছেন – আমি তো তখন থেকে তোমাকে উপনিষদই বুঝিয়ে যাচ্ছি।

আমরা এখানে ঋষিদের কথাই আলোচনা করছি। এক একটি কথাকে বোঝাবার জন্য কত রকমের উপমা নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা আলোচনা করে করে একটা মন্ত্রের এ চতুর্থাংশও শেষ করতে পারছি না। এতো আলোচনার পরেও আমরা পুরোপুরি সংশয়মুক্ত হয়ে বুঝতে পারছি না। এই জিনিসটাকেই সাত-আট হাজার বছর ধরে ভারতের সব থেকে উচ্চ মস্তিষ্কের অধিকারী ঋষিরা সারাটা জীবন ধরে মুখস্ত করে গেছেন, চিন্তন করে গেছেন, বিভিন্ন ভাষ্য রচনা করে গেছেন, বিদেশী পণ্ডিতরা এই সব দার্শনিক তত্ত্ব দেখে হাত তুলে দিচ্ছেন। আর এই সব তত্ত্বকে আমরা বিশ্বাসই করতে পারছি না। সাধুরা যে কালে বলছে তাই মেনে নিচ্ছি। বিজ্ঞানেরও যে কোন তত্ত্বের যে আবিষ্কার হয়, যেমন নিউটনের মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম, আইনস্টাইনের Theory of Relativity বা Laws of Quantum একদিনে আসেনি, অনেক দিন ধরে খাটতে খাটতে, সাধনা করতে করতে হঠাৎ মনের মধ্যে একটা সত্য উদ্ভাসিত হতেই বুঝে গেল যে এটা থেকে এই হয়। বেদের এই তত্ত্বগুলিও ঠিক তাই। এই তত্ত্বগুলি কাদের মধ্যে ধরা পড়ে? যে ঋষিদের হৃদয় একেবারে পরিষ্কার, নির্মল, স্বচ্ছ হয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, বলছেন – *ইতি প্রতীষ্যা কবয়ো মনীষা,* তাঁরা নিজেদের প্রজ্ঞা, বুদ্ধিকে যখন প্রয়োগ করেন তখন তত্ত্ব গুলিকে তাঁরা ধরতে পারেন। আমি আম গাছের তলায় মুখ হাঁ করে বসে আছি আর গাছ থেকে আমটা এসে আমার মুখে পড়বে, তা কখন হয় না।

প্রথমে চলে সাফাইয়ের কাজ, মনকে একেবারে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করা হয়, তারপর যুক্তি দিয়ে বিচার দিয়ে নিজের প্রজ্ঞা দিয়ে বুদ্ধিকে ক্ষুরধার করা হয়। ক্ষুরধার বুদ্ধিকে এবার যখন প্রয়োগ করতে শুরু করবেন, তখন একটা তত্ত্ব বেরিয়ে আসবে। কি তত্ত্ব? যেমন বলছেন সৎ আর অসৎ যুক্ত হয়ে আছে, সৎ এর জন্ম অসৎ থেকে, যা কিছু কার্য আছে তার কারণ হল অব্যক্ত। এরপর আমরা বুঝি আর নাই বুঝি তাতে ঋষির কিছু যায় আসে না। আমাদের সাধারণ বুদ্ধি বলে ছেলে থাকলে তার মাকেও থাকতে হবে। মাও সন্তান তাই তারও একজন মা আছেন। এইভাবে বিচার করতে করতে শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে ব্যাপারটা দাঁড়াবে আমরা ভাবতেই পারব না, কারণ আমাদের বুদ্ধি সেখান পর্যন্ত পোঁছাতেই পারবে না। দীর্ঘকাল ব্যাপি সাধনা করে করে হৃদয় পরিষ্কার হলে তখন বুঝতে পারবে। গীতার পঞ্চোদশ অধ্যায়ে ভগবান বলছেন – *উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্। বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ (১৫/১০)*।। মানুষ জাগ্রত অবস্থায় খাওয়া-দাওয়া করছে, কর্ম করছে আবার ঘুমিয়ে পড়ছে, সমস্ত কিছুর পশ্চাতে আত্মা আছেন বলেই এত কিছু হচ্ছে, *বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি,* মানে যারা বিমূঢ়, সাধারণ লোকেরা এটা দেখতে পায় না। তবে কারা দেখতে পান? *পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ,* যাঁদের জ্ঞান চক্ষু খুলে গেছে তাঁরাই দেখতে পান – ভেতরে আত্মা আছেন বলেই শরীর কাজ করতে পারছে। যতই বক্তৃতা শুনি, যতই শাস্ত্র অধ্যয়ন করি কোন কিছুতেই হবে না, এগুলো সাধনা সাপেক্ষ। সাধনা হল হৃদয় মনকে পরিষ্কার করা।

দু ধরণের লোকের মন পরিষ্কার হয়। এক যারা অতি মুর্খ, মুর্খতমের থেকেও মুর্খ। প্রত্যন্ত গ্রামের আদিবাসীরা চুরি করে না, মিথ্যা কথা বলে না। গ্রামের লোকেদের মত সৎ লোক পাওয়া যাবে না, ওরা জানেই না চুরি করা কাকে বলে, মিথ্যা কথা কাকে বলে। খুব সহজ সরল, এদের মনটাও তাই খুব পরিষ্কার। কিন্তু এদের জীবনচর্চার গতি ওখানেই থেমে থাকে, তাই এদের দ্বারা কিছু হয়ও না। দুই উচ্চতম ঋষি যাঁরা, এঁদের মন সব সময় পরিষ্কার। এই দু ধরণের লোকের মাঝখানে যারা আছে, আমাদের মত যারা, এরা সবাই গোলমেলে। কিছু হলেই বলবে – আপনি কি আমায় মিথ্যেবাদী বলে মনে করেন? মিথ্যেবাদী বলার অপেক্ষা কোথায়, মিথ্যেবাদী তো আছই। প্রত্যেকটি মানুষ একজন potential criminal, কিছু মানুষ আছে যারা পুলিশ, সমাজের ভয়ে করতে পারে না, কিছু লোক পরিবারের ভয়ে করে না, আর বেশির ভাগ লোক সুযোগ পায় না বলে করে না। যারা রাষ্ট্র ক্ষমতার বাইরে রয়েছে তারা এখন চেঁচাচ্ছে। কিসের জন্যে? সত্তা চাই। সত্তা যখন পেয়ে যাবে তখন এখন সত্তাধারীরা যা করছে তারাও ওটাই করবে। আমি এখন সৎ কারণ আমি চুরি করার সুযোগ পাচ্ছি না। এই কথা শোনার পর যদি কেউ বলে – আপনি কি আমাকে চোর মনে করছেন? চোর মনে করব কি, আসলে তুমি একজন potential ডাকাত। আর গ্রামের যে সব লোকেদের কথা বলা হল, এরাও এক এক জন potential ডাকাত, ওদের এখনও বুদ্ধিই জাগ্রত হয়নি তাই চুরিও করতে পারে না।

ঠাকুর বলছেন – যে নাচতে জানে তার কখন বেতালা পা পড়ে না। ঘুম থেকে তুলে নাচাতে শুরু করলেও তার বেতালা পা পড়বে না। ঠাকুর, স্বামীজীর মত ব্যক্তিত্বকে দিয়ে চেষ্টা করেও ভুল কাজ করান যাবে না। খুব সহজ উদাহরণ দিলে বোঝা যাবে। আমরা হলাম চরিত্রবান পুরুষ, অপরের মেয়ের দিকে, পরস্ত্রীর দিকে বা পর পুরুষের দিকে নজর দিই না। সত্য হল, আমাদের সেই সুযোগই নেই নজর দেব কি করে, আমাদের সেই পরীক্ষাই এখনও হয়নি। মথুরবাবু ঠাকুরকে নর্তকীর বাড়িতে নিয়ে গেছে, ঘরে ঢুকেই ঠাকুর 'মা' 'মা' বলে সমাধিস্ত হয়ে গেলেন, এটাই চরিত্র। মানে, ঠাকুর যদি খারাপ কিছু করতেও চাইতেন পারতেন না। ঠাকুরের উপমাতেই বলতে হয় – পরশমণির ছোঁয়া লেগে তরবারি সোনা হয়ে গেছে, সেই তারবারি দিয়ে আর হিংসার কাজ হবে না। যতক্ষণ আমাদের সেই পরশমণির স্পর্শ না হয়ে থাকে ততক্ষণ প্রত্যেকেই, সেই তথাকথিত বাবাজী বা নেতা থেকে শুরু করে একেবারে সামান্য কুলি মজুর পর্যন্ত সবাই সমান, কেউ উনিশ আর কেউ সোয়া উনিশ। এখন যে মন তা হল একটা potential criminal, একটা potential fraud, যে মন আগাছা আর জঙ্গলে ভর্তি হয়ে আছে, সেই মন দিয়ে কি আর সৎ আর অসৎ পরস্পর সম্পর্ক যুক্ত, অসৎ থেকে সৎ এর জন্ম হচ্ছে বুঝতে পারবে না ধারণা করতে পারবে! এই তত্ত্বগুলি আবিষ্কার করা দূরে থাক, বোঝা বা ধারণা করাই অসম্ভব। এই জিনিসগুলি কারা বুঝবেন? যাঁদের মন একেবারে পরিষ্কার হয়ে গেছে তাঁরাই বুঝতে পারেন যে সৎ আর অসৎ বন্ধু, বন্ধু মানে দুটো আলাদা কিছু নয়।

হৃদি প্রতীষ্য মানে হৃদয়ে জানতে পারে। বাইরে কিছু দেখে তার মনে হচ্ছে তা নয়, যেমন আমরা এই বোতল দেখছি, মাইক্রোফোন দেখছি, এখানে বাইরে থেকে কিছু হচ্ছে না। এই ধরণের সমস্ত জ্ঞান ভেতরে নিজের মনের মধ্যেই পরিষ্কার জাগ্রত হয়। আইনস্টাইন $E = MC^2$ দেখছেন, তিনি কোথায় দেখছেন? আসলে সবাই এই সত্যগুলিকে মনের মধ্যেই দেখেন। $E = MC^2$ যেটা দেখেছেন সেটা বাইরে অঙ্কের মাধ্যমে কষে কষে বার করেছেন, কিন্তু এর পেছনে বিজ্ঞানের যে সত্যটা রয়েছে, সেটাকে তিনি মনের মধ্যে দেখেছেন। তখন থেকে যে আমরা সৎ অসতের কথা বলে আসছি, এই দুটোর মধ্যে প্রকৃত পক্ষে একটা সম্পর্ক রয়েছে, এই সত্যটাই শুদ্ধ মন আর পবিত্র হৃদয়ের দ্বারাই আবিষ্কৃত হয়। এই সত্যই উত্তরকালে একই ধরণের শুদ্ধ মন ও শুদ্ধ হৃদয়ের অধিকারী পুরুষের দ্বারা যাচাই হয়ে যায়। আমাদের মত সাধারণ মানুষ শুধু শ্রবণ করে যাব, ধারণা করা বা উপলব্ধি করা যাবে তখনই যখন আমাদের মনও ঐ রকম শুদ্ধ ও পবিত্র হবে।

তিরশ্চীনো বিততো রশ্মিরেষামধঃ স্বিদাসী৩দুপরি স্বিদাসী৩ৎ।
রেতোধা আসন্মহিমান আসন্‌ৎস্বধা অবস্তাৎ প্রযতি পরস্তাৎ।।৫।।

পঞ্চম মন্ত্রে সৃষ্টিটা কিভাবে হল বলছেন। কাম আসার পর সৃষ্টি হতে শুরু করেছে, সৃষ্টি শুরু হওয়ার পর পুরো জিনিসটাকে যেন প্রসারিত করে ছড়িয়ে দিল। জিনিসটা যেটা ছোট ছিল সেটা এখন বাড়তে শুরু করেছে। প্রথমে বলেছিল কিছুই নেই, কেননা অসৎ থেকে সৃষ্টি হচ্ছে, এবার প্রথম আলো বিকশিত হয়ে সৃষ্টি যেন এগোতে শুরু করল। এই আলোকে বলছেন রশ্মি। বলছেন, যে জায়গাতে সৃষ্টি হবে সেখানে পুরোটা যেন রশ্মির মত ছেয়ে গেল। সূর্যের কিরণ যেমন সর্বত্র ছড়িয়ে যায়, ঠিক তেমনি অবিদ্যা, কাম ও কর্ম সব ছড়িয়ে গেল। ছড়িয়ে গিয়ে নানান রকম কার্যবর্গে পরিণত হয়ে গেল। এটা কারণ, এটা কার্য, এটা ভোগ্য, এটা ভোক্তা এভাবে বিভাজন হয়ে ছড়িয়ে গেল। রশ্মির অর্থ হতে পারে আলো বা কিরণ অথবা দড়ি।

অধঃ স্বিদাসীদুপরি স্বিদাসীৎ, এই কামবীজ, অজ্ঞান বীজ দুম্ করে চারিদিকে ছড়িয়ে গেল। মনে করা যাক একটা ঘরে লোকজন এবং আরও অনেক কিছু রয়েছে। ঘরটাকে ছোট করতে করতে পয়েন্ট সাইজে করে দেওয়া হল। ধরা যাক এই পয়েন্ট সাইজটা রাবারের দড়ির মত। এখন কোন সৃষ্টি কর্তা এলেন। তিনি এই পয়েন্ট সাইজের রাবারটাকে টানতে শুরু করলেন। যখন টানতে শুরু করলেন, ঐ পয়েন্ট সাইজটাও আস্তে আস্তে বাড়তে বাড়তে তার আগের স্বাভাবিক সাইজে ফিরে এল। এর বিস্তার চারিদিকে হতে থাকে। ওপর নীচে, ডান দিক থেকে বাম দিকে, আড়াআড়ি আবার লম্বালম্বি ভাবে চারিদিকে বিস্তার হতে থাকে। তিনটে দিকেই একসাথে টানতে শুরু করেছে, নীচের দিকে, উপরের দিকে আর আড়াআড়ি। *রেতোধা আসন্মহিমান* –

যিনি এই রেতকে ধারণ করে আছেন তিনিই সবার উপরে আর রেত হল নিকৃষ্ট। বলতে চাইছেন যখন সৃষ্টি হল তার কিছু কিছু ছিল সাধারণ আর কিছু কিছু ছিল মহিমা যুক্ত মানে powerful। আমরা মনে করছি সৃষ্টিতে সব সমান, ভক্তদের মাঝে কেউ ছোট নয় কেউ বড় নয় সবাই সমান, তা কিন্তু নয়। *আসনৎস্বধা অবস্তাৎ প্রযতি পরস্তাৎ* - যিনি ভোক্তা তিনিই শ্রেষ্ঠ আর যেটা ভোগ্য সেটা নিকৃষ্ট। সৃষ্টি যখন হয়েছে তখন সেখানে তো দুই নেই, তিনি নেই, সৃষ্টিতে রয়েছেন সেই এক ভগবান। তাঁর নিজেরই শক্তি অবিদ্যাকে আহ্বাণ করলেন, তাঁর মনে যেন কাম এসে গেল। কাম এসে যাওয়া মানে সৃষ্টির বীজ এসে গেল। তিনি নিজেকেই যোনি করেছেন আর তার মধ্যেই যখন কাম প্রবেশ করেছে তখন সৃষ্টি হতে শুরু হল। সৃষ্টির শুরু হয়ে গেল, এবার সৃষ্টিতে বিভিন্ন কার্যবর্গের বিভাজন এসে গেল। বিভাজন দাঁড়াতেই যিনি সচ্চিদানন্দ, অবিদ্যার দরুণ এবার সেই সচ্চিদানন্দের মধ্যে দুটো বিভাজন হয়ে গেল – ভোক্তা আর ভোগ্য। সচ্চিদানন্দই ভোক্তা সচ্চিদানন্দই ভোগ্য। নির্বাণষটকম্এ আচার্য শঙ্কর বলছেন *অহং ভোজনং নৈব ভোজ্যং ন ভোক্তা চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহম্*, আমি ভোগ্যও নই ভোক্তাও নই, আমি সেই চিদানন্দস্বরূপ শিবোহহম্, এই ভাবটা তিনি এখান থেকেই গ্রহণ করেছেন। যিনি সচ্চিদানন্দ তিনি ভোক্তা তিনিই আবার ভোগ্য। তিনিই সাপ হয়ে দংশন করেন তিনিই ওঝা হয়ে বিষ নামান। তিনিই ব্যাধি রূপে মানুষের প্রাণ হরণ করেন তিনিই আবার বৈদ্য হয়ে ব্যাধি নিরাময় করেন। এর মধ্যেই আবার বলছেন, ভোক্তা সব সময় শ্রেষ্ঠ আর ভোগ্যটা নিকৃষ্ট।

এই জায়গায় এসে ভাষ্যকাররা অনেক কিছু ব্যাখ্যা করছেন। সচ্চিদানন্দই আছেন, কিন্তু তার মধ্যে যেন একটা স্পষ্ট বিভাজন দেখা যাচ্ছে – Superior & Inferior। Superior-inferior এসে গেছে মানে ভোক্তা আর ভোগ্য এসে গেল। ভোক্তা আর ভোগ্যের মধ্যে ভোক্তা Superior আর ভোগ্য Inferior। এই বিভাজনের মধ্যেই জীবন-দর্শন এসে যায়। গীতায় ভগবান পরা প্রকৃতি আর অপরা প্রকৃতির কথা বলছেন, পরা প্রকৃতি মানে চৈতন্য আর অপরা প্রকৃতি মানে জড় বা প্রকৃতি। যিনি চৈতন্য তিনিই অপরা প্রকৃতিকে ভোগ করেন। সেইজন্য যিনি ভোগ করেন সব সময় তিনিই উপরে থাকবেন। আর যাকে ভোগ করা হচ্ছে তাকে সব সময় নীচেই থাকতে হবে। তাহলে জীবনের উদ্দেশ্য হল ভোক্তা হওয়া। আমি বলতে পারি যে, আমি ভোক্তা ভোগ্য কোনটাই হতে চাই না, কারণ সচ্চিদানন্দ ভোক্তা-ভোগ্যের পারে। খুব ভালো কথা ঠিকই, কিন্তু যখন দ্বৈত জগৎ থাকবে তখন সেখানে ভোক্তাও থাকবে ভোগ্যও থাকবে। ব্যবহারিক জীবন দ্বৈত জগতের মধ্যেই সব সময় চালাতে হবে। তাই এই জগতে ভোক্তা হওয়াটাই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। এখানেই বলা হচ্ছে যে উঁচু নীচু প্রভেদ প্রথম থেকেই করা হয়েছে। নরেন রাখাল এরা চিরদিনই আলাদা। ধনী-দরিদ্র চিরকালই থাকবে, সামাজিক পরিবর্তনে মাঝে মাঝে ধনী দরিদ্র হয় আর দরিদ্র ধনী হয়, কিন্তু অসাম্য চিরকালই থাকবে। বেদের মতেই – inequality is the law of life, যেটা খাদ্য সে ছোট আর যে খাচ্ছে সে বড়। গাধা মানুষের বোঝা বহন করে, তেমনি মানুষরাও দেবতাদের বোঝা বহন করে চলেছে। আর আমরা বড়লোকেদের বোঝা বহন করি। মানবজীবন পুরোটাই পরজীবত্বের অস্তিত্ব স্বরূপ। আমরা সবাই কাউকে না কাউকে নিংড়ে যাচ্ছি। যে নিংড়াচ্ছে সেই শ্রেষ্ঠ আর যাকে নিংড়ে নিচ্ছে সেই হয়ে যায় অধম। শেষ যিনি চুষে যাচ্ছেন তিনি হলেন পুরুষ, একা তিনি প্রকৃতিকে চুষে যাচ্ছেন। প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা, পুরো সৃষ্টি প্রকৃতি থেকেই এসেছে। প্রকৃতি কেন? পুরুষের ভোগের জন্য। যতক্ষণ এই পুরুষ অর্থাৎ শেষ ভোক্তা না হচ্ছে ততক্ষণ মুক্তি হবে না। ভোগ্য আর ভোক্তার পারে যদি যেতে হয় তাহলে আপনাকে শেষ ভোক্তা অর্থাৎ পুরুষ হতে হবে। পুরুষ হওয়া মানেই পূর্ণ শক্তির অধিকারী হতে হবে। ভেতরে পূর্ণ শক্তির বিকাশ না হওয়া পর্যন্ত কারুর না কারুর ভোগ্য হয়ে থাকতে হবে। ঘোড়া গাধা যেমন মানুষের বোঝা বয়ে বেড়ায়, মানুষ তেমনি দেবতাদের বোঝা বয়ে বেড়ায়। মানুষ তাই দেবতাদের ভোগ্য। দেবতারাও আবার আরেকজনের ভোগ্য। যখন সব কিছু থেকে অনাসক্ত হয়ে যাবে, কিছুই চাইছে না, তখন সবাই তার কাছে আসবে। অনাসক্ত হয়ে যাওয়া মানে, তার যে স্বাভাবিক অবস্থা সেই অবস্থা থেকে তার কখনই বিচ্যুতি নেই। ভোগ্য মানেই কখন আনন্দ পাওয়া কখন কষ্ট পাওয়া। যতই আনন্দের বস্তু হোক সেই জিনিসের প্রতি কখন না কখন আমাদের বিরক্তি আসবে। ঠাকুরের যেমন ঈশ্বরীয় কথা থেকে কখনই বিরক্তি নেই, কারণ ওটাই তাঁর স্বাভাবিক অবস্থা। যখন পরা প্রকৃতির অবস্থায় চলে গেল

তখন তার সামনে থেকে যায় অপরা প্রকৃতি। তখন তিনি হলেন সেই সচ্চিদানন্দ আর এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হল প্রকৃতি, তাঁর ভোগের জন্য। সেখান থেকে দেখেন পরা অপরা বলে আলাদা কিছু নেই, এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ছাড়া কিছু নেই, এটাই শেষ কথা। কিন্তু তার আগে পর্যন্ত ভোগ্য আর ভোক্তা থাকবেই।

সৃষ্টি থেকে সব কিছু বেরিয়ে আসছে, ব্যাপারটা এত দ্রুত গতি সম্পন্ন হতে থাকে যে আমরা সঠিক করে বলতে পারবো না যে এটার পর সেটা, সেটার পর এটা আসছে। বিগব্যাঙ থিয়োরি আবিষ্কারের পর বিগব্যাঙকে বোঝাবার জন্য আমেরিকায় একটা খেলনা বেরিয়েছিল, যার নাম ছিল Ultimate Plastic, তার মধ্যে একটা ছোট্ট প্লাস্টিকের কিউব্ থাকত যেটাকে টানা যেত। পুরোটাই সলিড প্লাস্টিক, ঐ কিউবের মধ্যে ছোট ছোট বল এমন ভাবে থাকত, টানা হলেও বল গুলির সাইজ পাল্টাত না। বাচ্চাদের বলা হত দু দিকে দড়ি লাগিয়ে কিউবটা টানতে থাক। যখন টানা শুরু হত তখন এই ছোট্ট কিউবটা তিন দিকে বাড়তে বাড়তে পুরো ঘরের সাইজের হয়ে যেত। Galaxy গুলো দেখানোর জন্য বল গুলো রাখা থাকত।

মডার্ন ফিজিক্সে space এর যে ধারণা, এখানেও বলতে চাইছেন সেই spaceকে সৃষ্টির শুরু হতেই যেন প্রসারিত করে দেওয়া হল। আর এই space এখনও প্রসারিত হয়েই চলেছে। কিভাবে হচ্ছে? জড় আছে আর প্রাণ রয়েছে, প্রাণ এই জড়ের উপরে হাতুড়ির মত আঘাত করে যাচ্ছে, আগে যেমন বলা হয়েছিল *আনীদবাতং*, এখানেও ঠিক ঐ রকম বলা হচ্ছে। Space, matter যা কিছু আছে তার উপর আঘাত হয়েই চলেছে আর একটার পর একটা সৃষ্টি হয়েই চলেছে।

সৃষ্টি যখন হতে শুরু করল তখন পুরো ব্যাপারটা এত দ্রুত গতিতে সৃষ্টি হতে লাগলো যেন চোখের পলক পড়তে যত সময় লাগে তার থেকেও দ্রুততার সাথে তৈরী হয়েছে, তাই বলা মুশকিল যে আকাশ থেকে বায়ুর সৃষ্টি হল না বায়ু থেকে আকাশের সৃষ্টি হল। এখানে ভাষ্যকারদের বক্তব্য হচ্ছে – যখন সৃষ্টি হতে শুরু হয়েছে তখন প্রথমে এসেছে আকাশ, আকাশ থেকে বায়ু, এইভাবে একটার পর একটা, অগ্নি, পৃথিবী ও জল সৃষ্ট হয়েছে। এগুলো সৃষ্টি হওয়ার পরেই জড় পদার্থ সকল আর জীব সকলের জন্ম হল। তবে পরের দিকে যুক্তির দিক দিয়ে দেখার সময় বোঝা যাচ্ছে যে বায়ু থেকে আকাশের ব্যাপারটা যুক্তি বিচারে দাঁড়াচ্ছে না। ফিজিক্সেও বলছে বিগব্যাঙ যখন বিস্ফোরণ হয় তখন এক সেকেণ্ডের মধ্যে কি হয় বোঝাই যায় না। সেই সময় তাপমান যে অবস্থায় চলে যায় সেটা আমরা কল্পনাই করতে পারিনা। কিন্তু ঋষিরা বলে দিচ্ছেন কোনটার পর কোনটা সৃষ্টি হয়ে হয়ে শেষে matter and light এই দুটো বেরিয়ে এল। যেটাই যেটার পরে আসুক না কেন, এনারা বলছেন পুরো ব্যাপারটাই এক নিমেষের মধ্যে সৃষ্টি থেকে বেরিয়ে আসছে। সেগুন গাছ লাগান হল, তারপর কবে বড় হবে, আর কবে তার কাঠ থেকে আসবাব তৈরী হবে আমরা জানিনা, সৃষ্টি কিন্তু সেই ভাবে হচ্ছে না। নিমেষের মধ্যে হয়ে যাচ্ছে, একটার পর একটা যেন সাজান ছিল আর আঘাত করতেই দুম্ করে বেরিয়ে আসছে। কে আঘাত করছে? শক্তি বা প্রাণ যাই বলা হোক না কেন, সেই আঘাত করে যাচ্ছে।

কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্রবোচৎ কুত আজাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ।
অর্বাগ্‌দেবা অস্য বিসর্জনেনাহথা কো বেদ যত আবভূব।।৬।।

পরের মন্ত্রে এসে আবার অন্য ধরণের কথা বলছেন। সৎ অসতের কথা, *আনীদবাতং* energy matter এর উপর আঘাত করছে, এগুলো ঋষিরা পবিত্র হৃদয়ে জানতে পারেন। এত কথা বলার ষষ্ঠ মন্ত্রে বলছেন – *কো অদ্ধা বেদ*, কে জানে! সৃষ্টির ব্যাপারে এত যে কথা বলা হল এগুলো কে ঠিক ঠিক জানে, আর কেই বা ঠিক ঠিক বলবে? কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে, কোথা থেকে এই সৃষ্টি এল, কোথায় যাবে, সৃষ্টির আগে কি ছিল, এগুলো কে বলবে? যিনি বলছেন সেতো দূরের কথা, আদপে এগুলো কেউ জানে কিনা সেটাই কেউ বলতে পারছে না। যেমন আমরা অনেক সময় অনেক কিছু জানি কিন্তু বলতে পারিনা। কিন্তু এখানে বলছেন – বলা তো দূরের কথা, এটা কেউ জানেও কিনা সন্দেহ হয়। মানুষের কথা ছেড়ে দাও, দেবতাদেরও জন্ম সৃষ্টির অনেক পরে। দেবতাদের আগে কি হয়েছে কে জানবে! সেইজন্য কে বলতে পারবে সৃষ্টি কোথা থেকে শুরু হয়েছে আর কিভাবে শুরু হয়েছে। এটাই বেদান্তের মূল বাক্য। ভাই! এটাকে বলা যাবে না। গানে বলছেন,

ব্রহ্মাণ্ড ছিল না যখন মুণ্ডমালা কোথায় পেলি। একেই বলে সততা, ঋষিরাও স্বীকার করে নিচ্ছেন। একটা অবস্থার পর আর ধরা যায় না, নাসাদীয়সূক্তম্ নিজেই বলে দিচ্ছে যারা খুব নিশ্চিত হয় দৃঢ়তার সাথে যুক্তি দিয়ে সৃষ্টির সম্বন্ধে সব কথা বলে দেন, তাদেরকে বলছেন – বেদের ঋষি, উপনিষদের ঋষিরা কি সত্যিই জানেন জিনিসটা? চতুর্থ মন্ত্রে বলেছিলেন – ঋষিরা হৃদয়ের পবিত্রতার পরাকাষ্ঠায় চলে গিয়ে নিজেদের প্রজ্ঞাকে সেখানে লাগিয়ে তাঁরা কিছু জিনিস আবিষ্কার করেছিলেন। কিন্তু প্রমাণ কোথায় তাঁরা যেটা জেনেছিলেন সেটাই ঠিক? কোন ভাবে প্রমাণ করা যাবে না। সেইজন্য বলছেন *কঃ অদ্ধা বেদ ক ইহ প্রবোচৎ* - কে সত্যিই জানেন আর কে সত্যি সত্যিই বলতে পারবেন? যদি তোমাকে মানতে হয় তাহলে ভাই ঋষিদের বাক্যই মানতে হবে। যদি না মানতে পারো তাহলে তোমাকে কিছুই মানতে হবে না। সৃষ্টির ব্যাপারে আর প্রশ্ন করতে যেও না। গীতার ভাষ্যেও যখনই সৃষ্টির প্রসঙ্গ এসেছে তখনই আচার্য শঙ্কর এই কথাই বলছেন, আমরা জানি না, জানার কোন পথও নেই, তখন মন ছিল না, কাল ছিল না। কে দেখেছে, আর কেউ বা বলবে আমি দেখেছি।

তারপর বলছেন *কুত আজাতা* – কোথা থেকে এর জন্ম হয়েছে, কোথায় তৈরী হয়েছে এই সৃষ্টি? দেবতারাও কি জানতে পারেন? এখানে যে দেবতাদের কথা বলা হচ্ছে, যে অর্থে আমরা ইন্দ্র, বরুণ, মিত্রকে জানি, এখানে সেভাবে দেবতার কথা বলা হচ্ছে না। যজ্ঞ হত, যজ্ঞে যেসব আহুতি দিতেন, সেই আহুতি যাঁদের উদ্দেশ্যে করা হত, ঋষিদের কাছে সেই সব দেবতারা শ্রেষ্ঠতম পুরুষ। ঋষিরা বলছেন, আমাদের কথা তো বাদ দাও, সেই শ্রেষ্ঠতম দেবতাদের জন্মও সৃষ্টির অনেক পরে। এখানে আমরা আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা পেলাম। আমরা যে ইন্দ্র, মিত্র, বরুণাদি দেবতাদের কথা বলি, এই দেবতাদের পূজা ঋষিরাও করতেন। কিন্তু ঋষিরা জানতেন এই দেবতারা ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করেন না। দেবতারা সৃষ্টি কর্তা নন, এনারা প্রকৃতির দেবতা, মানে দেবতাদের শুধু প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা দেওয়া ছিল। সেইজন্য এখানে বলছেন *অর্বাগদেবা অস্য বিসর্জনেনাহথা* – দেবতাদের জন্মও সৃষ্টির অনেক পরে হয়েছে। আমরা এদের পূজো করি, প্রার্থনাও করছি আমাদের ভালো ভাবে দেখাশুনা করার জন্য, কিন্তু এটাও ভালো করে জানি যে দেবতাদের জন্ম অনেক পরে হয়েছে। যিনি জন্মের সময়ে সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন একমাত্র তিনিই বলতে পারবেন সৃষ্টির সময় কি হয়েছিল। কিন্তু কেউই তো সেই সময় ছিল না।

সৃষ্টির ব্যাপারে ঋষিদের এটাই শেষ কথা নয়, তারপর তাঁরা যখন তাঁদের পবিত্র হৃদয়ে তাঁদের প্রজ্ঞাকে লাগিয়েছেন তখন তাঁরা সৃষ্টির তত্ত্বকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। এখন সত্যিই বোঝা যায় এর পরে সৃষ্টির ব্যাপারে যুক্তি দিয়ে আর কিছু বলা যায় না। বিজ্ঞানীরা ফিজিক্সের থিয়োরি প্রয়োগ করে আজকে যে dark matter, dark light বলছে সেটাকে তারা প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছে না, অনুমানের মাধ্যমে বলছে। Dark matter মানে যেটাকে আমরা verify করতে পারিনা। বলা হচ্ছে যে dark matter নাকি অনবরত আমাদের শরীর মাঝখান দিয়ে যাচ্ছে, আর এই পৃথিবীর যা ওজন তার উনিশ গুণ বেশি ওজন এই পৃথিবীকে ঘিরে রেখেছে। পৃথিবী যখন সূর্যের চার পাশে প্রদক্ষিণ করছে তখন নাকি পৃথিবী এই dark matter আর dark energyর সমুদ্রের মাঝখান দিয়ে ছুটে চলেছে। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের আমরা যা কিছু এখন দেখতে পাচ্ছি তার ওজন, সমস্ত dark matter এর মোট ওজনের মাত্র একশ ভাগের পাঁচ ভাগ। বাকী ৯৫% পদার্থের কোন খবর বিজ্ঞান জানেই না। আমার আপনার মাঝখানে যদি একটা vacuum করে দেওয়া হয়, তাহলে কি ঐ জায়গাটা খালি পড়ে আছে? না, আমার আপনার যে মোট ওজন তার কুড়ি গুণ বেশি ওজনের dark matter দিয়ে ঐ জায়গাটা ভরে আছে। বিজ্ঞানীরা একেবারে হিসেবে করে দেখেছেন, যদি এ রকম না হয় তাহলে হিসেব মিলবে না।

এত যে dark matter আর dark light এর কথা বলছে বিজ্ঞান, তারাও বলছে এগুলো আমরা সরাসরি জানতে পারছি না, indirect পদ্ধতিতেই জানতে পারছি। সৃষ্টির কথা আলোচনা করতে গিয়ে আমরাও বলছি সৃষ্টিকে আমাদের indirect method এ জানতে হবে। কি সেই indirect method? ঋষিরা ধ্যানের গভীরে শুদ্ধ পবিত্র মনকে এই সৃষ্টির রহস্যে লাগালেন তখন তাঁরা এই সৃষ্টির রহস্যটাকে বুঝতে পেরেছিলেন। শেষ মন্ত্রে বলছেন –

ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আবভূব যদি বা দধে যদি বা না।
যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্ সো অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ।।৭।।

আগের কথাকে টেনেই আবার বলছেন যাঁর থেকে সৃষ্টিটা বেরিয়েছে তিনিই একমাত্র জানেন, হয়তো বা তিনিও জানেন না। অর্থাৎ বলতে চাইছেন ঈশ্বর ছাড়া আর কেউ জানবেন না সৃষ্টি কিভাবে হয়েছে। ঈশ্বর জানেন বললে, আপনি ঈশ্বরের মনকেও জেনে গেলেন, কিন্তু ঈশ্বরকেই তো জানা যায় না, তাই বলছেন তিনিও জানেন কিনা জানা নেই। তাই বলছেন সৃষ্টির আগে কি ছিল, সৃষ্টি কিভাবে হয়েছে একমাত্র তিনিই জানেন হয়ত তিনি নাও জানেন। যদি কেউ জানেন তিনিই জানেন, তিনি ছাড়া আর কারুরই জানার কথা নয়। আবার এখানে এসে আটকে গেল। এখানে বলছেন একমাত্র ভগবান জানেন, অথচ এর আগে সৎ অসৎ নিয়ে অনেক কথা বলা হয়েছে, এটাকেই যদি মেনে নিতে হয় তাহলে পুরুষসূক্তম্ যে তত্ত্ব দিচ্ছে সেটাও ঠিক হয়ে যাচ্ছে, তন্ত্রে যেখানে বলছে শিব-শক্তির খেলা সেটাও তাহলে ঠিক বলছে, পুরুষ প্রকৃতির সান্নিধ্যে সৃষ্টি সেটাও ঠিক হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আসল বক্তব্য হল প্রমাণ দিয়ে, যুক্তি দিয়ে, সাক্ষি দিয়ে এটাকে বিচার করা যায় না। যদি আমাদের সৃষ্টিকে সব থেকে ভালো যুক্তি দিয়ে বুঝতে হয়, চিন্তা-ভাবনা করতে হয় তাহলে ঋষিরা নাসদীয় সূক্তে যে ভাবে জিনিসটাকে প্রজ্ঞার দ্বারা ব্যক্ত করেছেন, তখন সৎও ছিল না অসৎও ছিল না, অন্ধকার অন্ধকার দিয়ে আবৃত ছিল, এটাই সব থেকে শ্রেষ্ঠ বর্ণনা। যিনি এই সৃষ্টির জন্মদাতা তিনিই হয়তো এই সৃষ্টির রহস্যকে জানেন, কারণ তিনিই জন্ম দিয়েছেন। মা সন্তানের জন্ম দিয়েছেন, মা জানে কবে সন্তানের জন্ম হয়েছে, সন্তানের জানার কোন পথই নেই। আর সন্তানের সন্তান সে কি কখন জানতে পারে তার বাবার বাবার জন্ম কিভাবে হয়েছিল। তাই বলা হচ্ছে যাঁর থেকে এই সৃষ্টি তিনিই এই সৃষ্টি রহস্যকে বুঝতে পারবেন। অথবা *সঃ অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ* - যিনি স্রষ্টা তিনিও হয়তো এই সৃষ্টির রহস্য জানেন না। এই লাইনের অন্য ব্যাখ্যা হল – একমাত্র তিনিই জানেন, *ন বেদ* কথার অর্থ তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না। নাসাদীয়সূক্তম্ কবিতা, কবিতার সমস্যা হল, এতে কিছু কিছু শব্দ উহ্য থাকে বলে এর অর্থ পাঁচ ভাবে করে দেওয়া যায়।

আমরা এখানে সৃষ্টির রহস্য উন্মোচনের শেষ ধাপে পোঁছে গেছি। প্রথমে দেখলাম এগুলো ঋষিরা পবিত্র হৃদয়ে দেখতে পান। দ্বিতীয় ধাপে বললেন কে জানতে পারবে এই সৃষ্টির কথা? কারণ আমাদের দৃষ্টিতে যারা সবচাইতে বুদ্ধিমান, দেবতাদেরও সেই সময় জন্ম হয়নি। তৃতীয় ধাপে এসে আরও জটিলতা তৈরী করে বলছেন – যিনি স্রষ্টা, যিনি সব কিছুর অধ্যক্ষ *অস্যাধ্যক্ষঃ*, হয় তিনি এর রহস্য জানেন বা হয়তো তিনিও জানেন না, অথবা একমাত্র তিনিই জানতে পারেন। স্বামীজী এর অনুবাদ করেছেন – He knows, সৃষ্টি প্রকরণের শেষ কথা ভগবান নিজেও জানেন কিনা সৃষ্টিটা কিভাবে হয়েছে বা আদপে কোন সৃষ্টি হয়েছে কিনা, বলা যায় না। এটাই বেদের মত। আরেকটা ব্যাখ্যা হল – যদি সৃষ্টির ব্যাপারে আদপে কেউ কিছু জানে তা একমাত্র তিনিই জানেন, তাছাড়া আর কারুর পক্ষে জানা অসম্ভব। আমরা জানি যে বেদে ঈশ্বরের সম্বন্ধে কোন কথা নেই। কিন্তু এই শেষ মন্ত্রে যে বলা হচ্ছে *যো অস্যাধ্যক্ষঃ*, যিনি এই সৃষ্টির অধ্যক্ষ, এই উক্তিতে কিন্তু আমরা সেই পরম সত্তার কথা বেদে পাই, ঈশ্বর নাম ব্যবহার না করেও ঈশ্বরকে বেদ স্বীকার করে নিচ্ছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতে বেদের ঋষিরা ভগবান মানতেন না, এই মতটা যে কত ভ্রান্ত ধারণা এখানে এসে তার প্রমাণ হয়ে যায়। ভগবান যিনি, তাঁকে সব সময় অধ্যক্ষ রূপে দেখা হয়। যেমন দেশে প্রধানমন্ত্রী আছেন, রাষ্ট্রপতি আছেন, বড় বড় প্রশাসকরা আছে। কিন্তু রাষ্ট্রপতি সর্বেসর্বা, তিনি হলেন অধ্যক্ষ। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারী আছেন, তার নীচে আরও আরও অফিসার আছে, তারপর জেলা শাসক, বিডিওরা আছেন। তারা সবাই নিজের নিজের ক্ষেত্রে প্রধান, কিন্তু রাষ্ট্রপতি সবার উপরে, তিনিই সবার অধ্যক্ষ। আমাদের ছোট খাটো নানা সমস্যার জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে যাওয়ার দরকার পড়ে না, ছোট ছোট অফিসারদের কাছে গেলেই কাজ হয়ে যাবে। বেদের ঋষিদেরও ঠিক এই ভাবনা কাজ করত। ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র যত দেবতা আছেন, এছাড়াও আরও ছোট ছোট দেবতারা আছেন, তাদের দ্বারাই ওনাদের কাজ হয়ে যেত, তাই ওনারা অধ্যক্ষের কাছে কোন কিছুর জন্য আবদার করার প্রয়োজন অনুভব করতেন না। কিন্তু উপনিষদে বা গীতাতে এসে এসব ছোট খাটো দেবতাদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেখানে বলছে ঈশ্বরই আমার সব কিছু করে দেবেন, এসব ছোট ছোট

দেবতাদের কাছে যাবার আমার কী দরকার! বৈদিক যুগ থেকে পরবর্তি হিন্দু ধর্মের দৃষ্টিভঙ্গিতে এটা একটা বিরাট রূপান্তর। বৈদিক যুগের ধারণা ছিল যে দেবতাদের দ্বারাই যখন আমার সব কাজ হয়ে যাচ্ছে তখন ভগবানকে কেন বিরক্ত করতে যাব। পরের দিকে হিন্দু দৃষ্টিভঙ্গিতে এটাই ঘুরে দেবতাদের গুরুত্ব কমে গেল।

নাসদীয়সূক্তমেই প্রথম দর্শন সাংখ্যের বীজ সুপ্ত ছিল। সাংখ্য দর্শনের সৃষ্টি তত্ত্ব নাসদীয়সূক্তমের তত্ত্বকে অবলম্বন করেই পল্লবিত হয়েছে। সাংখ্যে এই তত্ত্ব আছে বলে যোগদর্শনও নাসদীয়সূক্তমের তত্ত্বকে গ্রহণ করেছে। সেখান থেকে বেদান্ত দর্শনও নাসদীয়সূক্তমের সৃষ্টি তত্ত্বের এই ভাবকেই গ্রহণ করেছে, মানে শক্তি বা প্রকৃতি জড়ের উপর কার্য করে। তাই প্রথম হল প্রকৃতি তারপর সেখান থেকে বিবর্ত হতে থাকে। পুরুষসূক্তমের সৃষ্টি তত্ত্বে ভগবানই সব কিছু হয়েছেন। নাসদীয়সূক্তমে প্রাণই যেন সব সৃষ্টি করছে কিন্তু পুরুষসূক্তমে ভগবান সব কিছুর স্রষ্টা, আর তিনি নিজেকেই সব কিছুতে প্রবিষ্ট করেছেন। নাসদীয়সূক্তমের আসল সৌন্দর্য হল, সত্যিকারের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সৃষ্টি তত্ত্বকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। একজন সত্যিকারের দার্শনিক, চিন্তাবীদ যে দৃষ্টিকোণ দিয়ে সৃষ্টিকে দেখেন নাসাদীয়সূক্তম্ও ঠিক সেভাবেই সৃষ্টিকে দেখেছেন। একজন ভক্ত সৃষ্টিকে কিভাবে দেখবে তার দৃষ্টিকোণ দিয়ে পুরুষসূক্তম্ সৃষ্টিকে ব্যাখ্যা করেছে। আমরা এখন সেই পুরুষসূক্তমকে নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি।

।। পুরুষসূক্তম্ ।।

সৃষ্ঠি অনেক ধরণের ব্যাখ্যা হয়, নাসদীয়সূক্তম্ তার একটা দিক। অন্য দিকে পুরুষসূক্তম্ সৃষ্টিকে ব্যাখ্যা করার আরেকটি দিক। নাসদীয়সূক্তমের মত পুরুষসূক্তমের দর্শন খুব একটা জটিল নয়। সৃষ্টি নিয়ে আমাদের যে সাধারণ ধারণা, ছোটবেলা থেকে সৃষ্টির ব্যাপারে যা শুনে আসছি সেটাকেই পুরুষসূক্তমে পৌরাণিক আকারে কাব্যিক শৈলীতে ব্যক্ত করা হয়েছে। পুরুষসূক্তম্ বেদের খুব বিখ্যাত সূক্তম্। পুরুষসূক্তম্ যেমন ঋগ্বেদে আছে, তেমনি যজুর্বেদে, তৈত্তিরীয় আরণ্যকেও আছে এবং আরও অনেক জায়গায় আছে।

জার্মান ও বৃটেনের বেশ কয়েকজন পণ্ডিত সংস্কৃত ভাষা ও বেদ জানার জন্য যে কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন তা সত্যিই অকল্পনীয়। ম্যাক্সমূলার এই ধরণের পণ্ডিতদের মধ্যে শুধু একটা নাম, কারণ ম্যাক্সমূলার ছাড়াও গ্রিফিথ, ম্যাকডোনাল্ডের মত আরও অনেক বড় বড় পণ্ডিত ছিলেন। তাঁরা সংস্কৃত জানতেন, বেদের সংস্কৃত শিখেছিলেন, সায়নাচার্যকে অধ্যয়ন করেছেন, বেদের অন্যান্য প্রাচীন ভাষ্যকারদের ভাষ্য অধ্যয়ন করেছেন, এরপর তাঁরা নিজেদের মত ব্যাখ্যাও দিয়েছেন, কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আমাদের পরম্পরা মতের সাথে ওনাদের মত মেলে না। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ভাষার ডিগ্রী কোর্স বা মাস্টার ডিগ্রীতে প্রথমের দিকে যখন বেদ অধ্যয়ন শুরু হয়েছিল সেখানে তাদের ভারতীয় পরম্পরার মত আর পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মত, দুটো মতকেই পড়তে হত। যার ফলে বেদের ব্যাপারে সংস্কৃত ছাত্রদের বিচিত্র বিচিত্র ধারণা হয়ে গিয়েছিল। পুরুষসূক্তমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই শব্দগুলো আসার জন্য পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা বলে দিলেন পুরুষসূক্তম্ পরে রচনা করে বেদে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা পরম্পরা বিদ্যাকে অন্ধের মত মেনে নিতে চান না, সব কিছুতে নিজেদের যুক্তি বিচারকে বেশি প্রাধান্য দেন। বিদেশী পণ্ডিতদের মত যেহেতু পরম্পরা মতের সঙ্গে মেলে না, তাই পুরুষসূক্তমের ব্যাপারে বিদেশী পণ্ডিতদের এই ধরণের মন্তব্যকে কোন ভাবেই ভারতীয় পণ্ডিতরা মানবেন না। সত্যিও তাই, যুক্তিতেও দাঁড়ায় না। কারণ, যেভাবে ঋগ্বেদ, যজুর্বেদকে আমরা সাজানো গোছান অবস্থায় পাই তাতে পরিষ্কার বোঝা যায় পরের দিকে কেউ সব কিছু সুন্দর ভাবে গুছিয়ে রেখেছেন, না সাজিয়ে দিলে সব কিছু এত সুন্দর ভাবে আমরা পেতাম না। যদি গোছান হয়ে থাকে তাহলে পরের দিকে আর ইন্টারপোলেশান হওয়ার কোন প্রশ্নই আসতে পারে না। তবে বেদ একদিনেই রচনা হয়নি, ধীরে ধীরে হয়েছে। হতে পারে একটু পরের দিকে পুরুষসূক্তম্ বেদে এসেছিল। ব্যাসদেবে যখন এসে বেদের বিভাজন করলেন তার কিছু দিন আগে হয়ত এসেছিল, আমাদের জানা নেই। আমরা এখানে আমাদের পরম্পরা বিদ্যাতে যা বলা আছে সেই বিদ্যাকেই অনুসরণ করে চলব।

মানুষের কাছে একটা প্রশ্ন বার বার ঘুরে ঘুরে আসতে থাকে, আমি কে, আমি কোথা থেকে এলাম? এটাই মানুষের চিরন্তন প্রশ্ন, সৃষ্টির রহস্যকে মানুষ সব সময় জানতে চায়। বিজ্ঞানীদের মধ্যে পদার্থ বিজ্ঞানী, রসয়ান শাস্ত্রের বিজ্ঞানী, জীববিজ্ঞানী সবাইকেই এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। আবার যিনি অধ্যাত্ম বিজ্ঞানী, দর্শনের পণ্ডিত, ধর্মের পণ্ডিত সবাইকেই এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। আমি কে, আমি কোথা থেকে এসেছি, মৃত্যুর পর আমরা কোথায় যাই? এই জিজ্ঞাসা গুলি কোন না কোন জায়গায় ঘুরে ফিরে এসে যাবে। স্বাভাবিক ভাবে এসব জিজ্ঞাসার উত্তর দেওয়ার সময় বিভিন্ন জন বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে উত্তর দেন। বিজ্ঞানীরা বলবেন তুমি পদার্থ থেকে এসেছ পদার্থেই মিশে যাবে। মাণ্ডুক্যকারিকাতে আবার এত রকম মতবাদ নিয়ে এসেছেন যে দেখে আমাদের অবাক হয়ে যেতে হয়। সেখানে পর পর বলে গেছেন সৃষ্টি কিভাবে হয়েছে। বলার পর শেষে দেখিয়ে দিচ্ছেন সৃষ্টি বলে আদপে কিছুই নেই, সবটাই মনের ভুল। অন্য দিকে দর্শনের পণ্ডিতরা মনকে একটা চেতন পদার্থ রূপে দেখেন। ধর্মীয় দর্শন আবার ঈশ্বরীয় সত্তাকে স্বীকার করেন। বিজ্ঞান, দর্শন আর ধর্ম এই যে তিন রকমের দৃষ্টিভঙ্গী, এই তিনটে দৃষ্টিভঙ্গীই এই জায়গাতে এসে বিরাট তফাৎ হয়ে যায় – বিজ্ঞান সব ব্যাখ্যা পদার্থের ভেতর খুঁজবে, দর্শন সব ব্যাখ্যা মনের মধ্যে খুঁজতে চাইছে, দর্শনের কাছে মনই সব। ধর্মে যখন প্রবেশ করবে তখন তাকে সব ব্যাখ্যা ঈশ্বরে খুঁজতে হয়। ব্যাখ্যা সব সময় এই তিনটে স্তরে চলতে থাকে – পদার্থ, মন আর আত্মা বা চৈতন্য।

বিজ্ঞানীদের মতে পদার্থই কোন সময় চৈতন্যের রূপ ধারণ করে নেয়। যেমন হাইড্রোজেন জ্বলে আর অক্সিজেন জ্বালায়, কিন্তু দুটো মিলে গেলে জলের সৃষ্টি হয়ে যায়, জল আবার অগ্নিকে নির্বাপিত করে ঠাণ্ডা করে দেয়। দুটো আলাদা পদার্থের নিজস্ব ধর্ম পাল্টে গিয়ে অন্য একটা ধর্ম এসে যায়। ওনাদের মতে পদার্থ পদার্থের সাথে মিশ্রণ হতে হতে একটা চেতনার আভাস এসে যায়। ভারতের চার্বাকদেরও একই মত ছিল, সেইজন্য বিজ্ঞানের মত আমাদের কাছে নতুন কিছু নয়। বিজ্ঞানী, চার্বাকপন্থী এরা সবাই ভৌতিকবাদী, ভৌতিকবাদী মানে যারা পঞ্চভূতকেই শেষ কথা বলে মনে করে। দর্শনে আবার মন আর পদার্থ দুটোকেই গুরুত্ব দিয়ে মানা হয়। পদার্থের সৃষ্টিই হয় মন থেকে, সেখান থেকেই ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদের মত দর্শনের জন্ম। পাশ্চাত্য দর্শনেও Idealism আর Realism এই দুটো মত চলে। প্রথম থেকে এই দুটো মতে একটা পুরনো বিবাদ চলে আসছে, তা হল পদার্থ মনকে সৃষ্টি করে নাকি মন পদার্থকে সৃষ্টি করে। কিন্তু ধর্মে যখন এসে গেল, তা খ্রীশ্চান হোক, ইসলাম হোক, হিন্দু হোক, জৈন, শিখ, বুদ্ধ যে ধর্মই হোক না কেন সব ধর্মের কাছে সৃষ্টি সব সময় ঈশ্বর থেকে হয়।

বেদে সৃষ্টি নিয়ে খুব বেশি আলোচনা করা হয়নি। কিন্তু বেদের দুটি নামকরা সূক্ত, একটি নাসদীয়সূক্ত আরেকটি পুরুষসূক্তম্, এই দুটি সূক্তে সৃষ্টিকে নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বেদের অন্য অন্য মন্ত্রেও সৃষ্টির ব্যাপারে কিছু থাকতে পারে কিন্তু এই দুটো সূক্তমে সৃষ্টির ব্যাপারকে খুব স্পষ্ট আর বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এই দুটো সূক্তমের মধ্যে তফাৎ হল, পুরুষসূক্তমে যিনি পুরুষ সৃষ্টি তাঁর থেকে হয়েছে, কিভাবে হয়েছে সেটাকে ব্যাখ্যা করছেন। এর আগে বলা হয়েছে যে দেবতারাও অনেক নীচের, দেবতাদের উপরে আছেন সিদ্ধরা, কিন্তু শেষ কথা হলেন ভগবান। ভগবান শব্দ আবার বেদে ঠিক ওই ভাবে আসেনি যেভাবে আজকে আমরা ভগবান বলি, বেদের শব্দটা হল পুরুষ। পুরুষ শব্দ এসেছে পুর থেকে, পুর মানে নগরী। এই দেহরূপ নগরীতে কে বাস করছেন? আমি আপনিই বাস করছি। আমি মনে করছি, আমি এই শরীর, কিন্তু আসল আমি যিনি তিনিই এই শরীরে বাস করেন। আমি যদি মনে করি আমি এই শরীর, তাহলে মনে করব অন্তর্যামী বা ঈশ্বর এই দেহরূপ নগরীতে বাস করছেন। আর আমি যদি মনে করি আমি অন্তর্যামী, তাহলে মনে করব আমি এই দেহে বাস করি। মূল কথা হল এই শরীরের ভেতরে যিনি আছেন তিনি চৈতন্য। বেদে যদিও দেবতার ধারণাই বেশি কিন্তু ধীরে ধীরে বেদেও পুরুষের ধারণা এসে গিয়েছিল। এখানে আমাদের দু রকমের সংশয় হয়, যখন জীবাত্মা রূপে দেখছে তখন ভেতরের এই জীবাত্মাই মৃত্যুর পর স্বর্গে যাচ্ছে, পিতৃলোকে যাচ্ছে, সেখান থেকে আবার জন্ম নিচ্ছে। এখন বেদ বা উপনিষদে আমরা যে পুরুষের বর্ণনা পাই সেখানে বলছেন *অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষো জ্যোতিরিবাধূমকঃ*। এর মধ্যে কোথাও কোন কল্পনা জড়িয়ে নেই, এটাই সত্য।

বিশেষ করে যখনই উপনিষদের কোন কথা আসে তখন সেখানে আর কোন প্রশ্ন করা যাবে না। পুরুষ কি রকম বলছেন? আংঠার মত আর জ্যোতিঃস্বরূপ, যে জ্যোতির আলোর মধ্যে কোন ধোঁয়া নেই। যাঁরা ধ্যান করেন তাঁরা দু প্রকারের ধ্যান করেন। একটাতে নামের উপর খুব জোর দেওয়া হয়, যেমন ওঁ নমঃ শিবায়, এই নামের উপর যদি বেশি জোর দেওয়া হয় তখন পরা, পশ্যন্তি, মধ্যমা ও বৈখরী এই চারটি স্তরের মধ্যে দিয়ে নাম চলতে থাকে। সাধারণ কথাবার্তাও এই চারটে স্তরে চলে – স্থূল, সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতম আর সূক্ষ্মতর। ঠাকুর যেমন বলছেন, সন্ধ্যা গায়ত্রীতে লয় হয়, গায়ত্রী প্রণবে লয় হয়, প্রণব অনাহতে আর অনাহত ভেদ করে যোগীরা পরমাত্মার সাক্ষাৎ করেন। কিন্তু যাঁরা রূপের উপর বেশি জোর দেন, যেমন শিবের রূপ, মা কালীর রূপ, তখন তাঁদের জ্যোতি দর্শন হয়। এই দুটো হল ধ্যানের দু রকম প্রকার বা আমরা তিনটেও বলতে পারি। ঠাকুর বলছেন ঈশ্বর দর্শনের একটা লক্ষণ হল কুণ্ডলিনী জাগরণ, নীচে মূলাধার থেকে মহাবায়ু উপরের দিকে উঠতে থাকে। দ্বিতীয় হল অনাহত ধ্বণি, শুধু ধ্যানেই নয়, সব সময়ই যোগী শুনতে পাচ্ছেন। আর তৃতীয় হল জ্যোতি দর্শন, এই জ্যোতি কোন জড় আলো নয়, একেবারে জীবন্ত আলো। যোগী পরিষ্কার বুঝতে পারেন এই জ্যোতি চৈতন্যের জ্যোতি, বাইরের আলোর জ্যোতি নয়। উপনিষদেও অনেক জায়গায় বলছেন সূর্য, চন্দ্র, তারা, অগ্নির যে আলো এই চৈতন্য জ্যোতির আলোর জন্যই।

এই দুটো ধারণাতে ধ্যান, একটা ভগবানের ধারণা আর দ্বিতীয় অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ, এই দুটোর বিভাজন এই ভাবে হয়ে যায় – যাঁরা ভেতরে অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষকে দর্শন করেন, তাঁদের মধ্যে কিছু কিছু যোগী এখানেই সব কিছু শেষ করে দেন, আবার কিছু কিছু যোগী এরপর দেখেন এই জ্যোতিই আছে এছাড়া আর কিছু নেই, এই চৈতন্য জ্যোতিকেই তাঁরা সচ্চিদানন্দ রূপে দেখেন। তার ফলে পুরুষের দুটি অর্থ হয়ে যায়। যাতে কোন রকম জটিলতা না হয় সেইজন্য ওনারা পরের দিকে এই শব্দগুলিকে সরিয়ে আত্মা শব্দ নিয়ে এলেন। আত্মা নিয়ে আসার পর আবার সেই সংশয় এসে গেল। যার জন্য ইদানিং কালে তিনটে খুব প্রচলিত শব্দকে নিয়ে আসা হয়েছে – পুরুষ শব্দ এখনও ওই একই অর্থে ব্যবহার হয়, আত্মা শব্দ এখনও ঐ অর্থেই ব্যবহার হয় কিন্তু নতুন একটা শব্দ নিয়ে আসা হল, যে শব্দ উপনিষদেই ছিল, তা হল ব্রহ্ম। কিন্তু আত্মার সাথে এর কোন তফাৎ নেই। পুরুষ যিনি ভেতরে আছেন আর পুরুষ যিনি সর্বব্যাপী এক। কিন্তু আপনার ধ্যান ধারণা কি রকম হয়েছে আপনার সিদ্ধি লাভ কি রকম হয়েছে সেটার উপর নির্ভর করবে আপনার কাছে পুরুষের অর্থ কি হবে আর আত্মার অর্থ কি হবে। কারণ আত্মা মানেই ব্রহ্ম। কিন্তু সাধারণ মানুষ distinguish করতে পারে না বলে আত্মা একটা পুরুষ একটা এই ভাবে আলাদা করে দিয়েছেন। আলাদা করে দেওয়ার ফলে সাধারণ লোকেরা মনে করে ভক্ত আর ভগবানের মিলনের মত আত্মা আর ব্রহ্মের মিলন হয়। কিন্তু তা কখন হয় না, আত্মাই ব্রহ্ম ব্রহ্মই আত্মা, পুরুষ যিনি ভেতরে বাইরেও তিনিই। কিন্তু এই বাইরে আর ভেতরকে নিয়ে কিছু কিছু জায়গায় সমস্যা এসে গেছে। অনেক পণ্ডিত আছেন তাঁরা পুরুষকে যখন ব্যাখ্যা করবেন তখন হৃদয়ে যিনি আছেন তাঁকেই পুরুষ রূপে ব্যাখ্যা করবেন, আবার অনেকে পুরুষকে সব কিছুকে মিলিয়ে ব্যাখ্যা করেন। পুরুষসূক্তমে কিছু মন্ত্রে পুরুষকে অন্তর্যামী রূপে নিচ্ছেন, কিছু মন্ত্রে ভগবান রূপে নিচ্ছেন। কিন্তু পরম্পরাতে পুরুষ মানেই ভগবান। তিনি আবার সবার ভেতরে আছেন। কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা আবার পুরুষের অর্থ করেন অন্তর্যামী যিনি বাইরে আছেন। সেই পুরুষ থেকে কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে সেটাই পুরুষসূক্তমে দেখাচ্ছেন। প্রথম মন্ত্রে বলছেন –

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বা অত্যতিষ্টদ্দশাঙ্গুলম্।।১০/৯০/১(ঋ)

মন্ত্রের দিক থেকে গায়ত্রীমন্ত্র ভারতবর্ষে শ্রেষ্ঠ মন্ত্র আর সূক্তের দিক থেকে পুরুষসূক্তম্ সব থেকে বিখ্যাত সূক্ত। পুরুষসূক্তম্ হল ঈশ্বরের ঠিক ঠিক আরাধনা, কারণ এর মধ্যে ঈশ্বরের স্বরূপের বর্ণনা রয়েছে। অনেক ব্রাহ্মণরা পুরুষসূক্তমকে ভগবান নারায়ণের স্নানমন্ত্র রূপে ব্যবহার করেন। পুরুষসূক্তমকে যে কেউ নারায়ণের স্তুতি রূপেও গ্রহণ করতে পারেন, শিবেরও স্তুতি রূপে নিতে পারেন আবার ঠাকুরের স্তুতি রূপেও নিত্য স্নানের পর পাঠ করতে পারেন। আমি যাঁকেই ঈশ্বর মনে করছি পুরুষসূক্তম্ তাঁরই স্তুতি। পুরুষের দুটি অর্থ – একটি বিরাট আর দ্বিতীয় স্বরাট। প্রত্যেক প্রাণীর হৃদয়ে যিনি আছেন তিনিই সেই পুরুষ বা স্বরাট

আবার পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে ভগবান রূপে যিনি বিরাজমান তিনিই পুরুষ। এখানে সেই পুরুষের বর্ণনা করা হচ্ছে। তাঁর *সহস্রশীরষা, সহস্রাক্ষ, সহস্রপাৎ*, সেই পুরুষের হাজারটি মাথা, হাজারটি চোখ, হাজারটি হাত। বেদে হাজার শব্দ দিয়ে অনন্তকে বোঝান হয়। যদিও আমাদের লক্ষ, কোটি এই শব্দগুলি আগে থেকেই আছে কিন্তু যখনই সহস্র শব্দ নিয়ে আসবে তখনই বুঝতে হবে এই সহস্র শব্দ দিয়ে অনন্ত বলতে চাইছেন। আগেকার দিনের লোকেরা গুনতে জানত না, তাই সাধারণ মানুষদের জন্য বিভিন্ন ভাবে সংখ্যার ধারণা করিয়ে দেওয়া হত। এখনও গ্রামে গঞ্জে যারা গুনতে জানে না তারা সব কিছুতে কুড়ি দিয়ে হিসেব করে – এক কুড়ি, দু-কুড়ি, তিন-কুড়ি এইভাবে। আগে মানুষ আঙ্গুলের সাহায্যে গুনতো, দুই হাতে পাঁচ যুক্ত পাঁচ দশটি আঙ্গুল আবার পায়ের দশটা আঙ্গুল, সব মিলিয়ে কুড়িটা আঙ্গুল, এই কুড়ির বাইরে কোন সংখ্যা এদের ধারণা ছিল না। কুড়ির বাইরে তাই এক-কুড়ি, দু-কুড়ি এই ভাবে হিসাব করত। যদিও বেদের ঋষিরা সংখ্যার হিসাব জানতেন, কিন্তু কবিতায় কাব্যিক ভাবকে ফোটাবার জন্য ওনারা অনন্তকে বোঝাবার জন্য সহস্র বলে দিলেন।

ঠিক এই ভাবটাই আমরা উপনিষদ ও গীতাতেও পাই, বিশেষ করে গীতাতে খুব প্রচলিত একটি শ্লোক আছে যেখানে বলছেন *সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্। সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি।।* ভগবানের সর্বত্র পা, সর্বত্র তাঁর চোখ, সর্বত্র তাঁর মাথা, সর্বত্র তাঁর কান। এর অর্থ ভগবান স্বরূপতঃ নির্গুণ নিরাকার এবং সর্ব্ব্যাপী। তাই তাঁর যে অঙ্গ আছে তা সব জায়গাতেই বিদ্যমান হবে। আবার এভাবেও ব্যাখ্যা করা হয় – বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু আছে সব তাঁরই চোখ, তাঁরই হাত, তাঁরই মুখ। ভগবানের যে সত্যিকারের হাজারটা হাত, পা, মুখ আছে তা নয়, তিনি অনন্ত। কিন্তু অনন্তকে বর্ণনা করা যাবে না, সংখ্যা দিয়ে তাঁকে মাপা যাবে না, সেইজন্য হাজার শব্দ দিয়ে সেই অনন্তকেই বুঝিয়ে দিচ্ছেন। আরেকটি ব্যাখ্যা হয় – ভগবান সবার সাথেই জুড়ে আছেন, সবার সঙ্গে এক হয়ে আছেন সেইজন্য সব হাতই তাঁর হাত সব চোখই তাঁর চোখ, সব মুখই তাঁর মুখ। মা যেমন সন্তানকে বলে – বাবা, তুমি খেলেই আমার খাওয়া হয়। কেন বলছে মা? কারণ মায়ের সাথে সন্তানের এমন একত্ববোধ যে সন্তান খেলেই মায়েরও খাওয়া হয়ে যাচ্ছে। এখানে মা সন্তানের সাথে জুড়ে আছেন। পুরুষসূক্তমের বৈশিষ্ট্যই হল এই সূক্তমের পুরোটাই সগুণ সাকার, এখানে নির্গুণের কোন ব্যাপারই নেই। সেইজন্য এখানে গীতার *সর্বতঃ* শব্দ ব্যবহার করা হচ্ছে না, বলছেন *সহস্রশীর্ষা*, সহস্র শব্দ দিয়ে বলে দিচ্ছেন তিনি অনন্ত। ভাষ্যকাররা পরিষ্কার বলেই দিচ্ছেন এর অর্থ হল সব জীব তাঁরই মুর্ত রূপ।

দ্বিতীয় লাইনে বলছেন – *স ভূমিং বিশ্বত বৃত্বা অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্* - এখানে *ভূমিং* বলতে শুধু এই পৃথিবীকেই নয় সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে বোঝাচ্ছে, শুধু এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নয় যত রকমের বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হতে পারে সব কটিকে নিয়ে বলছেন। আগামীকাল বিজ্ঞানীরা যদি আরও পঞ্চাশটা ইউনিভার্সের কথা বলে দেয় তাতেও আমাদের কোন অসুবিধা হবে না। কারণ ভূমি এই একটি শব্দ বলে দেওয়ার পর যত ব্রহ্মাণ্ডই আসুক না কেন সব এর মধ্যে ঢুকে যাবে। মায়ের উদরে কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হচ্ছে আবার লয় হচ্ছে। যত ব্রহ্মাণ্ডই এর পর আসুক না কেন আমাদের কোন সমস্যা নেই, কিন্তু সমস্যা হবে খ্রীশ্চান আর মুসলমানদের। কারণ আল্লা বা গড একবার সৃষ্টি করে দিয়েছেন এরপর সেখানে যদি দুটো সৃষ্টি এসে যায় তখন ঝামেলা শুরু হয়ে যাবে। আমাদের কাছে কোন সমস্যাই নয়, কারণ *স ভূমিং বিশ্বত বৃত্বা*, এই পুরুষ পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে রয়েছেন, *বৃত্বা* মানে পরিবিষ্ট, সব দিক থেকে ঘিরে রেখেছে। আর তাই না, *অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্*, পুরুষ সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে রয়েছেন কিন্তু তিনি নিজে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড থেকে একটু বেশি। কতটা বেশি? *দশাঙ্গুলম্*, দশ আঙ্গুল বেশি। কে মেপে দেখেছে যে ভগবান বিশ্বব্রহ্মাণ্ড থেকে দশ আঙ্গুল বেশি? কেউই দেখেনি, এটাই ভগবানের মহিমার কাব্যিক ব্যঞ্জনা, এটাই কবিত্ব। ফিজিক্সের থিয়োরি অনুযায়ী ব্রহ্মাণ্ড যতই বিস্তার হতে থাকুক বেদের কবিতায় পুরুষ সব সময়ই ব্রহ্মাণ্ড থেকে দশ আঙ্গুল বেশি থাকবেন, তার মানে ভগবান সব সময় বড়ই থাকবেন। আমরা যে বলছি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে ভগবান, তার মানে এই নয় যে এই ব্রহ্মাণ্ড যেখানে গিয়ে শেষ হয়ে যাবে ভগবানও সেখানেই শেষ হয়ে যাবেন, ব্রহ্মাণ্ড যতই বাড়তে থাকুক ভগবান সব সময় তার থেকে দশ আঙ্গুল বেশি থাকবেন। কারণ সমস্ত সৃষ্টিটা তিনি আবার সৃষ্টির বাইরে যা কিছু আছে সেটাও তিনি। তার মানে, তিনি যখন সৃষ্টি করেন তখন সৃষ্টির উপাদান যে তিনি বাইরে থেকে নিয়ে আসেন তা নয়, পুরোটা তিনিই হয়ে

আছেন। গীতায় ভগবান বলছেন *একাংশেন স্থিতো জগৎ*, সমগ্র সৃষ্টিতে যত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আছে, যত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তুমি কল্পনা করতে পার, সবটাই আমার ছোট্ট একটা অংশে অবস্থিত। তার মানে, ভগবানের পায়ের বুড়ো আঙুলের নখার ডগার ছোট্ট অংশে যত রকমের বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কল্পনা করা যাবে সব অবস্থিত। এটা কি সত্যি না মিথ্যে? পুরোপুরু সত্যি। কেন সত্য? আমাদের পায়ের যে নখের ডগা সেখানে কোটি কোটি জীবানু আছে যারা রীতিমত কলোনি তৈরী করে বাস করছে। আমাদের চোখের পাতার নীচে কোটি কোটি মাইক্রোস বাস করে। চোখের যে মাইক্রোস আর পায়ের যে মাইক্রোস দুটো পুরো আলাদা, কোন মিল নেই। দুটোর জায়গা পাল্টাপাল্টি করে দিলে মরে যাবে। গীতায় যে ভগবান বলছেন *একাংশেন স্থিতো জগৎ*, ঠিকই বলছেন। ইংরাজীতে দুটো শব্দ আছে immanence আর transcendence, immanence মানে সবটাতেই তিনি ব্যাপ্ত, এই সৃষ্টিতে ঈশ্বরের বাইরে কিছু নেই, সমস্ত সৃষ্টিটা তিনিই। তাহলে কি সৃষ্টিতে তিনি শেষ হয়ে যাচ্ছেন? কখনই শেষ হয়ে যাচ্ছেন না। সৃষ্টির বাইরেও তিনি। কতটা তিনি? দশ আঙুল বেশি। এটাই কাব্যিক অভিব্যক্তি। ভগবানের এই বৈশিষ্ট্যতাকে যতটা কাব্যিক ভাবে প্রস্ফুটিত করা যায় বিজ্ঞানের দ্বারা বোঝা যাবে না। একজন কবি একটা কবিতা লিখেছিলেন A man is born in every second and a man dies in every second। এক বিজ্ঞানীর হাতে এই কবিতাটা যাওয়ার পর সে ঘোর আপত্তি করে বলছে 'মহাশয়, আপনার কবিতায় একটা ভুল তথ্য দেওয়া হয়েছে, মৃত্যু ১.৩ সেকেণ্ডে হয়'। কিন্তু কবিতার জন্য ১.৫ সেকেণ্ড মেনে নেওয়া যেতে পারে। কেন বললেন? কারণ কবিতাকে মেলাতে হবে। যখন কবি কিছুর বর্ণনা করবেন তিনি একটা ভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এক ভাবে বলবেন, আবার কোন যুক্তিবাদী যখন সেই জিনিসটাকেই বর্ণনা করবে তখন সে অন্য ভাবে বলবে। কিন্তু বিষয় বস্তুর ভাবের মধ্যে কোন তারতম্য থাকবে না।

দশাঙ্গুলমের যে ব্যাখ্যা এখানে দেওয়া হয়েছে, পরবর্তি কালে অনেক পণ্ডিতরা একে আবার অন্য ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁরা বলছেন, নাভীমূল হল আমাদের সমগ্র শরীরের কেন্দ্রবিন্দু, এই কেন্দ্রবিন্দু থেকে ঠিক দশ আঙ্গুল উপরে পুরুষের বাস, সেখানেই যোগীদের জ্যোতি দর্শন হয়, *অঙ্গুষ্ঠমাত্রম্*। এখন আমরা সবাই জানি যে নাভিস্থল থেকে দশ আঙ্গুল মেপে মেপে যে জায়গাটায় আসবে সেটাই হৃদয়ের স্থান, এই হৃদপদ্মেই ইষ্টের ধ্যান করতে বলা হয়। ভগবান কোথায় বাস করেন? এই প্রশ্ন করলে মোটামুটি সব ভক্তই বলে দেবেন তিনি হৃদয়ে বাস করেন। এই শরীরটাই জগৎ, বিশ্বভূমি, সেই শরীরের ভেতর নাভিমূল থেকে দশ আঙুল উপর হৃদয়ে পুরুষ বাস করেন। কিন্তু আমাদের পরম্পরাগত বিদ্যায় এটা মানে না। শ্রীকৃষ্ণের একটি নাম দামোদর। দামোদর কেন নাম হল? যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে বাঁধার জন্য দড়ি নিয়ে এসেছেন, বাঁধতে গিয়ে দেখছনে দড়ি দু আঙুল ছোট হয়ে যাচ্ছে। ঘরে যত দড়ি ছিল সব দড়ি নিয়ে এলেন, দেখছেন তাও দু আঙুল ছোট, গ্রামে যত দড়ি ছিল সব নিয়ে আসার পরেও দু আঙুল ছোট হয়ে যাচ্ছে। কখন কি এই জিনিস হতে পারে? আরে ভাই এটা কৃষ্ণকাহিনী নয়, আসলে *স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বা অত্যতিষ্টদ্দশাঙ্গুলম্*, এই ভাবকে কাহিনীর মাধ্যমে স্পষ্ট করা হচ্ছে। পরে শ্রীকৃষ্ণ মায়ের ওই পরিশ্রম দেখে করুণাবশতঃ মায়ের বন্ধন স্বীকার করে নিলেন। এটাই immanence আর transcendence, তিনি এই বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন আবার বিশ্বের বাইরেও তিনি।

মানুষ কুকুরকে ভয় পায়, সেইজন্য যাদের বাড়িতে কুকুর আছে সেই বাড়ির দরজার উপর নোটিশ লাগান থাকে, কুকুর হইতে সাবধান। কিন্তু এটাই আশ্চর্য যে মানুষ ভগবানকে কখনই ভয় করে না। কোথাও কি লেখা থাকে 'ভগবান হইতে সাবধান'? আমরা কি কেউ ভগবানকে ভয় পাই? একজন মহিলা নিজের স্বামীকে দাবিয়ে রাখে কিন্তু একটা টিকটিকি আরশোলা দেখলে ভয়ে চিৎকার করে বাড়ি মাথায় করে দেবে। স্বামী বেচারার অবস্থা টিকটিকি আরশোলার থেকেও অধম। আমরাও কুকুরকে ভয় পাই কিন্তু ভগবানকে ভয় পাইনা, তাই মিথ্যে কথা বলা, চুরি করা, ছলচাতুরি করা সব করছি। আমাদের কাছে ভগবান কুকুরের থেকেও অধম। কিন্তু ঋষিদের কাছে তা ছিল না, তাঁদের কাছে ঈশ্বর অত্যন্ত উচ্চ, তাই তাঁরা ভগবানকে স্থান দিলেন *অত্যতিষ্টদ্দশাঙ্গুলম্*, আমাদের শরীরের কেন্দ্রস্থল থেকে ঠিক দশ আঙ্গুল উপরে হৃদয়ে, ভগবানের বাস সবার হৃদয়ে। কিন্তু আমাদের হৃদয়ে ভগবান ছাড়া বাকি সব কিছুই আছে, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য এগুলো দিয়েই আমাদের হৃদয় পূর্ণ হয়ে আছে। বেদের ঋষিদের ধারণা ছিল – আমি যদি পুরুষকে অন্তর্যামী

রূপে দেখি, স্বরাট রূপে দেখি তখন তিনি আমার হৃদয়ে বাস করছেন। আবার যখন বিরাট রূপে দেখি তখন তিনি সবেতেই আছেন আবার যতটুকু এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তার থেকেও আরও বেশি আছেন। আসল ভাব যেটা বলতে চাইছেন ঋষিরা তা হল তিনিই আছেন, তিনি ছাড়া আর কিছু নেই, সব চোখ তাঁর চোখ, সব মুখ তাঁর মুখ, সব হাত তাঁর হাত, সব পা তাঁর পা। এটাই গীতাতে যে শ্লোকটা আমরা একটু আগে আলোচনা করলাম তাতে খুব সুন্দর করে বর্ণনা করা হয়েছে।

একটা কথা খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে, বেদ, উপনিষদ, গীতা প্রচণ্ড যুক্তিসম্মত। আমরা মনে করি ধর্ম মানে শুধু বিশ্বাস। কিন্তু কখনই তা নয়, ধর্ম মানে hard core rationality। যে ধর্মে rational লোক যত কম হবে সেই ধর্মের তত দুরবস্থা হবে। কারণ rationality ছাড়া ধর্ম কখনই চলে না। শুরু করার সময় সবাইকে একটা জিনিসকে শুধু মানতে হবে, বাচ্চাদের যেমন মায়ের কথায় প্রচণ্ড বিশ্বাস, ওরা জানে মা কখন ভুল কথা বলবেন না, যার মা নেই সে যার কোলে বড় হয়েছে তার কথাকে বিশ্বাস করবে। ঠিক তেমনি ধর্মেও খুব সাধারণ একটা জিনিসকে বিশ্বাস করতে হয়, গুরু যেটা বলে দিয়েছেন সেটা সত্য। পরে বড় হয়ে যাওয়ার পর মা যদি বলে সূর্য উদয় হল, তখন ছেলে বলবে – না মা, সূর্য উদয়ও হয় না অস্তও যায় না, পৃথিবীটা সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে। তার মানে ছেলে এখন মায়ের জ্ঞানকে অতিক্রম করে যাচ্ছে। মা যেটা বলেছেন সেটা সারা জীবন যে ছেলেকে মানতে হবে তা নয়, কিন্তু শুরুটা ওখান থেকেই হয়। একটা অবস্থার পর আরও অনেক আইডিয়া আসতে শুরু হয়ে যাবে, তখন ওই আইডিয়াগুলো মেলাতে গেলে মায়ের আইডিয়া গুলো পড়ে থাকবে। তাই বলে মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা চলে যায় না, মায়ের প্রতি আগেও যেমন শ্রদ্ধা ছিল এখনও তাই থাকবে। শাস্ত্রের ক্ষেত্রে এসেও তাই হয়। প্রথমে গুরুকে মেনেই চলা শুরু হয়, গুরু যা বলছেন সব সত্য। তবে সচ্চিদানন্দই একমাত্র গুরু, সচ্চিদানন্দ ছাড়া কেউ গুরু হন না। সচ্চিদানন্দই মানুষ গুরুর মাধ্যমে উপদেশ দেন। গুরুকে তাই কখনই মানুষ রূপে দেখতে নেই, সচ্চিদানন্দ রূপেই গুরুকে দেখতে হয়। সেই গুরু বলে দিয়েছেন ঈশ্বরই সত্য। এরপর নিজেকে সাধনার মধ্যে নামিয়ে দিতে হবে। সাধনা করতে করতে এবার সে বিচার করতে থাকুক ঈশ্বরই সত্য কিনা, তাতে কোন দোষ নেই। কিন্তু এই বিচার করার জন্য একটা পাত্রতা চাই, আগে থেকে একটা গভীরে প্রশিক্ষণ দরকার। বেদে যা কিছু আছে কোনটাই বিশ্বাস অবিশ্বাসের কিছু নেই, প্রত্যেকটি মন্ত্র অত্যন্ত উচ্চমানের যৌক্তিকতায় সমৃদ্ধ। বিশ্বের তাবড় তাবড় যত পণ্ডিত আছেন বেদ তাঁদের মাইক্রোস্কোপের তলা দিয়ে গেছে, তাঁরা কোথাও বেদের কোন কথাকে অযৌক্তিক বলছেন না। বেদের বক্তব্যের সাথে ওনারা একমত না হতে পারেন, সেই উপলব্ধির অবস্থায় না যেতে পারেন কিন্তু বেদের কথা অযৌক্তিক এ কথা কখনই বলবেন না। ঋষিদের বক্তব্য খুব সহজ সরল – ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন, ঈশ্বরই সব কিছু হয়েছেন। কিন্তু এই কথা কে বলবেন? নাসদীয়সূক্তে বলছে সেই সময় দেখার জন্য কেউ তো ছিল না। সৃষ্টির সময় কেউ যদি থাকতেন তিনিই তো দৃঢ়তার সাথে বলতে পারবেন। এনারা বলছেন সৃষ্টি এভাবেই হতে হবে। কিন্তু পুরো ব্যাপারটা বিশ্লেষণের দ্বারা বিস্তার করে দেখলে বোঝা যাবে যে এনারা একেবারে ঠিক কথা বলছেন। কিন্তু এই বলার মধ্যে একটা conjection আছে, মানে প্রত্যক্ষ প্রমাণ, অনুমান প্রমাণ লজিকালি একটা জাম্প মেরে পেছনের দিকে গিয়ে দেখছেন এটা এভাবেই হতে হবে। তাই বলে ওটাই যে সত্য তা নয়, কারণ পুরুষসূক্তমে এক রকম বলছেন আবার নাসদীয়সূক্তমে অন্য রকম বলছেন। কিন্তু একই ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পুরুষসূক্তমও পাঠ করছেন সাথে সাথে নাসদীয় সূক্তমও পাঠ করছেন। কারণ দুটোতেই কোথাও না কোথাও একই কথা বলছেন, শেষ স্রষ্টা সেই এক আর তিনিই সব কিছু হয়েছেন। তবে কিভাবে তিনি স্রষ্টা, কিভাবে তিনি সব কিছু হন এই ব্যাপারটা কেউ জানে না। পুরুষসূক্তম্ আর নাসদীয়সূক্তম্ দুটোর তত্ত্ব কিন্তু আলাদা নয়। কিন্তু তার প্রসেসটা আলদা, পদ্ধতি আলাদা হতেই হবে, তার কারণ ওই সময় ওখানে দেখার কেউ ছিল না। বাকিটা ঋষিরা কল্পনা করেছেন আর তাঁর শিষ্যরা সেটাকে ছন্দোবদ্ধ করে দিয়েছেন।

মহম্মদ গাজনী যখন দিল্লীর সিংহাসনে ছিলেন সেই সময় আলবেরুনি নামে একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক ফরাসী দেশ থেকে ভারতে এসেছিলেন হিন্দু ধর্মকে জানার জন্য। তখন এক হাজার দশ কি বারো সাল। তিনি একটা খুব সুন্দর কথা বলছেন – এখানকার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা সারাটা দিন শুধু তর্কাতর্কি করতে

থাকে, কিন্তু দর্শনের কোন তত্ত্ব নিয়ে তর্কাতর্কি করছে না, তর্কাতর্কি শুধু শব্দ নিয়ে। সচ্চিদানন্দই আছেন, সচ্চিদানন্দই সব কিছুই হয়েছেন এই নিয়ে কোন ব্রাহ্মণ তর্ক করবেন না। জগৎ অর্থহীন, এই নিয়েও কেউ তর্ক করবে না। কিন্তু কিভাবে তিনি হয়েছেন এটাকে নিয়ে তর্ক লেগে থাকবে, কারণ তখন শব্দ নিয়ে ঝামেলা লেগে যায়। ভারতবর্ষ হল শব্দ সাধনার দেশ, এখানে বিচার সাধন হয় না। বিচার যা কিছু করার সবটাই বেঁধে দেওয়া হয়ে গেছে, এর বাইরে এনারা কিছুতেই যাবেন না, আর তত্ত্ব নিয়ে কখনই কেউ তর্ক করবেন না। সৃষ্টি কিভাবে হয়েছে, কি পদ্ধতিতে হয়েছে এই নিয়ে প্রচুর বিতর্ক আছে, কিন্তু সৃষ্টির যে মূল তত্ত্ব, ঈশ্বর আছেন, ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন আর তিনিই সব কিছু হয়েছেন এই নিয়ে কোন বিবাদ নেই। সৃষ্টিকে কেউ বলবে মায়া, কেউ বলবে বাস্তবিক সৃষ্টি, কেউ বলবে ঈশ্বর আর সৃষ্টি আলাদা হয়ে গেছে, কেউ বলবে সৃষ্টি শক্তির মাধ্যমে হচ্ছে, সৃষ্টির ব্যাপারে নানান রকমের কথা বলবেন কিন্তু মূল তত্ত্ব কখনই পাল্টাবে না। বেদের এটাই বৈশিষ্ট্য, মূল তত্ত্ব থেকে কখনই সরতে দেবে না। পুরুষসূক্তমেও বলতে চাইছেন, ভগবানই সব কিছু হয়েছেন। প্রথমেই ইট, পাটকেল দিয়ে শুরু না করে মানুষকে দিয়ে শুরু করছেন। স্বামীজীর বিখ্যাত কবিতা বহুরূপে সম্মুখে ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর, এই ভাব নতুন কিছু নয়, পুরুষসূক্তম্ শুরুই হয় এই ভাব দিয়ে। *সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ*, সেই পুরুষ বা ভগবান তাঁর হাজারটে মাথা, তিনিই এই সব কিছু হয়েছেন কিনা। দ্বিতীয় মন্ত্রে বলছেন –

পুরুষ এবেদগং সর্বম্ যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্।
উতামৃতাত্বশেসানঃ যদন্নেনাতিরোহতি।।১০/৯০/২(ঋ)

যদ্ভূতং যা কিছু হয়ে গেছে, *যচ্চ ভব্যম্*, যা কিছু ভবিষ্যতে হবে, *পুরুষ এবেদগং* – সবটাই পুরুষই হয়েছিলেন আবার হবেন। এখানে জড় পদার্থ আর চেতন পদার্থ সব পদার্থকে এক করে দিয়েছেন। একটা ক্ষুদ্র তৃণের যে ডগা সেখান থেকে শুরু করে ব্রহ্মা পর্যন্ত সবটাই পুরুষ। যা কিছু আগে আগে হয়ে গেছে সেটাও তিনি ছিলেন, পরে পরে যা কিছু হবে সেটাও তিনিই হবেন। এখানে অনন্ত জিনিসটাকে বোঝানর জন্য এভাবে বলছেন। আমাদের মন হল সীমিত। সীমিত হওয়ার জন্য যখন অনন্তের কথা ভাবি তখন আমরা বৃহতের কথা ভাবি, আমাদের কাছে তাই অনন্ত হল আকাশ, সমুদ্র। অনন্ত মানে তা নয়। গণিতে বা পদার্থ বিজ্ঞানে যখন অনন্তের ব্যাপার আসে তখন তারা বলে দেয় একটা ইক্যুয়েশানে একটা জিনিসকে দেখিয়ে দিচ্ছে। $N = n+1$ যখন বলা হল, গাণিতিক দিক দিয়ে এটাই অনন্ত। কিন্তু বাস্তবে অনন্ত কিনা কি করে আমরা বুঝব? বাস্তবে নাম্বার কখনই অনন্ত হবে না। কারণ সব নাম্বার মনের জগতে আছে, আর মন নিজেই সীমিত, সেইজন্য mathematical infinity বা physicsএর infinity সব সময় আধ্যাত্মিক অনন্তের নীচে থাকবে। Mathematical infinityকে আপনি quantify করতে পারেন, কত রকমের যে তাদের infinity আছে, তারা আবার infinityর মধ্যেই infinityকে ঢুকিয়ে দেয়। Infinityকে নিয়ে বলার সময় ওনারা একটা খুব নামকরা গল্প বলেন, পরে যেটা নিয়ে আবার সিনেমাও হয়েছিল। একটা হোটেল আছে, সেই হোটেলে অনন্ত সংখ্যার রুম আছে, আর প্রত্যেকটি রুমে লোক আছে। এবার হোটেলে একজন কাস্টমার এসেছে। এই খদ্দেরকে কি হোটেলে জায়গা দেওয়া যাবে কি যাবে না? অনন্ত সংখ্যার রুমে অনন্ত লোক ঢুকে আছে এবার এই লোকটিকেও জায়গা দিতে হবে। এই জিনিসটাকে বলে mathematical jugling, এরাও বলে দিচ্ছেন নিশ্চয়ই জায়গা দেওয়া যাবে। কিভাবে দেওয়া হবে? এক নম্বর রুমের লোককে বলা হবে দু নম্বর রুমে চলে যেতে, দু নম্বর রুমের লোককে বলবে তিন নম্বর রুমে চলে যাও, তিন নম্বরকে বলবে চার নম্বরে চলে যেতে। প্রথম রুমটা ফাঁকা হয়ে গেল, সেখানে নতুন লোককে ঢুকিয়ে দেবে। এবার অনন্ত নাম্বারের এই সিরিজটা চলতেই থাকবে। অনন্ত লোক, অনন্ত ঘরে অনন্ত শিফটিং চলতেই থাকবে। এভাবে একজনকে কেন, যত খুশি লোককে জায়গা দিতে পারবে। অনন্ত + অনন্ত = অনন্ত, অনন্ত+১=অনন্ত তেমনি অনন্ত+অনন্ত মানে দুটো অনন্ত হবে না, অনন্তই হবে। এটাকেই বলে mathematical jugling। এভাবে অনেক রকম কায়দা করা যায়, অনন্ত হোটেলের ব্যবসাতে যদি লোকসান হয় তাহলে লোকসানটাও অনন্ত হতে হবে, যদি মুনাফা হয় সেটাও অনন্ত হবে। কিন্তু এখানে প্রশ্ন হতে পারে, যদি অনন্ত লোকসান হয়ে যায় এরপর কি তার মুনাফা হবে কি হবে না? এগুলোই ব্রেণের খেলা। সমগ্র গণিতে যে অনন্ত এর পুরোটাই jugling, কিন্তু spiritual infinity নয়,

কারণ একটা মহৎ আর গণিতের অনন্ত হল বৃহতকে নিয়ে খেলা করা। গণিত আর পদার্থ হল মনের বিষয়, মন হল সীমিত। সেইজন্য পুরো গণিত, পদার্থ বিজ্ঞান ওই সীমিতের মধ্যেই ঘুরপাক করছে। তাহলে এখানে অনন্তের ধারণা কি করে হবে? ঠাকুর বলছেন, আর আমাদের সব শাস্ত্রেই আছে, নির্বিকল্প সমাধিতে অনন্তের দর্শন হয়। দর্শন তো হয় না, ঠাকুর বলছেন বোধে বোধ হয়। কারণ মনটা নীচে পড়ে থেকে যায়, মন যেই নীচে পড়ে থেকে গেল, সীমিত জিনিসটাকে ছেড়ে দিল তখন সে অনন্তকে অনুভব করে, অনন্তকে জানতে পারে না। অনন্তকে একমাত্র অনন্তই জানতে পারে।

এখন কোন ঋষির এই অনন্তের অনুভব হয়েছে, এবার তিনি আমাদের বোঝাবেন কি করে? উনি হয়ত মুখ দিয়ে বললেন ঈশ্বর অনন্ত। আমরা হলাম কুয়োর ব্যাঙ, আমরা সমুদ্রের ধারণাই করতে পারছি না সেখানে অনন্তের ধারণা করব কি করে! কুয়োতে কি করে একটা সমুদ্রের ব্যাঙ পড়ে গিয়েছিল। কুয়োর ব্যাঙ একটা লাফ মেরে জিজ্ঞেস করছে তোমার সমুদ্র কি এতটা বড়। সমুদ্রের ব্যাঙ হেসে বলছে না, আরও বড়। শেষে কুয়োর ব্যাঙ এক ধার থেকে আরেক ধারে লাফ দিয়ে বলছে এর থেকেও বড়? সমুদ্রের ব্যাঙ বলছে, ধুর্! এর থেকে অনেক বড়। কুয়োর ব্যাঙ বলছে, তুমি ধাপ্পা মারছ। আমাদেরও একই সমস্যা, আমাদের মস্তিষ্কটা একটা কুয়োর মত। কুয়োর একটা সীমা আছে, কেউ ছোট কুয়ো কেউ বড় কুয়ো, তাই অনন্ত জিনিসটা আমরা কেউই ধরতে পারব না। তাহলে আমাদের কি করে বোঝাতে হবে? বিপরীত কথা এনে, একমাত্র উপনিষদই এইভাবে বলেন, *তদেজতি তন্নৈজতি*, তিনি চলেন আবার তিনি চলেনও না, তিনি অত্যন্ত দূরে আবার অত্যন্ত কাছে। বিপরীত কথা এনে অনন্তের ভাবকে আমাদের মধ্যে বসাতে চেষ্টা করেন। এখানেও ঠিক তাই করেছেন। ধীরে ধীরে আমাদের অনন্তের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু প্রথমে বলে দিলেন সব কিছু তিনিই হয়েছেন।

ঠাকুর বলছেন – ঈশ্বর বস্তু আর সব অবস্তু। এই কথাতে সবাই মনে করেন ঈশ্বরই বস্তু আর বাকী সব ফালতু জিনিস। আদপেই তা নয়, এর বক্তব্য পরিষ্কার – ঈশ্বরই আছেন, তিনি ছাড়া আর কিছুই নেই। এই বোতলকে আমরা কি বলব? বস্তু না অবস্তু? ঈশ্বর রূপে এই বোতল বস্তু, আর বোতল রূপে দেখলে অবস্তু। কিন্তু এই বোতলও ঈশ্বরের একটা বিশেষ রূপকে প্রকাশিত করছে। কিন্তু যখনই আমরা এর ঈশ্বরের রূপকে সরিয়ে বস্তু রূপে দেখবে তখনই সেটা অবস্তু হয়ে যাবে। টাকাকে মানুষ কিভাবে দেখে? সবই যদি তিনি হন, তাহলে টাকাকেও ঈশ্বর রূপে দেখতে হবে, গয়নাগাটিতেও ঈশ্বর দেখতে হবে। কিন্তু সমস্যা হল পুরুষরা একমাত্র টাকাতেই ঈশ্বর দেখে আর মেয়েরা গয়নাতেই ঈশ্বরকে দেখে, এর বাইরে আর কোথাও ঈশ্বরকে দেখতে চায় না। কিন্তু পুরুষসূক্তমে বলছে – *যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্*, যা কিছু হয়েছিল যা কিছু হবে সবই ঈশ্বর, ঈশ্বর বই আর কিছুই নেই। টাকা-পয়সা, সোনার গয়নাতে যে ঈশ্বর দেখছে এতে কোন ভুল নেই, সেখানে ঈশ্বর দেখুক সব ঠিক আছে, কিন্তু এই টাকা-পয়সা, গয়নার বাইরে মানুষ কি দেখছে? স্বামীজীকে এক আমেরিকান বিদূষী মহিলা বলছেন 'স্বামীজী আপনি আত্মা, ব্রহ্ম, ঈশ্বর, জীব সব যা বলছেন শুনতে খুবই ভালো লাগছে, সবই ঠিক বলছেন কিন্তু আমি আমার আত্মার ছবি আমার গয়না, আমার ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স, আমার নাম যশ প্রতিপত্তির মধ্যেই দেখতে পাই'। স্বামীজী বলছেন 'ম্যাডাম্ আপনি তাই দেখতে থাকুন, কোন আপত্তি নেই, হাজার হাজার জন্ম ধরে এগুলোর মধ্যে আপনি আপনার আত্মাকে দেখতে থাকুন, আপনার যেখানে দেখে আনন্দ হবে সেখানেই দেখুন, কারণ আনন্দ ঈশ্বরেরই একটি গুণ, তিনি সচ্চিদানন্দ কিনা। তারপর কোন জন্মে যখন আঘাত পাবেন, কষ্ট পেয়ে চেঁচামেচি করবেন, কান্নাকাটি করবেন তখন আপনি ঘুরে দাঁড়াবেন'। যেখানেই নিরানন্দ সেখানটাই যেন মনে হয় ঈশ্বরের বাইরে। না সেটাও ঈশ্বরের মধ্যে, কেননা যা কিছু সবই ঈশ্বর। এটাই আমাদের মূল সমস্যা, আমরা কিছু জিনিস দেখে আনন্দ পাই, কিছু জিনিস দেখলে মনে নিরানন্দের ভাব আসে। অত্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিসের জন্যই আমাদের যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট, কারণ আমরা কিছু পছন্দ মত কর্ম করতে চাই, নিজেদের কিছু পছন্দের লোকের সাথে কথা বলতে চাই, কিছু পছন্দের লোকের সঙ্গ পেতে চাই, ফলে আমাদের যত রকমের দুঃখ-কষ্ট। কথায় বলে যার আছে ভালোবাসা তার আছে ঘৃণার মত দুর্বাসা। অথচ ভগবান যে সবার মধ্যে রয়েছেন সেটাকে ভুলে আমরা ভগবানের থেকে দূরে পালাবার চেষ্টা করে চলেছি, কিন্তু পালিয়ে যেখানেই হাজির হই সেখানেও ভগবান আগে থেকেই আমার জন্য বসে আছেন। যখন আমরা কোন

কিছুর থেকে পালাচ্ছি, তার মানে এটি আমার কাছে ভগবান নয়, তার মানে আমার মধ্যে গলদ রয়েছে। কারণ যার মনে কোন রকমের গলদ থাকবে না তার কাছে *যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্*, যা কিছু আছে সব ভগবানই। যদিও এটাকে তত্ত্বগত ভাবে মেনেও নেওয়া যায়, মেনে নিয়ে বিশ্বাস করে বলছি আমি জানি তিনিই সব কিছু হয়েছেন কিন্তু আমি এখন সব কিছুতে তাঁকে দেখছি না, আমি জানি একদিন আসবে যখন আমি এটা প্রত্যক্ষ করব যে তিনিই সব কিছু, এটুকুও যদি কেউ ভাবতে পারে তাহলে বুঝে নিতে হবে সে আধ্যাত্মিক পথে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। কিন্তু বেশির ভাগ মানুষ মানতেই চায়না, এসব কথা শোনার বা জানার সুযোগই পায়না। কেউ সুযোগ পেলে শুনতে চায়না, কানে আঙ্গুল চাপা দিয়ে দেয়। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে অনেকে এসে ঠাকুরের কথা শুনছে, তাদের সঙ্গের বন্ধুরা যারা এসেছে কানের কাছে এসে বলছে আর কতক্ষণ চল না এবার। শেষে উঠছে না দেখছে রেগেমেগে বলছে তুই এখানে থাক আমরা নৌকাতে গিয়ে বসছি। এসব আধ্যাত্মিক কথা এদের মস্তিষ্ক নিতে পারেনা। পশু জন্ম থেকে প্রথম মানুষ জন্ম হলে এ রকমই হয়ে থাকে।

এই যে সর্ব্বব্যাপী চৈতন্য, যা কিছু আছে সবই চৈতন্যময়, এটা আমি বুঝতে পারছি না এটা আমার দোষ, আমি মানতে পারছি না এটা আমার দোষ। কিন্তু সত্য হচ্ছে ঠাকুর ছাড়া কিছুই নেই। স্বামী নিখিলানন্দজী কথামৃতের প্রথম ইংরাজী অনুবাদ করেছিলেন, তাছাড়া তিনি গীতা উপনিষদও ইংরাজীতে অনুবাদ করেছিলেন। রামকৃষ্ণ মঠ মিশনে ওনাকে একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলা যেতে পারে। পূর্ব জীবনে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন। গীতা উপনিষদের যে অনুবাদ করেছেন বিশ্বে আজ পর্যন্ত কেউ এত নিখুঁত অনুবাদ করেননি। শেষ বয়সে ওনার একজন আমেরিকান সেবক ছিলেন। সেবক কিছু দিন আগে একটা খুব সুন্দর ঘটনা বলেছিলেন। নিখিলানন্দজীর তখন অনেক বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। একদিন কি একটা কথার পিঠে স্বামী নিখিলানন্দ বলছেন – এইতো আমার সময় হয়ে গেল, আর বেশি দিন হয়তো বাঁচবো না। নিখিলানন্দজী একবার দুবার কথাটা বললেন। অনেকবার বলার পর ওনার সেবক, যিনি নিখিলানন্দের কাছে দীক্ষাও নিয়েছিলেন, খুব বিরক্ত হয়ে হঠাৎ ইংরাজীতে বলে উঠলেন – Till Sri Ramakrishna is there it does not matter to me who lives, who dies। যতক্ষণ ঠাকুর আছেন ততক্ষণ কে মরল কে বাঁচল তাতে আমার কিছুই যায় আসে না। আমরা এখানে মন্ত্রের যে অংশটি আলোচনা করছি, খুব গভীর ভাবে চিন্তা করলে সেবকের এই উক্তির মধ্যে এই মন্ত্রের গূঢ়ার্থটা ধরতে পারব।

মনে করা যাক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কিছু নেই, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন একটা কাঁচের জার আর এই কাঁচের জারটাকে শ্রীরামকৃষ্ণের শরীর মনে করা যাক। জারের মধ্যে তরল পদার্থে ভর্তি, সেখানে অনেক ধরণের ছোট ছোট মাছ ও অন্যান্য ছোট ছোট প্রাণী রয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে, শ্রীরামকৃষ্ণের আকৃতিটাও ওর ভেতরে রয়েছে, আর যত গ্রহ, নক্ষত্র, তারা, তারামণ্ডলী সব ঠাকুরের আকৃতির ঐ কাঁচের জারের মধ্যে রয়েছে। এখন এই কাঁচের জারের মধ্যে কেউ মরল কি বাঁচল তাতে কি আসে যায় যতক্ষণ এই শ্রীরামকৃষ্ণ রূপী কাঁচের জারটা আছে, কেননা তিনিই তো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে রয়েছেন। কারণ যা কিছু ওর মধ্যেই আছে, সবই তো শ্রীরামকৃষ্ণের শরীর।

নর্থ পোল আর সাউথ পোলে জল জমে বরফ হয়ে যায়। সেখানে বরফের নানান রকম আকৃতি হয়ে রয়েছে। কোন কারণে একটা বরফের আকৃতি গলে গেল। এখন গলে গিয়ে সেটা কি হবে? জলই তো হবে। জল থেকে বরফ আবার বরফ থেকে জল হয়েই চলেছে, মাঝখানে নানান আকৃতি নিচ্ছে। ঠিক সেই রকম আমি মরে গেলাম কি সে মরে গেল তাতে কি আর হবে। মরে গিয়ে যাবেটা কোথায়, রামকৃষ্ণের বাইরে তো সে কোন ভাবেই যেতে পারছে না, কারণ শ্রীরামকৃষ্ণ ছাড়া তো আর কিছুই নেই। *ইদম্ সর্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্*, মানে যা কিছু আছে শ্রীরামকৃষ্ণ ছাড়া কিছু নেই, যা কিছু হবে শ্রীরামকৃষ্ণ ছাড়া কিছুই হবে না। আমি আপনি শ্রীরামকৃষ্ণেরই একটা আকৃতি আবার যখন আমি আপনি মরে যাব সেই শ্রীরামকৃষ্ণতেই অন্য রূপে থাকব। আমার আপনার যে অস্তিত্ব সেটাও শ্রীরামকৃষ্ণ, আমার আপনার যেটা অনস্তিত্ব সেটাও শ্রীরামকৃষ্ণ। এই ভাবটা যার মধ্যে দৃঢ় ভাবে বসে গেছে সে কি আর কোন মৃত্যু জনিত দুঃখ বা আঘাত পাবে? ঠিক এই জিনিসটাই শ্রীকৃষ্ণ বলছেন – *অশোচ্যানান্যশোচস্ত্বং প্রজ্ঞা বাদংশ্চ ভাষসে*। ঈশ্বর ছাড়াতো কিছু নেই, তুমি কাকে

নিয়ে শোক করব! নিখিলানন্দজী মহারাজ সেবকের কথা শুনে এত প্রভাবিত হয়ে গিয়েছিলেন যে সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকার বিভিন্ন সেন্টারে ফোনে সবাইকে বলতে লাগলেন যে – দ্যাখো, আমার সেবক আজ কী দারুণ সুন্দর একটা কথা বলেছে – Till Sri Ramakrishna is there how does it matter to me, who lives or who dies। আনন্দে উদ্দিপ্ত হয়ে বললেন যে এতদিনে তাঁর একজন শিষ্য এই জিনিসটাকে ঠিক ঠিক ধরতে পেরেছে। সত্যি কথা বলতে কি এগুলোকে নিয়ে যখন গভীর ভাবে চিন্তা করা যায় তখন আমাদের মনের অনেক আজেবাজে ধরণের আবেগ মাথা তুলতে পারবে না। আর যখন উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবকে নিয়ে মনন করতে থাকবে তখন শ্রীরামকৃষ্ণ ছাড়া আর কিছুই নেই, এটা দৃঢ় থেকে দৃঢ় হতে থাকবে। নর্থ পোলে জল ছাড়া কিছুই নেই, ঐ জলই বরফ হয়ে নানান আকৃতি নিচ্ছে আবার বরফ গলে গিয়ে সেই জলেই পরিণত হয়ে যাচ্ছে, জল ছাড়া কিছুই নেই।

আর বলছেন *উতামৃতত্বস্যেশানঃ যদন্নেনাতিরোহতি* – এই যে পুরুষের কথা বলা হচ্ছে তিনি হলেন অমৃতে লোকের ঈশান, ঈশান মানে রাজা বা মালিক, আবার নশ্বর লোকেরও প্রভু। *যদন্নেনাতিরোহতি* – যারা অন্ন খেয়ে বড় হয় বা বেঁচে থাকে, তাদের যদি অন্ন না জোটে তা হলে তারা মারা যাবে, মানে যারা মৃত্যুলোকের বাসী, তাদেরও তিনি প্রভু। এখানে বলা হচ্ছে – জড়, জীব আর অমৃত এই তিনটিরই তিনি প্রভু। ঈশান, মানে যিনি শাসণ করেন, তিনি হলেন রাজা, তিনিই সব কিছুর নিয়ন্তা। মালিক বলতে আমরা যে অর্থে মনে করি, এ্যব্রাহিমিক ফ্যামিলির ধর্মে যিনি God the Father বা God the king তিনি কঠোর, একটুও ডানদিক বামদিক হতে দেবেন না, ওই অর্থে হন না। আমাদের এখানে ভগবান জ্ঞাতা রূপে হন, যেটা গীতায় বলছেন *বেদাহং সমতীতানি বর্তমানানি চার্জুন। ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাং তু বেদ ন কশ্চন।।* ভূত, ভবিষ্যত, বর্তমান সবটাই আমি জানি। জানা মানেই মালিক। যে জিনিসটাকে আপনি জেনে গেলেন আপনি সেটার মালিক। যে কোন জিনিসকে জানা, কোন বিদ্যা, যেমন আপনি যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ কি করে করতে হয় জেনে গেলেন তার মানে আপনি এখন এই বিদ্যার মালিক হয়ে গেলেন। একমাত্র ভগবানই সবটা জানেন, সেইজন্য ভগবান মালিক। তাহলে ভগবানকে যদি কেউ জেনে যায় তাহলে সে কি ভগবানেরও মালিক হয়ে যাবে? তা কি করে হবে! ভগবানই আবার বলে দিচ্ছেন *মাং তু বেদ ন কশ্চন*, আমাকে কেউ জানতে পারে না। কারণ তিনি অনন্ত। জানা মানেই বুদ্ধির খেলা, বুদ্ধি হল সীমিত, সীমিত কখনই অনন্তকে জানতে পারবে না। তাহলে কি করে জানেন? বোধে বোধ করেন, আর তিনি যতটুকু জানিয়ে দেন। ঠাকুর বলছেন, ইচ্ছে করলে তিনি ব্রহ্মজ্ঞানও দিয়ে দিতে পারেন। ব্রহ্মজ্ঞান দেওয়ার অর্থ কি? এই বোধ করিয়ে দেওয়া যে তিনি অনন্ত। তাই বলে অনন্তের জ্ঞান হয়ে যাবে না। বিরাট বোধ, সমুদ্র বিরাট এই বোধে বিরাটকে মেপে নেওয়া যায়, অনন্ত ঠিক সেই ভাবে বোধ হয়ে যাবে কিন্তু মেপে নেওয়া যাবে না। অনন্ত আর বিরাটের এটাই তফাৎ। এখানে তাঁকে পুরুষ বলা হচ্ছে, আবার পুরাণে যেখানে ভাগবত ধর্মের কথা বলা হয়েছে সেখানে যাঁকে ভগবান বলা হয়েছে, সেই একই পুরুষের কথাই এখানে বলা হয়েছে, আমরা যাঁকে ঈশ্বর বলছি, যাকে ক্রিয়াত্মক শক্তি বলা হচ্ছে সবই সেই পুরুষ। পুরুষের বিশেষত্ব কোথায়? তিনিই সব কিছু হয়েছেন। কেউ বলতে পারবে না যে আমি ঈশ্বরের বাইরে বা আমি ঈশ্বরের অধীনে নই। ভাষ্যকাররা বলছেন, ভগবান নিজেই সব কিছু হয়েছেন, স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ, কিন্তু ভগবান যিনি তিনি এই কারণ অবস্থারেও পারে। পারে হওয়ার জন্য সমস্ত জগৎ তাঁর কাছে পরিদৃশ্যমান, সেইজন্য তিনিই সব কিছুর মালিক। এত কিছুর পরেও আমরা ঈশ্বরের থেকে কুকুরকে বেশি ভয় করি – কুকুর হইতে সাবধান, কারণ আমরা ভগবানকে ভয় পাইনা। ভক্তির দিক থেকে পুরুষসূক্তম্ অনেক বেশি প্রভাবশালী। বেদে গায়ত্রী মন্ত্রের পরই পুরুষসূক্তমের গুরুত্ব। দক্ষিণ ভারতের হাজার হাজার ব্রাহ্মণরা এখনও স্নান করার আগে বা পরে পুরুষসূক্তম্ পাঠ করেন।

কিছু দিন আগে একটা গবেষণামূলক পেপার বেরিয়েছে তাতে বলছেন – কয়েকজন নিউরো বিজ্ঞানী কিছু পুরুষ মহিলার মুখে মাথায় অনেকগুলো সেনসার্স লাগিয়ে দিয়েছিল। আর সবার অজান্তে ঐ সেনসার্স গুলোর মাধ্যমে রিমোটের সাহায্যে সব পুরুষ মহিলাদের বিভিন্ন কথাবার্তাগুলোকে রেকর্ড করা হচ্ছিল। পরে দেখা গেল যখনই মহিলা পুরুষরা গ্রাম্য কথা মানে পরনিন্দা পরচর্চা, সাধারণ কথাবার্তা নিয়ে থাকছে, তখনই

তাদের প্রত্যেকের মস্তিষ্ক এক অসন্তুষ্টির অবস্থাতে চলে যাচ্ছে। আবার যখনই কোন গভীর বিষয় নিয়ে কথা বা আলোচনা করছে তখন দেখা যাচ্ছিল যে এদের মস্তিষ্ক শান্ত অবস্থায় চলে যাচ্ছে। এরা কিন্তু বুঝতে পারছে না কখন কি রেকর্ডিং হচ্ছে, আবার বিভিন্ন ধরণের আলোচনার সময় মস্তিষ্ক যে সব ধরণের তরঙ্গ ছাড়ছে সেটাও রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে। এরা কি কথা বলছে সেই সময় মনের মধ্যে কি ধরণের তরঙ্গ উঠছে, মস্তিষ্ক কি ধরণের তরঙ্গ ছাড়ছে সবই রেকর্ড হয়ে যাচ্ছিল। এইভাবে বেশ কয়েক দিন ধরে বিজ্ঞানীরা কয়েক জনের উপরে পরীক্ষা চালাল। এই গবেষণা থেকে দেখা গেল যে যখনই এরা জাগতিক বা সাংসারিক কথাবার্তা বলছে তখনই মস্তিষ্ক অস্থির হয়ে পড়ছে, মন বিক্ষুব্ধ হয়ে যাচ্ছে, প্রত্যেকের মধ্যেই একই জিনিস পাওয়া গেল, কারুর মধ্যে এর এতটুকু ব্যাতিক্রম নেই। যখনই কোন গভীর তত্ত্ব আলোচনা করছে, তা যে কোন তত্ত্বই হোক না কেন, সাহিত্য, কবিতা, দর্শন নিয়ে আলোচনা করছে তখনই মন সঙ্গে সঙ্গে প্রশান্তির অবস্থায় চলে যাচ্ছে।

গবেষণা পত্রটি সত্যিই খুব তথ্যমূলক ও তাৎপর্যপূর্ণ। আগেকার দিনে বেশির ভাগ ব্রাহ্মণরা নিত্য সকালে উঠে চণ্ডীপাঠ, গীতাপাঠ, পূজা-অর্চনা করতেন, তাঁদের চোখমুখের মধ্যে একটা সৌম্য শান্ত ভাব লেগে থাকত। ভোগের ইচ্ছা, মানসিক চাহিদা সমাজে চিরদিনই ছিল, কিন্তু সামাজিক অনুশাসনে সেগুলো চাপা থাকত। কিন্তু বর্তমান সমাজে অনুশাসনের রাশটা আলগা করে দেওয়া হয়েছে। সেদিন আর বেশি দেরী নেই, মানুষের মৃত্যুর কারণ কোন রোগভোগ হবে না, বেশির ভাগ মানুষের মৃত্যুর কারণ হবে আত্মহত্যা। রোজই খবরের কাগজে তিন চারটে আত্মহত্যার খবর থাকবে। মন যখন চঞ্চল হয়ে যায়, নিজের মনের উপর যখন সমস্ত রকমের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে তখনই মানুষ আত্মহত্যা করে। মন কেন চঞ্চল হয়? তার একমাত্র প্রধান কারণ পরনিন্দা আর পরচর্চা। যত পরনিন্দা আর পরচর্চাকে প্রশ্রয় দেবে ততই জীবন বিপজ্জনক পরিণতির দিকে এগোতে থাকবে। কিন্তু যাঁরা ধর্মপথে চলেন, ধর্মাচরণ করেন তাঁদের কেউই কক্ষণ আত্মহত্যা করতে যাবেন না। এটা একটা দিক, আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল যারাই ধর্মপথে থাকবে তাদের মনে কখনই বিমর্ষ ভাব আসবে না। এখানে যারা শুধু ধর্মীয় আচরণ করছেন তাদের কথাই বলা হচ্ছে, আধ্যাত্মিক মনোভাবাপন্নদের ধরা হচ্ছে না, তাঁরা আরও উচ্চস্তরের মানুষ। যাদের মন সব সময় হতাশায় আচ্ছন্ন, যাদের মধ্যে আত্মহত্যার মনোভাব আছে এরা কখনই ধার্মিক ব্যাক্তি হতে পারে না, কারণ এদের ভগবানে কোন আস্থা নেই। যার ভগবানে আস্থা আছে তার কক্ষণ হতাশার ভাব আসবে না, আসতেই পারে না। ভগবানে আস্থা আছে আর মন হতাশাগ্রস্থ পরস্পর বিরোধী। কারণ যিনি আনন্দস্বরূপ তাঁকে চিন্তন করলে কারুর মনে কি নিরানন্দ ভাব আসতে পারে? হতাশা, আত্মহত্যার মনোভাব এগুলো নিরানন্দ অবস্থার ফসল, আমার মনে কোন আনন্দ নেই ভাবলেই বোঝা যাবে হতাশা তাকে গ্রাস করে নিয়েছে। ভগবান সচ্চিদানন্দ, চিরন্তন, চিরকালের, অফুরন্ত আনন্দের উৎস। সেই উৎসের সাথে একবার নিজেকে যুক্ত করতে পারলে কি তার মনে কখন দুঃখ, হতাশা, বিমর্ষ ভাব আসবে?

যারা ঈশ্বর বিশ্বাস করে না, ভগবান-টগবান মানে না, তারা কি করবে? খুব ভালো কথা, আপনাকে ঈশ্বর মানতে হবে না, আপনি ঈশ্বরের কথা চিন্তা নাই বা করলেন, কিন্তু আপনি উচ্চ চিন্তন নিয়ে থাকুন, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, সাহিত্যে, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, নান্দনিক শিল্প নিয়ে থাকুন। এর ফলস্বরূপ আপনার মন কখনই বিক্ষিপ্ত হবে না, মন এতেও শান্ত থাকবে। কিন্তু আমাদের মন ইন্দ্রিয়ের পোষা কুকুরের মত, ইন্দ্রিয় সব সময়ই ভোগ করতে চাইছে, আর মন বুদ্ধিও ভোগের পেছনে ছুটে চলেছে। যে বুদ্ধি দিয়ে উচ্চ চিন্তন হবে, যে বুদ্ধি দিয়ে, যে মন দিয়ে ঈশ্বর দর্শন পর্যন্ত হয় সেই মন বুদ্ধির সমস্ত তেজ ভোগের রসদ জোগাড় করতেই শেষ হয়ে যাচ্ছে, ভোগ করার শক্তিটাও হারিয়ে ফেলছে। যখন অনেক দিন ধরে দেখে যে তেঁতুল আর আমড়া খেয়েই চলেছি তখন বাপু সুইসাইড করাই ভালো।

পৃথিবীতে যত প্রাণি আছে, সবারই এক একটা শরীর এক একটা জিনিসকে ভোগ করার জন্য উপযুক্ত। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের দ্বাদশ অধ্যক্ষ স্বামী ভূতেশানন্দজীকে একজন মহারাজ বলছেন – মহারাজ, আমার তো অনেক কিছুই হল, কিন্তু মাংস খাওয়ার সাধ এখনও মিটল না, তা আমার কি হবে মহারাজ? ভূতেশানন্দজী বলছেন – কি আর হবে, আগামী জন্মে শকুন হয়ে জন্মাবে, তখন খুব করে মাংস খাবে। শুনেই

ঐ মহারাজ ভয়ে কাঁপতে শুরু করে দিয়েছেন। কারণ এটা ঋষি বাক্য কিনা। ততক্ষণে ভূতেশানন্দজী ওনার মনের অবস্থা বুঝে নিয়েছেন, ভরসা দিয়ে ওনাকে বলছেন – না না, আমি এমনি মজা করে বলছিলাম। এর তাৎপর্য কি, এই মানব শরীর মাংস খাবার পক্ষে উপযুক্ত নয়। মাংস খাওয়ার শরীর কাদের? সিংহ, বাঘ, শকুন, এরা মাংস খেয়েই থাকে। আমাদের কিছু হলেই ডাক্তাররা বলেন রেড মীট্ খাবেন না। অথচ সিংহ বাঘ এরা মাংসই খেয়ে থাকে, আর কি তার প্রচণ্ড শক্তি, কি তার যৌবন। বাঘ, সিংহ কখন ভাত খায়না, ঘাসও খায় না। কিন্তু আমাদের মাংস খেতে বারণ করছে। এদের শরীর থেকে যে ধরণের রাসায়নিক পদার্থ নিঃস্বরণ হয় ওরা যে মাংস খাচ্ছে সেটাকে কার্বোহাইড্রেডে রূপান্তরিত করে দিচ্ছে। আমাদের শরীরে সেই ক্ষমতাই নেই। যারা মদ খায় তাদের শরীরের ক্ষমতা থাকা চাই সেই মদের কেমিক্যালসকে ভাঙ্গার। ভারতীয়দের শরীরে সেই ধরণের জিনই নেই যে মদকে ভাঙ্গবে। বিদেশীদের শরীরে সেই জিন আছে, সেইজন্য ইউরোপ, আমেরিকার লোকেরা মদ খেয়ে মাতলামো করে না। কিন্তু এখানে পেটে একটু মদ পড়তে না পড়তেই মাতলামো শুরু হয়ে যাবে। মানব শরীর এক উচ্চ অবস্থাকে প্রাপ্ত করার জন্য, ধর্ম লাভের জন্য, দর্শনের উচ্চ চিন্তনের জন্য, তোমার এই শরীর মাংস খাবার জন্য নয়, মদ খাবার জন্য নয়। কিন্তু বেশির ভাগ মানুষই মাংস আর মদের পেছনেই বেশি অর্থ ব্যয় করে। ভগবান যখন দেখবেন যে তোমাকে এত সুন্দর একটা মানব শরীর দিলাম যাতে তুমি এক উচ্চ আদর্শ লাভ করতে পার, কিন্তু সেই চেষ্টা না করে তুমি মাংস, মদ, যৌন লিপ্সাতে মত্ত হয়ে গেলে, তখন ভগবান তাকে অন্য জায়গায় পাঠিয়ে দেবেন মানে এমন এক যোনিতে পাঠিয়ে দেবেন যেখানে তোমার উচ্চ আদর্শের চিন্তা করতে হবে না, খুব করে মাংস খাবে আর বংশবৃদ্ধি করতে থাকবে।

প্রত্যেক মানুষ যেমন যেমন চিন্তা করবে তার শরীর থেকে সেই চিন্তা অনুযায়ী বিভিন্ন ধরণের আলোর আভা বেরোতে থাকে। জাগতিক চিন্তা করলে তার শরীর থেকে লাল আলো, ভালো উচ্চ চিন্তা করলে সাদা আলো আবার মন যখন ক্রোধ, রাগ, হিংসাতে ভরে যায় তখন কালো আলোর আভা ছাড়তে থাকে। মানুষের মন যখন কোন গভীর উচ্চ চিন্তাতে নিমগ্ন হয়, যে কোন উচ্চ চিন্তাই হোক, সাহিত্য, বিজ্ঞান, ধর্মীয়, আধ্যাত্মিকতার মত যে কোন কিছুর উচ্চ চিন্তা, তখনই সেই মানুষের শরীর খুব শুদ্ধ উচ্চ তন্মাত্রা ছাড়তে থাকে, লাল আলো, কালো আলো বেরনো একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। দেখা যায় এদের প্রতি সবাই আকৃষ্ট হয়, সবাই তাকে ভালোবাসে, ব্যাক্তিত্বের মধ্যে একটা আকর্ষণী শক্তি চলে আসে। এগুলো কাল্পনিক কিছু নয়, এই ধরণের আলো সত্যি সত্যি বেরোয়। আমাদের চোখ দেখতে পায়না কিন্তু মন ঠিক দেখতে পায়।

পুরুষসূক্তম্ অত্যন্ত গভীর উচ্চ চিন্তার বিষয়, রোজ এর তত্ত্বকে যদি চিন্তন মনন করা যায় তাহলে যে কোন মানুষের ব্যাক্তিত্ব পুরো পাল্টে যাবে। কারণ আমাদের যে বাস্তবিক সত্তা সে সব সময় তার নিজের স্বভাব উন্মোচনের জন্য ছটফট্ করে যাচ্ছে। পুরুষসূক্তমের উচ্চ ভাব তার সত্তাকে জাগ্রত করার সুযোগ এনে দিচ্ছে। বেদে ঈশ্বর বা ব্রহ্ম শব্দ আসেনা, ব্রহ্ম শব্দও সেই অর্থে বেদে আসেনি যে অর্থে পরের দিকে উপনিষদে এসেছে। বেদে দেবতার কথাই বেশি আসে, ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি। কিন্তু ভগবান বলতে আমরা যা বুঝি সেই ভগবানকে বেদের ঋষিরা বোঝাবার জন্য পুরুষ শব্দটাই বেশির ভাগ সময় ব্যবহার করতেন।

আমরা আগেই বলেছি যে পুরুষ দুটো অর্থে করা হয় একটা স্বরাট, যিনি আমাদের ভেতরে আছেন, আর আরেকটি বিরাট। *সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ* - তাঁর সহস্র মাথা, সহস্র চোখ, সহস্র পা বলে বোঝাতে চাইছেন পুরুষ অনন্ত। আবার আরেকটি অর্থও করা যায় – সব মাথাই তাঁর মাথা, সব চোখই তাঁর চোখ, সব পা তাঁরই পা। তাঁর বাইরে কিছুই নেই। পুরুষ ছাড়া কিছুই নেই, শুধু তাই নয়, অতীতে যা কিছু হয়েছে ভবিষ্যতে যা কিছু হবে ভগবান ছাড়া কিছুই হবে না, তিনিই আছেন, God alone exists। স্বামীজী এবং জোসেফিন ম্যাকলাউডের মধ্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ চিঠি পত্রের আদান প্রদান হয়েছিল। একটি চিঠিতে ম্যাকলাউড স্বামীজীকে লিখছেন – আপনি যে তত্ত্ব আমাদের শিখিয়ে এসেছেন আমি এত দিনে সেটা বুঝতে পারছি যে all is God, সবই ঈশ্বর। স্বামীজী সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিচ্ছেন – সব রামায়ণ বলে দেওয়ার পর প্রশ্ন করছে সীতা কার বাবা, জোসেফিন তুমি আদপেই আমার তত্ত্ব কিছুই বুঝলে না। আমি কখনই বলিনি যে সবই ঈশ্বর, আমি সব সময়েই তোমাদের বোঝাতে চেয়েছি যে ঈশ্বরই সব। *সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম*কে জোসেফিন বুঝলেন

সবই ঈশ্বর। কিন্তু তাই বলে এই বোতল কি ঈশ্বর? এই চক, এই মাইক্রোফোন কি ঈশ্বর? না, বোতল, চক, মাইক্রোফোন যদি ঈশ্বর হন তাহলে ঈশ্বর সঙ্কীর্ণ হয়ে যাবেন। এই বোতল, চক, মাইক্রোফোন রূপে ঈশ্বরই হয়েছেন। সেইজন্য বলা হয় ধর্মের তত্ত্ব বুঝতে গেলে অত্যন্ত সূক্ষ্ম বুদ্ধির দরকার। সূক্ষ্ম বুদ্ধি হয় শুদ্ধ সাত্ত্বিক আহার গ্রহণের মাধ্যমে। গীতায় আছে কোন কোন আহার সাত্ত্বিক আহার। কাড়ি কাড়ি ভাত মাংস খেলে সূক্ষ্ম বুদ্ধি হয় না। আগেকার দিনের ঋষিরা, ব্রাহ্মণরা হবিষ্যান্ন খেতেন, রাত্রে প্রায়ই উপোস করে থাকতেন, তার ফলে তাঁদের সূক্ষ্ম বুদ্ধি জাগ্রত হয়েছিল। সবই ঈশ্বর আর ঈশ্বরই সব এই দুটি কথা শুনতে অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপার মনে হবে। কিন্তু দুটোর মধ্যে যে গূঢ় পার্থক্য রয়েছে সেটা ঠিক মত না ধরতে পারলে সমস্ত শাস্ত্র ওলোট পালট হয়ে যাবে। এর আগে দুটো মন্ত্রকে নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এবার তৃতীয় মন্ত্রে বলছেন।

এতাবনস্য মহিমা অতো জায়াগ্শ্চ পুরুষঃ।
পাদোহস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি।।১০/৯০/৩(ঋ)

এতাবানস্য মহিমা – জগৎ বলে যা কিছু আছে, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড বলে যা কিছু ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বোধগম্য হচ্ছে, জড়, সজীব, নির্জীব যা কিছু আছে সব কিছুই সেই পুরুষের মহিমা। মহিমা শব্দের অনেকগুলো অর্থ হয়, এখানে মহিমা শব্দের অর্থ হল বিস্তার। সায়নাচার্য মহিমার অর্থ করে বলছেন স্বকীয় সামর্থ বিশেষ, যেটা তাঁর নিজের ক্ষমতার মধ্যে থাকে সেটাই তাঁর মহিমা। আমার বাড়ি যেমন, আমার বাড়ি আমার ক্ষমতার ভেতরে আছে, বাড়ির বাইরে চলে গেলে আমার ক্ষমতা নেই। বাড়িতে আমার সামর্থ রয়েছে, এটাই আমার বিস্তার। যে জগতের কথা বলা হচ্ছে, এই জগৎ হল ভগবানের বিস্তার। আসলে সৃষ্টিটাই ঈশ্বরের মহিমা। *অতঃ জায়াগ্শ্চ পুরুষঃ* – কিন্তু তাঁর এই সব মহিমা থেকেও তিনি আরও মহিমান্বিত। তাঁর যে মহিমা, তাঁর যে শক্তি, তাঁর যে ক্ষমতা, তাঁর যে ঐশ্বর্য তিনি এসবের থেকে আরও অনেক অনেক বেশি। একজন কাঙালী সারাদিন খেটেখুটে একশটি টাকা আয় করে, তার সমস্ত কাজের মূল্য একশটি টাকা, এই একশ টাকাতেই তার সব ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হয়ে আছে। এ হল আমাদের সেই গালাগাল দেওয়ার মত, দু-পয়সার কাঙাল আবার বড় বড় কথা বলতে আসছে। তার মানে তোমার যা ক্ষমতা ওখানেই শেষ। এই সৃষ্টি পুরুষের মহিমা, তাহলে কি ভগবান এই সৃষ্টিটা যতটুকু ততটুকুই? কখনই না, যা তুমি দেখছ ভগবান এতটুকুই নন, এর থেকেও তিনি অনেক বেশি। বড় বড় দোকানের মালিকরা শোকেসে কিছু কিছু জিনিস সাজিয়ে রাখে, কিন্তু দোকানে এটুকুই মাল নেই, গোডাউনে এর থেকে আরও অনেক ঢের মাল রাখা থাকে। এই সৃষ্টিটা ভগবানের শোকেস, গোডাউনে তাঁর আরও অনেক কিছু রাখা আছে। এটাকেই বলা হচ্ছে *এতাবানস্য মহিমা*। কিন্তু *জায়াগ্শ্চ পুরুষঃ* – পুরুষের এর থেকে অনেক বেশি মহিমা।

তৃতীয় মন্ত্রের দ্বিতীয় লাইনে বলছেন, এই সৃষ্টির থেকে তাঁর মহিমা কতটা বেশি। *পাদোহস্য বিশ্বা ভূতানি* – যা সৃষ্টি দেখা যাচ্ছে এটা ভগবানের এক পাদ মাত্র। সংস্কৃতে পাদ কথাটা খুব তাৎপর্য্য পূর্ণ। মানুষ সব সময়ই দ্বিপাদ, মানে দু পা বিশিষ্ট। কিন্তু যখনই পাদ শব্দটা আনবেন তখনই এনারা চতুষ্পাদ নিয়ে বলবেন। পাদের ঠিক আগে চার বলছে, তার মানে পাদ বলতে সমগ্রকে বোঝায় আর চতুষ্পাদ বললেই বুঝতে হবে সমগ্রকে চারটে ভাগ করে তার এক ভাগ বলা হচ্ছে, আমরা যেমন বলি চতুর্থাংশ। যখনই পাদ কথাটা আসবে তখন বুঝতে হবে চার ভাগের এক ভাগ বলা হচ্ছে। বলছেন *পাদোহস্য বিশ্বা ভূতানি* – বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু আছে এটা পুরুষের চার ভাগের এক ভাগ। আর *ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি* – বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বাইরে মানে সৃষ্টির বাইরে যা কিছু আছে সব অমৃত মানে immortal অর্থাৎ পুরুষের চার ভাগের এক ভাগ mortal আর তিন ভাগ immortal। জন্ম মৃত্যু, সৃষ্টি প্রলয় স্থিতি যাবতীয় যা কিছু সব এই চারভাগের এক ভাগের মধ্যেই হচ্ছে, বাকি তিন ভাগে কিছুই হয় না। এটাই আবার একটা কবিতা, এর আগে বললেন *দশাঙ্গুলম্*, সৃষ্টি যতটা তার থেকে তিনি দশ আঙ্গুল বেশি আর এখানে বলছেন *ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি*, এখানে একটা জিনিসকে বোঝাতে চাইছেন, এই সৃষ্টিতেই তাঁর উপচয় হয়ে যায় না। সৃষ্টির বাইরেও তিনি আছেন।

যদি কেউ প্রশ্ন করেন এই তিন ভাগ কি অব্যক্ত? আমরা এই দৃশ্যমান এক চতুর্থাংশকে যখন পুরুষের ব্যক্ত বা প্রকাশিত বলছি তাহলে কি তিন-চতুর্থাংশকে কি অব্যক্ত বলব? কখনই এই তিন চতুর্থাংশকে অব্যক্ত বলা যাবে না। কারণ বাংলায় যে অব্যক্ত শব্দ ব্যবহার করা হয় সংস্কৃতে বিশেষ করে শাস্ত্রে এর অর্থ পুরো আলাদা হয়ে যায়। এখানে অব্যক্ত বলা যাবে না, তার কারণ যা কিছু মায়া বা প্রকৃতি তাকেই অব্যক্ত বলা হয়, এক চতুর্থাংশকে যদি ব্যক্ত বলে বাকি তিন চতুর্থাংশকে অব্যক্ত বলা হয় তাহলে ঈশ্বরকে মায়া বা প্রকৃতি বলা হয়ে যাবে, কিন্তু ঈশ্বর হলেন ব্যক্ত, অব্যক্ত, মায়া, প্রকৃতি সব কিছুর পারে। এই তিন চতুর্থাংশ আসলে কি তা কেউ বলতে পারে না। নাসদীয়সূক্তে বলেছে *কো অদ্ধা বেদ*, কে জানে, কে বলতে পারবে? মানে যদি কিছু কেউ জানেন তবে তিনিই জানেন। এক চতুর্থাংশ বা তিন চতুর্থাংশের যে কথা বলা হচ্ছে এটা কি কেউ দাঁড়িপাল্লায় মেপে নিয়ে তারপর এসব কথা বলছে? কেউই জানে না। কিন্তু কিছু একটা বোঝাবার জন্য এভাবে বলছেন যা আছে তার এক চতুর্থাংশ হল যা কিছু ব্যক্ত দেখছি, আর বাকি তিন চতুর্থাংশের কোন খবর আমরা জানি না, কিন্তু সেটাই অমৃত। অমৃতের নীচে যদি একটা লাইন টানা হয় তাহলে এর নীচে দৃশ্যমান জগৎ অর্থাৎ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, আর লাইনের ওপরে যা আছে তা ব্যক্ত ও অব্যক্তের পারে। এই লাইনকেই বলা হয় অব্যক্ত বা মায়া বা প্রকৃতি। যেমন পুরুষকে বলা যায় না যে তিনি মায়ামুক্ত বা মায়াবদ্ধ, এই লাইনকে নীচ থেকে যে অতিক্রম করে উপরে চলে যাব তখন সেটা কি আর মুখে বলা যাবে না, এটাকেই বলে তিনি ব্যক্ত ও অব্যক্তের পারে। মায়ামুক্ত বললেই বুঝতে হবে যে তিনি কোন না কোন সময়ে মায়াতে বদ্ধ ছিলেন। মায়াধীশ বলা হচ্ছে বোঝানর জন্য, আসলে মায়ার সাথে ঈশ্বর বা পুরুষের কোন সম্পর্কই নেই। মায়া, প্রকৃতি, ব্যক্ত, অব্যক্ত যত কথা আছে সব এই লাইনের নীচে। এর ওপরে কি আছে মুখে বলা যাবে না। সেইজন্য ঠাকুর বলছেন – কালাপানিতে জাহাজ গেলে আর ফেরে না, মানে আর কোন খপর আসে না। এই লাইনের ঘুনাংশ উপরে গেলেই সব কথা বন্ধ।

ওখানে কি আছে কেউ জানে না, কিন্তু লোকেদের বোঝানর কিছু শব্দের সাহায্য নেওয়া হয়, সেইজন্য ঋষিরা বলছেন অমৃত। অমৃতের অর্থ যে ওখানে গেলে অমর হয়ে যাবে তা নয়, অমৃত মানে ওখানে কোন ধরণের রূপান্তর নেই, কোন ধরণের বিকার নেই। তাহলে আমরা বুঝলাম একপাদের মধ্যেই যত ধরণের লীলাখেলা চলছে আর বাকি তিনপাদের ব্যাপারে কোন কথা বলা যাবে না। সব কিছুর পার, জীবন-মৃত্যুর পার, সুখ-দুঃখের পার, বাক্য মনের অতীত। অব্যক্ত শব্দ যেই অর্থে বাংলাতে ব্যবহার করা হয় সংস্কৃতে এই ধরণের কোন শব্দই হয় না। ব্যক্ত অব্যক্ত হল যেটা দেখা যায় আর যেটা দেখা যায় না, তার মানে কার্য আর কারণ, কার্য জগৎ, তার কারণ প্রকৃতি, সেইজন্য প্রকৃতিকে অব্যক্ত বলা হয়। কিন্তু প্রকৃতির ওপরে যিনি আছেন তাঁকে নিয়ে কোন কথাই বলা যাবে না। নির্বিকল্প সমাধিতে যে লাইনের কথা বলা হয়েছিল সেই লাইনটা ভেঙ্গে এক হয়ে যায়, সেইজন্য নির্বিকল্প সমাধিতে কি হয় তার কোন উত্তর দেওয়া যায় না, কারণ মন যে পর্যন্ত যাবে সে ততটুকু পর্যন্তই ভাষায় ব্যক্ত করবে, কিন্তু যখন লাইনকে ভেঙ্গে সেই তিন চতুর্থাংশের সঙ্গে এক হয়ে যাচ্ছে তার আগেই মন নাশ হয়ে যাচ্ছে। মন কিছুতেই লাইনকে অতিক্রম করতে পারে না।

পাশ্চাত্যের দার্শনিকরা ভগবানের কথা বলতে গিয়ে বলেন God is Transcendent and immanent, এর সব কিছুতেই তিনি আছেন। তিনি কি সেখানেই শেষ? না। বাড়িতে আলুর দম রান্না করা হয়েছে। এখন জিজ্ঞেস করা হচ্ছে আলুগুলো কোথায়? আলুর দম করে দিয়েছি। আলু গুলি কোথায় আছে? সব শেষ হয়ে গেছে। কোথায় শেষ হয়েছে? আলুর দমে। যে আলু সেটাই আলুর দম হয়ে গেছে। তাহলে তো সব একটা জায়গায় গিয়ে শেষ হয়ে গেল। ঈশ্বর আর সৃষ্টি কি আলু আর আলুর দম? না। যতটুকু সৃষ্টি হওয়ার হয়ে গেল, কিন্তু ঐ সৃষ্ট যা কিছু হয়েছে ঈশ্বর তার থেকে অনেক অনেক বেশি আর তারও অনেক ওপরে। ভারতীয় আধ্যাত্মিক পরম্পরার এটাই মহিমা যে এই গূঢ় তত্ত্বগুলিকে কাহিনী আকারে সাধারণ মানুষকে বোঝান হয়। এই তত্ত্বটাই একটা বাচ্চাদের কাহিনীতে খুব সুন্দর করে বলা আছে।

কুবেরের কথা আমরা সবাই জানি, বলে নাকি কুবেরের থেকে বেশি ধন সম্পদ আর কারুর কাছে নেই। প্রচলিত আছে যে ভগবান বিষ্ণুর যখন বিয়ে হয়েছিল, তখন কনেকে সাজাবার জন্য বিষ্ণু কুবেরের থেকে

রত্ন ধার করেছিলেন। সেই ধার মেটানোর জন্য সবাই এখন তিরুপতিতে গিয়ে সোনা, টাকা সব ঢালে। মানে তিরুপতিতে যত প্রণামী পড়ে সব কুবেরের কাছে চলে যাচ্ছে। ভগবান বিষ্ণু এত টাকা কুবেরের থেকে ধার নিয়েছিলেন যে এখনও সেই টাকা শোধ হয়নি। সেই কুবেরের এখন অহঙ্কার হয়েছে, সারা ব্রহ্মাণ্ডে আমার মত এত ধন, সম্পদ, রত্ন কারুর নেই। এত অহঙ্কার হয়েছে যে কুবেরের একবার ইচ্ছে হল শিবকে তার নিজের ঐশ্বর্য দেখাবে। তাই এখন মাঝে মাঝেই কুবের শিবকে গিয়ে আকুতি মিনতি করে বলছে – প্রভু আপনি কৃপা করে একবার আমার কুটিরে আপনার পাদস্পর্শ দিয়ে আমার ঘরে দুটি অন্ন যদি গ্রহণ করেন তাহলে আমি ধন্য হয়ে যাই। আসলে কুবের চাইছে শিব আমার ঘরে এসে আমার ঐশ্বর্যটা দেখুক। এদিকে শিব নানান টালবাহানা করে কুবেরকে এড়িয়ে যাচ্ছিলেন। শিব অন্তর্যামী, কুবেরের মনের ভাব শিব বুঝে গেছেন। এদিকে কুবেরও পীড়াপীড়ি করেই চলেছে। শেষে শিব বললেন – তুমি আমার গণেশকে একদিন তোমার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তোমার মনের মত তৃপ্তি করে ওকে খাইয়ে দাও। কুবের একটু হতাশ হয়ে গেছে। কি আর করবেন, শিব যখন যেতেই পারছেন না, ঠিক আছে তাহলে গণেশকেই নিয়ে যাওয়া যাক।

গণেশ কুবেরের বাড়িতে এসেই কুবেরকে বলছে – আমার খুব খিদে পেয়েছে, তোমার ঘরে কি কি খাবার দাবার আছে আমাকে খেতে দাও। এখন কুবেরের ঘরে যত রকমের খাবার দাবার রান্না করা ছিল, যত রকমের ফল ফলাদি ছিল সব গব্‌গব্‌ করে খেয়েই চলেছে। কুবেরের ঘরে খাবার দাবারের বিশাল ভাণ্ডার। সেই খাদ্য ভাণ্ডারে যত রকমের খাবার ছিল গণেশ খেয়েই চলেছে। এত তাড়াতাড়ি সব খাবার শেষ করে দিচ্ছিল যে পরিবেশনের লোকজনরা দৌড়াদৌড়ি করে খাবার পরিবেশন করেই চলেছে। এদিকে যত খাবার মুজত ছিল সব গেল শেষ হয়ে। তখন আবার নতুন করে খাবার দাবার বানাতে শুরু করে দিয়েছে। পরিবেশন করতে দেরী হচ্ছে দেখে গণেশ গেছে প্রচণ্ড রেগে। রেগে গিয়ে গণেশ বলছে – খাওয়াতে যখন পারছ না তাহলে খাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করলে কেন, কোথায় তোমার রান্না হচ্ছে, কোথায় তোমার রান্নাঘর। চেঁচামেচি করে রান্নাঘরে ঢুকে গেছে। রান্না ঘরে যত রকমের খাবার ছিল সব শুড় দিয়ে টেনে নিয়ে খেয়েই বলছে – তোমাদের খাবারের ভাণ্ডার ঘরটা কোথায়, আমার পেট ভরছে না। এদিকে গণেশের চেঁচামেচিতে চাকর বাকর সব প্রাণের ভয়ে পালিয়েছে। এখন কুবেরের ঘরে যা কিছু ছিল সব গণেশ তাঁর শুড় দিয়ে টানছে আর পেটে চালান করে দিচ্ছে। কিছুই যখন আর অবশিষ্ট রইল না, তখন গণেশ কুবেরকে বলছে – তোমার বাড়িতে এসে আমার পেট একটুও ভরল না, তাই এখন আমি তোমাকেই খাব। তুমি খেতে আমাকে ডেকেছ কেন, আর যদি ডাকলেই তাহলে আমার পেট ভরাতে পারছ না কেন? বলেই কুবেরের পেছনে তাড়া করেছে। কুবের এখন প্রাণপনে ছুটেছে, ঘাম ফেলতে ফেলতে ছুটে শিবের কাছে এসে তাঁর পায়ে পড়ে বলছে – প্রভু আপনি আমাকে রক্ষা করুন। শিব আগে থেকেই সব বুঝে গেছেন। তিনি কুবেরকে কিছু না বোঝার ভান করে বলছেন – তোমার আবার কি বিপদ হল? কুবের বলছে – আমি তো গণেশের পেট ভরাতে পারলাম না, এখন গণেশ বলছে আমাকেই খাবে। তখন শিব গণেশকে বলছেন – এই গণেশ তোমার কি হয়েছে, তুমি অমন চেঁচামেচি করছ কেন? গণেশ বলছেন – আমার খুব খিদে পেয়েছে। শিব তখন গণেশকে মৃদু তিরস্কার করে বলছেন – খিদে পেয়েছে তো মার কাছে যাও, অপরকে কেন খাওয়ার জন্য জ্বালাতন করছ। গণেশ শিবের এক কথাতেই সুরসুর করে মায়ের কাছে চলে গেল। কুবের তখন ভাবছে – আমার অক্ষয় ভাণ্ডারের খাবার দিয়েও গণেশের পেট ভরাতে পারলাম না, অথচ মা পার্বতী এই গণেশকে রোজ দু বেলা পেট ভরে খাওয়াচ্ছেন কি করে।

বাচ্চাদের এই কাহিনীর তাৎপর্যটা কোথায়? এই ব্রহ্মাণ্ডের যে সব থেকে ধনী সে হল কুবের। কিন্তু গণেশের কাছে কুবেরের ধন রত্ন কিছুই নয়। অথচ দু বেলা মা পার্বতী গণেশকে পেট ভরে তৃপ্তি করে খাইয়ে যাচ্ছেন, মা পার্বতীর কাছে কোন ব্যাপারই নয়। কিন্তু কুবের তার সর্বস্ব দিয়েও গণেশকে এক বেলা তৃপ্তি করতে পারল না। শিব ধমক দিয়ে গণেশকে বললেন – খিদে পেয়েছে তো মার কাছে যাও অন্যকে কেন বিরক্ত করছ। যেন এটা কোন ব্যাপারই নয়। এই যে পুরুষসূক্তে বলা হচ্ছে - *পাদোহস্য বিশ্বা ভূতানি* এক পায়ে ভগবানের সমস্ত সৃষ্টি, এখানে মানে এই এক পাদের মধ্যে যা আছে সব দিয়েও গণেশকে এক বেলা তৃপ্তি করে খাওয়ানো যাবে না, কিন্তু এক পাদের বাইরে গিয়ে আর গণেশকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। এক

পাদের উর্দ্ধে সব অনন্ত, ওখানে আমাদের কিছুই চলবে না, ওখানে গিয়ে সব শেষ হয়ে যাবে, শিব ভগবান কিনা। ভগবান অনন্ত ঐশ্বর্যবান, এটাকে বাচ্চাদের কি করে বোঝাবে। তাই একটা খুব সুন্দর সহজ সরল গণেশের কাহিনী দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া হল। কুবের, যিনি এই সৃষ্টির মধ্যে সব থেকে বড়লোক, কিন্তু কুবেরের ঐশ্বর্য ভগবানের ঐশ্বর্যের সামনে একটা চিনির দানার থেকেও ক্ষুদ্র। কুবেরের কাছে যা সম্পদ আছে এটাও শিবের, কিন্তু শিবের ঐশ্বর্য এরও পারে। পুরাণের মধ্যে যত রকমের আজগুবি কাহিনী আছে তার যে কোন একটা কাহিনীকে যদি চোখ কান বন্ধ করে বেছে নেওয়া যায় তাহলে দেখা যাবে তার মধ্যে বেদের কোন না কোন একটা মন্ত্রের অন্তর্নিহিত তত্ত্বকে খুঁজে পাওয়া যাবে। বেদের এক একটা ভাব নিয়ে ঋষিরা যুগোপযোগী করে আমাদের মত সাধারণ মানুষের জন্য এই পৌরাণিক আখ্যায়িকাগুলি রচনা করে বেদের তত্ত্বগুলিকে আমাদের মস্তিষ্কে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। শিব ও পার্বতী অনন্ত ঐশ্বর্যের মালিক, তাঁদের কোন দিন চিন্তা করতে হয় না যে ঘুম থেকে উঠে গণেশকে কি খাওয়াবেন এমনই তাঁদের অক্ষয় ভাণ্ডার, গণেশও কোন দিন টের পায়না কিভাবে দুবেলা তার পেট ভরে যাচ্ছে, এমনই ভগবানের ঐশ্বর্য। চতুর্থ মন্ত্রে এই ভাবটাই আরও বিস্তৃত করে বলা হচ্ছে –

ত্রিপাদূর্ধ্ব উদৈৎপুরুষঃ পাদোঽস্যেহাঽহভবাৎপুনঃ।
ততো বিশ্বঙ্ব্যক্রামৎ সাশনানশনে অভি।।১০/৯০/৪(ঋ)

এসব মন্ত্রের মধ্যে এত গভীর উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সব রয়েছে যে, যে কোন একটা মন্ত্রের ভাবকে নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা ধ্যান করা যায়। যে ভাগটাকে ত্রিপাদ বলা হল, এই ত্রিপাদকেও একটা অংশের ভাগ বলা হচ্ছে, কিন্তু তিনি এই ত্রিপাদেরও ঊর্দ্ধে, তিনি সমস্ত পাদকেও অতিক্রম করে যান। এই ত্রিপাদেই কোন বিকার নেই। আর *পাদোঽস্যেহাঽহভবাৎপুনঃ* কিন্তু যে এক পাদের কথা বলা হয়েছে এখানেই জন্ম-মৃত্যুর খেলা চলতে থাকে। এই এক পাদের মধ্যে সমস্ত প্রাণীকে বার বার বিভিন্ন যোনির মধ্য দিয়ে আসা যাওয়া করতে হয়। ত্রিপাদে কক্ষণ কিছু হয় না, ওখানে কোন ধরণের বিকার নেই, কিন্তু এই এক পাদে সব কিছু বার বার পাল্টে পাল্টে যাচ্ছে, অনবরত দৃশ্যের পরিবর্তন হয়ে চলেছে। মানুষ যা কিছুই করুক না কেন, ধর্মের প্রশিক্ষণ তার যেমন যেমন হবে, সেই শিক্ষাকে ভিত্তি করে তার তেমন তেমন বিজ্ঞান, সাহিত্য, কলা থেকে সব কিছুই হবে। পাশ্চাত্যের আধুনিক বিজ্ঞানের ধারণাগুলো খ্রীষ্ট ধর্মেরই দান, পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীরাও খ্রীশ্চান ধর্মের পরম্পরার সৃষ্টির ধারণা থেকে কিছুতেই বেরোতে পারেনা, আইনস্টাইনও পারেননি, অন্যান্য বিজ্ঞানীরাও পারেননি। ইদানিং কালে অত্যাধুনিক গবেষণার ফলে বিজ্ঞানের ধারণাগুলো খ্রীশ্চানদের ধারণা থেকে সরে অন্য দিকে নিয়ে যাচ্ছে, এখনও তারা সেই পুরনো ধ্যান ধারণাকে ছাড়তে পারছে না।

খ্রীশ্চানদের একটা ধারণা ভগবান এই সৃষ্টিকে একবারের মত চালু করে দিয়েছেন, আর যা কিছু হবার, আসা যাওয়া সব এর মধ্যেই চলছে। এই সৃষ্টি একবার হয়ে গেছে আর সৃষ্টি হবে না। পরে ফিজিক্সের বিগব্যাঙ থিয়োরি এল। এই থিয়োরিতে বিজ্ঞান বলছে সৃষ্টির এক সেকেণ্ডের মধ্যে কি হয়েছিল সেটা আমরা বলতে পারবো না, কিন্তু তারপর থেকে আমরা সৃষ্টির সব বলে দিতে পারি। এই কথা বলে দেবার পর বিজ্ঞান দেখছে অনেক কিছুই হিসেবে মিলছে না। তারপর দশ বারো বছর আগে ফিজিক্সের আরেকটি নতুন থিয়োরি এলো যা আগের সব থিয়োরিকে পুরো উড়িয়ে দিল। তাদের থিয়োরিতে বলছে বিগব্যাঙ হয়ে সৃষ্টি হল তারপর আবার সঙ্কুচিত হতে হতে একটা পয়েন্টে সাইজে গোটা সৃষ্টি চলে যাবে, তারপর আবার বিগব্যাঙ বিস্ফোরণ হয়ে সৃষ্টি সামনে আসবে আবার ছোট হতে হতে পয়েন্ট সাইজে চলে যাবে আবার বিগব্যাঙ – এই ভাবে সৃষ্টি একবার আসছে আবার যাচ্ছে। ফিজিক্স আর গণিতের হিসেবে এই থিয়োরি দেওয়া হয়েছে, তারা বলছে এই হিসেব ছাড়া সৃষ্টিকে কোন ভাবেই ব্যাখ্যা করা যাবে না। এই থিয়োরির নাম দেওয়া হয়েছে Cyclic Theory of Universe, যদিও এখনও অনেক পদার্থ বিজ্ঞানী এই থিয়োরিকে মানে না। হিন্দুদের কাছে এই থিয়োরির নাম কল্প। হাজার হাজার বছর আগে ঋষিরা আজকের বিজ্ঞানের এই সৃষ্টিতত্ত্বকে বলেছিলেন কল্প। কল্প মানে? *যথাপূর্বং অকল্পয়ন্*, এর আগের বারে সৃষ্টি যেমনটি হয়েছিল এবারেও সৃষ্টি ঐভাবেই ঐ একই প্রণালীতে এগোবে, নতুন কিছু হবে না। এখন ফিজিক্সও একই কথা বলছে। এই যা সৃষ্টি হচ্ছে এটা এই এক

পাদের মধ্যেই আর বাকী তিন পাদে কিছুই হয় না, ওখানে যা আছে তা এক ভাবেই আছে, কোন কিছুর বিকার নেই সেইখানে। আমরা চিন্তাই করতে পারিনা ত্রিপাদে কি আছে। সমুদ্রের উপমা নিয়ে চিন্তা করা যেতে পারে, যেমন সাতটি সমুদ্র আছে, সমুদ্র যেমন আছে তেমনই থাকে কিন্তু নর্থ পোল আর সাউথ পোলে যে সমুদ্র সেখানে ঠাণ্ডার সময় জল জমে বরফ হয়ে যাচ্ছে আবার গরমের সময় বরফ গলে জল হয়ে যায়। সৃষ্টি অনেকটা এই রকম। ভগবান হলেন এই সমুদ্রের মত, সমুদ্রে কিছুই হয় না, তাঁরই এক ছোট্ট অংশে কখন সমুদ্রের জল বরফ হয় আবার কখন বরফ গলে সমুদ্রের জল হয়ে যায়। যেখানে বরফ হচ্ছে সেটাও তিনি, সৃষ্টির বাইরে যা আছে সেটাও তিনি আবার জলটাও তিনি বরফটাও তিনি। *অভবৎ পুনঃ* জল থেকে বরফ আবার বরফ থেকে জল বার বার হচ্ছে, হয়েই চলেছে, একবার হয়েই যে শেষ হয়ে যাবে তা না।

কিছু কিছু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা বেশি চিন্তা-ভাবনা করতে চান না, আধুনিক বিজ্ঞানের নতুন নতুন তত্ত্বের আবিষ্কার সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল নন, এনারা তাই এগুলোকে খুব আক্ষরিক অর্থে নিয়ে নেন। সৃষ্ট জগৎ জন্মাচ্ছে মরছে, যখন লয় হয় তখন পুরোটাই হচ্ছে, কিন্তু আবার যখন সৃষ্টি হয় তখন খুব ছোট্ট একটা অংশের মধ্যেই হয়। ঠাকুর খুব সুন্দর উপমা দিচ্ছেন, বিরাট সমুদ্রের কোথাও কোথাও বরফ হয়ে গেছে, যেখানে বরফ হয়ে গেছে সেখানে ওই বরফ একবারে গলে জল হয়ে যাচ্ছে আবার সেখানেই বরফ দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। যখন বরফ গলে গেল তখন নিরাকার হয়ে যাচ্ছে, যখন বরফ হয়ে গেল তখন সাকার হয়ে যাচ্ছে, সাকার মানেই সৃষ্টি। সমুদ্র কিন্তু অনন্ত। তার মানে ওই জায়গাতেই সব সময় বরফ হবে আবার গলে গিয়ে আবার বরফ হবে তার কোন মানে নেই, যে কোন জায়গাতেই হতে পারে। কখন এখানে হচ্ছে কখন অন্য কোথাও হচ্ছে, কখন বরফ স্ফটিকের মত হয়ে গেল, কখন হল না। কিন্তু এই রকম কত জায়গায় হবে তার কোন ঠিক নেই, কারণ তিনি অনন্ত কিনা। অন্যান্য ধর্মে বলে ভগবান একদিন ঘুম থেকে উঠে জগতের সৃষ্টি করলেন, আমাদের এখানে তা নয়, সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সব সময় চলছে। এটাও অনন্ত process। আর অনন্ত জায়গায় অনন্তের মধ্যে চলছে। তাই কত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হচ্ছে, কত ব্রহ্মাণ্ড লয় হচ্ছে আমাদের পক্ষে জানা কখনই সম্ভব নয়। কিন্তু এখানে বর্ণনা করছেন, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যদি থাকে তাহলেও ভগবানের আধ্যাত্মিক রূপ যেটা সেটা তার থেকে সব সময় ঢের বেশি থাকে। কোন দিনই ভগবান সৃষ্টির মধ্যে শেষ হয়ে যাবেন না, এ জিনিস সম্ভবই নয়।

অভবাৎ পুনঃ, আগে আগে যেমনটি যেভাবে হয়েছিল ঠিক তেমনটি সেভাবেই হবে। কখন পাল্টাবে না, এই processটা মনে রাখলে আর ভুল হবে না। সমুদ্রে আগে যেমন ঢেউ ছিল পরের ঢেউ ঠিক সেই রকমই হবে। ঠিক সেভাবেই হবে যে বলছেন, আমাদের পক্ষে এগুলো জানা সম্ভব নয়। ঋষিরাই বা কী করে জানবেন, কারণ ঋষিরাও তো তখন ছিলেন না। ঋষিদের আধ্যাত্মিক জ্ঞান থাকতে পারে কিন্তু সৃষ্টির জ্ঞান কোথা থেকে হবে! কিন্তু পুরো জিনিসটাকে যদি যুক্তির উপর দাঁড় করাতে হয় তখন এছাড়া আর অন্য কোন গতি নেই, pattern has to be the same, pattern cannot be changed by anyone। কারণ একটু পরেই দেখাবেন, ভগবান কখনই সরাসরি সৃষ্টি কার্যে জড়ান না।

ততঃ বিশ্বঙ্ব্যা-ক্রামৎ - *বিশ্বঙ্র* অর্থ হল বিবিধ সৃষ্টি। কি রকম বিবিধ? বিভিন্ন প্রকারের প্রাণী মানে দেবতা, মানুষ, তির্যক যোনি, পশু, পাখি সব তিনিই হয়েছেন। *ব্যক্রামৎ*, তিনিই সব কিছুতে ব্যপ্ত হয়ে আছেন, সে সাপ বিছে হোক, দেবতা হোক, মানুষ হোক সব কিছুতে তিনিই ব্যপ্ত। দুটি শব্দ *বিশ্বঙ্* আর *ব্যক্রামৎ*, বিশ্বঙ্ মানে নানান রকমের যোনি, আর ব্যক্রামৎ মানে হওয়া। ভগবান যিনি তিনিই নানান রকমের যোনি হয়েছেন। কোথা থেকে হয়েছেন? ওই একটি পাদ থেকে। ওই একটি পাদের মধ্যেই পুনঃ পুনঃ, এই সৃষ্টি হল আবার সংহার হয়ে যাবে, সেখান থেকে আবার সৃষ্টি হবে আবার সংহার হয়ে যাবে। পরিবেশবিদরা বলছেন পৃথিবীর নাশ হয়ে যাবে। পৃথিবীর কি করে নাশ হবে? নাশ হয়ে যাবে কোথায়? প্রাণীরা মরে যাবে, তাতে পৃথিবীর কি আসে যায়, ভগবানের তাতে কি আসে যায়! তুমি যদি মনে কর মানুষ ভগবানের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, মানুষ মরে গেলে ভগবানের দুঃখ হবে। সেতো তুমি বলছ, সবার উপর মানুষ সত্য, এটা তো তোমার কথা। ভগবান কি নিজে কোথাও এই কথা বলছেন? কোথাও বলছেন না। যদি পরিবেশ বিপন্ন হয় তাহলে মানুষ মরবে। মানুষ মরে কি হবে, হাড়গোড় সব পচে পেট্রোলিয়াম হয়ে যাবে, তাতে পৃথিবীর কিছুই হবে না। আর এই অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের

একটা ক্ষুদ্র গ্রহ পৃথিবীর মানুষ গুলো মরে গেছে ভগবান টেরও পাবেন না। সমস্যা হল যারা মনে করছে, ভগবান যখন সৃষ্টি করেছেন তখন তাঁর বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। কি উদ্দেশ্য সেটাই বলতে পারছে না। আরে ভাই মানুষ মরলে পশু হয়ে জন্মাবে, পশু মরবে গাছপালা হয়ে জন্মাবে, গাছপালা মরবে আবার কিছু হয়ে জন্ম নেবে, তাতে পৃথিবীর কি আসে যায়, সৃষ্টির তাতে কি আসে যায়। সৃষ্টি যেমন আছে তেমনই থাকবে।

তারপরে বলছেন *সাশন অনশনে, সাশন* যে খাওয়া দাওয়া করে আর *অনশনে* মানে যে খাওয়া দাওয়া করে না। এবারে পুরো অর্থটা দাঁড়াচ্ছে দেবতারা যারা আছেন অন্যান্য জীব যারা আছে, যারা খাওয়া দাওয়া করে। দেবতারা খাওয়া দাওয়া করেন না, দেবতাদের খাওয়ার প্রয়োজনই হয় না, সূক্ষ্ম জিনিসেই তাঁদের সব মিটে যায় কিন্তু মানুষ, পশু, পাখি, কীট-পতঙ্গ এদের খাওয়া দাওয়া করতে হয় তা নাহলে শরীর থাকবে না, আর কারা খায় না, যেমন পাথর, পাহাড়, নদী এরা খাওয়া দাওয়া করে না। এদের সবেতে কে আছেন? ভগবানই ব্যাপ্ত, *বিশ্বঙব্য-ক্রামৎ*, ভগবান নিজেকে সব কিছুতে ছড়িয়ে ব্যাপ্ত করে রেখেছেন। এই ব্রহ্মাণ্ডে এমন কোন কিছু নেই যেটা ঈশ্বরের ব্যাপ্তির বাইরে রয়েছে। আর এই ব্রহ্মাণ্ড কতটুকু? বলছেন ভগবানের খুব ছোট্ট একটা অংশ এই ব্রহ্মাণ্ড। গীতার দশম অধ্যায়ে শেষ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন – তোমাকে আর বেশি কি বলব, শুধু এটুকু জেনে নাও আমার একটি ছোট্ট অংশে এই পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিদ্যমান। এই শ্লোকটা পড়ে মনে হবে যেন শ্রীকৃষ্ণ আত্মশ্লাঘা করছেন। এটি কোন ভাবেই শ্রীকৃষ্ণের আত্মশ্লাঘা নয়, এই উক্তি সরাসরি বেদ থেকে এসেছে। এটা কোন দাঁড়িপাল্লা দিয়ে কিংবা স্কেল দিয়ে মাপার জিনিস নয়, এই ভাবটাই এখানে বলতে চাইছেন যা কিছু জড় বস্তু আছে তার থেকে চৈতন্য অনেক উপরে। এখানে দুটো জিনিস বোঝাচ্ছেন, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে জড় চেতন যা কিছু আছে সব তিনিই হয়েছেন আর এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেই তিনি শেষ হয়ে যান না।

গীতার সপ্তম অধ্যায়ে এই ব্যাপারটা নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে যেখানে বলা হয়েছে ঈশ্বরের দুটো প্রকৃতি, একটা পরা প্রকৃতি আরেকটি অপরা প্রকৃতি। দুটি শ্লোকে জিনিসটাকে খুব সুন্দর পরিষ্কার করে ভগবান বলে দিয়েছেন – *ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ। অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরস্টধা।।৪।। অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্। জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ।।৫।।* ভগবানের যে পরা প্রকৃতি সেখানে কিছুই হয় না, সেখানে না আছে কোন বিকার, না আছে বৃদ্ধি বা ক্ষয়, না আছে জন্ম না আছে মৃত্যু। যা কিছু এই অপরা প্রকৃতিতেই হবে। অপরা প্রকৃতি জড়, জড় হলেও তার স্বাভাবিকতাও সেই চৈতন্য, সেইজন্য জীব, দেবতা এরাও এই অপরা প্রকৃতির মধ্যে অন্তর্গত। যারা খাওয়া দাওয়া করে আবার যারা খাওয়া দাওয়া করে না তারাও আছে। তার মানে বলতে চাইছেন সমস্ত কিছু জড় প্রকৃতি, চেতন প্রকৃতি, জীব জগৎ সবটাই তিনি। পঞ্চম মন্ত্রে বলছেন –

তস্মাদ্বিরাডজায়ত বিরাজো অধি-পুরুষঃ।
স জাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাদ্ভূমিমথো পুরঃ।।১০/৯০/৫(ঋ)

পুরুষসূক্তমের এটি একটি খুব কঠিণ মন্ত্র। সংস্কৃতে *তস্মাৎ* শব্দের অর্থ তাঁর থেকে, তাঁর থেকে মানে সেই পুরুষ থেকে। বলছেন *তস্মাৎ* মানে সেই আদি পুরুষ, আদি পুরুষ হলেন ভগবান, যেহেতু বেদ ভগবান বলে না, এখানে বেদ বলছে আদি পুরুষ। সেই আদি পুরুষ থেকে *বিরাড জায়ত*, বিরাট জন্ম নিয়েছে। এই বিরাট থেকে আবার পুরুষের জন্ম। যখন এই দ্বিতীয় পুরুষের জন্ম হল, তখন বলছেন জন্ম নিয়ে এই পুরুষ সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ছেয়ে গেলেন। সেখান থেকে তিনি পৃথিবীর জন্ম দিলেন, সেই পৃথিবী থেকে তিনি বিভিন্ন জীব-জন্তুর জন্ম দিলেন। এই কারণে প্রথমেই বলা হল এই মন্ত্র সত্যিকারের কঠিন মন্ত্র আর এই মন্ত্রের ভাব ধারণা করাও কঠিন। এই বিরাট মানে সেই আদি পুরুষ থেকে ডিম রূপে যে বিরাটের জন্ম হল, যাকে বলা হয় হিরণ্যগর্ভ, মানে সোনার ডিম। সেই ডিমের আকার বিশাল। বলছেন সৃষ্টির যা কিছু হবে তা প্রথমে ডিম আকারে জন্ম নেয়। প্রথমে বললেন সেই আদি পুরুষ থেকে বিরাটের জন্ম, সেই বিরাটের থেকে আবার *বিরাজো অধি-পুরুষঃ* অধি-পুরুষের জন্ম। কেউ যদি বলি বাবার থেকে ছেলের জন্ম আবার সেই ছেলের থেকে বাবার জন্ম হল, এটা কি কখন বোঝা যায়? বেদে প্রায়ই একটা ধারণার খুব উল্লেখ পাওয়া যায় তাহল – ‘ক’

থেকে ‘খ’ এর জন্ম আবার ‘খ’ এর থেকে ‘ক’ এর জন্ম হচ্ছে। যেমন অনেক জায়গায় বলা হয় যে জিনিস থেকে ইন্দ্রাদির জন্ম আবার ইন্দ্রাদির থেকে সেই জিনিসের জন্ম নেয়। এটা বেদের একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য। পুরাণেও একটা ধারণার উল্লেখ পাওয়া যায় যেখানে বলছে ব্রহ্মা প্রথমে নিজের মন থেকেই সৃষ্টিকে এগিয়ে দিচ্ছিলেন। কিন্তু মন থেকে সৃষ্টি করতে গিয়ে ব্রহ্মা দেখলেন এতে প্রচুর সময় অপচয় হয়ে যাচ্ছে। সৃষ্টি দ্রুত এগোচ্ছিল না, ব্রহ্মা চাইছিলেন সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় একটা গতি দিতে। তখন ব্রহ্মা নিজেকে দুটো ভাগে বিভক্ত করে দিলেন। তিনি নিজেকে একটা ভাগে পুরুষ আরেকটা ভাগে নারী করে নিলেন। এই নারী আর পুরুষ থেকে সৃষ্টি এগোতে লাগল।

ভাগবত পুরাণেও খুব সুন্দর বলছেন, ভগবান প্রথমে পঞ্চভূতের সৃষ্টি করলেন – আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী। পঞ্চভূতের সৃষ্টি করে ভগবান তাদের সৃষ্টি করতে বলে দিলেন। পঞ্চভূত থেকেই জগতের সব কিছুর সৃষ্টি হয়েছে। বিজ্ঞান যে এ্যটমের কথা বলে, এ্যটমের পুরোটাই পঞ্চভূতের পৃথিবী বা ভূমির মধ্যে আছে। পঞ্চভূত মানে পাঁচটি সূক্ষ্ম তত্ত্ব বা মহাভূত, যদিও ঠিক ঠিক তুলনা হবে না, ইলেক্ট্রন প্রোটন কোয়ার্ক্স এই সূক্ষ্ম স্তরে যদি তুলনা করা হয় তাহলে কিছুটা ধারণা করা যেতে পারে। এনারা বলেন ভূমি তত্ত্ব এসে যাওয়ার পরই ঠিক ঠিক পরিদৃশ্যমান জগতের অনুভব হয়। পঞ্চভূতকে সৃষ্টি করে বলে দেওয়া হল, তোমরা এসে গেছ এবার সৃষ্টির কার্য করতে থাক। কিন্তু দেখা গেল তারা কিছুই সৃষ্টি করতে পারছে না। তারা তখন ভগবানকে গিয়ে বলল, আমরা সৃষ্টির কার্য করতে পারছি না। তখন ভগবান ওই পাঁচটি ভূতের মধ্যে নিজেই প্রবেশ করে গেলন। ভগবান এদের মধ্যে প্রবেশ করতেই দেখা গেল এবার তারা সৃষ্টি কার্যে সক্ষম হয়ে গেছে। আকাশ, বায়ু আদি তত্ত্ব এত সূক্ষ্মভূত কিন্তু তার মধ্যেও ভগবান প্রবেশ করে গেলেন, তার মানে ভগবান আরও কত সূক্ষ্ম। আকাশ সব থেকে সূক্ষ্মতম তত্ত্ব, কিন্তু ভগবান তার থেকেও সূক্ষ্ম। ভগবান ওই সূক্ষ্মতম থেকেও সূক্ষ্ম হয়েই শেষ হয়ে যাচ্ছেন না, তিনি আবার অনন্ত। এই যে ধারণা, তিনি পঞ্চভূতের সৃষ্টি করলেন কিন্তু পঞ্চভূত সৃষ্টি কার্যে অসমর্থ, তখন ভগবান নিজেই এদের মধ্যে প্রবেশ করে গেলেন তারপর তারা সৃষ্টি করতে সমর্থ হলেন। তাহলে এই সৃষ্টিটা কে করছেন? সৃষ্টি কে করছেন সত্যিই বলা খুব মুশকিল। আপাতদৃষ্টিতে সৃষ্টি পঞ্চভূত করছে, কিন্তু পঞ্চভূতের মধ্যে ঈশ্বর না থাকলে সৃষ্টি হবে না। পদার্থ বিজ্ঞান বলছে এই জগৎ পদার্থ থেকে এসেছে, বিজ্ঞান ভুল কিছু বলছে না। আমরাও বলছি পঞ্চভূত থেকে জগৎ এসেছে, একই কথা। কিন্তু পঞ্চভূতের মধ্যে যে ঈশ্বর প্রবেশ করেছেন তার কি প্রমাণ আছে? কোন প্রমাণই নেই। তাহলে ঈশ্বরই যে সৃষ্টি করছে তার কি প্রমাণ আছে? কোন প্রমাণ নেই। তাহলে আমরা আবার সেই পুরনো দিনে ফিরে যাচ্ছি, সাধক আছেন, সাধক সাধনা করছেন, সাধনা করতে করতে শেষ অবস্থায় গিয়ে দেখছেন ঈশ্বরই আছেন আর যা কিছু আছে সব ঈশ্বরই হয়েছেন। পঞ্চভূত সৃষ্টি করতে পারছে না আর ঈশ্বরই সব হয়েছেন এই দুটোকে যখন মেলাতে যাচ্ছেন তখন তাঁরা আনলেন, ভগবান এর মধ্যে ঢুকে আছেন, তা নাহলে সৃষ্টি হবে না। জড় কখন সৃষ্টি করতে পারে না। প্রাচীনতম দর্শন সাংখ্য দর্শনে সৃষ্টি প্রকৃতি করে। প্রকৃতি সত্ত্ব, রজো আর তমো এই তিনটে গুণের সমাহার। সত্ত্ব, রজো আর তমো বিবর্তিত হতে হতে পঞ্চভূত সৃষ্টি হয়েছে। সাংখ্য মতে সৃষ্টি প্রকৃতি করে, এই মত বেদান্ত মানে না, আর শাস্ত্র প্রমাণ দিয়ে সাংখ্যবাদীদের তাঁরা তুলোধুনো করেন। দুটো জড় পদার্থ যদি থাকে এরা এক অপরের কাছে যাবে কি করে!

পদার্থ বিজ্ঞানের একটা থিয়োরিতে বলছে, একটি মানুষ কোন এক দ্বীপে পৌঁছে গেছে। দ্বীপে প্রথম কোন মানুষের পদার্পণ হয়েছে, বালি ছাড়া দ্বীপে কিছু নেই। হঠাৎ লোকটি একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখছে বালির উপর একটা রোলেক্স ঘড়ি পড়ে আছে। এখানে রোলেক্স ঘড়িটা কোথা থেকে এল? তখন পদার্থ বিজ্ঞান বলছেন, ওখানে বাতাস চলছে তাতে random mixing of sand হয়ে হয়ে একটা ঘড়ি তৈরী হয়ে গেছে। এই কাহিনী কি কেউ বিশ্বাস করতে পারবে? কিন্তু পুরো পদার্থ বিজ্ঞান এই থিয়োরীর উপর দাঁড়িয়ে আছে। পদার্থ বিজ্ঞানীরাই এই উপমা নিয়ে এসেছেন। এ্যটমের সংমিশ্রণে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিজে থেকেই হয়ে যাচ্ছে, ডিএনএ, জীনস সব নিজে থেকেই মিশ্রণ হতে হতে হয়ে যাচ্ছে, মানুষও নিজে থেকেই হয়ে যাচ্ছে। কারণ জড় জড়ের উপর কাজ করে যাচ্ছে। তাহলে চাঁদে মিশ্রণ হয়ে হয়ে একটা রোলেক্স ঘড়ি কেন হতে পারবে না! যদি

random mixing দিয়ে মানুষ হতে পারে তাহলে রোলেক্স কোম্পানীর ঘড়ি কেন হতে পারবে না! ঋষিরা এই জিনিসটাকে কেটে দিচ্ছেন। তাঁরা কি কোন আবেগ তাড়িত হয়ে কেটে দিচ্ছেন? কোন আবেগবশতঃ কিছু বলছেন না, তাঁরা এই জিনিসটাকে স্পষ্ট দেখতে পান। ঠাকুর যখন বলছেন, তিনিই সব কিছু হয়েছেন, তাঁর ইচ্ছাতেই সব কিছু হয়, তিনি কেন এই কথা বলছেন? কারণ ঠাকুর এটাতেই প্রতিষ্ঠিত। যদিও এগুলো সব সত্য কিন্তু যতক্ষণ অনুভব না হচ্ছে ততক্ষণ এগুলোর কোন অর্থ থাকে না। যাঁর অনুভূতি হয়েছে, তাঁর বাইরে অন্যের কাছে এগুলোর কোন অর্থ হয় না। তাহলে আমরা কি ঠাকুরের কথা শুনব না? অবশ্যই আমাদের শুনতে হবে, কারণ যখন জানব ঈশ্বরই সব কিছু হয়েছেন, তিনিই সব কিছু করছেন তখন কেউ যদি আমার গলা কেটে দেয় আমি তখন বলতে পারব *ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে*। আমাকে কষ্ট কে দিচ্ছে? ঈশ্বর। তাহলে যে লোকটি আমাকে গালাগাল দিল সে কে? ঈশ্বর। আর আমি কে? ঈশ্বর। তাহলে কে কাকে কষ্ট দিচ্ছে, তখন কিসের থেকে শোক হবে আর মোহই বা কোথা থেকে আসবে!

ব্রহ্মানন্দজী তাঁর শিষ্যদের উপদেশ দিতেন না। একদিন এক শিষ্য মহারাজকে জিজ্ঞেস করছেন – মহারাজ আপনি আমাদের উপদেশ দেন না কেন? মহারাজ শুনে বলছেন, যখনই ভাবি উপদেশ দেব তখন ঈশ্বরের কথাই চিন্তা করতে থাকি, ঈশ্বরের কথা চিন্তা করলেই দেখি তোমরা সেই ঈশ্বরেরই রূপ, এরপর আমি তোমাদের আর কি উপদেশ দেব! ঈশ্বরের উপদেশ দেওয়া মানে ঈশ্বরীয় কথা, ঈশ্বরীয় কথা বলা মানে ঈশ্বরের চিন্তা। ঈশ্বরের চিন্তা এলেই দেখছেন সবই ঈশ্বর, এরপর কাকে উপদেশ দেবেন। এখানেই স্বামী বিবেকানন্দের বৈশিষ্ট্য, একদিকে তিনি জানেন সবই ঈশ্বর তা সত্ত্বেও তিনি উপদেশ দিচ্ছেন। এটা যে স্বামীজীর কি বিরাটত্ব আমরা ধারণাই করতে পারব না। উপদেশ তিনিই দেন যিনি জানেন আমরা ঈশ্বর নই, কিন্তু স্বামীজী জানেন আমরা ঈশ্বর, তা সত্ত্বেও উপদেশ দিচ্ছেন। এই জিনিস অসম্ভব। যিনি জানেন সবাই ঈশ্বর তিনি কখনই উপদেশ দিতে পারবেন না। আর ঈশ্বরকে যে জানে না সেই উপদেশ দিতে পারবে। কিন্তু এখানেই স্বামীজীর বৈশিষ্ট্য। স্বামীজীর যে সমস্যা হত না তা নয়, স্বামীজীও থেকে থেকে ওই ভাবে চলে যেতেন, ঠাকুর তখন আবার তাঁর উপর অন্য রকম আবরণ নিয়ে আসতেন। আর কথামৃতের পাতায় পাতায় ঠাকুরের এই অবস্থার বর্ণনা। ঠাকুর বলছেন, বাপু! এখন যা অবস্থা তাতে হয় সবারই কথা মানতে হয় আর তা নাহলে কারুরই কথা মানি না। ঠাকুরের অসুখ করেছে, একটা বাচ্চা ছেলে বলে দিচ্ছে আপনি এইটা করুন, ঠাকুর সেটাই করছেন, আবার ডাক্তার এসে আরেকটা করতে বলছে, ঠাকুরও তাই করছেন, যে যখন যেটা করতে বলছে সেটাই করে দিচ্ছেন। ডাক্তার যে রকম বলছে আরেকজন তার উল্টোটা বলছে, তিনি উল্টোটাই করছেন। যে যখন যা বলছেন তিনি তাই করছেন। কেন করছেন? কারণ সবাইকে তিনি নারায়ণ দেখছেন। নরেন এসে একদিন বলে দিল, আপনি যে কালী কালী করেন এটা মনের ভুল। ঠাকুরের কাছে সেটাও সত্য, কারণ নরেন বলছে, নরেন সাক্ষাৎ নারায়ণ কিনা। ঠাকুর আবার মা কালীকেই জিজ্ঞেস করতে দৌড়ে কালী মন্দিরে যাচ্ছেন, মা নরেন বলছে মনের ভুল, আমি মুর্খ বলে আমাকে তুই বোকা বানালি! মা তখন বলছেন, নরেন মানবে। ফিরে এসে নরেনকে বলছেন তোর কথা আর আমি শুনব না। এই উচ্চস্তরে যিনি বিচরণ করছেন, তাঁর কথাগুলোকে যদি আমরা বিশ্বাস করে চলি তখন ধীরে ধীরে ঈশ্বর আছেন এই বিশ্বাসটা দৃঢ় হতে থাকে, বিশ্বাস যত দৃঢ় হয় তত অনুভূতি হতে থাকে। তারপর যখন ঈশ্বরের সাক্ষাৎ দর্শন হয় একমাত্র তখনই বোঝা যায় তিনিই সব কিছু হয়েছেন। তার আগে অর্থাৎ ঈশ্বর দর্শন না হতেই যদি কেউ মুখের কথায় বলে সব তাঁর ইচ্ছাতেই হয় বুঝতে হবে সে একটা spiritual fraud। এরা নিজের বেলায় আঁটিসাটি পরের বেলায় দাঁতকপাটি। যারা নিজের উপরে সব কিছু নেয়, আমার যা কিছু হচ্ছে ভালো মন্দ সব ঈশ্বরের ইচ্ছায় হচ্ছে এরা ছাড়া বাকি সব spiritual fraud।

এখানে সৃষ্টির ব্যাখ্যা এভাবে করা যেতে পারে, এই ব্যাখ্যা ভাষ্যের সাথে নাও মিল থাকতে পারে। নির্গুণ নিরাকার যিনি তিনি কখন সৃষ্টি করেন না, ভাগবতাদি গ্রন্থে যে বর্ণনা করা হয়েছে তাতে পরিষ্কার বোঝা যায়। সেখানে নির্গুণ নিরাকারকে ক্ষীর সাগরের সাথে তুলনা করা হয়েছে। অনন্ত সাগরের কোথাও কিছু নেই। কিন্তু অনন্ত সাগর আছে, অনন্ত সাগরের কথা আমরা আজকে বলছি, কারণ যিনি অনন্ত সাগরের কথা বলছেন

তাঁর মন সৃষ্টি হয়ে গেছে, সেই মনের মাধ্যমে দেখছি বলে আমরাও সাগর দেখছি। কিন্তু তিনিই যখন একমাত্র থাকেন তখন দ্রষ্টাও থাকে না দৃশ্যও থাকে না, শুধু মাত্র শুদ্ধ চৈতন্যই আছেন। কোন একটা কারণে, কেউ জানে না ওই কারণটা কি, কেন হয়, হঠাৎ অবিদ্যার উদয় হয়। অবিদ্যার কেন উদয় হয়, কিভাবে হয় এর উত্তর কেউ কোন দিন দিতে পারবে না, কারণ অবিদ্যার যখন উদয় হয়, তার অনেক পরে মনের জন্ম হয়। যার পরে জন্ম হয়েছে সে তার আগের কথা কি করে বলবে! আমি বাইরে থেকে ঘরে এলাম, তার আগে কেউ ঘরে আগুন লাগিয়ে চলে গেছে। পুলিশ এসে আমাকে ধরল, ধরে বলছে কে এই আগুন লাগিয়েছে। আমার কাছে তখন একটাই উত্তর, আমার আসার আগে এই ঘটনা হয়েছে, আমি কি করে বলব! ঠিক সেই রকম মন পরে এসেছে তাই মন তার আগের কথা কি করে বলতে পারবে! বলতে না পারার জন্য ওই জায়গাটায় নানান শব্দের ব্যবহার করা হয়। যেমন খ্রীশ্চানরা বলছে God's will, শাক্ত মতে বলবে ঈশ্বরের শক্তি, বেদান্তীরা এটাকেই মায়া বলছেন, সাংখ্যবাদীরা বলছেন প্রকৃতি। আসল কথা হল কেউই উত্তরটা জানে না। জানার তো কোন প্রশ্নই নেই, যেমনি আপনি জেনে গেলেন তার মানে আপনারই কথাতে আপনারই দর্শন ভেঙে পড়ে যাবে। কারণ জিনিসটা অযৌক্তিক হয়ে যাবে। অযৌক্তি কেন হবে? আপনার মনেরই সৃষ্টি হয়নি তার আগের কথা আপনার মন কি করে বলবে! সেইজন্য এনারা একটা শব্দ তৈরী করে নিচ্ছেন, এরপর আপনি সেটাকে অবিদ্যাই বলুন, মায়া, প্রকৃতি, শক্তি যাই বলুন আর ঈশ্বরের ইচ্ছাই বলুন ওই নিরাকারে একটা চাঞ্চল্য এসে যায়, ওই চাঞ্চল্যকে একটা অঞ্চলের মধ্যে হতে হবে, সৃষ্টি তো এক পাদেই হতে হবে, তাই বলছেন *ত্রিপাদূর্ধ্ব*। চাঞ্চল্যকে যেই আঞ্চলিকতার মধ্যে নিয়ে আসা হল তার মানে অনন্ত এখন সীমিত হয়ে গেল, অনন্তের উপর একটা বিভাজন রেখা এসে গেল। বিভাজন রেখা কেন এসেছে? অবিদ্যার জন্য। এই অবিদ্যা বাস্তবিক না কল্পনা? আপনার মন যেমন তার উপর নির্ভর করবে বাস্তবিক নাকি কল্পনা। আপনি যদি শক্তির উপাসক হন তাহলে আপনি বলবেন অবিদ্যা সত্য, শিব আর শক্তি এক সঙ্গে থাকেন, আমরাই বলছি ঠাকুর মা একসাথে আছেন *যথাগ্নের্দাহিকা শক্তি*। মা চাইলেন এবার সৃষ্টি করব। আপনি যদি ঘোর বেদান্তী হন তখন বলবেন এটা মায়া। কিছুই হয়নি, শুধু সচ্চিদানন্দই আছেন। আপনার মনের গঠন যেমন তার উপর নির্ভর করবে আপনি অবিদ্যাকে কিভাবে নেবেন।

পুরাণ মতে বলবে, হঠাৎ দেখা গেল অনন্ত নাগের উপর বিষ্ণু শয্যায় শায়িত। তিনি ছোটখাটো বিষ্ণু নন, বিরাট বিষ্ণু, তিনি অনন্ত, যিনি অনন্ত তাঁর শয্যায়ও অনন্ত হবে, তাই তিনি অনন্ত নাগের উপর শয়ন করে আছেন। তাঁর যে নাভি হবে তাকেও বিরাট হতে হবে। সেই নাভি থেকে যে পদ্ম বেরিয়ে আসবে সেই পদ্মকেও বিশাল হতে হবে। তখন দেখা গেল সেই পদ্মের উপর ব্রহ্মা এসে গেলেন। তারপর ব্রহ্মা তপস্যাদি করলেন। এই যে পৌরাণিক লম্বা কাহিনী, এই কাহিনী দিয়েও সৃষ্টি তত্ত্বের সব কিছুকে স্পষ্ট করতে পারছে না। পুরাণের সৃষ্টি তত্ত্বকে বুঝতে গেলে পুরো বেদ পুরাণ পড়তে হয়। কিন্তু এখানে দুটো সমস্যা হয়ে যায়। আমি আপনি যে আছি, আমার আপনার থাকাতে শুধু আধ্যাত্মিকতাতেই সমস্যা হয় না, পদার্থ বিজ্ঞানেও সমস্যা হয়। আমি কোথায় বসে আছি, এই ঘরে চেয়ারে বসে আছি। কখন বসে আছি? ঘড়ি বলছে বিকেল পাঁচটা চল্লিশ মিনিটে। টাইম আর স্পেস এসে গেল। আমার যে স্পেস সেটা নির্দিষ্ট হয়ে আছে। যদি স্যাটেলাইটের Global Positioning System (GPS) লাগিয়ে দিয়ে দেখা হয়, ওরা পুরো পিন পয়েন্ট করে বলে দেবে অমুক জায়গায়, অমুক সময়ে আমি বসে আছি। আমি অমুক ব্যক্তি কোথায় ফিক্সড হয়ে আছে? দেশ ও কালে বদ্ধ আছে। বাচ্চারা যেমন প্রজাপতি ধরে কাগজে পিন বা আঠা দিয়ে লাগিয়ে রাখে, আমাকেও পিন দিয়ে ফিক্সড করে দেওয়া আছে। কোথায়? দেশ ও কালে। ছটার সময় এই ঘরে এসে দেখবে আমি নেই। তাহলে অনন্ত আর এই সীমিতের মধ্যে একটা বড় তফাৎ হল দেশ ও কালের। তাছাড়া ক্রিয়া আছে, আমি হাত নাড়ছি, হাত নাড়া মানে ক্রিয়া, ক্রিয়া মানেই measurement of time। সময়কে যখন মাপা হয় তখন আমরা ক্রিয়াকে বলতে পারব না, কারণ ক্রিয়া হতে হলে কম করে তিনটে dimensionএ হতে হবে। তার মানে আমাদের দরকার দেশ ও কাল। এই দেশ ও কাল কোথা থেকে সৃষ্টি হল? আইনস্টাইন না আসা পর্যন্ত সমগ্র পদার্থ বিজ্ঞান, নিউটনের মত শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীরাও দেখাতে পারলেন না যে দেশ, কাল এগুলো সব জড়িয়ে আছে।

আইনস্টাইন এসে দাঁড় করালেন, অথচ বেদের এই মন্ত্রে দেশ কাল সব কিছুকে ফিক্সড করে রেখেছে। কারণ নির্গুণ নিরাকারের প্রথম বৈশিষ্ট্য তাঁর দেশ কাল বলে কিছু নেই। আগেকার লোকেরা এই জিনিসটা বুঝতেন না, পরে বিগব্যাঙ আসার পরে বুঝতে পারছেন। আইনস্টাইনের থিয়োরী যখন আসতে শুরু হল তখন প্রথমেই এল expanding universe। অথচ একশ বছর আগে স্বামীজী পুরুষসূক্তমের এসব মন্ত্রকে ব্যাখ্যা করলেন, ব্যাখ্যা করে তাঁর Complete Worksএ অনেক জায়গায় বর্ণনা করেছেন। Space created হয়, space expand করে এসব কথা আইনস্টাইন সেদিন এসে বললেন। পাশ্চাত্য দুনিয়া তার আগে জানত না space created হয় আর space expand করে। এখন তাঁরা বলছেন, space কোথায় expand করে? কোথায় expand করে তাদের বোঝার বা ধারণা করার ক্ষমতা আছে? Space শুধু expandই করে না তার সাথে বলছেন time has a beginning। Time মানেই কাল, বলছেন কালের জন্ম হয়। কখন জন্ম হয়? অবিদ্যার যখন জন্ম হয়। এটাকেই মন্ত্রে বলছেন creation of space। কিভাবে হয়? *তস্মাদ্বিরাডজায়ত*, *বিরাড* মানে totality, সামগ্রিক। বিরাডের এখানে পরিষ্কার অর্থ এক অন্তরীক্ষ দুই the hugeness। কিসের hugeness? এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের, বিগ ব্যাঙের থিয়োরীতে যেখানে বলছে space expand করে তখন তা ঠিক এভাবেই হয়। প্রথমে একটা ডিম, ওই ডিম বড় হতে শুরু করল। বড় যখন হচ্ছে তখনই space তৈরী হচ্ছে। ডিমটা যেই বড় হয়ে যাচ্ছে ডিমের মাঝখানে space তৈরী হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ওই ডিম কোথায় বড় হচ্ছে? আমরা এর আর ধারণা করতে পারব না। কিন্তু জিনিসটা এভাবেই হয়, অঙ্ক আর অন্য অনেক পদ্ধতিতে দিয়ে আজ প্রমাণিত হয়ে গেছে, এভাবেই হতে হবে। সৃষ্টিতে প্রথমে creation হয় space আর Timeএর। দেশ ও কালের সৃষ্টি যখন একবার হয়ে গেল, এবার আস্তে আস্তে সব কিছুর সৃষ্টির শুরু হবে। বিরাট হল creation of space and time। এটাই চৌদ্দশ পনেরশ বছর আগেকার ভাষ্যাকারদের মত, সেইজন্য বলছেন *তস্মাদ্বিরাডজায়ত*, সেখানে বিরাটের জন্ম, বিরাট হল Totality। Totalityকে আচার্য বলছেন ব্রহ্মাণ্ডের যে জন্ম হল ওই ব্রহ্মাণ্ড স্বর্ণ বর্ণের। ওই ডিমটা বড় হতে শুরু করল। ডিম ফুটে যেমন মুরগীর বাচ্চা বেরিয়ে আসে, তেমনি সেই বিরাট থেকে বেরিয় এল *বিরাজো অধি-পুরুষঃ*। এখানে দুটো পুরুষ এসে গেল, প্রথমে নির্গুণ নিরাকার পুরুষ কিন্তু দ্বিতীয় যে অধি পুরুষের জন্ম হল তিনি সগুণ সাকার। সগুণ সাকার কোথা থেকে আসছেন? যখন দেশ ও কালের সৃষ্টি হয়ে গেল তখন ভগবান সেই দেশ ও কালের মধ্যে ঢুকে যান। এই যে পুরুষ দেশ ও কালের মধ্যে ঢুকে গেলেন তিনি তখন হয়ে গেলেন দেহাভিমানী, দেহের সাথে এনার একাত্মবোধ। ইনিই পরে সব কিছুর অন্তর্যামী হন।

এখানে এসেই ব্যাপারটা খুব সংশয় তৈরী করে। ভগবান আছেন, তিনি নির্গুণ নিরাকার যাই হোন না কেন, তিনি একটা ডিম তৈরী করলেন, যে ডিম দেশ ও কালের জন্ম দিল, দেশ ও কালের জন্ম দিয়ে তিনি নিজেই তার মধ্যে প্রবেশ করে গেলেন। যিনি অনন্ত, তিনি একটা সীমিত জিনিস তৈরী করে তার মধ্যে ঢুকে গেলেন, এটা কি করে সম্ভব? বেদে কিন্তু এই ব্যাপারটাই বার বার আসে। যেমন বলছেন, কিছু কিছু জিনিস দিয়ে ইন্দ্র তৈরী হল, ইন্দ্র আবার ওই জিনিস গুলিকেই তৈরী করল। এখানে বলতে চাইছেন, সৃষ্টি তত্ত্ব বোঝা খুব কঠিন, ভগবান বললেন let there be light আর সৃষ্টি হয়ে গেল, আসলে বলতে চাইছেন এভাবে হয় না। সৃষ্টি তত্ত্ব ধারণা করা কঠিন তাই প্রথমে বলছেন ভগবান বিরাটকে তৈরী করলেন, বিরাট মানে দেশ আর কাল। দেশ ও কাল মানেই মায়া, মায়া দিয়ে যখন নির্গুণ নিরাকারকে দেখা হবে তখন তাঁকে সগুণ সাকার দেখাবে, সগুণ সাকার মানেই ঈশ্বর, ঈশ্বর মানেই মায়ার আবরণ দিয়ে যখন নির্গুণ নিরাকারকে দেখা হয় তখন যে জিনিসটাকে দেখায় সেটাই ঈশ্বর। এবার তিনি পর্দার এদিকে চলে এসেছেন। আরেকটা হল তিনি ঢোকেনওনি বাইরেও যাননি। আমরা সবাই এই ঘরে আছি, ঘরের বাইরে একটা পর্দা দেওয়া আছে। বাইরে থেকে ফুটো দিয়ে যখন কেউ ঘরের ভেতরটা দেখবে তখন সে বলবে – এই দেখো ঘরের মধ্যে লোকের আবির্ভাব হয়েছে। আবির্ভাব কোথা থেকে হবে, এরা তো আগে থেকেই নিজের মত আছে। বলছে দেখা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে মানে যা দেখছ সব চিরদিনই ওখানে ছিল। উপমার সাহায্যে এই জিনিসগুলো যত সহজে বলে দেওয়া যায় ঈশ্বরের ব্যাপারে এত সহজে বলা যায় না। সেইজন্য বলছেন তিনি এটাকে সৃষ্টি করেছেন, বেদের

প্রসিদ্ধ মন্ত্রে বলছেন *তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ*, তিনি ওটাকে সৃষ্টি করলেন, সৃষ্টি করে তার মধ্যে ঢুকে গেলেন। আমি একটা বাড়ি তৈরী করলাম, তৈরী করে বাড়িতে ঢুকে গেলাম, ভগবানের ক্ষেত্রে তা হয় না। কারণ ভগবান অনন্ত, সর্বব্যাপী। যিনি সর্বব্যাপী তিনি একটা জিনিস তৈরী করে কি করে ঢুকে যাবেন! কখনই সম্ভব নয়। সেইজন্য পরে পরে বেদান্ত এসে সব সিদ্ধান্তকে কেটে আলাদা করে দিয়েছে, কারণ কোন সিদ্ধান্তই বেদান্তের যুক্তিতে দাঁড়াবে না। একটাই দাঁড়ায় – অবিদ্যা বা মায়া। মায়া দিয়ে যখন দেখা হবে তখন সব কিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে। সচ্চিদানন্দ ছাড়া কিছু নেই, কিন্তু যেই মায়া এসে গেল, তখন সচ্চিদানন্দ মায়ার এদিকে এসে যখন তিনি নিজেকে দেখছেন তখন সেই নির্গুণ নিরাকার সচ্চিদানন্দকে সগুণ সাকার সচ্চিদানন্দ রূপে দেখাচ্ছে। এই জিনিসকে কল্পনা করা খুব কঠিন। একটা উপমা দিয়ে বোঝান যেতে পারে, আমরা এই ঘরে বসে সামনের দিকে তাকিয়ে আছি, আর ঐদিকটা পুরো আলোময়। আমাদের সামনে একটা পর্দা টাঙিয়ে দেওয়া হল। এবার আলোময় জায়গা থেকে একটা ফোটন পর্দার ফুটো দিয়ে বেরিয়ে এসে আলোর দিকে তাকাচ্ছে, ফোটন আর আলো তো একই। কিন্তু সামনে পর্দা এসে গেছে, তাহলে সেই আলোময়কে কেমন দেখবে? পর্দার যেমন রঙ যেমন রূপ তেমনই দেখবে। পর্দা লাল হলে আলো লাল দেখবে, পর্দার রঙ কালো হলে কালো দেখবে। কিন্তু কে দেখছে? আলো দেখছে। কাকে দেখছে? আলোকেই দেখছে। পর্দা যদি সরিয়ে দেওয়া হয় তখন কি দেখবে? ফোটন দেখবে আমিই আছি। উপমাতে সব কিছু মেলান যায় না, কিন্তু একটা আইডিয়া দেওয়া যায়। ঠিক তেমনি শুদ্ধ চৈতন্য নিজেকে মায়ার পর্দা দিয়ে যখন দেখেন তখন প্রথম জিনিসটা দেখেন সেটাই সগুণ সাকার। সগুণ সাকার কে দেখছেন? যিনি নির্গুণ নিরাকার তিনিই দেখছেন, তিনি ছাড়া আর কেউ দেখে না। তাহলে আমি আপনি যে ঈশ্বর দর্শন করছি তখন কে দর্শন করছেন? তিনিই দর্শন করছেন, যিনি নির্গুণ নিরাকার তিনিই দেখছেন। বেদান্ত ছাড়া কোন সৃষ্টি তত্ত্বই দাঁড়ায় না। আর তা নাহলে জিনিসটাকে খুব সহজীকরণ করে রাখতে হবে, ভগবান তিনিই সৃষ্টি করে দিলেন। তাহলে স্পেসটা কোথা থেকে এল? যেমনি কেউ অনেক ধাক্কা দিতে শুরু করবে সব ধর্মগুলো ভেঙে পড়তে শুরু করবে।

পরের লাইনে বলছেন – *স জাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাদ্ভূমিমথো পুরঃ* যিনি নিরাকার তিনি যখন সাকার রূপ ধারণ করলেন, সেই আদিপুরুষ যখন অধিপুরুষ হলেন তখন এই সৃষ্টির জগতে তাঁর নানা রকমের ক্ষমতা এসে গেছে। এখন তিনি নিজেকে বিস্তার করে সৃষ্টিকে এগিয়ে দিতে শুরু করলেন। কি রকম ভাবে তিনি সৃষ্টিকে এগিয়ে নিয়ে গেলেন? এখন যেন বিরাট থেকে জড় আর আত্মা বা চৈতন্য আলাদা হয়ে গেছে। বিরাট জড় রূপে আর পুরুষ আত্মা রূপে আত্মপ্রকাশ করলেন। এই জড়কে নিয়ে তিনি সৃষ্টির কাজ শুরু করলেন। তাঁর কাছে অফুরন্ত পদার্থ এসে গেছে সেই পদার্থ দিয়ে নিজেকে বিস্তার করতে করতে চারিদিকে তিনি ছড়িয়ে গেলেন। সেখান থেকে পৃথিবীর জন্ম হল, তারপর নানা রকমের জীব জন্তুর জন্ম হল। আসলে এটি একটি খুব উচ্চ মানের কবিতা, কবিতার মধ্য দিয়ে একটা সহজ তত্ত্বকে বোঝাতে চাইছেন, ঈশ্বর ছাড়া কিছুই নেই। এই একটি তত্ত্বকে কবিতার শৈলীতে, নানা তুলনাত্মক বিষয় দিয়ে, নানা কথার মাধ্যমে বোঝাতে চাইছেন।

এখানে মূল কথা বলতে চাইছেন, তিনি সৃষ্টি করে তার মধ্যেই আবার ঢুকে যান। জগৎকে তিনিই সৃষ্টি করলেন তারপরে তার মধ্যেই তিনি প্রবেশ করে গেলেন। তাই সৃষ্টিটাও পুরুষ আর তিনি নিজেও পুরুষ। কিন্তু ঈশ্বর ছাড়া কিছুই নয়, জড়টাও ঈশ্বর, তাঁরই একটা অংশ যেন জড়ের মত দেখাচ্ছে। সেই জড়ের মধ্যে তিনিই আবার ঢুকে যান। যখন জড়ের মধ্যে ঢুকে যান তখন তিনি আত্মা রূপে, যেমন দেহের মধ্যে আত্মা রূপে বিরাজ করেন। কিন্তু দেহটাও আত্মা ছাড়া কিছুই না, আবার দেহের ভেতরে যিনি জীব তিনিও আত্মা ব্যতিরেকে কিছুই নন। তবে এর একটা উৎকৃষ্ট বা পরা প্রকৃতি আরেকটি নিকৃষ্ট বা অপরা প্রকৃতি। পরা প্রকৃতি সেই আত্মা আর অপরা প্রকৃতি এই দেহ। দেহের সৃষ্টি আছে আবার যার সৃষ্টি আছে তার নাশও আছে। কিন্তু আত্মার সৃষ্টিও নেই নাশও নেই। এই অংশটুকুই বারবার সৃষ্টি হচ্ছে আবার লয় হচ্ছে, এটুকুর মধ্যেই জন্ম-মৃত্যুর খেলা চলতে থাকে, এটাই এক চতুর্থাংশ। জড়ের আবার জন্ম-মৃত্যু কেন হয়? ওর মধ্যে তিনি ঢুকেছেন বলেই জড়ের নানান খেলা চলে। তিনি যদি জড়ের মধ্যে না প্রবেশ করেন তাহলে কিছুই হবে না।

যিনি নির্গুণ নিরাকার প্রথমে তাঁর নাম দিলেন পুরুষ, তিনিই ছিলেন। পুরুষকে ইংলিশে বলছে Cosmic Spirit, মানে চৈতন্য। সেই পুরুষ থেকে বিরাটের জন্ম। এই চৈতন্য ঠিক কি রকম? এই জায়গাতে এসে যাঁরা দ্রষ্টা, যাঁরা সত্যকে দেখেছেন তাঁদের মধ্যে কখন কোন বিরোধ হয় না। ঝগড়া বিবাদ যত হয় তাঁদের শিষ্য বা অনুগামীদের মধ্যে। গীতার একটি শ্লোকে বলছেন *অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্যোঽয়মুচ্যতে*, এই ধরণের অনেক শ্লোক আছে। অনন্ত মানে অনন্ত। অনন্তের অর্থকে ধারণা করা বা বোঝা আমাদের মত সাধারণ লোকেদের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। তিনি নেই এই জিনিসটা বলা যাবে না, এর পর বাকি সব কিছুই বলা যাবে। কারণ তিনি নেই যদি বলে দেওয়া হয় তাহলে তো কিছুই থাকল না। সেইজন্য যে কোন ধর্মে যদি বলিষ্ঠ পরম্পরা না থাকে এগুলোই পরে খুব অশান্তি তৈরী করে। ঠাকুর এক জায়গায় বলছেন, তিনি দ্বৈত, তিনি অদ্বৈত তিনি আরও কত কি, তিনি এক আবার তিনি দুই, তিনি আবার এক দুইয়ের পারে। ঠাকুরের এই কথার অর্থ বোঝার জন্য হয় তার আধ্যাত্মিক অনুভূতির দরকার আর তা নাহলে মন যদি শান্ত হয়ে থাকে, সেই শান্ত মনে এই বিচারগুলো হঠাৎ যদি উদ্ভাসিত না হয়, এর অর্থ কোন দিন বোঝা যাবে না।

এখন যিনি সচ্চিদানন্দ তাঁর কি নাম হবে? বিভিন্ন ধর্মে বিভিন্ন রকম নাম দেওয়া হয়েছে। মুসলমানদের দুটো পরম্পরা, একটা আরবিক আরেকটি পার্সিয়ান। পার্সিয়ান পরম্পরাতে ভগবানকে বলে খোদা আর আরবিক পরম্পরাতে ভগবানকে বলছে আল্লা। আরবিকরা খুব গর্ব করে বলে, ভগবানের যে নামই দাও না কেন, সেই নাম মানুষের উপরেও লাগিয়ে দেওয়া যায়। যেমন খ্রীশ্চানদের কেউ নিজের মালিককে বলতে পারে you are my God। হিন্দুরাও বলে আপনি আমার ভগবান, স্বামী স্ত্রীকে বলে তুমি আমার দেবী। কিন্তু আল্লা নাম কখন মানুষের উপর লাগানো যায় না, তুমি আমার আল্লা, এই কথা হয় না। তুমি আমার ঈশ্বর, তুমি আমার ভগবান, তুমি আমার খোদা বলা যাবে কিন্তু তুমি আমার আল্লা বলা যাবে না। একজন মুসলিম লেখক তাঁর বইতে এই জিনিসটা লিখছেন। আমাদের এখানেও বলবে, তুমি আমার ভগবান, তুমি আমার ঈশ্বর বা মালিককে বলবে আপনি আমার ভগবান, কিন্তু কখন বলবে না আপনি আমার সচ্চিদানন্দ বা আপনি আমার ওঁ।

যিনি সর্বব্যাপী, সব কিছুতে ব্যপ্ত হয়ে আছেন তাঁকে আমরা কি বলে সম্বোধন করব? আসলে কিছু দিয়েই সম্বোধন করা যায় না। বলছেন তাঁর উপর কোন ক্রিয়া হয় না, তিনিও কোন ক্রিয়া করেন না। করার তো কথা নয়, যিনি অনন্ত তিনি কোথায় ক্রিয়া করবেন, কার উপর ক্রিয়া করবেন! তাহলে উনি যখন সৃষ্টি করছেন তখন কিভাবে করছেন? *তস্মাদ্বিরাডজায়ত*, সেই পুরুষ হলেন Cosmic Spirit আর এটা হয়ে গেল Cosmic body। সমষ্টিতে যা কিছু আছে, সবটাকে নিয়ে তাঁকে বলছেন বিরাট। একই বিষয়ের উপর বিভিন্ন লোক বিভিন্ন সময়ে যখন কাজ করে আর ওই একই বিষয়ে যদি একজন লোকই কাজ করে থাকে তখন দুটো কাজের মধ্যে একটা বড় তফাৎ থাকবে। একজন লোক যদি কাজ করে থাকে তাহলে সেখানে কোন খাপছাড়া কিছু থাকবে না, সব কথাই সঙ্গতিপূর্ণ হবে আর অনেক বিজ্ঞানসম্মত হবে। কিন্তু কোথায় সঙ্গতি থাকবে? নাম গুলিতে সঙ্গতি থাকবে। যেখানে অনেকে মিলে করছে সেখানে আইডিয়ার বিস্তার অনেক বেশি হবে, তাই বলে একজনের আইডিয়া অপরের আইডিয়াকে কেটে দেবে না, কিন্তু শব্দগুলো পাল্টে যাবে। একটা জিনিসকে বোঝাতে গিয়ে যে শব্দগুলোকে ব্যবহার করা হচ্ছে, সেই শব্দের মধ্যে তফাৎ থাকবে, আইডিয়াতে কখনই বিরোধ করবে না। আইডিয়াতে যদি বিরোধ হয়ে যায় তাহলে বুঝতে হবে তার পদ্ধতিগত কিছু ত্রুটি আছে। হিন্দু শাস্ত্রে এই সমস্যা পাওয়া যাবে। আমাদের কত রকমের শাস্ত্র, এত মনীষীরা বিভিন্ন আইডিয়ার উপর দিনের পর দিন এত কাজ করে গেছেন যে প্রত্যেকের কাজকে আধার করে এক একটা শাস্ত্র তৈরী হয়ে গেছে। বেশির ভাগ শাস্ত্রই চিরদিনের মত হারিয়ে গেছে, কিন্তু তারপরেও যা অবশিষ্ট আছে তার সবটুকু অধ্যয়ন করে বোঝা, বুঝে ধারণা করা একজন মানুষের পক্ষে কখনই সম্ভব নয়, তার জন্য কত জন্ম যে লাগবে ভগবানই জানেন। পুরুষ, বিরাট এই শব্দগুলি এক এক জায়গায় এক এক অর্থ হওয়ার জন্য অনেক সংশয় উৎপন্ন হয়। আমরা এখানে খুব সহজ অর্থে পুরুষ শব্দের অর্থ করছি যিনি আছেন, যিনি সৎ পুরুষ তাঁর নাম পুরুষ। কিন্তু পরে পরে পুরুষ শব্দ অনেক কিছুর অর্থে লাগিয়ে দেওয়া হল, যেমন ব্রহ্মাকেও পুরুষ বলা শুরু হয়ে গেল। পুরুষসূক্তমের এই অধি-পুরুষের মনু তিনটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। পুরাণের ধারণাকে ভিত্তি করে মনু বলছেন,

ব্রহ্মা, যিনি সৃষ্টিকর্তা, তাঁকে পুরুষ বলে সম্বোধন করা হয়। তারপর ব্রহ্মা যখন নিজেকে পুরুষ আর নারী দু ভাগে বিভক্ত করলেন, তার যে পুরুষ অংশ তাকেও পুরুষ বলা হয়। আর তাদের থেকে যে পুরুষের প্রথম জন্ম হল তাকেও পুরুষ বলা হয়। আবার আমাদের সবার ভেতরে স্বয়ংজ্যোতি যিনি অন্তর্যামী রূপে আছেন তাঁরও নাম পুরুষ। সেইজন্য বলা মুশকিল পুরুষকে এখানে ঠিক কি অর্থে বলতে চাইছেন।

কিন্তু এর সহজতম ব্যাখ্যা হল, বিশেষ করে পরের দিকে শাস্ত্রাদিতে যে ব্যাখা করা হয়েছে এবং বেদান্তও যেটা মেনে নিয়েছে, তা হল অনন্ত চৈতন্যই আছেন। এই অনন্ত চৈতন্যের যে ভাব সেটা কি জিনিস আমাদের পক্ষে বোঝা অসম্ভব। আমাদের দুটো জিনিস মনে রাখতে হবে, একটা হল, মা কালীর দর্শনের পর ঠাকুর মন্দিরে পূজো করছেন, তিনি দেখছনে সবটাই চিন্ময়, পূজার উপকরণ, পূজার পাত্রকেও চিন্ময় দেখছেন। মায়ের যে মুর্তি, মুর্তির নাকের কাছে হাত রেখে দেখছেন মায়ের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস পড়ছে, আর আলাদা আলাদা করে চৈতন্যকে দেখছেন না, অখণ্ড চৈতন্য। ঠাকুর চারিদিকে ফুল ছুঁড়তে শুরু করে দিয়েছেন। এইসব দেখেই সবাই ভাবল ঠাকুরের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। সেখানে দাঁড়িয়ে যদি কেউ ঠাকুরকে দেখে সে কি দেখবে? দেখবে ঠাকুর পাগলের মত চারিদিকে ফুল ছুঁড়ে যাচ্ছেন। যে কেউ দেখলে ঠাকুরকে পাগল ভাববে। দ্বিতীয় হল, পরের দিকে নরেন্দ্রনাথ প্রথম প্রথম দক্ষিণেশ্বরে এসে হাজরা মহাশয়ের কাছে বসে থাকতেন, হাজরা মহাশয় আবার জ্ঞান বিচার করতেন। হাজরার সাথে ঠাকুরের নামে মজা করে নরেন্দ্রনাথ বলছেন, বাঃ! ঘটিও ব্রহ্ম, বাটিও ব্রহ্ম, সবই ব্রহ্ম! ঠাকুর ঘর থেকে বেরিয়ে নরেনের কথাগুলো শুনেছেন। ঠাকুর শুনে বলছেন ও! তাই। হাজরা আর নরেন দুজনে ঠাকুরকে দেখে হাসছেন। ভাবলে অবাক লাগে, নরেন নব্য লেখাপড়া জানা যুবক, অন্য দিকে ঠাকুর একজন নিরক্ষর ব্রাহ্মণ, কিন্তু ঠাকুরের প্রতি এমন একটা আকর্ষণ তৈরী হয়েছে আর ঠাকুরও নরেনকে এমন অপার্থিব ভালোবাসায় বেঁধে ফেলেছেন যে নরেন এখন নিয়মিত দক্ষিণেশ্বরে আসা-যাওয়া করছেন। কিন্তু ঠাকুরের একেবারে যেটা মৌলিক আধ্যাত্মিক সত্য, চৈতন্যই একমাত্র আছেন, সেটাকে নিয়ে নরেন ঠাট্টা করছেন। কি ঠাট্টা করছেন? উনি কি বলছেন দেখ, ঘটিও ঈশ্বর বাটিও ঈশ্বর! ঠাকুর স্বামীজীর জীবনের এই একটি ঘটনাকে আমরা যদি মাথায় রাখি তাহলে বুঝতে পারব আমাদের কি অবস্থা! নরেন ঠাকুরের প্রধান পার্ষদ, যাঁকে ঠাকুর বলছেন সপ্তর্ষির ভূমি থেকে নিয়ে এসেছেন, যিনি নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত আত্মা আর জন্ম থেকেই যিনি সিদ্ধ। এগুলো না হয় আধ্যাত্মিকতার দিক থেকে বলা হচ্ছে, এবার ব্যবহারিক দিক থেকে দেখলে নরেন একজন লেখাপড়া জানা শিক্ষিত যুবক, কিন্তু ঠাকুর তাঁর মধ্যে এমন একটা আকর্ষণ এনে দিয়েছেন যে নিয়মিত দক্ষিণেশ্বরে আসছেন আর মুগ্ধ হয়ে ঠাকুরের কথা শুনে যাচ্ছেন। এক সময় ঠাকুর যখন নরেনের সাথে কথা বলা বন্ধ করে দিলেন, তখনও নরেন দক্ষিণেশ্বরে আসা বন্ধ করে দিচ্ছেন না। সেই লেখাপড়া জানা, উচ্চ আধার, কত উচ্চ আধার, অধরের যেখানে একটা শক্তি সেখানে নরেনের মধ্যে আঠারোটা শক্তি, সেই তিনি ঠাকুরের কথা বোঝা তো দূরের কথা গ্রহণ করাও অসম্ভব, ঠাকুরের কথাকে নিয়ে ঠাট্টা করছেন। উচ্চ আধারের যদি এই অবস্থা হয়, আমি আপনি তাহলে কোথায়! আমরা একটু শাস্ত্রের কথা পড়ে, মহারাজদের কাছ থেকে শোনার পর ভাবছি সব বুঝে ফেলেছি। কিছুই বুঝিনি। ঠাকুর উপমা দিচ্ছেন, সংসারীদের ঈশ্বরে অনুরাগ হল তপ্ত কড়াইয়ে একটু জলের ছিটে দেওয়া, একটু ছ্যাঁৎ করে জল মুহূর্তে উবে যাবে। আমাদের ঠিক এই দুরবস্থা। এই অবস্থাই থাকবে, আর এখান থেকেই সাধনা করে করে মনের এই অবস্থার পরিবর্তন আনতে হবে। নরেনের মত আধারকেও ঠাকুর একটু ছুঁয়ে দিলেন, তখনই নরেনের অবস্থার পরিবর্তন হয়ে গেল। জগতে যা কিছু আছে তার সবটাই মনের মধ্যেই অনুভূত হয়, এই মনেই এক সময় জগতকে সত্য বলে দেখায়, এই মনই আধ্যাত্মিক স্তরে চলে গেলে জগতকে মিথ্যা বলে দেখায়। অবস্থার পরিবর্তন হয়ে গেলে সামনের বস্তু অন্য রকম দেখায়। নরেনকে ছুঁয়ে দিতেই নরেনের অবস্থার পরিবর্তন হয়ে গেছে, এখন তিনিও দেখছেন সব কিছুই চৈতন্য। বাড়িতে হরিণের মাংস রান্না হয়েছিল, খাওয়ার সময় নরেন খেতে পারছেন না, দেখছেন চৈতন্য। কোন কিছুই খেতে পারছেন না, জলটাও খেতে পারছেন না। হেদুয়ার পার্কে এসে রেলিঙে মাথা ঠুকছেন। মাথা ঠুকে বুঝতে চাইছেন এতদিনের যে জ্ঞান, এই সংসার সত্য, যেখানে লোহা মানে লোহা আর অবস্থার পরিবর্তন পর যে লোহাকে চৈতন্য দেখছেন এর মধ্যে কোনটা সত্য। লোহাতে

ঠোকার জন্য কপাল ফুলে ব্যাথা হয়ে গেছে, সেই ব্যাথা অনেক দিন থাকল কিন্তু চৈতন্য ছাড়া কিছু নেই এই ভাব যাচ্ছে না। যাঁর এই অনুভূতি হয়ে গেছে, আর এতেই যিনি সর্বদা প্রতিষ্ঠিত, আস্তে আস্তে তাঁর ওই ভাবটা উপশম হয়ে যায়। কারণ ওই ভাব থাকলে স্থূল পার্থিব শরীরটা আর চলবে না, কারণ ওই ভাবের মধ্যে থাকলে তিনি খাওয়া-দাওয়া কিছুই করতে পারবেন না। যার ফলে আস্তে আস্তে শরীরটাই খসে পড়ে যাবে।

যতক্ষণ একটা মায়ার আবরণ না এসে যায়, যেখানে লোহাকে লোহা রূপে, খাবারকে খাবার রূপে দেখবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর জীবন চলবে না। ঠিক সেই রকম বেদান্তও বলছে সৎ, চিৎ ও আনন্দের মধ্যে মায়ার আবরণ এসে যায়। সচ্চিদানন্দ, লাইন, আবরণ, মায়া এগুলো ধারণা করা আমাদের পক্ষে একটু কঠিন মনে হয়, কিন্তু একটু চিন্তা করতে করতে স্পষ্ট ধারণা তৈরী হয়ে যায়। এখন অখণ্ড চৈতন্যর উপর যদি লাইন টানা হয় তাহলে লাইনটাও যদি চৈতন্য হয় তাহলে তো দুটো চৈতন্য হয়ে যাবে। দুটো চৈতন্য হলে সব গোলমাল লেগে যাবে, দুটো চৈতন্য কখনই হবে না, যিনি অখণ্ড চৈতন্য, যিনি অনন্ত, অনন্তের আবার দুটো কি করে হবে! দুটো সত্যও কখন হতে পারে না। সেইজন্য এর যে ব্যবহার তার জন্য বলছেন জড়। কিন্তু আমরা যেভাবে সজীব আর নির্জীব, living and dead মনে করি এই জড় সেই অর্থে জড় হয় না। যার মধ্যে চৈতন্য নেই তাকে আমরা বলছি জড়। কিন্তু চৈতন্যের উপর পড়ে আছে বলে চৈতন্যের আলোকে জড় আলোকিত থাকে। চৈতন্যের আলোতে আলোকিত থাকার জন্য একেও চৈতন্যের মত দেখায়, কিন্তু চৈতন্য নয়। টিউব লাইটের কাঁচে কোন আলো নেই, কিন্তু যেই সুইচ অন হল, এবার বিদ্যুৎ প্রবাহ হতেই কাঁচকেও আলোকিত দেখাচ্ছে। টিউবের পেছনে যে বিদ্যুৎ রয়েছে তাকে আমরা দেখতেও পাই না, জানতেও পারি না, আর তাকে নিয়ে আমরা বিচারও করি না, আমরা দেখছি আলোকিত কাঁচের আলোতে ঘরটাও আলোময় হয়ে গেছে। এই জগতটাও ঠিক তেমনি চৈতন্যের আলোতে আলোকিত আর চৈতন্যের আলোর সর্বোচ্চ প্রকাশ হয় বুদ্ধিতে, বুদ্ধিও তাই আলোকিত। এই আলোকিত বুদ্ধি দিয়ে সেই অখণ্ড চৈতন্যের আলোতে জড় এসে যাওয়ার পর সেখানে যাকে সব থেকে শ্রেষ্ঠ দেখাচ্ছে তার নাম দিলেন আদি-পুরুষ আর যাঁর আলোতে আলোকিত হচ্ছে তাঁকে বলছেন বিরাট। বিরাট শব্দের উচ্চারণ কখন বিরাড হয় আবার কখন বিরাজ হয়। বিরাট শ্রেষ্ঠ অর্থে বলছেন। কিন্তু বিরাট বললে আবার বিরাজমান বোঝায়, যিনি আছেন, যাঁর অস্তিত্ব এবার বোঝা যাবে। বিরাটের এইদিকে যিনি আছে, তাঁর যে সত্তা, এই সত্তা সত্যি হোক মিথ্যে হোক আর যাই হোক, তিনি ওই বিরাটকে আশ্রয় করে আছেন। বিরাট যদি না থাকেন তাহলে এই সত্তাও থাকবে না। প্রজেক্টর থেকে পর্দায় আলো ফেলা হয়েছে, প্রজেক্টরের আলোর সামনে একটা সিনেমার রীল রেখে দেওয়া হয়েছে। পর্দায় তখন নানা রকমের দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। ওই রীল যদি না থাকে পর্দায় শুধু আলোই দেখা যাবে। রীল আছে বলে সিনেমার নানা রকম দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। বিরাটকে যে জিনিসটা আশ্রয় করে আছে, জিনিসটা অনেকটা সিনেমার মত, কিন্তু নিরপেক্ষ। আর বিরাটকে আশ্রয় করে আছে বলে অন্য রকম দেখাচ্ছে। আশ্রয় করাকে বলা হয় অধিকরণ, অধিকরণের অধি শব্দকে নিয়ে বলা হয় অধি-পুরুষ। বস্তুত আদিপুরুষ আর অধিপুরুষের মধ্যে কোন তফাৎ নেই, দুটো এক। সিনেমাতে আমরা যে দৃশ্য দেখছি, ওই দৃশ্যও যা আলোও তাই, দুটোতে কোন তফাৎ নেই। তফাৎটা হল মাঝখানে সিনেমার রীলটা। সিনেমার রীলটাই জড়ের সামগ্রিক রূপ। কিন্তু এই জড় কোথা থেকে আসবে? কারণ আমরা তো আগেই বলছি তিনি অনন্ত, সর্বব্যাপী। যদি তিনি সর্বব্যাপী হন তাহলে এটা কখনই real হতে পারে না, সম্ভবই নয়। এখন এটা সত্য হতেও পারে, নাও হতে পারে, এটা ঠিক কি আমরা জানি না। কিন্তু আমরা এটা জানি, এই অনন্ত সত্তা বা চৈতন্য আছেন বলে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দেখাচ্ছে। আদিপুরুষ আছে বলে অধি-পুরুষ দেখাচ্ছে। সেইজন্য বলা হয় এটা মায়ার কার্য। মায়া মানে এমন একটা জিনিস যাকে ব্যাখ্যা করা যাবে না। যেভাবে আমরা এই গ্লাশ, বোতল, মাইককে ব্যাখ্যার করে দিতে পারব সেইভাবে মায়াকে ব্যাখ্যা করা যাবে না। তার মানে একে মিথ্যাও বলা যাবে না।

যেমন একটা বিরাট আলো আর তার সামনে একটা বড় পর্দা টাঙানো হয়েছে, পর্দার মধ্যে যখন আলোটা দেখা হবে তখন অন্য রকম দেখাবে। পর্দার বদলে যদি একটা আতস কাচ সূর্যের আলোর সামনে ধরা হয় তখন আতস কাচটা যেখানে যেখানে ধরা হবে সেখানেই আলো পড়বে আবার কাচের রঙ যেমন যেমন

হবে আলোর প্রতিফলনের রঙও সেই রকম হবে। আতস কাঁচটি হল মায়ার মত। সূর্যের আলো সর্বব্যাপী। আতস কাচ লাগিয়ে দিলে সেখানে আরেকটা সূর্যের জন্ম হয়ে গেল। সেই সূর্য এখন নীচে চলে গেছে, আকাশের সূর্যও সূর্য আর আতস কাচের মধ্য দিয়ে যে সূর্য প্রতিফলিত হচ্ছে সেটাও সূর্য। এবার নীচে যে সূর্য দেখা যাচ্ছে এটাও এক পুরুষ। ঠিক তেমনি সচ্চিদানন্দ যখন মায়াকে ভেদ করে নীচে যে ভাবে প্রতিফলিত হন সেটাও এক পুরুষ। তার মানে দাঁড়াল মায়ার ওপারে যে চৈতন্য, সেই ভগবান, সেই সচ্চিদানন্দকে মায়ার এপারে যখন দেখা যাচ্ছে তাঁরও নাম পুরুষ। সেই সচ্চিদানন্দকে বলছেন আদি পুরুষ আর মায়ার নীচে যে সচ্চিদানন্দকে দেখা যাচ্ছে তাঁর নাম অধি-পুরুষঃ। মায়া শব্দ কিন্তু বেদে নেই। কিন্তু সৃষ্টির সময়কার কথা বলতে গিয়ে যে বলা হচ্ছে একটি পাদ, ঐ এক পাদকেই বলছে বিরাট। এই বিরাটের মধ্যেই যেটা সব থেকে বেশি ব্যক্ত তাঁকেই বলছেন ভগবান। যেমন নর্থ পোল আর সাউথ পোলের কথা বলা হল, এখন মনে করা যাক সেখানে হিমালয়ের সাইজের বরফের পাহাড় হয়েছে আর বরফের একটা ছোট্ট টুকরোও সেখানে আছে। বরফের হিমালয় আর বরফের টুকরো দুটো স্বভাবতঃ একই জিনিস, কারণ দুটোই বরফ দিয়ে তৈরী, কিন্তু হিমালয় হিমালয় আর বরফের ছোট টুকরো টুকরোই। বরফের টুকরো বলতে পারে – ওহে হিমালয় তুমিও যা আমিও তাই। কোন অর্থে এক বলতে পারে? যে জিনিস দিয়ে আমরা দুজনে তৈরী হয়েছি, সেই অর্থে বরফের টুকরো আর বরফের হিমালয় এক। কিন্তু এক বলার আগে তাদের দুজনকে জলে পরিণত হতে হবে। যতক্ষণ বরফ রূপে আছে ততক্ষণ হিমালয় বিরাট, আর বরফের টুকরো ক্ষুদ্র। এই যে চার ভাগের এক ভাগের কথা বলা হয়েছে, এই একপাদ বিরাট রূপে ভগবান বা ঈশ্বর, আর ছোট বরফের টুকরোটা হলাম আমরা। এই হল শিব আর জীবের স্বরূপ। শিব সব থেকে বৃহৎ প্রকাশ আর জীব অতি ক্ষুদ্র রূপে বিভিন্ন প্রাণী। যেটাকে জড় বলছি সেটাও একই, সজীব নির্জীব দুটোই সেই চৈতন্যেরই, সেই আদি পুরুষরেই অভিব্যক্তি। পার্থক্য শুধু তার আকারে, বিশালত্বতে।

এখানে যে অধি-পুরুষঃ বলছেন এই অধি-পুরুষ হলেন ঈশ্বর। আর এই ঈশ্বর এক চতুর্থাংশের যা কিছু আছে তার শাসন কর্তা। গীতাতে এই আদিপুরুষ আর অধি-পুরুষকে একই বলা হচ্ছে, ঈশ্বর আর ব্রহ্মকে এক বলা হয়। ব্রহ্ম আর ঈশ্বরের মাঝখানে মায়া আছে বলে আলাদা মনে হবে কিন্তু মায়াকে সরিয়ে দিলে ঈশ্বর আর ব্রহ্মে কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু মায়ার জগতে ঈশ্বর সর্বশ্রেষ্ঠ। সেই আদি পুরুষ থেকে সৃষ্টি, সৃষ্টির মাঝখান দিয়ে যখন সেই আদি পুরুষকে অবলোকন করা হচ্ছে তখন তিনিই হয়ে যান শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, শিব, বুদ্ধ, যীশু। মায়ার আবরণে সেই সচ্চিদানন্দকে বিভিন্ন যুগে এই এই রূপে দেখা যায়। মায়ার শক্তিতে এই রূপ দেখাচ্ছে। মায়ার শক্তি আসার পর আমরা এখন দুটো সত্তা দেখছি, চৈতন্য সত্তা আর জড় সত্তা। জড়ের মাঝখান দিয়ে যখন চৈতন্যকে দেখা হচ্ছে তখন চৈতন্যকে ভগবান রূপে দেখাচ্ছে। এবার এই ভগবানকে বিষ্ণুই বলুন, রামচন্দ্র বলুন, কৃষ্ণ বলুন, শ্রীরামকৃষ্ণই বলুন কিছু আসে যায় না, কিন্তু তত্ত্বতঃ সবাই সেই শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ। জড়ের ভেতর দিয়ে শুদ্ধ সচ্চিদানন্দকে দেখলে তাঁর একটা আকৃতি এসে যাচ্ছে। যিনি শ্রীরামচন্দ্রের ভক্ত তিনি কোন দিন শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান রূপে দেখতে পারবে না। কারণ তাঁর মনের যে বিস্তার সেই বিস্তারের থেকেও বড় দেখছে শ্রীরামচন্দ্রকে, সেখানে শ্রীকৃষ্ণের ঢোকার সুযোগই নেই। সেইজন্য ভগবানকে যখন দেখছে তখন যে তার ইষ্ট তার বাইরে সে কাউকেই দেখতে পারবে না। এই যে বিরাট, এই বিরাট হল আদিপুরুষ আর অধিপুরুষের মধ্যবর্তী স্থানীয় অবস্থা। বিরাট না থাকলে আমরা কোন দিন অবতারকে জানতে পারব না। স্বামীজী এই বিভাজন রেখাকে বলছেন দেশ, কাল ও কারণ। যিনি কালে অনন্ত, দেশে অনন্ত আর কারণ বলে কিছু নেই, তাঁর উপর এই বিভাজন রেখা আসাতে দেশ, কাল ও কারণ এসে গেল। সময়কে স্বামীজী ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলছেন দুটো ঘটনা হওয়ার পর এই দুটোর পরিমাপটাই সময়। যিনি অনন্ত তিনি কার উপর কার্য করবেন! একটা বাক্স জিনিস দিয়ে ঠাসা, বাক্সের বস্তু নড়াচড়া করবে কোথায়! ঠিক তেমনি যিনি সর্বব্যাপী, কাজ করতে গেলে তাঁকে তো একটু নড়চড়ার জায়গা দিতে হবে, তিনি তো সব জায়গায় ব্যপ্ত হয়ে আছেন, কোথায় কাজ করবেন! সেইজন্য ভগবান ক্রিয়াহীন। ক্রিয়া নেই বলে সময়কে মাপা যাবে না। একটা রহস্য জনক পদ্ধতিতে, যেটাকে কেউ কোন দিন ব্যাখ্যা করতে পারবে না,

তস্মাদ্বিরাডজায়ত, বিরাটের জন্ম হয়ে যায়। এই জন্মটা সত্যি না মায়া আমরা জানি না। তখন একসাথে তিনটে জিনিসের জন্ম হয় – দেশ, কাল ও কারণ। শুরু হয়ে গেল সংসারের লীলা। বিরাট মানেই এই তিনটে দেশ, কাল ও কারণ। সৃষ্টিতে এই কটি জিনিসকে মনে রাখলে সব কিছু সহজে বোঝা যাবে – ভগবান, ভগবান থেকে বিরাটের জন্ম, বিরাট সঙ্গেই সৃষ্টি হয় দেশ, কাল ও কারণের। বিজ্ঞানও বলছেন পদার্থের জন্ম হলে তখনই সময়ের জন্ম, তখনই দেশ ও কার্য কারণ সম্পর্কের জন্ম হয়। এই সৃষ্টিতেই যে ভগবানের উপচয় হয়ে যায় তা নয়, তিনি এর সমষ্টিরও বড়। সেখান থেকে তিনি ধীরে ধীরে সব কিছুর সৃষ্টি করতে শুরু করেন।

ভগবানের সৃষ্টির বিধানটা কি? পদার্থ বিজ্ঞান বলবে, শক্তি ধীরে ধীরে পার্টিকেলসে রূপান্তর হয়ে যায়। কোয়ান্টাম ফিজিক্সে খুব নামকরা একটা কথা আছে, ফিজিক্সের বড় বড় বিজ্ঞানী, নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন তাঁরাও বলেন আমরা কোয়ান্টাম ফিজিক্স বুঝি না। কারণ মস্তিষ্কের সূক্ষ্ম বিচার পদ্ধতি দিয়ে যতদূর জানা যাচ্ছে তার সাথে কোয়ান্টাম ফিজিক্স মেলে না। নোবেল প্রাইজ পাওয়া বিজ্ঞানীরাই কোয়ান্টাম ফিজিক্স বোঝেন না সেখানে আমরা কি করে বুঝব! ঋষিদের কাছে সব সৃষ্টিই হয় যজ্ঞ থেকে। ফিজিক্সে সব সৃষ্টি হয় এনার্জি থেকে। এনার্জি মানেই ক্রিয়া, যজ্ঞ মানেও ক্রিয়া, কোথাও তফাৎ নেই। ঠাকুরকে একজন বলছেন, বিদেশে ওরা ঈশ্বর মানে না, কিন্তু শক্তি মানে। ঠাকুর শোনার পর বলছেন, শক্তি মানলেই হবে। ঠাকুর বলতে চাইছেন, তোমার অস্তিত্বের বাইরে কিছু একটা আছে মানলেই হবে। বিজ্ঞান বলছেন কসমিক এনার্জি থেকে সৃষ্টি হয়েছে, বিজ্ঞানীরা ভুল কিছু বলছেন না, ঋষিরাও তাই বলছেন, সব কিছু যজ্ঞ থেকে সৃষ্টি, যজ্ঞ মানেই ক্রিয়া, ক্রিয়া মানেই এনার্জি, এনার্জি থেকেই সব কিছুর সৃষ্টি। এটাই পরের মন্ত্রে বলছেন –

যৎপুরুষেণ হবিষা দেবা যজ্ঞমতন্বত।
বসন্তো অস্যাসীদাজ্যম গ্রীষ্ম ইধ্মঃ শরদ্ধবিঃ।।১০/৯০/৬(ঋ)

যে কোন ক্রিয়া মানেই যজ্ঞ। আমাদের যত ক্রিয়া সবই সাধারণ ক্রিয়া, এই ধরণের ক্রিয়াকে বলে জাগতিক ক্রিয়া, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এই ক্রিয়া অপবিত্র। যেমন যখন নারীসঙ্গ করছে তখন এই ক্রিয়া জাগতিক, আর এই ক্রিয়াই অপবিত্র ক্রিয়া হয়ে যায় যখন রাস্থাঘাটে প্রকাশ্যে বা গোপনে মেয়েদের শ্লীলতাহানি করে বেড়াচ্ছে। খাওয়া-দাওয়া না করলে শরীর থাকবে না, খাওয়া-দাওয়াটাও জাগতিক ক্রিয়া, এই খাওয়া-দাওয়াই পার্টিতে, বিয়ে বাড়িতে হৈহুল্লোড় করে করছে এই ক্রিয়াই তখন অপবিত্র হয়ে যাচ্ছে। মানুষের যে কোন কার্যই জাগতিক, জাগতিক কর্মই অনেক ক্ষেত্রে অপবিত্র কর্ম হয়ে যায়। মানুষের কোন কার্যই আধ্যাত্মিক ক্রিয়া হয় না। কর্ম যখন অপবিত্র হয় তখন তার মানসিকতা ধীরে ধীরে কুণ্ঠিত হয়ে যায় আর মৃত্যুর পর স্বর্গে না গিয়ে নিজের শুদ্ধিকরণের জন্য নরকে যেতে হয়। সেখানে জ্বালা-যন্ত্রণা ভোগ করে শুদ্ধি হওয়ার পর আবার সাধারণ মানুষ হয়ে জন্ম নেবে। প্রচুর অপবিত্র কর্ম যদি করে থাকে তাহলে তাকে সেখান থেকে কোন নিম্ন যোনিতে পাঠিয়ে দেবে। যারা নিজের বুদ্ধিকে কাজে লাগায় না, তাদের ছাগল হয়ে জন্মাতে হয়, ছাগলদের বুদ্ধি কাজে লাগাতে হয় না। যারা প্রচুর পরনিন্দা পরচর্চা করে তারা ছারপোকা হয়ে জন্মে সবার পেছনে কামড়াবে। যে যেটা পছন্দ করে প্রকৃতি তাকে সেই পছন্দের কাজ যে যোনিতে সহজ ভাবে করে তৃপ্ত হবে সেই যোনিতেই পাঠিয়ে দেবে, এটাই প্রকৃতির নিয়ম। এভাবেই জাগতিক জীবন থেকে নরকের জীবনে আর নরকের জীবন থেকে জাগতিক জীবনের মধ্যে সব মানুষ বন্ বন্ করে ঘুরতে থাকে। এই চক্র থেকে বেরিয়ে আসা যায় না। নিউটনের যে first law, second law আছে অর্থাৎ যেটা চলছে চলবে, যেটা দাঁড়িয়ে আছে দাঁড়িয়ে থাকবে যতক্ষণ তার উপর একটা বাইরের শক্তি না লাগানো হবে ততক্ষণ এর থেকে বেরোতে পারবে না। Forceএ যত জোর থাকবে, জিনিসটার উপর ধাক্কাটা তত জোরে লাগবে। বস্তুর উপর যে নিয়ম চালু জীবনের উপরেও সেই নিয়ম চালু আছে। সবারই জীবন পাখার মত ঘুরছে। চন্দ্র যেমন পৃথিবীকে, পৃথিবী যেমন সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে যাচ্ছে, একই ভাবে আমরা সবাই আমাদের নিজের নিজের কক্ষ পথে ঘুরে যাচ্ছি। এর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কোন উপায় নেই। বিচার করলেও আমরা তাই পাই, আর মহাপুরুষরাও তাই বলেন। চাঁদ চাইলেও পৃথিবীকে ছেড়ে অন্য কারুর পেছনে ঘুরতে পারবে না, তাকে পৃথিবীর চারিদিকেই ঘুরতে হবে। তাহলে মুক্তি কিভাবে হবে? কিংবা মানুষ স্বর্গেই বা কিভাবে যায়? এই আবর্তন চক্রকে ভাঙা যায় না যতক্ষণ

না অবতার পুরুষ এসে একটা ধাক্কা দিচ্ছেন। অবতার পুরুষ মানে আদিপুরুষ বা অধিপুরুষ, তিনি সব নিয়মের বাইরে। অবতার পুরুষ এসে মানুষের মধ্যে যাঁরা শ্রেষ্ঠ তাঁদের ধাক্কা মেরে এই চক্র থেকে বার করে দেন। এই শ্রেষ্ঠরা আবার তাঁদের নীচে যারা আছে তাদেরকে ধাক্কা মেরে তাদের কক্ষ পথটাই পাল্টে দেন। যাদের কক্ষ পথটা পাল্টে গেল, তারা তো এখন অন্য অরবিটের বাইরের শক্তি হয়ে গেল, এরা তাদের নীচে যারা আছে তাদেরকে ধাক্কা মারে। ধাক্কা মারতে মারতে বেলুড় মঠের ইউনিভার্সিটির গেটের কাছে পৌঁছে গেল। সেখানে দেখল একটা নোটিশ, আধ্যাত্মিক ক্লাশে বেদ, উপনিষদ, গীতা পড়ান হবে। এর আগে জীবনে সে অনেক দুঃখ পেয়েছ, আনন্দও পেয়েছে, লড়াই করেছে, মার খেয়েছে, বিভিন্ন সংস্কার এসে জমা হয়ে আছে। সেই সংস্কারের মধ্যে হয়ত একটু আধ্যাত্মিকতার সংস্কারও ছিল। ঐ সংস্কার এখন ঠেলে বেরিয়ে ইউনিভার্সিটির ক্লাশে ভর্তি করতে বাধ্য করে দিল। এরপর তার অরবিট পাল্টে গেল। কতটা পাল্টাবে বলা মুশকিল, গুরুর শক্তির উপর কিছুটা নির্ভর করে। এগুলো খুব আক্ষরিক ভাবে নিতে হবে না, উপমা দিয়ে বোঝান হচ্ছে।

বিচারশীলরা জানেন মানুষের কোন ক্ষমতাই নেই যে মায়ার বন্ধন থেকে বেরিয়ে আসবে। কিন্তু এই যে ইউনিভার্সিটিতে এখন শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে এসেছে এবার সে জাগতিক থেকে আধ্যাত্মিকতার দিকে প্রথম পদক্ষেপটি ফেলল। কিভাবে পদক্ষেপ ফেলল? যজ্ঞ করে, এখানে যে বেদ অধ্যয়নের জন্য আসছে এটাই যজ্ঞ। যজ্ঞ জাগতিক জিনিসকে আধ্যাত্মিকতায় রূপান্তরিত করে দেয়। যে কোন কাজই হোক, যত মন্দ কাজই হোক সব ধরণের কাজকেই যজ্ঞে পাল্টে দেওয়া যায়। কোন মানুষকে হত্যা করাটাও যজ্ঞ রূপে সম্পন্ন করা যেতে পারে। যেমন পুরো মহাভারতের যুদ্ধটাই যজ্ঞ, যুদ্ধের নামই ধর্মযুদ্ধ। এই যুদ্ধে মানুষকে হত্যা করার পরিকল্পনা হচ্ছে না, এই লড়াই ধর্ম আর অধর্মের লড়াই। কিন্তু মুশকিল হল দু পক্ষই বলছে আমি ধর্ম পথে আছি। কিন্তু যুদ্ধটাকে পুরো যজ্ঞ রূপে নিচ্ছেন। হিন্দু ধর্মই একমাত্র ধর্ম যে ধর্ম সব কিছুকে যজ্ঞে নিয়ে চলে গেছে। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়াটাও যজ্ঞ, গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে বিস্তারিত ভাবে যজ্ঞের বর্ণনা দিয়েছেন। খাওয়ার আগে ব্রহ্মার্পণং বলে খাওয়া মানে খাওয়াটা তখন আর জাগতিক কার্য থাকল না, পুরো যজ্ঞে পাল্টে গেল। এমন কি নারী-পুরুষের সম্পর্ককেও পদে পদে যজ্ঞ রূপে দেখান হয়েছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে রীতিমত বর্ণনা আছে কোন কোন বেদমন্ত্রোচ্চারণ করে পুরুষ নারীর সঙ্গ করবে। বিদেশী পণ্ডিতরা এগুলোকেই বার করে দেখায় হিন্দু ধর্মে কত নোংরামিকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে। হিন্দু ধর্মে কোন নোংরামি নেই, কলুষিত কর্মকে কিভাবে নিষ্কলুষ কর্মে রূপান্তরিত করতে হয় হিন্দু ধর্ম সেটাই দেখিয়ে দিচ্ছে। আমাদের এখানে কারুর কাছে গিয়ে ঋষি হতে হয় না। মহাভারতে ব্যাধের কথা আছে, মাংস বিক্রী করা যার জাত ধর্ম। মাংস বিক্রী করেই সেই ব্যাধ একজন ঋষি হয়ে গেলেন। কি করে ঋষি হয়ে গেলেন? তাঁর ওই কাজকে তিনি যজ্ঞ রূপে সম্পন্ন করলেন। ধর্মের জগতে উচ্চতম যে জিনিসটা হিন্দু ধর্মের অবদান সেই জিনিসটা হল যজ্ঞ, সমস্ত কর্মকে কিভাবে যজ্ঞ রূপে সম্পন্ন করতে হয় হিন্দু ধর্ম দেখিয়ে দিয়েছে। পূজো আর যজ্ঞ বা হোমের একটা বড় পার্থক্য হল, যজ্ঞ হল যখন অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হচ্ছে আর পূজো হল যখন দেবতার সামনে গিয়ে অর্ঘ্য দেওয়া হচ্ছে। উচ্চতম যজ্ঞে কোন কিছুই দরকার পড়ে না। গীতায় যেমন বলছেন *অপানে জুহ্বতি প্রাণ প্রাণেহপানং তথাপরে*, নিঃশ্বাস নিলাম এটাই আহুতি হয়ে গেল। কিসে আহুতি দেওয়া হল? যে প্রাণ রয়েছে সেই প্রাণে আহুতি দেওয়া হল। গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে পর পর অনেক রকম ক্রিয়াকে কিভাবে যজ্ঞে রূপান্তরিত করতে হয় দেখিয়ে দিয়েছেন। আমি হাত নাড়ছি এটাও যজ্ঞ, আচার্য ক্লাশ নিচ্ছেন এটাও যজ্ঞ, শিষ্যরা শাস্ত্রের কথা শ্রবণ করছে এটাও যজ্ঞ, যে কোন কাজকে যজ্ঞের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সম্পন্ন করলে সব রকম কর্মই যজ্ঞ হয়ে যাবে। শুধু তাই না, সন্তানোৎপদানের প্রক্রিয়াকেও এনারা বেদের মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে সম্পাদিত করতে বলে যজ্ঞে রূপান্তরিত করে দিলেন। এসব ভাবলে আমাদের অবাক হয়ে যেতে হয় সংস্কৃতিকে কত উচ্চ স্তরে তাঁরা নিয়ে গিয়েছিলেন আর আজ সেই সংস্কৃতি কোথায় নেমে এসেছে। সন্তানোৎপাদনকেই ঋষিরা যজ্ঞ রূপে দেখছেন তাহলে এই যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি সেটাকে ঋষিরা কি রূপে আমাদের সামনে রাখবেন? বলছেন, সৃষ্টি মানে ভগবান এখন যজ্ঞ করছেন। আদিপুরুষ কোন ক্রিয়া করতে পারবেন না, কিন্তু অধিঃপুরুষ এবার যজ্ঞ করছেন।

বিরাটের সৃষ্টি হয়ে গেছে, তার মানে space সৃষ্টি হয়ে গেছে, কিন্তু সব কিছুর এখনও সৃষ্টি হয়নি। শরীর সৃষ্টি হয়ে গেছে কিন্তু তার সাথে আর কি কি সৃষ্টি হয়েছে পরিষ্কার করে বলা নেই। কিন্তু এগুলোকে খুব আক্ষরিক ভাবে নিতে নেই। এখানে দুটো জিনিসকে আক্ষরিক অর্থে নিতে হবে, একটা হল সৃষ্টিতে যা কিছু আছে সব ভগবান থেকে সৃষ্টি হচ্ছে আর দ্বিতীয় হল সৃষ্টিটা ভগবানের যজ্ঞ। এখানে কোন পাগলামির কিছু নেই, ভগবানের হঠাৎ খেয়াল হল বা বাচ্চাদের মত ইচ্ছে হল আর তিনি সব সৃষ্টি করতে নেমে গেলেন তা নয়। তাহলে কি করছেন? ভগবান যজ্ঞ করছেন। যজ্ঞ করতে গেলে কি কি দরকার হয়? হোম, আসন, হবিষা ইত্যাদি। কিন্তু এখন কিছুই নেই, কারণ সৃষ্টিই তো হয়নি, তিনি এবার সৃষ্টি করবেন। কিন্তু বিরাট তৈরী হয়ে গেছে। মন্ত্রে সেটাকেই একটা কবিতার মাধ্যমে সেই তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য একটা দুর্ধর্শ রূপককে ব্যবহার করা হচ্ছে। কিছু কিছু জিনিস ইতিমধ্যে তৈরী হয়ে গেছে যেমন বলছেন space তৈরী হয়ে গেছে, কাল তৈরী হয়ে গেছে, কিন্তু আনুষাঙ্গিক দ্রব্য কিছু নেই। *যৎপুরুষেণ হবিষা দেবা যজ্ঞমতন্বত* দেবতারা ঠিক করলেন এই যে পুরুষ, যে পুরুষ এক চতুর্থাংশের মধ্যে রয়েছেন, সেই অধিপুরুষকে আমরা যজ্ঞে বলি দেব। দেবতারা এখন যজ্ঞ করবেন আর সেই যজ্ঞে এই অধিপুরুষকে বলি দেবে। তখন তো সৃষ্টি হয়নি, জীব জন্তু কিছুই জন্ম নেয়নি, যজ্ঞ করতে গেলে নানান রকমের জিনিসের দরকার। অগ্নিকুণ্ড দরকার, অরণি কাষ্ঠের দরকার, ঘৃত ও আরও আনুষাঙ্গিক অনেক কিছুর দরকার। তাহলে দেবতারা কিভাবে যজ্ঞ করবেন? দেবতারা এবার তাই মানসিক যজ্ঞ, মনে মনে এই যজ্ঞটা শুরু করলেন। তিনটে মূল ঋতু, বসন্ত, গ্রীষ্ম আর শরৎ এসে গেছে, কারণ সময়ের সৃষ্টি হয়ে গেছে, সময়ের সৃষ্টি হওয়া মানে বিরাটের ঋতম্ এসে গেছে, ঋতম্ এসে যাওয়া মানে periodicy এসে গেছে, তার মানে ঋতুকাল এসে গেল। কিন্তু সবটাই মনে মনে। *বসন্তো অস্যাসীদাজ্যম গ্রীষ্ম ইধ্মঃ শরদ্ধবিঃ* দেবতারা আহুতি দেওয়ার জন্য বসন্ত ঋতুকে ঘি বানালেন, গ্রীষ্ম ঋতুকে অরণি কাষ্ঠ বানালেন, শরৎ ঋতুকে হবি করলেন। অনেকে প্রশ্ন করেন দেবতারা হঠাৎ কি করে ঠিক করলেন যে বসন্ত ঋতুকে ঘৃত করা হবে? এর উত্তরে বলা হয় দেবতারাও নাকি ধ্যান করলেন। কি ধ্যান করলেন? আগের কল্পে সৃষ্টিটা কিভাবে হয়েছিল। ধ্যানের মাধ্যমে দেবতারা জানলেন যে আগের কল্পে বসন্ত ঋতুকে এই ভাবে যজ্ঞের ঘৃত করা হয়েছিল। যখন ধ্যানে দেখলেন যে এর আগের কল্পেও এভাবেই যজ্ঞ করা হয়েছিল, তখন তারা ঠিক করলেন এই কল্পেও আমরা যজ্ঞ করব, সেই যজ্ঞে বসন্ত ঋতুকে ঘি করা হবে, গ্রীষ্ম ঋতু হবে কাঠ আর শরৎকাল হবে তার হবি। তখন কিছুই নেই কিন্তু দেবতারা এসে গেছেন, দেবতাদের সৃষ্টি হয়ে গেছে। এখন দেবতারা যদি যজ্ঞ না করেন তাহলে বাকি অংশের সৃষ্টি হবে না। এখানে যদিও পুনরাবর্তশীল সৃষ্টিকে বোঝাতে চাইছে কিন্তু যেটা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ তা হল এর সবটাই মানসিক প্রক্রিয়া। সবটাই মনে মনে, ধ্যানের মধ্যে দিয়ে হচ্ছে। তার থেকেও বড় ব্যাপার, যা কিনা এই পুরুষসূক্তমের মূল তত্ত্ব তা হল – যা কিছু সৃষ্টি সব পুরুষ নিজেই হয়েছেন। তাই এই ব্রহ্মাণ্ডের যা কিছু আছে সব তিনি নিজেই হয়েছেন, তিনি ব্যতিরেকে অন্য কিছু নেই। ভগবান চৈতন্য পুরুষ, কিন্তু তাঁর কাছে এখন কিছু নেই, এখন সৃষ্টি করতে হবে। অনেক কাল্পনিক কাহিনীতে এই ধরণের মন্ত্রগুলি থেকে তাঁদের কল্পনা এসেছে। তিনি ইচ্ছে করলেন। কি ইচ্ছে করলেন? আমি এক আমি বহু হব। এখানে আমাদের একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, এই ধরণের কথাগুলো যখন বলা হয় ভগবান ভাবলেন আমি এক বহু হব, এগুলো ঋষিরা ভেবেছেন, এছাড়া তো সৃষ্টি হতে পারে না। তখন বিরাটের সৃষ্টি হয়ে গেল। বিরাটের সৃষ্টি হয়ে গেলেই যে দুম দুম করে সব কিছুর সৃষ্টি হয়ে যাবে তাতো নয়। তাহলে কিভাবে সৃষ্টি হবে? ভগবানকেও যজ্ঞ করতে হবে। সেইজন্য জীবনে আমরা যা কিছু পেতে চাই তার জন্য আমাদের যজ্ঞ করতে হবে। বিদ্যা অর্জন করতে হলে অধ্যয়ন যজ্ঞ করতে হবে।

এখন যজ্ঞে সেই পুরুষকে বলি দেওয়া হল, তাঁর অঙ্গ থেকে পৃথক পৃথক হয়ে হয়ে যা যা হবে সব তিনি নিজেই সেই সেই বস্তু হবেন। সোজা কথায় বলা যেতে পারে ভগবানকে কেটে কেটে বলি দিয়ে নানান জিনিসের সৃষ্টি হল। কারা বলি দিলেন? দেবতারা। কি ভাবে বলি দিলেন? ধ্যানের মাধ্যমে। ধ্যানের ব্যাপারটাই একটা কাব্যিক আঙ্গিনায় বর্ণনা করা হচ্ছে। যতই কাব্যিক হোক না কেন, আমাদের কিন্তু মনে রাখতে হবে সেই সত্যকে, সত্য হল সৃষ্টি ঈশ্বর থেকেই হয়, যা কিছু হয়েছে সব ভগবানই হয়েছেন, দ্বিতীয় হল কার্যে যখন

নামছেন তখন ঈশ্বরই সব কিছুকে যজ্ঞ রূপে সম্পাদন করেন, আমরাও যা কিছু করব যজ্ঞ রূপে করব। খাওয়া, স্নান, পড়াশোনা, নিদ্রা সবটাই যজ্ঞ রূপে করা। যজ্ঞ আবার দু রকমের, সকাম যজ্ঞ আর নিষ্কাম যজ্ঞ। কিছু যদি পাওয়ার বাসনা থাকে তাহলে সেটাই সকাম যজ্ঞ, কোন বাসনা নেই সেটাই নিষ্কাম যজ্ঞ। সকাম সব সময় তিনটেই হবে বিদ্যা, সম্পদ আর সেবা, ত্যাগ হল নিষ্কাম যজ্ঞ। জীবনে যদি কিছু পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করতে হয় তাহলে একমাত্র বিদ্যা, সম্পদ আর সেবার জন্যই প্রার্থনা করা যেতে পারে। বিদ্যা, সম্পদ আর সেবাকে যখন কেউ নিষ্কাম ভাবে কাজে লাগাবে তখন সে ত্যাগে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। সব কিছুই যজ্ঞ রূপে করতে হবে। ভগবানও যজ্ঞ রূপে করছেন, তখন তাঁর কাছে কিছুই নেই, তাই তিনি মানসিক যজ্ঞ করছেন। গীতাতে অনেক রকম যজ্ঞের কথা পর পর বলে গেছেন, তার মধ্যে জ্ঞান যজ্ঞকে ভগবান শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ বলছেন। এখানে পুরুষকে যজ্ঞের পশু রূপে বলি দেওয়া হচ্ছে। বলি দেওয়ার পর তাঁর শরীরেরই বিভিন্ন অঙ্গ থেকে জগতের যা কিছু আছে সব সৃষ্টি হল। এখন যজ্ঞের পশু এসে গেছে, ঘৃত এসে গেছে, অরণি এসে গেছে, হবিও তৈরী হয়ে গেছে তাই যজ্ঞ সম্পন্ন করার ক্ষেত্রের আর কোন বাধা রইল না।

পুরুষসূক্তমের মূল বক্তব্য কবিতার আকারে বর্ণনা করে মূলতঃ দেখাচ্ছেন সৃষ্টি ঈশ্বর থেকে হয়েছে আর তিনিই সব কিছু হয়েছেন। কবিতার একটা সমস্যা হল, কবিতার আকারে কোন তত্ত্বকে ব্যক্ত করতে গিয়ে অনেক ফাঁক থেকে যায়। এখানেই বুদ্ধির খেলা শুরু হয়ে যায়। বুদ্ধিতে কল্পনাও থাকে আবার যুক্তিও থাকে। এই বুদ্ধিকে আশ্রয় করেই আইনস্টাইন একটা যুক্তি দিয়ে একটা থিয়োরীকে দাঁড় করিয়ে দিলেন, এই বুদ্ধি দিয়েই সেক্সপিয়ার তাঁর কল্পনাকে সাজিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করছেন। পরের দিকে যে পুরাণাদি সাহিত্য এসেছে সেখানে এই ফাঁকগুলিতে বুদ্ধির খেলা শুরু হয়ে গেছে। যেমন বিরাট মানে কি, বিরাটে কি ছিল, বিরাটের পর কি কি ছিল। এখনও কোন প্রতিভাবান ব্যক্তিত্ব যদি ইচ্ছে করেন তিনি পুরুষসূক্তমকে আধার করে একটা পূর্ণাঙ্গ শাস্ত্র রচনা করে দিতে পারেন। এই ফাঁক থেকে যাওয়ার জন্য অনেকের মনে বিভিন্ন সংশয় তৈরী হয়। সংশয় হবে না যদি এর সব কিছুকে আক্ষরিক ভাবে না নেওয়া হয়। এর আধ্যাত্মিক তাৎপর্যটুকু নিয়ে নিলে আর কোন সংশয় থাকবে না। সপ্তম মন্ত্রে বলছেন –

তং যজ্ঞং বর্হিষি প্রৌক্ষন্ পুরুষং জাতমগ্রতঃ।
তেন দেবা অযজন্ত সাধ্যা ঋষয়শ্চ যে।।১০/৯০/৭(ঋ)

এই যজ্ঞ মনে মনেই হয়ে যাচ্ছে। কার মনে? অধিপুরুষের মনে, তাঁকে ব্রহ্মাই বলুন, প্রজাপতি বলুন, ভগবান নারায়ণ বলুন, বিভিন্ন মতাবলম্বীরা বিভিন্ন নাম দেবেন, কিন্তু বেদে তাঁকে অধিপুরুষ বলছেন। কারণ তিনি বিরাটের উপর বিরাজমান, অধিকরণ থেকে অধিপুরুষ বলছেন। সেই যে বিরাটের প্রথম সৃষ্টি হল, সেখানে যে শুধু দেশ আর কালেরই জন্ম হয়েছে তাই না, সেখানে কিছু দিব্য সত্তারাও আছেন। এখানে তিন জন দিব্য সত্তার নাম করছেন, *তেন দেবা অযজন্ত সাধ্যা ঋষয়শ্চ যে*, সিদ্ধ বা সাধ্যা, ঋষি আর দেবতা। দেবতারা অন্তরীক্ষে থাকেন, যাঁদের শরীর কান্তিমান, খুব উচ্চমানের ঋষিদের সিদ্ধ বলা হয়। সায়নাচার্য সিদ্ধ বলতে ব্যাখ্যা করছেন যাঁর মধ্যে সৃষ্টি করার সামর্থ্য আছে, তার মানে প্রজাপতি আদি। সৃষ্টি কার্যে কয়েকজন প্রজাপতিরাও জড়িত ছিলেন। ভগবানের কয়েকজন মানসপুত্র হন। আচার্য শঙ্কর তাঁর ভাষ্যে এগুলোকে খুব সহজীকরণ করে দিয়েছেন। ভগবান যখন মন থেকে প্রথম সৃষ্টি করলেন তখন তাঁর মন থেকে চারজন ঋষি জন্ম নিলেন – সনক, সনন্দন, সনাতন আর সনৎকুমার। কিন্তু তাঁরা সৃষ্টি কার্যে কোন মন না দিয়ে তপস্যায় বেরিয়ে চলে গেলেন। তখন তিনি তাঁর প্রজাপতি আদি সন্তান যাঁরা ছিলেন, সপ্তর্ষি ঋষিদের প্রবৃত্তিমার্গের শিক্ষা দিলেন। আচার্য শঙ্কর এটাকে খুব সহজ করে দিয়েছেন, কিন্তু বেদে এত সহজ ভাবে নেই। বেদের সময় যে শব্দগুলো ছিল পরের দিকে সেই শব্দের অর্থ পাল্টে গেছে। এখানে দুটো অর্থেই নেওয়া যেতে পারে, দেবতা, ঋষি আর প্রজাপতিগণ। প্রজাপতিদের জন্ম কিন্তু ভগবানের মন থেকে, তাঁরাই সৃষ্টিতে প্রথম আবির্ভূত হয়েছেন। পুরাণের এটাই বিচিত্রতা, এতে সৃষ্টি তত্ত্বের এত বিভিন্ন ধরণের বর্ণনা আছে এটাই একটা আলাদা গবেষণার বিষয় হয়ে যাবে, আর কোন তত্ত্বই কারুর সাথে মেলে না, মেলার কথাও নয়। কারণ সৃষ্টির কথা কারুরই বলার কথা নয়। প্রথমে বলছেন দেবতা, ঋষি আর সিদ্ধরা এসে গেছেন, কিন্তু এনারা সেই দেশ, কাল ও

কারণের মধ্যে নয়, এই তিনটে আবার বিরাটের মধ্যে। বিরাটের সৃষ্টি কিভাবে হয়েছে কেউ জানে না, কারণ তাঁর নিজেরই সৃষ্টি পরে হয়েছে। এখানে যে দেবতা, ঋষি আর সিদ্ধ এই তিন শ্রেনীর কথা বলছেন, এনারা আবার কজন ছিলেন তারও কোন উল্লেখ নেই। পরের ঋষিরা চাইলে নিজের ইচ্ছে মত সংখ্যা দিতে পারেন, কেউ বলছেন তিনজন দেবতা, কেউ বলেন তেত্রিশ দেবতা আর আমাদের সময়ে তেত্রিশ কোটি দেবতা হয়ে গেছে। কিন্তু প্রথমের দিকে তিনজন দেবতাই ছিলেন। ঋষিদের ক্ষেত্রেও সংখ্যা বলতে গিয়ে সপ্তর্ষির সাত জন ঋষির কথা বলছেন। পরের দিকে এই সাতজন ঋষির নামও বিভিন্ন পুরাণে আলাদা আলাদা হয়ে গেছে, আর বারোজন প্রজাপতি। সবারই ভগবানের মন থেকে সৃষ্টি। এবার সবাইকে সৃষ্টির কার্যে নামতে হবে। তাঁরা সবাই মিলে ভগবানকেই ধরেছেন। মা কালীর মন্দিরে যেভাবে পশুকে বলি দেওয়া হয়, সেইভাবে এবার পুরুষকে বলি দেওয়া হবে। প্রথম যজ্ঞ হচ্ছে তাতে ভগবানকেই যজ্ঞের পশু বানিয়ে বলি দেওয়া হবে। কোন ভগবানকে, এই অধিপুরুষকে। কারা অধিপুরুষকে যজ্ঞের পশু বানাচ্ছেন? তাঁরই সন্তানরা, দেবতা, ঋষি আর সিদ্ধগণ। অধিপুরুষকে ধরা বাঁধা যাবে, কারণ তিনি এখন শক্তির এলাকায় চলে এসেছেন। কিন্তু এই যজ্ঞ মনে মনে সম্পাদিত হচ্ছে। কার মনে হচ্ছে? ভগবানেরই মনে। তিনি কল্পনা করছেন যে তিনি সৃষ্টি করে দিয়েছেন, তাঁর সৃষ্টিতে দেবাতাদিরা এসে গেছেন। তিনটে ঋতুও এসে গেছে, তিনটে ঋতু যজ্ঞের তিনটে ভূমিকা নেবে। এবার যজ্ঞে বলি দেওয়া হবে সেই ভগবানকেই। হিন্দু ধর্মই একমাত্র ধর্ম যে ধর্ম তার ভগবানকেই বলি দিচ্ছে। *প্রৌক্ষন*, সবাই সেই পুরুষকে বদ্ধ করে তাঁর উপরে মন্ত্রঃপূত বারি সিঞ্চন করে দিলেন, পুরুষকে কুশ ঘাসের উপরে রাখা হল। দেবতারা সেই পুরুষকে যজ্ঞের আসনে উপবেশন করালেন। সিদ্ধগণ ও ঋষিগণ এই যজ্ঞকে অবলোকন করবেন। অষ্টম মন্ত্রে বলছেন –

তস্মাদ্যজ্ঞাৎ-সর্বহুতঃ সংভৃতং পৃষদাজ্যম্।
পশূংস্তাংশ্চক্রে বায়ব্যান্ আরণ্যান্ গ্রাম্যাশ্চ যে।।১০/৯০/৮(ঋ)

পুরুষের বলি দেওয়া হয়ে গেল। *তস্মাদ্যজ্ঞাৎ-সর্বহুতঃ*, পুরুষকে বলি দেওয়া পর সব কিছু যজ্ঞে আহুতি দেওয়া হয়ে গেল, তখন সেই পুরুষ থেকে কি কি জন্ম নিল? *সংভৃতং পৃষদাজ্যম্*, পুরুষের অঙ্গ থেকে প্রথম ঘৃতের জন্ম হল। আগে যে ঘিয়ের কথা বলা হয়েছিল সেই ঘি ছিল কল্পনার। এবার যে ঘিয়ের জন্ম হল এটাই আসল ঘি, ঘি দুধের সার। কেন ঘৃতের প্রথম জন্ম হল? কারণ যজ্ঞ না হলে কোন কিছুই সৃষ্টি হবে না, যজ্ঞের জন্য এবার সত্যিকার ঘিয়ের জন্ম হয়ে গেল। এখনও তো গরুর জন্ম হয়নি তাহলে ঘি কোথা থেকে এসে গেল? ঠাকুর বলছেন লাউ, কুমড়োর ফল আগে ফুল পরে হয়। ভগবানের লীলাতে সব কিছুই হতে পারে। আর যদি একে কবিতার রূপে নেওয়া হয় তাহলে আর কোন সমস্যা থাকবে না। মূল বক্তব্য হল, সবটাই তাঁর থেকে সৃষ্টি। আমরা যে ঘি খাই ঠিক সেই অর্থে ঘিয়ের অর্থ হয় না, ঘি হল সার। গরুর সার দুধ, দুধের সার ঘি আর ঘিয়ের সার হল আয়ু। সেইজন্য বলা হয় ঘি খেলে আয়ু বৃদ্ধি হয়। এগুলোকে আমরা কাব্যিক রূপেও নিতে পারি আবার এভাবেও চিন্তন করা যেতে পারে, মানুষের কাছে তখনকার দিনে গরু খুব মূল্যবান ছিল, গরুর সার দুধ, দুধের সার ঘি, ঘিয়ের সার জীবন, সেই জীবন সবার আগে এসে গেল। তবে এই ব্যাখ্যা ভাষ্যকাররা দিচ্ছেন না, দেখানো হচ্ছে মানুষ একটা জিনিসকে কত ভাবে চিন্তন করতে পারে।

পশূংস্তাংশ্চক্রে বায়ব্যান্ আরণ্যান্ গ্রাম্যাশ্চ যে, তারপর সেই পুরুষ থেকে তিন ধরণের পশুর সৃষ্টি হল। বাতাসে চলাফেরা করে সেই সকল প্রাণির উদ্ভব হল, মানে পাখিদের জন্ম হল। অরণ্যে যে সব পশুরা থাকে সেই সব পশুদের জন্ম হল, আর গ্রামে বা লোকালয়ে যে পশুরা বাস করে তাদেরও জন্ম হল। পুরুষসূক্তম্ কবিতা, তাই কবিতার ভাবে বলা হচ্ছে যে পাখিরা জন্ম নিল, বন্য পশু আর গৃহপালিত পশু সবারই জন্ম হল এই পুরুষের থেকে। কেউ বলবে যে গরুতে ভগবান আছে আর বাঘের মধ্যে ভগবান নেই, তা বললে হবে না, গরুতেও তিনি বাঘেতেও তিনি। তিনিই সব হয়েছেন, এটাকে বোঝাবার জন্যে একটা একটা জিনিসকে সামনে নিয়ে এসে কবিতার আকারে ব্যখ্যা করে বোঝান হচ্ছে। *বায়ব্যান্*, বায়ু থেকে মানে বায়ু দেবতা থেকে জন্ম নিল, বেদের একটা ইউনিক ধারণা আছে যে পশুদের সৃষ্টি বায়ু দেবতা থেকে হয়। এভাবে বলার একটা কারণ হতে পারে, সৃষ্টি মাত্রই প্রাণ শক্তিতে চলে, প্রাণীরা প্রাণ শক্তিতে জীবন ধারণ করে থাকে বলে তাদের প্রাণী

বলা হয়। আবার প্রাণ সব সময় বায়ুর উপর চলে। আমরা যে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছি আসলে আমরা বায়ুকে বাইরে থেকে টানছি, এই বায়ু দিয়ে কিছু হয় না, কিন্তু বায়ুর যে সার সেটা হল প্রাণ, এই প্রাণ ভেতরে যাওয়ার জন্যই আমাদের শরীর চলছে। তাই বলে বায়ু আর প্রাণ কি কখন আলাদা কিছু? বায়ু আর প্রাণ সম্পূর্ণ আলাদা, বায়ুর সাথে প্রাণের কোন সম্পর্কই নেই। যাঁরা সমাধিতে চলে যান তাঁরা নিঃশ্বাস নেন না। কিন্তু সাধারণ লোকেদের ক্ষেত্রে প্রাণ বায়ু দিয়েই ভেতরে যায়। যোগীরা যখন ওই অবস্থায় চলে যান যেখানে তিনি প্রাণের সাথে একাত্ম হয়ে যান, এরপর তাঁকে সমুদ্রের তলায় যদি রেখে দেওয়া হয় সেখানেও তিনি জীবিত থাকবেন। যোগীদের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্যই হলে তাঁদের শ্বাস-প্রশ্বাস খুব ধীর গতিতে প্রবাহিত হয়। এছাড়া ধ্যানের ক্ষেত্রেও কুম্ভক অবস্থার উপর খুব জোর দেওয়া হয়। কুম্ভক মানেই নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস না নেওয়া। সাধারণ প্রাণীদের জীবন চলে পুরো বায়ুর উপর, যোগীদের যে যত উচ্চমানের তার তত বায়ুর প্রয়োজন কমে যায়, যেমন দেবতাদের প্রাণ ধারণের জন্য বায়ুর দরকার হয় না। সেইজন্য বায়ু আলাদা প্রাণ আলাদা। ভাত-ডাল খাওয়ার জন্য শরীরে শক্তি হচ্ছে, কিন্তু শুধু যে ভাত-ডাল দিয়েই শরীরে শক্তি যাচ্ছে তা নয়, অনেক কিছু দিয়েই শরীরে শক্তি যেতে পারে, শরীরে শক্তি সরবরাহ করার অন্যান্য অনেক রকম উপায় আছে। খাদ্য যেমন শরীরের শক্তি সরবারহের প্রধান উৎস, বায়ুও সেই রকম প্রাণশক্তি প্রবাহের প্রধান উপায়। কিন্তু বায়ু ছাড়াও প্রাণ চলতে পারে, তবে যোগীরা ছাড়া কেউ পারবে না। যে প্রাণন ক্রিয়ার জন্য প্রাণীকে প্রাণী করে, সেখানে পরিষ্কার বোঝা যায় যে এখানে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস চলছে। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস পরিষ্কার চলে পশুদের মধ্যে, সেইজন্য এদের জন্ম বায়ু দেবতা থেকে। তৈত্তেরীয় ব্রাহ্মণেও আছে যেখানে বলছেন বায়ু দেবতা থেকে পশুদের সৃষ্টি হয়। একদিকে ঘৃতের সৃষ্টি হয়ে গেল, সঙ্গে তিন ধরণের পশুরও সৃষ্টি হয়ে গেল। এবার নবম মন্ত্রে বলছেন –

তস্মাদ্যজ্ঞাৎসর্বহুতঃ ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে।
ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাৎ যজুস্তস্মাদজায়ত।।১০/৯/৯(ঋ)

দেবতাদের যজ্ঞ সমাপ্ত হয়ে গেলে সেই যজ্ঞ থেকে বেদ বেরিয়ে এল, বেদের সাথে বেদের যে চারটি অঙ্গ, সেই চারটি অঙ্গও বেরিয়ে এল। *ঋচঃ* – ঋচ হল ঋক। বলা হয় পুরুষসূক্তমেই আমরা প্রথম ঋগ্বেদ হিসেবে ঋচের উল্লেখ পাই। *সামানি* – যজ্ঞ থেকে সামগান বেরোলে। *ছন্দাংসি* – এই যজ্ঞ থেকে ছন্দের উদ্ভব হল। এখানে যে ছন্দের কথা বলা হচ্ছে এই ছন্দকে অনেকে কবিতার বিভিন্ন ছন্দের কথা বলছে, আবার অনেকে পুরুষসূক্তমের এই ছন্দ অথর্ববেদকে বোঝাচ্ছে। *যজুস্তস্মাদজায়ত* – সেখান থেকে যজুর্বেদ বেরোল। ঋগ্বেদের যে মন্ত্র তাকে ঋচা বলা হয়, তেমনি যজুর্বেদের মন্ত্রকে তাকে যজুঃ বলা হয়, সাম গানকে সাম বলে, এই তিনটের বাইরে বাকি যা কিছু আছে সবটাকে ছন্দ বলে, সেগুলো অথর্ব বেদে রাখা হয়েছে। সমগ্র বেদকে ঋক, সাম, যজু আর অথর্ব এই চারটি ভাগে ব্যাসদেব বিভাজিত করেছিলেন। পরম্পরাতে বলা হয় ব্যাসদেব ঋক, সাম, যজু এই তিনটে নামে বিভাজন করেছিলেন অথচ বেদেই এই তিনটে নাম আগে থেকেই ছিল আর অথর্ব বেদের আরেকটি নাম ছন্দ। তবে অত্যন্ত পরিতাপের যে, আমাদের ব্রাহ্মণরা বেদ পুরো মুখস্ত করতেন, বেদের কোথায় কি আছে সব কম্প্যুটারের মত বলে দিতেন কিন্তু জনগণের সামনে বেদের পুরো জিনিসটাকে রাখার সময় ঠিক ভাবে রাখতে পারতেন না। বেদের উপর প্রথম পাণ্ডিত্য অর্জন করলেন বিদেশীরা, যাঁদের মধ্যে ম্যাক্সমূলার, গ্রিফিথ, ম্যকডোনাল্ডের মত অনেক পণ্ডিতরা আছেন। তাঁরা সংস্কৃত ভাষা আয়ত্ত করার পর বেদের সংস্কৃত শিখলেন, তারপর বেদকে তাঁরা ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করলেন। ইংরাজীতে অনুবাদ করার সময় এনারা নিজেদের মত অর্থ করলেন। নিজেদের মত করতে গিয়ে তাঁরা মিথ্যা কিছু বলেননি, তাঁদের যেটা মনে হয়েছে সেটাকেই ঠিক মনে করে অনুবাদ করে গেছেন। আরও মুশকিল হল, অনেক কিছুই তখন জানা ছিল না। অনেক কিছু জানা না থাকার জন্য তাঁরা দেখালেন বেদ হল আর্যদের সাহিত্য যার সাথে জেন্দাবেস্তার অনেক মিল আছে। এদের আবার মিল আছে ইংরাজীর সেই শব্দের সাথে যে শব্দগুলো রোমান ও লাটিন থেকে এসেছে। সেই থেকে লাটিন, জার্মান ভাষীদের যে জাতি আর জেন্দাবেস্তার যে ধর্মীয় জাতি সবটাকে মিলিয়ে একটা নাম দিলেন আর্য। আর্য শব্দটা হয়ে গেল একটা Linguistic Group। তারপর বলতে শুরু করলেন আর্যরা মধ্য এশিয়ার কাস্পিয়ান সমুদ্রের কাছ থেকে এসেছে। সেটাকে তাঁরা আবার প্রমাণিতও করে দিচ্ছেন।

এই ধরণের বিচিত্র তথ্য শুনে স্বামীজী রেগেমেগে বললেন, পাশ্চাত্য জগতে যারা বাইরে বাইরে না ঘুরে বেড়ায়, কিছু জয় যদি না করতে পারে তাদেরকে অপদার্থ বলা হয়। নিজেদের জিনিসগুলোকে এরা ভারতীয়দের নামে বলছে। খুব কড়া ভাষায় স্বামীজী বলছেন যারা এই ধরণের সিদ্ধান্ত দেয় তারা সবাই ওই কাস্পিয়ান সাগরে ডুবে মরে যেত তাহলে ভালো হত।

তারপর বহু বছর হরপ্পা সভ্যতার আবিষ্কার হল। হরপ্পা সভ্যতার আবিষ্কার হতেই তারা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বলতে শুরু করে দিল, আমরা যা বলেছি সেটাই আজ প্রমাণিত, আর্যরা বাইরে থেকে এসে যত আদিবাসীরা ছিল তাদের সবাইকে মেরে শেষ করে নিজেরা বসে গেল। এর মধ্যে যেমন পাণ্ডিত্য ছিল অন্য দিকে অনেক বদ কূটনীতি ছিল। বৃটিশরা চাইছিল ব্রাহ্মণদের ব্রাহ্মণ বিরোধীদের থেকে আলাদা করে দিতে, যেটা আমাদের পরম্পরাতে কখনই ছিল না। ব্রাহ্মণ বিরোধী ভারতে তখন চারটি সম্প্রদায় ছিল, জৈন, বৌদ্ধ, বৃটিশ আর চতুর্থ ব্রাহ্ম। ব্রাহ্মদের ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে বরাবরের একটা ক্ষোভ ছিল, ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে তারা বিষোদ্গার করেই গেছে। বৃটিশরা ছিল ধুর্ত, তারা দেখল ভারতকে যদি শেষ করতে হয় তাহলে প্রথমেই ব্রাহ্মণদের খুব কায়দা করে সবার থেকে আলাদা করে সরিয়ে দিতে হবে, কারণ ব্রাহ্মণরাই সব থেকে বুদ্ধিমান। সেইজন্য বৃটিশরা বলতে শুরু করল ব্রাহ্মণরা বাইরে থেকে ঘোড়ার পিঠে চেপে ভারতে এসে ভারতের আসল সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে দিল। এদের সাথে যোগ দিল তখনকার দিনের কম্যুনিস্টরা। কম্যুনিস্টরা সব কিছুতেই দেখে শ্রেণী-সংগ্রাম। এরাও তাই বলতে শুরু করল উপনিষদ হল শ্রেণী-সংগ্রাম, ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে ক্ষত্রিয়ের লড়াই, পুরাণ হল ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে শূদ্রদের লড়াই।

পাশ্চাত্য পণ্ডিত থেকে শুরু করে আজকের বুদ্ধিজীবিরা প্রমাণ করতে চাইছে পুরুষসূক্তমকে বেদের মধ্যে পরের দিকে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। কেউ একবারও ভাবল না যে ব্রাহ্মণরা বাকি সব জায়গায় করতে পারবেন, কিন্তু বেদের ক্ষেত্রে এই জিনিস তাঁরা কখনই করতে পারবেন না। তাঁরা তাঁদের পূর্বজদের কাছ থেকে বেদ যেমনটি পেয়েছেন তেমনটি রেখে দিয়েছেন। এরা তখন বলছে ঋক, সাম, যজু এই নামগুলো আগে কোথাও আসেনি, সেইজন্য এটা প্রমাণিত যে পুরুষসুক্তমকে পরে বেদে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। ইংরেজ পণ্ডিতরা পরে বেদ পড়ার পর প্রমাণ দিতে শুরু করল যে, এই নামগুলো অন্যান্য জায়গাতেও ব্যবহৃত হয়েছে, দ্বিতীয় ঋক, সাম, যজু এগুলো এক একটা বিশেষ ছন্দের নাম। সায়নাচার্য আবার বলছেন আমাদের সাতটি ছন্দ আছে, এই ছন্দ ভগবান থেকে সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু আবার অন্য ভাষ্যকাররা বলছেন ছন্দ মানে অথর্বন্‌, অথর্বন আরেকটি বিশেষ ছন্দ। ঋক ছন্দ, সামগান, যজু ছন্দ ভগবানকে যখন বলি দেওয়া হয়েছে তখন সেখান থেকে সৃষ্টি হয়েছে।

ভারতীয় পণ্ডিতদের মতে বেদ চারটি, কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা সব সময় তিনটি বেদের কথা বলেন। কেন পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা তিনটি বেদের কথা বলেন? তার কারণ – এক জায়গায় আমরা আলোচনা করেছিলাম যে বেদের একটা নাম ত্রয়ী। ত্রয়ীর অর্থ হয় ঋক, সাম ও যজু। এই ত্রয়ী শব্দ থেকেই পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা তিনটি বেদের কথা বলে আসছে। আসলে ঋক, সাম ও যজুকে যখন বেদের অর্থ হিসেবে বলা হয়েছিল তখন সংখ্যার কথা না বলে ছন্দ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে – ঋক এক বিশেষ ছন্দ, সাম যেটা গান হিসাবে ব্যবহার করা হয় আর যজু গদ্যাকার ছন্দ, যা যজ্ঞে আহুতির সময় ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ফলে এখানে আমরা কবিতা, গান আর গদ্য পেলাম, তাহলে অথর্বকে আমরা কি বলব। সেই কারণে অথর্বের কথা বেশি আসত না বলে বেদকে ত্রয়ী বলা হত। পরবর্তি কালে অথর্ববেদের আরেকটা নাম দিল ছন্দ এবং একটা বিশেষ শ্রেণীর সাহিত্য রূপে গণ্য করা শুরু করল, কারণ অথর্ববেদের মধ্যে আমরা পদ্য ও গদ্য দুটোই পাই। কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা যে করেই হোক দেখাবেন যে বেদ তিনটেই ছিল আর পরের দিকে অথর্বকে বেদের সাথে যুক্ত করা হয়েছে। আমাদের পণ্ডিতরা কখনই পাশ্চাত্যের পণ্ডিতদের কথা স্বীকার করেন না, তাঁরা মনে করেন এই চারটে বেদ এক সাথেই আর একই পদ্ধতিতে সৃষ্টি হয়েছিল। পুরুষসূক্তমেই তার উল্লেখ করা হচ্ছে – ঋক, সাম, যজু ও অথর্ব এই যজ্ঞ থেকেই বেরিয়েছে।

আমাদের মনে অনেকগুলো প্রশ্নের উদয় হয়, তার মধ্যে একটা খুব বড় প্রশ্ন হল আমি কোথা থেকে এলাম, যাঁদের আমরা জ্ঞানী বলে জানি, সে যে কেউই হতে পারে, বাচ্চারা যেমন তাদের বাবা মাকে জ্ঞানী মনে করে, বাচ্চারা তাঁদেরকেই এই প্রশ্ন করে, বড় হয়ে সমাজে যাঁদের আমরা জ্ঞানী মনে করি তাঁদের সৃষ্টি নিয়ে প্রশ্ন করি। দার্শনিক এবং ধার্মিক পুরুষদেরও জিজ্ঞেস করা হয়, পদার্থ বিজ্ঞানীই হন আর যে বিজ্ঞানীই হন না কেন তাঁদেরও মানুষ জিজ্ঞেস করে। অদ্বৈত বেদান্তের খুব নামকরা গ্রন্থ মাণ্ডুক্যকারিকাতে একটা কথা বলছেন, গুরু তাঁর শিষ্যকে যেমনটি ভাব ঢুকিয়ে দেন শিষ্য জগতকে তেমনটিই দেখবে আর নিজেকেও সেই ভাব নিয়ে দেখবে। এখানেই এই ভাব শেষ হয়ে যাবে না, যে ভাব নিয়ে সে জীবন অতিবাহিত করেছে মৃত্যুর পর সেই ভাবের সাথেই সে এক হয়ে যাবে। বস্তুবাদীরা মনে করে পদার্থ থেকেই আমাদের জন্ম, মৃত্যুর পর আমরা সবাই পদার্থেই মিশে যাব, এই ভাব নিয়ে জীবন কাটালে তাদের তাই হবে। বিজ্ঞানের মতে পদার্থের কখন নাশ হয় না, একটা যে বালিকণা তারও নাশ হয়ে যাবে না। বালিকণা আগুনে পুড়ে গেলে ধুয়ো হয়ে যাবে। ধুয়ো হয়েই বা কোথায় যাবে! এই পরিবেশের মধ্যেই থাকতে হবে, বিভিন্ন রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ায় এটা ওটার সাথে মিশ্রণ হতে হতে আবার তাকে মাটিতে ফিরে আসতে হবে, এই প্রক্রিয়া চলতেই থাকবে, এ জিনিস কখনই বন্ধ হবে না। তাহলে যারা নিজেদের পদার্থ মনে করছে তাদেরও পদার্থ রূপে আসা যাওয়ার চক্র চলতেই থাকবে, এই চক্র কখন বন্ধ হবে না। শরীর তো চলবে তার সাথে তাদের জীবাত্মারও ওই একই গতি হবে, ঘুরতেই থাকবে। তুমি নিজেকে পদার্থ মনে করছ তাহলে পদার্থের নিয়মেই চলতে থাক।

বিজ্ঞান আর বস্তুবাদীদের তত্ত্ব এক। এদের বাইরে যারা ধর্মকে মানে, তাদের মধ্যে মুসলমানরা মনে করে মৃত্যুর পর আমি জন্নতে যাব, সেখানে আল্লার কাছে থাকব। আল্লার যা হবে এদেরও তাই হবে। বৈষ্ণবরা মনে করে মৃত্যুর পর আমি বিষ্ণুলোকে যাব, ভগবান বিষ্ণুর যা হবে বৈষ্ণবদেরও তাই হবে। বেদান্তীরা এসব কিছুই মানে না, তারা বলছে আত্মজ্ঞান লাভ হলেই আমার মুক্তি হয়ে যাবে, তখন আমার আর জন্ম নেই মৃত্যু নেই। বেদান্তীদের তাই হবে। যারা বস্তুবাদী দার্শনিক আর যারা বিজ্ঞানকে মানে তাদের এক রকম ব্যাখ্যা আছে, যারা অন্যান্য দর্শন মানছে তাদের কাছেও বিভিন্ন ব্যাখ্যা আছে, ধর্মের আবার নিজের নিজের ব্যাখ্যা আছে। বেদে আমরা যা অধ্যয়ণ করছি এটাই হিন্দু ধর্মের মূল ভাব, শুধু হিন্দুদেরই মূল নয়, ভারতে যে চারটি মূল ধর্ম, হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ও শিখ, এই চারটি ধর্মের কিছু কিছু জিনিসে ওই একই ভাব থেকে যায়। যেমন চারটি ধর্ম, জ্ঞান লাভের দ্বারা মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত জন্ম আর মৃত্যুর এই খেলা চলতে থাকবে, এই ভাব ধরে রেখেছে। শুধু মুক্তির ব্যাখ্যা এক এক ধর্মে এক এক ভাবে করছে এবং মুক্তি লাভের পথটাও আলাদা।

যে কোন মানুষের জ্ঞান তিন ভাবে আসে। একটা হল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, ইন্দ্রিয়ে দিয়ে জগতের একটা ধারণা তৈরী হয়। বস্তুবাদীরা ও বিজ্ঞানীরা ইন্দ্রিয়ের উপরই বেশি নির্ভর করে, আমি ইন্দ্রিয় দিয়ে যা কিছু অনুভব করছি এই অনুভবের বাইরে আমি যাব না। হিন্দুরাও তাই বলে, প্রত্যক্ষ আমি যা কিছু জানছি একে কোন দিন প্রশ্ন করা যাবে না। কিন্তু ইন্দ্রিয়ের উপরেও একজন আছে, সে হল বুদ্ধি। যুক্তি বিচার দিয়ে আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা যদি কোন কারণে প্রত্যক্ষকে বাতিল করে তাহলে কিন্তু যুক্তিতর্ক দিয়ে যেটা পাওয়া যাচ্ছে সেটাকে বেশি মানব। যেমন দুটো ট্রেন পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে, একটা ট্রেনে আমি বসে আছি। হঠাৎ আমার পাশের ট্রেনটা চলতে শুরু করল, আমি দেখছি আমার ট্রেনটা উল্টো দিকে চলতে শুরু করে দিয়েছে, বাচ্চারা তাই দেখবে। ইন্দ্রিয় দিয়ে তার কাছে যে জ্ঞান আসছে, এটাই মিথ্যা জ্ঞান। যুক্তি দিয়ে তখন বাচ্চাকে বোঝান হয়। আমাদের সবারই জীবন এই দুটো জ্ঞানের মধ্যেই ঘুরপাক খায়, একটা প্রত্যক্ষ প্রমাণ আরেকটা অনুমান প্রমাণ। কিন্তু তৃতীয় যে জ্ঞান, স্বামীজী যাকে বলছেন intuitive জ্ঞান, এর থেকে নীচে যেটা পশুপাখীদের ক্ষেত্রে হয় তাকে বলছেন instinct জ্ঞান, পশুরা সহজাত জ্ঞানের উপরেই চলে। সহজাত জ্ঞান হল সবার নীচে, এর উপরে হয় প্রত্যক্ষ প্রমাণ, তারও উপরে অনুমান, অনুমান হল একটা শাস্ত্রীয় পরিভাষা যার অর্থ যুক্তিতর্ক। কিন্তু যখন intuitive knowledge আসে, অর্থাৎ ধ্যান ধারণা করে নিজেকে পবিত্র করা হল, এই পবিত্রতা যখন হয় তখন কিছু জ্ঞান আসে। যুক্তিতর্ক দিয়ে ওই জ্ঞানকে কেউ কোন দিন স্থাপিত করতে পারবে না। একটা জিনিসের যেটা সত্য সেই সত্যকে সত্য একমাত্র ঋষিরাই বলতে পারেন। যে কেউই যদি মন থেকে সব রকম

কামনা বাসনাকে সরিয়ে দেয় তার সাথে ধ্যান ধারণা করে তারও মধ্যে ওই ক্ষমতাটা চলে আসবে। এই ক্ষমতা সবারই মধ্যে আছে, এটাই intuitive wisdom। এই সত্যগুলোকে সংগ্রহ করে যেখানে লিপিবদ্ধ করা হয় তখন তাকেই বলা হয় শাস্ত্র, শাস্ত্র মানেই collection of intuitive wisdom। কিছু কিছু জায়গায় যদি কোথাও ফাঁক থেকে যায় তখন ওই জায়গাতে ওনারা যুক্তি দিয়ে বা কল্পনা করে মিলিয়ে দেন। শাস্ত্র তৈরী হয় ঋষির ধ্যানের গভীরে যে সত্যগুলোকে প্রত্যক্ষ করেছেন সেই সত্যের বর্ণনা দিয়ে। এখানে যে কোন যুক্তিতর্ক আছে বা প্রত্যক্ষ প্রমাণাদি আছে তা কখনই থাকবে না, এনারা তাই এর একটা নাম দেন অপরোক্ষানুভূতি, এই জ্ঞান প্রত্যক্ষ ভাবে আসেনি তাহলে পরোক্ষ হবে, কিন্তু এই জ্ঞান পরোক্ষ ভাবেও আসেনি, এই জ্ঞানকে ঋষিরা সাক্ষাৎ করেন, কিন্তু দেখেন না, অনুভব করেন। সেইজন্য বলছেন অনুভূতি। এই অনুভূতি প্রত্যক্ষ মানে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দ্বারা হয়নি, আর পরোক্ষ মানে অন্য ভাবে আসছে না, একেবারে সরাসরি আসছে সেইজন্য এর নাম হল অপরোক্ষানুভূতি। বেদে আমরা যা কিছু পাই সবটাই অপরোক্ষ জ্ঞান।

ঋষিদের অপরোক্ষ জ্ঞান হল, সৃষ্টি ভগবান করেছেন। শুধু ভগবান করেছেন তা নয়, ভগবানই সব কিছু হয়েছেন। ভগবান সব কিছু হয়েছেন এই সত্যকে এখন মানুষের কাছে ধারণা করার জন্য দিতে হবে। যদিও কথামৃতে ঠাকুর তাঁর অনেক ধরণের অনুভূতির বর্ণনা আমাদের জন্য রেখে গেছেন আর সেখানে কোন ফাঁক রেখে যাননি। কিন্তু বেদের ঋষিরা সারা জীবনে চার পাঁচটি তত্ত্বকে আবিষ্কার করলেন, তারপর নিজের শিষ্যকে বলে দিলেন, তাঁর শিষ্য সে হয়তো খুব উচ্চমানের কিন্তু গুরুর মত নয়, কিন্তু পরে তাঁদের যে শিষ্যরা এলেন, তাঁরা দেখলেন গুরুর এই তত্ত্বটা হারিয়ে যেতে পারে সেইজন্য তিনি ছন্দোবদ্ধ করে প্রার্থনাকারে পুরুষসূক্তমের মত সূক্তে দাঁড় করিয়ে দিলেন। তাঁরা তখন সাধারণ লোকেদের এই উচ্চতত্ত্বকে বোঝাবার জন্য কিছু কিছু উপমা নিয়ে এলেন। পরে আমাদের মত মুর্খরা উপমাকেই সত্য রূপে গ্রহণ করে মূল তত্ত্ব থেকে সরে এল। ফলে তত্ত্বটা গেল হারিয়ে, রয়ে গেল উপমা। ধর্ম মানে তাই, আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে কোন ঋষি যে অবদান রেখে গেলেন তার সাংঘাতিক মূল্য। কিন্তু ধীরে ধীরে বাইরের খোলসটা থেকে যায় কিন্তু ভেতরের জিনিসটা হারিয়ে যায়। কারণ ভেতরের আসল জিনিসটাকে ধরে রাখার জন্য যে সাধনার দরকার সেই সাধনা নেই। যিনি দেখেছিলেন ঈশ্বরই সব কিছু হয়েছেন, তিনি তাঁর শিষ্যকে বললেন। শিষ্য খুব কৃতাঞ্জলী হয়ে গ্রহণ করে নিজেকে ধন্য মনে করল। শিষ্যের যে শিষ্য সে দেখল খুব সুন্দর জিনিস, সে তাড়াতাড়ি সেটাকে ছন্দোবদ্ধ করে দিল যাতে মানুষ সহজে ভুলে না যায়। কারণ মানুষ তাল ও ছন্দ যুক্ত কবিতাকে সহজে মনে রাখতে পারে। একবার ছন্দোবদ্ধ হয়ে যাওয়ার খুব দাম হয়ে গেল, এরপর গুরু পরম্পরায় চলতে থাকল। ব্রাহ্মণরা মুখস্ত করে যেতেন কিন্তু এর কি অর্থ, কি বলতে চাইছে, এর পেছনে আধ্যাত্মিক সত্যট কি বোঝার সেই চেষ্টাটা হারিয়ে যায়। মূল বক্তব্য হল, হয় আপনি বলুন তিনিই সব কিছু সৃষ্টি করেছেন, তাই সব কিছুতে একটা একতা আছে, আর নয়তো বলুন আসলে তিনিই সব কিছু হয়েছেন, সব কিছুই একটা একত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে। এই ব্যাপারটা হারিয়ে গেল। সেখান থেকে এই ভাব এল যেটা আমরা নয় নম্বর মন্ত্রে ব্যাখ্যা করলাম। দশম মন্ত্রে বলছেন –

তস্মাদশ্বা অজায়ন্ত যে কে চোভয়াদতঃ।
গাবো হ জজ্ঞিরে তস্মাৎ তস্মাজ্জাতা অজাবয়ঃ।।১০/৯০/১০(ঋ)

ঐ যে অধিপুরুষ, যাঁকে যজ্ঞে বলি দেওয়া হয়েছে, সেখান থেকে এবার জন্ম নিল ঘোড়া। *তস্মাদ* মানে সেটা থেকে। কোন সেটা থেকে? এর আগেই আমরা বললাম, কবে কোন ঋষি একটা আধ্যাত্মিক সত্যকে দেখেছেন, সেটাকে তাঁর শিষ্যরা ছন্দোবদ্ধ করেছেন। তারও হাজার বছর পর একজন ভাষ্যকার এসে তার উপর ভাষ্য লিখছেন। স্বাভাবিক ভাবেই অনেক ফাঁক তৈরী হয়ে যাবে। ভাষ্যকাররা মূল তত্ত্বকে আর মন্ত্রের যে শব্দ তার অর্থের সাথে মিলিয়ে একটা সামঞ্জস্য তৈরী করে পুরো বক্তব্যটা একটা সামগ্রিক যৌক্তিকতার মধ্যে রাখার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাও কারুর কারুর মত হল ভগবান থেকেই সব সৃষ্টি। অন্য দিকে বেদের মূল হল যজ্ঞ, যজ্ঞই বেদের শেষ কথা। তাই এখানে বলছেন যজ্ঞ থেকে সৃষ্টি হল। কাদের সৃষ্টি হল? *যে কে চোভয়াদতঃ*, এমন সব প্রাণীর সৃষ্টি হল যাদের দুটি করে চোয়াল, মানে ঘোড়া, ভেড়া, ছাগল ও গরু।

তস্মাদশ্বা অজায়ন্ত, এতে খুব মজার ব্যাপার আছে। ভারতে দুই ধরণের খুব নামকরা পণ্ডিত আছেন। একটা হল বৃটিশ পণ্ডিতরা, বৃটিশরা আমাদের উপর রাজ করছে তখন। তারপর এল মার্ক্সিস্ট পণ্ডিতরা। বৃটিশ পণ্ডিতরা দেখাতে চাইছেন ভারতভূমি চিরদিনই বাইরে থেকে আসা লোকেদের আধিপত্য করার ভূমি। এখানে বাইরে থেকে যারা আসবে তারাই ভারতে আধিপত্য করবে আর সেই রাজা হবে। বৃটিশরাও বাইরে থেকে এসেছে তাই তারা এখন রাজা। হিন্দুদের বলে দিল, তোমরাও বাইরে থেকে এসেছ। তোমরাও বাইরে থেকে এসে এখানকার লোকদের মেরে কেটে এতদিন রাজ করে গেছ। এরপর মার্ক্সিস্ট ঐতিহাসিক পণ্ডিতরা এলেন, তাঁদের কাছে শ্রেনী-সংগ্রাম ছাড়া কিছু নেই, সব কিছুতেই তাঁরা শ্রেনী-সংগ্রাম দেখেন। মার্ক্সিস্টদেরও দেখাতে হবে হিন্দুরা বাইরে থেকে এসেছে। আমরা সবাই বাচ্চা বয়স থেকে জেনে এসেছি, হিন্দুরা হল আর্য, আর্যরা মধ্য এশিয়া থেকে ভারতে এসেছে। তাদের কাছে সব থেকে প্রামাণিক বস্তু হল এই অশ্ব। বলে দিল ভারতে কোন সময়ই ঘোড়া ছিল না, ঘোড়া মধ্য এশিয়ার পশু, এরা যখন ভারতে এসেছিল তখন সব ঘোড়ার পিঠে করে এসেছিল, সেই থেকে এদের ঘোড়ার প্রতি বিশেষ আকর্ষণ। সেইজন্য এখানে বলছেন *তস্মাদশ্বা অজায়ন্ত*। পুরুষসূক্তমে একটা অশ্ব শব্দ এসেছে সেখান থেকে একটা থিয়োরী দাঁড় করিয়ে দিল আর্যরা বাইরে থেকে এসেছিল। বেদের আরেকটা শব্দ পুরুন্দর, পুরন্দর মানে যিনি শহর নাশ করেন, ইন্দ্রের এক নাম পুরন্দর, ইন্দ্র এক রাজা ছিল, সে বাইরে থেকে তার লোকজনদের নিয়ে এসে সিন্ধুঘাটির সবাইকে মেরে শেষ করে রাজত্ব করতে শুরু করে দিল। আমরাও মুর্খ বলে এদের কথা মেনে এসেছি। অনেক পরে দেখা গেল ব্যাপারটা তা নয়। পরে সিন্ধুঘাটিতে কোন মৃতদেহের হাড়গোড় কিছুই পাওয়া গেল না। এত লোককে যে মারা হল এদের মৃতদেহগুলো তাহলে কোথায় গেল? অনেক খোঁজাখুজি করে কোথাও একটা হাড়ের টুকরো পাওয়া গেল না। বোঝা গেল যে কোন মারামারিই হয়নি। প্রাকৃতিক কোন পরিবর্তনের কারণে ওখানকার বাসিন্দারা অন্য দিকে সরে গিয়েছিল। পুরো থিয়োরী এখন পাল্টে গেছে। কিন্তু গত দুশ বছর ধরে আমরা এই থিয়োরীকে মাথায় বসিয়ে রেখেছি। এখন আবার নতুন করে সমস্যা এসেছে, আর্যরা তাহলে কোথা থেকে এসেছে? কোথা থেকে আসবে মানে? কোথাও তো বর্ণনা নেই যে আর্যরা বাইরে থেকে এসেছে। স্বামীজী বলছেন, বেদের কোথাও নেই যে আমরা বাইরে থেকে এসেছি।

গাবো হ জজ্ঞিরে তস্মাৎ, ওই যজ্ঞ থেকে গরুর জন্ম হল আর *তস্মাজ্জাতা অজাবয়ঃ*, অজা মানে ছাগল, ছাগলের জন্মও সেই যজ্ঞ থেকে হল। আগে বললেন বায়ুর যত পাখি, অরণ্যের যত পশু, গৃহের যত পশু সব এই যজ্ঞ থেকে সৃষ্টি হয়েছে। এটাকেই আবার পুনরাবৃত্তি করে বলছেন, ঘোড়া, গরু, ছাগল সব যজ্ঞ থেকে সৃষ্টি হল। কোন কোন ভাষ্যকাররা আবার বললেন এগুলো যজ্ঞের জন্যই সৃষ্টি হয়েছে। কারণ অশ্বমেধ যজ্ঞে ঘোড়া লাগে, গরু থেকে যে দুধ ঘি হয় সেটাও যজ্ঞে দরকার হয় আর যজ্ঞে বলি দেওয়ার জন্য ছাগল দরকার। এখানে গরুকে বিশেষ কোন স্থান দেওয়া হয়নি, অন্য সব পশুর মতই গরুরও জন্ম হয়েছে। কিন্তু পরের দিকে বিশেষ করে পৌরাণিক সাহিত্যে গরুকে একটা বিশেষ স্থান দেওয়া হয়েছে। তখনকার দিনে মানুষের জীবনে গরুর বিশেষ মূল্য ছিল, গরুর দুধ ঘি যেমন প্রয়োজনীয় বস্তু অন্য দিকে চাষবাসের জন্যও গরুই ছিল সম্বল। কিন্তু কোন কারণে একটা সময় চাষবাসের জন্য গরুর আকাল হয়ে গিয়েছিল। তখন গরুকে মা, দেবী বানিয়ে গরুর সংরক্ষণের উপর জোর দেওয়া হয়েছিল। বেদে কিন্তু গরুকে বিশেষ কোন মাহাত্ম্য দেওয়া হয়নি, কারণ ছাগলের যেখান থেকে জন্ম গরুরও সেখান থেকে জন্ম হয়েছে। এ পর্যন্ত সব ঠিকঠাক চলছে, কারুর মনে কোন প্রশ্ন নেই। কিন্তু কোন শিষ্যের মনে প্রশ্ন আসতে পারে, একাদশ মন্ত্রে সেই প্রশ্নকে রেখে বলছেন –

যৎপুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্।
মুখং কিমস্য কৌ বাহূ কা ঊরূ পাদা উচ্যেতে।।১০/৯০/১১(ঋ)

ভগবান তিনি তো ছোট্টখাট্ট মানুষ নন, তিনি বিরাট। কারণ আগেই বলে দিয়েছেন *তস্মাদ্বিরাডাজয়ত*। একাদশ মন্ত্রে শিষ্য গুরুকে জিজ্ঞেস করছেন, *যৎপুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্*, এই যে যজ্ঞ হল, যজ্ঞে এই যে বলি দেওয়া হল, সেই আদি পুরুষকে কিভাবে বলি দেওয়া হয়েছিল, তাঁকে কটি টুকরো করা হয়েছিল?

সেখান থেকে আর কি কি জিনিসের উৎপত্তি হল, যেগুলো উৎপন্ন হল তাদের আকার কি রকম হল? সেই পুরুষের হাতগুলো কি হল, তাঁর মুখ কি হল, তাঁরা উরু, পা এগুলোর কি অবস্থা হল? যে কোন জীবন্ত জিনিসের এ কটি জিনিস থাকবে। খুব সাধারণ প্রশ্ন, পুরুষকে বলি দেওয়ার পর তাকে যে ভাবে টুকরো করা হয়েছিল, সেই টুকরো থেকে কি কি সৃষ্টি হল সেটাকে বিস্তার করে বলার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। এখানেই বেদের সব থেকে বিতর্কমূলক একটি মন্ত্র এসেছে। এই একটি মন্ত্রকে নিয়ে আম্বেদকর থেকে শুরু করে নেতা, রাজনীতিবিদরা এখনও চেঁচামেচি করে যাচ্ছেন। কিছু দিন আগেও একটা গোষ্ঠি থেকে দাবী তোলা হয়েছে পুরুষসূক্তমের যত কপি আছে সব কপিকে জ্বালিয়ে দিতে হবে। এটিই সেই বিখ্যাত দ্বাদশ মন্ত্র –

ব্রাহ্মণোহস্যমুকমাসীৎ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
ঊরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পড্ভ্যাগং শূদ্রো অজায়ত।।১০/৯০/১২(ঋ)

সেই আদি পুরুষ, যাঁকে বলি দেওয়া হল, তাঁর মুখ থেকে ব্রাহ্মণের জন্ম হল, তাঁর বাহূ থেকে ক্ষত্রিয়ের জন্ম হল, যদিও ক্ষত্রিয় শব্দটা বলা হয়নি, এখানে বলা হয়েছে *রাজন্যঃ, রাজন্যঃ* বলতে বোঝায় যারা রাজ কর্ম করেন। সেই পুরুষের ঊরূ থেকে বৈশ্যদের জন্ম হল। আর তাঁর পা থেকে শূদ্রের জন্ম। যারা জাতিপ্রথার কঠোর সমালোচক তারাই এই মন্ত্রের খুব নিন্দা করেন। এদের মূল বক্তব্য পুরুষসূক্তম্ ব্রাহ্মণদের বড় করেছে যেহেতু তারা পুরুষের অর্থাৎ ভগবানের মুখ থেকে উৎপন্ন হয়েছেন। যেহেতু সেই পুরুষের পায়ের থেকে শূদ্রের জন্ম হওয়ার কথা বলেছে তাই শূদ্রকে ছোট করা হয়েছে। এটা গেল পুরুষসূক্তমের সমালোচনার একটা দিক। দ্বিতীয় যেটা তারা সমালোচনা করে তা হল – পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা মনে করে বৈদিক যুগে কোন ধরণের জাতিপ্রথা ছিল না, এখানে যে চারটে বর্ণের কথা বলা হয়েছে, এই চারটে বর্ণ নাকি বেদের সময়ে ছিল না। তার মানে চারটে বর্ণকে যে মন্ত্র উল্লেখ করছে, নিশ্চয়ই সেই মন্ত্র পরে রচনা করে ঋগ্বেদের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। ব্রাহ্মণরা নিজেদের বড় করার জন্য পুরুষসূক্তম্ রচনা করে ঋগ্বেদের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে। এখানে জাতিপ্রথা নিয়ে ছোট্ট কয়েকটা কথা আমরা বলতে পারি।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা বলছেন পুরুষসূক্তমে পরিষ্কার চারটে বর্ণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য আর শূদ্রের কথা আনা হয়েছে। কিন্তু পরের দিকে পণ্ডিতরা বললেন এই শব্দগুলো আগেও বেদে ছিল, ব্রাহ্মণ শব্দতো অবশ্যই ছিল, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য আর শূদ্র আকারে ইঙ্গিতে ছিল। দ্বিতীয় কথা, তর্কশাস্ত্রে একটা নামকরা কথা আছে absence is never a proof, একটা জিনিসের উল্লেখ নেই তার মানে ওটা নেই, এই জিনিস কখন হয় না। যদি উল্লেখ করা থাকে তাহলে ওটাই প্রমাণ, কিন্তু যদি উল্লেখ করা না থাকে যেমন বলছে শূদ্র শব্দ বেদে কোথাও আসেনি, তার মানে এই নয় যে তখন শূদ্র ছিল না, যদি উল্লেখ থাকে তাহলে প্রমাণ করছে যে শূদ্র ছিল। পরবর্তি কালে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র শব্দগুলো কোথা থেকে এসেছে কারুর জানা নেই। কিন্তু একটা আমাদের জানা আছে, যেটা পুরাণাদিতে বার বার বলছেন সত্যযুগে একটাই বেদ আর একটাই বর্ণ ছিল, সবাই সব রকমের কাজ করতেন। বেদেই আবার একটা মন্ত্রই আছে যেখানে বলছেন আমার বাবা ব্রাহ্মণ আর আমার মা দাসীর কাজ করেন, আমার ভাই বৈশ্যের কাজ করে। বেদের বেশির ভাগটাই পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা নিজেদের মত অনুবাদ করেছেন, তার থেকেও বড় ব্যাপার তারা সব সময় বেদকে কবিতা রূপে দেখেছেন। বেদের সব কিছুই হল আধ্যাত্মিক সত্য, এগুলোকে কবিতা রূপে দেখাটাই ভুল। ম্যাক্সমূলার বলছেন, বেদের কবিরা মাঝে মাঝে কোথায় উপরে উঠে চলে যেতেন, সেখানে গিয়ে এই কবিতাগুলো রচনা করেছেন। কিন্তু তা নয়, ঋষিরা উপরেই ছিলেন, মাঝে মাঝে সেখান থেকে নেমে এই কথাগুলো বলে গেছেন। যেমন স্বামীজীর রচনাবলী পড়ার পর কেউ যদি বলে স্বামীজী কি সুন্দর লেকচার দিতেন, এর মধ্যে কয়েকটি কথা কি ভালো বলেছেন। কিন্তু তাতো নয়, স্বামীজী সমাধিবান পুরুষ, সমাধিবান পুরুষ যা কিছু বলেন সেটাই ধর্ম। কোথাও কোথাও স্বামীজীর ভাষা খুব সুন্দর, কোথাও আবার ভাষা খুব সাধারণ। এটা যদি কেউ না বুঝতে পারে ধর্ম তার জন্য নয়।

আগেকার দিনে যা ছিল, যেটা আমরা এখন আন্দাজে বলতে পারি কারণ কোন প্রমাণই এখন নেই, বেদ ছাড়া সেই সময়কার কোন সাহিত্যই নেই। কিন্তু কিছুটা অনুমান ও পৌরাণিক সাহিত্যের বর্ণনাকে আধার

করে যেটা পাওয়া যায় তা হল সেই সময় ওনাদের কাছে আর্য আর অনার্য এই দুটো শ্রেনী ছিল। অনার্যদের একটা সময় বলা হত অন্ত্যজ। ভারতবর্ষে দুই শ্রেনীর মানুষ, একটা শ্রেনী হল যারা চাইছে আমাকে আধ্যাত্মিক জীবনে উপরে উঠতে হবে, আরেকটা শ্রেনীর এই ব্যাপারে কোন আগ্রহ নেই। এনারা এদের একটা শ্রেনী করে দিলেন অন্ত্যজ, তোমার যা করতে ইচ্ছে হবে তুমি তাই কর, খাও পিও মৌজ কর, আমার কাছে আসবে না। অন্ত্যজদের কেউ যদি এদিকে ঢুকতে চায় কোন দিন ঢুকতে দেবে না। একটা সময় কোন একজন অন্ত্যজ এই গ্রুপে চলে এসেছিল, যে বলছে আমি ঈশ্বরের পথে যেতে চাই, সেখানে আবার চারটে শ্রেনী হয়ে গেল। একটা হল যাঁরা সম্পূর্ণ ভাবে পবিত্র জীবন-যাপন করে যাচ্ছেন আর বিদ্যা চর্চা ছাড়া আর কিছু করতেন না, দ্বিতীয় যাদের মধ্যে খুব সক্রিয় ভাব, ক্ষমতা অর্জন করতে চাইছে, অপরের জন্য প্রাণ দিতে চায়, তৃতীয় হয়ে গেল যারা সমাজের আর্থিক লেনদেনকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে আর শেষের এরা বলছে ভাই আমার দ্বারা এই কাজগুলো হবে না, সবার সেবা করার জন্য যতটুকু কাজ করা দরকার সেই কাজটুকু আমি করে দেব। এই চারটে শ্রেনীই inter changeable ছিল। এইভাবে চলতে চলতে কোন একটা জায়গায় থেকে এই সিস্টেমটা crystalised করতে শুরু করল। যেমন ডাক্তারের ছেলে বাড়িতে বাচ্চা বয়স থেকেই রোগী, ওষুধ, চিকিৎসা দেখে আসছে, ওর পক্ষে মেডিকেল লাইনে যাওয়াটা সব সময় সহজতম হবে। কিন্তু তাই বলে ডাক্তারের ছেলে ইঞ্জিনিয়ার হতে পারবে না তা নয়, অবশ্যই হতে পারবে। ইঞ্জিনিয়ারের ছেলেও ডাক্তার হতে পারবে। কিন্তু যে পেশার পরিবেশে বড় হচ্ছে সেই পেশার লাইনে যাওয়াটা সহজ হবে। যে কোন সমাজে যে কোন প্রথাকে দাঁড় করানো হোক না কেন প্রথাতেই কিছু না কিছু দোষ থাকবে। এনারা দেখলেন আমরা যদি এই জিনিসটাকে বংশগত করে দিই তাহলে যে কোন প্রথা থেকে এই প্রথা কম দোষযুক্ত হবে। তাহলে freedom এর ব্যাপারে কি হবে? Freedom চিরকালই ছিল, আমরা এটা মানি না আর জানিও না। শূদ্রকে ব্রাহ্মণ কখন করত না ঠিকই, কিন্তু শূদ্র যদি টাকা-পয়সা লেনদেনের কাজে ঢুকে গিয়ে বৈশ্য হতে চাইত তারা তা হতে পারত। আর শূদ্রদের ক্ষত্রিয় করা দেওয়াটা ভারতের ইতিহাসে আগাগোড়াই হয়ে এসেছে। রাজস্থানে রাজপুতদের ইতিহাস তো রহস্যে হারিয়ে গেছে। বলা হয় রাজপুতরা আসলে কোন দিনই ক্ষত্রিয় ছিল না, বেশির ভাগই এরা আদিবাসী ছিল। কিন্তু কোন একটা সময়ে এদের ক্ষমতা আর ধর্মের প্রতি নিষ্ঠা দেখে সবাইকে ক্ষত্রিয় করে দেওয়া হয়েছিল। রাজস্থানে এখনও অনেকে মনে করে রাজপুত বলে কোন জাত হয় না। কিন্তু রাজপুতরা তাহলে এলো কোথা থেকে? কোন জিনিসকে মান্যতা দিতে গেলে একটা কাহিনী দাঁড় করাতে হবে। এখানেও তারা একটা কাহিনী বানিয়ে দিয়েছে।

আমরা যদি মেনে চলি বেদের সময় একটি বর্ণই ছিল, তাহলে চারটি বর্ণ কোথা থেকে এল? ব্যাপারটা তেমন কিছু নয়, এনাদের কাছে ছিল যারা বুদ্ধির কাজ করবে তারাই ব্রাহ্মণ, যাদের শক্তি আছে, ক্ষমতা আছে, যুদ্ধ করছে, অপরের প্রাণ রক্ষা করছে তাদের নাম দিল ক্ষত্রিয়। বুদ্ধি যাদের বেশি তারাই রাজ করে, তাই স্বাভাবিক ভাবে ব্রাহ্মণরা শ্রেষ্ঠ। কিন্তু অস্ত্র ক্ষত্রিয়দের হাতে, অস্ত্র তারা ছাড়বে না, সেইজন্য ক্ষত্রিয় আর ব্রাহ্মণের লড়াই চিরকলই ছিল। আবার যার কাছে টাকা আছে সে অন্য দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ। হিন্দু সমাজ দাঁড়িয়ে আছে যজ্ঞের উপর, যজ্ঞের মুঠোটা ধরা আছে ব্রাহ্মাণদের কাছে, তাই ব্রাহ্মণরা হয়ে গেলেন শ্রেষ্ঠ। কিন্তু যাদের টাকা নেই, তলোয়ার নেই, বুদ্ধি নেই, এদের কি হবে? এরাও তো ধর্মের পথে যেতে চাইছে। এরা থেকে গেল সবার নীচে। কিন্তু বেদ তাদেরকে নিম্ন বলছেন না, বেদ বলছেন চারটে বর্ণ ঈশ্বর থেকেই সৃষ্টি হয়েছে, শূদ্রও ঈশ্বরেরই রূপ। এখানে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, শূদ্র নিকৃষ্ঠ এভাবে বলছেন না, পুরুষসূক্তমের একেবারেই এই বক্তব্য নয়। বলতে চাইছেন, তুমি যে শূদ্রকে নিকৃষ্ঠ মনে করছ, এই রূপটাও ভগবানেরই রূপ। পুরুষসূক্তমে বলছেন পজিটিভে আর এর ব্যাখ্যা করছে নেগেটিভে, এগুলোই পলিটিক্স। আমেরিকাতে নিগ্রোদের কোন অধিকারই ছিল না। হোটেলে ঢুকতে পারবে না, সেলুনে যেতে পারবে না, কত রকম অধিকার থেকে নিগ্রোরা বঞ্চিত ছিল বলতে গেলে বিরাট লম্বা লিস্ট হয়ে যাবে। পরে এব্রাহাম লিঙ্কনরা নিগ্রোদের জন্য অধিকার নিয়ে এলেন। ভারতে এভাবে কখনই নেওয়া হয়নি, সামাজিক আচার আচরণে কিছুটা ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী ছিল কিন্তু আধ্যাত্মিকতার দৃষ্টিতে একেবারে পরিষ্কার বলে দিচ্ছেন, দেখো ভাই, ব্রাহ্মণও ভগবানেরই রূপ আর শূদ্রও ভগবানেরই রূপ।

এটাই বেদের অন্য মন্ত্রে বলছেন *ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমান্ অসি ত্বং উত বা কুমারী*, হে প্রভু তুমিই সেই নারী, তুমি সেই পুরুষ, তুমিই সেই কুমার আর তুমিই সেই কুমারী। *ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ*, বৃদ্ধ লাঠি হাতে স্খলিত পদে চলছে সেটাও তুমি। এটাই ঠিক ঠিক ভারতের আদর্শ। ভগবান ছাড়া কিছু নেই আর ভগবানই সব কিছু হয়েছেন।

শুধু মাত্র পুরুষসূক্তমের মধ্যেই নেই, বেদের অন্যান্য জায়গায়ও জাতি হিসেবে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের কথা উল্লেখ আছে। বেদ সম্বন্ধে আলোচনার শুরুতে যজুর্বেদের একটা মন্ত্রের উল্লেখ করা হয়েছিল, সেই মন্ত্রে এই চারটে জাতির কথা বলা আছে। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল, কোন সমাজ ব্যবস্থায় একটা শ্রেণী যখন বিশেষ সুযোগ সুবিধা নিতে শুরু করে, আর এই সুযোগ সুবিধা নেওয়াটা যদি দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকে এবং একটা শ্রেণীর উপর শোষন নিপীড়ন চলতে থাকে তখন সমাজের মধ্যে একটা উচ্চ-নীচ ভেদের মনোভাব জন্ম নেয়। যে কোন সমাজে শোষক ও শোষিত থাকলে সেই সমাজে উচ্চ-নীচ ভেদাভেদের মনোভাব আসবেই আসবে।

ভগবানের কোন অঙ্গ ভগবান ছাড়া হতে পারে কি? সহজ উপমা নেওয়া যেতে পারে। মনে করা যাক একটা চিনির পুতুল বানান হল, আর চারজনকে এই চিনির পুতুল খাওয়ার জন্য বলা হল। একজন মুণ্ডুটা নিল, একজন হাতটা নিল, একজন ঊরুর অংশটা নিল আরেকজন পায়ের অংশটা নিল। এখন এই চারজন কি কোন আলাদা জিনিস পেল? একজনের অংশ তেতো, আরেকজনেরটা মিষ্টি, অন্যজনেরটা নোনতা আর চতুর্থজনেরটা কি ঝাল লাগবে খাওয়ার সময়? যে পায়ের দিকটা পেয়েছে সে যদি যে মাথা পেয়েছে তার সাথে মারামারি শুরু করে – তুমি কেন মাথা নিলে আমাকে কেন পা দিলে? এর কি কোন সমাধান আছে? সবটাই তো চিনি। আচ্ছা, এবার এই চারজনের প্রত্যেককে এক কাপ করে চা দেওয়া হল। যে মাথা পেয়েছিল সে মাথাটা চায়ের কাপে ফেলে দিল, যে পা পেয়েছিল সে সেই পা চায়ের কাপে মিশিয়ে দিল, এখন এদের একজনের চা ঝাল আরেকজনের চা কি তেতো হবে? সবার চা মিষ্টিই হবে। কিন্তু এরা যদি মাথা, পা, হাত নিয়ে মারামারি শুরু করে দেয় – আমি কেন প্রত্যেক দিন চিনির পা পাব, মাথা কেন পাবো না? এই ধরণের ছেলে মানুষী কথার কি কোন সদুত্তর আছে? পুরুষ, যিনি সচ্চিদানন্দ, যিনি নারায়ণ, যিনি নিরাকার তাঁর মাথা আর পায়ের মধ্যে কি কোন তফাৎ করা যায়? এই সাধারণ ব্যাপারটা আমাদের দেশের নেতারা কিছুতেই বুঝতে পারল না। চিনির পুতুলের মাথা আর পায়ের মিষ্টত্বের পার্থক্যটা বাস্তবে না থাকলেও আমাদের দেশের বরেণ্য অগ্রগণ্য কিছু নেতাদের মাথার মধ্যে পার্থক্যটা বসে আছে। এখন যদি উল্টোটা হত, ব্রাহ্মণরা যদি বড় না হয়ে শূদ্ররা বড় হয়ে যেত তখন জিনিসটা অন্য রকম হয়ে যেতে। এরা পা আর মাথাকে কেন ছোট বড় করছে? কারণ আমার যে মাথা মানে আমার যেটা বড় জিনিস সেটা আমার থেকে যিনি বড়, জেষ্ঠ্য, শ্রেষ্ঠ তাঁর পায়ে গিয়ে পড়ছে। এখন যদি মনে করি পা একটা নীচের জিনিস সেখানে গিয়ে আমার মাথাটা পড়ছে, এটাতো আমার চিন্তা। কিন্তু একজন প্রতিবন্ধীর কাছে তার পা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা মনে করি মাথাতে চিন্তা হয়, মাথাতে বুদ্ধি আছে তাই মাথা পায়ের থেকে বড়। এগুলোই বালবুদ্ধির পরিচয়। কিন্তু আসল সমস্যার জন্ম হয়েছে শোষন আর নিপীড়ন থেকে। যে শোষিত হয়ে আসছে, যে নিপীড়িত হয়ে আসছে তাদের মধ্যে একটা ভুল ধারণা ঢুকিয়ে দেওয়ার ফলে এই মন্ত্রটি নিয়ে এত বিতর্কের জন্ম নিয়েছে। আসলে নারায়ণ যিনি, তাঁর শরীরের কোন অংশ থেকে কি সৃষ্টি হচ্ছে এটা কোন পার্থক্যই তৈরী করছে না।

কোনটা ঠিক আর কোনটা ঠিক নয় এই বিচার করতে আমরা এখানে আসিনি, পুরুষসূক্তমে কি আছে সেটাকে জানা আর তার দর্শনকে হৃদয়ঙ্গম করে মানব জীবনের উদ্দেশ্য পরম নিঃশ্রেয়সের দিকে এগিয়ে যাওয়াই আমাদের মূল লক্ষ্য। এখানে মূল কথা এই চারটি বর্ণই ভগবান থেকে সৃষ্টি হয়েছে। এই তত্ত্বই গীতায় ভগবান বলছেন – *চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ। তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্তারমব্যয়ম্।।* এই চারটি বর্ণ আমিই সৃষ্টি করেছি, আমার থেকেই এদের সৃজন হয়েছে। জগতে এমন কিছু নেই যেটা আমার থেকে আলাদা, যেটা আমার থেকে সৃষ্টি হয়নি। ঋষিরা ধ্যানের গভীরে এই সত্যকেই প্রত্যক্ষ করেছেন। কি সেই সত্য? ঈশ্বরের থেকেই সব হয়েছে, তিনিই সব কিছু হয়েছেন, যা কিছু আছে সব তিনি। ভগবানই যদি সব

কিছু হয়ে থাকেন তাহলে এর মধ্যে গ্রাহ্য ত্যাজ্য বলে কিছু থাকে না। যে বর্ণ ব্যবস্থা মানবজাতির মানসিক প্রবণতাকে সঠিক ও সফল রূপদান করার জন্য, এটাও তাঁরই সৃষ্টি। পুরুষসূক্তমের দ্বাদশ মন্ত্রের একটি অদ্ভূত বৈশিষ্ট্য হল, একদিকে ভারতবর্ষের নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণরা স্নানের সময় নিত্য পুরুষসূক্তম্ শ্রদ্ধা সহকারে পাঠ করবেনই অন্য দিকে বেদের সমালোচকরা এই মন্ত্রকে সব জায়গায় উল্লেখ করবেই করবে। খবরের কাগজে জাতিপ্রথার ব্যাপারে যখনই কিছু লেখা হবে এই মন্ত্রের উল্লেখ সেখানে থাকবেই থাকবে। বেদের আর কোন মন্ত্রকে নিয়ে এত বেশি বিপরীত অবস্থান দেখতে পাওয়া যাবে না।

আমরা এর আগেও বলেছি যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞান, যুক্তিতর্ক দিয়ে যে জ্ঞান আর intuitive জ্ঞান তিনটেই আলাদা। Intuitive জ্ঞান, ধ্যানের গভীরে বা সমাধি মন্দিরে যে জ্ঞান আসে, এই জ্ঞান যিনি পেয়েছেন তিনি যখন কোন কথা বলেন সেই কথা সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে না। আমেরিকাতে স্বামীজী যখন লেকচার দিতে শুরু করলেন তখন সেখানকার লোকেদের পক্ষে তাঁর কথাকে ধরা খুব মুশকিল ছিল। সেইজন্য তিনি জনসভায় ভাষণ দেওয়াকে গুটিয়ে এনে মুষ্টিমেয় বাছাই করা কয়েকজনকে নিয়ে ক্লাশ নিতে শুরু করলেন, যারা জিনিসটাকে বুঝতে পারবে। স্বামীজী এক জায়গায় বলছেন, যিনি যীশু তিনিও ভগবান আর যে জুডাস যে বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করেছিল সেও ভগবান। এটাই হিন্দুদের প্রধান বৈশিষ্ট্য, হিন্দুদের কাছে ভগবান ছাড়া কিছু নেই। আমি বুঝতে পারছি না, সেটা আমার বোঝার দোষ, আমি দেখতে পারছি না, আমার দৃষ্টির দোষ কিন্তু তাই বলে আদর্শকে কখনই নীচে নামিয়ে দেওয়া যাবে না। আদর্শকে যারাই নীচে নামিয়ে দেবে তাদের জীবন বলে আর কিছু থাকবে না, ওখানেই জীবন শেষ। হিন্দুদের কাছে একজন সাধু মহাত্মার যে রূপ সেই রূপও ভগবানের আর যে একজন খুনী সেই রূপও ভগবানেরই রূপ। অন্য ধর্মে এই কথা বললে ওরা আঁৎকে উঠবে। অথচ গীতায় ভগবান বলছেন *বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি। শুনি চৈব স্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ।।* ঠাকুর বলছেন, আমি দেখলাম কুকুর-কুকুরীর মৈথুনেও সেই ব্রহ্মজ্যোতি লক্ লক্ করছে। বাইরের লোকরা শুনলে বলবে, ছিঃ ঠাকুর এসব নোংরা নোংরা কথা বলেছেন! সেইজন্য আধ্যাত্মিকতা কখনই সাধারণ মানুষদের জন্য নয়। এরপর ত্রয়োদশ মন্ত্রে আবার অন্য জিনিসকে নিয়ে বলছেন –

চন্দ্রমা মনসো জাতঃ চক্ষোঃ সূর্যো অজায়ত।
মুখাদিন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ প্রাণাদ্বায়ুরজায়ত।।১০/৯০/১৩(ঋ)

পশুপাখিদের সৃষ্টি, বিভিন্ন বর্ণের মানুষ কিভাবে সৃষ্টি হল বলার পর এবার পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকে নিয়ে বলছেন। *চন্দ্রমা মনসো জাতঃ,* সেই পুরুষ, যাঁকে বলি দেওয়া হল, তাঁর মন থেকে চন্দ্রমার সৃষ্টি হল। এটি একটি কবিতা, মূল তত্ত্বকে এখন কবিতাতে পরিণত করা হয়েছে। ঋষিদের কাছে চন্দ্র আর সূর্য বিশালাকার বস্তু, সেইজন্য যে কোন ধর্ম শাস্ত্রে এই দুটো প্রচুর প্রাধান্য পেয়েছে। আমাদের এখানেও যখনই দেবতাদের দেখাতে হয় তখন এনারা এই চারটির মধ্যেই ঘোরাফেরা করেন – সূর্য, চন্দ্র, ইন্দ্র আর অগ্নি। কিন্তু এই সূর্য ও চন্দ্র আকাশের স্থুল সূর্য চন্দ্র নয়। এই সূর্য আর চন্দ্র হলেন দেবতা। আমাদের শরীরের পেছনে এক চৈতন্য জীব রয়েছেন, যেটাকে আমরা আসল আমি বলছি। ওনারাও ঠিক সেইভাবে বিশ্বাস করেন প্রত্যেকটি জিনিসের পেছনে একটা শক্তি আছে। আমরা যে সূর্যকে দেখছি এই সূর্যের পেছনেও একটা আধ্যাত্মিক সত্তা আছে, তাঁর নাম সুর্য দেবতা, চন্দ্রের পেছনেও একজন দেবতা আছেন যাঁর নাম চন্দ্র দেবতা। আমরা সূর্য চন্দ্রকে অতি সাধারণ কিছু ভেবে থাকি তাতে কিছু আসে যায় না। কারণ এনাদের কাছে ঈশ্বর ছাড়া কিছু নেই। যেখানে ঈশ্বরের বেশি প্রকাশ সেখানে আমরা তাঁকে দিব্য সত্তা রূপে দেখতে থাকব। আমাদের কাছে দেবতা বা ঈশ্বর হলেন একটা objective reality। এই গ্লাশ আমার সামনে যেমন আছে ভগবানও ঠিক তেমনি একজন কেউ আছেন। ভগবান এভাবে হন না। আমাদের মন দিয়ে যখন শুদ্ধ চৈতন্যকে দেখা হয় তখন আমার মন যে রঙে রাঙিয়ে আছে শুদ্ধ চৈতন্যকে ঠিক তেমনটি দেখাবে। মনের রঙ যদি পুরোপুরি সরে যায় তখন আমরা কিছুই দেখতে পারব না, তখন আমরা অনুভব করব। এখন আমাদের মনের রঙ হল সূর্য বিরাট একটা কিছু, সূর্যের জন্য আমাদের জীবন চলছে, সেইজন্য আমরা সূর্য দেবতাকে দেখছি, আসলে কিন্তু আমরা দেখছি সেই অনন্তকে। সেই অনন্তের সামনে সূর্য যখন আমার মনের রঙে রাঙিয়ে আসছে তখন দেখছি সূর্য

দেবতাকে। চন্দ্রমার ক্ষেত্রেও তাই, যিনি অনন্ত তাঁকে চন্দ্র দেবতা রূপে দেখছি। যখন মানুষ নিজের স্ত্রীর মধ্যে ভগবানকে দেখে তখন স্ত্রীকে চন্দ্রমুখী দেখে। যে জিনিসটা আমার ভালো লাগে সেটাকেই আমি ভালোবাসি, চৈতন্যকেও ওভাবেই দেখবে। ঠাকুর যখন অনন্তকে মা কালীর মাধ্যমে দেখছেন তখন দেখছেন মা কালীই অনন্ত। এরপর ঠাকুর বর্ণনা করছেন মা কালী তাঁর সাথে কথা বলছেন। আমরা ভাবছি মা কালীর যে রূপ সেই রূপে মা ঠাকুরের সাথে কথা বলছেন। আবার কখন অনন্তকে সচ্চিদানন্দ রূপে বর্ণনা করা হয়। বেদেও যখন সূর্য বা চন্দ্রমার বর্ণনা আসে তখন এই স্থূল রূপে বর্ণনা করা হচ্ছে না, সূর্য চন্দ্রকে দেবতা রূপে বর্ণনা করা হচ্ছে। আমরা হলাম সীমিত, সীমিত যখন অনন্তকে দেখে তখন সীমিতের সামনে যেন একটা কাঁচ লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। কাঁচ যেমনটি অনন্তকে তেমনটি দেখাবে। প্রেমিক প্রেমিকাকে অনন্ত রূপে দেখছে, প্রেমিকা প্রেমিকের মধ্যে অনন্তকে দেখছে। এই অনন্তকে কতটুকু আর দেখাবে, বিন্দু রূপেই দেখাবে। কিন্তু যখন সূর্য দেবতা রূপে দেখছে তখন আরেকটু বড় দেখাবে। আর যখন ভগবান বিষ্ণু রূপে দেখছে তখন আরও বিরাট দেখাবে। ভগবান বিষ্ণুর পর আর কিছু কল্পনা করা যাবে না। দ্বৈত ভাবে, আমি আলাদা জগৎ আলাদ, এই ভাবে এর থেকে আর বড় কল্পনা করা যাবে না। এরপরে হতে গেলে সব রঙকে সরিয়ে দিতে হবে, তখন নির্গুণ ব্রহ্ম রূপে অনুভব হয়। এখানে সেই একই জিনিস পর পর চলবে। সেই যে চন্দ্রমা দেবতা, অনন্ত রূপে চন্দ্রমাকে কিভাবে দেখছেন? চন্দ্রমা *মনসো জাতঃ*, সেই যে পুরুষ যাঁকে বলি দেওয়া হচ্ছে তাঁর মন থেকে চন্দ্রমার সৃষ্টি। আর *চক্ষোঃ সূর্যো অজায়ত*, সেই পুরুষের চোখ থেকে সূর্যের সৃষ্টি হল। তাহলে আমরা বলতে পারি চোখ তো সবার দুটি হয়, তাহলে সূর্য একটি কেন? কারণ এটি কবিতা, কবিতাকে মেলাতে গেলে মুশকিলে পড়ে যেতে হবে। বলতে চাইছেন যা কিছু আছে, তুমি যদি শূদ্রের মাধ্যমে অনন্তকে দেখতে চাও, সেটা তাই, যদি ব্রাহ্মণের মাধ্যমে দেখতে চাও, সেটাও তাই। যদি ঘোড়া, ছাগল, গরুর মাধ্যমে দেখতে চাও তাতেও তাই। তবে আমাদের অনেক পছন্দ অপছন্দের ব্যাপার আছে। প্রথমে পছন্দের বস্তুর মাধ্যমে দেখা শুরু করতে হয়, যাকে আমরা ভালোবাসছি, যে জিনিসটাকে আমরা ভালোবাসি, আগে এগুলো দিয়ে শুরু করতে হয়। আমাদের মনে রাখতে হবে ভালোবাসাটাই আনন্দ, আনন্দ একমাত্র ঈশ্বরের। যে জিনিসে আমরা ঈশ্বরকে দেখতে চাই না, সেই জিনিসকে আমরা ভালোবাসি না। আমরা সব সময় সীমিত বস্তুর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকেই দেখতে চাই। তাতে দোষ কিছু নেই। ঈশ্বর ছাড়া মানুষ কাউকেই ভালোবাসতে পারে না। যখন কোন কিছুতে সে ঈশ্বরের প্রকাশকে দেখে, সেখানে ভুল দেখুক আর ঠিকই দেখুক, তখন তাতে দোষের কিছু নেই। ঠাকুর বলছেন স্ত্রীদের কাছে নিজের স্বামী যেমন তেমন আর পরের স্বামী রসরাজ। একজনকে বলছে যেমন তেমন আরেকজনকে বলছে রসরাজ, আবার রসরাজের স্ত্রীর কাছে তার স্বামী যেমন তেমন আর অন্যের স্বামী রসরাজ, এটা কি করে সম্ভব? কারণ objective সৌন্দর্য কক্ষণ থাকে না, objective আনন্দ কক্ষণ থাকে না, আনন্দ সব সময় আসে ভেতর থেকে। ঈশ্বরের আনন্দকে ওই বস্তুর মাধ্যমে যখন দেখছে, তখনই সেই বস্তুর আনন্দকে মানুষ পায়। মানুষ নিজের সন্তানকে ভালোবাসছে মানে ঈশ্বরকেই ভালোবাসছে, তবে অজান্তায় ভালোবাসছে। এটা যখন জেনে ভালোবাসবে তখন সে নিজেই ভগবান হয়ে যাবে। এই জিনিসটাকে ঠাকুরও বলছেন। এক বৃদ্ধা বিধবা নিজের ভাইপোকে ভুলতে পারছে না। ধ্যান করতে বসলেই ভাইপোর মুখ ভেসে ওঠে। ঠাকুর বলছে, তাকে গোপাল রূপে দেখ তাহলেই হবে। আপনি কাকে নারায়ণ রূপে দেখবেন তাতে কিছু আসে যায় না। এই বোতলকেও যদি কেউ নারায়ণ রূপে দেখে তাতেই তার নারায়ণ জ্ঞান হবে। কিন্তু তাকে বোতলকেই নারায়ণ রূপে দেখতে হবে। দেখতে দেখতে মন এমন একাগ্র হয়ে যাবে যে নারায়ণ ছাড়া সে আর কিছুই দেখতে পারবে না। কেউ নিজের স্বামীকে নারায়ণ রূপে দেখছে, স্ত্রীকে দেবীর রূপে দেখছে, নিজের মেয়েকে দেবী রূপে দেখছে তাতে কোন কিছুই আসে যায় না। কারণ যিনি অনন্ত তিনিই আছেন, তিনি ছাড়া তো আর কিছু নেই। ঈশ্বরের সহজ প্রকাশ আনন্দ রূপেই আসে। যাতে আপনার আনন্দ আসছে, যা কিছু দেখে আপনার আনন্দের অনুভব হচ্ছে, বুঝবেন ঈশ্বর লাভ করার এটাই আপনার সহজ পথ। গত দু হাজারের বছরের ইতিহাস যদি দেখা হয় তাহলে দেখা যাবে একটা মেয়ে নিজের স্বামীকেই বেশি ভালোবাসে, পতি পরমেশ্বর, স্বামীতেই যদি সেই পরমেশ্বর দেখে তাতেই তার ঈশ্বর জ্ঞান হয়ে যাবে, সেও সীতা সাবিত্রী হয়ে যাবে। তাহলে পুরুষরা কেন নিজের স্ত্রীর মধ্যে সাক্ষাৎ জগজ্জননীকে দেখে না? কারণ পুরুষের ধর্মটাই অন্য

রকম, পুরুষরা মেয়েদের মত আবেগপ্রবণ নয়। কোন মেয়ে যদি বলে আমার স্বামী একটা পাষণ্ড, কুলাঙ্গার, ওর মধ্যে আমি পরমেশ্বরকে খুঁজে পাই না। তাহলে তুমি কাকে বেশি ভালোবাস? পরপুরুষকে ভালোবাসি। তাহলে ওর মধ্যেই দেখ। ভাগবত শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টান্ত নিয়ে এল, সব গোপীরা শ্রীকৃষ্ণকে ভালোবাসছে। তুমি যদি পরপুরুষকেই ভালোবাস কোন দোষ নেই, কিন্তু তার মধ্যে সেই ভগবানকেই দেখতে হবে। আমি তাকে আলিঙ্গন চুম্বন করতে পারি? কেন পারবে না, সবই করতে পারবে। কিন্তু এই বোধ রাখতে হবে, আমি সেই সচ্চিদানন্দকেই দর্শন স্পর্শন করছি। কাকে দিয়ে কার মাধ্যমে করছি এর কোন গুরুত্ব নেই। দূর থেকে হিমালয়ের কোন নৈসর্গিক দৃশ্য দেখছি, আমি ভাবছি কি করে ওখানে পৌঁছান যায়। কিন্তু ওই দৃশ্যকে দেখতে হলে আমি যে কোন ভাবে দেখতে পারি, ইচ্ছে করলে বাইনাকুলার দিয়ে দেখতে পারি, ক্যামেরার লেন্স দিয়ে দেখতে পারি, চোখটা একবার ডান দিকে ঘুরিয়ে চশমা দিয়ে দেখছ, চশমা খুলে খালি বাঁ দিকে চোখ ঘুরিয়ে দেখতে পারি। কিন্তু সারা জীবন যে যেভাবে দেখে এসেছে সেকি অন্য রকম ভাবে দেখতে চাইবে! আমরা সারা জীবন নিজের শরীর ছাড়া অন্য কোথাও আনন্দ পাইনি, খুব বেশি হলে নিজের স্ত্রী পুত্রের মধ্যে আনন্দ পেয়েছি। আমরা জানব কী করে যে ওখান থেকে বেরিয়ে আসার পর আনন্দের অনুভব কি রকম হয়। এখানে মূল বক্তব্য এটাই, সচ্চিদানন্দকে যখন সূর্যের মধ্যে দেখছে তখন সূর্য, যখন চন্দ্রমাকে দেখছে তখন চন্দ্রমাই সচ্চিদানন্দের প্রকাশ। এখানে কখনই বস্তু রূপে স্তুতি করা হচ্ছে না, দেবতা রূপে বলা হচ্ছে তখনও তার উদ্দেশ্য হল অনন্তের গুণ।

যেখান থেকে যা যা বেরিয়েছে, পরে ধীরে ধীরে সে সেটারই দেবতা হয়ে গেছে। যেমন বলছেন পুরুষের মন থেকে চন্দ্রমার জন্ম, আমাদের মনের দেবতা হলেন চন্দ্রমা। মানসিক রোগীদের ইংরাজীতে বলা হয় lunatic patient, লুনাটিক শব্দ এসেছে ইংরাজী Lunar থেকে। লুনার মানে চাঁদ, অর্থাৎ চন্দ্রের স্থান খারাপ হয়ে গেলে মানুষের পাগলামি বেড়ে যায়। সাধারণত বলা হয়ে পূর্ণিমা অমাবস্যাতে শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিগুলি একটু বেড়ে যায়, সেইজন্য একাদশী ব্রত করতে বলা হয়, একাদশী ব্রত করলে শরীরের তেজটা একটু দমে যায় আর তিন দিন বাদে যখন পূর্ণিমা অমবস্যা হবে তখন মনটাও শান্ত থাকবে। *চক্ষোঃ সূর্যঃ অজায়ত* – সেই পুরুষের চোখ থেকে সূর্যের জন্ম হল, সেখান থেকেই সূর্য হয়ে গেলেন চোখের দেবতা। বলা হয় চোখ আর সূর্যের সাথে নাকি একটা যোগ আছে। সম্রাট আকবর এক সময় সূর্যের উপাসনা শুরু করেছিলেন, খালি চোখে সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকতেন।

মুখাদিন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ প্রাণাদ্বায়ুর অজায়ত – পুরুষের মুখ থেকে ইন্দ্র আর অগ্নির জন্ম হল, তাঁর নিঃশ্বাস থেকে বায়ু জন্ম নিল, তাই বায়ু হয়ে গেলেন প্রাণের দেবতা। মুখ থেকে ইন্দ্র আর অগ্নির জন্ম হওয়ার ব্যাপারটাও খুব মজার। ইন্দ্র আর অগ্নি যদিও দুজন আলাদা দেবতা, বেদে ইন্দ্রের উপর সব থেকে বেশি মন্ত্র, মন্ত্রের সংখ্যার দিক দিয়ে দ্বিতীয় স্থানে অগ্নি দেবতা। ইন্দ্র আর অগ্নি দেবতাকে প্রায়ই একসাথে নেওয়া হয়, এখানেও তাই বলছেন ভগবানের মুখ থেকে ইন্দ্র আর অগ্নি একসাথে বেরিয়েছেন। এক জায়গা থেকে দুজনের জন্ম তাহলে ইন্দ্র আর অগ্নি ভাই ভাই। সত্যি কি তাই? একেবারই নয়, এটাই কবিতা। বলতে চাইছেন তোমার দেবতাদেরও ভগবান থেকেই সৃষ্টি। কিন্তু তার আগে বলেছেন মুখ থেকে ব্রাহ্মণের জন্ম, এখানে বলছেন ইন্দ্র আর অগ্নির জন্ম। এবার এগুলোকে যে যেমন ভাবে যত ভাবে খুশি ব্যাখ্যা করে দিতে পারে। ভগবানের মুখ থেকে ব্রাহ্মণেরও জন্ম আবার ইন্দ্র অগ্নিরও জন্ম, তাই এরা সবাই ভাই। মূল বক্তব্য হল যার প্রতি তোমার ভালোবাসা আছে, যাকে সম্মান করছ তার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকে দেখ। আর সৃষ্টির দিক থেকে সব কিছু তাঁর থেকেই বেরিয়েছে। বলছেন *প্রাণাদ্বায়ুর অজায়ত*, ভগবানের প্রাণন ক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে, এটাও কল্পনা। কারণ তিনি এখন অধিপুরুষ হয়ে গেছেন, তাঁর একটা যেন দেহ এসে গেছে, দেহ হওয়া মানেই প্রাণন ক্রিয়া চলবে। ভগবানের সেই প্রাণ থেকে বায়ুর জন্ম হল।

তের নম্বরের মন্ত্রকে আবার উল্টেও বলে। কি রকম উল্টো বলে? আমাদের শরীরটা দেবতাদের প্রতিমূর্তি। আমাদের মন চন্দ্রমার বাসস্থান। ভগবানের মন থেকে চন্দ্রমার সৃষ্টি, তাই মনের দেবতা চন্দ্রমা। আমাদের চোখের যিনি দেবতা আর আদিত্য মণ্ডলে যিনি আছেন, দুজন একই। সূর্য মণ্ডলের যিনি সূর্যদেবতা

তাঁকে দিয়ে যখন দেখছি তখন অনন্তকে এক রকম দেখাচ্ছে, তাহলে আমাদের চোখের উপর ধ্যান করলে কি হবে? অবশ্যই হবে, আমি যদি ধ্যান করি আমার চোখে সেই আদিত্য দেবতা যিনি অনন্তরই একটি রূপ। অধিপুরুষের দেহ থেকে যে অঙ্গ বেরিয়েছে সেই অঙ্গকে পরে মানুষের সাথে সম্পর্ক করিয়ে দেওয়া হয়েছে।

নাভ্যা আসীদন্তরিক্ষম্ শীর্ষ্ণো দ্যৌঃ সমবর্তত।
পদ্ভ্যাং ভূমির্দিশঃ শ্রোত্রাৎ তথা লোকাগং অকল্পয়ন্।।১০/৯০/১৪(ঋ)

চতুর্দশ মন্ত্রেও একই ভাবে বলা হচ্ছে, সেই পুরুষের শরীরের কোন কোন অংশ থেকে কি কি জন্ম নিল। পুরুষের নাভি থেকে সৃষ্টি হল অন্তরীক্ষ। এনাদের কাছে দুটো জিনিস ছিল একটা পৃথিবীলোক আরেকটি স্বর্গলোক আর এই দুটোর মাঝখানের অংশকে বলছেন অন্তরীক্ষ। ঈশ্বরের বিরাট রূপের যাঁরা ধ্যান করতে চান তাঁদের জন্য পুরুষসূক্তমের প্রত্যেকটি মন্ত্রই অত্যন্ত সহায়ক। গীতার একাদশ অধ্যায়ে বিশ্বরূপের মাধ্যমে ভগবানের যে বিরাট রূপ দেখান হয়েছে তার প্রেরণা পুরুষসূক্তম্ থেকেই এসেছে। বিরাটের ভাব উপনিষদেও এসেছে আর ভাগবতে তো বহুবার দেখান হয়েছে। এখানে বিরাটের বর্ণনা কাব্যিক রূপে করছেন, কিন্তু তত্ত্বটা বাস্তব। ঠাকুরও বিরাটের কথা বলতে গিয়ে বলছেন, একদিন তিনি দক্ষিণেশ্বর ফুলে ফুলে প্রস্ফুটিতে বড় বড় ফুল গাছ দেখে বলছেন সেই বিরাটের পূজো হচ্ছে, একটা একটা গাছ যেন ফুলের তোড়া। ভগবানের কাছে যখন যাই তখন ফুলের স্তবক নিয়ে যাই, কিন্তু বিরাটের যখন পূজা হয় তখন এই পুরো গাছগুলোই ফুলের স্তবক। আমরা ভগবানের শালগ্রামের পূজা করছি, শিবলিঙ্গের পূজা করছি, ভগবানকে মানুষ রূপে, বিষ্ণু রূপে দেখছি, কিন্তু ভগবানের আসল রূপ হল বিরাট। কি রকম বিরাট? তাঁর চোখ সূর্য, মন চন্দ্রমা আর অন্তরীক্ষ মানে আমরা যতদূর কল্পনা করতে পারি ততটা শুধু তাঁর নাভি। এটাই আধ্যাত্মিক সত্য, ভগবান যখন নির্গুণ নিরাকারে থাকেন তখন এক রকম, কিন্তু ওই আদিপুরুষ যখন অধিপুরুষ হয়ে যান, তার মানে ভগবানের যেন একটা স্থূল আকার এসে গেল তখন তিনি কি রকম হন বলতে গিয়ে বলছেন পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটাই তিনি। তাঁকে একটা কিছু নামে সম্বোধন করতে হবে, তাই বলছেন পুরুষ। পুরুষ হলে তাঁর একটা মাথা হবে, চোখ হবে, হাত-পা হবে। এগুলো কিভাবে হবে? তখন বলছেন এই এই ভাবে সব কিছু হয়েছে। খোলা জায়গায় বা ছাদে উঠে রাতের আকাশে দিকে তাকিয়ে পাঁচ মিনিটও যদি আমরা চিন্তা করতে থাকি এই বিশাল আকাশ, দিগন্ত এটাই সেই বিরাটের রূপ, ওই অন্তরীক্ষ তাঁর নাভি, কলকাতা শহরের এই যে এত আলো এই আলো যেন ভগবানের সামনে প্রদীপ জ্বলছে, কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের মনটা কোথায় হারিয়ে যাবে টের পাওয়া যাবে না। আধ্যাত্মিক হওয়া মানে এটাই, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাঁরই শরীর।

শীর্ষ্ণো দ্যৌঃ সমবর্তত, দ্যুলোক মানে স্বর্গ, তাঁর মাথা থেকে স্বর্গের সৃষ্টি হল, এখানে স্বর্গ মানে অন্তরীক্ষের উপরে যে লোক সেই স্থানের কথা বলা হচ্ছে। *পদ্ভ্যাং ভূমিঃ*, তাঁর পা থেকে ভূমি অর্থাৎ পৃথিবীর সৃষ্টি হল। পদার্থ বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে দেখলে এগুলো মিলবে না, না মিললে কিছুই আসে যায় না। পদার্থ বিজ্ঞানের দিক দিয়ে গেলে আকাশ গঙ্গা এসে যাবে, ওটাই তো শেষ, ভগবান ওতে শয়ন করে আছেন। *দিশঃ শ্রোত্রাৎ*, দশটি দিক তাঁর কর্ণ থেকে জন্ম নিল। এখান থেকে কর্ণের দেবতা হলেন দিকসমূহ। *তথা লোকাং অকল্পয়ন্* - এই ভাবেই দেবতারা বিভিন্ন লোকের কল্পনা করলেন। এখানে শব্দটা হচ্ছে *অকল্পয়ন্*, এই শব্দ দিয়ে সামগ্রিক সৃষ্টিকে বোঝাচ্ছে। আসলে দেবতারা এভাবেই জগতের একটা আকার দিয়েছিলেন অথবা এভাবেও বলা যায়, যে জগতকে আমরা দেখছি, এটাকে দেবতারা এই ভাবেই মনে মনে কল্পনা করেছিলেন। এই যজ্ঞ পুরো মানসিক যজ্ঞ, এখন পশুকে যেমন যজ্ঞে বলি দেওয়া হয় ঠিক সেইভাবে পুরুষকে বলি দেওয়া হচ্ছে, দেবতারা এখন বলি দিয়ে দিয়ে এইভাবে জগতের একটা আকার দিলেন, আর দ্বিতীয়তঃ এটা মানসিক যজ্ঞ, জগৎ এই ভাবে সৃষ্টি হোক দেবতারা মনে মনে কল্পনা করতে লাগলেন। মহানির্বাণতন্ত্রেও এভাবেই নিজের যে চিন্তা ভাবনা আছে সেই চিন্তা ভাবনাকে দিয়ে এটাকে জল, এটাকে ফুল, এটাকে বস্ত্র ভাবা হয়েছে।

এর পরে সৃষ্টিকে নিয়ে যখন আমি ধ্যান করব তখন ব্রাহ্মণকে যখন চিন্তা করব তখন ভাবব যে এই ব্রাহ্মণ সেই পুরুষের মাথা, যখন শূদ্রকে দেখব তখন ভাবব সে তাঁর চরণ। কার চরণ? শ্রীরামকৃষ্ণের চরণ।

আমাদের মাথা তো সর্বদা তাঁর চরণেই দিতে চাইছি। আমরা কি আর শ্রীরামকৃষ্ণের মাথায় গিয়ে আমাদের মাথা ঠেকাই? যখনই কোন শূদ্রের সামনে গিয়ে দাঁড়াব তখন আমরা ভাবব সে শ্রীরামকৃষ্ণের চরণ, এখানেই আমার মাথাকে নত করতে হবে। অর্থাৎ ব্রাহ্মণকে যে শ্রদ্ধার ভাব নিয়ে দেখব, একজন শূদ্রকেও ঠিক সেই একই শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখতে হবে। কারণ আমাদের সব কিছু, আমার আমিত্ব, ব্যাক্তিত্ব সব শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে সমর্পিত। এই গভীর উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবটা পুরুষসূক্তমের মাধ্যমে আমাদের কাছে আসছে, শ্রদ্ধার সঙ্গে, বিনম্র ভাবে, গভীর ভাবে হৃদয়ে এই ভাব ধ্যান করতে হবে। যাবতীয় যা কিছু দেখছি এটা শ্রীরামকৃষ্ণরই রূপ। অনেক সময় আমাদের মনে হতে পারে যে আমরা যেন চিন্তা করে করে সম্মোহিত হয়ে এগুলো ভাবছি। আমরা বাস্তবিকই সম্মোহিত হয়ে আছি, কিন্তু এই চিন্তার জন্য সম্মোহিত হচ্ছি না, ‘এই দেহটাই আমার সব’ এই বিশ্বাসে আমরা সবাই সম্মোহিত হয়ে আছি। এই সম্মোহনকে কাটাবার জন্য বিরাটের রূপ নিয়ে আসতে হয়। বিরাট রূপের চিন্তন করলে শরীরের প্রতি সম্মোহন ভাবটা কেটে যায়। দেহের প্রতি সম্মোহনটা কেটে গেলে কি হয়? এত দিন দেহের সুখেই আনন্দ আসছিল, দেহের সুখের জন্য টাকা-পয়সা, পরিবারের মত সীমিত জিনিস থেকে আনন্দ পাচ্ছিল। কিন্তু বিরাটের চিন্তা করতে করতে সীমিত জিনিস থেকে আনন্দ আসাটা বন্ধ হয়ে গেল, বন্ধ হয়ে এবার যে আনন্দ আসবে সেটা কোন বস্তুর মাধ্যমে আসবে না, আনন্দের যে মূল উৎস সেই উৎসের মুখটা খুলে গিয়ে মানুষ তখন প্রকৃত চিরন্তন অফুরন্ত আনন্দের আস্বাদ করতে পারবে।

এর আগেও আমরা কয়েকবার আলোচনা করতে গিয়ে বলেছি ঋষিরা দেখছেন ঈশ্বর ছাড়া কিছু নেই আবার জগৎ, সৃষ্টির সত্যতাও তাঁদের সামনে বিদ্যমান। এই দুটোকে মেলাতে গিয়ে ঋষিরা দেখছেন যা কিছু আছে সচ্চিদানন্দই আছেন। যা কিছু আছে তিনি আছেন বা যা কিছু আছে সব তিনিই হয়েছেন, যিনি করছেন সেটাও তিনি, করাটাও তিনি আর যেটা হয়েছে সেটাও তিনি, এই জিনিসটাকে একটা কাব্যিক রূপে বেদের কয়েক জায়গায় উপস্থাপনা করা হয়েছে কিন্তু পুরুষসূক্তমের মত এতটা পরিষ্কার ভাবে নেই। পরের দিকে যত শাস্ত্র এসেছে সেখানেও এই ভাবকে আরও প্রাঞ্জল ভাবে নিয়ে আসা হয়েছে। হাজার হাজার জপ করাটা আধ্যাত্মিক হওয়া নয়, আধ্যাত্মিক হওয়া মানে পুরুষসূক্তমে যে কথা বলছেন, সব কিছুই তিনি, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাঁরই শরীর, এই দৃষ্টি দিয়ে সব কিছুকে দেখা। এই ভাবকে ধারণা করতে যদি কঠিন মনে হয় তাই আরও সহজ করে দিচ্ছেন, যা কিছু ভালো লাগে, যাকে ভালোবাসছি সেই বস্তু বা ব্যক্তির মধ্যে তাঁকে দেখা।

সৌন্দর্যের পূজারীরা বলেন ভগবান তো সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্ তিনি অসুন্দর, কুৎসিৎ বা লম্পট দুশ্চরিত্র কি করে হতে পারেন? এগুলো সত্ত্বগুণের লক্ষণ, সত্ত্বগুণের একটা বৈশিষ্ট্য সে সব সময় সৌন্দর্যের দিকে আকৃষ্ট হবে, সত্ত্বগুণ বিদ্যা, সুখ খোঁজে। এখনও যারা ঈশ্বরের সুন্দর রূপ খুঁজে বেড়াচ্ছে তাদের এখনও আধ্যাত্মিক যাত্রা শুরু হয়নি। যারা এখনও নারায়ণের মূর্তিতে তাঁর চোখের সৌন্দর্য, ঠোঁটের মিষ্টি হাসি খুঁজছে বুঝবেন এদের মন এখনও বিষয়াসক্ত। তবে নারীর সৌন্দর্য দেখার থেকে ঈশ্বরের সৌন্দর্য দেখা অনেক ভালো। নারীর সৌন্দর্যের বর্ণনা যারা করে তাদের মধ্যে রজোগুণের প্রাধান্য আর যারা ঈশ্বরের সৌন্দর্যের বর্ণনা করে তাদের রজোগুণ কমে সত্ত্বগুণ বাড়তে শুরু করেছে। কিন্তু মানুষ যখন বিষয় থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করে তখন সে বলবে প্রভু! এটাও তোমার রূপ ওটাও তোমার রূপ। আর ঈশ্বরই সব কিছু হয়েছেন এই জ্ঞানে পূর্ণ রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়ার পর তাঁর সুন্দর অসুন্দরের কোন বোধই থাকবে না। তার আগে পর্যন্ত তাঁকে বিচার করে যেতে হবে, ঠাকুর! এটাও তোমার রূপ ওটাও তোমার রূপ।

প্রসাদ নেওয়ার সময় মনে মনে ভাবছি ভালো ভালো জিনিসগুলো যেন পাই। যাদের পরিচিতি থাকে তারা চেয়ে চিন্তেই নেবে, আমাকে সন্দেশটা দাও বা আমাকে শশা দিও না। প্রসাদেও দুটো বুদ্ধি কাজ করে, একটা প্রসাদ বুদ্ধি আরেকটা আহার বুদ্ধি। আহার বুদ্ধিতে বলছে আমাকে ভালো ভালো জিনিস দেওয়া হোক আর প্রসাদ বুদ্ধিতে বলবে আমাকে কণিকা মাত্র দিন। আহার বুদ্ধিটাই সাংসারিক বুদ্ধি। ঠাকুর বলছেন জ্ঞানীরা ভয়তরাসে, অর্থাৎ জ্ঞানীও যদি কেউ হয়ে যায় তারও কিন্তু ভয় থাকবে। সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত, অত্যন্ত ভালো মানুষ, বিদ্যা আছে, ভালো ভালো গুণ আছে আর ঈশ্বরের সুন্দর রূপ দেখতে চায়, ঈশ্বরের বিগ্রহের মুখের দিকে ঘন্টার পর ঘন্টা তাকিয়ে থাকে, আর তারপরেই রাস্তায় বেরিয়ে নোংরা ভিখারীকে দেখে ভাবছে এর

মধ্যে কী করে ঈশ্বর থাকতে পারেন, তাহলে বুঝতে হবে এখনও তার আধ্যাত্মিক যাত্রা শুরু হয়নি। এর পতন হতেও বেশি সময় লাগে না। আজ ঈশ্বরের সুন্দর রূপ দেখার যে স্পৃহা এটাই কাল নারীর সুন্দর মুখ দেখার স্পৃহাতে নেমে যাবে, কিছু করার থাকবে না। এর জন্যই শাস্ত্র, তা নাহলে তো সহজেই বলে দেওয়া যেত যে যেখানে যা কিছু সুন্দর সেটাই ঈশ্বরের রূপ। বিদ্যুতের স্তম্ভে অনেক জায়গায় লেখা থাকে ৪৪০ ভোল্ট, স্পর্শ করলে কি হবে সেটা লেখা থাকে না, কারণ সবাই জানে কি হবে। কিন্তু কোথাও লেখা থাকে না আগুনে হাত দেবে না, হাত পুড়ে যাবে। আগুনে হাত দিলে কি হবে সবাই জানে, কারণ এটাই স্বপ্রকাশ সত্য, self evidence truth। যে সত্য স্বপ্রকাশ নয় সেখানেই সমস্যা, কারণ সেখানে আমাদের জাগতিক বুদ্ধিটা অন্য ভাবে চলে। সেইজন্য এগুলোকে নিয়ে শাস্ত্র বার বার আলোচনা করছে। এরপরে পঞ্চদশ মন্ত্রে বলছেন –

সপ্তাস্যাসন্‌পরিধয়ঃ ত্রিঃ সপ্ত সমিধঃ কৃতাঃ।
দেবা যদ্যজ্ঞং তন্বানাঃ অবধ্নন্ পুরুষং পশুম্।।১০/৯০/১৫(ঋ)

বেদের ঋষিদের কাছে যজ্ঞই ছিল প্রধান। যজ্ঞ প্রধান বলে সব কিছুকে তাঁরা যজ্ঞ দিয়েই ব্যাখ্যা করবেন আর সব কিছুতে যজ্ঞকে নিয়ে আসবেন। মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত পুরো জীবনটা যজ্ঞ দিয়ে বাঁধা। শুধু মানুষের জীবনই নয়, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিটাও একটা যজ্ঞ। কিন্তু সৃষ্টির সময় তো কিছু নেই, কি দিয়ে যজ্ঞ হবে? সেই যজ্ঞই বা কে করবেন? বলছেন ভগবানই যজ্ঞ করবেন। যজ্ঞের যে উপকরণ দরকার সেই উপকরণ কোথা থেকে আসবে? সব উপকরণই মানসিক হবে। মানসিক উপকরণ কি করে হবে? কেন হবে না! আমরা মনে কোন জিনিসের কল্পনা করি? যে জিনিসের পূর্ব অভিজ্ঞতা হয়েছে সেই জিনিসকেই আমরা কল্পনা করি। যেমন একজন এসে বলল নীল ঘোড়া দেখেছে। ঘোড়ার রঙ কখন নীল হতে দেখা যায় না। এই ধরণের উদ্ভট কথা একমাত্র কবি আর বাচ্চারা বলতে পারে। যে বলছে নীল ঘোড়া, তার ঘোড়ার ব্যাপারে আগে অভিজ্ঞতা আছে আর নীল রঙের ব্যাপারে অভিজ্ঞতা আছে, দুটো অভিজ্ঞতা মিলে এক বিচিত্র জিনিসের কল্পনা তৈরী হচ্ছে। যদিও নীল ঘোড়া হয় না, কিন্তু নীলও হয় আর ঘোড়াও হয়। দুটো মিলিয়ে এক বিচিত্র জিনিসকে নিয়ে আসা হচ্ছে যেটা উনি আগে অনুভব করেছেন। এই যজ্ঞ কিভাবে হচ্ছে? ভগবান করছেন। কিভাবে করছেন? এর আগের কল্পে যেভাবে সব কিছু হয়েছিল। এর আগের কল্পে সব উপকরণগুলো ছিল, সেইজন্য ভগবানের পক্ষে কল্পনা করা অসম্ভব নয়। এটা তাই মানসিক সাঙ্কল্পিক যজ্ঞ। তাই বলে এটা কি কোন বিচিত্র কোন কল্পনা, যেখানে নতুন নতুন জিনিস নিয়ে হাজির হচ্ছেন? তা কখনই বলতে চাইছেন না, আসলে বলছেন, আগের আগের কল্পে এভাবে সব কিছু হয়েছে। তখনও অগ্নি ছিল, তখনও ঋতু ছিল, দিন ছিল রাত ছিল, চন্দ্রমা ছিল, দেবতারা ছিলেন সব কিছুই ছিল। ভগবান এবার মনে মনে কল্পনা করছেন। তাহলে সৃষ্টিটা কি বাস্তবিক নাকি মানসিক কল্পনা? এসব ক্ষেত্রে এসে বেদ পরিষ্কার করে কিছু বলে না, সেই কারণে বিরাট সমস্যা থেকে যায়। এই সৃষ্টি বাস্তবিক নাকি কাল্পনিক? আমার আপনার ক্ষেত্রে পুরোপুরি বাস্তবিক। যিনি শুদ্ধ চৈতন্য তিনি তো অনন্ত, সৃষ্টিটা কোথায় হবে! সৃষ্টি হওয়ার জন্য তো একটা জায়গা চাই, কিন্তু তিনি তো অনন্ত। সেইজন্য হিন্দু ধর্মেই একটা দর্শন আছে যেখানে পুরো সৃষ্টিকেই কাল্পনিক বলে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কার কল্পনা? আমার আপনার কল্পনা নয়, যিনি শুদ্ধ চৈতন্য এটা তাঁর কল্পনা। এই যে যজ্ঞ হচ্ছে এটাও কল্পনা আর সৃষ্টি যেটা হচ্ছে সেটাও কল্পনা। তবে এর বেশি বললে আমাদের মন পুরোপুরি সংশয়াচ্ছন্ন হয়ে যাব। কিন্তু পরের দিকে বৌদ্ধদের বিজ্ঞানবাদ আদি সব এখান থেকেই বেরিয়েছে। অনন্ত চৈতন্যের বাইরে তো কিছুই নেই যার বাইরে কিছু একটা solidification হবে। তাহলে এই solidificationটা কি? বেদান্তের কাছে এটা নাম আর রূপ ছাড়া কিছু নয়। এই নাম আর রূপের কল্পনা আমার আপনার নয়, ভগবানের কল্পনা। ভগবানের কল্পনা যদি হয়, যেখানে আমি আপনি সবাই আছি, সেখানে কল্পনা বললেও যতটা সত্য, সত্য বললেও ততটাই সত্য, কোন তফাৎ হয় না। যেমন স্বপ্নে আমরা যা কিছু দেখি সেই দেখাটা ততটাই সত্য যতটা জাগ্রত অবস্থায় এই জগৎ সত্য। ঠিক এভাবেই এখানে যা কিছু বলা হচ্ছে সবটাই বাস্তব।

যেমন পঞ্চদশ মন্ত্রে বলছেন, যজ্ঞে বলি দেবার জন্য যে পশুকে রাখা হয়েছে, সেই পশুকে সাত ভাবে ঘিরে রাখা হয়েছে। এটাই যজ্ঞের একটা বিধি। অনেক ভাষ্যকাররা বলেন এই সাত অগ্নির সাতটি রূপ, যজ্ঞের

সময় অগ্নিকে যজ্ঞের চারিদিক দিয়ে ঘিরে দেন। আরেকটি অগ্নি রাখা হয় অশুভ শক্তিকে আটকাবার জন্য। এটাকেই আবার সায়নাচার্য বলছেন *সপ্তাস্যাসন্‌পরিধয়ঃ* বলতে বেদে যা সাতটি ছন্দের কথা বলা আছে, সেই সাত রকমের ছন্দ দিয়ে যজ্ঞের পশুকে ঘিরে রাখা হয়েছে বা সাত রকমের ছন্দ দিয়ে তাঁর অর্চনা করা হচ্ছে। *ত্রিঃ সপ্ত সমিধঃ কৃতাঃ* – যজ্ঞের জন্য কটি কাঠ লাগবে? সাত গুণিতক তিন, মানে একুশটি কাঠের টুকরো যজ্ঞের জন্য লাগবে। ভাষ্যকাররা আবার বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করে বলছেন, একুশটি সমিধ হল, বারটি মাস, ছটি ঋতু, ভূঃ অন্তরীক্ষ এগুলোই তাঁর অরণি কাঠ যেটা যজ্ঞে ব্যবহার করা হত। তার মানে, যজ্ঞে যা যা উপকরণ লাগছে তার সব কিছুকে এনে দেখাচ্ছেন সৃষ্টিটা যেন একটা যজ্ঞ। ভারতীয় পরম্পরার ঐতিহ্যে সাত সংখ্যাটি খুব পবিত্র সংখ্যা রূপে ভাবা হয়। সাত সংখ্যা দিয়েই সপ্তদ্বীপ, সপ্ত সাগর, অগ্নির সাত রকমের জিহ্বার কথা বলা হয়েছে। *দেবা যদ্যজ্ঞং তন্বানাঃ অবধ্নন্ পুরুষং পশুম্,* এই ভাবে সব আয়োজন করে দেবতারা যজ্ঞে পশুকে বলি দিল। কে যজ্ঞ পশু? সেই আদিপুরুষ। ভগবানকেই বলি দেওয়া হচ্ছে। সেই ভগবানকে বলি দিচ্ছেন সব দেবতারা মিলে। শেষ মন্ত্রে বলছেন –

যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবাঃ তানি ধর্মাণি প্রথমান্যসন্।
তে হ নাকং মহিমানঃ সচন্তে যত্র পূর্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ।।১০/৯০/১৬(ঋ)

পুরুষসূক্তমের প্রথম মন্ত্রটি যেমন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এর শেষ মন্ত্রটিও খুব বিখ্যাত মন্ত্র। প্রথম মন্ত্রের মূল ভাব শেষ মন্ত্রে এসে প্রাঞ্জল হয়ে উঠেছে। আকাশের দ্যুলোকে খুব উচ্চমানের ঋষি ও সিদ্ধরা থাকেন আর যেখানে দেবতারা থাকেন, সেই অন্তরীক্ষে যেন তাঁরা এই যজ্ঞটা করেছিলেন। আর এই যজ্ঞই হল জগতের প্রথম ধর্ম। এই যে কথাটা *যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবাঃ* – যজন করা মানে পূজো করা, যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞের পূজা সম্পন্ন হল, কিভাবে করল? দেবতারা সেই পুরুষকে যজ্ঞে বলি দিয়ে। আমরা কালী পূজায় পশু বলি দিই, সেই পশুকে বলির দ্বারা মা কালীকেই অর্পণ করছি। ঠিক সেই রকম এখানেও বলি দেওয়া হল, কার উদ্দেশ্যে বলি দেওয়া হল? সেই পুরুষের প্রতি উৎসর্গ করার জন্য বলি দেওয়া হল। কাকে বলি দেওয়া হল? সেই পুরুষকেই। তার মানে, যেটা করা হচ্ছে সেটা যজ্ঞ, বলি দেওয়াটাও যজ্ঞ, যাকে বলি দেওয়া হল সেও সেই পুরুষ, যার উদ্দেশ্যে বলি দেওয়া হল সেও সেই পুরুষ, তিনিও যজ্ঞ। সবটাই যজ্ঞ। যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞের প্রতি যজ্ঞ করা হল। দেবতারা কিভাবে পুরুষের পূজা করলেন? যজ্ঞের দ্বারা। কিভাবে যজ্ঞ করা হল? পুরুষকে বলি দিয়ে। তিনটি যজ্ঞের কথা বলছেন, *যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত*, দেবতারা যজ্ঞ করলেন। কি দিয়ে যজ্ঞ করলেন? যজ্ঞ দিয়ে, এখানে যজ্ঞ বলতে ভগবান বা পুরুষ। কি আহুতি দিলেন? *যজ্ঞম্,* এখানে দ্বিতীয়, তৃতীয়া আর ক্রিয়া এই তিনটেই যজ্ঞ। ক্রিয়াটাও যজ্ঞ, যেমন আমি রুটি খাচ্ছি, রুটি দ্বিতীয়া, খাচ্ছিটা ক্রিয়া। ক্রিয়াটা এখানে *অযজন্তঃ,* যজ্ঞ করলেন, যাকে বলি দেওয়া হচ্ছে সে যজ্ঞ, যার প্রতি বলি দেওয়া হচ্ছে তিনিও যজ্ঞ, আর যজ্ঞ প্রণালীটাও যজ্ঞ। ঠিক এই ভাবই গীতার শ্লোকে বলা হয়েছে, যে শ্লোক আমরা নিত্য আবৃত্তি করি – *ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্। ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা।।(৪/২৪)।।* যেটা অর্পণ করা হচ্ছে সেটাও ব্রহ্ম, যেটা দিয়ে অর্পণ করা হচ্ছে সেটাও ব্রহ্ম, যাকে দেওয়া হচ্ছে সেও ব্রহ্ম, পুরো পদ্ধতিটাই ব্রহ্ম, সবই ব্রহ্ম, ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নেই। এখানেও একই কথা বলছেন, সেই পুরুষের যে পূজো হল যজ্ঞের দ্বারাই পূজো দেওয়া হল। এখানে প্রথমার কথা বলা নেই, যদিও দেবতা সিদ্ধদের কথা বলছেন। কিন্তু সেটাও যজ্ঞের যিনি আদিপুরুষ তাঁর মনেই হয়ে চলেছে, সেইজন্য সেটাও তিনি। যে কোন, পূজা, অর্চনা, সাধনার শেষ সিদ্ধির যে কথা তা এই মন্ত্র। সাধনা করে করে সাধক যখন উচ্চতম অবস্থায় চলে যান তখন তিনি দেখেন সব কিছুই ব্রহ্ম। কারকের সাথে যত রকমের বিভক্তি হয় আর তার সাথে ক্রিয়া সবটাই তিনি। ক্রিয়া কি করে ব্রহ্ম হতে পারেন এটা বোঝা খুব মুশকিল, কিন্তু এখানে কোন অসুবিধা হয় না, কারণ যজ্ঞ শব্দ দিয়েই তিনটে এসে যায়, *যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত*। হিন্দুদের জীবনের আধারই এটা – *যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত*। আমরা যা কিছু করছি সবটাই যজ্ঞ করছি, খাচ্ছি যজ্ঞ করছি, জল পান করছি যজ্ঞ, ঘুমোচ্ছি যজ্ঞ।

ঈশ্বরের পূজা ঈশ্বরকে দিয়েই করা হল, এভাবে ছাড়া আর অন্য কোন ভাবে ঈশ্বরের পূজা করা যায় না। যে যাকে ভালোবাসে সে তাকে তার ভালো লাগার জিনিসই দেবে। ঈশ্বরের যজ্ঞ যেটা সেটা একমাত্র ঈশ্বর

নিজেই, তাছাড়া আর কোন কিছুতেই তাঁর যজ্ঞ হয় না। সেইজন্য তাঁকে দিয়েই তাঁকে অর্পণ করা হল। *তানি ধর্মাণি প্রথমান্যাসন্* - এটাই সৃষ্টির প্রথম ধর্ম। সৃষ্টিতে প্রথম যে ভালো কাজ সেটা এই যজ্ঞ দিয়েই শুরু হল, ভালো কাজ মানেই ধর্ম। ধর্মে বা যে কোন জিনিসের আচরণে যেটা প্রাচীন সেটাকেই সম্মান দেওয়া হয়, অর্থাৎ পরম্পরাতে যেটা চলে আসছে সেটাকেই বেশি সম্মান দেওয়া হয়। যেমন বলা হয় তোমাদের ঐতিহ্যকে ধরে রাখো, গুরুজনদের শ্রদ্ধা করবে, প্রণাম করবে, বয়স্ক মহিলা বা পুরুষদের সম্মান দেবে, এগুলোই ধর্ম। যে রীতিনীতি যত পুরনো তার সম্মান তত বেশি। বলছেন বেদের সব থেকে পুরনো ধর্ম হল *যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত*, যজ্ঞ দিয়ে যজ্ঞকে যজন করা। এটাই ধর্মের শেষ কথা। আমাদের খুব নামকরা কথা আছে, বলছেন শিবের পূজা কিভাবে হবে? তুমি নিজেকে আগে শিব কল্পনা কর, নিজেকে শিব কল্পনা না করার আগে শিবের পূজা হবে না। ব্রাহ্মণরা নারায়ণের পূজা করার আগে তাঁরা নিজেকে নারায়ণ কল্পনা করেন, তারপর মন্ত্র পাঠ করেন। এগুলো কোন কল্পনার জিনিস নয়, এটাই সঠিক পথ। আমি ঈশ্বরের সাথে এক আর ঈশ্বরকে দিয়েই ঈশ্বরের পূজো হয়। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে মা ভবতারিণীর পূজা করার সময় দেখছেন সব কিছুই চিন্ময়, কোশাকুশি, চৌকাঠ, ফুল, অর্ঘ্য, নৈবেদ্য সব চিন্ময়, সব চৈতন্যময়, কোথায় তিনি পূজো করবেন! ঠাকুর তখন চারিদিকে ফুল ছুঁড়ছেন। এটাই বাস্তবিক দেখেন, সেইজন্য বলছেন *তানি ধর্মাণি প্রথমান্যাসন্* - এটাই প্রথম ধর্ম, যজ্ঞ দিয়ে যজ্ঞের পূজো।

জগৎ আসলে একটা জগৎ রূপী বিকার – *জগদ্রুপানাং বিকারাং ধর্মং*। ধর্ম কি? জগৎ সব সময় ছিটকে যাচ্ছে, কিন্তু এটাকে যে ধারণ করে আছে সেটাই ধর্ম। ধর্ম যদি ধারণ না করে থাকত তাহলে জগৎ ছিটকে বেরিয়ে চলে যেত। প্রথম ধর্ম প্রভুর পূজা। প্রভুর পূজা প্রভুকে দিয়েই হয়। আর পুরো ব্যাপারটাই মনসা, মনে মনে। আরণ্যকে গিয়ে ঠিক একই জিনিস হয়, তখন অশ্বমেধের মত যত যজ্ঞ আছে সব মনে মনে কল্পনা করে সম্পন্ন করা হয়। যারা প্রচুর জপ ধ্যানাদি করতে চান তাদের পক্ষে এই ধরণের একটা ভাব অবলম্বন করা খুবই কার্যকরী। শ্রীরামকৃষ্ণই সব কিছু হয়েছেন, যা কিছু দিয়েই প্রভুর অর্চনা করছি সেটা তিনিই হয়েছেন, তাঁরই জিনিস দিয়ে তাঁকেই আরাধনা করছি। গঙ্গা জল দিয়েই গঙ্গা পূজা করা হয়। এই ভাব প্রথমে আমাদের আরোপ করতে হয়, ধীরে ধীরে এটাই বাস্তব রূপে জীবনে চলে আসে। সাধনা মানেই তাই, যে জিনিসটাকে আজকে আমি চেষ্টা করে বার বার করছি, সিদ্ধি অবস্থায় এটাই স্বাভাবিক হয়ে যায়। সাধনা আর সিদ্ধিতে কোন পার্থক্য থাকে না, হিন্দু ধর্মে সাধনাও যা সিদ্ধিও তাই। পওহারি বাবা বলছেন জন্ সাধন তন্ সিদ্ধি, যে জিনিসকে নিয়ে সাধনা করবেন সেই জিনিসটারই সিদ্ধি হবে।

বলছেন – *তে হ নাকং মহিমানঃ সচন্তে। যত্র পূর্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ। নাকং* শব্দের অর্থ আগে, সামনে। ধর্ম শব্দ এসেছে *ধারয়ণ্* থেকে, ধারণ করা থেকে ধর্ম এসেছে। যে গুণের দ্বারা কোন বস্তুকে ধরে রাখা হয়, সেটাই সেই বস্তুর ধর্ম। মানুষকে যজ্ঞই ধরে রাখে, যজ্ঞই মানুষের ধর্ম। ইদানিং কালে এসে ঠাকুর বলছেন ঈশ্বর দর্শনই মানব জীবনের উদ্দেশ্য। এটাই মানুষের ধর্ম, মানুষকে সব সময় সজাগ থাকতে হবে যে, আমাকে ঈশ্বর দর্শন করতে হবে। এই যে যজ্ঞ হল, এই যজ্ঞের ফল স্বর্গপ্রাপ্তি। এটাই প্রথম পূজা, আর যাঁরা এই যজ্ঞ সম্পন্ন করলেন তারা অন্তিমে উচ্চতম স্বর্গ লাভ করবেন যেখানে আদি দেবতারা সবাই বাস করেন। স্বর্গের অনেক স্তর রয়েছে, কিন্তু এখানে বলছেন এই দেবতারা উচ্চতম স্বর্গ পেয়ে গেলেন যেখানে আদিপুরুষ ও আদি দেবতাদের বাস। যিনিই যজ্ঞ করবেন তাঁকে এভাবেই যজ্ঞ করতে হবে। কিভাবে? ঈশ্বরই সব হয়েছেন, ঈশ্বর থেকেই সব কিছু বেরিয়েছে, তাঁর পূজা তাঁকে দিয়েই করতে হয়। ঈশ্বরই সব কিছু হয়েছেন, পুরুষসূক্তমের এটিই মূল ভাব। জপ, ধ্যান, ভজন, পূজনের জন্য এটি একটি খুব উচ্চতম ভাব, এই ভাব অবলম্বন করে যে কেউই জপ, ধ্যান ও ভজন করতে পারেন। যখন পূজা করছি, জল, কোশাকুশি, ফুল, চন্দন, ধূপ, বিগ্রহ, আসন, পূজারী সব তিনিই হয়েছেন। এটাই পুরুষসূক্তমের দর্শন, সেটাকেই কাব্যিক রূপে বর্ণনা করে আধ্যাত্ম-পিপাসু মানুষের জন্য উপস্থাপনা করা হয়েছে।

।। গায়ত্রীমন্ত্র ।।

(ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ

ঋগ্বেদের অন্তর্গত গায়ত্রীমন্ত্র বেদের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্র। পুরুষসূক্তম্ আলোচনা করার সময় বলা হয়েছিল পুরুষসূক্তম্ বেদের একটি অন্যতম প্রধান মন্ত্র, বহু মানুষ আজও নিত্য পুরুষসূক্তম্ আবৃত্তি করেন। যাঁরা শিবভক্ত তাঁরা *ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্ধনম্। উর্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্মুক্ষীয় মাঽমৃতাৎ* শিবের এই মন্ত্র আবৃত্তি করেন। এটিও বেদমন্ত্র। এই ভাবে বেদের অনেক মন্ত্র এখনও বহু মানুষ প্রতিদিন আবৃত্তি করে যাচ্ছেন। কিন্তু সবার থেকে গায়ত্রীমন্ত্রের বেশি পরিচিতি। ভারতের বেশির ভাগ মানুষই, বিশেষ করে যারা হিন্দু পরম্পরাকে এখনও ধরে রেখেছেন তাঁরা গায়ত্রীমন্ত্র নিত্য জপ করেন।

গায়ন্ত্রীমন্ত্রের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এই মন্ত্র যজ্ঞেরও মন্ত্র আবার ধ্যানেরও মন্ত্র। বেদের অনেক শব্দ বহুকাল আগেই হারিয়ে গেছে, কেউ বলতে পারবেন না বেদের এই শব্দের ঠিক কি অর্থ। বেদের শব্দগুলি হারিয়ে যাচ্ছিল বলে যাস্ক বেদের শব্দের উপর একটি অভিধান রচনা করে রাখলেন, যার নাম নিরুক্ত। ত্রয়োদশ বা চতুর্দশ শতাব্দীতে সরস্বতীর বরপুত্র সায়নাচার্য এলেন, তাঁর উপর সত্যিই ঈশ্বরের কৃপা ছিল। তিনি বেদের উপর ভাষ্য রচনা করলেন। ইদানিং আমরা বেদের যা কিছু অর্থ বা ব্যাখ্যা পাই চোখ-কান বুজে বলে দেওয়া যেতে পারে সব সায়নাচার্যের জন্যই পাচ্ছি। আচার্য শঙ্কর আবার উপনিষদের ভাষ্য দিয়েছেন। উপনিষদের কিছু কিছু মন্ত্র বেদের আরণ্যকেও এসেছে আবার কোথাও কোথাও ব্রাহ্মণ অংশেও এসেছে, তখন এগুলোও স্বাভাবিক ভাবেই আচার্যের ভাষ্য হয়ে যাচ্ছে, কারণ মন্ত্রগুলি একই। গায়ত্রীমন্ত্রের উপর বৈদিক যুগ থেকেই মানুষ ধ্যান করে আসছে।

সায়নাচার্য গায়ত্রীমন্ত্রের অনেকগুলি অর্থ করেছেন। একটা অর্থ করছেন, এই মন্ত্রের যিনি দেবতা তিনি যেন আমাদের অন্ন দেন। যদিও ভর্গো মানে আলো কিন্তু ভর্গোর মানে অন্নও হয়। ধী শব্দের অর্থ বুদ্ধি, কিন্তু আবার রক্ষণ করার ক্ষমতা এই অর্থেও ধী শব্দ ব্যবহার করা হয়। দেবতারা আমাদের যে অন্নাদি দেবেন এগুলো আমরা যেন ঠিক ঠিক রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারি। বেদের যজ্ঞের একটাই উদ্দেশ্য কি করে জাগতিক ঐশ্বর্যের সমৃদ্ধি হবে। কিন্তু এই শব্দের অন্য অর্থও আছে। সায়নাচার্য যদিও ভর্গো শব্দের একটা অর্থ অন্ন করেছেন, কিন্তু প্রথমে ভর্গোকে ওই অর্থেই নিয়েছেন যে অর্থ এখন আমরা ব্যবহার করছি। এখানে একটা ব্যাপার বোঝার আছে, যেটা এর আগেও আলোচনা করা হয়েছে। বেদের যে কোন মন্ত্রের দুটি রূপ, বাহ্যিক রূপ আর আন্তরিক রূপ। বাহ্যিক রূপ শব্দ মাত্র, বাহ্যিক রূপকে নিয়ে সারা জীবন পরে থাকলেও কাজের কাজ কিছুই হবে না। সেইজন্য গায়ত্রীমন্ত্র যতই আমরা জপ করে যাই না কেন তাতে কিছুই হবে না। কেন হবে না, তার জন্য আমাদের একটু গভীর ভাবে চিন্তা করে দেখতে হবে।

আমরা সবাই শব্দ সাগরের মধ্যে ভেসে আছি। শব্দ সাগরের এই ভাসমান অবস্থা থেকে একটু ডুব দিলে আমরা জলের ভেতরে যে একটা আলাদা জগৎ আছে সেই জগৎ দেখে অবাক হয়ে যাই। কত রকমের মাছ, জলজ প্রাণী, উদ্ভিদ দেখছি। ওখান থেকে আমাদের কবিতার জন্ম নেয়, নানা রকমের দর্শন বেরিয়ে আসে। ডুব দিতে দিতে আরও গভীরে গিয়ে সমুদ্রের তল পেয়ে যাচ্ছি। জলের উপরেই যার জন্ম, সে শুধু জলের ঢেউ, তরঙ্গকেই জানে। সে অবাক হয়ে দেখে জলের নীচেও একটা ধরাতল আছে। আধ্যাত্মিক জীবন মানে তাই। আমরা শব্দ সাগরে ভাসছি। শব্দের তরঙ্গকে অতিক্রম করতে করতে যখন মৌনের অবস্থায় চলে যাই তখন মানুষ আধ্যাত্মিকতা সত্তার যে ধরাতল, সেখানে পৌঁছে যায়। গায়ত্রীমন্ত্রের বাহ্যিক রূপ নিয়ে যখন জপ করছি তখন শব্দের ঢেউয়ের মধ্যেই খেলা করছি। যেমনি গায়ত্রীমন্ত্রের মনন করতে করতে একটু গভীরে যেতে শুরু করলেন, তখন মনের গভীরতায় চলে যাচ্ছেন। সমুদ্রের তলদেশে যেমন নানান রকমের প্রাণীজগৎ উদ্ভিদ জগতের সৌন্দর্যের খেলা চলছে ঠিক তেমনি মনের গভীরে যে সৌন্দর্যমণ্ডিত এক জগৎ রয়েছে, মনের মধ্যে যে একটা অসীম ক্ষমতা লুকিয়ে আছে তার প্রকাশ হতে শুরু হয়ে যায়। মনের এই জগতকেও অতিক্রম করে যখন সমাধিবান হয়ে যাচ্ছেন তখন তিনি সেই তলদেশে পৌঁছে যাচ্ছেন। তখন স্পষ্ট হয়ে যায়, এই তলদেশ আছে বলেই সমুদ্রের জলের এত ঢেউ, এত উচ্ছাস। যিনি স্রষ্টা তিনিই যে একমাত্র বস্তু এই জিনিসটা

তখনই ঠিক ঠিক বোধে বোধ হয়। সেইজন্য গায়ত্রীমন্ত্র বা বেদের অন্যান্য মন্ত্রের যে শাব্দিক অর্থ এর কোন গুরুত্ব নেই। গায়ত্রীমন্ত্রের একমাত্র উদ্দেশ্য জাগতিক কল্যাণ আর আধ্যাত্মিক জ্ঞানপ্রাপ্তি।

সন্ন্যাসের শ্রেষ্ঠতম সাধনা আর গায়ত্রীমন্ত্রের সাধনা একেবারে এক। সন্ন্যাসের নিয়মে বলা হয়, বেদে যা তিনি করে এসেছেন সন্ন্যাস নেওয়ার পর সব শেষ। আগেকার দিনের ব্রাহ্মণরাই বেশি সন্ন্যাস নিতেন। ব্রাহ্মণ মানেই তাঁকে ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী মন্ত্র জপ করতে হবে। কিন্তু যেমনি তাঁর সন্ন্যাস হয়ে গেল তাঁকে আর গায়ত্রী জপ করতে হবে না। স্বামীজী বেলুড় মঠ স্থাপন করার পর সন্ন্যাসাদির প্রথা করার সময় একটা নিয়ম করে দিলেন, যাঁরাই বেলুড় মঠে সন্ন্যাসী হতে আসবেন তাঁদের প্রথমে গায়ত্রী মন্ত্র নিয়ে ব্রহ্মচারী হয়ে থাকতে হবে। যাঁরা ব্রাহ্মণ পরিবার থেকে আসতেন তাঁদের আগে থেকেই যজ্ঞ উপবীত করে গায়ত্রী মন্ত্র নেওয়া হয়ে গেছে, কিন্তু তাঁদেরকেও এখানে আবার নতুন করে গায়ত্রী মন্ত্র নিতে হয়, তার সাথে কিছু ব্রত নিতে হয়। ব্রহ্মচর্যে দীক্ষিত হয়ে কয়েক বছর থাকার পর তাঁদের সন্ন্যাস হয়। সন্ন্যাস হয়ে যাওয়ার পর এই সংসার, বেদ সবটাই পেছনে পড়ে থাকে। সন্ন্যাস আর বেদ দুটো সব সময় পরস্পর বিরোধী। কারণ বেদ মানেই কর্মকাণ্ড আর সন্ন্যাস হল জ্ঞান, কর্ম আর জ্ঞান দুটো কখনই এক সঙ্গে চলে না। সেইজন্য সারা দেশে এই প্রথা চলে আসছে, যেদিন সন্ন্যাস হয়ে যাবে সেদিন থেকে আর তাঁকে গায়ত্রী মন্ত্র জপ করতে হবে না।

কিন্তু বেলুড় মঠে এসে এই নিয়মটা একটু অন্য রকমের হয়ে যায়। বেলুড় মঠে প্রবেশ করার পর প্রথম তিন বছর সাধারণ ভাবে থাকবে। তারপর দু বছর ট্রেনিং সেন্টারে থাকে। ট্রেনিং সেন্টারে প্রশিক্ষণ শেষ হয়ে যাওয়ার পর প্রত্যেককে উপনয়ন করিয়ে গায়ত্রীমন্ত্র দেওয়া হয়। সেদিন থেকে তাকে সকাল সন্ধ্যা ইষ্টমন্ত্র জপ করার মত গায়ত্রীমন্ত্রও জপ করতে হয়। সন্ন্যাস হয়ে যাওয়ার পর গায়ত্রীমন্ত্র আর জপ করতে হয় না। সন্ন্যাসীদের জন্য তখন আবার আলাদা একটি গায়ত্রীমন্ত্র দেওয়া হয়, যার নাম পরমহংস গায়ত্রী। কিছু বিশেষ মন্ত্র আছে যা একমাত্র সন্নসীদেরই দেওয়া হয়, সন্ন্যাসী ছাড়া অন্য কাউকে এই মন্ত্র দেওয়া হয় না। কোন সন্ন্যাসী কোন অবস্থাতেই কাউকে এই মন্ত্র বলবে না। কিন্তু সন্ন্যাসী সন্ন্যাসীকে বলতে পারে। এই মন্ত্র কোথাও লিখিত আকারেও পাওয়া যাবে না। সন্ন্যাসীদের অন্যান্য যা মন্ত্র আছে তার সবটাই কোনটা এই বেদে কোনটা ঐ বেদে পাওয়া যাবে, কিন্তু এই বিশেষ মন্ত্রটি, যে মন্ত্রটি সন্ন্যাসীকে সন্ন্যাসী বানায়, সেটি কোথাও পাওয়া যাবে না। কেউ যদি বলে আপনি কিসের সন্ন্যাসী, গেরুয়া পড়ে যত চালবাজী করছেন। না, সন্ন্যাসী এই কারণে যে তিনি ঐ মন্ত্রটা জানেন। যাক, এগুলো আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়।

বেলুড় মঠে যখন ব্রহ্মচর্যে দীক্ষিত করা হয় তখন, যারা ব্রাহ্মণ বংশ থেকে এসেছেন তারা আগে থেকেই গায়ত্রী মন্ত্র জানেন, তাদেরকে নিয়েও আর সবাইকে গায়ত্রীমন্ত্র দেওয়া হয়। স্বামী গম্ভীরানন্দ যখন প্রেসিডেন্ট ছিলেন তখন তিনি একবার এই রকম প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ব্রহ্মচারীদের গায়ত্রীমন্ত্র দিয়ে ব্রহ্মচর্যে দীক্ষিত করেছিলেন। সেই সময় একজন ব্রহ্মচারী গায়ত্রীমন্ত্র পাওয়ার পর স্বামী গম্ভীরানন্দজীকে জিজ্ঞেস করছেন 'মহারাজ, এই গায়ত্রীমন্ত্র জপ করার সময় ঠাকুরের ধ্যান করতে পারি'? স্বামী গম্ভীরানন্দজী নতুন ব্রহ্মচারীকে বলছেন 'হ্যাঁ, অবশ্যই ঠাকুরের ধ্যান করতে পার, যদি এই মন্ত্র থেকে তোমার মনে হয় এর ভাব গুলো ঠাকুরের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে তাহলে অবশ্যই করতে পারবে'। স্বামী গম্ভীরানন্দের এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্যটি আমাদের অনেকের দৃষ্টি খুলে দিয়েছিল। আমাদের মনের মধ্যে কথাগুলো চিরদিনের মত গেঁথে গিয়েছিল। আমরা ছোটবেলা থেকে শুনে এসেছি গায়ত্রীদেবীকে দেখতে এই রকম, গায়ত্রীমন্ত্র মানে সূর্যোপসনা আরও কত কি শুনেছি। কিন্তু হঠাৎ গম্ভীর মহারাজ বললেন ঠাকুরকে যদি এর ভাবের সঙ্গে তুমি মিল দেখতে পাও তাহলে অবশ্যই ধ্যান করবে।

কিন্তু আরও যেটা দৃষ্টি খুলে দিয়েছিল তা হল, যাঁরা গম্ভীর মহারাজ থেকে ব্রহ্মচর্য পেয়েছিলেন, তাঁদের যখন সন্ন্যাস হয় তখন স্বামী ভূতেশানন্দজী ছিলেন মঠের অধ্যক্ষ। সন্ন্যাসের পর সন্ন্যাসীদের কিছু নির্দেশিকা দেওয়া হয়, তার মানে তুমি এখন সন্ন্যাসী হয়েছ এখন তুমি এই এই জিনিস করবে, এই এই জিনিস করবে না। সেই সময় একজন নতুন সন্ন্যাসী আনন্দ করে স্বামী ভূতেশানন্দজীকে বলছেন 'মহারাজ আর তো গায়ত্রীমন্ত্র জপ করতে হবে না'? সন্ন্যাসীর কথা শুনে উনি খুব বিরক্ত হয়ে বলছেন 'গায়ত্রী জপ কেন করবে

না? গায়ত্রী জপে তোমার কি সিদ্ধিলাভ হয়ে গেছে'? ব্যাপারটা হল, প্রথমে গুরুর কাছে ইষ্টমন্ত্র নিয়েছে, সেই ইষ্টমন্ত্র জপ করতে হয়, আবার সন্ন্যাসীর বিশেষ মন্ত্র আছে, সেটাও জপ করতে হয়, মাঝখান থেকে স্বামী ভূতেশানন্দজী গায়ত্রীমন্ত্রও জপ করে যেতে বলে দিলেন। এর পর নতুন সন্ন্যাসীরা ভাইস প্রেসিডেন্ট মহারাজের কাছে গিয়ে বলছেন 'মহারাজ, স্বামী ভূতেশানন্দজী তো আমাদের গায়ত্রীমন্ত্রও জপ করতে বলে দিলেন'। উনি কি শুনলেন ঠিক বোঝা গেল না কারণ তিনি বললেন 'উনি বলে দিয়েছেন তো গায়ত্রীমন্ত্র জপ করতে হবে না'! তখন সবাই বললেন 'না, তিনি তো করতে বলেছেন'। ভাইস প্রেসিডেন্ট মহারাজও একটু যেন অবাক হয়ে গেছেন, কারণ সাধারণত জপ করতে বলা হয় না।

আবার বিকেলে মিটিংএর সময় মহারাজরা গিয়ে স্বামী ভূতেশানন্দজীকে বললেন 'মহারাজ আপনি কি গায়ত্রীমন্ত্র জপ করতে বলেছেন'? স্বামী ভূতেশানন্দজীর একটা বিশেষ হাসি ছিল, যে হাসিতে তিনি সব কিছুকে উড়িয়ে দিতেন। মহারাজের কথা শুনে উনি সেই হাসি মিশিয়ে বললেন 'তোমার কি গায়ত্রী মন্ত্রে সিদ্ধি হয়ে গেছে'? মানে, তুমি সন্ন্যাসীই হও আর যাই হও, যেখান থেকেই হোক তুমি একটা মন্ত্র নিয়েছিলে, সেই মন্ত্রে এখনও তোমার সিদ্ধিই হল না, তাহলে তুমি মন্ত্রটা ছেড়ে দেবে কি করে! অধ্যক্ষ মহারাজের মন্ত্রের ব্যাপারে এই সিদ্ধান্তটি আমাদের অনেকেরই চোখ খুলে দিয়েছিল। কোন মন্ত্র যখন কোন গুরুর কাছে থেকে নেওয়া হয় তখন তার একটাই উদ্দেশ্য, তা হল সেই মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করা। গায়ত্রী মন্ত্র এবং অন্যান্য যত মন্ত্র আছে সবই সিদ্ধ মন্ত্র এবং গুরু পরম্পরায় দীক্ষার মাধ্যমে শিষ্য এসব মন্ত্র পায়। সাধারণতঃ মনে করা হয় যিনি মন্ত্র দিচ্ছেন তিনি এই মন্ত্রে সিদ্ধ। যদি আমরা মনে করি তিনি সিদ্ধ নন, কিন্তু তাঁর গুরু অথবা সেই গুরুর যিনি গুরু অর্থাৎ পরম্পরাতে কেউ না কেউ সিদ্ধ ছিলেন। কিন্তু যিনি মন্ত্র গ্রহণ করছেন তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য হল এই মন্ত্রে সিদ্ধ হওয়া। মন্ত্রে সিদ্ধ হওয়া মানে, মন্ত্রের যে শব্দ ওই শব্দ আর শব্দ থাকবে না, মন্ত্রকে তিনি জীবন্ত দেখতে পাবেন। স্বামী ভূতেশানন্দজী খুব মিষ্টি করে বলে দিলেন 'তোমার কি গায়ত্রী মন্ত্রে সিদ্ধি হয়ে গেছে? যেদিন সিদ্ধ হবে সেদিন ছেড়ে দেবে'। এই কথা কখন বলছেন। নতুন সন্ন্যাস হওয়ার পর সন্ন্যাসীরা দুবার তিনবার জিজ্ঞেস করার পর খুব মিষ্টি করে বলছেন। স্বামী ভূতেশানন্দজী যখন বলছেন তখন এটাই স্বতঃসিদ্ধ যে এই মন্ত্রগুলি সিদ্ধ হয়। ঠাকুর যখন যে পথে, যে মতে সাধনা করছেন তখন তাতেই সিদ্ধি লাভ করে নিচ্ছেন। সিদ্ধি লাভ হয়ে যাওয়া মানে, জিনিসটা যেটা, সেটা যেমনটি ঠিক তেমনটি দেখে নিচ্ছেন, দেখে নেওয়ার পর সেটাকে ছেড়ে অন্য একটা দিকে চলে যাচ্ছেন। সারা জীবন আমরা গায়ত্রী মন্ত্র জপ করে যেতে পারি কিন্তু তাতে কিছুই হবে না।

জলের নীচে পাথরকে যত বছর রেখে দেওয়া হোক পাথর পাথরই থাকবে, কিন্তু স্পঞ্জ জলকে শুষে নিয়ে বেরিয়ে চলে আসবে। যে কোন মন্ত্রের একটা অর্থ থাকে, মন্ত্র একটি জিনিসকে ইঙ্গিত করছে। মন্ত্র সিদ্ধি মানে যেটাকে ইঙ্গিত করছে, সেটি যেমনটি ঠিক তেমনটি বেরিয়ে আসবে। আমাদের সমস্যা হল আমাদের প্রত্যেকে নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা ও সংস্কারবশতঃ মনের মধ্যে একটা আকার তৈরী করে রাখি। আমাদের কাছে যত শব্দ আসে সব শব্দই মন যে আকার তৈরী করে রেখেছে সেই আকারের মধ্যেই ঘুরপাক করতে থাকে। ফলে শব্দের মূল ভাবটা ধারণা হয় না। এর একটা খুব সহজ উদাহরণ, নয়-দশ মাসের কোন বাচ্চাকে যদি মা হাত উঁচু করে বলে তোমাকে আমি মার লাগাব। বাচ্চা তখন হাসে। কারণ শিশুর কাছে মায়ের যে কোন ভঙ্গিমা, যে কোন শব্দের একটাই অর্থ – মায়ের ভালোবাসা। আমি যে কথা বলছি সেই কথা আমার ভেতরটা যে রকম আর যাকে বলছি তার ভেতরটা যে রকম, এই দুটো মিলে কথার আদান-প্রদান হয়। গায়ত্রী মন্ত্রের একটা সার আছে, আর বাইরে আছে একটা শব্দের আবরণ। আমার ভেতরটা যেমন, গায়ত্রী মন্ত্রের শব্দও সেই অনুযায়ী আমাকে প্রভাবিত করবে। উপমা সব সময় একদেশীয় হয়, সব কিছুকে তাই উপমা দিয়ে বোঝান যায় না। আমাদের ভেতরটা একটা ক্ষেতের মত, ক্ষেতে গমের বীজ দিলে গম ফলবে, ধানের বীজ দিলে ধান হবে, এটাই নিয়ম। কিন্তু এখানে তা হবে না, আমার ভেতরটা যেমন ফসলটা তেমন হবে। প্রত্যেক হিন্দু মানেন যে গায়ত্রী মন্ত্র অত্যন্ত পবিত্র মন্ত্র। কোন সাধু যদি কাউকে বলে দেন রোজ বারো বার গায়ত্রী মন্ত্র জপ করতে, এরপর সে সকালে উঠে স্নান করবে, গঙ্গাজল ছিটিয়ে পবিত্র হয়ে ঠাকুরের ছবির সামনে বসে নিষ্ঠার

সাথে বারো বার গায়ত্রী মন্ত্র জপ করতে বসে যাবে। কারণ তারও ভেতরে সেই ভাবটাই আছে, গায়ত্রী মন্ত্র পবিত্র মন্ত্র, সাধু আমাকে বারো বার জপ করতে বলে দিয়েছেন। এবার এর জন্য যত রকমের আচার নিয়ম আছে সেগুলো করে জপ করতে বসবে। তার ভেতরে শ্রদ্ধাও আছে, শ্রদ্ধা, পবিত্রতা ও নিষ্ঠা সহকারে জপ করতে বসে গেল। এরপর কি হবে? তার ভেতরে আর তো কিছু নেই। মনের যে স্থৈর্য, তীক্ষ্ণতা, যোগাভ্যাস করে যে জিনিসগুলিকে অর্জন করতে হয়, যার দ্বারা যে কোন জিনিসের আবরণকে উন্মোচন করে দেওয়া সম্ভব হয়, সেই গুণগুলি নেই। ফলে মন্ত্রের উপর যে আবরণ রয়েছে সেই আবরণকে কোন দিন খুলতে পারছে না। ঠাকুরের মন্ত্র নিয়ে আপনি শুদ্ধ পবিত্র হয়েছেন, শুদ্ধ পবিত্র ভাবে স্নান করছেন, আসন পাতছেন, ধুপ-ধুনো দিচ্ছেন, সবই করে যাচ্ছেন, পাঁচ বছর, দশ বছর, পঁচিশ বছর ধরে একই জিনিস করে যাচ্ছেন। কিন্তু কিছুই হচ্ছে না। আপনার ভেতরটা যেমন আপনার বহিঃপ্রকাশও তেমনটিই হবে। আর যাদের সময় নেই, আসনে বসে জপ করার সময় নেই, গাড়িতে উঠে সিডি লাগিয়ে গায়ত্রী মন্ত্র কান দিয়ে শুনে যাচ্ছে, তারও ভেতরটা যেমন বাইরেরটাও তেমন। আরেকটু যারা পবিত্র তারা ধুপ-ধুনো দিয়ে করছে। কিন্তু যিনি জ্ঞানী, তিনি মনটা ধীরে ধীরে স্থির থেকে আরও স্থির করতে থাকেন। এবার একটা ভোঁতা কুড়ুলে ধার দেওয়া শুরু হল। মনকে স্থির নিশ্চল করা মানে কুড়ুলে ধার দেওয়া। এইভাবে ধার দিতে দিতে এমন ধারালো হয়ে যাচ্ছে যে একটা খুব পাতলা সূক্ষ্ম আবরণ, সেটাকেও কেটে সরিয়ে দিচ্ছে। এরপর মন্ত্রের অর্থটা ফুটে বেরিয়ে এল। যেদিন মন্ত্রের অর্থ ফুটে বেরিয়ে এল, সেদিন তার ভেতরের সব শক্তি ফেটে বেরিয়ে আসবে। তাহলে এটা কি হয় জিরো নয়তো এক? না, তা নয়। জিরো মানে, হয় অর্থ একেবারেই জানলেন না আর যদি জেনে যান তাহলে আপনি স্বামী বিবেকানন্দের মত একজন মহাত্মা হয়ে গেলেন। না, সেটাও হয় না। এর একটা ক্রমবিন্যাস আছে। জপ করতে করতে যত গভীরে নামছে, মন তত একাগ্র হতে থাকে, মন যত একাগ্র হয় শক্তির তত প্রকাশ হতে থাকে। মন যখন পূর্ণ একাগ্র হয়ে যাবে তখন পূর্ণ শক্তি বেরিয়ে আসবে। সেইজন্য যতটুকু করা হবে ততটুকুই লাভ, যদি উদ্দেশ্য থাকে মন্ত্রের অর্থ পরিষ্কার করার। অর্থ বোঝার উদ্দেশ্য যদি নাও থাকে, শুধু যদি অনুশীলনও করা হয় তাতে মন একটু একাগ্র হয়। একটুও মন যদি একাগ্র হয় তাতেই শক্তি নিজেকে প্রকাশিত করার পথ পেয়ে যায়।

গায়ত্রীমন্ত্র খুবই নৈর্ব্যক্তিক মন্ত্র, অর্থাৎ কোন নির্দিষ্ট দেবী বা দেবতার দিকে নির্দেশ করা নেই। যেমন স্বামীজী রচিত আরাত্রিক ভজন, 'খণ্ডন ভববন্ধন', এই স্তবটি বিশেষ কোন ঠাকুর দেবতার দিকে নির্দেশ করছে না। যদিও আমরা সবাই ঠাকুরের সামনে বসে আরতির সময় ভজন করি, কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে কোথাও ঠাকুরের কোন নামের উল্লেখ করা নেই। খণ্ডন ভব বন্ধন আমরা শ্রীরামচন্দ্রের নামেও গাইতে পারি আবার শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যেও গাইতে পারি, পরে যত অবতারই আসুন না কেন সবারই উদ্দেশ্যে গেয়ে দিতে পারব। স্বামীজীর এই আরাত্রিক ভজন একেবারের নির্বিশেষ ভজন। ঠাকুরের আরতির সময় রোজ গান করা হয় বলে এখন এই ভজন ঠাকুরের নামে হয়ে গেছে। ঠিক সেই রকম গায়ত্রীমন্ত্রও নির্বিশেষ মন্ত্র। কিন্তু গায়ত্রীমন্ত্রের সঙ্গে দুজনকে যোগ করে দেওয়া হয়েছে। প্রথম হল সূর্য দেবতা আর দ্বিতীয় গায়ত্রীদেবী, যার জন্য এই মন্ত্রের নামই হয়ে গেছে গায়ত্রীদেবী। কিন্তু সূর্য দেবতা বা গায়ত্রীদেবীর সাথে গায়ত্রীমন্ত্রের আদপেই কোন সম্পর্ক নেই। অথচ আমরা গায়ত্রীদেবীর অনেক মুর্তি বা ছবি দেখতে পাই, এমনকি গায়ত্রীদেবীর মন্দিরও হয়ে গেছে। যেহেতু সুর্যোদয়ের আগে গায়ত্রীমন্ত্র জপ করতে হয় তাই অনেকে গায়ত্রীমন্ত্রকে সূর্য দেবতার সঙ্গে জুড়ে দিয়েছে। কিন্তু গায়ত্রীমন্ত্রের অর্থ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এই মন্ত্রের সাথে কোন দেবী বা দেবতার কোন সম্পর্ক নেই।

প্রত্যকে মন্ত্র একটা ভাবকে বহন করে। বিজ্ঞানের ভাষায় যখন CO_2 লেখা হয়ে গেল, তখন এই CO_2 অনেক কিছুকেই প্রতিনিধিত্ব করছে। এই CO_2 শুধু যে কার্বনডাই অক্সাইডকেই বোঝাচ্ছে তা নয়, এতে বলছে কার্বনের একটা এ্যাটম আছে, অক্সিজেনের দুটো এ্যাটম আছে, এর অন্য মলিকিউলের ওজন এত, এই ভাবে অনেক কিছু এই ছোট্ট CO_2র মধ্য দিয়ে বলা হচ্ছে। ঠিক তেমনি যে কোন মন্ত্র, যেমন 'ওঁ নমঃ শিবায়' মন্ত্রে অনেক কিছু বলা হচ্ছে। কিন্তু এই যে CO_2 বলা হল, এর মধ্যে শুধু কয়েকটা টেকনিক্যাল তথ্য দেওয়া

হয়েছে। কিন্তু ‘ওঁ নমঃ শিবায়’ মন্ত্রের মধ্য দিয়ে শুধু কিছু তথ্য দিচ্ছে না, মন্ত্রের মধ্যে যে ভাবটা সুপ্ত আছে বাস্তবে সেই ভাবকে আমাদের দর্শন করতে হবে। যেমন আমরা CO_2 বললে ভালো ভাবেই জানি, কয়লাকে পোড়ালে CO_2 তে রূপান্তর হয়, যেটা আমরা যখন চাইব যখন ইচ্ছে হবে যে কাউকে দেখিয়ে দিতে পারি।

যেমন ‘ওঁ নমঃ শিবায়’, বলা হয় এই মন্ত্র শিবের প্রতিমুর্তি। মন্ত্রের ‘ওঁ’ আর ‘শিব’ এই দুটোই এক। এটা আমরা শুনেছি কিন্তু অনুভব হয়নি। তাই এই মন্ত্র একটা মামুলি তথ্য রূপেই রয়ে গেল আমাদের কাছে। নবম বা দশম শ্রেনীর ছাত্ররা যেমন ফিজিক্স কেমিস্ট্রির ফরমুলা মুখস্ত করে, মন্ত্রও আমাদের কাছে ঠিক সেই রকম হয়ে গেছে। আমরা তো মন্ত্রকে কোন কাজে লাগাতে পারছি না। কাজে লাগানো তো অনেক দূরের, মন্ত্রের মধ্যে যে সত্যটা রয়েছে, বাস্তবে যা প্রত্যক্ষ করা যায় সেই ব্যাপারেও আমাদের কোন ধারণা নেই।

ভিআইপি দের প্রোটেকশানের জন্য পুলিশদের এক ধরণের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। অনেক দিন ধরে এই প্রশিক্ষণ চলে। প্রশিক্ষণের পর পরীক্ষা নিয়ে দেখে নেওয়া হয় সবাই ঠিক ঠিক প্রশিক্ষণ পেয়েছে কিনা। এই রকম একটা পরীক্ষাতে প্রশ্ন করা হয়েছে ‘প্রধানমন্ত্রীর কনভয় যাচ্ছে সেই সময় একটা আওয়াজ হল, এখন তুমি কি করে বুঝবে এটা কিসের আওয়াজ’? মানে যে আওয়াজটা হয়েছে সেটা বন্দুকের গুলির আওয়াজ, না বোমা ফাটার আওয়াজ, না পটকার আওয়াজ, না কোন গাড়ির টায়ার ফেটেছে? সঙ্গে সঙ্গে একজন দাঁড়িয়ে বলছে ‘স্যার, বইতে তিনটি পয়েন্টের কথা বলা হয়েছে’। সবাই হেসে উঠেছে, বইতে লেখা আছে সেটা জেনে আমার কি হবে। তোমাকে তো বাস্তবে আওয়াজ শুনে বুঝতে হবে এটা কিসের আওয়াজ। যারা খুব দক্ষ পুলিশ অফিসার তারা আওয়াজ শুনেই বলে দেবে কি ধরণের বন্দুকের থেকে গুলি বেরিয়েছে। একজন নামকরা পুলিশ অফিসারের এক বিয়ে বাড়িতে নিমন্ত্রণ ছিল। তিনি তার বডিগার্ড সহ অনুষ্ঠানে গেছেন। বিয়ে বাড়িতে নানান ধরণের বাজি ফাটছে, সেই বাজির আওয়াজের মধ্যে হঠাৎ একটা ফায়ারিংএর আওয়াজও হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ওনার বডিগার্ডরা ছুটে এসে বলছে ‘স্যার আওয়াজ হো গিয়া’। ‘আওয়াজ হো গিয়া’ মানে ফায়ারিং হয়েছে। পুলিশ অফিসার বিয়ে বাড়িতে নিমন্ত্রিত ছিলেন তিনি বলে দিলেন এখানকার থানার যে ইনচার্জ সে বুঝে নেবে। ওখানকার পুলিশ কিন্তু ব্যাপারটা ছেড়ে দিল না, পরের দিন পুলিশ খোঁজ নিয়ে জানল বিয়ে বাড়ির কেউ বরযাত্রিদের স্বাগত জানাতে আকাশে কয়েক রাউণ্ড ফায়ারিং করেছিলে। সেই পুলিশ অফিসার বলছিলেন তারা কি করে বুঝতে পারেন – বন্দুকের ফায়ারিং হলেই দুম্ করে প্রথমে আওয়াজ হলেও শেষে একটা মেটালিক টিং শব্দ হয়, এই মেটালিক টিং শব্দ দিয়ে দক্ষ পুলিশ বুঝে নেবে এটা রিভলবারের থেকে ছেড়েছে, না পিস্তল থেকে ছেড়েছে, না রাইফেল বা বন্দুক থেকে গুলি ছোঁড়া হয়েছে।

যে পুলিশ কনস্টেবল বলছে কিতাব মে লিখা হ্যায়, এই রকম জেনে কি হবে! দীক্ষা নিয়ে মন্ত্রের ব্যাপারেও আমাদের এই একই অবস্থা। মন্ত্রের অন্তর্নিহিত সত্যকে যতক্ষণ উপলব্ধি না হচ্ছে ততক্ষণ তার কোন দাম নেই। গায়ত্রীমন্ত্রের আমরা দুটো দিক পেলাম, একটা স্বামী গম্ভীরানন্দজী যেটা বলেছেন আর দ্বিতীয় স্বামী ভূতেশানন্দজী যেটা বললেন। স্বামী ভূতেশানন্দজী বলছেন ‘তোমার কি সিদ্ধি হয়ে গেছে যে তুমি মন্ত্র ছেড়ে দেবে’? আর স্বামী গম্ভীরানন্দজী বলছেন ‘তুমি যদি মনে করে শ্রীরামকৃষ্ণের এই জিনিসগুলো রয়েছে তাহলে তুমি গায়ত্রীমন্ত্র জপ করার সময় ঠাকুরের ধ্যান করতে পার’।

গায়ত্রীমন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য গায়ত্রীমন্ত্র সম্পূর্ণ একটি নিরপেক্ষ, নির্বিশেষ মন্ত্র, কোন দেবী দেবতার সঙ্গে সম্বন্ধ নেই, আর অত্যন্ত শক্তিশালী মন্ত্র। মুসলমানদের প্রণাম মন্ত্র, লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ এটিও খুব নির্বিশেষ মন্ত্র। মুসলমানদের এই মন্ত্রের মত গায়ত্রী মন্ত্রেও আধ্যাত্মিকতার যা যা গুণ আছে সব একত্রিত করা আছে।

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি, ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ।

গায়ত্রীমন্ত্রের প্রথমে ওঁ দিয়ে শুরু আবার শেষে ওঁ উচ্চারণের দ্বারা মন্ত্রকে বন্ধ করতে হয়। ওঁ দিয়ে শুরু করে ওঁ দিয়ে শেষ করে আবার ওঁ দিয়ে শুরু করতে হয়। গায়ত্রী মন্ত্রের প্রথম শব্দ ওঁ। যদিও ওঁ বেদের বিষয় নয়, ওঁ হল উপনিষদের বিষয়। ওঁ কোন শব্দ নয় আর ওঁ কোন অক্ষরও নয়, ওঁ একটা ধ্বণি, যে ধ্বণিতে ‘অ’, ‘উ’ আর ‘ম’ এই তিনটে মিশে আছে। সেইজন্য ইংরাজীতে যে OM লেখা হয়, এটা ঠিক নয়, সঠিক হল

AUM। উপনিষদেই আছে *অকার-উকার-মকার ইতি*, এই তিনটে ধ্বণির মিলিত যে ধ্বণির সৃষ্টি হয় তার নম ওঁ। ওঁ হল অনাহত, অনাহত মানে, আহত হয়ে এই ধ্বণির উৎপত্তি হয়নি। তার মানে, এই ধ্বণিকে মুখ দিয়ে ঠিক ঠিক উচ্চারণ করা যায় না, ধ্যানের গভীরে যোগী এই ধ্বণি শুনতে পান। ধ্যানের গভীরে যে ধ্বণি অনুভূত হয়, তখন দেখা যায় যে সেই ধ্বণির সাথে এতদিন মুখ দিয়ে যে ওঁম উচ্চারণ করা হয়েছে তার সঙ্গে ঠিক মিলছে না। এনারা বলেন মন্দিরে বড় বড় যে গম্ থাকে তার থেকে যে ধ্বণি উৎপন্ন, সেই গম্ ধ্বণির যে অনুরণ হয়, তার ‘গ’কে সরিয়ে দেওয়ার পর তাতে যে ওঁম্ ধ্বণি হয় ওই ধ্বণি ধ্যানের অনাহত ধ্বণির খুব কাছাকাছি। ধ্যানের গভীরে এই অনাহত ধ্বণিকে আমাদের ভাষায় অভিব্যক্ত করতে হবে, ভাষায় অভিব্যক্ত করার সময় আমরা বলি ওঁম্। এই ওঁমএর ধ্বণি বাস্তবিকই একটা ধ্বণি রূপে আসে, কোন কল্পনা করে বলছেন তা নয়, এই ধ্বণি পরিষ্কার শোনা যায়, যোগীরা ধ্যানের গভীরে এই ধ্বণিকে স্পষ্ট শুনতে পান। এই ধ্বণিকে শোনার জন্য খুব বিরাট বড় যোগীও হতে হয় না। খুব গভীর নিষ্ঠা ও একাগ্রতা নিয়ে কিছু দিন জপ-ধ্যান করলেই এই ধ্বণি শোনা যায়।

ঋষিরা ধ্যানের গভীরে অতিন্দ্রীয় অবস্থায় কিছু কিছু পারমার্থিক সত্যকে দেখতে পান। আবার কেউ ধ্যানে পারমার্থিক সত্যের একটু নীচের দিকে অন্য ধরণের সত্যকেও দেখতে পান। ঠাকুর বলছেন ধ্যানের অবস্থায় কত রকম আলো দেখেছি। আলোর কথা যে ঠাকুর বলছেন, এখানে তিনি ধ্যানের একটা বিশেষ অবস্থার কথা বলছেন, জ্ঞানের অবস্থার কথা বলছেন না, এটা পারমার্থিক সত্য নয়। ঋষিরাও ধ্যানের গভীরে অনেক রকমের জিনিস দেখেছেন, পারমার্থিক সত্যকেও দেখছেন, জাগতিক সত্যগুলিকেও দেখছেন। আবার যখন এর মাঝামাঝি কিছু সত্য দেখছেন তখন তিনি কি দেখছেন? ঠাকুর বারবার বলছেন ঈশ্বরই বস্তু বাকি সব অবস্তু। মনের গভীরে চলে যাওয়ার পর সেখানে তিনি মৌন হয়ে যান, মৌন থেকে আরেকটা অবস্থায় গিয়ে দেখেন আমি আছি কি নেই একটা দোদুল্যমানতা চলতে থাকে। সেখান থেকে তৃতীয় অবস্থায় গিয়ে আমিটা পুরোপুরি মুছে যায়, সেখানে আমি বলে আর কিছু নেই, শুধু তিনিই থাকেন। এই অবস্থাকেই ঠাকুর বলছেন শুধু বোধে বোধ হয়, বোধটুকুই থাকছে, আমি তুমি বলে কিছু থাকছে না, জ্ঞান, জ্ঞেয় আর জ্ঞাতা, ধাতা, ধ্যান আর ধ্যেয় সব এক হয়ে যায়। এটাই একমাত্র সত্য। কিন্তু এই সত্যে যাওয়ার আগে তিনি তো অনেক কিছুই দেখছেন, আবার ওই সত্য থেকে নামার সময়ও অনেক কিছু দেখেন। সেই কথাগুলো ঠাকুর যখন কোন ভক্তকে বলছেন, তখন সেই ভক্তের মানসিক অবস্থা, পরিপক্কতা এগুলো মাথায় রেখে তার উপযোগী করে বলছেন। ঠাকুর বেশির ভাগ ভক্তদের শনি ও রবিবার আসতে বলতেন কিন্তু তাঁর অন্তরঙ্গদের, যাঁদের আমরা ঠাকুরের পার্ষদ বলে জানি, তাঁদের অন্যান্য দিনে ডাকতেন। পার্ষদরা আসার পর আবার ঠাকুর চারদিক দেখে নিতেন ধারে কাছে কেউ আছে কিনা। দেখার পর দরজা বন্ধ করে কথা বলতে শুরু করতেন। কারণ এই ষোলজন পার্ষদকে ঠাকুর যে কথাগুলো বলছেন সংসারীদের এসব কথা শোনার পাত্রতাই নেই। কথামৃতে ঠাকুর যে বারবার কামিনী-কাঞ্চনের কথা বলছেন, এই কথার মধ্যে বিয়ে করা, ভোগ করা, অর্থ রোজগার করা এগুলো কোন ব্যাপারই নয়, এগুলো উড়ে যেতে বেশি সময় লাগে না। কিন্তু ঠাকুরের কামিনী-কাঞ্চনের ব্যাপারে যত কথা আছে তার একটাই অর্থ, এই সংসার। যারাই সংসার সাজিয়ে বসেছে, তারা না চাইলেও মোহ, আবেগ এগুলো তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে মাটিতে ফেলে দুরমুশ করতে থাকবে। এই অবস্থায় কোন মানুষই উচ্চ আধ্যাত্মিক সত্যগুলিকে ধারণা করতে পারবে না। ঠাকুর তাই দরজা বন্ধ করে দিতেন। তাই বলে কি ঠাকুর নরেনকে যে কথা বলেছেন আর মাস্টারমশাই কথামৃতে ঠাকুরের মুখনিঃসৃত যে কথা লিপিবদ্ধ করেছেন, এই দুটো কথা কি আলাদা কথা? কখনই আলাদা নয়। বেদ, উপনিষদ, গীতার আধ্যাত্মিকতার যে শেষ কথা সেই কথাগুলোই কথামৃতের পাতায় পাতায় জ্বল জ্বল করছে। বলছেন ঠিকই কিন্তু ত্যাগ বৈরাগ্যের কথা পার্ষদের সামনে যে জোর দিয়ে বলছেন, সেই জোর দিয়ে সংসারীদের সামনে বলছেন না। কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগের কথা একটু বলে দিচ্ছেন। কিন্তু এর মাঝামাঝারি অনেক কথা আছে যেগুলো সংসারীদের সামনে কখনই বলতেন না, আর কিছু কিছু দিব্যদর্শনের কথা খুব বিশেষ আধার না হলে বলতেনই না। ঠাকুরেরই উপমা আছে, বাড়িতে স্ত্রী সবারই সেবা করে, শ্বশুড়, শাশুড়ি, ভাসুর, দেওর সবাইকে খুব যত্ন নিয়ে সেবা করে

যাচ্ছে। কিন্তু স্বামীর সাথে তার আলাদা সম্পর্ক। গুরুও শিষ্যদের শিক্ষা দেওয়ার সময় সবাইকে শিক্ষা দিচ্ছেন, সব শিষ্যের ভালোমন্দ দেখার দায়ীত্ব গুরুর। কিন্তু শিষ্যদের মধ্যে কয়েকজন থাকবে যারা গুরুর বিশেষ। তাদের কাছে গুরু আসল কথাগুলো বলেন। কোন গুরুর হয়ত কুড়িজন শিষ্য আছে। কিছু কিছু কথা তিনি কুড়িজন শিষ্যকেই বলছেন, আবার কিছু কিছু কথা বারোজনকে বলেছেন, আবার কিছু কিছু কথা হয়ত চারজনকে বলেছেন। শিষ্যরা এবার ছড়িয়ে গিয়ে নিজেদের আশ্রম করেছেন, তিনিও এবার তাঁর শিষ্যদের সব কথা বলছেন না, শিষ্য দেখে বলছেন। ফলে জ্ঞানের নানান রকম ধারা হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে।

সৃষ্টিকে যদি পেছনের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়, সব শেষে পুরো সৃষ্টিটা একটা শব্দে গিয়ে দাঁড়িয়ে যায়। এই শব্দকে ঋষিরা বলছেন স্ফোট বা শব্দব্রহ্ম, খ্রীশ্চানরা বলে লোগোস, লোগোস থেকেই পরে লজিক শব্দ এসেছে। সৃষ্টির সব কিছু লয় হতে হতে সব শেষে একটা শব্দে গিয়ে দাঁড়িয়ে যায়, ঋষিরা এর খুব সহজ যুক্তি দেন। যে কোন কাজ করার আগে প্রথমে আমাদের মনে একটা বিচার আসে। এই বিচার ধীরে ধীরে একটা শব্দের আকার ধারণ করে। এই শব্দ প্রথমে মনে মনেই আকার নেয়। মনের ভেতরে শব্দের যে আকার তৈরী হয় আর মুখ দিয়ে সেই শব্দ ভাষার আকারে বেরিয়ে আসছে, দুটোতে কোন তফাৎ নেই। তারপর সেই বিচার কার্যে পরিণত হয়। সাধারণ মানুষের কাছে মনে যে বিচার আসে তার কোন দাম নেই, মুখে যেটা আসে তার দাম বেশি আর যে বিচার কার্যে পরিণত হয় তার দাম সব থেকে বেশি। অথচ গুরুত্বের বিচারে যেমন যেমন পেছনের দিকে যাওয়া হবে তার দাম তত বেশি হতে থাকে। মনের বিচার এতই গুরুত্ব যে ঠাকুর বলছেন কলিতে মনের পাপ পাপ নয়, কিন্তু সন্ন্যাসীদের কাছে মনের পাপও পাপ। সন্ন্যাসী মনে মনে কোন নারীর চিন্তা করলে যতটা পাপ হবে ঠিক ততটাই পাপ হবে যদি সন্ন্যাসী নারীসঙ্গ করে। সন্ন্যাসীর পক্ষে নারীর চিন্তা করা আর বাস্তবে নারীসঙ্গ করা দুটোই সমান। কিন্তু গৃহস্থের জন্য মনের পাপ পাপ নয়, বিয়ে করার পর অন্য কোন নারীর প্রতি দেখে তার মনে দুর্বলতা এসেছে, কিন্তু সে মুখেও দুর্বলতা প্রকাশ করল না আর কার্যেও পরিণত করল না, গৃহস্থের কোন পাপ হবে না। কার্যে পরিণত হলে মনে তার প্রভাব বেশি করে পড়বে। ঋষির কাছে মনের গুরুত্ব অনেক অনেক বেশি। সংসারীদের মন অত্যন্ত দুর্বল, দুর্বল মনের চিন্তা-ভাবনাগুলিও দুর্বল হবে। কিন্তু ধ্যান-ভজন করে করে যাঁদের মনের একাগ্রতা সূচাগ্রের মত তীক্ষ্ণ হয়ে গেছে, তাঁরা মনে মনে যেটা চিন্তা করবেন সেটাই সঙ্গে সঙ্গে হয়ে যেতে বাধ্য। শ্রীরামচন্দ্র যেমন সুগ্রীবকে বলে দিলেন, তুমি ধরে নাও বালি শেষ। এবার বালিকে তিনি কিভাবে বধ করবেন কোন ব্যাপারই নয়, তাঁর মনে বালিকে বধ করার চিন্তা এসে গেছে, তার মানে বালি বধ হয়ে গেছে। কিন্তু আমি যদি মনে মনে ভাবি রান্না করব, তাহলে কি রান্না হয়ে যাবে? কখনই হবে না। কারণ আমার আর ঈশ্বরের মধ্যে তফাৎ আছে, ঈশ্বর হলেন ইচ্ছাময় বা ইচ্ছাময়ী, তিনি ইচ্ছা করলেন সৃষ্টি হোক সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি হয়ে গেল। পৃথিবী সৃষ্টি করার জন্য কি ঈশ্বরকে মাটি, বালি, পাথর জোগাড় করতে হয়েছিল? কিছুই জোগাড় করতে হয়নি, কারণ চিন্তার জগতে শব্দও যা বস্তুও তাই। তিনি ইচ্ছা মাত্র করেছেন, বাকিটা এবার এমনিই দাঁড়িয়ে যাবে। ঈশ্বরের ইচ্ছাই শেষ কথা, ইচ্ছা ছাড়া তাঁর কাছে বাকি আর কোন কিছুরই গুরুত্ব নেই।

শব্দ বলতে আমরা সাধারণতঃ কথাবার্তা, বস্তুতে বস্তুতে ঘর্ষণ হয়ে বায়ুতে যে কম্পন হয় সেটাকেই শব্দ বলি। বৈদিক ঋষিরা শব্দের আরেকটি অর্থ করেছেন, মনের ভেতর যে কোন চিন্তা বা বিচারই শব্দ। যে কোন নাম আর নামীকে অভেদ বলা হয়। সব বস্তুর সাথেই একটা শব্দ জড়িয়ে থাকে। শব্দের আমরা দুটো অর্থ পেলাম, বিচার আর অক্ষর। তিনটেকে যদি আলাদাও করে দেওয়া হয় তখনও সেই একই জিনিস থাকবে, আলাদা কিছু হবে না। যে কোন বস্তুর তিনটি স্তর থাকে। যেমন এই কলম, কলম বস্তু রূপে আছে, দ্বিতীয় এর একটি নাম আছে, কলম, ইংরাজীতে পেন আর অন্যান্য ভাষাতে অন্য কিছু নাম আছে। কলম আবার একটা বিচার, যিনি এই কলমের স্রষ্টা, এই জিনিসটা প্রথম যার মাথায় এসেছিল। প্রথমে তার মাথায় একটা বিচার এসেছিল, জিনিসটাকে এভাবে তৈরী করলে এটা দিয়ে লেখার কাজ করা যাবে। সেখান থেকে কলমের সৃষ্টি হল। শিল্পী ছবি আঁকছেন, কবি কবিতা রচনা করছেন, করার আগে তাঁদের মাথায় একটা বিচার এল, সেই বিচার একটা আকার ধারণ করে, ওই আকারটাই বাইরে ছবির মাধ্যমে, কবিতার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়।

যখন বাইরের আকার আর ভেতরের আকার মেলে না তখন আমাদের মনে একটা অতৃপ্তির ভাব আসে, আর নয়তো সেই আকারটাকে নষ্ট করে দিই। এই জিনিস মানুষের ক্ষেত্রেই হবে, কিন্তু ঈশ্বরের ক্ষেত্রে তিনি যেমনটি চিন্তা করবেন ঠিক তেমনটিই বেরিয়ে আসবে।

আমরা সবাই, এমনকি সব ধর্মই মানছে ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই সব কিছু হয়। ইচ্ছার মধ্যে জিনিসটা অদৃশ্য থাকতে পারে কিন্তু ঈশ্বরেরই ইচ্ছা। মুসলমানরা আরও গোঁড়া, তারা বলে আল্লা বললেন ঘোড়া হোক, সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়া হয়ে গেল। বৃহদারণ্যক উপনিষদে এটাকেই একটু অন্য ভাবে নিয়েছেন, তিনি ঘোড়া হয়ে গেলেন, তিনি গরু হয়ে গেলেন, তিনি পাখি হয়ে গেলেন ইত্যাদি। যে জিনিসটা হবে তার আগে শব্দ আসবে, তারও আগে একটা বিচার আসবে। ভগবানের মনে যে জিনিসের আইডিয়া বা বিচার এসেছে, ওটাই একমাত্র সম্পূর্ণ নিখুঁত। ওই নিখুঁত জিনিসটা জগতে কখনই পাওয়া যাবে না, সম্ভবও নয়। কারণ world is a corruption এই জগৎ একটা বিকারযুক্ত। যে কোন ধর্মই বলবে জগৎ একটা বিকার, আমার স্বাভাবিক অবস্থা থেকে আমি বিকৃত হয়ে গেছি। কোথা থেকে বিকৃত হয়ে আছি? ভগবানের যে perfectionএর stageআছে সেই stage থেকে বিচ্যুত হয়ে আছি। আইডিয়াল গরু মানে কামধেনু, কিন্তু জগতের সব গরু দিনে একবার দুবারের বেশি দুধ দিতে পারে না, কিন্তু কামধেনু আমাদের সব ইচ্ছার পুর্তি করে দিতে পারে। সেই রকম ঘোড়া মানে উচ্চৈঃশ্রবা, হাতি মানে ঐরাবত, কুকুর মানে সরমা, সব কুকুরের মা সরমা, সাপ মানে কদ্রু। প্রত্যেকটি জিনিসের সৃষ্টি যেটা হচ্ছে তার একটা করে আইডিয়াল ভগবানের কাছে আছে। সেই আইডিয়াল থেকে সৃষ্টি যখন নামতে থাকে তখন আস্তে আস্তে অপূর্ণতার দিকে চলে যায়। সরমা ভগবানের সৃষ্টি আর রাস্তার কুকুরও ভগবানের কিন্তু রাস্তার কুকুর প্রজনন প্রক্রিয়া দিয়ে আসছে। প্রজনন প্রক্রিয়াতে আসা মানেই সেখানে অপূর্ণতা এসে গেল। যে কোন স্টাইল মানেই অপূর্ণতা। কিসের থেকে অপূর্ণতা? ভগবানের মনে প্রথম যে বিচার এসেছিল সেটা থেকে। কারণ ভগবান থেকে প্রথম যেটা সৃষ্টি হল ওটাই আদর্শ। এমনকি যে কোন শব্দও যখন ভগবানের কাছ থেকে উচ্চারিত হয় সেটাই একমাত্র সঠিক উচ্চারণ। যেমন 'ক', ভগবানের মুখ থেকে যে 'ক' উচ্চারিত হচ্ছে তখন তার একটা স্টাইল আছে, পরে এসে এই শব্দ বিকৃত হয়ে গেছে। সিন্ধুনদীর তীরে স্বামীজীর যে দিব্য দর্শন হয়েছিলে সেখানে স্বামীজী লক্ষ্য করলেন, ইদানিং যে ভাবে বেদের মন্ত্র উচ্চারিত হয় তার সাথে ঋষির বেদমন্ত্রের উচ্চারণে অনেক তফাৎ। স্বামীজী উচ্চারণের উপর বার বার জোর দিয়ে গেছেন। স্বামীজীর শিষ্য জিজ্ঞেস করছেন – ঘট বললে কি ঘট সৃষ্ট হয়ে যাবে? স্বামীজী বলছেন, আমি তুমি বললে হবে না, কিন্তু ঈশ্বরের মনে ঘটের প্রথম যে উচ্চারণ হয়েছিল, ঠিক সেই রকমটি উচ্চারণ করলে ঘটের সৃষ্টি হবেই। ওরহান্ পামুর তাঁর 'My Name is Red' উপন্যাসে লিখছেন, যে কোন মুসলিম শিল্পীর স্বপ্ন ছিল, আমাকে এমন ঘোড়া আঁকতে হবে, যে ঘোড়ার ছবি স্রষ্টার মনে এসেছিল। বাকি সব ঘোড়া ওই ঘোড়ার কপি হবে, কিন্তু imperfect copy। তখন ওই কপিকেই দেখে আমরা যারা শিল্প বুঝি তারা বলবো, বাঃ কি সুন্দর! স্বামীজী বলছেন Education is the manifestation of perfection, তাহলে perfectionএর মানে কি দাঁড়াচ্ছে? যেটা ঈশ্বরের সঙ্গে আছে। যে বিদ্যা আমাদের ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যায় সেটাই বিদ্যা। তেমনি যে কোন জিনিসের perfection, যেমন ভাত রান্না করছি, আমাকে perfect ভাত রান্না করতে হবে, ভগবান যখন ভাত জিনিসটা ভেবেছিলেন তখন যে ভাত হল তাকেই বলা হবে perfection। তার বাইরে সব ভাতই imperfection। Imperfection মানেই স্টাইল। মুসলিম শিল্পীদের জীবনের স্বপ্ন এটাই ছিল, আল্লার মনে যে ঘোড়ার চিন্তা এসেছিলে সেই ঘোড়াকে আঁকতে হবে। সেখান থেকে তাঁরা বুঝলেন যতক্ষণ আমি এই পার্থিব জগৎকে দেখছি ততক্ষণ আল্লার জগৎকে কোন দিন দেখতে পারবো না। আল্লার জগতের ঘোড়াকে যদি না দেখতে পায়, সেই ঘোড়াকে আঁকা যাবে না। সেইজন্য তাঁদের স্বপ্ন ছিল আমি এমন perfect হয়ে যাব যে চোখ বন্ধ করে আঁকলেও আল্লার মনের সেই ঘোড়ার রূপ ছবিতে ফুটে উঠবে। তখন তাঁরা দেখলেন, আমি যদি চোখ বন্ধ করেই সেই ছবি আঁকি আর আঁকাটাই যদি আমার জীবনের উদ্দেশ্য হয়, আঁকাটাই যদি আমার সাধনা হয়ে থাকে তাহলে আমার চোখ রাখার কোন প্রয়োজন নেই। সেই থেকে তাঁদের স্বপ্নই ছিল আমি যেন আঁকতে আঁকতে অন্ধ হয়ে যাই। সত্যিই তাই হল, বড় শিল্পী যখন অন্ধ হয়ে গেলেন আর তারপর তিনি যে

ছবি আঁকছেন সেই ছবি এক দুর্ধর্ষ ছবি হয়ে যাচ্ছে। এরপর ওরহান পামুর তাঁর উপন্যাসে একটা অদ্ভুত জিনিস লিখছেন, ঘটনাটা কতটা সত্যি আমাদের জানা নেই, তিনি লিখছেন, পরের দিকে মুসলিম শিল্পীদের একটা ফ্যাশন হয়ে গেল যে আমাকে অন্ধ হয়ে যেতে হবে। কারণ অন্ধ যতক্ষণ না হচ্ছে ততক্ষণ তোমার সেই সম্মান হবে না। সেইজন্য কোন কোন চিত্রকর শেষ বয়সে কায়দা করে চোখে খুব পাতলা ছুঁচ ফুটিয়ে নিজেই অন্ধ হয়ে যেতেন, আমি আর এই পার্থিব জগতকে দেখছি না, শুধু আল্লার জগতকে দেখছি।

এটাই perfection, এটাই ideal state যেখানে ঈশ্বরের সৃষ্টি কেমন বোঝাচ্ছে। এই perfection হল ঈশ্বরের মনে যে আইডিয়া আর বস্তু মাঝখানে শব্দ আসছে। শব্দের আবার দুটি অর্থ, আমরা যে কথাবার্তা বলছি আর দ্বিতীয় আমাদের মনে যে ভাবনা-চিন্তার উদয় হচ্ছে। জগতে যাবতীয় যত বস্তু আছে, সব বস্তুর পেছনে একটা আইডিয়া আছে বা একটি শব্দ আছে। এটাকেই বৈষ্ণবরা বলছেন নাম নামী অভেদ। ভগবান বিষ্ণুর নাম করাও যা, ভগবান বিষ্ণুর ধ্যান করাও তাই আর ভগবান বিষ্ণুর সাক্ষাৎ দর্শন হলেও তাই। নাম আর নামী অভেদ বৈষ্ণবদের এই ভাব পুরোপুরি সত্য। নাম আর নামী যদি অভেদ হয় তা হলে বস্তুর দিকে দৃষ্টি না দিয়ে বস্তুর নামের দিকে দৃষ্টি দিলেই হল। ঠিকই বলা হচ্ছে, আধ্যাত্মিক জগতে এই বহির্জগতের কোন দাম নেই। আসল দাম ভাব জগতের। ভাবরাজ্যের রাজা শ্রীরামচন্দ্র এখনও রাজত্ব করছেন, সেই রাজ্যে বিভীষণ, হনুমান তাঁরা সবাই এখনও জীবিত। যত দিন ভক্ত থাকবে ততদিন তাঁরা ভাবরাজ্যে বেঁচে থাকবেন। এনাদের আমরা যদি স্থূল জগতে খুঁজে বেড়াই সেটা আমাদের বোকাম। ভাবরাজ্য তাঁদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ বিচারের জগতে ওই অস্তিত্বের অনেক গুরুত্ব। ওখানেই বিচার আর বস্তু এক হয়। আর ওই জগৎ থেকেই এই বহির্জগৎ চলছে।

এখন জগতে যত বিচার আছে সব বিচারকে আমাদের অ থেকে হ পর্যন্ত যে বর্ণমালা আছে সেই বর্ণমালার বর্ণ দিয়ে প্রকাশ করা যায়। আমাদের বর্ণমালা 'অ' দিয়ে শুরু আর 'ম'তে গিয়ে শেষ হয়। য র ল ব এগুলোকে অন্তস্ত বলে। 'অ' বর্ণ কণ্ঠ থেকে বেরোয়। শিশুরাও প্রথম 'অ' বর্ণই উচ্চারণ করে, দ্বিতীয় মা বা পা শব্দ উচ্চারণ করে। বিশ্বের সব বাচ্চারাই প্রথম 'মা' শব্দই উচ্চারণ করে। মুখ খুললে মা পা এই শব্দই প্রথম বেরবে। আমাদের যা কিছু শব্দ আছে সব 'অ' থেকে 'ম', 'অ' আর 'ম'য়ের মাঝখানে যত বর্ণ আছে সব কণ্ঠ থেকে মুখ পর্যন্ত গড়িয়ে চলে, একটা বর্ণকে প্রতীক রূপে যদি সবটা বোঝান হয় তাহলে 'উ' দিয়ে বেশি বোঝান যাবে। এই 'অ', 'উ' আর 'ম' এই তিনটে অক্ষরকে যদি নেওয়া তাহলে পুরো বর্ণমালাকে ধরা হয়ে যাবে। পুরো বর্ণমালাকে যদি ধরা হয়ে যায় তাহলে জগতের সব শব্দকেই ধরা হয়ে যাবে। 'A' থেকে 'Z' পর্যন্ত এই ছাব্বিশটি অক্ষরের মধ্যে সমগ্র ইংরাজী সাহিত্য আবদ্ধ হয়ে আছে। তাহলে কি এই ছাব্বিশটা অক্ষরকে জেনে নিলেই পুরো ইংরাজী ভাষাকে আয়ত্ত করে নিতে পারবে? পারবে না, কারণ বর্ণ আর অক্ষর এবং বাক্য বিন্যাসের উপর যে বাচ খেলা চলে, এই খেলা শিখতেই সারা জীবন চলে যায়। তবে বাংলার বাহান্ন বা ইংরাজীর ছাব্বিশটি বর্ণকে জেনে নিলে যত শব্দ সৃষ্টি হতে পারে সব শব্দের শেকড়টাকে ধরা হয়ে যাবে। যত বিচার আছে, যত ভাব আছে সব শব্দের মধ্যে বাচ খেলা। ওরহান পামুরের উপন্যাসে তিনি এটাই দেখাচ্ছেন, একটা বস্তু, সেই বস্তুর যে আদর্শ, যেটা আল্লার মনে ছিল, সেটাই ধীরে ধীরে কপি হয়ে হয়ে জগতে এত বৈচিত্র্য এসেছে। বর্ণমালায় যত বর্ণ আছে, এই বর্ণগুলি একটা যখন আরেকটার সঙ্গে মিলন হচ্ছে তখনই সৃষ্টি হয়ে যায়। সংস্কৃতে যে বাহান্নটি বর্ণ, এগুলি প্রত্যেকটি মৌলিক আকারে রয়েছে। এই বাহান্নটা বর্ণের আবার মৌলিক রূপ হল তিনটে বর্ণ 'অ', 'উ' আর 'ম'। এই 'অ', 'উ' আর 'ম'কে যদি ধরে নেওয়া হয় তাহলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যত রকম আইডিয়া আছে সবটাকেই ধরে নেওয়া হবে। আইডিয়া যা সৃষ্টিও তাই। তার মানে, ওঁ এর উপর যাঁর দখল হয়ে গেল তিনি জগতের সব কিছুকে জেনে নিলেন।

ওঁ হল শব্দব্রহ্ম। ব্রহ্মকে মন দিয়ে বোঝা যায় না, শব্দ দিয়ে প্রকাশ করা যায় না, একমাত্র আকার ইঙ্গিতে বোঝান যায়। ব্রহ্মকে সব থেকে কাছাকাছি বোঝান যায় ওঁ দিয়ে। 'অ', 'উ' আর 'ম' দিয়েই ভগবানকে জানা যেতে পারে। ভগবানকে আমরা একমাত্র তটস্থ লক্ষণ দিয়ে জানতে পারি। তটস্থ লক্ষণ মানে, নদীর ওপারে ধুয়ো দেখা যাচ্ছে, ধুয়ো দেখে আমরা বুঝতে পারছি ওখানে লোকজন আছে। সৃষ্টি দিয়ে স্রষ্টাকে

জানা যায়। সব সৃষ্টিকে তো জানা সম্ভব নয়, তবে আইডিয়া রূপে জানতে পারি। আইডিয়া রূপে জানার সব থেকে ভালো উপায় হল বর্ণমালাকে জানা। বর্ণমালাকে জানতে হলে শুধু 'অ', 'উ' আর 'ম'কে ধরতে পারলেই জেনে যাব। 'অ', 'উ' আর 'ম'কে জানা মানে ওম্‌কে জানা। একদিকে সগুণ সাকার ব্রহ্ম আরেক দিকে নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্ম। ওঁ হল এই নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্ম থেকে যখন সগুণ সাকার ব্রহ্মে আসছেন ঠিক তার মুখে। ওখান থেকেই সৃষ্টির শুরু, ওম্‌কে অতিক্রম করে গেলেই স্রষ্টার অসীমে লীন হয়ে যাবে। সেইজন্য ওঁ থেকে সৃষ্টি আর ওঁ হল স্রষ্টার প্রতীক, ওঁ কোন শব্দ নয়, কোন ধ্বণিও নয়। ঈশ্বরকে আমরা গড্‌ বলতে পারি, আল্লা বলতে পারি, বিষ্ণু বলতে পারি, কালী বলতে পারি কিন্তু এর কোনটাই ঈশ্বরের নাম হবে না। ঈশ্বরের ঠিক ঠিক বাচক যদি হতে হয় তাহলে একমাত্র ওম্‌ই ঈশ্বরের ঠিক ঠিক বাচক। গড্‌, আল্লা এগুলো এক একটা শব্দ, যে কোন শব্দই আমরা বানিয়ে দিতে পারি, কিন্তু তা কখনই ঈশ্বরের চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করতে পারবে না। ঈশ্বরের চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে একমাত্র ওঁ। কারণ 'অ', 'উ' আর 'ম' সমস্ত বর্ণমালাকে প্রতিনিধিত্ব করছে, বর্ণমালা আবার আইডিয়া জগতের সব কিছুকে প্রতিনিধিত্ব করছে, আইডিয়া জগৎ মানেই বিচার আর বস্তু। বিচার থেকে বস্তু বেরিয়ে আসে। এগুলো কোন তাত্ত্বিক দর্শন নয়, এটাই বাস্তব। উপনিষদের যেখানে অর্থবাদ করা হয়েছে সেখানে বলা হয়, যিনি 'অ'কে জয় করে নেন তিনি জগৎ জয় করে নেন, যিনি 'উ'কে জয় করে নেন তিনি অন্তরীক্ষের জগৎকে জয় করে নেন, আর যিনি 'ম' কে জয় করে নেন তিনি স্বর্গলোককে জয় করে নেন, তার মানে যিনি ওমকে জয় করে নেন তাঁর কাছে সমস্ত সৃষ্টিটাই চলে আসবে। এগুলো বিদ্যার স্তুতি, খুব আক্ষরিক ভাবে নিতে নেই। কিন্তু ওমকে নিয়ে যখন সাধনা শুরু করা হয় তখন মন অনেক গভীরে যাওয়ার সম্ভবনা থাকে। গভীরে যাওয়া শুরু হলে ধীরে ধীরে বস্তুর পেছনে যে বিচার থাকে সেই বস্তুটা খসে পড়ে যায় আর বস্তুর পেছনে যে তন্মাত্রাগুলি রয়েছে সেখানে ধ্যান হতে শুরু হয়, তন্মাত্রার পেছনে যে মহৎ তত্ত্ব রয়েছে অর্থাৎ যে চিন্তা রয়েছে সেখানে ধ্যান শুরু হয়ে যায়। ওই চিন্তাতে যখন সে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল, তখন সে সমস্ত জগতের সত্যিকারের মালিক হয়ে যাবে। এখানে আর অর্থবাদের কিছু নেই, সত্যিকারের মালিক হয়ে যায়। ঋষিদের তাই কত সম্মান। ইদানিং খবরের কাগজে কত সাধুবাবার নাম আসছে, কারুর হাজার কোটি টাকা কারুর দশ হাজার কোটি টাকার সম্পত্তি। এভাবেই হয়েছে, সাধনা করেছেন, সাধনা করে সিদ্ধি হয়েছে, তাই পেয়েছেন। কিন্তু মাঝখানে কি হল? যে সিদ্ধির শক্তিতে আরও অনেক দূর এগিয়ে যেতেন, কিন্তু প্রলোভন সামলাতে পারলেন না, তাই সিদ্ধিটা খসে পড়ে গিয়ে এখন জেলে বসে আছেন। প্রলোভনে যদি না পড়তেন তিনিও স্বামীজীর মত হয়ে যেতেন। স্বামীজী কি করেছেন? ওঁ জয় করেছেন, এর বাইরে আর কিছু করেননি। ঠাকুরকে যদি অবতার রূপে না নিয়ে যদি একজন সিদ্ধ পুরুষ রূপে নিই, তাহলে ঠাকুরও ওঁ জয় ছাড়া আর কিছুই করেননি। ওঁ যে জয় করে নিল সে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে জয় করে নিল। হিন্দু ধর্মে কত রকমের মত, কত মতাদর্শ কিন্তু একজন হিন্দুও নেই যে ওঁ মানবে না। বৌদ্ধরা হিন্দুদের গালাগালি দিয়ে বিরুদ্ধে চলে গেল, তাঁরাও হিন্দুদের ওঁ ছাড়তে পারল না। জৈনরাও হিন্দুদের বিরুদ্ধে কিন্তু তাঁরাও ওঁ নিয়েছে। হিন্দুদের মধ্যে যারা শাক্ত, যারা তন্ত্র মতে চলেন, তারা জানতই না ওঁ জিনিসটা কি, কিন্তু পরে তারাও ওঁ নিল। শিখ ধর্মেও তাই, তাঁরা তো ওঙ্কার দিয়েই শুরু করছেন, এক ওঙ্কারই সৎ। ওঁম্‌ই একমাত্র সার্বজনীন প্রতীক, কোন দিন যদি বিশ্বের সমস্ত ধর্মকে একটি ধ্বজার নীচে নিয়ে আসতে হয়, প্রথমেই তাদের ওঁ কে নিতে হবে, 'ওঁ'ই চিরন্তন সত্য। যেমন আল্লা, আল্লা মুসলিম ধর্মের নিজস্ব, ওঁ সেই রকম কোন ধর্মেরই নিজস্ব নয়। ওঁ হল একটা চিরন্তন সত্য। ওঁ তাই বৌদ্ধরাও নিতে পারে, মুসলমানরাও নিতে পারে, খ্রীশ্চানরাও নিতে পারে। যদিও এরা কেউ নিতে চাইবে না, কারণ বোঝার ক্ষমতা খুব কম। তবে এটাই সত্য যে, যদি কোন শব্দ দিয়ে ঈশ্বরের চরিত্রকে সব থেকে কাছাকাছি বোঝাতে পারে তা হল একমাত্র ওঁ। গায়ত্রী মন্ত্র যখন জপ হয় তখন এই ওঁ দিয়ে শুরু হয় আর ওঁ দিয়েই শেষ হয়।

ওঁ বলার পর বলছেন *ভূর্ভুবঃ স্বঃ*, যদিও ঋগ্বেদে যে মন্ত্র আছে তাতে *ভূর্ভুবঃ স্বঃ* নেই, ওখানে শুরুই হয় *তৎসবিতুর* থেকে। কিন্তু গায়ত্রী মন্ত্র রূপে যখন বলা হয় তখন ভূর্ভুবঃ স্বঃ বলা হয়, না বললে মন্ত্রের ঠিক ঠিক ব্যাখ্যা হবে না। 'ভূ' শব্দ হওয়ার অর্থে হয়, পৃথিবী হয়েছে, তাই পৃথিবীর আরেকটা নাম ভূ, যে লোকে

আমরা বাস করি। স্বঃ মানে স্বর্গলোক, ভূলোক আর স্বর্গলোকের মাঝখানের অংশকে বলে ভুবঃ। ওঁ বললে যেমন সব কিছুকেই বুঝিয়ে দেওয়া হয়, ঠিক তেমন ভূঃ, ভবঃ আর স্বঃ বললে সমস্ত লোককেই বুঝিয়ে দেওয়া হল। লোক মানে যত রকমের সৃষ্টি হয়েছে, যে সৃষ্টি হতে পারে, যে সৃষ্টি আগে হয়ে গেছে, আমাদের দৃশ্য জগৎ আর অদৃশ্য জগতের যা কিছু আছে সবটাকে মিলিয়ে বলছেন *ভূর্ভুবঃ স্বঃ*। মুণ্ডকোপনিষদে বলছেন *পরীক্ষ্য লোকান্*, লোক শব্দে সেখানেও এই জিনিসটাকেই বোঝান হচ্ছে। লোক মানে *লুক্যতে*, যে জিনিসটাকে দেখা যায় বা অনুভব করা যায়। পৃথিবীলোককে দেখা যায় আর তার সাথে এখানে কর্মের ফল প্রাপ্ত করা যায়। ঠিক তেমনি দেবতারা যেখানে আছেন সেখানেও কর্মফল পাওয়া যায়। সেইজন্য সবটাকে মিলিয়ে লোক বলছেন, খুব সংক্ষেপে বলছেন *ভূর্ভুবঃ স্বঃ*। ভূঃ ভুবঃ আর স্বঃ এই তিনটেকে অন্য ভাবেও অনেকে অর্থ করেন – ভূঃ মানে দৃশ্যলোক, ভুবঃ হল মনোজগৎ এবং স্বঃ মানে আধ্যাত্মিক জগৎ। আমরা এখানে সোজাসাপ্টা যা অর্থ হয় সেটা ধরেই এগোব। ভূঃ, ভুবঃ আর স্বঃ এর অর্থ ভূঃ পৃথিবীলোক যেখানে জীব বাস করে, স্বঃ স্বর্গলোক, যেখানে দেবতারা বাস করেন। আর মাঝখানে ভুবঃ অন্তরীক্ষলোক। এই ভুবঃ বা দ্যুলোককে শঙ্করাচার্য খুব সুন্দর ব্যাখ্যা করে বলছেন যেখানে পাখিরা চলাচল করে সেটাই ভুবঃ।

প্রার্থনা করার সময় সব সময় দুটো জিনিসকে নেওয়া হয়। যে দেবতার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করা হয় সেই দেবতার দু ধরণের গুণকে নেওয়া হয় – একটা তাঁর জাগতিক গুণাবলী আর আরেকটি তাঁর আধ্যাত্মিকতার গুণগত দিক। এই তিনটি লোককে যিনি সৃষ্টি করেছেন বা এই তিনটে লোকের যিনি অধিপতি তাঁর কাছে প্রার্থনা করা হচ্ছে। এই তিনটে লোকের অধিপতি কে? এই তিনটে লোকের যিনি স্রষ্টা, তিনটে লোকের যিনি কর্তা, তিনটি লোকের যিনি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। তিনি কে? যে কেউ হতে পারেন। নির্ভর করছে আমি যাকে মনে করি তিনিই অধিপতি হবেন। গায়ত্রী মন্ত্র পুরোপুরি নিরপেক্ষ ও নির্বিশেষ, যে কেউ এর অধিপতি, দেবতা, কর্তা বা স্রষ্টা হতে পারেন। কিন্তু ছোটবেলা থেকে আমরা জানি গায়ত্রী মন্ত্র মানে গায়ত্রীদেবীর উপাসনা, আবার যেহেতু সবিতুর বলা হচ্ছে তাই গায়ত্রী মন্ত্র মানে সূর্যের উপাসনা, হিন্দুরা স্বভাবেই সূর্যোপসাক। সেইজন্য প্রাচীন কাল থেকে গায়ত্রীমন্ত্রের সাথে সূর্য দেবতাকে যুক্ত করে দিয়েছেন। তদুপোরি এখানে যে *প্রচোদয়াৎ* শব্দ তার অর্থ করা হয় আমাদের বুদ্ধিকে আলোকিত করা হোক। আলো বললে আমরা সূর্যকে মনে করি আর আলোর সাথে সূর্যের একটা বিশেষ সম্পর্ক আছে সবাই ধরে নিই। সেইজন্য গায়ত্রীমন্ত্রে তারা সূর্যের উপাসনা করতেন। কিন্তু সূর্যের সঙ্গে গায়ত্রীমন্ত্রের কোন সম্পর্ক নেই। গুরু রূপে যিনি গায়ত্রীমন্ত্র দিচ্ছেন তিনি যার উপর ধ্যান করতে বলবেন শিষ্যকে সেই দেবতার উপরই ধ্যান করতে হবে। আর তা নাহলে গুরুকে জিজ্ঞেস করে নিতে হবে আমি অমুক জিনিসকে ধ্যান করতে পারি কিনা। এর আগে স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজের কথা বলা হয়েছিল। ব্রহ্মচর্য ব্রতে দীক্ষিত হওয়ার পর একজন ব্রহ্মচারী স্বামী গম্ভীরানন্দজীকে জিজ্ঞেস করলেন, গায়ত্রী মন্ত্র জপের সময় আমি ঠাকুরের ধ্যান করতে পারি কিনা। মহারাজ শুনে বলছেন 'যদি তোমার মনে হয় ভূর্ভুবঃ স্বঃ এর মালিক ঠাকুর তাহলে ঠাকুরেরই ধ্যান করবে'। সায়নাচার্য গায়ত্রী মন্ত্রের ভাষ্যেও একই কথা বলছেন। যিনি গায়ত্রী মন্ত্রে ধ্যান করেন, তাঁর যিনি ইষ্ট তিনি তাঁরই ধ্যান করবেন। কেউ যদি বলে আমি সগুণ সাকার ঈশ্বর মানি না, আমি নির্গুণ নিরাকার সেই জ্যোতির্ময় আলোকেই মানি। ঠিক আছে, তুমি তাহলে সূর্যের জ্যোতির উপর ধ্যান কর। এমনকি গায়ত্রী মন্ত্রে তুমি নিজের মনের উপরেও ধ্যান করতে পার। গায়ত্রী মন্ত্র পুরোপুরি নির্বিশেষ নিরপেক্ষ মন্ত্র। হিন্দু ধর্মের যিনি ঈশ্বর তিনি নির্গুণ নাকি সাকার এগুলোর উপর হিন্দু ধর্ম খুব বেশি জোর দেয় না, এখানে আইডিয়াই প্রধান, বিষয়কে কখনই গুরুত্ব দেওয়া হয় না। আইডিয়া হল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যিনি স্রষ্টা তাঁর কাছে প্রার্থনা করা। রামভক্ত বলবে, ওহি রাম জগৎ পসেরা, সেই রামই এই জগৎকে বিস্তার করেছেন। যে যাঁর ইষ্টকে ওখানে বসিয়ে দিতে পারেন, কোন অসুবিধা হবে না। কিন্তু এটা মনে রাখতে হবে, যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে সব ভগবানেরই সৃষ্টি, যাঁর তুমি ধ্যান করছ তাঁর বাইরে কিছু নেই। ঈশ্বরের বাইরে কিছু হতে পারে না, ঈশ্বরের বাইরে যেটা তাকে অনীশ্বর বলে। ঈশ্বর মানে যিনি শাসন করেন আর অনীশ্বর মানে যার কোন অস্তিত্বই নেই।

পরের অংশে বলছেন *তৎসবিতুর্বরেণ্যং*, যিনি সমস্ত লোকের স্রষ্টা তিনি *সবিতুঃ*, জ্যোতির্ময় আর তিনিই একমাত্র *বরেণ্যম্*। *বরেণ্যম্* মানে যাঁকে গ্রহণ বা বরণ করা যায়, যাঁকে পূজো করা যায়। একমাত্র ভগবানই বরণীয়। *ভর্গোদেবস্য*, তিনি আলো আর জ্ঞানের মুর্তরূপ। *'ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ'* তিনি যেন আমাদের বুদ্ধিকে প্রচোদিত করেন, প্রচোদিত করা মানে প্রেরণা দান করা। কোন দিকে প্রেরণা দেবেন? যাতে আমরা তাঁর দিকে এগোতে পারি। এরপর আমরা একটা একটা শব্দ ধরে আলোচনা করব।

আমরা যাঁকেই পরম সত্তা রূপে ভাবি না কেন তাতে কিছু আসে যায় না, কিন্তু তাঁর কতকগুলি গুণ ও বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে। প্রথম গুণ, তিনি স্রষ্টা এবং সব কিছুর মালিক। যে ঈশ্বর সব কিছুর মালিক নন সেই ঈশ্বর আবার কিসের ঈশ্বর। ঠাকুর বলছেন, যে বাবুর বাগান নেই, বাড়ি নেই সেই বাবু কিসের বাবু। তেমনি, যে ঈশ্বরের ঐশ্বর্য নেই সেই ঈশ্বর কিসের ঈশ্বর। সেইজন্য বলছেন *ভূর্ভুবঃ স্বঃ* যার উপরেই আমি গায়ত্রীমন্ত্র জপের সময় ধ্যান করিনা কেন আমাকে মনে করত হবে তিনি এই তিনটে লোকের স্রষ্টা আর এর কর্তা বা অধীশ্বর। এরপর বলছেন *তৎসবিতুর*, তৎ শব্দটাও বেদ ও উপনিষদের খুব প্রচলিত শব্দ। উপনিষদেই আমরা পাই বিখ্যাত মন্ত্র *তত্ত্বমসি – তৎ ত্বম্ অসি*, মানে সেটা তুমিই। তৎ মানে সেটা। আঙ্গুল দিয়ে নির্দেশ করে দেখিয়ে দিচ্ছে। ওঁ যেমন ঈশ্বরের বাচক তেমনি তৎ হল ঈশ্বরের বাচক। তৎ ভগবানেরই একটি নাম। গীতায় আছে *ওঁ তৎসদিতি নির্দেশো*, তৎ ভগবানের দিকে ইশারা করে নির্দেশ করা। আবার তৎ হল সেটা। আমরা ভগবান বলতে নারায়ণ বুঝি, বিষ্ণুকে বুঝি, কিন্তু এখানে তৎ বলতে ভগবানকেই বোঝাচ্ছে। তৎ ভগবানকে কেন বোঝাচ্ছে? আসলে ভগবানের কোন বিশেষণ নেই, আমরা আমাদের নিজেদের সুবিধার্থে তাঁকে কিছু বিশেষণ দিয়ে দিই। উপনিষদে বলছে নেতি নেতি, সেখানে বলা হচ্ছে ভগবানকে জানা হয় নেতি নেতি করে, ভগবান এটা নয়, এটা নয়। আমরা যেভাবে ঈশ্বরকে, গড্, আল্লা, কালী, বিষ্ণু বলি বেদে ঠিক ঐভাবে ঈশ্বরকে বলতে চাওয়া হয়নি, বেদে সব সময় আকার ইঙ্গিতে বলা হয়েছে। নির্গুণ নিরাকারকে কোন কিছু দিয়ে জানা যায় না। কোন শব্দ দিয়েও তাঁকে বোঝান যায় না। কিন্তু তিনি আছেন, তাঁকে আকার ইঙ্গিতে জানা যায়। সেইজন্য তৎ শব্দ দ্বারা তাঁকে ইঙ্গিত করা হল। *তৎসবিতুঃ*, সেই তৎ কি রকম বলতে গিয়ে বলছেন তিনি আলোরূপী প্রকাশমান, দীপ্যমান। *সবিতুর* আরেকটা ব্যাখ্যা হল সূর্যসদৃশ। আমরা যত কিছুর প্রকাশ দেখতে পাই তার মধ্যে সূর্যই সব থেকে বেশি প্রকাশমান, সেইজন্য ভগবানের একটা নাম *সবিতুঃ*। ঠাকুরের আরাত্রিক ভজনে স্বামীজী ঠাকুরের বর্ণনা করছে জ্যোতির্জ্যোতিঃ, তিনি জ্যোতিরও জ্যোতি। ঈশ্বরকে যাঁরা উপলব্ধি করেন তাঁরা জ্যোতি রূপেই উপলব্ধি করেন।

ভগবানকে আবার বলা হয় সচ্চিদানন্দ। সচ্চিদানন্দ মানে তিনি সৎ, চিৎ ও আনন্দ, এই তিনটে ভগবানের কোন গুণ নয়, এটাই তিনি। সৎ মানে যিনি আছেন, কিন্তু আমি কি বুঝতে পারছি না আমি আছি? চিৎ মানে যার চেতনা আছে, বুদ্ধি আছে, আমি কি বুঝতে পারছি না যে আমার বুদ্ধি নেই? আর আনন্দ! একবার বিরিয়ানি খেতে পারলে আনন্দের কি শেষ আছে। তাহলে নেতি নেতি কিভাবে হবে? অর্থাৎ ঈশ্বর যে সৎ, তিনি যে চিৎ আবার তিনি যে আনন্দ স্বরূপ এই তিনটেরই আমাদের ধারণা আছে। আমি একটা জিনিসকে দেখে তার ব্যাখ্যা করছি, আমি একজনকে দেখে আনন্দ পাচ্ছি, সৎ, চিৎ ও আনন্দের ধারণা আমাদের মধ্যে রয়েছে। কিন্তু বলছে ঈশ্বরকে নেতি নেতি করে জানা যায়। ঈশ্বরকে যে সৎ চিৎ আর আনন্দ বলা হচ্ছে এটা ঠিক আবার তাকে কোন নাম দিয়ে উপাধি দিয়ে জানা যায় না, নেতি নেতি করে জানা হয়, এটাও ঠিক। কিন্তু এই দুটোকে মেলান যাবে কিভাবে? যুক্তিতে কোথাও এই দুটোর মিল থাকতে হবে। নেতি নেতি বলতে বোঝায় যা কিছু জগতে দেখছি তার সাথে ভগবানের কোন মিল নেই আবার এই জগতের সব কিছুর ব্যাপারে আমাদের যত রকমের ধারণা আছে তার সাথেও ভগবানের কোন মিল নেই। মূলতঃ বলতে চাইছে ব্রহ্মই সৎ আর বাকি সব অসৎ, আমি যে নিজেকে আছি বলে মনে করছি আসলে এর কোন অস্তিত্বই নেই, আসল সৎ তিনিই। ঠাকুর বলছেন ঈশ্বরই বস্তু বাকি সব অবস্তু, তার মনে ঈশ্বরই সৎ বাকি সব অসৎ। আমি যেটাকে সৎ বলে জানছি, আমি যেটাকে সৎ বলতে বুঝি সেটা সৎ নয়, আমার মনের মধ্যে যে সৎ ধারণা রয়েছে সেই সৎ একমাত্র তিনি। আমিই অসৎ, সেই জন্য নেতি নেতি করে ঈশ্বরকে জানতে হয়। আমাদের কাছে থাকা মানে

হয় শরীর মন, শরীর মন না থাকলে আমরা বলি নেই। তিনি শরীর মন নন, তিনি আলাদা। সেইজন্য মনে তিনি নেই, কিন্তু তিনিই আছেন। ঠিক তেমনি আমাদের কাছে চিৎ মানে বুদ্ধি, আমাদের কারুর ডাক্তারি বুদ্ধি আছে, কারুর ম্যানেজমেন্ট বুদ্ধি, কারুর কারিগরি বুদ্ধি আছে। কিন্তু এগুলো যে বুদ্ধিতে হয় সেই বুদ্ধি আসলে জড়। ব্রহ্মের যে চিৎ সেটাই প্রকৃত চেতনা। কারণ প্রকৃতির এলাকায় যা কিছু আছে সব জড়। মন, বুদ্ধি সব প্রকৃতির এলাকার বস্তু তাই এরা সবাই জড়। ব্রহ্মের যে বুদ্ধি সেটাই চৈতন্য। টিউব লাইটের যে আলো এই আলো জড়ের আলো। কিন্তু যখন ব্রহ্মের জ্যোতির কথা বলা হয় তখন সেটাই চৈতন্যের আলো। ঠাকুর মা ভবতারিণীকে 'মা তুই দেখা দিবিনি' বলেই তিনি গলায় খড়্গ চালাতে গেছেন। সেই মহুর্তে মা যেন তাঁর হাত ধরে ফেললেন, আর ঠাকুর দেখছেন চৈতন্যের জ্যোতি তাঁকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে, তিনি যেন জ্যোতির সমুদ্রে ভেসে যাচ্ছেন। চৈতন্যের জ্যোতিটা যে কি, এ আমরা কোনদিন বুঝতে পারব না, যে অনুভব করেছেন তিনিই একমাত্র বলতে পারবেন। আর কাউকে বলেও বোঝান যায় না।

আমার যা কিছু আছে, আমার শরীর, মন, বুদ্ধি, এগুলো সব জড়, কিন্তু এর ওপরে আমার একটা সত্তা আছে সেটাই চৈতন্য। তৎ বলে ওই জিনিসটাকে ইঙ্গিত করা হচ্ছে। জগতের যা কিছু আছে তার ব্যাপারে আমার যে ধারণা আছে তার সাথে এর কখনই মিল খাবে না। মিল খাবে না বলে দূর থেকে আঙ্গুল দিয়ে ইঙ্গিত করে দেওয়া হল। আঙ্গুল দিয়ে যখন দেখিয়ে দেওয়া হচ্ছে তখন এটাই হয়ে যায় নেতি নেতি, মানে এখানে যা কিছু আছে এগুলোর সাথের এর কোন মিল নেই, তথাপি তিনি আছেন। শিশু মায়ের কোলে উঠে বলছে 'মা আমি চাঁদ দেখব'। মা তখন তার আঙ্গুলকে চাঁদের দিকে ইশারা করে বাচ্চাকে বলছে 'এই আঙ্গুলের ডগার দিকে তাকিয়ে সোজা আকাশের দিকে তাকাও, তাহলেই চাঁদ দেখতে পাবে'। বাচ্চা দেখছে আঙ্গুলের নখ, চাঁদের দিকে নজর দিতে পারছে না। ঈশ্বরের সম্বন্ধে যা কিছু বলা হয় সবই এই আঙ্গুল দেখানো। যা কিছু বলা হয় সব ইশারা করা। আমাদের সমস্যা ঐ বাচ্চার মত, ঈশ্বরের সম্বন্ধে যা কিছু বলা হচ্ছে সেগুলো দিয়ে ঈশ্বরের দিকে ইশারা করা হয়, যে জিনিসকে ইশারা করছে সেই জিনিসটাকে কেউ দেখছে না, আমরা ঈশ্বরের দিকে না দেখে সেই জিনিসগুলির দিকেই তাকাই, আঙ্গুলের নখটাই দেখছি। ঈশ্বরের সম্বন্ধে যখনই কোন শব্দ বলা হল তখন আমরা শব্দের উৎপত্তি, শব্দের কি বিন্যাস ইত্যাদি জিনিসকে নিয়েই মেতে থাকি। এখানে তৎ বলতে শুধু যে ঈশ্বর তা নয়, এই তৎ অনেক কিছুকে বোঝাচ্ছে। এই তৎ নারায়ণ বা বিষ্ণুর থেকে আরও অনেক কিছুকে বলছে। যখন আমরা নারায়ণ বা বিষ্ণু বলে দিচ্ছি তখন আমরা নির্দিষ্ট একটা কিছুকে বলছি। প্রত্যেক মানুষের হৃদয়ে যিনি বাস করেন, যিনি জলের উপরে শয়ন করেন তিনি নারায়ণ, এখানে তাঁকে সাকার করে দিচ্ছি। কিন্তু যখন তৎ বলছি তখন তিনি নির্গুণ নিরাকার হয়ে গেলেন। নির্গুণ নিরাকার যখনই করে দেওয়া হল তখনই বুঝে নিতে হবে যে তাঁকে কোন কিছু দিয়ে বোঝান যাবে না। তাহলে কি তৎ শুধু নির্গুণ নিরাকারে জন্যই বলা হচ্ছে? কখনই না, এই তৎ শব্দ যেমন নিরাকার নির্গুণকে বোঝাচ্ছে ঠিক একই ভাবে তৎ সগুণ সাকারের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। সগুণ সাকারের যে গুণগুলি আরোপিত করা হচ্ছে এই গুণগুলো কোন জাগতিক গুণের কথা বলা হচ্ছে না, জাগতিক গুণগুলির থেকে সগুণ সাকারের গুণ একেবারেই আলাদা।

যদিও গায়ত্রীমন্ত্রে ভগবান বলছেন না এখানে তৎ বলেই ছেড়ে দিয়েছেন। গায়ত্রীমন্ত্রের *ভূর্ভুবঃ স্বঃ* এই প্রথম অংশে তৎ এর জাগতিক প্রকাশের শক্তিকে বলা হয়ে গেল। ছন্দ রাখার জন্য তৎ শব্দকে পরের লাইনে আনা হয়েছে।

তৎসবিতুর্বরেণ্যং, যিনি ঠিক ঠিক বরণ করার যোগ্য তাঁকে বলছেন *বরেণ্যম্*। ঈশ্বরই একমাত্র, যাঁকে বরণ করা যায়। গীতার *মচ্চিত্ত মৎপরঃ* এই শ্লোকের উপর ভাষ্য দিতে গিয়ে আচার্য বলছেন, ভগবান অর্জুনকে বলছেন আমাকে কে পায়? *মচ্চিত্ত*, যাঁর মন শুধু আমাতেই পড়ে আছে। আর বলছেন *মৎপরঃ*, আমাকে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করছেন। তারপরেই আচার্য বলছেন, একজন যুবকের মন যুবতীতে একেবারে ডুবে আছে, কিন্তু যুবতীতে আসক্ত যুবকও জানে ভগবান, তা তিনি শিব হন বা বিষ্ণুই হন, তিনিই পরমশ্রেষ্ঠ। সে জানে আমার মন যুবতীতে লেগে আছে ঠিকই কিন্তু ঈশ্বর এই মেয়েটির থেকেও শ্রেষ্ঠ। কারণ যখন প্রার্থনা করে তখন সে

ঈশ্বরের কাছেই প্রার্থনা করে বলে, হে প্রভু! তুমি কৃপা কর যাতে আমি মেয়েটিকে পাই। ঈশ্বরকেই পরমশ্রেষ্ঠ জেনে প্রার্থনা করছে যাতে সে মেয়েটিকে পেতে পারে, কিন্তু তা না বলে সে তো বলতে পারত প্রভু তুমি কৃপা করা যাতে তোমাকেই আমি পাই। পারে না, কামনা-বাসনার যখন ঝড় আসে তখন সব কিছু উড়ে যায়, সব জানা সত্ত্বেও সে ঈশ্বরের কাছে মাথা ঠুকে ঠুকে প্রার্থনা করবে, হে প্রভু কৃপা কর আমি যেন ওই মেয়েটিকে পাই, কৃপা কর আমার মেয়ের যেন ভালো একটা পাত্র জোটে, প্রভু কৃপা কর যাতে ছেলের চাকরি হয়, প্রভু কৃপা কর যাতে আমার প্রমোশন হয়, টাকা হয়, বাড়ি হয়। সে তো মানছে প্রভু সর্বশক্তিমান, শ্রেষ্ঠতম। যাঁকে লাভ করলে সব কিছু চাওয়া-পাওয়ার সমাপ্তি হয়ে যায়, তাঁকেই কেউ চাইছে না। সংসারীরা টাকারই উপাসনা করে যাচ্ছে। সেই টাকার জন্য কার কাছে প্রার্থনা করছে? যাঁর কাছে প্রার্থনা করছে তিনি ইচ্ছে করলে জগতের সব ধনদৌলত তার পায়ের তলায় এনে হাজির করিয়ে দিতে পারেন। তাহলে টাকা না চেয়ে তাঁকে চাইলেই তো হয়। এটাই আমাদের দুর্ভাগ্য। আমরা জানি তিনি *মৎপরঃ*, কিন্তু *মচ্চিত্ত* হবে না, চিত্ত টাকাতে লেগে আছে। আর বুড়ো বয়সে চিত্তের মধ্যে নানা রকমের চিন্তা লেগে থাকে, আচার্য শঙ্কর খুব সুন্দর বলছেন – *বৃদ্ধস্তাবচ্চিন্তামগ্নঃ, পরমে ব্রহ্মণি কোঽপি লগ্নঃ*, বৃদ্ধাবস্থায় চিন্তায় মগ্ন হয়ে থাকবে তবুও ভগবানের প্রতি কেউ অনুরক্ত হতে চায় না, ঈশ্বরেই আমাদের মন যেতে চায় না, অনুরক্ত হওয়া তো অনেক দূরের। এখানে বলছেন, তিনিই একমাত্র *বরেণ্যম্*, তিনিই বরণীয়।

ঋষিরা এও জানেন যে এদের মন ঈশ্বরে যাবে না, সেইজন্য বলছেন *ধীয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ*, প্রভু! তুমি কৃপা কর যাতে আমার মন তোমার দিকে যায়। *বালস্তাবৎক্রীড়াসক্ত-স্তরুণস্তাবৎ তরুণীরক্তঃ*, বাচ্চা বয়সে খেলা করতে করতে বাল্যকাল কেটে যাচ্ছে, তরুণ অবস্থায় তরুণীর প্রতি আসক্ত হয়ে তারুণ্যের তেজকে নিঃশেষ করে দিচ্ছে, এরপর বৃদ্ধ হয়ে গেল তখন চিন্তামগ্ন। অথচ তিনটে বয়সেই সে প্রার্থনা করে যাচ্ছে, বাচ্চা বয়সে প্রার্থনা করে হে ঠাকুর! পরীক্ষায় যেন পাশ করতে পারি। যৌবনে প্রার্থনা করে হে ঠাকুর কৃপা কর মেয়েটাকে যেন পাই আর বুড়ো বয়সে হে ঠাকুর নাতি-পোতার মুখ যেন দেখতে পাই। যিনি শ্রেষ্ঠতম, সর্বশক্তিমান তাঁর দিকে মন কিছুতেই যাবে না। যিনি *বরেণ্যম্* তাঁর দিকে মন যায় না, তাই বলছেন, *ধীয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ*, আমার মন যেন তোমার দিকে যায়।

তিনি শুধু *সবিতুর্বরেণ্যম*ই নন, তিনি *ভর্গো দেবস্য*। *ভর্গো* আর *সবিতুঃ* এই দুটো আলাদা, *ভর্গো* মানে আমার মনের ভেতরে যে তমস আছে সেই তমসকে তিনি দূরীভূত করে আমার অন্তরকে আলোকিত করে দেন। বাইরে যেমন তাঁর *সবিতুর* রূপ, তেমনি ভেতরে তাঁর *ভর্গো* রূপ, *ভর্গো* মানে আলো। সায়নাচার্য সবিতুর অর্থ করছেন – সবিতু = পরেমশ্বর, যিনি সবারই অন্তর্যামী রূপে প্রেরণা দেন। আমি ভালো কাজ করছি, এই ভালো কাজ করার কে প্রেরণা দিচ্ছেন? অন্তর্যামী রূপে যিনি আমার ভেতরে আছেন। খ্রীশ্চানরা এই কথা মানবে না, তারা বলবে ভালো জিনিসটা এ্যঞ্জেলস্ করায় আর খারাপ জিনিসটা ডেভিল করায়। আমাদের এখানে তা নয়, এখানে ভালো মন্দ দুটোই অন্তর্যামী করাচ্ছেন। পরেমশ্বরই অন্তর্যামী রূপে ভেতরে থেকে সব কিছু চালাচ্ছেন। সেই পরমেশ্বর, যিনি জগৎস্রষ্টা তিনিই আবার আমার অন্তর্যামীকে প্রেরণা দেন। ভালো করতেও তিনি প্রেরণা দেন, মন্দ করতেও তিনিই প্রেরণা দেন। স্বাভাবিক ভাবে আমাদের মনে প্রশ্ন আসতে পারে তিনি মন্দ করতে আমাদের কেন প্রেরণা দেন? তিনি কখনই আমাদের মন্দ করতে প্রেরণা দেন না। যে কোন কাজের পেছনে চৈতন্য সত্তা না থাকলে কাজ হবে না। সেইজন্য বলা হয় মন্দ কাজের পেছনে সেই চৈতন্য সত্তাই আছে। চৈতন্যের ব্যাপারটা আমরা বুঝতে পারি না বলে বলা হয় ভালোরও তিনি প্রেরণা দেন মন্দেরও তিনি প্রেরণা দেন। আসলে কোনটাই নয়, তিনি আছেন বলেই জগৎ চলছে। আলো আছে বলেই আমরা কাজ করি, এই আলোতেই কেউ ভাগবত পাঠ করছে আবার কেউ নোট জাল করছে, আলো নির্বিকার। অন্তর্যামী আছেন বলেই ভালোটাও করছি মন্দটাও করছি। এখানে প্রার্থনা করা হচ্ছে, হে ঠাকুর! আমি যেন মন্দ কাজ না করি, ভালো কাজ করার দিকে যেন মন যায়। ভালো মন্দকে কে ঠিক করে দেবে? বলছেন, ধর্ম, কর্ম, মতি। ধর্ম, কর্ম, মতি কোথা থেকে আসবে? শাস্ত্র থেকে। আমরা যে প্রার্থনা করছি, কার প্রার্থনা করছি? ভেতরে যিনি অন্তর্যামী আছেন তাঁরই প্রার্থনা করা হয়। ধর্মে, কর্মে মতি আসছে না, সেইজন্যই তো এই গায়ত্রী মন্ত্র। খুব করে গায়ত্রী

মন্ত্রের জপ করে যাও, দেখবে কয়েক দিনের মধ্যেই মন শুদ্ধ হয়ে যাবে, মন শুদ্ধ হলে এদিক ওদিক মন ছিটকে যাবে না, মন এক জায়গায় স্থির হলে তখন ধর্মে, কর্মে মতি এসে যাবে।

আবার সূর্যের আরেকটি নাম সবিতা, *সবিতু* যিনি সূর্যের মত আলোকিত। ভগবানকে সব সময় জ্যোতির্ময়ের সাথে সমীকরণ করা হয়, ঈশ্বরত্বকে কখনই অন্ধকারের সাথে গণ্য করা হয় না। সেইজন্য যখন ধ্যান করতে বলা হয় তখন বলে দেওয়া হয় হৃদয়ে যে জ্যোতি আছে তাকে সব সময় উদীয়মান সূর্যের জ্যোতি রূপে কল্পনা করে ধ্যান করবে। কারণ একটাই, ঈশ্বর আর জ্যোতি যেন এক হয়ে আছে, জ্যোতির সাথে ঈশ্বরকে যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে, সব সময় জ্বলজ্বল করছে। শুধু জ্বলজ্বল করছে না, এই জ্যোতি সচল সজীব আলো। এই জিনিসটা ধ্যান করে সিদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত বোঝা যায় না।

ভর্গো রূপে আমাদের ভেতরকার অজ্ঞান সমূহকে সরিয়ে জ্ঞানের আলো নিয়ে আসেন। *দেবস্য* মানে, ভূঃ ভুবঃ আর স্বঃ এই তিনটে লোকের যিনি স্রষ্টা। আর *ধীমহি* মানে, আমরা তাঁর ধ্যান করছি। কার ধ্যান করছি? *দেবস্য*, যিনি এই তিনটে লোকের স্রষ্টা ও মালিক। আর বলছে, *ধীয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ*। *ধী* মানে বুদ্ধি, আর *যো* মানে সেই ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা হচ্ছে। কি প্রার্থনা করা হচ্ছে? *প্রচোদয়াৎ*, তিনি যেন আমার বুদ্ধিকে তাঁর দিকে প্রচোদিত করে নিয়ে যান। মূল প্রার্থনা হল, হে প্রভু! আমার বুদ্ধিকে তুমি শুদ্ধ কর।

সায়নাচার্য যিনি বেদের ভাষ্য রচনা করেছেন, তিনি গায়ত্রী মন্ত্রের ভাষ্যও দিয়েছেন। সেখানে তিনি ধী শব্দের অর্থ করছেন, ধর্ম-কর্মের ব্যাপারে বুদ্ধি। বুদ্ধি আমাদের সবারই আছে, কিন্তু সব সময় দুর্বুদ্ধিটাই বেশি থাকে। কিভাবে টাকা হয়, কিভাবে ওকে-তাকে খুশি করে কাজ হাসিল করা যায়। কিন্তু কোনটা আমাদের ধর্ম অর্থাৎ কোনগুলো আমাদের কর্তব্য আর তাকে কার্যে পরিণত করা, এই ব্যাপারটা তখনই ঠিক ঠিক হবে যখন ধী ঠিক থাকে। যাদের অনেক গোলমাল চলছে, জীবনটা এলেমেলো ভাবে চলছে, সে ছেলে হোক, মেয়ে হোক, বুড়ো হোক, বুড়ি হোক তাকে সকালে এক হাজার আর বিকেলে এক হাজার গায়ত্রীমন্ত্র জপ করতে বলুক। কয়েকদিনের মধ্যে তার সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে। এক হাজার জপ করতে না পারলে যতটা পারবে করবে, যতটা করবে ততটাই লাভ। গায়ত্রীমন্ত্র জপ করলে সব রকমের অবসাদ, যত রকমের সমস্যা সব পরিষ্কার হয়ে যাবে। হতে বাধ্য, তা নাহলে কি পাঁচ হাজার বছর ধরে কোটি কোটি ব্রাহ্মণরা এমনি এমনি গায়ত্রীমন্ত্র জপ করে যাচ্ছেন! চার-পাঁচ জন মুর্খ হতে পারে তাই বলে পুরো দেশের ব্রাহ্মণরা কি মুর্খ হতে পারে! বেদের কোন পণ্ডিত ব্রাহ্মণ পাওয়া যাবে না যে, কথায় কথায় রেগে যান, একটু দুঃখ-কষ্টে ভেঙ্গে মাটিতে লুটোপুটি খান। গায়ত্রী মন্ত্রের জপ-ধ্যান করে করে তাঁদের সব কাম-ক্রোধ-লোভ রিপুগুলো পুড়ে ছাই হয়ে যায়। দুটো টাকা দিতে গেলে অত্যন্ত লজ্জিত বোধ করবেন, অত্যন্ত বিনয়শীল হয়ে যান। ধী ধর্মে কর্মে মনটাকে লাগিয়ে দেয়।

গায়ত্রীমন্ত্রের শেষ অংশ ‘*ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ*’ এটাই প্রার্থনা, এখানে ‘*নঃ*’ মানে আমাদের। *প্রচোদয়াৎ* মানে নিয়ে যাওয়া। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রতীকের নীচে লেখা আছে ‘তন্নো হংসঃ প্রচোদয়াৎ’ – যিনি পরমহংস আমাদের যেন তিনি নিয়ে যান। কোথায় নিয়ে যাবেন? ওই হংসের দিকে যেন নিয়ে যান, ভগবানের দিকে যেন মন যায়। গায়ত্রী মন্ত্রের এখানে কিরকম অন্য রকম মনে হবে – বলছেন ধিয়ো মানে ধি, বুদ্ধি, তিনি যেন আমাদের বুদ্ধিকে আলোকিত করেন। প্রচোদয়াৎ কথার প্রকৃত অর্থ আধ্যাত্মিক জগতে খুব জটিল। বর্তমান যগের নিরিখে এই প্রচোদয়াৎকে আমরা আলোকিত করার অর্থে নিতে পারি – মানে আমার বুদ্ধিকে আলোকিত করে দাও। যারা ভক্ত তারা বলবেন – প্রভু আমার মনকে তোমার দিকে নিয়ে যাও। গায়ত্রীমন্ত্রের এই শেষ লাইনে জ্ঞান আর ভক্তির দুটোরই অর্থ করা যায়। প্রচোদয়াৎ দুটো অর্থেই লাগান যেতে পারে – একটা আমাদের বুদ্ধিকে আলোকিত করে দাও, আমাদের বুদ্ধির শক্তি যেন বৃদ্ধি পায়, আরেকটা অর্থ করা যেতে পারে আমাদের বুদ্ধিকে যেন তিনি তাঁর দিকে টেনে নিয়ে যান।

মূল প্রার্থনা হল – May we become divine। বর্তমানে আমাদের বুদ্ধি জড়। খুব সাধারণ জিনিসই আমরা ধরতে পারিনা। মনের খুব সাধারণ ছোট ছোট আবেগ থেকেও বেরোতে পারিনা। বুদ্ধি মানে

আমরা বুঝি একটা জিনিস ঠিক, আরেকটা জিনিস যে ভুল এটাকে জানা, আসলে বুদ্ধি মানে তা নয়। বুদ্ধি মানে যেট ঠিক সেটাকে ধরে রাখা। ঠিক জিনিসটাকে শুধু জানলেই হবে না, সেই ঠিকটাকে ধরে রাখাই বুদ্ধির ঠিক ঠিক অর্থ। আমরা অনেক ভালো কথা, উচিৎ কথা এখান ওখান থেকে শুনে থাকি, কিন্তু যা শুনলাম সেগুলো আমরা পালন করতে পারিনা। করতে পারিনা কারণ আমাদের বুদ্ধি নেই। ঠিক জিনিসটাকে যাতে ধরে রাখতে পারি, সেই বুদ্ধিটা যাতে হয় সেইজন্য এই গায়ত্রীমন্ত্র জপ করা। এখানে যে বুদ্ধির কথা বলা হচ্ছে – সেই বুদ্ধি এমন তীক্ষ্ণ হবে যা দিয়ে জাগতিক বিষয়কেও বোঝার ক্ষমতা আর emotional life এ ঠিক জিনিসকে ধরে রাখা, তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ হল আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে যেটা আধ্যাত্মিক নয় সেটাকে বাদ দিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা। গায়ত্রীমন্ত্রের প্রার্থনা এই তিনটেকে একসাথে নিয়ে করা হয় – আমাদের বুদ্ধিকে তিনি প্রকাশিত করুন বা আমাদের বুদ্ধিকে তার দিকে নিয়ে যান। বেশির ভাগ জায়গায় যখনই গায়ত্রীমন্ত্রের অনুবাদ দেখা যায় তখন এই দু ভাবেই দেখা যায়। যিনি বলছেন তিনি তাঁর শিষ্যদের মত করে বলেন বলে গায়ত্রীমন্ত্রের অর্থের পার্থক্য হয়ে যায়। তাতে দোষের কিছু হয় না।

ক্লাশ ফাইভ বা সিক্সের ছাত্রদের জন্য গায়ত্রীমন্ত্র খুব প্রয়োজন, গৃহস্থদের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, আর স্বামী ভূতেশানন্দজী সন্ন্যাসীকেও বলে দিলেন – তুমিও গায়ত্রীমন্ত্র জপ কর। কেন বললেন? কারণ ব্রহ্ম আর মায়ার কথা আমরা সবাই শুনি, ব্রহ্ম যে কি বস্তু, মায়া যে কি বস্তু আমরা জানিনা, কিন্তু ব্রহ্ম আর মায়াকে তফাৎ করতে আমাদের শিখতে হবে। বুদ্ধি যদি জড় হয়, মন যদি অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে তাহলে ব্রহ্ম আর মায়া এই দুটোকে পৃথক করা আমাদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। তারজন্য দরকার মনের শক্তির। মনের শক্তির বিকাশ একমাত্র এই গায়ত্রীমন্ত্র জপের মধ্য দিয়েই সম্ভব।

এখন আমরা ধ্যান করছি। কার উপর মনকে একাগ্র করছি? *তস্য দেবস্য*, তাঁর উপর ধ্যান করছি যিনি এই ত্রিলোকের (ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ) প্রভু, যিনি *সবিতুর*, স্বভাবে দেদিপ্যমান, যিনি *ভর্গো*, আলোময়। কোন অন্ধকার কালো মুর্তি তা নয়, দেদিপ্যমান আর চৈতন্য এই দুটো পরস্পর সম্পর্ক যুক্ত। তারপরে আসছে বরেণ্য। বরেণ্য, যিনি শ্রেষ্ঠতম, যিনি একমাত্র বরণীয়, বরণ করার একমাত্র যোগ্য যিনি। মানুষের মন টাকা পয়সার দিকে যেতে পারে, মন ভোগের দিকে যেতে পারে, আমি জানি ভগবানই একমাত্র বরেণ্য কিন্তু আমার মন এখন ভোগকে বরণ করেছে। স্বামীজী বলছেন – When you make a compromise admit that you are making a compromise, but from that don't lower the ideal. তুমি যদি কোথাও compromise করতে বাধ্য হচ্ছ কর, কিন্তু তোমার আদর্শকে কখনই নীচে নামিয়ে দেবে না। তুমি বল আমি পারছি না, আমি দুর্বল, আমি মেনে নিচ্ছি কিন্তু আদর্শকে কখন ছোট করে দিও না। এটাকেই গীতা বার বার বলছে *মচ্চিত্তঃ* ও *মৎপরঃ*। শঙ্করাচার্য তাঁর গীতার ভাষ্যে *মচ্চিত্তঃ* আর *মৎপরঃ* এর যে ব্যাখ্যা দিচ্ছেন তা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। একটা ছেলে একটা মেয়েতে অনুরক্ত, তার চিত্তে মেয়েটিই সব সময় বিরাজ করছে, কিন্তু সেও জানে ভগবান এই মেয়েটিরও ওপরে। ছেলেটি ভালো করেই জানে ভগবানই শ্রেষ্ঠ মেয়েটি কখনই শ্রেষ্ঠ নয়। এখানে এটাই বলছে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীকে পাল্টাবার জন্য চেষ্টা করতে হবে।

যারা সংসার ধর্ম করছে, কিসের জন্য সে সংসার ধর্ম করছে? মনে কিছু একটা দুর্বলতা ছিল, বিয়ে করে সংসার করল, সন্তান হল, স্ত্রী-সন্তানের নিরাপত্তার কথা ভাবতে হবে। তার জন্য তাকে অর্থোপার্জন করতে হচ্ছে। এই সবই হল জীবন-জীবিকাকে ঠিকঠাক রেখে সুস্থ স্বাভাবিক ভাবে জীবনকে চালানোর প্রক্রিয়া। কিছু টাকা ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করে রাখলে আমার আর খাওয়া পড়ার চিন্তা হবে না। এই প্রক্রিয়াকে ঠিক রেখে আমি এবার ভগবানের দিকে বেশি করে মন দেব। আমার সাধারণ খাওয়া পড়াতেই চলে যাবে, এখন আমি নিশ্চিন্তে ভগবানে বেশি মন দিতে পারব। কিন্তু এর ঠিক উল্টোটা আমরা করি। আমরা রোজ গিয়ে ভগবানকে ধরি, ধরে তাকে বলি – হে ঠাকুর, দেখো আমার সন্তানরা যেন ঠিক থাকে, আমার ব্যাঙ্ক ব্যালেন্সটা যেন বাড়তে থাকে, শেয়ার মার্কেট যেন ঠিক থাকে। আমাদের উদ্দেশ্য সংসারের কাঁধে দাঁড়িয়ে ভগবানকে ধরে রাখা, কিন্তু আমরা কি করছি? ভগবানের কাঁধে দাঁড়িয়ে সংসারকে আঁকড়ে ধরে রাখতে চাইছি। আমাদেরও তাই কষ্টের পর কষ্ট বেড়েই চলে। গায়ত্রীমন্ত্র এই জিনিসটাকেই কেটে দিতে বলছে, গায়ত্রীমন্ত্রে বরেণ্যং

ভগবানকে বলা হচ্ছে, তাকে বরণ কর, একমাত্র তিনিই বরণীয়। কিন্তু আমরা সংসারকেই বরণ্যেম করে রেখেছি। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে দাঁড়িয়ে একজন বলছে – একবার নাতির চাঁদ মুখটা দেখে আসি, নাতির চাঁদ মুখ দেখলে প্রাণ জুড়িয়ে যায়। ঠাকুর বলছেন – চাঁদ মুখ না পোড়ার মুখ। তাহলে কে আমাদের কাছে বরেণ্যম? সংসার। কেন? ঠাকুরের কাঁধে দাঁড়িয়ে আমরা জগতকে বরেণ্য করতে যাচ্ছি। কিন্তু জগতের ঘাড়ে চেপে ঠাকুরকে ধরতে হবে। জগতের যা কিছু আছে সব কিছুই আমাদের মুক্তির দিকে নিয়ে যাচ্ছে, ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারটেই মুক্তির দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য। সংসারে থাকতে গেলে টাকার দরকার, খেটেখুটে কিছু টাকা উপার্জন করে সেই প্রয়োজনটা মিটিয়ে দিলাম, মনটাও পরিষ্কার হয়ে গেল, এবার ঠাকুরকে ধরব। আমার একটু বাসনা ছিল, বাসনা মিটে গেছে, এখন আমি বাসনা থেকে মুক্ত, এই ভাবটা যেই এসে গেল তখন পুরো মন সেই বরেণ্যম যিনি, ঈশ্বরের দিকে ফেলে দিলাম। কিন্তু আমাদের কিছু টাকা হয়ে গেলে আরও টাকা কি করে হবে তার পেছনে ছুটতে থাকি, একটা দুটো বাসনা মিটে গেল আরও দশটা বাসনাকে টেনে পুরো মনকে সংসারে জড়িয়ে রাখছি।

বরেণ্যম কে? সেই তৎ। সেই তৎ কে? *ভূঃ, ভুবঃ স্বঃ* এই তিনটে লোক যিনি রচনা করেছেন, একমাত্র তিনিই বরেণ্য। এখন তুমি যদি না পার তাহলে বল আমি পারছি না, আমার মন এখনও ভোগে পড়ে রয়েছে, আমার মনে ভোগের ইচ্ছা এত প্রবল আমি পারছি না। ঠিক আছে তোমাকে পারতে হবে না। তুমি এই বরণ্যেমকে মেনে নাও, তাঁর কথা একটু ভাব, আর এই গায়ত্রীমন্ত্র জপ করে যাও। সিনিয়র মহারাজদের কাছে কোন দুঃখ-কষ্টের কথা বলতে এলে ওনারা বলেন – তুমি নিজে মন্দিরে ঠাকুরের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁকে সব জানাও, আর প্রার্থনা করে বল – প্রভু আমি পারছিনা, তুমিই একমাত্র বরণ্যেম তুমি আমাকে শরণাগতি দাও। তোতা পাখির মত, টেপরেকর্ডারের মত বলতেই থাক। এই ভাবে বছরের পর বছর বলতে থাক। দশ বছর, পনের বছর, তিরিশ বছর ধরে যখন সকাল সন্ধ্যা ঠাকুরের সামনে মাথা ঠুকে ঠুকে বলতে থাকবে ঠাকুর আমায় শরণাগতি দাও। তখন হঠাৎ একদিন তোমার মনের একটা দরজা খুলে যাবে আর তুমি নিজের মনেই বলবে যে – এতদিন আমি ঠাকুরের কাছে শরণাগতি চাইছিলাম, এতদিন আমি এই প্রার্থনা করছিলাম, ওঃ এখন বুঝলাম, শরণাগতির মানে এই। এই বোধটুকু এসে গেলেই বুঝতে পারবে তোমার মধ্যে যে চৈতন্য শক্তি সুপ্ত হয়ে ছিল সেটা চলতে শুরু করেছে। তার মানে আজ হোক কিংবা কাল হোক তোমার শরণাগতি হবেই হবে, কেউ আর আটকতে পারবে না। যন্ত্রের মত যে প্রার্থনাটা করা হচ্ছিল সেটাও যদি বন্ধ করে দেওয়া হয় তাহলে কোন দিনই তার আর হবে না, সে আরও সংসারের আবর্তে জড়িয়ে পড়তে থাকবে।

গায়ত্রীমন্ত্র মেকানিক্যাল ভাবে জপ করে যাচ্ছি, সেখানে বরেণ্যম্ বলছি, কিন্তু আমার কাছে ঈশ্বর ছাড়া সব কিছুই বরন্যেম্, আমার ছেলে বরেণ্যম, আমার মেয়ে বরেণ্যম, আমার টাকা বরেণ্যম্, আমার গাড়ি-বাড়ি, মান-সম্মান সব বরেণ্যম। ভগবানকে তো আমি চাকর বানিয়ে রেখেছি। চাকরকে যেমন বলি – এই তুই দাঁড়া আমি তোর ঘাড়ে উঠে আমড়া পাড়ব, আমরাও ভগবানের কাঁধে পা দিয়ে আমড়া পাড়ছি, আমড়া মানে আমার সন্তান, আমার স্ত্রী, আমার স্বামী, আমার টাকা-পয়সা, মান-সম্মান যাবতীয় জিনিস। তিনিই একমাত্র বরেণ্যম্, তিনিই একমাত্র পূজার্হ। সবাই তাঁরই পূজা করে, আগেকার দিনে যাঁরা ঋষি ছিলেন তাঁরাও তাঁরই পূজা করেছেন। স্বামীজী একজন শ্রেষ্ঠ মানব, আমরা যদি তাঁকে জিজ্ঞেস করি, স্বামীজী আপনি কার আরাধনা করে শ্রেষ্ঠ হয়েছেন? স্বামীজী বলবেন, ঈশ্বরের আরাধনা করেছি। তাই ঈশ্বরই একমাত্র বরেণ্যম্। আকবর বাদশার কাছে এক ফকির বাবা সাহায্যের জন্য গেছেন। ফকির গিয়ে দেখছেন বাদশা তখন নমাজ পড়ছেন, নমাজ পড়ার পর বাদশা হাতজোড় করে বলছেন – আল্লা আমাকে ধন দাও, দৌলত দাও। ফকির সেখান থেকে উঠে চলে যাচ্ছিল। বাদশা ইশারা করে ফকিরকে বসতে বললেন। পরে বাদশা ফকিরকে উঠে যাওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করাতে ফকির বলছেন – বাদশা যাঁর কাছে চাইছে আমিও তাঁর কাছে গিয়ে চাইব। যাঁর সাধনা করে, আরাধনা করে এনারা মহৎ হয়েছন তিনিই বরণ্যেম্, আমিও তাঁর আরাধনা করব।

ভর্গো মানে আলো, সবিতুর অর্থও আলো। কিন্তু সবিতুর আলো বোঝায় দেদিপ্যমান, জ্বলজ্বল করছে সব সময়। ভর্গোর আলো অন্ধকারকে দূরীভূত করার অর্থে বোঝায়। সায়নাচার্য ভর্গোর অর্থ করেছেন, অবিদ্যার

কার্যকে যে নাশ করে। অবিদ্যা মানেই অন্ধকার, তমস, সেই অবিদ্যাকে নাশ করে বিদ্যা, আলোকেই বিদ্যা বলা হয়। দ্বিতীয় যে অর্থ করছেন তাতে বলছেন ভর্গোকে বলা হয় স্বয়ংজ্যোতি, কঠোপনিষদে বলছেন *তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং*, চৈতন্যজ্যোতিঃস্বরূপ তিনি আছেন বলেই এই সূর্য, চন্দ্র আলোকিত হচ্ছে, আগুন জ্বলছে। তৃতীয় বলছেন, ভর্গো মানে পরমব্রহ্মাত্মক তেজ, ভর্গো কোন আলো নয়, সেই পরমব্রহ্মের তেজ। ভর্গো আর সবিতুর মধ্যে অনেক মিল আছে। গায়ত্রীমন্ত্রের প্রার্থনা *ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ*, আমার বুদ্ধিকে আলোকিত কর। তিনি জ্যোতির্ময়, জ্যোতিষ্মান, আবার তিনি অন্ধকারকে সরিয়ে দেন। তিনি সবিতুঃ আর তিনি ভর্গো, তিনি সেই আলোর প্রভু যে আলো অন্ধকারকে দূর করে। *দেবস্য* মানে দেবতা, তিনি সমস্ত দেবতাদের দেবতা, শ্রেষ্ঠ প্রভু। ভূঃ ভুবঃ স্বঃ এই তিন লোকের প্রভু যিনি তিনিই দেবস্য, সব কটি বিশেষণ পরস্পরের সাথে এক হয়ে আছে। তৎ, যিনি ভগবান তাঁর ওপরে এই এই বিশেষণ আরোপিত করা হয়েছে। প্রথম বিশেষণ তিনি এই ত্রিলোকের রচয়িতা, প্রভু। দ্বিতীয় বিশেষণ মনোজগতের ব্যাপার, তিনি বরেণ্যম্। পরে পরে বিশেষণ গুলো তিনি সবিতু, তিনি ভর্গো এবং তিনি দেবস্য। *ধীমহি* – আমরা তাঁকে ধ্যান করি। এখানে অহং ধীমহি বলতে পারি, মানে আমি ধ্যান করছি। ধীমহিতে যেটা ধ্যানের কথা বলছেন এটা প্রার্থনার জন্য বোঝাচ্ছে। আমরা যখন কারুর প্রশংসা করি তখন বলি আমি তোমারই চিন্তা করছিলাম। মানে আমার মন তোমার উপরেই একাগ্র করছি, অথবা আমার মনটা তোমার উপরেই পুরোপুরি পড়ে রয়েছে। *বরেণ্যম্* শব্দ দিয়ে *মৎপরঃ* ভাবকে নিয়ে আসছেন আর *ধীমহি* শব্দ দিয়ে *মৎচিত্ত* ভাবকে প্রকাশ করছেন। আপনি যে শুধু বরেণ্যম্ই নন, আমার মন আপনাতেই পড়ে আছে। মৎপরঃ আর মৎচিত্ত গীতার এই সুন্দর ভাবকে গায়ত্রীমন্ত্রে বরেণ্যম্ আর ধীমহি দিয়ে বলে দিলেন, তুমিই শ্রেষ্ঠ আবার তোমাতেই আমার মন, দুটোই এসে যাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলছেন – তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা। জীবনের ধ্রুবতারাটা বরেণ্যম্ আর তোমারেই করিয়াছি যেটা সেটাই ধীমহি। বিল গেটস্ পৃথিবীর সব থেকে ধনী লোক, তাতে আমার কি, ভগবান ত্রিলোকের স্রষ্টা, তাতে আমার কি! আমার কাছে তিনি এই যে আমি তাঁরই ধ্যান করছি, ধ্যান করা মানে আমার মনটা তাঁর চিন্তা দিয়েই ভরিয়ে দিচ্ছি, যিনি সব কিছুর রচয়িতা, যিনি আলোকময়, সবিতু, যিনি ভর্গো অর্থাৎ যিনি অজ্ঞান অন্ধকারকে সরিয়ে দিয়ে আমাদের অন্তরকে আলোকিত করে দেন, মানে যিনি এই জগতকে আলো দিচ্ছেন আবার মনেও আলো দিয়ে আমাদের অন্তর জগতকে উদ্ভাসিত করে দেন, আর যিনি শ্রেষ্ঠ, বরেণ্যম। বিল গেটস্ সব থেকে ধনী হতে পারেন কিন্তু আমি বিল গেটসের ধ্যান করতে যাচ্ছি না।

গায়ত্রী মন্ত্রের মোটামুটি তিন ভাবে অর্থ করা হয়। প্রথম অর্থে বলছেন – ঠিক ঠিক আধ্যাত্মিক মঙ্গল হয়। দ্বিতীয় অর্থে বলা, যারা একটু সাধারণ স্তরের তাঁরা এই অর্থ করেন – সবিতুর মানে স্থূল সূর্য, আমরা এই সূর্যের উপাসনা করছি, কারণ সূর্য থেকেই সব কিছুর জন্ম। সূর্য আছে বলেই মানুষ, জীব-জন্তু, পশু-পাখি সবাই জেগে উঠছে। আবার স্থূল দিক দিয়ে দেখলে সূর্যে রশ্মিই আমাদের এখানে পড়ছে, গাছপালারা সূর্যের রশ্মিকে ফটোসিন্থেসিস করছে, আমাদের খাদ্য তৈরী হচ্ছে, আমাদের অস্তিত্বটাই দাঁড়িয়ে আছে সূর্যকে অবলম্বন করে। তার মানে ভূঃ, ভুবঃ আর স্বঃ যা কিছু আছে সব সূর্যের জন্যই আছে, এর মধ্যে কোথাও কোন ভুল নেই। তাই সূর্যে উপাসনা করা হচ্ছে। দুটো অর্থ হয়ে গেল। যে কোন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সূর্য আছে বলেই এসেছে। ভর্গোর তৃতীয় আরেকটা অর্থ হয়, *পাপানাং তাপতম্*, পাপকে সূর্যের আলো তাপ দিয়ে পুড়িয়ে দেয়। প্রথমটা অবিদ্যার অর্থে, আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে অবিদ্যার কার্য, অবিদ্যাকে নাশ করে দেয়। দ্বিতীয় যিনি সূর্য দেবতা, আমরা রোজ যে সূর্যকে দেখছে তাকে বলা হচ্ছে না, কিন্তু এই স্থূল সুর্যকেই কেন্দ্র করে সূর্য দেবতার উপাসনা এসেছে। সূর্য পাপ নাশ করে দেন। অর্থাৎ বলতে চাইছেন গায়ত্রী মন্ত্র জপ করলে পাপ নাশ হয়। কিন্তু যাঁরা আধ্যাত্মিক পথের পথিক, তাঁদের কাছে পাপ-পূণ্য এগুলো কিছু নয়। একটা দুটো গাছ উপড়ে লাভ নেই, এবার পুরো জঙ্গলকেই সাফ করে দিতে হবে। গায়ত্রী মন্ত্র পুরো জঙ্গলকে, অর্থাৎ অবিদ্যার শেকড়টাকেই উপড়ে দেয়। তৃতীয় আরেকটা অর্থ করা হয়, যেহেতু গায়ত্রী মন্ত্র যজ্ঞের মন্ত্র, দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করা হয়, সেইহেতু এর আরেকটি অর্থ এভাবেও করা হয়ে থাকে। ভর্গো শব্দের অর্থ যেমন আলো আবার ভর্গো মানে অন্নও হয়। তাই প্রার্থনা করা হচ্ছে, আমরা সেই দেবতার উপাসনা করি যিনি আমাদের অন্ন দেন, তিনি যেন আমাদের

প্রচুর অন্ন দেন। তাহলে দাঁড়াল, গায়ত্রী মন্ত্র যদি জপ করা হয় তাহলে তিনটে জিনিসই হয়, প্রথম জাগতিক কল্যাণ, দ্বিতীয় পাপের নাশ হয় তাই মনেরও শান্তি হয় কিন্তু তৃতীয় অর্থে বলা হয় আধ্যাত্মিক জ্ঞান হয়। এই কারণেই হিন্দুরা গায়ত্রী মন্ত্রকে এত সম্মান দিয়ে আসছেন। এই অর্থগুলি শব্দের মধ্যেই দেওয়া আছে এর কোন ব্যাখ্যা করারও দরকার নেই। সংস্কৃতের অর্থগুলিকে পর পর সাজিয়ে দিলে তিনটে অর্থই স্পষ্ট বেরিয়ে আসবে। প্রথম অর্থ, সূর্যের কাছে প্রার্থনা করা হচ্ছে আমাকে সমৃদ্ধি দাও, দ্বিতীয় অর্থ হে সূর্য দেবতা আমরা যত পাপ করেছি সেই পাপ যেন নাশ হয়ে যায়। মনুস্মৃতিতেও বলা হয়েছে গায়ত্রী জপ করলে পাপ শুদ্ধি হয়ে যায়। আর এর শেষ অর্থ, আমার যেন আধ্যাত্মিক জ্ঞান হয়, আমার মন যেন ঈশ্বরের দিকে যায় আর আমার যেন আত্মজ্ঞান হয়। গায়ত্রী মন্ত্র এই তিনটে অর্থেই হয়। আমরা সবাই তিনটে ভূমির কোন একটা ভূমিতে অবস্থান করে আছি। একটা ভূমি হল ভৌতিক ভূমি, যারা পুরোপুরি ভোগ-বাসনার মধ্যে সংসারে ডুবে আছে, দ্বিতীয় ভূমি ধার্মিক ভূমি আর তৃতীয় আধ্যাত্মিক ভূমি। বেশির ভাগ ব্রাহ্মণরাই ধার্মিক ভূমিতে থাকতেন, ধর্ম কর্ম করতেন আর যাঁরা মোক্ষ পথে চলে যান তাঁরাই কেবল আধ্যাত্মিক ভূমিতে বিচরণ করেন। এই একটি মন্ত্রই তিনটে ভূমিতেই প্রযোজ্য হয়ে যাবে যদি এর শাব্দিক অর্থকে সেইভাবে সাজিয়ে নেওয়া হয়। যারা ঘোর সংসারী তাঁরা প্রার্থনা করছেন হে প্রভু! আমাকে জাগতিক সমৃদ্ধি দাও যাতে সংসারে আমি শান্তিতে থাকতে পারি, যারা ধার্মিক তারা বলছেন, হে প্রভু! আমার যত পাপকর্ম আছে তার নাশ হোক আর যারা আধ্যাত্মিক রাজ্যের পথিক তারা বলছে, হে প্রভু! অবিদ্যার যে রাজ্য এটাকে উপড়ে ফেল। খণ্ডন ভববন্ধন, হে প্রভু! এই যে সংসারের বন্ধন এই বন্ধনকে তুমি খণ্ডন করে দাও।

আমরা কেন তাঁর ধ্যান করছি? আমার যে ধী, মানে আমার যে বুদ্ধি, সেই বুদ্ধিকে তিনি যেন প্রচোদয়াৎ, আমার বুদ্ধিকে তিনি যেন তাঁর দিকে এগিয়ে দেন। তাঁর দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া মানে, আলোকিত করা, প্রকাশিত করা। সূর্যের যত কাছে যাব ততই সূর্যের আলো বেশি বেশি করে প্রকাশ হতে থাকবে। কিন্তু এখানে যে আলোর কথা বলা হচ্ছে সেটা সূর্যের আলো নয়, সবিতু আর ভর্গো শব্দে যে জ্যোতির কথা বলা হচ্ছে সেই জ্যোতির আলোতে আমাকে প্রকাশিত কর, আলোকিত করার অর্থ হল, ভুল জিনিসগুলিকে, বিশেষ করে জাগতিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে জানার ক্ষেত্রে ভুলটাকে ধরে ফেলব, মনের জগতে আমি আর আজেবাজে জিনিসে নিজেকে আবদ্ধ করব না, আর আধ্যাত্মিক জগতে ঠিক ঠিক অধ্যাত্ম পুরুষে রূপান্তরিত হয়ে যাব।

।। দেবীসূক্তম্ ।।

বেদে দেবতাদের যত বর্ণনা আছে সেই তুলনায় দেবীদের সম্বন্ধে খুব বেশি কিছু নেই। দেবীসূক্তম দেবীর ব্যাপারে বেদের একটি অত্যন্ত দুর্লভ সূক্তম্। দেবীসূক্তমের মত মেধাসূক্তম্ও দেবীকে নিয়ে। যেটুকুই বলা হয়েছে দেবীর ব্যাপারে, ততটুকুতেই আমরা পুরো একটা দর্শন পেয়ে যাই। তন্ত্র দর্শন ছাড়া হিন্দু দর্শনে দেবীর ব্যাপারে আমরা খুব বেশি কিছু পাইনা। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে যে লক্ষ্মীর কথা পাই, হিন্দু দর্শনে তাঁকেও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে খুব বড় একটা ভূমিকাতে আমরা পাইনা। বেদান্তে যেখানে মায়াকে নিয়ে বলছে সেখানেও দেবীশক্তিকে খুব বেশি একটা গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। একমাত্র শক্তি সাধনাতেই পুরোপুরি দেবীকে নিয়েই সব কিছু, এ ছাড়া আর কোথাও দেবীশক্তির বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায় না। কিন্তু বেদে দেবীসূক্তম্ আর মেধাসূক্তমের মধ্যেই দেবীর শক্তি ও তাঁর কার্যাবলীর এবং দর্শনের ব্যাপারে অনেক কিছুই পাওয়া যায়। পরের দিকে যে তন্ত্রশাস্ত্রের আবির্ভাব হয়েছে তার বেশির ভাগই এই দেবীসূক্তমকে আধার করেই হয়েছে। চণ্ডীতে একেবারে শেষের দিকে রাজা সূরথ ও বৈশ্য যখন দেবীর সম্বন্ধে সব কিছু জেনে নিয়ে সাধনা শুরু করলেন তখন এই দেবীসূক্তম্কে অবলম্বন করে এবং দেবীসূক্তম্ জপ করেই তাঁরা সাধনা করেন। তাই আমরা এখন একটি বেদের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিককে নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি।

বেদের প্রত্যেকটি সূক্তম্ আর প্রত্যেকটি মন্ত্রই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বেদে কম গুরুত্ব বেশি গুরুত্বের কোন ব্যাপার নেই। যেমন অনেকে চণ্ডীতে এই অংশে স্তব আছে, এখানে স্তুতি আছে, এখানে যুদ্ধের বর্ণনা আছে,

এইভাবে ভাগ করে বেশি গুরুত্ব আর কম গুরুত্ব দিয়ে শ্রেণী বিভাগ করেন। বেদে কিন্তু এভাবে কোন শ্রেণী বিন্যাস করা হয় না, বেদের সব কটি মন্ত্রকেই সমান গুরুত্ব দিতে হবে। তবে ব্যাক্তি বিশেষে পছন্দ অপছন্দের ব্যাপার এসে যায়। কেউ এই অংশ বেশি পাঠ করেন, কেউ অন্য একটা অংশকে বেশি জোর দেন।

বেদে মূল যে দেবীদের কথা পাই তাঁরা হলেন পৃথ্বী, রাত্রি, শ্রী। এনারাই বেদের আসল দেবী। দেবীসূক্তমের মত কতকটা একই রকম একটা ঘটনা কেনোপনিষদে আমরা পাই, যেখানে উমা হৈমবতীর কথা বলা হয়েছে। পরে পুরাণে এসে এই উমা হৈমবতীকেই পার্বতীর জীবনের সাথে যেন যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। সাহিত্য সৃষ্টিতে সাহিত্যকাররা আগের কিছু ঘটনাকে নিয়ে বর্তমানের সাথে যোগ করে দেন। দেবীসূক্তমের দেবী হলেন বাক্ দেবী। দেবীসূক্তমের একটা দিকে এই মন্ত্রগুলো বাক্ দেবীকে উৎসর্গ করা হয়েছে, আরেকটি দিকে এই বাক্ দেবীই পরে সরস্বতী রূপে পূজিত হয়ে আসছেন।

দেবীসূক্তম্ পুরোটাই অহম্ দিয়ে বলা হয়েছে। প্রথম মন্ত্র থেকেই অহম্ দিয়ে শুরু করা হয়েছে। অহম্ শব্দের অর্থ আমি। দেবীসূক্তমের অহম্কে নিয়ে বিভিন্ন ভাষ্যকারদের মধ্যে অনেক বিতর্ক আছে। পুরো দেবীসূক্তম্ পাঠ করলে আমাদেরও মনে হবে আমি বলতে কোন দেবী যেন এই কথাগুলো বলছেন। সায়নাচার্য, যিনি বেদের ভাষ্য রচনা করেছেন, তিনি কিন্তু পরিষ্কার যুক্তি দিয়ে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিয়েছেন। যাঁরা ভাষ্য রচনা করেন তাঁদের কথা মানতে হয়। সায়নাচার্য তাঁর ভাষ্যে বলছেন, আগেকার দিনে অম্ভৃণ নামে এক ঋষি ছিলেন। সেই ঋষির এক মেয়ের নাম ছিল বাক্। দেবীসূক্তম্ সেই ঋষি কন্যা বাক্ রচনা করেছেন। বেদে যত মন্ত্র আছে সব মন্ত্রের একজন করে ঋষির নাম থাকে, বলা হয় এই মন্ত্র অমুক ঋষির রচনা। ঋষির নাম থাকলেও এটা পরিষ্কার হয় না যে, তিনি মন্ত্রদ্রষ্টা নাকি তিনি এই মন্ত্রের রচয়িতা। সাধারণতঃ মন্ত্রে যে শব্দগুলো ব্যবহার করা হয় সেগুলো মন্ত্রদ্রষ্টার মুখ থেকেই বেরিয়ে এসেছে। মন্ত্রদ্রষ্টার অর্থ হল, ওই সত্যকে যিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। দেবীসূক্তমের যে আটটি মন্ত্র, এই মন্ত্রগুলিকে সেই সত্যদ্রষ্টা ঋষিকা ছন্দোবদ্ধ করেছেন নাকি অন্য কেউ করেছেন আমাদের জানার উপায় নেই। কিন্তু পরম্পরাতে আমরা জেনে আসছি এগুলো সব মন্ত্রদ্রষ্টা। কথামৃতের কথাগুলি যেমন ঠাকুরের কথা, ঠিক তেমনি মন্ত্রের কথাগুলিও সেই সত্যদ্রষ্টা ঋষির। যেমন স্বামীজীর রচনাবলীতে কিছু কথা স্বামীজী নিজের হাতে লিখেছেন, যেমন স্বামীজীর পত্রাবলী, আবার কিছু কথা তিনি যে ভাষণ দিয়েছিলেন সেগুলিকে অনেকে নোট করেছেন, নোট করতে গিয়ে কিছু কথা আগে পরে হয়ে থাকতে পারে। স্বামীজীর রচনাবলী মানে সবটাই স্বামীজীর কথা। ঠিক তেমনি অম্ভৃণ ঋষির বাক্ নামে এক কন্যা ছিল, তিনি দেবীসূক্তম মন্ত্রের মন্ত্রদ্রষ্টা। সেইজন্য বলা হয় অহম্ বলতে সেই বাক্ ঋষিকাই বলছেন। দেবীসূক্তম্ আবার অথর্ব বেদেও এসেছে যদিও সেখানে সামান্য একটু পরিবর্তন দেখা যায়। সেখানে আবার বাক্ দেবীকে উল্লেখ করা হয়েছে। এই নিয়ে ভাষ্যকারদের মধ্যে বিভিন্ন মতান্তর দেখা যায়। যদিও সায়নাচার্য বেদের ভাষ্য রচনা করেছেন, কিন্তু তিনি নিজে আবার পুরোপুরি বেদান্তী ছিলেন, আচার্য শঙ্করের দর্শনকেই তিনি অনুসরণ করতেন। ফলে তাঁর ভাষ্যের মধ্যে আচার্য শঙ্করের মতের প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়।

আমরা এখন প্রথম মতকে মেনে নিয়ে বাক্ ঋষিকাকে মন্ত্রদ্রষ্টা রূপে গ্রহণ করে নিচ্ছি। নারীদের মধ্যে যাঁরা ঋষি হতেন তাঁদের ঋষিকা বলা হত। বেদে আমরা অনেক ঋষিকার নাম পাই। অনেকের মধ্যে কোথা থেকে একটা ভ্রান্ত ধারণা তৈরী হয়ে আছে যে, মেয়েদের বেদ পাঠ করতে নেই, মেয়েদের গায়ত্রী মন্ত্র জপ করতে নেই। অথচ বেদে একজন কি দুজন ঋষিকার নাম পাওয়া যায় না, প্রচুর ঋষিকা ছিলেন, যাঁরা সাধনা করে সেই সত্যকে উপলব্ধি করে মন্ত্রদ্রষ্টা হয়েছেন, আর তাঁদের শিষ্যরা হাজার হাজার বছর ধরে তাঁদের মন্ত্র কণ্ঠস্থ করে পাঠ করে যাচ্ছেন, সেই মন্ত্র দিয়ে যজ্ঞে আহুতি দেওয়া হচ্ছে, আর মেয়েরা বেদ পাঠ করবে না এর থেকে বড় দুর্ভাগ্যের কথা কখন হতে পারে! দেবীসূক্তমকে দূর্গাদেবীর স্তুতিতে ব্যবহার করা হয় ঠিকই, আর বেদের সব সূক্তরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে, দেবীসূক্তমেরও একটা আলাদা বিশেষত্ব আছে। দেবীসূক্তমের প্রধান বিশেষত্ব হল এখানে মানুষ আর দেবীর মধ্যেকার তফাৎটা মুছে যায়। ঠাকুরের যখন জগন্মাতা মা কালীর দর্শন হয়েছে এবং আবার যখন তিনি অদ্বৈত সাধনা করছেন তখন মা কালী ঠাকুরকে বলছেন – তুই ভাবমুখে থাক। ভাবমুখে থাকাটা কি? একদিকে পার্থিব শরীর রয়েছে অন্য দিকে তিনি সচ্চিদানন্দের সঙ্গে

নিজেকে এক দেখছেন। বোঝার সুবিধার্থে ক্ষণিকের জন্য আমরা ঠাকুরের উপর থেকে বৈষ্ণবদের অবতারবাদ, গীতার অবতারবাদের কথা বা শ্রীরামকৃষ্ণ দর্শনে আমরা যেভাবে ঠাকুরকে অবতার দেখছি, সেই অবতারবাদকে সরিয়ে রাখছি। বেদে অবতারবাদ নেই, উপনিষদে অবতারবাদ নেই, সাংখ্য অবতারবাদ মানে না, সেইজন্য ক্ষণিকের জন্য আমরা যদি অবতারবাদকে না মানি, তাহলে দেবীসূক্তমের বক্তব্য আর ঠাকুরের কথার মধ্যে একটা যোগসূত্রের মেলবন্ধন পাওয়া যাবে।

আমি নিজেকে যে জিনিসের সঙ্গে একাত্ম করে নেব, নিজেকে আমি তাই মনে করব। এই আমি বলতে কে? আমি বলতে আমরা মনে করি আমি এই শরীর। শরীর যদি ভালো থাকে আমি নিজেকে ভালো মনে করি, শরীরের প্রশংসা করলে খুশী হই। শরীর থেকে এক ধাপ উপরে যদি নিজেকে মনের সঙ্গে জুড়ে দিই, তখন আমার মনের মত সব কিছুর সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাব। আমার স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে মন দিয়ে যখন জুড়ে দিচ্ছি, তখন তাদের খুশীতেই আমি খুশী হই, তাদের আনন্দে আমি উৎফুল্ল হই। এরপর যখন সাধনা শুরু হয়, সাধনা করে করে মন যখন শুদ্ধ হয়ে গেল, আধ্যাত্মিক ভাবের সাথে যখন এক হয়ে গেল তখন যে বোধগুলো আসতে শুরু হয়, সেই বোধ কার কি রকম আসে বলা যায় না। এই বোধ নির্ভর করে সাধনার আগে তিনি যা যা ভাব অবলম্বন করে এগোচ্ছিলেন। ঠাকুরের সাধনার ভাব ছিল সন্তান ভাব, সেইজন্য শেষ পর্যন্ত ঠাকুর বলে গেছেন আমি মায়ের সন্তান। প্রথমের দিকে আরবে থাকাকালীন ওখানকার খ্রীশ্চান, জহুদি আদিবাসীরা মহম্মদকে বিদ্রুপ করে বলত – ভগবান যীশুকে আমাদের জন্য দূত করে পাঠিয়েছেন, জিউসদের মধ্যে কত দূত পাঠিয়েছেন কিন্তু ভগবান তোমাদের জন্য কোন দূত পাঠাননি। মহম্মদের মনে চিরদিনই একটা সন্তাপ ছিল যে আমাদের মধ্যে তিনি দূত পাঠাননি। এরপর মহম্মদ সাধনা করে যখন সিদ্ধি লাভ করলেন তখন তিনি নিজেকে ভগবানের দূত রূপেই দেখলেন। সেই থেকে মহম্মদ হয়ে গেলেন আল্লার দূত। যীশু সাধনা করলেন নিজেকে ভগবানের পুত্র রূপে, ভগবানকে তিনি পিতা রূপেই সাধনা করে গেলেন। ফলে যীশু চিরদিন নিজেকে Son of God রূপেই দেখে গেলেন। কিন্তু যিনি ব্রহ্ম রূপে সাধনা করবেন, তাঁর যখন সিদ্ধি হবে তিনি কি দেখবেন? শঙ্করাচার্যের যে স্তোত্র আছে *চিদানন্দরূপোহম্ শিবোহহম্ শিবোহহম্*, তখন তিনি নিজেকে এই রূপেই দেখবেন। তাহলে শ্রীরামকৃষ্ণ যে নিজেকে মায়ের সন্তান রূপে দেখছেন, মহম্মদ নিজেকে দূত রূপে দেখছেন, যীশু পিতার সন্তান রূপে দেখেছেন আর যিনি বলছেন শিবোহহম্ শিবোহহম্ এনাদের দেখার মধ্যে কি তফাৎ আছে? কোন তফাতই নেই। যত রকম ভাব আছে, শান্ত ভাব, সখ্য ভাব, দাস্য ভাব ইত্যাদি, যে ভাব নিয়ে সাধনাই করুক না কেন, সিদ্ধির পরে সেই ভাবটাই থাকে যে ভাবকে অবলম্বন করে সিদ্ধি লাভ করেছেন। যিনি সৃষ্টি আর স্রষ্টার সঙ্গে নিজেকে এক করে দিচ্ছেন তিনি স্রষ্টার সঙ্গে এক হয়ে যাবেন। যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর সাধনা করে তাঁর সঙ্গে এক হয়ে গেলে ভগবান বিষ্ণুর সঙ্গে এক হয়ে যাবেন। সগুণ ব্রহ্মের সঙ্গে নিজেকে এক করে দিলে সৃষ্টিতে যাবতীয় যা কিছু হচ্ছে তিনিই তার সব কিছুর স্রষ্টা হয়ে যাবেন। তখন তিনি দেখবেন এই সৃষ্টি আমার থেকেই বেরিয়েছে, আমিই জগতপ্রসবিনী, সব কিছু আমার থেকেই বেরিয়েছে, *মত্তঃ সর্বং প্রবর্তন্তে*।

দেবীসূক্তম পাঠ করে এর ভাবকে অনুধাবন করলে একটা জিনিসই মনে হয়, বাক্ ঋষিকা যখন সাধনা করেছিলেন তখন তিনি নিশ্চয়ই সচ্চিদানন্দকে স্রষ্টা রূপে বা পুরুষসূক্তমের পুরুষ রূপে সাধনা করেছিলেন। যার ফলে সিদ্ধি লাভ করে তিনি দেখছেন জগতে যা কিছু আছে সব আমার থেকেই বেরিয়েছে। বেদান্তে যখন অহং ব্রহ্মাস্মির সাধনা করা হয় সেই সাধনার একটা গুরুত্বপূর্ণ উপলব্ধি হল *মত্তঃ সর্বং প্রবর্তন্তে*, জগতে যা কিছু আছে সব আমার থেকেই বেরিয়েছে। কিন্তু জগতের সব কিছু তো ঈশ্বর থেকে বেরিয়েছে, তাহলে আমি কি করে বলতে পারি আমার থেকে সব কিছু বেরিয়েছে! কথামৃতে ঠাকুর বারবার বলছেন, মানুষের বলার জো নেই যে সে ঈশ্বর। সেইজন্য আমরা বলেছিলাম অবতারতত্ত্বকে কিছুক্ষণের জন্য সরিয়ে রেখে জিনিসটাকে বিচার করলে সুবিধা হবে। যুক্তি দিয়ে বিচার করলে ব্যাপারটা এভাবেই দাঁড়ায়। যখন ভগবান অবতার হয়ে আসেন তখন তাঁর ক্ষেত্রেও সেই একই জিনিস হয়, তিনি নিজেকে তাঁর নির্গুণ ব্রহ্ম বা সগুণ ব্রহ্ম এই দুটোর সঙ্গে এক করে বলছেন। কিন্তু যিনি সাধক তিনিও যদি ওই ভাবে সাধনা করেন তখন তিনিও বলবেন জগত আমার

থেকেই সৃষ্টি। জগতে মানুষ ভগবানকে প্রথম বাবা রূপে, মা রূপে, কর্তা রূপে নানা ভাবে দেখে। এবার যে ভাব নিয়ে তার সাধনা শুরু হবে সিদ্ধির অবস্থায় তার সেই ভাবই থাকবে। কেউ ঠাকুরকে নিজের বাবা রূপে সাধনা করল, সারা জীবন সাধনা করে গেল। এরপর তার যদি অদ্বৈত জ্ঞান হয়েও যায়, পরে যখন আবার অদ্বৈত অবস্থা থেকে নেমে আসবে তখনও কিন্তু সে বলবে ঠাকুর আমার বাবা। কিন্তু আমিই সেই ব্রহ্ম, অহং ব্রহ্মাস্মি এই ভাব নিয়ে সাধনা যিনি করেন, সিদ্ধির পরেও তাঁর এই ভাব থাকবে, আমিই সেই ব্রহ্ম, যেখান থেকে সব সৃষ্টি হয়েছে, যেখানে সব কিছু স্থিত হয়ে আছে, সেখানেই সব কিছুর লয় হচ্ছে। আপাতদৃষ্টিতে শুনে মনে হবে কী অহঙ্কারী কথা। কিন্তু তাঁর এতটুকুও অহঙ্কার নেই। কারণ যে ভাব নিয়ে সাধনা করা হয়েছে সিদ্ধির পরে ঠিক ওই ভাব নিয়েই সচ্চিদানন্দকে জানেন, যদি না সচ্চিদানন্দ কোন একটা স্তরে তাঁর মোর না ঘুরিয়ে দেন। এই ভাবকেই কথামৃতে ঠাকুর হনুমানকে দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন, যেখানে হনুমান বলছেন দ্বৈত ভাবে থাকলে শ্রীরামকে এক রকম দেখি, বিশিষ্টাদ্বৈত ভাবে থাকলে আরেক রকম দেখি আর অদ্বৈত ভাবে থাকলে অন্য রকম দেখি।

হনুমান এই কথা আদৌ বলেছিলেন কিনা আমাদের জানা নেই, কিন্তু অদ্বৈত ভাব নিয়ে সাধনা যিনি করছেন, ব্যবহারিক জীবনে তাঁর অদ্বৈত ভাব থাকে না। ব্যবহারিক জীবনে সবাইকে দ্বৈত ভূমিতে নামতেই হয়। দ্বৈত ভাবে নামার সময় তাঁকে কয়েকটি ভাব অবলম্বন করতে হবে, সন্তান ভাব বা সখ্য ভাব বা বন্ধু ভাব। দেবীসূক্তমে ঋষিকার ভাব হল শান্ত ভাব, স্রষ্টার সাথে আমি এক। আমি দাস বা সেবক নই, সন্তান যদি হই তাহলে তুমি সম্রাট আমি রাজপুত্র, এই সাম্রাজ্য আমার। ঠাকুর মজা করে বলছেন, শুনেছি নাকি ছেলের উপর মায়ের তেমন নালিশ চলে না। তখনকার দিনে হয়তো কোন নিয়ম ছিল, মা যদি ছেলের বিরুদ্ধে সম্পত্তি নিয়ে কোন মামলা করে তাহলে সেই মামলা টিকবে না। মানে, মায়ের যে সম্পত্তি তার উপর ছেলের স্বাভাবিক নিয়মেই অধিকার থাকবে। তাই যদি হয় তাহলে শ্রীশ্রীমা যদি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মালকাইন হন আর আমি যদি নিজেকে শ্রীমায়ের সাথে এক মনে করি, আর সত্যি সত্যিই যদি আমার সেই অনুভূতি হয়ে থাকে তাহলে এই জগৎ তো আমারই। তখন আমার যে উদ্গার নির্গত হবে ঠিক সেই একই উদ্গার এই দেবীসূক্তমে ঋষিকা করছেন। কিন্তু আমরা বড় হয়েছি অবতারবাদের চিন্তা ভাবনা নিয়ে। অবতারবাদের চিন্তা ভাবনায় লালিত হলে দেবীসূক্তমের ভাব বোঝা যাবে না। অবতারবাদের পটভূমিকায় দেবীসূক্তমের অর্থ দাঁড়াতে পারবে না। তখন জিনিসটা অন্য ভাবে নিতে হবে, তখন বলা হবে দেবীসূক্তমের কথা বাক্ দেবীর কথা। সেইজন্য অথর্ব বেদে এসে যখন ঋষি পাল্টে গেছে তিনি যেন দেখছেন বাক্ দেবী এই কথাগুলো বলছেন। সেই থেকে দেবীসূক্তমকে বাক্ দেবীর স্তুতি রূপে নেওয়া হয়েছে। কোন মানুষ এরকম কথা বলতে পারেন ভাবলেই আমাদের শরীর মন শিহরীত হয়ে ওঠে। সেইজন্য দেবীসূক্তমকে মা দুর্গার স্তুতি রূপেই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়ে আসছে, কারণ জগতপ্রসবিনী মা দুর্গাই একমাত্র এই ধরণের কথা বলতে পারেন। কিন্তু দেবীসূক্তমের দেবীকে দুর্গা দেবী রূপে না নিয়ে বাক্ দেবী রূপেই নেওয়া হয়। মন্ত্রের যিনি ঋষিকা তাঁরও নাম বাক্ আর যিনি মন্ত্রের দেবী তাঁরও নাম বাক্। তবে আমরা যে দেবীরই পূজা করি না কেন, মা দুর্গা, সরস্বতী, মা কালী যে কোন শক্তির আরাধনাতে এই দেবীসূক্তম্ দিয়ে স্তুতি করলে সব দেবীরই স্তুতি করা হয়ে যায়।

বাক্ দেবী এই মন্ত্রের দেবী হওয়াতে ব্যাপারটা আরও মজার হয়ে গেছে। বাক্ দেবী মানে, যেখানেই কোন শব্দ আছে সেখানেই বাক্ দেবী আছেন। কথা বলছি, শব্দ হচ্ছে এখানে বাক্ দেবী আছেন, টেবিলে টোকা মারছি, শব্দ হল এখানেও বাক্ দেবী আছেন, পাখার শব্দ হচ্ছে বাক্ দেবী আছেন, বিদ্যুৎ কড়কাচ্ছে, মেঘ গর্জন করছে বাক্ দেবী আছেন, বিগ্ ব্যাঙে বিস্ফোড়ন হল বিরাট শব্দ হল কিন্তু আমরা শুনতে পেলাম না, সেখানেও বাক্ দেবী আছেন। যেখানেই ধ্বণি সেখানেই বাক্ দেবী। ধ্বণি কত দূর পর্যন্ত আছে? যেখানেই ওঁ সেখানেই শব্দ, যেখানেই শব্দ সেখানেই বাক্ দেবী। ঠাকুর বলছেন – সন্ধ্যা গায়ত্রীতে লয় হয়, গায়ত্রী প্রণবে লয় হয়, প্রণব নাদে লয় হয়, যোগীরা সেই নাদ ভেদ করে পরমাত্মার সাক্ষাৎ করেন। বেদের সাধনাই সন্ধ্যা গায়ত্রী। সন্ধ্যা বন্দনাদি করতে করতে মন যখন গভীরে চলে যায় তখন শুধু গায়ত্রী মন্ত্র জপ হতে থাকে। গায়ত্রী মন্ত্র জপ করতে করতে মন আরও গভীরে চলে গেল, তখন শুধু ওঁ থাকে। তখন ফোয়ারার মত ওঁ হতে

থাকে। সেই সময় তিনি হয়ত জপ করতে চাইছেন না কিন্তু তাও জপ হয়ে যাচ্ছে, এটাকেই বলে অজপা জপ। অজপা জপে কোন প্রচেষ্টা থাকে না, নিজে থেকেই চব্বিশ ঘণ্টা জপ হতে থাকে। এই অবস্থায় আসার পর তাঁরা নাদ ধ্বণি শুনতে পান, এটাকেই বলে অনাহত ধ্বণি। অনাহত ধ্বণি মানে ধ্বণি কোন আহত হয়ে উৎপন্ন হচ্ছে না। অনাহত ধ্বণি অখণ্ডিত ধ্বণি। বর্ণমালার অক্ষর আমরা যে উচ্চারণ করি এগুলো সব খণ্ডিত ধ্বণি।

যেখানেই সৃষ্টি, যেখানেই দেশ, কাল, কার্য, কারণের সমাবেশ হয়েছে, যেখান থেকে মায়ার আবরণ শুরু সেখানেই ওঁ। পরমাত্মার ঠিক পরের ধাপ, যেখান থেকে সৃষ্টি কার্য শুরু হয় সেখানেই আসে ওঁ। এটাকেই খ্রীশ্চান ধর্মে বলছে In the beginning there was word, the word was with God, the God is word। ওঁ যা পরমাত্মাও তাই, ওঁ আর পরমাত্মা অভেদ। কিন্তু 'ওঁ'কে ভেদ না করলে পরমাত্মা পর্যন্ত যাওয়া যায় না। আধ্যাত্মিক বুদ্ধি জাগ্রত না হলে এগুলোকে ধারণা করা যায় না। কয়েকটি ধাপ আছে, প্রথমে কোন ঋষি জপ-ধ্যান করতে শুরু করলেন, জপ করতে করতে প্রথম ধাপে তাঁর অজপা জপ শুরু হয়, নিজে থেকেই জপ হতে থাকে। সেখান থেকে আরও এগিয়ে গিয়ে তিনি বাস্তবিক শুনতে পান 'ওঁ'এর ঘণ্টা ধ্বণির মত শব্দ হচ্ছে। তাঁর মনে হয় সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ওঁ ধ্বণিতে ব্যাপ্ত হয়ে আছে। আধ্যাত্মিক সাধনা যে কোন ধর্ম মতেই করা হোক না কেন সবাই এই ধ্বণি শুনতে পান। স্বামীজী বলছেন, মন যখন সমাধিতে যায়, অর্থাৎ মন যখন ঈশ্বরে লয় হয়ে যায় তাঁর এই জগতের সাথে যে শেষ সম্পর্ক থাকে সেটা এই প্রণবের সাথে। অন্যান্য ধর্মে তো প্রণব বলা হয় না, কিন্তু এই ঢং ধ্বণির কথা সব ধর্মের সাধকরাই বলেন। কিন্তু প্রণব ধ্বণিকেও যখন ভেদ করে বেরিয়ে যান তখন আর কিছুই থাকছে না, সাধকের মন তখন সচ্চিদানন্দের সঙ্গে লয় হয়ে যায়। যতক্ষণ এই ধ্বণির আবরণকে ছিঁড়ে না দেওয়া যায় ততক্ষণ পরমাত্মাতে লয় হবে না। ধ্বণিকে ভেদ করে প্রণবের পারে চলে গেলে পঞ্চভূতের স্থূল শরীর আর থাকবে না। কিন্তু এই গভীরতারও অনেক তারতম্য আছে। পরমাত্মাতে লয় হয়ে যাওয়ার পর আবার মন যখন দ্বৈত ভূমিতে নামবে তখন প্রথম তাঁর চেতনা আসে প্রণব ধ্বণি দিয়ে। তারপর সেখান থেকে অনাহত ধ্বণির রাজ্য থেকে নামতে নামতে আবার খণ্ডিত ধ্বণির রাজ্যে এসে প্রবেশ করেন, প্রত্যেকটি ধ্বণিকে পৃথক পৃথক ভাবে অনুভব করেন, এটা পাখির আওয়াজ, এটা মানুষের আওয়াজ, এটা পাখার আওয়াজ ইত্যাদি। এরপর পুরোপুরি জগতের বোধটা ফিরে আসে। ঠাকুর এক জায়গায় বলছেন – সমাধির অবস্থায় আমি যদি এই রকম ভাবে থাকি তাহলে আমার কানে এই মন্ত্র বলবি। অর্থাৎ ঠাকুর খুব নির্দিষ্ট করে বলে দিচ্ছেন, যদি কৃষ্ণ ভাবে থাকি তাহলে এই মন্ত্র বলবে, শ্রীরাম ভাবে থাকলে এই রকম মন্ত্র বলবে, অদ্বৈত ভাবে থাকলে এই রকম মন্ত্র বলবে ইত্যাদি। মনে করা যাক ঠাকুর কৃষ্ণ ভাবে আছেন। সমাধি মগ্ন ঠাকুরের কানে তখন হৃদয়রাম ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় এই মন্ত্র বলতে শুরু করেছে। ঠাকুরের মন সমাধি থেমে নেমে আসার জন্য প্রণব ধ্বণিকে ছুঁই ছুঁই করতে চাইছে, তখন এই মন্ত্র ঠাকুরের কানে বার বার ধাক্কা মারার জন্য খুব সহজে জগতের সঙ্গে সংযোগ হতে সাহায্য করছে। কারণ মন তখন কৃষ্ণ ভাবে থাকার জন্য এই মন্ত্রের ধ্বণিকে অবলম্বন করে আস্তে করে মনটা নামতে শুরু করে। তখন যদি অন্য কোন মন্ত্র বলা হয় এই ভাব সেটাকে দিয়ে সংযোগ করতে পারবে না। তাতে ক্ষতি কিছুই হবে না, মনটা নামতে সময় একটু বেশি লাগবে। তবে সমাধির অবস্থা দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী হলে শরীরের ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। পঞ্চভূতের শরীরের জন্য খাদ্য চাই, জল চাই, না পেলে শরীর নষ্ট হয়ে যাবে। মন যে জিনিসকে অবলম্বন করে একাগ্রতায় চলে যায়, মনকে সেখান থেকে নামাবার জন্য ওই সম্পর্কিত জিনিসকে নিয়েই নামিয়ে আনতে হয়। এক যুবতী স্ত্রীর স্বামী মারা গেছে, শোকে সে এমন হয়ে গেছে যে কান্নাও ভুলে গিয়ে পাথরের মত হয়ে গেছে। সবাই ভাবছে মেয়েটি হয়ত আর বাঁচবে না। গ্রামের এক বয়স্কা মহিলা মেয়েটির সন্তানকে এনে তার কোলে দিয়ে দিল। তারপরেই হঠাৎ মেয়েটির কান্না শুরু হয়ে গেল। কান্না শুরু করে দেওয়ার পর গ্রামের মেয়েরা বলছে এবার মেয়েটি বেঁচে যাবে। স্বামীর চিন্তায় মেয়েটির মন যে কোথায় হারিয়ে গেছে নিজেরও কোন চেতনা নেই, এবার স্বামীর সঙ্গে যুক্ত কোন জিনিসকে মনে করিয়ে দিলেই তার চিন্তাকে সেখান থেকে নামিয়ে আনা যাবে। ছোট্ট শিশুটিই স্বামীর সাথে সংযোগের বস্তু। অনেক সময় তাও মনকে নামিয়ে আনা সম্ভব হয় না। শ্রীশ্রীমার ছিল রাধু। রাধুকে অবলম্বন করে মা জগতে মনটা নামিয়ে রাখতেন। মায়ের শেষ সময়ে যখন তাঁর

শরীর চলে যাবে তখন স্বামী সারদানন্দজী মায়ের কাছে রাধুর ছেলেকে পাঠাচ্ছেন, কিন্তু মা কাছে আসতে দিলেন না। মা তখন বলছেন – আর তোরা আমাকে বাঁধতে পারবি না। মায়ের কথা শুনেই শরৎ মহারাজও বুঝে গেলেন মাকে আর রাখা যাবে না। আমাদের অনেক সাধ্য সাধনা করে জগৎ থেকে মনকে উপরে তোলার চেষ্টা করতে হয় কিন্তু সমাধিবান পুরুষরা, অবতার পুরুষরা চেষ্টা করে করে উপর থেকে মনকে নীচে নামিয়ে আনেন। নীচে নামিয়ে আনার জন্য একটা ওজন লাগে সেটা হল এই নাম-রূপ-শব্দাদি। কিন্তু প্রকৃত সমাধিবস্থায় তো তাঁর কোন হুঁশ নেই, তখন কি বস্তু দিয়ে তাঁকে বাঁধবেন? তখন একমাত্র সংযোগ থাকে শব্দের সাথে। যে ভাব অবলম্বন করে তিনি সমাধির অবস্থায় গেছেন, সেই ভাব সম্পর্কিত শব্দ গেলে সেই শব্দকে অবলম্বন করে তাঁর মন আস্তে করে নেমে আসে। তাহলে বাক্ দেবীর এলাকা কত দূর? পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়েই তাঁর এলাকা। যেখানেই সৃষ্টি সেখানেই বাক্ দেবী। কারণ নির্গুণ ব্রহ্ম ছাড়া যাবতীয় যা কিছু আছে সবটাই শব্দের এলাকা। সৃষ্টি শুরু হয় শব্দ থেকে। একদিকে আমরা জানি সৃষ্টি ঈশ্বর থেকে, অন্য দিকে বলা হয় সৃষ্টি শব্দ থেকে হয়। তাই ঈশ্বরও যা বাক্ দেবীও তাই। এটাকেই তন্ত্রে বলে দেবী থেকে সৃষ্টি, এটাকেই বেদান্তে বলে মায়া থেকে সৃষ্টি, সাংখ্য বলছে প্রকৃতি থেকে সৃষ্টি। বেদ বলছে বাক্ দেবী থেকে সৃষ্টি। দেবীসূক্তমের প্রথম মন্ত্রেও তাই বলছেন –

অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।
অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্যহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা।।১।।

বাক্ দেবী বলছেন আমি রুদ্র, বসু, আদিত্য, বিশ্বদেব যত দেবতা আছে এদের সবাইকে চালাচ্ছি। এই আমিটা কে? এই আমিটা সগুণ ঈশ্বর, এই আমিটাই প্রকৃতি, এই আমিটাই মায়া, এই আমিটাই যে কোন শক্তি। যেখানেই শব্দ সেখানেই বাক্ দেবী, কারণ সৃষ্টি মানেই শব্দ, সৃষ্টি আর শব্দ এই দুটো কখন আলাদা হয় না। নাদ্ ব্রহ্ম দিয়েই সৃষ্টি, যেখানেই নাদ্ সেখানেই বাক্ দেবী। আবার মন্ত্রের যিনি মন্ত্রদ্রষ্টা সেই বাক্ ঋষিকা তিনিও যখন বাক্ দেবীর সঙ্গে এক দেখছেন তখন তিনিও বলতে পারেন সব সৃষ্টি আমার থেকেই হয়েছে। সেইজন্য এই দুটোর যে কোন ব্যাখ্যাকেই ধরা হোক না কেন, অর্থ একই থাকবে। কিন্তু পরের দিকে বেদান্তে যে অহং ব্রহ্মাস্মির কথা বলা হয়েছে সেখানেও যিনি অহং ব্রহ্মাস্মি বলবেন তিনিও দেবীসূক্তমকে এভাবেই নেবেন। যাঁরা শক্তি উপাসক বা দ্বৈত ভাবের সাধক তাঁরা এটাকে সগুণ ঈশ্বর রূপে নেবেন। ভাষ্যকাররা দেবীসূক্তমের দুটো দৃষ্টিভঙ্গীকেই গ্রহণ করেছেন। কিন্তু যাঁরা ঘোর দ্বৈতবাদী, কট্টর ভক্ত তাঁরা শুনলে আঁতকে উঠবেন – মাগো! নিজেকে বলে কিনা সে ঈশ্বর! কেনোপনিষদে ঠিক এই ধরণের একটা প্রতিচ্ছবি পাওয়া যাবে, যেখানে উমা হৈমবতী দেবতাদের বলছেন – তোমরা যা দেখলে সেটাই ব্রহ্ম ছিল। উমা হৈমবতী ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন বলেই জানতেন দেবতারা যা দেখছেন সেটা ব্রহ্ম। কিন্তু সেখানে ব্রহ্মকে একটা আজব বস্তু রূপে উপস্থাপিত করা হয়েছে, জগতের কোন কিছুর সাথেই তার কোন মিল নেই।

বাক্ দেবী বা বাক্ ঋষিকা শুরুতেই বলছেন *অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরামি*। সায়নাচার্য এই ব্যাপারে খুব কট্টর ছিলেন, তিনি ভাষ্যে পরিষ্কার বলছেন, আত্মজ্ঞান হলে যে অনুভূতি হয় সেই অনুভূতির বর্ণনা করছেন বাক্ নাম্নী এক ব্রহ্ম বিদুষী। তিনি নিজেকে সচ্চিদানন্দের সাথে এক মনে করছেন। সেইজন্য পরমাত্মার সাথে তাঁর তদাত্মিকা হয়ে গেছে, এক আত্মার ভাব এসে গেছে। একাত্ম ভাব এসে যাওয়াতে কি হচ্ছে? যেমন পরমাত্মাই সব কিছুই হয়েছেন, তিনিই সব কিছুর অধিষ্ঠান। ভগবান সম্বন্ধে আমাদের সবারই একটা সাধারণ ধারণা যে, ভগবান সর্বশক্তিমান আর তিনিই জগতের সব কিছু হয়েছেন, আবার তিনি সব কিছুরই আধার। যেমন সমুদ্রে হিমশৈলী ভাসছে, হিমশৈলী জল থেকেই হয়েছে। হিমশৈলীর যদি অনেকগুলি টুকরো ভাসতে থাকে, সবটাই জল। জল তার আধারও আবার জলই তার আধেয়। জলই সব কিছু হয়েছে, বরফ যেটা টাপুর-টুপুর করছে সেই বরফও জল, বরফকে যে ধরে আছে সেটাও জল। ঠিক তেমনি পরমাত্মা সব কিছু হয়েছেন, তিনিই আবার সব কিছুকে ধারণ করে আছেন। ঋষিকা এই পরমাত্মার সঙ্গে একাত্ম বোধে অবস্থিত, এখানে কল্পনার কিছু নেই। সেই বোধে তিনি দেখছেন আমিই সব কিছু হয়েছি আর সব কিছুকে আমিই ধারণ করে আছি। সাধন ভজন করে সিদ্ধির অবস্থায় যাঁরা চলে যান, বেদান্ত মতে সবারই ঠিক এই অনুভূতিই হবে।

রুদ্রের এক নাম শিব, কিন্তু এখানে শিবের কথা বলছেন না, একাদশ রুদ্রের কথাই বলা হচ্ছে। আট জন বসু ছিলেন। পরমাত্মার সঙ্গে এক হয়ে বলছেন আমি এই একাদশ রুদ্র আর অষ্টবসুদের চরামি। চরামি শব্দের অর্থ করছেন চালনা করা, আমি এদের চালাই। শুধু রুদ্র আর অষ্টবসুদেরকেই আমি চালাই না, দ্বাদশ আদিত্য, বিশ্বেদেব এদেরকেও আমি চালাই। একাদশ রুদ্র, অষ্টবসু, দ্বাদশ আদিত্য এনারা সবাই নামকরা দেবতাদের গোষ্টি। এক এক যুগে এক একজন খুব প্রতাপশালী থাকেন, যেমন ঠাকুরের সময় কেশব সেনরা খুব নামকরা লোক ছিলেন, এই কথাগুলো তখন তাঁদের উদ্দেশ্য করে বলা হবে। আজকের দিনে হলে অন্য কাউকে উদ্দেশ্য করে বলা হবে। বেদের যুগে এনারাই ছিলেন খুব নামকরা দেবতা। আমি এদের সাথে না থাকলে এরা সবাই নিষ্প্রভ হয়ে যাবে। বিদ্যুতের খেলনা গুলো বিদ্যুতের শক্তিতে নড়াচড়া করে, প্লাগ থেকে তার খুলে দিলে খেলনাগুলো অচল হয়ে পড়ে থাকে।

রুদ্র, বসু, আদিত্য, বিশ্বদেব এই দেবতারা যে এত লাফালাফি করছে কারণ আমি এদের সঙ্গে চলি। আমি আছি বলেই এরা চলাফেরার শক্তি পাচ্ছে। অধ্যাত্ম রামায়ণেও ঠিক এই ভাবটা পাওয়া যায়। সীতা বলছেন – বনবাসে থেকে আমি যে এত তপস্যা করছি এতেই শ্রীরামচন্দ্র এত শক্তিমান হয়েছেন, আমি যদি চাই, আমার তপস্যার যা তেজ তাতেই আমি এক্ষুণি রাবণকে ভষ্ম করে দিতে পারি। কিন্তু এভাবে রাবণকে ভষ্ম করে দিলে আমার তপস্যার শক্তি শেষ হয়ে যাবে। রাবণকে শেষ করে দিতেই যদি আমার শক্তি ফুরিয়ে যায় তাহলে শ্রীরামচন্দ্র যে কাজের জন্য নরদেহ ধারণ করে অবতীর্ণ হয়েছেন সেই কাজ তিনি আর পূরণ করতে পারবেন না। এটা শক্তি সাধনা, শক্তি সাধনাতে শক্তির প্রশংসা করা হচ্ছে। শাস্ত্রের অনেক কথাকে আক্ষরিক অর্থে নিতে নেই। এই জিনিসগুলোকে যাঁরা কবিরা রচনা করেছেন, তাঁরা অনেক সময় তাঁদের কল্পনার লাগামটা খুলে দেন, তার ফলে কল্পনা সীমা রেখাকে অতিক্রম করে অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। শাস্ত্রে যেমনটি আছে ঠিক তেমনটি নিলে আমাদের অনেক সময় অনেক সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়। ঠাকুর বলছেন – শাস্ত্রে চিনিতে বালিতে মেশানো আছে, বালিটুকু সরিয়ে চিনিটুকু নিতে হয়। অধ্যাত্ম রামায়ণের যে বিষয় আমরা উত্থাপন করলাম সেখানেও চিনিতে বালিতে মিশে আছে, শ্রীরামচন্দ্রের শক্তি কি শুধু সীতার জন্য? আমরা বলতে পারব না। আমরা যেটা জানি তা হল, যার জন্য অধ্যাত্ম রামায়ণের প্রসঙ্গকে টানা হল, শ্রীরামচন্দ্র দাঁড়িয়ে আছেন সীতার শক্তিতে, এই ধারণার বীজ নিহিত রয়েছে দেবীসূক্তমে, যেখানে বলা হচ্ছে রুদ্র, বসু, আদিত্য আর বিশ্ববসু এদের সাথে আমি চলি বলেই এদের এত ক্ষমতা। এনারা বেদের খুব ক্ষমতাশালী দেবতা। তাহলে কি বেদের সত্যতাকে নিয়ে প্রশ্ন করা যাবে? আমরা কখনই তা পারিনা, বেদে যা আছে তার বিরুদ্ধে কোন প্রশ্নই কেউ করতে পারেনা, কারণ হিন্দুরা বেদকে এভাবেই দেখেন। এখানে শক্তির কথা বলা হচ্ছে, শক্তি মুর্ত ও অমুর্ত দুটোই হতে পারে। অধ্যাত্ম রামায়ণে সীতা শক্তির মুর্ত দেবী আর দেবীসূক্তমের বাক্ শক্তির অমুর্ত রূপ। বাক্ দেবী শক্তিস্বরূপিনী, শক্তি ছাড়া সব কিছুই অচল, জড়। ব্রহ্ম যিনি, তাঁরও যদি শক্তি না থাকে তাহলে ব্রহ্মাণ্ড হবে না। ঠাকুর বলছেন – যে বাবুর বাগান নেই, বাড়ি নেই, সেই বাবু কিসের বাবু। ব্রহ্মের যদি সৃষ্টি নাইই থাকে, ব্রহ্মাণ্ড যদি নাইই হয় তাহলে সেই ব্রহ্মকে নিয়ে আমার কি হবে। যে ঈশ্বরের ঐশ্বর্য নেই সে কিসের ঈশ্বর। বাক্ দেবীর বলা উদ্দেশ্য হল জগতে যা কিছু হয়েছে সব আমারই রূপে হয়েছে আর জগতে যা কিছু আছে অধিষ্ঠান রূপে আমিই রয়েছি। ঠাকুরের কথাই যেন এখানে সায়নাচার্য বলছেন – অগ্নি আর তার দাহিকা শক্তি, দুধ আর তার ধবলত্ব, ব্রহ্ম আর তার শক্তি অভেদ। জগতে যা কিছু আছে, তার মধ্যে ভগবানও আছেন, তার সব কিছুর অধিষ্ঠান হল শক্তি। বাক্ দেবী সেই শক্তির প্রতিমুর্তি। তিনি কিভাবে চলেন? শ্রীরাম যেমন সীতার সাথে চলছেন সেইভাবে চলছেন না। এখানে বলা হচ্ছে – তিনি সব কিছুর অধিষ্ঠান। সব কিছুর অধিষ্ঠান বলতে কিরকম বোঝায়? যেমন যত ধরণের গহনা আছে সব ধরণের গহনার অধিষ্ঠান যেমন সোনা, যেমন যত রকমের মাটির পাত্র আছে সব পাত্রের অধিষ্ঠান যেমন মাটি, ঠিক তেমনি জগতে যা কিছু আছে তার অধিষ্ঠান শক্তি। বাক্ দেবী বলছেন আমিই সেই শক্তি। তাই যাবতীয় যা কিছু আছে, যেটা হয়েছে, যেটা হবে আর যেটা হয়েছিল তার সবটাই আমি। পুরুষসূক্তমে যেমন বলছেন, *যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্* এখানে বলছেন আমিই সেই। সেই যে পরাশক্তি সেটা একটাই, দুই নেই।

পরের লাইনে বলছেন - *অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্যহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা*। বেদে কয়েকজন যমজ দেবতার বর্ণনা আছে। দেবতা দুজন আলাদা আলাদা, কিন্তু যখন নাম নেওয়া হয় তখন দুজনের নাম একসাথে নেওয়া হয়। মিত্র আর বরুণ দুই দেবতা একসাথে থাকেন, কিন্তু মিত্র দেবতার আলাদা একটা ব্যক্তিত্ব আছে বরুণ দেবতারাও আলাদা ব্যক্তিত্ব আছে। ঠিক তেমনি ইন্দ্র আর অগ্নি এই দুই দেবতা এক সঙ্গে চলেন। বেদে ইন্দ্র, অগ্নি, মিত্র, বরুণ সব থেকে ক্ষমতাশালী দেবতা। এনাদের একটু নীচে আছেন অশ্বিনীদ্বয় দেবতা। অশ্বিনীদ্বয়রা দেবতাদের চিকিৎসক। হিন্দু সমাজে ডাক্তারদের সম্মান চিরদিনই একটু কম ছিল। এখন অবশ্য ডাক্তারদের বিরাট সম্মান। কিন্তু সেই সময় এতই সম্মান কম ছিল যে অশ্বিনী দেবতাদের সোমরস পান করার অধিকার ছিল না। এই নিয়ে যেমন অনেক সমস্যা ছিল আর অশ্বিনীকুমারদের খুব দুঃখও ছিল, দেবতা হয়েও আমাদের সোমরস পান করার অধিকার নেই। কিন্তু পরে চ্যবন ঋষির বদন্যতায় এনারাও যজ্ঞের সোমরস পান করার অধিকার পেয়ে যান। এটাই আবার মহাভারতে একটা বিরাট কাহিনী রূপে এসেছে। কিন্তু বেদে অশ্বিনীকুমারদের সম্মান ছিল না। বাক্ দেবী বলছেন আমি এদের *বিভর্মী*, বিভর্মী মানে ধারণ করা, মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র ও অগ্নিকে আমিই ধারণ করে আছি, তার সাথে অশ্বিনীকুমারদেরও নাম করছেন। দেবতাদেরই তিনি ধারণ করে আছেন তাহলে বাকিদের কথা আর কি বলব। কয়েকজন শ্রেষ্ঠ ও ক্ষমতাশালী দেবতাদের নাম নিয়ে বলার উদ্দেশ্য সৃষ্টিতে যা কিছু হচ্ছে সব আমিই চালাচ্ছি। জগতে সব কিছুই গতিশীল, এমন কিছু জগতে নেই যার গতি নেই। জগৎ শব্দটা এসেছেই গম্ ধাতু থেকে, গম্ মানে চলার অর্থে বলা হয়। জগতে সব কিছুই চলছে। কে চালাচ্ছেন? বাক্ দেবী। আবার স্থিরতা বা স্থৈর্যও রয়েছে, যেমন আমরা অনেক কিছুকে স্থির দেখছি। পদার্থ বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তে সব কিছুই গতিশীল, আবার গতির মধ্যেই একটা আবার স্থিতিও আছে। স্থিতি রূপে তিনি সব কিছু ধারণ করে আছেন, আবার গতি রূপে সব কিছুকে চালাচ্ছেন। সেইজন্য একই সঙ্গে দুটো বলছেন, আমি সব কিছুকে চালাচ্ছি আবার আমিই সব কিছুকে ধারণ করে আছি।

শুধু মন্ত্রের সরাসরি অর্থ বলে দেওয়াটাই ভাষ্যকাররা যুক্তিযুক্ত মনে করেন না। এরও পেছনে একটা সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক সত্য লুকিয়ে থাকে, সেই সত্যকে বার করে আনাটাই ভাষ্যকারদের প্রধান কাজ। এখানে সায়নাচার্য তাঁর ভাষ্যতে বলছেন, সুক্তিতে যে রজত ভ্রম হয় সেখানে সুক্তিটাই সত্যা রূপাটা মিথ্যা, একটা দড়ি পড়ে আছে, অন্ধকারে দেখে মনে হচ্ছে যেন একটা সাপ পড়ে আছে। এখানে দড়িটাই সত্য সাপটা মিথ্যা। সায়নাচার্য বলছেন – এই ইন্দ্র, অগ্নি, মিত্র, বরুণ এগুলো সব ভ্রম। তাহলে সত্যটা কি? সচ্চিদানন্দই একমাত্র সত্য, তিনিই আছেন, তাঁর উপরেই এই জগতের ভ্রম হচ্ছে। *বিভর্মি অহম্* - আমার শক্তিতেই দেবতারা দাঁড়িয়ে আছে। কল্পনা করা যাক রাত্রিবেলা একটা গয়নার দোকানে একজন মানুষ পূর্ণ চেতনা নিয়ে বসে আছেন, হঠাৎ দোকানের সব গহনাগুলো জীবন্ত হয়ে গেল আর সবাই একে অপরের সঙ্গে কথা বলছে। একজন বলছে আমি বড় আরেকজন বলছে আমি বড়। এই নিয়ে সব গহনাগুলো তুমুল ঝগড়া শুরু করেছে। সেই সময় হঠাৎ সোনা তার চৈতন্যকে জাগ্রত করে সব কটা গহনাকে বলছে – আমি আছি বলেই তোমরা এখানে আছ। মিত্র, ইন্দ্র, বরুণ যে যত বড়ই হোক না কেন, আমি (বাক্ দেবী) আছি বলেই তোমরা দেবতারা আছ।

এখানে কিন্তু এই ব্যাপারটা আমাদের খুব ভালো করে মনে রাখতে, যদি আমরা মনে করে নিই ঋষিকা এই কথাগুলো বলছেন, তখন তিনি কিন্তু বাক্ দেবীর সঙ্গে একাত্ম মনে করছেন না, নিজেকে একাত্ম করছেন পরমাত্মা বা সচ্চিদানন্দের সাথে। আর যদি মনে করি বাক্ দেবী বলছেন তখন বাক্ দেবী শক্তি রূপে বলছেন। তবে কেউ যদি বলেন বাক্ ঋষিকা বাক্ দেবীর সাথে একাত্ম হয়ে এই কথাগুলো বলছেন, তখন তিনিও ঠিকই বলছেন। কিন্তু ভাষ্যে বলছেন তিনি পরমাত্মার সাথে নিজেকে এক দেখছেন। তাহলে আমরা বলতে পারি শক্তি তো পরমাত্মার সঙ্গে এক, সেদিক দিয়েও ঠিক। সেইজন্য ওই জায়গায় গিয়ে বুদ্ধি ও যুক্তি দিয়ে বেশি আলোচনা করা যায় না। একজন সাধিকা সাধনা করে করে পরমাত্মার সঙ্গে নিজেকে একাত্ম বোধ করে নিয়েছেন, তারপর তিনি বলছেন জগতে যা কিছু হয়েছে সব আমিই হয়েছি। তিনি ঠিকই বলছেন, শেষ অবস্থায় এই বোধটাই সবার হয়। এবার বাক্ দেবী বা মা দুর্গা যদি বলেন তখন তো আর কোন সংশয়ই হবে না, কারণ মা নিজেই সব কিছু হয়েছেন। তেমনি যে কোন মানুষ ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পর একই জিনিস দেখবেন

আর এই ভাষাতেই বলবেন। কিন্তু এই বোধে দেখেন না যে আমি ওটাও হয়েছি আর এটাও হয়েছি। এই বোধে দেখেন, আমি সেই সুক্তিকা যেখানে রজত ভ্রম হচ্ছে। এখন রজতকে ধাতু রূপে দেখেন বা গহনা রূপে দেখেন তাতে কিছু আসে যায় না। সুক্তিকা সুক্তিকাই, ভ্রম যে রকমেরই হোক। এই ভ্রমে মানুষ আছে, না সিংহ আছে, না হাতি আছে তাতে কিছু আসে যায় না। তুমি যত রকমের ভ্রম দেখছ সবটা আমিই হয়েছি। পরে যা কিছু হবে সেটাও আমি হব, আর যা কিছু আগে হয়েছিল সেটাও আমিই হয়েছিলাম। কারণ পরমাত্মা ছাড়া কিছু নেই। পরমাত্মা ছাড়া বাকি সবটাই ভ্রম। সায়নাচার্য তাঁর ভাষ্যে বলে দিলেন, জগতে যা কিছু আছে সব সুক্তিকাতে রজত ভ্রমবৎ, আর আমি সেই সুক্তিকা। সেইজন্য যাবতীয় যা কিছু হয়েছে সব আমিই হয়েছি। দু-একটা কথা দিয়ে এগুলোকে ব্যাখ্যা করে বোঝান যায় না। তাই প্রথমে দেবতাদের দিয়ে বলে দেওয়ার পর আরও অনেক কিছুকে নিয়ে বলা হচ্ছে। দ্বিতীয় মন্ত্রে তাই বলছেন –

অহং সোমমাহনসং বিভর্ম্যহং ত্বষ্টারমুত পূষণং ভগম্।
অহং দধামি দ্রবিণং হবিষ্মতে সুপ্রাব্যে এ যজমানায় সুন্বতে।।২।।

তখনকার দিনে সোম এক ধরণের জড়িবুটি ছিল। সোমের ব্যাপারে আমাদের পরম্পরাতে নানান রকমের মত ও ব্যখ্যা পাওয়া যায়। কেউ বলেন সোম থেকে হোম হয়েছে, কেউ বলেন ইরানে সোম নামে এক ধরণের জড়িবুটি ছিল, কেউ বলেন হিমালয়েও এক ধরণের গাছ পাওয়া যেত তার পাতাকে সোমপাতা বলা হত। ঠাকুর হোমাপাখির কথা বলছেন। তখনকার দিনে ‘স’ আর ‘হ’এর উচ্চারণ এত মিলেমিশে যেত যে পুরো ব্যাপারটাই গুলিয়ে যায়। সোম জিনিসটা ঠিক কি জিনিস ছিল আমরা সঠিক ভাবে কেউই জানি না। তবে একটা জিনিস ছিল যেটা থেকে ব্যাপারটা একটু বোঝা যায়। তখনকার দিনে এক ধরণের তৃণ ছিল, তার পাতাকে পাথরের উপর খুব ভালো করে পেষা হত। তারপর সেই পেষাই করা মণ্ডকে এক ধরণের বিশেষ কাপড়ের মধ্যে রেখে তাতে উপর থেকে দুধ বা বিশেষ ধরণের জল ঢালা হত। সেই জল নীচের একটা পাত্রে জমা হত। পাত্রে সোমপাতা পেষাইয়ের জল ছাঁকার পর পাত্রে পড়ার সময় একটা আওয়াজ হত। বলা হয় সোমের যে আওয়াজ, ওই আওয়াজেই পুরোহিত বা দেবতাদের আনন্দের আর সীমা থাকত না। ঠাকুর উপমা দিচ্ছেন যারা গাঁজা খায়, গাঁজা যখন তৈরী করা হয় তখন তাতেই তাদের আনন্দ। গাঁজার টান দেওয়ার আগেই গাঁজাখোড় দের মৌতাত এসে যায়। সোমের আওয়াজেও ঠিক তাই হত। সোমরস যে পান করা হবে কিন্তু তার আগে সোমরস তৈরী করার প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে তাতেই তারা আনন্দ একেবারে ফেটে পড়ত। সোমরস পান করলে নাকি একটা নেশার মত ঘোর আসত। যজ্ঞে দেবতারা সোমরস পান করতেন। সোমরস পান করতেন বলে দেবতারা অমরত্ব পেতেন। অমরত্ব পাওয়া মানে শক্তি পেতেন। দ্বিতীয়তঃ বলা হয় যে সোমরসে কিছু ভেষজ গুণ ছিল, শোনা যায় যে অন্ধ ব্যক্তিকে যজ্ঞের পর সোমরস পান করিয়ে দিলে তার দৃষ্টি শক্তি ফিরে আসত। সোমকে রাজা বলা হত, নামই ছিল সোমরাজা। সোমরাজা তৈরীর ব্যাপারে ব্রাহ্মণরাই বিশেষজ্ঞ ছিলেন। কিন্তু বেদেই সোমকে জ্ঞানের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এক জায়গায় বলছেন, বেশির ভাগ লোক মনে করে সোম মানে পানীয় কিন্তু সোম মানে জ্ঞান। আত্মজ্ঞান লাভ করাকেই ঠিক ঠিক সোমরস পান করা বলতেন, সেই অমর হয়ে যায়, তারই জগদ্ব্যাধি চলে যায়। এই ব্যাপারটা কিন্তু একেবারে পরিষ্কার ভাষায় বলা হয়েছে, বিশেষ অর্থ দিয়ে বার করতে হয় না। বেদ তো একদিনে রচিত হয়নি আর একজন ব্যক্তি রচনা করেননি, বিভিন্ন ঋষি বিভিন্ন সময় রচনা করেছেন। সোমরস পানের কথা বেদে বহুবার বর্ণনা করা হয়েছে, সেইজন্য সোমরস পানের ব্যাপারে কোন প্রশ্ন হতে পারে না। এখন এই সোমরস যখন তৈয়ার করা হয় তখন তরল সোমরসকে এক পাত্র থেকে আরেক পাত্রে ঢালাঢালি করার সময় আওয়াজ হত। যেমন লস্যি তৈরী করার সময় ঘোলটাকে অনেকবার ঢালাঢালি করে। এই সোমরসকে যখন এক পাত্র থেকে আরেক পাত্রে ঢালে সেই সময় একটা বিশেষ ধরণের আওয়াজ হত, এই শব্দকে বলা হয় *অহনসম্*। মন্ত্রে বলছেন, সোমের এই যে শক্তি, যে শক্তিতে দেবতারা অমরত্ব লাভ করেন, যে শক্তিতে সমস্ত ব্যধি নিরাময় হয়ে যায়, যার দ্বারা মানুষ মহৎ হয়ে যায়, এই সোমকে আমিই ধারণ করে আছি।

*অহনসম্*এর আরেকটি অর্থ শত্রুনাশ করার শক্তি। *হন্তা* যে অর্থে হয়, সেখান থেকে *অহনসম্* আসছে। সোম হল শত্রুহন্তা, সেই সোমকে আমি ধারণ করি। যারা খুব মদ পান করে তারা যখন গ্লাশে মদ ঢালার আওয়াজটা শোনে তাতেই তাদের মদের নেশা ধরে যায়। বাক্ দেবী বলছেন – ঐ যে শক্তি যে শক্তিতে মানুষের মনের মধ্যে নেশা ধরিয়ে দিচ্ছে সেই শক্তি আমি। আমি আছি বলেই এই আওয়াজটা হচ্ছে আর সেই আওয়াজ যে শক্তিতে অন্যকে আকৃষ্ট করছে সেটাও আমি। *ত্বষ্টা, ভগ* সব দেবতাদের নাম, ত্বষ্টা যিনি বিভিন্ন লোকের সৃষ্টি কাজে নিযুক্ত থাকেন, আর ভগ এক দেবতারও নাম আবার ভগ শব্দের অর্থ আলো হয় আবার ঐশ্বর্যের অর্থেও হয়। বলছেন যে এই সব দেবতাদের যে দ্যুতি বা আলো সেটা আমি অথবা এর অর্থ করা যায় – এই দেবতাদের যা বুদ্ধি, যা কিছু শক্তি সব আমিই হয়েছি।

পূষণ মানে আলো হয় আবার পোষণ করাও হয়। সেইজন্য পরের দিকে পূষণকে সূর্যের সঙ্গে এক করে দেওয়া হয়েছে। যার জন্য দেখা যায় সূর্যোপসনায় কোথাও কোথাও পূষণ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। ত্বষ্টা মানে যিনি পালন করেন, সেইজন্য পরে ত্বষ্টাকেও কখন ব্রহ্মার সঙ্গে, কখন ইন্দ্রের সঙ্গে এক করে দেওয়া হয়েছে। এক একটা গুণকে পরে পরে এক এক দেবতার উপর আরোপ করে দেওয়ার ফলে বিভিন্ন দেবতারা এক অপরের সঙ্গে মিশে যায়। এগুলো ভুল কিছু নয়, সেইজন্য আমাদের ভাষ্যের উপর নির্ভর করতে হয়।

অহং দধামি দ্রবিণং হবিষ্মতে সুপ্রাব্যে এ যজমানায় সুন্বতে – যাঁরা যজ্ঞ-যাগ করছেন সেই পুরোহিতদের রক্ষণাবেক্ষণ দরকার আর এই যজ্ঞ-যাগের ফলে যে সম্পদ হয়, ব্রাহ্মণরা যে দক্ষিণা পান অথবা কোন কিছু করার পর তার থেকে যে সাফল্য আসে সব কিছু আমার কাছ থেকেই পায়। *দ্রবিণং* মানে যজ্ঞের ফল, তা যে কোন রূপেই হতে পারে, পুত্রেষ্টি যজ্ঞ যিনি করেছেন, যজ্ঞের ফল স্বরূপ যে পুত্র প্রাপ্তি হবে সেটাও *দ্রবিণং*। তবে *দ্রবিণং* এর সাধারণ অর্থ ধন-সম্পত্তি। আমরা মনে করি, যজ্ঞ-যাগ যে দেবতার উদ্দেশ্যে হয় সেই দেবতাই সন্তুষ্ট হয়ে সব কিছু দেন, কিন্তু এখানে দেবী বলছেন – *অহং দধামি দ্রবিণং হবিষ্মতে* – যারা যজ্ঞ-যাগ করে যে ধন-সম্পদ পায় তা আমিই তাদের দিই। *সুপ্রাব্যে এ যজমানায় সুন্বতে* - আগেকার দিনে পুরোহিতরা যজমানদের নিয়ে যে বিভিন্ন ধরণের যজ্ঞ-যাগ করত, সেই যজ্ঞ-যাগ অনেক রকম ভাবে করা হত, এখানে সোমযাগের কথা বলা হচ্ছে, এই যে বিভিন্ন ধরণের যজ্ঞ-যাগের দ্বারা দেবতাদের পূজো করছে এদের সবারই সাফল্য আমার মাধ্যমেই আসে। এই মন্ত্রের মূল ভাব হল, যে কোন ধর্মীয় কাজ করে তার যে প্রাচুর্যতা আসছে সেটা এই বাক্ দেবী বা বাক্ ঋষিকাই দেন। এটাই স্বাভাবিক, কারণ বালির উপর মরীচিকা, মরীচিকাতে যা কিছু দেখা যাচ্ছে বালি আছে বলেই দেখা যাচ্ছে। বালিই সব কিছু হয়েছে। যে বালির সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে নেবে সে বলবে আমিই এই সব কিছু হয়েছি। এখানেও তাই বলছেন, যজ্ঞের যে ফল পাওয়া যায়, জপ-ধ্যানের যা ফল পাওয়া যায় সব আমিই দিই।

অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বসূনাং চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম্।
তাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা ভুরিস্থাত্রাং ভূর্যা বেশয়ন্তীম্।।৩।।

আমিই এই পুরো বিশ্ব ভূমণ্ডলের সার্বভৌম রানী। রাষ্ট্র বলতে আমরা যে অর্থে বুঝি, ভারত, পাকিস্থান, আমেরিকা, জাপান এক একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র। কিন্ত এখানে শুধু পৃথিবীরই নয়, এই মহাজগতে, সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড মিলিয়ে যা আছে সেটাকে রাষ্ট্র বলা হচ্ছে, বাক্ দেবী সেই রাষ্ট্রের *রাষ্ট্রী* মানে সম্রাজ্ঞী। কোন দেশের সম্রাজ্ঞী নন, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তিনি সম্রাজ্ঞী। সায়নাচার্য বলছেন – *সর্বস্য জগৎ ঈশ্বরী*, সমগ্র জগতের যিনি ঈশ্বরী তাঁকে বলছেন *রাষ্ট্রী*। বেদে *রাষ্ট্রী* মানে যিনি শাসন করেন, যিনি ঈশন্ করেন। এখানে আমরা যদি বাক্ দেবী রূপে নিই তাহলে এর অর্থের কোন হেরফের হবে না। আবার যদি বাক্ ঋষিকা রূপে নিই তাতেও কোন অর্থ পাল্টাবে না, তখন বাক্ ঋষিকা নিজেকে ঈশ্বরের সঙ্গে এক দেখছেন। ঈশ্বরের সাথে যিনি নিজেকে এক দেখছেন তখন ঈশ্বরের যা যা গুণ সবটাই তাঁর মধ্যে থাকবে। বাইবেলে যীশু বলছেন, I and my Father in heaven is one। পিতা আর তাঁর পুত্র যদি এক হয় তাহলে পিতার যা যা ঐশ্বর্য পুত্রেরও সেই একই ঐশ্বর্য। এখানে বাক্ ঋষিকা নিজেকে পরমাত্মার সঙ্গে এক দেখছেন, সেইজন্য বলছেন, *অহং রাষ্ট্রী*। আমার

ইচ্ছাতেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় সব কিছু চলছে। সাধারণতঃ আমাদের কাছে ঈশ্বর শব্দটাই আসে, ঈশ্বরী শব্দ ব্যবহার হতে খুব একটা দেখা যায় না, কিন্তু এখানে দেবীকে ঈশ্বরী রূপে বলা হচ্ছে। *সংগমনী বসূনাং*, বসু বলতে আমরা যদিও অষ্টবসুর বসু বুঝি, কিন্তু এখানে বসু মানে সম্পত্তি। রাজা হলেই তো হবে না, রাজার রাজকার্য আর রাজ্য চালাতে সম্পত্তিরও দরকার। তাই বলছেন এই রাষ্ট্রের যাবতীয় ধনরাশি আমিই সংগ্রহ করে আমার মুঠোয় রাখি। এর অর্থ দেবী একদিকে লক্ষ্মী, লক্ষ্মী এই অর্থে বলা হচ্ছে যার কাছে সমস্ত ধন-সম্পদ রয়েছে, আবার তিনি সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সম্রাজ্ঞী। *সংগমনী*র অর্থ যিনি সংযোগ করিয়ে দেন। যিনি উপাসক, যাঁরা প্রচুর কাজকর্ম করছেন, যজ্ঞ-যাগ করছেন তাঁদের সবারই কিছু প্রাপ্য থাকে। প্রাপ্য কর্তা আর যেটা প্রাপ্য এই দুটোর যে সংযোগ হবে, এই সংযোগ হলাম আমি। অর্থাৎ যার যা প্রাপ্য আমি তার প্রাপ্য পাইয়ে দিই, তাই বলছেন আমি *সংগমনী*। *সংগমনী* শব্দ ভগবানের ক্ষেত্রে বলা হয় বিধাতা। আমার কর্মের ফল আমার কাছেই আসবে, আপনার কর্মের ফল অন্য কারুর কাছে না গিয়ে আপনার কাছেই আসবে। এই ব্যাপারটা সম্ভব হয় বিধাতা আছেন বলে। আর বলছেন – যাদের নামে আহুতি দেওয়া হয়, তাদের মধ্যে আমি শ্রেষ্ঠতম। সেইজন্য দেবতারা তাদের বিভিন্ন কর্মের জন্য আমাকে অনেক জায়গায় অধিষ্ঠাত্রী করে রেখেছেন।

চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম্ - দেবী যে শুধু মাত্র সমস্ত ধন-সম্পদ সংগ্রহ করছেন, তিনি যে শুধু ঈশ্বরী, সম্রাজ্ঞী তাই নয়, এমন কি তিনি ব্রহ্মজ্ঞান পর্যন্ত দিয়ে দিতে পারেন। দেবী যে সর্বোচ্চ জ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞান দিয়ে দিতে পারেন, এটাই আবার কেনোপনিষদে উল্লেখ করা হয়েছে। উমা হৈমবতী এসে দেবতাদের বলছেন – *ত্বং ব্রহ্ম হোবাচ*। কাহিনী হল – একবার দেবতা ও অসুরদের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছে। সেই যুদ্ধে দেবতারা অসুরদের বিরুদ্ধে জয়ী হয়ে নিজেরা বলাবলি করতে শুরু করল আমাদের শক্তিতেই আমরা এই যুদ্ধে জয়লাভ করেছি। সেখানে তিন জন মূল দেবতা ছিলেন – ইন্দ্র, বায়ু আর অগ্নি। হঠাৎ এই তিন দেবতা দেখেন দূরে এক অচেনা বস্তু দাঁড়িয়ে আছেন। কি সেই বস্তু? সন্ধানে প্রথমে অগ্নি দেবতা গেলেন। অচেনা বস্তু অগ্নিকে জিজ্ঞাসা করলেন – তুমি কে? অগ্নি বললেন – আমি অগ্নি দেবতা আমার আরেকটি নাম বৈশ্বানর ইত্যাদি। তিনি খুব অবজ্ঞা করে জিজ্ঞেস করলেন – তোমার কি কাজ? অগ্নি বলছেন – জগতে যা কিছু আছে আমি ভস্ম করে দিই। তিনি তখন একটা সামান্য শুকনো ঘাসের টুকরো অগ্নির সামনে দিয়ে বললেন – তুমি একে ভস্ম কর তো। অগ্নি দেবতা পুরো শক্তি লাগিয়ে প্রাণপনে পোড়াতে চেষ্টা করেও ঘাসের কিছুই করতে পারলেন না। লজ্জায় নত মস্তকে অগ্নি সেখান থেকে ফিরে এলেন। তারপরে বায়ু দেবতাকে পাঠান হল। সেও বায়ু দেবতাকে জিজ্ঞেস করলেন – তুমি কে, তুমি কি কাজ কর? বায়ু দেবতা তখন বললেন – আমার নাম বায়ু, আমার আরেকটি নাম মাতরীশ্ব। দেখাচ্ছেন দেবতাদের কত অহঙ্কার। দু চারটে কার নাম থাকে? যার সম্মান বেশি। আগেকার দিনে রাজারা দুটো, চারটে, পাঁচটা নাম রাখতেন। তিনি জিজ্ঞেস করছেন তুমি কি কর? আমার কাজ এই জগতে যা কিছু আছে সব কিছুকে উড়িয়ে নিয়ে যাই। বায়ু দেবতাকেও ঘাসের একটা টুকরো দিয়ে বলছেন – ঘাসের এই টুকরোকে উড়িয়ে দেখাও তোমার কত ক্ষমতা। বায়ু দেবতা অনেক চেষ্টা করেও ঘাসের টুকরোকে এক চুলও নড়াতে পারলেন না। লজ্জায় মুখ চুন করে বায়ু দেবতাও ফেরত চলে এসেছেন। এরপর শেষে দেবতাদের রাজা ইন্দ্র গেছেন। যিনি ওখানে ছিলেন তিনি ইন্দ্রকে পাত্তাই দিলেন না, ইন্দ্র যাবার সাথে সাথেই তিনি সেখান থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তখন ইন্দ্র দেখতে পেলেন আকাশে এক অতি সুন্দরী নারী মুর্তি। সেই নারী মুর্তি তখন ইন্দ্রকে বললেন – তোমরা এতক্ষণ যেটা দেখছিলে সেটাই ব্রহ্ম, তাঁর শক্তিতেই তোমাদের শক্তি। ইন্দ্র প্রথম দেখলেন, জানলেন বলে ইন্দ্র দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

দেবী ভোগ অপবর্গ দুটোই দেন, সেইটাই এখানে বলতে চাইছেন। পরমব্রহ্মকে জানাই প্রত্যেক মানুষের একমাত্র পরম কর্তব্য। বাক্ ঋষিকা বলছেন, *চিকিতুষী*, আমি সেই পরমব্রহ্মকে সাক্ষাৎ করেছি। এই সাক্ষাতের মধ্যে কোন ধরণের সন্দেহ নেই, মনের দ্বারা ঈশ্বরকে চিন্তন করে কিছু বলা হচ্ছে না, এখানে চিন্তনের কোন অবকাশই নেই। ঠাকুর মা কালীর দর্শন পেয়েছেন, অদ্বৈত তত্ত্বের উপলব্ধি করেছেন, আমরা তাঁরই শিষ্য, প্রশিষ্য। এখানে কোন শিষ্য বা প্রশিষ্যের কথাও বলছেন না, আমি নিজে তাঁকে সাক্ষাৎ করেছি। ঠাকুর বলছেন, ঈশ্বরকে চিন্তা করলে বা ধারণা করলে এক রকম কিন্তু তাঁকে সাক্ষাৎ করলে অন্য রকম। ঠাকুর

তাই জোর দিয়ে বলছেন, এত চিন্তা করে কি হবে! তাঁকে সাক্ষাৎ করাটাই আসল কাজ। আমরা সবাই চিন্তনের স্তরে পরে আছি। কিন্তু যখন তাঁর সাক্ষাৎ হবে তখন তিনিও এই কথাই বলবেন, আমি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কর্তা।

ঠাকুর বলছেন, সবাই তাঁকে মানে, সবাই তাঁর অধীনে চলে আসে, তাঁর কথা কেউ অমান্য করতে পারে না। বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, কেশব সেনের মত তখনকার দিনে কলকাতা ও তার আশে পাশের যত বিখ্যাত গণ্যমান্য লোকেরা ছিলেন, সবারই দক্ষিণেশ্বরে ভবতারিণী মন্দিরের নিরক্ষর গ্রাম্য পুরোহিত ঠাকুরের কাছে এসে মাথা নত হয়ে যেত। ঠাকুরের কাছে যাঁরাই আসতেন তাঁদের কারুর মধ্যে কোন অবজ্ঞার ভাব থাকত না। ঠাকুর যা যা কথা বলছেন সবাই অবাক হয়ে শুনতেন, কেউ কোন তর্ক করার সাহস করতেন না। ঠাকুরের কাছে সবার পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার চুপসে যেত। যাঁরাই ব্রহ্মজ্ঞানী, ব্রহ্মকে সাক্ষাৎ করেছেন তাঁদের সবারই ঠাকুরের মত হয়ে যাবে। স্বামীজী যখন ভারত পরিক্রমা করছেন তখন তাঁর বয়স মাত্র সাতাশ আটাশ, কিন্তু ওই বয়সেই তখনকার ভারতবর্ষে যত বড় বড় পণ্ডিত ও নামকরা ব্যক্তিত্ব ছিলেন সবারই সাথে স্বামীজী কথা বলেছেন আর সবাই স্বামীজীর পাণ্ডিত্যের কাছে শ্রদ্ধায় নত হয়ে গেছেন। স্বামীজী বিদেশে গেছেন সেখানেও কত বড় বড় বিখ্যাত মানুষরা স্বামীজীর সাক্ষাৎ করে বিস্মিত হয়ে গেছেন। ম্যাক্সমূলারের কাছে গেছেন, পল ডায়সন, হিরণ ম্যাক্সিন, টেক্সলার মত বিজ্ঞানীরাও নিয়মিত স্বামীজীর বক্তৃতা শুনতে আসতেন। ইউরোপ আমেরিকার তখনকার দিনের নামকরা কোন ব্যক্তিত্বের সঙ্গে যদি স্বামীজীর একবার দেখা হয়ে যেত স্বামীজীর বাণীর প্রভাব ও ভারে সবাইকেই আস্তে আস্তে নত হয়ে যেতে হত। অতি সাধারণ মানুষ এমনকি বাচ্চারাও যখন স্বামীজীর সংস্পর্শে আসত তারাও স্বামীজীর ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ অনুভব না করে থাকতে পারতেন না। জাহাজে করে স্বামীজী যাচ্ছেন, একটি বাচ্চা ছেলের সঙ্গে দেখা হয়েছে। স্বামীজী বাচ্চাটিকে ডেকে বলছেন – Come! I will teach you how to die। ছেলেটি বলছে I am not interested। অনেক পরে, স্বামীজী খুব বিখ্যাত হয়ে যাওয়ার পর এই ছেলেটির ব্যাপারে খোঁজ নেওয়া শুরু হয়। পরে যোগাযোগ হওয়ার পর ভদ্রলোক বলছেন, বাচ্চা বয়সে একবার স্বামীজীর সাথে জাহাজে করে যাচ্ছিলাম, উনি কথায় কথায় আমাকে বললেন – এসো! তোমাকে শেখাব কিভাবে মরতে হয়। কিন্তু তখন আমার জীবন রঙীন আশার স্বপ্নে মশগুল ছিল, আমি বললাম – না, আমার শেখার দরকার নেই, আমি মরতে চাই না। এখন আমার বয়স হয়ে গেছে আর ভাবছি, এই সময় যদি স্বামীজী বলতেন অবশ্যই তাঁর কাছে শিখতে যেতাম। এটাই ব্রহ্মজ্ঞানীর লক্ষণ, কেউই তাঁকে পাশ কাটিয়ে যেতে পারবে না।

ঠাকুর বলছেন – অমুক কয়েকজন বন্ধু নিয়ে এখানে আসে। কিছুক্ষণ পরেই বন্ধু তার কানে ফিস ফিস করে বলতে থাকে – আর কতক্ষণ শুনবি! তাতেও যখন কেউ উঠছে না তখন বলে, তোরা শোন আমি নৌকায় গিয়ে বসছি। ঠাকুরের কথাও তো তাকে ধরে রাখতে পারছে না, এগুলোকে কি বলা যাবে? কিছুই না, তার মানে ঠাকুর এদের ধরছেন না। যদি ঠাকুর একবার ধরে নেন তাকেও তিনি পাল্টে দিয়ে তার মনকে ঈশ্বরাভিমুখী করে দেবেন। কিন্তু তিনি ধরছেন না। কেন ধরছেন না, এই ব্যাপারটাই পরের মন্ত্রে বলা হবে। এখানে মূল কথা হল, যাঁর ঠিক ঠিক ব্রহ্মজ্ঞান হয় জগতের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীটাই পুরো পাল্টে যায়। সেইজন্য বলছেন *প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম্*, যাঁদের পূজা করা হয়, যাঁদের উদ্দেশ্যে স্তুতি করা হয় তাঁদের মধ্যে আমি অগ্রণী। আমরা সবাই চাই লোকে আমাদের সম্মান করুক, স্বামী চাইছে স্ত্রী আমার সেবা করুক, স্ত্রী চাইছে স্বামী যেন সব সময় আমার বশে থাকে। কিন্তু তাও লোকেরা আমাদের সম্মান দেয় না, বাড়ির লোকেরা আমার কথা শোনে না। কারণ আমাদের মধ্যে আত্মজ্ঞানের অভাব। ঠাকুর বলছেন, কেশবের ধ্যানটুকু ছিল তাই তাঁর এত মান সম্মান। আমাদের মধ্যে যে শুদ্ধ চৈতন্য আছেন, তাঁর উপর আবরণ পড়ে আছে। ধ্যান, তপস্যা করতে করতে এই আবরণগুলো সরে যেতে শুরু হয়। যত আবরণ সরে যাবে তত চৈতন্যের শক্তির বিকাশ হতে থাকবে, যত শক্তির বিকাশ হবে তত লোকে তাঁকে মানবে, জানবে। যখন সব আবরণ সরে যাবে তখন তাঁর নামে বেলুড় মঠের মত মন্দির তৈরী হয়ে যাবে। আমরা না হয় ঠাকুরকে অবতার বলে মানছি, কিন্তু যাঁরা অবতারবাদই মানেন না, যাঁরা এগুলো বোঝেন না, তাঁরা ঠাকুরকে দেখছেন তিনি একজন সাধক, দক্ষিণেশ্বরে মা কালীর সাধনা করেছিলেন। কত সাধকই তো মা কালীর সাধনা করছেন, কিন্তু ঠাকুর এমনই সাধনা করলেন

যে তাঁর নামে দক্ষিণেশ্বরের মত একটা মন্দির দাঁড়িয়ে গেল। এ জিনিস যে কোন লোকেরই হতে পারে, এটাই এখানে বাক্ ঋষিকা বলছেন।

তাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা ভুরিস্থাত্রাং ভূর্যা বেশয়ন্তীম্, এই জগতে যা কিছু আছে সব আমিই ধারণ করে আছি, আমিই সব কিছু নিজেই হয়েছি। চিনি দিয়ে বিভিন্ন ধরণের খেলনার আকৃতি দিয়ে এক ধরণের মিষ্টি তৈরী হয় যার নাম মঠ। চিনির মঠ দিয়ে ইঁদুর, হাতি, বাঘ, কুকুর, বেড়াল তৈয়ার করা হয়েছে। ইঁদুর বা হাতির যদি চেতনা হয়ে যায় তখন সে দেখবে আসলে আমি চিনি। আমি ইঁদুর হতে পারি কিন্তু আমার আসল স্বরূপ হল আমি চিনি। ইঁদুর তখন হাতি, বাঘ এদের দেখিয়ে বলবে, এই যা কিছু দেখছ এগুলো আমিই হয়েছি। উপনিষদে মৃত্তিকার তৈরী খেলনার উপমা দিয়ে বলছেন, এই যে নানান রকমের মাটির খেলনা এগুলো সব নাম আর রূপ কিন্তু মৃত্তিকাই সত্য। কোন খেলনা যদি নিজেকে মৃত্তিকার সঙ্গে একাত্ম করে নেয় তখন সেও এই একই কথা বলবে, এই যাবতীয় যা কিছু দেখছ সব আমিই হয়েছি। ব্রহ্মজ্ঞানী বাস্তবে নিজেকে ঠিক এভাবেই দেখেন। তখন তিনি দেখেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু আছে সব আমিই হয়েছি। আর যা কিছু আছে সবের মধ্যে আমিই অন্তর্যামী রূপে ঢুকে রয়েছি। যেমন জল, জলের সার হল শীতলতা, জল যে প্রবাহিত হয় অর্থাৎ জলের যা কিছু ধর্ম সেটাই তার সার, সেই সার আমিই হয়েছি। মানুষের যে সার সেটাও আমি। প্রত্যেকটি মানুষের অন্তর্যামী রূপে আমিই আছি। সেইজন্য দেবতারা সব জায়গায় আমাকে বসিয়েছেন। এই বসিয়েছেন ব্যাপারটা ভাষ্যকাররা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা দেন। দেবতারা তাঁর স্তুতি করেন এই অর্থে বলা হচ্ছে বা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তিনি নিজেকে যে নানান ভাবে প্রকাশিত করছেন বা দেবতাদের কার্যসমূহ তাঁর ইচ্ছাতেই সম্পন্ন হচ্ছে সেইজন্য দেবতারাও তাঁকে সম্মান করেন এই অর্থেও বলা হচ্ছে যে তিনি আমাকে সব জায়গায় বসিয়েছেন। মূল কথা বলতে চাইছেন, জগতে যা কিছু আছে সব আমিই হয়েছি, সবার মধ্যে যে অন্তর্যামী বিরাজ করছেন সেটাও আমি হয়েছি, আমিই আবার এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের শাসনকর্ত্রী, আমিই সব কিছু চালাচ্ছি কারণ আমি রাষ্ট্রী, আর যে যা ফল প্রাপ্ত করছে সেই ফল আমিই প্রদান করি বা এভাবেও বলা যায় আমি আছি বলে সবাই সবার কর্মের ফল পেয়ে যায়।

অনেক দিক দিয়ে আমরা এর চিন্তা করতে পারি, কারণ রূপেও তিনি কার্য রূপেও তিনি, কার্যের যে সঞ্চালন সেটাও তিনি, কর্মফলটাও তিনি। এগুলো কোন উচ্চ দর্শন নয়, এটাই সত্য। আমরা যা যা করছি সবই হিপনোটাইজ দর্শন। এগুলো শুনলে আমরা মনে করি বেদান্তের কত উচ্চ কথা, শুধু উচ্চ কথাই নয়, এটাই বাস্তব। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড রূপে আমিই বিরাজ করছি, রক্ষক হয়ে আমি রক্ষা করছি আবার ভক্ষক হয়ে আমিই নাশ করছি। কিন্তু আমি তো এটা মানতে পারবো না। তাহলে বেদ উপনিষদ পড়ে আমাদের কি লাভ হচ্ছে! এখন কোনটা উচ্চ আর কোনটা নিম্ন? এটা ঠিকই যে সাধারণ অবস্থা থেকে এগুলো চিন্তা করলে মনে হবে বেদান্তের বড় বড় কথা। কিন্তু বেদান্তের এই অবস্থায় পৌঁছে গিয়ে দেখলে তখন বলবেন, ইস্! আমি কী অত্যন্ত জঘন্য জীবন অতিবাহিত করছিলাম! নির্ভর করছে আমি আপনি নিজেকে কোন জায়গাতে রাখতে চাইছি। আমরা ওই উচ্চ অবস্থায় নিজেকে রাখতে পারব না। ঋষিরাও জানতেন ত্যাগ-বৈরাগ্যের কথা, সন্ন্যাসের কথা, ঈশ্বর দর্শনের কথা গৃহস্থদের জন্য নয়। ঠাকুরও বলছেন – সংসারে হবে না কেন, হবে কিন্তু বড় কঠিন। কেন কঠিন? কারণ ঈশ্বর জ্ঞান লাভের জন্য যে পথই অবলম্বন করা হোক না কেন, পূর্ণ ত্যাগ ছাড়া ঈশ্বর জ্ঞান হয় না। পূর্ণ ত্যাগ মানে কোন কামনা থাকবে না। গৃহস্থের কোন কামনা থাকবে না তা কি কখন হতে পারে! তার স্ত্রী আছ, সন্তান আছে, পাঁচ রকমের সমস্যা আছে, কামনা না থাকলে কি করে তার সংসার কার্য চলবে! কাম্য কর্ম ছাড়া সংসার যাত্রা নির্বাহ হতেই পারবে না। ঠাকুরও বলছেন, বাড়িতে স্ত্রী রয়েছে, মা রয়েছে এখানে এসে জপ করছে! বাড়ির দেখাশোনা না করে যে গৃহস্থ ঠাকুরের নাম নেয় ঠাকুরের ভাষায় সে তো একটা ঢ্যামনা সাপ। গৃহস্থকে সব রকম কাজ করতে হবে, সেইজন্য গৃহস্থের পক্ষে পূর্ণ ত্যাগ সম্ভব নয়। তাহলে গৃহস্থদের পক্ষে কী করণীয়? ঠাকুর বলছেন এক হাত দিয়ে ঈশ্বরকে ধরবে আরেক হাত দিয়ে কাজকর্ম করবে। ঠাকুরের নাম করতে করতে নিষ্ঠা জাগলে তিনিই একটা ব্যবস্থা করে দেবেন। কেউ হয়ত বাড়ির দায়ীত্ব নিয়ে নিল।

আমরা এখানে বেদের বিভিন্ন মন্ত্র ও সূক্ত নিয়ে আলোচনা করছি। বেদের কোন মন্ত্রই চিন্তা ভাবনার ফলশ্রুতি নয়, এগুলো পুরোপুরি বাস্তব। ঋষি শব্দের অর্থ দ্রষ্টা, অর্থাৎ ঋষিরা সত্যকে এভাবেই দেখেছেন। আমাদের দুর্ভাগ্য যে আমরা জগতকে অন্য রকম দেখছি। যেটা সত্য সেটা আমাদের কাছে মিথ্যা মনে হয়, যেটা মিথ্যা সেটাই সত্য বলে মনে হয়। আবার বলছেন যিনি আত্মজ্ঞানী হন তাঁর আর কি কি হয় –

ময়া সো অন্নমতি যো বিপশ্যতি যঃ প্রাণিতি যঈং শৃণোত্যুক্তম্।
অমন্তবোমান্ত উপক্ষিয়ন্তি শ্রুধিশ্রুত শ্রদ্ধিবং তে বদামি।।৪।।

শ্রুধিশ্রুত, আমি যা বলছি যার কান আছে সে শোন। তুমি যে আমার কথা শ্রবণ করবে তার জন্য তোমার একটা শর্ত থাকা চাই, সেই শর্ত হল *শ্রদ্ধিবং*, শ্রদ্ধার সাথে যদি আমার কথা না শ্রবণ কর তাহলে এসব কথা তোমার কোন কাজে লাগবে না। ব্রহ্মজ্ঞানের কথা আমি তোমাদের বলছি। আমি বাক্ দেবী আমি নিজে তোমাদের বলছি, যদি শ্রবণ করার ইচ্ছে থাকে তাহলে তোমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে শ্রবণ কর। *ময়া সো অন্নমতি*, মানুষ যা কিছু খাদ্য ভক্ষণ করে সেটা আমার জন্যই খেতে পায়, আমি যদি না থাকি তাহলে খাদ্য তার আর ভেতরে যাবে না। টাকা থাকলেই মানুষ খেতে পারে না, ঘরে সব খাদ্য মজুত থাকলেই যে খেতে পারবে তা নয়। খাওয়া-দাওয়া করার জন্য একটা সুস্বাস্থ্য দরকার। হয়ত সব কিছুই আছে কিন্তু ডায়বেটিকস হয়ে গেছে বা কোন ব্যাধি এসে গেছে কিছুই খেতে পারছে না, অন্য দিকে গরীব-কাঙালরা পেটের জ্বালায় জ্বলেপুড়ে মরছে কিন্তু বাড়িতে কোন খাবার নেই। *ময়া সো অন্নমতি*, অন্ন ভোগ করার যে শক্তি এই শক্তি আমি। গীতায় ভগবান বলছেন, *অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতাঃ*, বৈশ্বানর মানে জঠরের যে অগ্নি, এই ভাবে নানান রকমের যত অগ্নি আছে সব আমি। এই ভাবটাই পরে পঞ্চপ্রাণের ধারণাতে পর্যবসিত হয়েছে। প্রাণ, অপান, সমানা, উদানা ও ব্যায়ানা, এই পঞ্চ প্রাণের ধারণা এখান থেকেই এসেছে। আমরা নিঃশ্বাস নিচ্ছি বলে অপান বায়ু ভেতরে গেল, নিঃশ্বাস ছাড়ছি প্রাণ বায়ু বেরিয়ে গেল। উপনিষদ বা গীতাতে যত কথা আছে সব বেদেই আছে। বেদের ভাবকেই পরের পরের ঋষিরা অন্য ভাবে বলছেন। ঋষি যে রকমটি অনুভূতি করেছিলেন সেই রকম কথাই বলেছেন। বেদের বাইরে কখনই পরের ঋষিরা যাবেন না।

এই মন্ত্রে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের বিভিন্ন কার্যকে দেখাচ্ছেন, যা কিছু খাওয়া হয়, যা কিছু দেখা হয়, যা কিছু শ্রবণ করা হয় আর যা কিছু প্রাণনক্রিয়া হয় সবটাই আমার জন্যই সম্ভব হয়। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের উপর দিয়েই মূলতঃ আমাদের প্রাণন ক্রিয়া চলে। মানুষ যা কিছু দেখে আমার জন্যই দেখে। মানুষ যা কিছু কথা বলে, যা কিছু কর্ণে শ্রবণ করছে সব আমার জন্যই সম্ভব হচ্ছে। কেনোপনিষদে ঠিক এই ধরণের একটি মন্ত্র আছে – *শ্রোত্রস্য শ্রোত্রম্ মনসো মনোঃ* – যা কিছু শ্রবণ করা হয়, তার পেছনে আরেকটি শক্তি আছে বলে সে শুনতে পারছে। *যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষূংষি পশ্যতি*, যা কিছু দেখছে, তার পেছনে আরেকটি শক্তি আছে, এই শক্তি চৈতন্যরই শক্তি। এগুলো ধারণা করে সত্যিই খুব কঠিন, তার উপর বিজ্ঞান আসার পর আরও কঠিন হয়ে গেছে, কারণ বিজ্ঞান শরীরের ইন্দ্রিয়গুলিকে মেশিন রূপে দেখে। আসলে তা নয়। আমাদের ঋষিরাও জানতেন শরীর মনের কার্যের মধ্যেও স্থূল ইন্দ্রিয়ের কার্য জড়িয়ে আছে। দূরবীন বা ক্যামেরা আমরা জানি এগুলো মেশিন। কিন্তু আমরা জানি চোখ দিয়ে আমরা যেভাবে দেখি দূরবীন বা ক্যামেরা সেইভাবে কাজ করতে পারে না। আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়ের পেছনে যে শক্তি আছে সেটা সেই চৈতন্যের শক্তি। বাক্ দেবী বা বাক্ ঋষিকা নিজেকে সেই চৈতন্যের সঙ্গে একাত্ম হয়ে বলছেন – আমিই সেই শক্তি যার জন্য মানুষ আহার, শ্রবণ, দর্শন সব কিছু করতে পারছে।

অমন্তবোমান্ত উপক্ষিয়ন্তি, ভাষ্যকার এর অর্থ করছেন – ঈশ্বর অন্তর্যামী রূপে সবার মধ্যে অধিষ্ঠিত, তিনি অন্তর্যামী হওয়াতে এই কার্যগুলো সম্ভব হচ্ছে, এই জিনিসটাকে যে জানে না তাকে বলছেন *অমন্তবঃ*। যারা আমার এই জিনিসগুলো জানে না বা মানে না ক্রমে তারা এই সংসারে হীন হয়ে যায়। যাদের মধ্যে আধ্যাত্মিকতার অভাব থাকে বা যে জাতির মধ্যে আধ্যাত্মিকতা নেই ধীরে ধীরে সেই জাতির ক্ষয় হয়ে যায়। হয়তো এই মন্ত্রকেই মাথায় রেখে স্বামীজী এক সময় বলেছিলেন, তোমরা বিশ্ব ইতিহাসের পেছনের দিকে

তাকাও, তাহলে বিশ্বজয়ী রোমানদের সেই রথ কোথায় গেল, গ্রীকদের যে এত বড় বড় যুদ্ধ বাহিনী, এই রকম কত জাতি এল আবার চলে গেল। কিছু দিন রাজত্ব করল, কত লোকের গলা কেটে দিল তারপর একদিন নিজেরাই শেষ হয়ে গেল। কারা শেষ পর্যন্ত থেকে গেল? একমাত্র যাঁদের মধ্যে আধ্যাত্মিক শক্তি ছিল। যে জাতির মধ্যে আধ্যাত্মিক শক্তি আছে সেই জাতির কোন দিন নাশ হবে না, যদি না নিজেরা নিজেদের নাশ করতে চায়। জহুদিরা, পার্সিরা বাইরের কাউকে বিয়ে করবে না, অন্য দিকে অন্যরা তাদের গলা কেটে যাচ্ছে কিন্তু তা সত্ত্বেও এরা টিকে আছে। তার একমাত্র কারণ তাদের মধ্যে আধ্যাত্মিক শক্তি আছে। ঠিক তেমনি যে মানুষের মধ্যে আধ্যাত্মিক শক্তি আছে সেই মানুষকে কেউ নাশ করতে পারবে না। আধ্যাত্মিকতা মানে, যিনি জেনে গেছেন সব কিছুর পেছনে, সব শক্তির পেছনে ঈশ্বরই আছেন। তাঁকে আর কেউ নাশ করতে পারবে না, তাঁর শক্তিটাই আলাদা ধরণের হয়ে গেছে। সেইজন্য এই মন্ত্রে বলছেন *অমন্তোবোমান্ত উপক্ষিয়ন্তি*, তুমি মানো আর নাই মানো, যার মধ্যে এই দৈবী চেতনা নেই, তিনিই সব কিছু করছেন এই বিশ্বাস যাদের মধ্যে নেই, তার কিন্তু বিনাশ হয়ে যাবে। এই কথা বলার পর বলছেন, যাদের কান আছে তারা শোন, এই কথাটা বোঝ। *তে বদামি* – এই কথা আমি বলছি, এটা বোঝ আমিই হলাম সমস্ত প্রাণীর ঠিক ঠিক শ্রদ্ধার পাত্রী, তাই যদি তোমায় কারুকে শ্রদ্ধা করতে হয় ভক্তি করতে হয় তাহলে একমাত্র এই দেবীকেই করতে হবে। কারণ মানুষ যাবতীয় যা কিছু করছে সব আমারই মাধ্যমে করছে, আমি আছি বলেই সব করতে পারছে।

অহমেব স্বয়মিদং বদামি জুষ্টং দেবেভিরুত মানুষেভিঃ।
যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাম্।।৫।।

শুধু তাই না, আমি নিজেই এই কথাগুলো তোমাকে বলছি। এটা কোন পাগল এসে তোমাকে বলছে তা নয়, আমি সেই দেবী, আমিই তোমাকে বলছি। কাশীপুর উদ্যানবাটীতে ঠাকুরের শেষ সময়, স্বামীজী ভাবছেন ইনি যদি এখন এই অবস্থায় নিজে বলেন যে আমি অবতার তাহলে আমি মেনে নেব। ঠাকুর স্বামীজীর মনের ভাব বুঝে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বলছেন – এখনও অবিশ্বাস! আমি বলছি যে রাম সেই কৃষ্ণ বর্তমানে সেই এই শরীরে রামকৃষ্ণ। যদিও ঠাকুরের কথায় বা শ্রীমা বা স্বামীজীর কথার মধ্যে আমি জিনিসটা নেই, কিন্তু একটু বিচক্ষণ দৃষ্টি নিয়ে দেখলে তাঁদের কথাতেও আমি ভাবটা বোঝা যায়। ঠাকুর বলছেন, হাজরা এখানকার মত উল্টে দিতে চায়। এখানকার মত মানে ঠাকুরের নিজস্ব যে ভাব। হাজরা ছিলেন কাঁচা বুদ্ধির লোক, কিছু বই পড়ে নিজের মত একটা ধারণা করে নিয়েছে। *অহমেব স্বয়মিদং বদামি*, আমি বলছি শোন, এই কথা একমাত্র বলতে পারেন যিনি পরমাত্মার দর্শন করেছেন। ডাক্তার সরকার ঠাকুরকে বলছেন – আমি বলছি শোন। ঠাকুর খুব রেগে গেছেন – তোমার কথা আমি কী শুনব! তুমি হলে কামী, ক্রোধী, লোভী, অহঙ্কারী। মানুষ মাত্রেই কামী, লোভী, অহঙ্কারী তার কথা আমরা কী শুনব! যখন দরকার পড়বে তখন মিথ্যা কথাও বলতে ছাড়বে না। *অহমেব স্বয়মিদং বদামি*, এই অবস্থায় আসার আগে তোমাকে পূর্ণজ্ঞানী হতে হবে। যীশুও বলছেন – I am in my Father and Father is in me, অনেক পাগলও তো এই ধরণের কথা বলে, সেই কারণে সাধারণ মানুষের পক্ষে পার্থক্য করা খুব মুশকিল। কয়েক বছর লোকদৃষ্টির অন্তরালে থাকার পর ফিরে এসে যীশু যখন উপদেশ দিতে শুরু করলেন তখন তিনিও বলছেন আমার পরে অনেক false prophet আসবে। আগেকার দিনে অনেক সাধুবাবারা ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন আর লোকেদের উপদেশ দিতেন। যীশুর সময়েও এই ধরণের কিছু সাধুবাবা ছিলেন যাঁরা ঘুরে ঘুরে উপদেশ দিতেন, এনাদের বলা হত প্রফেট। False Prophets মানে যাদের জ্ঞান হয়নি। যীশু যখন অশিক্ষিত গ্রামের লোকদের ঈশ্বরীয় কথা বলছেন তাঁরা তখন যীশুর কথা শুনে charmed হয়ে যাচ্ছেন। হতবাক হয়ে শুনছেন আর বলছেন – Here is the man who is talking with authority। ঈশ্বরীয় কথা অনেকেই বলেন কিন্তু সবারই authority থাকে না। ঠাকুর খুব সহজ ভাষায় বলছেন চাপরাশ। গীতাতেও অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন – *স্বয়ঞ্চৈব ব্রবীষি মে*।, আপনি নিজে আমাকে এই কথা বলেছেন। কোন বাবাজীর চেলারা যদি এসে বলে ইনি অবতার, তাহলে এই কথার কোন দাম থাকবে না, বাবাজীকে নিজে বলতে হবে। ইদানিং অনেক বাবাজী বলছেন সেইই নাকি আসল অবতার। এখানে দুটো জিনিস খুব গুরুত্বপূর্ণ, যিনি ঈশ্বরের অবতার তাঁকে নিজেকে বলতে হবে। আবার যারা পাগল

তারাও বলে আমিই শ্রেষ্ঠ। কেউ যদি এসে বলে আমি অবতার আমরা বুঝব কি করে? এটা বোঝার জন্যই অধ্যাত্ম শাস্ত্র পড়তে হয়। যে বলছে আমি অবতার, তার এই কথার কি দাম সেটা বুঝতে হলে তার অন্যান্য জিনিস গুলিকে বিচার করতে জানতে হয়। যখন তাঁর মধ্যে সাধুর সমস্ত গুণ বিদ্যমান থাকবে তখন সে যদি বলে আমি অবতার তাহলে সেই কথার দাম থাকে। যারা গোলমেলে তাদের ভালো করে খতিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে যে তার সাধুত্বের মধ্যে অনেক গলদ আছে। তাদের কথাও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

জুষ্টং দেবেভিরুত মানুষেভিঃ – আমি যে কথাগুলো বলি তার সব কথাই দেবতা আর মানব জাতির সবার মঙ্গলের জন্যই বলি। আমার কথাগুলি সবারই প্রিয়, দেবতাদেরও প্রিয় আবার মানুষেরও প্রিয়। এই বাক্ দেবী বেদের অন্য দেব-দেবীর মত কোন সাধারণ দেবী নন। ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ সাধারণ দেবতা, দেবীসূক্তমের বাক্ দেবী সেই সচ্চিদানন্দের সাথে এক। *যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাম্* - আমি যার প্রতি প্রসন্ন হই তাকে আমি শক্তিমান বানিয়ে দিই। *উগ্রম্* মানে বাংলার উগ্র নয়, সংস্কৃতে উগ্র মানে সবার থেকে শ্রেষ্ঠ। মানুষের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ হয়? যাঁর উপর শক্তির কৃপা হয়েছে। সূক্তমের নাম দেবীসূক্তম্, এখানে মায়ের স্তুতি করা হচ্ছে, সেইজন্য বলছেন যাঁর উপর মায়ের কৃপা হয়। কিন্তু এখানে মা কোথাও বলা হচ্ছে না, কিন্তু মূল হল যেখানে আধ্যাত্মিক শক্তি কাজ করে সেখানেই শ্রেষ্ঠত্বের প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। কঠোপনিষদে বলছেন *যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য*, আত্মা যাঁকে বরণ করেন তিনিই আত্মাকে জানতে পারেন। আমরাও বলি ঠাকুর যাঁকে বেছে নিয়েছেন। ঠাকুর কাকে বেছে নেন? যাঁদের প্রস্তুতি আছে তাঁদের মধ্য থেকেই তিনি বেছে নেন। শুধু প্রস্তুতি থাকলেই যে তিনি বেছে নেবেন তারও কোন নিশ্চয়তা নেই। কিন্তু যাদের প্রস্তুতি নেই, তাদের ব্যাপারে কোন প্রশ্নই নেই। চাষ করার পর ফসল ভালোও হতে পারে আবার ভালো নাও হতে পারে। কিন্তু চাষই যদি না করে তাহলে কিছুই হবে না। এখানেও বলছেন যাঁদের মধ্যে প্রস্তুতি আছে তাঁদের মধ্যে কাউকে *উগ্রং কৃণোমি*, কাউকে আমি শ্রেষ্ঠ করি। তাঁদের মধ্যে কাউকে আমি *ব্রহ্মাণং*, ব্রহ্মা মানে স্রষ্টা বানিয়ে দিই। *তমৃষিং*, যাঁরা অতিন্দ্রিয়ের দ্রষ্টা আমি তাঁদের ঋষি বানিয়ে দিই। *তং সুমেধাম্* আর যাকে আমি চাই তাকে আমি মেধা শক্তি দিয়ে দিই, *সুমেধাম্* মানে শোভন প্রজ্ঞাঃ। সাধারণ ভাবে মানুষ অত্যন্ত স্থূল বুদ্ধি সম্পন্ন হয়। মুষ্টিমেয় কয়েকজনের মধ্যে সূক্ষ্ম বুদ্ধি হয়, তাঁদের আমরা বলি প্রজ্ঞাবান। এখানে শুধু প্রজ্ঞার কথা বলছেন না, বলছেন *সুমেধাম্*, সুন্দর মেধা। যাঁর মধ্যে মেধা এসে গেল, গ্রহণ ধারণ সামর্থম্ যাঁর মধ্যে এসে গেছে তিনি তো সবাইকার রাজা। শঙ্করাচার্য, স্বামীজী এনারা সুমেধা, স্বামীজীর কথার মধ্যে কোথাও বাকজাল নেই, কোথাও পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করছেন না। ঠাকুরের ক্ষেত্রে আমরা সুমেধা বলতে পারি না, কারণ তিনি সাক্ষাৎ ভগবান। বাক্ দেবীকে কেন সাধারণ দেবতার সঙ্গে এক ভাবা যাবে না? কারণ ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র দেবতাদের এই ধরণের কোন ক্ষমতা নেই। ইন্দ্র হয়তো কিছু দিতে পারেন, বরুণ সেটা দিতে পারেন না, আবার বরুণ যেটা দিতে পারেন সেটা আবার ইন্দ্র বা মিত্র দিতে পারবেন না। কিন্তু বাক্ দেবী ইচ্ছে করলে অনেক কিছুই করে দিতে পারেন। যে শক্তি চাইছে তাকে শক্তি, যে মেধা চাইছে তাকে মেধা দিয়ে দিতে পারেন আবার কাউকে ব্রহ্মা বানিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা দেবীর আছে। যিনি ত্যাগ বৈরাগ্য চাইছেন, অর্থাৎ যিনি ঋষি হতে চাইছেন, দেবী তাঁকে ঋষি বানিয়ে দিতে পারেন। বাক্ দেবী যে কাউকে পক্ষপাত করছেন তা নয়। তবে এটাও ঠিক যে ঈশ্বরের কার্য বোঝা যায় না। এর মৌলিক নিয়মটা সব সময় মনে রাখতে হবে, মনের সীমানা যত দূর যায় তত দূর পর্যন্তই আমরা বিচার করতে পারি। কিন্তু চৈতন্য মানেই মনের এলাকার বাইরে, সেইজন্য ঈশ্বরতত্ত্ব মানুষের মন জানতে পারে না, তাই ঈশ্বরের কার্যকেও মন ব্যাখ্যা করতে পারবে না। হঠাৎ দেখছি এই লোকটি বিরাট উপরে চলে গেল। কি করে চলে গেল? ঈশ্বরের কৃপা। ঈশ্বর তার উপর কৃপা কেন করলেন? আমরা কি করে জানব কেন তিনি কৃপা করলেন। যে কোন মানুষ যখন অনেক উপরে চলে যায়, যেমন আলেকজাণ্ডার সারা বিশ্বের রাজা হয়ে গেল। সেও তো একটা কামী, লোভী, অহঙ্কারী ছিল, কত নিরীহ লোককে হত্যা করেছে। আপনিও তো একদিন ভারতের প্রধানমন্ত্রী হয়ে যেতে পারেন। এগুলোকে নিয়ে কিছু বলা যায় না, কিন্তু যেখানে সুমেধা আছে, যেখানে একটা স্নেহের ভাব আছে অথচ ক্ষমতা আছে, তখন বুঝতে

হবে তার উপর ঈশ্বরের কৃপা আছে। ঈশ্বর তাঁকে কেন কৃপা করলেন? আমাদের জানার কোন পথ নেই। কিন্তু এটা ঠিক যাদের প্রস্তুতি আছে তাদের উপরই তাঁর কৃপা হয়।

এখানে আবার একটা সংশয় আসে, পুরুষসূক্তমে ব্রহ্মা বলতে অধিপুরুষের কথা বলা হয়েছে। ভগবান নিজের মায়াকে অবলম্বন করে প্রথমে তিনি নিজেকে ব্রহ্মা রূপে দেখান। কিন্তু এখানে বলছেন আমি মানুষকে ব্রহ্মা বানাই। মায়ার প্রথম অবস্থায় যেখানে সৃষ্টি শুরু হয় ওই জায়গাটা খুবই সংশয়াত্মক। প্রথম যাঁকে দেখা যাচ্ছে তাঁকে ব্রহ্মা বলছেন, এই ব্রহ্মা আসলে কি কেউ ঠিক পরিষ্কার করে বলছেন না। বিভিন্ন শাস্ত্রাদিতেও তাই ব্রহ্মাকে বিভিন্ন ভাবে বলা হয়েছে। পরের দিকে অবশ্য ব্রহ্মাকে মানুষ রূপে নেওয়া হয়নি। ব্রহ্মার ঠিক নীচে মনুকে নিয়ে আসা হয়েছে, সেখানে আবার বলা হয়, মানুষের মধ্যে যাঁদের প্রচুর সুকৃতি আছে তাঁদের থেকেই কাউকে মনু করা হয়। কিন্তু দেবীসূক্তমে যিনি ব্রহ্মা হবেন সেটা বাক্ দেবীর ইচ্ছাতেই হবে। সাংখ্য দর্শন, যার থেকে পরে যোগদর্শন এসেছে, তাতে একটা মত আছে, যেটা বেদান্তেও কোথাও কোথাও বলা হয়েছে, তাতে বলছেন যদি কেউ প্রচুর সাধন-ভজন করে থাকেন কিন্তু মুক্তি লাভ হয়নি, কোথাও একটু অবিদ্যা তাঁর মধ্যে থেকে গেছে, সাংখ্য মতে তিনি প্রকৃতিলীন পুরুষ হয়ে যান। মৃত্যুর পর তিনি সব থেকে উচ্চলোকে যাবেন। উচ্চলোক আমাদের কাছে সত্যলোক, সত্যলোকেরই একটা নাম ব্রহ্মলোক বা বিষ্ণুলোক, আমরা এখন রামকৃষ্ণলোক বলছি। এই মতে বলা হয়, ওই লোকে গিয়ে তিনি প্রকৃতিলীন হয়ে ওই লোকের সাথে এক হয়ে যান। প্রকৃতিলীন হওয়া মানে তিনি প্রকৃতির সঙ্গে এক মনে করেন, তখন তিনি ব্রহ্মা হয়ে যান। এই অর্থে এখানে এই ব্রহ্মার কথা বলা হচ্ছে। প্রকৃতিলীন হল ব্যষ্টির মধ্যে ঈশ্বরের সব থেকে বেশি প্রকাশ। জীবাত্মা সব থেকে যে উচ্চ অবস্থায় যেতে পারে তা হল ব্রহ্মলোক। ব্রহ্মলোকে তিনি ব্রহ্মার সাথে এক হয়ে যান। তাঁর মধ্যে ব্রহ্মার সমান ক্ষমতা থাকবে কিন্তু তিনি সৃষ্টির কাজে নামবেন না। যিনি প্রথম ব্রহ্মা হন সৃষ্টির অধিকার তাঁরই থাকে। এগুলো বিভিন্ন মত, যে যেমন খুশী এর ব্যাখ্যা করতে পারেন, আধ্যাত্মিক দর্শনে যার কোন দাম নেই।

অহং রুদ্রায় ধনুরাতনোমি ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্তবা উ।
অহং জনায় সমদং কৃণোম্যহং দ্যাবা পৃথিবী আবিবেশ।।৬।।

গীতার দশম অধ্যায়ে ভগবানের যে নানা রকম বিভূতির বর্ণনা করা হয়েছে, এখানেও কয়েকটি মন্ত্রে বিভূতির বর্ণনা করা হচ্ছে। এখানে যে রুদ্রের কথা বলছেন এই রুদ্রকেই পরে শিবের সাথে এক করে দেওয়া হয়েছে, শিব হলেন পৌরাণিক দেবতা। শিবের অস্ত্র ধনু। রামায়ণে আমরা শ্রীরামচন্দ্রকে একজন ধনুর্ধর রূপে পাই। কিন্তু বেদে যখনই ধনু শব্দ আসবে তখনই তা রুদ্রের সঙ্গে এক করে বলা হবে। শিবের আরেকটি নাম ত্রিপুরহর। ত্রিপুর নামে এক প্রচণ্ড শক্তিশালী ও ক্ষমতাশালী অসুর ছিল, শিব এই ত্রিপুরাসুরকে নাশ করেছিলেন বলে তাঁর আরেক নাম ত্রিপুরহর। শিব যে ধনু দিয়ে এই অসুরকে নাশ করেছিলেন, সেই ধনু পরে জনকরাজার কাছে রাখা ছিল। এই ধনুই শ্রীরামচন্দ্র ভেঙ্গে সীতাকে পেয়েছিলেন। দেবী বলছেন *অহং রুদ্রায় ধনুঃ* – রুদ্রের ধনুতে যে শক্তিতে ছিলা বা দড়ি লাগানো আছে সেই শক্তি আমি বা সেই দড়িটা আমি। আমি না থাকলে শিব সেই ধনুতে জ্যা রোপণ করতে পারতেন না। *ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্তবা উ* – রুদ্র কাকে বধ করেছেন? *ব্রহ্মদ্বিষে*, যারা ব্রাহ্মণ শক্তির বিদ্বেষী, সেই বিদ্বেষীদের শিব নাশ করেছেন। মূল কথা যে কোন শক্তি তা মেধা বা বুদ্ধি রূপেই হোক, ত্যাগ বৈরাগ্য রূপেই হোক বা ধন-সম্পদ রূপেই হোক, সব শক্তিই আমার জন্যই। *অহং জনায় সমদং কৃণোম্যহং দ্যাবা পৃথিবী আবিবেশ* – *সমদম্* শব্দের অর্থ সংগ্রাম, দেবী বলছেন, আমার ভক্তদের যখন সংগ্রামে নামতে হয় তখন আমি তাদের শত্রুদের বধ করি। শুভ শক্তি আর অশুভ শক্তির লড়াই সব সময়ই চলছে। দেবী শুভ শক্তির পক্ষ অবলম্বন কর সব সময় অশুভ শক্তির নাশ করেন। অশুভ শক্তিও দৈবী শক্তি, কিন্তু প্রথমের দিকে আধ্যাত্মিক শক্তিকে বোঝানর জন্য শুভ ও অশুভ বা ভালো ও মন্দ এই দুটোকে পরিষ্কার করে আলাদা করে দেখান হয়। দুটোকে আলাদা করে বলা না হলে সাধারণ মানুষ শুভ ও অশুভকে পার্থক্য করতে পারবে না। অশুভ শক্তির স্তুতি কখন করা হয় না, রাবণের শক্তি, কংসের শক্তি, এগুলোও শক্তি কিন্তু এই শক্তির স্তুতি কখন করা হয় না, স্তুতি সব সময় শুভ শক্তিরই হয়। শুভ শক্তির জয় সব সময় আধ্যাত্মিক শক্তির জোরেই হয়। এগুলো নিয়ে অনেক মতবাদ আছে। ভগবান যিনি তিনি দেবতাদেরও ভগবান আবার

অসুরদেরও ভগবান। দেবতাদের শক্তির মধ্যেই ভগবান আছেন অসুরদের শক্তির মধ্যে ভগবান নেই, তা কখন হতে পারে না। অসুরদের শক্তি সব সময় ইন্দ্রিয়ের শক্তিতেই চলে, ইন্দ্রিয়ের শক্তির আশ্রয়ে থাকার জন্য অসুররা কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ এই রিপুগুলির শক্তিতে এগিয়ে যায়। কাম, ক্রোধের শক্তিতে যখন এগিয়ে যায় তখন দৈবী শক্তি আর এদের সাথে পেরে ওঠে না। দৈবী শক্তিকে তখন আধ্যাত্মিক শক্তির সাহায্য নিতে হয়। আধ্যাত্মিক শক্তির সাহায্য নেওয়া মানে ধ্যান, তপস্যাদি করে নিজের শক্তি বৃদ্ধি করা। আধ্যাত্মিক শক্তিতে যখন বলীয়ান হয়ে যায় তখন আবার অশুভ শক্তিকে পরাস্ত করতে পারে। কাম, ক্রোধের শক্তিকে আমরা প্রায়ই বলি আসুরিক শক্তি। উপনিষদের শেষ কথা, যেখানে শুভ-অশুভের পারের কথা বলছেন বা শুভ-অশুভ একই মনে হওয়ার কথা, এখানে সেই বর্ণনাটা নেই। এখানে ভক্তদের জন্য বর্ণনা করা হচ্ছে, ভক্তদের যখনই বলতে হয় তখন তাদের কাছে শুভ আর অশুভকে আলাদা করেই দেখাতে হয়। যার ফলে ভক্তদের মনে অনেক সময় সংশয় জাগে, শুভ শক্তি ভগবানের শক্তি কিন্তু তাও শুভ শক্তি অশুভ শক্তির কাছে মার খায়, অশুভ শক্তিই কেন বার বার এগিয়ে যায়। ভক্তদের এই সংশয় দূর করার জন্য বলা হয়, শুভ শক্তি এই কারণেই মার খায় তার মধ্যে আধ্যাত্মিক শক্তি ছিল না। তার মানে, তপস্যা, জপ-ধ্যান করেনি, করলে এই রকম পরিণতি হত না। বলতে চাইছেন তুমিও তপস্যা কর, জপ-ধ্যান কর। করতে করতে একটা উচ্চ অবস্থার স্তরে গিয়ে দেখে শুভও যা অশুভও তাই, তখন আর শুভ অশুভকে নিয়ে বেশি মাথা ঘামাতে চায় না। কিন্তু সাধারণ লোক এগুলো বুঝবে না, তাকে তার জীবন চালাতে, স্ত্রী, পুত্রকে ভালো ভাবে রাখতে হবে। যতটা তার সাধ্যে কুলায় ততটা করে বাকিটা ঈশ্বরের কৃপার উপর নির্ভর করে তাঁর প্রার্থনা করে। প্রার্থনা করলে ঈশ্বর শুনবেন কিনা জানি না, সেইজন্য এখানে কাহিনী রচনা করে বলছেন, *অহং রুদ্রায় ধনুরাতনোমি ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্তবা উ*, শুভ শক্তি যখন এগিয়ে আসে আমি তখন তাকে সাহায্য করি, যেমন অশুভ শক্তি ত্রিপুরাসুরকে বধ করার সময় রুদ্রের ধনুতে আমি জ্যা রোপণ করি।

দ্যাবা পৃথিবী আবিবেশ, পৃথিবী আর দ্যাবা মানে অন্তরীক্ষ লোক সর্বব্যাপী রূপে আমিই ধরে আছি, আমার বাইরে কিছুই নেই, আমিই সব জায়গায় ছেয়ে আছি। দেবী অন্তর্জগতের যা কিছু, মেধা, বুদ্ধি, ত্যাগ, বৈরাগ্য, ব্রাহ্মণত্ব, আবার যা কিছু শক্তির খেলা তা ধন-সম্পদ বা শারীরিক বা মানসিক, আবার এই বহির্জগতের যা কিছু দেখা যাচ্ছে আবার যা দেখা যাচ্ছে না সবটাতে তিনিই আছেন।

অহং সুবে পিতরস্য মূর্ধন্ মম যোনিরপস্ব(অ) হন্তঃ সমুদ্রে।
ততো বিতিষ্ঠে ভুবনানু বিশ্বো তামূং দ্যাং বর্ষ্মণোপস্পৃশামি।।৭।।

দেবীসূক্তমের সাত নম্বর মন্ত্রটি একটি কঠিণ মন্ত্র। এখানে সংক্ষেপে বক্তব্য হল, পরমাত্মার উপর যে মায়া শক্তির খেলা চলছে সেই শক্তিটা আমি, সেইজন্য এই যে সৃষ্টি হচ্ছে, সৃষ্টিতে যা কিছু আছে সবটাই আমি। তাই স্বর্গ থেকে পাতাল পুরোটাই আমার শরীর। কোথাও কোথাও বর্ণনা আছে, পুরুষসূক্তমে যদিও পরিষ্কার করে বলা নেই কিন্তু বলা হয়েছে যে পুরুষ যিনি মানে ভগবানের ভ্রুকুটি হল স্বর্গ, অন্তরীক্ষ ভগবানের ভ্রু। *পিতররমস্য মূর্ধন্* - দেবী বলছেন ভগবানের ভ্রু থেকে যে অন্তরীক্ষ জন্ম নিল এটা আমার জন্যই হয়েছে। আকাশকে *পিতর* বলা হয়। বেদে এটা খুব নামকরা ধারণা যে, আকাশকে পিতা আর পৃথিবীকে মা বলা হয়। এখানে বলছেন, আকাশ বাবা কিন্তু এই আকাশকে আমিই জন্ম দিয়েছি। তার মানে যাবতীয় সব কিছুর কথা ছেড়ে দাও, তোমার যে পিতা আকাশ, সেই আকাশকেই আমি জন্ম দিয়েছি। কোথায় জন্ম দিয়েছি? *অহং সুবে পিতররমস্য*, পরমাত্মার উপরে জন্ম দিয়েছি। এর ভালো উপমা মরুভূমিতে মরীচিকা। মরীচিকাতে জলের ভ্রম হয়। সেই জলে সব কিছুই দেখা যাচ্ছে। তালগাছও দেখা যায় আবার পুরো শহরের ছবিও দেখা যায়। কিন্তু আসলে মরুভূমি ছাড়া তো সেখানে কিছুই নেই। ঠিক তেমনি পরমাত্মা ছাড়া কিছু নেই, পরমাত্মার উপর আমরা সব কিছু দেখছি। মরুভূমিতে তাপ প্রবাহের ফলে যে শক্তি তৈরী হয় সেই শক্তিতে জল, সেই জলের মধ্যে মায়ানগরী দেখাচ্ছে। কিন্তু বালি ছাড়া কিছু নেই, অথচ অনেক কিছু দেখাচ্ছে। দেবী বলছেন, এই শক্তিটাই আমি। তাহলে জলটা কে? আমি। এই নগরীটা কে? আমি। আবার এই শক্তি মরুভূমি থেকে আলাদা কিছু নয়, সেইজন্য মরুভূমিটাও আমি। আমাদের পক্ষে এই জিনিস ধারণা করা খুব কঠিণ, কিন্তু এটাই সত্য।

এবার আমরা নীচ থেকে উপর পর্যন্ত যদি দেখি তাহলে কি দেখছি? বেদে বলছেন পৃথিবী হল মা আর আকাশ বাবা। বলছেন, তোমকে বাদ দাও, তোমার বাবাকেই আমি জন্ম দিয়েছি। কিভাবে জন্ম দিয়েছি? এই পরমাত্মার উপরে জন্ম দিয়েছি। আকাশ ভগবান থেকে আলাদা কিছু নয়। ভগবানের উপরেই এই আকাশ দাঁড়িয়ে আছে। যেমন মরুভূমির উপরে মরীচিকা দাঁড়িয়ে আছে, ঠিক তেমনি আকাশও পরমাত্মার উপর দাঁড়িয়ে আছে। *মম যোনিরপস্ব(অ) হন্তঃ সমুদ্রে* – এই জায়গাটা আবার অনেক জটিল অর্থ হয় বলে অনেকে অনেক রকম ব্যাখ্যা করেন। দেবী বলছেন আমার জন্ম সমুদ্র থেকে। এখানে সমুদ্রের একটা অর্থ হয় পরমাত্মা, কারণ ভাষ্যকাররা বলছেন সমুদ্র যেমন বিশাল পরমাত্মাও বিশাল, সেইজন্য পরমাত্মার একটি নাম সমুদ্র। অপ মানে জল আমরা সবাই জানি কিন্তু অপ শব্দের আরেকটি অর্থ সর্বব্যাপী। পরমাত্মার মন সর্বব্যাপী। দেবী বলছেন পরমাত্মার মন থেকে আমার সৃষ্টি। যেমন সমুদ্রের জল থেকে সব প্রাণীর সৃষ্টি, তেমনি আমারও সৃষ্টি পরমাত্মার মন থেকে। এটা খুব আশ্চর্যের যে আমাদের বেদের ঋষিরাও জানতেন যে জীবনের উৎস হল সমুদ্র। সমুদ্র থেকে যেমন সব জীবন এসেছে ঠিক তেমনি পরমাত্মা থেকেই সব জীবন এসেছে। সমুদ্র যেমন সর্বব্যাপী পরমাত্মাও সর্বব্যাপী, সেইজন্য পরমাত্মার এক নাম সমুদ্র। আবার সমুদ্র মানে জল, সেইজন্য পরমাত্মার যে সর্বব্যাপীত্ব তাকে জল বা কারণ বলে। কিন্তু সায়নাচার্য পরিষ্কার বলছেন, অপ বা সমুদ্রের জল বলতে বোঝায় পরমাত্মার মন। সচ্চিদানন্দের মন বলতে চিৎ ব্যাপারটা বোঝায়, অর্থাৎ চৈতন্য ভাব, সেখানে এই মায়ার সৃষ্টি। পৌরাণিক কাহিনীতে বলা হয় সৃষ্টির আগে ভগবান ক্ষীর সাগরে অশেষ নাগের উপরে শুয়ে আছেন। দেবী বলছেন আমার জন্ম পরমাত্মা থেকে, আবার সমুদ্রের একটা অর্থ পরমাত্মা, ক্ষীর সাগরে বিষ্ণু শয়ন করে আছেন, মানে যিনি ভগবান তিনি যেন সমুদ্র, আর ভগবান বিষ্ণুর যে সাকার রূপ সেটা এই নিরাকারের উপরে শায়িত, কারণ নিরাকারটা দেখান হয় সমুদ্রের উপমা দিয়ে, পুরাণে ক্ষীর সাগর বলছে। তিনি শুয়ে আছেন কিসের উপরে? শেষ নাগের উপরে। শেষ নাগ অনন্তের উপমা, অনন্তের উপরে ভগবান শুয়ে আছেন সাকার রূপে। সেই ভগবান বিষ্ণুর থেকেই সৃষ্টি প্রথম এগোতে শুরু করে। পুরাণ আর দর্শনের তত্ত্ব এইভাবে দুটোর মধ্যে একটা যোগসূত্র করা হয়েছে। শক্তি ছাড়াতো সৃষ্টি হবে না। সৃষ্টি শুরু হওয়া মানেই শক্তির খেলা আরম্ভ। এবার পরিষ্কার বোঝা যাবে দেবী কেন বলছেন আমার জন্ম সেই পরমাত্মা থেকে। যা কিছু সৃষ্টি হচ্ছে আর সেই সৃষ্ট বস্তুর সাথে ভগবানের যে সম্পর্ক করা হয় সেটা আমার মাধ্যমেই করা হয়। মন থেকে যেটা সৃষ্টি হয় সেই জিনিস মন থেকে কখন আলাদা হয় না। আমরা যে স্বপ্ন দেখি সেটাও মনের সৃষ্টি, মনও যা স্বপ্নও তাই, আমাদের চিন্তা-ভাবনাও তাই। কিন্তু যখন চিন্তা-ভাবনাকে কার্যে পরিণত করতে যাওয়া হয় তখন আরও অনেক আনুষাঙ্গিক জিনিসের প্রয়োজন হয়। তখন সৃষ্টি অন্য রকম হয়ে যায়। মনের চিন্তন ভেতরে এক রকম হয়, সেই চিন্তন বাইরে প্রকাশ হলে আরেক রকম হয়। সেইজন্য সৃষ্টিকে সব সময় বলা হয় সৃষ্টিটা পরমাত্মার মনের ব্যাপার। বাইরে সৃষ্টি করতে ভগবানের অনেক কিছুর দরকার পড়বে, কিন্তু ভগবানের বাইরে তো কিছু নেই। সেইজন্য সৃষ্টির কিছুই বাইরের নয়, সবই পরমাত্মার মনের ভেতরে। এগুলো খুবই উচ্চ তত্ত্বের কথা। কিন্তু আমরা যদি শক্তির কথা বলি, সেই শক্তির কথা বলতে গিয়ে বলছেন, পরমাত্মার যে মন, সেই মনেই শক্তির জন্ম। চিতি বা শক্তির যে কথা বলা হচ্ছে এটাই ভগবানের মায়া বা শক্তি, তা আমরা যে শক্তিরই কথা বলি না কেন, সব শক্তির জন্ম ভগবানের মনে। পরমাত্মা ছাড়া তো কিছু নেই, সেই চৈতন্যের মধ্যে একটা চিন্তা এল, ওই চিন্তাটাই মায়া, ওই মায়াটাই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রূপ নিয়েছে। তাহলে বাক্ দেবী কোথায় আছেন? এই পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটাই আমার শরীর। শ্রীরামকৃষ্ণ বারবার বলছেন – ব্রহ্ম আর শক্তি, কালী আর ব্রহ্ম অভেদ। এটাই আবার বেদান্তে যখন আসে তখন মায়ার একটা বিভাজন রেখা আনা হয়। সাংখ্যে প্রকৃতি আবার তন্ত্রে শক্তির একটা বিভাজন রেখা এসে যায়। শক্তির এই বিভাজনকেই এখানে বলা হচ্ছে।

ততো বিতিষ্ঠে ভুবনানু বিশ্বো তামূং দ্যাং বর্ষ্মণোপস্পৃশামি – সেই সমুদ্র বা সেই পরমাত্মার থেকে যখন আমার জন্ম হয় তখন সেখান থেকে আমি সমস্ত কিছুতে ছড়িয়ে পড়ি। *বর্ষ্মণ* মানে কারণভূত, *উপস্পৃশামি* মানে স্পর্শ করা, আমিই সব কিছুর কারণ আর আমার শরীরের দ্বারা সব লোককে আমি স্পর্শ করে আছি, আর

সব জীবের মধ্যে আমি প্রবেশ করি। মূল ভাব হল – যিনি নিরাকার ঈশ্বর, তাঁর থেকে যখন শক্তির প্রকাশ হয় তখন সেই শক্তি থেকেই আকাশ, অন্তরীক্ষ, পৃথিবী, সমস্ত লোক, সমস্ত ভূত উৎপন্ন হচ্ছে।

সংক্ষেপে এই মন্ত্রের মূল অর্থ হল, আমার জন্ম পরমাত্মার মনে। সেই পরমাত্মার উপরে আমি আকাশকে জন্ম দিই, যেমন মরুভূমির উপর মরীচিকার জন্ম হয়। সৃষ্টিতে যা কিছু হয় সব আমার থেকেই সৃষ্ট হয় আর আমি সব কিছুকে স্পর্শ করে আছি। সব কিছুর মধ্যে আমিই বিদ্যমান, আমার বাইরে কোথাও কিছু নেই। এবার বলছেন, পাথর থেকে শুরু করে দেবতা পর্যন্ত যাবতীয় যা কিছু সব *মম কারণ ভূতম্ ব্রহ্ম চৈতন্যম্*। ব্রহ্ম চৈতন্য আমি, ব্রহ্ম চৈতন্য আছেন বলেই সব কিছু হয়েছে।

অহমেব বাত ইব প্রবাম্যারভমাণা ভুবনানি বিশ্বা।
পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যৈ তাবতী মহিনা সংবভূব।।৮।।

বাতাসের গতি যেমন অবারিত, তাকে কেউ বাধা দিতে পারে না, ঠিক সেই রকম সৃষ্টিতে যাবতীয় যা কিছু আছে এই সব কিছুতে আমিই ছেয়ে আছি, সব কিছুকে আমিই চালাই। ঠাকুর অনেকবার বলছেন – তাঁর ইচ্ছা ছাড়া গাছের পাতাটিও নড়ে না। আমরাও বলতে থাকি ঠাকুরের ইচ্ছাতেই সব কিছু হচ্ছে, যদিও আমরা বেশির ভাগ না বুঝেই এই কথা বলি। কিন্তু যিনি জানেন চৈতন্য ছাড়া কিছু নেই, যে জানে ইলেক্ট্রিসিটি ছাড়া পাখা, আলো, ফ্রিজ, ওভেন কিছুই চলবে না, তিনিই বলতে পারেন তাঁর ইচ্ছা ছাড়া কিছুই হয় না। চৈতন্য ছাড়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কিছুই চলতে পারবে না। ইলেক্ট্রিক ইঞ্জিন চলছে সেটাও তাঁর ইচ্ছাতেই চলছে, গাছের পাতা নড়ছে সেটাও তাঁর ইচ্ছাতেই নড়ছে। কিন্তু ইলেক্ট্রিকসিটির ব্যাপারটা যে জানে না সে নানা রকমের ভুল করবে। যিনি ইলেক্ট্রিক ইঞ্জিনিয়ার তিনি সবটাই জানেন। পরমাত্মার তত্ত্বকে যিনি জেনে গেছেন তিনি জানেন সবটাই চৈতন্যের শক্তিতে তাঁর ইচ্ছাতেই চলছে। *অহমেব বাত ইব প্রবাম্যারভমাণা ভুবনানি বিশ্বা*, বায়ু যেমন জগতের প্রাণন ক্রিয়াকে চালাচ্ছে, ঠিক তেমনি আমি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে চালনা করছি।

পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যৈ তাবতী মহিনা সংবভূব, ত্রিভুবনে যাবতীয় যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে, তার যে রূপ, তার আকার, তার গুণ, বৈশিষ্ট্য সব আমার থেকেই হয়েছে। দেবী বলছেন – এই পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, স্বর্গ আমার শক্তিতেই হয়েছে কিন্তু এই সব কিছুর থেকে আমি আরও বিরাট। পুরুষসূক্তমে বলছে – *ত্রিপাদূর্ধ্ব*, গীতাতে বলা হচ্ছে – *একাংশেন স্থিতো জগৎ*, মানে ভগবানের যে ছোট্ট অংশ ঐটুকুতেই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যা কিছু, বাকী তিন চতুর্থাংশের এর বাইরে। এই তিন চতুর্থাংশ নিরাকার, কোন আকার নেই। দেবীও ঠিক একই কথা বলছেন *পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যৈ* – স্বর্গলোক, অন্তরীক্ষলোক, ভূর্লোক এগুলোরও পারে আমি। *তাবতী মহিনা সংবভূব* – দেবী নিজের মহত্ত্বের কথা বলে বলছেন। *মহিনা* শব্দকে এনারা বলছেন *মহিম্না*, বেদের সংস্কৃত একটু অন্য ধরণের। যা কিছু ভালো সেটাই আমার সব কিছু নয়। দেবতারা যে তাদের শক্তি দেখাচ্ছে সেই শক্তি আমার থেকেই এসেছে, ধন, সম্পদ, বল, জ্ঞান, মহৎ গুণ সবই আমার জন্য। আর আমি ভগবানের সাথে এক, আলাদা কিছু নয়। যখন আমি নিজেকে প্রকাশ করতে চাইব তখনই এই সৃষ্টির খেলা শুরু হয়, কিন্তু আমি এই সৃষ্টি থেকে অনেক অনেক উপরে।

ভক্তরা বলেন ঈশ্বরই সব কিছু হয়েছেন, কিন্তু বেদে ঈশ্বর শব্দ সেই অর্থে আসে না। শক্তির ধারণা দেবীসূক্তমে খুব পরিষ্কার ভাবে আসছে। পরমাত্মা বা ব্রহ্মের রূপ কখনই পাল্টায় না, শক্তিরই রূপ পাল্টায়। ব্রহ্ম নির্গুণ নিরাকার, যেখানে গুণ, রূপ থাকবে সেখানেই পরিবর্তন আসবে। যেমন লাল রঙের কোন বস্তু, আজকে লাল দেখাচ্ছে কাল লাল রঙ পাল্টে যেতে পারে। যেটা সুগন্ধ যুক্ত কাল তার সুগন্ধ চলে যেতে পারে। আজ যেটা ভালো কাল সেটা খারাপ হয়ে যাবে। আজ যেটা খারাপ কাল সেটাই ভালো হয়ে যেতে পারে। কিন্তু ব্রহ্ম এর সব কিছুর পারে। যাঁর কোন গুণ নেই, আকার নেই তাঁর কোন transformation হবে না। অথচ প্রতিনিয়ত আমরা সব কিছুর transformation দেখতে পাচ্ছি, এর ব্যাখ্যা করা যাবে না। তাই বলা হয় যোগীরা ধ্যানের গভীরে গিয়ে যেটা হতে পারে না অথচ হয়েছেন এই ব্যাপারটা বুঝতে পারেন। দেবীসূক্তমে

এই জিনিসটাই বলা হচ্ছে, বাক্ ঋষিকা যাঁর অনুভূতি হয়ে গেছে, তিনি বলছেন সব কিছু আমিই হয়েছি; আমি এই আকাশের বাইরে, আমাকে সীমাবদ্ধ করা যায় না, অথচ আমিই সব কিছু হয়েছে।

নাসদীয়সূক্তম্, পুরুষসূক্তম্, গায়ত্রীমন্ত্র এবং শেষে দেবীসূক্তম্ আলোচনার মাধ্যমে বেদের দর্শনটা কি আমরা জানবার ও বোঝবার চেষ্টা করলাম। বেদের দর্শনের একটা চিত্র তুলে ধরার জন্য এই আলোচনা করা হল। এরপর আরেকটি সূক্তম্ যেটা পাশা খেলাকে নিয়ে বলছে তার খুব অল্প আলোচনা করতে যাচ্ছি। এর মধ্যে খুব সুন্দর একটা মন্ত্র আছে। পাশ্চাত্যের পণ্ডিতরা এই মন্ত্রকেই একটা মামুলি জাগতিক কবিতা বলে মনে করে। কবিতার একেবারে শেষের দিকে বলছেন – হে ভাই, তোমরা শোন, তোমরা কেউ জুয়া খেলতে যেও না, জুয়া খেলা বন্ধ করে মন দিয়ে ভালো করে চাষবাস কর। চাষবাস করে যা অর্থ উপার্জন করবে তাতেই আনন্দে থাকো। হে জুয়াড়ি, তোমার যাবতীয় যা কিছু ধন-সম্পদ ছিল, জুয়া খেলে সব চলে গেল।

জুয়া খেলা বা আগেকার দিনের পাশা খেলার রোগটা যুধিষ্ঠিরেরও ছিল। স্তোত্রে পাশার ঘুটি গুলোকে একটা শক্তি রূপে দেখান হচ্ছে, তবে অশুভ শক্তি রূপে। তাকে প্রার্থনা করা হচ্ছে – হে পাশা, আমাদের উপরে আনন্দ বর্ষণ কর। কিভাবে আনন্দ দিতে বলছে? বলছে – তুমি যাকে জাপটে ধরবে সে সব দিক দিয়ে শেষ, সেইজন্য মাথা নত করে তোমার কাছে প্রার্থনা করি আমাকে তুমি জড়িয়ে ধরো না। তোমার সব ক্রোধ, তোমার সব শক্তি দিয়ে তুমি আমার শত্রুদের ভালোবেসে জড়িয়ে ধরো। হে দ্যুত তুমি আমার দিকে দৃষ্টি না দিয়ে আমাদের শত্রুদের প্রতি দৃষ্টি দাও। তারাই জুয়া খেলুক। এখানে বলা হচ্ছে না যে আমি জুয়া খেলায় জিতি আর আমার শত্রুরা হেরে যাক। বলা হচ্ছে জুয়া খেলার নেশাটা যেন অন্য দিকে যায়। এখানে যিনি প্রার্থনা করছেন আগে তাঁর খুব জুয়া খেলার নেশা ছিল। বেদের একটা ধারণা ছিল, যে কোন শক্তি তা শুভই হোক আর অশুভই হোক, সবারই একটা সত্তা বা মুর্তরূপ আছে। সেই সত্তাকে যদি এভাবে প্রার্থনা করা হয় তাহলে সেই সত্তা তার খারাপ প্রভাব থেকে মুক্ত করে ভালোর দিকে নিয়ে যাবে। এখানেও ঠিক তাই হচ্ছে, যদি কারুর জুয়া খেলার নেশা থাকে আর সে যদি এই মন্ত্র পাঠ বা জপ করে তাহলে তার জুয়া খেলার নেশাটা একেবারে চলে যাবে।

এখানেই আমরা বেদের আলোচনা শেষ করছি। আগেও বলা হয়েছে, সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করা এক মনুষ্য জন্মে কখনই সম্ভব নয়, বিশেষ করে বর্তমান যুগে। তবুও আলোচনার মাধ্যমে বেদ কি বলতে চাইছে, বেদের মূল উদ্দেশ্য ও বক্তব্যকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হল। স্বামীজী বলছেন, ভারতের জাতীয় সুর হল বেদ, সেইজন্য সম্পূর্ণ বেদ অধ্যয়ন যদিও সম্ভব নয় কিন্তু বেদ সম্বন্ধে একটা স্বচ্ছ ধারণা প্রত্যেক ভারতবাসীর থাকা উচিত। ভারতের জাগতিক ও আধ্যাত্মিক অভ্যুদয় বেদের ধর্ম ও দর্শনকে অবহেলা করে কখনই সম্ভব নয়। স্বামীজী তাই বলতেন, সেইদিন কবে আসবে যেদিন ভারতের ঘরে ঘরে বেদের পূজা হবে। এই আলোচনা পড়ার পর কারুর যদি বেদের ব্যাপারে একটুও স্বচ্ছ ধারণা হয়ে থাকে এবং আরও গভীর ভাবে বেদ অধ্যয়ন করার অনুপ্রেরণা লাভ করে, তাহলে বুঝব আমাদের এই আলোচনা সার্থক হয়েছে। এই বলে ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর চরণে আমাদের প্রণাম নিবেদন করে এতদিনের বেদ আলোচনা শেষ করছি।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

।।ওঁ শ্রীরামাকৃষ্ণারর্পণমস্তু।।

সূচীপত্র

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	ভারতের জাতীয় সুর	১
২	শব্দের শক্তি	৪
৩	বেদ ও সনাতন সত্য	৫
৪	ধর্ম ও ধর্মের গতি-প্রকৃতি	৭
৫	বেদের বিশালত্ব	৯
৬	হিন্দু ধর্মের অন্যান্য আনুষাঙ্গিক শাস্ত্রের সাথে বেদের সম্পর্ক	১০
৭	আস্তিক দর্শন ও নাস্তিক দর্শন	১১
৮	বেদের আলোচনার মূল কেন্দ্রবিন্দু পুরুষার্থ	১১
৯	বেদ শব্দের অর্থ	১৫
১০	বেদের পাঁচটি নাম ও বেদের ধর্ম সাধন	১৯
১১	বেদ অনন্ত	২৬
১২	চার্বাকদের বিরুদ্ধে মীমাসংকদের যুক্তি	৩০
১৩	শব্দের জন্ম	৩১
১৪	তত্ত্ব ও তথ্য	৩৩
১৫	বেদের প্রাচীনত্ব	৩৫
১৬	ভাব, শব্দ ও বস্তু	৩৮
১৭	আর্যরা কি বহিরাগত	৪১
১৮	ম্যক্সমুলারের অবদান	৪৪
১৯	বেদ মুখস্ত করার প্রাচীন কয়েকটি পদ্ধতি	৪৭
২০	বেদ ও বেদব্যাস	৫০
২১	বৈদিক অভিধান নিরুক্তে অগ্নি শব্দের বিভিন্ন অর্থ	৫৩
২২	বেদমন্ত্রের ব্যক্তি থেকে নৈর্ব্যক্তিক, মূর্ত থেকে অমূর্তের দিকে অগ্রসর	৫৪
২৩	বেদের বিভিন্ন আনুষাঙ্গিক শাস্ত্র	৫৭
২৪	বেদের বিভিন্ন শাখার উৎপত্তি	৫৮
২৫	বেদের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য	৬০
২৬	অগ্নি দেবতা	৬৫
২৭	অগ্নিসূক্তম	৬৮
২৮	বেদের ধর্ম	৮৯
২৯	বেদের দেবতা	৯২
৩০	অসুর, দৈত্য ও দানব	৯৯
৩১	পিতৃগণ ও পিতৃলোক	১০১
৩২	বেদের আচার পদ্ধতি ও বিধি-নিষেধ	১০৫
৩৩	বেদের নৈতিকতা	১০৭
৩৪	বেদ ও আত্মার ধারণা	১০৮
৩৫	কর্মবাদ ও মুক্তির ধারণা	১১১
৩৬	সৃষ্টির ব্যাপারে বেদের দুটি মত	১১৩
৩৭	অনন্তের ভাবনা	১১৫
৩৮	ভয় ও পাপ বোধের ধারণা	১১৭
৩৯	বহির্জগৎ থেকে অন্তর্জগতের দিকে যাত্রা	১২১
৪০	বেদের পরবর্তিকালে বেদের প্রভাব	১২৩

৪১	ইন্দ্র দেবতা	১২৭
৪২	বরুণ দেবতা	১২৮
৪৩	বিষ্ণু ও একাদশ রুদ্র	১২৮
৪৪	বেদের ঋষি	১৩০
৪৫	বেদের যজ্ঞ	১৩২
৪৬	শাস্ত্রের প্রথম সংজ্ঞা	১৪১
৪৭	মানসিক যজ্ঞ	১৪১
৪৮	আধ্যাত্মিকতায় উত্তরণ	১৪২
৪৯	মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ	১৫৩
৫০	উপাচার, প্রার্থনা, জপ ও তপস্যার বিবর্তন	১৬৮
৫১	অমরত্বের সন্ধান	১৭২
৫২	ত্যাগ বৈরাগ্যের ধারণা	১৭৩
৫৩	বেদাঙ্গ	১৭৫
	মন্ত্র ও সূক্তম্	১৭৮-৪৭৫
৫৪	ওঁ সহ নাববতু। সহ নৌ ভুনক্তু।	১৮১
৫৫	ওঁ শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ। শং নো ভবত্বর্যমা।	১৮৬
৫৬	ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা	১৯১
৫৭	ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে	১৯৩
৫৮	সংজ্ঞানা সূক্তম্	১৯৪
৫৯	হিরণ্যগর্ভসূক্তম্	১৯৯
৬০	অভয়সূক্তম্	২২১
৬১	সভাসূক্তম্	২৩৫
৬২	ইন্দ্রস্য নু বীর্যাণি প্র বোচং যানি চকার প্রথমানি বজ্রী	২৩৮
৬৩	যশ্যাশ্বসঃ প্রদিশি যস্য গাবো যস্য গ্রামা যস্য বিশ্বে রথাসঃ	২৩৯
৬৪	ন যং জরন্তি শরদো ন মাসা ন দ্যাব ইন্দ্রমবকর্শয়ন্তি	২৪১
৬৫	রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায়	২৪১
৬৬	রাত্রিসূক্তম্	২৪৮
৬৭	জাতবেদসে সুনবাম সোমমরাতীয়তো দহাতি ব্যাদঃ	২৫২
৬৮	তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ	২৫৪
৬৯	ত্রীণি পদা বি চক্রমে বিষ্ণুর্গোপা অদাভ্যঃ	২৫৫
৭০	সত্যেনোত্তভিতা ভূমিঃ সূর্যেণোত্তভিতা দ্যৌঃ	২৫৯
৭১	সোমং মন্যতে পপিবান্যৎসম্পিংষন্ত্যোষধিম্	২৫৯
৭২	সোমেনাদিত্যা বলিনঃ সোমেন পৃথিবী মহী	২৬০
৭৩	ত্রাতা নো বোধি দহশান আপিরভিখ্যাতা মর্ডিতা সোম্যানাম্	২৬০
৭৪	যো নঃ পিতা জনিতা যো বিধাতা ধামানি	২৬২
৭৫	প্র ভ্রাতত্বং সুদানবোহধ দ্বিতা সমান্যা	২৬৭
৭৬	অগ্নিং মন্দ্রং পুরুপ্রিয়ং শীরং পাবকশোচিষম্	২৬৯
৭৭	ত্রাতারমিন্দ্রমবিতারমিন্দ্রং হবেহবে	২৭১
৭৮	মূষো ন শিশ্না ব্যদন্তি মাধ্য স্তোতারং তে শতক্রতো	২৭২
৭৯	ত্বং হি নঃ পিতা বসো ত্বং মাতা শতক্রতো বভূবিথ	২৭৫
৮০	অগ্নিং মন্যে পিতরমগ্নিমাপিমগ্নিং ভ্রাতরং সদমিৎসখায়ম্	২৭৬
৮১	যস্তে স্তনঃ শশয়ো যো ময়োভূর্যেন বিশ্বা পুষ্যসি বার্যাণি	২৭৯

৮২	অথং বেনশ্চোদয়ৎ পৃশ্নিগর্ভা জ্যোতির্জরায়ু	২৮১
৮৩	পরি ত্বা গির্বণো গির ইমা ভবন্তু বিশ্বতঃ	২৮২
৮৪	অথং বেনশ্চয়োদয়ৎ পৃশ্নিগর্ভা জ্যোতির্জরায়ু রজসো বিমানে	২৮৪
৮৫	বেনস্তৎ পশ্যন্ নিহিতং গুহা সদ্ যত্র বিশ্বং	২৮৪
৮৬	দোহেন গামুপ শিক্ষা সখায়ং প্র বোধয়	২৮৭
৮৭	অচ্ছা ম ইন্দ্রং মতয়ঃ স্বর্বিদঃ সধ্রীচীর্বিশ্বা উশতিরনূষত	২৮৭
৮৮	দেবো ন যঃ পৃথিবী বিশ্বধায়া উপক্ষেতি	২৮৮
৮৯	মাকির্ন এনা সখ্যা বি চৌষুস্তব চেন্দ্র বিমদস্য চ ঋষেঃ	২৮৯
৯০	বিশোবিশো বো অতিথি বাজয়ন্তঃ পুরুপ্রিয়ম্	২৯০
৯১	বয়ং ঘা তে ত্বে ইদ্বিন্দ্র বিপ্রা অপি ষ্মসি	২৯১
৯২	ত্বয়েদিন্দ্র যুজা বয়ং প্রতি ব্রুবীমহি স্পৃধঃ	২৯৩
৯৪	যদগ্নে স্যামহং ত্বং ত্বং বা ঘা স্যা অহম্	২৯৪
৯৫	মহে চন ত্বামদ্রিবঃ পরা শুল্কায় দেয়াম্	২৯৫
৯৬	ইন্দ্র ক্রতুং ন আ ভর পিতা পুত্রেভ্যো যথা	২৯৮
৯৭	পূর্বো জাতো ব্রহ্মণো ব্রহ্মচারী ধর্মং	২৯৮
৯৮	ব্রহ্মচারী সিঞ্চতি সানৌ রেতঃ পৃথিব্যাং	৩০২
৯৯	আচার্য উপনয়মানো ব্রহ্মচারিণং কৃণুতে গর্ভমন্তঃ	৩০৫
১০০	ব্রহ্মচর্যেণ তপসা রাজা রাষ্ট্রং বি রক্ষতি	৩০৫
১০১	ব্রহ্মচর্যেণ তপসা রাজা রাষ্ট্রং বি রক্ষতি......	৩০৫
১০২	অক্ষেত্রবিৎ ক্ষেত্রবিদং হ্যপ্রাট্ স প্রৈতি	৩০৮
১০৩	গণানাং ত্বা গণপতিং হবামহে	৩১৪
১০৪	ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্যস্মিন্দেবা	৩১৬
১০৫	ব্রতেন দীক্ষাম্ আপ্নোতি দীক্ষয়াপ্নোতি দক্ষিণাম্	৩১৮
১০৬	বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং	৩২০
১০৭	ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমাগ্নিমাহুরথো দিব্যঃ	৩২২
১০৮	তদেবাগ্নিস্তদাদিত্যস্তদ্ বায়ুস্তদ্ উ চন্দ্রমাঃ	৩২৩
১০৯	ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্ যশঃ	৩২৩
১১০	তাবাংস্তে মঘবন্ মহিমোপো তে তন্বঃ শতম্	৩২৪
১১১	স পর্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং	৩২৪
১১২	উতেয়ং ভূমির্বরুণস্য রাজ্ঞ উতাসৌ	৩২৪
১১৩	সবিতা পশ্চাতাৎসবিতা পুরস্তাৎ	৩২৫
১১৪	ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্ধনম্	৩২৫
১১৫	ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমান্ অসি ত্বং উত বা কুমারী	৩২৬
১১৬	অকামো ধীরো অমৃতঃ স্বয়ম্ভূ রসেন তৃপ্তো	৩২৭
১১৭	চত্বারি বাক্পরিমিতা পদানি তানি	৩২৯
১১৮	আ বিবাধ্যা পরিরারস্তমাংসি চ জ্যোতিষ্মন্তং	৩৩১
১১৯	বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরা সুব	৩৩১
১২০	ইয়ং যা নীচ্যর্কিণী রূপা রোহিণ্যা কৃতা	৩৩২
১২১	উচ্ছন্তি যা কৃণোষি মংহনা মহি প্রখ্যৈ	৩৩২
১২২	অগ্নির্জ্যোতির্জ্যোতিরগ্নিরিন্দ্রো জ্যোতির্জ্যোতিরিন্দ্রঃ	৩৩২
১২৩	ব্রহ্মা দেবানাং পদবীঃ কবিনামৃষির্বিপ্রাণাং	৩৩৩
১২৪	মন্যে ত্বা যজ্ঞিয়ং যজ্ঞিয়ানাং মন্যে	৩৩৩

১২৫	শ্রিয়ে তে পাদা দুব আ মিমিক্ষুর্ধৃষ্ণুর্বজ্রী	৩৩৪
১২৬	দ্যাবা চিদস্মৈ পৃথিবী নমেতে শুষ্মাচ্চিদস্য	৩৩৪
১২৭	অপশ্যং গোপামনিপদ্যমানমা চ পরা	৩৩৪
১২৮	মা ন একস্মিন্নাগসি মা দ্বয়োরুতো ত্রিষু	৩৩৫
১২৯	চক্ষুর্নো ধেহি চক্ষুষে চক্ষুর্বিখ্যৈ তনুভ্যঃ	৩৩৫
১৩০	সত্যং বৃহদৃতমুগ্রং দীক্ষা তপো ব্রহ্ম যজ্ঞঃ	৩৩৫
১৩১	গৃণামি তে সৌভাগত্বয় হস্তং, ময়া পত্যা	৩৩৬
১৩২	সম্রাজ্ঞী শ্বশুড়ে ভব, সম্রাজ্ঞী শ্বশ্রাং ভব	৩৩৬
১৩৩	উদীর্ষ্ব নার্যমি জীবলোকং, গতাসুম্ এতম্	৩৩৭
১৩৪	নাসদীয়সূক্তম্	৩৩৭
১৩৫	পুরুষসূক্তম্	৩৮৬
১৩৬	গায়ত্রীমন্ত্র	৪৩৩
১৩৭	দেবীসূক্তম্	৪৫২